ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ; পৌষ—১৩৭০—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

মাসানুক্রমিক—চিত্রসূচী

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ৪ঠা আষাঢ়ের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

প্রসাধন

—শৌখিন সমাজে অভিনয়যোগ্য উচ্চপ্রশংসিত নাটকসমূহ—

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

বিরাজ-বৌ ২৲ কাশীনাথ ২৲
বিন্দুর ছেলে ১-৫০
রামের সুমতি ১-৫০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

জনা ২-৫০, প্রফুল্ল ২-৫০, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ১-৫০, নল-দময়ন্তী ২৲, বুদ্ধদেব-চরিত ২৲

রমেশ গোস্বামী প্রণীত

কেদার রায় ২-৭৫

অনুরূপা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে

মহা... ২-৫০

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ইরাণের রাণী ১-৫০
কর্ণার্জ্জুন ২-৫০, ফুল্লরা ২৲,
সুদামা ১-২৫, অপ্সরা ০-৩৭

তারক মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপ্রসাদ ১-৫০

যামিনীমোহন কর প্রণীত

মিটমাট ০-৭৫ প্রহেলিকা ০-৭৫

নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত

বঙ্গেবর্গী ২-৫০, পথের শেষে ও ধর্ষিতা (একত্রে)—৫-৫০
দেবলাদেবী ২-৫০,
ললিতাদিত্য ২৲

মনোমোহন রায় প্রণীত

রিজিয়া ১-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

আলিবাবা ১৲, নর-নারায়ণ ২-৭৫
প্রতাপ-আদিত্য ২-৭৫
আলমগীর ২-৫০,
রত্নেশ্বরের মন্দিরে ০-৭৫,
ভীষ্ম ২-৭৫, বাসন্তী ০-২৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

রাণাপ্রতাপ ২-৫০, দুর্গাদাস ২-৫০,
সাজাহান ২-৫০, মেবারপতন ২-৫০,
পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২৲,
সোরাব-রুস্তম ১-২৫, পুনর্জন্ম ১-০০,
চন্দ্রগুপ্ত ২-৫০, বিরহ ২৲
সীতা ২৲, সিংহল-বিজয় ২-৫০
ভীষ্ম ২-৫০, নূরজাহান ২-৫০

নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে
দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত নাট্যরূপ

শ্যামলী ১-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাধীনতা ২৲
হর-পার্ব্বতী ১-২৫
সিরাজদ্দৌলা ২৲
সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি ১-২৫

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

আত্ম-উচ্ছ্ব ৪-৫০
রাতকাণা—বীরবাজা এবং মুখের মত

কানাই বসু প্রণীত

গৃহপ্রবেশ ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অহল্যাবাঈ ১৲, ঝান্সীর রাণী ২৲

মন্মথ রায় প্রণীত

মরা হাতী লাখ টাকা ১-২৫,
অশোক ২৲, সাবিত্রী ২৲,
চাঁদসদাগর ২৲, খনা ২৲,
জীবনটাই নাটক ২'৫০,
কারাগার, মুক্তির ডাক ও মহুয়া (একত্রে) ৩-৫০
মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল ও রঘুডাকাত (একত্রে) ৩৲
ধর্মঘট, পথে বিপথে, চাষীর প্রেম, আজব দেশ (একত্রে) ৪৲
একাঙ্কিকা ৫৲ নবএকাঙ্ক ৩৲
কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎ পর্ণা—রাজনটী—রূপকথা (একত্রে) ৩৲
সাঁওতাল বিদ্রোহ—বন্দিতা—দেবাসুর (একত্রে) ৩৲
মহাভারতী ২-৫০
ছোটদের একাঙ্কিকা ২৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বন্ধু ১-৭৫

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত

সমাজ ১-২৫

রেণুকারাণী ঘোষ প্রণীত

রেবার জন্মতিথি ১-২৫

তুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত

ছেঁড়া তার ২৲, পথিক ২-২৫

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রণীত

মন-প্যাখি ২৲

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

পৌষ—১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাজগৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন অংশে বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রধান হয়ে অবস্থান করিতেছে। আদ্যাশক্তি অ, উ, ম আকারে স্পন্দিত হয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়শক্তিরূপে পরিণত হয়ে বিশ্বকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা কেন্দ্রস্বরূপ। ইঁহাকে বিষ্ণুনাভি [illegible] হয়। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিগণকে ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া ধরা হয়। ইঁহারা পুরাণমতে বশিষ্ঠ, অত্রি, মরীচি অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু। ঋগ্বেদের সপ্তর্ষির নাম বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, কশ্যপ, গৌতম, অত্রি ও ভরদ্বাজ। ব্রহ্মলোকে ওঁকারবিশিষ্ট সামগান হয়। ব্রহ্মভাব তেজোদীপ্ত, রক্তিমবর্ণ, পরমতঃ নিষ্কাম ও শুদ্ধভাববিশিষ্ট। ব্রহ্মভাব ও শৈবভাবে তত্ত্বে কেবল অদ্বৈত কথাটিই প্রযোজ্য। অদ্বৈতে তত্ত্ব আছে, লীলার কোন স্থান নেই। যদিও স্বয়ং ব্যাসদেব বলেছেন, 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'। বিষ্ণুলোক লীলার অন্তর্গত। 'লীলা' কথাটি সম্পূর্ণভাবে এখানে প্রযোজ্য। যদিও পুরুষ ও প্রকৃতি অংশ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মময়ী বা ব্রহ্মাণীগণ বাস করেন। শিবলোকে শিবানী বা হরের গৌরী এবং অন্যান্য পুরুষ প্রকৃতি অংশ ত আছেই। কেন্দ্রে মহাশক্তি মা মহামায়া আছেন। যাঁর কৃপাই একমাত্র আশ্রয়। জয় মা আনন্দময়ী। ব্রহ্মা তাঁর গোষ্ঠীসহ এই সৃষ্টিকে পালন ও ধারণ করে আছেন।

ইহাকেই কেন্দ্রশক্তি বা বিষ্ণুনাভি বলা হয়। ব্রহ্ম 'নিরাকার নির্ব্বিকল্প রূপ। 'অহং' বোধ না থাকিলেও সেখানে চেতনার সাড়া রয়েছে। ব্রহ্মমুক্তিকে নির্ব্বাণমুক্তি বলা হয়। ব্রহ্ম প্রজ্ঞার অতীত। 'নান্তপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং ন প্রপঞ্চ উপশম। শান্তম্ শিবম্, তুরীয়ম্, অদ্বৈতম্, বিষ্ণুলোক পরিপূর্ণতা লাভ কোরেছে পুরুষ প্রকৃতির যুগল মিলনে। নারায়ণ শুদ্ধসত্ত্বের এবং নারায়ণী শুদ্ধসত্ত্বময়ী। রাধাকৃষ্ণ পরিপূর্ণতা লাভ কোরেছে ওঁকারের মধ্যে। ইহাকে সাযুজ্যমুক্তি বলা হয়। ভগবানের শিবভাবকে দুই অংশে ভাগ করা যায়। মঙ্গলময় ও সংহারকর্ত্তারূপে। শিব হলেন জ্ঞানীবর, পূর্ণযোগে শয়ান। শিবমুক্তিকে সালোক্যমুক্তি বলা হয়। পাপ, তাপ, দুঃখ, গ্লানি, ভালমন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞান, পূর্ণযোগে বিশেষিত। অতএব কিছুই কিছু নয়। এগুলি সৃষ্টির এক একটি বিকারমাত্র। পুরুষ যখন জ্ঞ নময়, তিনি দ্রষ্টা ও সাক্ষীস্বরূপ। শুদ্ধাপ্রকৃতি তখন লীলায় আনন্দময়ী। ব্যক্তিগতজীবনে দেখা যায় পুরুষ যদি জ্ঞানহীন হয় এবং নারী যদি ব্যভিচারিণী হয়, ওঁকারের পূর্ণমিলন ত দূরের কথা, সাধারণ সাংসারিক জীবনও দুর্ব্বিসহ হয়। শিবের মঙ্গলরূপ পূর্ণজ্ঞান বিষ্ণুলোকের অন্তর্গত ভূলোকে অমিতভাবে ফলদান কোরেছে। শিব অংশে আচার্য্য শঙ্করাচার্য প্রমুখ মহাপুরুষগণের বেদান্তদর্শন কিংবা পতঞ্জলির যোগদর্শন, বুদ্ধের শূন্যবাদ কোনটাকেই অস্বীকার করিবার উপায় নেই। প্রেমভক্তিপথের মহাপুরুষগণের বেশীরভাগই শিব অংশ, বিষ্ণু আচ্ছাদিত। মূলতঃ ব্রহ্মারপুত্র সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিগণের অংশ বা পূর্ণঅংশ অনেক জায়গাতেই আছে। যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ এঁদের অন্তর্গত। আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই তাই। নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণ বিভিন্ন ভাববিশিষ্ট হয়ে এক একবার এক একভাবে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুলীলা সৃষ্টির ধারা, আর শিবকে সংহারকর্ত্তা বলা হয়। ধারাগতভাবে দুইটি বিভিন্ন। জন্মমৃত্যুর প্রবাহ বিপরীতমুখী দুইটি স্রোত বিভিন্ন হলেও মঙ্গলময় শিব পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, ইনিই মায়ের সিদ্ধিদাতা গণেশ, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীশক্তি। উৎসশক্তি বরাভয়দায়িনী মায়ের সঙ্গে এঁরাও আমাদের অগ্নিগোলকে বিষ্ণুশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শক্তি ও আনন্দলীলা বর্দ্ধন কোরেছেন। বিভিন্ন শক্তিপ্রবাহকে সংমিশ্রণে, ও ভিন্নভাবে সাধনে, প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ও প্রয়োগে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করা সম্ভব হয়েছে।

"চেতনাচেতনানাং", বহু চেতনার মধ্যে একমাত্র চেতনা। মূল স্বর বা প্রণবনাদ মহাচেতনার স্বর। মহাচেতনার বেদনায় জীবের দুঃখে স্পর্শকাতর হৃদয় মহামানবদের। মানুষ মানুষ কিসে? তার মনুষ্যত্ব চৈতন্যে। Human being a rational animal মানুষ যখন ঘোর কলিতে এসে পৌঁচেছে, দেখা যায় চেতনা আজ অবচেতনায় অবনমিত হয়েছে। চাই তাই পুনঃ পুনঃ নতুন কোরে চেতনার সঞ্চার—ভাগবতীশক্তি যে কেন্দ্র থেকেই আসুক না কেন। জীব আত্মকেন্দ্রিক অহংজ্ঞানসম্পন্ন অত্যাধিকমাত্রায় হয়ে পড়েছে। অবচেতনা যেন নিশ্চেতনায় না পৌঁছায়। তাই উপনিষদের ঋষি বলেছেন,

'তমসো মা জ্যোতির্গময়।'

জীবের তাই মহাশক্তির সাধন করা প্রয়োজন। ভগবান কৃপা করিবেন, মহামায়া কৃপা করিবেন। 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' প্রয়োজন তাগিদে মাত্রাযুক্ত হয়ে সৃষ্টিতে পরিপূরকভাবে এক অন্যে বা পরপর সকল কর্ম্মই সম্পন্ন হয়ে চলেছে। একটা প্রাকৃতিক নিয়মে সব বাঁধা। অস্বীকার করিবার উপায় নেই। Nature abhors the vacuum শূন্য স্থানই পূর্ণ হয়। পূর্ণ ত পূর্ণই, নতুন কোরে পূর্ণের প্রয়োজন হয় না। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" নিবৃত্তিই সাধনার চরম লক্ষ্য। কলিকে আজ সত্যযুগে ক্রমশঃই নিয়ে যেতে হবে। মায়ের কৃপা, ভগবানের কৃপার প্রয়োজন। যাঁর সৃষ্টি তিনিই দেখেন, নিশ্চয় আরো বেশী করে কৃপা বর্ষিত হবে। মোট ২৪০০ হাজার বছরে চারিযুগবিশিষ্ট এক কল্প হয়। এখন আমরা মধ্য সময়ে বা ঠিক কলির মাঝপথে এসে উপস্থিত হয়েছি। (জ্ঞানাবতার শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের লিখিত 'কৈবল্য দর্শনম্' পুস্তকটি দ্রষ্টব্য)

অত্যাধিক জড়বাদী আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, যদিও আমরা অনেক অনেক সংস্কারমুক্ত হয়েছি। ভগবান সবার,

সবাই একসূত্রে আবদ্ধ। 'সূত্রে মণিগণা ইব।' আগেকার দিনের শ্রেষ্ঠ নৃপতিরা নিজেদের প্রজাকে সন্তানতুল্যজ্ঞানে সেবা ও কর্ত্তব্যপালন কোরেছেন। ধর্ম্ম ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা তাঁদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দেখি। তাঁরা বীর্য্যের প্রতীক, দুর্ব্বলের সহায়ক। যতদিন এইভাব ছিল, ততদিন রাজা প্রজার কোন অহংগত চেতনামূলকভাবে ভেদ ছিল না। যতই দিন গেল কালের অবক্ষেপে ক্রমশঃই দেখা দিতে লাগল অহংজ্ঞানসম্পন্ন প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব। আঘাত প্রতিঘাত করে। 'তুমি যারে পশ্চাতে টানিছ সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' হে অহংজ্ঞানসম্পন্ন মূঢ় জীব, তুমি তোমাকেই অবহেলা করিতেছ। তুমি যে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—'প্রাণো বিরাট। বিভিন্ন ভাববিকারে হে ব্রহ্মা তুমি ব্যষ্টিভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতেছ। সে কথা তমসাচ্ছন্ন জীব ভুলে গেছে। তাই আজ মহামিলনের মন্ত্র, ... চেতনার মূলে যে ঘুণ ধরেছে তার চাই পরিণতি। এটাকে Scienceএর ভাষায় বলা হয় Potential Drop. যতটা তুমি অহংকারে ভাগবতী চেতনা বিচ্যুত হয়ে নিজেকে বড় ভাববে, ততটাই নিজেকে ছোট কোরে ফেলবে নীচের সঙ্গে মিশে গিয়ে। ইহাকেই বলে অহংকারের পতন।' অর্থসম্পদ বা ধন ঐশ্বর্য্য মানুষকে প্রতিক্রিয়াশীল করে না—করে নিয়মনোভাব। এদেশে রাজার ছেলের সন্ন্যাসী হওয়ার উদাহরণ অজস্র। আজকের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ধর্মবিচ্যুত মানসিক অবচেতনার ফল এবং অন্যদিক দিয়ে সবার স্বার্থে দানস্বরূপ বলা যায়, তারতম্য যতই হোক না কেন। শুধু অর্থবৈষম্যই কারণ নয়, জীবন ও সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে একই জিনিষ চলিতেছে। নিষ্কামভাবে সাধনার প্রয়োজন, ধর্ম্মকে সংস্কারমুক্ত কোরে যথার্থভাবে প্রয়োগ কোরতে হবে। সবই আছে অথচ সাধন নেই। সেজন্য সব পাপের মূল 'অহং'এর নাশ হচ্ছে না।

অন্নময়কোষযুক্ত ভূলোকে খাদ্য সমস্যা নিদারুণ, না খেলে নয়। কিন্তু এটাই শেষ নয়। পঞ্চভূতের সমষ্টি এ দেহ গ্রহণ করে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমকে। মুলতঃ মন্ত্র দ্বারা দেহ তেজ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। "বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে সূচয়ে।" অগ্নিগোলকে সৌরতেজেই প্রাণশক্তি। Cosmic Salvation কথাটি এখানে বেশ প্রযোজ্য। যে যত পরিমাণে এই তেজ গ্রহণ কোরতে পারবে, ততই তার ভাল। মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদির সঙ্গে তাই প্রাণায়ামের এত সুন্দর ব্যবস্থা। 'জামদগ্নিঃ ঋষিঃ অনুষ্টুপছন্দ অগ্নির্দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।' 'দিব' ধাতু দেবতা। 'দিব' কথার অর্থ তেজ বা জ্যোতি। দেবলোক মানে জ্যোতির্ময়লোক। এই আনন্দময় লোক জ্যোতিরই প্রকাশ। সুতরাং প্রাণায়াম পদ্ধতিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনই বলা যায়।

এখন ধর্ম্মকে ভাষাগতভাবে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ কোরে দেখা যাক্। 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয়যোগে 'ধর্ম' পদ নিষ্পন্ন। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। "ধর্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ ধর্মং পরমং বদন্তি।" জ্ঞান বা মহাচেতনার সাহায্যে পরব্রহ্মকে ধারণ করাই হল ধর্ম্মের শেষ কথা। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, "যোগ্যতাবচ্ছিন্নাধর্মিণঃ শক্তিরেব ধর্মঃ. যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্মীর বা পদার্থের কার্য্যসাধিকা শক্তিই ধর্ম"। অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুমাত্রই বিভিন্নভাবে যে গুণ ও শক্তির পরিচয় দিচ্ছে তাহা নিজ নিজ ধর্মেরই পরিচয় বহন করে। সব শক্তিই মহাশক্তিতে এবং সব চেতনাই মহাচেতনাতে সংযুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং ধর্ম সম্পূর্ণতালাভ কোরেছে শক্তি ও চেতনার পূর্ণমিলনে ও সার্থক রূপায়নে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার কোরলে দেখা যায় ধর্ম্ম সর্ব্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। আমাদের Electronci theory মতে কেন্দ্রবিন্দু বা neucleus মূলকেন্দ্রশক্তি। যেটাকে কেন্দ্র কোরে অন্যান্য অণুপরমাণু আশ্রয় কোরে আছে। সেইরকম তার নিকটবর্ত্তী অপর একটি কেন্দ্রশক্তিকে কেন্দ্র কোরে আরও অণু পরমাণু আশ্রয় কোরে আছে। এ যেন একটা জাল। প্রত্যেক বিন্দুই শক্তিসম্পন্ন, যতই কেন্দ্রের দিকে ততই শক্তি অধিক। একইপ্রকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মূলশক্তিস্বরূপ এবং এক একজন লোকেশ্বর নিজ লোকের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপ। আমরা জীবমাত্রই নিজ সীমা, শক্তি ও ক্ষমতানুযায়ী সীমাবদ্ধ। যতই অগ্রসর হওয়া যায়, অবিদ্যা দূরীভূত হয়, ততই ক্ষুদ্রতা অপসারিত হয়ে বিরাটাকারে স্ফুরিত হয়। সেইরূপ কেন্দ্রশক্তি বা তাহার নিকটবর্ত্তী ঋষিগণ বিরাট বোধে ও পরমচেতনায় অবস্থান

করিতেছেন। গৃহস্বামীর মতামতের উপর যেমন পারিবারিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ এই মহানদের ইচ্ছায় সৃষ্টির মঙ্গল অনেকাংশে নির্ভর করে। এই কেন্দ্রশক্তিকে central magnetic force বললে বুঝতে সুবিধা হয়। এটা যেন very powerful magnet, ভাগবতী মহাচেতনা ও মহাশক্তিতে শক্তিমান। অপর সকল শক্তিই অধীনস্থ। বিষ্ণুনাভিই হল universal magnetic centre কেন্দ্র থেকে যে যতই দূরে যাচ্ছে দেখা যায় চুম্বকীশক্তি ততই কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ ক্রমশঃই অবচেতনার ভাব বেড়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরান্তরে। সুরু বা মধ্যের কোন শক্তি নাই; জীব যদি অন্যায়, অসত্য কাজ করে, তবে তাহা সুচেতনাহীনতারই পরিচায়ক। ভগবান বা সত্য হতে হঠে যাচ্ছে। তাই প্রয়োজন অধ্যাত্মসাধনার - যাহা শক্তি ও জ্ঞানদান করে। শুধু তাই নয়, সুরু বা মধ্যের কোন শক্তি যদি অবনতির দিকে যায় তো অধীনস্থ সবার উপরই তার প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃষ্ট হয়।

এই কেন্দ্রশক্তি সকল যেন Radio centre, এঁদের কাজই হল চেতনার বার্ত্তা, আনন্দের বার্ত্তা, আলোকের বার্ত্তা ও সকল মহতীভাবসমূহ জীবলোকের অন্তর্দ্দেশে সঞ্চারিত করা। এঁরাই জগৎবরেণ্য—মহান। সর্বাগ্রে জামদগ্নি ঋষি ও শ্রীশ্রীমুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা যাক। ইনিই আমাদের লোকেশ্বর। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। মহানদের কাজই হল সৃষ্টির যা কিছু ভাল সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা—আর শুধু বিলিয়ে দেওয়া, অবচেতনায় চেতনা সঞ্চার করা, মৃতে প্রাণ দেওয়া। এঁরাই আদর্শ। প্রেম, ত্যাগ ও জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে এঁদের মধ্যে বিরাজিত। জয়তু ভগবান। হে ভগবান, তোমাকে আজ আহ্বান করি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্যরচিত হৃদয়াসনে, নব-নবরূপে তুমি জন্মপরিগ্রহ কর দৈহিক সম্পর্ক বিরহিত আমাদের চিত্তলোকে :—

"উদ্যতে নমঃ, উদায়তে নমঃ, উদিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ, স্বরাজে নমঃ, সম্রাজে নমঃ॥"

('যোগীকথামৃত'—শ্রীশ্রীযোগানন্দগিরি)
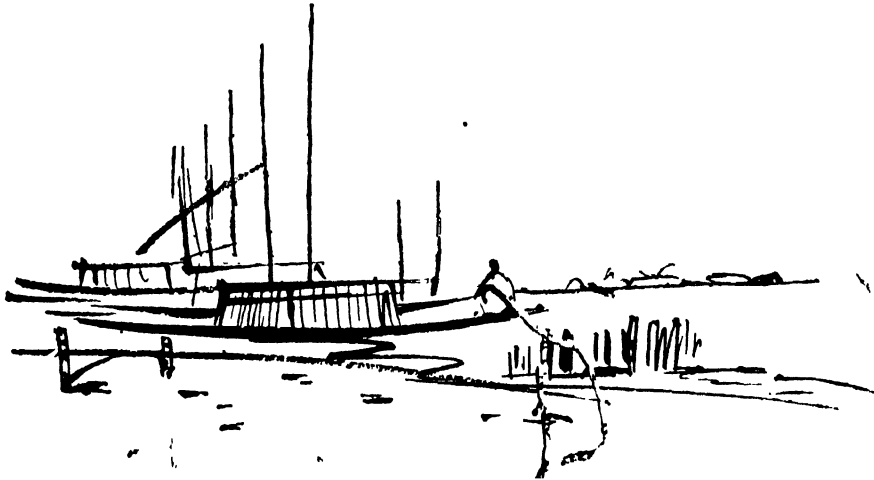
এ বি সি ডি

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

বহুদিন আগেকার কথা। আমরা থাকি ভবানীপুরে—পালিত ষ্ট্রীটে। ফাল্গুন মাস। কলকাতার লোকারণ্যে কোকিলের ডাক শোনা যায় না। তবে বসন্তের বাতাস নিঃশব্দ সংগীতে যৌবনের বাণী পৌঁছে দেয় কানে কানে। সকাল আটটা হবে। বাইরের ঘরে খবরের কাগজ খুলে বসেছি। কাছেই কলতলায় দৃশ্যকাব্য জমে উঠেছে নারী-পুরুষের বিচিত্র কলরবে। এমন সময় প্রসাদবাবু এসে হাজির। সংগে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক।

প্রসাদবাবু বললেন—পরিচয় করিয়ে দিই। মিস্টার এ্যালবিয়ন বিনোদচন্দ্র দাস। এডিনবরার গ্র্যাজুয়েট। কিছুকাল আগে এঁর লেখা বই 'Future of Christianity in India ইউরোপের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অনেক দেশ ঘুরেছেন, অনেক পড়াশুনাও করেছেন। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি জ্ঞান, যেমন জ্ঞানী তেমনি উদার—যাকে বলে 'a man of wide culture'। গুণী লোক, কিন্তু একটি দোষেই সব মাটি করেছে। কর্তৃপক্ষের সংগে বনিয়ে চলতে পারেন না। বাংলার বাইরে কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন—কোথাও বেশীদিন টিকে থাকেননি। সামান্য মতান্তর হয়েছে কি কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। নাগপুর বিসপ্‌স্ কলেজে আমরা চারজন বাঙালী ছিলাম। ইনি ছিলেন আমাদের 'লিডার'। এঁর প্রতিষ্ঠাও ছিল খুব। ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছিলেন অনেকখানি। তাদের কাছে ইনি এ বি সি ডি নামে পরিচিত ছিলেন। আমরাও এঁকে এ বি সি ডি ব'লেই ডাকি। আত্মভোলা প্রাণ-খোলা 'মাই ডিয়ার' মানুষ। আমাদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড় হলেও কোন ভেদাভেদ নেই। আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় এ বি সি ডি-র অনুপ্রেরণায় আমরা সকলেই কাজ ছেড়ে চলে এসেছি। এমন একটি মানুষের সংস্পর্শে আসা সত্যিই ভাগ্যের কথা। আপনিও নিশ্চয় খুশী হবেন।

অধ্যাপক এ বি সি ডিকে যথারীতি সংবর্ধনা জানালাম। এ বি সি ডি মানুষটি ছোটখাটো, গৌরবর্ণ, গোঁফ-দাড়ি কামানো। মাথার চুল পাতলা, চোখ দুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি। গায়ে ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে গ্লেজ্‌ড-কিডের নিউকাট। বেশ ফিটফাট—তবু মনে হয় প্রসাধনের ওপর পড়েছে প্রচ্ছন্ন অবসাদের ছায়া। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও চেহারায় মেলে স্বাস্থ্য ও শক্তির নিদর্শন। প্রৌঢ়দের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদল সহজে যৌবনকে ভুলতে চান না, আর একদল বার্ধক্যের বাঁশি শুনবার জন্য সারাক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। এ বি সি ডি প্রথম দলেই পড়েন। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় থাকেন? খুব কাছেই—ল্যান্সডাউন হাজরা রোডের মোড়ে বললেই চলে। দোতলা বাড়ি। সামনেই ফুটপাতে নিমগাছ। বাইরের বারান্দা থেকে বাঁ দিকে একটা কাঠের সিঁড়ি বরাবর দোতলায় উঠে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছেন?

—কী আশ্চর্য! এত কাছে আপনার বাড়ি অথচ আপনাকে জানতাম না।

—কি ক'রে জানবেন, কলকাতার সংগে কোন সম্পর্কই যে রাখতে পারিনি। 'লং ভেকেশন' এও বড় একটা আসতাম না। দেশভ্রমণের নেশা আমার ছেলে-বেলা থেকেই। তাছাড়া কলকাতার পরিবেশটাও আমার কাছে তেমন প্রীতিকর ছিল না। থাক সে কথা, এখন প্রয়োজনের বিষয় বলি। আমি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার একটা ইতিহাস লিখেছি। ভাবছি 'থিসিস্' হিসাবে ওটা 'সাবমিট' করব ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে।

তার আগে আপনার সংগে কিছু আলোচনা করতে চাই। ওয়েস্টার্ণ স্কলারদের 'রেফারেন্স'গুলোও আপনাকে একবার দেখিয়ে নিলে ভালো হয়। প্রসাদভায়া সেইজন্যেই আমাকে নিয়ে এসেছে আপনার কাছে।

অত্যন্ত সংকোচের সংগে বললাম—আপনার মতো অভিজ্ঞ পণ্ডিতের সংগে আলোচনা করবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি আপনার ছাত্রস্থানীয়।

ছাইদানে চুরুটটা ঠুকতে ঠুকতে এ বি সি ডি বললেন—সে কি কথা! আমি ইতিহাসের ছাত্র, আর আপনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। আপনার সাহায্য আমার দরকার বই কি। দেখুন, সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে অভিমান করা চলে না। বেলা হয়ে গেল। আজ উঠি। একদিন আসবেন আমার ওখানে।

অদ্ভুত মানুষের স্বভাব। দূরের জন্য মন কেমন করে; দুর্লভের মোহ আনে ব্যাকুলতা। যে জিনিস অতি কাছে তার ওপর আকর্ষণ হয়না; যা সহজে পাওয়া যায় তার প্রতি অনুরাগ জন্মায় না। তাই যাই যাই ক'রেও এ-বি-সি-ডি-র বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সেদিন রবিবার। বেলা আন্দাজ সাড়ে পাঁচটা। পূর্ণ থিয়েটারে দুপুরের শো-তে 'দেবদাস' দেখে ফিরছি। রাস্তায় মোটরের ভিড় তেমন শুরু হয়নি। রমেশ মিত্তির রোডের একটা বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নিচে পাড়ার ওড়িয়া ঠাকুরদের তাসের আসর তখনও জমজমাট। কাছেই এক জমিদার ভবনের রেডিওতে পঙ্কজ মল্লিকের গান শোনা যাচ্ছে—'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'।—ল্যান্সডাউনের মোড় ঘুরতেই এ-বি-সি-ডি-র সংগে দেখা। বললেন—কই ভায়া আমার ওখানে এলেন না তো? কবে আসছেন?

অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললাম—বিশেষ কাজ ছিল, সময় ক'রতে পারিনি, ক্ষমা করবেন। কাল নিশ্চয়ই যাব। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—বহরমপুর কলেজে লোক চেয়েছে। একখানা দরখাস্ত ফেলে এলাম পোস্ট অফিসে। আর চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগেনা।

আর কথার খেলাপ করা চলে না। পরদিন বিকেলের দিকে কলেজ থেকে ফিরেই এ-বি-সি-ডি-র বাড়ি গেলাম। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি দরজার দু-পাশে দু-খানি ছোট প্রস্তর ফলক—একটিতে লেখা 'Sanctum', অন্যটিতে 'A B C D'। পায়ের শব্দ শুনে এগিয়ে এসে এ বি সি ডি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন—বসালেন এক-খানা কৌচের ওপর। ঘরটি বেশ বড়। একদিকে জানলার ধারে স্প্রিংয়ের খাট, অপর তিন দিকে র‍্যাকে র‍্যাকে বই বোঝাই। এক কোণে তেপায়ার ওপর মহীশূরের সুগন্ধি চন্দন ধূপ জ্বলছে। আবহাওয়া শুচি-স্নিগ্ধ। আসবাব-গুলো সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়, কিন্তু কল্যাণীর করস্পর্শে পরিচ্ছন্নতায় প্রদীপ্ত নয়। কেমন যেন একটা ছন্নছাড়া ভাব অচিরেই প্রকট হয়ে ওঠে আমার দৃষ্টিতে। এ বি সি ডি তাঁর 'থিসিস'টা নিয়ে সামনের কৌচটায় বসলেন, আর একটা 'Light of Asia' জায়গায় জায়গায় পড়তে লাগলেন। ঘণ্টাখানেক এইভাবে আলো-চনা চলল। তারপর এ বি সি ডি বললেন—আজ এই পর্যন্ত, আর একদিন হবে। এখন মাঝে মাঝে আপনাকে একটু কষ্ট না দিয়ে উপায় নেই। আমার সমস্যাটা বলি শুনুন। বিদেশী 'ডক্টরেট'-এ দেশ ছেয়ে গিয়েছে। এম, এ ডিগ্রির আর ইজ্জত নেই। 'ডক্টরেট' না থাকায় কোন কলেজেই আমাকে পাকাপাকিভাবে Head of the department করেনি। হাজারিবাগে তো মহামুশ্কিলেই পড়েছিলাম। এক বিহারী তরুণ লণ্ডন পি-এইচ-ডি উদয় হওয়া মাত্রই গুঞ্জন শুরু হ'ল—তাকে Head of the dapartment করতে হবে। অবস্থা বুঝে আমি মানে মানে বিদায় নিলাম। অধ্যাপক জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বাধ্য হয়েই বুড়ো বয়েসে উঠে প'ড়ে লেগেছি 'ডক্টরেট'-এর জন্যে। এডিনবরা থেকে 'ডক্টরেট' নেবার কথা। বিষয় নির্বাচন হয়েছিল, কাজও শুরু করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ বিশেষ পারিবারিক কারণে আমাকে দেশে ফিরতে হয়। যাই হোক, অবসর মতো সেই বিষয়টা নিয়ে কাজ করেই এই 'থিসিস'টা খাড়া করেছি।

আমি বললাম—আপনার কাছে প্রেরণা পেলাম। আমাদেরও অবহিত হওয়া দরকার। শুনছি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি শীঘ্রই একটা Lower Research degreeর ব্যবস্থা করবে। ভবিষ্যতে ডি-ফিল হবে কলেজে পড়ানোর minimum qualification। এম-এ ডিগ্রিতে ইস্কুল-মাস্টারি চলবে; অধ্যাপনা চলবে না।

—আমি প্রসাদভায়া ও নিশীথ ভায়াকে প্রায়ই একথা বলি। দেখুন, বাড়ি বসে তো বেশী দিন চলেনা। সংসারের চাপ আছে। একটি চির-রুগ্ন ভাই রয়েছে। তার পরিবারের ভার আমাকেই বহন করতে হয়।

চাকর চা নিয়ে এল। তাকে লক্ষ্য ক'রে এ বি সি ডি বললেন—এ হচ্ছে হারাধন—'মোর পুরাতন ভৃত্য।' আমার কাছে বহুকাল আছে। ওকে ছাড়া আমার একদণ্ডও চলেনা—He is all the world to me.

কথায় কথায় রাত হয়ে যায়। আর একদিন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিই। বাইরের মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। ঘরের আবহাওয়ার মধ্যে যেন দীর্ঘ দিনের হাহাকার স্তম্ভিত হয়ে আছে।

মাস দেড়েকের মধ্যে কয়েকবার এ বি সি ডি-র বাড়ি যাতায়াত করেছি। তাঁর 'থিসিস'-এর আলোচনাও হয়েছে। ভদ্রলোককে আমার বেশ লাগে। বিলাত-ফেরত—ক্রীশ্চান—বেশভূষা আচার ব্যবহার বা কথাবার্তায় কিছু বোঝবার জো নেই। তাঁর ঘরটি বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—বাড়ির ওপর তলার সংগে কোন যোগাযোগ দেখিনে। বোধ হয় ওটা later extension। ঘরে জিনিসপত্র প্রচুর—তবে গৃহিণীপনার কোন ছাপ তো নজরে পড়েনা। সদর অন্দর একাকার। ভদ্রলোক কি বিবাহ করেন নি? হয়তো তাই হবে। খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হলেও আলাপ অল্প দিনের। জিজ্ঞাসা করতে শিষ্টতায় বাধে।

বৈশাখের শেষাশেষি। মোহনবাগান মহামেডান স্পোর্টিংয়ের লীগখেলা দেখতে গিয়েছিলাম। বালিগঞ্জবাসী বন্ধু হাজরা-ল্যান্সডাউনের মোড়ে নামিয়ে দিলেন মোটর থেকে। আকাশে কালো মেঘ। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মাথায় দিয়ে হনহন করে হাঁটছি। দাস ষ্টোর্স'এর সামনে এ বি সি ডি-র কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কি ভায়া, ছাতার আড়াল দিয়ে কেন? মোহনবাগান হেরেছে বুঝি?

উত্তর দিলাম—হ্যাঁ।

—ভালো খেলে হেরে গেল তো?

না হেসে থাকতে পারলাম না। বললাম—আপনি দেখছি সব খবরই রাখেন।

—রাখি বই কি। আপনাদের বয়েসে আমারও ও নেশা একটু আধটু ছিল। এখন আর ভালো লাগেনা। আসুন আসুন, ভিতরে এসে বসুন, ঝড় উঠেছে।

এ বি সি ডি-র আহ্বানে ভিতরে গিয়ে বসলাম। এক রোগা লিকলিকে ভদ্রলোককে দেখিয়ে এ বি সি ডি বললেন—আমার ভাই চারু। রোগে রোগে বেচারার শরীরটা মাটি হয়ে গেল। জীবনটাও গেল নষ্ট হয়ে। মেয়ে ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে অথচ রোজগারের ক্ষমতা নেই। পরিশ্রম একেবারেই সহ্য হয়না। এই স্টেশনারি দোকানটা কোন রকমে বসে বসে চালায়। আপনাদের একটু Patronage আশা করি। আমারই উপকার করা হবে।

—নিশ্চয়ই। এর জন্যে আপনি এত সংকোচ বোধ করছেন কেন? বাড়ির কাছে—পাড়ার মধ্যে—এতে আমাদেরই তো সুবিধে।

—অনেক ধন্যবাদ। চারু নড়াচড়া করতে পারেনা, পাঁচ জনের সংগে আলাপ পরিচয় করবারও উপায় নেই। ওকে ভগবান মেরেছেন, কি করবে!

—সে তো বটেই। আচ্ছা, বহরমপুর থেকে কোন খবর আসেনি?

—না। 'থিসিস্'-এ finishing touch দেওয়ার কাজটা এগিয়ে যাচ্ছে। সেও কম লাভ নয়।

ধুলোর ঝড় পনর মিনিটেই থামে। আমি বাড়ির দিকে অগ্রসর হই। সন্ধ্যায় খালি গাড়ি টেনে নিয়ে চলে 'Happy boy'-এর 'হুকার'। তপসে মাছ হেঁকে যায়। বড় লোভনীয় জিনিস। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা মনে পড়ে। গুপ্ত কবি মহানিদ্রায় সুপ্ত হয়েছেন কত কাল, কিন্তু বাঙালীর চিত্তে তাঁর হাস্যরস আজও লুপ্ত হয়নি।

কলকাতাবাসী হলেও আমাদের পরিবার তেমন আধুনিক নয়। ছোটরা খেলে গোলকধাম, বড়রা খেলে পাশা। বৃহৎ সংসার—হইচই লেগেই আছে। প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে মৃদু প্রতিবাদ জানান। বর্ষীয়সীরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেয়ে মহলকে শোনান—আপনাদের ছেলেরা বাজে কাজে বড় সময় নষ্ট করে। পৃথিবীতে কাজ অকাজ ও বাজে কাজের ব্যবধানটা সব সময় সুস্পষ্ট নয়। আমরা ওসব কথায় কান দিইনে। পড়াশুনা ও আমোদ প্রমোদ

সমান উদ্যমেই চলে। সে দিন শনিবার। সন্ধ্যার পর বৈঠকখানার পাশের ঘরে পাশা জমে উঠেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হলেন এ বি সি ডি। বললেন—বাঃ এ যে দেখছি সাবেক আমলের আবহাওয়া। How refreshing! আমারও যোগ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আমি সসম্ভ্রমে স্থান ছেড়ে দিলাম এ বি সি ডি-কে। তিনি পরম উৎসাহে দান ফেলতে লাগলেন—'ছ তিন নয়,' 'বারো পঞ্জা সতর,' 'দশ ছয় ষোল'। যাঁর Bridge বা Biliards খেলার কথা তাঁকে মহাভারতী যুগের পাশা-খেলায় প্রাণ ঢেলে দিতে দেখে আমরা তো অবাক। এ বি সি ডি চলে যাওয়ার পর বড়দা মাথা নেড়ে বললেন, —ওহে, রকম সকম দেখে মনে হয় এ বি সি ডি একজন 'Mystery man'। বড়দার বয়েস হয়েছে। বহু দিন জজিয়তির পর অবসর গ্রহণ করেছেন। চোর ডাকাত, পকেটমার, প্রেমে পড়া যুবক, ধর্মে গোঁড়া প্রৌঢ়, ভীমরতি ধরা বৃদ্ধ—নানা মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। লোক চরিত্রের বিভিন্ন দিক ধরা পড়েছে তাঁর চোখে। তাই তেমন ভালো না লাগলেও তাঁর কথাটা উপেক্ষা করতে পারলাম না। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ক্রমেই যেন ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

মেঘলা সকাল। কলেজ বন্ধ। বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে শহরের কাব্যহীন বর্ষা জীবনের কথা ভাবছি। হারাধন এসে একটুকরো কাগজ হাতে দিলে। তাতে লেখা আছে:

* * *

আজ সন্ধ্যায় জলসার আয়োজন করেছি। একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার। আপনারই মতো কয়েকজন আসবেন। ৬টা নাগাত expect করব। রাত্রে আপনার এখানেই খাওয়া।

এ বি সি ডি

* * *

সারা দুপুর বিরামবিহীন বৃষ্টি। বিকেলেও ছাড়বার কোন লক্ষণ নেই। যাই হোক, যথাসময়ে Sanctum-এ উপস্থিত হলাম। নিশীথবাবু ও প্রসাদবাবুর পাশে বসে আছেন দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক। বুঝলাম ওরাই গায়ক ও বাদক। মেঝেয় কার্পেট পাতা। মাঝখানে জরদা রঙের টেবিল ঢাকা দিয়ে মোড়া জলচৌকিতে ফুলদানি ও ধূপদানি। কাছেই হারমোনিয়াম ও তবলা। আমি এ বি সি ডি-কে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার 'থিসিস'-এর আলোচনা পর্ব শেষ হতে আর কত দেরি?

নিশীথবাবু রবীন্দ্রভক্ত। তিনি ব'লে উঠলেন—"আজ যুক্তিতর্ক ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ খাটবেনা। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।"

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—বর্তমান পরিবেশে 'থিসিস'-এর প্রসংগ তোলা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে। এই বর্ষণমুখর শ্রাবণ সন্ধ্যায় যিনি সংগীতের আসর বসিয়েছেন তিনি যথার্থই কবি।

জলেশ দাশগুপ্ত পর পর কয়েকখানি মল্লার গাইলেন। শেষে গাইলেন দ্বিজেন্দ্রলালের "আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার।" ঝিঁ ঝিঁ ডাকা বর্ষা রাত। ঝিঁঝিঁটের মর্মস্পর্শী মূর্ছনা। আমরা সকলেই অভিভূত হলাম। এ বি সি ডি অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন নিমীলিত নয়নে। মনে হ'ল তাঁর অন্তর ভেসে গিয়েছে বহু দূরে—বন্দী হয়েছে অতীতের কোন গোপন গহ্বরে। মিনিট পাঁচেক পরে ধীরে ধীরে চোখ মেলে জলেশবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—কী চমৎকার গলা আপনার। গলার গুণে গানের সুর ও ভাব আমাকে একেবারে বিহ্বল ক'রে তুলেছে।

মৃদুহেসে শান্ত স্বরে বললেন জলেশবাবু—দাস সাহেব। বন্ধুবর বলেছেন আপনি কবি। আমি মনে করি আপনি একাধারে কবি ও প্রেমিক।

গানের পালা শেষ হলে আমরা এ বি সি ডি-র সংগে নিচে নেমে এলাম। অন্দর মহলে আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। মাটিতে আসন পাতা। চারুবাবুর মেয়ে হাসি দাঁড়িয়ে। সে পরিবেশন ক'রে খাওয়ালে খিচুড়ি, ইলিশ মাছ ভাজা, আলুবখরার চাটনি, দই ও মিষ্টি। সে দিনের অভিজ্ঞতা রমণীয় ও রহস্যময়।

কিছু দিন ব্যস্ত ছিলাম। এ বি সি ডি-ও আসেননি। 'Sanctum'-এ গিয়ে দেখি তালাবন্ধ। দাস হৌস-এ চারু বাবুর সংগে দেখা হ'ল। তিনি বললেন—বহরমপুর কলেজ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে পরদিনই দাদা চলে গেছেন। আপনাদের খবর দেবার সময় পেলেন না

চিঠিতে জানিয়েছেন ভালো বাড়ি পেয়েছেন। পূজার ছুটিতে আসবেননা, নিরিবিলিতে থিসিসটা তৈরি করবেন।

পূজার ছুটি। বাড়িতে আমি একা। আর সকলেই পুরীতে। রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ি। ভোরে উঠে ছাদে বেড়াই। চমৎকার লাগে। প্রাসাদপুরীর অভ্রভেদী আত্মবোধনার মধ্যে প্রকৃতির সংগে পরিচয়ের স্থান আর কোথায়! অনুভব করি শরৎ এসেছে। আকাশে তার ইংগিত, বাতাসে তার বার্তা। ম্যাডক স্কোয়ার সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে সানাই আগমনী আলাপ করে—যেন সুরলোকের নবত বাজে। রাস্তায় প্রসাদবাবুকে দেখে নেমে এলাম দোতলায়। তাঁকে ডেকে বসালাম বারান্দায়। বললাম—এ বি সি ডি বহরমপুর কলেজে যোগদান করেছেন।

প্রসাদবাবু খুশী হয়ে বললেন—সুসংবাদ। ভদ্রলোক বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। সংসার না পেতেও সংসারী তো!

—ও, উনি bachelor! আমি ঐ রকমই অনুমান করেছিলাম। আচ্ছা, বলতে পারেন—ওদের পরিবার ক্রীশ্চান হয়েছেন কত দিন আগে?

—ওঁদের পরিবার তো ক্রীশ্চান নয়, ক্রীশ্চান উনি নিজেই। অবশ্য এটা আমার ধারণা, এ সম্বন্ধে ওঁর সংগে কোন দিন কোন কথা হয়নি। তবে নাগপুরে থাকতে অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওঁর নিকটতম আত্মীয়দের কয়েকখানা চিঠি আমার চোখে পড়েছিল। তাতে মনে হয়েছিল ওঁদের পরিবার গোঁড়া হিন্দু।

—আমারও তাই মনে হয়। হালচাল তো ষোল আনাই হিন্দুর। জলসার রাত্রে খেতে বসে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা নেই, ডিম মাংস চপ কাটলেটের বালাই নেই। খাঁটি হিন্দু বাড়ির খাওয়া। ভাইঝিটির সলজ্জ ভাবভংগি ক্রীশ্চান সমাজের ধার দিয়েও যায়না। এ বি সি ডি নিজেও এই ধরণের জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। কি বলেন?

—ঠিক বলেছেন। ওঁর ঘরখানি বাড়ির বাইরে, কিন্তু উনি গৃহস্থেরই একজন। উনি কেন যে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন জানিনে। মাঝে মাঝে বলেন—আমি কোন ধর্মই মানিনে, মানি শুধু ভগবানকে। তিনিই একমাত্র সত্য। জীবনের অজানা পথে আমাদের নিয়ে যান হাত ধ'রে। এই যে আত্মসমর্পণ, এই যে 'Lead kindly Light' ভাব—এর মধ্যে একটা ট্রাজেডির আভাস পাওয়া যায়না কি?

—আমিও তাই ভাবি। ভদ্রলোক যখন চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন তখন তার সংগে বেরিয়ে আসে তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস অন্তরের অন্তস্তল থেকে। প্রেমের গান শুনে উন্মনা হয়ে যান। নিশ্চয়ই ওঁর মধ্যে কোন করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে। যতই দিন যায়, ততই মনে হয় এ বি সি ডি-কে যত জানি তত জানিনে।

—অসম্ভব নয়। পৃথিবীর একভাগ স্থল আর তিন ভাগ জল। তেমনি মানুষের এক ভাগ ব্যক্ত, আর তিন ভাগ অব্যক্ত।

হাত ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে প্রসাদবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—আজ আসি। কথায় কথায় বেলা অনেকখানি গড়িয়েছে।

প্রসাদবাবু চলে যান। নিস্তব্ধ বারান্দায় একা বসে থাকি। অনুশোচনায় মন ভরে ওঠে। এ বি সি ডি বহরমপুরে 'থিসিস' তৈরি করছেন, আর আমরা কলকাতায় তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে নিয়েই 'থিসিস' রচনা করছি। অত্যন্ত লজ্জার কথা। একজন অমায়িক শিক্ষাব্রতীর ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে আলোচনা করা ঘোর অন্যায়। পরচর্চা কি মানুষের স্বভাব? ঔৎসুক্য কি আত্মার তৃষ্ণা?

মেজদা শিক্ষা বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। তিনি অনেক দিন আগে পরলোক সম্বন্ধে পড়াশুনা ও লেখালেখি আরম্ভ করেছিলেন। ইদানীং পরলোকগত আত্মার সংগে যোগাযোগ করছেন। ভালো 'medium হয়ে উঠেছেন automatic writing এর। কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসেন; তাঁকে কেন্দ্র ক'রে বসেন কয়েক জন যাঁদের এ বিষয়ে বিশ্বাস আছে; সকলেই একান্তচিত্তে চিন্তা করেন কোন বিশিষ্ট আত্মাকে। দেখতে দেখতে 'medium' আবিষ্ট হয়ে পড়েন, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে, পেনসিল ন'ড়ে ওঠে, আত্মার আবির্ভাব হয়। জিজ্ঞাসা করলে পরিচয় দেন, প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়। কেউ অল্প ক্ষণেই বিদায় নেন, কেউ বা অনেকক্ষণ

ধ'রে নানা কথা বলেন। জীবের মতো আত্মারও প্রকার ভেদ আছে। আমাদের সম্মুখে একটা নতুন জগৎ যেন খুলে গিয়েছে। পরমহংসদেব আসেন, স্বামীজী আসেন, বঙ্কিমচন্দ্র আসেন। উচ্চস্তরের আত্মার সান্নিধ্যে এসে অমূল্য উপদেশ শুনে বিবিধ বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিলাভ ক'রে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই। বাড়িতে একটা ছোট-খাটো 'সেক্রেটারিয়েট' বসে' গিয়েছে। বড় বড় বাঁধানো খাতায় প্রেত-চক্রের বিবরণী লিখে রা া হয় নিয়মিতভাবে। আমরা লোকান্তর রহস্যে ডুবে আছি। সন্ধ্যার পর বৈঠক বসে, চলে রাত্রি দশটা পর্যন্ত। আজকাল বেলাবেলি কাজ সেরে বাড়ি ফেরা আমাদের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জানুয়ারি মাস। বালিগঞ্জের মাঠে বেড়িয়ে ফিরছি। সংগে মেজদা আছেন। সূর্য অস্তোন্মুখ পশ্চিম দিগংগনার চোখে সোনার স্বপন। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের কাছে আচমকা যেন এ বি সি ডি-র ডাক-শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি পদ্মপুকুর রোড ধ'রে এগিয়ে আসছেন এ বি সি ডি। জিজ্ঞাসা করলাম—'থিসিস' দিতে এসেছেন বুঝি ?

—না, বহরমপুর ছেড়ে একেবারেই চলে এসেছি। শরীর ভালো যাচ্ছেনা, constipation এ ভুগছি, মাথাটা মাঝে মাঝে ঝিম ঝিম করে, কেমন একটা দুর্বলতা অনুভব করি। 'থিসিস' পাঠিয়েছি ডিসেম্বরের গোড়ায়। চারুর চিঠিতে আপনার খবর পেতাম। আমি না হয় ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু আপনি কলম ধরেন নি কেন ? Research এ মন দিয়ে ছন নাকি ?

মেজদার পরিচয় ও প্রেতচক্রের বিবরণ দিয়ে বললাম যে নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছি তাতে মগ্ন হয়ে আছি। একটুও অবসর নেই। অন্য কাজে মনও যায়না। আপনার কি এতে বিশ্বাস আছে ?

—বিলক্ষণ আছে। পৃথিবীর পর্দার আড়ালে কত অজ্ঞাত জগৎ রয়েছে যার কোন খবরই আমরা রাখিনে। পাশ্চাত্য মনীষীরা এ ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং অপার্থিব লোকের সংগে রীতিমতো যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ইংগিত দিয়াছেন :

"পরিচিত সীমানার
বেড়া-ঘেরা থাকি ছোটো বিশ্বে ;
বিপুল অপরিচিত
নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যে।"

মেজদাদার দিকে চেয়ে এ বি সি ডি বললেন—দাদা, আপনার permission পেলে আমি আপনাদের বৈঠকে গিয়ে একটু বসি।

মেজদা বললেন—বেশ তো, আজই আসুননা, সাড়ে সাতটায় বৈঠক বসবে।

সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিটের সময় এ বি সি ডি উপস্থিত হলেন। পায়ে মোজা, গায়ে ওভার কোট, মাথায় 'কান ঢাকা টুপি। মেজদা বললেন—আমরা এখন আমেরিকার মহিলা' স্পিরিচুয়ালিস্ট' লিলিয়ান এডগারের আত্মাকে আহ্বান করছি। কি ভাবে কি হয় দেখুন ; তারপর আপনি যে আত্মার সংগে যোগাযোগ করতে চান তাঁকে আহ্বান করব।

এডগারের আত্মা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিদায় নিলেন। এ বি সি ডি-কে বলা হ'ল তাঁর অভিলষিত আত্মাকে স্মরণ করতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার খসখস ক'রে পেনসিল চলতে লাগল। আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী এ বি সি ডি প্রশ্ন শুরু করলেন—নাম কি ?

—মীরা

—আম কে চিনতে পার ?

—খুব পারি।

—কোথায় আছ ?

—পঞ্চম স্বর্গে।

—কেমন আছ ?

—ভালোই। * * * আপনার জন্যে সময়ে সময়ে কষ্ট হয়।

এ বি সি ডি-র কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। আত্মসংবরণ ক'রে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—মা-বাবাকে মনে আছে?

—আছে বই কি। * * * পার্থিব জীবন অনেক-দিন আগে দেখা ছবির মতো ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। আপনি খুব চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। ভাববেন না, যে কাজে ব্রতী হয়েছেন তাতে কৃতকার্য হবেন।

অকারণে পেনসিল ঘুরতে লাগল। এ বি সি ডি-কে আমরা বুঝিয়ে বললাম—উনি আর থাকতে চাননা। ওঁকে ছেড়ে দিতে হবে।

হতাশভাবে এ বি সি ডি বললেন—তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাইনে। কতকাল পরে তোমার সংগে কথা-বার্তা ব'লে বড় আনন্দ পেলাম। মাঝে মাঝে বিরক্ত করব।

—আচ্ছা আসি।

এ বি সি ডি কে বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থায় রেখে মীরার আত্মা চলে গেলেন। বৈঠক শেষ হ'ল। মেজদাকে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন এ বি সি ডি—জীবিত ও মৃতের মধ্যে আপনি যে সেতু রচনা করেছেন তা সত্যিই অদ্ভুত। কথার ভংগিতে মানুষ চিনতে একটুও দেরি হয়না। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আবার হয়তো আপনাকে জ্বালাতন করতে হবে, কিছু মনে করবেন না।

এ বি সি ডি কে এগিয়ে দিতে গেলাম পালিত ষ্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত। রাস্তায় যেতে যেতে বললাম—মীরাকে আপনি খুবই স্নেহ করতেন মনে হয়। সে কি হাসির বড় বোন?

—না।

—তবে মীরা কে?

এ বি সি ডি শুক্লা চতুর্থীর অস্তগামী চাঁদের দিকে চেয়ে রইলেন নীরবে। তারপর বললেন—আর এক দিন শুনবেন!

কনকনে ঠাণ্ডা। মিটমিটে আলো। শ্রান্তদেহে ঘরে ফেরে ঘুগনি আলুরদমওয়ালা। আমার অন্তর্জগতে প্রসারিত হয় নূতন প্রহেলিকা।

গরমের ছুটির পর কলেজের নতুন 'সেসন' শুরু হয়েছে। পুরোদমে কাজ চলছে। খবর পেলাম এ বি সি ডি 'ডক্টরেট' পেয়েছেন। ভারি আনন্দ হ'ল। ছুটে গেলাম অভিনন্দন জানাতে। এ বি সি ডি বললেন—প্রসাদ ভায়া কাল এসেছিলেন। নিশীথ ভায়া একটু আগেই চ'লে গেলেন। এর জন্যে এ বয়েসে অভিনন্দন নিতে লজ্জা করে। আমার তরফ থেকেই বরং আপনাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। আপনাদের উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে 'থিসিস'টা কোনকাজেই লাগত না, শুধু পোকায় পেটে যেত।

—জীবনের প্রতিকূলতার মধ্যেও আপনি যে প্রাণশক্তি হারান নি 'ডক্টরেট' তার পরিচয়। আপনার অধ্যবসায় সত্যিই অনুকরণীয়।

—একটা কথা আছে। St. Paul's এর Principal আমার পুরনো বন্ধু। Congratulation এর সংগে তিনি Senir Professorshipএর offer পাঠিয়েছেন। ৫০০ টাকা দিতে চান। আমার টাকার দরকার। হাসির বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছি। প্রসাদভায়া ও নিশীথ ভায়া তো accept করতে বলেন। আপনার কি মত?

—নিশ্চয়ই করবেন। কলকাতায়—respectable college—দেখতে দেখতে Post graduateএ চলে যাবেন।

—ওসব আশা রাখিনে। এখন আর সেদিন নেই যে গুণ আছে ব'লে আমার মতো বুনো লোকেরও ডাক পড়বে। Propagandaর যুগ। প্রচার চাই। শুধু রাত জাগা পাণ্ডিত্যে পার পাওয়া যায়না ভায়া। যোগ্যতার পুরস্কার পায় তারাই যারা ভাগ্যবান, যাদের বোঝা ভগবান বহন করেন।

—ডক্টর লক্ষ্মীনারায়ণের 'ডিনার' এ যাচ্ছেন তো?

—ও সব জায়গায় আমরা কলকে পাবনা। আমাদের না যাওয়াই ভালো। নিজের মান নিজের কাছে। বুঝলেন ভায়া ও একটা diplomatic dinner। শুনছি উনি কি একটা commissionএ যাবার চেষ্টায় আছেন। তাই এই আয়োজন।

—আপনার মর্যাদাবোধ দেখে শ্রদ্ধা হয়। আপনার কাছে অনেক জিনিসই শিখবার আছে।

অঘ্রাণ মাস। হাসির বিয়ে হয়ে গেল। এ বি সি ডি-র যেমন সংকল্প তেমন কাজ। একটু নড়চড় হবার জো নেই। বুড়ো হাড়েও যে সময়ে সময়ে ভেলকি খেলে এ বি সি ডি তার জলন্ত প্রমাণ। তার ব্যক্তিত্বে ব্যবহারে মিষ্টি কথায় ও শিষ্ট ভংগিমায় শুভকর্ম নিষ্পন্ন হয় নির্বিঘ্নে। পরদিন অপরাহ্ন বেলা। রোশনচৌকির সানাই সাহানার সমস্ত করুণা ঢেলে দেয়। বাড়িশুদ্ধ লোকের চোখ ছলছল ক'রে ওঠে। হাসি কাঁদতে কাঁদতে শশুরবাড়ি চলে যায়। কোন রকমে আত্মসংবরণ ক'রে এ বি সি ডি বসে পড়লেন

বারান্দার বেঞ্চির ওপর। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর আর্দ্রকণ্ঠে বললেন—আজ বড় ফাঁকা বোধ হচ্ছে। হাসি আমার অন্তরের অনেকখানি জুড়ে ছিল। কি নিয়ে থাকব? মরণকালে যদি বেশীদিন বিছানায় পড়ে থাকি তো দেখবে শুনবে কে? বউমা তো চাকুর চাকায় বাঁধা।

—দেখুন, সংসারে কারও ওপর নির্ভর করা যায়না। অবস্থার সৃষ্টি করেন যিনি ব্যবস্থাও তিনিই ক'রে দেন। এখন মনটা মুষড়ে পড়েছে। তাই ভাবনা হচ্ছে। পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

এ বি সি ডি মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন। আমি আস্তে আস্তে অন্য প্রসংগ তুলে তাঁকে কতকটা সহজ অবস্থায় এনে সে দিনের মত বিদায় নিলাম।

তিন মাস পরে। এ বি সি ডি ইউনিভার্সিটিতে Part-time Lecturer হয়েছেন। দু জায়গায় কাজ চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন—কোথাও বড় একটা যাননা। এ বি সি ডি-র অনুপ্রেরণায় আমি গবেষণায় মন দিয়েছি। সময়ের একান্ত অভাব। 'Sanctum'এ যাতায়াত প্রায় বন্ধ। একদিন নিশীথবাবুর মুখে শুনলাম এ বি সি ডি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিছুদিন আগে। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় 'Sanctum'এ গেলাম। সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে এ বি সি ডি আমাকে বসতে বললেন গদি-আঁটা আরাম কেদারাটা খাটের কাছে টেনে নিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছেন? আপনার অসুখের খবর দেন নি কেন? আজ নিশীথবাবু বললেন।

—বিশেষ কিছু নয়—a mild type of Influenza। শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে কিন্তু মনটা তেমন সজীব হয়নি। কোন কিছু ভালো লাগেনা। বাড়ির বাইরে যেতেও ইচ্ছা করেনা। মনে হয় সময়ের স্রোত যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে ঘরখানার মধ্যে। তখন মনের মানুষ কাছে পাওয়ার জন্য কী ব্যাকুলতা! আপনাকে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।···আচ্ছা, আপনার সেই 'স্পিরিচুয়ালিস্ট দাদার খবর কি?

—তিনি আগামী সপ্তাহে আসছেন।

—What a coincidence! আমি ক-দিন থেকে হঠাৎ আমার মনে পড়ল এ বি সি ডি র বিস্মৃত প্রতিশ্রুতি। বললাম—প্রেতচক্রের অধিবেশনে আপনি যাঁর আত্মাকে আহ্বান করেছিলেন তাঁর পরিচয় তো দেননি। একেবারে ভুলে গিয়েছেন।

—মীরার কাহিনী আমারই জীবনের বেদনাময় ইতিহাস। যে ইতিহাস আপনাকে শোনাতে আজ ইচ্ছা হচ্চে। কিন্তু সময় হবে কি? কয়েক ঘণ্টা নষ্ট করতে রাজী আছেন?

—আমার বিশেষ কাজ নেই, কেবল বাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে দিলেই হবে।

হারাধনের হাতে বউদির কাছে একখানা 'স্লিপ' পাঠালাম:—'Sanctum'-এ আটকে পড়েছি জরুরী কাজে, ফিরতে অনেক রাত হবে। ঠাকুরকে বলবেন, খাবার ঢাকা দিয়ে রাখতে শোবার ঘরে। কড়া নাড়লে নিধিয়া যেন দরজা খুলে দেয়।

ঠিক সাতটার সময় বিছানার ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসলেন এ বি সি ডি। উপাখ্যান শুরু হবে। শোনবার জন্য আমার মনে ছাত্রের আগ্রহ।

এ বি সি ডি আরম্ভ করলেন—আমি যখন General Assemblyতে পড়ি তখন এ্যালবার্ট অমিত বিশ্বাস ছিল আমার সহপাঠী। বাদুড়বাগানে তাদের বাড়ি আমি মাঝে মাঝে যেতাম। অমিতের বাবা মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। অমিতের ছোট বোন আইভি বেথুন স্কুলে পড়ত। তাকে আমার খুব ভালো লাগত।

মিস্ বিশ্বাস কি রূপসী ছিলেন?

—ঠিক রূপসী বলা যায়না তবে সুশ্রী। তার গুণের অবধি ছিল না। যেমন লেখা পড়ায় তেমনি কাজকর্মে। কী মধুর কণ্ঠ। কী অপূর্ব হাত পিয়ানোয়! আদর আপ্যায়নে অতুলনীয়া। চা খাবার নিয়ে যখন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করত, তখন কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে পড়ত মুখের ওপর আর পেলব প্রাণের প্রীতি দিকে দিকে উৎসারিত হয়ে তার সান্নিধ্যকে ভরে তুলত স্বর্গীয় কমনীয়তায়। ভায়া, রূপ বাইরের, গুণ ভিতরের। রূপ দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গুণ কাছে এসে হৃদয় জয়

অতিথিরূপে পেলেই আমরা খুশী হই, গুণের সংগে আত্মীয়তা করতে চাই।

—চমৎকার। তার পর।

—আমি যে বছর বি এ পাশ করলাম আইভি সে বছর এণ্ট্রান্স পাশ করলে। আমাদের প্রীতি ক্রমেই ঘনীভূত হতে লাগল। জীবনে যখন বসন্ত আসে, অন্তর যখন মুকুলিত হয়ে উঠে, তখন এমনিই হয়। আমরা গোঁড়া হিন্দু, আইভিরা ক্রীশ্চান, মিলনের অন্তরায় অনেক —একথা বুঝেও দূরে সরতে পারিনে। কথা পাড়লে আইভি চুপ করে থাকে। নীরবতার মধ্যেই হয় মানুষের গভীরতম প্রকাশ। মুখের ভাষা যখন স্তব্ধ হয়ে যায় তখন অন্তর ধরা দেয় চোখের ভাষায়। ব্যবধানের বিষয় আইভি যেন চিন্তাই করেনা। মনে হয় ভবিষ্যতের পথ তার কাছে উন্মুক্ত—সহজ সরল উজ্জ্বল। আমার ভাবান্তর ঘটে; মুখের ওপর ফোটে চিন্তার রেখা, হাসিতে বাজে বিষাদের সুর। সেটা মিসেস বিশ্বাসের অভিজ্ঞ দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি একদিন আমাকে নিভৃতে ডেকে বললেন—দেখ বাবা, আইভি তো বিনুদা বলতে অজ্ঞান! তুমিও আমাদের একান্ত আপনার ক'রে নিয়েছে। কিন্তু মুশকিল এই তুমি আমাদের সমাজের নও। মিষ্টার বিশ্বাসের সংগেও কথা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে তোমার মতো ছেলে পাওয়া যায়না। তুমি baptised হলে ভবিষৎ গড়ে তোলার কোন বাধাই থাকেনা। বড় বড় মিশনারীদের সংগে ওঁর ঘনিষ্ঠতা আছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য তোমাকে বিলাত পাঠাবার ব্যবস্থা অনায়াসেই হতে পারে। অনেক দিন থেকে কথাটা বলি বলি ক'রেও বলা হয়নি। কেমন যেন বাধে মুখ ফুটে বলতে। ধর্ম ও সমাজ জীবনের বড় বন্ধন, বাবা। তোমার অভিভাবক রয়েছেন—মা না থাকলেও মাথার ওপর বাবা আছেন। তিনি কি ভাববেন? এই প্রস্তাবের মধ্যে অনুদারতার—হয়তো বা সংকীর্ণ স্বার্থের আভাস পাবেন। আমরা তাঁর কাছে বড় ছোট হয়ে যাব, বাবা তাই অত্যন্ত সংকোচ বোধ করি। আইভি আমাদের একটি মাত্র মেয়ে। তার সুখ শান্তির কথা ভাবতে গিয়ে তোমার দুঃখ অশান্তির কারণ না হই। এ ভাবনাও হয়। কি করলে ভালো হয় ঠিক বুঝতে পারিনে। তোমরা জীবনে সুখী হও শুধু এই কামনাই করি। কিছু মনে করোনা, বাবা। তোমাকে ছেলের মতো দেখি বলেই কথাটা বলতে সাহস করেছি। সব দিক বিবেচনা ক'রে তুমিই আমাদের পথ দেখাও।

তিন মাস চিন্তার পর মন স্থির ক'রে ফেললাম। বাড়ির অবস্থা খারাপ। বাবার রোজগার নেই। একমাত্র পৈতৃক বাড়িখানি সম্বল। ছোট ভাইটি নিতান্ত ক্ষীণ-জীবী, নিজের পায়ে দাঁড়'তে পারবে কিনা সন্দেহ। বিশ্বাস পরিবারকে জানিয়ে দিলাম যে পথে লক্ষ্মী ও আইভির মতো অঙ্কলক্ষ্মী দুইই লাভ করব সেই পথই আমার জীবনের একমাত্র পথ। বাড়িতে কাউকে কিছু বললাম না। চির-বন্ধুর পথেই চলে প্রেমের জয়রথ। সে রথের চিরসারথি ভগবান। যথাকালে আমার conversion ও এডিনবরায় মিশনের টাকায় পড়াশুনার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'ল। যাত্রার কয়েক দিন পূর্বে বাবার মুখ সহসা গম্ভীর হয়ে উঠেছে দেখে বুঝলাম খবরটা তাঁর কানে পৌচেছে। ভয়ে বুক কাঁপে, কি জানি কোন্ অসহনীয় অগ্ন্যুৎপাতের সম্মুখীন হতে হবে। আইভি বলে—ভয় কি বিনুদা, বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেননা। এখন যদিই বা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, যখন বিলাত থেকে তাঁর মুখ উজ্জ্বল ক'রে ফিরে আসবে তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। ক্ষমা তিনি করবেনই। সে ভার আমার ওপর রইল।

সংকটে সমবেদনা প্রেমকে ক'রে তোলে প্রগাঢ়, ভীতি-বিক্ষুব্ধ চিত্তে সঞ্চার করে সাহস। আইভির কথায় ভরসা পেলাম। বাবাও রাগ বা দুঃখ তেমন কিছু প্রকাশ করলেন না, যদিও প্রাণে লেগেছিল প্রচণ্ড আঘাত। বিদায় বেলায় বললেন—ভবিষ্যতের আশায় তুমি অতীত ও বর্তমানকে ভাসিয়ে দিয়েছ। দেখো যেন ক্ষতিপূরণ করতে পারো। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়, তবে পরিবারের প্রতিও একটা কর্তব্য আছে। তোমার মা ভাগ্যবতী, আগেই চোখ বুঁজেছেন। বেঁচে থাকলে অশেষ দুঃখ পেতেন। ভগবান আমাকে নিয়ে বার বার পরীক্ষা করছেন। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য। কিন্তু ভাগ্যবান তারা, যারা আমার আশে পাশে থেকে শিক্ষা লাভ করবে।

বাবার রাগ-চাপা দুঃখ ও আইভির দুঃখ-চাপা হাসির

ধো সমুদ্র যাত্রা করলাম আগামী কালের আলোর দিকে চেয়ে।

হারাধন ওভালটিন ও বিস্কুট নিয়ে এল। এ বি সি ডি বললেন—রাত্তিরের খাওয়া সেরে নিই। ভায়া, আপনি ও কিছু খান। ফিরতে অনেক দেরি হবে।

দশ মিনিট বিরতি। তার পর শুরু করলেন এ বি সি ডি—এডিনবরায় মাস ছয়েক বেশ কাটে। স্বাধীন দেশ, উন্নত মানুষ, সুসভ্য পরিবেশ, শিক্ষার স্বর্ণ সুযোগ, আমার অভিনব অভিজ্ঞতা। চারু চিঠি লেখে মাঝে মাঝে, আইভি লেখে প্রতি মেলে। কল্পনায় আনি সেই দিন, যে দিন দেশে ফিরে আইভির হাস্যোজ্জ্বল অভ্যর্থনা পাবো। পুনর্মিলনের পটভূমিতে মধুর হয়ে ওঠে বিরহ। হঠাৎ আইভির চিঠি আসা বন্ধ হয়। বিশ্বাস পরিবারের সংগে আমার আসল সম্পর্কটা আমাদের পরিবারে সুস্পষ্ট নয়। কাজেই চারুকে খবরের জন্যে লেখা যায়না। অকরুণ নীরবতায় দুর্ভাবনা হয়। আইভিকে কেবল্ করি। কোন সাড়া নেই—যাকে বলে' All quiet 'হীন সন্দেহ জাগে—আইভির ভাবান্তর ঘটেছে, তার যৌবনের অংগনে আবির্ভাব হয়েছে নূতন পূজারীর। বিচিত্র কি! আঁখির অন্তরাল অচিরেই যবনিকা টেনে দেয় মনের মঞ্চে। প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে পড়ে সুদূরের স্মৃতি। আমার তখনকার মনের অবস্থাটা সুন্দর ফুটে উঠেছে কবি গুরুর 'বিরহীর পত্র'-তে—

ভালবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল।
চায়, পায়, হারায় আবার।

উপায় নেই। মিশনের সর্ত অনুযায়ী দু বছরের ডিগ্রী নিতে হবে, আর ভারতে Christianity-র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখতে হবে—যা গ্রন্থাকারে ছাপা হবে। মনকে সান্ত্বনা দিই আর নীরবে কাজ করে যাই। বছর ঘোরে। ফাইনাল পরীক্ষার ৬ মাস বাকী। এই সময় একদিন অকস্মাৎ মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ে। একটি নবাগত বাঙালী ছাত্র আমার সংগে আলাপ করতে এসে একখানি বই ফেলে গিয়েছিলেন টেবিলের ওপর। ক্যালকাটা এডিসন স্টেট্‌সম্যান কাগজের মলাট দেওয়া বইখানি নাড়া চাড়া ক'রতে করতে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় Editorial column এর পাশে। লেখা

In Memoriam

Biswas—In sad and loving memory of our dear daughter, Ivy, Whom God called to His Eternal Rest suddenly on March 4, 1909, "In memory a constant thought, in heart a silent sorrow." (Inserted by her parents—BenJamin Haladhar and Verna Sudamini)

কে যেন সুইচ টিপে মুহূর্তে জগতের সমস্ত আলো এক সংগে নিভিয়ে দেয়। চোখে ঘোর অন্ধকার দেখি। দেহমন অবসন্ন হয়ে আসে। বইখানা হাত থেকে মেঝেয় পড়ে। আইভির নীরবতার কারণ চির-নীরবতা। ওতো স্বপ্নেও ভাবিনি। কী ভুলই না হয়েছে, কত অবিচারই না করেছি! অপরাধের গ্লানি চির-বিচ্ছেদ বেদনাকে শোণিত রাঙা ক'রে তোলে। আমার মানসিক আবহাওয়াটা কল্পনা করতে পারেন ভায়া? সুদূর এডিনবরার সুবিশাল ছাত্রাবাসের জনহীন কক্ষ। কুহেলী মলিন তপনহীন দিন। অন্ধকার তরল হয়ে আসে ধীরে ধীরে। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে চলচ্চিত্রের মতো ভেসে উঠে রৌদ্র রঞ্জিত ভারত—কলকাতা বাদুড় বাগান—তরুলতা ঘেরা ছোট বাড়ি—নানা রঙের পর্দা—সুসজ্জিত বৈঠকখানা—টেবিলের ওপর জল ভরা ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। আর কিছু নেই—আর কেউ নেই।

বাষ্পাকুল হয়ে উঠল এ বি সি ডি-র কণ্ঠ। আমি ভাবতে লাগলাম—কী অদ্বিতীয় শক্তি ভালোবাসার! একমাত্র ভালোবাসাই মানুষ-বিশেষকে মিশিয়ে দিতে পারে নিখিল বিশ্বের সংগে। মানুষ বিশেষের আবির্ভাবে জগৎ জুড়ে বাজে আনন্দগান, মানুষ বিশেষের তিরোভাবে সারা পৃথিবী পরিণত হয় নিরানন্দের অন্ধকূপে।

এ বি সি ডি একটু জিরিয়ে আবার আরম্ভ করলেন—একটি চরম আঘাত মানুষের জীবন দর্শনকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে নিয়ে যায়। অপরিমেয় আশাবাদের মৃত্যু হলে তার ভস্মরাশি থেকে বেরিয়ে আসে অনতিক্রমণীয় নৈরাশ্যবাদ। মনে হ'ল অর্থহীন এই প্রবাস-জীবন। ভাবলাম যেমন ক'রে হোক পালাই এখান থেকে। কিন্তু আমি যে অসহায়, আমার হাত পা যে

[illegible]

আস্তে চাঙ্গা হয়ে উঠি। বিপরীত ভাব প্রবল হয়ে জাগে মনের মধ্যে। দেশের মাটিতে আর পা দেব না। বিদেশেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হবে। যথাসময়ে পরীক্ষা দিই এবং তারপর মিশনের প্রবন্ধের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত করি। পরীক্ষায় ফল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উচ্চস্থান অধিকার ও বৃত্তিলাভ। অজস্র ধন্যবাদ দিই ভগবানকে। মিশনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচি। স্বাধীনভাবে research-এ আত্মনিয়োগ করি, নিশ্চিন্তভাবে কাজে অগ্রসর হই। আবার অন্তরায় দেখা দেয়। চারুর কেবল্ আসে:—বাবা রোগ শয্যায়। ডাক্তার বলেন আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা কম, তবে বেশী দিন বাঁচবেন না। যদি শেষ দেখা দেখতে চাও তো যত শীঘ্র পারো দেশে ফিরে এসো।

ঘা-খাওয়া মন মুয়ে পড়ে, উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে আসে, প্রতিজ্ঞা যায় ভেঙে। সংসারে বড় হওয়াই যে সব চেয়ে বড় জিনিস তা নয়। মনে পড়ে বিদায় বেলায় বাবার কথা—'পরিবারের প্রতিও একটা কর্তব্য আছে।' ডক্টরেটে অভিলাষ অপূর্ণ থাকে থাক। দেশে ফিরতেই হবে। বিধিলিপি কি খণ্ডানো যায়? The moving finger writes and having writ, moves on." ।

দেশে ফেরার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই বাবা লোকান্তর যাত্রা করলেন। মৃত্যুর পূর্বে আমাকে কাছে ডেকে বললেন—বিনু, তোমার ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি বাড়িতেই থাকবে।
বংশ রক্ষার জন্যে চারুর বিয়ে দিয়েছি। তার সংসার তুমি দেখবে। সে তো কর্মক্ষম নয়। তার ভার তুমি নিলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করেছি। লোকলোচনের অন্তরালে পরমপুরুষ আপনার মনে কি খেলা খেলেন তা তিনিই জানেন। আশীর্বাদ করি সুখী হও।

বাবার মৃত্যুর পর জীবনের রিক্ততা আরও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। নিজেকে বড় অপরাধী ব'লে বোধ করি—বাবার অকাল মৃত্যুর কারণ হয়তো আমিই। যৌবনের কুসুম কাননে আমরা যখন ক্ষণিকের তৃপ্তি খুঁজে ফিরি তখন কল্পনাও করতেও পারিনে কত দীর্ঘদিনের শান্তি আমাদের হারাতে হবে। অনেক ইতস্ততঃ ক'রে শেষে একদিন বাদুড়বাগানে যাই। শুনি অমিত দেরাদুনে চাকরি করে, তার বাবা মা কলকাতার বাস তুলে দিয়ে সেখানেই আছেন, বাড়ি ভাড়া দেওয়া। দেরাদুনে চিঠি লিখি আমার সংবাদ দিয়ে। মিস্টার ও মিসেস্ বিশ্বাস সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লেখেন, সংসারী হতে উপদেশ দেন এবং তাঁদের কাছে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এইখানেই আমার আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি। এরপর থেকে হারাধনকে সম্বল ক'রে বিদেশে বিদেশে চাকরি ক'রে বেড়িয়েছি, আর চারুর সংসার দেখেছি। বিশ্বাস দম্পতির সান্ত্বনা গ্রহণ করেছি কিন্তু উপদেশ বা আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারিনি।

আমি বললাম—আপনার জীবনকাহিনী বড়ই 'ট্র্যাজিক', শুনলেও চোখে জল আসে। সংসারে কার দুঃখ যে কোথায় এবং কতখানি তা কিছুই বোঝা যায় না বাইরে থেকে। ভালো কথা, আপনি মীরার পরিচয় তো দিলেন না?

—ও, বলতে ভুলে গিয়েছি। আইভিও যে মীরাও সে। ওর আত্মাকেই আকর্ষণ করেছিলাম আপনাদের চক্ষে। ওর 'ক্রীশ্চান নেম'টাই চলিত ছিল। আমিই শুধু ওকে মীরা ব'লে ডাকতাম। ও পছন্দও করত। একদিন বলেছিল—বিনুদা, আমার স্বদেশী নামটা তো লুপ্ত হতে বসেছিল, আপনিই ওটা উদ্ধার করেছেন। আমার বড় ভালো লাগে—জানার মধ্যে যেন অজানার বাঁশি শুনতে পাই। মীরা চলে গিয়েছে স্বর্গে, রেখে গিয়েছে 'তৃষিত স্মৃতির মরু'। কিন্তু উপায় কি? দুঃখ দেবতার দান, তাকে হাসিমুখে সহ্য করাই তো জ্ঞানীর ধর্ম। মনো-মন্দিরের নির্মমতা থেকে দুঃখকে বাহিরবিশ্বে টেনে আনলে সান্ত্বনা মেলে না, বরং মুখর মানুষের চপলতার মাঝে অনেক সময়ে তার মর্যাদাহানি হয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্তিমিত নয়নে নীরব হলেন এ বি সি ডি। আমার মনে পড়ল Washington Irving সম্পর্কে William Makepeace Thackeray-র উক্তি—"Deep and quiet he lays the love of his heart, and buries in; and grass and flowers grow over the scarred ground in due time." শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল আমার মাথা। বললাম—এতদিন ছিলাম শুধু প্রতিবেশী, এখন হলাম প্রাণের প্রতিবেশী। আজ থেকে আমি আপনার ছোট ভাই।

ভাবাবেগে হাত চেপে ধরলেন বিনোদদা। তাঁর কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জলে হাত ভিজে গেল। আমার প্রাণের পিয়ানোয় পিলু বেজে উঠল।

রাত দুটোয় বাড়ি ফিরে না খেয়েই শুয়ে পড়ি। পাড়ায় রোঁদে বেরিয়েছে পাহারাওয়ালা। তার ভারি বুটের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। ফাল্গুনী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছেয়ে ফেলেছে চারিদিক। কী স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা! চোখে স্বপন নামে। ধূলি-ধূসর জগৎ যেন মায়া-কানন। তারই এক আলোছায়া আঁকা লতা-বিতানে মুখোমুখি বসে আছি আমরা দুজনে—আমি আর বিনোদদা। কোথায় কলকাতা কে জানে। সময় চলে যায়। সে দিকে বক্তা বা শ্রোতা কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। *** সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এক তন্বী তরুণী। অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখি তার কনকের হার। হীরকের দুল, কুন্তল-আকুল মুখ। কে-এ? এ-কি স্বপন দেশের রাজকুমারী? ফাল্গুন রাতের দখিন হাওয়ায় আনমনা হয়ে চলে এসেছে আমার নির্জন-কুঞ্জে পথ ভুলে? এ কি মীরা? এ বি সি ডি-র যৌবন-রাঙা আকাশে ক্ষণিকের দেখা দিয়ে যে অদৃশ্য হয়েছিল কোন্ নীরবের দেশে? কিছুই বুঝতে পারিনে। ঘুমের ঘোরে সব একাকার হয়ে যায়।

রূপ-বহ্নি

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

জাগায়েছ এ-কী রূপ, ওগো বহ্নিশিখা,
স্নেহসিক্ত দীপমূলে—দেহ-কূলে—অনির্ব্বাণ লিখা
অনায়াস অনিন্দ্য সুন্দর!
কঠিন মুঠিতে যেন ধরা-দেওয়া ইশারার চকিত চমক
খ'সে পড়ে নিচোলের ত্রস্ত প্রান্ত হ'তে
বিলাস মর্ম্মর—
শূন্য-সে পতঙ্গ-প্রাণ!—তবু কেন তার
তরে তিয়াস-ব্যঞ্জক
অযাচিত লক্ষহীরা-হাসি
প্রচণ্ড দাহতে
বিচ্ছুরিছ ক্ষমাহীন, ওগো সর্ব্বনাশী?
পেলব ও-কুচবিম্বে ফুটেছে প্রসূন,
অতনুর-ফুলশরে নিরুদ্ধ যে মনের আগুন
কামনায় মুক্তি রসাতল!
—ভরেছ' কী তারি রস ভঙ্গুর ভৃঙ্গারে তব দৃপ্ত অনুভবে
দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে শিরায় শিরায়,
মৃত্যু হলাহল
তাই মোর নৃত্য করে অহর্নিশ নিষ্করুণ জীবন আহবে
বিস্মৃতির ভাঙি' অপস্মার,—
চিত্ত কিনারায়
কেঁদে' ওঠে সৃষ্টিছাড়া রিষ্টি-হাহাকার!—

ঐন্দ্রিক এ-ফাঁদ!—তবু আছে উত্তরণ
মদিরাক্ত মুহূর্ত্তের, নেশা-লাগা এষার পীড়ন
মোচনের নির্ব্যক্ত প্রেরণা—
তারো ঊর্দ্ধে নির্য্যন্ত্রণ রতি হ'তে যবে তুমি হৈমবতী ধ্যানে
রূপায়িত,—মহেশের মর্ম্ম-উচাটন,
অরূপ মন্ত্রণা,—
রুদ্র মোর অস্তিত্বের যত ক্ষোভবিক্ষোভের প্রদ্যুম্ন আহ্বানে
হবে লব্ধ শর্ব্বরীর স্বাদ
স্রগ্ধ সমাপন,
অন্তর্দ্দাহ অন্তিমের অপূর্ব্ব আহ্লাদ!—
আশ্লেষ আগ্রহ শ্লেষ—নিগ্রহের ঋণ!
তাইতো ধরিতে চাই এক দেহে নিত্য রাত্রি দিন
ওগো বহ্নি, রূপ স্বতন্তর,
বুকের ঊষর হ'তে তাপদগ্ধ ললাটের ভ্রূ-যুগ মাঝারে
অপরূপ আঘাতের আশ্চর্য্য আরাম!
যুগ-যুগান্তর
তাইতো কাঙ্ক্ষিত তুমি,—সত্তা তব আমার এ
চেতনা-পাথারে
প্রণয়ের পৃক্ত দিদৃক্ষায়
উন্মেষ নিষ্কাম,
মোর দিব্যতৃতীয় নয়ন দীপিকায়!

স্বামী বিবেকানন্দ : তাঁহার জীবন ও বাণী

কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

বৈচিত্র্যই সৃষ্টির বিশেষত্ব। মানস চক্ষের অন্তরালবর্ত্তী দেবতা সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে অবিরাম রচনা করে চলেছেন নবীনতর অধ্যায়,—যার মধ্যে পুরাতনের কণা মাত্র নেই, নেই একের সহিত অন্যের ক্ষীণতম সাদৃশ্য। সৃজনকালে মানুষ জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে পুনরাবৃত্তির দোষে সৃষ্টিকে বৈচিত্র্যহীন করে তুলতে পারে। কিন্তু যিনি অনন্ত শক্তির অধার, তাঁর রচনাধারায় কোন পূর্ব্ব ইতিহাস নেই, কোন হিসাব নেই। কবি বলেছেন।

প্রথম দিনের সূর্য্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
'কে তুমি'?
মেলেনি উত্তর।

বাস্তবিক কোন উত্তর নেই। সম্ভবত তাই একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য। কিন্তু সেই পার্থক্য—যাকে "বৈচিত্র্যের মাধুর্য্য" নামে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবেনা, তাকেই নিম্নপর্য্যায়ে নামিয়ে এনে মানুষ করেছে বিভেদের সূত্রপাত। যার ফলে কত অসংখ্য সম্ভাব্যময় জীবনের ও কত সাধের প্রাণবিন্দুর ঘটেছে নৃশংস অপচয়!

কিন্তু বিবেকানন্দ ঈশ্বর প্রেরিত মুক্ত-পুরুষ। তিনি দেখেছেন বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য, দেখেছেন বিভিন্নতার ভিতর একই শক্তির মূল। যে কালে তিনি জীবনের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন সেই কালে বঙ্গদেশের ভাগ্য বিদেশীর হাতে রঙ্গে পরিণত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্যজ্ঞান-বিজ্ঞান, ন্যায়-অন্যায় সমগ্র দেশের, বিশেষত বঙ্গদেশের শিরা উপশিরায় উগ্র মদিরার ও মত্ততার করেছিল সঞ্চারণ; সেই বিষক্রিয়ায় উত্থিত বিধর্ম্মের হলাহল বিবেকানন্দ পান করেছিলেন নীলকণ্ঠের ন্যায়।

প্রথম জীবনে প্রাণবন্যায় উচ্ছল, অনুশাসনের সহস্র দুয়ার ভাঙ্গা মুক্ত জীবনের প্রতীক বিবেকানন্দের স্বপ্নময় মন সমগ্র মানব জাতির দুর্দ্দশায় হাহাকার করে উঠলো। জীবনের যে মুহূর্ত্তটি ক্ষণকালের মধ্যে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল মর্মভেদী আর্ত্তনাদে, তা কি আর ফিরে আসবে? সহস্র তপস্যারও অলভ্য যে প্রাণ, মানুষ কি তা ফিরে পাবে! প্রতিক্ষণের বর্ণ সম্ভার, প্রতি পদক্ষেপের অনুরণন, প্রতিটি নিশ্বাসের মধ্যে যার অনন্ত পরিচয়,—অসংখ্য বন্ধন দুর্ভেদ্য কারায় কেন তার এই নিষ্পেষণ! বিবেকানন্দের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তিনি কামনা করলেন সীমাহীন সম্ভাবনায় ভরা এই জীবন সহস্রদলে বিকশিত হোক, জীবনের প্রতিটি রন্ধ্র ঐক্যতানে পূর্ণ হোক। সমস্ত শাসন, সকল দুয়ার ভেঙ্গে বাধাহীন, পরিপূর্ণ মুক্ত জীবনের সুধাপানে জীবনের জয়গান ধ্বনিত হোক। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি জানালেন, "একটি মানুষের উদ্ধারের জন্য যদি আমাকে সহস্রবার জন্মাতে হয় তবে আমি তাতেও রাজী।……নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুজাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝাড়, জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে।"

আহ্বানটি শুধু মাত্র বাক্যসমষ্টি নয়; যেন উত্তপ্ত লৌহশলাকার উপর কঠিন আঘাতের সঙ্গে নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। স্বামীজী নিজে স্বীকার করেছেন যে তিনি সমাজতন্ত্রী। তাঁর মতে, সকল নরনারী একই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, এবং সকল জ্ঞান পবিত্রতার আধার স্বরূপ একই

আত্মার বহু রূপ। মানুষে মানুষে ভেদ ও বৈষম্য কেবল তাহাদের আত্মশক্তির বিকাশের তারতম্যে। সেই জন্য তিনি বেদান্তের মহান তত্ত্ব কেবল ব্রাহ্মণের গৃহে, অরণ্যে কিম্বা গিরিগুহায় আবদ্ধ রাখতে স্বীকৃত হননি। তিনি কামনা করেছেন—"বিচারালয়ে ভোজনালয়ে দরিদ্রের কুটিরে মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে,—সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব অালোচিত হোক।······যে জেলেকে বেদান্ত শিখাও সে বলিবে, তুমিও যেমন, আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক আমি না হয় মৎস্যজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন আমার ভিতরেও সে ঈশ্বর আছেন।' আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই—অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা।—এই উক্তি আধুনিকতম সমাজতন্ত্র থেকে ভিন্ন নয়। স্বামীজী অনুভব করেছেন, "সমষ্টির উন্নতিতেই ব্যষ্টির উন্নতি, সমষ্টির সুখেই ব্যষ্টির সুখ। এ অনন্ত সত্য,—জগতের মূল ভিত্তি। ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু, পালনে অমরত্ব।"

যে তেজ যে বীর্য্যবত্তা দেশপ্রেম তথা মানবপ্রেমের জন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রয়োজন, স্বামীজীর তা ছিল পূর্ণমাত্রায়। প্রকৃত শিক্ষাতেই যে জাতির অগ্রগতি ও অভ্যুত্থান ঘটে, স্বামীজী তা উপলব্ধি করেছিলেন মরমের সঙ্গে। তিনি বলতেন, "মানুষ গড়াই আমার ব্রত।" একদা তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, "নেতা হওয়া বড় কঠিন। সঙ্ঘের পায়ে যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি নিজের সত্তা পর্য্যন্ত নেতাকে বিসর্জন দিতে হয়।

কাপুরুষতা, ভীরুতা, তমোগুণের বিরুদ্ধে তিনি সদাই ব্যবহার করেছেন তিক্ত ভাষা। "If there is any sin in the world, it is weakness, weakness is sin, weakness is death."···"আমি চিরকাল বীরের মত চলে এসেছি, আমার কাজ বিদ্যুতের মত শীঘ্র, আর বজ্রের মত অটল চাই।"

কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে উন্নতির প্রধান বাধা,—অর্থাৎ সমাজের দারিদ্র্য ও ক্ষুন্নিবৃত্তিতে অসমর্থ জনগণের অবস্থায় স্বামীজীর দূরদৃষ্টি পড়েছিল। 'সেই জন্য প্রারম্ভে ধর্ম্মোপদেশ দান করা অপেক্ষা দৈহিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন "যদি জীবনীশক্তি প্রবল হয়, তবে কোন রোগের বীজাণু সেই দেহে থাকতে পারে না। আমাদের জীবনধর্ম্ম, এর ধারা যদি স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হয়, মহাতেজে প্রবাহিত হয়, শুদ্ধ ও শক্তিশালী হয়, তবে সব দিক ঠিক থাকবে, রাজনৈতিক সামাজিক এবং অন্যান্য জাগতিক ত্রুটি, এমন কি দেশের দারিদ্র্য,—সকলই নিরাময় হবে।—স্বামীজীর বলিষ্ঠ জীবনবাদ এই।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান উপদেশ "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" একেই জীবনের মূলমন্ত্র করেছিলেন স্বামীজী। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করে তিনি গুরুভাইকে লিখে জানালেন, "আমার আশ্রম অতি অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? মুসলমান বালককেও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবেনা। তাহাদের খাওয়া দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল, এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতব্রত হয় এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম্ম—জটিল দার্শনিকতত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ।···তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরে পুঁজো হে বাপু! হিন্দু, মুশলমান, খৃশ্চান ইত্যাদি সকলজাতের ছেলে লও—···আর ধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীনভাব তাহাই শিখাইবে।"

ভারতবর্ষ কখন কাহাকেও আঘাত করেনি। সহিষ্ণুতাই তাহার স্বধর্ম্ম, বিরোধের মধ্যে ঐক্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়ই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এই গ্রহণের ক্ষমতার এই উন্মেষশালিনী প্রতিভা ভারতবর্ষকে যুগে যুগে নবীনতর দৃষ্টিদান করে নূতনকে বরণ করার সামর্থ্য দান করেছে। যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্বামীজী তাই সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, "আমরা পাশ্চাত্যের শিল্প বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিব, কিন্তু ভারতীয়তাকে বর্জন করে নয়। Make a Europian society with Indian background.

যুগ যুগান্তর হইতে মানব জাতির মধ্যে অহোরাত্র যে সংগ্রাম পরিলক্ষিত হচ্ছে, এবং কোন বিশেষ রাজত্ব কেন যে স্থায়িত্ব-লাভ করতে পারেনি, পারছেনা এবং পারবে না, তার কারণ স্বামিজী বিশ্লেষণ করেছেন, "ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণ জাতি কখনও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেনা; ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন, স্থায়ী হইতে

পারে, কেবল পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি কখনও জয়লাভ করিতে পারেনা। ক্ষমা ও কোমলতাই সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। "কারণ" প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার—ইহাই একমাত্র বস্তু যাহা সকল দুঃখ দূর করে—একমাত্র পানপাত্র—যাহা পান করিলে ভবব্যাধি দূর হয়।"

সামাজিক উন্নতিসাধনে সদাব্যস্ত, স্বামীজীকে স্বামী অভেদানন্দ বলেছিলেন, "সন্ন্যাসীর কি এই সকল কাজে মেতে থাকা উচিৎ?" উত্তরে স্বামিজী বলেন, "জানিনা, তোমরা ধর্ম্ম বল্‌তে কি বোঝ। রসই যদি না থাকলো, শুধু শুকখোলা চুষে কি লাভ? ধর্ম্ম তো শুধু নিজে সাধন করলেই চলবেনা, দেশবাসীকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্ম্মসাধনায়। কিন্তু ঠাকুর কি বলতেন না, খালি পেটে ধর্ম্ম হয়না? আমার কাছে তো ভাই ধর্ম্ম মানে দরিদ্র অসহায় নিঃসম্বল, দুঃস্থ মানুষের সেবা করা, তাদের নির্জীব বুকে প্রাণ জাগিয়ে তোলা,—তাদের জীর্ণ দেহে শক্তি দেওয়া।·· যার আশীষবাণীকে আমি বাস্তব রূপ দেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি—সেই জীবত্রাতা ঠাকুরের মন্ত্রের মূলেও বুঝিবা আছে এই কথাই। দিকে দিকে মানুষ যদি মরে পচে হেজে যায়,—মঠ—মন্দির নিয়ে কি হবে ভাই?"

কথাগুলির মধ্যে যেন সেই পরম কারুণিক প্রেমময়ের ভেসে আসছে দুঃখহরা বাঁশরীর সুর। স্বামিজী বিশ্ব ভ্রমণ পরিক্রমার জন্য প্রস্তুত হলেন। এলেন কন্যাকুমারী। উক্ত স্থানের পরম রমণীয়, মৌন শান্ত গম্ভীর পারিপার্শ্বিকতায় মুগ্ধ হলেন তিনি একান্তভাবে। সম্মুখে অসীম সিন্ধু,—পশ্চাতে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত—সুনিবিড় বিশাল অরণ্য; দূরদূরান্তরে অসংখ্য জনপদ। এখানে উপবেশন করে স্বামিজী যেন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করলেন আপন অন্তরে।

কিন্তু সহসা তাঁর সদা মুক্তি-প্রয়াসী মন যেন বলে উঠলো, 'আর কেন, এবার যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করি!' পরক্ষণে অন্তর প্রশ্ন করলো, 'তাহলে কেন এসেছিলে জগতে, কোটি কোটি লোকের অন্তরের ব্যথা অনুভব করেছ তুমি আপন অন্তরে; স্মরণ কর তাদের শীর্ণ শুষ্ক পাণ্ডুর মুখচ্ছবি।'

আত্মস্থ হলেন স্বামিজী। তাইত তাঁর তখনও অনেক কাজ বাকী! নবীন প্রেরণায় মন তখন মেতে উঠেছে নবতম কর্ম্মের উৎসাহে। 'ভারতের কল্যাণ, ভারতবাসীর কল্যাণ'—এই মূল মন্ত্র ঘন ঘন মন্দ্রিত হচ্ছে তাঁর—স্পর্শকাতর হৃদয় তন্ত্রীতে।

জাপানে গিয়ে তাদের দেশপ্রেম, 'সাহসিকতা, কর্মকুশলতা ও শিল্পানুরাগ দেখে স্বামিজী হলেন চমৎকৃত। অদম্য উচ্ছ্বাসে মাদ্রাজের শিষ্যবর্গকে লিখলেন,—

'তোমরা কি করছো? সারা জীবন কেবল বাজে বকছো। এসো, এদের দেখে যাও; তারপর যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাতি যায়। হাজার হাজার বছর ধরে কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ তোমরা।···খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার করে শক্তিক্ষয় করছো। শত শত যুগের সামাজিক অত্যাচার তোমাদের মনুষ্যত্ব একেবারে দলে পিষে দিয়ে গেছে।···এসো মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত্ত থেকে বাইরে নিয়ে এসে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এসো আমরা ভাল হবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেয়োনা,—অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদে কাঁদুক,—পেছনে চেয়োনা, এগিয়ে যাও।"

স্বামিজী বিশ্বাস করতেন ভারতের নিদ্রিত সিংহকে যদি জাগ্রত করতে পারা যায় তবে কার্য্যসিদ্ধি অনিবার্য্য। তাঁর ধারণা যে ভ্রান্ত নয়, তার প্রমাণ দিয়েছেন, কানাই দত্ত, ক্ষুদিরাম; আশাকে সত্যে পর্যবসিত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র ও ভারতের অগণিত জ্ঞাত-অজ্ঞাত বীর সন্তান—যাদের 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।' তাই উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ কোন বিদেশীকে জানিয়েছিলেন, 'যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, তবে আগে বিবেকানন্দকে জান। এত বড় ধ্রুব সত্য আর বুঝি বেশী নেই!

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মানবকল্যাণের জন্য মঠ স্থাপন করে স্বামিজী যে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত সহস্তে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বুঝি বা গুরু ভাইদের সহজ যাতায়াত

সম্ভব ছিলনা। কিন্তু অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, প্রকৃত তথ্য তা নয়, তিনি সকল বন্ধনের মাঝে চির-বৈরাগী। 'কেবল কাজটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি,—শুধু এই জন্য যে, আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাব, তখনও যেন যন্ত্রটি সামনের দিকে এগিয়ে চলে। বহুদিন আগে যেদিন জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, সেইদিনই আমি মৃত্যুকে জয় করেছি। আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা হলো 'কাজ'—এমন কি তাও প্রভুকে সমর্পণ করে দিচ্ছি,তিনিই সব চেয়ে ভাল জানেন।'

অর্থাৎ কবির ভাষায়.—"সীমার মাঝে অসীম তুমি—বাজাও আপন সুর।'

এই সূত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন,······এই জন্য বারংবার আমি বলি যাতে সকলে কাজের জন্য তৈয়ার থাকে। একজন মরে গেলে অমনি একজন (প্রয়োজন হলে দশজন) কাজে লাগবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। দ্বিতীয় কথা মানুষের interest না থাকলে কেউ খাটে না; সকলকে দেখানো উচিত যে, প্রত্যেকের কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে এবং কার্য্যধারা সম্বন্ধে মতপ্রকাশের ক্ষমতা আছে।···এমন একটি যন্ত্র খাড়া কর যে আপনি আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে। আমাদের ইণ্ডিয়ায় ঐটি প্রধান দোষ যে, আমরা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না। আর তার কারণ এই যে, আমরা অপরের সঙ্গে কখনও ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাইনা এবং, আমাদের পরে কি হবে, তা কখনও ভাবি না।" একে গণতন্ত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বল্‌লে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না।

তথাকথিত দেশপ্রেমিকের উপর স্বামিজী বিন্দুমাত্র আস্থাবান ছিলেন না। বলেছেন, "আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিনমিনে, ভিনভিনে, ছেঁড়াণ্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরুত্বে বরণ করায় স্বামিজী অনেকের নিকট অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের দেশের তথাকথিত কল্যাণকামীর দল জানিয়েছিলেন, স্বামিজী যদি গুরু পূজা ত্যাগ করেন, তবে তাঁরা দলভুক্ত হতে পারেন। উত্তরে স্বামিজী শ্লেষ করে বলেন, "যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁত আছে। বলি এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায়-যায়, কণ্ঠে মড় মড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে?···কে জানে কার কি মতিগতি। আমার যেন মনে হয় ওসব লোককে গ্লাসকেসের ভিতরই তাল;

প্রীত না মানে জাত কুজাত
ভুখ্ না মানে বাসী ভাত॥

আমি তো এই জানি।"

দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্ব হতেই স্বামিজীর মন পার্থিব জগতের কর্ম্মময় জীবনের উর্দ্ধে যেতে থাকে। কুমারী ম্যাকলাউডকে লেখেন, 'আমি এখন সেই আগেকার বালক বই কিছু নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটির তলায় রামকৃষ্ণের বাণী অবাক হয়ে শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেত। বালকভাবটাই হবে আমার আসল প্রকৃতি,—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতির উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র।···আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশি; এত যে কষ্ট পেয়েছি তাতেও খুশি; জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি তাতেও খুশি; আবার এখন যে নির্ব্বাণের শান্তি সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি, তাতেও খুশী।···দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা থাকতেই মুক্ত হই,—সেই পুরাণ 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না!···শিক্ষাদাতা গুরু, নেতা, আচার্য্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!"

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি থেকে আমরা জেনেছি যে, স্বামিজী সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি; নর-নারায়ণের নর-দেবতা। কিন্তু অপর একটি পরিচয়ের কথা সহজ-শ্রাব্য নয়। কুমারী মেরী হেলকে পত্রে স্বামিজী স্বয়ং জানান, "এখন আমি সত্যিকারের বিবেকানন্দ হতে চলেছি। তুমি কখনও মন্দকে উপভোগ করেছ? হাঃ! হাঃ! বোকা মেয়ে, সবই ভাল। যত সব বাজে। কিছুভাল, কিছু মন্দ। ভাল মন্দ দুই-ই আমার উপভোগ্য। আমিই ছিলাম যীশু এবং আমিই ছিলাম জুডাস ইস্ক্যারিয়ট; দুই-ই আমার কাছে খেলা, আমারই কৌতুক।"

জগতে কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম

গ্রহণে উৎসাহিত করেননি। বলেছেন স্বধর্মে অধিষ্ঠিত থেকে বিভিন্ন ধর্ম্মকে উদারচিত্তে স্বীকৃতি দাও। তাই আজ তিনি জগৎপূজ্য। স্বামিজীর নিকট ভারতের ঋণের শেষ নেই, যুগ যুগান্তর তাঁর আশীর্ব্বাদ ভারতের উপর বর্ষিত হবে। কিন্তু প্রায় তিনবৎসর কালের পাশ্চাত্য-ভ্রমণ বিদেশীদের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা তারা সহজে, বিস্মৃত হবে না, তাঁর স্মৃতি শাশ্বত হয়ে বিরাজ করবে।

উপেক্ষিত প্রতিভা

বীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়

কবি ও নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী দ্বারে এসে অনাদরে ফিরে গেল। বাঙালী তাঁর "প্রতাপাদিত্যে"র স্রষ্টাকে বাঙালী এর মধ্যেই ভুলে গেছে। কেউ উদ্যোগী হয়নি তাঁর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে। এখন যাঁরা রঙ্গালয়ের কর্ণধার তাঁরাও কেউ এ বিষয়ে মনোযোগী হলেন না। একমাত্র শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের "সপ্তপর্ণা" সম্প্রদায় ক্ষীরোদপ্রসাদের শতবার্ষিকী স্মৃতি পূজায় তাঁর বিখ্যাত জনপ্রিয় গীতিনাট্য "আলিবাবা" ও কাব্যনাট্য "নরনারায়ণ" অভিনয় করে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। বাঙালী তার জাতীয়তাবোধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন বলেই বোধকরি এতবড় একজন প্রতিভাবান দেশাত্মবোধের উদ্বোধক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্বন্ধে সে আজ এত শোচনীয়-ভাবে উদাসীন।

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের দান অসামান্য। কোনদিনই তা ম্লান হবার নয়। তাঁর গীতিনাট্য "আলিবাবা" তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। ক্ষীরোদ-প্রসাদের অন্যতম গীতিনাট্য "কিন্নরী"ও এক সময়ে বাংলা রঙ্গালয়ে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। "বরুণা" তাঁর আর একখানি উল্লেখযোগ্য গীতিনাট্য। তাঁর "রঘুবীর," "নর-নারায়ণ" এবং "আলমগীর" প্রতিভাবান প্রয়োগশিল্পী ও অভিনেতা স্বর্গত শিশিরকুমারের যাদুস্পর্শে অমর হয়ে আছে। এখানে একটি কথা সততই মনে হয় যে, স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি বুঝি বড় হয়ে উঠেছে। শিশিরকুমারের অভিনয় যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, "আলমগীর" শিশির-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান। "আলমগীর" পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। কারো কারো মতে "নর-নারায়ণ" তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। "নর-নারায়ণ" শুধু নাটকই নয় একখানি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য। এমন সুললিত মধুর ভাষায় বাংলা নাট্যকাব্য আর দ্বিতীয় একখানি নেই। তাঁর অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি ও নাট্যপ্রতিভা এ গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সে বিচার পণ্ডিতের। সাধারণ দর্শক ও পাঠক যুক্তি দিয়ে কোনো নাটকের বিচার করে না। তারা বিচার করে অনুভব দিয়ে। তাই তাদের কাছে যুক্তির চেয়ে হৃদয় স্পর্শনের মূল্য বেশী।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, তাঁর চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ ও দৃশ্য সন্নিবেশ খুবই উপভোগ্য। ধরুন "রঘুবীর" নাটকের কথা—কৃষক সেখানে নিজের ভাষায় কথা বলে। সখার মা গ্রাম্য লোভী স্ত্রীলোকের প্রতিচ্ছবি। ভীলের ছেলে-মেয়ে রঘুবীর এবং শ্যামলী—ব্রাহ্মণের গৃহে লালিত-পালিত তাদের আচরণ, চলন, বলন সবই ব্রাহ্মণোচিত। রাজকন্যা পরীবানু ঠিক রাজার মেয়ের মতই স্বল্পভাষী ও ধীরস্বভাবা। ফলব্যবসায়ী লোভী জাফর রাজ্যের লোভে নবাবকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করলেও তার চরিত্র ও আচার-ব্যবহার সবই নীচ বংশোচিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদ সব সময়েই দর্শকদের মনে রেখে তাঁর নাটক সৃষ্টি করতেন। সেই জন্যই তাঁর নাটক সকল সময়েই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে। এখানে তাঁর রচিত বাংলা রঙ্গালয়ের চিরনূতন, অতিজনপ্রিয় অভিনব গীতি-নাট্য "আলিবাবা"র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আরবের মরুপথ বয়ে বাংলার মাটিতে বাংলার আউল-বাউল, ফকির-দরবেশের মত "আলিবাবা" আমাদের নিজস্ব, আমাদের আপনার জন হয়ে গেছে। মুসলিম্ হারেমের

বান্দা আবদাল্লা ও মর্জ্জিনাকে আপনার করে নিয়েছে বাঙালী পাঠক আর দর্শক। এইখানেই ক্ষীরোদপ্রসাদের কৃতিত্ব, এইখানেই তাঁর নাটকীয় প্রতিভা।

ক্ষীরোদপ্রসাদের যুগান্তকারী নাটক "প্রতাপাদিত্য" বাংলার দেশাত্মবোধকে একদা সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। "আলিবাবা"র নাট্যকার যে আবার এ ধরণেও নাটক লিখতে পারেন এ ছিল সেদিন এক বিস্ময়। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রসঙ্গে আমার নিজের শৈশবের একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। যদিও তা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবুও তা প্রকাশ না করে থাকতে পারছি না। শিশু মনে গীতি-নাট্যের কি প্রভাব এবং নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রভাব কি ভাবে সেদিন আমার মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই এখানে জানাব। তখন আমি নিতান্ত ছোট ছেলে। মা দিদিমার সঙ্গে অভিনয় দেখতে গেছি। রঙ্গালয়ের দোতলায় কি তিনতলায় (ঠিক আমার মনে নেই) জাল দিয়ে ঘেরা মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে মা দিদিমার কাছে বসে অভিনয় দেখছি। প্রথমে কি একটা সামাজিক নাটকের অভিনয় হল। তার কথা সুস্পষ্ট আমার মনে নেই। হয়তো তখন আমার সামাজিক নাটক বুঝবার মত জ্ঞান এবং বুদ্ধি হয়নি। তাই সে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়, চরিত্র-চিত্রণ এবং সংলাপ আমার মনে কোনই রেখাপাত করতে পারে নি। কিন্তু দ্বিতীয় নাটক গীতি-নাট্য "আলিবাবা"র অভিনয় যখন আরম্ভ হল তখন কেন জানি না—প্রস্তাবনা থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে দেখলুম। নাটকের ঘটনাবলী আমার শিশুমনে যে মায়াজাল বিস্তার করেছিল, সত্যি কথা বলতে কি আজ জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তার স্মৃতি ভূলতে পারিনি।

বাংলা ভাষায় সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত গীতিনাট্যের মধ্যে "আলিবাবা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজনপ্রিয় একথা বললে হয়তো বেশী বলা হয় না।

"আলিবাবা"র অভিনয় আমি বহুবার দেখেছি। তখনকার দিনে বিখ্যাত নৃত্যবিদ্ নৃপেন বসুর (যিনি ন্যাপা বোস নামে পরিচিত ছিলেন) আবদাল্লার ভূমিকায় নৃত্য-গীত ও অভিনয় এবং কুসুমকুমারী, নীরদাসুন্দরী পরে চারুশীলা প্রভৃতির মজ্জিনা সত্যই খুব উপভোগ্য এবং দেখবার মত ছিল। তা ছাড়া এক সময়ে ভবানীপুর নাট্য-মন্দিরে ভবানী থিয়েটারের অতুল মাষ্টারের আবদাল্লা এবং ভবানীপুরের চারুশীলার মর্জ্জিনাও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে-ছিল। তার অনেক পরে শ্রীমধু বোসের প্রযোজনায় অভিজাত সৌখিন সমাজের অভিনীত "আলিবাবা" দর্শক-দের অভিবাদন জানায় এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে। আব-দাল্লার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীমধু বোস এবং মর্জ্জিনার রূপ দেন কুমারী সাধনা সেন (তখনও তিনি বিবাহিতা হন নি)। সে অভিনয় যাঁদের দেখবার সুযোগ হয়েছিল তাঁরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন গীতিনাট্য হিসাবে "আলি-বাবা" অভিজাত শ্রেণীরও প্রিয়। সেই অভিনয়ে শুচিতা বা আধুনিকতার অঙ্গ হিসাবে—"বাজে কাজে…মিন্‌সে"… এই গানটির "মিন্‌সে" শব্দটির কর্ত্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তা হ'লেও "আলিবাবা" "আলিবাবা"ই ছিল। Ali-dady"তে পরিণত হয়নি।

হাস্যরস সৃষ্টিতেও ক্ষীরোদপ্রসাদের ক্ষমতা ছিল অসামান্য। গুরুগম্ভীর নাটকের মাঝেও হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি কৃপণতা করেননি। তাঁর রচিত প্রহসনও আছে একাধিক।

সে সব দৃষ্টান্ত আর রস-সংলাপ উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। "দাদা ও দিদি" "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" "বাংলার মস্‌নদ" প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক তদানীন্তন ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক পড়বার এবং অভিনয় দেখবার সুযোগ অনেকেই পেয়েছেন। যাঁরা সে সুযোগ পাননি তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ ক্ষীরোদপ্রসাদের সার্থক জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হবে তাঁর নাটকের পঠন, পাঠন এবং অভিনয়ে।

জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে "প্রতাপাদিত্য" নাটকের অবদানও বড় কম নয়। প্রতিভাবান নাট্যকারের প্রসাদ গুণে বাঙালী বীর প্রতাপাদিত্য বাঙালীর হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ একজন খাঁটি বাঙালী ছিলেন এবং বাংলা ভাষাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন। এখানে একটি ঘটনার ক্ষীণ স্মৃতি আমার মনে পড়ে। কোন মামলায় সাক্ষী দেবার সময় ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর বক্তব্য বাংলায় বলেন, কিন্তু অপরপক্ষের আইনজীবী ইংরাজিতে তাঁর বক্তব্য বলবার জন্য জেদ ধরেন এবং আদালতকে জানান যে, তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধীধারী অধ্যাপক এবং ইংরাজি অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি। অতএব তিনি ইংরাজিতে তাঁর উত্তর দিতে বাধ্য। পরাধীন ভারতে ইংরাজদের আদালতে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন—"ইংরাজি আমি ভুলে গেছি। ইংরাজি আমার মাতৃভাষা নয়। বাংলা আমার মাতৃভাষা। বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় আমার বক্তব্য বলা সম্ভব নয়।"

আজ আমরা তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীতে তাঁর কথা স্মরণ করে তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা এবং অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।
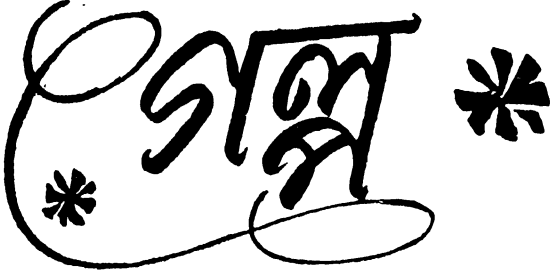
নেকার নদীর ধারে

মণিভূষণ মজুমদার

সারাবছর রামলাল ড্রেসডেন সহরের এক কারখানায় হাড়-ভাঙ্গা-খেটে, জার্ম্মানীর দক্ষিণে নেকার নদীর ধারে Black forestএর একটা অতি ছোট্ট গ্রামে ঘুরে আসবে ঠিক করল,—কয়েকদিনের ছুটিতে। রামলাল যেখানে কাজ শেখে—পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ছাত্রই আসে কাজ শিখতে সেখানে। তিনটি জাপানীও আছে। এই সব বিদেশী ছাত্ররা নিজের নিজের দেশের আচার ব্যবহার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। ওদের আলাপ বেশ জমাট হয়। কিন্তু জাপানী তিনজনেই কারো সঙ্গে আলাপ করত না, যদিও ওরা জার্ম্মান ভাষা আগেই শিখেছিল। একদিন ফোরমান অটো বলল—

এই যে দেখছ জাপানী, ওরা সবই শিখতে চায়, তাই কথাই বলে না, হয়ত ভাবে কাজের সময় ওতে ক্ষতি হবে।

ওরা বাহিরে যখন যায় এখন কেউ কেউ Guten Tag বলে ওদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চায়, তখন ওরা শুধু একটু হেসে ওদের হলদে বড় বড় দাঁত বেরই করে কিছুই বলে না বিশেষ।

নেকার নদীর ধারের গ্রামের কথা বলেছিল অটো, আরও খবরের জন্য Kassberg strasseএর একটা দোকানের হের ভাল্এর সঙ্গে দেখা করতে বলে। জোয়া-ফিম্ তাঁকে জানে তাই ৫টা বাজবার আগেই রামলাল Boiler suit খুলে হাত ধুয়ে জোয়াফিমকে বলে—

চলনা হাত ধুয়ে একটু আগেই, হের্ ভাল্এর সঙ্গে তাহলে দেখা হয়ত হবে।

ওদেশে কেউ একটু আগে গেলে কিছুই বলে না, যদি ফোরমান্এর চোখে পড়ে তবে সে একটু হেসে ও চোখ-টিপে বসবে—'কি হে খবর ভাল ত ?'

রামলালের কথায় জোয়াফিম্ যেমন কাজ করছিল file চালাতে চালাতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—ওরা আমাকে পাঁচ মিনিটেরও মাইনা দেয়। মনে হল রামলালের, ছেলেবেলায় একবার ইস্কুল পালাচ্ছিল খেলা দেখবে বলে, আর ধরা পড়ে অনন্ত মাষ্টারের সেই কসে কান মলাটা।

ওরাই নেকারকে বলে নদী—কারণ অনেক দূর থেকে জল বয়ে আসছে। স্রোতও আছে—কারণ ঝর.পাতা ও ফুল ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ও মাঝে মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। ট্রেনে সে সময়ে ১ম থেকে ৪র্থ ক্লাস পর্য্যন্ত ছিল এই সব ছোট গ্রামের লোকাল গাড়ীতে। বড় লাইনের Express গাড়ী ছেড়ে রাম এই রকম ছোট গ্রামের গাড়ীতে বসেছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় বাগান ও ছোট ছোট বাড়ী—মেয়েরা লেপ তোষক রোদে দিচ্ছে, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলছে সিঁড়ির ধারে বসে—ট্রেন ধীরে ধীরে চলে যায় ছোট লাইন—হাতে তার অনেক সময়। তেমন ছিল না সময় ওই সব Express গাড়ীর। এক ষ্টেসন ছাড়ল ত থামবার নাম নাই, বিরক্তি ধরে যায় ওর ঝিক্ ঝিক্ একটানা আওয়াজে। আর করিডোর দিয়ে Speise waagen (খাবার গাড়ী) বয় ঝুড়ি হাতে ডাকবে—বিয়ার চাই, কফি চাই sandwich চাই Biffe.

Sandwich এ থাকে salami না হয় Ham, প্রথমটায় থাকে গরু শুয়োর ও গাধার মাংসের কিমা। Beer খেলেও মুখ তিতো হয়, আর কফি—সেত বলাই যায় না, মনে হয় ছেলেবেলায় পিলে হলে যে চিরতার রস খাওয়াত তাই যেন। জল নাই, চাইলে দেবে Soda-water, না হয় sprudel এক রকম Mineral জল, দাম বেজায়। আর শুধু জলকে বলবে Frisches wasser (fresh water), আর চোখ গোল গোল করবে, তারপর গাড়ীর কামরার সব কটী লোক বুড়ো বুড়ি চ্যাংড়া চেংড়ী বাচ্চা খুকুও—মুখ দিয়ে কেমন একটা আওয়াজ করবে।

আর বয় হেসে বলে Bloss wasser! তারপর টলটলে বিয়ারের বোতল দেখিয়ে ঝুড়ি হাতে চলে যাবে—"Beer biffe," অন্য কামরায় গিয়ে হাঁকবে। রামলাল মনে মনে বলে—ব্যাটা মাতালের জাত, ওরা হয়ত বলে—মর ব্যাটা রোগে পড়ে। ওরা সাধারণত খায় না যেটা বোতলে ভর্ত্তি না থাকে ও কোন লেবেল না থাকে। ভারতবর্ষের লোকের কাছে ভেজালটাই অনেক সময় আসল হয়। যেমন মাইনার চেয়েও উপরিই বড়। হরিহরের চাকুরী হল মাইনা এত টাকা, সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন হবে—উপরি কত? উপরিই আসল, ওতেই হরিহরের সংসার, জমিজমা, ও পুকুরে মাছ ছাড়া হবে ও ওর দিকেই কনের বাপ তাকায়।

ছোট্ট গ্রাম প্লাটফরম নাই, ঝাঁপিয়ে নামতে হয়। হাতের বাক্সটা এক বুড়ি নামিয়ে দিল। Danke অর্থাৎ Thanks, তার জবাবে জার্ম্মানরা সর্ব্বদাই বলে Bitte (ওর মানে কি জানি না)—Wo wollen Sie gehen? (কোথায় যাবে?)

—একটা হোটেল না হয় থাকবার ঘর, কারো বাড়ীতে যাব। দুগালই বুড়ির আরো গেল তুবড়ে হাসতে, ও কপালের চামড়া আরো গেল কুঁচকে, চোখ দুটী গোল গোল করে রামলালের একটা হাত জাপটে ধরে গেল ষ্টেসনের কাছেই একটা ছোট্ট পাথরের দোতালা বাড়ীতে। বুড়ির অন্য হাতে একটা কাপড়ের পোঁচকা—মনে পড়ে দেশের দিদিমা যেন ফুলকাটা কাঁথা ও পাটালি গুড়, চিড়ে ভর্ত্তি গাঁটরি নিয়ে চলেছে নাতির বাড়ী। দরজায় ঘণ্টা মারতেই যে এল তাকে দেখে মনে পড়ে যায় পরশুরামের ভুশুণ্ডিমাঠের মূর্ত্তিমান—বেঁটে, মোটকা, ঘাড় নাই, মাথা-ভর্ত্তি টাক্, কিন্তু বিরাট গোঁফজোড়া ঠোঁটের দুদিকে এসে নেমেছে চিবুকের কাছে। যেন হুড্ডু প্রপাত,—ফোঁটা ফোঁটা বিয়ারের রস গড়িয়ে পড়ছে। টল্ টল্ করছে উপরের দিকে। নাকটা মনে হয় পাহাড় কেটে দুটী রেলের টানেল। পরণে রং চটা প্যাণ্ট, গায়ে টাই ছাড়া সার্ট, তার উপর কালো সোয়েটার। (মাথায় টাক পড়ে, গোঁফের ত টাক দেখি না) ভদ্রলোক সার্টের হাতায় গোঁফজোড়া মুছে কথাবার্ত্তার পর বোঝা গেল ওটা ওরই বাড়ী—হোটেলও বলতে পার, এখানে অনেক tourist আসে ও থাকে, খেতেও দেবে, তবে যারা আসে সবাই গাড়ী নিয়ে। আর ৮টা garage আছে। স্থানটী অতি স্বাস্থ্যকর, তবে রামলালই প্রথম কালা আদমী—but you are welcome.

দোতালায় ছোট্ট ঘর, পূব খোলা, বড় জানলার ধারে খাট পাতা, ঘর ভর্ত্তি এখানে ওখানে Aster Pansy, Ficus ইত্যাদি গাছে ভর্ত্তি, জানলার Ivy—প্রায় গাছেই ফুল ফুটেছে। পূবদিকে দেখা যায় শুধু মাঠ ও পাহাড়—আর সর্ব্বত্রই Tanne গাছের মাথা উঁচু করে রয়েছে সোজা আকাশের দিকে। Land lady (সহজ কথায় আমরা বলি বুড়ি, তা তার যতই বয়স হোক্ না কেন) গরম জল ও গামলা নিয়ে ঘরে এল—যেন একটা বিয়ারের পিপে গড়াতে গড়াতে যাচ্ছে, হাঁটছে কিনা বোঝা যায় না। রামলাল মুখ, হাত ধুয়ে এক ঘুম দিল, জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়া আসছে। হঠাৎ দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গেই দেখে স্যুপের প্লেট হাতে বুঝি শূর্পণখা, মিঠে হাওয়ায় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল—রামলাল ভাবছিল বুঝি উর্ব্বশী, কারণ আগেই শুনেছিল Schone schwarzwald madchen—অর্থাৎ Black forest এর মেয়েরা সুন্দরী হয়। কিন্তু বাতি জ্বালতেই দেখা গেল দুটি কুতকুতে চোখ, মুখটি এত গোল যে সত্যিই চন্দ্রবদন, নাক ও ঠোঁট দেখেই বুঝতে পারে—বাপ-মুখো মেয়ে। স্যুপের প্লেটটি চোখ বুজেই খেল, তারপর মাংসের টুকরো যেমন শক্ত তেমনি ভোটকা গন্ধ। এর পর এল কর্ত্তা হাতে কয়েক বোতল বিয়ার। গল্প চলছে বিয়ারও চলছে ঘন ঘন, ও কর্ত্তার হাঁক Mutti (মুটী) বিয়ার আন। রামলাল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় আর ভাবে এই বুঝি পিপেমার্কা বুড়ীকে বলছে 'মুটকী' আর তাও বলছে ভুশুণ্ডিমাঠের মোটকা বুড়ো—লাগবে নাকি হাতাহাতি এই সন্ধ্যা বেলায়! ভাগ্যিস মনে পড়ল ওদেশে বয়স হলে স্বামী স্ত্রীকে ডাকে Mutti অর্থাৎ মা, আর স্বামীকে ডাকে বাবা বলে। যাক্ জার্ম্মাণ দেশে ত বাংলা মুটকীর মানে বোঝে না।

ভোরে উঠে নেকার নদীর ধারে ধারে বনের ভিতর রামলাল চলে যায় ও দুপুরে পড়ে Heine র Lieder, ঘরে থাকতে ওর প্রায়ই মনে হয় কে যেন ওর দরজায়

উঁকি মারছে, মাঝে মাঝে দরজাটা ফাঁকও হয়। রামলাল দেখে ভয়ে ভয়ে, কারণ যদি শূর্পণখার অভিসার হয়, তবে ও ঠিক করেছে এক দৌড়ে ষ্টেশনে গিয়ে যে কোন গাড়ীই পাক উঠে বসবে—থাক পড়ে বাক্স ও বই। কিন্তু ফিক্ ফিক্ হাসি ও ফিস্ ফিস্ কথা শুনে ত মনে হয় না যে ওটা ফ্যাসফ্যাসে গলাওয়ালা বুড়ির ধুমসী মেয়ে। তবে এ কে? দু তিন দিন পর রামলাল বাড়ী ফিরে ঘরের দরজা খুলতেই কে যেন দৌড়ে পালাল রামলালকে একরকম ঠেলে দিয়েই। এ কিরে, এই দক্ষিণের Black forest এ এখনও কি পরি থাকে? রবিঠাকুরের গল্প মনে পড়ে—পরি যখন চলে যায় তখনই ও জানিয়ে যায়—যতদূর দেখেছে দুটি টানা টানা চোখ, সোনালী চুল উড়ে যায়, আর গালদুটি যেন গোলাপ ফুলের পাপড়ী। ওর আরো মনে পড়ল Grimm এর গল্প Snow white, ধরতে গেলে হাত ফস্কে দেয় ছুট—রামলাল ও তখন ছুটে গেল ওর পূব জানলায়, তাকিয়ে আকাশের দিকে ভাবছে যদি পরিই হয় তবে ওখান দিয়েই হয়ত ডানা মেলে উড়ে যাবে।

পরদিন রামলাল পড়ছে।

Himmel sah ich in ihren Augen

অর্থাৎ স্বর্গ দেখেছি তোমার নয়নে। তখনই টুক্ টুক্ করে ঘরে ঢুকল Snow white, হয়ত ডাইনীর হাতছাড়া পেয়েছে রামলাল--এ সুযোগ ছাড়বে না, দুহাতে জাপটে ধরল, খিল খিল করে হেসে বলল

—একটা পিচ খাবে? পকেট থেকে একটা পাকা টুকটুকে পিচফল বের করে ধরল রামলালের সামনে।

—আমিত দেখছি এক জোড়া!

—বোকা হাঁদা এই ত আমার হাতে, আমার মুখের দিকে দেখছ কি?

—কিন্তু আমার হাতে ত Snow white grimms marchen পড়েছ?

ঠাস্ করে একটা চড় এসে পড়ল রামলালের গালে। এরপর রামলাল সর্বদাই তাকিয়ে থাকে কখন Snow white আসবে ওর ঘরে, আর দুজনে বেড়াবে মাঠে ও ছুটবে পাহাড়ের উপরে। ওরা ফিরবার সময় জড়িয়ে ধরে দুজনে, আর Snow white পথের ধারের হয়ত প্রত্যেক বাড়ীতেই ঘণ্টা বাজাবে ও যেই বের হবে বলবে—

—এই দেখ আমার বন্ধু, ওর নাম নাকি লাল অর্থাৎ যাকে আমরা বলি Rose, কিন্তু আমি বলি Schwartzer (অর্থাৎ কেলে মাণিক)

আর এক বাড়ীর সামনে ঘণ্টা মেরে বলবে—

—এর নাম 'রাম' আর এই কেলে হাঁদা বলেকি—রাম নাকি ওদেশের দেবতা। আচ্ছা তুমিই বলত ঠাকুর্দা—এই কেলে লোকটা থাকে রাক্ষসে দেশে, জঙ্গল ভর্ত্তি, ওখানে বাঘ ও সাপ ঘুরে বেড়ায়,—ইঃ ভাবতেই কেমন লাগে। ওই ভুতুড়ে দেশে নাকি দেবতা থাকে। দূর ছাই!

অন্য দরজায় এসে বলবে—এরই সঙ্গে আমি চলে যাব ওর দেশে, ওখানে সারা বছর রোদ ওঠে—ও রাতে চাঁদের আলোয় ওর বাড়ী ঘর বাগান ভরে যায়, বাগান ভর্ত্তি ফুল কতরকমেরও ফল। কি মজা!

দিন চলে যায়, রামলালের ছুটিও ফুরাল। রামলাল সেদিন Snow white কে জড়িয়ে ধরে বসল—

—আমি এখন চলে যাব, আর ফিরব না, আর আমাদের দেখাও হবে না।

ওকি কিছু শুনছে। কালো দুটো চোখে ভর্ত্তি জল, টপ টপ করে দুই গাল বয়ে যায়।

রামলাল চুমোয় যত মুছে দেয়, ততই বাড়ে ওর কান্না।

—ইলোনা তুমি কি আমার বৌ হবে।

—তাহলে আরো আট বছর অপেক্ষা করতে হবে। পরীকে কি ওদের রাণী নির্বাসনে পাঠিয়েছে? ট্রেণ ছেড়ে দিল, ইলোনার হাতের রুমাল উড়তে উড়তে আর দেখা গেল না, গাড়ী পাহাড়ের দিকে বেঁকে গেল।

হাঁ বলতে ভুল হয়েছে, ইলোনার বয়স তখন আট।

স্বদেশসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল

জ্যোতির্ময়ী দেবী

১৯০৫এর প্রথম বঙ্গ বিভাগ। সেই ক্রূর কুটীল বিভাগে যে বিদ্বেষের বীজ বপন করা হয়েছিল তা এই ছ'দশকে মহীরুহ হয়েছে। বট গাছের মত সে অমর। তার ডালপালা যখন তখন বেরিয়ে আসছে, সেই শিকড়টি থেকে যার—অন্ত কোথায় কেউ বলতে পারবেন না।

কিন্তু এই ভাগ বিভাগের কথা আমাদের বলার বিষয় নয়। আমি বলছি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশসঙ্গীতের কথা।

সেই বঙ্গচ্ছেদের হুকুম যখন ফিরল না সে যুগের বাঙালীর মনের বেদনা বিক্ষোভ যেভাবে দিকে দিকে কর্মে ধর্মে সাহিত্যে সঙ্গীতে নানাভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময়ের সকল মানুষের মনে যে দাগ কেটে বসেছিল—সে-দিনের কথা সকলেরই মনে আছে যাঁরা বেঁচে আছেন।

খ্যাত বিখ্যাত অজানা জানা কবি লেখক সকলেরই মনে এক বেদনা সুরে সুরে গানে গানে বেজে উঠেছিল।

এক নিমেষে উদ্বোধন মন্ত্র হয়ে উঠ্‌ল বন্দেমাতরম্‌। তার সঙ্গে সেই সব সংখ্যাহীন সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গান। রাখীবন্ধন দিনের গান "বাংলার মাটী বাংলার জল।"

কিন্তু বন্দেমাতরম্‌ যেমন মন্ত্র, আর সমস্ত গান তেমনি একক গাইবার গান।

হেন কালে ঠিক কোন্‌ সাল মনে পড়ে না, একটি অমর সঙ্গীতের আবির্ভাব হ'ল। "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।" যার শেষ লাইন হল "দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ।"

এই গানটিতেই বোধহয় প্রথম 'কোরাস' কথাটার ব্যবহার হয়। বোধহয় সঙ্গীতকারের অভিপ্রায় ছিল একজন গায়ক গাইবেন—আর অন্য সকলে ধুয়ায় কোরাস অংশে ধুঁয়া ধরবেন। সে যাহা হোক এই গানটি যেন জাতির সমবেত মনকে আকুল উদ্বেল করে তুলল। তা সে গায়ক কেউ একলাই গান, কিম্বা সভা সমিতিতে সকলে মিলেই গান করুন।

'দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার দেশ।' যে দেশে যেখানে বাঙালী ছিলেন সকলের ঘরেই হিতবাদীর প্রকাণ্ড পাতা থেকে গান ছড়িয়ে পড়ল। কেউ সুর জানুন বা না জানুন, বাঙালীর ঘরে ঘরে সবাই গায়। কে কোন্‌খান থেকে সুর শিখে নিয়েছে কে জানে।

আমরা সুদূর প্রবাসে। গান কিন্তু গঙ্গা যমুনার মত ভেসে এলো কণ্ঠে কণ্ঠে সুরের স্রোতে স্রোতে। লোকে কান ভরে মন ভরে শোনেন।

বেদনায় আকুল বাঙালী পেলেন,
উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার।
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর।
—অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ।
তাঁর কি না এই…

কোন্‌ বাঙালী কোন্‌ ভারতবাসী বুদ্ধের নাম জানে না? কোন্‌ বালক শিশু জানে না? কান মন আকুল হয়ে মেতে উঠল সুরে গানে। চোখের সামনে সঙ্গীতে ইতিহাস ফুটে উঠ্‌ল। বাঙালী তাঁর যেন আড়াই হাজার বছর আগের অতীতের অমর ঐতিহ্য নিমেষের মধ্যে দেখতে পেলেন। তারপরে—

একদা যাহার বিজয় সেনানী—হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাঁহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়
সন্তান যাঁর তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ—
তাঁর কিনা এই—

মনে জাগল বাংলার অতীশ দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, শান্ত রক্ষিত—জানা অজানা কত জন ধর্ম কর্মবীর মনস্বী মনীষীর ইতিহাস। এমন করে আর কোন্‌ গানে কে গেয়েছেন! এবারে—

'উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাস গাহিল গান
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য ···'

আত্মবিস্মৃত বাঙালী, প্রবাসী স্বদেশবাসী বাঙালী—এমন গান আগে শোনেনি। এমন সুরে মাতানো আপনার জাতির গৌরবের দিনের ইতিহাস সঙ্গীত তার কানে আগে কখনো বাজেনি। আমরা শুনলাম। বেসুরে বেতালে কোরাস গাইল লোকে। তখন পর্দা মেয়েরা ঘরের প্রাঙ্গণে, ছেলেরা বাইরের পথে—

'উদিল যেখানে বুদ্ধআত্মা'—
'অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল'
'একদা যাঁহার বিজয় সেনানী'
'নিমাই কণ্ঠে মধুর তান'
'যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য'

এক মুহূর্ত্তে একটী গানে সে যেন সমস্ত বাঙলা ভারতবর্ষ বাঙালীর ও স্বদেশবাসীর অক্ষয় অমর কীর্ত্তি দেখতে পেল। কোথায় সে আপনার কীর্ত্তিময় কথা—গান্ধার হতে জলধি শেষ—তা তারা জেনেও জানে না। তবু সেই হৃতগৌরবের ব্যাকুল বেদনা অভিব্যক্তিময় সঙ্গীত তাদের মনকে সেই অজানা কীর্ত্তিকর্মময় জগতের আভাসলোকে নিয়ে গেল। সে সময়ের মানুষ আমরা—তাদের সেই সঙ্গীতমুগ্ধতা দেখেছিলাম।

পরে পরে তাঁর রচিত আরো গান অমর স্বদেশ সঙ্গীত দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কবি সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনাও করলেন। আর নাটকেও দেশপ্রেমের সঙ্গীত। যদিও নাটকের বিষয়বস্তু অতীতের বিভিন্ন স্বদেশীয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। কিন্তু তার মূল সুরটি পরাধীনতার লাঞ্ছনার বেদনারই।

কলকাতার অভিনীত নাটক আমরা একটিও দেখবার সুযোগ পাইনি বিদেশে বাসের জন্য। দুর্গাদাস, মেবার-পতন, সাজাহান, নূরজাহান, কোনোটিই না। কিন্তু গান সুরের স্রোতে মানুষের মনের কূল ভিজিয়ে ভাসিয়ে ভেসে এসেছিল সমস্ত সুদূর প্রবাসের প্রবাসী বাঙালীর কানে আর মনে। তাঁদের বারোয়ারী দুর্গোৎসবের অভিনয়ের আঙিনায়ও যে গান শোনা গেল 'গিয়াছেন সমর আহবে'

"সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির
উঠ বীর জায়া বাঁধ কুন্তল মুছগো অশ্রু নীর।"
"মেবার পাহাড় উড়িছে যাহার রক্ত পতাকা
উচ্চশির।"

শ্লেষের গানও ছিল :—

'পাঁচশো বছর এমনি করে সয়ে আসছি সমুদায়।'
সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাপ বলায়।

কিন্তু শ্লেষের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত সকলের জন্য নয়। দেশ তখন তার মাতৃমূর্ত্তির ধ্যানমূর্ত্তি চাইছে। স্তবে ধ্যানের আকার চাইছে। কোন্ ভাষায় দেশমাতৃকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে অন্বেষণ করছে।

এবারে 'বঙ্গ আমার' গানের কবি গাইলেন,—

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।
... ...
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ।
বন্দিল সবে জয় মা জননী জগজ্জননী ভারতবর্ষ।
... ... জগত্তারিণী ভারতবর্ষ।

গাইলেন—"ধন ধান্য পুষ্পেভরা—

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাক তুমি'
"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—"

মরুবাসী বেদুয়িনই হোক, আর সুজলা সুফলা বঙ্গবাসীই হোক—সকল মানুষের জন্মভূমিই স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়েই ঘেরা থাকে!

কবির দেশমাতৃকার মূর্ত্তিধ্যান, কবির গান, কবির সুর তাঁর ভাষা তাঁর স্বদেশ প্রেম ভালবাসা প্রথম স্বদেশ মন্ত্র সঙ্গীত "বন্দেমাতরমের" মতই তাঁর গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে।

তাঁর বলিষ্ঠ ভাষা—গভীর ভাব, আশ্চর্য্য উদাত্ত সুরে রচিত মাতৃভূমির স্তব এক নিমেষেই সকলের মন হরণ করেছিল।

প্রবাসকালে সার জগদীশচন্দ্র ও লোকেন্দ্র পালিত মহাশয় তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে স্বদেশ সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

আজ যদি কবির শতবার্ষিকীতে বলি সে সময়ে তাঁর স্বদেশ সঙ্গীতের সমাদর হলেও সর্বত্র যথাযোগ্য সমাদরের অভাব রয়েছে তাহলে অসত্য বলা হবে না।

বিরহের-স্বরূপ

শ্রীমতী শ্রুতি দেবী

কথাটা বড় আপাত-বিরোধী শোনালো! স্বকীয়তা যার আদৌ নেই—তার আবার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে কেন? তবু ওঠে. সাহিত্যের ধর্মই হ'ল—অরূপে রূপারোপ করা, অনির্দেশ্যকে ইঙ্গিতে নির্দেশ্যলোকে ব্যঞ্জনান্বিত করা।

বিরহের স্বভাবটা নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—যে সেটা বিচিত্র। পাত্র ভেদে তো বিভিন্ন বটেই, উপরন্তু তার বুকেই প্রতিফলিত হয় ব্যক্তি-বিশ্বের ছায়া। তাই তাকে তরল বলা চলে। এছাড়া জলের সঙ্গেও তার তুলনা করা চলে—কারণ বিরহও ওই রকম বর্ণহীন। সূর্যের আলো যেমন জলের কবলে পড়ে সপ্ত বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়—বিরহের বর্ণালিতে তেমনি জীবনের আলোর বাহার।

কার জীবনে? প্রাণীর,—বস্তু নয়। কপোতকে দেখেছি কপোতীর বিরহে কাতরাতে। আবার মানুষ তো পেয়ে প্রতিনিয়তই হারাচ্ছে—হারিয়ে হারিয়েই মানুষের পরম প্রাপ্তি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পরম-প্রাপ্তির উপকূলে জীবন নেই। আশার নদী যখন নিরাশার সমুদ্রে তার অন্তিম আশ্রয় পায়—সেই মোহনাতেই তো জীবন জাগে। তাই বালুচরের রুক্ষ হাহাকারেই জীবনের কোমল জাগৃতি। জাগর জীবনই তাই বিরহের রূপ। বিপরীত পক্ষে বিরহের রূপই জীবন। সেইতো দুই পক্ষের চরম মুল্য। জীবন তো বিরহেরই কাব্য। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ব্যক্তিজীবনই বিশিষ্টরূপে বিয়োগান্ত।

'পরমের' তৃপ্তি হয়তো 'চরমে' নেই। কিন্তু অতৃপ্তির ক্রন্দন প্রাণী যেদিন বিস্মৃত হবে—তখন তার আর থাকবে কি? সমস্ত অস্তিত্ব সেদিন সুষুপ্তির নির্বেদের গহন গভীরে হারিয়ে শেষ হয়ে যাবে। ভঙ্গুর প্রাণের শাশ্বত-মহিমা সেদিন ক্ষুন্ন হবে। কারণ মেঘের ছবি গগনের অঙ্গনে প্রতিনিয়তই মুছে যাচ্ছে—কিন্তু মেঘতো আছেই—তাই চিত্রেরও বিরাম নেই। তেমনি প্রাণ যদি চির বিশ্রাম একান্তই কোনদিন পায়, তবে এই বিচিত্র জীবনচিত্র সেদিন মসীলিপ্ত হবে। জগতের না হলেও সেটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর "সেই শেষ" দিন।

অনাদিকাল থেকে আদিম চিত্ত "ক্রন্দসী"। তাই ক্রন্দিত। এ ক্রন্দন কিসের? বিরহের। চিত্ত চায় চিত্তকে—হাত পায় মাত্র দেহ—মন তাতে মানবে কেন? তাই বুকে বুক, মুখে মুখ রেখেও কান্না তার থামে কৈ? থামতে যে পারে না—নিরাকার আরেক আকার-হীনকে স্পর্শ করবে কি করে? বিষয়টি অসম্ভব! তাই একমাত্র সম্ভাব্য বস্তু হলো—অশ্রু।

এই অবাস্তব বিশ্বের একমাত্র বাস্তব স্বপ্নিলতার ছায়া অশ্রুতে। অশ্রুর ধারায় জীবনের তথা বিরহের স্রোত বিধৃত। তাই জীবনের আকাশে অশ্রুর বাদল নামে মেঘলায়। অশ্রু বিরহের রসনির্যাস। বিরহের স্বাদটি কেমন? না, বেদনায়। জীবনের পেয়ালা বেদনায় সত্যিই ভরপুর। ভাবের ঘরে তাই শৈবাল জমে গেল—তবু শেষ হ'লো না। রোজই সে নিত্য ঘনায়মান।

বেদনার যন্ত্রণা তাই অসহ্য। নিত্যই তাই তার এক বুলি—"গাগল হলেই বাঁচি।" পাগলামীর অভিসারে মন প্রায়ই উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই চিত্তের তল খুঁজে পায়—চেয়ে দেখে—পাগল যে সে বেচে নেই—টিকে আছে মাত্র জীবনকে অস্বীকার কোরে।

বিরহের আলোকে একবার জীবনটাকে দেখে নেওয়া যাক্। জীবনের আকাশে বিরহের রাগিণী স্বরান্বিত হচ্ছে অবিরত—ক্রন্দনের মূর্ছনায় সে সজল—সচলও বটে। মীড়ে তার কালের ঘণ্টাধ্বনি। কালের প্রহরীই তো এই জীবনকে প্রতি মুহূর্তে করছেন খণ্ডিত—আবার সেই খণ্ডের মধ্য থেকে অখণ্ডকে মহাকালই করছেন উদ্বোধিত।

এই মহাকালের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নিবিড়—বিরহের

তো নিবিড়তর। বিরহের অবস্থান তাই মহাশ্মশানে, মহাকালের তীর্থে! কালের প্রবাহে তাই বিরহের তারল্য লীন —তাই অচ্ছেদ্য।

এই বিরহের সুবাস ছড়িয়ে আছে—পৃথিবীর প্রতিটি ফুলে। শ্মশানযাত্রীর একমাত্র পাথেয়।

বিরহ সত্যিই সুন্দর। এই সুন্দরের উপাসক হলেন সাহিত্যিক তথা শিল্পী। তাই শিল্পী চিরবিরহী। শিল্প তার অভিব্যক্তির প্রয়াস মাত্র। সাধারণে এই বিরহের খোঁজ জানে না বলেই তাদের জীবনে সুখ আছে, আনন্দ নেই—অল্পদিনেই সুখের বোঝা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে —ও দুঃখ দেয়। বেদনাই আনন্দ। বিরহানন্দ হলো প্রাণরস এবং রসাস্বাদনই জীবনের ধারানুভূতি।

কবি

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

কবি আমি কবিতালিখি—এই শুধু জানি মোর কাজ :
প্রত্যেকের হৃদিতন্ত্রে অজানার সুর বেঁধে দিয়ে
পুলক ঝঙ্কারে তুলি : বিষাদের বিষবাষ্প নিয়ে
সকলেরে এনে দিই আনন্দের অপূর্ব্ব আস্বাদ।
প্রত্যেকের অন্তরেতে ফল্গুধারা সম,
যখন যে ধারা বহে, তারে ধরি মোর কবিতায়,
সবাকার সামনে আনি, নিত্য আমি এই দুনিয়ায়
হোক বা না হোক তাহা বিশ্বে কারও প্রাণ প্রিয়তম।
সুন্দর সৃজন করা এ জীবনে কোনদিন মোর কাম্য নয়?
সৃষ্টিকে সুন্দর করা বিশ্ব বুকে কর্ম্ম শুধু মোর :
এতে যদি ঝরে পড়ে ঝরো ঝরো মম অশ্রুলোর
তবু ঘুচিবে না জানি কাব্যলক্ষ্মী সাথে মোর আছে
যে প্রণয়?

কল্পনার কল্পলোকে, প্রকৃতির উন্মুক্ত ভাণ্ডারে—
যে রত্ন লুকিয়ে আছে তারই শুধু করি যে সন্ধান;
মধুতে হুলের ব্যথা, অমৃতে সে গরলের দান।
বরে নিই বিশ্বে আমি হাস্য মুখে সদা
নির্ব্বিচারে।
নূতন যাত্রার পথে অভিনব প্রস্তুতি আমার :
কাঁটাকুঞ্জে পরিপূর্ণ জীবনের ক্ষুদ্র পরিবেশ।
সত্য ও সুন্দর যাহা তারই শুধু করি যে উদ্দেশ
এতে অভিমন্যু আত্মা কাঁদে তো কাঁদুক বারবার
সংসার সমরাঙ্গণে দারিদ্র্যের চক্রব্যূহে নিতি।
কিবা ক্ষতি এতে বলো? অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে যদি,
প্রাণ মোর তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে যায় নিরবধি
থাকিবে অম্লান তবু ক্ষুদ্র মোর জীবনের স্মৃতি।
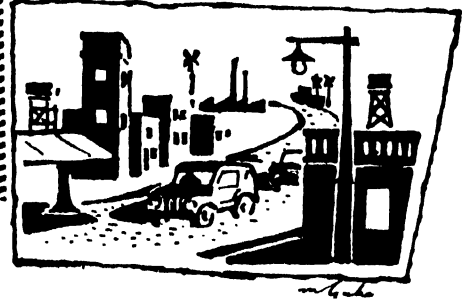
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

...জেগে আছে মিষ্টি লোহারণী।

বুক জ্বলছে তার। অনেক কষ্টে বাঁধা সংসার—অনেক আশা ; সব তার ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে।

রাত কত জানেনা, একলাই বসে আছে দাওয়ায়। দেখেছে ধীরে ধীরে কারিগর লোকটা কেমন বদলে গেছে। আগেকার সেই মানুষটা মাথা ঠেলে উঠেছে—বন্য উদ্দাম দুর্বার সেই মানুষটা।

সেদিন যৌবনের বেগে তাকে পরাস্ত করেছিল—আজ বয়স হয়েছে। বাইরের মন চায় ঘরের নিভৃত শান্তি। কিন্তু সে আশা তার ব্যর্থ হতে চলেছে।

অপমানিত ব্যর্থ মিষ্টি আজ কারিগরের উপর সব আশা হারিয়েছে—মন ভরে উঠেছে পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর ব্যর্থতায়।

ধীরে ধীরে বের হয়ে এল পথে। অন্ধকার নির্জন পথ। কোথাও কোন শব্দ নেই। শিশির ভেজা পথ ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে মিষ্টি।

ভালো লাগে এমনি নির্জন পথ চলতে। একাই সে জেগে রয়েছে—আর সবাই নিবিড় শান্তিতে মগ্ন।

...বাঁশীর সুর জেগে ওঠে—সেই দয়িতবিরহের সুর।

...হঠাৎ অবিনাশ ওকে দেখে বাঁশী নামায়।

..কাঁদছে মিষ্টি। ডাগর দুচোখ ওর জলে ভরে উঠেছে।

—মিতেন!

...কথা কইলনা মিষ্টি।...কেমন বিরস চাহনিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। মনের অনেক খবরই সে অজানতে জেনেছে—তাই বোধ হয় ওর বুকের জ্বালা বাঁশীর সুরে ফুটে ওঠে। মন ছোঁয়।

—এতরাতে!

—রাত দিন আর ফারাক কই। অন্ধের আবার রাতদিন।

মিষ্টি কথাগুলো বলে কি এক দুঃসহ জ্বালায়।

--কি মনে করে? অবিনাশ একটু অবাক হয়েছে।

—মন কি বুঝি মিতেন, জ্বলে তাই বেরিয়ে পড়লাম।

—মনের বড় জ্বালা।

হাসে মিষ্টি—মন থাকাটাই জ্বালা মিতেন। বড় জ্বালা—অবুঝ হয় আর হু হু কাঁদে।

কথা কইলনা অবিনাশ। বসে আছে মিষ্টি। আবছা আঁধারে কেমন বিবশ তার চাহনি—বলিষ্ঠ দেহের একটি নীরব মাদকতা ওর দুচোখের চাহনিতে। রাত্রি গভীর।

...হঠাৎ চমকে ওঠে মিষ্টি।...অবিনাশের হাতখানা ওর হাতে-কেমন সারাদেহে একটা চাঞ্চল্য। কাছে টানছে তাকে—আর ও কাছে।

—মিতেন! কাঁপছে অবিনাশের কণ্ঠস্বর।

শিউরে ওঠে মিষ্টি। উঠে দাঁড়াল।

—উঠলে যে!

—না, না। মিতেন। এ আমি চাইনি এতো আমি চাইনি।

—কিহল? ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অবিনাশ।

—কিছু না।

—চলে যাচ্ছো!···

কোন জবাবই দিলনা মিষ্টি ওর কথার। সরে গেল—মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে কোন রহস্যময়ী অধরা নারীর মতই।

···বাঁশী আর বাজান হলনা। অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে অবিনাশ। সত্যি! মুহূর্তের ভুলে একটা অন্যায় কোথায় করে ফেলেছে সে।

···লজ্জা আসে নিজের মনে। হু হু বইছে বন-ফেরা রাত্তি-জাগা বাতাস—কোথায় ডাকছে দুএকটা ভুলো পাখী, আবার সব চুপ চাপ।

সব আঁধারে ডুবে গেছে।

···মিষ্টি বাড়ী ফিরছে।

কেমন যেন হয়ে গেছে সারা মন। নিজের জীবনে যাদের দেখেছে—তারাতো এমন নয়। এসেছে তারা রাতের অন্ধকারে উন্মাদ হয়ে—মদ্যপ লম্পটের দল। জৈবিক ক্ষুধার বীভৎস রূপই দেখেছে। পঙ্কিল সে নরক থেকে বাঁচবার চেষ্টায় সরে এসেছে ঘৃণায়।

···মানুষকে চোখে দেখেনি যে—তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বাঁচতে চায় নিজে—বাঁচাতে চাইবে তাকে। তাদের মাঝ থেকে কারিগরকে তুলে এনেছিল।

অবিনাশ সে জাতের নয়। আজ রাত্রি অন্ধকারে কোন নীরব স্বীকৃতির চকিত সন্ধানে খুসীতে মন ভরে উঠেছে। সে সম্পদ হেলায় হারাতে চায়না সে।

···বাড়ীতে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। দাওয়ায় সাটপাট হয়ে শুয়ে আছে লোকটা—পরণে তেলকালি মাখা প্যাণ্ট, একটা নীল কাপড়ের হাফ সার্ট, তেলের দাগে সেটাও রঞ্জিত, আর সারা গা থেকে উঠছে মদের গন্ধ।

পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলল কারিগর।

—কোথা গিয়েছিলি রাতদুপুরে—কোন নাগরের কাছে।

কথা কইলনা মিষ্টি।

—জবাব দিছিসনা যে? এ্যাই! জানতা নেহি—ছেনালিপণা ঘুচিয়ে দোব।

সেই শ্যামনগরের কলের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে পলাতক মানুষটা। আবার জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। এগিয়ে আসে মিষ্টি।

—দয়া ক'রে দেয় নুন, ভাত—মারে তিন গুণ। বড় তেল বেড়েছে তুর না?

—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব। খুনে মিনষে কোথাকার।

চমকে ওঠে কারিগর। জোঁকের মুখে চুণ পড়েছে।

বিড় বিড় করছে।···মিষ্টি আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে। অনেক সহ্য করেছে সে, আর নয়। আপোষ করে ওই শয়তানের সঙ্গে আর বাস করবেনা সে।

—যেখানে খাটবি সেইখানে থাকগে। ইথানে কেন?

—কি বললি?

—ঠিকই বলেছি। সবাইকে শোনাব তোর কথা।

···চুপ করে গেল কারিগর। মিষ্টি ভিতরে গিয়ে খিল বন্ধ করে দেয়।

···দাওয়াতেই পড়ে থাকে কারিগর।

সারাটা দিন কাযের পর আজ সন্ধ্যাবেলায় একটু আসর জমেছিল কলবাড়ীতে। ভুবনও এসে পাকাপাকি আস্তানা বেঁধেছে ওখানে। বৌটাকেও দেখেছে—কেমন নধর পুরুষ্টু মেয়েটা।

···গোকুল এনেছিল ভাল দিশী চোলাই মদ।

···হুল্লোড় জমেছে রাতদুপুর অবধি।

···বাড়ী এসে এই ঝামেলা। কেমন সব কথাগুলো শুনে নেশা ছুটে যায় তার। আজ মিষ্টি রাগে ফেটে পড়েছে।···সব খবরই জানে সে।

··জানে তার আগেকার পরিচয়, তাই ওকে নিয়েই

এসেছিল এই অন্ধকার পল্লীর মাঝে—তাকে ভুলিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল।

…কিন্তু সব কোনদিকে ছারখার হয়ে গেল।

কলের নেশা আছে—নেশা আছে সেই মত্ত লৌহ-দানবের। একবার যে তার পাকে পড়েছে তার আর রেহাই নেই। .

সব রস নিংড়ে বের করে নেবে—দেহমনের সব রস।

…তাই সেই জীবনকে ভুলতে পারেনি শ্যামনগর মোল্ডিং মিলের পুরোনো কারিগর। পারার বিষের মত সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে।

.. রাত হয়ে আসে।

…দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে মধ্য-আকাশের নীলাভ তারাটা।

উঠে বসেছে কারিগর। মাথার মধ্যে এমনি একটা যন্ত্রণা!

…সেই বীভৎস ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে! মেজে ভরে উঠেছে রক্তে! ছটফট করছে বৌটা দুঃসহ যন্ত্রণায়।

…হাতের সেই কাঠখানা ফেলে দিয়ে নিমেষের মধ্যে বের হয়ে পড়ে কারিগর—অতীতের সেই ছবিটা আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে!…আতঙ্ক আর ভয়ে কেমন শিউরে ওঠে।

…জানে!…ওরা জানে—মিষ্টি জানে তার অতীতের সেই কলঙ্কময় ইতিহাস—ফেরারী খুনের আসামী সে।

…সব তার হারিয়ে গেল—মাঝখানের এই ক'বছরের দিনগুলো, শান্তি আর নিশ্চিন্ততার দিন।…

পালাবে!…

পালাবে এখান থেকে। আবার হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে -যেখান কেউ আর খুঁজে পাবে না তাকে।

…পূব আকাশে দুর্গাপুরে ব্লাষ্টফার্ণেসের আলোটা দীপ্তশিখায় জ্বলছে।…

পা পা করে উঠে এল কারিগর দরজার কাছে!… পিছনে ফিরেও চাইল না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জন-হীন পথে নামল রাতের অন্ধকারে। চলেছে সে—জোরে পা চালিয়ে আঁধারে হারিয়ে গেল নিঃশেষে।

বাজপড়া তালগাছের মত মুষড়ে পড়েছে অতুলকামার। ভুবন চলে গেছে—ভুবনের জন্য নয়, বুকের একখানা পাঁজরা গেছে ওই কদমবৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে। এ বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী যেন মুছে গেছে।

…চুপ করে বসে থাকে অশোক। ওরা সকলেই।

ষষ্ঠীচরণ বলে ওঠে—পানুদাস তো কারখানা জোর চালিয়েছে—ট্রাকে করে মাল চালান দিচ্ছে। ভুবনই উঠে পড়ে লেগেছে।

—চুপ দে! ওর কথা বলিস না ষষ্ঠে। চমকে ওঠে অতুল। বুড়ো বলে ওঠে—তোরা পারিস চালা। তবেই ইয়ার জবাব হবে।

বুড়ো কি ভাবছে। কথাটা কালীই পাড়ে।

—ছোটবাবু তুমি গ্রামপ্রধান হও।

অশোক জবাব দেয়—না। ওসব রাজনীতিতে আমাকে টেনো না কালী। যা করছি তাই নিয়েই থাকি। তোমরাই ব্যবস্থা করো।

অতুলও সায় দেয়—ঠিক বলেছেন ছোটবাবু। ওসব দলবলে যাবেন নাই। বড় ভাল জিনিষ লয়। পানু হেরেছে এই ঢের—তুরা যা পারিস কর।

শালের আগুনে গনগন করছে ঘরখানা। কেমন ভাবসা গরম। ভাবনায় পড়েছে ওরা। কাজের লোক নাই—যা মাল তৈরী হচ্ছে তা ও সামান্য।

—দরও কম করেছে পানু!

—করুক। ত্যানাপরে থাকিস—একবেলা খেয়ে। দিনকতক টিঁকে থাকতে পারবি নাই?

অতুলকামার ছেলেছোকরাদের দিকে চেয়ে থাকে। ছানি পড়ে আসছে। ঘোলাটে চোখের সামনে কেমন অন্ধকার নামে। ওদের চোখেমুখে দেখেছে অতৃপ্তির ছায়া—দুঃখকষ্টভোগ করে নিজের মঙ্গলের জন্যও টিকবার ক্ষমতা—জোর ওদের যেন নেই।

গদাকামার কি ভাবছে। পাড়ার পদাই, বসন্ত, খেতন সবাই কারখানায় চাকরী নিয়েছে। আর বাকী তারা যেন জীবনে কিছুরই স্বাদ পেল না।

অশোকও মনে মনে কেমন হতাশ হয়।

পানুদাস সত্যিই এদের মূলে আঘাত হেনেছে, পানু দাস নয়—এই যুগ, পানু একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

…হঠাৎ জীবনকে আসতে দেখে দাঁড়ায় অশোক।

—কি ব্যাপার।

...জীবন পকেট থেকে ফর্মটা বের করে—দুর্গাপুরে চাকরীর ব্যাপারে গ্রামপ্রধানের একটা সই লাগবে।

—কালী!

অশোকের ডাকে এমোকালী শাল থেকে কয়লামাখা অবস্থাতেই উঠে আসে। বলে ওঠে অশোক।

—একটা সই করে দাও।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কালী, তার সই ওই ছাপান কাগজে চাই, দুর্গাপুর কারখানার কর্তারা তবেই চাকরী দেবে! রীতিমত অবাক হয়ে গেছে সে। একটু সামনে নিয়ে হাতের কালিঝুলি পরণের ট্যানায় মুছে সই করে কম্পিত হাতে।

জীবন কাগজখানা নিয়ে বের হয়ে গেল।

কি ভাবছে অশোক।

তারকবাবুর ছেলে! পচিশবছরের প্রেসিডেন্ট দুর্দান্ত সেই জমিদার। তারই ছেলে আজ কারখানায় যাচ্ছে সেমিস্কিলড লেবার হয়ে; তার সার্টিফিকেট সই করছে অখ্যাত অজ্ঞাত একটি মানুষ—পরগাছা কালীকান্ত কর্মকার।

...কি এক নীরব স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছে এ যুগ—সাধারণ মানুষকে। ওরা হয়তো আজও তার মূল্য বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারেনি সে দায়িত্বের কথা।

—ছোটবাবু!

অশোক কালীর দিকে চাইল।

কালী বলে ওঠে—ব্যাপারটা ঠিক বোঝলাম না ছুটবাবু!

—চাকা ঘুরছে কালী। তোমাদেরও বদলাতে হবে, ওই স্বীকৃতির যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

অতুল কর্মকার উঠে আসে। বুড়ো লাঠিখানায় ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

...বলে ওঠে—তাই বোঝান উদিকে ছুটবাবু। শালারা এখনও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলনা, মাথা নীচু করে পা চাটবার জন্যে দৌড়চ্ছে। একশালা আগেই গেছে সেই জাহান্নামে—সঙ্গে ঘরের লক্ষীকেও—

কেঁদে ফেলে বুড়ো। কান্নায় ওর গলার স্বর বুজে আসে।

প্রথম চেতনার যুগ। জড় অসাড় পদার্থে প্রথম সাড়া আসছে। তার কঠিনদেহের অনুপরমাণু কাঁপছে কি এক প্রচণ্ড আলোড়নে। সইতে পারলে তাতে সাড়া বের হবে, সচেতন হয়ে উঠবে সেই সুপ্ত হারানো প্রাণ।

...তাই সব যার তা সইবার ক্ষমতা নেই সেই প্রচণ্ড আলোড়নের ধাক্কায় সে চুরমার হয়ে যাবে। খান খান হয়ে খসে পড়বে, কিছু খসে পড়ার পরও বাকী যারা থাকবে তারা প্রাণময় হয়ে উঠবে—দেখবে বহু বাধার পর নোতুন দিনের আলো ভরা পৃথিবীকে দুচোখ মেলে।

তাই খসছে ভাঙ্গছে চারিদিক। নোতুনকে গড়ে তোলার সাধনায়।

ফাঁকা পথদিয়ে আসছে অশোক।

ছাহুদাসের দোকানের পাশে ওদের আড্ডা তখনও ভাঙ্গেনি।

দুপুরের রোদ চড় চড়ে হয়ে উঠেছে, আমগাছের বোল গেছে শুকিয়ে, গুটি ধরেছে। তালফুলের কাঁদিতে সবে গোল দানা পাকাচ্ছে।

...অবনী, ফনী মুখুয্যে, মণি দত্ত আরও অনেকেই বসেছিল। ক'দিন ধরেই জল্পনা কল্পনা করছে, কোন পথ পায় নি।

ডেকে ডেকেও মজুর মুনিষ মাহিন্দার মেলেনি। জমি বেবাক পড়ে আছে তাদের আরও অনেকেরই।

—কি হবে এবার ছোটবাবু!

—জমি যে ফাটলে যাবে। এইবার বয়সও নেই যে কারখানায় কায দেবে। আর গাঁয়ের মুনিষ জনও তো কারখানায়, বলে, দেড় টাকা রোজ—বাঁধা ডিউটি, কে যাবে কিলা রোদে জলে গরুর পিছনে লাঙ্গল ঠেলতে।

মণি দত্ত বলে ওঠে—শালোদের মেজাজ যেন তাতা তাওয়া, হাত দেবেন তো ছ্যাঁক। উদেরই দিন এয়েছে।

চুপ করে থাকে অশোক। দেখেছে সকাল বেলায় ঠিকাদারের ট্রাক আসে রাস্তার ধারে, বাউরীপাড়া—লোহার পাড়া থেকে অনেকেই যায়, প্যান্ট জামাও পরে, কেউ কেউ বা জুতোও কিনেছে। মুখে সিগ্রেট।

...দলে দলে বিভিন্ন গ্রাম থেকে গিয়ে ট্রাকে ওঠে—ফেরে সেই রাত্রে। ওদের অনেকেরই পা টলে। মুখে মদের গন্ধ—খিস্তী আর হিন্দী গান।

মদ আগেও খেত।

তবে ধেনো খাদ্য এবং পানীয় দুটোই হ'ত। এখন খায় বোরা ব্লাডার ভর্তি কারবাইডের তৈরী বিষাক্ত পানীয়।

…কি ভাবছে সে। দেখেছে—এক নিদারুণ বিপদের ছায়া সামগ্রিকভাবে ঘনিয়ে আসছে কৃষিনির্ভর এই জীবনে। একখানা গ্রামে নয়, আশপাশের সমস্ত গ্রামেই।

— কিছু একটাতো করতে হবে ছোটবাবু!

রুক্ষ ধু ধু মাঠে নীল ছায়া মেলা রোদ কাঁপছে। লিলি রোদ। লাল মাটির শেষে গেরুয়াডাঙ্গায় সেই অসীম শূণ্যতা। মাঝে মাঝে ওঠে রোদতাতা প্রান্তরে ছোট্ট ঘূর্ণি ঝড়।

দুরন্ত কাল বৈশাখীর ইসারা আনে।

ষোল চাষে পান।
আট চাষে ধান।
তার অর্দ্ধেক মুলো
বিনি চাষে তুলো॥

ধরণী শুচায় কথাটা বলে ওঠে—এবার তুলোর চাষই করবো ভাবছি। অবনী গম্ভীরভাবে জবাব দেয়—সেই সঙ্গে কিছু চিটে গুড়ও কিনে রেখ, গাময় মাখলে মানাবে ভালো।

—ওইটাই বাকী আছে কাকা। মণি দত্ত জবাব দেয়।

…নীলাম্বরবাবু চুপ করে থাকেন। এ ভাবনা তিনিও ভাবছেন। তার জমিজায়গারও হাল একরকম। নিতে বাউরী আছে—ঠিকে আরও কয়েকজন বাউরী পাড়ায় লোহার পাড়ায়।

কিন্তু তারাও কবে থাকে কবে যায় গোছের অবস্থায় রয়েছে। বাকী দুচার জন আছে পাকা ফলের মত—ঝুলছে শূন্য বোটার ডগায়। কবে খসে পড়ে জীবন বৃক্ষ হতে। তাদের দিয়ে কায হবেনা। সোমথ যোয়ানগুলো পালিয়েছে—তাদের ছেঁড়া কাঁথার মত পথের একপাশে ফেলে রেখে। বাতাসে রোদে জলে ক্ষয়ে একদিন আপনা হতেই মাটিতে মিশিয়ে যাবে।

নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন—একটা পথ তো ভাবা দরকার।

অশোক বলে ওঠে—ভেবেছি, কিন্তু রাজী হবার মত অবস্থায় না এলে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়; নোতুন কিছুকে মেনে নেবার আগে মনের প্রস্তুতিও দরকার।

—সেকি এখনও বাকী আছে অশোক?

অবনী মুখুয্যের কথায় হাসে অশোক।

—আছে মামাবাবু।

—কে জানে বাবা। এর পরও বরাতে আর কি আছে।

কথা বলেনা অশোক। ওদের দিকে চেয়ে থাকে। বলে ওঠে—জমিগুলোতে চাষ করতে গেলে যৌথ কিছু করা দরকার। কমিটি করুন, তাদের হাতে তুলে দেন ওই জমি। আপনিও তার অংশীদার হবেন। সব জমি এককরে চাষ করলে—কম লোকে হবে, দরকার হয় ট্রাক্টর পাওয়া যাবে।

ধরণী মুখুয্যে আঁৎকে ওঠে। জমির দখল ছেড়ে দিতে হবে। তারপর ধর আমার তো সব সোল—একেবারে যাকে বলে আকালপোষা জমি। জল ঝর্ণা ধরে, তার সঙ্গে ডাঙ্গা ডাংসি চটান কিনা এক হ'ল? হ্যাঁরে।

ছান্নুদাসও দাঁড়িয়েছিল। কথাটা শুনে বলে ওঠে—তাইতো দেখছি খুড়ো। মুড়ি মুড়কী একদর।

— কথাটা একটু ভাবতে হবে বাবা। অবনী এক কথায় যেন এ প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে পারলে বাঁচে।

চুপকরে থাকে অশোক। ওরা ক্রমশঃ উঠে চলে গেল ভিতরের দিকে।

হাসছে অশোক—দেখলেন তো। মরবে তবু সোজা হবেনা।

নীলাম্বরবাবু সায় দেন—তাই দেখছি। কথাটা খারাপ বলনি অশোক—ওরা রাজী না হোক আজ—একদিন হতেই হবে বোধ হয়।

…চলে আসছে হঠাৎ অশোক মণি দত্তের কথতে ফিরে চাইল।

—একটু কথা ছিল ছোটবাবু। ওই যে বল্লেন যৌথ ব্যাপারটা—

—বৈকালে এসো। কথা হবে।

—তাই যাবো। মণিদত্ত গম্ভীরভাবে ভাবছে কথাটা। জায়গাটা শূন্য হয়ে গেছে, কেউ নেই। পিছন

ফিরে দেখে অশোক চুপিসারে বের হয়ে আসছে অবনী-ধরণী আরও কয়েকজন। পিছনে আসছে ছান্নু। ওরা দোকানের বাইরের চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছে।

…দাঁড়াল।

ছান্নু বলে ওঠে—এ আবার এক চাল অবনী খুড়ো।

ধরণী বিজ্ঞের মত টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বলে—তাই দেখছি। এদ্দিন ছিল মুরুক্ষু ঠগ—এরা লেখাপড়া জানা ডাকাত। সব তো গেছে, বাকী আছে বিঘে কতক জমি, বুকের মাড়ি। তাও আবার ছেড়ে দিতে হবে! বেশ কথা বাবা।

অবনী বলে ওঠে—অল রাবিশ। ব্লাডি ফুলস।

ধরণী বলে—কথাটা তারককে জানাতে হয় একবার।

অবনী জবাব দেয়—নো গুড। হি ইজ অলরেডি ডেড। বোবা মেরে গেছে গোপাল মন দুঃখে বুঝলে।

ছান্নু তখনও হাসছে। কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিতে চায় সে। কারবারের যৌথ বোঝে; যে বাগে পাবে অপরকে ঠগাবে। কিন্তু চাষে যৌথ—এ সোনার পাথর বাটি। বিশ্বাসই করতে পারে না।

অবনী ধরণী আরও দুচারজন কি ভাবছে হঠাৎ একটা গাড়ী ধুলো উড়িয়ে আসতে দেখে ওরা চেয়ে থাকে।

…পাকা রাস্তা থেকে পথটা কোনরকমে এসেছে গ্রাম অবধি। রিলিফের রাস্তা। কোনরকমে কিছু লোককে কায দেবার জন্যই মাটি কেটে রাস্তার মত একটু জায়গায় ফেলে গেছে। কাঁকুরে মাটি। আপনা হতেই বসে গিয়ে একটু রাস্তার মত হয়েছিল এতদিন।

…গাড়ীখানা এগিয়ে আসছে—একটা প্রাইভেট গাড়ী।

…সতীশ ভট্‌চায আরও দুজন মাড়োয়ারী বসে রয়েছে। বিশাল দেহ বেশ ঘৃতপুষ্ট। গাড়ীখানা থেকে সতীশ ভটচায একবার হাত নেড়ে কি বলে যায় ওদের। সরু পথ ধরে গাড়ীখানা চলেছে এগিয়ে।

সতীশ ভটচাযের কথা মিথ্যা নয়। শিষ্যবর্গ—এবং জ্যোতিষের খদ্দেরও জুটেছে, বেশ শাঁসালো খদ্দের।

তারাই বাড়ী করে দিচ্ছে সেই সঙ্গে কিনেছে কিছু ধান জমিও।…তারকবাবুই বিক্রী করেছে। আরও কিছু কিনবে।

…ধুলো উড়ছে—পেট্রলের পোড়া গন্ধমেশা ধুলো—ফণীবাবু গজগজ করে।

—ব্লাডি।

তাদের নাকের উপর দিয়ে চালকলা বাঁধা বামুন আজ গাড়ী হাকিয়ে যায়। দিন এমনি বদলে গেছে।

নিতে বাউরী বাউরীপাড়ার বটতলায় বসে দড়ি পাকাচ্ছে।…সেই সঙ্গে ছেলেটা বাখারী চাঁচছে। আরও ক'জন বসে আছে।

শূন্যপ্রায় পাড়াটা। ঘরগুলো অধিকাংশই ফাঁকা। চালাগুলো বেওয়ারিশ অবস্থায় পড়ে আছে, ধ্বসে পড়ছে মাটি—জীর্ণ খড়।

কালো বাউরী—বিষ্টু পটু আরও ক'জন কি ভাবছে।

—ভাবছি আমরাও যাবো রে নিতে। রিলিফও নাই—চাষবাসও নাই কি না। নিতাই বাউরী মুখ তুলে চাইল ওর দিকে।

…কিই বা বলবে সে। তার অবস্থাও তেমনি। একা চাষ করা যাবে না; বাপবেটায় দুপাঁচ বিঘে জমি গ্রামের মধ্যে চাষ করেও ধান বাঁচাতে পারবে না; ধান ফাঁকার ফসল নয়, মাঠের ফসল—আশপাশের টানে ওর বাড়ন বাঁচন, ফলন ফসল।

পটু বলে ওঠে, কি রে, চুপ মেরে রইলি কি। তবু ভরসা হারাতে পারে না নিতে—সব্বাই শলা করছিল, ছোটবাবুও কি বলছিল। দেখনা দুএকটা দিন। তারপর যিথানে যাস যাবি, কে মানা করছে।

…হাসে বিষ্টু—বড্ড মায়া তুর ই মাটিতে লয় নিতে!

নিতে কথা বলে না, চেয়ে থাকে ওর দিকে।

সত্যিই বলে মনে হয় কথাটা। এ মাটির কি এক টান আছে। নামালে খাটতে গেছে দু একবার, দামোদর পেরিয়ে দল বেঁধে গেছে। পিছনে হারিয়ে গেল তাদের গাঁ—মোলবাগান। মনটা ফাঁকা হয়ে যেত। শরবন আর তালবনার পাতা কাঁপা বাতাসের সুর মনে কান্না আনে। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে বিরাট পৃথিবীতে।

আবার ফিরে আসবার সময় দূর আকাশ কোল থেকে গ্রামসীমা দেখে দৌড়ে আসত, বাতাসে কান পেতে শুনতো তালবনের সুর—বনের সবুজ আর পাখীর ডাক। ওই বুড়ো বটতলায় এসে বাঁক নামিয়ে পেন্নাম করত নিতে। বলত

—পেন্নাম কর বউ। ঘরকে ফিরে এলম। বাপুতি সাত-পুরুষের ভিটে। বৃদ্ধ বটগাছ বাপের তুলি্য।

…এ মাটিতে এতকাল কাটিয়েছে, অন্ন জুগিয়েছে এ মাটি। আজ কি এমন পাপ করেছে সে যে হন্যে হয়ে বেরুতে হবে ভিখারীর মত এক মুঠো ভাতের আশায়।

…অবনী, ধরণী মুখুয্যে আরও কয়েকজনকে আসতে দেখে একটু অবাক হয় ওরা। এদিকে বড় একটা ওরা আসতো না উল্টে এরাই যেত ধন্না দিতে। আজ তাই ওদের দেখে একটু অবাক হয়।

—আসুন, ঠাকুর মশায়। তা—নিতে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

অবনী বলে ওঠে—একবার তোরা আসবি সন্ধ্যাবেলায় বড়বাবুর ওখানে।

—আজ্ঞে! পটু কথাটা বলতে গিয়েও পারে না।

—আসবি, কাযের কথা আছে। গাঁয়ে আছিস—তোদেরও পুষতে হবে ত। কায কাম দিতে হবে। সেই কথাই কইবো। আসিস।

ওঁরা চলে গেল। বিষ্টু বলে ওঠে—কথাটা কেমন লাগছে। যেচে এসে নেমতন্ন।

পটু ধমক দেয়—তুর সবতাতেই ওই। চল তো দেখি কি বলে। কেমন আশার সুর জাগে ওদের মনের অতলে।

হাসছে অবনী, ছানু দাস একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল, ওরা ফিরে যেতেই বের হয়ে আসে।

—আসবে বল্লে?

জবাব দেয় ফণীবাবু—না এসে যাবে কোথায়?

ছানু মন্ত্র দেয়—সব কটাকেই কিছু কিছু ধান টাকা দিয়ে বেঁধে ফেলান খুড়ো, যেন একজন মুনিষ ও না পায়। ওসব ভক্কিবাজী এখানে চলতে দেবেন না। যৌথ চাষ!

—তারকবাবুকে কথাটা জানানা দরকার। তুইও চল ছানু—

ছানু জবাব দেয়—আমাকে এর মধ্যে টানবেন না, আমি তো রইলামই আপনাদের দলে। কথাটা তারক-বাবুর সামনে ওদের বলুন—ফেলতে পারবে না ওরা। ওদেরও তো কায চাই।

বৈকালের পড়ন্ত রোদের আভায় শূন্য মাঠ—লালডাঙ্গা রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। পাখী ডাকছে। দীঘির কোণে কালো জল সীমার ধারে সবুজের নিশানা। বাইরের বকুল-গাছের কালো পুঞ্জীভূত ডালে রক্ত লাল ছোপ, বকুল গন্ধে উদাস অপরাহ্ন বেলা আমন্থর হয়ে উঠেছে।

অশোক খানিকটা ভেবে-চিন্তে তৈরী হয়েছে।

নীলম্বরবাবু—মণিদত্ত—বুড়ো অতুল কামার—কালী—ষষ্ঠীচরণ আরও অনেকেই এসেছে। ওরাও কথাগুলো শোনে মন দিয়ে। কি যেন আশার কথা!

…পরিষ্কার হিসাব কষে দেখায় অশোক। সারা গ্রামে ধর পাঁচশো বিঘে ধান জমি আছে; তাতে চাষ করতে লাগে পঁচিশ যোড়া বলদ, পঞ্চাশজন মুনিষ আর দুজন সরকারই যথেষ্ট। আর যদি একটা ছোট্ট ট্রাক্টর হয়—নিজেদের জমি চাষ তো হবেই, ভাড়া খাটানো যাবে; তাতেই খরচ উঠে যাবে। এই বলদ মুনিষ—সরকার রেখে চাষ করে যা উৎপন্ন হবে তাতে দাম মিটিয়ে মালিকদের যা থাকবে ভাগ চাষের থেকে তা কোন অংশে কম নয়।

আর এখন কি হচ্ছে—এতকাল।

কালী হিসাব করে বলে ওঠে—তা আজ্ঞে ঘর ঘর মরুক্কে বাছুর ছাড়া প্রায় যোড়া পঞ্চাশ ষাট মিলবে, মুনিষ কামিন লিয়েও ধরুন লাগে শ দেড়েক দুয়েক আর সরকার তো ঘর ঘর—তা দশ বিঘের চাষই হোক আর বিশ বিঘের চাষ হাল ফালই হোক। আর তার খরচও তেমনি বেশী পড়ে গড়পড়তা।

অশোক বলে ওঠে—এদ্দিন সকলেই বেকার ছিল—ওভাবে তাই চলেছে। এখন লোকে কায পাচ্ছে—একশোই হোক আর আশি টাকাই হোক এর চেয়ে বেশী মাইনে; তাই চলে যাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে, এখন কি আর সেভাবে চলবে?

অতুল কামারও ভেবেছে কথাটা; সেও দেখেছে তার পাড়ার লোকদের এতে পোষাবে না; সামান্য জমি, হাল-ফাল করে সবাই লোকসানই দিয়েছে।

মাথা নাড়ে সে—না ছোটবাবু। জমি আর রাখতে পারবো না।—তাই বলছি এমনিতেই জমি ছেড়ে দেবে যদি, দু এক বছর এই ভাবে যৌথ করে দেখ।

—হিসাবে তো সাফই মনে হচ্ছে ছোটবাবু।

—দেখতেও সাফ হবে ষষ্ঠীচরণ।

—স্যার ওই যে কলের নাঙল বললেন—

কালীর কথায় হাসে অশোক—একটু এগোলেই হবে, একটা পাম্পও আনতে হবে।

—পাম্প!

—জল সেচ হবে।

—ও! দেখেছি বটে দামোদরে বাঁধ হবার সময়। ভক্ ভক্ জল উঠছে, তেমনি!

—হ্যাঁ।

—অতুল ওর দিকে চেয়ে থাকে ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মেলে।

অশোক বলে ওঠে—কিন্তু পরস্পরকে বিশ্বাস করতে হবে আগে। নাহলে এটা দাঁড়াতে পারবেনা।

বুড়া অতুল বলে ওঠে—বিশ্বাস! এ যুগে বিশ্বাস কাকে কি করবে ছোটবাবু! তবু দেখেছি দামোদরের বানে ডোবা একই গাছ সাপ আর মানুষ একসঙ্গে বাস করেছে। কেউ কাউকে ছোবল মারেনি।

নীলাম্বরবাবু বলেন—সেইটাই জীবনের ধর্ম অতুল। তেমনি বিপদের দিনে আজ আমরাও হয়তো শুধু বেচে থাকার দরকারেই আপাততঃ ওটি ভুলবো।

কালী তাগাদা দেয়—তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত ডেকে জানিয়ে দিই কারা জমি দেবে—কারা দেবেনা। তেমনি কায স্থরু করবো।

—আর আমরা! আমরা কি হিসেবের বাইরেই থাকবো ছুটবাবু।

নিতে বাউরী বসেছিল এককোণে, সঙ্গে বাউরী লোহার পাড়ার আরও দুচার জন।...মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো।

মাটির সঙ্গে আজন্ম সম্বন্ধ তাদের, এ কথায় তারা সার বুঝেছে। তাই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

অশোক বলে—তোদের তো আগেই চাই নিতাই। বাউরী পাড়ার লোহার পাড়ার যে কজন কায করতে চায় কালই খবর দে। হপ্তাহে মাইনে পাবি—আর ধান পোতার সময়—কাটার সময় দেড়া মাইনে।

...অশোকও যেন ডুবে যায় কাযের নেশায়। আবার সেই নেশায় পেয়ে বসে তাকে।... যে নেশায় মত্ত হয়ে গড়েছে স্কুল, গার্লস স্কুল, ডাক্তারখানা। সেই নেশায় আর দুর্বার শক্তি নিয়ে মেতে উঠেছে গ্রামের এই সমস্যার সমাধান করতে।

...বেশ পড়াশোনাও স্থরু করেছে, দেশ বিদেশের কো-অপারেটিভ ফার্মিংএর কথা, তাদের সমস্যা—তার সমাধান। কতখানি সাহায্য সহযোগিতা কোথা থেকে কি ভাবে আসবে তাও ছক নিয়ে কর্মসূচী করে তুলেছে।

এ নিয়ে অনেকদিন হতে পড়াশোনা—কায-কর্ম স্থরু করেছে। সদরেও যোগাযোগ করেছে; কিন্তু কথাটা পাড়েনি নিজে থেকে। ওদের দিক থেকে সমস্যাটা বড় হয়ে উঠলে তখনই কথা বলার স্থযোগ হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হ্যারিকেনটা জালিয়ে কাগজগুলো দেখছে অশোক—হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল। অবাক হয়ে যায়—আপনি!

...শিখা এসেছে। শিখা সহজ ভাবেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে।—কি এত কায করেন জানিনা, বৈকালে শুনলাম রীতিমত মিটিং করছেন।

—হ্যাঁ। একটু ব্যস্ত ছিলাম। কালই একবার সদরে যেতে হবে। একটা বড় কাযে হাত দিয়েছি।

হাসে শিখা—তা বিরুদ্ধ দলের তোড়জোড় দেখেই বুঝলাম।

—মানে!

—ওই অবনীবাবু টাঁকপড়া এক ভদ্রলোক আরও কারা বেশ উৎসাহের সঙ্গে মুণ্ডপাত করছিলেন শুনলাম।

হাসে অশোক—তাই নাকি!

—হ্যাঁ তারকবাবুর বাড়ীতে ওরা ছিলেন। মণিমালা আমার পরিচিত তাই দেখা করতে গিইছিলাম। বেচারা!

অশোক চুপ করে থাকে, কি ভাবছে। শিখাই বলে ওঠে।—আপনি কিন্তু একটুও বদলাননি, আগেকার মতই তেমনি গোঁয়ার—একগুঁয়ে রয়ে গেছেন।

অশোক প্রশ্ন করে—মণিমালাকে দেখে খানিকটা বুঝেছেন আজকের পরিবর্তনটা।

—চুপ করে থাকে শিখা। কি ভাবছে সে। জবাব দেয়।—হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি।

—সেই বদলের প্রবল স্রোতের মাঝে দাঁড়িয়ে—

সামগ্রিকভাবে বাঁচবার চেষ্টা করছি শিখা; একা নয়—সবাইকে নিয়ে। আজও ওরা এ মতে বিশ্বাস করে না তাই নিন্দা করে, করবেও। হয়তো চরম আঘাত হানবে—

—তবুও থামবেন না? শিখা প্রশ্ন করে।

—হেরে যাবো কিনা জানিনা; মনে হয় জিতবোই। ওরা এই দারুণ বিপদের কথা স্মরণ করেনি। এখনও বিশ্বাস করে ফাঁকি দিয়ে বাঁচতে পারবে, কিন্তু এ ভুল যেদিন ভাঙ্গবে সেদিন বানে ডোবা গাছে সাপের হিংসা ভুলে সেও বাঁচবার চেষ্টাই করবে। আমাদের হাতে হাত মেলাতে বাধ্য হবে।

চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে শিখা। কালো ডাগর চোখে কি যেন মায়া। একটা কঠিন শপথে যেন অশোকের দুচোখ জ্বলছে।

শিখার মনে তারই উত্তাপ। বলে ওঠে—মনে হয় এখানে এসে ভালোই করেছি।

—কেন?

—একটা যুগের নিদারুণ ব্যর্থতার যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেছি এই ধ্বসেপড়া গ্রামের বুকে। প্রথমে দেখেছিলাম সবুজ হলুদ বন আর লাল গেরুয়া ডাঙ্গার বুকে হুমড়ি খাওয়া একটা গ্রাম। তার মানুষগুলোকে। কিন্তু তাদের এত সমস্যা—এত জ্বালা তলিয়ে দেখিনি!

শিখা বলে চলেছে।

হাসে অশোক, মলিন ক্লিষ্ট হাসি। বলে ওঠে—সব গ্রামের—সব ঘরের—প্রতিটি মানুষের বুকে আজ এমনি জ্বালা শিখা; কেউ বুঝেছে—কেউ বুঝতে চায়নি। কিছু লোকও এ জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়, বাঁচতে চায় নোতুন করে। দেখছ!

[ক্রমশঃ

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণে

শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী

সুরের পূজারী কবি হে দ্বিজেন্দ্রলাল,
বঙ্গ সাহিত্যের তুমি উজ্জ্বল মশাল।
সারস্বত জগতে তুমি দুর্লভ শিখা,
ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণোজ্জ্বল লিখা।
স্বদেশী সংগীতে তব বাঙালীর প্রাণ,
স্বাদেশিকতার সুরে ডেকেছিল বান।
তোমার পূজার মন্ত্র হয়নি নিষ্ফল,
ভারতীর আশীর্ব্বাদে হয়েছে সফল।

তোমার অনুপম কাব্য "আর্য্যগাথায়"
হৃদয় ধর্ম্মের সুর আজো শোনা যায়।
বঙ্গের গৌরব শিখা হে ভাস্বর কবি,
অনন্ত মহিমাময় তব স্মৃতি ছবি।
অন্তরে জাগ্রত চির জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ,
তোমার আশীষে হোক দেশের কল্যাণ।
অমৃত অমর কবি হে স্বদেশ প্রাণ,
শতাব্দীর শঙ্খে বাজে তব জয় গান।

তব শতবার্ষিকীতে একান্ত প্রার্থনা।
সিদ্ধ হোক বাঙালীর হৃদয় বাসনা।

কুমায়ুঁর কৌশানী

আভা পাকড়াশী

আজ আকাশটা বেশ পরিষ্কার। তাই রাণীক্ষেতে আমাদের হিমালয় হোটেলের পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইনাকুলারে দেখছি ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোঠ। বেশ পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছিল সেই বরফাচ্ছাদিত চূড়গুলি। রাণীক্ষেতের এইটেই প্রধান আকর্ষণ এই আড়াইশো মাইলব্যাপি স্নো রেঞ্জ। দত্তসাহেব সেদিন এই বাইনাকুলারটি দিয়াছিলেন। আমরা বলেছিলাম আমরা একদিন একটি ভাল করে দেখেই ফিরিয়ে দেব আপনার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি। কদিন আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি, আজ দেখলাম। কি যে অপূর্ব্ব দৃশ্য। সকালের সোনালী রোদ পড়েছে বরফে ঢাকা ত্রিশূলে। রামধনু রং ধরেছে চূড়াগুলি। আমরা চারজনে কাড়াকাড়ি করে বাইনাকুলার দিয়ে দেখছি। কেননা একবার রোদ সরে গেলেই আর এই অপরূপ রূপ থাকবেনা। ঢাকা পড়ে যাবে মেঘের আড়ালে।

বাইনাকুলারটি খুবই দামী। তাই আমার স্বামী চাইলেন সেদিনই ওটি ফিরিয়ে দিতে। আপারম্যালে থাকেন দত্তসাহেব। বাইনাকুলারটি ওঁরই "অ্যাডায়ার দত্ত কোম্পানী"র তৈরী। এই শ্রীপ্রবোধ দত্তই তার মালিক ছিলেন। বহুকাল প্রতীচ্যে ছিলেন কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে প্রাচ্যের ডাক, দেশের হাতছানি এড়াতে পারেন নি। তাই নীরব নির্জন চীড়ের জঙ্গল ঘেরা, পাইনের পাতায় ঢাকা রাণীক্ষেতকে নিজের আবাসস্থল করে নিয়েছেন। আবার এই স্নো রেঞ্জের হাতছানি হয়তো তাঁকে ফেলে আসা প্রতীচ্যকে মনে পড়িয়ে দেয়।

ওঁর ওখানে পৌঁছে দেখি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির এক্স-ভাইসচ্যান্সেলর অমিয় ব্যানার্জি অতিথি হয়ে এসেছেন। ওঁরা বাল্যবন্ধু। এর আগে এঁর এখানে দিল্লী ইউনিভার্সিটির ইকনমিকসের চেয়ার-হোল্ডার ডাক্তার বি, এস গাঙ্গুলীর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। ইনি বার্ড ওয়াচার।

যাই হোক এখন শুনলাম এই ব্যানার্জি দম্পতি ওখান থেকে সোজা মোটরে কৌশানী যাচ্ছেন। আমরা বাইনাকুলারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বরফঢাকা চূড়াগুলির যখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলাম তখন ওঁরা তাই শুনে বললেন আপনারা যখন এত আগ্রহ নিয়ে স্নো দেখেছেন, আর দেখে এত আনন্দ পেয়েছেন তখন আপনারাও আমাদের সঙ্গে কৌশানী আসুন না। কৌশানী গেলে আপনার দুটো লাভ। একতো রাণীক্ষেত থেকে কৌশানী যাবার

কৌশানীর ক্ষেতের দৃশ্য ফটো: শঙ্কর

এই পঞ্চাশ মাইল রাস্তার অতি সুন্দর শোভা। এই পথেই আপনারা real কুমায়ুঁর beauty দেখতে পাবেন। আর তাছাড়া এই ত্রিশূল, নন্দা দেবী, নন্দা কোট এত কাছে চোখের ওপর দেখতে পাবেন যে মনে হবে বোধ হয় একটা লাফ দিলেই পৌঁছে যাবেন। বড় লোভ হল শুনে। ওরা গিয়ে ডাকবাংলায় উঠবেন। সেখানে নিশ্চয়ই আর

একখানা ঘর পাওয়া যাবে। অবশ্য নিজেদের রসদ সঙ্গে নিতে হবে। কৌশানী পাহাড়ের গণ্ডগ্রাম কিছুই পাওয়া যায়না সেখানে। পরশু ভোরে বেরুবেন ওরা। ওদের সঙ্গে আমরাও যাব,এক রকম কথা দিয়েই আমরা ফিরে এলাম।

কিন্তু হোটেলে ফিরেই জ্বরে পড়ল আমার ছোট ছেলে গোরা। যাওয়া হোলনা ওদের সঙ্গে। পরে আমরা রওনা দিলাম বাসে। ডিম, চাল, ডাল আলু, পেঁয়াজ মশলা সবই প্রায় সঙ্গে নিলাম। উপস্থিত আমাদের গন্তব্য স্থল হল কৌশানী ছাড়িয়ে বাগেশ্বর। প্রথমে উঁচুতে উঠে কৌশানী পৌছে আবার তাকে পথে ফেলে রেখে বাগেশ্বর গিয়ে সেখানে সরযূ আর গোমতীর সঙ্গম দেখে, আর মহাভারতের যুগের বাগেশ্বর শিবের মন্দির দর্শন করে আবার ওপরে উঠে কৌশানী।

সত্যিই চমৎকার শোভা এই পথের! সিঁড়ি সিঁড়ি করা ক্ষেত। মনে হয় প্রত্যেকটি সিঁড়িকে কেউ বিভিন্ন রঙ দিয়ে এঁকেছে। আসলে পাহাড়ীরা থাকে থাকে ফসল বুনেছে। বীট, গাজর, পিয়াজ, ধান, গম, আলু। তারই রঙ ফলেছে এক একটি থাকে! পাহাড়েরও শোভা অপূর্ব। কোনটি বা নীল কোনটি ধূসর দেখাচ্ছে। আসলে যে পাহাড়ে কোন গাছ পালা নেই সেই পাহাড় রং ধরেছে ধূসর। আর যেটিতে জঙ্গল ভরা সেটি রং ধরেছে নীল।

এসেছি লুএর দেশ থেকে। রাণীক্ষেতেও দুপুরে বেশ গরম লাগে মে মাসে। মনে হয় পাখা থাকলে খুলে দিলে ভালই লাগত। তাই যতই বাস ওপরে উঠছে ততই সুন্দর একটা ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে।

কোশী নদীর তীরে কৌশানী। কোশী উপত্যকা খুবই উর্ব্বরা। সেচের অভাব নেই বলে ক্ষেত ভরে ফসল ফলেছে আর নয়নাভিরাম দৃশ্য ধরেছে। দেখতে দেখতে চলেছি। পৌছে গেলাম কৌশানী। বেশ ঠাণ্ডা এখানে। আবার বাস নীচে নামছে, চলেছি বাগেশ্বরের দিকে। পথে পড়ল গরুড়। এখানে মস্তবড় মন্দির আছে গরুড়ের। বাগেশ্বরে সরযূ আর গোমতী বয়ে চলেছে। বেশ বুঝতে পারছি দুটি স্রোতস্বতীর ধারা এক খাতে বইলেও নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। যেন দুটি ভগ্নী। তার একটি গৌরী অন্যটি শ্যামা। বড় সুন্দর শোভা। মন্দিরটির জীর্ণতাই তার বয়েসের প্রমাণ। গরমে বড় কষ্ট হচ্ছিল। সঙ্গের খাবার সেই গঙ্গাতীরে বসে খেতে গিয়ে মাছির তাড়নায় কোনরকমে গলাধঃকরণ করে তাড়াতাড়ো করে বাসে ফিরে এলাম। আমরা ড্রাইভারের সিটের সঙ্গে যে সিট ফার্ষ্টক্লাশ নামধারী লম্বা সিট দুটি আছে তারই যাত্রী। তারপর রেলিং দেওয়া। ওদিকে থার্ডক্লাশের। এতক্ষণ আমরা এই ফার্ষ্টক্লাশের একমাত্র অধিকারী ছিলাম। এখন ফিরে এসে দেখলাম একজন খদ্দরের সালোয়ার কামিজ পরা প্রৌঢ়া ইংরেজ মহিলা তাঁর বেশ স্থুলায়তন ঝোলাটি কোলে নিয়ে বসে আছেন। আসে পাশে আমাদের জিনিষপত্র ছড়ান থাকায় অমনি সঙ্কুচিত হয়ে বসেছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর বসার জায়গার পরিসর একটু বাড়িয়ে দিই।

স্বদেশী পোষাক পরা বিদেশী মহিলা স্বভাবতঃই আমাদের মনে কৌতুহল জাগাল। প্রশ্নোত্তরে জানলাম ইনিই গান্ধীজীর অন্যতমা শিষ্যা সরলা বেন। বাপুজীর আদর্শ অনুসারে সর্ব্বোদয় সঙ্ঘের পরিচালনায় কৌশানীতে তিনি একটি স্কুল করেছেন। আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর স্কুলটি পরিদর্শন করার জন্য। আমার স্বামী ওঁর সঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা করলেন। উনি কিন্তু অন্যসব বিষয়ে নিজের মতামত বিশেষ জাহির না করে শুধুই শুনে গেলেন। অবশ্য নিজের স্কুলের আদর্শবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন। এঁরই সহ-সঙ্গী ছিলেন মীরা বেন। গান্ধীজীর দেহরক্ষার পর তিনি স্বদেশে ফিরে যান। তাঁর লেখা নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী স্পিরিটস পিস্‌প্রিসেভ নামে ধারাবাহিক ভাবে ইলাষ্ট্রেটেড্‌ উইকলিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

এসে গেলাম কৌশানীতে। বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে ডাকবাংলো অনেকটা ওপরে। সরলাবেনও নামলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁরই একটি ছাত্রী। ভারী সুন্দরী এই পাহাড়ী মেয়েটি। নাম কান্তি। যাবার সময় আমাদের গন্তব্য পথের উল্টোদিকের একটা টিলা দেখিয়ে বললেন— এ দিকে আমার স্কুল। রাস্তাটা ভালনা। মানে বিপদের নয়, বিপথ আর কি। যাবেন নিশ্চয়ই। "মাতাজীকা আশ্রম" বললে যে কোন পাহাড়ী লোক দেখিয়ে দেবে।

সুন্দর ডাকবাংলোটি আমাদের। সামনে একটা গোল বারান্দা তারপর ঘর, পাশেই বাথরুম। একজন দারওয়ান আছে সে দুধের ব্যবস্থা করে দিল। চমৎকার দুধ। বাকি জিনিষ তো নিয়েই ফিরেছিলাম। সবই খরচ করছি সন্তর্পণে, ফুরিয়ে গেলে তো আর পাব না। বাসন পত্র, প্লেট চামচে বেশীর ভাগ এখানেই পেয়েছি।

ষ্টোভে রান্না করছি। নিজেই সব পরিষ্কার করছি। কিন্তু একটা বড় দুঃখ আকাশ সেই মেঘে ঢাকা। যে জন্যে এলাম সেই বরফে ঢাকা চূড়াগুলি দেখব বলে—তা আর হচ্ছে না। এদিকে মাত্র চারদিনের রসদ সঙ্গে এনেছি। জানি তার মধ্যে ফিরে যাব। দত্তসাহেব আমাদের এই সামনের ঘরটাই নিতে বলেছিলেন ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেছি। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার না হলে সবই যে বৃথা যাবে। দারওয়ানের কাছে দুঃখপ্রকাশ করলেই সে বলত, "জলদি কিয়া আপলোক আভি আয় কে, সিতম্বর অক্তোবর মে 'সোনো' দিখাই দেতা। আভি সোনো ওনো কঁহা আব ? মানে ভুল সময় এসেছ তোমরা, সেপ্টেম্বর অক্টোবর এলে স্নো দেখতে পেতে, এখন স্নো কোথায় ? এই লোকটি এখান কারবহু পুরাণ কেয়ার-টেকার। নিজেই বলল, লেখক প্রবোধ সান্যাল এই-খানে বসেই "দেবতাত্মা হিমালয়" লিখেছিলেন। তার মধ্যে ওরও নাম আছে। চারদিকে চীড় আর দেব-দারুতে ঘেরা সুন্দর পরি-বেশে এই ডাকবাংলোটা। লাইট নেই। রাত্রে কেরো-সিনের সেজ দিয়ে যায়। ইনস্পেকসন বাংলোটা একটু নীচে। সেটিও চমৎকার।

পরদিনই গেলাম সরলা বেনএর স্কুল দেখতে। নাম "লক্ষ্মী আশ্রম"। লক্ষ্মী আশ্রমের চতুর্দিকেই যেন লক্ষ্মীর কৃপা উছলে উঠছে। ওঁর নির্দেশে কান্তি, সেই বাসে দেখা কান্তিমতী মেয়েটি আমাদের সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল।

বেশীর ভাগ কাঠের আর মাটির দোতলা বাড়ী। তবে স্কুল বাড়ীটি পাকা। স্কুলে পৌঁছবার রাস্তাটি সত্যই বিপথ। নালা ডিঙিয়ে, টিলা পেরিয়ে উঠতে হয়। তবে একবার ওপরে উঠলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মেয়েদের হাতে তৈরী ক্ষেতের শ্যামলিমা টেনে নেয় মনকে। এখানে মেয়েরাই সব কাজ করে। এইসবই তাদের শিক্ষার মধ্যে পড়ে। বহুকাল আগে ছাত্রেরা যেমন গুরুগৃহে গিয়ে অধ্যয়ন করত। সেখানে সেই ঋষির আশ্রমে তারা গো-দোহন, কাষ্ঠসংগ্রহ, ফসল উৎপাদন, পুষ্পচয়নসবই করত, সঙ্গে সঙ্গে চলত তাদের অধ্যয়ন। সেদিক থেকে এই আশ্রমের নামটিও যথাযথ হয়েছে। সত্যিই, যেন এই সরলাবেন কোন ঋষিমাতাই—আর এই মেয়েরা তাঁর অনুগতা শিষ্যা।

এখানে মাত্র কুড়ি টাকা করে দেয় মেয়েরা, তবে হরিজন মেয়েদের জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে সামান্য সাহায্য আসে। তিন বছর ধরে এদের সব শেখানো হয়। এর মধ্যে দুবছর ছাত্রীরা প্রবেশনার থাকে। তারপর তাদের পরীক্ষা করে দেখা হয়। এদের মধ্যে যারা স্থায়ী সদস্যা হবার যোগ্যা তাদের আরও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পরবর্তী ছাত্রীদের কাছ থেকে আর কোন ফিস নেওয়া হয় না। শুধুমাত্র এদের তেল সাবান আর হাত-খরচের জন্য পাঁচটি করে টাকা নেওয়া হয়। এই সবই কান্তির সঙ্গে চলতে চলতে শুনছিলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি বুঝি ঐ শেষোক্ত দলের ? সহাস্যে উত্তর দেয়, হ্যাঁ। আমি আর আমার দিদি দুজনেই এখন এখানে
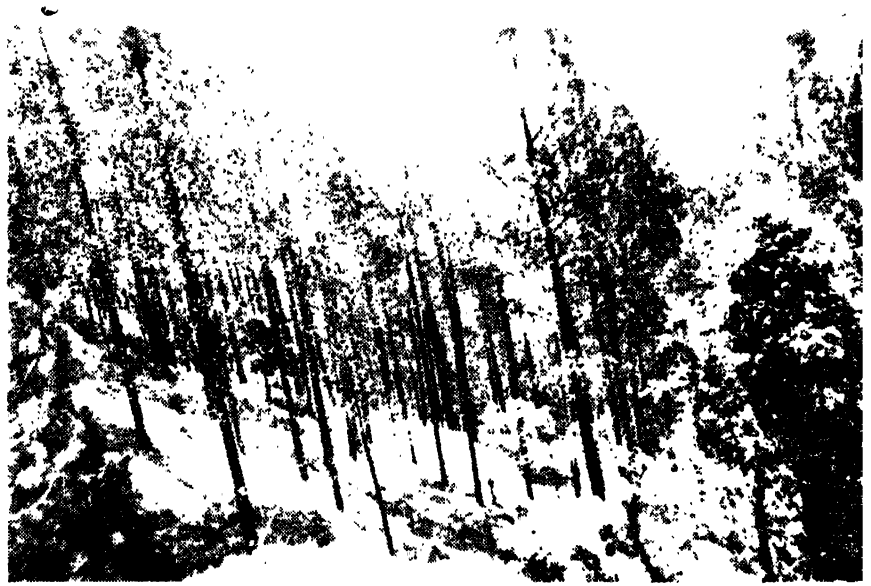
চীড়ের শোভা   ফটো

আছি। পরে কোথায় যেতে হবে তা এখনো জানিনা। বহেনজী যা বলবেন তাই হবে। বহেনজী মানে সরলাবেন।

এরপর ওর সঙ্গে গেলাম রান্নাঘরে। দেখলাম মেয়েরা নিজেরাই রান্না করছে। রান্নার কাঠ এরাই কেটে আনে জঙ্গল থেকে। পুরনো কাপড়ের সুতো দিয়ে আসন বুনেছে মেয়েরা, সেই আসনে বসেছে ছোটরা। তাদের খাওয়াল বড়রা। নয় দশ বছর বয়েস থেকে এই স্কুলে নেওয়া হয়। তারপর বয়েস আর যোগ্যতা অনুযায়ী এরা কাজের ভার পায়।

গোশালায় সুপুষ্ট গরুগুলি আলস্যসুখে জাবর কাটছে। মেয়েরা এদের পরিচর্য্যা করে। দুধ যা হয় তাও সমান ভাগে সবাই পায়।

কম্বলঘরে মেয়েরা কম্বল বুনছে। বড়রা ছোটদের শেখাচ্ছে। এরা নিজেরাই ভেড়ার লোম থেকে উল তৈরী করে। তারপর তাকে রংএ ছোপায়। আবার সেই উল দিয়ে সোয়েটার বোনে, কম্বল বোনে, জলিন তৈরী করে। কি তাড়াতাড়ি আর কি সুন্দর বুনছে দেখলে অবাক হতে হয়। আমরা কয়েকটি সোয়েটার কিনে এদের কিঞ্চিৎ সাহায্য করলাম। জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা এই যে বড় মেয়েরা ছোটদের শেখাচ্ছে এরা কার কাছে শিখেছে? বলল—প্রথমে সর্ব্বোদয় সঙ্ঘ থেকে শিক্ষয়িত্রী এসে এদের শিখিয়েছেন। এখানকার এই নিয়ম। এই সংস্থায় ভর্তি হতে হলে আগে ছাত্রীর মা বাবাকে লিখে দিতে হবে যে, তাঁদের মেয়েকে এঁরা যে সঙ্ঘে চাইবেন সেখানে পাঠাতে হবে। সেখানে গিয়ে এমনি একটি সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। এখানে মেয়েরা প্রধানতঃ শেখে কৃষিবিদ্যা, গো-পালন, সমাজবিজ্ঞান, বস্ত্রশিল্প, সিল্ক ও উল বয়ন, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, গৃহ-বিদ্যা, রন্ধন ইত্যাদি।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম মেয়েরা কাপড় কাচছে। ঝরণার জল একটি চৌবাচ্চায় জমা হয়েছে। আজ ওদের পালা পড়েছে কাপড় কাচার। এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য কাজ করবে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়। ওদের মূলমন্ত্রই হল সাম্যবাদী আর স্বাবলম্বী হতে হবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখলেম কয়েকটি বড় মেয়ে শুশ্রূষা করছে। এই রোগীর সেবাও ওদের পাঠের মধ্যে গণ্য; বলল কান্তি। আমি বললাম—এদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়না কেন? বলল—এরা নিজেরাই যেতে চায় না। পরস্পরকে সাহায্য করায় ওদের মধ্যে এমন একটা নিবিড় বন্ধন গড়ে ওঠে যে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

সত্যি দেখলাম প্রত্যেকটি মেয়েই কি হাসিখুশী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। এরা প্রাণের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। কাজ এদের কাছে বোঝা নয়। ভয় পায় না কাজকে তাই। ওরা যেন এক একটি কর্ত্তব্যের প্রতিমূর্ত্তি।

এই সবুজ রংএর শাড়ীপরা পর্ব্বত দুহিতাটিকে প্রকৃতই প্রকৃতি কন্যা বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের পেয়ে খুব খুশী—সমানে শত মুখে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, আবার আমার ছোট ছেলের সঙ্গে খুব গল্প করছে এতই উৎসাহ। নিজেদের এই সংস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

লাইব্রেরী দেখতে যেয়ে দেখলাম, অনেকগুলি বই ছিল আমাদের সর্ব্বোদয় সংস্থার। আমরাও আগ্রহ করে কিনলাম। হাতে তৈরী আটা আর গুড়ের নাড়ু এনে আমাদের জল খাওয়াল। পাহাড়ী গান গেয়ে শোনাল। ওদের দেশের সুমিষ্ট আর সব চেয়ে প্রিয় বেড়ুফল আর কা-ফলের গান।

"বেড়ুপাকো বারমাস্যা
নবন কা-ফল পাকো মেরি ছয়লা।"

ভারী মিষ্টি গলা এই কিশোরীর। আজও এই টানা সুরের পাহাড়ী গানটি কানে বাজে। এবার আমরা আবার অফিস ঘরে ফিরে চললাম।

শ্রীমতী সরলার কাছে এসে তাঁর স্কুলের প্রশংসা করায় খুবই প্রীত হলেন। তারপর ব্যক্ত করলেন এই স্কুলের আসল উদ্দেশ্য। গ্রাম উন্নয়ন ও স্বাবলম্বন এই হল দেশের ও জাতির উন্নতির মূল। এই কথাই বলতেন বাপুজী, সুতরাং আমি সেই ব্রতই নিয়েছি। আমার মতের সঙ্গে বিনোবাজী সম্পূর্ণ একমত। তাই আমাদের পথও এক। সর্বোদয় মানে আমরা মনে করি (সর্ব্বের উদয়) সকলের উন্নতি। আমার এই স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তা দুটি ছাত্রীও যদি দুটি গ্রামকে জাগাতে পারে, তবে তাদের ছাত্রীরা আবার অন্য গ্রামকে সংস্কৃত করবে। এই ভাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে শিক্ষার আলো

সাম্যবাদ আর স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা। তাই আমি এখন মাসে অন্ততঃ পনের দিন কান্তি বা তার দিদিকে নিয়ে অন্য গ্রামে গিয়ে তাদের মধ্যে এমনি উদ্দীপনা দেবার চেষ্টা করি। তবে দেখেছেন ত, আমাদের অর্থের বড় অভাব—তাই বলছি আপনারা যদি হাতে কাটা সুতো পাঠিয়ে দেন বা বছরে কিছু অর্থ সাহায্য করেন কিম্বা বন্ধুদের দিয়ে কিছু সাহায্য করান বড়ই উপকৃত হব। যদিও আশে পাশের আর অনেক দূর গ্রাম থেকেও আমার স্কুলে ছাত্রী আসে, কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েই টাকা দিতে পারেনা। এই পাহাড়ীরা বড় গরীব আর দুঃস্থ। এদের মেয়েরা পেঠ ভরে খেতে পাবে শুধু এইজন্যেই তাদের স্কুলে পাঠায়, শিক্ষা এদের কাছে গৌণ। "আমি বললাম" কেন, গবণমেণ্ট মানে নেহেরুজীর কাছে আবেদন করলেই তো পারেন। এটি যখন গান্ধীজীর আদর্শের প্রতীক তবে কেন তিনি সাহায্য করেন না। প্রথমে কিছু বললেন না। মাথা নীচু করে কি যেন চিন্তা করলেন। পরে বললেন, "নেহেরুজী এখন আর এই আদর্শের পক্ষপাতী নন। এই কারণেই তাঁর দান নিতে আমার বাধে।" আত্মবিশ্বাসে আস্থাশীলা এই মহিলার প্রতি শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে ওঠে মন।

এই যন্ত্রযুগেও একজন ইংরেজ মহিলার ভারতের মাটিতে বর্ত্তমান বিনোবাজী ও স্বর্গত মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে যাবার মত অধ্যবসায় ও মনের বল দেখে সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেমন পাণ্ডবদের শুধু ধর্ম্ম ভরসা ছিল, শ্রীমতী সরলা বেনেরও সেই একমাত্র ভরসা বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভের পর, সরকারের সহযোগিতার অভাবে শ্রীমতী মীরা বেনের ভারত ত্যাগের পর। যাই হোক, পাঠকপাঠিকারাও দয়া করে শ্রীমতী সরলা বেনের সামান্য আবেদন মঞ্জুর করবার চেষ্টা করবেন আশা করি।

এরপর আমার ছেলের অনুরোধে তিনি আমাদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। ফটো তোলা হ'ল। কান্তিও দাঁড়াল হেসে। পরে এঁরা গুরু-শিষ্যা আমাদের অনেক দূর অবধি পৌছে দিয়ে গেলেন। আমরা নেমে এসেও দেখলাম ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। এই মায়ার বাঁধনেই বেঁধেছেন এ পাহাড়ীয়া কঠিন কঠোর মানুষ-গুলিকে।" মাতাজী কি আশ্রম—বললে তারা একবাক্যে এই কারণে সহজেই তাঁকে চেনে। তিনি যে তাদের দুর্দিনের বন্ধু, দুর্ব্বলের সহায়। "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাবে অন্যেরে" গীতার এই বাণীর তিনি জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি ছাত্রীদের সঙ্গে সমানে পরিশ্রম করেন। সব কাজে তাদের সাহায্য করেন। তাঁর স্কুলে উঁচু নীচু ভেদ নেই, সবাই সমান। সকলের সমান অধিকার আছে প্রত্যেক কাজে। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ভাগ পায় তারা, জাত অনুযায়ী নয়। এই যন্ত্রের বিরাটত্বের মধ্যেও তিনি ক্ষুদ্র মনুষ্য শক্তিকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টাই করে চলেছেন।

শঙ্কর, লেখিকা, সরলাবেন, কান্তি, গোরা

যেন প্রখর সূর্য্যালোকের মধ্যে একটি দীপবর্তিকার মৃদু শিখা বিকীরণ করছে তাঁর স্কুলটি। বলছে—কল্যাণ আছে এর মধ্যেই। এই লক্ষ্মী আশ্রমের চতুর্দিকে যেন মা লক্ষ্মীর প্রসন্ন কৃপার দৃষ্টি উপলব্ধি করা যায়। এই আশ্রম-কন্যারা যেন সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁরই আরাধনা করে চলেছে। আমাদের সঙ্গে অনেকটা এসে পৌছে দিয়ে গেলেন। শেষ কথাও বললেন—আমাকে একটু সাহায্য করবেন কিন্তু আপনারা; ভুলে যাবেন না। আমার ঠিকানা—"কস্তুরবা উত্থান মণ্ডল"···লক্ষ্মী আশ্রম কৌশানী (আলমোড়া)

কাল রাত্রের প্রচণ্ড বৃষ্টির পর আজ খুলে গেল আকাশ। সোনালী সকালের প্রথম অরুণোদয়ের লাল আভা পড়েছে

বরফাচ্ছাদিত চূড়াগুলির ওপর। তুষারশুভ্র পর্ব্বতমালার একটি বিরাট মিছিল আমাদের চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে ফুটে উঠল। গিরিরাজের কি অপূর্ব্ব প্রকাশ। একেবারে চোখের সামনেই তুষারধবল ত্রিশূল। তারপর নন্দা দেবী, নন্দা কোঠ, যুধিষ্ঠির, শতপন্থ—প্রত্যেকটি চূড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

বিদায় নিলাম কৌশানী থেকে। দরওয়ানের কথা বিফল করে দিয়ে অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে—"যেনো" দেখে নিয়েছি। রসদও ফরিয়েছে। নেমে তো এলাম কিন্তু বাস ষ্ট্যাণ্ডে বাস পেলাম না। ঘর ছেড়ে দিয়ে, বকসিস দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার সেঘরে ঢুকতে কিছুতেই ইচ্ছে হলনা। তাই বাস ষ্ট্যাণ্ডের ওপরেই একটা ভাঙ্গাবাড়ীতে রাত কাটালাম। সারা রাত ছাতা মাথায় দিয়ে বসে। ফুটো ছাত দিয়ে অজস্র বৃষ্টির জল আসছে। দুর্ভোগ ছিল বরাতে কে খণ্ডাবে—তায় মাত্র দুগ্ধ ভরসা। কোথায় সুন্দর ডাক বাংলোর আরামের নরম বিছানা, আর কোথায় খোয়া ওঠা ভাঙ্গা বাড়ীর মেঝে। পরদিন ভোরে রাণীক্ষেত রওনা হলাম।

উপলব্ধি

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

এই যে জীবন কান্না হাসি
মিথ্যা মায়ায় ভরা,
অসার প্রেমের আবর্জনায়
চিত্ত পাগল করা,
অন্ধ স্নেহে আকুল হয়ে
মূর্খ সেবক সম—
পাগল হয়ে বাসিস ভালো
ভাবিস্ প্রিয়তম—
শক্র সে জন নয়কো আপন
তার ছলনায় ভুলি'
মাখিস নে আর মোহে ভরা
এ সংসারের ধূলি।
আসা শুধু যাওয়ার লাগি—
মাঝে কয়েক দিন
কান্না হাসির ঢেউ বয়ে যায়
শুনিয়ে মরণ বীণ।
তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে
যায় ভুলে যায় নিতি—
আজকে যাহা টাট্‌কা সবজ
কাল যে তাহা স্মৃতি।

প্রশ্ন জাগে সেই

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়

সবুজ ঘন ধরার বুকে আঁধার এলো নেমে,
পূবের রবি পশ্চিমেতে কখন গেছে থেমে।
সবাই জানে, আমিই শুধু তোমার কথা ভেবে
সব ভুলেছি, 'রাত্রি হ'ল' কেই বা
বলে দেবে?

আবার কখন আঁধার মুছে রাত্রি হবে পার—
আঁধার ডুবে, আবার পূবে জ্বলবে আলো, আর
তোমার খোঁজে হয়তো আমার
সময় হারাবেই,
বিশ্বভুবন হয়তো খুঁজে ফিরবো তোমাকেই।

কেমন ক'রে বোঝাই বলো, এ মন বোঝে না যে,
সেদিন যারা ছিল, আজও সবাই হেথা আছে—
সেই তারা আজ জ্বলছে, নভে, সেই
চাঁদও আজ ওঠে,
সেই কাননে তেমনি করে, কতনা ফুল ফোটে।

সবাই ছিল, সবাই আছে, তুমিই শুধু নেই—
কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে প্রশ্ন জাগে সেই।

প্রজাপতি মন

অজিত চট্টোপাধ্যায়

ফিকে রংটা দুচোখের বিষ শর্মিলার। কিন্তু সুশান্তর ঠিক উল্টো। হাল্কা যে কোন রংই ওর প্রিয়। ওরই মধ্যে সবুজ বা কচি কলাপাতার রংটাই আবার একটু বেশী ভালো লাগে। কোন জিনিষ কিনতে গিয়ে সুশান্তর দুটি চোখ কচি কিশলয়ের মনোরম বর্ণটির খোঁজ করে ফিরে।

শর্মিলার চোখে ঐ রংটাই আবার জ্বালা ধরিয়ে দেয়। ফিকে বা হাল্কা কোন রংই ওর পছন্দসই নয়। 'কি যে সব পানসে রং মানুষের পছন্দ হয় বাবু'—শর্মিলা প্রায়ই অনুযোগ করে। ওর আয়ত কালো চোখের দুটি তারায় ঘন লাল বা গভীর কালো রং পরমপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুশান্ত বলে, 'পানসে বলো আর যাই বলো তোমার ঐ ক্যাটকেটে লাল বা কালো রং কেউ পছন্দ করবে না। চোখে যেন বড্ড লাগে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও, শাড়ীর দিকে হাঁ করে চাইবে মানুষ-জন। যেন সং চলেছে পথে।'

প্রতিবাদ জানিয়ে শর্মিলা উত্তর দেয়,—'তোমার ঐ প্যানপেনে হাল্কা রঙের চেয়ে গভীর রং অনেক সুন্দর। আর রাস্তা দিয়ে হেটে গেলে যারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাদের স্বভাবই ওই। রঙের কোন দোষ নেই মশাই, বুঝলে ?—

রং নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে খিটিমিটি। ফিকে রং ছাড়া কোন বস্তুই কিনবে না সুশান্ত। শর্মিলারও ধনুকভাঙ্গা-পণ। শাড়ী থেকে ব্লাউজ পর্য্যন্ত সবকিছু ঘন রঙের। লালের সঙ্গে লাল কিংবা কালোর সঙ্গে কালো, ম্যাচ করে ঠিক পরবে। সুশান্ত হেসে বলবে,—বেশ মানিয়েছে কিন্তু। লাল রং হোলে বলে,—নিশাচরী-রূপ। কালো হলে মন্তব্য করে, এ যে সাক্ষাৎ রক্ষাকালী সাজলে। শর্মিলা জবাব দেয় না। মুখ টিপে হাসে। কথাটা আংশিক ভাবেও সত্যি নয়। হ্যাঁ, রূপ আছে শর্মিলার। ঘন লাল আর গভীর কালো দুটোতেই সমান মানায় ওকে। ফর্সা রং, ছিপছিপে গড়ন। কোঁকড়া চুল হাটু পর্য্যন্ত নেমে গেছে। মুখের উপর বাঁ গালের ছোট্ট তিলটি একটি সৌন্দর্য্য বিন্দুর মতই শোভা পায়।

বেহালার কাছে বাড়ী সুশান্তর। ফ্ল্যাট বা ভাড়া বাড়ী নয়। নিজেদের বাড়ী। ওর বাবা করিয়েছিলেন তাঁর কর্মজীবনে। এখন দোতালায় থাকে ওরা। নীচের তলায় ভাড়াটেরা থাকে। কি একটা সদাগরী অফিসে কাজ সুশান্তর। ডালহৌসী অঞ্চলে অফিস।

শর্মিলার কাজ শুধু গিন্নিপণা, তাই বলে শুধু রান্না-বান্না করেই ক্ষান্ত নয় সে। দোতলার খোলা ছাদে সুন্দর বাগান রচনা করেছে। ছোটবড মাঝারী টবে বসানো ফুলগাছ—ব্ল্যাকপ্রিন্স থেকে শীতের মরসুমী ফুল, কিছুই বাদ নেই। দোপাটি, গাঁদা আর বেলফুল। কত কি যে ফোটে। ওদের সুবাসে স্বল্প আয়তন ছাদটা যেন 'ম' 'ম' করে। ওরই মধ্যে চেয়ার পাতা আছে দুখানা। ছোট্ট একটি তেপায়া টেবিল। অফিস থেকে সুশান্ত এলে চা খায় ওরা।

শর্মিলা বলে,—'দেখেছ ডালিয়াগুলো, কি বড় বড় হয়েছে।'

ঘাড় ঝুঁকিয়ে সুশান্ত দেখে। সারাদিনের ক্লান্তিকর অফিস কাটিয়ে পরিবেশটা বড় সুন্দর লাগে। শীতের বেলা সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে আর দেরী নেই। আকাশে তারা ফুটে উঠবে এবার। হয়ত চাঁদ উঠবে একফালি।

—'তোমার ঐ আসমানী রঙের ফুলগুলো ভারী সুন্দর লাগে আমার'—সুশান্ত বলে।

—'তাতো লাগবেই। ফিকে রঙের ফুল কিনা। তোমার চোখে তো সুন্দর মনে হবেই—

সুশান্ত চোখ তুলে তাকাল এবার। শর্মিলার দিকে। উজ্জ্বল লাল রঙের একখানা শাড়ী পরেছে শর্মিলা। কপালে লাল টিপ। গায়ের ব্লাউজটাও লাল। সদ্য প্রসাধনের পর খানিকটা সিঁদুর দিয়েছে সীমন্তে।

'কি যে বলো', সুশান্ত হাসবার চেষ্টা করল। 'কিছু একটা বললেই তুমি সেই পুরানো ব্যাপারটা টেনে আনবে। লাল রং বলে কি, আমি গোলাপ ফুল ভালবাসি না? নাকি তোমাকে?' চোখের কোণে একটা দুর্বোধ্য হাসি সুশান্তর। চিকমিকিয়ে উঠেছে চোখের তারা দুটো। দুষ্টুমির হাসি ঠোঁটের এককোণ থেকে অপরকোণে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা হাত বাড়াল সুশান্ত। বুঝতে পেরে সরে গেল শর্মিলা। মুখ ভার করে বলল,—'যাও, আর সোহাগ দেখাতে হবে না। তুমি যে কী রং ভালবাস, তা আমার আর জানতে বাকী নেই।'

বিয়ের পরই বুঝতে পেরেছিল শর্মিলা। ঘন রং এতটুকু পছন্দ করেনা সুশান্ত। ওর সাদা রঙের ট্রাউজার্স, ফিকে হলুদ রঙের সার্ট, আর হাল্কা সবুজ রঙের টাই দেখে খটকা লেগেছিল। নতুন বউ হয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেনি প্রথমে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে এল ব্যাপারটা। বিয়ের পরের মাসেই এক শাড়ী এনে হাজির করল সুশান্ত। হয়ত নতুন বউকে খুশী করার ইচ্ছে ছিল মনে। কিন্তু শাড়ী দেখে ঠোঁট উল্টোল শর্মিলা। নতুন বউয়ের মুখে এক ঝলক আলোর বদলে কালো মেঘের ছায়া ভেসে এল।

সুশান্ত বলল,—'কি ব্যাপার? কাপড়টা পছন্দ হয়নি তোমার?'—

—'কাপড়টা তো বেশ ভালই। জমিটা পাতলা আর ঠাস বুনুনি। শুধু রংটাই—

—রংটা? বেশ সুন্দর তো। কচি কলাপাতার রং ভাল লাগে না তোমার?'—

—'একটুও না।' ঠোঁট উল্টে জবাব দিল শর্মিলা। একটু থেমে বলল,—'এত রং থাকতে এই সব ফিকে রং কেন পছন্দ তোমার? গাঢ় রং ভালবাস না?'

—'কেন ফিকে রঙে আপত্তি কিসের? কি সুন্দর তোমাকে মানাবে এতে'—

—'ছাই'—মুখখানা পাংশু করে বলল শর্মিলা, 'আসলে ঘন রং একটুও ভালবাস না তুমি। কাল যে বেড়াতে যাবার সময় নীল শাড়ীটা পরেছিলাম, তোমার বুঝি পছন্দ হয়নি'—

—'কেন হবেনা? নীলাম্বরী অপছন্দ করতে পারি কখনো?'—

—'থাক থাক। নীলশাড়ীর আর প্রশস্তি গাইতে হবে না'—

সে শাড়ী শর্মিলা নিজে গিয়ে ফেরৎ দিতে এসেছিল দোকানে। সুশান্ত পিছু পিছু গিয়েছিল তার। দোকানে গিয়ে একরাশ কাপড় থেকে ঘন লাল রঙের একটা শাড়ী বেছে নিয়েছিল সে। সুশান্ত আপত্তি করেনি। নিজের মতে খাও; আর অন্যের রুচিমত সাজো। এটি প্রবাদবাক্য শুধু। মেয়েদের বেলায় খাটে না।

ইতিমধ্যে শর্মিলার এক বন্ধুর বাবা এসে বাসা নিলেন ওদের পাড়ায়। স্কুল পড়তে মালতীর সঙ্গে খুব মাখামাখি হয়েছিল। তখন মফঃস্বলে থাকত শর্মিলা। ওর বাবার সঙ্গে গাধাবোটের মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হত ওদের। বর্ধমান থেকে বসিরহাট, কুচবিহার থেকে মালদহ, কত জায়গাতেই না ঘুরেছে। মালদহ হতেই আলাপ মালতীর সঙ্গে। বারলো গার্লস স্কুলের ভাল ছাত্রী ছিল মালতী। শুধু পড়াশুনোতেই নয়, কথাবার্তা চলনে বলনেও চৌকস—। প্রতি বছর প্রাইজ পেত দুহাত ভর্তি। শর্মিলার সঙ্গে বড় ভাব ছিল ওর। কানায় কানায় ভরে ওঠা ভরানদীর মত দুকূলপ্লাবী ভালবাসা।

প্রথমটা বুঝতে পারেনি শর্মিলা। রাস্তার ওপারের তেতলাবাড়ীর ছাদে কে একটি মেয়ে বেড়াচ্ছে। যেন অল্প অল্প চেনা। পুরনো গানের কলির মত। সুর মনে আসে, কিন্তু কথাগুলির ঠিক হদিশ পায় না।

অন্য একদিন। রাস্তার বাসষ্টপে দাঁড়িয়েছিল মালতী। হাতে বই আর ঝোলানো হাতব্যাগ। বোধহয় পড়াশুনো করে। কলেজ কিংবা লাইব্রেরী যাবার জন্য প্রস্তুত। চাকর পাঠিয়ে ওকে ডেকেছিল শর্মিলা, অবাক মালতীও। মুখে কথা সরেনি অনেকক্ষণ—

—'কিরে তুই? একেবারে বউ সেজে বসে আছিস যে'—

—শর্মিলা ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, 'বিয়ে করলে

মেয়েরা তো বৌ হয়। তুই নতুন কি বললি'—

—'ইস্ কতদিন পরে দেখা তোর সঙ্গে' মালতী ওকে জড়িয়ে ধরল।

—'তোকে দেখেছি ভাই ছাদে। কিন্তু ডাকতে সাহস পাইনি। কি জানি, হয়ত ভুল আমার—

—'কতদিন বিয়ে হল তোর? ভদ্রলোক কইরে?'—

—'এখনও এক বছর হয়নি। আর ভদ্রলোককে পাবি কোথায় এখন? বউয়ের আঁচলধরা হলে না হয় সারাদিন ঘরেই থাকত। তেমন তো নয়। তার আফিস নেই?'—

শর্মিলা একটা কটাক্ষ করল।

মালতী হেসে বলল, 'বারে, বেশ কথা বলতে শিখেছিস তো? তখন তো মুখ ফুটত না।'—

—'চিরকাল বুঝি একরকম যায়?'

হঠাৎ ছোট্ট একটু হেসে মালতী প্রশ্ন করল, 'তারপর, তোর সেই অশোকদার কি খবর রে? অশোক দত্ত, যিনি তোকে পড়াতেন।'

একটা চকিত কালো ছায়া ভেসে গেল শর্মিলার মুখের উপর। সে ভাব কাটিয়ে নিয়ে বলল শর্মিলা—কি জানি। এতদিন কি আর মনে করে রেখেছি?'—

—'তা ঠিক, কতদিন তো হল। আর চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল। কিন্তু সেই গাঢ় রংটা তো ছাড়তে পারিসনি। তোর অশোকদা বলত না? তোকে 'ডিপ্' রং ভিন্ন মানায় না। সেটা তো ভুলিস নি'—

মালতীর চোখটা একবার বুলিয়ে গেল সমস্ত ঘরটার মধ্যে। জানালায় গাঢ় লাল রঙের পাতলা পর্দা। বিছানায় নীল রঙের চাদর। আলনায় নানা রঙের শাড়ী, কিন্তু সব কটিরই রং গাঢ়। লাল, নীল বা মেরুণ বর্ণ। টেবিলের উপর ফুলদানীতে শোভা পাচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। তারও রঙ ঘন।

—'ছেড়ে দে ওসব কথা। শর্মিলা চাপা দিল প্রসঙ্গটা, হেসে বলল,—'আসিস না একদিন বিকেলে। ওর সঙ্গে আলাপ করবি—'

—'নিশ্চয়,' মালতী সোৎসাহে জবাব দিল।

দু একদিন পর। সন্ধ্যের সময় ছাদে বসে গল্প করছিল শর্মিলা। সুশান্ত একটা চেয়ারে বসে রিং করছিল সিগারেটের ধোঁয়ায়! মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো জবাব দিচ্ছিল শর্মিলার কথায়। আকাশে তারা ফুটেছে অল্প কয়েকটি। শীত আর নেই বললেই চলে। গাঢ় লাল, আর খয়েরী রঙের মরসুমী ফুল ফুটেছে টবের গাছে।

—'আসতে পারি?" দরজার কাছে মেয়েলী গলায় কে যেন ডাকল।

কাছে গিয়ে শর্মিলা অবাক।—'ওমা তুই!. আমি ভাবলাম কে এল আবার।—

—'বিরক্ত হলি ত?'

—'দূর। আয় আয়।' শর্মিলা ওকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এল।

—'তোমাকে বলেছি না এর কথা। নতুন এসেছে এ পাড়ায়। মালদহে একক্লাসে পড়তাম আমরা। ভীষণ ভালো পড়াশুনোয়। এম, এ, পড়ছে এ বছর'—শর্মিলা এক নিঃশ্বাসে বলল কথা কটি।

সুশান্ত মুখ তুলে চাইল। নমস্কার করে বলল,—'ভারী আনন্দ হল আপনার সঙ্গে আলাপ করে। কি সাবজেক্টে পড়ছেন?'

—'বাংলায়। ও কিছু নয়। শর্মিলা বড্ড বাড়িয়ে বলছে। একমাস হল এসেছি এ পাড়ায়, কিন্তু শর্মিলার সঙ্গে দেখা হল মাত্র তিনদিন আগে।' মেয়েটি হাসল। সুশান্ত চেয়ে দেখল আবার। শর্মিলার মত সুন্দরী নয়। শ্যামবর্ণ পাতলা পাতলা গড়ন। মাথার চুল বিনুনী করে ঝোলানো পিঠের দুপাশে। পরণে হাল্কা হলুদ রঙের শাড়ী।

ছাদে বসে গল্প গুজব শুরু করল ওরা। পুরাতন নূতন আর ভবিষ্যতের মিশ্র কাহিনী।

কোথাকার কোন পেটা ঘড়িতে নটা বাজল। মালতী বলল,—'ইস্ বড্ড দেরী হয়ে গেল। আজ উঠি, কেমন?'

শর্মিলা বলল, 'আবার আসবি কিন্তু।'

—'আসবো নিশ্চয়। কিন্তু তুই যাবি না?'—

শর্মিলা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। মালতী চলে গেল। একটা নিঃস্তব্ধতা, কয়েকটি মৌনমুহূর্ত গড়িয়ে পড়ল।

সুশান্ত বলল,—'তোমার বন্ধুটি বেশ কথা বলতে পারে। খুব চটপটে কিন্তু'—

—'খুব। মালদহে ডিবেট করত। কত প্রাইজ পেয়েছে।'

সুশান্ত হাসল।

বেশ কিছুদিন কেটেছে। ইতিমধ্যে অনেকবার এসেছে মালতী। কয়েকবার গিয়েছে শর্মিলা, কখনো একা একা, কখনো সুশান্তকে নিয়ে। নিজেদের বাড়ীর ছাদে গোল হয়ে বসেছে। গল্প করেছে, হেসেছে আবার তাল মিলিয়ে তর্ক করেছে। কখনো বিপক্ষে ওরা দুজনে, সুশান্ত একা। কখনো শর্মিলা নিস্পৃহ। তর্ক করেছে ওরা দুজনেই—

মাস দুই পর।

অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরছিল সুশান্ত। নিউমার্কেটে একবার যাওয়া প্রয়োজন। আজকের দিনটির একটি বিশেষ অর্থ আছে ওর আর শর্মিলার জীবনে। দিনটি ওদের বিয়ের তারিখ। প্রথম বিবাহ বার্ষিকী। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুশান্ত ভাবছিল। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ওর কাঁধে হাত রাখল।

মুখ ফেরাতেই চিনতে পারল সুশান্ত। ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের অশেষ সরকার। কিন্তু কি মোটা হয়েছে অশেষ। গোলগাল মুখ আর দশাসই চেহারা। এই ক'বছরেই যেন আগাগোড়া পাল্টে গেছে মানুষটা।

অশেষ ওকে টেনে নিয়ে গেল একটা রেস্তরায়। বলল 'কিরে সুশান্ত, কেমন আছিস ?'

—'ভালো, তুই ?—

—'কেটে যাচ্ছে একরকম। বেথা করেছিস ?'

হাসল সুশান্ত। বলল,—'তুই করেছিস ?'

কথা শুনে হো হো করে হাসল অশেষ। 'করেছি মানে ? দুটি ছেলেমেয়ের বাবা হয়ে বসে আছি। নে তোর কথা বল'—

—'বিয়ে তো করেছি। কিন্তু শুধু পতি, পিতা হওয়া পর্য্যন্ত হতে আর পারিনি'—সুশান্ত রসিকতা করল।

—'হবে হবে। ক্রমে ক্রমে সবই হবে। তারপর তোর অফিসটা কোথায় ? —

ডালহৌসীর একটা অফিসের নাম করল সুশান্ত। বয় এসে চা দিল। ধুমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুশান্ত বলল,—'আর কারো সংগে দেখা হয় ?'

—'হয় মাঝে মাঝে। তারপর, তোর সেই নিভা সান্যালের খবর কি ? যাকে সবুজপরী নাম দিয়েছিলি।'

—'নিভা সান্যালের খবর আমি কি করে জানব ?' একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল সুশান্ত।

—'তা নয়। তবে কলেজে পড়তে তোর সঙ্গে তো বেশ আলাপ জমেছিল।'—

—'কলেজের আলাপ কলেজেই শেষ, কলেজের বৃত্ত ছাড়িয়ে খুব কম জীবনেই তা বাইরে আসে। কে জানে কোথায় এখন নিভা সান্যাল। হয়ত সিঁদুর পরে সংসার করছে।'—সুশান্ত আস্তে আস্তে বলল কথা কটি।

—'কিরে, কেন উদাসীন এত ? একদিন তো ওর হাল্কা রঙের শাড়ীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলি'—

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সুশান্ত উঠল বলল,—আজ কাজ আছে অশেষ। তুই একদিন আয়-না আমার অফিসে।'

—'সময় কই তেমন ? আচ্ছা পারি তো আসব।'—

অশেষ বিদায় নিল।

সুশান্ত হেঁটে চলল নিউমার্কেটের দিকে একটা শাড়ী কিনবে শর্মিলার জন্য। কিন্তু মনের মধ্যে শর্মিলার মুখটা আড়াল পড়ে গেছে কোথাও। উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে অন্য একটি মুখ। নিভা সান্যাল। বি, এ, ক্লাসে সুশান্তর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার। হাল্কা রঙের শাড়ী আর জামা পরে আসত মেয়েটি। সুশান্তর চোখে ভালো লেগেছিল। আজ এখন নিভা সান্যালকে মনে পড়ছে। শর্মিলাকে নয়।

দোকানে ঢুকে একটা শাড়ী নিল সুশান্ত। বেশ কিছু টাকা লাগল। কিন্তু কাপড়খানা সুন্দর। হাল্কা সবুজ রং, পাড়ের কাছে জরির কাজ। গা ভর্তি ছোট ছোট বুটী। শর্মিলার নিশ্চয় পছন্দ হবে সুশান্ত ভাবল। অবিশ্যি রংটা ফিকে। কিন্তু কিছুতেই গাঢ় রঙের কোন শাড়ী পছন্দ হল না সুশান্তর। সবুজ শাড়ীখানায় নিভা সান্যালকে কেমন মানাত ? প্রশ্নটা একবার উঁকি দিয়ে গেল সুশান্তর মনে।

রাতে মালতী এসে অবাক। আজকের দিনটিতে সেই একমাত্র অতিথি। শর্মিলা ওকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিল। কিন্তু চারদিক অদ্ভুত স্তব্ধ। কোথায় গেল

সবাই ? এত চুপচাপ কেন ওরা ? আলো জলছে না কেন বাড়ীতে ?—

খুঁজে খুঁজে শর্মিলাকে বের করল মালতী। খাটের উপর শুয়ে আছে। একটা আধময়লা শাড়ী পরণে। বিকেলে চুল বাঁধেনি। প্রসাধন করেনি। নিশ্চয় গা ধোয় নি।

—'কিরে, এমন করে শুয়ে আছিস যে? সুশান্তবাবু কই ?'

ওকে দেখে উঠে বসল শর্মিলা। ঠোটের কোণে হাসি আনল। বলল,—'আয় বোস। তোর সুশান্তবাবু নেই। রাগ করে বেড়াতে বেরিয়েছেন ভদ্রলোক। বোস না, এক্ষুণি আসবে—

অন্য কিছু নয়। দাম্পত্য কলহ। সেই হাল্কা সবুজ রঙের শাড়ীখানাই যত নষ্টের মূল। প্রথমে উল্লসিত হয়েছিল শর্মিলা। বিয়ের তারিখে শাড়ী উপহার এনেছে দেখে। কিন্তু রং দেখেই মাথা খারাপ। শাড়ীখানা ছুঁড়ে ফেলেছে রাগে—

মালতী বলল,—'এ তোর বাড়াবাড়ি। আজকের দিনটায় রাগ না করলেই পারতিস। আর আচ্ছা মেয়ে তুই—। মন বদল করতে পেরেছিস আর রং বদল করতে পারিস না ?—

অনেকরাতে বাড়ী ফিরল সুশান্ত। মালতী আগেই চলে গেছে। সেই রকম চুপচাপ আর নিস্তব্ধ পরিবেশ। কোনো কথা বলল না সুশান্ত। ছাদের আলসেয় হাত রেখে দাঁড়াল চুপ করে।

ঘরের মধ্যে দুটি পায়ের লঘুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সুশান্ত জানে শর্মিলা আসছে ছাদে।

চৈত্রের শেষ। বসন্ত অতিক্রান্ত, গ্রীষ্ম প্রায় এসে গেছে। ওরা জানে এখুনি আবার আলো জ্বলবে ছাদে। আলো জ্বলবে ওদের মনে। ওরা কথা বলবে, জ্যোৎস্নারাতে মশগুল হয়ে গল্প করবে। আগের সবকিছু ভুলে যাবে, বিস্মৃত হবে।

শুধু ওই রঙটুকু। প্রথম পরিচয়ের সবকিছু চুকে গেছে। রংটুকু সম্বল। ও রং বদলায় না, মোছে না। কোনদিন বিবর্ণ হয় না।

আমি মন করলেই

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

এই আলো এই গান—আরো কিছু কান্নার মাঝে
নিরুদ্বেগ শৈবাল স্বপ্নেরা
খেলা করে মাটির আরামে
আমি চোখ মেললেই,
চোখ মেললেই।
অবাক আলোর বেদনার সেতু ভেঙ্গে
শত শত প্রস্তুতির খবর আসে।
নিবিড় আগ্রহের সমারোহে
প্রাণের স্বপ্নেরা উচ্ছল আরামে—লুটোপুটি খায়
আমি মন করলেই,
মন করলেই।
তেপান্তরে ব্যঙ্গমা দুটো সুখ দুঃখের কথা জানায়
রাজকুমারকে
রোদ দেখি আমি চোখ মেললেই, শুধু মন করলেই।

গান

(মিশ্র বেহাগ)

তাল ঃ ত্রিতাল

কী দিয়ে তোমায় পূজিব হে প্রভু
আমার বলিতে কিছু নাই।
তোমারে সাজাতে বল বল প্রভু
ভূষণ খুঁজিয়া কোথা পাই ॥
ফুল, ফল যত পূজা-উপচার,
কিছু নয় মোর, সকলি তোমার,
তোমারি সে-দান আমার বলিয়া
দেবো, কেমনে তোমারে বল তাই ॥

নিজেরে সঁপিব চরণে তোমার
সেও তো আমার ওগো নয়;
সব-ই যদি তুমি হে বিশ্বরূপ
হোক তবে হৃদি তুমিময়।
তবে, তোমারি পূজা তুমি আপনি কর,
আরতির দীপ হাতে তুলিয়া ধর,
হৃদি মন্দিরে সে মহা পূজার
প্রসাদ পেতে যে আমি চাই ॥

কথা ও সুর ঃ রামকৃষ্ণ চন্দ

স্বরলিপি ঃ সেবা বন্দ্যোপাধ্যায়

II সা গা গা মা | পা না -া -া | না র্সা র্সা র্সা | র্সনা -া ধনর্সনা ধপঙ্কাগা |
কী দি য়ে তো মা ০ ০ য় পূ জি ব হে প্র ০ ০০০০ ভু০০০
০ ১ ২´ ৩

*I গঙ্কা গা ধা পা | ঙ্কা গা গা মা | গা -া -া -া | -া -া -া -া *II
আ০ মা র্ ব লি তে কি ছু না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ১ ২´ ৩

II -া সগা ঋা গরা | ন্া ঋসা ন্া ধ্া | ধ্া ন্া সা স্া | সগা -া গা -া |
০ তোমা রে সা০ জা ০০ তে ০ ব ল ব ল প্র ০ ভু
০ ১ ২´ ৩

I সা গা -া গা | গা মা পা না | ধনা র্রসা -া ধনা | -া -া ধপা হ্মগা | *······*
তৃ ষ ণ খুঁ জি য়া কো থা পা॰ ০.০ ০ ০০ ০ ০. ০০০ই
০ ১ ২´ ৩

II {গা মা পা -া | না -া না ধা | না না র্সা না | র্সা -া -া -া |
ফু ল ফ ল্ য ০ ত ০ পূ জা উ প চা ০ ০ ০
০ ১ ২´ ৩

I র্সা র্গা র্গা -া | র্রর্গর্মা -া -া র্গর্রা | র্রর্গা র্রর্গা র্গর্রা র্সনা | র্সা -া -া -া} |
কি ছু ন য় মো॰॰ ০ ০ র্॰ স ০ ক ০ লি॰ তো০ মা ০ ০ র্
০ ১ ২´ ৩

I{ -া ননা না র্সা | ধনা র্রর্সা -া পা | পধা পধা -া পা | (মা -া গা -া)} | মা মা গা গা
০ তোমা রি সে দা ০ ০ ০ ন আ০ মা০ র্ ব লি ০ য়া ০ লি য়া দে ব
০ ১ ২ ৩

I -া সগা গা গা | গা গা হ্মা ধা | পা -া -া হ্মা | গা মা গা রসা | *······*
০ কেম নে তো মা রে ব ল তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই॰
০ ১ ২´ ৩

II -া সরা না সা | সরা -া রা -া | -া সরা গা মা | গমা রগা -া -া |
০ নিজে রে সঁ পি॰ ০ ব ০ ০ চর ণে তো মা॰ ০০ ০ র্
০ ১ ২´ ৩

I রা পা পা পা | পা পহ্মা হ্মাধা | পা -া -া -া | -া -া -া -া |
সে ও তো আ মা ০ র্ ওগো ন ০ ০ ০ ০ ০ ০য়্
০ ১ ২´ ৩

I{ হ্মা ধপা গা মা | ধা -া ধা -া | পা পধা নর্সা ধনা | না -া -া ধপা |
স বি॰ য দি তু ০ মি ০ হে বি॰ ০০ শ্ব॰ ভূ ০ ০ প্॰
১ ২´ ৩

I হ্মা ধা পা পা | মা গা সনা রা | সা -া -া -া | ।। (।।)} | পা পা
হো ক্ ত বে হৃ দি তু॰ মি ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় ত বে
১ ২´ ৩

I গা মা পা পা | না -া না না | -া ননা র্সা না | র্সা -া র্সা র্সা |
তো মা রি পূ জা ০ তু মি ০ আপ নি ক র ০ প্র ভু
০ ১ ২´ ৩

I -া র্সর্গা র্গা র্গর্রা | র্রর্গর্মা -া র্মা র্মর্গর্রা | -া র্রর্গা র্রর্গা র্গর্রর্সা | র্রর্সা -া -া -া |
০ আর তি র০ দী॰প ০ হা তে॰॰ ০ তুলি য়া॰ ধ০০ রো॰ ০০ ০
০ ১ ২´ ৩

I না না না র্সা | নর্সা র্রর্সা র্সা পা | পধা পধা পা মা | গা -া -া -া |
হৃ দি ম ন্ দি॰ ০ ০ ০ রে ০ সে॰ ম॰ হা পূ জা ০ ০ র্
০ ১ ২´ ৩

I সগা গা গা গা | গা গা হ্মা ধা | পা -া -া হ্মা | গা গমা গা রসা :I II
প্র০ সা দ পে তে যে আ মি চা ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ই০
০ ১ ২´ ৩

মল্লরাজত্বে সঙ্গীতের সৃষ্টি ও প্রচার

শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্গীতাচার্য্য)

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের রাজসভায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে যে সময় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিপুল চর্চা হয়েছিল তার প্রভাব শক্তিতে প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামেও এনে দিয়েছিল মানুষের প্রাণে সঙ্গীতের মাদকতা।

তাই বাল্যকালে দেখেছি গ্রামে গ্রামে তানপুরা পাখোওয়াজ নিয়ে শ্রেষ্ঠসঙ্গীত ধ্রুপদ গানের চর্চা। সে সময় বিবাহাদি ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মে অনুষ্ঠিত হত ধ্রুপদাদি গানের আসর। উপস্থিত হতেন গ্রাম গ্রামান্তর হতে যাঁরা বড় গায়ক তাঁরাও। সাধারণ আসরেও অন্ততঃ দু-চারজন গায়ক বাদক ধ্রুপদ সঙ্গীতে আসর মাতিয়ে রাখতেন। বুঝতে না পারা শ্রোতারাও আগ্রহ নিয়ে শুনতেন বিষয়বস্তুর শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়ে।

এখন তাই মনে হয়, তখনকার মানুষ দর বড় বস্তুর প্রতি কি সুন্দর শ্রদ্ধা ছিল। শুধু তাই নয়, তাকে অনুসরণ করে চলার জন্যও একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা তাঁরা রাখতেন।

যে সকল গ্রামে তখন যাত্রার দল ছিল তাতে সঙ্গীতের বিরাট অংশ থাকত এবং গানগুলো গাওয়া হতো প্রকৃত সাধনার সম্পদ নিয়ে। জুড়িরা গাইতেন ধ্রুপদ পদ্ধতিরই গান। আর কম বয়স্কদের গানগুলোয় থাকত কীর্ত্তনেরই সুর নানান প্রকাশভঙ্গী নিয়ে এবং এক একটা গান তারা গাইত অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যেকে ছাড়্ ধর্‌তাইএর দ্বারা তান বিস্তার দেখিয়ে। এদের গানে কীর্ত্তনের সুরের সংগে রাগ সঙ্গীতের খাঁটি সুরেরও মিশ্রণ ছিল। ঝিঁঝিট,খাম্বাজ, সিন্ধু, আলাইয়া, বিভাস এই রাগগুলোই বিশেষভাবে ওই গানে আকর্ষিত হয়েছিল।

যাত্রার গানেও দস্তুর মত কণ্ঠ সাধনা, শিক্ষা ও তালিম নিতে হত। আমি দেখেছি খানিকটা রাত থাকতে শিক্ষককে ছেলেদের গলা সাধাতে। ছেলেরা সে সময় আনন্দে ও উৎসাহ নিয়ে ঘুম থেকে উঠে আসত। শিক্ষকেরও তালিম দেবার অদ্ভুত নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দেখেছি।

সে যুগে ধর্ম্মীয় আবহাওয়ার গুণে সকল মানুষই যেন প্রধান সাধনার বস্তুকে সংস্কার ও স্বভাব শক্তিতেই গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাই গান বাজনা শিক্ষার্থীদেরও সঙ্গীতের মর্য্যাদা ও মূল্যমান বোধহয় একমাত্র কামনা ছিল। আর ছিল কীর্ত্তন গান গাওয়ার মধ্যে প্রেমভাব ও রস-লালিত্যের প্রচার বাসনা।

এই সমস্ত গান শুনে শুনে অতি সাধারণ শ্রেণীর লোকেরাও অল্প বিস্তর গাইতে শিখেছিল। এইরূপভাবে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সঙ্গীতের আনন্দময় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে অন্তরকে সর্বদা আনন্দিত ও হৃদয়ানুগ নানান গুণসমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

ছন্দতালের দুরূহ সাধনার প্রকাশ প্রতীক পাখোওয়াজ-বাদ্য সাধারণ জনমনেও এত আনন্দদোলা জাগিয়েছিল যে তার আকর্ষণের প্রমাণ খোল, ঢোল, ঢোলক, মাদোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রে বিশেষরূপে পাওয়া যায়। বিস্ময় আনিয়ে দেয় যখন শুনি, না শেখা মানুষের হাতে ওই সব যন্ত্রে নানান তালের সুন্দর সুন্দর বোল, পরম ও অদ্ভুত অদ্ভুত তেহাইসমূহ। সঙ্গতের মাধ্যমে যে বস্তুগুলো উৎপন্ন করতে এখনকার দিনে শিক্ষার্থীদের বহুদিন ধরে শিক্ষা ও সাধনা করতে হয় সেগুলো এদের ধারাবাহিক সংস্কারে স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে আসছে।

মল্লভূমে যন্ত্র-সঙ্গীতের মধ্যে তাউসের প্রচলন এত বেশী হয়েছিল যে ওস্তাদ মহল ছাড়াও ঐ যন্ত্র যাত্রায়, রামায়ণ-গানে ও কীর্ত্তনাদিতে এবং ঢুলি-ডোমদের ব্যবসায় বিশেষ-ভাবে প্রবেশ করেছিল। এই যন্ত্রটি রাগরূপ প্রকাশের উৎকর্ষতার জন্য যে অবয়ব নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এখন তার সে রূপাবয়ব এক রকম উঠেই গেছে। যন্ত্রটি দেখতে ঠিক ময়ূরের আকৃতির মত ছিল, তাই তার উর্দু নাম 'তাউস্'।

ওর থেকেই সহজ গঠন নিয়ে তৈরি হয় 'এসরাজ' যন্ত্র। এ-ও এখন প্রায় সঙ্গীত-গোষ্ঠী ছাড়া হতে বসেছে। অথচ এই বাদ্যের সঙ্গীত-প্রকাশক শক্তি যে কত উচ্চে—তা যাঁরা উঁচু দরের শিল্পীর কাছে শুনেছেন তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

মল্লভূমের ডোমেদের তাউস বাদনের সঙ্গে তাল সঙ্গতের এক আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেছি। গৎ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতকার প্রথমতঃ একটা খঞ্জনী নিয়ে সুরু করলেন সঙ্গত করতে, ক্রমশঃ দুটো, তিনটে এই রকমভাবে সাত, আটটা পর্য্যন্ত খঞ্জনী নিয়ে বাজতে লাগল তালে তালে ছন্দে ছন্দে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর আঘাত দিয়ে এবং লুফোলুফির দ্বারা। যেন এক ম্যাজিকের মত বস্তু সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়ে অবাক করে দিতে থাকে। এখনও এরূপ কৃতি সঙ্গতকার দু'একজন আছেন। যে সব ক্রিয়া অনুষ্ঠানে এই সব কৃতিরা উপস্থিত হয়ে তাঁদের কৃতিত্ব দেখিয়ে যেতেন এবং পেতেন উৎসাহ ও অর্থ, এখন আর সে সব নাই। সব জায়গাতেই মাইক এসে গেছে। গ্রামীণ শিল্পীদের বংশ ক্রমশই লোপ পেয়ে গেল।

মল্লভূমের যে অঞ্চলে ডোমদের প্রধান সঙ্গীত গোষ্ঠী ছিল, বিষ্ণুপুর হতে তার দূরত্ব ছিল আট মাইল, গ্রামের নাম জরপুর। এখানের মনোমোহন ডোম্ বেহালা বাজাত রাগ রূপ রচনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়ে। সকাল বেলা ও রাত্রে বেহালায় তার হাতে বিভাস ও সিন্ধু রাগ শুনে অতিশয় আনন্দ পেয়েছিলাম। ছড়ের এমন ঘোরাল ও মধুর টান প্রায় শুনা যায় না। ঐ রাগ দুটিতে যেন সে সিদ্ধ ছিল। ঐখানের হরি ডোমের সানাই সুমিষ্ট স্বর তুলে রাগ বিস্তার, তাল ও ছন্দের খেলা দেখিয়ে লোককে মুগ্ধ করত। অথচ আশ্চর্য্য, শুনে শুনেই এরা সব কিছু আয়ত্ব করে নিয়েছিল। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, মল্লভূমের সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন সে সময় রাগসঙ্গীতময় হয়ে উঠেছিল এবং মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়ে ধরা দিয়েছিল তার মহিমা ও কৃষ্টি।

মল্লরাজাদের সময় নর্ত্তকী ও বাঈজী সৃষ্টিও বড় কম হয়নি। শুধু বাঈজীরাই নয়, নর্ত্তকীরাও উচ্চাঙ্গ সংগীতের সব শ্রেণীর গানই ভাল গাইতে পারত। বৃদ্ধা ভৈরবী বাঈজীর গান শুনে মন খুব তারিফ্ করেছিল। রাজত্ব পতনের শেষ অবস্থার সময় থেকে এদেরও শোচনীয় অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় এবং ক্রমশঃ বাঈজীগোষ্ঠী লোপ পেয়ে যায়। বৃদ্ধাবস্থায় লক্ষ্মীবাঈজীকে ভিক্ষা করে দিন যাপন করতে হয়েছে। বাড়ীতে যখন আসত তখন একমুঠো চালের আশায় টপ্পা গান শুনাত। শোরী মিঁয়ার টপ্পাগুলো এমন গাইত যে এখনও মনে হলে ভাবি—তারা কত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে শিক্ষা ও সাধনা করেছিল। এঁদের কণ্ঠ যেমন ছিল বলিষ্ঠ তেমনি ছিল রসাল। টপ্পার তানগুলো যেন ঢেউএর মত ফুলে ফুলে দুলে দুলে সমের তটে আছড়ে পড়ত। বহুকাল সাধনা না করলে গাওয়ার এরূপ কৃতিত্ব অর্জন হয় না। এমন সাধিকাদের পেটের জ্বালায় ভিক্ষা করতে হয়েছিল এ কথা যখনই মনে পড়ে—তখন গভীর দুঃখে ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ি এবং চক্ষু অশ্রুসজল হয়।

যাই হোক্ বহুকাল ধরে মল্লভূমে বহুমুখী ধারায় সঙ্গীতের যে বিরাট ও বিপুল স্রোত বয়ে এসেছে এবং এখনও তার মূলধারা বিস্তৃত বেগেই চলেছে, তার সমতুল্য অন্য কোথাও আর পাওয়া যাবে কিনা বলা খুবই শক্ত।

ধ্রুপদ চর্চার কথায় বলতে পারি আমার সেই বাল্য জীবনে যদি গণনা করা হত, তাহলে নিয়মিত চর্চার ধ্রুপদ-গায়ক শতাধিক এবং সেইসংখ্যক পাখোওয়াজ-বাদক অক্লেশে পাওয়া যেত। তখনকার আসরের শেষের দিকে গায়করা বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ গানের চার অঙ্গের ভাবধারার মাধ্যমে বলিষ্ঠ রূপের খেয়াল গানও দু'চারটে করে গাইতেন। সে গানগুলোর বিস্তৃত রচনাও বিশেষ পাণ্ডিত্য গভীর ভাবপূর্ণ ছিল। ভাবভাষাসমৃদ্ধ এই রকম খেয়াল গান আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহও গাইতেন। বহুকাল ধরে প্রচারিত এইসব গান ক্রমশঃ হিন্দী খেয়ালের মোহচর্চার প্রবল ধাক্কায় একেবারে চাপা পড়ে গেছে। উদ্ধার করবার আর বিশেষ উপায় নেই।

এ দেশে সঙ্গীতের আর একটা দিক যে আছে, সেও বড় সুন্দর ও ভাববিহ্বলতায় পরিপূর্ণ। এই দিকের বিষয়বস্তু গ্রাম্যসঙ্গীতকে নিয়ে। যুগের এবং তারিখের খবর জানি না, তবে এককালিন এবং ক্রমিক ধারায়

গ্রাম্য কবিদের সংখ্যা যে কত সৃষ্টি হয়ে এসেছে এবং কত রকমের শ্রেণীগত গ্রাম্যগীত যে এখনও শুনতে পাওয়া যায় তা দেখে আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইয়াছি। ওই সব কবিদের গানগুলো যখন শুনি, তখন অনেক গানে রচনার ভাবে পাণ্ডিত্যের পরিচয় এনে দেয়। বহু গানের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও তন্ত্রশাস্ত্রের গভীর তথ্য সহজ ভাষায়, সহজ উপাদান ও উদাহরণ দিয়ে রচিত হলেও তার ভাবার্থ গ্রহণ করতে গভীর মনোনিবেশ ও জ্ঞানবোধের দরকার হয়। অথচ এইসব কবিরা যে লেখাপড়ায় তেমন অধিকারী ছিলেন তা শুনা যায়নি। তাই বিস্ময় সহকারে মনে হয়, শাস্ত্রাদি চর্চা ও তার আলোচনা কত বেশী এবং ব্যাপকভাবে হয়েছিল।

তারপর সহজ সরল ভাব দ্বারা যে সমস্ত গান কবিদের রচনা আছে সেগুলো শুনা মাত্র মনকে আলোড়িত ও মুগ্ধবিহ্বল করে দেয়। এখানের গ্রাম্য সঙ্গীতের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের অনেক গানে ঝুমুরের সুরই বেশী পাওয়া যায়। বাকী গানগুলোর মধ্যে কীর্ত্তনের মত সুর ও গ্রাম্যসুরের নানা ধারা নিয়ে এখনও চলে আসছে। ঝুমুর গানে যে সুর শুনতে পাওয়া যায় তাতে বেশ মনে হয় যেন স্থানাঞ্চলের প্রকৃতির স্বভাব থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ভাষার ভাব এবং ওই সুর যেন প্রেমবিরহের প্রকৃত রূপটি দুইএর মধ্যে মিলে এক হয়ে গেছে। শুনা মাত্র মনের ভাববীণার তারগুলোতেও করুণ মধুর সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে এবং চোখ দুটোকে অশ্রু ছল্ ছল্ করে দেয়।

এই অঞ্চলে যে সব গ্রাম আছে তার প্রান্ত সীমার দৃশ্যরূপ বড়ই বৈরাগ্যবিধুর ও উদাস-করুণ। যখন আমি এই সকল স্থানে কোন কোন সময় আগ্রহ নিয়ে দাঁড়াই, তখন সঙ্গীতেরও একটি অপরূপ মূর্ত্তি যেন ভাবের মনে ফুটে উঠে। অনুভবে তার স্বরূপকে মনে হয় যেন শ্রেয়ঃবস্তুকে পাবার আকুলতায় অদৃশ্য কোন চির-উদাসী ব্যাকুলপ্রেমিকের করুণ কণ্ঠ বায়ুহিল্লোলে ভেসে বেড়াচ্ছে পশ্চাতের বনানী এবং প্রান্তরের স্থানে স্থানে। দীর্ঘদেহ তরুরা বংশপরম্পরা সেই সঙ্গীত নিঝুম বিস্ময়ে ঊর্দ্ধে তাকিয়ে যুগের পর যুগ শুনে যাচ্ছে। মন আমার আকুল হয়ে ব্যাকুলভাবে খুঁজতে থাকে সেই সঙ্গীতকে ধরবার জন্য। কিন্তু তা কি সম্ভব?

যাই হোক—আমরা যদি সঙ্গীত সাধনার প্রথম স্তর থেকেই তাকে প্রকৃতরূপে লাভ করবার জন্য নিষ্ঠা, ভক্তি, ভালবাসা ও প্রেম দিয়ে একাগ্রতায় অগ্রসর হতে চেষ্টা করি এবং তাঁর মূর্ত্তিকে হৃদয়ে সর্বদা বসিয়ে রাখতে পারি তাহলে সব রূপকেই একদিন প্রত্যক্ষ করতে পারব। এই প্রকৃত পথে গেলে নাম, ডাক, উপাধি ও প্রতিষ্ঠার লালসা ইত্যাদি কিছুই থাকে না এবং কেউ সাহসও করে না দিতে। এইভাব দেখেছি আগে অনেক সঙ্গীত-সাধকের মধ্যে।

পরিশেষে আমার বিশেষ বক্তব্য, আমাদের দেশে বহুপ্রকারের পল্লীগীতসকল এখনও যাঁরা রক্ষা করে আছেন তাঁদের কাছ থেকে সেই সব গানের সমস্ত বিষয় যত্ন করে রাখার আবশ্যকতা খুবই আছে, মনে করি। নচেৎ এইসব সংগীতের একটী অপূর্ব ভাবরাজ্য একেবারেই লোপ পেয়ে যাবে।

নতুন বাড়ী

জয়শ্রী চক্রবর্তী
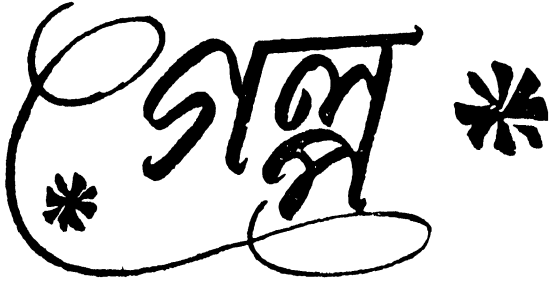
বাড়ীটা সুতপার মনের মতন।

বাড়ীর চারদিকের—চার দু'গুণে আটখানা ঘর, একটী চতুষ্কোণ উঠোনকে ঘিরে, প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। ঘরগুলো বড় নয়। মাঝারি সাইজের। সুন্দর, সুদৃশ্য! জানালাগুলো বড়। দরজাগুলো আরও বড়। আলো-বাতাসের অভাব নেই। প্রশস্ত খোলামেলা চারপাশ। বেশ স্নিগ্ধকর পরিবেশ।

রাস্তার সামনেই সুতপার ঘর। বড় রাস্তা না হলেও যানবাহনের চলাচল নিতান্ত কম নয়। হরেকরকম লোকজনের যাতায়াত। বিভিন্ন লোকের কোলাহল! সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত, ফেরিওলাদের চিৎকার। সব মিলিয়ে, এখানকার পরিবেশ, খুব অস্থির মুখর। প্রখর ভাব সর্বক্ষণ, গলা উঁচিয়ে থাকে। সুতপার বেশ লাগে।

বাড়ীর মধ্যে বাড়ীওয়ালা ছাড়া আরও দু'ঘর ভাড়াটে। কারো সংগে তার তেমন আলাপ হয়নি। কিন্তু আলাপী, বেজায় পাকা মেয়েটি সেদিন, বিনা অভ্যর্থনায় সুতপার ঘরে এসেছিল। বছর আষ্টেক বয়সের, সুন্দর মেয়েটির চোখে মুখে কৌতুহল। নাম ওর মিনু। এ' কথা সে কথার পর বলছিল—কাল রাত্তিরে বউটার কান্না শুনে বুঝি ভয় পেয়েছিলে। সুতপা অবাক সুরে জবাব দিল—তুমি কি করে জানলে! মিনি চট্ করে উত্তর দিল—"মা মণি, বাবুকে বলছিল, নতুন ভাড়াটের বউটা কি ভীতু?" আশ্চর্য! সুতপা বিস্মিত হোল। ভয় পেয়েছিল সত্যি। গত রাত্রে হিমাদ্রির নাইট্ ডিউটি ছিল। সমস্ত রাত একা সে ঘরে। একা বলে নয়, আগেও একা থাকতে হয়েছে। কিন্তু নতুন বাড়ী অচেনা পরিবেশ! অজানা অনুভূতি! তারপর মাঝ রাতে, এক নিপীড়িত বধূর কান্না! মাতাল স্বামীটার রণহুঙ্কার, রাতের নিস্তব্ধতাকে ভয়ার্ত করে তুলেছিল।' সুতপা প্রায় ভয় পেয়ে মিনুদের ঘরের দরজা ঠেলেছিল। মিনুর মা বেরিয়ে আসতে সুতপা বলেছিল—"দেখুন, আমার ভয় করছে, একটু আসবেন আমার ঘরে।" বিনা দ্বিধায় মিনুর মা ঘরে এসেছিল। অভয় দিয়েছিল ঐ মেয়েলী কান্না আর পুরুষের চিৎকার—এ বাড়ীর ব্যাপার নয়। পাশের বাড়ীর কীর্তি! মাঝে মাঝে এমন হয়। লোকটা মাতাল। নাম যুগলকিশোর। নেশার দাপটে বউ ঠ্যাঙায়। সারা পাড়ার ঘুম ভাঙ্গায়। এখন সকলের গা সওয়া হয়ে গেছে। ভয়ের কিছু নেই।' নানা কথা বুঝিয়ে মিনুর মা বিদায় নিয়েছিল। সুতপার ভয় কাটলেও বিশ্রী আবহাওয়ার দরুণ সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। সকালেই মিনু এসে হাজির। তার মুখে পাকা পাকা কথা শুনে সুতপা হাসলো। পরে ছুটে সে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। ওখানে দাঁড়িয়ে মিনু হঠাৎ সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো—'শিগ্‌গীর দেখবেন আসুন—"সুতপা না জানি কি ভেবে ছুটে গেল। মিনু আঙুল তুলে দেখালো—ঐ দেখুন, যে লোকটা বউকে মারে।" সুতপার দৃষ্টি নামলো, পাশের বাড়ীর রকের সামনে। লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল। ভাগ্যি, তার দৃষ্টিটা ছিল অন্য দিকে। আর কানটাও বোধহয় সজাগ নয়। নইলে মিনুর ঐ চিৎকার, আর সুতপার কৌতুহলী তাকানো দেখলে, লোকটা নিশ্চয় কিছু ভাবতো। সুতপা আর না দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে এলো।

পরক্ষণে হিমাদ্রি বাড়ী ফিরে এলে, সুতপা গত রাতের ঘটনা গুছিয়ে বললো স্বামীকে। বললো মিনুর কথাও। ততক্ষণে ও' অদৃশ্য! সুতপা বললো—'ভারি পাকা মেয়ে। তোমার পায়ের শব্দ পেয়ে পালিয়েছে।" হিমাদ্রি হাসলো।—"তুমি তাহলে

লোকটাকেও দেখলে?" সুতপা বললো—"শুধু আমি কেন, তুমিও দেখতে পারো। এখনো বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে।" এ' কথায় হিমাদ্রির কৌতূহল বাড়লো। 'কই দেখি তো—বলে সেও জানলায় দাঁড়ালো। পেছনে দাঁড়িয়ে সুতপা ইসারা করলো। লোকটা তখন সবে দাঁতন শেষ করে, বাড়ী ঢুকছে। সুতপা একটু বিস্ময় সুরে বললো—'লোকটাকে দেখলে মনে হয় না বউ ঠ্যাঙায়।" হিমাদ্রি জবাব দিল—'হুঁ! আমাকে দেখলে কি কেউ বলবে, তোমাকে এত ভালবাসি?" হিমাদ্রির সারা মুখে দুষ্টু হাসি! সুতপার মুখ আবেগে অনুরক্ত! মুখে সে "তাই না বটে" বলে জানলার পর্দা টেনে, স্বামীর বক্ষলগ্না হোল। হিমাদ্রি তার গতরাতের বিরহটা, এই একটা মুহূর্তে পুরিয়ে নিতে, নির্লজ্জ অধর স্পর্শের সিক্ততায়, নিজের সংগে সুতপাকেও হাঁফিয়ে তুললো। পরে, সুতপা ছুটে পালিয়ে গেল।

রাতের নিঃসঙ্গতার চেয়ে, দিনের সঙ্গীহীন পরিবেশটা, সুতপার আরও খারাপ লাগে। রাতটা এ'পাশ ও'পাশ করে, শেষে ঘুমিয়ে কেটে যায়। কিন্তু হিমাদ্রির দিনের ডিউটি, যে সপ্তাহগুলোতে থাকে, সুতপার তখন অস্বোয়াস্তির এক শেষ! দশটায় বেরিয়ে যাবে হিমাদ্রি—ফিরবে সন্ধ্যের মুখে। সারা দিনে দুজন লোকের সংসারের কাজ শেষ করেও, অফুরন্ত সময়। সময়গুলো খাঁ খাঁ করে। সুতপার একা একা ভাল লাগে না। অন্য ভাড়াটেদের ঘরে যেতেও, তার ইচ্ছে করে না। সুতপা জেনেছে, পরিবারগুলোর মধ্যে কালচরের অভাব। হাঁড়ি হেঁসেল, রান্না খাওয়া নিয়ে সমস্ত দিন মত্ত! প্রাত্যহিক জীবনে ওদের কোন নতুন সংস্কার হয় না। একই ছাঁচে, একই ধাঁচে, সময়ের তালে তালে পা ফেলে চলেছে। বৈচিত্র্যহীন, ছন্দহারা এই জীবনগুলো, সুতপাকে ভারি অবাক করে দেয়। ওদের মধ্যে যে প্রাণটা বাস করে সেটারও বোধহয় ওঠানামার নতুনত্ব নেই। আত্মসর্বস্ব মানুষগুলো, শুধু নিজেদের ভাগ্য গড়ছে, কেবল কাজের স্তূপের মধ্যে দিয়ে। কাজের কারখানা বানিয়ে।

দুপুরে বই পড়ে কাটিয়ে বিকেলটায় সুতপা এসে দাঁড়ায় জানলার সামনে। এখানে দাঁড়ালে খোলা আকাশটাকে কাছে পাওয়া যায়। অনেক দূরের…অনেক অস্পষ্ট দৃশ্যও তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনা। মনটা যেন ফাঁক পেয়ে, বদ্ধ জীবনের খাঁচা থেকে উড়ে পালায়, দূর দূরান্তরে। নিজেকে যেন সে অনেক সময় হারিয়ে ফেলে। পেছন থেকে কেউ ডাকলেও, সুতপার খেয়াল হয়না। পিঠে ধাক্কা পড়লে, সুতপা চমকে উঠবে। সামনে হিমাদ্রির বিরক্তিমাখা মুখ।—ডাকলে শুনতে পাওনা? এই এক সপ্তাহে, নতুন বাড়ীর, নতুন রাস্তায় যে মন হারিয়ে ফেলেছো।" সুতপা সলজ্জ হাসি ছড়িয়ে, জানলার পর্দা টেনে সরে আসবে।—"কি আশ্চর্য সামনের রাস্তা দিয়ে এলে, অথচ দেখতে পেলাম না?" সুতপার গলায় বিস্মিত সুর। হিমাদ্রি তিক্ত স্বর—"তা দেখবে কি করে! চোখ থাকে আকাশে, মন থাকে বাতাসে!" সুতপা হাসে! কথাটা হিমাদ্রি ঠিকই বলে। চোখ তার মেঘের দেশেই ঘুরে বেড়ায়, মনটা বোধ হয় আর কোথাও।

সুতপার এই ভাবপ্রবণতা চিরদিনের। বিয়ের আগের জীবনে দুর্নামের অন্ত ছিলনা। মা বলতেন, এত ভাবপ্রবণতা, বড় অলুক্ষণে মতি। দুঃখ পেতে হয় নাকি, সারা জীবন। বাবা বলতেন, মেয়ের মনের গতি নেই। ঘরে মন রাখেনা, আকাশে রেখে দ্যায়। এ' মেয়ে কেমন করে সুখী হবে? একটা আশঙ্কার দুঃস্বপ্ন যেন দেখতেন, সুতপার মা বাবা। কিন্তু সুতপার ভাবুকতার তাতে ছেদ পড়তোনা। সন্ধ্যে হলে ছাদে উঠে যাওয়া, রাতের আকাশের তারা গোণা—ভোরের জানলা খুলে, প্রথম সূর্যোদয়ের দৃশ্য দর্শন, নয়তো শান্ত বিষণ্ণ দুপুরে চিলেকোঠার খুপড়ী জানলায় চোখ রেখে, দূরের পাতাশূন্য শিরীষ গাছটার বিরস ছবিটা শুধু চেয়ে দেখা, এ সবই সুতপার নিত্য অভ্যেস ছিল। পড়ার সময়তেও, বই খুলে, বিমনা হয়ে ভাবতো তার মনের অতল রহস্যের সুরগুলো! কখনো আকাশচুম্বী সৌধে চড়ে, আস্ত পৃথিবীটাকে, পায়রার খোপ, নয় তো চড়ুই পাখীর পুঁচকে বাসা বলে মনে হোত তার। নিজেকে মনে করতো, মুক্ত বিহঙ্গ! উন্মুক্ত আকাশচারিণী। নীল সাদা, কালো মেঘের স্তরে, স্তরে কখনো সে ডুব দিয়ে দিয়ে মুক্ত নিঃশ্বাস ফেলতো। মনে হোত কি স্বাধীন জীবন।

সেই সুতপা, লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে, শ্বশুর ঘর

করতে এলো। হিমাদ্রির ঘরণী হয়ে। শ্বশুর শাশুড়ী নেই। নেই হিমাদ্রির কোন আত্মজন। তার প্রিয়জন হোল সুতপা।

প্রেতপুরীর মত একটা ঝুপ্‌সী অন্ধকার বাড়ী। পচা নর্দমার পাশে, হাঁপানী রোগীর মত দিনরাত হাঁফাতো বাড়ীটা। হাঁফিয়ে গেল সুতপা। "উঃ এই বাড়ীতে তুমি থাকো?" হিমাদ্রি কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিল—একা মানুষ, তা'ও আবার ভাড়া কম। রাতটুকু শুয়ে কাটানো সুতপার আশ্চর্য লেগেছিল, এটা কি মানুষের উক্তি? একটু স্বাস্থ্য-জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই লোকটার। সুতপা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল—'না না, এ বাড়ীতে কিছুতেই থাকা হতে পারেনা।' হিমাদ্রি নববধূকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কি ভয় করে তপু? সুতপা সে কথার উত্তর দেয়নি। কিন্তু ভেবেছিল, কথাটা ঠিকই। ভয় করে বৈকি! ভয় পাবার মত একটা ভূতের বাড়ী যেন। আলো বাতাসহীন চূণ বালি খসে পড়া বাড়ীটাকে মানুষের আবাসস্থল মনে হোতনা! মনে হোত এক রাজ্যি ভূতের আস্তানা। রাত বিরেতে গা ছম্ ছম্ করতো। ভাঙা উঠোনের ইট খসে-পড়া, পাঁচিলের গা বেয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকতো ঝাঁকড়া-মাথা সেই নিমগাছটা। ঐ বাড়ীর তিন পুরুষের গাছ নাকি। তিন যুগ ইতিহাসের সাক্ষী!

অস্থি-চর্মসার দেহসমেত কোটরাগত দু' চোখের দৃষ্টি জ্বেলে, আশীর বুড়ি, বাড়ীউলী হেমিপিসী বলতো, ঐ গাছ, ঐ বাড়ীর তে-পুরুষের মানুষগুলোকে বড় হতে দেখেছে। মরতে দেখেছে। ওটার মধ্যেই নাকি তিন পুরুষের জ্যান্ত পরাণগুলো ধ্বক্ ধ্বক্ করছে।' শুনতে গিয়ে সুতপা শিউরে উঠতো! উঃ কি সব্বনেশে বাড়ী! ছেলে দেখে সুতপার বাবা-মা পছন্দ করলো, কিন্তু এমন বাড়ীর কথা মনে ঠাঁই দেয়নি। নইলে সুতপা কি আসতো এই বাড়ীতে মরতে? তার চেয়ে কুমারী থাকা ভাল। নইলে এ বাড়ী থেকে এখুনি পালানো দরকার। স্বামীকে সে ক্রমাগত ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো—আর এখানে নয়। শিগ্‌গীর বাড়ী দেখো। উঃ আকাশ নেই বাতাস নেই শেষে দম বন্ধ হয়ে মরবো?"

হিমাদ্রি বুঝেছিল, সুতপার মনের অবস্থা। তাই তলে তলে সে নিজেই চেষ্টা চালাচ্ছিল, বাড়ী বদলানোর। তাও চট করে হোল কোথায়? কোলকাতায় বাড়ী খুঁজতে গিয়ে দশ মাস প্রায় কেটে গেল। শেষে বাড়ী মিললো, কিন্তু ভাড়ার অঙ্ক শুনে হৃদস্পন্দন স্থির। মাত্র একখানা ঘরের ভাড়া পঞ্চাশ টাকা? মাইনের এক তৃতীয়াংশ! হবেনা, বলে থামলো হিমাদ্রি। সুতপা নাছোড়বান্দা! নিতেই হবে ঐ বাড়ী। আলো বাতাস, রাস্তার ওপর, অমন ঝকঝকে ঘরের ভাড়া, পঞ্চাশ টাকা বোধহয় কিছুই নয়। তাও খাস কোলকাতায়। স্বামীকে বোঝালো সুতপা। হিমাদ্রি বুঝলো বটে। তবে তিনটে রাত সে ভেবে নিল। দশ টাকার জায়গায়, আরও চল্লিশ টাকা বাড়তি? ভাবতে গিয়ে তার তিন রাতই ঘুম হোলনা। কিন্তু চতুর্থ দিনে মন স্থির করে, সুতপার ইচ্ছেকেই বলবৎ করলো। একে বউ, তায় নববধূ! কোন ইচ্ছেই বোধহয়, অপূর্ণ রাখা যায় না। নিজের ইচ্ছেটাকেও হয়তো হারাতে ইচ্ছে করে।

মাইনে পেয়েই ওরা চলে এসেছিল। এসেই ঘর-দোর সাজাতে সুরু করলো সুতপা। কতদিন মনের মতন ঘর সাজানোর অবকাশ হয়নি। নতুন ডিস্‌টেম্পার করা ঘরের দেওয়ালে, সুদৃশ্য ক'টা ছবি সে টাঙালো। তার বিয়েতে পাওয়া সেই বড় আয়নাটাও। ঠিক তার নীচেই, দেওয়াল ঘেঁসে ভাঙা রংচটা টেবিলটা ঠেস্ দিয়ে রাখলো। বাক্সে তোলা তার নিজের তৈরী করা আইহোল্ ষ্টীচ্ এর—সৌখিন ফুল তোলা টেবল্ ক্লথটা বার করে ঢেকে দিল, টেবিলের সমস্ত সামনেটার চেহারা ফিরলো। যেন কালো কুৎসিৎ মেয়েকে বিয়ের রাতে, নতুন বেনারসী, গয়না পরিয়ে সাজানো হোল। তাতে সৌন্দর্য ধরা পড়লো। হিমাদ্রি দেখে বললো—"বাঃ বেশ সাজিয়েছো তো! সুতপা টেবিলের ওপর তাদের যুগল মূর্তির ফটো ষ্ট্যাণ্ডটা রাখতে রাখতে, বেশ গর্বিতভাবে উত্তর দিল—"দেখতে হবে তো কে সাজাচ্ছে!" হিমাদ্রি সহাস্যে উত্তর দিল—হুঁ—দেখছি বৈ কি, আমার বউ। সুতপা সশব্দে হেসে উঠলো। পরে ওরা দুজনে ধরাধরি করে, পায়া ভাঙা চৌকিটা, ঘরের ঠিক জায়গায় রাখলো। কিন্তু সুতপার ঠিক মনঃপূত হোল না। খুঁতখুঁতে গলায় বললো—উহু, হোল না। ঘরের আয়তনের সংগে মেলেনি। একটু সামঞ্জস্যহীন দেখাচ্ছে। সুতপা যেন তার ঘর সাজানোটাকে

একটা কবিতার মত তৈরী করতে চাইলো। মিল, ছন্দ, সমতা, সব নিয়ম মেনে নিয়ে। হিমাদ্রি আবার ঘর্মাক্ত হয়ে চৌকি টানলো। সুতপার নির্দেশমত সামঞ্জস্য রক্ষা করলো। সুতপা সানন্দে বললো—'ব্যস্ এই ঠিক।' ঘরের মুখ বদলে গেল। খাঁদা নাকে মুক্তোর নোলক দুললো!

সাদা ধবধবে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো হিমাদ্রি।—উঃ আর নয়।' এবার সাজানো রেখে, ষ্টোভে খিচুড়ী চাপাও। ক্ষিদে পেয়েছে ভীষণ। সুতপা হাসিমুখে অনুনয় জানালো—"লক্ষীটি, আর একটু সেরে নিই', সে ব্যস্ত হয়ে মিট-সেফের ওপর জাপানী কাঁচের টি-সেটটা সাজিয়ে নিয়ে, রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। সে দিনটা ছিল, সুতপার কাছে একটা উৎসবের দিন। মনের আনন্দে পরিশ্রম করেছিল রাত পর্যন্ত। আর সমস্ত রাতটাই সুতপা গল্প করে কাটিয়েছিল—স্বামীর সংগে! আনন্দের স্রোতে সুতপা খাওয়া ঘুম বাদ দিয়ে মন ভাসিয়েছিল।

তারপর থেকে সুতপার দিনগুলো কাটছে। কাজ করে। বই পড়ে। ঘর সাজায়। মনোমত না হলে, এটা ওটা টেনে সরায়। যে ভাবে হোক সময়টাকে সে পার করে ছায়। সবচেয়ে আনন্দ হয়—বিকেলবেলায় জানলার সামনে দাঁড়াতে। এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে, নীল পর্দা ঠেলে সমস্ত মুখখানা বাড়িয়ে ছায়। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু অসীম নীলাকাশে ছড়িয়ে পড়া মেঘের রাশিগুলো চোখে পড়ে। ধোঁয়ার মত ধূসর। কখনো বরফের স্তূপের মত জমাট! নীল, সাদা, কালো, রঙে রঙে ছড়াছড়ি। হরেক রঙের বাহার। উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে যেন সুতপা, মেঘের মেলা দেখে বেড়ায়। আর সেই আকাশ-ছোঁয়া কল্পনা তাকে ঘিরে তৈরী করে এক অদৃশ্য জগৎ। কিন্তু বিরক্ত হয়ে একদিন হিমাদ্রি বললো—"রাস্তার সামনে জানলায় ও'ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, হাজার লোকের দৃষ্টি পড়ে। কথাটা শুনে সুতপার বিস্ময় জাগলো। হঠাৎ এ' উক্তি? কিন্তু চিন্তা করার আগেই ও' জবাব দিল—এতদিন কোথায় ছিলাম বলতো; শুধু দমবন্ধ ঘরে পচে মরা। হাঁফিয়ে উঠেছি একটু আলো বাতাসের অভাবে। আজ এমন সুযোগে আমায় বাধা দিওনা, লক্ষীটি! কাতর সুর সুতপার কণ্ঠ ছাপিয়ে ওঠে। হিমাদ্রি এ' কথায় বিশেষ খুশী হোলনা। বরং একটু উত্তপ্ত ছায়া, সারা মুখে তার ছড়িয়ে পড়লো। মেয়ে বউদের ও' ভাবে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দৃষ্টিকটু বৈকি! আর রাস্তার লোকগুলোই বা কি ভাবে? সুতপা একেই সুন্দরী, তাও মাথায় গায়ে কাপড় থাকেনা। ভারি খেয়ালী মন। —না, না, এ' মোটেই ভাল নয়। মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো হিমাদ্রি। চাপা রোষে সে বললো—কি আশ্চর্য তোমার অনুরোধ, নিজে কিছু বোঝনা জানোনা, ওভাবে দাঁড়ানো চলে না? স্তব্ধ হয়ে গেল সুতপা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে। এ' যেন নতুন মুখ। নতুন গলার স্বর। এ সবের সংগে তার কোনদিনও পরিচয় নেই। হিমাদ্রিকে যেন ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক মনে হোল। পর মুহূর্তে চোখে জল এলো, কিন্তু সামলে নিলে নিজেকে। কেন, কিসের জন্য সে হার মানবে? পরাজিত হতে চায়না সুতপা, প্রতিবাদ জানালো—তার মানে? তুমি বলতে চাও, আমার দাঁড়ানো অপরাধ, আর তাই নির্বিবাদে, মানতে হবে?" এ কথায় হিমাদ্রি যেন জ্বলে উঠলো—"মানে নয়। মানতে হবে।" সুতপা ঝাঁকালো হয়ে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, তাই মানবো, কিন্তু বলতে পারো অপরাধ কোথায়? বিচিত্র পৃথিবীর পথে-ঘাটে তোমরা ঘুরে বেড়াও, বুক ভরে চোখ ভরে তার সব স্বাদটুকু নিয়ে নাও, কেবল আমাদের বেলায় অপরাধ? শাসনের ব্যবস্থা?" এবার আরও কঠোর ভাবে জবাব দিল হিমাদ্রি—হয়তো তাই। সমস্ত নিয়মের মধ্যে তোমরা থাকতে বাধ্য। পৃথিবীর বৈচিত্র্য তোমাদের নয়, আমাদের। ঘরের মধ্যেই, তোমাদের সীমানা তৈরী করেছে বিধাতা"—আশ্চর্য! কি অমানুষিক যুক্তি! রুদ্ধস্বরে সুতপা জিজ্ঞেস করলো—তাহলে মেয়েদের মনটা মূল্যহীন? অর্থাৎ মনের বালাই নেই? হিমাদ্রি আবার স্পষ্টভাবে উত্তর দিল—হ্যাঁ, বিধাতার নিয়মানুসারে মেয়েদের মনের মূল্য বহির্জগতে নিতান্ত নগণ্য। সংসারের মধ্যে তোমাদের মনটুকুর স্থান হতে পারে। বাইরে গেলে তা ধৃষ্টতা! উপরন্তু বেয়াদপি স্পর্দ্ধা! সুতপা আর প্রতিবাদ করলো না। যুক্তিহীন তর্কে যোগ দিতে তার বিরক্তি লাগলো। উপরন্তু অভিমানে সে সরে গেল। আড়ালে গিয়ে চোখভরা জলটুকু, দু'হাতে চেপে ঝরিয়ে ফেললো সে।

সেই নীল-পর্দা ঠেলে মেয়ের দাঁড়ানো বন্ধ

হোল। সুতপাই হার মেনেছে। হয়তো এমনি করে হার মানতে হয় অনেক মেয়েকেই। তাই তার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হোলনা। আর উপায় বা কি? মেয়েদের মন নেই। বিমনা মেয়ে সুতপা তাই ঘরের নিভৃত কন্দরে অবস্থান সুরু করলো। নীল পর্দাটা এবার থেকে একই নিয়মে দাঁড়িয়ে রইলো। মুক্ত বাতাসের অবাধ গতিপথও রুদ্ধ হোল। পর্দার সামান্য গলিপথ দিয়ে,—সামান্য যাতায়াত। একটু উঁকি ঝুকি দেওয়ার প্রয়াস! নিদাঘের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে—বাতাসহীন ঘরে—সুতপার অস্থিরতা বাড়লো। হাঁফিয়ে উঠলো সে। উঃ এই পবিত্র বাতাসের গতিপথ কে রুদ্ধ করলো? সুতপা মনে মনে বিষাক্ত হয়ে উঠলো। কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনা, স্বামীকে। নিষ্ঠুর নির্দয় ঐ মানুষটা! অশ্রদ্ধায় অতৃপ্তি জাগে ধীরে ধীরে। কিন্তু বাইরে সুতপা তার কিছুই প্রকাশ হতে দিলনা। সংসারে শান্তির প্রচেষ্টা তার একান্ত কাম্য!

বোধহয় কোন শুভ কামনাই অনাবিল পথে এগোতে পারেনা। দৈবের মত, অদৃশ্য শয়তান তার রাহুগ্রাস প্রসারিত করে এগিয়ে আসে। নইলে এত করেও হিমাদ্রি কেন খুশী হোলনা? তার অভিযোগের কাঁটা তো সে তুলে দিয়েছে? কিছুই ভেবে কুল পেলনা সুতপা। জানালায় দাঁড়ানো তার বন্ধ, তবু হিমাদি কেন আজও সন্দিগ্ধ? অফিস থেকে ফিরেই, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে। জানালার পর্দার দিকে চেয়ে। একটু যেন পর্দাটা সরে আছে। মনে হচ্ছে, তার ফেরার আগে, সুতপার গোপন উপস্থিতি ছিল। হয়তো, তার অগোচরে সুতপা তার দাঁড়ানোর অভ্যেস একই নিয়মে চালাচ্ছে। মনে মনে অসম্ভব কল্পনার জাল বোনে, হিমাদ্রি। যুক্তিবাদীর অদ্ভুত যুক্তির কল্পিত ছবিগুলো, বিক্ষুব্ধ করে তোলে তাকে। মনোবাদী হিমাদ্রির মনে মনে সন্দেহের ঘোর আন্দোলন সুরু হয়। ক্রমে ক্রমে তা চরম সীমায় উঠলো। অসহিষ্ণু অতৃপ্ত হয়ে উঠলো সে স্ত্রীর ওপর। সুতপা বিস্মিত! বিমূঢ়। কিছুই সে বুঝতে পারেনা।

কিন্তু সব চেয়ে হতচকিত করলো সুতপকে. যেদিন হিমাদ্রি বাড়ী ঢুকেই, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত প্রথম সুরু করলো সেই জঘন্য উক্তি—"আমি বাড়ী ঢুকতে দেখি সেই মাতালটা এই ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে। সুতপা শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো—"কোন মাতালটার কথা বলছো?" হিমাদ্রি চেঁচিয়ে উঠলো, ন্যাকা সেজে আছো? জানোনা কোন মাতালটা, ঐ যুগলকিশোর। পরে একটু থেমে সে বললো—তুমি যাকে দেখে বলেছিলে, দেখলে মনে হয়না তো বউ ঠ্যাঙায়! সেই বদমাইসটা।" রাগে ফুলতে লাগলো যেন সে। সুতপা দেখলো স্বামীর রোষদীপ্ত দৃষ্টিটা তাকে লক্ষ্য করেই অগ্নিশিখার মত জ্বলছে।

তারপর থেকে প্রতিদিনই, হিমাদ্রির সেই ঘৃণিত উক্তি, জঘন্য জিজ্ঞাসা, "রাস্তা ঝাঁট দেওয়া মেথরটাও শেষে তোমাকে দেখে ভুলেছে? নর্দমা সাফ করতে করতে কেন সে উঁকি মারে জানালার পাশে? পাড়ার রাম শ্যাম থেকে মাতাল মেথর, কিসের আগ্রহে এদিকে চেয়ে থাকে জানিনা। সুতপাও জানেনা, কারও প্রলুব্ধ দৃষ্টি তাদের জানলায় থমকে থাকে কিনা। এমন ঘটনা তার চোখে পড়েনি। যদিও সে এখন জানলায় দাঁড়ায়না, কিন্তু যখন সে দাঁড়াতো এবং অন্যান্য বাড়ীর সোমত্ত কুমারী মেয়েরা পর্যন্ত নিয়মিত হারে জানলায় দাঁড়ায়। সুতপা এমন কাউকে তখন দেখেছে বলে মনে পড়েনা, যে লুব্ধদৃষ্টি ফেলেছে, এই জানলায় কিংবা অন্য বাড়ীর দিকে। তবে, নতুন ভাড়াটে দেখে কারও দৃষ্টি হয়তো পড়তে পারে, ঐ জানলায়, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে? সন্দেহ করার যুক্তিও ভিত্তিহীন। দগ্ধ-ঘৃণায় মন ভরে উঠলো সুতপার। কি হীনমনা এই পুরুষ জাতটা! মনে মুখে কিছুই আটকায় না? যা খুশী তাই ভাবা, যা খুশী তাই উচ্চারণ করা? রুচি শিক্ষা, সব কি বিসর্জন দিয়েছে হিমাদ্রি? নিজের স্ত্রীকে ইঙ্গিত করে—" উঃ আর ভাবতে পারে না সুতপা। চোখের জলে সে নিজেকে, ডুবিয়ে, ভাসিয়ে দ্যায়, মুক্তি চায় এই যন্ত্রণা থেকে।

কিন্তু সুতপার অশ্রুতে হিমাদ্রির মনের পরিবর্তন হোল না। উপরন্তু সন্দেহের আবর্তে সে ক্রমাগত ঘুরতে লাগলো। মনের মধ্যে তার বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড আলোড়ন চললো। দিনে স্বোয়াস্তি নেই। রাতে ঘুম নেই। কাজে মন নেই। হিমাদ্রি যেন পাগল হতে চললো। এবং এটার উৎপত্তিস্থল হোল, মাতাল যুগলকিশোরকে কেন্দ্র

করে।...অথচ সুতপাই একদিন ঐ লোকটার যেন প্রশংসা করেছিল। (দেখলে মনে হয়না বউকে মারে) হিমাদ্রিও দেখে বুঝেছে বাইরে থেকে লোকটার চেহারার বাহার আছে। দেখলে শুধু ভাল মনে হয় না, "ভালও লাগে।" সেটা কিন্তু সুতপা বলেনি। হয়তো মনে চেপে রেখে, কিছুটা মনে মনে ভালবাসতেও পারে। আর চোখে চোখেও যে সাক্ষাৎ হচ্ছে না, এমন কথাই বা কে বলতে পারে? অন্ততঃ হিমাদ্রি তা বলবেনা। তারই চোখের সামনে কতদিন ধরা পড়ে গিয়ে যুগলকিশোর চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে চোরের মত। পালিয়ে যেতে পথ পায়নি বেচারা। কিন্তু বিছের কামড়ে জলে ওঠে হিমাদ্রি। ঐ সুতপাই এর মূল। নইলে লোকটা সাহস পায়? সমর্থন না পেলে? কে জানে এতদিনে ওদের প্রেমের আদান প্রদান চলছে কিনা! মেয়েদের মনকে বিশ্বাস নেই। অমন ঠুকনো মন ভোলাতে, মাতালও পারে! পাগলের প্রেমে পড়েছে, এমন মেয়েকেও, সে জানে। কি সাংঘাতিক এই মেয়ে জাতটা? পাগল, ছাগল, মাতাল, লম্পট কিছুই বাকি রাখলো না? সাধে কি শাস্ত্রে বলেছে—'স্ত্রী মন, না জানে মধুসূদন'। গোটা বিশ্বটাকে ওরাই বোধ হয় রসাতলে ডাসিয়ে দিতে পারে। হিমাদ্রির সর্বাঙ্গ শিহরিত! ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো সে।

ভয়ার্ত সুতপা আতঙ্কিত হয়ে ভাবলো লোকটা কি শেষে পাগল হয়ে যাবে? সমস্ত রাতে চোখের পাতা এক করে না। অন্ধকার ঘরে পায়চারী করে, মুখে বিড়বিড় করে কি যেন বলে! সুতপা তার বর্ণোদ্ধার করতে পারেনা। বিবর্ণ হয়ে যায়। স্বামীর বিক্ষিপ্ততা দেখে। সুতপা বোঝাতে চায়, স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়—কেন এই মিথ্যে ভাবনা নিয়ে মরছো? এই পাগলামীর কোন অর্থ হয়? কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে যায়। হিমাদ্রি তার ধারণায় স্থির। সুতপাকে তার বিশ্বাস নেই। ঐ মেয়েরা রহস্যময়ী, ছলনাময়ী, মায়ায় ভোলাতে চায়। কথায় বোঝাতে চায়। সব মিথ্যে, সব ফাঁকি! না না, সে কোন কথা শুনতে চায় না, সুতপা কিছু বলতে গেলে হিমাদ্রি চেঁচিয়ে ওঠে। অনেক সময় নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকে। ডাকলে ওঠেনা। কথা বললে সাড়া দ্যায় না। প্রায় দিন অফিস কামাই, প্রায় দিন লেট্। সুতপা ভাবনায় পাথর হয়ে যায়। স্বামীর ভালবাসা, মন সবই সে হারিয়েছে, এখন কি লোকটা শেষে পাগল হয়ে যাবে? এমন বিকৃত মানুষকে চোখে দেখা তো দূরের কথা, গল্প উপন্যাসেও নজির পায়নি। সুতপার মনে হোল, একটা দুঃস্বপ্ন সে দেখছে। রুদ্ধ নিশ্বাসে হাঁপিয়ে মরছে...।

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে পড়ন্ত বেলায় সে পথে নামলো। দু' চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, মরা ম্রিয়মান কণ্ঠস্বর! একা সে কখনো পথ হাঁটেনি। হিমাদ্রি থাকে সংগে। কিন্তু আজ একাই চলেছে সুতপা। একা। বড় একা। একা একা পথ হাঁটে।...

ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ীটার সামনে এসে সে দাঁড়ালো। চিনতে ভুল হয়নি। সেই রুদ্ধশ্বাস কানা গলি। পচা নর্দমা। ধ্বসে পড়া, একফালি বাড়ীর অংশ। এখানে দাঁড়িয়ে সুতপার মনে হোল, সত্যি কি এ বাড়ীতে মানুষ থাকে? অথচ এখানে পাক্কা দশ বছর কাটিয়েছে হিমাদ্রি। আর হিমিপিসীর জীবন ভোর কাটলো।

দরজা ধাক্কা দিতে হিমিপিসী বেরিয়ে এলো—'কে রে কাজলী নাকি?' কাজলী এ পাড়ায় পুরোন যুগের মেয়ে। হিমিপিসীর সই। মাঝে মাঝে সে আসে। সুতপা বললো—"পিসী আমি। তোমার সেই নতুন বৌ!"—ওমা! হ্যাঁ গা তুই, সোল্লাসে আহ্বান জানালো হিমিপিসী, তা বাইরে কেন রে, ভেতরে আসবি নি? চোখেও তেমন দেখি নে বাছা। তোরাও গেলি-পর না খেয়ে মরি"—সুতপা এগিয়ে গেল।—"কেন পিসী, ঘর কি তোমার ভাড়া হয়নি?" মনে মনে কিন্তু সুতপা সেটা আন্দাজ করে এসেছিল। ও'ঘর ভাড়া হবে না সে তা জানতো। কথাটা আরও ভাল করে মিলে গেল। হিমিপিসী হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বললো—"ভাঙা ঘর কেউ ভাড়া নিতে চায় না। আলো নেই। বাতাস নেই। দিনে পিদীম জ্বলে, রেতেও কুপী—সবাই বলে যায়, মানুষ থাকে এখানে। এখন বল্ দিকিন বাছা তোরাও তো মানুষ ছিলি। তোদের ঠাঁই হোল তো, ওদের কেন হয়না?' হিমিপিসীর গলার স্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে। সুতপা যেন প্রস্তুত ছিল। সংগে সংগে জবাব দিল—'ও ঘর কেউ ভাড়া নেবেনা পিসী! আমরাই আসবো।' "সত্যি বলছিস্?" অবিশ্বাস্য আশায় হিমিপিসীর ক্ষীণদৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ঠিক আসবো। দশ টাকার ভাড়ারও পাঁচটাকা বাড়িয়ে আসবো। কিন্তু মনে মনে সুতপা বললো—পাঁচ টাকা কেন, যত খুসী বাড়ানো যাবে। ওই ঘর তার চাই। তবে আর নয়। আনন্দে সে পথে নামলো। হিমিপিসীর শেষ কথাটাও তার শোনা হোল না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যঃ দেশাত্মবোধ

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ,

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের সার্থক সূচনা। কথাটা পাকাপাকি ভাবে স্বীকৃতির দৃষ্টান্ত যেমন বিরল, অস্বীকৃতির যুক্তিও তেমন দৃঢ় নয়। একথা ঠিক, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙ্গালী-ভাবনায় দেশপ্রীতির স্ফূর্ত্তি যতটা ব্যাপক বাঙ্ময় রূপ গ্রহণ করেছে, পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে উহা ততোটা প্রত্যাশিত ছিল না। মুসলমান-বিজয় বাঙ্গালী চেতনাকে আকাঙ্ক্ষিতভাবে আত্ম-সচেতন করতে সক্ষম হয়নি, অথচ ইংরেজ আগমন সে সাফল্যকে সার্থক করেছিল। এর দুটো কারণ; এক বাণিজ্যিক, দুই সাংস্কৃতিক। ফলতঃ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দেশ ও জাতি চেতনা গভীরতর হয়েছিল। এ কারণেই ঐ যুগের বাংলা কাব্যে জাতি-ভিত্তিক বীর কাহিনীর উদ্ভব। সুতরাং অস্বীকারের উপায় নাই, ইংরেজ বিজয়ের ফলেই বাঙ্গালী-ভাবনায় পরাধীনতার জ্বালা বৃশ্চিক দংশনের সৃষ্টি করেছিল।

ওপরের কথা অনুসারে বলা চলে, উনিশ-শতকী বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধ সক্রিয় ও সার্থক হয়েছে। দেশাত্মবোধের প্রতিফলন দেশচেতনা ও দেশপ্রীতিতে। যে জাতির বা ব্যক্তির দেশ সম্বন্ধে বোধ নেই, তার দেশ-প্রীতি স্বভাবতই জাগে না।

উনিশশতকী বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধ সক্রিয় ও গভীর হয়েছে। কিন্তু এর বীজ রয়ে গেছে আরও সুদূরে।

মুসলমান ও ইংরেজ বাংলা দেশে যখন অনুপস্থিত, তখন বাঙ্গালীর রচিত সাহিত্যে দেশাত্মবোধ কোন্ স্বরূপে ছিল, তার সংবাদ সন্ধান করা শক্ত। তবে একথা ঠিক, আধুনিক কালের দেশপ্রীতির প্রকাশ ও বাঙ্ময় রূপ মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র হলেও উনিশ শতকী বাংলা সাহিত্যের দেশাত্মবোধের মূল যে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রয়েছে, তা অস্বীকার করা চলে না।

উনিশ-শতকী দেশাত্মবোধ সক্রিয়, গোষ্ঠীপ্রধান এবং গভীর। ব্যাপক ও স্পষ্ট। এই শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের যে কেন্দ্রিকতা তা সীমিত পরিমিত, ধর্ম্ম জাতি ও রাষ্ট্রভিত্তিক। কারণ তখন বাহিরের সংঘাত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। যেটুকু করেছিল তা ধর্ম্মের ও পূজার মধ্যে সীমিত ছিল। সুতরাং তা বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর মুক্তির কথা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। আর এইজন্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে প্রতিফলিত যে দেশপ্রীতি—তা রূপে-রেখায়, ভাষায় ও চিন্তায় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ থেকে আলাদা। উনিশ শতকের দেশাত্মবোধ ব্যাপক ও গভীর হওয়ার মূলটা কোথায়? ত্রয়োদশ শতকের তুর্কী আক্রমণ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ বিজয় এই উভয়ের সমন্বয়ের ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীর দেশপ্রীতির স্বরূপ স্বতন্ত্র, উজ্জ্বল ও ব্যাপক হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে দেশ চেতনার যে প্রকাশ, তার কিছুটা তুর্কী অত্যাচার হতে জাত। অর্থাৎ বিধর্ম্মীর পীড়ন জাতিকে দগ্ধ করছিল। একথা যেমন ঠিক, তেমনি এও স্বীকার্য্য যে, ঐ দেশপ্রীতির আর এক উৎস ছিল ভারতীয় মহাকাব্য।

এখন দেখা যাক, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের স্বরূপ কেমন ছিল। ষোড়শ শতকের জাতি ও দেশপ্রীতি ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু এরও পূর্ব্বে দেশপ্রীতি কি বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত ছিল? একথা বললে নিশ্চয়ই কষ্টকল্পনা করা হবে না যে, দশম শতাব্দীর প্রহেলিকাচ্ছন্ন ধর্ম্মীয় সাহিত্যে 'চর্য্যাপদে' বাঙ্গালী চেতনার ইঙ্গিত রয়েছে। ৪৯নং পদটি ভুসুকের।

কবি বলেছেন : অজয় জঙ্গালে দেশ লুড়িউ। অর্থাৎ নির্দ্দয় দস্যু দেশ লুট করিল। এর ধর্ম্মীয় ব্যাখ্যা যাই থাকুক, নির্দ্দয় দস্যু কর্ত্তৃক দেশ লুণ্ঠিত হওয়ার জন্য কবি-চিত্ত যে ব্যথিত, তারই এক ইঙ্গিত এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় "বঙ্গ সাহিত্যে স্বদেশ চেতনা ও ভাষারীতি" পুস্তকে যে আলোচনা করেছেন, তাতে উনিশ শতাব্দীর-পূর্ব্ব সাহিত্যে দেশ চেতনার সামান্য আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় মহাকাব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে স্বদেশ বন্দনার দৃষ্টান্ত ব্যাপক। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে দেশাত্মবোধ স্পষ্ট, উজ্জ্বল এবং সার্থক। মহাভারত কথাটিই তো দেশ-প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এ বাক্য মহাকবি বাল্মীকির। বিষ্ণুপুরাণের ভারতমাতার মাহাত্ম্য কীর্তনের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের স্বদেশ বন্দনার মধ্যে ঐক্যসূত্র যেমন স্পষ্ট, সাদৃশ্য হীনতাও তেমনি আছে। এতএব, এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে, দেশ বন্দনার ধারা কেবলমাত্র উনিশ শতকেই জেগেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে দেশপ্রীতির ধারা যদি বাংলা সাহিত্যে এসে থাকে, তবে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে এই বোধ অ-প্রকাশ থাকে কিরূপে? বলা চলে বাংলা সাহিত্যে দেশবন্দনা আকস্মিকও নয়, বিদেশ আগতও নয়।

নয় বলেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেশচেতনা জাতি ধর্ম ও সংগ্রাম মহিমা বর্ণনায় উজ্জ্বল। এই যুগের সাহিত্যে দেশপ্রীতির লক্ষণ জাতিকেন্দ্রিক, ধর্ম-ভিত্তিক ও রাজানুগত্যমূলক। রাজাকে বা জমিদারকে ব্যাসের সমান, রামচন্দ্রের সমমূল্যে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। গৌড় দরবারের সাহিত্যে এ-জাতীয় রাজবন্দনা তো প্রচুর। হিন্দু কবিরা মুসলমান নবাবকে সাক্ষাৎ রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর রাজ্যকে অমরাবতী বলেছেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ষোড়শ শতাব্দীর। 'চণ্ডীমঙ্গলে কবি নিজের গ্রাম মহিমা বর্ণণা করেছেন। এতে দেশ-প্রাণতার প্রতিফলন স্পষ্ট :

দামুন্যার লোক যত , শিবের চরণে রত,
সেইপুরী হরের ধরণী।

* * *

গঙ্গা সম সুনির্ম্মল তোমার দুচরণ জল
পান কৈনু শিশুকাল হইতে।

নবদ্বীপ বর্ণনাও দেশ বন্দনা :

ভুবনে বিখ্যাত গ্রাম সুধন্য সুপুণ্য গ্রাম
জম্বুদ্বীপ আর নবদ্বীপ।

রাজবন্দনাতেও দেশপ্রীতির স্বাক্ষর :

আড়-রা ব্রাহ্মণ ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।

* * *

ধন্য রাজা রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত
বীর-বাঁকুড়া ভাগ্যবান।

বিধর্ম্মী রাজার অত্যাচার বর্ণনা :

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌরাঙ্গ উৎকল অধিপ
যে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ যরিপ॥
উজীর হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি।

উনিশ শতাব্দীর দেশ বন্দনার প্রকাশ লক্ষ্য করলে এর তফাৎ বোঝা যাবে :

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্ম্মহীন ভূমাহীন হয়ে?
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

চৈতন্যভাগবত ষোড়শ শতকের। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তি প্রচারধর্ম্মের কারণে, এবং সংস্কারবদ্ধ ও সুলতানী অত্যাচারে পীড়িত মানুষকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। মহাপ্রভুর দিব্য আবির্ভাব জাতীয় মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে দিল। সাহিত্যেও তার ব্যাপক প্রভাব ঘটলো। চৈতন্য-কেন্দ্রিক রচনাসমূহে যে বীরবন্দনা তার লক্ষ্য চৈতন্যদেব। চৈতন্য প্রভুকে এই অর্থেই বাঙ্গালীর মুক্তিদাতা বলা চলে কিনা তা বিচার করে দেখতে হবে। রামমোহন রায়কে ভারতপথিক বলা হয়। রামমোহনের প.ক্ষ এ-কথা যদি প্রযুক্ত হয়, তবে মহাপ্রভুকে কি বলবো? চৈতন্য-আবির্ভাবকেই বাংলার নবযুগের মাইলষ্টোন বলা সঙ্গত। এক শ্রেণীর মানুষ—সংখ্যায় এরা অধিক, মুসলমানী শাসনে ভোগ বিলাস মত্ত,

স্তাবক ও জিজ্ঞাসাশূন্য জীবন যাপনে জড়ত্ব পেয়েছিল। মহাপ্রভু এই অবস্থা থেকে মানুষকে আত্মচিন্তায় মগ্ন হবার আহ্বান দিলেন। নিজেকে জানার সঙ্গে দেশকে জানার প্রেরণা আসে। বেদের 'আত্মানং বিদ্ধি'—নিজেকে ও দেশকে জানার মন্ত্র। নিজের জানার প্রেরণা থেকে জাগে আত্মশুদ্ধি। মহাপ্রভু এই আত্মশুদ্ধির মন্ত্র দেন।

অধর্ম্মের বৃদ্ধিই আত্ম-পরাধীনতার পরিচয়।

ধর্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাঢ়ে দিনে দিনে ॥

ধর্ম্মহীন জাতির মন্ত্র কি ?

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি সংকীর্ত্তন।

বিংশ শতাব্দীতে 'বন্দেমাতরম্,' 'ভারতমাতা কি জয়' জাতীয় শ্লোগানাবলির সঙ্গে এর সাদৃশ্য কি কষ্টকল্পনা ? হরিসংকীর্ত্তনকে জাতীয় মুক্তির মন্ত্ররূপে দেখেছিলেন বৃন্দাবনদাস :

এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।

জাতির আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের জন্য যে ঐকান্তিক কামনা, তাই বীর বন্দনা। চৈতন্যভাগবতে নবদ্বীপ বর্ণনা :

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।

চণ্ডীমঙ্গলেও এই জাতীয় বর্ণনা রয়েছে।

১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা 'ধর্ম্মমঙ্গলে' দেশাত্মবোধের পরিচয় আরও সার্থক : রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'ও জীবের কল্যাণ কামনা করা হয়েছে।

গৌড় দরবারের কবিদের রচনা অনেক উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এযুগের সাহিত্যে রাজবন্দনা ও দেশ-বর্ণনাও প্রচুর। এগুলি নিছক স্তুতিগান নয়! মনে হয় এরই মধ্যে দেশ-প্রাণতার অস্ফুট আভাস রয়েছে। 'চৈতন্য ভাগবতেও' যবনভীতি আছে :

'অন্যথা যবনে গ্রাস করিবে কেবল।' এর সার্থক প্রকাশ 'বীরবাহুতে' :

এবে সেই দেশমান্যা ভারত বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে ॥

অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র 'অন্নদা মঙ্গলে' ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা ক্লাসিক সাহিত্যের অনুবর্ত্তন :

সপ্ত দ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাধ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥

এর সঙ্গে তুলনীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'ভারতবর্ষ' শীর্ষক কবিতায় :

সিন্ধু হতে ব্রহ্মপুত্র হিন্দুস্থান তুমি,
অবিস্মৃত অগণিত 'বীর-প্রসূ-তুমি !
স্বাধীনতা বেদী দিলে সুখ-পীঠ-স্থান।
গৌরব কবর এবে অসুখ আধান ;
আর্য্যালোক-বাস বলি আর্য্যাবর্ত্ত নাম
তবগরিমার বুঝি এই পরিণাম !

কাজেই ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকী সাহিত্যে যে দেশ-বন্দনা আছে, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে তা আরও সার্থক ও ব্যাপক হয়েছে। এর কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়।

উপরি আলোচিত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের আলোচনা করা কি অপ্রাসঙ্গিক ?

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির কুফল

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য

ইংরেজ আমলে লক্ষ্য করেছি যে প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনে ছাত্র-সমাজই প্রথমে সাড়া দিয়েছে, মুক্তি আন্দোলনে তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে এবং ইহাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলবার জন্য যে কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করতে, এমন কি জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। যে দেশের ছাত্রছাত্রীরা কিছুকাল পূর্বেও এইরূপ বীর ও সাহসী ছিল, যারা বৃটিশের গুলির সামনে এগিয়ে যেতেও দ্বিধা করেনি, যাদের অতীত কার্যকলাপ গৌরব মণ্ডিত, গত বছর চীনা আক্রমণের প্রথম ভাগে তাদের নিকট উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায়নি বলে কোন কোন মহল অভিযোগ করেছে। এর জন্য দায়ী ছাত্রসমাজ নয়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাই ইহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রভাব খুবই বেশী, ছাত্রজীবনে যে যেরূপ শিক্ষা পায়, তার চরিত্রও সেইরূপ ভাবে গঠিত হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনে সামরিক শিক্ষা পেলে ছাত্রের মনোবৃত্তি হবে সামরিক, ধর্মীয় শিক্ষা পেলে হবে ধার্মিক, ধর্মের সম্পর্কহীন শিক্ষা পেলে হবে দেশের কুলাঙ্গার ইত্যাদি। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্মাবতার, এবং ভীম, অর্জুন, পুরু, রাণাপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীর-পুরুষদের জীবনকাহিনী প্রতিটি স্কুলে পড়াবার ব্যবস্থা হলে ছাত্রজীবন হতেই প্রত্যেকের মনে স্বধর্ম ও স্বদেশ-প্রেমের প্লাবন আসবে, সমগ্র জাতি উন্নত ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হবে। কিন্তু সংগ্রামী মনোভাব সৃজনের ও উত্তম চরিত্র গঠনের সহায়ক এই সমস্ত পুস্তক পড়ানোর দিকে শিক্ষক মহাশয়দের ততটা ঝোঁক নেই, যতটা আছে ছাত্রছাত্রীদের $a^2+b^2=(a^2+2ab+b^2)-2ab=(a+b)^2-2ab$ ইত্যাদি শেখানোর দিকে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, বর্তমান যুগের শিক্ষাপদ্ধতি দেশে সংগ্রামী মনোভাব সৃজনের মোটেই সহায়ক নয়। ইহা ছাড়া বর্তমান যুগের শিক্ষার প্রভাবে জীবনের প্রথম ভাগ থেকেই ছাত্রদের কেহ কেহ ঈশ্বরের ভক্তি, পরলোক বিশ্বাস, গুরুজনে শ্রদ্ধা, ভদ্রতা, নম্রতা, শিষ্টাচার ইত্যাদি হারিয়ে ফেলছে। এইরূপ দৃষ্টান্তও আমাদের চোখে পড়ে, যেখানে সন্তান জনকজননীর সঙ্গে অভদ্র আচরণ করছে। শিক্ষক মহাশয়ের সামনে সিগারেট টানতে টানতে যাচ্ছে, প্রমোশন না দিলে শিক্ষককে অপমান করছে ইত্যাদি। এইতো বর্তমান শিক্ষার প্রভাব। মারাঠাবীর শিবাজীর নাম সকলেই জানেন। তিনি লেখাপড়া কম জানতেন, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি লেখাপড়া জানতেনই না। মায়ের নিকট সব সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের বীরপুরুষদের কাহিনী শুনে শুনে তাঁর ভেতর এমন স্বদেশ প্রেমের প্লাবন আসে যে তিনি হিন্দুদের তথা ভারতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য বহিরাগত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেন এবং ভারতের বুকে এক স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে যান। আজ যদি ৪৪ কোটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর স্থলে শিবাজীর মত মাত্র ৪৪ লক্ষ অল্পশিক্ষিত স্বধর্ম, স্বজাতি ও স্বদেশ প্রেমিক বীর পুরুষ এদেশে থাকতো, তবে হিংস্র চৈনিক ড্রাগনের বিষদাঁত ভেঙ্গে ভারত আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হতো।

যারা ভারতীয় স্বাধীনতার অবিনশ্বর ভাস্কর সুভাষচন্দ্রকে জাপানের দালাল বলে কুৎসা রটনা করেছে, যারা আজাদ-হিন্দ ফৌজের ভারত আক্রমণকালে এই ভারতীয় বাহিনীর বিরোধিতা ও ইংরেজের পক্ষে প্রচার কার্য চালিয়েছে, যারা বর্তমান জনপ্রিয় কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতা কচ্ছে এবং যারা চীনাহানাদারদের মুক্তিফৌজ আখ্যা দিয়ে বরণের

গর বেলায়

অস্তাচল

ফটো: বিমল সরকার
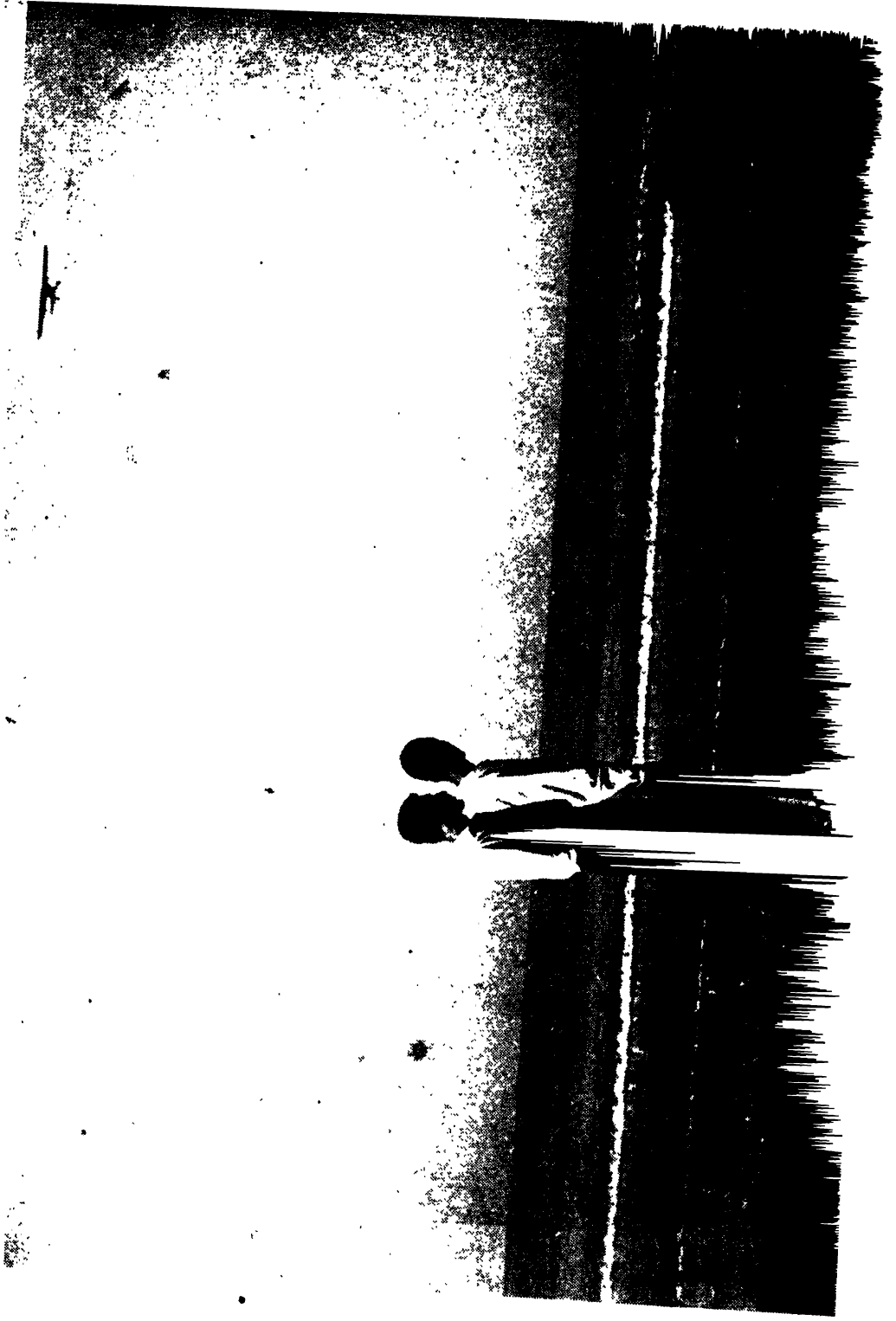
আশায় ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছে, তারাতো ভারতের বাইরের লোক নয়। তারা কিছুদিন পূর্বে এই দেশের স্কুল-কলেজেরই ছাত্র ছিল। আবার এদের মধ্যেই শিক্ষিতের হার বেশী। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলের নেতাকে কি আমরা অশিক্ষিত বলতে পারি? কিন্তু তিনি চীনকে আক্রমণকারী পর্যন্ত বলতে পারেন নি। কেরালা ও পশ্চিমবাংলায় শিক্ষিতের হার অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু এই কেরালায় ও পশ্চিমবাংলায় চীন ও পাকপ্রেমিকের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। এই সমস্ত কি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কুফল বুঝায় না? যে খাদ্যদ্রব্য মানুষের ভেতর জীবনশক্তি সঞ্চার করতে পারেনা, বরং শরীরের ভেতর নানা রোগের সৃষ্টি করে, তাকে কি কোনদিন সুখাদ্য বলা যেতে পারে? আমার মনে হয়, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি জাতির চরিত্র-গঠনে মোটেই সহায়ক নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—"আমাদের এই পুণ্য-ভূমিতে একমাত্র ধর্মই জাতীয় জীবনের বনিয়াদ। ভারত-বাসীর জীবন-সঙ্গীতে ধর্মই মূল সুর। * * * * ধর্মের পথ বর্জন করিলে তোমাদের মৃত্যু অপরিহার্য। যে মুহূর্তে তোমরা জাতীয় জীবনের এই মূল প্রবাহের বাহিরে যাইবে, তখনই ঘটিবে এই জাতির বিলুপ্তি। ধর্ম, কেবল ধর্মই ভারতের প্রাণ। উহা যদি চলিয়া যায় তাহা হইলে রাজনৈতিক প্রগতি বা সমাজ সংস্কার সত্ত্বেও—এমনকি প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে কুবেরের ঐশ্বর্য ঢালিয়া দিলেও ভারতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন নাই, একথা আমি বলি না; শুধু তোমাদিগকে মনে রাখিতে বলি যে, এই দেশে এসব লক্ষ্য গৌণ, ধর্মই মুখ্য।"

আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি একপ্রকার ধর্মের সম্পর্কহীন বলা চলে। ছাত্রজীবনে ছেলেমেয়েদের অসংখ্য পুস্তক পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মপুস্তকগুলো পড়াবার ব্যবস্থা কোন বিদ্যালয়ে আছে বলে মনে হয় না। এইভাবে বর্তমান শিক্ষার প্রভাবে জীবনের প্রথম ভাগ হতে আমরা ধর্মের পথ বর্জন করে চলেছি, যেটি আমাদের বর্তমান অধঃপতনের কারণ।

ধর্মের সম্পর্কহীন শিক্ষার আর একটি কুফল এই যে, আমাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের স্বধর্মের প্রতি আকর্ষণ নেই। ফলে খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের সামান্য প্রলোভনে আমাদের ভাই-বোনরা ধর্মান্তর গ্রহণ করে। শোনা যায় এই স্বাধীন ভারতেও দৈনিক গড়ে প্রায় হাজার হিন্দু ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়িতেছি। ১৫ বছর পূর্বে অখণ্ডভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে আমরা (হিন্দুরা) সংখ্যালঘিষ্ট ছিলাম, এই সমস্ত অঞ্চল ভারতের হাতছাড়া হয়েছে, অবশিষ্ট ভারতও সে পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। আসামের অবস্থা বর্তমানেই কাহিল। স্বধর্মপ্রিয়তা জাতিকে স্বদেশপ্রেমিক করে তোলে এবং পাঠ্যজীবন হতে শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেকের অন্তরে এইরূপ ভাব জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা জাতির ভেতর ধর্মপ্রিয়তার ভাব জাগাতে পারে না। সেই জন্যই এদেশে পঞ্চমবাহিনীর সংখ্যাবেশী। স্বামীজী, নেতাজী, গান্ধীজী ছিলেন স্বধর্মপ্রিয় এবং এই স্বধর্মপ্রিয়তাই তাঁদের ভেতর স্বদেশপ্রেমের প্লাবন এনেছিল। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে চীনপন্থী ভারতীয় নাগরিকরা ছাত্রজীবনে ধর্মবিষয়ে কোন শিক্ষা পায়নি, যা তাদের স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও বিদেশের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছে। সুতরাং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করে পাঠ্যজীবন হতে ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা না দিলে তারা ভাবীজীবনে দেশমাতার সুসন্তানে পরিণত হতে পারবে না। ছাত্রছাত্রীরা জাতির ভবিষ্যৎ, বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণকালে ছাত্র সমাজের উপযুক্ত সাড়া পেতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের ভেতর স্বধর্মের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, কারণ স্বধর্মপ্রিয়তা মানুষকে স্বজাতি ও স্বদেশ প্রেমিক করে তোলে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার সাহস ও শক্তি জোগায়।

আমার মনে হয় যে সমস্ত পুস্তক ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনের ভাবীজীবনে কোন কল্যাণ আনয়ন করবে না, সে সমস্ত বই পাঠ্য তালিকা হতে বাদ দিয়ে মাত্র কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুস্তক পড়ানোর ব্যবস্থা করলেই ভাল হয়। ছাত্রজীবনে বালকবালিকাদের অন্তরের প্রসারতা, বুদ্ধির বিকাশ ও উত্তম স্বাস্থ্য গঠনের সুযোগ দেওয়ার

অন্যও অনাবশ্যক পুস্তক পাঠ্যতালিকা হতে বাদ দিয়ে উল্লিখিত অল্পসংখ্যক বই পড়ালে ভাল হয়।

(এক) গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো নিয়ে একটি ধর্মবিষয়ক পুস্তক। (সংস্কৃত ভাষায়)।

(দুই) শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্মাবতার এবং পুরু, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীরপুরুষের পূর্ণ জীবনকাহিনীসহ একটি ভারতীয় ইতিহাস।

(তিন) একটি গণিত।

(চার) একটি বিজ্ঞান।

(পাঁচ) এই চারটির সঙ্গে আর ২।৩টি প্রয়োজনীয় পুস্তক ছেলেমেয়েদের পড়তে দিলেই যথেষ্ট।

এই সম্পর্কে এইটিও উল্লেখ করতে চাই যে, ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাধিক্য বশতঃ শুধু যে ছেলেদের ক্ষতি হচ্ছে তা নয়, অভিভাবকরাও অসংখ্য পুস্তক ছেলেমেয়েদের জন্য খরিদ করতে গিয়ে ব্যয়ভারে জর্জরিত হচ্ছেন। আমার ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে, তাদের বই খরিদ করা এবং লেখাপড়ার অন্যান্য খরচের দরুণ এমন চাপ আমার ওপর পড়ছে যে কোনরূপ পুষ্টিকর আহার সম্ভব হচ্ছে না এবং এই কারণে বর্তমানে "লো ব্লাড প্রেসারে" ভুগছি। প্রতিবছর জানুয়ারী মাসে যেন নরক যন্ত্রণা ভুগি এবং এই মাসে ছেলেদের বই খরিদ করার ব্যাপারে যা ঋণ হয়, তা সারাবছর টানতে হয়। এইরূপ বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের কত অভিভাবক যে ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচের চাপে ঋণভারে জর্জরিত হচ্ছেন এবং এই কারণে পুষ্টিকর আহারের অভাবে ভুগছেন —একমাত্র ভগবান জানেন। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে অভিভাবক হত্যার কলও বলা চলে।

ধর্মের সম্পর্কহীন ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যবসায়ীরা বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের মাত্রা এতই বাড়িয়েছে যে, এইরূপ খাদ্যদ্রব্য আহারের ফলে ছাত্রছাত্রীরা মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম ও স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছে। একদিকে শরীরের হানিকর ভেজাল খাদ্যদ্রব্য এবং অন্য দিকে অসংখ্য পাঠ্যপুস্তকের চাপ, এই দুয়ের ফলে জীবনের প্রথমভাগেই ছাত্রছাত্রীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে, তাদের স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে এবং তাদের কর্মশক্তি ও উৎসাহ এখন বিলুপ্তির পথে। ছাত্রসমাজের যদি আমরা এভাবে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দি, তবে শত্রুর আক্রমণ কালে তাদের নিকট কিভাবে সাড়া পাওয়া যাবে!

এই দেশের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছেন, তার কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ কচ্ছি :—

"বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি শুধু কেরাণী সৃষ্টির নিখুঁত একটি যন্ত্র বিশেষ। ইহার প্রভাবে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লোপ পাইতেছে। তাহারা জোর করিয়া বলিতে সুরু করিয়াছে যে, গীতা ষোল আনাই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সঙ্কলন, আর বেদ কতকগুলি পল্লীগীতির সমাবেশ মাত্র। ভারতের বাহিরের জাতি ও বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জ্ঞান অর্জনে ইহাদের উৎসাহ প্রচুর; কিন্তু নিজেদের চৌদ্দপুরুষ তো দূরের কথা, সাত পুরুষের নাম পর্যন্ত ইহারা জানে না।

আমাদের গুরুমহাশয়রা ছেলেদের তোতাপাখী করিয়া তুলিতেছেন। রাশি রাশি বিষয় ঢুকাইয়া তাহাদের কোমল মস্তিষ্কগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন। হা ভগবান! গ্র্যাজুয়েট হইবার আজ কী হুড়াহুড়ি! কিন্তু কিছুদিন পরে সব ঠাণ্ডা! আর এত কাণ্ড করিবার পর তাহারা এইটুকু মাত্র শিখে যে, এদেশের ধর্ম, রীতিনীতি সব অসার, এবং পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই বরণীয়। তারপর স্নাতকোত্তরকালে দেখা যায় যে, অন্ন সংস্থানের যোগ্যতাটুকুও অর্জন করা হয় নাই। এরূপ উচ্চশিক্ষার কী সার্থকতা? ইহা লোপ পাইলেও তেমন কিছু যায় আসে না। এই ধরণের শিক্ষা অপেক্ষা খানিকটা কারিগরীশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে অনেক ভাল হইত; কারণ তাহা হইলে চাকুরীর প্রত্যাশায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যে-কেহ সহজেই কাজের যোগাড় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারিত।

* * * *

স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা তোমরা আজকাল পাইতেছ, তাহা শুধু অজীর্ণ রোগগ্রস্তের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছে। তোমরা শুধু যন্ত্রের মত কাজ করিয়া চলিয়াছ, আর জীবনযাপন করিতেছ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মত।

মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতঃই বর্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা। এই সকল শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষ-তৈয়ার। শিক্ষা বলিতে এমন তথ্য-রাশি বুঝায় না, যাহার মর্ম কখনও হৃদয়ঙ্গম হয় না, অথচ যাহা শুধু মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া সারা জীবন উহাকে অনর্থক বিপর্যস্ত করিতে থাকে। * * * শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি যথার্থ কার্যকরী জ্ঞান অর্জন, বর্তমান পদ্ধতি যাহা পরিবেশন করে, তাহা নহে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যাহা দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি-বৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে।

আমি মনে করি ধর্মই শিক্ষার অন্তরতম অঙ্গ। ইহা যেন অন্ন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত অপর সবই ব্যঞ্জনস্থানীয়।"

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে স্বামীজীর উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বর্তমান যুগের শিক্ষার প্রভাবে মানুষের মন থেকে ঈশ্বরে ভক্তি, পরলোকে বিশ্বাস, ধর্মে আস্থা এবং সেইরূপ অন্যান্য সুভাবগুলো ধীরে ধীরে বিলোপ পাচ্ছে, দেশে রাবণ ও বিভীষণের সংখ্যাক্রমে বেড়ে চলেছে। বাইরের জাতি ও বিষয়-সমূহের জ্ঞান অর্জন এবং পৃথিবীর আদিম থেকে বর্তমান যুগের তথ্যসমূহ অবগত হওয়ার জন্য এই দেশের অধি-বাসীদের আগ্রহ খুবই বেশী, কিন্তু এই দেশের শতকরা ৯০জনই হয়ত প্রপিতামহের নাম পর্যন্ত জানে না। গীতা আমাদের পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু "গীতা" কি জিজ্ঞেস করলে এইদেশের শতকরা ৭৫জন হয়ত জবাব দিবেন "গীতা" একটি মেয়ে। মাষ্টারমশায়রা গীতার বিষয়বস্তু নিয়ে সাধারণতঃ শ্রেণীতে আলোচনা করেন না, ফলে ছাত্রেরা পাঠ্যজীবনে বা ভাবীজীবনে এর চেয়ে বেশী বলতে অসমর্থ।

মোট কথা, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী দেখা যাচ্ছে। এইরূপ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না, মানুষের ভেতর স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি অনুরাগ জাগে না এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকল্পে সংগ্রাম করবার মনোবল জোগায় না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ছেলেমেয়েদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার এবং তাদের পিতামাতাদের মেরে ফেলার একটি যন্ত্রবিশেষ বলা চলে। স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষও তাই বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছেন। দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।"

তুমি যে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তুমি যে ডাকো আমায় দূরে
খেয়াঘাটে একলা তখন
নিঝুম দুপুরে।
মেঘের সঙ্গে কী করে যায় মেশা
বল কোন দাঁড় বাইবার নেশা
নিয়ে যায় আমায় তেপান্তরে ?

একলা আমি চলতে পারি না যে
মনে পড়ায় চপল পলক মাঝে
সন্ধ্যা যখন আলিঙ্গনে বাঁধে
সিন্ধু তখন উধাও হবার সাধে
গুণগুনিয়ে ওঠে অবাক সুরে।

সেখানে নেই কোনো আশার মায়া
সেখানে তো ঘুমেরই আবছায়া
সেইখানেতে যদি দাঁড়াই পাশে
সময় শুধু আপন অট্টহাসে
বন্ধ দুয়ার তোমার অন্তঃপুরে॥

'বিস্মরণী'র কবি মোহিতলাল

মিহিরকুমার রায়

ভারতীপর্বের কবিগণ সূর্যমুখীফুলের মত রবীন্দ্র-প্রতিভালোকে যখন প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠছিলেন, তখন রবীন্দ্রানুসারী ভাবধারাকে পাশ কাটিয়ে তিনজন কবি বাংলা সাহিত্যে নোতুন সুর ও স্বাদ সঞ্চার করলেন। এই কবিত্রয়ের মধ্যে সর্বাগ্রজ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং সর্বকনিষ্ঠ নজরুল ইসলাম। মোহিতলাল এলেন এঁদেরই মাঝখানে। যতীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে আমদানি করেছিলেন বুদ্ধিবাদপ্রসূত প্রশ্নমনস্কতা, বলিষ্ঠ অবিশ্বাস এবং স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া। বাংলার ছেলে হয়েও তিনি গীতিমুখরিত বনবীথিকার পরিবর্তে স্বপ্ন দেখেছেন গোবী সাহারাকে। আর সেই স্বপ্নে ভেসে উঠেছে জড়বাদ, প্রেম ও যৌবনের প্রতি কবিমনের সক্রিয়-বুদ্ধির বিরূপতা এবং দুঃখবাদ। এই দুঃখবাদ কিন্তু সোপেনহাওয়ারী দুঃখবাদ নয়। মানবপ্রেমে অভিসিঞ্চিত দুঃখবাদ মানবপ্রেমেরই মহাসংহিতা।

কাব্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবমুহূর্তটি ছিল রবীন্দ্রনাথের অরূপ সাধনার পর্ব এবং রবীন্দ্র-ভাবনায় ভাবিত রোমান্টিক ভাববিলাসী কবিদের কলগুঞ্জনের যুগ। কাব্যসাহিত্য 'জীবনের ক্ষেত্রে প্রাণপ্রদ ও প্রাণবিদারক রস' সঞ্চারিত করে। রবীন্দ্র সমকালীন অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রে তা 'বিলাস ভোগ্যবস্তু'তে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই এই কবিত্রয় রবীন্দ্রযুগের কবি হ'য়েও রবীন্দ্র-ভাবিত পন্থা পরিত্যাগ করে অন্য পথে চলতে সুরু করেছিলেন।

নজরুল এলেন বিদ্রোহীসত্তাকে নিয়ে। 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল যেদিন আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না' সেইদিনই কবির বিদ্রোহী সত্তা শান্ত হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। জনগণের বুক ও মুখের ভাষার বাণীগ্রন্থনই তাঁর কাব্য। সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ-ই তার প্রমাণ। অবশ্য তার সঙ্গে এসে মিশেছে প্রেম-ভালবাসার প্রতি কবির তন্নিষ্ঠ সাধনা—যেন বিষ্ণের বাঁশীর ফুৎকার মিলিয়ে গেছে দোলন চাঁপার কুঞ্জবনে।

জগত ও জীবনকে পরিত্যাগ করে যখনই কবিদের সাধনা শুরু হয়েছে মঙ্গলময় অনধিগম্য ভাবকে নিয়ে, রোমান্টিক বিলাসিতাকে নিয়ে, তখনই বাংলা সাহিত্যে এই কবিগণের আবির্ভাব।

মোহিতলাল এলেন বলিষ্ঠ ভোগবাদকে নিয়ে! ভাওআলের কবি গোবিন্দদাসের যে ভোগবাদ, তারই উত্তরসাধক আমাদের কবি। কিন্তু গোবিন্দদাস যেখানে 'কামনার কালীদহে' নারীদেহের পঙ্ককুণ্ডে আত্মনিমজ্জনেই পরিতৃপ্ত, মোহিতলাল সেখানে 'দেহেরি মাঝারে দেহাতীতের ক্রন্দন সঙ্গীত শুনেছেন। মোহিতলালের ভোগবাদকে বলাধান করেছে তাঁর অকুণ্ঠ মানব প্রেম ও মর্ত্যপ্রীতি। সমসাময়িক কালের রবীন্দ্রানুসারী কবিদের যে ভোগবাদ তা ভিক্টোরীয় যুগের আদর্শবাদের ও শুচি-শুভ্র সৌন্দর্য নিষ্ঠার আলোক সম্পাতে প্রোজ্জ্বল। দেহকে বাদ দিয়েই অদেহী প্রেম-স্বপ্নে মশগুল ছিলেন এঁরা। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে দেহজ প্রেম তো কোনদিনই সত্য সাধনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি। ঔপনিষদিক ভাবধারায় ভাবিত কবি মঙ্গলময় চৈতন্যে বিশ্বাসী বলেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মানুষের স্থূল দেহটা পরিত্যক্ত হয়ে মানব জীবনের গভীর ভাব স্বরূপটিই স্থান পেয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের মধ্যে ঐ ত্রয়ী কবির সুর-স্বাতন্ত্র্য যুগ-রুচির প্রতি তাঁদের মানসিক বৈরূপ্যেরই চিহ্ন। এই রকম যুগ-বিরূপতা নিয়েই মোহিতলাল বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর স্বল্পসংখ্যক কাব্যগুচ্ছ নিয়ে। কিন্তু সংখ্যার স্বল্পতা ভাবের ন্যূনতা প্রকাশ তো করেই না, বরং কবিব্যক্তিত্বের গভীর প্রত্যয়লব্ধ অভিজ্ঞতার আলিম্পনে এবং রচনা-শৈলীর ঘনগম্ভীর পরিবেশ সৃজনে একক মহিমার দীপ্তি দান করেছে কবির কাব্য সম্ভারকে।

মোহিতলাল কাব্যের ক্ষেত্রে শাক্ত-সাধক বামাচারী কবি বলেই খ্যাত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপনপসারী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। করোটীর পানপাত্রে আসব পান করার উদগ্র বাসনা কাব্য-ক্ষেত্রে তাঁর 'রুচির ধর্ম' পালনেরই প্রতীক। জগত ও জীবনকে অধ্যাত্মসুন্দর ভাববাদীর দৃষ্টিতে না দেখে তিনি জীবনকে কঠিন আশ্লেষ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভোগবাদ ভোক্তার বলিষ্ঠ আত্মতৃপ্তির কলধ্বনি। ভুঞ্জনের মহিমা ও ত্যাগের গরিমা উভয়ই তাঁর সেই ভোগ-বাদকে উজ্জ্বল করেছে। প্রেমের যে বাণী-সংহিতা কবি নির্মাণ করেছেন, সে প্রেম চলিষ্ণু জীবনেরই অংগাবরণ মেখে নিয়েছে। কামই প্রেমের ভিত্তি। আবার দেহ-ই সকাম প্রেমের জন্ম দেয়। মোহিতলাল ঐ দেহকেই অবলম্বন করেছেন এবং দেহ-ভুঞ্জনের মাধ্যমেই প্রেমের শুভ্র শতদলের সৌরভ লাভে ধন্য হয়েছিলেন।—

হায় দেহ!—নাই তুমি ছাড়া কেহ—
জানি তাহা প্রাণে প্রাণে,
মুরতি পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমাপানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহা পরিশেষ!—
দেহ-লীলা অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে!

জনৈক সমালোচক বলেছেন—"যতীন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি জড়বাদীরূপে; তাহারই একটু রকম ফেরে মোহিতলালকে পাইতেছি দেহবাদীরূপে। রকম ফের বলিলাম এই জন্য, জড়বাদই ত দেহবাদের বনিয়াদ।" সমালোচকের এই মন্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে হয়। কারণ যতীন্দ্রনাথের জড়বাদ সক্রিয়-বুদ্ধিবাদপ্রসূত। জীবন-সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে উষর প্রান্তরের ক্যাকট্যাস জাতীয় এক রুক্ষ প্রাণের ধর্মই সেখানে প্রকাশিত। বাইরেটা জড়-জাতীয় কিন্তু অন্তর তা নয়। প্রতিক্রিয়ার চাপেই প্রথম যৌবনের ঘোষণা—'চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই'। উত্তর জীবনে চেতনার কূলে অতিক্রান্ত যৌবনের প্রাণধর্মের প্রতি স্মৃতিতর্পণ আছে। কিন্তু মোহিতলালের দেহবাদে জড়-বাদ নেই। প্রাণহীন দেহবাদ দেহভুঞ্জনের আবিলতার নামান্তর মাত্র—এ কথা কবি ভালভাবেই জানতেন। তাঁর দেহবাদে 'মনের মমতা'—প্রেম—এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

শাস্ত্রোক্ত বাণী নারী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির সাক্ষ্য বহন করে—নারীকে শ্মশানঘাটের মতই পরিত্যাগ করা উচিত, নারী নরকের দ্বার ইত্যাদি। মোহিতলাল এই ভাবধারায় অবিশ্বাসী। 'পান্থ' কবিতায় সোপেনহাওয়ারের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত কবি-উক্তিই তাঁর মানস-প্রকৃতির স্বাক্ষর বহন করে। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী শ্যামল অথচ ভ্রূকুটি ভয়াল অবস্থাকেই কবি জীবন বলে কল্পনা করেছেন এবং সেই জীবনকেই পরিত্যাগ করে যাঁরা "দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ স্বপনে" মশগুল, তাঁদের দলে তিনি নিজেকে 'ব্রাত্য' বলে আখ্যাত করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। কবি-হৃদয় যেন শাশ্বত প্রেমিকপুরুষের মতই বলে উঠতে সক্ষম হয়—

প্রকৃতি জোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন,
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার
অতৃপ্ত নয়ন।

এই অতৃপ্তির তৃপ্তিই কবিকে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ স্মরগরলে 'নারীস্তোত্র' রচনায় প্ররোচিত করেছে। কবির এই দেহচেতনায় তথা প্রেমভাবনায় পারসিক প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এও সত্য যে "পারস্যের পহ্লবী অধ্যায় থেকে কবি যে নূরজাহানকে নিয়ে" এসেছিলেন কবি তার দাহন ও দীপ্তি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি; সেই দাহন ও দীপ্তির পেছনে কবির জীবনসত্য ও কাব্যসত্য লুকিয়েছিল এবং ঐ সত্যেরই বহিঃপ্রকাশ 'পান্থ' কবিতায়—

তাই আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের
দীপখানি জালো।

এই উপাসনার মধ্যে কবি-চিত্তের বিরাটত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেহ-কেন্দ্রিকতা প্রেম সম্ভাব্যতাকে এনে দিলেও

কবি তাঁর প্রেম কবিতায় যে প্রেমের জয়গান গেয়েছেন তা শক্তিহীন রতি-উৎসুকের ব্যাভিচার নয়—তাত আছে "প্রীতি-নিবিড় বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে পূর্ণভাবে জাগ্রত করিয়া তাঁহার জীবন চেতনাকে বৃহত্তর চেতনার অধীন করিয়া লইবার" সাধনা।

মোহিতলাল 'দেহ'কে প্রেম-সাধনার সোপান হিসেবে গ্রহণ করলেও বিস্মরণীর 'অকাল-সন্ধ্যা' কবিতাটি আপাত-দৃষ্টিতে কবি-ধর্ম-বিচ্যুতির পরিচায়ক বলে মনে হয়। কবি তাঁর কাব্যগুচ্ছের মধ্যে যে দেহবাদ-স্বরূপের জয়গান করেছেন, এটি তার একটি বিরল-ব্যতিক্রম। দেহকে কেন্দ্র করে কবির প্রেম-জীবনের যে উদ্বোধন হয়েছিল, তা যেন আজ বেদনা-ঘন পরিবেশে অস্তমিত হতে চলেছে আকালিক সন্ধ্যার সজল মেদুরতার মধ্যে। এই রকম বিরল ব্যতিক্রম কবিতা পাঠে পাঠকের ধারণা স্বভাবতঃই আহত হয়—পাঠক ভাবতে থাকেন, যে দেহবাদের বনিয়াদ কবি এতক্ষণ রচনা করেছেন, তা হয়তো কবির নিজ প্রাণ-ধর্মেরই বিরুদ্ধাচরণ মাত্র। কিন্তু এই কবিতাটিতে যে সত্য প্রকাশিত তা কবির প্রাণধর্মের বৈরূপ্য প্রমাণক নয় বরং অন্যতর সত্যই স্বয়ং প্রকাশিত। কবির ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তা যে বিভিন্ন দুটি সমান্তরাল পথে চলেছিল তা এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। কবি আত্মা ও ব্যক্তি আত্মার পারস্পরিক মিলন ঘটানো অসম্ভব হয় তখনই যখন ব্যক্তি-আত্মা নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মত নির্জনতা-ভিক্ষু হয়ে ওঠে। মোহিতলালের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। প্রেম ও জীবনের প্রতি ব্যক্তি-আত্মার আলিম্পনাঙ্কিত আসক্তি প্রকাশকে নিষ্ঠাবিরোধী বলে ভেবে নেওয়ার প্রতিক্রিয়া মোহিত-লালের মধ্যে ছিল। তাই এই কবিতাটি পাঠকের দৃষ্টিতে সুর-স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন বাহক হয়ে উঠেছে। কবি সত্তার পেছনে ব্যক্তি-সত্তার এই নিষ্ঠাচার ছিল বলেই কবির কাব্যে কোথাও মদনোল্লাসের গ্রন্থি-ছেঁড়া অনিষ্ঠা প্রকাশিত হয়নি বরং প্রেম এক অপূর্ব মহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

মোহিতলালের দেহবাদের পাশে পাশে কবির অকুণ্ঠ মানবপ্রেমের প্রকাশ কতকগুলি কবিতার বিষয় বস্তু। বিস্মরণীর 'কালাপাহাড়' ও 'স্বপন পসারী'র 'নাদিরশাহের জাগরণ' ইত্যাদি কবিতায় ঐ ভাবের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোপুরি বহ্নিপূজারী কবি। তিনি অগ্নি-বৈশ্বানরকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর কাব্যে। মোহিতলালও রুদ্রসাধক কবি। সেই রুদ্র সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল কবির আসবপানমত্ত অঘোর পন্থীর দুর্বার প্রবৃত্তি। তাঁদের পার্থক্যও কম ছিল না। জীবন ও যৌবধর্মের সাধনায় মোহিতলাল যখন বেহুঁশ, মাতাল; 'যতীন্দ্রনাথ তখন জীবনকে নির্যাসশূন্য করে তোলার মত্ততাতেই বেতাল'। কিন্তু মানুষের জীবনকে দেবতা ও অদৃষ্টের ফাঁসি থেকে বাঁচাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা উভয়েরই লক্ষ্যে ছিল। যতীন্দ্রনাথ যখন লেখেন :

> চির বিদ্রোহী মানব আত্মা—আজিও তোমার
> মানে কি বশ,
> জনে-জনে তারা বিশ্বামিত্র হরিতে বিশ্বকর্মা-যশ।
> … … …
> এ জগতে তব স্বেচ্ছাতন্ত্র,—তাই নর তার জবাব দিতে
> গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তরে প্রাণপাত করে এ পৃথিবীতে।
> (অপমান, মরুশিখা)

মোহিতলালও তখন বলেন—

> ভেঙ্গে ফেল মঠ-মন্দির চূড়া, দারু-শিলা
> কর নিমজ্জন !
> বলি উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন !
> নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ যবন, নাই ভগবান্—ভক্ত নাই,
> যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে। মানুষের বুকের
> রক্ত চাই !
> ছাড়ি লোকালয় দেবতা পালায় সাত সাগরের
> সীমানা পার।
> … … …

মোহিতলাল মানব-প্রেমের উদাত্ত সঙ্গীতে এমনই আত্ম-হারা যে সভ্যতা বিধ্বংসী মানবশোণিত লোলুপ কালা-পাহাড়কেও আহ্বান জানাতে দ্বিধা করেন নি। নজরুলের বিদ্রোহী সত্তায় এমন-ই একটি স্বরাট পুরুষের পদসঞ্চার অনুভূত হয়েছে। 'দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্বিসহ।' বলে যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে তাই তাঁদের কাব্যের ধ্রুবপদ। ধর্মধ্বজীদের চোরাবালিতে যখন মানব হৃদয় ক্লেদঘন, অবস্থার বিপাকে যখন মানবি-কতার কণ্ঠরুদ্ধ তখনই এই কবিদের আবির্ভাব। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জনঅভ্যুত্থানের পাশে কাব্য জগতে ধ্রু-

জাতীয় জনঅভ্যুত্থান যুগ-মানস পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী স্বাক্ষরই বহন করছে। সত্যেন্দ্রনাথ এতখানি বিদ্রোহী হয়ে না উঠলেও তাঁর কাব্য শুধু সারস্বত বন্দনায় কিংবা মঞ্জুল ছন্দ হিল্লোলে দোলায়িত নয়, তাঁর কাব্যের মধ্যেও বিশ্বজনকে আহ্বান জানিয়ে নতুন পৃথিবীর 'বারতা' শোনানর বাসনা স্বয়ং প্রকাশিত—

জাগ, জাগ, ওগো বিশ্বমানব! বারতা এসেছে আজ!
তোমার বিশাল বপু হ'তে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ,
মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি-পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে যার ঘর।"

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্য কবিত্রয়ের পার্থক্য শুধু সুরের ও প্রকাশভঙ্গীর। একজনের সুর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব-প্রসূত সর্বজনের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সুর, অন্যদের সুর ওজোগুণদীপ্ত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহী সুর।

'বিস্মরণী'র অন্তর্গত দুটি কাব্য নাটিকায় মোহিতলালের কবি প্রতিভার বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। অতীতের পৃষ্ঠা থেকে কবি এমন কতকগুলি রুদ্ধ শ্বাস উৎকণ্ঠাবোধক চরিত্র অবলম্বন করেছেন যাদের মাধ্যমে কবি স্বীয় সৃষ্টি শক্তির চমৎকারিত্বকে সাধারণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। জাহাঙ্গীর নূরজাহানের দেহ-কান্তির সৌষ্ঠব ও দাহন-দীপ্তি দেখে তাঁকে সাম্রাজ্ঞীর আসন দান করেছিলেন। কিন্তু সেই সাম্রাজ্ঞীর প্রাণদণ্ডাদেশ জারী করা হ'লে যখন নূরজাহান জাহাঙ্গীরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন, তখন জাহাঙ্গীরের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে সঙ্কটময় মুহূর্তের সৃষ্টি করেছিল তাই কাব্য নাটিকায় প্রাণবন্ত হিসেবে স্মরণ্য। জাহাঙ্গীরের সেই সঙ্কটময় মুহূর্তকে আরও জটিল ঘটনাবর্তে পরিণত করেছে নূরজাহানের প্রেম ও প্রেম-সমাধি সম্ভাবনার মধ্যবর্তী এক নিঃশঙ্ক জীবনের তিক্ত মধুর স্মৃতিচারণা। 'রোমান্স রঙ্গিণ জীবনাদর্শের ঐশ্বর্যমণ্ডিত আদি ও অকৃত্রিম জীবনের যে বলিষ্ঠতা,' তাই এই কবিতায় আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

'মৃত্যু ও নচিকেতা'র মধ্যে মৃত্যুর স্বরূপ জানার আগ্রহ ব্যাকুলতায় উদ্বেলিত হৃদয় নচিকেতা বৈবশ্বতের কাছে যে ভাবে মৃত্যুর মহান্ গম্ভীর, প্রশান্ত উদার মূর্তির আবির্ভাব মুহূর্তটির জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে তার ভাব স্বরূপই এই কবিতাটিকে অপূর্ব চমৎকারিত্ব দান করেছে। পরিবেশ সৃজনে পুরাণজীবনের অঙ্গাবরণ নাটিকাটিকে বিলীয়মান অতীতের স্মৃতি সুরভিতে ভরে দিয়েছে। কবির ক্ল্যাসিক্যাল মেজাজ সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে কবির মনে যে 'form' সচেতনতা দেখা গিয়েছিল, তারই অনুবর্তন এই সব কবিতায়। Dramatic lyric সৃষ্টিতে ইংরেজ কবি ব্রাউনিং-এর স্থান অদ্বিতীয়। মোহিতলালও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই স্মরণীয়। রূপনেমীর প্রতি কবির তন্নিষ্ঠ আগ্রহের ফলেই এই কবিতাগুলির জন্ম। কিন্তু তবুও এই সব কবিতায় রূপ-সচেতনতার সঙ্গে কবির ভাবাভিব্যক্তি প্রকাশ দুর্লক্ষ্য নয়। উপসংহারে মোহিতলালের এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি (title poem) আলোচনা করেই আমাদের আলোচনায় ছেদ টানবো। এই কবিতাটি আত্ম-দিদৃক্ষামূলক কবিতা। কবি তাঁর ফেলে-আসা জীবনের দিকেই শুধু দৃষ্টিপাত করেন নি, তাঁর নতুন সুরের অপূর্ণতা ও ব্যর্থতার কথাও বলেছেন। সকল প্রতিভাশালী আত্ম-সচেতন কবির মনেই এই দিদৃক্ষু মনটি বাসা বেঁধে থাকে। রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল পর্যন্ত, এমন কি অত্যাধুনিক সমাজ সচেতন কবিও নিজেদের কবি জীবনের পর্যালোচনা করে থাকেন।

যতীন্দ্রনাথ বাংলার ছেলে হয়েও কেন গোবী-শাহারার স্বপ্ন দেখেছেন, প্রেম ও যৌবনকে কেন অস্বীকৃতি জানিয়েছেন—তার একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁর কাব্যে। নজরুল তো ব'লিষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন—

পরোয়া করি না বাঁচি আর না বাঁচি
যুগের হুজুগ কেটে গেলে
মাথার ওপরে জ্বলছেন রবি, রয়েছে সোনার
শত ছেলে।

তাঁর একান্ত বাসনা—তাঁরই শোণিতাক্ষরে যেন সর্বনাশীদের পরোয়ানা লেখা হয়।

মোহিতলালেও ঐ রকম আত্মদিদৃক্ষা বড় হয়ে উঠেছে, বাংলার নিত্য প্রবহমানা কাব্যস্রোতে কবি যে নতুন

শোণিত স্বাদ সঞ্চারিত করেছিলেন, তা বাংলার হৃদয় ধর্ম বিরুদ্ধ বলেই তাঁর মনে হয়েছে। বলিষ্ঠ কবি ব্যক্তিত্বের সঞ্জীবন মন্ত্রে কবে যে সুর আমদানী করেছিলেন তা হয়তো বর্তমান পাঠকের কাছে উপভোগ্য হবেনা—এই ধারণাই তাঁর মনে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি আলোকাভিসারের পরিবর্তে তিমিরাভিসারকেই বরণীয় করে তুলেছিলেন। এতে কবির আক্ষেপ নেই, বরং আপনার ব্রত সাধনায় আত্ম প্রত্যয়ের সুরই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং শেষতঃ এই আশাবাদও তিনি পোষণ করেছেন—

'যে গান হেথায় হল নাকো সারা
সুর খানি তার হবে না যে হারা,
আরেক ভুবনে সন্ধ্যার তারা
লইবে তাহারে তুলে—
নব জাগরণী গাইবে সেথায়
বিস্মরণীর কূলে।'

বিশ্বামিত্র

মুকুন্দবিহারী মিত্র

কল্পনায় হেরি তব তপঃশীর্ণ মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়
ধ্যান-মৌন মহা ঋষি। তিলে তিলে করিতেছ ক্ষয়
তপস্যার হোমানলে বাসনা বন্ধন। অকস্মাৎ
কুঞ্জে কুঞ্জে বেজে ওঠে বসন্তের মদির সঙ্গীত
গুঞ্জরিয়া ওঠে অলি; শুরু হ'লো কুসুমের মেলা
মলয় হারালো দিশা, স্রোতস্বিনী
পুলক বিহ্বলা।

সহসা ঝঙ্কারি ওঠে নৃত্যপরা কোন্ অপ্সরার
নূপুর আকাশ পথে? অতনু হানিল পুষ্পশর
অলক্ষ্যে হৃদয় মাঝে। নির্ব্বাপিত লালসা অনঙ্গ
আসক্তির চিতাভস্মে জ্বলিল আবার। মহাকাল
হাসিল নীরবে। লাস্যময়ী নারী
হ'লো কল্পনার
মায়াময়ী—গ্রাসিল সে হুতাশন ছায়াতনু তার।

অপ্সরা বিদায় হ'লো—রেখে গেল তীব্র তুষানল
জীবনের মর্ম্মমূলে। যুগান্তের সাধনার ফল
চকিতে মিলায়ে গেল, ধূলিসাৎ স্পর্দ্ধিত বাসনা
ব্রাহ্মণত্ব লভিবার—নব বিশ্ব করিতে রচনা
উপেক্ষিয়া বিধাতায়। সেই হ'তে রুদ্রমূর্ত্তি তুমি
ভয়ঙ্কর, দেবতা মানব ত্রাস—তোমারে প্রণমি।

তোমারে প্রণমি ঋষি—ভ্রূকুটি-কুটিল তব ভাল
ত্রিলোকের বিভীষিকা। তোমার গোপন অশ্রুজল
রিক্ততার নীরব বেদনা পশিছে অন্তরে মোর
কল্পান্তের পার হ'তে। ব্যর্থতার আঘাতে কাতর
তবু শির সমুন্নত। বীর্য্যাব ন্ হে মহাসাধক
বিশ্বের অমিত্র তুমি—বিশ্বামিত্র জ্বলন্ত পাবক।
মিত্রকুলপিতা তুমি—আমি মিত্র, করিব সৃজন
কাব্য-অর্ঘ্য তব নামে—তা'রে তুমি করিও গ্রহণ।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

তৃতীয় পর্ব

(কাঁটা ও ফুল)

এক

গৌরী কাশীতে গুরুচরণে আশ্রয় নেওয়ার পরে আরো তিন বৎসর কেটে গেছে। রমার বয়স এখন ষোলো, দত্তাত্রেয় চোদ্দয় পড়েছে। সে প্রায়ই কাশীতে আসে, থাকে বন্দনার কাছে। মন্থুভাই এখন প্রৌঢ়, পঞ্চাশে পা দিয়েছে। কিন্তু এখানে একটু থেমে সংক্ষেপে বলতে হবে এ কয় বৎসরে এ দুটি পরিবারের মধ্যে নানা ওলট পালটের কথা।

গৌরী রমাকে নিয়ে কাশী চ'লে যাবার পরে মন্থুভাই প্রথমদিকে ক্ষেপে উঠে কাশী রওনা হয় আর কি—যাবে কয়েকজন গুণ্ডা নিয়ে, আনবে রমাকে ছিনিয়ে, গৌরীকে দেবে শিক্ষা যে জোর যার মুল্লুক তার। কিন্তু পিণ্টো ত্রস্ত হ'য়ে ওকে উপশান্ত ক'রে বলে আদালত করবে। পারিবারিক কেলেঙ্কারি নিয়ে আদালত করবার ইচ্ছা মন্থুভাইয়ের সত্যিই ছিল না একটুও, কিন্তু ও ভেবেচিন্তে রাজি হয় শুধু এই আশায় যে রমাকে আদালতের রায়েহেফাজতে পেলে হয়ত গৌরীকেও ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে। গৌরী কী ধাতু দিয়ে গড়া ও শুধু যে জানত না তাই নয়, অকুণ্ঠে পিণ্টোর বৈজ্ঞানিক বেদবাক্য শিরোধার্য করল: যে, সব নির্ভরযোগ্য জ্ঞানেরই ভিৎ হচ্ছে পরিসংখ্যান—statistics, স্ত্রীর হালচালের ঠিক দিয়ে আঁক ক'ষে পিণ্টো ওকে বুঝিয়ে দিল মেয়েদের জীবনের কেন্দ্র সন্তান, গৌরীও মেয়ে, অর্থ রমাকে আদায় করলে গৌরীও আদায় হবেই হবে—কান টানলে মাথা না এসেই পারে না—E. D.

কিন্তু মনস্থির করতে মন্থুভাইয়ের তিন চার বছর লাগল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সে কত লেখালেখি, লোক পাঠানো, তর্জন গর্জন, টেলিফোন কী নয়? শেষে যখন দেখল গৌরীর ফেরার আশা দুরাশা তখন সে অগত্যা আদালতে কেস আনল।

মন্থুভাই ভেবেছিল গৌরী প্রাণপণে লড়বে রমার হেফাজত দাবি ক'রে। কিন্তু ও আশ্চর্য হ'ল যখন কোর্টে গৌরী কোনো উকিলই মোতায়েন করল না। মহাদেব চেয়েছিলেন উকিলের সব খরচ দিতে। কিন্তু বিষ্ণুঠাকুর বললেন শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে: "অসম্ভব, আদালতে কোনো কিছুর জন্যেই করতে পারি না আমরা। সে পারে বিষয়ী সংসারী। গৃহী যোগীকে হ'তে হবে 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী'। তিনি যা করেন: thy will not mine be done"

ফল যা হবার—মন্থুভাই চার্জ আনল desertion এর—স্ত্রী ছেড়ে গেছে। আদালত স্ত্রীর প্রতিবাদ না পেয়ে তাকে দোষী ধরে নিয়ে "নিরপরাধ" (?) স্বামীর স্বপক্ষেই ডিক্রি দিল অপরাধিণী স্ত্রীর বিপক্ষে: সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত রমাকে থাকতেই হবে পিতার হেফাজতে। গৌরী রমাকে বুকে ধ'রে আশীর্বাদ ক'রে বলল: "ভয় কোরো না মা, এখানকার আদালতের রায় উপরকার রায়ে উল্টে যাবেই যাবে যদি তুমি শুধু সেই আদালতেরি মুখ চেয়ে থাকতে পারো। মনে থাকবে?"

রমা চোখের জল মুছে বলল: "থাকবে মা। কেবল তুমি ভুলো না।" গৌরী বলল: "মা, তুমি আমার

কাছে দেবতার বর, গুরুর আশীর্বাদ, তোমাকে কি ভুলতে পারি ?"

রমা পুণায় ফিরে এল শূন্য গৃহে, কিন্তু অচল অটল। বাপের সামনে এতটুকু হা হুতাশ করল না।

এ যে অভাবনীয়। পিণ্টো বিজ্ঞানের জ্ঞানকোষের নানা নজির ঘেঁটে বোঝালো ওকে—কিন্তু সে-নজিরে মনুভাইয়ের বিশেষ লাভ হ'ল না, কারণ রমাকে ফেরৎ পেয়েও গৌরীকে টলাতে পারল না। তখন হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকে ওর মনে প'ড়ে গেল বিষ্ণু ঠাকুরের একটি প্রায়োক্তি: গৌরী আর প্রহ্লাদ মস্ত আধার। কিন্তু এ কী কাণ্ড ? ও যে স্বপ্নেও ভাবে নি যে, যে-গৌরীর মেয়ে-অন্ত-প্রাণ ছিল সে এক কথায় শুধু গৃহসুখ ও বিলাস নয়—প্রাণাধিকা মেয়েও ছাড়তে পারবে গুরুর জন্যে ও ভেবেছিল মোক্ষম চাল চেলেছে। কিন্তু ঠাকুরের চাল ছিল আরো মোক্ষম। তাই যখন মেয়েকে ফেরৎ পেয়েও মনু-ভাই মেয়ের মাকে ফিরে পেল না তখন ওর প্রথম মনে হল যে, পিণ্টোর বৈজ্ঞানিক পরামর্শ শুনে রমার হেপাজতের দাবি ক'রে মস্ত ভুল করেছে: লাভ তো কিছুই হ'ল না। উপরন্তু সবাই ওকে ছিছি করতে লাগল এমন লক্ষ্মীপ্রতিমা মেয়েকে মার কাছ ছাড়া ক'রে আনার জন্যে। আর শুধু সবার চোখে ছোট হওয়ার লজ্জাই তো নয়—রমাকে এনে ও ঠেকে শিখল—যুবতী মেয়েকে সাবধানে রাখবার না আছে ওর সময় না সাধ্য। রমা উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়—বড়ই দৃষ্টিকটু। ও ঠিক করল রমার জন্যে একটি পাত্র ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ওকে কাশীতে মার হেফাজতে রাখাই বিধি। তাছাড়া গৌরীকে আর একবার তুতিয়ে পাতিয়ে ফেরাবার চেষ্টা করলে মন্দ কি ?

এই সব সাত পাঁচ ভেবে প্রহ্লাদের সঙ্গে রমাকে গৌরীর কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল কাশীতে বিষ্ণুঠাকুরের আশ্রমেই। এর পরে কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে খুব নরম সুরেই গৌরীকে লিখল ফিরে আসতে। গৌরী উত্তরে ওকে শুধু লিখল তার পক্ষে পুনর্মূষিক হওয়া একেবারেই অসম্ভব। পিণ্টো শুনে রেগে বলল: "তোর কি এতটুকু সেল্‌ফ্ রেস্‌পেক্ট নেই ? এর পরেও স্ত্রীর প্রসাদ চাওয়া ? ওকে এক্ষণি ডাইভোর্স ক'রে তুই আবার বিয়ে কর্ না। তুই টাকার কুমীর, স্ত্রী পাবি সহজেই। ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব হয় ?" ইত্যাদি।

কিন্তু মনুভাই বহুচেষ্টা করেও পারল না গৌরীর আশা ছাড়তে। পিণ্টো ওকে ব্যঙ্গ করত স্ত্রৈণ ব'লে। কিন্তু ও কী করবে ? গৌরীর পরে আর কোনো মেয়েকেই যে ওর মনে ধরে না—অকৃতদার পিণ্টো বিজ্ঞানেরই খবর রাখে, গৃহিণী কী বস্তু জানবে কোত্থেকে ? বিশেষ ক'রে এমন গৃহিণী! মনুভাই মুখে গৌরীকে যতই শাপমন্যি দিক না কেন মনে মনে তার রূপ গুণ বুদ্ধি—সর্বোপরি চরিত্রবল ও নিষ্ঠার জন্যে শ্রদ্ধা না ক'রে পারত না। যখন গৌরী রমাকেও ছেড়ে দিল বিনা বাক্যে তখন এ-শ্রদ্ধা পৌঁছল সভয় সমীহে—যার ইংরাজি নাম awe, বলত ও প্রায়ই পিণ্টোর কাছে। পিণ্টো হাসত, বলত: এরি তো নাম স্ত্রৈণ—definition of uxoriousness—শ্রদ্ধা প্লাস কুসংস্কার=নাজেহাল pitiful inconsistency—Q. E. D. বৈজ্ঞানিকের পরিভাষা কি গাণিতিক না হ'য়ে পারে ?

মনুভাইয়ের মন কিন্তু একটু যেন খুসি মতনই হ'ত—পিণ্টো যে পিণ্টো তার বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞতায় ফাঁক আছে দেখে—যে বিশ্বজ্ঞ হ'য়েও জানল না স্ত্রী কী বস্তু! আর এ-জগতে স্ত্রীর মতন কাম্য আর কী আছে ? ও স্বভাবে অসংযমী হওয়ার দরুণ মাঝে মাঝেই স্বৈরিণীদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে বেচাল হলেও ইন্দ্রিয়দাসত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম থেকে নিষ্কৃতি পেত না তো: অবসাদ ও পরিতাপ, উদভ্রান্তি ও মোহভঙ্গ, উত্তেজনা ও আত্মগ্লানি ধরত ওকে চেঁকে।

বার বার ভুগে শেষে পিণ্টোকে না ব'লে ফের গৌরীকে লিখল কাতর হ'য়ে। অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে শেষে লিখল যে গৌরী যদি ফিরে আসে তবে ও গুরুদেবের কাছে ক্ষমা চাইতেও রাজী আছে। এবার উত্তরে গৌরী লিখল একটি দীর্ঘ পত্র: "এখন আর হয় না। যখন আমি চেয়েছিলাম নত হ'তে তখন আমাকে মাড়িয়ে চ'লে গেছ আমার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত ক'রে। কিন্তু সেই কর্ষণেই আমার অন্তর উর্বর হ'য়ে উঠেছে—ফলেছে কৃপার ফসল। তাই তোমার বিরুদ্ধে আমার মনে আজ এতটুকু ক্ষোভ নেই, সত্যি বলছি। কেবল এ-

সংসারে যা যায় তা আর ফেরে না, যে-ফুলটি একবার ঝ'রে যায় সে আর ফোটে না। অতীত থাকে শুধু স্মৃতি-লোকেই—বর্তমানে তার আর পুনরুজ্জীবন হয় না। গুরুদেব বলেন কে এক গ্রীক দার্শনিক বলেছেন এক নদীতে মানুষ দুবার স্নান করে না। দিনে দিনে পদে পদে এক হয় আর। তাই আজ আমিও আর সে-গৌরী নেই যাকে তুমি একদিন বধূবরণ করেছিলে, আর তুমিও সে—তুমি নেই যাকে একসময়ে ভালোবেসেছিলাম সর্বান্তঃকরণে—যেমন ভালো বোধহয় জীবনে কাউকে বাসিনি কোনোদিন। কিন্তু পলে পলে তিলে তিলে সে-ভালোবাসাকে তুমি চূর্ণবিচূর্ণ করেছ তোমার লালসায়, কর্কশতায়—বিশেষ ক'রে নাস্তিক ব্যঙ্গবিদ্রূপে। গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েও হয়ে উঠেছ গুরুদ্রোহী, তাঁর অপার কৃপা পেয়েও তাঁকে অপমান করেছ আত্মঘাতী অহঙ্কারে। নৈলে আজ আমাদের জীবন কী মধুময় হ'তে পারত বলো দেখি? এক ইংরাজ কবি বলেছেন of all the saddest things the saddest is—what might have been! তাই আরো বাজে আমাকে যে তোমার স্ত্রী হ'য়েও তোমার সহধর্মিণী হ'তে পারলাম না। পারব কেমন ক'রে বলো? তুমি তো চাও নি সহধর্মিণী, চেয়েছিলে শুধু শয্যাসঙ্গিনী। আমি পারি নি তোমার মনের মতন হ'তে—মানি। কিন্তু সে-দোষ খতিয়ে আমার নয়, দোষ নিয়তির যিনি আমাকে সন্তানের লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছিলেন আসলে গুরুচরণেই—যেখানে সব চাওয়াই সমাপ্ত হয় পরম পাওয়ার—কূলে ছেড়ে অকূলের কোলে।

"এক সময়ে কতই না কেঁদেছি—কেন এতবড় আঘাত আমাকে সইতে হ'ল। কিন্তু আজ বুঝেছি যে এ-বেদনা আমার কাছে শাপে-বর হ'য়ে এসেছিল, কেন না তারি অঞ্জনে আমি দেখতে পেয়েছি সংসারিয়ানার আসল রূপ, চিনতে পেরেছি কৃপার মহিমা, খ'সে পড়েছে মায়ার বন্ধন, পদে পদে শৃঙ্খলে বেজে উঠেছে নূপুর। তাই তো আজ আমার মনের সব ক্ষোভই জল হ'য়ে গেছে—আমি সত্যের অপলাপ না ক'রে বলতে পারি যে, আমি আজও তোমার সেই হিতৈষিণীই আছি।

"শেষে শুধু তোমাকে একটি অনুরোধ জানাই। আমার কাশী আসবার ঠিক আগেই গুরুদেবের কথায় রমা প্রহ্লাদের কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। বছর দুই আগে ধ্রুব ওর কাকার এক উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে বিলেত গেছে প্রকাশনার কাজ শিখতে। ফিরে ধর্মগ্রন্থ প্রকাশক হবে। সেও দীক্ষা নিয়েছে প্রহ্লাদের কাছে। গুরুদেব বলেন প্রত্যেকেরই গুরু নির্দিষ্ট থাকে তাই গুরুকরণ শব্দটি ভুল চয়ন, বলা উচিত গুরুবরণ। কিন্তু সে যাক্। ধ্রুব আর ছ সাত মাসের মধ্যেই বিলেত থেকে ফিরবে আমেরিকা হ'য়ে। আমার অনেকদিন থেকে ইচ্ছা—ওর সঙ্গে রমার বিবাহ দিই। কিন্তু তুমি মত না দিলে তো হবার জো নেই, কেন না রমা এখনো নাবালিকা। ধ্রুব বড় চমৎকার ছেলে। বয়স তার এখন সাতাশ। রমা তাকে ভালোবেসেছে, যদিও ধ্রুব তাকে বধূবরণ করতে চাইবে কিনা জানি না। আমার মনে হয় সে রাজী হবে, কিন্তু এ-বিবাহ তো এখন হ'তে পারে না তোমার সম্মতি ও আশীর্বাদ বিনা। হয়ত তুমি ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলবে 'না'। কিন্তু আমি অপেক্ষা করব: কে জানে একদিন হয়ত তোমার সুমতি হবে, গুরুর কৃপায় পদেপদেই অঘটন ঘটতে দেখি নি কি?

"আর একটি কথা মাত্র। যদি আমাকে হঠাৎ পরপারে পাড়ি দিতে হয়—(কেন জানি না, আমার কানে কে যেন কেবলই গায়: ডাক এসেছে) —তাহ'লে তুমি অন্তত একটু সংযত জীবন যাপন ক'রে রমাকে সুযোগ দিও তোমাকে শুধু ভালোবাসবার নয়, শ্রদ্ধা করবার। জন্মদাতাকে শ্রদ্ধা করতে না-পারা সন্তানের পক্ষে যে কত দুঃখের, তা তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি, আর জানে রমা। তাই ফের বলি তোমাকে: এখনো সময় আছে—উধাও হোয়ো না ঢালুপথে, রঙ্গিনী স্বৈরিণীদের সঙ্গ ছাড়ো—আর তোমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কথায় ভুলো না—যে তোমাকে পেয়ে বসেছে ভূতের মত—মূর্তিমান্ evil genius যাকে বলে। গুরুদেব প্রায়ই বলেন—আমাদের কাছে যেমন সবচেয়ে বড় বর হ'য়ে আসে সাধুর কৃপা, গুরুর প্রসাদ—কেন না ঠাকুরের কৃপা সব প্রথম আসে এই প্রণালী বেয়েই—তেমনি সবচেয়ে বড় অভিশাপ হ'য়ে আসে নাস্তিক অশ্রদ্ধার দুর্বুদ্ধি। মহাভারতের একটি শ্লোক গুরুদেব প্রায়ই আবৃত্তি করেন:

অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচনী।
জহাতি পাপং শ্রদ্ধাবান্ সর্পো জীর্ণামিব ত্বচম্॥

অর্থাৎ এ-জীবনে অশ্রদ্ধার ম'ত পাপ নেই, আর শ্রদ্ধার ম'ত শুদ্ধিদাতা নেই, কারণ শ্রদ্ধাবান পাপের কালো গ্লানি থেকে তেম্‌নি সহজে মুক্তি পায় যেমন সাপ পায় তার জীর্ণ নির্মোক থেকে। তাই তো তোমাকে চিরদিনই পই পই ক'রে মানা করেছি পিন্টোর মতন নাস্তিকদের ছায়া না মাড়াতে। আজ শেষবার বলছি—যদি জীবনের সবচেয়ে বড় দানকে বরণ করতে চাও তবে গুরুদেবের কাছে ফের নত হ'য়ে ধর্মবুদ্ধির দীক্ষা নিয়ে বৈজ্ঞানিক শূন্যবাদীদের মিথ্যা মন্ত্রণায় কান দেওয়া ছাড়ো। জন্মান্ধ হ'লেও কথা ছিল, কিন্তু যে চোখ নিয়ে জন্মেছে সে কেন চোখ মেলে দেখতে পায় না—বৈজ্ঞানিকেরা শক্তিবাদ ও ভোগবাদের জুড়িগাড়িতে ক'রে আমাদের নিয়ে চলেছে কোন্ ধ্বংসের পথে?"

মনুভাই এ-চিঠি পেয়ে ফের আগুন হ'য়ে উঠল, গৌরীকে লিখল: "চোখ মেলে দেখতে পায় না কে? আমি না তুমি? তোমার দুরবস্থা চাক্ষুষ ক'রেই তো আমি বিশ্বাস হারিয়েছি গুরুবাদে, আস্তিকতার মোহ ছেড়ে নাস্তিক বিজ্ঞানের দীক্ষাকে চিনেছি আলোর দীক্ষা ব'লে। প্রহ্লাদ আমাকে না জানিয়ে লুকিয়ে রমাকে দীক্ষা দিয়েছে এ-ও গুরুর পক্ষেই সম্ভব। এর পরেও তুমি আমাকে বলো কিনা রমার বিবাহ দিতে ধ্রুবর সঙ্গে? তোমার লজ্জা করে না? তাছাড়া রমার মতন মেয়ের—heiressএর—কি সুপাত্রের অভাব যে, নিষ্কর্মা পাণ্ডা-পুরুষের কুপুত্রের হাতে ওকে স'পে দেব?"

দুই

এদিকে মনুভাই গোঁ ধ'রে আরো গা ভাসিয়ে দিয়ে চলল উচ্ছৃঙ্খলতার পথে, ওদিকে মহাদেব কাশীবাসী হবার পর থেকে প্রহ্লাদ গুরুর নির্দেশে সাধনায় ফুটে উঠল ফুলটি হ'য়ে আর সাবিত্রী হ'য়ে দাঁড়াল তার পূর্ণ সহধর্মিণী—ব্রহ্মচারী স্বামীর "বিদ্যা স্ত্রী"। বিষ্ণু ঠাকুর মাঝে মাঝে ওদের দেহুর আশ্রমে এসে দু-চারদিন ক'রে কাটিয়ে যেতেন। সে-দিনগুলি ওদের জীবনে যেন নিত্যনব আনন্দের দেয়ালি জ্বালিয়ে দিয়ে যেত। ওরাও থেকে থেকে কাশী গিয়ে গুরুগৃহে দুতিন সপ্তাহ কাটিয়ে আসত দত্তাত্রেয়কে নিয়ে। মহাদেবের সঙ্গে তখন ওদের দিনগুলি যে কী আনন্দে কাটত—বিশেষ ক'রে যখন পিতাপুত্রে বসত আসর জমাতে!—কেবল এখন আর ওস্তাদি গানের কসরৎ দেখাতে নয়—ভজনকীর্তনে ভক্তির বান ডাকিয়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী ও গৌরী পরস্পরের সাধন জীবনের স্পর্শে দিনের পর দিন ভক্তির প্রেরণা পেতে নিত্যনব আনন্দ ছন্দে, দেখত কত কী অঘটন গুরুকৃপার প্রসাদে ঠাকুরের নরলীলায়! সে কি একটা? এ-একঘেয়ে তৃপ্তিহীন দীপ্তিহীন জগতে যে শুধু সাধনভজনে পূজাকীর্তনে জপতপে এত আনন্দ শান্তি ঝরতে পারে—পথ চলতে পথের ধুলোবালি কাঁটা আগাছা যে ভগবানের ছোঁওয়ায় পদে পদে গোলাপ হ'য়ে ফুটতে পারে এ-সত্য তারা কেমন ক'রে জানবে যারা কোনোদিন সাধনাকে বরণ করেনি গুরুর নির্দেশে?

তিন

এই সময়ে বিপিনের মা-র ডাক এল ওপার থেকে। দীক্ষা নেওয়ার পরে তাঁর মন আশ্চর্য বদ্‌লে গিয়েছিল। পাড়াপড়শীরা বলত: "বিশ্বাস হয় না সত্যি যে মানুষের স্বভাব এত বদ্‌লে যেতে পারে গুরুর ছোঁওয়ায়।"

রটনাটা মিথ্যা নয়। বিপিনও বলত গৌরব ক'রে একথা। তার মা গঙ্গাজলে অন্তর্জলী হবার সময়েও একথা স্বীকার করেছিলেন গাঢ়কণ্ঠে: "গুরুর কৃপায় যে অসম্ভব সম্ভব হয় তার প্রমাণ আমি। নৈলে কি আমার মতন পাপিষ্ঠাকে আশীর্বাদ করতে আসতেন এমন দেবগুরু?" ব'লে মালতীকে দেখিয়ে: "আর এই লক্ষ্মীপ্রতিমা—একেও পেয়েছিলাম তো তাঁরি বরে! সত্যি গুরুদেব, অবাক হবে আজ ভাবি আমি—কী ভাবে ওর মধ্যে দিয়ে আলো এল ঠাকুরের! ওকে যন্ত্রণা দিতাম ব'লেই না আপনি এলেন ওর সহায় হ'য়ে—আমার পাপ মন আপনাকে শাপমন্যি দিল—যার ফলে বিপিন হ'ল পঙ্গু। আমি পাগল হয়ে যাওয়ার দরুণ ঠাঁই পেলাম দয়াময়ীর চরণে—বিপিনেরও নবজন্ম হ'ল দয়াময়ের ছোঁওয়ায়! এসবই হ'ল আমার এই লক্ষ্মী মা-র জন্যেই তো। তাই শুধু একটি অনুরোধ—আপনি যদি পারেন

ওর একটি বিয়ে দেবেন। ওর মতন পুণ্যবতী যাকে স্বামী ব'লে বরণ করবে সে ঠাকুরের কৃপাও পাবেই পাবে।"

বিষ্ণুঠাকুরও চাইতেন তাঁর আর সব শিষ্যার মতন মালতীও বিবাহ ক'রে গৃহস্থাশ্রমে যোগ করবে স্বামীর সঙ্গে—দু একটি সন্তানের পরে নেবে ব্রহ্মচর্য ব্রত। মালতীকে বলতে সে বলল: "বিবাহ করবার আমার ইচ্ছা নেই গুরুদেব। তবে আপনি আমার দেবতা—আপনি যে-বিধানই দেন না কেন আমি মাথা পেতে নেব।"

বিষ্ণুঠাকুর গুরুমাকে একদিন বললেন: "মালতীর সঙ্গে ধ্রুবর বিবাহ দিলে কেমন হয়?"

গুরুমা (একটু চুপ ক'রে থেকে): কি জানো? আমার অনেকদিনের সাধ—রমার সঙ্গে ধ্রুবর বিয়ে হয়—রমা ওকে ভালোবাসে—"

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে): ব্রাহ্মণী! শেষে তপোবনেও রোমান্স?

গুরুমা (পিঠ পিঠ): দুষ্মন্ত শকুন্তলার শুভদৃষ্টি হয়েছিল কোন্ "শান্তরসাস্পদ আশ্রমে" তোমার কাছে অজানা থাকার কথা নয়।

বিষ্ণুঠাকুর (অভিবাদন ক'রে): কবির ভাষায়—"মেনেছি—হার মেনেছি।" (গম্ভীর হ'য়ে) তবে কি জানো? রমার সঙ্গে ধ্রুবর বিবাহ অসম্ভব। মনুভাই মত দেবেনা।

গুরুমা (একটু ভেবে): পরে?

বিষ্ণুঠাকুর: কোনোদিনই নয়। ও এখন পুরোপুরি দেবদ্রোহী তথা গুরুদ্রোহী। না—ও আশা ছেড়ে দাও।

গুরুমা: কিন্তু গৌরী মনে বড় দুঃখ পাবে।

বিষ্ণুঠাকুর (একটু ভেবে): আচ্ছা, এখন এ-প্রশ্ন মুলতুবি থাক, পরে দেখা যাবে—ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে। তুমি কাউকে কিছু বোলো না। কেবল একটা কথা: মালতীর বিবাহ দেবার আগে ওর দীক্ষা হওয়া দরকার।

গুরুমা: আমি তো অনেক দিন থেকেই বলছি, কিন্তু তুমি যে কেন ওকে দীক্ষা দিতে দেরি করছ—

বিষ্ণুঠকুর: কারণ খুব সোজা—আমি ওর গুরু নই যে—বলি নি তোমাকে?

গুরুমা: না তো। ওর গুরু কে তবে?

বিষ্ণুঠাকুর: প্রহ্লাদ।

গুরুমা (আশ্চর্য): প্রহ্লাদ বাবা? কই—

বিষ্ণুঠাকুর: তোমাকে বলি নি কারণ এতদিন আমিও জানতাম না। মাত্র কাল রাতে আমি জানতে পেরেছি—মালতীও কয়েকদিন আগে স্বপ্নে দেখেছে প্রহ্লাদ ওর গুরু।

গুরুমা: সত্যি? তাহ'লে তো বড় আনন্দের কথা—প্রহ্লাদ বাবার মতন গুরু—বড় ভাগ্যের কথা।

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে): বটেই তো—নইলে আমার কাছেই হয়ত দীক্ষা নিতে হ'ত অভাগিনীর।

গুরুমা (জানুতে চাপড় মেরে): তুমি ভা—রি দুষ্টু। এমন কথা কি ঠাট্টা ক'রেও মুখে উচ্চারণ করতে আছে।

বিষ্ণুঠাকুর: কী করি বলো, যখন সতী লক্ষ্মীর জিভে দুষ্ট সরস্বতী ভর ক'রে দয়াময় বাবুকে কাবু করেন। কিন্তু সে যাক্ তুমি প্রহ্লাদকে ডাক দাও—এই মাসেই ওর দীক্ষা হওয়া চাই।

গুরুমা: কেন?

গুরুদেব: একটা ফাঁড়া দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় দীক্ষার শুভস্পর্শে কেটে যেতে পারে।

গুরুমা (শিহরিত): ও মা! ফাঁড়া! আমি আজই লিখে দিচ্ছি।

চার

প্রহ্লাদ গুরুমার চিঠি পেয়ে লিখল—স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে সামনের মাঘ মাসে বহু ধর্মার্থীকে নিমন্ত্রণ করেছে চিঠি ছাপিয়ে। সভায় ভজন কীর্তন করতে হবে, কিছু বলতেও হবে, স্বামীজীর সম্বন্ধে। তার পরেই কাশী যাবে মালতীকে দীক্ষা দিতে।

ইতিমধ্যে কুম্ভমেলায় প্রয়াগে মহা ধুমধাম সুরু হ'ল। রমা, মালতী ও গৌরীকে নিয়ে মহাদেব গেলেন প্রয়াগে। তাঁবু পড়ল গঙ্গার চরে।

ওদের আনন্দ ধরে না! চারদিকে সাধুসন্ত, সামনে গঙ্গা। ভাণ্ডারা, হরিকথা, কীর্তন, গীতা ভাগবত পাঠ—প্রয়াগ হ'য়ে উঠেছে উৎসবের তপোবন!

শেষদিনে ওরা ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাস্নান করতে একটি নৌকা ভাড়া নিল। কী ভিড়! সঙ্গমের কাছে পৌঁছুতে মাঝির বেগ পেতে হ'ল। অনেক কষ্টে শেষে সঙ্গমে

পৌঁছল। শেষ দুদিন হঠাৎ বৃষ্টির ফলে জল ফুলে উঠেছে, নৌকার গায়ে উচ্ছল গঙ্গার খরস্রোত ঢেউ এসে লেগে ছিটকে ছিটকে উঠছে। মালতী রমা আনন্দে "ও মা! কী কাণ্ড!" ব'লে পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে: "ঐ দেখ্ ঐ শুশুক—হুশ্!......ঐ দেখ সন্ন্যাসীর জটা! উঃ সাড়ে চার হাত...দূর্ কম ক'রেও তিন গজ..." ইত্যাদি।

এম্‌নি সময়ে পাশ থেকে একটি নৌকা হুহু ক'রে এসে ওদের নৌকায় ধাক্কা মারল। সঙ্গে সঙ্গে মালতী জলে প'ড়ে গেল। সাঁতার সে খুব ভালোই জানত। বিধবা হবার আগে স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাঝে মাঝেই সাঁৎরে গঙ্গা পার হ'ত। কিন্তু সাঁতার দেবে কে? ধাক্কায় জলে প'ড়ে যাবার সময়ে বেটক্করে আগন্তুক নৌকার একটা উঠতি দাঁড় ওর রগে এসে লাগতে মালতী চিৎকার ক'রেই অজ্ঞান হ'য়ে ভেসে চলল গর্জমান স্রোতে। মহাদেব তৎক্ষণাৎ "জয় গুরু!" ব'লে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে মালতী খর-স্রোতে বিশহাত দূরে চ'লে গেছে। মহাদেব ভালো সাঁতার জানলেও প্রয়াগের গঙ্গার দুর্জয় স্রোতে টাল সামলাতে না পেরে ভেসে কাছের একটা নৌকার হালে লেগে তলিয়ে গেলেন। দেখে সঙ্গে সঙ্গে গৌরী ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে চলল মালতীর ভাসমান চুলের দিকে। অতিকষ্টে পৌঁছল নিঃসম্বিৎ দেহের কাছে, ধরল ওর চুল চেপে। সাঁতারে ও নিপুণ ছিল আশৈশবই, কিন্তু সম্প্রতি ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছিল ব'লে বিষম হাঁপিয়ে উঠে চিৎকার ক'রে উঠল। চুল ছেড়ে দিয়ে শুধু ভেসে থাকবার চেষ্টা করলে হয়ত বাঁচতে পারত, কাছাকাছি কোনো নৌকার মাঝি তুলে নিত, কিন্তু তাহ'লে মালতী ভেসে যায়। এম্‌নি সময়ে ওদিক থেকে একটা পুলিশ মোটরবোট নিয়ে ছুটে এল। গৌরী চুলশুদ্ধ হাত তুলতেই আরোহী পুলিশ চুল ধ'রে মালতীকে টেনে তুলল নৌকায়, কিন্তু গৌরী এত হাঁপিয়ে পড়েছিল যে উঠতে পারল না, প্রবল স্রোতে ভেসে চ'লে গেল।

মোটর বোটের কর্ণধার মালতীকে তুলে গৌরীর দিকে চলল দ্রুতবেগে। পৌঁছলও বটে কিন্তু গৌরীর দেহে তখন আর প্রাণ নেই। (ডাক্তারে পরে পরীক্ষা ক'রে রায় দিল যে ওর থ্রম্বোসিস হয়েছিল।)

মহাদেবের দেহ পাওয়া গেল তিনচার ঘণ্টা পরে—আড়াই মাইল দূরে একটি চরে বেধে গিয়েছিল। পুলিশ মোটরে দেহ তুলে আনা হ'ল বিকেলবেলা। রগের কাছে ক্ষত গভীর,—কিন্তু মুখে সে কী শান্ত হাসির আভা! দেখবার ম'ত!

পাঁচ

প্রহ্লাদ টেলিফোনে খবর পেয়েই সান্তাক্রুজ থেকে উড়ে কাশীতে পৌঁছল শেষ রাতে। বিষ্ণুঠাকুর নিজে বিমানঘাঁটিতে গিয়েছিলেন। প্রহ্লাদ নামতেই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

প্রহ্লাদ চোখের জল মুছে জিজ্ঞাসা করল: "আপনি কি এই ফাঁড়ার কথাই লিখেছিলেন?"

বিষ্ণুঠাকুর বললেন: "ঠিক এই ফাঁড়া মানে কি? কারুর প্রাণসংকটযোগ থাকলে যোগীরা তার মাথার উপর একটা অশুভ ছায়ামতন দেখতে পান। ভাগবতে বলেছে বিশ্বরূপ মহাকায়ের 'ছায়াস্থ মৃত্যু'—ছায়ার উপনাম মৃত্যু।—কিন্তু সে যাক, আমি শুধু বলতে চাই যে তুমি এ শোককে যেন সেই ভাবে গ্রহণ করতে পারো যে ভাবে গ্রহণ করলে হৃদয়ের পদ্ম আরো দল মেলতে পারে ঠাকুরের কৃপার পানে।"

মোটরে আসতে আসতে বিষ্ণুঠাকুর প্রহ্লাদের হাত চেপে ধ'রে বললেন: "আমার মন আনন্দে টইটুম্বুর হ'য়ে উঠেছে বাবা!"

প্রহ্লাদ (চমকে): আনন্দ?

বিষ্ণুঠাকুর: নয়? বাবা, মরতে হবে সবাইকেই। তোমার প্রিয় কবি গেয়েছেন না—

একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি
দুঃখ মিছে, কান্না মিছে,
দুদিন আগে দুদিন পিছে,
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।

বটে, কিন্তু কাল সন্ধ্যায় এ গানটি গাইতে গাইতে কী খবর এল শুনবে?

সিন্ধু মুখে যে নদী ধায়
মরণে নবজীবন পায়
অকূল কোলে পূরণ হয় তার সকল ক্ষতি।

এ কথার কথা নয় বাবা। জীবনে অনেক মীড়ই বেজেও বাজে না, অনেক সুরই অনিশ্চিত, ধ্রুব কেবল একটি সুর—মৃত্যু। সব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় নানা জটিল যুক্তি দিয়ে, শুধু এইখানেই যুক্তি বুদ্ধি প্রতিভা বল সব হার মানে। কিন্তু এ-হারও জিৎ হ'য়ে দাঁড়ায় কার কাছে বলো তো? না, যে দেখতে পেয়েছে মরণের মধ্যে জীবনেরই প্রতিবিম্ব। আর সেই পারে এক কথায় পরপারে পাড়ি দিতে গান গেয়েঃ "ভয় কি? এ-পারেও যাঁর চোখের আলো আমাকে পথ দেখিয়েছে ওপারেও সেই আলোর আলোই আমাকে পরম স্নেহে তুলে নেবে যদি আমি তাঁর শরণ চাই।"

প্রহ্লাদ (চোখ মুছে): আশীর্বাদ করুন গুরুদেব, যেন এ-আঘাতে আমার এই প্রত্যয়ই আরো দৃঢ় হ'য়ে ওঠে। এখনো মনটা অস্থির আছে।

বিষ্ণুঠাকুর (তার একটি হাত কোলে টেনে নিয়ে): জানি বাবা। আমাকেও কি দুঃখ শোক পেতে হয়নি? জগতে কি এমন কোনো মানুষ আছে যার পায়ের নিচের মাটি কখনো টলমল ক'রে ওঠেনি আকস্মিক দুর্যোগে? কিন্তু যতই মাথা ঘুরবে ততই খুঁটি আঁকড়ে ধরতে হয়। আর আমাদের জীবনে সব চেয়ে বড় খুঁটি কে জানো না কি?

প্রহ্লাদঃ জানি গুরুদেব, গুরুকৃপার মধ্যে দিয়ে ভগবৎকৃপার পরম উপলব্ধি। আপনি আমাকে আরো কাছে টেনে নিন—শক্তি দিন। নৈলে রমার সামনে দাঁড়াব কোন মুখে বলুন? (দুহাতে মুখ ঢেকে) কেন আমাকে বললেন তাকে দীক্ষা দিতে? আমাকে বড় আধার বলেনই বা কী জন্যে? যে নিজেকে সামলাতে পারে না সে অপরকে বল দেবে কিসের জোরে? শুধু বাবা নয়, দিদিও ছেড়ে গেলেন আর এক মুহূর্তে? (ব'লে বিষ্ণু ঠাকুরের কোলে ভেঙে পড়ে কান্নায়)।

বিষ্ণুঠাকুর (প্রহ্লাদের শিরশ্চুম্বন ক'রে): জোর আছে বাবা, তবে খবর নেই। আর সেই খবর দিতেই আঘাত আসে বার্তাবহ হ'য়ে। আমি ভুল করি নি। তুমি কী ধাতুতে গড়া আমাকে ঠাকুর নিজে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই আমি জানি যে তাঁর বলে বলী হ'য়ে তুমি হাঁটবে—ভাগবতের ভাষায়—বিনায়কানীকপমূর্ধসু—অর্থাৎ সব বাধাবিঘ্নের মাথার উপর পা রেখে—আর সেদিন সুদূরও নয়। রমা ও ধ্রুবকে তুমি দীক্ষা দিয়েছ; এবার মালতীকেও মন্ত্র দিতে হবে। তবে এ তো সূচনা মাত্র। পরে আরো অনেক ধর্মার্থী শিষ্যশিষ্যা আসবে তোমার কাছে। কারণ গুরু তোমাকে হ'তেই হবে। আমি যার অপেক্ষা করেছিলাম সে এই আঘাত। তাই বলতে পারি যে এতদিনে সময় এসেছে।

প্রহ্লাদ (মুখ তুলে আশ্চর্য হ'য়ে): এই আঘাতের অপেক্ষা ক'রেই কি ছিলেন এতদিন।

বিষ্ণুঠাকুরঃ হাঁা বাবা! পরের দুঃখের ভাগ নিতে পারে কেবল সে-ই যে গভীর বেদনার অন্ধকারকে আলো ব'লে চিনতে পেরেছে। এরই নাম দিব্যচক্ষু। এবার তুমি পাবে সেই শিবনেত্র—আর পাবে অচিরেই, তোমার ডায়ারিতে লিখে রাখতে পারো আমার এ-ভবিষ্যদ্বাণী।

ছয়

মহাদেব ও গৌরীর দেহ পাশাপাশি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সে কত যে ফুল মালা তুলসী···ধূপ দীপ নির্মাল্য। দলে দলে মেয়েরা আসে গৌরীর পায়ের ধুলো নিতে—বৃদ্ধ বৃদ্ধারা মহাদেবের পায়ে পড়ে লুটিয়ে। পরের জন্যে প্রাণ দেওয়া! এমন কি কাশীর কয়েকটি অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এসেও হাতজোড় ক'রে দাঁড়ায়।

*   *   *

মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে সন্ধ্যায় ফিরে এসেই প্রহ্লাদ গুরুমার ঘরে গেল। গুরুমা মালতীর শিয়রে ব'সে জপ করেছিলেন। প্রহ্লাদ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই মাথায় হাত দিয়ে বললেন নিচু স্বরেঃ "ঘুমুচ্ছে। জ্বর একশো চার। তুমি একবার রমার কাছে যাও বাবা, সে তোমার পথ চেয়ে আছে। মালতীকে আমি দেখছি। শুধু মাথার আঘাতই তো নয়—মন ওর বিহ্বল হ'য়ে পড়েছে আরো এই ভেবে যে ওরই জন্যে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল। সারাদিন ছটফট ক'রে সন্ধেবেলায় জ্বরের তাড়স একটু কমেছে, তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন এসব কথা থাক। রমা তোমার পথ চেয়ে আছে বাবা! শোক সবচেয়ে বেশি বেজেছে তাকেই। আহা!"

সাত

প্রহ্লাদ রমার ঘরে এসে দেখে সে গুরুদেব ও গুরুমার ছবির সামনে তন্ময় হ'য়ে জপ করছে। চোখের পাতা ভিজে, দেহ নিস্পন্দ, শুধু ঠোঁট নড়ছে। ও চমকে উঠল: কী অপরূপ মুখ! রমার রূপ নিয়ে লোকে বলাবলি করত। কিন্তু এ-তো সে-রূপ নয়! রূপ গ'লে যেন আলো হ'য়ে গেছে!

প্রহ্লাদ ওর কাছে এসে দাঁড়িয়ে ওর মাথায় হাত রাখে। রমা চোখ খুলে তাকিয়েই ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। প্রহ্লাদ মাটিতে ব'সে ওর মাথাটি কোলে টেনে নিয়ে জপ করে নীরবে মৃদু কণ্ঠে:

প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে! সর্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ।*

* * * *

ক্ষণভঙ্গুর প্রাণ দিয়েও যে-সাধুরা প্রাণীরে রক্ষা করে
নিখিল জীবের অন্তরবাসী প্রসন্ন হয় তাদের 'পরে।"

রমা চোখের জল মুছে প্রহ্লাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে হাতজোড় ক'রে।

প্রহ্লাদ ওর মাথায় হাত রেখে গাঢ়কণ্ঠে বলে: "তোমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলাম মা, কিন্তু তোমার জপতন্ময় মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি যে, তুমি পেয়েছ সেই আলো যার স্পর্শে মায়ার আঁধার কাটে।"

রমা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "মামাবাবু! আমি কত দীন কত সামান্য জানি ব'লেই বুঝি দীনতারণ আমাকে দিয়েছেন শোক জয় করার শক্তি। প্রথমে মাথা ঘুরে উঠেছিল। কিন্তু মূর্ছা ভাঙতেই কী বলব মামাবাবু... আমার নিজেরই যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না...মনে হয়... কে যেন আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর... আর আমার সব তাপ গ'লে যাচ্ছে। এ-কি আমার মনের ভুল মামাবাবু?

প্রহ্লাদ: না মা...এরই নাম কৃপার অনুভূতি। আর একথা বলছি আমি পুঁথি প'ড়ে নয়—কৃপার মর্ম কিছু জেনেছি ব'লেই।

রমা: আপনি মহাসাধক—একান্তী—আপনি জানবেন না তো জানবে কে মামাবাবু!...সত্যি, আমার কেবলই মনে পড়ছে—কী শুনবেন? (গাঢ়কণ্ঠে) যখন দাদুর আর মার দেহ নিয়ে তাঁর ও গুরুদেবের পায়ে রাখা হ'ল তখন গুরুমা বললেন শুধু কয়েকটি কথা—কিন্তু সে তো কথা নয় মামাবাবু—আলো! বললেন আমাকে বুকে টেনে নিয়ে: "দুঃখ ক'রো না মা, আনন্দ করো। শ্মশানে যেতে হয় শেষে সবাইকেই কিন্তু এমন মহাপ্রয়াণের ভাগ্য ঘটে কজনের? তাই দুঃখ বাজলেও তাকেই বড় ক'রে দেখো না। ভাগবতে ঠাকুর গোপবালকদের কী বলেছিলেন মনে রেখো সর্বদা:

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা॥

অর্থাৎ অপরের মঙ্গলের জন্যে শুধু ধন বুদ্ধি বাক্যকে নিয়োগ ক'রেই ক্ষান্ত হবে না, দরকার হ'লে প্রাণও দেওয়া চাই—আর যে এ পারে তারই জন্ম সফল। কারণ এইই হ'ল সাধনার সাধনা—সকলের মধ্যে ঠাকুরকে দেখে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা। কিন্তু আমরা স্বভাবে এম্‌নিই স্বার্থপর মা, যে, দীক্ষা পেয়েও ভুলে যাই যে সুখী হয় শুধু সেই যে পরার্থনিষ্ঠার ডাক শুনে স্বার্থের মায়ামোহ কাটিয়ে ওঠে।" এই যে বন্দনাদি!

বন্দনা এসে প্রহ্লাদকে প্রণাম ক'রে বলে: "দাদা, শিষ্যা করেছেন বটে। ওকে দেখে আমরা কত কী যে শিখেছি!"

রমা: অমন কথা বলে না বন্দনাদি। আমার আর কতটুকু শক্তি বলো? আমি তোমার একটা কথায় কত জোর পেয়েছি—তুমি জানো না আজো।

বন্দনা (আশ্চর্য): আমার কথায়?

রমা: হ্যাঁ। তুমিই আমার চোখ খুলে দিয়েছ প্রথম—নৈলে কি আমি বল পেতাম এত সহজে? তুমি বলেছিলে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে: "রমা, কাঁদিস নে তোর দাদুর জন্যে মায়ের জন্যে। গৌরব কর যে তাঁদের মধ্যে

---

* দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনে ঘোর হলাহল বিষের তাপে সকলে মহাদেবের কাছে এসে আবেদন করল: "ত্রাহি নঃ শরণাপন্নাং ত্রৈলোক্যদহনাদ্বিষাৎ"—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিষের তাপে জ্ব'লে যায়, রক্ষা করুন। তখন মহাদেব পার্বতীকে বলেন: "প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ..."

দেখতে পেলি গুরুকৃপা কী ভাবে মানুষকে ঢেলে সাজায়—স্বার্থ ছেড়ে পরমার্থকে বরণ করতে শিখিয়ে। দেখ না তোর মাকে—গুরুর জন্যে তোকেও তো ছেড়েছিলেন এক কথায়। তাই তো গুরুর কৃপাই আবার তোকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আবার সেই মা-ই নৌকায় তোর কথা না ভেবে পরের শিশুকে বাঁচাতে ঝাঁপ দিলেন তো। তেম্নি আবার দেখ্ তোর দাদুকে। তিনি কী ছিলেন কী হ'লেন বল্ তো? একসময়ে তোর মামাবাবু আর মামীমার গুরু-বরণের জন্যে কী দুঃখই না দিয়েছেন তাঁদের! সেই মানুষ সংসারের আসক্তি ছেড়ে বাণপ্রস্থী হ'ল—আর কখন বল্ তো? না, যখন ছেলে বৌ নাতি নিয়ে দিব্যি সুখে বিলাসের খাস-তালুকে বাকি জীবনটা কাটাতে পারতেন। ভাই রমা! বাঁচে সবাই, কিন্তু বাঁচার মতন বাঁচে কজন? ম'রে নিশ্চিন্ত হয়ও সবাই, কিন্তু তোর দাদুর মতন ম'রে অমর হ'তে পারে কজন এ সংসারে? গুরুবরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই যে অপরূপ বিকাশ হ'ল একজন সংসারী মানুষের—এ দেখেও লোকে মানতে চায় না রে যে, জীবনে যত রকম সত্যের পরিচয় পেয়ে আমরা দিনে দিনে কালো-বেদনার বোঁটায় আলোচেতনার ফুল ফোটাই তার মধ্যে সেরা ফুল—শতদল পদ্ম—হ'ল গুরুর-মধ্যে-দিয়ে-পাওয়া ইষ্টের কৃপা। তাই তোর জন্যে আমি কেবল এই প্রার্থনাই করি রমা, যেন তুই দেখতে পাস যে, গুরু আর ইষ্ট অভিন্ন—কারণ এ-সত্যকে যে চিনেছে তার আর দুঃখ থাকে না রে—তার কাছে প্রতি শাপও হ'য়ে দাঁড়ায় বর।"

তোমার এই কটি কথাই আমার চোখ খুলে দিয়েছিল বন্দনাদি! (প্রহ্লাদকে) না, মিথ্যা বলব না মামাবাবু! আমি এখনো গভীর দুঃখ পাই ভাবতে যে, মা নেই, দাদুকে আর দেখতে পাব না কোনোদিন। কিন্তু খেদ নেই আমার সত্যিই। আমি যে চিনতে পেরেছি কৃপাকে আরো বেশি ক'রে এই দুঃখের মধ্যে দিয়েই। আপনার স্নেহ পেয়েছি, গুরুমার সে যে কত আদর কী বলব? তিনি কাল আমার কাছে বন্দনাদির বাঁধা একটি গান গাইলেন—গানটি বন্দনাদি বেঁধেছিলেন প্রয়াগে দাদু ও মার মহাপ্রয়াণের পরে। (বন্দনাকে) গাও না ভাই গানটি, আমি চাই—মামাবাবুও দেহুতে ফিরে গেয়ে মামী-মাকে শোনাবেন এই গানটি।

বন্দনা: আমি কী গাইব দাদার সাম্নে?

প্রহ্লাদ: অমন করে না। গাও, আমি শুনে শুনে শিখে নিয়ে ফিরে গিয়ে তোমার বৌদিকেও শেখাবো।

বন্দনা একটু চুপ ক'রে থেকে গান ধরে:

এসো কান্ত বিজনে,
আমার ক্লান্ত লগনে,
এসো আমার প্রাণের গহনে
গভীর মিলনে।
চাই তোমাকে কায়ায় ছায়ায়
শান্তি তাপনে
মৌনে কাঁপনে।
এসো অশ্রু-কাননে,
আশার কুসুম বিছনে,
আঁধার মরণ ক'রে সাধন
নয়ন-কিরণে
এসো মলিন সুখের বিসর্জনে
নবীন যুগের আবাহনে
নিশীথ কালোয় আলোর বোধনে
অরুণ চরণে
শরণ স্বপনে
বিধুর বেদনে
চমক চেতনে।

[ক্রমশঃ

হাসি ও অশ্রুর তত্ত্ব

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

হাসি-অশ্রু আমাদের জীবনের অবশ্যম্ভাবী অভিজ্ঞতা। এমন কোন্‌জন আছেন যিনি কদাপি হাসেন নি অথবা কাঁদেন নি? মনে হয়, জন্ম-তোরণ দিয়ে ধরণীর রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করার যে ছাড়পত্র বিধাতার কাছ থেকে আমরা পাই তার শীলমোহরটি হাসি-অশ্রুর।

কারণ বিনা কার্য নেই। অতএব প্রশ্ন আসেই—কেন হাসি, কেন কাঁদি। দুঃখ পেলেই কাঁদি। কিন্তু হাসির ব্যাপারটি জটিল। কেন হাসি, তার উত্তর অত সহজে দেওয়া যায় না। এইজন্যে হাসি সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু চিন্তা সেই সুদূর যুগের এরিষ্টটোল থেকে এ যুগের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই করেছেন দেখতে পাই।

কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁর চিন্তা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য তিনি হলেন ফরাসী দার্শনিক—অঁরি বের্গস'। তাঁর পূর্ণাঙ্গ Laughter বইটির সবখানি জুড়ে রয়েছে একটা মৌলিক চিন্তার ঠাসবুনানি।

বের্গসের গোটা বক্তব্যবস্তু যে মূল তত্ত্বটির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হল এই :—

"The laughable element consists of a certain mechanical inelasticity, just where one would expect to find the wide awake adaptability and the living pliableness of a human being, The rigidity is comic and laughter is corrective." অর্থাৎ, হাসির উপাদান হল অনমনীয়তা—যা কিনা মানুষের নমনীয় এবং সামঞ্জস্য-সমর্থ স্বভাবকে আক্রান্ত করে থাকে। এই অনমনীয়তা কৌতুকপ্রদ এবং হাসি এর সংশোধক। প্রাণের লক্ষণ সজীবতা, এবং সজীবতার কাজ হল সকল কিছুর সঙ্গে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা। অতএব প্রাণবন্ত সজীব মানুষ সব কিছুর সমন্বয় সাধন করবে, খাপ খাইয়ে চলবে, এটা স্বতঃসিদ্ধ। ভদ্রসভায় শান্ত নীরব পরিবেশের মধ্যে বিরাট মুখব্যাদান করে নির্ঘোষে হাঁচলে হাসির উদ্রেক ঘটে, কারণ সে হাঁচি ভদ্রসভার রীতিনীতি ও পরি-মণ্ডলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে নি। রাস্তায় চলতে গিয়ে যে লোকটি কলার খোসায় পা দিয়ে পড়ে গেল, তারও ঐ দোষ। রাস্তায় চলতে গেলে যে সতর্কতার প্রয়োজন সেই সতর্কতার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে না পেরেই লোকটি পড়ল। এই সামঞ্জস্যের অভাবই 'রিজিডিটি' বা অনমনীয়তা। যে লোক কথা বলতে বারে বারে 'বুঝেছ কিনা' বলে, তার এই মুদ্রাদোষেই আমরা হাসি। কেন? সেই একই কারণ,—অনমনীয়তা সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তির অভাব। 'বুঝেছ কিনা' এই অপ্রাসঙ্গিক কথাটি যন্ত্রের মতো পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করাই হাসি আনে। একটি সজীব লোক যন্ত্রের লক্ষণ দেখাবে কেন? তাই আমরা অন্যের মুদ্রাদোষে হাসি, প্রাণের ক্রিয়ায় যখন যন্ত্রের লক্ষণ দেখা দেয় তখন কৌতুকের অবকাশ ঘটে।

একলা মানুষ হাসে না, হাসলেও নিজেকে অন্যের সমক্ষে কল্পনা করে তবে হাসে। এই কল্পনা অবশ্য অবচেতন মনেই ঘটে থাকে। সুতরাং সামাজিক মানুষই হাসে। হাসি তাই সমাজ বা ব্যষ্টিধর্মী। সামঞ্জস্য রক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি নিয়েই যখন হাসি তখন হাসি ব্যষ্টি-নির্ভর না হয়ে হয়তো পারে না।

Laughter is corrective, অর্থাৎ হাসি সংশোধক। অনমনীয়তা বা সামঞ্জস্য রক্ষার অভাবকে হাসি সংশোধন করতে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি নিজের অজ্ঞাতসারেই 'বুঝেছ কিনা' কথাটি যন্ত্রের মতো পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে থাকে, তার সে মুদ্রাদোষের ভঙ্গীটি আমরা নকল করে, হেসে জানিয়ে দিই ঐ যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকত্ব অনায়াসে পরিহার করা যায়। এই নকল করতে পারি বলেই, 'বুঝেছ কিনা' কথাটির অমন ব্যবহার কৌতুকপ্রদ। সেই সব বিবৃতিই কৌতুককর, যা আমরা সাফল্যের সঙ্গে অনুকরণ করতে পারি।

"A deformity that may be comic is a

deformity that a normally built person could successfully imitate."

যে নমনীয়তা প্রাণবন্ত সজীব মানুষ হিসাবে আমাদের কাছে অনায়াসলভ্য, তাকে আয়াসলভ্য করাটা দুর্বলতা। অন্যের মধ্যে এই দুর্বলতা দেখলে আমরা হাসি। আমাদের হাসির সঙ্গে তাই আমাদের একটা আত্মপ্রসাদ বোধ থাকে। ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স্ তাই বলেছেন,

"We laugh because……we have a sudden glory in discovering some eminency in ourselves by Comparison with the informities of others.' অন্যের দুর্বলতার সুযোগেই আমাদের এই চিত্ত-গরিমা। তবে এই গরিমাবোধের তারতম্য আছে। কখনো তা প্রকাশ পায় উৎকটরূপে, কখনো আভাস ইঙ্গিতের আবরণ নিয়ে, অন্তঃসলিলারূপে। এই তারতম্য নির্ভর করে আমার যে 'এটিচুড্' বা মনোভাব নিয়ে হাসি, তার ওপর। ইংরেজি ভাষায় হাসির যে বিভিন্নরূপের নাম পাই যথা উইট, হিউমার, স্যাটায়ার, আইরনি, ইত্যাদি, সেগুলি সবই আমাদের এই মনোভাবের ওপর নির্ভরশীল।

বুদ্ধিদীপ্তির নানা প্রতিফলনে উইটের বৈচিত্র্যময় চমক, গমক এবং শাণিত তীক্ষ্ণ বাকবিভঙ্গী দেখা দেয়। অবশ্য প্রকৃত উইটে আছে, সহিষ্ণুতা; হাসতে গিয়ে বুদ্ধিতে শাণ দেওয়াই হল তার কাজ, কোনরকম আঘাত দেওয়াতে তার মন তত নেই। সহিষ্ণুতার যখন অভাব ঘটে তখন হাসির যে রূপ ফোটে তা হল স্যাটায়ার, অর্থাৎ বিদ্রূপ এবং এই অসহিষ্ণুতার জন্যেই স্যাটায়ার যথেষ্ট আঘাত দিয়ে থাকে। পিত্তদোষদুষ্ট মেজাজের রুক্ষতা ও নীতিবাগীশের কলহপরায়ণতা নিয়ে স্যাটায়ারের হাসি বেশ নিষ্করুণ। এক কথায় স্যাটায়ারের হাসিতে বেশ হুল আছে। কিন্তু হাসি যখন বাইরে মধুরপ্রলেপ দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হুল ফোটায়, তখন তা হল আইরনি বা ব্যঙ্গ। স্যাটায়ার গায়ে জ্বালা ধরায়, আইরনি কিছু সুড়সুড়ি দিয়ে চিমটি কাটে।

আর হৃদয়ের রসে যে হাসির ভিয়েন সে হাসির আধার হল হিউমার। হিউম'রের মূল কথা হল মমতা, সহানুভূতি। অন্যের দুর্বলতা নিজের মনে করে নিয়ে যখন হাসা যায় তখনই হিউমারের সৃষ্টি হয়।

বের্গস যে হাসির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার সঙ্গে ডারউইনের জীবতত্ত্বের একটি মূলসূত্রের আশ্চর্য মিল আছে। ডারউইনের একটা কথা হল এই যে, প্রাণিগণ অবিরত সামঞ্জস্য-সাধনের কাজে ব্যাপৃত। এই তত্ত্বের সত্য রবীন্দ্রনাথের কাছেও প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা।" এই সামঞ্জস্য-সূত্রের সঙ্গে হাসির কারণ-সূত্র মিলিয়ে দিয়েছেন বলেই বোধ হয় বের্গসর কথা এতো মূল্যবান্ ঠেকে। হাসির এই ইতিবৃত্তের সঙ্গে অশ্রুর ইতিবৃত্তের কোন মিল আছে কিনা এ কৌতূহল একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনেই জাগ্রত হয়েছিল দেখতে পাই। হাসির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, অসঙ্গতিও দুই শ্রেণীর আছে, একটা হাস্য-জনক, আর একটা দুঃখজনক।… অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে, তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়; গভীরতর স্তরে আঘাত করলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়।" একথাকে রবীন্দ্রনাথ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেননি; কিন্তু সূত্রাকারে জানিয়েছেন যে, একই কারণকে ভিত্তি করে হাসি-অশ্রুর উদ্ভব।

এরিষ্টটোল বলেছেন, জীবনে অনর্থ থেকে রেহাই পাবার উপায় হল Golden mean অবলম্বন করা। এই Golden mean আর কিছুই নয়, শুধু সামঞ্জস্য রক্ষা করার ক্ষমতা এবং সামঞ্জস্যের অভাবেই যখন আমাদের হাসি-অশ্রুর সৃষ্টি হচ্ছে, তখন এমন ভাবতে পারি যে, যেদিন এই Golden mean দ্বারা এমন স্বর্ণ-সরণী তৈরী করা যাবে, যার ওপর দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষ চলতে পারবে, সেদিন মনুষ্যজীবনে আর হাসি বা অশ্রু কোনটিই থাকবে না। অবশ্য সে অবস্থা সম্ভব কিনা এবং কাম্যও ঠেকবে কিনা—সে কথা আলাদা।

প্রফুল্ল কি ট্রাজেডি?

শ্রীবরুণকুমার

'প্রফুল্ল' নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের একটি বিখ্যাত জনপ্রিয় সামাজিক নাটক। এই নাটকের নায়ক যোগেশ। তাঁহার বহু পরিশ্রমে গঠিত শান্তির ও সুখের সংসার অকস্মাৎ কিরূপে ভাঙ্গিয়া গেল, তাহারই করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এই নাটকখানিতে। সমালোচক মহলে এই নাটকখানি আলোড়ন তুলিয়াছে—বিশেষ করিয়া ইহার আঙ্গিকতার বৈশিষ্ট্য লইয়া। এক শ্রেণীর সমালোচক নাটকখানিকে ট্রাজেডি বলিয়া স্বীকার করিয়া, নানাবিধ যুক্তি প্রয়োগে তাঁহাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আবার আর এক শ্রেণীর সমালোচক নাটকখানির নানাবিধ ত্রুটি প্রদর্শন করাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ইহা ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারেনা। আবার ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ কয়েকজন সমালোচক নাটকখানির ট্রাজেডিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে বিচার্য বিষয় হইল যে, 'প্রফুল্ল'কে আমরা সত্যই ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি কিনা এবং স্বীকার করিলেও ইহা প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য কিনা। কিন্তু ইহা বিচার করিবার পূর্বে প্রয়োজন ট্রাজেডি বলিতে সাধারণতঃ আমরা কি বুঝিয়া থাকি এবং নাটককে কখন আমরা ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত করি সেই সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া।

ট্রাজেডি বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি অলজ্ঘ্য দুর্ভাগ্যের প্রতিরোধের নিমিত্ত প্রাণান্তকর প্রয়াস, এবং অবশেষে তাহাতে অকৃতকার্যতা। ট্রাজেডি নাটকের নায়ক এই অনিবার্য দুর্ভাগ্য প্রতিরোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে তাহা রোধ করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু এই প্রতিরোধের চেষ্টার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নায়কের অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং মহিমা। বিশাল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও মহিমান্বিত নায়কের পতনের জন্য আমরা অন্তরে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। Dixon সাহেব তাঁহার 'Tragedy' গ্রন্থে বলিয়াছেন: "It is however undifferentiated the characters, if the situation stirs in us the extremes of pity and alarm"—অতএব লক্ষ্যণীয় যে 'extremes of pity and alarm' উদ্রিক্ত করাই ট্রাজেডির উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ট্রাজেডির নায়কই যে ট্রাজেডির মূল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম। এই কারণেই ট্রাজেডি বিচারে নায়ক চরিত্রকেই মুখ্য আলোচ্য বিষয় করা হইয়া থাকে। এক্ষণে 'প্রফুল্ল' নাটকের নায়ক যোগেশের চরিত্র আলোচনার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে 'ট্রাজিক হিরো' সাধারণত কিরূপ হইয়া থাকেন। এ্যরিষ্টটল ট্রাজিক হিরোর সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন: "He falls from a Position of lofty emminence and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness, but to so great error of frailty,—অর্থাৎ ট্রাজেডির নায়কেরই কোন মারাত্মক ভ্রান্তি বা ত্রুটি তাঁহাকে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির অবস্থা হইতে দুঃখময় অবস্থায় পতিত করায়। কিন্তু বর্তমানে ট্রাজিক হিরোর এই সংজ্ঞা পরিবর্তিত হইয়াছে। অন্তর্নিহিত ত্রুটি ছাড়াও কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার প্রভাবেও যে নায়কের চরিত্রে ট্রাজেডি নামিয়া আসিতে পারে, তাহা বর্তমান কালের একাধিক প্রখ্যাত পাশ্চাত্য নাটকে দেখান হইয়াছে। এবং এই প্রকারের ট্রাজেডিকেই নাট্যসমালোচকেরা Tragedy of incident আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। আর নায়কের চরিত্রের মধ্যেই যে ট্রাজেডির বীজ নিহিত থাকে, তাহাকে আখ্যায়িত করা হইয়াছে 'Tragedy of charatcer' নামে। ইহার দৃষ্টান্ত Shakespeare এর 'ম্যাকবেথ' 'ওথেলো ইত্যাদি নাটকে। এক্ষণে উল্লেখযোগ্য যে বহু সমালোচক 'প্রফুল্ল' নাটকের ট্রাজেডিত্ব বিচার করিবার কালে তাঁহাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ

পূর্ব প্রচলিত ট্রাজেডির লক্ষণের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। অর্থাৎ 'Tragedy of incident' এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ না করিয়া তাঁহারা 'Tragedy of character এর প্রতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া নাটকখানি সমালোচনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা 'প্রফুল্ল' নাটকের ট্রাজেডি বিচারে যোগেশের চরিত্রগত ত্রুটিকেই মুখ্য আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। কিন্তু 'প্রফুল্ল' হইল 'Tragedy of incident' এর প্রকৃত উদাহরণ। যদিও 'Tragedy of character'কেও একেবারে বাদ দেওয়া চলিবেনা। অর্থাৎ 'Tragedy of incident এবং 'Tragedy of character' এই দুইয়ের দৃষ্টিতেই 'প্রফুল্ল' নাটকের বিচার করিতে হইবে। প্রথমেই আমরা Tragedy of character এর ধারা অনুসরণে 'প্রফুল্ল'র আলোচনা করিব। সুতরাং যোগেশের চরিত্র আমাদিগকে প্রথমে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি নাট্যসমালোচকগণ যোগেশকে নিষ্ক্রিয়তা দোষে দুষ্ট বলিয়া অভিমত পোষণ করিয়াছেন। অজিতবাবুর ভাষায়, "যোগেশের সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চূর্ণ হইয়াছে এবং সেই চূর্ণব্যক্তিত্ব ক্লীবের ন্যায় রমেশের ষড়যন্ত্রজালে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যোগেশের চরিত্রের আর যাহা কিছু বাকি থাকিল তাহাতে রহিয়াছে কুৎসিত মাতলামি, কদর্য নিষ্ঠুরতা ও নিষ্ক্রিয় দুঃখ-বিলাস। এতবড় একজন সচেষ্ট, সক্ষম পুরুষ হঠাৎ এরূপ একটি নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডে পরিণত হইলেন এবং তাহাও শুধু ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার জন্য। ইহা আকস্মিক পক্ষাঘাত, ট্রাজেডি নহে।"—অর্থাৎ যেহেতু যোগেশ তাঁহার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করেন নাই, সেইহেতু অজিতবাবু এই নাটকটিকে ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও অজিতবাবুর ন্যায়ই যোগেশ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "যোগেশের সাংসারিক দুর্ভাগ্যের সূচনা হইতেই কাহিনীর উন্মেষ এবং এই দুর্ভাগ্যের পূর্ণতার মধ্যেই ইহার পরিসমাপ্তি—ইহাতে কোন দ্বন্দ্ব নাই, অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার কোনও প্রয়াস নাই—নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য।" অতএব আশুবাবু যোগেশ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "তাঁহার শোচনীয় পরিণতির জন্য যোগেশ কতদূর সহানুভূতি পাইতে পারেন, তাহাও বিবেচ্য।" 'প্রফুল্ল' নাটকের বিয়োগান্তক ফল কার্যকরী হইবার পক্ষে আর একটি প্রধান বাধা—যোগেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আশুবাবু বলিয়াছেন, "তাঁহার জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির অংশ নাট্যকাহিনীর পূর্ববর্তী এবং কেবলমাত্র যোগেশের মুখের কথার দ্বারাই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে—প্রকৃত নাট্যিক দৃশ্যের ভেতর দিয়া তাহা প্রকাশ পায় নাই। 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' ইহা যোগেশের মুখের কথা, সাজান বাগানটি আমরা চোখে দেখিতে পাইলাম না বলিয়া ইহা যে কেমন করিয়া শুকাইয়া গেল তাহাও প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিলাম না—ইহার কেবলমাত্র শুষ্ক দিকটাই আমরা গোড়া হইতে দেখিলাম—এই কারণেই কাহিনীর বিয়োগান্তক ফল দর্শকের উপর কার্য্যকর হইতে পারেনা।" অর্থাৎ যোগেশকে নাট্যকার passive রূপে অবতারণা করাইয়াছেন ইহাই হইল আশুবাবুর অভিযোগ।

এক্ষণে এই সকল অভিযোগগুলি বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। ট্রাজেডির নায়ক সম্বন্ধে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ট্রাজেডির নায়ককে অবশ্যই উচ্চব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহান পুরুষ হইতে হইবে। কিন্তু আধুনিক কালে এই প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সমালোচক Dixon সাহেব তাঁহার বহুখ্যাত Tragedy গ্রন্থে Tragedy নাটকের নায়কের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন: "Good in some sense the hero of tragedy must be"—বিচারের এই মাপকাঠিতে যোগেশ চরিত্র নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে যোগেশ সম্বন্ধে যে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

নাটকের প্রথমেই নাট্যকার যোগেশকে যেরূপভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ কঠিন পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সুখের ও সোনার সংসারকে দাঁড় করাইয়াছেন। যোগেশের ভাষায় "দুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি করে চালিয়ে এসেছি ; বাবা

মারা গেলেন, মাকে নিয়ে দুটি অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধরে খোলার ঘর ভাড়া করে রইলুম। সে একদিন গেছে, এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি।" দুটি ভাইয়ের মধ্যে রমেশ এটর্ণি হইয়াছে, এবং বলা বাহুল্য তাহাও যোগেশেরই প্রচেষ্টায়। কিন্তু ছোট ভাই সুরেশকে তিনি মানুষ করিয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। ইহার জন্য তাঁহার অসীম দুঃখ। যাহা হউক ত্রিশ বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যোগেশ এক্ষণে বড়ই ক্লান্ত। তিনি এখন পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে ইচ্ছুক। সমস্ত সম্পত্তি তিনি ভাগ করিয়া দিতে চলিয়াছেন ভাইদের মধ্যে। এইরূপ অবস্থায় যোগেশকে আমরা পাইয়াছি। মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, সত্যনিষ্ঠ এবং সহৃদয় ব্যক্তিরূপেই আমরা নাটকের প্রথমে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই অবসর গ্রহণের মুখে বাধ সাধিল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সংবাদ। এই ব্যাঙ্কেই তাঁহার উপার্জনের একটি বৃহৎ অংশ জমা ছিল। সুতরাং অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনার সংবাদে যোগেশ অত্যন্ত মুহ্যমান ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। যে সময়ে এই দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহাতে যে যোগেশ অত্যন্ত shocked হইবেন, তাহা খুবই স্বাভাবিক এবং এই দুর্ঘটনার মধ্য দিয়াই যোগেশের ট্রাজেডির শুরু। হা-হুতাশ করিয়া যোগেশ বলিয়াছেন, "ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করেছি, গেল, একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল।" ইহার পর যোগেশ এই আঘাতকে ভুলিবার জন্য অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করিতে শুরু করিয়াছেন এবং ইহার পরিমাণ বাড়াইয়া যোগেশের ট্রাজেডিকে ত্বরায় আগাইয়া আনিতে সাহায্য করিয়াছে রমেশ। দুঃখের মধ্যেও যোগেশের সান্ত্বনা ছিল যে তিনি সততা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারই ভাষায়, "আমার সর্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা করে বলতে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়েও চলিনি।" কিন্তু এই সান্ত্বনার মূলেও কঠিন কশাঘাত হানিয়াছে রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা। রমেশের বিশ্বাসঘাতকতায় অবশেষে যোগেশকে প্রবঞ্চকই হইতে হইল। যোগেশ সকল কিছু বুঝিতে পারিয়াও নির্বিকার হইয়া রহিলেন এবং ইহাতেই ট্রাজেডির মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে।

যোগেশ ইচ্ছা করিলেই এই সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন কিন্তু একের পর এক আঘাতে এবং পুঞ্জীভূত অভিমানে তিনি বিরুদ্ধাচরণ করিবার মত মানসিক অবস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। Shakespeareএর king Lear যদি কন্যাদ্বয়ের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবিধানের জন্য বহিঃশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার উন্মত্ত এবং অসহায় অবস্থার জন্য যে সহানুভূতি ও চোখের জল পাঠকবর্গের নিকট হইতে লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাহা লাভে অসমর্থ হইতেন। ঐ অবস্থায় Learএর উন্মত্ত এবং অসহায় অবস্থার উপস্থাপনাই শ্রেয়ঃ হইয়াছে। যোগেশের পক্ষেও ঠিক এইরূপে বিচার করিয়া বলা চলে যে, তাঁহার এই নিষ্ক্রিয়রূপে আত্মপ্রকাশের ফলে তাঁহার মানসিক আঘাতের গভীরতা, সুনাম সুযশের আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসপরায়ণতা উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটির পর একটি আঘাত পাইয়া যোগেশ মদের নিকট নিজেকে বিকাইয়া দিয়াছেন। মদ্যপানের মধ্যেই সান্ত্বনার সন্ধান করিয়াছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের 'দান প্রতিদান' গল্পেও দেখিতে পাই শশিভূষণ, রাধামুকুন্দের বিশ্বাসঘাতকতা জানিতে পারিয়াও শেষ অবধি নির্বিকার হইয়াই ছিলেন। এই নির্বিকল্পতার মধ্যেই শশিভূষণের ভ্রাতৃপ্রেম গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিবর্তে শশিভূষণ যদি রাধামুকুন্দের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের ঔদার্য ও মহত্ত্ব বিনষ্ট হইত। ন্যায়ের নিকট যাহা দণ্ডনীয়, ভালবাসার নিকট অধিকাংশ সময়েই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে অভিমানের মধ্য দিয়া। যোগেশও রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা টের পাইয়াও নিষ্ক্রিয় থাকিয়াছেন রমেশের প্রতি অভিমান করিয়া।

অজিতবাবু যোগেশের ট্রাজেডির কারণ সুরাপান বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে বলিতে হয় যে মদ্যপান যোগেশের ট্রাজেডির কারণ নহে, পরিণাম। যদিও যোগেশকে প্রথম হইতেই আমরা মদ্যপরূপেই দেখিয়াছি, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে মদ্যপান তাঁহার ট্রাজেডির কারণ নহে। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় যোগেশের "অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, তাঁহার সুনাম

সুযশ আকাঙ্ক্ষাকেই তাঁহার ট্রাজেডির কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগেশের ট্রাজেডির কারণ হিসাবে কয়েকটি কারণকেই অভিহিত করিতে হয়। ব্যাঙ্ক ফেলই যোগেশের ট্রাজেডির মুখ্য কারণ এবং যে সময়ে ইহা ফেল করিয়াছে—যোগেশের সেই অবসর গ্রহণের অবস্থা রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা, যোগেশের প্রবঞ্চকরূপে দুর্নাম, এবং সুরেশের চোর হওয়া—এই সকল ঘটনাই (incidents) যোগেশের ট্রাজেডির সম্মিলিত কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বেই আমরা 'প্রফুল্ল'কে বিশেষভাবে 'Tragedy of incident'এর পর্যায়ভুক্ত বলিয়াছি।

কিন্তু ইহাও সত্য যে 'প্রফুল্ল' নাটকের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি ইহাতে প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির আসনলাভে অসমর্থ করিয়াছে। এই ত্রুটিগুলি হইল—যোগেশের চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তন, ভাব-ঐশ্বর্যের অভাব, কয়েকটি অতিরঞ্জিত ঘটনার সমাবেশ, রমেশের চরিত্রের শঠতার **অতিপ্রকাশ,** 'উৎকৃষ্ট ট্রাজিক রিলিফের (Tragic relief) অভাব এবং সর্বশেষে নাটকের গান পারিপাট্যের দৈন্য।

মাছের বাজার
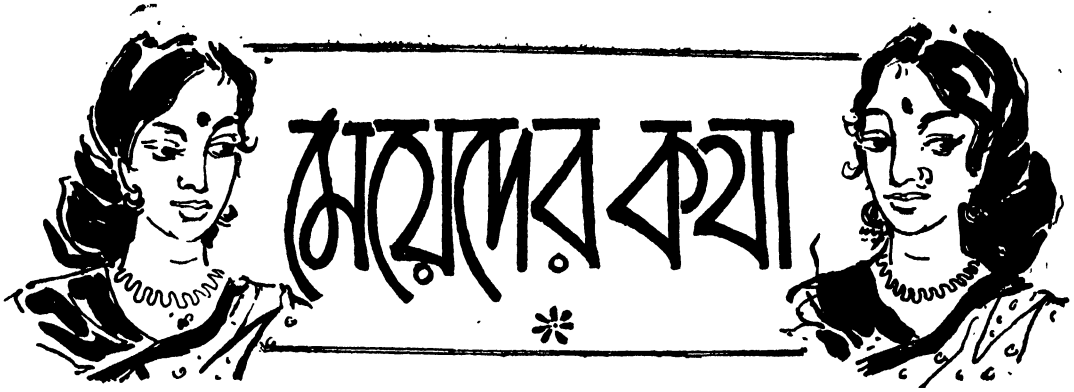
সভ্যতার সংকটে নারী

পঙ্কজিনী রায়

১৯৬৩ সালের একটি সভ্য দেশে প্রেসিডেন্ট নিহত হল আততায়ীর গুলিতে—মহাকালের বক্ষে চিহ্নিত হল বর্বরতার কোন স্তরে বাস করছে এই সভ্যদেশের মানুষেরা। মানব-সভ্যতার ইতিহাস নামে পরিচিত তা আসলে মানব-বর্বতার ইতিহাস। ইতিহাস শুধু সাক্ষ্য দিচ্চে কোন-যুগে মানুষ কতখানি বর্বর, তার বর্বরতার গতি প্রকৃতি কি, তার বর্বরতার স্বরূপ কি? এক একটা যুদ্ধ আসে তার সংহারী মূর্তি নিয়ে—নিরীহ মানুষ ভাবে, এই যুদ্ধের শেষে যে শান্তি আসবে তাতে মানুষ বর্বরতাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে। কিন্তু মানুষ কখনও তা পারল না, পারে নি বলেই সে এককালে বাল্মিকীর যুগে মনুষ্য-আকৃতি বিশিষ্ট জীবদের নর, বানর, ও রাক্ষস এই তিন ভাগে ভাগ করে ছিল। নরের শান্তি চিরকাল রাক্ষসেরা বিঘ্নিত করে এসেছে। রাক্ষসদের উৎপাতের ইতিহাসই মানবজাতির ইতিহাস—আসলে তা শুধু বর্বরতা-পরিমাপের ইতিহাস। সভ্যমানুষের পৃথিবী এখনও জন্ম পরিগ্রহ করে নি।

পৃথিবী সভ্য না হোক অন্তত সভ্যতার পথে কিছুটা এগিয়ে যাচ্চে—এটা হয়ত আমরা আশা করতে পারি। সেই এগিয়ে যাওয়ার পথে নারী কোন অবস্থায় অবস্থান করছে তা লক্ষ্য করা যাক। ডলার সমৃদ্ধ দেশ অ্যামেরিকার নারীর তুলনায় অন্য সমস্ত দেশের নারীরা পশ্চাতে পড়ে আছে। অ্যামেরিকান নারীরা কতদূর এগিয়েছে তা দেখা যাক।

The modern American woman leads simultaneously a multiplicity of lives, playing at once the role of sexual partner, mother, home-manager, hostess, nurse, shopper, figure of glamour, supervisor of children's schoosling and play and trips, culture avdieine and cultuse carrier, club woman, and often and careerist. for his part, psesents the position of the edwcated woman stripped of all romanticism since the dyingout of the servant class. In former times, he says, such woman would talk art and philosophy late into the hight; now they are so tired that the eyes close as soon as dishes are put away They used write te poetry, now they write launodry list,"

(The unfinished society : By Herbert von Borch)

এই তো হল শিক্ষিতা আমেরিকান নারীর প্রকৃত চিত্র। কিন্তু তাঁর শিক্ষা কালের চিত্র আরও সাংঘাতিক। বালক বালিকা ও তরুণ তরুণীরা সেখানে শিক্ষাকালে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। তাতে করে একটা সুস্থ যৌবন চেতনা গড়ে উঠার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা

হচ্ছেনা। হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-তাত্ত্বিক শ্রীপিটিরিম সরোকিন তাঁর The american ser revolution গ্রন্থে বলেছেন :—

Whatever aspect of our culture is considered, each is packed with sex obsession, If we escape from being stind by obscene literature, we may be aroused by crooners, or by new psychology and sociology or by the teachings of the frendianized pseudoreligious or by radio-television entertainment, we are completely surrounded by the rising tide of sex which is flooding every compartment of our culture, every section of our social life, unless we develop an inner immunity against these libidinal forces, we are bound to be conquered by the continious army of sex stimuli."

ঈদৃশ অবস্থায় সেখানকার তরুণ তরুণীদের মনের ও দেহের বিকাশ কীরকম ভাবে সাধিত হচ্চে সে সম্পর্কে সকলেরই উৎসুক্য জাগার কথা। অবাধ মেলা-মেশার সুযোগে, Datingএর বিচিত্র উপভোগে তরুণ তরুণীরা সেখানে নিজের আত্মাই রাখতে পারছে না। তার কুফল সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীরা বেশ চিন্তিত হয়েছেন। বয়স পনর বা তার চেয়েও কম, যে-সব মেয়ের বয়স তাদের মধ্যে অবৈধ্য শিশু-জন্ম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে এরূপ জন্মের হার চারগুণ বেড়ে গেছে। ওয়াশিংটনের ১৩টি স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে অবৈধ শিশু জন্ম দশগুণ বেড়ে গেছে। নিউ ইয়র্কে একবৎরের মধ্যে ১২৫০ পনর বৎসরের কম বয়সের ছাত্রীকে স্কুল থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছে। বাল্টিমোর সহরে যত অবৈধ জন্ম হচ্ছে তার অর্দ্ধেকের জন্য দায়ী উনিশ বছর বয়েসের ছেলে মেয়ে। সমস্ত আমেরিকার শতকরা ৪০ ভাগের অবৈধ সন্তানের জননীরা নাবালিকা।

অবাধ মেলামেশার যে ইচ্ছা প্রত্যক্ষ কুফল, তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে কি হচ্ছে? আমাদের দেশের বিরাট জনতার মধ্যে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ নেই। তার জন্যে সমাজ দেহ যে অক্ষত সুস্থ রয়েছে তা নয়। অপরাধ বিচারালয়ের খবর থেকে জানা যায় ধর্ষণোচিত মামলার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বর্ত্তমানে প্রায় আশীভাগ মামলা বলাৎকার ঘটিত। এর কারণ অবশ্যই সুস্থ আবহাওয়ায় ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার সুযোগের অভাব। কিন্তু আমেরিকার রিপোর্টে যাঁরা বিবেচনা করবেন তাঁরা সেখানকার অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই হতাশ হবেন। সর্বতো ভদ্র সর্বতঃ সুস্থ নর-নারীর সংগঠন সম্ভব হবে কোন পথে? সমাজতাত্ত্বিক আর সমাজ-নায়কদের সম্মুখে এ এক কঠিন সমস্যা।

—

রমণী রত্ন

যখন জাগলো প্রেম

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

ভাগীরথীর প্রবাহে যেখানে এসে মিশেছে অজয় নদ, দেবরাজ ইন্দ্র যেখানে এসে গঙ্গাস্নান করেছিলেন বলে লোকে, সেখানে আজো দাঁড়িয়ে আছে কাটোয়া সহর। মুসলমান শাসনকালে যে স্থান ছিল একটা বিখ্যাত বন্দর, শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য যেখানে একদিন তৈরী হয়েছিল দুর্গ, যে স্থানের অনতিদূরে নবাব আলিবর্দ্দীর কাছে পরাজিত হয়েছিল ভাস্করপণ্ডিতের মারাঠা সৈন্যদল, এককালে সেই কাটোয়া ছিল বৈষ্ণবদের লীলাভূমি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এখানেই কেশব-ভারতীর কাছে নেন সন্ন্যাসের দীক্ষা। এরই অদূরে আছে "চৈতন্যচরিতামৃত" রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপাট, নিকটেই হাজিগ্রামে আচার্য্য শ্রীনিবাসের মাতুলালয়। আজো পর্ব্বদিনে মুখরিত হয় কাটোয়া নগর বৈষ্ণবদের কীর্ত্তন ধ্বনিতে। বৈষ্ণব আচার্য্যদের স্মৃতি বুকে ধারণ করে আজো কাটোয়ানগর তীর্থের মর্য্যাদা পেয়ে থাকে ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে।

এই কাটোয়া নগরে বাস করতো দেবকীনন্দন রায়। লোকে বলতো, নবাবের ফৌজদার। মস্ত বড় ধনী। সোনাদানা অর্থ সম্পদের তার 'লেখাজোখা' নাই।

গর্ব্বও সেইজন্য ছিল তার অপরিসীম। ধনগর্ব্বান্ধতা তার চরমে উঠেছিল এবং অর্থ যার নাই, তার কোন মূল্যও ছিল না দেবকীনন্দনের কাছে।

শুধু অর্থ নয়, ধর্ম্মের অহমিকাও ছিল তার প্রচণ্ড। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বাঁকা সিঁথি, পরণে ফিনফিনে কালো পেড়ে ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে প্রকাণ্ড একটা সিন্দূরের ফোঁটা। লোকে জানে, প্রচণ্ড শাক্ত ছিল দেবকীনন্দন, ত্রিসন্ধ্যা পূজা পাঠ না করে জল গ্রহণ করে না সে। সর্ব্বদা কারণ পানে আরক্ত তার দুই চোখ। ক্ষমতার দম্ভে, ধর্ম্মের ভণ্ডামীতে সে হয়ে উঠেছিল দুর্দ্দমনীয়। এমন দুষ্কার্য্য নাই যা সে করে নাই, এমন মহাপাতক নাই—যা সে করতে পারে না। কিন্তু সবটাই ছিল তার ধর্ম্মের ভানে ঢাকা। তান্ত্রিক সাধনায় উত্তর-সাধিকার নাম দিয়েই চলতো তার ব্যভিচারের পালা অমাবস্যার রাতে, তার জন্য পাড়ার বৌঝিদের আত্ম-সম্মান নিয়ে বাস করা হয়ে উঠেছিল কঠিন।

নবাবের ফৌজদারের অপ্রতিহত ক্ষমতার ভয়ে নীরব হয়ে থাকে জনসাধারণ। বাধাই বা দেবে কে? সে ক্ষমতা আছে কার? নবাবের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগা যোগ থাকায় দেবকীনন্দনের প্রতাপ প্রায় রাজকীয় সর্ব্বশক্তিমত্তাতেই পৌচেছিল।

সেদিন সায়াহ্নে খুবই হৃষ্ট মনে কাটোয়া থেকে বর্দ্ধমানের পথে চলেছে দেবকীনন্দন। আশাতীত রাজস্ব পাঠিয়েছে সে জন্য তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন নবাব। সংবাদ পেয়েছে, নবাব দরবারে উচ্চপদের স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করবে সে। প্রফুল্ল অন্তরে তাই চলেছে সে বর্দ্ধমানে। যেখানে নবাব এসে ছাউনি ফেলেছেন উড়িষ্যা বিজয়ের পথে।

সহসা তার কানে প্রবেশ করলো সুমধুর সঙ্গীত। অন্তরালবর্ত্তিনী কোন গৃহবধূর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে গীত-গোবিন্দের একখানি গান। সুমধুর কণ্ঠস্বর। আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষের সমস্ত অশ্রুত সুর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সেই কণ্ঠে। সুললিত সেই কণ্ঠের ঝঙ্কারে চারি-দিক যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সুরের মূর্চ্ছনায় যেন চারিদিক মর্ম্মরিত হয়ে উঠেছে। অন্তরালবর্ত্তিনী গেয়ে চলেছে ভক্ত কবি জয়দেবের সেই অবিস্মরণীয় সঙ্গীত—

"রতি সুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্।"

কানন পথে চলেছেন মুরলী মনোহর কানু। অভিসারে এসেছেন প্রেমময়ী অভিমানিনী রাধা। যমুনা পুলিনে উৎকর্ণ হয়ে আছেন শ্রীমতী, আর কতক্ষণে এসে পৌছবেন তাঁর কৃষ্ণ। ভক্তকবির লেখা এই অপরূপ সঙ্গীত যেন প্রাণ পেয়েছে গৃহবাসিনী তরুণীর কণ্ঠে। রাধাকৃষ্ণের লীলাগান। মানুষের দেহ মন এখানে অস্বীকৃত নয়। তবু যেন লুপ্ত হয়ে যায় দেহ কামনা এক সীমাহীন অন্তরাবেগের মধ্যে। ব্যক্তিকামনাকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বকামনার যে চেতনা, মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের যে অভিসার, বৈষ্ণব সাধনার সেই মূলমন্ত্র ফুটে উঠেছে গানে। মর্ম্মরিত হচ্ছে আকাশ বাতাস।

কে এই গায়িকা?

অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন দেবকীনন্দন গায়িকার পরিচয় জানার জন্য। এমন অপরূপ সুরের মূর্চ্ছনা প্রকাশ করে যে কণ্ঠ, তার অধিকারিণীকে না দেখলে তার জীবনই যে বৃথা হয়ে যাবে।

সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলে দেবকীনন্দন।

চোখে পড়ে তার, তরুলতা ও গুল্মের সবুজ মায়া যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কয়েকটি পর্ণকুটির। কুটিরের প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র তুলসীমঞ্চের সম্মুখে একটি প্রদীপ জ্বলছে। আর তার সম্মুখে বসে আছে গলবস্ত্র হয়ে এক সুন্দরী কিশোরী। তার দেহে বিদায়োন্মুখ কৈশোরের প্রান্ত-সীমায় অস্ফুট যৌবনের আভাস। ফর্সা রং, ডাগর ডাগর কাজলটানা দুটি চোখ। সুন্দর মুখখানিতে স্নিগ্ধ লাবণ্য। তার শুভ্র গ্রীবার উপরে মৃদু বাতাসে কাঁপছে আলগা চুলের গুচ্ছ, সুঠাম নিটোল তনু। কণ্ঠে তার গান, চঞ্চল ঝরণা ধারার মতই ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

বিস্ময়ের অন্ত পায় না দেবকীনন্দন। নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। ভাবে দেবকীনন্দন, হাতের এত কাছে এমন অপূর্ব্ব রূপসী আছে। কেন জানতেম না এতদিন। ভাবে, একে তার চাই-ই।

একটু সম্বিত ফিরে পেয়ে লক্ষ্য করে সে, কিশোরীর সীমন্তে নেই সিন্দুর.—অনূঢ়া সে।

আশ্বস্ত হয় দেবকীনন্দন। ভাবে, বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয় নি যে নারী, তাকে বিবাহের অভিনয়ে করায়ত্ত

করা কঠিন হবে না বিত্তশালী ফৌজদারের পক্ষে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেবকীনন্দন কুটিরের চারদিকে—খোঁজে এমন কোন চিহ্ন যা দেখলে ভুল হবে না এই কুটিরকে চিনতে, ফেরার পথে। তারপর এগিয়ে চলে সে আনন্দিত মনে তার পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত পথে।

দিন কয়েক পর আবার সেই কুটিরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো দেবকীনন্দন। সঙ্গে অস্ত্রধারী অনুচরের দল রঙীণ রেশমী ঝালর দিয়ে ঢাকা এক পাল্কী নিয়ে।

ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসেন কিশোরীর পিতা গৃহদ্বারে, কে এলো তাঁর গৃহের সম্মুখে পালকি নিয়ে? দেখেন তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ফৌজদার দেবকীনন্দন. অবাক বিস্ময়ে অথচ ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে আপ্যায়ন করেন গৃহস্বামী বিনম্রভাষায়। প্রীত হয় দেবকীনন্দন সেই সম্ভ্রম-ভরা আচরণে। বলে সে—"যে আশা নিয়ে আমি এসেছি আপনার কাছে, তা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে এই ভরসাই আমি রাখি।"

উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন গৃহস্বামী। মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে কিসের আশায় এসেছে তাঁর কাছে প্রতাপান্বিত ফৌজদার? কি আছে তার? দরিদ্রের ঘর, সংসারে আছেন শুধু তিনি আর তাঁর কন্যা মাধবী। তবে কি মাধবীকেই কামনা করে ফৌজদার তার বিলাসের সঙ্গিনীরূপে?

ভীতির শিহরণ জাগে উৎকণ্ঠিত পিতার ব্যাকুলহৃদয়ে। রক্ষা করো প্রভু! কন্যার মান রাখো। লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলে তুমি কুরুরাজ সভায়, তেমনি আজ আমার কন্যাকে রক্ষা করো জনার্দ্দন!

ভীত কম্পিত হৃদয়, তবুও সাহসে ভর করে বললেন, গৃহস্বামী—"অবশ্যই পাবেন, যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়।"

উল্লসিত হয় দেবকীনন্দন। বলে ওঠে—"সাধ্যের অতীত নয় সে বস্তু। আমি আপনার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করি। আমাকে কন্যা দান করে আপনি সুখী হবেন নিশ্চয়ই।"

স্তব্ধ হন গৃহস্বামী, তাঁর আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। ফৌজদার দেবকীনন্দন কামনা করেছে তাঁর অনূঢ়া কন্যাকে, কি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব। নিজের বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য তাঁরই হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিতে এসেছে নরদেহী এক পশু। কি উত্তর দেবেন তিনি এ প্রস্তাবের?

অনুমান করে দেবকীনন্দন পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা। মৃদু হেসে বলে—"আমি বিপত্নীক। শাস্ত্রোক্ত মতে আমার হাতে কন্যা সম্প্রদান করুন। মাধবী হবে আমার পরিণীতা স্ত্রী।"

মন্দের ভাল,—ভাবেন গৃহস্বামী। আবার সেই সঙ্গেই মনে পড়ে তাঁর দেবকীনন্দনের বিলাসভবনের কথা। তাঁর নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক কন্যা হবে এক দুশ্চরিত্রের ঘরণী! কি শাস্তি পাবে সে জীবনে? কেমন হবে তার সম্মান, বহু-বল্লভ এক ব্যভিচারীর কাছে।

বেদনায় ছটফট করতে থাকে পিতৃহৃদয়; ভেবে পায় না কি করবে সে?

মাধবী এসে দাঁড়ালো দ্বারপথে। সিঁথিমূল অর্দ্ধেক ঢেকে ঘোমটা টানা, নতদৃষ্টি, নম্র ভঙ্গি। কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টানার জড়তা নেই; মুখে তার সপ্রতিভ ও নম্রতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ।

দেবকীনন্দনের চোখের সামনে যেন একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠ্‌লো! এযে অপরূপা!

পিতার দিকে তাকিয়ে বলে মাধবী—'মনস্থির করুন পিতা। রাধামাধবের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

মনে ভাবেন গৃহস্বামী—এই ভালো। বাহুবলে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার বদলে পত্নীর সম্মান দিয়ে নিতে চায় যখন ক্ষমতাশালী ফৌজদার, বাধা দেবারও যখন নেই কোন উপায়, তখন এই ভালো। শান্তি না পাক জীবনে, সম্মানটা ত রইল বেঁচে।

শানাইয়ের আনন্দ করুণ সুরে ভেবে উঠলো কাটোয়ার আকাশবাতাস—নিজগৃহদ্বারে এসে পালকি থেকে নামলো দেবকীনন্দন, সঙ্গে পট্টবাসপরিহিতা নববধূ মাধবী। উলুধ্বনি আর শঙ্খরবে মুখরিত হয়ে উঠলো চতুর্দিক।

বৌ দেখে সবাই একবাক্যে বললে—বেশ বৌ।

আরম্ভ হলো মাধবীর নূতন জীবন। কাটোয়ার ফৌজদার প্রাসাদে বলতে গেলে সেই হয়ে উঠলো সর্বময়ী কর্ত্রী। হাতে এসে পড়লো পরিবারের সব ভার। ঝি চাকরেরা তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ করে না। আত্মীয় পরিজন আশ্রিতরা মাধবীর নির্দ্দেশ মতই চলে। তার শান্ত সংযত ও প্রসন্ন গাম্ভীর্য্যকে সকলে শ্রদ্ধা করে, সমীহ করে।

এ তো গেল একদিকের কথা।

আর একদিক ?

ব্যভিচারী স্বামীর রূপলিপ্সা দুদিনেই মিটে যাবে, একথা বুঝেছিল মাধবী অনেক আগে। তবুও নূতন করে স্বপ্ন দেখতে থাকে সে, কি করে ফেরাবে সে স্বামীর মন। মনে ভাবে, দেখি না একবার চেষ্টা করে আমার স্বামীকে ফেরাতে পারি কিনা। মহাভারতে পড়েছি, সেকালের মেয়েরা কত কি করেছে স্বামীর জন্যে—কলাবতী, মাদ্রী, লোপামুদ্রা, স্বাহা—তাঁদের মত হতে পারব না জানি। কিন্তু একবার দেখিনা চেষ্টা করে! বামাচারী স্বামীর হৃদয়ে প্রেমের ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা যাতে হয় সেই হলো তার চেষ্টা—পিতার আদর্শকে স্বামীর জীবনে জাগানোর সাধনায় ব্রতী হলো সে। গৃহকোণে প্রতিষ্ঠা করলো সে রাধা-মাধবের বিগ্রহ—ফুলচন্দন, তুলসীপাতা আর ধূপধুনা দিয়ে পূজা করে সে প্রত্যহ।

কিন্তু কি দুষ্কর তার ব্রত! দিনের পর দিন দেবকী-নন্দনের হৃদয়ের পরিবর্ত্তনে জন্য চেষ্টা করে সে। কোন দিন তার মুখের দিকে চেয়ে শরীরের শিরা উপশিরায় উন্মাদনা জেগে ওঠে দেবকীনন্দনের,- দুটি বাহুর সবল আকর্ষণে মাধবীকে বুকের উপর টেনে নেয় সে। আবার কোনদিন সুরার নেশায় টলতে টলতে গৃহে ফিরে আসে সে প্রমোদ ভবন থেকে, বাহুতে আবদ্ধ থাকে কখনো অস্পৃশ্যা নারী। টুকটুকে চেহারা, ঘোমটা খোলা হাতে পানের ডিবে।

এমন দৃশ্যে অপমান বোধ করবে যে কোন বিবাহিতা নারী। মেয়ে মানুষের এত বড় লজ্জা, এত বড় অপমান আর নেই। দুহাতে বুক চেপে ধরে মাধবী, চোখে দেখে আঁধার।

আবার পরক্ষণেই মন থেকে সকল দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে দেয় সে। দ্রুত পায়ে ছুটে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে শয্যায় শুইয়ে দেয় সে, খুলে দেয় তার বেশ বাস—ধুইয়ে দেয় তার মুখ। সযত্নে দেবকীনন্দনের চুল বিলিয়ে-দিতে দিতে বলে—কেন যে ওসব খাও তুমি, কেন যাও এখানে সেখানে ?

দেবকীনন্দন তখন উত্থানশক্তি রহিত, বাহ্যজ্ঞান যেন নেই তার; বালিসে মাথা দিয়ে চুপ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। সুরায় অচেতন দেবকীনন্দন কোন উত্তর দেয় না। হয়তো শুনতেও পায় না সে কথা।

আবার কোনদিন মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে দেবকীনন্দন পদাঘাত করে তার দেহে। সেই দেহ,—যে দেহ দেখে একদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল দেবকীনন্দন, যে দেহকে একটিবার দেখেই সকল কাজ ফেলে আনতে গিয়েছিল সে পত্নীর সম্মান দিয়ে। সুরার নেশায় চিৎকার করে ওঠে দেবকীনন্দন—দূর হয়ে যাও সামনে থেকে। গুরুমা এলেন যেন!

অসহ্য দুঃখে মন টনটন করে মাধবীর। ভাবে, একি দুঃখের কপাল তার? তার সম্মতিতেই যে বিয়ে হয়েছে, একথা সত্যি। কিন্তু তখন কে জানতো যে, এমন এক নিদারুণ ভবিতব্য তৈরী হয়েছে তার জন্য। এই তার জীবন মরণের সাথী—তার স্বামী।

টলতে টলতে বিছানা থেকে নেবে পড়ে দেবকীনন্দন। দেরাজ খুলে নিয়ে আসে সুরার পাত্র। ঢক্ ঢক্ করে এক পাত্র শেষ ক'রে আর এক পাত্র তুলে ধরে মাধবীর মুখের সামনে।

ঘৃণায় পিছিয়ে আসে মাধবী। দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে তার। অনেকক্ষণ ধরে নিশ্চুপ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। বুক নিঙড়ে বের হয়ে আসে বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস। কান্নার আবেগে থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে তার দুটি ওষ্ঠ।

"—উপায় বলে দাও রাধামাধব। বলে দাও কি করবো আমি।"

আর্ত্ত অসহায়কণ্ঠ সর্ব্বশক্তিমানের পায়ে পৌঁছে দেয় তার অন্তরের বেদনা। তাঁর আসন কখন যে কিসের জন্য টলে কেউ জানে না; তিনি যে সকল জ্ঞানের অতীত!

মন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে মাধবীর। স্বামীর অনাদরে নয়, স্বামীর অনাচারে যন্ত্রণা বোধ করে সে। বলতে পারে না কাউকে; আর বলবেই বা কি? যখন একান্ত অসহনীয় মনে হয় তখন ঠাকুর ঘরে আশ্রয় নেয় মাধবী। রাধামাধবের বেদীর নীচে বুকভরা বেদনা আর আকুতি নিয়ে লুটিয়ে পড়ে। চোখের জলে ভিজিয়ে দেয় রাধামাধবের বেদীতল। আশা করে থাকে, ঠাকুরের

দয়ায় হৃদয়ের বেদনা গলে গলে যদি ধুয়ে মুছে যায়, যদি কিছু শান্ত হয় এ তীব্র অন্তর্দ্দাহ !

এমনি করেই দিন যায়।

ধীরে বৈষ্ণব সাহিত্যের অমর পদাবলীতে মনোনিবেশ করে মাধবী। প্রেম ও ভক্তির মাহাত্ম্য দিয়ে রচিত পদাবলীর মধুর সুরে মেতে গেল তার মন। খুলে গেল তার কাছে কৃষ্ণলীলার তথ্য ও দর্শনের চাবিকাঠি। ফুটে উঠল তার কণ্ঠের মধুর সুর—'হরি গেল মধুপুর হম কুলবালা, বিপথে পরল জৈছে মালতি মালা।'

খুলে ফেলল মাধবী পট্টবসন, তুলে রাখল যত রত্ন আভরণ—যা মানায় শুধু অর্থবান্ ফৌজদার গৃহিণীর দেহে। তুলে নিল অঙ্গে বৃন্দাবনী সাড়ি, কণ্ঠে নিল তুলসীর মালা। মাথার কবরীতে দিল শ্বেতপুষ্পের স্তবক। ললাটে আর বাহুতে আঁকল গঙ্গা মৃত্তিকার রসকলি। ঘরের কাজ করতে করতে কীর্ত্তনের পদ গুনগুন ক'রে গান করে মাধবী :—'অঙ্গনে আওয়ব জব রসিয়া। পালটি চলব হাম ঈষত হঁসিয়া ॥'

তার মধুর কণ্ঠের মূর্চ্ছনা একটা অলৌকিক মোহাবেশ এবং অতন্দ্র নীরবতায় চারদিক ভরে উঠলো।

সুরায় অচৈতন্য দেবকীনন্দনের কানে গেল সে সুর। শরীরে রোমাঞ্চ জাগলো তার। সুললিত কণ্ঠের মধুর মূর্চ্ছনা যেন তার তন্দ্রাতুর অনুভূতির দ্বারে মৃদু আঘাত করলো। সে কণ্ঠ যেন কবে, কোন বিস্মৃত অতীতে শুনেছিল সে ; হয়ত এ জন্মে, অথবা পূর্ব্বজন্মে, আজো বিলুপ্ত হয়নি তার স্মৃতি।

চঞ্চল হয়ে ওঠে তার মন ; দেখতে চায় সে গায়িকার মুখখানি, কিন্তু পারে না। নেশায় হতচেতন হ'য়ে গড়িয়ে পড়ে সে। ওদিকে সুরের মূর্চ্ছনা ছড়িয়ে চলে সমস্ত পরিবেশে : 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥ পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥"

গান শেষ করে দেখল মাধবী স্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছে দেবকীনন্দনের কপালে ; নেশার প্রভাবকে অতিক্রম করেও যেন তার চোখে জেগে উঠেছে জিজ্ঞাসা। উৎসুক হয়ে ওঠে মাধবীর মন, চাঞ্চল্য জাগে চোখে।

কিন্তু বৃথা। চেতনা ফিরে এলেই দেবকীনন্দনের মনে জেগে ওঠে কামনার আগুন। নিত্যকার অনুষ্ঠানসূচি অনুসরণ করে সে। নৃত্যগীতের ঝড় আর সুরার বন্যায় টলমল করে ওঠে প্রমোদভবন। উচ্ছ্বসিত হাসি, ঘুঙুরের রব, গেলাশের টুংটাং, সুরা পানোন্মত্তের প্রণয় ভাষণ ভেসে আসে সেখান থেকে। মাঝে মাঝে চলে লোক-দেখান শ্যামাপূজার আয়োজন। লোকের হাঁকে ডাকে, 'মা-মা' শব্দের সঙ্গে ছাগশিশুর ত্রস্ত চিৎকার মণ্ডপ প্রাঙ্গণকে সরগরম করে তোলে। কোমরে জড়ানো রক্তাম্বরের মধ্য হ'তে একটা বোতল বের করে মধ্যের তরল পদার্থ—কারণ বারি—গলায় ঢেলে চিৎকার করে ওঠে দেবকীনন্দন—জয় মা।

দিনের পর দিন কেটে যায়। দেবকীনন্দনের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। মাঝে মাঝে নেশার প্রভাবকে অতিক্রম ক'রে যে নূতন জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে তার মনে, তাও যেন বিভ্রম বলে মনে হয় মাধবীর। তবে কি স্বামীর হৃদয়ের গভীরে জাগেনি কোন অনুশোচনার আগুন, নূতন কোন আলো ?

দুঃখে, অভিমানে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। স্বামীর সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করবার জন্য মনস্থির করে মাধবী।

আহ্বান করলো মাধবী আচার্য্য শ্রীনিবাসকে তার স্বামীভবনে। আরম্ভ করলো অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্ত্তন দেবকীনন্দনের নিষেধ অমান্য করে। সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হয়ে উঠলো আকাশবাতাস। মৃদঙ্গ আর করতালের মধুর ধ্বনি এক কল্পরাজ্যের আবেশ নিয়ে এলো ফৌজদার ভবনে। ক্রোধে উন্মত্ত দেবকীনন্দনের প্রশ্নের জবাব দেয় মাধবী ফুলের পাপড়ীর মত কোমল ঠোঁট মুচড়ে—এ বাড়ীতে তোমার অধিকার যতটুকু, আমার অধিকারও কম নয় তার চেয়ে ; এ বাড়ির কুলবধূ আমি।

দেবকীনন্দনের ধৈর্য্য অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এত স্পর্দ্ধা এই নারীর ? কাটোয়ার ফৌজদারের মুখের উপর যে কেউ এমন করে কথা বলতে পারে, এ তার ধারণার অতীত। কী সাজ্ঘাতিক সাহস এই নারীর ! এত সাহস ওর হলো কেমন করে ?

মাধবীর অনমনীয় কঠোর ভঙ্গিতে হতবাক্ হয়ে উঠলো দেবকীনন্দন। স্ত্রীর চোখে চোখ রাখতে দ্বিধা

জাগে তার মনে। সঙ্কুচিত হলো তার মন মাধবীর স্পষ্ট ভাষণে।

কয়েকদিন পরের কথা।

সেদিন প্রাতে সদ্যঃস্নাত দেহে অপরূপ রূপের লাবণ্য মেখে পদাবলীর কলি গুন্ গুন্ করে গেয়ে চলেছে মাধবী। লালপাড় শাড়ী আর সিন্দূরের টিপে কল্যাণী মূর্ত্তি, তার দুই চোখে এক আশ্চর্য্য দীপ্তি, সারা মুখ যেন ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত। কণ্ঠে তার সুরের ঝঙ্কার:—'সখি, কেমনে ধরিব হিয়া। আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া।'

প্রমোদভবন থেকে ঠিক এমনি সময়ে ফিরে এলো দেবকীনন্দন, চোখের পলক পড়ে না তার মাধবীর রূপ দেখে, মুখে হাসি টেনে এনে তার দিকে মোহ-মুগ্ধ দৃষ্টিতে মাধবীর শান্ত মধুর রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে অধীর আবেগে ছুটে গেল, তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবার জন্য।

'না।'—দু'পা পিছু হটে গিয়ে বলে উঠলো মাধবী। বলে চলে মাধবী—"পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম আর সাত্ত্বিক আচার পালন করে না যে, সে স্বামী হলেও তার বাহু বন্ধনে ধরা দেবে না মাধবী। দেবে না আর সে প্রশ্রয় এক বামাচারী পুরুষকে।"

দেবকীনন্দনের মুখের হাসি মিলিয়ে যায় এবং তার দুই ওষ্ঠ যেন এক দুঃসহ অপমানে কাঁপতে থাকে।

মাধবীর চোখের তারায়, ঠোঁটের কোণে, আচার আচরণের প্রতিটি অভিব্যক্তিতে তখন ব্যক্তিত্বের অপরূপ বিকাশ। স্বামীর দিকে চেয়ে বলতে থাকে সে—"কোন বিভেদ দেখেন নি শাস্ত্রকারেরা শ্যাম ও শ্যামার মাঝে। যাঁর পূজাতেই হোক, ভক্তির আবেগ ফুটে ওঠে না যে স্বামীর চোখে, তার ধর্ম্মের ভণ্ডামীতে সাড়া দেবেনা কোন সতী রমণীর মন; ধরাও দেবে না তার বাহুতে।"

স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেবকীনন্দন। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় থর থর করে কাঁপতে থাকে তার দেহ। কে জানে অপমানে, না বেদনায়! দেখে মনে হলো, যেন জীবনের স্বপ্ন হারিয়ে শূন্য হয়ে গিয়েছে তার মন। রৌদ্র প্রখর হয়; বাদ্যরবে মুখর হয়ে ওঠে দেবকীনন্দনের পূজা মণ্ডপ। কিন্তু সে দিকে যেন খেয়াল নেই তার।

ধীরে ধীরে যেন অবসন্নের মত সেই গৃহদ্বারেই বসে পড়ে দেবকীনন্দন। ভুল হয়েছে, সত্যিই ভুল হয়ে গেছে এ জীবনে। সব উচ্ছৃঙ্খলতা আর অনাচার দূর করে দিয়ে শান্তির মন্ত্র গ্রহণ করে এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জীবন হতে চিরকালের মত দূরে যাওয়াই ত ভালো। সব লোভ, মোহ, ভুল আর নীচতার স্পর্শ থেকে যেন মুক্তি পেল দেবকীনন্দন।

উজ্জ্বল হয়ে উঠ্লো মাধবীর দুটি কাজলটানা চোখ; উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তার মন। ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে গৃহান্তরে গিয়ে একখানি বৃন্দাবনি পট্টবস্ত্র নিয়ে ফিরে আসে মাধবী, আর নিয়ে আসে পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যের চরিতামৃত। জিনিষ দুটিকে অঞ্জলি দেবার ভঙ্গিতে ধরে মিনতি জানায় মাধবী—"এই নাও স্বামি, তোমার স্ত্রীর আজীবনের সঞ্চয়, শ্রদ্ধার উপহার।"

কেঁপে উঠলো দেবকীনন্দনের চোখের দৃষ্টি। বিহ্বলের মত নীরবে পুঁথির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর হঠাৎ বৃন্দাবনী বস্ত্রখানা হাতে তুলে নিলো—ছিনিয়ে নিলো পুঁথিখানা পরম আগ্রহে। ধীরে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো তার চক্ষু। এত দিনে পেয়েছে সে পরম সম্পদ। যেন জীবনের অন্ধতা ঘুচে গেল এতদিনে।

"—মাধবি!"

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলে দেবকীনন্দন।

"—মাধবি, একবার শোনাবে কি সেই গানখানা, যে গান আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তোমার কাছে।"

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে চোখের আনন্দাশ্রু মুছছিল মাধবী। দেবকীনন্দনের এ পরিবর্ত্তন যে তার কাছে অভাবিত, অকল্পনীয়। এতো দিনে সার্থক হলো কি তার মনের কামনা! স্বামীর করুণ স্বরে কেঁদে উঠলো তার মন। গেয়ে উঠ্লো সে, ভাবে বিভোর হয়ে: "রতি সুখ সারে, গত মভিসারে, মদন মনোহরবেশম্।"

মুগ্ধ হয়ে গান শুনলো দেবকীনন্দন। চোখের দৃষ্টি হলো তার মোহাবিষ্ট। গান শুনতে শুনতে কখন দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে, বুঝতে পারেনি সে। এ কেমন গান? এ কি অদ্ভুত গান? হৃদয় নিঙড়ানো এই সঙ্গীতের আস্বাদ সে ভুলে ছিল কেমন করে, কোন প্রলোভনে?

হঠাৎ বলে উঠে দেবকীনন্দন—"আমায় মুক্তিদাও মাধবি।"

কেমন যেন চমকে উঠলো মাধবী।—আমি কোথায় আবদ্ধ করে রেখেছি তোমাকে! তোমার সঙ্গে আমার যে সহজ সম্পর্ক সেখানে তো বন্ধনের প্রয়োজন বাহুল্য। প্রেম মানেই তো মুক্তি। যদি সত্যিই মুক্তি চাও, মাতোয়ারা হও হরিপ্রেমে।"

আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গৃহ ছেড়ে চলে গেল দেবকীনন্দন প্রান্তরের পথে। কণ্ঠে বেজে উঠলো তার সুর:—আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়া মুখচন্দা।

গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখে মাধবী। দেখতে পায় সে, দূরে চলে যাচ্ছে তার স্বামী দেবকীনন্দন। প্রেমের যাদু মন্ত্রে সে আজ রূপান্তরিত। তার মনে ভক্তির আলো জলে উঠেছে। আলোর আভায় উজ্জল হয়েছে তার মুখ। যেন জন্মান্তর ঘটেছে স্বামীর! বেজে উঠলো মাধবীর জীবনের রাগিণী। তার তিলে তিলে গড়া স্বপ্নের কামনা যেন জলে উঠেছে হোমাগ্নির মত এক অনির্ব্বাণ শিখায়। অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে সে চেয়ে থাকে পথের দিকে।

নিজের পরিবর্ত্তনে নিজেই অবাক হয়ে গেল দেবকীনন্দন। তার বুকের মাঝে ভক্ত বৈষ্ণবের এত কোমল ও মধুর অনুভূতি গোপন ছিল, সে তার ধারণারও অতীত। ভক্তির সৌরভে পুলকিত হলো তার মন। নিজের প্রাণবন্যার চাঞ্চল্যে আকুল হয়ে উঠলো সে। ভাবের আবেগে গেয়ে উঠলো:—নব 'বৃন্দাবন নব নব তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল। নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল।'

চলে গেল দেবকীনন্দন। গৃহদ্বার ত্যাগ করে কাটোয়ার ধূলি ধূসরিত প্রান্তরের উপর দিয়ে ফৌজদার দেবকীনন্দনের ছায়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর দেখা যায় নি কোন দিন কাটোয়ার ফৌজদারভবনে সে দেহের ছায়া।

নবদ্বীপে আচার্য্য শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা নিয়ে চলে গেল সে বৃন্দাবনের পথে। মাধুকরী নিল দেবকীনন্দন। নিজের যা কিছু ছিল সব বিলিয়ে দিয়ে এক দুশ্চর সাধনায় ব্রতী হলো সে। নিজের চারপাশে কৃচ্ছ্র সাধনার আর নামজপের হোমানল জেলে তারি আভায় উজ্জল হয়ে উঠ্‌লো সে। কীর্ত্তনের মধুর সুরে আত্মহারা হয়ে গেল তার প্রাণ মন।

এ সবই ইতিহাসের কথা।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে দেবকীনন্দন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে আজো।

আর মাধবী? দেবকীনন্দনের যাত্রা পথের দিকে চেয়ে হঠাৎ তার সমস্ত দেহ মন এক প্রচণ্ড আবেগে কেঁপে উঠলো। তার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠ্‌লো স্বামীর বিরহে। নিজের হৃদয়কে বিশ্লেষণ করে দেখে সে। স্বামীর পরিবর্ত্তন চেয়েছিল সে সত্যই, সেই সঙ্গে চেয়েছিল স্বামী সঙ্গও। করতে চেয়েছিল তাঁর সেবা।

আবার তন্ময় হয়ে নিজের মনের গভীরে ভেবে দেখে মাধবী। এই ভালো; মানবীর হাতে আঘাত পেয়ে সত্যকার প্রেমের স্বাদ পেলো তার স্বামী। প্রেমের আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়ে গেল; পেল হরিপ্রেমের আস্বাদ। সার্থক আমার জীবন। নর্ম্মসহচরী নয়, প্রকৃত ধর্ম্ম-সঙ্গিনীর কাজই করেছি আমি।—নিজের প্রেম দিয়ে স্বামীকে করেছি সেই প্রেমের পথের পথিক, যে প্রেম নিবেদিত হয় ভগবানের চরণে। ধন্য আমি, সার্থক আমার প্রেম।

মাধবী স্নিগ্ধ আবেগে চোখ বুঁজে রইলো। তার মনের সব দুঃখ সব অভিমান নিমেষে জুড়িয়ে গেল। পরম পরিতৃপ্তিতে তার মন কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠলো।

তবুও কখন যে বাঁধ ভেঙ্গে অশ্রুর বন্যা নামল তার চোখে তা বুঝতেও পারলো না মাধবী। মাটিতে লুটিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদলো সে কতকক্ষণ। তার পর ভক্তিনম্র চিত্তে শান্ত সমাহিত হয়ে করজোড়ে চেয়ে রইল রাধা—মাধবের বিগ্রহের পানে। মনে হলো তার, যেন এক অপরূপ খুশীর আলোকে পুলকিত হয়ে উঠেছেন স্বয়ং রাধামাধব। পরিতৃপ্ত অন্তরে তিনি যেন চেয়ে আছেন তার দিকে সুমধুর ভঙ্গিমায়।

আজো আছে কাটোয়ায় ভাগীরথী তীরে রাধারমণের পাট, মাধবীর স্থাপিত সেই পাট কালের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে আছে আজো সমুন্নত মহিমায়। বাসন্তী পূর্ণিমাতে যখন জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক ভেসে যায়, বকুলের সুরভি যখন চারিদিক আমোদিত করে তোলে, তখন মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তপঃক্লিষ্ট সুন্দরী কিশোরীর এক প্রেমময় কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে যায় বিমুগ্ধ পথিকের, যে প্রতিজ্ঞার ফলে উদ্ধার পেয়েছিল তার বামাচারী স্বামী। মনে পড়ে তার, এক দুঃখিনী নারী তার জীবনে প্রথম প্রেমের আবির্ভাবকে চোখের জলে বন্দনা করে যখন ভিজিয়ে দিয়েছিল রাধারমণের পা দু'খানি, তখন মধুর বেদনায় আনন্দাশ্রু ঝরে পড়েছিল শিলাময় বিগ্রহের নয়ন থেকে।

রাশিচক্র দর্শনে স্ত্রীপুরুষ নির্ণয় ও অন্যান্য যোগ

উপাধ্যায়

জাতক স্ত্রী কি পুরুষ তা জানতে হোলে দ্রেক্কাণ বিচার আবশ্যক। কিন্তু বিচারের সময় সতর্কতার প্রয়োজন। কেন না যদি লগ্নে কোন স্ত্রীগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি থাকে, তা হোলে পুরুষ স্থানে স্ত্রী ও হয়ে থাকে। যে কোন ব্যক্তির রাশিচক্র বা জন্মকুণ্ডলী দেখে বলা যেতে পারে তার সম্বন্ধে। জাতক পুরুষ না নারী—তা নির্ণয় করার প্রণালী আছে। সেই প্রণালী অবগত না হোলে সঠিক বলা অসম্ভব।

লগ্ন, রবি ও রাহু এই তিনটীকে লক্ষ্য করা দরকার। এরা যে যে রাশিতে আছে, সেই সেই রাশি সংখ্যা যোগ করে তাকে সাত দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগশেষ এক, তিন, পাচ বা সাত অথবা শূন্য হয় তাহোলে সে কোষ্ঠী বা রাশিচক্র হবে পুরুষের আর দুই, চার, ছয় থাকলে হবে স্ত্রীলোকের।

এই নিয়ম প্রয়োগ করে শতকরা আশীটি মেলানো সম্ভব হয়েছে। তবে লগ্নের ভুল থাকলে বা স্ত্রী ও পুরুষ গ্রহের দৃষ্টির আধিক্য হোলে ফল অন্যথা হয়। যেখানে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, সেখানে সেই স্ত্রী পুরুষস্বভাব-বিশিষ্টা, আর পুরুষ স্ত্রীস্বভাবসম্পন্ন। ধরা যাক লগ্ন ধনু। রাশিচক্র গণনায় মেষ থেকে বামাবর্ত্তে গুণলে ধনু নবম ঘর। রাহু মেষে সুতরাং প্রথম ঘর, রবি বৃষে দ্বিতীয় ঘর। এখন একত্র করলে আমরা দেখতে পাই—৯+১+২= ১২÷৭=১২ / ৭=৫

ভাগের শেষ ৫ হওয়ায় কোষ্ঠীখানি পুরুষের।

ভৃগুসংহিতায় উক্ত কয়েকটি যোগের কথা নিম্নে বলা গেল।

ধনস্থানে রবি বৃহস্পতি ও কেতু আর সহোদরভাব সৌম্য রাশিতে হয় এবং সেখানে মঙ্গল অবস্থান করে, সুখস্থানে থাকে শনি, নিধনস্থানে বুধ এবং চতুর্থ স্থানে থাকে চন্দ্র তাহোলে ভৃগুর মতে এর নাম হবে বিবাদ যোগ। এ যোগে জন্ম হোলে সুখ দুঃখ ভোগ করতে হবে। স্ত্রী ও পুত্র সুখ ঘটবে না। শরীর ব্যাধিশূন্য থাকলেও মানসিক সুখের অভাব ঘটবে। পঞ্চম স্থানে রবি ও চতুর্থ স্থানে পাপ গ্রহ থাক্‌লে ভৃগুর মতে বৈকল্য যোগ। এ যোগে জাত ব্যক্তির সন্তান হানি ঘটবে। ধনস্থানে রাহু, পুত্র স্থানে মঙ্গল, রাশিচক্রে রবি পাপসংযুক্ত হোলে ব্যঞ্জক যোগ বলে। ভৃগু বলেন এ যোগে পুত্রাদি নাশ নিশ্চয়ই হবে। ধর্ম্মে রাহু, পুত্রস্থানে শুক্র বিকল বা বৃদ্ধ অবস্থায় থাকলে পঞ্চম যোগ হয়। এ যোগে পুত্র ও জ্ঞানের হানি ঘটে। ক্রূররাশিতে সপ্তম স্থানে রাহু, লগ্নে বা দ্বিতীয়ে পাপগ্রহ থাকলে নিশাচর যোগ হয়। এ যোগে পুত্র হয়ে শেষে মারা যাবে আর স্ত্রীনাশ ঘটবে। পুত্রস্থানে রাহু, লগ্নে বা সুখস্থানে রবি পাপসংযুক্ত হোলে দণ্ডযোগ হয় এ যোগে পুত্র ও কন্যার মৃত্যু ঘটে।

পুত্রস্থানে কেতু ষষ্ঠস্থানে চন্দ্র, ধনস্থানে বা নিধন স্থানে রবি থাকলে ভুজঙ্গ যোগ। এ যোগে পুত্রহানি ঘটে তিনটি পাপগ্রহ, ধর্ম্ম বা ভাগ্য স্থানে, সুখ স্থানে কিছু সন্তান স্থানে থাকলে এবং লগ্নাধিপতি পুত্রস্থানে থাকলে

ভৃগু বলেছেন এর নাম হবে কুজ্ৎকক যোগ। এ যোগে জন্ম হোলে বড় ভাই সর্ব্বত্র—এমন কি সভাস্থানে পর্য্যন্ত জাতকের নিন্দা করে বেড়াবে। জন্মলগ্ন থেকে গণনায় পঞ্চম স্থানে অর্থাৎ পুত্র স্থানে রবির সহিত রাহু অবস্থান করলে আর দেহস্থানে চন্দ্র থাকলে নিরয় যোগ হয়। এ যোগে জন্মালে গুরুজন, অর্থ সম্পদ ও গোধন নষ্ট হয়। সুতাধিপতি শত্রুগ্রহের সহিত থাকলে, আর লগ্নে পাপগ্রহ থাকলে এবং উক্ত স্থানে তিনটী পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকলে বিপুল যোগ হয়। এ যোগে জাত ব্যক্তি রোগে কষ্ট পায় আর তার পুত্রপৌত্রাদির হানি ঘটে।

লগ্নে বৃহস্পতি অথবা শুক্র নষ্ট বা বাল্যভাবে অবস্থিত, সৌম্যরাশিতে কেন্দ্র ও ত্রিকোণ, ষষ্ঠ স্থানে অথবা ব্যয় স্থানে পাপগ্রহ থাকলে গজযোগ হয়। এ যোগে জন্ম হোলে ভৃগুর মতে পুত্র রাজমান্য ও মহাশক্তিসম্পন্ন, নিজে ও বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি, ক্রোধী, দীর্ঘায়ু ও বহু পুত্রবান হয়।

লগ্নে বুধ ও শুক্র, ধন স্থানে রবি ও চন্দ্র, সপ্তমে বৃহস্পতি এবং আয় স্থানে মঙ্গল থাকলে জাতক সৌভাগ্য যোগ লাভ করে, শেষে রাজমন্ত্রী হয়। বন্ধুস্থানে শনি ও কেতু এবং কর্ম্মস্থানে বুধ থাকলে সৌভাগ্য যোগ ঘটে এবং সর্ব্ব সম্পদ লাভ হয়। জাতক ধনী মানী জ্ঞাতি-পোষক, সুবিদ্বান, শ্রীমান, রাজমন্ত্রী ও কুলাগ্রগণ্য হয়। ভ্রাতৃহীন, নাস্তিক, ব্যয়শীল ও পরদাররত হয়।

জন্মকালে মঙ্গল যে ভাবে অবস্থিতি করে তা থেকে তৃতীয় ভাবে যদি পাপগ্রহ থাকে তাহোলে জাতকের সহোদরের মৃত্যু হয়। জন্মকালে শুক্রাধিষ্ঠিত রাশির সপ্তমে যদি পাপযুক্ত মঙ্গল থাকে, তা হোলে স্ত্রীর বিনাশ ঘটে, আর শনি থেকে অষ্টমে পাপগ্রহরা বলবান হোলে জাতকের মৃত্যু হয়।

গৃহাধিপতির দ্বারা গৃহাদির চিন্তা, বৃহস্পতির দ্বারা সুখের চিন্তা, শুক্রের দ্বারা সুন্দরী ভার্য্যা, বাহন ও বিলাসোপযোগী বস্তুর চিন্তা, রাহু ও শনি দ্বারা আয়ু চিন্তা, রবি দ্বারা পিতৃ চিন্তা, চন্দ্র দ্বারা মাতৃ চিন্তা, বুধ দ্বারা বুদ্ধির চিন্তা করতে হয়।

যার পঞ্চমে রাহু কিম্বা পঞ্চমাধিপতি পাপযুক্ত এবং বৃহস্পতি নীচ রাশিগত তার বত্রিশ বছর বয়সে পুত্রবিয়োগ হবে। যার বৃহস্পতি থেকে পঞ্চম ভাবগত পাপগ্রহ অথবা লগ্ন থেকে পঞ্চমে পাপগ্রহ, সে ছাব্বিশ বৎসরে, তেত্রিশ বৎসরে অথবা চল্লিশ বৎসরে পুত্রবিয়োগজনিত দুঃখে কাতর হবে। শনি যদি পঞ্চম রাশি থেকে পঞ্চমে থাকে, আর পঞ্চমাধিপতি পঞ্চমে থাকে তাহোলে সাতপুত্র হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বারের গর্ভে যমজ সন্তান।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষ রাশি

অশ্বিনীজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম, ভরণীজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম এবং কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। উদরের গোলমাল। কর্ম্মোন্নতি হোলেও কর্ম্মস্থলে শত্রুবৃদ্ধির জন্য অশান্তি। পিতার রোগভোগ ও আকস্মিক বিপদ। কোন নারীর নিমিত্ত সুখ যোগ প্রাপ্তি। সন্তান, পত্নী বা ভ্রাতৃস্থানীয়ের মারাত্মক পীড়া যোগ। নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু। আয় স্থান শুভ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি মন্দ যাবে না। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে আশানুরূপ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অপবাদ ও আশাভঙ্গ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ রাশি

মৃগশিরার পক্ষে উত্তম, রোহিণীর পক্ষে মধ্যম এবং কৃত্তিকার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। ভ্রাতার রোগ ভোগ। আর্থিক উন্নতি। কর্ম্মোন্নতি। ব্যবসায়ে লাভ। ধনভাব শুভ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অশুভ। সম্পত্তি সংক্রান্ত গোল যোগ। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম। মামলা মোকর্দ্দমার আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়ী বৃত্তিজীবীর আর্থিক উন্নতি যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্যলাভ।

মিথুন রাশি

মৃগশিরার পক্ষে উত্তম, আর্দ্রার পক্ষে মধ্যম, পুনর্ব্বসুর পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মাসটি নানাপ্রকার বাধার মধ্য দিয়ে চলবে। বুদ্ধির ভুলে কাজকর্ম্মে অশান্তি সৃষ্টি। বন্ধুবিয়োগ,

আত্মীয় বিরোধ, অর্থ লাভ, পত্নী ও সন্তানের বিশেষ পীড়া, চাকুরি ক্ষেত্রে সন্তোষজনক সম্ভাবনা সত্ত্বেও উদ্বেগ ও অশান্তি। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুর পক্ষে উত্তম, পুষ্যার পক্ষে মধ্যম, অশ্লেষার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ভোগবৃদ্ধির সুযোগ। আর্থিক বিষয়ে ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা এমন কি বঞ্চিত হবার যোগ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ, নূতন সম্পত্তি প্রাপ্তি বা ক্রয় সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনীর পক্ষে উত্তম, মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনীর পক্ষে নিকৃষ্ট। দেহভাব মধ্যম। কোন নারীর কুহকে বিপন্ন হ'া। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি, সন্তানের পীড়া, মানসিক উদ্বেগ, কর্ম্মোন্নতি-যোগ। চাকুরিক্ষেত্রে উত্তম বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। আকস্মিক ধনলাভ যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর শুভ।

কন্যারাশি

চিত্রার পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে মধ্যম। উত্তর ফল্গুনীর পক্ষে অধম। আর্থিক উন্নতি, আশানুরূপ কর্ম্ম-সাফল্য, সম্মানবৃদ্ধি. স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি, সম্পত্তি বিষয়ে শুভ, পিতার স্বাস্থ্যহানি। নিজের বুদ্ধির বিভ্রম সৃষ্টি হ'তে পারে। গুরুস্থানীয়ের বিয়োগাশঙ্কা। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম।

তুলা রাশি

চিত্রা ও স্বাতীর পক্ষে উত্তম। বিশাখার পক্ষে মধ্যম, ভ্রাতৃস্থানীয়, মাতুল সম্পর্কীয়, সন্তান ও স্ত্রীর পীড়াযোগ। শত্রুবৃদ্ধি, মানসিক অশান্তি, গৃহ নির্ম্মাণে বাধা সৃষ্টি। মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ, গৃহ নির্ম্মাণে বাধা, বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরির ক্ষেত্র সাধারণভাবে চলবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ বলা যায় না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখার পক্ষে উত্তম, জ্যেষ্ঠার পক্ষে মধ্যম, অনুরাধায় পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যহানি, সন্তানের উন্নতি, গৃহনির্ম্মাণ-যোগ, কর্ম্মোন্নতি, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ। পুরাতন ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা। অর্থব্যয়, চিত্র ও রঙ্গ জগতের ব্যবসায়ীর পক্ষে অশুভ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম।

ধনু রাশি

মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে অধম, সাংসারিক অশান্তি, নিকটাত্মীয়ের কঠিন পীড়া। যানবাহন ও ভৃত্য সংক্রান্ত গোলযোগ! কণ্ঠ ও পরিপাক-যন্ত্র সম্পর্কীয় পীড়া। ধনভাব শুভ, নূতনভাবে কর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সম্ভা না। ব্যবসাক্ষেত্রে আশাতীতভাবে যোগাযোগ। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে পুরাতন গোলযোগ বৃদ্ধি। চাকুরির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম, শ্রবণার পক্ষে অধম। সন্তান ও গুরুস্থানীয়ের মারাত্মক পীড়া-যোগ। দেহভাব শুভ, আয় বৃদ্ধি, উত্তম ধনাগম, নূতন সম্পত্তি লাভ! বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশাতীত সাফল্য লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের আশাপ্রদ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। শতভিষা ও পূর্ব্ব-ভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্যভাব শুভ। নূতন ঋণের কারকতা আছে। ব্যয়বৃদ্ধি, পারিবারিক

অশান্তি ও দুশ্চিন্তা, পত্নী ও সন্তানের পীড়া। ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উন্নতির সম্ভাবনা। বিক্রয় বাণিজ্যে অধিকতর লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। কর্ম্মোন্নতিযোগ আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মীন রাশি

রেবতীর পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদের পক্ষে মধ্যম। উত্তরভাদ্রপদের পক্ষে নিকৃষ্ট। গুরুজন বিয়োগ। আকস্মিক পীড়া, যানবাহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনার ভয়। চিৎকিসাবিভ্রাট হেতু রোগবৃদ্ধি। অপ্রত্যাশিতপ্রাপ্তি। শত্রুনাশ, পরাক্রমবৃদ্ধি, উন্নতিরযোগ, ধনভাব শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মধ্যম। সম্পত্তিলাভের সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

অধীন ব্যক্তির দ্বারা প্রতারণা। শত্রুবৃদ্ধি, পিতার রোগভোগ, ধনাগম, সন্তানের শারীরিক অবস্থার আংশিক অবনতি, ধনাগম ও যশ। চাকুরিজীবার পক্ষে মধ্যম, কর্ম্মস্থলের বিভাগের পরিবর্ত্তন। স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ লগ্ন—

আর্থিক উন্নতি, ভ্রাতার পীড়া, কর্ম্মে সাফল্য লাভ। ব্যয় বাহুল্য। পত্নীর অসুস্থতা, ধনলাভ যোগ, সম্মানপ্রাপ্তি, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মিথুন লগ্ন—

বেদনাজনিত পীড়া, অর্থব্যয়, ব্যয়বাহুল্য, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ, কর্ম্মোন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ।

কর্কট লগ্ন—

বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ, পদোন্নতি, ভাগ্যবৃদ্ধিযোগ, স্ত্রীর পীড়া। সম্বন্ধুলাভ, তীর্থ পর্য্যটন, স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

সিংহ লগ্ন—

সন্তানের পীড়া, মানসিক উদ্বেগ, গুরুজন বিয়োগ। অযথা অর্থব্যয়, কলহ ও মামলা-মোকর্দ্দমা, ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কন্যা লগ্ন—

স্ত্রীর সহিত মতবিরোধজনিত অশান্তি, সম্মানবৃদ্ধি। পদোন্নতি, মানসিক উদ্বেগ। নানারকমে ব্যয়াধিক্য। মাতার পীড়াযোগ, সন্তানের স্বাস্থ্যহানি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

তুলা লগ্ন—

স্নায়ুগত পীড়া, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। গৃহাদি নির্ম্মাণ বা ধর্ম্মকার্য্যে অর্থব্যয়, শত্রুবৃদ্ধিযোগ, পুত্রকন্যার বিবাহের আলোচনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি সুবিধাজনক নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

বৃশ্চিক লগ্ন—

ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি, পদোন্নতি, সুখ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি। চিত্তের প্রসন্নতা। বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ, দাম্পত্য প্রণয়, অর্থ সঞ্চয়, কর্ম্মস্থলে গুপ্তশত্রুর অপকৌশলের প্রচেষ্টা, স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু লগ্ন—

পত্নীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাজনিত পীড়া। ভাগ্যোন্নতি। সন্তান সন্ততির লেখাপড়ায় উন্নতি। বাসগৃহের জন্য নূতন জমি সংগ্রহের চেষ্টা, সম্বন্ধুলাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মকর লগ্ন—

সহকর্ম্মীদের সঙ্গে মতানৈক্য হেতু কিছু অশান্তিভোগ। সম্বন্ধু লাভ, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, আর্থিকোন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে আশানুরূপ ফল লাভ। সন্তান সন্ততির বিবাহের আলোচনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

কুম্ভ লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা, বাতবেদনা, হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্তি। সন্তানাদির লেখাপড়ায় বাধা। কর্ম্মস্থলে উন্নতির আশা। ব্যয় বাহুল্যহেতু মানসিক চাঞ্চল্য। বন্ধু লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

মীন লগ্ন—

ভাগ্যোন্নতি, কর্ম্মস্থলে অশান্তি, ধনলাভ, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়াভোগ। পারিবারিক অশান্তি, বৃথা ভ্রমণের যোগ। মাতার পীড়া, বন্ধুর দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ—

গত ২০শে ডিসেম্বর দিল্লীতে এসিয়া জনসংখ্যা সম্মিলনের শেষ দিনের সভায় এইরূপ সতর্কবাণী বলা হয় যে, এসিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার জনসংখ্যাবৃদ্ধি একটি নিদারুণ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের দেশগুলির কর্তব্য—জরুরী ভিত্তিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম—বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পায়নের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। দ্রুত এবং ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এ অঞ্চলের অর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ও জীবনযাত্রার সন্তোষজনক মানে পৌছিবার চেষ্টা বানচাল হইয়া যাইতেছে। এ ধরণের জনসংখ্যা-সম্মিলন এসিয়ায় প্রথম হইল। ভারতসরকারের সহ-যোগিতায় রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃপক্ষ এ সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন—১০ দিন ব্যাপী সম্মিলন হইয়াছে। ২০টি দেশ হইতে ২৩০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। সকল দেশে যাহাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয় সে জন্য সকল দেশকে স্বতন্ত্র ভাবে পরিকল্পনা করিতে বলা হইয়াছে। সারা পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যাবৃদ্ধি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকে বিব্রত করিয়াছে। সে সমস্যা সমাধানের জন্য সত্বর উপযুক্ত কার্যপদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছে।

কলিকাতার সম্প্রসারণ—

২০শে ডিসেম্বর জানা গিয়াছে যে কলিকাতা ইম্প্রুভ-মেণ্ট ট্রাষ্ট দক্ষিণ-কলিকাতার সম্প্রসারণের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। গত ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে বেহালা মিউনিসিপালিটীর ৯টি ওয়ার্ড—৮নং হইতে ১৬নং পর্যন্ত অঞ্চল উন্নত করা হইবে। ঐ অঞ্চলের পূর্বে টালির নালা, পশ্চিমে ডায়মণ্ড-হারবার রোড, দক্ষিণে পুটিয়ারী, উত্তরে নিউ আলিপুর—ঐ এলাকার মধ্যে পড়িবে। সে জন্য জমি দখল, বাড়ী নির্মাণের জন্য জমি উন্নয়ন, পথঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির জন্য ট্রাষ্টকে অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ৬ সপ্তাহ পরে ট্রাষ্ট তাহার কাজ আরম্ভ করিবে। কলিকাতার সম্প্রসারণ বিশেষ প্রয়োজন—ঐ অঞ্চলটির উন্নয়ন হইলে সহরবাসী এক দল লোকের নানা সমস্যার সমাধান হইবে।

পরলোকে সুরাবর্দী—

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী হোসেন সহিদ সুরাবর্দী গত ৫ই ডিসেম্বর লেবানন দেশে বেইরুট সহরে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অবিভক্ত বাংলারও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন—তাঁহার পিতার নাম বিচারপতি স্যার জহিদ সুরাবর্দী—সুরাবর্দী পরিবার বহু পূর্বে দিল্লী হইতে আসিয়া মেদিনীপুরে বাস করেন—তাঁহার এক পিতৃব্য সার আবদুল্লা সুরাবর্দী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক ও অপর পিতৃব্য সার হাসান সুরাবর্দী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন। তাঁহার অগ্রজও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের বাগীশ্বরী অধ্যাপক ছিলেন। মৃত সুরাবর্দী ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন—গত ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশন কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হইলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র ও তাঁহার সঙ্গে সুরাবর্দী ডেপুটীমেয়র হন। গত ৪৫ বৎসর কাল তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু পদে ও বহুরূপে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বাংলার খাদ্যমন্ত্রী হন ও ১৯৪৬ সালে প্রধান-মন্ত্রী হইয়া দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে চলিয়া যান।

বারাকপুর মহকুমা সমিতি—

গত ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা-৩৫, ৩৫ ব্যারিষ্টার পি, মিত্র রোডে বারাকপুর মহকুমা সমিতির

এক বিশেষ সভায় কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫৯তম জন্মদিনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। সমিতির সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং কবি বীরেন্দ্র মল্লিক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, পান্নালাল মাইতি প্রভৃতি বহু কবি ও সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত হইয়া কবিকঙ্কণের দীর্ঘজীবন ও সুখ-শান্তি কামনা করিয়াছিলেন।

২৪ পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘ—

২৪ পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘের সহ-সভাপতি বসিরহাটের উকীল শ্রীবিজয়চন্দ্র দাশের আহ্বানে গত ১০ই নভেম্বর রবিবার বিকালে বসিরহাট দালাল-ভবনে বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে সংঘের বিজয়া-সম্মিলন হইয়াছিল। সংঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন, স্থানীয় মহকুমা শাসক প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং সংঘ-সম্পাদক শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ সংঘের পক্ষ হইতে সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রবীণ কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ বহু স্থানীয় সুধী-ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

তারকেশ্বরে কবি সম্মিলন—

গত ২৪শে নভেম্বর বঙ্গীয় কবিপরিষদের উদ্যোগে পুণ্যতীর্থ তারকেশ্বরে স্থানীয় হরিসভা গৃহে সন্ধ্যায় এক কবি-সম্মিলন হইয়াছিল। কলিকাতা ও অন্যান্য বহু স্থানের ৫০ জনেরও অধিক কবি তাহাতে যোগদান করেন ; সুকবি বীরেন্দ্র মল্লিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মেদিনীপুর লালগড়ের রাজা রণজিৎকিশোর সাহস রায় প্রধান অতিথি হন এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। তারকেশ্বরের খ্যাতিমান দেশকর্মী শ্রীদিঘাপতি ভট্টাচার্য সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরিষদের সম্পাদক কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহকর্মী কবিগণের চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এক দল কবি রাত্রিতে দিঘাপতিবাবুর নবনির্মিত গৃহে রাত্রে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

গত ৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানটি আসানসোল হইতে আদ্রা যাইবার পথে মুরাডি ষ্টেশন হইতে মাত্র আধমাইল দূরে—তিন দিকে পাহাড় বেষ্টিত একটি রম্য পরিবেশে অবস্থিত। ঐ অঞ্চলের অধিবাসী শ্রীঅন্নদা চক্রবর্তী যৌবনে দেশের মুক্তিসংগ্রামের সৈনিক ছিলেন—তাঁহার চেষ্টায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে লইয়া তৎকালীন মানভূম জেলায় প্রথম রাজনীতিক সম্মিলন সম্ভব হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য শ্রদ্ধেয় কবি স্বর্গত কিরণচাঁদ দরবেশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন এবং রামচন্দ্রপুর গ্রামে এক বিরাট আশ্রম নির্মাণ করিয়াছেন। সে নির্মাণযজ্ঞ এখনও শেষ হয় নাই—আমরা গত ৪ বৎসরে কয়েকবার আশ্রমে যাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি ও দিন দিন আশ্রমের কর্মক্ষেত্র এবং কর্মধারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ঐ স্থানে একটি বহু পুরাতন শ্মশান ছিল এবং শ্মশানের নিকট কয়েকটি বট ও অশ্বত্থ গাছে পূর্ণ জঙ্গল ছিল। স্থানটি চক্রবর্তীমহাশয়কে চিরদিন আকৃষ্ট করিত। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটি উচ্চ স্থান খনন করিয়া তন্মধ্যে যজ্ঞকুণ্ড, পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রভৃতি পাইয়াছেন। যে ঘরের মধ্যে যজ্ঞকুণ্ড অবস্থিত, তাহা পাকা—কতদিন পূর্বে নির্মিত তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, স্বামীজি ঐ স্থানে বহু গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন—তথায় আবাসিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, সমাজসেবা শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি চলিতেছে। প্রতি বৎসর শীতকালে এক মাস তথায় চক্ষু চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সে সময় এক একদিন শতাধিক বৃদ্ধ রোগীকে আশ্রমে আহার ও বাসস্থান দিতে হয়—কোন কোন রোগী প্রয়োজনমত আশ্রমে ২।৪ দিন বাস করিতেও বাধ্য হন। তাহাদের জন্য এবং বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, কর্মীদের বাসগৃহ প্রভৃতির জন্য তথায় শতাধিক পাকা ঘর ও বহু বারান্দা নির্মিত হইয়াছে। ৪টি বড় ইঁদারা খনন করিয়া জল সরবরাহ করা হয় এবং ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি ও অতিথিদের জন্য বহুসংখ্যক স্যানিটারি পায়খানা, স্নানের ঘর প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে মন্দির ও

নাটমন্দির—নাটমন্দিরটি প্রয়োজনের সময় নাটামঞ্চে পরিণত করা হয় ও তাহার সম্মুখস্থ বিশাল প্রাঙ্গণে দর্শক-গণের বসিবার স্থান হয়।

গত ৩০শ নভেম্বর শনিবার সকালে তুফান এক্সপ্রেসে কলিকাতা, শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর, ব্যাণ্ডেল, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় শতাধিক সাহিত্যিক আসানসোল হইয়া সন্ধ্যায় রামচন্দ্রপুরে যাইয়া উপস্থিত হন। সেদিন সন্ধ্যায় ও পরদিন সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাসভা হইয়াছিল। বার্ণপুর, ধানবাদ, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও সেদিন কয়েকশত সাহিত্যিক সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রবীণ শিক্ষাব্রতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল সভাপতিরূপে সকল সভাতেই উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীমন্মথ রায়, অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কবি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, যুগান্তরের শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, স্বপনবুড়ো শ্রীঅখিল নিয়োগী, প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় সভাপতিত্ব করেন। স্বামীজি সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশব মুখোপাধ্যায়, হাওড়ার সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, ডাঃ শম্ভু পাল, সম্মিলনের সাধারণ সম্পাদক সুরেন নিয়োগী, কবি শচীন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায়, পান্নালাল মাইতি, তারকেশ্বরের নিত্য-গোপাল পাল, বানপুরের শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ত্রিবেণীর নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, সুগায়ক সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আসানসোলের কবি শান্তিময় মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রপুরের প্রসিত রায়চৌধুরী, ধামুয়ার সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বেলঘরিয়ার অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রেবা চট্টোপাধ্যায়, বার্ণপুরের প্রবীণ লেখক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সম্মিলনে যোগদান ও অংশ গ্রহণ করিয়া সম্মিলনকে সাফল্য মণ্ডিত করেন। আশ্রমের কর্মীরা, বিশেষ করিয়া স্বামীজির পুত্র নন্দদুলাল, ব্রজদুলাল, শচীদুলাল প্রভৃতি প্রত্যেক অতিথিকে ব্যক্তিগত-ভাবে আদর যত্ন করিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। স্বামীজির চেষ্টায় কয় বেলা ভূরিভোজের ও সর্বদা চা খাবারের ব্যবস্থা থাকায় কাহারও কোন অসুবিধা হয় নাই। পল্লীগ্রামে এত অধিক সাহিত্যিকের সমাবেশ প্রায়ই দেখা যায় না। রামচন্দ্রপুর বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম এ বিষয়ে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের দপ্তর—

গত ৯ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দপ্তরগুলি পুনর্বণ্টন করিয়াছেন। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করায় ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল। নূতন ব্যবস্থা এইরূপ—(১) শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় অর্থ ও পরিবহন (স্বরাষ্ট্র) (২) শ্রীফজলর রহমন—স্বায়ত্ত শাসন (৩) শ্রীমতী পুরবী মুখোপাধ্যায়—স্বাস্থ্য (৪) শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য—ভূমিরাজস্ব ও সেচ (৫) শ্রীবিজয়সিং নাহার—শ্রম ও প্রচার (৬) শ্রীজগন্নাথ কোলে—কারাগার (৭) শ্রীঈশ্বরদাস জালান—বিচার ও আবগারী (৮) শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—শিল্প ও বন (৯) শ্রীমতী আভা মাইতি—ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ। (১০) রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা ও (১১) শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ বিভাগে পূর্বের মত বহাল আছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বরাষ্ট্র পুলিস, সাধারণ শাসন, কৃষি ও খাদ্য উন্নয়ন বিভাগের কাজ করিবেন। কামরাজ পরিকল্পনায় ২ মন্ত্রী, ৭ রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ৯ উপমন্ত্রী বাদ গেলে বর্তমানে ১২ মন্ত্রী ও ৪ রাষ্ট্রমন্ত্রী কাজ করিতেছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র পঞ্চায়েৎ ও শিক্ষা, শ্রীতেনজিং ওয়াংদি উপজাতি কল্যাণ ও সমবায়, শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ উন্নয়ন ও কৃষি এবং শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর স্বরাষ্ট্র পুলিস, আবগারী ও প্রতিরক্ষার কাজ করিবেন।

পরলোকে পানিক্কর—

গত ১৫ই ডিসেম্বর প্রখ্যাত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, শিক্ষাব্রতী ও কূটনীতিবিদ সর্দ্দার কে-এম পানিকর ৬৮ বৎসর বয়সে মহীশূরে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, তথায় সভা করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হন এবং হাসপাতালে নীত হইয়া মারা যান। অধ্যাপক ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী সভায় তাঁহার পাশে ছিলেন। ১৮৯৫ সালে কেবল মাধব পানিকর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজে ও অক্সফোর্ডে শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যারিষ্টার হন এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যাপকের কাজ করিয়া দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইম্‌স পত্রের সম্পাদক হন। তিনি নরেন্দ্র মণ্ডলের সেক্রেটারী, পাতিয়ালার মন্ত্রী, বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি, চীনে রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি পদে কাজ করেন। তিনি সুলেখক ছিলেন ও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার জন্য ১০ কোটি টাকা—

গত ৫ই ডিসেম্বর লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবি আর ভকত ঘোষণা করেন যে বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এ বৎসরে ১০ কোটি টাকা প্রদান করিবেন। কলিকাতার বর্তমানে যা অবস্থা তাহাতে জল সরবরাহ, ময়লা জল পরিষ্কার, পথ সংস্কার প্রভৃতি কাজের জন্য আরও বহু অর্থের প্রয়োজন। কলিকাতা মেট্রোপলিটন পরিকল্পনা সংস্থা দ্বারা এই টাকা সুষ্ঠুভাবে ব্যয়িত হইলে সহরবাসীর অসুবিধা আংশিকভাবে দূরীভূত হইবে

নির্ব্বাণ

চিন্ময়

ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি আলো আর ছায়া
বহু দূরে-গিরিচুড়ে ছেড়ে দিল কায়া।
তুমি নাই আমি নাই, নাই সুখ দুখ,
কেহ নাই কারো রূপ দেখিতে উৎসুক,
সীমাহীন নীরবতা প্রাণ স্পন্দহীন
অরূপের রূপছটা স্বরূপ সন্ধানী
দৃষ্টি পথে নাহি পড়ে, না হ শুনে বাণী,
প্রলয়ের পরে কিম্বা সৃষ্টির আদিতে
নাম রূপ রসহীন শিল্পীর আঁখিতে
অব্যক্ত আনন্দময় প্রশান্ত স্পন্দন
সুষুপ্তির স্বপ্নজাল করে না রচন।
সে অদৃশ্য ধ্রুবলোকে সত্যের সন্ধানে
চলেছে বিহগ বহ্নি কাহার আহ্বানে ?

পরিকল্পনা

সুলতা সেনগুপ্ত

পঁচিশ বছর আগে
মনে রামধনু জাগে
ভবিষ্যতের হাত ধরে চলি
উজ্জল পুবোভাসে

পঁচিশ বছর পরে
নব উন্মেষ পরমাণু হোয়ে লুটায় ধূলার ঝড়ে,
দলিয়া দলিয়া মান সম্মান
যে পথের শেষে, শেষ অভিযান
সে পথের রূপ দেখিবার মতো
হোল আজ অবসর
পথ কোথা হায়,
এ খেলার এক মৃতদেহ অজগর।

প্রাচীন কবির লেখনীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

শ্রীচৈতন্যের সময়ে বা তাঁর কিছু আগে বাংলা দেশে দেবকী-নন্দন সিংহ বলে এক বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হয়েছিল। কবিখ্যাতিস্বরূপ ইনি উপাধি পান 'কবিশেখর'। এই কবিশেখর নামেই কবি সমধিক পরিচিত। পদকর্তা-হিসেবেও এঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। কবির বাড়ী বর্ধমান বীরভূম অঞ্চলেই ছিল বলে মনে হয়। ইনি অনেক গ্রন্থ লেখেন; কিন্তু 'গোপালবিজয়' নামে গ্রন্থখানি ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। গোপালবিজয় বাংলা সাহিত্যের একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। সাতখানি হাতে-লেখা পুঁথি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া গিয়েছে; শ্রীমদ্ভাগবতের ছায়া অবলম্বনে গ্রন্থখানি লিখিত। গ্রন্থ-খানি অপ্রকাশিত থাকায় এর সাহিত্যরস-মাধুর্য এখনও অজ্ঞাত। গ্রন্থের শেষের দিকে রাসলীলার যে বর্ণনা আছে তা বাংলা সাহিত্যের একটি নব অবদান। এই লীলার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীমাত্র সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে চললেন; শেষে যমুনার তীরে এসে বসলেন এক কদম-গাছের তলায়। সেখানে বসে 'রাসরসে' বাঁশী মুখে ধরলেই সব রাগ-রাগিণী যেন মূর্ত হয়ে উঠল; আর—

> বেণুরবে কীটপতঙ্গাদি উলসিত।
> মুকুলের ছলে তরুলতা পুলকিত ॥
> পক্ষ-আদি করি বিনোদিল সর্ভে বাঁশী।
> সর্পজাতি বিধাতায় কইল নৈরাশী ॥
> কর্ণ নাহি সর্পজাতি আখিএ দেখি শুনে।
> আখি আছাদিল লোহে শুনিব কেমনে ॥
> বেণুরবে বৎস সব দুগ্ধ নাহি পিএ।
> বাটে মুখে আরোপি দোপাশে ফেনা বহে ॥
> বনে বেণুধ্বনি শুনি মৃগ পালে পালে।
> ঘূর্ণিত লোচনে আইসে কৃষ্ণ-অনুসারে ॥
> সহজে উদ্দাম যত দামড়া-দামড়ী।
> খোআর ভাঙ্গিঞা সব জাএ বড়াবড়ি ॥
> উভ পুছ উভ খুর উভ মাথা করি।
> চঞ্চল নআনে ধাএ দুই কান সারি ॥

কৃষ্ণের বেণু রবে যখন স্থাবর-জঙ্গমের এই অবস্থা, তখন গোপীদের যে-কী ভাব হতে পারে তা চিন্তারও বাইরে। গোপযুবতীরা হয়ে গেল কাঠের পুতুলের মতো; ত্রিভুবন মনে হতে লাগল শুধুই আনন্দময়; কৃষ্ণপ্রেমরসে গোপীগণ ভাসতে লাগল। এরপর হল তাদের নানা বিভ্রান্তি। কেউ জল আনতে দুধ নিয়ে আসে, কেউবা দুধ আনতে জল আনে; কাউকে আসতে বললে চলে যায়, আবার কাউকে চলে যেতে বললে আসে; একজনকে ডাকলে অন্য জন উত্তর দেয়। রান্নার ব্যাপারে আরও বিভ্রান্তি; কেউ কাঠখড়ে মিথ্যাই ফুঁ দেয়, কেউবা খালি উনুনে হাঁড়ি নাড়ে, জলন্ত উনুন কেউ চোখের জলে নিভিয়ে দেয়, কেউবা হাতে খড় নিয়ে উনুনে ফুঁ দেয়; হলদি সম্ভার দিয়ে কেউ ভাত রাঁধে, কড়াইতে ঘি দিয়ে কেউ তাতে জল দিয়ে দেয়; মাটিতে 'তেলানি' রেখে কেউ মিথ্যাই ভাজছে, পায়সের মধ্যে কেউ দিচ্ছে এক মুঠো নুন, কেউ বা তেল-নুন ছাড়াই রান্না করছে, কেউ পরিবেশন করতে গিয়ে নিজের ছায়াকে সত্য ভেবে তাকেই পরিবেশন করছে। কৃষ্ণাভিসারের বিলম্ব হবে ভেবে কেউ রান্না ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন না করেই গৃহকাজ শেষ করল।

দ্বিতীয়বার কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করলে গোপীগণ কৃষ্ণাভি-সারে বেশ পরিবর্তনে ব্যস্ত হল; কিন্তু তাতেও তাদের নানা বিভ্রম উপস্থিত—

> কেহো কেশবেশ করে মুকুতার মালে।
> নয়ানে চন্দন কেহো কাজল কপালে ॥

দর্পণের বিম্বে কেহো করে মুখ বেশে।
চরণের নূপুর কেহো পড়ে লঞা কেশে॥
কটির কিঙ্কিনী কেহো পড়ে নিঞা গলে।
কেহো পাএ হার পড়ে কেহো ফুলমালে॥
হাতের মুদড়ি কেহো করিল পাসলি।
পাসলি করিল কেহো হাতের মুদড়ি॥

দেহেও তাদের দেখা দিল নানা পরিবর্তন। কেউ কেউ চমকে উঠতে লাগল; কারও দেহ কদম্বকলিকার মতো পুলকে রোমাঞ্চিত হল। কারও চোখের আনন্দ জল আর রোধ মানে না, কারও হাত কেঁপে কেঁপে ওঠে। গোপীদের এই অবস্থা দেখে তাদের স্বামীরা ব্যাকুল হয়ে পড়ল; তারা প্রবোধ দিলেও গোপীরা সান্ত্বনা পায়না; কোনো গোপী স্বামীকে ছলনা করার জন্য নানা কথা বলে, কেউ ক্রোধে স্বামীর কাছে যায় না; কেউ স্বামীর ডাকে সাড়া দেয় না; কোনো স্বামী তার গোপীকে জোর করে আটকিয়ে রাখতে চায়।

• তৃতীয়বার বংশীধ্বনিতে চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের চাঞ্চল্যের মতো গোপীগণ 'হাকলি বিকলি' করতে লাগল। সংকেত পেয়ে তারা কৃষ্ণাভিসারে গমন করল; বর্ষার দুর্বার স্রোতের মতো তাদের কেউ বাধা দিতে পারল না, কারো স্বামী চরণ ধরে আটকাতে গেলে সেই গোপী 'পায়ে উঝটিঞা যায় পাছ নাহি চাহে'। কেউ কেউ গোপীদের ঘরে আটকিয়ে রাখায় তারা নিরুপায় হয়ে কৃষ্ণকথা ভাবতে ভাবতে দেহত্যাগ করল,—

কৃষ্ণরস ভাবিতে ভুঞ্জিল কর্মফলে।
বিরহের তাপে পাপ পুড়িল সকলে॥
পাপ পুণ্যক্ষয় গোপী হইল অদভুতে।
তখনি পাইল চিদানন্দ নন্দসুতে॥

কোনো কোনো গোপীর এই অবস্থা দেখে আর কেউ সাহস করে কোনো গোপীকে বাধা দিল না। গোপীগণ রাধার সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণের নিকট গমন করল।

ঘোর অন্ধকারে গোপীগণ এই ভাবে আসায় কৃষ্ণ কোনো কথা না বলে নীরব থাকলে সকলে মরণাধিক দুঃখ পেয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। কৃষ্ণ তখন তাদের বললেন, স্বামিগৃহ ত্যাগ করে এ-ভাবে আসা তোমাদের উচিত হয়নি; কারণ কুলধর্ম ও 'বেদপথ' লঙ্ঘন করলে কোনো জায়গায় ঠাঁই মেলেনা। কৃষ্ণের এই কথায় রাধা-আদি গোপীগণ চোখের জলে কৃষ্ণকে বলল, পরপ্রাণ নিয়ে তুমি আর কত চাতুরী খেলবে। শিশুকাল থেকেই তুমি স্ত্রী বধ করে আসছ, পুতনাই তার সাক্ষী; এখন যৌবনে যে কত গোপীকে তুমি বধ করবে তার কিছুই ইয়ত্তা নেই। তোমার বাঁশীর আহ্বান আর 'বিষম কুসুমশর' আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলেছে। এখন আমাদের কুল-শীল-লাজ-ভয় আর নাই। তোমাকে না দেখলে আমরা জীবন ধারণ করতে পারব না; পৃথিবীতে জন্মে যদি তোমার রূপই না দেখলাম তবে এ ছার জীবন রেখে লাভ কি? তুমি যে ভক্তবৎসল, দীন-দয়াল ও তুমি যে প্রেমের অধীন একথা বিশ্বাস করি কি ভাবে? যা হোক্, দোষ তোমাকে দিচ্ছি না, এ অদৃষ্টের বিড়ম্বনা আমাদেরই; তুমি আমাদের দয়া না করলে আর কে করবে? কেনইবা তুমি বাঁশী বাজাও, আর গোপীদের দগ্ধ করে কিইবা সুখ পাও। আমাদের কাম-সর্পে দংশন করেছে, তুমি যদি এ বিষ নষ্ট না কর তবে বৃথাই তোমার নাম কালীয়দমন; তোমা-ছাড়া গোপীদের আর বন্ধু নাই। তুমি শাস্তিই দাও বা দয়া কর, আমরা তোমার চরণে আশ্রয় নিলাম; এই বলে কোনো কোনো গোপী নয়নজলে কৃষ্ণের পদযুগল ভিজিয়ে দিল, কেউ কেউ কাতর নয়নে জোড়হাতে কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। তখন দয়ারসাগর কৃষ্ণ প্রসন্নবদনে তাদের দিকে চাইলেন। এই অবসরে গোপীগণ গন্ধ, মাল্য ও আভরণ দিয়ে কৃষ্ণকে সাজাল। সাজের পর কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে নিয়ে ও রাধার কাঁধে হাত দিয়ে বৃন্দাবনের তরু-লতাদির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পূর্ণিমার চাঁদ তখন আকাশে; চন্দ্রালোকে সর্বত্র দিনের মতো উজ্জ্বল। শশক, হরিণ, ময়ূর, তিতির, হাঁস সবই পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। এই সব জন্তুর মধ্যে হিংসার একান্ত অভাব। তারাও কৃষ্ণনামে পুলকিত হয়ে ওঠে, কৃষ্ণনাম শুনলে মাথা হেঁট করে তারা বন্দনা করে; তাদের মধ্যে জরা-মৃত্যুর ভয় নেই; কৃষ্ণের আগমনে তারা সবাই ছুটে এল কৃষ্ণকে দেখতে। এই সব দেখে গোপীরা অবাক হয়ে গেল। পরে গোপীরা কুঞ্জে কুঞ্জে আশ্রয় নিলে কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে মাঝ-কুঞ্জে প্রবেশ করলেন। নানা পরিশ্রমে রাধা কৃষ্ণকোলে নিদ্রা গেলে রাধাকে সেখানে রেখে কৃষ্ণ প্রতি

কুঞ্জে গোপীদের সঙ্গে মিলিত হলেন; তিনি একজনের গলার হার আর একজনের গলায়, একজনের হাতের কাঁকন অন্যের হাতে পরিয়ে দিলেন; কিন্তু 'নিন্দভোলে' কেউ এ-সব বিষয় জানতে পারল না। এরপর কৃষ্ণ পারিজাত বনে গিয়ে বংশীধ্বনি করলে হঠাৎ গোপীদের ঘুম গেল ভেঙ্গে। তারা কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে ধ্বনি অনুসারে পারিজাত বনে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হল। এই বনের মাঝে মাঝে কল্পলতানিকুঞ্জ; এই নিকুঞ্জগুলি অতুলনীয়, ছয় ঋতু সর্বদাই সেখানে বিরাজমান। বনের মধ্যে বিচিত্র সুবর্ণের পুরী,—

মেঘ যেহ করে যার রজত প্রাচীরে।
নানা মণি বিচিত্র ভিতরে বাহিরে॥
রত্নকাঞ্চনময় সিংহদ্বারখান।
না জানি এ কোন বিশ্বকর্মার নির্মাণ॥
গরুড়ের চূড়া শোভে দ্বারের উপরে।
অরুণ উইল জেন সুমেরু শিখরে॥

কৃষ্ণ এই রাসমন্দিরে গিয়ে রাধিকাকে নিয়ে মঞ্চে বসলেন, আর গোপীগণ তাঁদের চারপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। এদের মধ্যে চন্দ্রাবলী-আদি মুখ্য অষ্ট গোপিকা তাম্বুল, চামর, দর্পণ ইত্যাদি নিয়ে কৃষ্ণের সান্নিধ্যে রইল, আর চন্দ্রমুখ-আদি ষোল শত গোপী কৃষ্ণের প্রতি স্থিরনেত্র হয়ে কৃষ্ণ-অধরামৃত পান করতে লাগল। বেণু-বীণার রবে চার দিক গেল ভরে; রাধাকৃষ্ণ তখন রাসমঞ্চ থেকে নেমে গোপীদের মাঝে আসলেন। কেউ মৃদঙ্গ, কেউ পিনাক, কেউবা সারঙ্গী বাজাতে লাগল, কেউ হাতে তুড়ি দিয়ে সুললিত গানে সবাইকে করল মুগ্ধ। কৃষ্ণ এই আনন্দে যোগ দিলেন; নানা অঙ্গভঙ্গিতে তিনি করলেন সকলকে মুগ্ধ। কখনও বাম কর কটিতে রেখে ডান হাত চূড়ার উপরে রাখলেন; কখনও দুই হাত মণ্ডলী করে শিখায় ধরলেন, কখনও বা গোপীদ্বয়ের কাঁধে হাত দিয়ে হেসে হেসে নিজেকে দেখতে লাগলেন, আবার কখনও দু-হাত সামনে প্রসারিত করে পায়ে তাল দিতে লাগলেন; মাঝে মাঝে কৃষ্ণ বেণু বাজিয়ে এই আনন্দময় পরিবেশকে মধুরতর করে তুললেন; কিন্তু ষোল শত গোপীর মধ্যে এক কৃষ্ণ থাকায় সকলের মন ভরছে না দেখে কৃষ্ণ বহু হলেন এবং দুই দুই সখীর মাঝে দাঁড়ালেন তাদের হাত ধরে,—

কৃষ্ণের শ্যামল বাহু শোভে গোপীগলে।
মদনে সাজিল জেন কুবলয় মালে॥
গোপীমুখ মাঝে মাঝে কৃষ্ণমুখ সাজে।
নীল গৌর চান্দে জেন পাতিল সমাজে॥

সকলেই কৃষ্ণকে পেল বলে কারও আর অভিমান রইল না; কোনো সংকোচ না থাকায় সবাই কৃষ্ণের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসে যোগ দিল। কৃষ্ণরসে মেতে যাবার ফলে আর কোনো কিছুই তারা শুনতে পায়না; কোনো গোপী কারোর কৃষ্ণের দিকে চায় না; অন্য কারোর কৃষ্ণদেহে কেউ হাত দেয় না; কখনও কখনও তারা আনন্দে জয়-ধ্বনি করে ওঠে; মনে হয় ত্রিভুবন আনন্দ হিল্লোলে ভাসমান। জল, স্থল, আকাশ যেন সব এক হয়ে গেছে। গোপীরা যে কোথায় আছে তার জ্ঞান বা লেশমাত্র শ্রম-বোধ তাদের নাই,—

অবিরত স্বেদজল সব গায়ে ঝরে।
দেহ উবরিঞা রস উছলিঞা পড়ে॥
নিমিষ বিরতি নাহি গোপীনাথ-সঙ্গে।
কদম্বকলিকা হেন পুলকিত অঙ্গে॥
নয়ানে আনন্দজল বহে অবিরতে।
আতিরসে চকোর কি উগারে অমৃতে॥
খেনে দাহা খেনে শীতে খেনে আগেয়ানে।
হেন রসে মজিল সুন্দর গোপীকালে॥

এই ভাবে ষোলশত গোপীর মনোরঞ্জন করে কৃষ্ণ আবার সমস্ত রূপ সংহরণ করে এক হলেন এবং রাধাকে নিয়ে বসলেন রাসমঞ্চে। এমন সময় রাত্রি অবসান দেখে সবাই হয়ে উঠল চঞ্চল; মনে হল যেন এক নিমিষে রাত্রি প্রভাত হল; তখন কৃষ্ণের কাছে গোপীরা কাকুতি মিনতি করে বলল,—

এই পরিহার করি তোহ্মার চরণে।
আর হেন সতত নহিব দরশনে॥
দূরে থাকি অনুরাগ বাঢ়াইবে চিতে।
চান্দ-কুমুদিনী-সম রাখিবে পিরীতে॥

আসন্ন বিচ্ছেদে গোপীগণ আকুল হয়ে উঠল; অধোমুখে তারা অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল। কৃষ্ণ সকলকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নগরের দিকে চললেন। নগরের উপান্তে এসে কৃষ্ণ সকলের কাছে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলে ক্রন্দনরত ও বিরহাকুল গোপীদের আর পা চলতে চায় না; লোকলাজ ভয়ে তারা কোনো প্রকারে গৃহে গেলেও তাদের মন রয়ে গেল কৃষ্ণের কাছেই।

অযুতমনের কবি

সন্ত নিহাল সিং

বর্তমান শতাব্দী শাশ্বতের পানে প্রবেশোন্মুখ হলেও এখন সবে সে শিশুর মত ক্ষীণপদী পথিক। অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসী-গঙ্গাতট অগণিত পদযাত্রা খচিত ছিল এবং তার ওপরের মাটিতে বড় ছোট মন্দিরচূড়া শোভা পেত—সেই গঙ্গার জল যে-বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগের দেওয়ালে আছড়ে পড়ত সেখানে একজন ইংরেজকে হালকাতুরীয় হ্যাণ্ডলুম দেখানো হয়েছিল। তাঁর শ্মশ্রুও ছিল অল্প অল্প অর্থাৎ কামানো ছিলনা, সঙ্গে গোঁফ জোড়াও—যে রকম তাঁর স্বদেশীয়গণের থাকত। সে সময়টা ছিল এই শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিক। আমি সেই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাঁর মুখের সেই অসহায় দাড়িটা ছিল অনেকটা লালচে-খয়েরী রঙের। তবু সেটা তাঁর মুখমণ্ডলে শোভাপেতো, সম্মানও মিলেছিল তার জন্যে, সমকালীন য়ুরোপীয় রূপদক্ষদের কাছ থেকে এই রীতিটি তিনি নিয়েছিলেন। (যদিও এটা অত্যন্ত গোপনীয়রূপে আমাকে একজন কানে কানে বলেছিল) এই ভদ্রলোক হলেন তৎকালীন কলিকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ চিত্রকর ই, বি, হ্যাভেল। এই সনাতন কৃষ্টিকেন্দ্র বারাণসীতে তিনি এক স্বল্পায়ু সফরে এসেছিলেন।

অনাগরিকা ধর্মপাল নামে এক সিংহলী বৌদ্ধ তাঁকে সেই হাওয়াই তুরীয় হ্যাণ্ডলুমটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে এনে দিয়েছিলেন, ইনিও সে সময় "মধ্যমার্গ" পুনরুদ্ধারের জন্য সারনাথে বসবাস করছিলেন। সেই জিনিষটা চিত্রকর-অধ্যক্ষের মনকে গঙ্গা থেকে ভাগীরথী তীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি আমাদের ধ্রুপদী সংস্কৃতিবান এবং বিরল সাফল্যবান এক মনীষির কথা বলেছিলেন, তিনি নাকি বহুকাল ধরে ভারতীয় হস্তশিল্পে প্রাণসঞ্চার করবার প্রয়াসে রত আছেন। তিনি হ্যাভেল সাহেবের সর্বাপেক্ষা প্রতিশ্রুতিবান্ ছাত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাকা রব ন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহুবর্ষব্যাপী ন্নতধরণের হ্যাণ্ডলুম তার সুবিশাল পরিবারায়ত্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ঘরে ঘরে প্রবর্তনায় ব্যাপৃত ছিলেন তিনি। এমন কি তার পূর্বেও যুবাবয়সে তিনি নাকি জনকয়েক আত্মীয়সমভিব্যাহারে কলকাতায় বিপণি খুলেছিলেন, সেখান থেকে অভারতীয় পণ্যাদি একটিও বিক্রীত হয়নি; সেগুলোকে ঠিক আবার স্বদেশী দ্রব্যও বলা চলেনা।

সেই ইংরেজ চিত্রকর বলেই চলে ছিলে; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই গীতিমাধুর্যসমন্বিত কবিতা রচনা করে আসছেন। আমাদের সেগুলো গতিশীল স্বরসঙ্গতির মত প্রেরণা দিত। বিশ্বপ্রসারী রূপদক্ষশ্রেষ্ঠ হিসেবে তিনি অবনীন্দ্র আহৃত হ্যাভেলের প্রাচ্য ভাবধারার পুনরুজ্জীবন প্রয়াসে এবং দেশের যুবাদলকে প্রতীচ্যের দাসানুগ এবং আত্মবিধ্বংসী অনুকরণেচ্ছা হতে ফেরাবার প্রচেষ্টায় প্রধান অবলম্বন ছিলেন। এই হল আমার দর্পণে প্রথম রাবীন্দ্রিক প্রতিবিম্ব।

॥ ২ ॥

অক্টোবরের (১৯০৫) মাঝামাঝি সময়ে আমি কলিকাতায় এসেছিলাম, এটাই আমার সে-শহরে প্রথম পদক্ষেপ নয় এর আগে যদিও রাজধানীতে এসেছিলাম (তখনও রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়নি) সে সময় যেন কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। সেই রাস্তা, সেই প্রাসাদের সারি-ই ছিল। জীবনধারার কথাও একই ছিল। সে সময় সেই গতানুগতিক আলস্যবোধটা যেন আর দেখতে পেলামনা। একটা দুর্বোধ্য খাতে যেন কি এক রহস্যঘন গোপনীয়তা তলে তলে শক্তিবদ্ধ হয়ে এক গতিপথ খননে ব্যস্ত ছিল।

এর আগে এই উদ্দেশ্যশীল মনোভাব আমি অন্ততঃ মানুষের বহিরাকৃতিতে দেখিনি। ক্রোধ এবং অসন্তোষের অন্তরাগ্নি তাদের মুখমণ্ডলে জলজল করছিল। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল আর্ল মারকুইস্ কার্জন তখন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করতে চেয়েছিলেন। ব্যর্থমনোরথ তিনি তাদের প্রতি কটূক্তি করলেন যে, তারা সত্যের কাছে

চিরদিন অনাবৃত আগন্তুকই রয়ে যাবে। বঙ্গ বিভাগের ঘোষণা করলেন তিনি। সেই প্রদেশাঙ্গচ্ছেদ এবং শাসন বিভাগ জনতার রাজনৈতিক ঐক্যের রূপ দিল।

সে-সময় কলকাতার অসন্তোষ অচিরেই সারাভারতে ছড়িয়ে পড়ল, এ যেন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সূচিত করল। মানুষ সেদিন অভূতপূর্ব পাশে পাশে কাঁধে কাঁধ স্পর্শ করে দাঁড়ানোর উপযোগিতা উপলব্ধি করল। তারই প্রতিফলনে একে অপরের হাতে চিরন্তন ভ্রাতৃত্বের প্রতীক রাখি পরিয়ে দিল। সেই সৌভাগ্যলগ্নে সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল, "বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুণ্য হউক হে ভগবান"। এই স্বদেশাত্মার প্রেরণাসৃজনী সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই আন্দোলনের উদ্গারণে, রূপায়ণে এবং দিক্‌নিরূপণে অন্যতম প্রধান হোতা ছিলেন। সেই আবেগনির্ঝর অচিরেই বাংলার আগল ভেঙ্গে দিল, ছাপিয়ে পড়ল সমগ্র মাতৃভূমে অমিতপ্রভাবে প্রাণ পেল সমগ্র ভারতবর্ষ। একটি মাত্র বাক্যে আমি সেদিন দেখলাম আবেগের বন্যাদ্বার উন্মোচিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দানে।

১৯০৭ সালের বসন্ত কিম্বা গ্রীষ্মকাল। আমি তখন টোকিও জেলার হংগো-কু শহরে, আমি দেখলাম সহস্রাধিক জাপানী, অ-জাপানী ছাত্র পরিবেষ্টিত কোন বাঙালী যুবককে আসতে। তিনি তখন বোধ হয় সবে কৈশোরের বেড়ি পার হয়েছেন। শুনলাম তাঁর নাকি স্বদেশভুঁইয়ে সুবিশাল জমিজমা আছে এবং তিনি নাকি হস্তচালিত কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার্থে বিদেশ চলেন। তিনি কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হ্যাভেল তাঁর সম্বন্ধে আমার কাছে বেশ প্রশংসা করেছিলেন এবং কলকাতায় তাঁর প্রদর্শনী আমার কাছে জনমুগ্ধকর ও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাপানে তিনি বেশীদিন থাকলেন না, চললেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এরপর ইলিনয় রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের দেখা হয়েছিল, আমি তখন শিকাগোতে সাংবাদিকতার ছাত্র—টোকিওতে এবং প্রাচ্যের অন্যান্যস্থানেও শিক্ষাগ্রহণ করে এসেছিলাম ইতিমধ্যেই। তাঁর সৌজন্যে ভারতে ফিরে (সে, ১৯১০) তাঁর এক ভগ্নীর শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীর সাহায্যে তাৎপর্য পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। এ ছাড়াও সে-বছর গরমকালে সিমলাতে থাকাকালীন ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং রাসবিহারী ঘোষও আমাকে সাহায্য করেছিলেন।

আমি জানলাম যে রবিবাবুর ব্যক্তিত্ব সর্ব্বতোমুখী। সম্পত্তিসংরক্ষণের দায়িত্ব সত্ত্বেও তিনি কবিতা লিখেছেন, নাটক লিখে প্রয়োজনা করেছেন, গান গেয়েছেন, অভিনয় করেছেন, প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করেছেন, সমকালীন সাহিত্য-চারুকলা-বিষয়ক পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেছেন, নিজেও পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতার পর পাতা টীকাসংগ্রহনিবন্ধকবিতা-কৌতুককর নক্মা, গল্প, উপন্যাসও তাঁর লেখনীনিঃসৃত হয়েছে। নিজে তো এছাড়াও পশ্চিমবাংলার বোলপুরের এক গ্রাম শান্তি-নিকেতনে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন, তার শিক্ষক ছিলেন।

স্বদেশপ্রেমের ঝংকার তাঁর হৃদয়তন্ত্রে চির আন্দোলিত, রাজনৈতিক পরাধীনতার গ্লানিময় অবমাননা তিনি মর্মস্থলে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই লজ্জায় তাঁর আত্মা সঙ্কুচিত ছিল, তাঁর বেদনার্ত ছায়াও প্রায়ই তাঁর কাব্যবীণায় প্রতিফলিত হয়েছিল। এই ভাব তাঁকে অবনমিত করেছিল, তাঁর প্রতিভাকে বিনষ্ট এবং প্রাণহীন করে দিয়েছিল। মানুষের শক্তি এবং ক্ষমতার দৌড় তাঁর জানা ছিল, তাঁর সৃজনীশক্তি সেই ক্ষীণমান আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করল। যে-সময়ের কথা লিখছি তখন ভূপেন বসু রবীন্দ্রনাথের পরে রোষান্বিত ছিলেন, তিনি তাঁকে কলিকাতা ত্যাগ করায় এবং বোলপুরে ব্যাপৃত করার জন্য দোষ দিলেন। সে সময় তাঁর মতে কবির উপস্থিতি, সক্রিয় ও সদাসাহচর্য একান্তই আবশ্যক ছিল। রাজনৈতিক গণআন্দোলনের বিষাদকে জালিয়ে, তাঁর কাব্যের আমোঘ শক্তিতে তাদের টেনে তুলে তাঁর উচিত ছিল শক্তিভৃৎগদ্যের বিক্রমে তাদের হতাশার পাকথেকে টেনে তোলা। ভূপেন্দ্রর মন তখন সিমলায় শাসনপরিষদের আনীত বন্ধননীতির বিরুদ্ধে রোষান্বিত ছিল। তাঁর শক্তি থাকলে তিনি হয়ত রবি-বাবুকে কাব্যসাধনা বন্ধ করে তাঁকে সবলে সেই দুঃসাহসিক সংগ্রামে নিক্ষেপ করতেন। রাসবিহারী ঘোষেরও একই মনোভাব ছিল, তবে তিনি অনেক সংযমী ছিলেন, অন্ততঃ

৩

অথচ সমালোচকদের খুশী আর ধরেনা, যখন বোলপুরের নিভৃতে নির্জনে কবির ফসল সঞ্চয় বিশ্বে ছড়িয়ে গেল। ভূপেন বসুও পরে সংশোধনী অনুক্রমে উল্লসিত হয়েছিলেন। আমার মনে হয় রামানন্দবাবুই আমাকে শান্তিনিকেতনের কথা বলেছিলেন। বাল্যাবধি রামানন্দবাবু আমার কাছে মিত্র অপেক্ষা বরং অগ্রজতুল্য ছিলেন। তাঁর দুষ্কর সম্পাদনাকার্য হতে বিরতি নেব'র জন্যে কবি বলেছিলেন: "আপনি স্কুলশিক্ষক ছিলেন, আপনি এ'দিকেও তো দেখতে পারেন।"

বলাবাহুল্য, এখানে রবীন্দ্রনাথকৃত স্বীয় কবিতার ইংরেজী অনুবাদ-এর কথাই বলা হচ্ছে। একা'ধিকবার এই কাজ গ্রহণে অনুরুদ্ধ হয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেগুলো পড়ে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। ভাষান্তরের সৌন্দর্যে পুলকিত হয়ে, এবং বাগার্থগুলোর উপযুক্ত প্রয়োগে চমককৃত হয়ে তিনি কবিকে অধ্যবসায়ী হতে অনুরোধ করলেন।

-- এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে এলেন। তাঁর কিছু অনূদিত কবিতা উইলিয়াম্ রদেনষ্টাইনের গৃহে সমবেত সাহিত্যিক এবং রূপদক্ষের সম্মুখে পাঠ করলেন উইলিয়াম্ বাট্লার ইয়েটস্। সেগুলো পরিমিতসংখ্যায় 'গীতাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত করল ইণ্ডিয়া সোসাইটি। প্রত্যেক সমালোচক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন। এর পরেই এল নোবেল পুরস্কার। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি কেবলমাত্র বাংলার কবি রইলেন না, হলেন পৃথিবীর কবি। এই গল্প আমি এবং তাঁর অন্তরঙ্গ কয়েকজন জানেন, সুতরাং এর বিশ্লেষণ মাত্রেই বাহুল্য। এইসময় কেদার নাথ দাশগুপ্ত আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। ইনি তখন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনসভা স্থাপিত করেন। তিনি বললেন তাদের সংস্থা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থিত করবেন এবং শুধালেন যে, তার একটি স্বদেশী কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন এবং সেটি যদি তিনি ঐ সভায় আবৃত্তি করেন, কবি কি কিছু মনে করবেন। তাঁর সম্মানার্থে একাধিক সভা ও সমিতি হয়েছিল। কবির শ্মশ্রু আমাকে তখন আকর্ষিত করে। কোন কথাবার্তায় বা অঙ্গভঙ্গিমায় উল্লাস প্রকাশ করতে দেখিনি, এমন শান্ত এবং গাম্ভীর্যবান ছিলেন তিনি চিরদিন। পুরুষ-মহিলা সবার সাথেই তার ব্যবহার অমায়িক ব্যবহার। যেই তাঁকে দেখেছে তাঁর কথা শুনেছে, সেই তাঁকে প্রাচ্যের ভবিষ্যবেত্তা ঋষি বলে স্বীকৃতি দেবে।

৪

ডাবলিনে যখন যাই তখন আমার বাসস্থান মেরিয়ন স্কোয়ারে ইয়েটসের গৃহ সন্নিহিত ছিল, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়ে আমাকে বলেছিলেন: "অধিকাংশ ব্যক্তির লেখাই এমন যে তার থেকে একটি বাক্য প্রতিস্থত করলেই সেটা নিরর্থ হয়ে দাঁড়ায়, রবীন্দ্রনাথ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রত্যেক বাক্যেই প্রায় এমন কি প্রত্যেক বাক্যাংশেই, অর্থবোধ বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। যতই তার রচনা পড়বেন, ততই তার অর্থবোধ আপনার মধ্যে জন্মলাভ করবে।" সে সময় এ, ই, নামে এক প্রখ্যাত চিত্রকর-কবি-গদ্যরচয়িতাও আমার কাছে ডাবলিনে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তিসমন্বিত। তিনি একজন সুমহান চিত্রকর হতে পারতেন ইচ্ছে করলেই কেননা চিত্র প্রাথমিকভাবে মানসিক প্রতীতি এবং দ্বিতীয়তঃ তাকে নিষ্ঠাসহকারে কাগজ কিম্বা ক্যান্‌ভাসের ওপর আঁকতে হবে।

৫

লণ্ডনের হ্যাম্পষ্টিড অন্তর্গত বেলসাইনপার্ক এভেন্যুতে থাকাকালীন আমার নিকটেই থাকতেন জেমস্ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্। পাব্লিক সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত ভ্রমণের পর তাঁর নিভৃত সাহিত্য অলোচনা কক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায়তনের কথা এবং তিনি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই শিক্ষায়তন। বদ্ধঘরের পরিবর্তে পল্লবিত-তরুতলে প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে ছাত্র ও শিক্ষকের পারিবারিক সম্পর্ক যে বুদ্ধি এবং বোধির শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগঠন সম্ভব, একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বললেন যে, সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষায়তনকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। যে সব যুবক সেখান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে আসছে, তারা নাকি তাদের ধারার অনুপযুক্ত। একদিন দুপুরে লর্ড

কারমাইকেলের বাংলা সফরের অব্যাহতি পরেই, তাঁকে ম্যাকডোনাল্ডের কথা বললাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম যে তাঁরা কি সত্যিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিদ্রোহী বা তাঁর শান্তিনিকেতনকে রাজবিদ্রোহের ষড়যন্ত্রপীঠ বলে সন্দেহ করছেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে ক্রোধমিশ্রিত স্বরে বললেন, "কতিপয় কর্মচারীর দুষ্ট আচরণই এর কারণ", বললেন যে তিনি এই সামাজিক-আধ্যাত্মিক শিক্ষায়তনের নাম পুলিশের গোপন খাতা থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

৬

১৯১৯ সালের শরৎকাল। সে-সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মণ্টেগু—গঠন-সংস্কার বিষয়ক ব্যাপারে লণ্ডনে এসেছিলেন পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে উপস্থাপনের জন্যে। একদিন স্মৃতিমন্থিত সন্ধ্যায় আমরা তাঁর হাইড-পার্ক সন্নিহিত গৃহের বৈঠকখানায় আরামদায়ক অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে আছি। জন-জীবনের মত ব্যক্তিজীবনেও তিনি বাগ্মী ছিলেন, তাঁর কথার জোয়ার রোধ করে আমি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়-কালীন কলিকাতার অভিজ্ঞতা বিবৃত করলাম। হঠাৎ বোধহয় তিনি আমার বর্ণনার পরে বলেছিলেন, রবি অনেকের সঙ্গে বিবাদ করে সেই সঙ্কটমুহূর্তে নিজেকে সমর্থন করেছিলেন। কতিপয় অধৈর্য আদর্শবাদী তাঁকে আন্দোলনের নেতৃত্বভার ত্যাগ করাতে চেষ্টা করে-ছিলেন। কবি কদাপি তা শোনেননি। তিনি এই মাঝদরিয়ায় অশ্বদলী দলের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন এবং বলেওছিলেন। আহ্বানে তিনি প্রত্যেক মত খণ্ডিত করে এগিয়ে চললেন। সেই চরম পরীক্ষার দিনে তিনি সুরেন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত সহচর ও বন্ধু ছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের আজীবন সখ্য ছিল, অথচ কেউই কবির কৃতিত্বে গর্বান্বিত ছিলেন না। এই মহান বিজ্ঞানীও কবির স্বীকৃতির বিলম্বের কথা স্বীকার করেছেন। রবি কাব্যের উৎকর্ষ মানোন্নীত হতে পৃথিবীর লোকের দশকের পর দশক অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা বুদ্ধি-জীবিদাসত্বে এমন অবনমিত যে প্রতীচ্য যতদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকৃতি দিল না, অনেক ভারতীয়ই সঙ্কটে পড়তেন এ বিষয়ে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, যেই নোবেল পুরস্কার পেলেন লোকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর সম্মাননায়। তাদের ব্যথার প্রতিদানে রবিও উত্তম সাজা দিয়েছিলেন।" সে সময়ে শান্তিনিকেতনে প্রেরিত প্রতি-নিধিদল কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননাসভার দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি স্বাভাবিক শ্লেষোক্তিসহকারে আমাকে একথা বলে ছিলেন। তারা এত পশ্চাৎপদ ছিল স্বভাবে যে সম্মান্ত ব্যক্তি তাদের সামনে এসে স্পষ্ট বললেন যে, তারা বুদ্ধি-জীবী ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু নয়।

৭

১৯২১ সালের জুলাই মাসে, বিলাতের নিম্নসভা ১৯১৯ সালের বসন্তে ইংরেজকৃত পাঞ্জাবের লাহোর ও অমৃতসরের অবমাননাকর কলঙ্কময় নিগ্রহণ-এর বিষয়ে আলোচনা করলেন (মূল ঘটনার প্রায় পনের মাস পরে)। ভারতরাষ্ট্রে নিযুক্ত সম্রাটের প্রধান রাষ্ট্রসচিব এডুয়িন স্যামুয়েল মণ্টেগু প্রাণপাত পরিশ্রম করে কিছু করতে চাইলেন যাতে করে জনগণের প্রশংসা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু নিরাশ হলেন এই উদ্দেশ্যসাফল্য প্রয়াসে। আমি নিজের চোখে, নিজের কানে শুনেছি তাঁকে অপমানকর ধ্বনি শুনতে—কেন না যে-স্তরে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেটা রাজকীয় স্বার্থে হানিকর বলে বোধ হয়েছিল।

উচ্চসভাও আলোচনা করলেন। কিন্তু ব্যাপারটা সেইখানেই স্থাণুবৎ স্থির হয়ে রইল।

সেই বিতর্ক দিবসের অপরাহ্নে আমি নীচের তলার ঘরের কোণের দিকের জানলায় বসেছিলাম চুপ করে। পাশে ছিলেন সদ্য আগত কবি। কবি সেই অত্যাচারে মর্মাহত অবনত হয়ে বসেছিলেন, বিশেষ করে এই দুষ্কৃতি এড়িয়ে যাওয়া যেন আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের বৃত্তান্ত একত্রিত করে তাঁকে দেখিয়ে কিছু অদলবদল করে আমি সেটা ভারতের কোন এক সংবাদপত্রে তারযোগে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁর মাতৃভূমির প্রতি যে কি অগ্নিময় ভালবাসা ও কি মহানাত্মা যে তিনি ছিলেন, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:

আমাদের শাসন কর্তৃপক্ষের এই বর্বর মর্যাদাতিক্রমের

পক্ষে এই নিঃসঙ্কোচ ক্ষমা চাইতে বলায় তিনি বেদনার্ত ও অপমানিতবোধ করেছিলেন। তিনি বললেন,—এর ফলেই আমরা আমোদপ্রিয় জাতির হাতে বিশ্বাসের ভার তুলে দেওয়ার অসারত্ব ও অবমাননা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, এরা যে আমাদের ঘৃণার চোখেই দেখে যাবে এমনিই। কেবল মাত্র অন্তর্দুর্বলতা দূর করে এবং আমাদের সামাজিক, শিক্ষামূলক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সংগঠিত করেই আমরা এই অবনতির গহ্বর হতে উঠে আসতে পারব। "আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও সাধারণ মানুষের দুর্দশা-মোচনের জন্য। সর্ব্বপ্রকার বিভেদ বিসর্জন দাও। সহ-যোগিতা ও একাত্মচিত্তের আত্মাকে জাগরূক কর। বর্তমানের এই ভ্রান্তিভঙ্গের আঘাত যদি নিতে পারি, ছদ্ম-বেশে আশীর্ব্বাণী নেমে আসবে আমাদের শিরে এবং জাতীয় আত্মশ্রদ্ধা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, বাস্তবগত উৎকর্ষময় নতুন জীবনের যে যুগ, তাঁর বনিয়াদ গঠিত হবে। শুধুমাত্র অধীনতা ও পরনির্ভরশীলতা হতে মুক্ত হয়ে, আমাদের সমস্ত ভয় দূরে ফেলে দিয়ে এবং অনর্থক শক্তিহীন ক্রোধ ও প্রতিশোধমূলক অসন্তোষের ধ্বংসপথ রুদ্ধ করেই আমরা মহত্ত্বের পানে উঠতে পারব।"

—হিন্দু (মাদ্রাজ) [অনূদিত]

যে নাইট উপাধি তিনি মাননীয় সম্রাটের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সেটা যখন তিনি অত্যাচারের প্রতিবাদ-প্রতীক হিসেবে ত্যাগ করলেন নিজেকে বঞ্চিত করে, তাতে তদানীন্তন ভারত সংসদের সদস্য ও মণ্টেগুর বিশ্বস্ত বন্ধু ভূপেন বসুর মত আর কেউই ততটা বিচলিত হননি। অতি উচ্চাদর্শের দেশপ্রেমের দুঃসাহসী দৃঢ়তার প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি প্রায় বিস্মৃত হলেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় দশ বছর আগে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

৮

কবি জানতেন যে মণ্টেগুকে প্রথম মুহূর্তেই অকর্মণ্য-বোধে তাঁর সহকর্মীদের উপর নিক্ষেপ করে দেবে। বারাকনহেডের অধীনে মুমূর্ষুরা তাঁকে উৎক্ষেপনার্থে শপথ গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে তাঁকে রাজনীতির মরুভূমিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

ভারতবর্ষ নিজেকে শিক্ষিত দেশ বললেও প্রকৃত পক্ষে তা বাস্তব সর্ব্বস্ব। অন্ততঃ এইটাই কল্পনা করা যেতো। বলা হয় যে মণ্টেগু নাকি ব্যর্থ হয়েছিলেন—ব্যর্থ হয়ে-ছিলেন ইন্দো-ইঙ্গ ইতিহাসের সবচেয়ে সঙ্কটজনক পরি-স্থিতিতে।

কবির মত পৃথিবীকে তিনি জানতেন, ফলে তিনি বিচারে কাউকেই দোষারোপ করেননি এই ঘটনায়, কোন সৎসাহসী প্রচেষ্টার কোন ফাঁক রাখেননি, এমন কি যদিও তা' অনেকাংশে নিষ্ফল হয়েছিল। এই পরিস্থিতির পরি-প্রেক্ষিতে এর বেশী আশা করা যায় না।

এক দ্বৈত উদ্দেশ্য তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। প্রথমতঃ ভারতের সেবা করা, দ্বিতীয়তঃ ভারতের এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে উদ্ধার করা।

অবজার্ভারের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি লর্ড চেমসফোর্ডের উত্তরাধিকারী হিসেবে মণ্টেগুর নাম প্রস্তাব করলেন। (এ সময় আমি ঐ পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম)। ব্যবহারগত অনেক দোষ থাকলেও ব্রিটেনের শাসক-শ্রেণীতে, তাঁর মতে, আর কেউই প্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনারেল হবার মত সহানুভূতিশীল ও কল্পনাময় ছিলেন না। সেই মুমূর্ষু ষড়যন্ত্রের কাছে কোন কথাই চলল না। লর্ড রিড়িং সহজেই পেলেন পুরস্কার, কিছুদিন বাদেই মণ্টেগু লর্ড কার্জনের অবিজ্ঞজনোচিত এবং অনেকাংশে অন্যায়মূলক তুর্কী-চুক্তির প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন। তুর্কীরা মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) পরাভূত হয়েছিল। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পীড়িত হলেন ও তাঁর মৃত্যু হল।

৯

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে শুধু সর্বময় ভক্তি দিয়ে ভাল-বাসেননি ; তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার ভূমির উর্বরতা, প্রাচুর্য তাঁর গর্বের বস্তু ছিল। আরো গর্বিত ছিলেন তার মন্থর তালে তালে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির জন্য। প্রায় প্রত্যেক সভাতেই তিনি বলতেন যে, আমরা প্রতীচ্যের কাছে যত-টুকু পাই, ততটুকুই যেন প্রতিদান দিই, এমন কি তার চেয়ে বেশীই দেব প্রয়োজনবোধে। তিনি স্বাধীনতা ও গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল দান প্রতিদান চেয়েছিলেন। তিনি চিরদিন আত্মীয়তার আনুকূল্য পাপমুক্ত করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন।

পৃথিবীতে আমি বহু কৃতি ও চিন্তাবিদ্‌দের সাহচর্যে এসেছি। কিন্তু পৃথিবীর কোন এক-চতুর্থাংশেই এরকম মুক্তিপাগল ব্যক্তি দেখিনি ;—কিম্বা নিয়ত এ রকম আগ্রহশীল-আকুল দেখিনি যিনি তার জন্য মহত্তম আত্মোৎসর্গ করতে পারতেন। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দিহান যে, প্রয়োজন্ উদ্ভূত হলে তিনি হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে আত্মবলিদান করতেন।

এবং মুক্তি তার কাছে রাজনৈতিকমুক্তির চেয়ে অনেক বড় মুক্তি ছিল। সে মুক্তি নিষ্পেষণশীল দারিদ্র্য হতে মুক্তি, দলিত সমাজতন্ত্র হতে মুক্তি এবং সামাজিক রীতি-নীতি হতে মুক্তি। সমস্ত জীবনব্যাপী তিনি এই বাণী বিলিয়ে গেছেন কথায়, লেখায় এবং সর্ব্বোপরি জীবনে।

—অনুবাদ : শঙ্কর রায়

বিচিত্র বিশ্ব

শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

কি এক বিচিত্র বিশ্ব স্থলে জলে নভে
অন্তরীক্ষে, চিত্তে চিত্তে মহা অনুভবে
শিরায় শিরায় মোর রক্তে রক্তে হায়,
অহরহ টানটুকু প্রেমে প্রাণে পাই।
তবুও শিহরি উঠি মাঝে মাঝে হেথা
প্রেম নেই, স্নেহ নেই, নেই ধর্ম যেথা।

শাণিত কৃপাণ হস্তে কপট বন্ধুত্বে
ফিরিতেছে নর নারী নরের পশ্চাতে।
মনে করি, কিছু দিন থাকি এক ঠাঁই
হেরিয়া অপূর্ব বিশ্ব নয়ন জুড়াই।
চোখের সম্মুখে ভাসে শাণিত কৃপাণ,
মিটি মিটি হাসি আর রক্তাক্ত নয়ান।

বিচিত্র হলেও বিশ্ব তাড়না প্রদান,
মোহমুক্ত হও, আর চাহহ নির্বাণ।

মহাকাশ অভিযানের কথা

উপানন্দ

বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে লক্ষ্য করলাম পাশ্চাত্য জাতির মহাকাশে দুর্দম অভিযান। মহাকাশে যারা উড়ে মানুষের চিরন্তন বাসনাকে পূর্ণরূপ দিয়েছেন, তাঁরা বিশ্বের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শাশ্বত স্বাক্ষর করেছেন, তাঁরা হয়েছেন মৃত্যুহীন। প্রথমেই মনে পড়ে যুরি গাগারিনকে। ১২ই এপ্রিল ১৯৬১ সালে তিনি মহাশূন্যে উড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর তাঁকে অনুসরণ করলেন এ্যালেন শেফার্ড। ইনি মহাশূন্যে উঠলেন ৫ইমে ১৯৬১ সালে। ৬ই আগষ্ট ১৯৬১ সালে ঘেরম্যান টিটভ উড়লেন মহাকাশে। ২১শে জুলাই ১৯৬১ সালে মহাকাশে উড়লেন ভার্জিল গ্রিসম্। ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ সালে জন গ্লিন, ৩রা অক্টোবর ১৯৬২ সালে উয়াল্টার শিরা, ২৪শে মে ১৯৬২ সালে কারপেনটার, ১২ই আগষ্ট ১৯৬২ সালে পাভেল পাপোভিচ, ১১ ইআগষ্ট ১৯৬২ সালে নিকোলায়েভ, ১৫ই মে ১৯৬৩ গর্ডনকুপার, ১৪ই জুন, ১৯৬৩ সালে ভ্যালেরি বিকোভস্কি আর ১৬ই জুন ১৯৬৩ সালে ভ্যালেন্টিনা তেরেজকোভা বিশ্বের মহাকাশে উড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন আর গ্রহনক্ষত্রদের সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন।

একদিন মাটির মানুষ উঠবে মহাশূন্যে, এরূপ ধারণা ছিল অসম্ভব। এরূপ কল্পনাও ছিল আকাশকুসুম। মানুষের স্বপ্নাতীত ছিল এরূপ ঘটনা। কিন্তু বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। মানুষের মহাকাশ অভিযানের পথে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে পৃথিবীর দুইটি শীর্ষস্থানীয় জাতি—সোভিয়েট রাশিয়া আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। এঁদের সাফল্য গৌরবে সমগ্র মানব জাতি গৌরবান্বিত। সর্ব্বোত্তম বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া এমন সব তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এমন সব বস্তুর উদ্ভাবন করেছেন—যার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহু দূরবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহকে পৃথিবীর খুব কাছে এসে অভিবাদন জানাতে হয়েছে।

তোমরা শুনেছ মহাকাশের অভিযানের পথে স্পুটনিক যুগ সক্রিয়; কিন্তু এখন স্পুটনিক যুগ পিছনে পড়ে গেছে। আমরা এযুগ পেরিয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি, গ্রহ উপগ্রহে গিয়ে আমরা উপনিবেশ স্থাপন করবো, এরূপ সঙ্কল্প করেছি। আমাদের সঙ্কল্প কার্য্যকরী করবার জন্যে এসেছে পলিয়ট যুগ। আমরা চলেছি পলিয়ট যুগের মধ্য দিয়ে।

চল্তি বছরের সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশ যানের তালিকায় তোমরা বোধহয় পেয়েছ পলিয়ট—এই নতুন যান পলিয়ট আমাদের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার জন্যে অগ্রণী হয়েছে। এর আনুকুল্যে এখন আর মহাকাশচারীকে মহাকাশযানের খেয়ালের ওপর চলতে হবে না। চালক তার খুশীমত মহাকাশের যেখানে সেখানে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারবে—ডাইনে, বামে, ওপরে নীচে সর্ব্বত্র হবে অবাধগতি। এর আগে তা সম্ভব হোতো না। মহাকাশযানের দয়ার ওপর চল্তে হোতো চালককে। পলিয়ট সে সব বাধাবিপত্তি দূর করে আমাদের পক্ষে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার পথ পরিষ্কার করেছে। এজন্য এই পলিয়ট আমাদের ধন্যবাদার্হ।

মহাকাশযান পলিয়টের সঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী কয়েকটি জেট ইঞ্জিন দিয়ে দিলে সময়মত এর গতিপথ উল্টানো যেতে পারে। অতিরিক্ত ইঞ্জিন বিশেষ বিশেষ কোণে রেখে তা চালু করলে, মহাকাশযানও ওদের তালে তাল দিয়ে চল্তে থাকবে। নৌকার পালের মত

আয়ন ফলকও এই পলিয়টের দিক পরিবর্তন করতে পারে। আজ মহাকাশ জয় করতে রাশিয়ার মত আমেরিকাও শক্তি দেখাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দান কম নয়। ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল, যার নব নামকরণ হচ্ছে কেপ কেনেডি, এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। গত চার বছর ধরে এখান থেকে আকাশে উড়েছে হাজার হাজার রকেট আর মিসিল। কেপ ক্যানাভেরালের পানে পৃথিবী এখনও চেয়ে আছে।

১লা মার্চ ১৯৫৯ সাল। কেপ ক্যানাভেরাল উড়িয়ে দিল মহাকাশে তার পাওনিয়র—৪। প্রচণ্ড তার গতি। চাঁদ থেকে মাত্র সাঁইত্রিশ হাজার মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সে পৌছে ঘুরতে সুরু করলো। ঐ বছরের আগষ্ট মাসেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে পাঠালো তার কৃত্রিম গ্রহ। একই বছরের মে মাসে কেপ ক্যানাভেরলের রকেট ঘাঁটি থেকে রকেটে করে আকাশ পথে তিনশ মাইল ওপরে বেড়িয়ে এলো মার্কিণ যুগল—এবল আর বেকার। কিছুক্ষণ ধরে আকাশ ভ্রমণের পর ওরা দুজন নামলো স্বদেশের মাটিতে।

এরপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'পাওনিয়র ৫'এর সঙ্গে হোলো আমাদের পরিচয়। এই কৃত্রিম গ্রহটি আকাশপথে পাঠিয়ে দিলেন আমেরিকা, তা এখনও দূরে চলেছে পৃথিবী থেকে বেশ কিছু দূরে থেকে সূর্য্যকে কেন্দ্র করে।

এবল আর বেকারের পর মহাশূন্যে পাঠানো হোলো একজন শিম্পাঞ্জীকে। নাম মিঃহাম। ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল বেগে ঘুরে ফিরে এলেন মিঃহাম। মিঃ হ্যামের মহাকাশযাত্রার আগে আর পরে কেপক্যানাভেরল থেকে পাঠানো হয়েছিল কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ। এরা মহাশূন্যের রহস্যালোকে এসে পৃথিবীর কাছে মহাকাশের কিছু ঘোমটা খুলে দিয়েছে। ১৯৬১ সালে এপ্রিল মাসে আমেরিকা থেকে প্রেরিত মহাকাশ যানটি প্রথমে দুরবীণ বলে মনে হয়েছিল।

মহাকাশে উঠেছে প্রথম বানর, তারপর শিম্পাঞ্জী, সব শেষে মানুষ। মার্কিণ নৌবাহিনীর এ্যালান বি শেফার্ড আমেরিকার প্রথম আর বিশ্বের দ্বিতীয় মহাকাশচারীর স্থান অধিকার করেছেন। ১৯৬১ সালের ৫ই মে শেফার্ডের ক্যাপসুল মহাশূন্যে উড়ে চলেছিল ঘণ্টায় পাঁচ হাজার একশো মাইল বেগে। পনরো মিনিটে সোজাসুজি একশো পনের মাইল তারপর মহাশূন্যে ঘুরে নির্দ্দিষ্ট জায়গা থেকে কয়েক শ মাইল দূরে এসে নামলেন শেফার্ড। কয়েক মাস পরে এদিকে অগ্রণী হোলেন ক্যাপ্টেন ভার্জিল করিসন। ইনিও মহাকাশ বিচরণ করলেন। এরপর ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কুড়ি তারিখে পরিক্রমা করলেন কর্ণেল গ্লেন তাঁর রকেট নিয়ে ৮৮·২৯ মিনিটে।

এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন মার্কিণ নৌবহরের লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার ম্যালকলম স্কট কার্পেন্টার। ইনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন তিনবার। মহাশূন্য থেকে মহাকাশচারীদের ফেরাবার ব্যাপারে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, তার অনেকখানি সমাধান করে রাশিয়া এগিয়ে গেছেন অনেকখানি। আমেরিকার শেফার্ড থেকে সুরু করে প্রত্যেক মহাকাশচারী ফেরবার সময় বেশ কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু পাননি রাশিয়ান মহাকাশচারীরা। নতুন জগৎ আবিষ্কারের জন্যে আমেরিকা ও রাশিয়ার উদগ্র সাধনার এখনও শেষ হয়নি।

আজ পৃথিবীতে যিনি মনুষ্য সমাজের মধ্যে দৈনন্দিন আলোচনার বস্তু তার নাম ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোফা। এই রাশিয়ান তরুণী বিশ্ববন্দিতা। মহাকাশ বিজয় করে যখন তিনি নামলেন মাটিতে তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে নানা প্রকার টীকা টিপ্পনি করেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের সন্দেহ দূরীভূত করে দিলেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক।

এতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোতোনা যদি তিনি না নারী হোতেন। নারীর দ্বারা মহাকাশ বিজয় নর-সমাজের মুখে যেন চুণকালী মাখানোর মত হয়ে পড়েছে, তাই নানাদিক দিয়ে উঠেছিল নানা কথা। এই নারীর জন্ম রাশিয়ার মাসলে নিকোভো গ্রামে। ১৯৬১ সালে ১২ই এপ্রিল তারিখে ভস্তক-১এর মহাকাশ যাত্রী হোলেন গাগারিন। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে যার গাগারিন বিশ্ব-বিশ্রুত হোলেন। এই বছরেই আগষ্ট মাসে টিটভ ভস্তক—২এ চড়ে মহাকাশে উঠলেন।

ভস্তক মানে মহাযান। ১৯৬২ সালে আগষ্ট মাসের এগারো ও বারো তারিখে রাশিয়া পাঠালো মেজর আন্দ্রিয়ান নিকোলয়েভ আর কর্ণেল পাভেল পোপোভিচকে মহাশূন্যের পথে। নিকোলয়েভ আর পোপোভিচ একই সঙ্গে মহাকাশ থেকে কয়েকবার পৃথিবী ঘুরেছেন। এর পর ১৯৬৩ সালের জুন মাসে আর একজোড়া ভস্তক উড়িয়ে দেওয়া হোলো। কক্ষপথে প্রবেশ করলো ভস্তক—৫ আর ভস্তক—৬

প্রথমটির চালক ভেলেরি বাইকোভস্কি। দ্বিতীয়টির চালক বিশ্বের প্রথম মহাশূন্যচারিণী ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোফা। ডাকনাম ভলিয়া, আকাশে উড়লেন শঙ্খচিল নামে। ইনি ট্রাকটার চালকের মেয়ে। যখন ছোট, বাবার কাছে চাইলো এই মেয়ে তার ট্রাকটারকে, উদ্দেশ্য চাঁদামামার দেশে যাবে।

অবাক হয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—'ট্রাকটার নিয়ে কি সম্ভব? চাঁদমামার দেশে যাওয়া যায় না—অসম্ভব'—মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে বাবা আদর করে তাকে ভুলিয়ে দিলেন।

'তখন ভলিয়া পড়ে ইস্কুলে। ভলিয়ার বাবা দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধে চলে গেলেন। যুদ্ধে মারা গেলেন তিনি। মেয়েটি মায়ের সঙ্গে শুধু ঘরের কাজ নয়, কারখানায়ও কাজ করতো। সতের বছর বয়স থেকেই সুরু হোলো কারখানায় কাজ করা। ভলগা নদীর ধারে কারখানা। কারখানাটিতে চাকা তৈরী হোতো। মা তখন একটি সুতোর কলের কর্ম্মী। বছর কয়েক পরে চাকা তৈরীর কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে ভলিয়া এলো সুতোর কলে। মা ও মেয়ে একই জায়গায় কাজ করলো। কিছুদিন পরে মা অবসর নিলেন। ভলিয়া এই কলে ক্রমে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করলো। কলের কর্ম্মীসঙ্ঘের নির্ব্বাচনে সে হোলো সঙ্ঘ সম্পাদিকা। কর্ম্মক্ষমতার প্রাচুর্য্য, তা ছাড়া অপরিমিত পরিশ্রম করবার শক্তি থাকায় এই ভলিয়া কারখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে বহু কাজ করতো। ঘরের কাজ, পড়া-শুনা, খেলার মাঠে গিয়ে খেলাধূলা, প্যারাস্যুট লাফান—সব কিছু নিয়ে ওর দৈনন্দিন জীবন মহা আনন্দে অতিবাহিত হোতে লাগলো। ওকে দেখে সবাই বলতো "কি দস্যি মেয়ে রে বাবা!" প্যারাস্যুটে লাফানোর জন্যে এরো-ক্লাবে যোগদান করলো। প্যারাস্যুট লাফানোর দক্ষতার পরিচয় পেয়ে ভস্তক-বাহিনী এই মেয়েটিকে গ্রহণ করলো। তার মত অন্য কয়েকজন মেয়েকেও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রথম মহাকাশচারিণী হয়ে ভলিয়াই সাফল্য-গৌরবলাভ করলে। আজ পৃথিবীর কাছে সে পেয়েছে সর্ব্বোত্তম সম্মান। আমরা স্বাধীন ভারতের ছেলেমেয়ের দল। এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহাকাশ জয় করবো এই আশাই অন্তরে পোষণ করি।

—

কাউন্ট লিও টলষ্টয়
রচিত
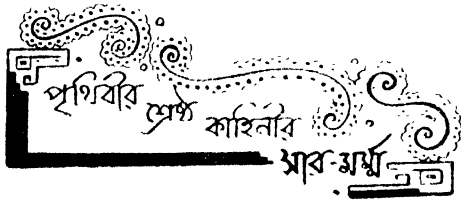
দি লঙ্ এক্সাইল্

(The Long Exile)

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মিকারের কথা শুনে আক্‌শ্যেনক কোনো জবাব দিলো না ...শুধু একটা চাপা-দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে কয়েদখানার পাথরের দেয়ালের পানে তাকিয়ে চুপ করে কি যেন চিন্তায় মগ্ন হলো। আক্‌শ্যেনককে এমন চিন্তাকুল দেখে মিকার বললে,—আমার কাহিনী তো সব শুনলে দাদা...এবার বলো দেখি তোমার কথা!...এই কয়েদখানায় তুমি পৌঁছুলে কি কীর্ত্তি বাধিয়ে?...কতদিনের মেয়াদে?... দেখে-শুনে তো মনে হয়—বেশ লম্বা-মেয়াদেই রয়েছো এখানে!

মিকারের রসিকতায় আক্‌শ্যেনক শান্তভাবেই জবাব দিলে,—ছাব্বিশ বছর আগে এ কয়েদখানায় এসেছি... জানি না আরো কতকাল এমনি বন্দী হয়েই থাকতে হবে!

আক্‌শ্যেনকের কথা শুনে মিকার চমকে উঠলো... বললে,—ছাব্বিশ বছর...বলো কি!...তা কোন্ অপরাধে তোমার এমন শাস্তির ব্যবস্থা হলো?...

নিজের দুঃখ সর্ব্বদা নিজের মনেই চেপে রাখতো আক্‌শ্যেনক...কাকেও সে সহজে তার মনের কথা খুলে বলতো না কোনোদিন। মিকারের কৌতূহল দেখে আক্‌শ্যেনক বিশেষ কিছু বললো না...ছোট একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে সে জবাব দিলে,—সে কথা শুনে আর লাভ কি!...এই বলে সে সেখান থেকে সরে সরে গেল।

মিকার কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্র নয়...বিশেষ করে তার কৌতূহল জেগেছে যখন এই বুড়ো-কয়েদীর পূর্ব্ব-ইতিহাস জানবার জন্য! আক্‌শ্যেনক দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আশপাশের অন্য কয়েদীদের কাছে বুড়ো-কয়েদীর অপরাধের কাহিনী জানতে চাইলো। মিকারের পীড়াপীড়িতে অন্য কয়েদীরা তাকে আক্‌শ্যেনকের কয়েদখানায় আসার ইতিবৃত্ত সব খুলে বললো। স্তব্ধ-বিস্ময়ে সে কাহিনী শুনতে শুনতে মিকারের মুখের কৌতুক-হাসির ভাব মিলিয়ে গেল...ক্ষণেকের জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে মনে-মনে সে যেন কি ভাবলো...তারপর সহসা ছুটে গেল কয়েদখানাকার নিরালা-কোণে—সটান আক্‌শ্যেনকের কাছে। মিকারের অদ্ভুত ব্যবহার দেখে অন্য সব কয়েদীরাও কৌতূহল ভরে এগিয়ে এলো তার পিছু পিছু...হঠাৎ এমন পরিবর্ত্তন ঘটলো কেন, তারই পরিচয় জানতে!

বেচারা আক্‌শ্যেনক তখন একান্তে বসে কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন...মিকার ছুটে গিয়ে আবেগ-ভরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বৃদ্ধ-কয়েদীর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললে,—তাই তো

দাদা, তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে—মুখখানা নিতান্তই চেনা-চেনা···আগেই কোথাও দেখেছি যেন কবে!··· কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার দাদা!···এ ক'বছরে এত বুড়ো হয়ে গেছো তুমি, যে সহজে চেনা যায় না তোমায়!

মিকারের মন্তব্য শুনে আক্শ্নেনক কোনো জবাব দিলো না···বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে চকিতের জন্য সে শুধু একবার নতুন-কয়েদীর পানে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আগের মতোই চুপচাপ আবার কি যেন চিন্তা করতে লাগলো! মিকারও পরম-বিস্ময়ে একদৃষ্টে আক্শ্নেনকের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

তাদের এই অদ্ভুত-আচরণ দেখে অন্য কয়েদীরাও কৌতুহল-ভরে মিকারের কাছে এগিয়ে এসে নানান্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।···এই বুড়ো-কয়েদীকে সে আগে কোথায় দেখেছে এবং এমন অবাক হবারই বা কারণ কি?

এমনি নানান্ সব প্রশ্ন!···মিকার কিন্তু তাদের সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। এতক্ষণ যেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, তেমনিভাবে একদৃষ্টে আক্শ্নেনকের পানে চেয়ে থেকেই সে হঠাৎ আপন-মনে অস্ফুট-কণ্ঠে বললে —সত্যিই আশ্চর্য্য ঘটনা!···এতকাল পরে এভাবে আবার আমাদের দুজনের দেখা হবে—এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি!

এ কথা শুনে আক্শ্নেনক কৌতুহলী-দৃষ্টিতে মিকারের পানে ফিরে তাকালো···সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে,—বটে!··· কোথায় দেখেছো তুমি—আমাকে?···তুমি কি শুনেছো যে আমি খুনী-আসামী··· মানুষ-খুন করার অপরাধে দীর্ঘ-মেয়াদে সাইবেরিয়ার এই কয়েদখানায় সাজা ভোগ করছি!

মিকার জবাব দিলে,—শুনেছি বৈকি!···দেশের সবাই এ খবর জানে···ছেলে-বুড়ো সকলেই শুনেছে তোমার সেই মানুষ-খুনের কাহিনী! তবে, সে আজ অনেকদিনের কথা···তাই খুঁটিনাটি খবর সব ঠিক মনে নেই এখন।

গম্ভীর-কণ্ঠে আক্শ্নেনক বললে,—তাহলে শুনেছো হয়তো যে কিভাবে বুকে ছোরা বসিয়ে মানুষ-খুন···

কথা শেষ হবার আগেই হো-হো করে হেসে মিকার জবাব দিলে,—নিশ্চয়!···নীজ্-নিহির শহরের মেলায় যাবার পথের ধারে সরাইখানার ঘরে তল্লাসীর সময়, সরকারী-পেয়াদারা যে লোকটির তোরঙ্গের ভিতরে রক্ত-মাখা-ছোরার সন্ধান পেয়েছিল, তাকেই তো খুনী আসামী সাব্যস্ত করেছে সবাই!—তবে, অন্য কেউ যদি বেমালুম ধরা না পড়ে বেশ কায়দায় হাত-সাফাই করে অজান্তে সঙ্গোপনে সেই তোরঙ্গের ভিতরে রক্তমাখা-ছোরাটাকে গুঁজে রেখে দিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য অন্য ব্যাপার!···কিন্তু তেমন কাজ কি সম্ভব!···খুনী-আসামীই বা কেমন করে বেমালুম অজানা অন্য আরেকজনের কুলুপ-আঁটা তোরঙ্গ খুলে তার ভিতরে সেই রক্তমাখা-ছোরাখানা লুকিয়ে রাখতে পারে? কারণ, কুলুপ-আঁটা তোরঙ্গের পাশেই তো তখন শুয়ে ঘুমুচ্ছিল তোরঙ্গের মালিক স্বয়ং···তোরঙ্গ খুলে খুনের রক্তমাখা-ছোরাখানা লুকিয়ে রাখার সময়, শব্দ শুনেও কি সেই মালিক জেগে উঠে আসামীকে হাতে-নাতে পাকড়াও করে ফেলতে পারতো না?···কি বলো দাদা···তোমার কি মনে হয়?···

মিকারের এ সব কথা শুনে আক্শ্নেনকের মনে সন্দেহ জাগলো···তার ধারনা হলো অজানা-অচেনা এই নতুন-কয়েদীটিই হয়তো সে রাতে পথের ধারের সরাইখানায় সেই নিরীহ-সদাগরের বুকে ছোরা বসিয়ে খুন করেছে!

এ সন্দেহ জাগার সঙ্গে-সঙ্গেই আক্শ্নেনকের শান্ত-মন কি যেন এক অজানা দোলায় অস্থির-চঞ্চল হয়ে উঠলো। কয়েদখানার নিরালা কোণে চুপচাপ বসে থাকা আর সম্ভব হলো না তার পক্ষে···দল ছেড়ে সেখান থেকে দূরে সরে এসে সে একা চিন্তাকুলভাবে কয়েদখানার বেড়া-ঘেরা প্রাঙ্গণে পায়চারী করতে লাগলো! বিষাদ-ব্যথার ভারে মন তার এমনই বিচলিত হয়ে উঠলো যে সারারাত চোখে ঘুম এলো না একফোঁটা!···অস্থির-মনে সারারাত যতই সে একা পায়চারী করে বেড়ায়, ততই চোখের সুমুখে কেবলই ভেসে ওঠে অতীতের কত সব হারানো-স্মৃতির ছবি! মনে পড়ে—তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে···ঘর-সংসার আর বন্ধু-বান্ধবদের কথা···অফুরন্ত শান্তি-সুখে আর হাসি-গান-আনন্দে ভরা ভ্লাদিমির-শহরের মধুর-জীবনের স্মৃতি! মনে পড়ে—সেই নীজ্-নিহির শহরের মেলায় বেশাতী বেচতে যাবার দিনটির কথা···পথের ধারে সরাই-খানায় সেই সঙ্গীন-রাত্রির স্মৃতি···অকস্মাৎ পুলিশের আবির্ভাব···জিনিষপত্র খানা-তল্লাস···রক্তমাখা-ছোরার সন্ধান···গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা-জারী···মিথ্যা-খুনের দায়ে

সরকারী-আদালতে বিচারের প্রহসন·· সুদূর সাইবেরিয়া-প্রান্তরের কয়েদখানায় দীর্ঘ নির্বাসনদণ্ড···কোথা থেকে যে দুর্ভাগ্যের দমকা-ঝড় এসে দুরন্ত-দাপটে তার সহজ-সুন্দর নিষ্পাপ-নিশ্চিন্ত-জীবনটাকে আগাগোড়া এমন ছারখার করে দিলো! নিজের এই লাঞ্ছনা-অপমান, মিথ্যা-কলঙ্ক আর শোচনীয় পরিণামের কথা ভাবতে ভাবতে মিকারের উপর ঘৃণায়-আক্রোশে আক্‌স্যেনকের মন রীতিমত তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠলো! তার দৃঢ় ধারণা হলো—এত সব দুর্ভোগের জন্য কপটাচারী মিকারই একমাত্র দায়ী! খোলাখুলি স্বীকার না করলেও, মিকারের কথাবার্তায় আর আচার-ব্যবহারে স্পষ্টই সন্দেহ হয় যে রক্তমাখা-ছোরা আর সরাইখানায় সেই নিরীহ-সদাগরকে বেঘোরে খুন করার ব্যাপারে সে বিশেষভাবে জড়িত!

এ সব কথা চিন্তা করতে করতে আক্‌স্যেনকের মন মিকারের অন্যায়-আচরণের প্রতিশোধ নেবার আক্রোশে ফুঁশে উঠলো! কিন্তু সে ক্ষণিকের আক্রোশ···পরের মুহূর্তেই আক্‌স্যেনক মনের গ্লানি দূর করবার মানসে একাগ্রভাবে ঈশ্বরের শরণাগত হলো···সারারাত সে শুধু প্রার্থনা আর ভগবানের নাম-গান করেই কাটালো···তবু তার অশান্ত-মন শান্ত হলো না···মিকারের উপর ঘৃণা-আক্রোশ ঘুচলো না এতটুকু!

ক্রমশঃ

স্যমন মাছের সন্তান পালন ও গৃহ নির্মাণ

গৌর আদক

পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রাণীই তার শিশুসন্তানকে সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এটা প্রাণীদের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। খেচর, জলচর এবং উভচর—এ সব প্রাণীর মধ্যেই এটা সমান ভাবে প্রচলন আছে। এমন কোন প্রাণী নেই এ পৃথিবীতে যে এই প্রবৃত্তির হাত থেকে বিরত আছে। তবে সব প্রাণীর সন্তানপালনের ধরণ কিন্তু এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন ধরণ।

এখানে অন্যান্য প্রাণীর কথা বাদ দিয়ে শুধু এক জলচরদের কথাই ধরা যাক। মাছ জলের প্রাণী, জলের সঙ্গে এদের নিকট সম্পর্ক। জলের গভীরতা ভেদ করে এরা দিবানিশি ঘুরে বেড়ায় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। কখন দ্রুতগতিতে, কখন বা মন্থর গতিতে, এটা মাছেদের স্বাভাবিক অবস্থার ঘটনা। কিন্তু মাছেদের সন্তান প্রসবের সময় হলেই তখন আর এরা স্বাভাবিকভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে না। তখন তাদের স্বাভাবিকভাবে ঘোরা-ফেরার গতি দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে এবং যতদিন না এদের সন্তান প্রসব হয়ে বেশ সাবলীল হয়ে ওঠে, ততদিন পর্যন্ত এরা আর স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ফিরে আসতে পারে না। অবশ্য এটা শুধু মাছেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ।

মাছেরা সন্তান প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব থেকে অন্যান্য খেচর প্রাণীর মতন গৃহ নির্মাণ করে, তার মধ্যে সন্তান প্রসব করে। এ গৃহ নির্মাণ এদের অস্থায়ী, স্থায়ী নয়। সন্তান প্রসবের পর যখন সন্তানগুলি একাকা ঘোরা-ফেরা করতে পারে তখন মাছেরা আর সেই কষ্টাশ্রিত গৃহের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না, তখন সেই গৃহটি আস্তে আস্তে জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়তে থাকে গভীর জলের মধ্যে।

মাছেদের গৃহ নির্মাণ এবং সন্তান পালন দুই-ই বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিশেষ করে পুকুরের মাছ অপেক্ষা সমুদ্রের মাছের এই দুই কাজের মধ্যে বিচিত্রতা একটু বেশি পরিমাণে অনুভূত হয়

সমুদ্রের স্যমন মাছের সন্তান-পালনটি খুবই বিচিত্র। ইহারা ক্ষীণতোয়া পার্বত্য নদীতে আসিয়া ডিম প্রসব করে। এই সকল নদীতে আসিবার সময় ইহাদিগকে অনেক বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। নদীগর্ভের খানিকটা স্থান ক্রমাগত লেজের ঝাপটায় পরিচ্ছন্ন করিয়া সেইস্থানে ইহারা ডিম প্রসব করে। স্রোতের মুখ হইতে ডিমগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আইল বাঁধিয়া দেয়।

বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল মৎস্য সমুদ্র হইতে নদীতে চলিয়া আসে এবং তথায় প্রসবের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লয়। ইহাদিগের প্রথম কাজ সেই নির্দিষ্ট স্থানের প্রস্তর বালুকা প্রভৃতি আবর্জনারাশি এক

পার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়া সেই স্থানটিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করে। কখন বা দুইটি মৎস্য পরস্পরের ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকায়। আবার কখন বা পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করে। তাহাদিগের এই কার্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় যেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়াছে।

এইরূপে স্থানটি পরিষ্কৃত হইলে আবাস নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। প্রস্তরখণ্ডগুলি উপর উপর সাজাইয়া দুই তিন ফুট উচ্চ করে। ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডগুলি সাধারণতঃ ইহারা মুখে করিয়া বহন করিয়া আনিতে পারে না। এ-ক্ষেত্রে তাহারা বেশ একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করে। তাহা হইতে ইহাদিগের বুদ্ধিরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ বেগবান স্রোতের মুখেই ইহারা বাসের উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিয়া লয়। নদীর উপরিভাগে কিছুক্ষণ সন্তরণ করিয়া একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ইহারা বাছিয়া লয়। তৎপরে ক্রমাগত ধাক্কা এবং নীচে হইতে মোচড় দিয়া সেটিকে কিছুদূর সরাইয়া আনে। পরে মৎস্য দিকটি জমির উপরে আসিলে মুখ দিয়া সমগ্র প্রস্তরখণ্ডটি উত্তমরূপে কামড়াইয়া ধরিয়া লেজটি উপর দিকে তুলিয়া ধরে। প্রস্তর ও মৎস্য উভয়ই তখন স্রোতের টানে খানিক দূরে ভাসিয়া আসে। দুই চারিবার এইরূপ করিলে প্রস্তরখণ্ড ঈপ্সিত স্থানে আসিয়া পড়ে এবং নিপুণ ইঞ্জিনিয়ারের মতই মৎস্য আপন বাসা নির্মাণ করিয়া লয়।

মনোহর মৈত্র

১। শাদা-কালো টালি সাজানোর হেঁয়ালী :

সুদর্শনবাবু সৌখিন জমিদার…সম্প্রতি দেশে নতুন ইমারৎ গড়ে তুলছেন। রাজমিস্ত্রীকে দিয়ে ঘরের মেঝেতে সুন্দর-ছাদে টালি বসানোর সময় তিনি লক্ষ্য করলেন সবশুদ্ধ ২৫খানি টালি তার প্রয়োজন। এই ২৫খানা টালির মধ্যে ১৩খানা টালি কালো রঙের আর ১২ খানা টালি শাদা-রঙের। সুদর্শনবাবুর দুর্ভাবনা হলো…কি উপায়ে নিখুঁত-পরিপাটি ছাদে চৌকোণা-ঘরের মেঝেতে বেজোর-সংখ্যার এই ২৫ খানা শাদা-কালো টালিকে মানানসইভাবে সাজিয়ে বসানো যায়। রাজমিস্ত্রী পাকা লোক…জমিদারবাবুর দুশ্চিন্তা দেখে সে বললে,—হুজুর… কোনো চিন্তা করবেন না! ধৈর্য ধরে দেখুন—কেমন সহজে কায়দা করে অন্ততঃপক্ষে ১৪ ধরণের সুন্দর-সুন্দর ছাদে ঐ ১২ খানা শাদা-রঙের আর ১৩ খানা কালো-রঙের টালি সাজিয়ে আপনার ঘরের মেঝে নিখুঁতভাবে বানিয়ে দিতে পারি!

রাজমিস্ত্রীর কথা শুনে সুদর্শনবাবু গোড়াতে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে এমন কাজ সম্ভব হতে পারে! শেষে তাঁর চোখের সামনে রাজমিস্ত্রী যখন নিপুণ-কায়দায় শাদা-কালো রঙের ২৫ খানা টালি সাজিয়ে বিভিন্ন-ছাদে ঘরের মেঝে আগাগোড়া সুসজ্জিত করে দেখালো—তখন তিনি বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তোমরা এঁকে দেখাতে পারো চৌকোণা ঘরের মেজেতে আগাগোড়া কি উপায়ে চৌদ্দ রকম ছাঁদে টালি সাজিয়ে সুদর্শনবাবুর সেই রাজমিস্ত্রী সহজেই এ সমস্যার সমাধান করেছিলো?

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। শীতে আসে…অতি মধুর
সুমিষ্ট-ব্যঞ্জনে…
উলটিয়ে দিলে তারে
সুধা ঢালে কানে।

রচনা :—দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া)
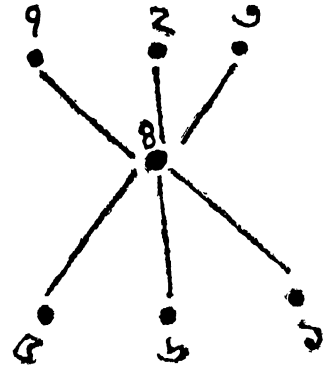
৩। ইউরোপীয়-সাহিত্যের এমন একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখকের নাম করো—যাঁর নামের প্রথম দুই অক্ষরে ভারতের এক-ধরণের প্রাচীন-মুদ্রার নাম বোঝায়…শেষের দুই অক্ষরে বোঝায় পাশ্চাত্যের সুবিখ্যাত একটি দেশের নাম এবং মাঝের দুই অক্ষরে—ভারতীয়-প্রথায় ওজনের বিশেষ এক-ধরণের হিসাবের মাপ বোঝায়। বলো দেখি—মুদ্রা, ওজন আর দেশ নিয়ে রচিত যাঁর নাম সেই সুবিখ্যাত ইউরোপীয় লেখকটি কে ?

রচনা :—কার্তিক ও ভবানী
: কাশীপুর, পঞ্চকোটরাজ, পুরুলিয়া

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর ঃ
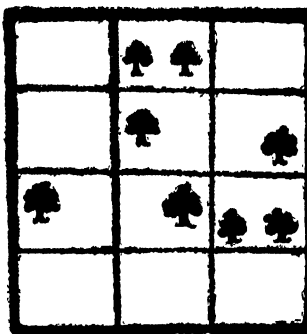
১। উপরের নক্সাটি দেখলেই বুঝতে পারবে—রতনপুর গামের বিচক্ষণ জমিদার-মশাই কি উপায়ে বাগানের বারো টুকরো জমি আর আমগাছ আটটিকে নিখুঁত-হিসাবে তাঁর চার ছেলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

২। ঘটক

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পপু ও টুটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), পতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), কলু মিত্র (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), সতোন, সঞ্জয়, মুরারী ও সুনীল (ভিলাই), শ্যামদাস রায় (বিদ্যাধরপুর), নীতা, টুটন, বোনটি, ভাইটি, রুবু, বুবু, ছবু, বুড়ি, লিপু ডলি ও বেগুনা (কলিকাতা),

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুবু ও মিহু গুপ্ত (কলিকাতা), বাপি, বুড়াম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), শর্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), পিন্টু হালদার (বালী), শুভা, সোমা, কল্পনা ও অরিন্দম বড়ুয়া (কলিকাতা), সুনীরা ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ),

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (নওয়াদা), সন্দেশ ও সুশীল আলিপুর), ইন্দ্র দাস (কটক),

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

স্থানাভাববশতঃ এবং বিলম্বে উত্তর পাবার ফলে গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'কিশোর-জগতের' যে সব সভ্য-

সভ্যাদের নাম প্রকাশিত করা সম্ভব হয়নি, নিম্নে তাদের তালিকা দেওয়া হলো :—

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

চৈতালী ও মিঠু বসু (কলিকাতা), খুকু, জলি, ডলি, মাণিক, পিটু, রুমা, তোতন, খোকন ও মৌ (সম্বলপুর), প্রভাত মোদক (বাঁশবেড়িয়া), আলো, তুফান, চাইনা, মালা, পলা, সোমা, সীমা, শম্পা ও মিঠু (রৌরকেল্লা), ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাঁশবেড়িয়া), উমা ও আশীষ মুখোপাধ্যায় (খাদাহাটী), সন্ত মন্ত, কান্ত ও বনানী সিংহ (গয়া), উমা বসু (খারারিয়া), নবকুমার শাসমল (চেতুয়া রাজনগর), শিবরাম ও শশাঙ্কশেখর মিশ্র (কইনান), অলককুমার কণ্ডু, বাণী, শুভ ও পার্থ হাজরা (খাড়ুই শাকনাড়া), কার্তিক ও ভবানী (কাশীপুর), বাবলু ও বাদল ভট্টাচার্য্য (কুমারডুবি), অণিমা, কণিকা, কৃষ্ণা ও নিরুপমা (রুক্মা), জগৎ, নিমাই, নিতাই, শঙ্করী ও প্রতিমা নন্দী (চকছাপি), পরেশনাথ ও তুষারকান্তি দে (শালকিয়া), দীলিপকুমার, দীপিকা, পঙ্কজ, ভানু, বুলু ও অঞ্জু দত্ত (দেবালয়), সুশীলকুমার অধিকারী, বিমল, বিপুল, শরৎ, হরেন, পরিমল, শিশির ও কমল (পতিগ্রাম), বিদু, অমিয়, তপন মান্না, কালিপদ দাস, দিলীপ, বিনয়কুমার, বিনয়কৃষ্ণ, নিশীথ, কমল, বীরেন, বিনন্দ ও বাবলু মান্না (পারুলদা), মমতা চক্রবর্ত্তী ও শালটু ভট্টাচার্য্য (দুবড়ী), একলব্য, সুভাষ মণ্ডল, দেবরঞ্জন বসুমল্লিক, হরেকৃষ্ণ, সাধন ও ছন্দা (বেলুড়), সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা, নারাণচন্দ্র ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর), দীলিপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া), হাবু, বাবু, শামু, মামণি ও চম্পা (কলিকাতা), অরুণচন্দ্র ও মীনা সরকার (কালাইন), প্রদ্যোত, ঝুমকোলতা, বকুলদা, রত্না, গৌতম (দলমোর), রেখা, জ্যোতিপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ (যশপুরনগর), দেবাশিস ও সুবল সেন (অভিরামপুর), টুকাই, কচো ও বাচ্চু চট্টোপাধ্যায় (আগড়পাড়া)।

কার্ত্তিক মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

তারকনাথ নন্দন (বাঁশবেড়িয়া), তারাশঙ্কর ও প্রভাত রঞ্জন ঘোষ (কামারপুকুর), শৈলেন সাধু (আসানসোল), রাণু, বুলু ও তুষার দত্ত (কলিকাতা), বু ও বালু মিত্র (গুড়াপ), অরাগময়, সিপ্রাধারা, ধীরাগময় ও মণিমালা হাজরা (বড়বড়িয়া), সুভাষ ও চিত্তরঞ্জন দত্ত, প্রিয়কুমার ও ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়, দীলিপকুমার ঘটক, হারাধন ঘোষ বিশ্বাস, মণিমোহন সিংহরায়, মলয় মল্লিক, রূপেন চট্টোপাধ্যায়, অসীম হালদার ও সৌরীশ দে (বৰ্দ্ধমান), সঞ্জয় রায় (নিউ বারাকপুর), প্রবীরগোপাল ও প্রদীপগোপাল মুখোপাধ্যায় (শিবপুর), মা, মামু, দিদিভাই, দাদাভাই, মন্টু, সন্ত ও আমি (নওয়াপাড়া), বারীন্দ্র ও দিলীপকুমার সিংহরায় (গোবিন্দপুর)।

কার্ত্তিকমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

শাশ্বত ও শর্ম্মিলা গোস্বামী (যাদবপুর), বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (নওয়াদা)।

আমাদের দেশের পুরাণ-কাহিনী থেকেও প্রমাণ মেলে যে অতি-প্রাচীন কালেও ভারতের কুশলী-সৌখিন অধিবাসীদের মধ্যে বিচিত্র-ধরণের পাতার-তৈরী অভিনব ঘুড়ি ওড়ানোর খুবই রেওয়াজ ছিল। এমন কি, এই ঘুড়ি-ওড়ানোর ব্যাপারে সেকালে তীব্র-প্রতিদ্বন্দ্বীতা, রেশারেশি, ক্রীড়া-প্রতিযোগীতা, বাজী-রাখা প্রভৃতিরও প্রচুর নজীর-সন্ধান পাওয়া যায় অতীতের ঐতিহাসিক পুঁথি-পত্রে। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে অধুনাবধি ঘুড়ি-ওড়ানোর সখ রীতিমতই সুপ্রচলিত রয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে।

প্রতীচ্যের আধুনিক গবেষক-পন্ডিতেরা অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন যে খৃষ্ট-জন্মের প্রায় চারশো বছর আগে গ্রীসদেশের 'টারেন্টাম্' (TARENTUM) অঞ্চলের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক 'আর্কাইটাস্' (ARCHYTAS) অভিনব উপায়ে কাঠের তৈরী এক বিচিত্র-ছাঁদের 'পায়রা-ঘুড়ি' (WOODEN PIGEON) নির্ম্মাণ [illegible] সেকালের সেই বিচিত্র

'পায়রা-ঘুড়িটিকে নাকি আশ্চর্য্য কৌশলে অনায়াসেই আকাশে ওড়ানো যেতো দিব্যি সহজ-স্বচ্ছন্দ্য-গতিতে। এ সব ছাড়াও প্রাচীন যুগে ঘুড়ি-ওড়ানোর কৌশলের আরো বহু তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়।

অপরাধ কিনা গোয়ালঘর তোলার সময় বাধা দিতে গেলে যোগীবরের দিদি মালিনীর মাথায় কোদালের এক কোপ বসিয়ে দিয়েছে।

মামলার পরামর্শ দিতে মাতব্বর অভিমন্যু অদ্বিতীয়। মালিনী একে মেয়েছেলে—তার উপর মাথায় মারাত্মক জখম। এ-মামলার জিত নির্ঘাৎ।

সজ্ঞানে স্বহস্তে যোগীবর দিদির মাথায় বেশ বড় রকমের ক্ষত করে ফেলল। মোটা সেলামীর বিনিময়ে ডাক্তারী সার্টিফিকেটও সংগ্রহ হল।···অতঃপর মামলার আর বাকী রইল কী? যোগীদেরই হার হল শেষ পর্য্যন্ত।

প্রত্যক্ষদর্শী'র প্রমাণ কোথায়?···কে দেখেছে?··· বিপক্ষের জেরায় পড়ে যোগীবরের দিদির মাথার ঘায়ে ব্যথা বেড়ে গেল বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী'রূপে কোন সাক্ষীকেই টেকান গেল না।

··· ··· ···

এক একটা মামলার দিন আসত···আর মনে মনে হরির লুটের মানত করত উভয় পক্ষ। সেই হরিরলুটের পালা পড়ে গেল নিত্যানন্দদের ভাগে। ফৌজদারী মামলায় তাদের জিত হয়েছে। নিত্যানন্দের কাকিমা পাশের বাড়ীর পচার-মার সঙ্গে সেই হরিরলুটের দিন তারিখ ঠিক করে সবেমাত্র উঠি-উঠি করছে, এমন সময় ও উঠানের বুঁচি এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলে,··· জ্যেঠিমা, লেঠেলে যে যোগীবরদের ঘর-বাড়ী ভরে গেছে। জ্যাঠামশাইকে নাকি মাইর‍্যা ফেলবে ওরা···কি সব কইছে গো।'

'অ্যাঁ, কি বললি? তোর জ্যাঠামশাই আবার কি করল! এই ত মানুষটা খেয়ে বের হয়ে গেল।'

তিনি পচার মাকে ডেকে বললেন, 'হ্যারে পচার-মা, তোর সঙ্গে দেখা হয়নি ছোট কর্ত্তার! তুই কি কোন ঝগড়া-ঝাটি করতে দেখলি কারুর সঙ্গে!'

একটা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ কানে আসতে লাগল যেন ওদেরও। পচার-মা একটু চিন্তিত হয়ে বলে উঠল, কই না ত? তবে হ, আমি যোগীবরের ছোটভাই হরিবরকে ভাখলাম ছুটে চলছে পচ্ছিম পাড়ার দিকে। আমি অত গ্রাহ্যি করি নাই। ভালও লাগে না দিনরাত অত বজ্জাতি।'

এদিকে নিত্যানন্দের তিন ভা'য়ের একজনও বাড়ীতে নেই। কাকে দিয়ে তিনি কি খবর নেন। তিনিও মহা-ভাবনায় পড়লেন। বললেন, কি হবে ভাই পচার-মা! একটা মামলায় জিত হয়েছে বটে, তা তুই ত জানিস এখনও সত্বের মামলা চলছে·· এর মধ্যে আবার কোন বিপদ গো?

বুঁচি আবার চেঁচাতে আরম্ভ করল। 'হুই ছাখ জ্যেঠিমা—হুই ছাখ। তোমাদের দলের লেঠেলরাও যে এদিকে আসছে গো···কি হবে গো জ্যেঠিমা, কি হবে!'

প্রমাদ গুণল পচার-মা, বলল, 'না, তোমাগো জ্বালাতনে যে এ গেরামে বাস করাও দায় হইয়া ওঠছে। দুদিনও নিচ্চিন্দি থাকবার জো নাই। আমি ত ভাবছি ওনাকে কয়ে ছেলেমাইয়া নিয়া এ গেরাম ছাড়ে'···বলতে না বলতেই ফণী সর্দ্দার ছুটে এসে নিত্যানন্দের কাকার নাম ধরে 'রবিদা ···রবিদা কোথায়—বলে হাঁকডাক সুরু করল। নিত্যা-নন্দের কাকিমা—বাড়ী নেই—বলামাত্র দ্বিতীয় কথা শোনার অপেক্ষা না রেখে—'এলেই পাঠিয়ে দিও যোগীবরদের—ওখানে' বলে ছুটে গেল। এদিকে যোগীবরের বিধবা বোন মালিনী ত মহা সোরগোল, ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে···আটকুঁড়ের ব্যাটা আমার ভাইরে এভাবে মাইর‍্যা ফেলতি চাইছে রে···ওরে তোরা সব দেইখ্যা যারে। ওর তেরাত্তি পোহাবে না···ওর বৌ'র হাতের নোয়া, সিঁতার সিঁদুর মুছে যাবে।···তোরা থাকতি আমার ভাইগে এই গতিরে। ওরে আমার কপাল রে···বলে এমন চিৎকার সুরু করেছে যে কারণটি জানার পুর্ব্বেই সহানুভূতিতে লোকের মন ভরে গেছে।

সকলের মুখে এক কথা—'খুনি, খুনির বিচার চাই··· শাস্তি চাই। তাইত লেঠেল এসে গেছে! ওপক্ষেরও লেঠেলের অভাব হয়নি। কিন্তু মধ্যপাড়ার পঞ্চুঠাকুর ব্যাপারটা যেন খানিকটা আঁচ করতে পেরে রোজা আদিলদ্দি মোল্লাকে ডেকে পাঠাল ঝাড়-ফুঁকের জন্য।

ভীষণ ভীড়!

মহা হৈ হৈ রৈ রৈ।

ভীড় ঠেলে কিনু সরদার পঞ্চুঠাকুরের অনুমতি চাইল। 'অনুমতি করে ত সে এখনই রব্যার মাথাডা আইনে তার পায়ের কাছে রাখতি পারে।'

তদুত্তরে পঞ্চুঠাকুর তার কানে কানে কি কথা বলায়

হন্তদন্ত হয়ে সে তার লেঠেলদের পাছে ছুটে গেল। তারপর পঞ্চুঠাকুর জনতার দিকে মারমুখো হয়ে ধমকে উঠলেন,—'তোরা একটু চুপ কর দেখি। জীবন নিয়ে ত খেলা করা যায় না, আগে তার ব্যবস্থা, তারপর অন্য সব।

কাজির ব্যাটা আদিলদ্দি মোল্লা ঐ পথ দিয়েই চলেছিল কি কাজে। পথ থেকেই ধরে আনা হল তাকে।

'এই যে চাচা এসে পড়েছ দেখছি'—বলেই সকলকে সরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি সব কথা পঞ্চুঠাকুর কাজির ব্যাটাকে বলল।

কেমন থমথমে ভাব। কাজির ব্যাটাও সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে কাজি যোগীবরের দু'পা বেয়ে তাজা রক্ত গড়াতে দেখে তাজ্জব! একটা আশঙ্কামিশ্রিত ঔৎসুক্যের সহিত রোজার দৃষ্টিতে সে যোগীবরকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমন একটা ভাব দেখাল যেন এক্ষুণি যোগীবরের মৃত্যু অবধারিত। তাই না দেখে মালিনী তার সাঙ্গপাঙ্গ বুঁচি খেঁদির সঙ্গে একত্রে মরাকান্না জুড়ে দিল···'ওরে আমার ভাইরে··· তোর কি হলরে···তোর বুঁচি খেঁদির কি হলরে? আমাগো কার কাছে থুইয়া গেলিরে···রে। ওরে আমার কপালরে···।'

উপস্থিত সকলে হতবাক্। উচ্চরোলে বার বার তারা কাজিকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তুলল। কেমন দেখলে! বাঁচার আশা আছে ত?

পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'এমন শত্রুতা করলি কি আর এক গাঁয়ে বাস করা চলে? বেটাচ্ছেলে ভাবছে কি? এডা কি মগের মুল্লুক!' হরিবর কথাটা লুফে নিয়ে বলল, 'এডা যে মগের মুল্লুক নয় তাইত সে কিনু সরদারের দলকে ডেকেছে এর একটা উচিত জবাব দেওয়ার জন্য।'

'এতক্ষণে দেয়া হয়েও যেত' বলল কিনু সরদার স্বয়ং। কিন্তু কাজির ব্যাটা যখন এসে গেছে তখন তার শেষ রায়টা জেনে নিতে কতক্ষণ।'

কাজির ব্যাটা মোল্লাসাব গম্ভীর চালে তার শাস্ত্রে অর্থাৎ রোজা শাস্ত্রে এবং রোগের সিমটমে মিল খুঁজতে লাগল মাথাটা ঈষৎ দুলিয়ে দুলিয়ে। সেই মত বিহিত করতে হবে যে। যা তা একটা করলে ত হবেনা। বেড়ে রোগের বেড়ে [illegible]।

আকাশচুম্বি হট্টগোল, হৈ-চৈ তার কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম। কাজির ব্যাটা কিন্তু মূর্ত্তিমান ধৈর্য্যের প্রতীক! কোনদিকের কোন কথা তার কানে পৌঁছয় না। সে শুধু একবার রোগীর দিকে, আর একবার জনতার দিকে তাকাচ্ছে। বাক্‌শক্তিও রহিত।

সমস্বরে সকলে বলে উঠল, "এইবার—এইবার নিশ্চয়ই কাজির কারসাজি—অর্থাৎ ঝাঁড়ফিকির আরম্ভ হল বলে। জনতা একটু সরে সরে দাঁড়াল—পাছে ঐ রোগ তাদের কারো উপর কাজির ব্যাটা চালান করে দেয় তার মন্ত্রতন্ত্র বলে। তারা ভয়ে ভয়ে রামনাম জপতে লাগল মনে মনে।

"ঐ ত রোজা বিড়বিড় করে কি বলছে যেন। কিন্তু কই, সরিষা, আগুন···পাটখড়ি কিছুই ত কাজির ব্যাটা চাইছে না। এটা আবিষ্কার করল স্বয়ং যোগীবরের বৌ। আগুন জ্বালিয়ে সরিষা পোড়া না দিলে শুধু মন্ত্রের বলে ঐ দোষ কাটে নাকি? তাই ত সে আগেভাগেই রেকাবি করে কিছু শ্বেত সরিষা, ম্যাচ বাতি ও কিছু পাটখড়ি এনে রেখেছে।

শুধু মাত্র রোজার হুকুমের অপেক্ষা। স্বামী তার কত কষ্ট সইবে। সত্বর একটা বিহিত প্রয়োজন। কাজির হুকুমের অপেক্ষা না করেই সে তার ছেলে জ্যাকে ডেকে বলল, 'এইসব জিনিষগুলো দিয়ে আয় ত বাবা মোল্লারপোর কাছে। একটু জলদি জলদি যা হয় একটা কিছু করতি। মানুষটা কি বেঘাটায় মারা পড়বে নাকি? দেখছিস না চোখ-মুখের অবস্থা কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গেছে।'

ফেলু খুড়ো একটু অধৈর্য্য হয়ে বলে ফেললেন,—ব্যাপারডা কিন্তু আমার ভাল মনে হচ্ছে না বৌ। তোমরা বরং গোপাল ফকিরকে ডাকলি পারত্যা। রোজা সাব যে রকম বোজা হয়ে গেছে আর ত দেরী করা আমি ভাল মনে করিনা। কিসের ত্যা কি হয়ে যায়। তখনও 'আক্কেল সেলামী তোমাগেই দিতি হবে।'

রাম কেষ্ট—কাছেই দাঁড়িয়েছিল—কথাটা টেনে নিয়ে বলল, 'তা যা বলেছ খুড়ো, তহন কিন্তু বলতি পারবা না, তোমরা এতো নোক থাকতি—এট্টা সৎ পরামর্শ কেউ দিলে না।'

"এদিকে কাজিসাবকে হঠাৎ এক ক্ষ্যাপামীতে পেয়ে বসেছে,—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে যোগীবরকে।"

"আচ্ছা যোগী, তুমি একটা খাঁটি সত্যি কথা কও ত বাবা, তুমি যে জমিতে কচুড়ী মারতে নামছিলা কত পর্য্যন্ত জল ছিল সে ভুঁইতে ?"

যোগীবর আনুপূর্বিক সব ঘটনা বলে যেতে লাগল। সে সকালে পান্তা খেয়ে বিলের জমিতে কচুড়ি মারতে গিয়েছিল। কোমর পর্য্যন্ত জল ছিল সেজমিতে—বলেই কেমন অস্থির হয়ে মোল্লার পো···গো···উঃ···করে উঠল।

কাজির ব্যাটা বাধা দিয়ে বলল, "কি পরে জমিতে নামছিলা তুমি ?"

যোগীবর বলল, "গামছা পরে গো' বলতে বলতে ওর গলার স্বর কেমন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'য়ে এলো।

আবার প্রশ্ন,—'কতক্ষণ ছিলা ?"

যোগীবর বলল, 'ঘণ্টা দুই আড়াই।' যোগীবর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

অর্ধপথে বাধা দিয়ে কাজির ব্যাটা বলল, উঠেই বা কি দেখলে ?

"আমি তেমন কিছু দেখি নাই" কেমন বেহুসের মত বলে যোগী এবং আসতি-আসতি কেমন লাগছিল আমার, অত খেয়াল ও করেনি। বাড়ী আইস্যা পরণের গামছা ধুইয়ে কাপড় পরার পর দেখতি পাই আমার দু ঠ্যাং বাইয়া রক্ত পড়তিছে।"—বলেই যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করে।

এবার একেবারে মোক্ষম প্রশ্ন করে বসল রোজাসাব—মাথাটা ঈষৎ দুলিয়ে দুলিয়ে।

'তোমার আশে পাশের ভুঁইতি কারা ছেল বাবা যোগী ?'

নিতাইয়ের কাকা রবি গো'—বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল যোগীবর ও তৎসহ তার দিদি মালিনী।

সকলে কানখাড়া করে শুনছে সব। আর মনে মনে প্রমাদ গুণছে।

কাজির ব্যাটা বলল,—'রবি মাষ্টার হুঁ! তোমাদের সাথে না ওদের মামলা মোকদ্দমা চলছে।······হুঁ!'

'কিনু সরদার কাজির রায়ের অপেক্ষায় ছিল। এতক্ষণে তার রক্ত টগবগিয়ে উঠল: লেঠেল হলেও তার একটা ধর্ম আছে। কাজিসাব যখন রবি মাষ্টারের নাম করেছে তখন ওরই কাজ। ঐ রবিই বাণ মেরেছে যোগীকে। সহসা জনতাকে ঠেলে কাজিসাবের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিনু সরদার বলল,—'তাহলি মোল্লার পো রব্যার মাথাডা আনতি পারি। যাই আমার লেঠেলদের হুকুম দেই !!'

জনতার মধ্যেও একটা চাপা গুঞ্জরণ শোনা গেল। না জানি কি লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাবে—খুন-জখম, রক্তারক্তি! নিত্যানন্দদের দলের ভেনী সরদারও কথাটা শুনে এক ঝাঁকানি দিয়ে ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে দুহাত চালিয়ে প্রস্তুত। লেঠেলদেরও ইঙ্গিতে আদেশ করল। কিন্তু কাজিসাব রোষবহ্নি তুলতেই সকলে একটু থামল।

এবার সত্যি সত্যি কাজিসাব দেশলাই থেকে একটি কাঠি বের করে পাটখড়ি হাতে করল। রেকাবী হাতে এক মুঠো শ্বেত সরিষাও মুঠো করে ধরল। মুহূর্ত্তে কাজি-সাবের চেহারা ভয়ঙ্কর রূপ নিল। বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

বিক্ষুব্ধ জনতা চুপ হয়ে এতক্ষণে একটু সরে সরে দাঁড়াল। যোগীবরও কেমন নিস্প্রাণতা কাটিয়ে প্রাণ পাচ্ছে। সে উঠে বসতে চেষ্টা করল।

পুনরায় রোজা আদিলদ্দি মোল্লা বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে চতুর্দিক তাকাতে লাগল। হঠাৎ একস্থানে তার দৃষ্টি পড়তেই যোগীবরের দিদি মালিনীকে ডেকে রোজাসাব আদেশ করল—'যোগীবর যে গামছাখানা পরে বিলে গেছিল দাও ত মা।'

—তক্তপোষের তলা থেকে দলা পাকানো গামছাখানা এনে যেইমাত্র মালিনী রোজার সামনে রাখল—জনতা দ্রুত পিছু হটে উচ্চস্বরে রামনাম জপতে লাগল।

রোজাসাব এবার মালিনীকে কিছুটা নুন আনার জন্য আদেশ করল। গামছাখানিতে তখনও তাজা রক্তের দাগ। সেই রক্তে মালিনীর দুহাত রক্তমাখা হয়ে গেছে। সে দৃশ্যে আবার লেঠেলদের মস্তিষ্কে খুন চাপল রক্তের নেশায়।

"খুনের বদলে খুন! ন্যায্য দাবী! ন্যায় বিচার। লেঠেলি পেশা!" বলে চেঁচাতে লাগল কিনু সরদার।

কিছুক্ষণ বাদেই মালিনী একমুঠো নুন নিয়ে হাজির! রোজাসাব তখন গামছাখানা জোরে এক ঝাড়া দিতেই ইয়ে প্রকাণ্ড এক রক্তখেকো জোঁক মাটিতে পড়ল। কাজিসাব অগত্যা নুন মুঠো মন্ত্র পড়ে জোঁকের মুখে দিতেই সে একটু নড়েচড়ে ধনু:কর মত বেঁকে গেল।

এদিকে নিত্যানন্দদের টিনের ও খড়ের চালা ভেদ করে কতিপয় সড়্‌কি উর্দ্ধদিকে খাড়া হয়ে পুঁতে গেছে।

প্যাট ও প্যাঠ

শ্রী'শ'—

বিলাতের চিত্রজগতে চিত্র প্রযোজক

শ্রীউমেশ মল্লিক (লণ্ডন)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দেখতে দেখতে দিন কাটতে লাগলো প্রায় ৬।৭ মাস। তবকে তবকে মাসে আসতে লাগলো ৫০০। ৬০০ টাকা বাড়ী থেকে। আসলে কিছু হচ্ছে না। দমে গেল মনটা। কৃষ্ণমেননের কাছে শেষ বারের মত হানা দিলাম। লোকে যাই বলুক'—কৃষ্ণ মেননের কাছে আমার অবারিত যাতায়াত ছিল। বললে একদিন "দাঁড়াও আমার মনে পড়ে গেছে একজন পুরাণ বন্ধুর কথা London school of Economics এর Sidney cole বলে একজন ক্লাস ফ্রেণ্ডের কথা। সে bilur এ কি করে যেন।"

বলতে বলতে টেলিফোন তুলতেই ইলিং ষ্টুডিওতে Cole মশাই এর পাত্তা পাওয়া গেল। দেখা করবার বন্দোবস্ত হ'লো কৃষ্ণমেননের আলাপ আলোচনায়। Cole একজন অতি নামকরা পরিচালক—প্রযোজক এবং চিত্র সম্পাদক। তার ছবি হ'লো "স্যাস্‌লাই" "স্কট্‌ অব্‌ দি এণ্টারটিক" ইত্যাদি বহু ছবি তার করা। দেখা তার সঙ্গে হতেই বললেন—২।৩ সপ্তাহ ইলিং ষ্টুডিওতে এসো তার পর কলকাতায় ফিরে যাও। মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। মুঠো মুঠো বাবার টাকা খরচ করে বাড়ী চলে যেতে হবে এতে দুঃখ রাখবার ঠাই থাকবে না। শিখিয়ে দিলে যে ঐ দেশে এ বিষয়ে টিকে থাকতে গেলে কাউকে যেন ঘৃণাক্ষরে আমি না বলি আমার আসল উদ্দেশ্য। কারণ এ দেশের লোক কোন বিদেশীকে এ দেশে থাকতে বা কোন প্রকার সুযোগ করে নিতে দেখতে চায়না—পয়সা রোজগার করা তো দূরের কথা। বললেন তিনি আমায়, পরে—সুযোগ কোথায় পেতে পারি তা তিনি জানাবেন।' বিশেষ করে Sidnny Cole তখন এই সিনেমা জগতের union এর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। ইচ্ছে একটু করলেই তার পক্ষে আমাকে Union এ ঢোকাতে কোন প্রকার অসুবিধা ছিল না। আইন তাঁরা করেছেন। তা তাঁরাই ভাঙ্গতে রাজী নন। ভদ্র লোক নানান বিষয়ে প্রায় ১০।১৫ বার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন আমার, কিন্তু কোন দিনই তার আইন ভঙ্গ করেন নি union ব্যাপারে। যা হোক মাস কেটে গেল, কোন সাড়া শব্দ নেই। দেখা হয়ে গেল ঘটনা চক্রে একজন জগৎবিখ্যাত চিত্র-পরিচালক এর সঙ্গে, নাম Thorold Dickinson সম্প্রতি কলকাতা থেকে ফিরেছেন। এঁর নাম করা ছবি "স্যাস্‌লাইট্‌ মেন্‌ অব টু ওয়ার্লর্ডস্‌"। Cole এর ইনি বন্ধু। এঁকে গিয়ে ধরতেই এঁর সাহায্যে আর্থার ব্যাঙ্কের তখনকার সব থেকে মাথাওয়ালা লোক Earl st john এর দয়ায় প্রথম ডেন্‌হওস ষ্টুডিওতে ঢোকবার সুযোগ হ'লো। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, সম্পূর্ণ আলাদা রাজ্য।

এখানে সত্যি দেখা হ'লো যা আশা করেছিলাম Sri Lawrenc oliver Tean sinnprs, stewart granger dian a dors, anna nigle প্রভৃতি সকলেরই সঙ্গে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ছবিতে কাজ করছেন। এক একটা Devwan studos সেটএ—(এখানে বলা হয় stage) এক একটা ছবি হচ্ছে এক সঙ্গে প্রায় ৭টা। অদ্ভুত কাজ করবার ক্ষমতা। অভাবনীয় গোছান ব্যবস্থা। বছরের কোন দিন কোন্ সেটএ কোন্ ছবি হবে, কে কে চিত্র তারকা কোন্ কোন দিন আসবে, সে দিনে এমন কি Hair dresser কে কে আসবে এ সমস্ত Krodrelion Office এ 'লেখা পড়া খুঁটিয়ে কাজের

মুক্তি প্রতীক্ষিত "তাহলে" চিত্রে

পাহাড়ী সান্যাল

বন্দোবস্ত যা আছে নিজে চোখে না দেখলে বুঝানো যাবে না।

আসে চিত্রতারক প্রত্যেকে সেই সকাল ৮টায়। স্টুডিওতে হাজিরা দিতে হয় এত সকালে।

স্টুডিওগুলো প্রায়ই সব লণ্ডনের বাইরে। বেশ দূরে। সুতরাং হাজিরা ৮টায় দিতে হ'লে উঠতে হয় সেই সকাল পাঁচটায়। তারপরে বাসে ট্রেনে সেই হাড়-কাঁপান শীতের মধ্যে ছুটতে হয় সময় মত স্টুডিওতে পৌছাতে গেলে। পৌছে যার যার কাজ সব ঘড়ি ধরে নিজের বিভাগে চলে যায়। Make up প্রভৃতি করে যখন সেটে এসে পৌছায় সব তখন বেলা দশটা। ধীরে তালে পরিচালক মত সেই হিসাবে কাজ চলে। ছবির ফুটেজের সাধারণতঃ এখানে ৭০ মিনিট থেকে ১০০ মিনিটের ছবি হয়ে থাকে। এর মধ্যে রোজ সাধারণতঃ এই দীর্ঘতার ৭ মিনিট থেকে ৯ মিনিটের কাজ হ'লো স্ট্যানডার্ড। রোজকার কাজ হয়েছে বলে প্রযোজক সন্তুষ্ট হন। ছবির রাজ্যে দেখলাম সব সাম্যবাদ। সবাই সবাইএর নাম ধরে ডাকে।

আমার নাম নিয়ে Denham studioতে বেশ একটা যেন রসিকতা শুরু হ'লো। প্রত্যেকে ইংরাজী উচ্চারণ ও—মেন্ বলে শুরু করলো। বেলা ৯টায় পৌছিয়ে যখন স্টুডিওতে পৌছতাম তখন ফটকের দরওয়ান থেকে সকলে
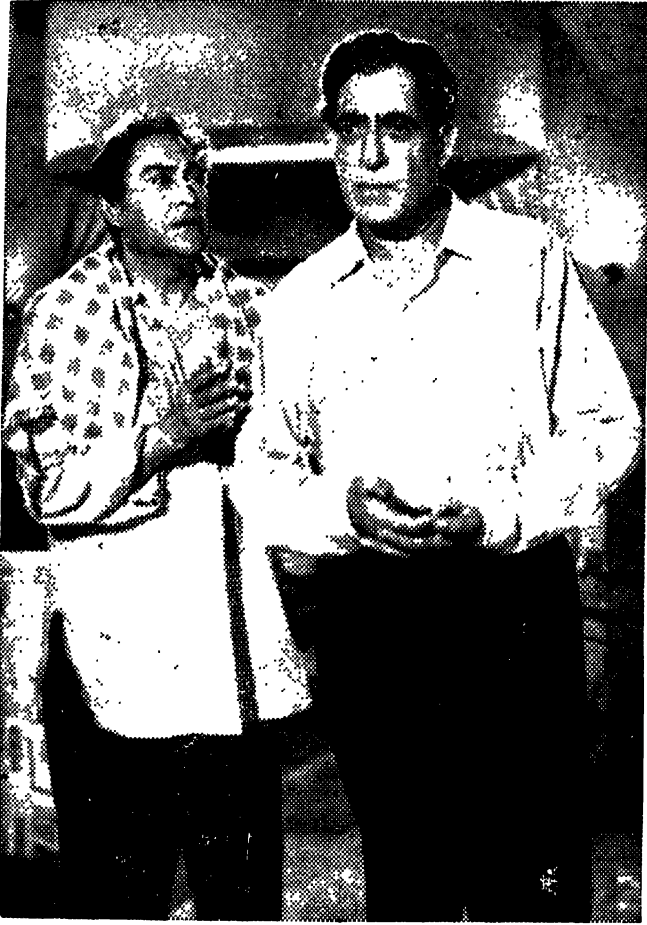
'যেতনা দুর ওতনা পাশ' চিত্রে

কে, এল সিং ও অশোককুমার

একবার চোখ পাকিয়ে দেখতো সব। কেউবা বলতো ঠাট্টা করে Good afternoon. নিয়ম এদেশে একবার ওপর-ওয়ালা যখন অনুমতি দিয়েছে তখন সেই অনুমতিকে শ্রদ্ধা করবার জন্য সে যেই হউক সকলে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। ফটকের দরওয়ান bow করে নমস্কার করা থেকে স্টুডিওর রেঁস্তরায় প্রযোজকদের খাবার টেবলে পর্যন্ত। রাজার হালে পাচজনের আদর সম্মান নিয়ে কাজ শিখতে লাগলাম। দেখলাম ২।৪ জন ইংরেজ ছেলে আমাকে দেখলেই চোখ ঠাওরে দেখছে। বুঝতে পারলাম না। মনে মনে ভয় হ'লেও নিজের গাম্ভীর্য্য রেখে আসা-যাওয়া করতে লাগলাম। বিলাতী রীতি হ'লো সব সময়ে নিজের পদ-মর্য্যাদা রেখে চলাফেরা করা। সম্মান এতে এখানকার লোকে তা করবে এমন কি আজকালকার দিনেও "মাননীয় মহাশয়" বলে সম্বোধনও করবে। সুতরাং কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করে রোজই আসি। বিরাট বিরাট সেট্। স-রা সহরটা যেন সেটের মধ্যে তৈরী হয়ে গেল। ধন্য Art department। এটা না করলে উপায় নেই কেননা এ দেশের জল বায়ু এত অনিশ্চিত যে বলবার কথা নয়। কবে যে বরফ পড়তে শুরু হবে কে জানে! সুতরাং ঘর-বাড়ী পাহাড় পুকুর সব এই সেটের মধ্যে হয়ে থাকে। আমি একটা ছবির কাজ শিখছিলাম যেখানে সারা রিওডিজেনার এক অংশ সহরটা সেটের মধ্যে হয়ে গেল যেন।

যা হোক হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম Unionএর পাণ্ডা এসে দাঁড়িয়ে আছে। অতি মোলায়েম-ভাবে আমায় এই স্টুডিওতে আসবার যে অনুমতি কে

দিয়েছে ইত্যাদি নানান প্রশ্ন করতে লাগলো। উত্তর পেয়ে তারা চলে গেল বেশ ভদ্রভাবে। ডাক পড়লো তারপর স্টুডিওর Managerএর Officeএ আমার। জানিয়ে দিল মালিক অনুমতি দিলেও স্টুডিওর Unionএর অনুমতি নেওয়া দরকার। সুতরাং Unionএর লোকদের কাছে গিয়ে বললাম যে পরের সপ্তাহে আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। কিছু বললো না তারা। পরের সপ্তাহে আবার বললাম পরের সপ্তাহ। এ ভাবে লুকোচুরি চললো Unionর পাণ্ডাদের সঙ্গে। একদিন এমন সময় এলো যখন তারা যেন আমার অস্তিত্ব সরকারী ভাবে আছে বলে স্বীকার করলো না। ততদিনে Unionএর পাণ্ডাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্টতা জমে গেছে। আর কোন প্রকার উপদ্রব তারা করতে লাগলো না। দেখলেই বলতো তোমার কলকাতা যাবার জাহাজের টিকিট না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করবো না বাড়ী যাওয়া সম্পর্কে তোমার। আগেই বলেছি যে এ দেশের Studioগুলো সহর থেকে দূরে।

গাড়ী ভাড়া দিয়ে সেখানে পরিচালক এবং প্রযোজকদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে গেলে নিজের সম্মান বজায় রেখে অর্থাৎ তাদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে luncheon খেয়ে বা চা ইত্যাদিতে যোগদান করতে খরচ পড়ে সাধারণতঃ রোজ কম করে ১৫৷২০ টাকা। ১০৷১২৲ টাকা lunchএর দাম বড় বড় studioর রেস্তঁরাতে।

কলকাতায় আগে ছিল যেখানে প্রডাকসন্ কোম্পানী খাওয়ার খরচ দিত Unitএর। মনে পড়ে মুষ্টীযোদ্ধা রবীন সরকার এক একদিনে প্রায় ৩০৷৪০ টাকা রুটী লুচি কলকাতায় ভারতলক্ষ্মী studioতে শ্রীঅর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জীর "পূর্বেরালে"র Unit খেয়ে সোরগোল বাধিয়ে দেওয়ার কথা। আমরা একসঙ্গে সহকারী ছিলাম বিনা বেতনে। বিলাতে এ রকম Unitএর খাওয়ার খরচ দেয় না Locationএর কাজের জন্য বাইরে বা বিদেশে গেলে ছাড়া। তার জন্য Unionএর একটা rate বাঁধা আছে প্রত্যেকের মাথা পিছু। যাহোক বিলাতে এই রোজ ১০৷১৫ টাকা খরচ ছাড়া ঘর ভাড়া প্রায় কমপক্ষে ৩০৷৩৫ টাকা সপ্তাহে সপ্তাহে দিয়ে কাজ শিখতে পয়সা লাগে যা, তা অভাবনীয়। তবে অবশ্য Studioতে feature filmএর কাজ শেখবার সুযোগ করে নেওয়া এক রকম অসম্ভব। আমি বছর বছর কোন রকমে লুকিয়ে চুরি করে প্রায় ১২টি ছবির সঙ্গে কাজ শিখেছি। একদিন হুকুম হ'লো আমাকে আর ডেন্হাম Studi এ কাজ শেখবার অনুমতি দেওয়া হবে না। আবার মাথাওয়ালা Rankএর প্রতিষ্ঠানের Earl Sr Sohকে দিয়ে ধরলাম। সে হাসিমুখে বললো "তোমার মনে হয় না কি যে তুমি অনেকদিন এ স্টুডিওতে আছ ?"

বুঝতে বাকী রইলো না যে তার কথাবার্ত্তায় কোথায় যেন একটু মৃদু আপত্তির সুর বেজে উঠেছে। সুতরাং সসম্মানে ডেন্হাম Studio থেকে বিদায় নিলাম। প্রত্যেকের কাছে বিদায় নিয়ে যখন অতবড় Studio ফটক পার হলাম তখন যেন চোখে জল এসে পড়েছে।

উর্দ্ধীপরা দারওয়ানও ঘন ঘন shake hand করে আপ্যায়িত করলো, জানিয়ে দিল এই ক বছর আমাকে তাদের studioতে পেয়ে তারা কত আনন্দিত হয়েছিল। studioএর বাইরে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি পিছনে একজন এসে কিউ করে দাঁড়ালো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো ভারতবর্ষের কোথা থেকে আমি আসছি।

আলাপ হয়ে গেল তার সঙ্গে নাম হ'লো তার Brian Easdale সবে মাত্র Hollywood থেকে "Red Shoes" চিত্রে সঙ্গীতাংশের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "Oscar" পেয়েছে। শুনেই আমার আবেদন একেবারে সরাসরি নিয়ে গেল সে National Studioতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক Michael powell এর কাছে। এইটি অদ্ভুতপ্রতিভাবান পরিচালক। তিনি আমাকে যাচাই করে বাজিয়ে দেখলেন সব রকমের প্রশ্ন করে। তারপর বললেন "আমার অন্ন যদি ধ্বংস না কর তাহ'লে আমার কাছে এস কাজ শিখতে!"

হাসিচ্ছলে এ কথাটা বললেন তিনি তার মত জগতে খুব কম পরিচালক আছেন যার প্রতিটি ছবি চিত্র জগতের অমূল্য সম্পদ যেমন :

১। Matter of life and deatt.

২। Black nareissus.

৩। Battle ofthe river

4। Plate the redshoes,

5। Gone to earth ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁর ছবি হচ্ছিল The Elusive pimpernal. সেখানে ছবির নায়ক ডেভিড্ নিভেন্, মার্কিট লিট্ল প্রভৃতি। ছুনিয়ার অনেক নাম করা ছবির চিত্র তারকার ভার সেখানে স্থতরাং এঁর কাছে কাজ শিখতে লাগলাম। মধ্যে মধ্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইকন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আমাকে যদি এই দৃশ্যটার পরিচালনার ভার দেওয়া হয় তাহলে আমি কিভাবে পরিচালনা করবো। ইত্যাদি ইত্যাদি। এত বড় একজন পরিচালক 'The red studios ওর" আলয়ে যে সময় করে এই সব জিজ্ঞাসা করতেন বা আলাপ আলোচনা করতেন এতে বহু টেক্‌নিশিয়ান আমাকে বলতো যে আমি অতি ভাগ্যবান লোক এ বিষয়ে। কেননা অনেকের চোখে মাইকেল পাওয়েল এ৺জন দ্বিতীয় হিটলার। বিশেষ করে তখন তিনি Shoes film করে নাম করেছেন। Americaয় Gone with thewind ছবির মত সমান সমান The red shoesওর বক্স অফিসের কৃটতি। এদের কাজ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা। এরা কেউ কলকাতার Studioর পরিচালকদের মত বিধি নিষেধ দিয়ে একেবারে একটা দৃশ্যের একজনের close np নিয়েই ছেড়ে দেয় না। কথোপকথনের সময় যদিও seript এ প্রধান চিত্র তারকার close upএর নির্দ্দেশ দেওয়া আছে তাহলেও এঁরা প্রধান চিত্র তারকা ছাড়াও অন্যান্যদের close up বহু mid shot ইত্যাদির ছবি নিয়ে থাকে এবং সম্পাদককে স্থযোগ দেয় তার নিজের ক্ষমতা মত দৃশ্যটিকে নাটকীয় করে তুলবার। সব থেকে চোখে পড়ে এদের ঘন ঘন পরিচালক প্রযোজকদের সমাবেশ যাতে এরা বেশ বিশদভাবে আলোচনা করে ছবির কাজে এগিয়ে যেতে পারে। এখানে আর একটা কথা বলবার আছে যে এ দেশে Assistant Director অর্থাৎ প্রধান সহকারী পরিচালক একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। কলকাতায় আমাদের সময় ছিল যেখানে প্রধান সহকারীর কোন প্রকার বিশেষ মূল্য ছিল না। এখানে পরিচালকের স্থযোগ স্থবিধার জন্যে সব রকম দায়িত্ব পূর্ণ কাজ প্রধান সহকারীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। সে চিত্র তারকাদের অভিনয়ের অংশ পড়ে রিহার্সাল দেওয়া কি "স্যুটিং" আরম্ভের পূর্ব্বে floor পরিচালনায় চিত্রতারকাদের দেখা শুনা করায় প্রডাক্‌সন ম্যানেজারের সঙ্গে সজ্ঞবদ্ধ ভাবে "দিন্" Callcard দেওয়ায়, stand in দের ব্যবস্থাপনা করার প্রভৃতি যাবতীয় কাজে। এমন কি crowd Artist এর কে কে নির্ব্বাচিত হবে কোন কোন অংশে কোথায় তার নির্দ্দেশ দেওয়া পর্য্যন্ত। পরিচালক তাঁকে শুধু বলে দেন তিনি কি কি ধরণের লোক চান, কোথায় কখন। এবং তাঁর সঙ্গে camera man এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কোথায় কি Camera বসবে ইত্যাদি পরিচালক প্রথম সহকারীকে বলে সমস্ত বিষয় তার হাতে ছেড়ে দেন। প্রথম সহকারী বা প্রধান সহকারী তার কথা মত প্রত্যেকটি কাজ খাতায় লিখে নেন। পরিচালক যখন নিজের ঘরে বিশ্রাম নেন্ তখন প্রধান সহকারী lignting Camera man এর সঙ্গে যাতে পরিচালক এর আদেশ মত Camera বসাবার নির্দেশ দেওয়ার কাজে কর্ম্মে হচ্ছে তা দেখেন।

আজকাল হয়তো কলকাতায়ও stand in এর ব্যবস্থা আছে। আমাদের সময় এ সব ছিল না। stand in মানে যখন lighting camera man আলোর নির্দ্দেশ দিচ্ছেন তখন চরিত্রের আসল অভিনেতাকে setএ দাঁড়িয়ে থাকতে না দিয়ে তাকে বিশ্রামাগারে পাঠিয়ে দিয়ে তারই মত দৈহিক গঠনের একজনকে চরিত্রের এমন কি makeup এবং পোষাক পরিয়ে দাঁড় করান হয় তারপর ছবি নেবার আগে যখন সব ঠিকঠাক তখন প্রধান সহকারী পরিচালক এবং আসল অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের ডাক দেয়। ছবি তোলার আগে পরিচালক lighting camera manকে আদেশ দেন তৈরী হবার জন্য lighting camera man আদেশ দেন camera operatorকে অর্থাৎ যিনি হাতে করে ক্যামেরা হাতোল ঘোরান তাকে। প্রধান সহকারী microphoneএর সাহায্যে সকলকে নিশ্চুপ হ'তে বলেন। লাল আলো—Red light জলতে থাকে প্রধান সহকারী বলেন "roll on" রোল অন্ তারপর পরিচালক বলেন "Action" ছবি নেওয়া হ'তে থাকে।

[ক্রমশঃ

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

পূর্ব্বভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা ঃ

ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের ইন-ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৬৩ সালের পূর্ব্ব ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের একাধিক খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছাড়াও মালয়েশিয়ার তিনজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়—ইউ চেং হো, তান ই খান এবং এন জি বুন বী যোগদান করেছিলেন। মালয়েশিয়ার কোন খেলোয়াড়ই পুরুষদের ফাইনালে উঠতে পারেননি। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের ২নং খেলোয়াড় দীপু ঘোষ (ভারতীয় রেলওয়ে) ১৫-৬, ও ১৫-৮ পয়েণ্টে মালয়েশিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় ইউ চেং হোকে পরাজিত করেন। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ৯-১৫, ১৫-৮ ও ১৫-১০ পয়েণ্টে তান ই খানকে পরাজিত করেন। মালয়েশিয়ার অপর খেলোয়াড় এন জি বুন বী তৃতীয় রাউণ্ডে ১৫-৫ ও ১৬-১৮ পয়েণ্টে ভারতীয় রেলদলের রমেন ঘোষের কাছে পরাজিত হ'ন। প্রতিযোগিতার মোট পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়রা দুটি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করেন—পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে ভারতীয় খেলোয়াড় সুনীলা আপ্তের সঙ্গে। প্রতিযোগিতার দুটি ক'রে অনুষ্ঠানের ফাইনালে জয়লাভ করেছেন ভারতবর্ষের সুনীলা আপ্তে (মহিলাদের সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলসে) এবং মালয়েশিয়ার এন জি বুন বি (পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে)। পুরুষদের ডাবলস খেতাব পান বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃত মালয়েশিয়ার তান ই খান এবং এন জি বুন বি।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মালয়েশিয়ার এই তিনজন খেলোয়াড়ই নিউজিল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত এ বছরের টমাস কাপ বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে শোচনীয়ভাবে ৮-১ খেলায় পরাজিত করেছিলেন।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ১৮-১৬, ১৫-১২ ও ১৫-৯ পয়েণ্ট দীপু ঘোষের (ভারতীয় রেলওয়ে) বিপক্ষে জয় লাভ করেন।

পুরুষদের ডাবলস : তান ই খান এবং এন জি বুন বি (মালয়েশিয়া) ১৫-৪ ও ১৫-৬ পয়েণ্টে নান্দু নাটেকার এবং সি ডি দেওরাসের (মহারাষ্ট্র) বিপক্ষে জয় লাভ করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : সুনীলা আপ্তে ১১-৪ ও ১২-১০ পয়েণ্টে সরোজিনী আপ্তেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : সুনীলা আপ্তে এবং এন জি বুন বি ১৭-১৬ ও ১৫-৬ পয়েণ্টে সরোজিনী আপ্তে (রেলওয়ে) এবং এ আই শেখকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

পূর্বাঞ্চল এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা ঃ

অল্ ইণ্ডিয়া এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের উদ্যোগে ভারতবর্ষে এক নতুন এ্যাথলেটিক স্পোর্টস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে—নাম দেওয়া

মীনাকুমারীর সৌন্দর্য্যের গোপন কথা...

'লাক্স আমার ত্বককে আরও লাবণ্যময় ক'রে তোলে'

– উনি বলেন।
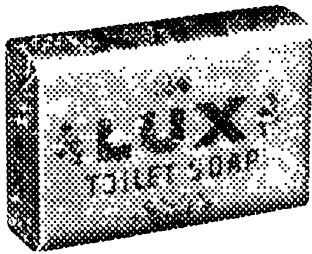
মীনা কুমারী, কমাল আমরোহীর 'পাকীজা' চিত্রের নায়িকা

লাক্স টয়লেট সাবান চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

হয়েছে আন্তঃ আঞ্চলিক এ্যাথলেটিক স্পোর্টস। এই আন্তঃআঞ্চলিক এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে যোগদানকারী অঞ্চলের সংখ্যা তিনটি—পূর্ব্বাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল। পূর্ব্বাঞ্চলের ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে হয়ে গেল। পূর্ব্বাঞ্চলের ক্রীড়ানুষ্ঠানে এই পাঁচটি দলের যোগদান করার কথা ছিল—পশ্চিমবাংলা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং সার্ভিসেস। কিন্তু উড়িষ্যা এবং সার্ভিসেস যোগদান করেনি।

লক্ষ্ণৌর পূর্ব্বাঞ্চলের এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে উত্তরপ্রদেশ পুরুষ বিভাগে এবং পশ্চিমবাংলা মহিলা বিভাগে বে-সরকারীভাবে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। বে-সরকারীভাবে পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন বিহার রাজ্যের রমেশ তাওদে এবং মহিলা বিভাগে পশ্চিমবাংলার অনিতা মুখার্জি।

বিহারের রমেশ তাওদে প্রতিযোগিতায় বিশেষ ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দেন। তিনি ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান লাভ করেন। বিহার পুরুষ বিভাগে মাত্র চারজন এ্যাথলিট নিয়ে ৭টি অনুষ্ঠানে নেমে ৬টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পায়। পশ্চিম বাংলা মহিলা বিভাগের ১০টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৭টিতে যোগদান ক'রে ৬টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। পুরুষবিভাগে পশ্চিমবাংলা মাত্র একটিতে প্রথম হয়। সুতরাং পশ্চিম-বাংলার প্রথম স্থান লাভের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭টি। পশ্চিম-বাংলার অনিতা মুখার্জি লং জাম্প ও জাভেলিনে প্রথম এবং ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় ও সটপুটে দ্বিতীয় স্থান পান।

মহিলা বিভাগের অনুষ্ঠানে মাত্র দুটি দল—পশ্চিমবাংলা এবং উত্তর প্রদেশ যোগদান করেছিল।

পশ্চিমবাংলা পূর্ব্বাঞ্চলের এই এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় যে যে অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করছে তার ফলাফল নীচে দেওয়া হল :

মহিলা বিভাগ : ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে এম হোল্ডার (রেঞ্জার্স ক্লাব) প্রথম ; লং জাম্প এবং জাভেলিনে অনিতা মুখার্জি (সিটি এ্যাথলিটিক ক্লাব) প্রথম ; ৮০ মিটার হার্ডলসে নমিতা ঘোষ (২৪-পরগণা) প্রথম ; ৪ × ১৮০ মিটার রীলে রেসে পশ্চিমবাংলা প্রথম।

পুরুষ বিভাগ : লংজাম্পে শিশুতোষ মুখার্জি (ইষ্টবেঙ্গলক্লাব) প্রথম।

বে-সরকারী দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম উত্তর প্রদেশ (১০০ পয়েণ্ট)। ২য় বিহার ৪৮ পয়েণ্ট ; ৩য় পশ্চিমবাংলা ২০ পয়েণ্ট

মহিলা বিভাগ : ১ম পশ্চিমবাংলা ৫৬ পয়েণ্ট।

দলীপ সিংজী ট্রফি :

আঞ্চলিক নক্-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় (দলীপ সিংজী ট্রফি) পূর্ব্বাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে মধ্যাঞ্চল দল অপেক্ষা বেশী রান করার কৃতিত্বে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করে। মধ্যাঞ্চল দলের অধিনায়ক কিষেণ রুংটা টসে জয়লাভ করেও প্রথম ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেননি। মধ্যাঞ্চল দলে ছিলেন দু'জন ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় বিজয় মঞ্জরেকার এবং সেলিম দুরাণী। অপরদিকে পূর্ব্বাঞ্চল দলে ছিলেন প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় (পূর্ব্বাঞ্চলের অধিনায়ক)।

প্রথম দিনের খেলায় পূর্ব্বাঞ্চল দল ৫ উইকেট খুইয়ে ৩৫০ রান করে। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে প্রকাশ পোদ্দার এবং শ্যামসুন্দর মিত্র দলের ১৩৪ রান তুলেন। দলের ১২৮ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৪৩০ রানের মাথায় পূর্ব্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় এবং খেলার বাকি ১৭৫ মিনিটে মধ্যাঞ্চল দলের ১ উইকেট পড়ে ১৫৪ রান ওঠে।

তৃতীয় দিনের খেলার এক সময় পর্য্যন্ত মধ্যাঞ্চল দলের রান ছিল ২৩৫, ২টো উইকেট পড়ে। কিন্তু এই ২৩৫ রানের মাথায় চতুর্থ ও পঞ্চম উইকেট পড়ে যায়। এবং মাত্র ৪ রান যোগ হওয়ার পর ২৩৯ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে। মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ৩২১ রানে শেষ হয়। তাদের এই কাহিল দশায় ফেলেন অনিল ভট্টাচার্য (১০৫ রানে ৫ উইকেট) এবং কল্যাণ মিত্র (৪৯ রানে ২টো উইকেট)।

পূর্ব্বাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের খেলায় ১০৯ রানের ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় তারা সেমি-ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দলের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাটা নিছক নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপার। দ্বিতীয় ইনিংসে তারা ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৬৭ রান করে।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পূর্ব্বাঞ্চল : ৪৩০ রান (প্রকাশ পোদ্দার ১০৪, শ্যামসুন্দর মিত্র ৭৭ এবং অম্বর রায় ৬৬। সেলিম দুরাণী ১০৪ রানে ৩ এবং রাজসিং ১০৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৬৭ রান (৫ উইকেটে। শ্যামসুন্দর মিত্র ৬৪ এবং কল্যাণ মিত্র ৪২)

মধ্যাঞ্চল : ৩২১ রান (হনুমন্ত সিং ৮৩, দেশপাণ্ডে ৬৮। অনিল ভট্টাচার্য্য ১০৫ রানে ৫ এবং কল্যাণ মিত্র ৪৯ রানে ২ উইকেট)।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা :

অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠের অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম বে-সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি ড্র গেছে। পুরো পাঁচদিন খেলা হয়নি। মুষলধারে বৃষ্টি নামায় তৃতীয় দিনে খেলাই হয়নি এবং একই কারণে খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের লাঞ্চের পর কিছু সময় খেলা হয়ে একেবারে খেলা বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছিল।

প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৫ উইকেট প.ড় ৩৩৭ রান ওঠে। ও' নীল এবং ব্রায়ান বুথ ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১০ রান তুলেন। এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে রিচি বেনো এবং বুথ ৭৬ মিনিটের খেলায় ১০২ রান করেন। প্রথম দিনে বুথ ১২৮ রান ক'রে নটআউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৪৩৫ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিনে তাদের বাকি ৫টা উইকেট পড়ে মাত্র ৯৮ রান যোগ হয় প্রথম দিনের ৩৩৭ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে। বুথ দলের সর্ব্বাধিক ১৬৯ রান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ১৫৭ রান তুলে, ৪টে উইকেট খুইয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের সূচনায় অষ্ট্রেলিয়ার ন্যাটা ফাস্ট বোলার আয়ান মেকিফের প্রথম ওভারের চারটে বল আম্পায়ার কলিন এগার ছুড়ে বল করার অভিযোগে 'নো বল' ডাকেন। ফলে দলের অধিনায়ক রিচি বেনো খেলায় আর মেকিফকে বল করতে ডাকেননি। মেকিফের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবন এইখানেই খতম হয়ে যায়। মেকিফ সম্বন্ধে ছুড়ে বল করার অভিযোগ পুরনো দিনের কথা। ১৯৫৮-৫৯ সালে এম সি সি দল অষ্ট্রেলিয়া সফরে এসে তাঁর বল দেওয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে আপত্তি করেছিল। তার আগে মেকিফ বিভিন্ন দলের বিপক্ষে ১৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন কিন্তু এ সব টেস্ট খেলায় তাঁর ছুড়ে বল করা সম্বন্ধে কোন অভিযোগই ছিল না। এম সি সির এই আপত্তির কারণে মেকিফ গত তিন বছর অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট দলে স্থান পাননি। বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেকিফ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে চিরতরে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

বৃষ্টির দরুণ তৃতীয় দিন খেলা বন্ধের পর চতুর্থ দিনের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ৩৪৬ রানে শেষ হয়। ফলে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের রানের ভিত্তিতে ৮৯ রানে অগ্রগামী হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার এডি বার্লো এবং উইকেট কিপার জন ওয়েট ৫ম উইকেটের জুটিতে দলের ৮২ রান তুলে দলকে শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। বার্লো ৫ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট খেলে দলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান (১১৪ রান) করেন।

চতুর্থদিনের বাকি সামান্য খেলার সময়ে অষ্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে ২৫ রান করে। ফলে তারা ১১৪ রানে অগ্রগামী হয়।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের সময় অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন তাদের রান ১৪৪ (১ উইকেট পড়ে)। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনোর এই ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা খুবই খেলোয়াড়সুলভ হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা হাতে খেলার সময় পেয়েছিল ২৪০ মিনিট এবং এই সময়ে তাদের জয় লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ২৩৪ রানের। অর্থাৎ মিনিটে একটা ক'রে রান করার চ্যালেঞ্জ। লাঞ্চের পর সামান্য সময় খেলা হয়েছিল। এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার একটা উইকেট পড়ে গিয়ে ১৩ রান উঠেছিল।

অষ্ট্রেলিয়া: ৪৩৫ রান (ব্রায়ান বুথ ১৬৯, ও'নীল ৮২, বেনো ৪৩ এবং লরী ৪৩। পোলোক ৯৫ রানে ৬ উইকেট) ও ১৪৪ রান (১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড; লরী ৮৭ রান)

দক্ষিণ আফ্রিকা: ৩৪৬ রান (নডি বার্লো ১১৪, ওয়েট ৬৬ এবং গডার্ড ৫২ রান। বেনো ৬৮ রানে ৫ উইকেট) ও ১২ রান (২ উইকেটে)।

ডুরাণ্ড কাপ:

১৯৬৩ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগান ২—০ গোলে অন্ধ্র পুলিস দলকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্ব পরাজয়ের শোধ নিয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। ১৯৫০ ও ১৯৬১ সালের ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে অন্ধ্রপুলিস দল (পূর্ব্বনাম হায়দরাবাদ পুলিস) যথাক্রমে ১—০ ও ১—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল। ১৯৬২ সালে প্রতিযোগিতা দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ রাখা হয়েছিল। সুতরাং মোহনবাগান এবং অন্ধ্রপুলিস দল উপর্যুপরি দু'বার ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেললো। এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান ডুরাণ্ড কাপের ফাইনালে খেলেছে ৬ বার এবং ডুরাণ্ড কাপ পেয়েছে ৪বার (১৯৫৩, ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬৩)। অন্ধ্রপুলিস দল ৭বার ফাইনালে খেলে ৪বার (১৯৫০, ১৯৫৪, ১৯৫৭ ও ১৯৬১) ডুরাণ্ড কাপ জয় করেছে।

১৯৬৩ সালের দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে মোহনবাগান দলের অধিনায়ক চুনী গোস্বামী প্রথমার্দ্ধের ২২ মিনিটে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৬ মিনিটে গোল করেন। সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ১—০ গোলে সি আই এল দলকে পরাজিত করে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে অন্ধ্র পুলিস দল ২—১ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করেছিল।

সাহিত্য সংবাদ

Sri Aurobindo on Social sciences and Humanities—

(an Anthology Compiled by Sri Kewal L. Motwani.)

শ্রীঅরবিন্দের রচনা দিব্য অনুভূতির প্রকট দ্যুতি। বহু বিস্তৃত তাঁর চিন্তার পরিধি, অতলস্পর্শ তার গভীরতা। তাঁর চিন্তার সূক্ষ্মতা ও ভাষার নৈপুণ্য শুধু গভীর মনোযোগ আর প্রদীপ্ত বুদ্ধিরই অধিগম্য।

কিন্তু তাঁর রচনা থেকে সংগৃহীত রত্নরাজি যোগীরাজ অরবিন্দের অন্তর্দৃষ্টি, কবিত্ব, যোগশক্তি যেন একত্র সমাবিষ্ট করে পাঠকের সামনে স্থাপিত করেছেন সংকলক অধ্যাপক মটোয়ানী,—যার মধ্যে কঠিনতার দুর্বোধ্যতা আর দুর্ভেদ্যতা নেই; আছে মূল্যবান্ সম্পদ-সঞ্চয়নের অপরূপ চাকচিক্য—যা পাঠকের চোখ ধাঁধায় না, জুড়িয়ে দেয় স্নিগ্ধ জ্ঞানের আলোক-লালিত্যে। অধ্যাপক মটোয়ানী বলেছেন :

Sri Aurobindo gave to the world an exquisite synthesis, deep spiritual and religious truths concerning man and the universe, a penetrating insight into the working of the occult and mystic in the life of both a vast cosmic vision translating the puissance of its being into human terms, a sublime scintillating beauty of expreience, suffused with magic of healing and transformation, all emerging from the depths of heights of his own experience of the Eternal."

অধ্যাপক মটোয়ানীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তথ্যের প্রাচুর্যে, চিন্তার গাম্ভীর্যে, প্রকাশভঙ্গির মহত্বে, আত্মদর্শনের গৌরবেও ঐশ্বর্যে শ্রীঅরবিন্দের অবদান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে অতুলনীয়, অনবদ্য, অভূতপূর্ব। শ্রীমটোয়ানীর সংকলন পাঠে পাঠক-মাত্রেই এই সত্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস।

গ্রন্থের ছাপ, বাঁধাই প্রশংসার দাবী রাখে।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

[প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট লঙ্‌ম্যানস্‌, মাদ্রাজ। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।]

দেবতার ডাক (গল্প গ্রন্থ)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

এই গল্প গ্রন্থের লেখক শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—সর্ব্বজনপরিচিত প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিক—গদ্য ও পদ্যে সব্যসাচী। গদ্যে ইনি বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে তাঁহার ধর্ম্ম চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থে ১৩টি ছোট গল্প আছে। গল্প গুলি ইতিপূর্ব্বে 'উজ্জীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে পাঠকপাঠিকা মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গল্পগুলির মধ্যে অলৌকিক ও অনন্যসাধারণ কাহিনী আছে। প্রত্যেক গল্পের মধ্যে বৈষ্ণবতত্ত্ব ও সাধনার কথা আছে। নামের প্রভাবে যে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায় এবং নিগুর্ণ ব্রহ্ম সগুণ রূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দেন ও লীলা করেন, তাহাই গ্রন্থের ভিন্ন আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানির ভাষা সরস ও মর্ম্মস্পর্শী। কবির কলমে গদ্য যে মধুর রূপ ধারণ করে, সেই রূপই গল্প গুলিকে সুখ-পাঠ্য করিয়াছে। এই গল্পগুলির উপজীব্য বাস্তব সত্য নয়—ধর্ম্ম জগতেরই উপভোগ্য, অনধিকারীদের জন্য নয়। অধিকারীরা গল্পগুলি পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন। মূল্য—তিন টাকা

শ্রীকালিদাস রায়

[প্রকাশক—শ্রীবলরাম ধর্ম্মসোপান পোঃ খড়দহ, জেলা ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ]

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপন্যাস "জীবনকাহিনী"—৪·৫০

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু"—২·৫০

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত দার্শনিক-সন্দর্ভ "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম" (৩৩শ সং)—২'০০

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত কিশোরদের জন্য "মজার মজার খেলা"—৩·০০

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "দ্বিচারিণী"—২'৭৫

শ্রীমধুসূদন মজুমদার প্রণীত ছেলেদের "বিল্বমঙ্গল"—০'৭০, "রূপ-সনাতন"—০'৭০ ও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত "ছেলেবেলার গল্প"—৩·০০

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

[illegible] কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

বাঁশরি

শিল্পী—ভবানীচরণ লাহা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মাঘ-১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

'শান্তিনিকেতন' পাঠের ভূমিকা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োদশ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়ে পড়ি যে শান্তিনিকেতন সতেরো খণ্ডে ১৯০৯-১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ অগ্রহায়ণ হ'তে ১৩২১ পৌষ পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও অন্যত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন তারই অধিকাংশ সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয়ে বেরিয়েছিল পুস্তকাকারে। অনেকগুলিই ছিল মৌখিক ভাষণ এবং কবি কর্তৃক পুনর্লিখিত হয়েছিল, আর কতকগুলি গোড়া থেকেই লিখিত ভাষণ ছিল।

'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধগুলি নতুন করে পড়তে গিয়ে দু-যুগের ওপার হতে এলোমেলোভাবে একটি কথা স্মরণে আসছে। তখনি সুপ্রতিষ্ঠিত একজন নবীন শক্তিমান্ কথাসাহিত্যিক তাঁর সৃষ্ট এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলছেন (অবশ্য আইনের ভাষায় obiter dictum বা প্রক্ষিপ্ত—ভাষণ)—ওরে মূঢ়, বক্তৃতার দ্বারা প্রেমের প্রচার হয়না—পুঁথিগত তত্ত্ব আওড়ালে মানুষের মন ভোলে না, উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। পরমহংস বলো, টলষ্টয় বলো, গান্ধী বলো—ওই এক নজীর। ওই নজীরটা চিরস্থায়ী দাঁড়িয়ে আছে বলেই রবিঠাকুরের "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা কম। এতে কাব্য আছে, পরমাত্মিক কল্পনার

অপরূপ সৌন্দর্য আছে, শুচিশুদ্ধ অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রকাশ-মহিমা আছে।" সঙ্গে সঙ্গে একথাও পড়ছি…রবিঠাকুর যদি সোনারতরী আর চোখের বালির আদর্শ নিয়ে থাকতেন তবে তাঁর হতো সাহিত্যিক অপমৃত্যু। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, নব নব নবান্ন যুগিয়েছেন আমাদের পাতে। মানুষের বিচিত্র রুচির প্রতি এত বড় সম্মান বোধহয় আর কোনো আর্টিষ্ট এর আগে প্রকাশ করেন নি। তাই ভদ্রলোক বৃদ্ধ হয়েও আজো নবযৌবনের দূত, প্রতিদিন নিজের স্বষ্টিকে তিনি অতিক্রম করে চলেছেন, তাঁর প্রতি রচনায় গতিশীল কাল নিজের ছায়া ফেলেছে।

প্রত্যেক লেখকেরই নিজের মত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায় কবির পার্ট কী সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, সেখানে 'নজীর' আছে কী 'নজর' আছে সে নিয়েও তর্ক হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু গতিশীল কালের পিছনে মহাকালের যে এক স্থিতিশীল রূপ আছে—তার সন্ধানও কী কবি দেননি। তাঁর কবি-চেতনায় উদ্ভাবিত হয়নি কি অস্পষ্টভাবেও এক কল্যাণতম রূপ—শুধু রূপবতী ধরিত্রীর ছায়া নয়, এক আনন্দ যজ্ঞের নিমন্ত্রণও। রবীন্দ্রনাথ গতির কবি, বলাকার সঙ্গে তিনি উধাও হয়ে যান নিরুদ্দেশের পানে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থিতিরও কবি, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের কবি। গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রস যেমন তাঁকে উৎফুল্ল করে, তেমনি আকাশের এক নিস্তব্ধ শান্ত অনুভবও। রবীন্দ্রনাথের কাছে দুই-ই গভীর ভাবে সত্য—

শুক বলে সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি
সারী বলে মেঘমালার নিত্য নূতন স্বষ্টি

কবি হচ্ছেন রূপকার, তিনি তাপস, তিনি একা, তাই তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা—তিনি জানেন—

চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয়
রিক্ত হাতে চলিয়ে যেয়ো
করোনা দাবী ফলের অধিকার

সিদ্ধ বাউলের ভাষায় বলা যায়—

কাজলে আর করবে কত যদি নয়নে নজর না থাকে
প্রেম যদি না মিললো খ্যাপা
তবে সাধনভজন কদিন রাখে

এই 'নজর'ই 'নজীর' খাড়া করে, শুধু কৌপীনবন্তরাই ভাগ্যবান বস্তু নয়। রসসাধকদের বোঝাও ভগবান বহন করেন, তবে 'রসেবশে' থাকতে হয়। রবীন্দ্রজীবনীকার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'শান্তি-নিকেতন' ভাষণগুলিকে ধর্ম বিষয়ক 'উপদেশমালা' বলে অভিহিত করে প্রশ্ন তুলেছেন—ধর্মদেশনায় কবির কী অধিকার? তিনি নিজেই জবাব দিচ্ছেন—এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের সন্দেহ ছিল এবং আজও সকলের সে বিষয়ে দৃষ্টি সংস্কারমুক্ত হয়নি—আপত্তি-কারীদের অভিযোগ এই যে, রবীন্দ্রনাথ ধনীর পুত্র, কবি, ভাববিলাসী আর্টিষ্ট, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কোনো গুরু-উপদেশ গ্রহণ করেন নি, ধর্ম বিষয়ে তাঁর ভাষণ ভারতীয় কোনো দার্শনিক মতবাদ সমন্বিত নয়। তাই তাঁর ধর্মবিষয়ক রচনাদি বস্তুতন্ত্রহীন…কবিরা যে কখনো নিজেদের আদর্শকে কর্মে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাইনা। বোধহয় তার একমাত্র ব্যতি-ক্রম রবীন্দ্রনাথ (টলষ্টয়, শ্রীঅরবিন্দ, রোমারোঁলা—যারা সাধকও বটে, সাহিত্যিকও বটে ?)। সমগ্র জীবনের যে একটি পরিপূর্ণতার আদর্শ তাঁর অন্তরে ছিল তাই তার ধর্ম। সে ধর্ম ভাবাত্মক মতবাদ, সৌখিন ভাববিলাস নহে। কবির ধর্মমত কঠিন আত্মশাসনের ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাচ উহা সর্বসাধনোপযোগী। কবির ধর্ম নিখিল জ্ঞানের সমন্বয়, জীবনের আপাতবিরুদ্ধ অর্থহীনতা ও বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যসাধন, মানুষের সকল বৃত্তি সুসংগত-ভাবে সুপুষ্ট হবার সুযোগদান। মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশই এই ধর্মজীবনের আদর্শ। কোনো ইন্দ্রিয়কে কৃশ করা নহে, মনকে উপবাসী করা নহে, আত্মাকে শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করা নহে—এই হচ্ছে নব-যুগের ধর্মবোধ।'

কিন্তু 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধ বা ভাষণগুলিকে শুধু উপদেশমালা বললেই সম্পূর্ণ করে দেখা হলো কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সংশয় থেকে যায়। কবির নিজের ভাষাতেই বলতে ইচ্ছে করে—

দেখো ত চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা

উত্তরে বলা যায়

দেখেছিলাম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে

তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে।

স্মরণ রাখতে হবে যে এই 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালাগুলি মোটে কয়েকটি বছরের সংকলন—মোটামুটি কবির পরিণত বয়সের একটি প্রজ্জ্বলন্ত দীপশিখা—সাত বছর যার আয়ু। কিন্তু কবি নিজে যে অমিতায়ু—তাই তাঁর বোধনমন্ত্রে তন্দ্রালস বায়ু প্রাণবান হয়।

এই প্রবন্ধমালার পিছনে রয়েছে কবিজীবনের আবাল্য ইতিহাস, তাঁর কুলগত সংস্কার, শিক্ষাদীক্ষা মনীষা উপনিষদ বৈষ্ণব-বৌদ্ধ শাক্ত চেতনার ইঙ্গিত, প্যাগান ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান বস্তুতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের আবেদন, ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের সমন্বয় চেষ্টা, বিশেষকরে মধ্যযুগীয় সন্তদের—তা ছাড়া কবির নিজের একটা সর্বজনীন আদর্শের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ রঙীণ মন, যা পাতা নড়ে, জল পড়ে থেকেও বিচিত্রতার আস্বাদন পায়, বিস্ময়ে যাঁর প্রাণ জেগে ওঠে, এক সর্বগ্রাসী চেতনায় —যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে—সে ছুটেছে মহাসাগরের পানে দু বাহু বাড়ায়ে। ওদেশের এক কবি গেয়েছেন—

To me, the meanest flower that
blows can give
Thoughts often lie too deep for tears.

কবিজীবনের এই যুগ যখন উগ্র স্বদেশী আন্দোলন এক-দিকে স্তিমিত হয়ে আসছে, আর একদিকে রূপান্তরিত হচ্ছে এক উগ্রতর পন্থায়, দেখি কবি সক্রিয় রাজনীতির পথ থেকে বিদায় নিচ্ছেন ধীরে ধীরে, তাঁর চিত্তে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে—

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি ত আর নাই
তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে সব মিছে হয়েছে মোর কাছে
রত্ন খোঁজা রাজ্য ভাঙা গড়া
মতের লাগি দেশবিদেশে লড়া
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চশিখা স্বর্ণ চাঁপার গাছে
পারিনে আর চলতে সবার পাছে

'শান্তিনিকেতন' পর্বের পিছনে যেমন নৈবেদ্য, খেয়া, স্বদেশী যুগের অপূর্ব গানগুলি, সামনে ও সমান্তরাল ভাবে তেমনি গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির আলেখ্যগুলি। সঙ্গে সঙ্গে কবি লিখছেন "গোরা"—যাকে বলা হয়েছে—an epic of India in transition—লিপিবদ্ধ করছেন জীবনস্মৃতি, লিখছেন শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘর। শোক আসছে, মৃত্যু দিচ্ছে আঘাত তবু—

কবির হিয়ায় চলছে রসের খেলা

প্রভাতবাবু বলেছেন—'শান্তিনিকেতন' ভাষণগুলির মধ্যে গীতাঞ্জলির ভাবধারা সুপ্ত—সেগুলি আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে বোধিকেও উদ্বুদ্ধ করে। 'ডাকঘরের' কথায় কবি বলেছেন —শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে।··· কিন্তু হঠাৎ কি হল, রাত দুটো তিনটেয় অন্ধকার যেন পাখা বিস্তার করল···যাই যাই মনে একটা বেদনা জেগে উঠল···আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। ঘটেছিল একটা কিছু, একটি অপরূপ নাটক সৃষ্টি হ'ল—নাম তার ডাকঘর। এরই অভিনয় দেখে মহাত্মাজী চোখের জল রাখতে পারেননি। এই সৃষ্টিকেই আমি বলবো আধ্যাত্মিক জগতের অনুভূতিময় একটি সংকেতের (symbol) ভাবময় (emotional) প্রকাশ।

প্রভাতবাবুর লেখাতেই পড়েছি যে শান্তিনিকেতনের উৎসব আয়োজনের মধ্যে মহর্ষির এক প্রিয় শিষ্য ও ভক্ত-অনুরাগী বলেছিলেন যে সবই দেখছি, দেখছি না কেবল বরকে (দুল্‌হাকে)। রবীন্দ্রনাথের হাতে নৈবেদ্যের সেই নৈর্ব্যক্তিক জীবন দেবতা (that ever evolving personality) ক্রমশঃ খেয়ার দুলহা হয়েছেন এবং সেই প্রিয়ই দেবতার রূপ নিলেন গীতাঞ্জলিতে—তখন তিনিই গীত-গোবিন্দ, আমোদিত দামোদর, সুপ্রিয় পীতাম্বর, যিনি তপের তাপের দগ্ধ দিনে শ্যামল বধুর স্পর্শ নেন, যার জন্য চোখের জলে ভিজে যায় পায়ের ধূলো যত। যে দেবতা ছিলেন অব্যক্ত তিনিই হয়েছেন ব্যক্ত, যুগে যুগে তার জন্য শুধু রাজপুত্ররাই ছিন্নকন্থা পরেনা, প্রতিটি মানবযাত্রী ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাত তুচ্ছ করে অন্তরের দীপটি জ্বালিয়ে এগিয়ে চলে। ১৩২১ সালে লেখা গীতালির শেষ কবিতা—শান্তি-নিকেতন প্রবন্ধগুলিরও শেষ কথা—

এই তীর্থ দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে কেহ রাতে, বসন্তে শ্রাবণ-বরিষণে
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ-বা কম্পিত
দীপশিখা
এনেছিল মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বারে বারে এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবার প্রণাম।

রবীন্দ্রনাথ হচ্চেন জীবনশিল্পী—তিনি মায়ার নূতন সংজ্ঞা দিলেন—মায়া হচ্চে চারিদিকের আপাত-প্রতীয়মান দ্বন্দ্ব- এর উত্তর হচ্চে হার্মনী বা সমন্বয় বা সমীকরণ, সামঞ্জস্য বিধান—মিলিয়ে দাও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সমাজ প্রকৃতিকে—অন্তর চেতনার সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতিকে—দেখবে দ্বন্দ্ব নেই, সেই দ্বন্দ্বও নেই মায়াও নেই। আবার অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে মায়ার অর্থই হচ্চে "মিত" হওয়া—নামরূপসীমার মধ্যে অসীমকে পাওয়া বা আবদ্ধ করা—আসলে সীমা হচ্চে অসীমেরই প্রকাশ, অনন্তেরই সান্ত স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্মসাধনা আবেগ নয়, উন্মাদন নয়, তবে ভাবঘন, প্রেমঘন, প্রজ্ঞাঘন, রসঘন, শান্ত ভাবনাময় ব্রহ্মবিহার, উল্লাস ভিতরের অন্তরঙ্গের, বহিরঙ্গের নয়।

সম্বরিয়া ভাব অশ্রু-নীর
চিত্তরবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর

নৈবেদ্যপর্বের এই উক্তি গীতাঞ্জলি-শান্তিনিকেতন যুগে একটু যেন বেশ ভাবঘন প্রেমঘন প্রজ্ঞাঘন রূপ যে নিয়েছে সে, বিষয়ে সন্দেহ নেই—"উচ্ছলফেন" অবশ্য নয়, তবে ভাবের ললিত ক্রোড়ে নিলীন, কারণ, ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা করেছেন কবি। অবশ্য তন্ময় হয়ে সমাধিস্থ বা বুঁদ হওয়াই তাঁর কাছে চরমপ্রাপ্তির সিদ্ধান্ত নয়। তাঁর ব্রহ্মবিহার হচ্চে বৃহতের মধ্যে নিমজ্জন, আকণ্ঠ আস্বাদন। তাই তিনি ব্রাহ্ম উৎসবকে বলেন ব্রহ্ম-উৎসব।' কেবল 'জানার' দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, 'হওয়া'র দ্বারা পেতে হয়।

দাদুর কথায়

জ্ঞানলহরী জঁহ তৈঁ উঠে বাণী বা পরকাশ
অনভব জঁহ তৈঁ উপজে সবদ কিয়া নিবাস
জহ্ তনমন কা মূল হৈ উপজৈঁ ওঁকার
তহঁ দাদু নিধি পাইয়ে নিরংতর নিরাধার

জ্ঞানলহরী যেখানে ওঠে সেখানেই ত বাণীর প্রকাশ—যেখানে অনুভূতি থেকে অনুভূতিতে আসি, সেইখানেই তো শব্দের নিবাস—সেই তনু আর মনের মিলে যেতে পারলেই জাগ্রত হন ওঙ্কার, দাদু সেইখানেই সবচেয়ে বড় নিধি পেয়েছে যা নিরন্তর নিরাধার। কবিরও সেই মত, গীতাঞ্জলিরও সেই সুর, শান্তিনিকেতনের ও সেই ভাষা

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি
কেন না
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে র'ব মরি।

শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীরও এই ডাক্। কবি উপমা দিচ্চেন আপেল ফলের—মাটিতে পড়ার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাকর্ষণ শক্তির আওতায় পড়লো সে—তুচ্ছ গতির মধ্যেই পেলে পরমা গতিকে, তিনিই এষঃ, তিনিই পরম সম্পদ, তিনিই পরম আশ্রয়। বুদ্ধিজীবীবৈজ্ঞানিকবাদী কবির মরমী মন world of facts আর world of valuesএর সঙ্গে একটা আদর্শগত সামঞ্জস্য করে নতুন রূপায়ন বা মূল্যায়ন করতে চাইছে। একদিকে প্রকৃতির ও নিয়মের জগৎ—আর একদিকে আনন্দের জগৎ, উপলব্ধির জগৎ, কবির জগৎ—এরি মাঝখানে আছে সংসার ও সমাজ, মঙ্গল কর্মের ক্ষেত্র, কুশলকর্মের ভিত্তিভূমি। কবি বুঝেছিলেন যে মানুষ তিন ডাইমেনশনে জন্মগ্রহণ করলেও তার থাকে একটা চতুর্থ ডাইমেনশনের সত্তার প্রক্ষেপ। একে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Intuitive mentality, জগৎকে বোঝা তাই আত্মসচেতনতা। মানবতাবাদের কথা যখন বলি, তখন আসে এই অধ্যাত্ম স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ এঁরা শ্রদ্ধায় সজ্ঞানে এই স্বীকৃতিকে মূল্য দেন, আবার ইউরোপের অনেক মানবতা-

বাদী বলেন যে তা কেন—ব্যবহারিক মনটাকে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে মিলিয়ে দাও। পারসোনালিজম্ বা একজিস্‌টেনশিয়ালিজমের মত মতবাদ অন্য কথা বলে। র‍্যাডিকাল হিউমানিজম্ মানুষকে ঐশী ভাবনার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে তার হাসিকান্না দোষগুণের মধ্যেই দেখতে চায়। রবীন্দ্রনাথ এর সামঞ্জস্যের সূত্র পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের চতুরাশ্রমের ব্যবস্থার মধ্যে। ব্রহ্মচর্যে সংযত নিষ্ঠাবান জীবনের ভিত্তি স্থাপন হলো বাল্যেও কৈশোরে, গার্হস্থ্যজীবনে যোগভোগে একত্র কুশলকর্ম করলাম—বানপ্রস্থের সময় এলে আসক্তির গ্রন্থিগুলিকে একে একে শিথিল করবার উপদেশ দেওয়া হলো, যার ফলে 'যতিতে' শ্লথবৃন্ত ফলের মত টুপ করে ঝরে পড়া যায় মহাসাগরের সীমা বিহীনে। তাই কবি বললেন—সত্যেই শেষ নয়, মঙ্গলেই শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ—এই হচ্ছে ভারতবর্ষের বাণী—একটা অপ্রমত্ত অখণ্ড বোধ।

শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলতেন যে রবীন্দ্র-নাথের অভ্যাস ছিল প্রতিদিন ভোরে স্তব্ধ হয়ে বসে আলোর প্রথম প্রসাদখানিকে গ্রহণ করা। এটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। বৈদিক কবির উপযুক্ত উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ কালোর মাঝ থেকে আলোকে উপর মাধ্যমে বরণ করতেন—

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই
এক আদি জ্যোতি উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে

এটি অবশ্য পরের যুগের কবিতা—কিন্তু এই আনন্দের পরশনের কিছুটা ভাগ পাবার জন্যই কয়েকজন ভক্ত ও অনুরাগী সেই আলো-আঁধারির সন্ধিক্ষণে ব্রাহ্ম মুহূর্তে প্রত্যুষার উদয়কালে জুটতেন কবির কাছে। কবি কিছু বলতেন, উপদেশ দিতেন—এই হলো শান্তি-নিকেতন ভাষণগুলির প্রাথমিক রূপ। এইগুলি পড়লেই কল্পনা করে নিতে পারা যায়—যেন এক তাপস বসে আছেন, প্রভাত আলোর হিরণ্ময়তার মধ্যে আপনি-মগ্ন—

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাৎ
চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা
যথা প্রসূতা সবিতুঃ

এইতো উষা এসেছে, জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ বসুধা প্রজ্ঞান জন্মেছে সর্বব্যাপী হয়ে—সূর্যেরও জন্মদান করেছেন এই উষা—

রুশৎ বৎসা রুশতী শ্বেতাগ্যাৎ
আরৈক্ উ কৃষ্ণা সদনানি অস্যাঃ

আরক্তিম সন্তানকে নিয়ে আরক্তিম হয়ে এসেছে মাতা শুভ্রাবরণী, আর কৃষ্ণাবরণী তিনি তাঁর সব কালো কক্ষের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, তাঁরা যে "সমানবন্ধু"।
তাই পরের যুগে কবি বললেন—

বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে
ভাষা নাই, ভাষা নাই
যখনি ভোর হোল রাত্রি
মন দাঁড়িয়ে উঠল
বললে আমি পূর্ণ
ভার অভিষেক হল আপনারি
উদ্বেল তরঙ্গে
উপচে উঠে মিলতে চলল চারিদিকের
সব কিছুর সঙ্গে

এরই পূর্বাহুভূতি পাই শান্তি-নিকেতনের কবি ভাষণা-বলীতে। সেই জন্য এই প্রবন্ধ গুলিকে ঠিক উপদেশমালা বলা চলে না। এখানে নিজস্ব একটা সৃষ্টিরূপ আছে, প্রচ্ছন্ন তত্ত্বের আভাস আছে, রসের ব্যঞ্জনা আছে, ভাষার লালিত্য আছে, ভাবের সৌকর্য আছে। তা ছাড়া এই নিবন্ধগুলিকে বুঝতে গেলে কবির মানসিক পরিমণ্ডলটিকে বুঝতে হবে (mental climate), শুধু (১) রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা বা পারিপার্শ্বিক হিসাবে নয়, (২) উনবিংশ শতাব্দীর সমন্বয়ী চেতনার প্রকাশ হিসাবেও। আরো দ্রষ্টব্য বিষয় যে রবীন্দ্রনাথের কুশলী শিল্প চাতুর্যে ভাষার সৌন্দর্য এমন একটা মোহময় আবেশের সৃষ্টি করে

যেন একত্র শ্রী, হ্রী ও ধীর সমাবেশ হয়েছে—রবীন্দ্রগন্থের অভিব্যক্তিতেও এই প্রবন্ধগুলির মূল্য অসীম—এখানে আমরা দেখছি এক পরমাশ্চর্য সৃষ্টিচাতুর্য। তাই এই ভাষণগুলিকে শুধু ধর্ম উপদেশ বলবনা, উপনিষদের ভাবকে আত্মস্থ করে রম্যরচনা বা ব্যাখ্যা বলবোনা, বলবো যে এইগুলি কবিচেতনার একটি বিশিষ্ট রসানুভূতি ও সম্ভোগ যার মধ্যে কাব্যের সৌন্দর্য আছে, জ্ঞানের তথ্য আছে, তত্ত্বের সমাবেশ আছে, একটা দার্শনিক অভিব্যক্তি আছে, আর আছে ভক্তজনের আকুতির সঙ্গে একটা আত্ম-বিশ্লেষণের, আত্ম উপলব্ধির আত্মসম্প্রসারণের ধারা, যার সুর দর্শনের চেয়েও কাব্যের কাছাকাছি—"কবয়ঃ" এর এক জন যে রবীন্দ্রনাথ—এতে কবিতার লাবণ্য ধ্বনি ও ঝঙ্কারের সঙ্গে পাই এক বিশ্বজনীন আরতির ছবি "গগন মৈ থালু রবিচন্দ দীপক বনে···ভবখণ্ডনা তেরী আরতি"

আরতি করতীহ, গাও ত গীত

ঝলকত ও মুখচন্দ

রম্যবীণায় বাজবে প্রথম আলোর প্রসাদখানি।

কবির ধর্ম কী ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি Richard Church রবীন্দ্রনাথের Hibbert Lectures এর Religion of Man অনুসরণ করে বলেছিলেন—In the poet's religion, we find no doctrine or injunction but the attitude of our entire being towards a truth which is ever to be revealed in its own endless creation. In dogmatic religion all questions are definitely answered, all doubts are finally laid to rest. But the poet's religion is fluid like the atmosphere round the earth where light and shadows play hide and seek. It never undertakes to lead anybody anywhere to any solid conclusion, yet it reveals endless spheres of light because it has no wall round itself রোঁলা যাকে প্যাসকাল উদ্ধৃত করে বলেছেন 'chemin qui maadche (to which marches) তাঁর ভাষায় 'Religion is never accomplished. It is ceaseless action and the wili to strive —the onspouring of a spring never a stagnant pool," রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় চঞ্চলা নদীর মত। প্রাণের স্রোতস্বিনী যার জোয়ার ভাটায়, আলো ছায়ায়, মন্দ-ভালোর মাঝখানে নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে বিশ্বপ্রবাহে যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত, তাকেই কবি বাঁশীতে ধরেছেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

আমি লিখি কবিতা, আমি আঁকি ছবি

দূরকে নিয়ে আমার সেই খেলা

কিম্বা

মনে হলো আকাশ যেন

কইলো কথা কানে কানে

মনে হলো সকল দেহ

পূর্ণ হলো গানে গানে

অতিসাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে নৈবেদ্য খেয়া—গীতাঞ্জলি গীতালির যুগ এবং শান্তিনিকেতন প্রবন্ধ মালার যুগ তাঁর কাব্য চেতনার তৃতীয় যুগ। প্রথম পর্বে নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, বিস্ময়ে প্রাণ জাগবে, চেতনা জাগবে, তার ভিতর আসছে বেগ ও আবেগ উদ্বেলতা, উচ্ছল কলকল তান, দ্বিতীয় পর্বে সেই চেতনা বিশ্ব চেতনার সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে, আসছে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, গাঢ় ভাবাবেশ, অনুভূতির তীব্রতা কমে ব্যাপ্তির দিকে চলেছে, তৃতীয় পর্বে সেই চেতনা প্রকৃতি থেকে খুঁজবে প্রকৃতির অধীশ্বরকে—কোথায় আমার জীবন দেবতা—তিনি কি আসছেন দুঃখের বেশে, যোদ্ধার বেশে, না ঝড়ের রাতে—পরাণসখা বন্ধু হে আমার—তিনি কি রাজার দুলাল না নির্মম নির্ভীক তপস্বী কঠোর শুচিব্রত—তিনি কালবৈশাখীতে আসছেন না বরষায় লোভন শোভন হয়ে, শরতে নয়ন ভুলানো রূপে, শীতের ঝরা পাতায়, হেমন্তের দিনান্ত বেলায়। চতুর্থ পর্বের সুরু হলো বলাকার সঙ্গে জীবনের চলমান নদীর flux এর মধ্যে কোথায় সেই অখণ্ড সত্য যেখানে সৃষ্টি পুঞ্জে পুঞ্জে রূপ থেকে রূপান্তরে চলেছে। পঞ্চম পর্বে—The wheel came full circle, তিনি দেখলেন দেবতাই নেমেছেন মানুষের বেশে। চিত্তাভস্মতলে মানব তপস্বী নতুন জগৎ সৃষ্ট করছে নিরাসক্ত ধ্যানের আসনে বসে—এই তো Divinity of pain, Humanity of Divinity শুধু জীবই শিব

নন, শিব ও জীব। মহামানবের কল্পনাই রবীন্দ্র চেতনা'র শেষ দান। তখন আর ভক্তের মুগ্ধ নিবেদন নয়, সমানে সমানে সমঝসা রচিত নয়, মানুষে মানুষে মিলিয়ে যে মহা-দেবতা তারই পাদপীঠে পূজা। শেষসপ্তক-পুনশ্চ-পত্রপুট আরোগ্য-আকাশ প্রদীপে পাচ্চি আমরা মানুষের মহৎ স্বরূপের ইতিহাস। প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে আর আত্মবিলয়ের ভাব নেই। কবি বলেছেন—মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন—জন্মমৃত্যুর অন্তরালে একটা নিরাসক্তি এসেছে—এক সর্বজ্যোতির্ময় প্রাণসত্তার ঘন সমুদ্রে কবি নিমগ্ন নৈর্ব্যক্তিক সাধনায়—তিনি বলছেন

আমি আজ পৃথক হব

যে আমি মুক্ত, যে আমি স্বচ্ছ, যে আমি অতন্দ্র সৃষ্টিকে চরিয়ে নিয়ে যায় যুগ হতে যুগান্তরে নব নব চারণ ক্ষেত্রে। এই চেতনা কবিমনে পদ্মের কোরকের মত প্রচ্ছন্ন আছে বহু দিন হতেই। এই যুগে ব্যক্তিগত বিশ্বভুবনেশ্বর প্রায় বিলুপ্ত রয়েছে একটা agnostic touch বা সত্যসন্ধানীর দৃষ্টি। কাব্যে ভাবের মাধুর্যের বদলে এসেছে সত্যের ঋজুতা, ভাষাতেও তাই, ছন্দগঠনেও তাই। এ হচ্ছে কবির অহংকার—সমস্ত মানুষের হয়ে অহংকার—চেতনার রং এ পান্না হবে সবুজ। পূর্ব্বের যুগে সব চেতনাই শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক ভগবদ্ব্যাপ্তিতে আশ্রয় নিয়েছিল—এখানে দেখি প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে পুরুষ, পেরিয়ে এসে পুরুষেরই প্রতীক হিসাবে মানুষ বসেছে সিংহাসনে—সে মানুষ শুধু রাজাধিরাজ নয়, রাজার ঘরের দুলাল নয়—যারা কাজ করে, পাথর ভাঙে তারাও। একে শুধু প্রোলেটিরিয়াট্ চেতনা বললে ভুল হবে, এ হচ্ছে উত্তরণ ও অবতরণ—এক নব সংহিতার সোহং বাদ।

অসীম দূরের প্রেক্ষনীতি
পড়ুক ধরা শেষ গণিতে
জিত হয়েছে, কিম্বা হল হার

সাধক যিনি, ভক্ত যিনি, দৃষ্টিমান যিনি, তিনি প্রাণের প্রদীপটি জেলে ধরায় আসেন, তাঁর বাণী শোনান—সে কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ নয়, প্রেমেরও যোগ—এই কথাগুলিই শান্তিনিকেতন রচনাগুলির সার—তপস্বিনী মৈত্রেয়ী উপকরণপীড়িত সংসারের মধ্যে সেই অমৃতের প্রার্থনাটিই মেনে নিয়েছিলেন। পরিপূর্ণ প্রেমকে পাবার জন্য—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ কলকাতার ওভারটুন হলে কবির "তপোবন" পাঠের ভিত্তিস্বরূপ—শাশ্বত ভারতবর্ষের সাধনা হচ্চে বিত্তের সঙ্গে চিত্তের যোগ—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ—পরের ধনে লোভ করোনা—এই চিত্তের যোগ সম্ভব নয় যদি চিত্তের জাগ্রত জিজ্ঞাসা বৃত্তি না থাকে—তাই শান্তিনিকেতনের প্রথম কথাই হলো—ওঠো, জাগো, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—সংশয় আসে আসুক, ক্ষতি হয় হোক্—তবু তব স্পর্শ পরশে নমস্কার সত্য হোক্, নিজের অন্তরের দেবতাকে বঞ্চনা করোনা—১১ই মাঘ ১৩২১ সালে কবি আবার এই কথারই আবৃত্তি করলেন—এই হল তাঁর মন্ত্রের আবিষ্কার—সত্য আর জ্ঞান যে অনন্ত। তবু প্রশ্ন আসে, আসা উচিত—প্রবুদ্ধ উন্মুখী মর্ত্যমন প্রশ্ন করবেই—কস্মৈ দেবায়—কে সে, কী সে, কোন পথ গ্রাহ্য, কোন পথ বাহ্য। জ্ঞানে বা কর্মে মহৎলাভ হলেও কিছুটা ফাঁক থেকে যায়, সেটাকে ভরাতে হয় প্রেমের দ্বারা। প্রেমের মধ্যে আছে আত্ম-বিলোপ, আত্মদান। আত্মদান মানেই নিজেকে ফিরে পাওয়া, আত্ম আবিষ্কার। কবি বলছেন—এখানেই আছে স্থিতি আর গতির সামঞ্জস্য, হাঁ আর না-র মিলন। প্রেমের এক কোটি সগুণ, আর এক কোটি নির্গুণ। তার এক-দিকে বলে আমি আছি, আর একদিকে আমি নেই। 'আমি' না হলেও প্রেম নেই, 'আমি' না ছাড়লেও প্রেম নেই। এই তত্ত্বটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রেমের তিন রূপ—প্রথম রূপ যদি ধরি তার জৈবিক রূপ—শুধু আমি চাইনা, আমার চাই, দেহেতে অণুতে, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে কামনায় ভঙ্গীতে আমি আস্বাদন করতে চাই—সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাস—এটা একদিক দিয়ে physical needএর রূপক্। প্রেমের দ্বিতীয় ধারা হচ্চে তার aesthetic need. আমি সুন্দরকে চাই—আমি প্রিয়কে চাই, শ্রেয়কে চাই—সুন্দর কাকে বলি, যাতে চোখ ধাঁধায়, রক্ত তাতায়, মনকে শুধু যা রসসিক্ত করে, উন্মিলিত করে, উন্মোচিত করে, উদ্বোধিত করে, তখন সুন্দরই হয় সত্য Truth Beauty, Beauty truth. প্রেমের তৃতীয় অভিব্যক্তির ধারা হচ্চে তার spiritual need—শুধু আশ্রয় বা অবলম্বন নয়, তার অধ্যাত্ম সত্তার স্বীকৃতি।

অর্থাৎ আমায় ভালোবাসতেই হবে—এ আমার ধর্ম—এ আমার ত্যাগ—এই ত্যাগই আমার ভোগ—তা না হলে আমি ফুটবোনা, বিকশিত হবোনা—আমি 'হয়ে' (become) উঠবোনা। প্রথমটিতে শুধু চাওয়া, শুধু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা, দ্বিতীয়টিতে সমানে সমানে ভোগ, আমিও দেবো, তুমিও দেবে,রসঘন প্রেমঘন দান প্রতিদানে মিলন সুসম্পন্ন। তৃতীয় পর্যায়ে শুধু দিয়েই আমি আনন্দিত, নন্দতি, নন্দতি, নন্দতি, শুধু ত্যাগ, শুধু উৎসর্জন, এখানে নেওয়ার বা চাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই, আবার মত্ততাহীন তত্ত্বপারাবার নেই। এখানে ভালবাসার ভোগ আত্ম-ব্যাপ্তিতে, আত্মসম্প্রসারণে ও আত্ম-বিলুপ্তিতে—আমিই তুমি—কিন্তু সোহহম্ নয়—বরং অয়মহং।

কবি শান্তিনিকেতন রচনাবলীতে প্রথমেই তাই আমাদের সাবধান করে দিলেন যে প্রেমের সাধনার বিকার-শঙ্কার বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। রসসম্ভোগকেই প্রেমের চরম সিদ্ধি বলে জানলে নেশায় পেয়ে বসে। প্রেম যদি সংযম হারায়, সত্য থেকে স্খলিত হয়, সেখানে যদি মত্ততার প্রাবল্য আসে তাহলে সে প্রেম ঋষি অভিশাপের দ্বারা প্রতিহত, ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, দেবরোষে ভস্মীভূত হয়। কালিদাসের কাব্যে নাটকে কবি এই প্রতীকই খুঁজে পেয়েছিলেন—সেই জন্যই প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়রূপ শুধু—

প্রহর শেষে আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখে ছিলাম আমার সর্বনাশ

নয়, সেখানে সর্ব খর্ব তারে দাহন করতে পারে—যে মহা রুদ্রের শক্তি তারই আবাহন। তোমার দিকে আমিই ত চলেছি—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে

সে তো আজকে নয়—

ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে

এখানে কবির ভয়, কবির গর্ব, কবির আত্মোপলব্ধি সব মিলে তাঁকে বলাচ্ছে

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে—তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি
আছি, আমি আছি
এবং ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মত যেন
অঙ্গ ওঠে ভরে

শ্রদ্ধেয় নলিনী গুপ্ত বলেন—এই রূপকল্পের অনুভূতি, ভাষা ভাবই যেন শাঁখের করাত—দুদিকই কাটে।

হয়তো তাই।

বীথিকায় এসে দেখি কবি রাত্রি রূপিণীকে ডেকে বলছেন—

আলো জ্বালো, এবারে ভালো করে চিনি

যখন অপ্রমত্ত "মিলন" হলো তখন অনুভূতির ছবিটা কি রকম—

নাই সময়ের পদধ্বনি (Time has a stop)
নিরন্ত মুহূর্ত স্থির দণ্ডপল কিছুই নাই গণি
নাই আলো নাই অন্ধকার
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার
নাই সুখ দুঃখ, ভয় আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হল সব
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব
তোমাতে সমস্ত লীন
তুমি আছ একা
আমি হীন চিত্ত মাঝে একান্তে তোমারে শুধু দেখা

প্রায় বৈদিক সূক্তের প্রতীকগুলিই ব্যবহার করেছেন কবি। কিন্তু 'সমস্ত লীন' হলেও, "আমি হীন" হলেও তার মধ্যে একটু 'অহং' রয়ে গেছে' যে দেখছে একান্তে।

রবীন্দ্রনাথ চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথাই বলেননি "আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। চর্ম-চক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে ঘৃণা করবে এত বড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বলছি এই চোখ দিয়েই এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকতো তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে। শুধু 'দেখা' নয় 'শোনা'ও।

রবীন্দ্র-চেতনার এই বিরাট পটভূমিকার কথা বিস্মরণ হলে তাঁর শান্তিনিকেতন রচনামালার যথার্থ তাৎপর্য বোঝা যাবে না। ১৩১১ সালে কবি লিখেছিলেন—তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোন অধিকার নেই। দ্বৈত অদ্বৈত-বাদের কোন তর্ক উঠলে আমি নিরুত্তর থাকব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়ে বলছি—আমার মধ্য দিয়ে অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রয়েছে।

সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়

মহা সম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে—মৃত্যু হবে অমৃত। এই তো গীতভারতীর প্রসাদ।
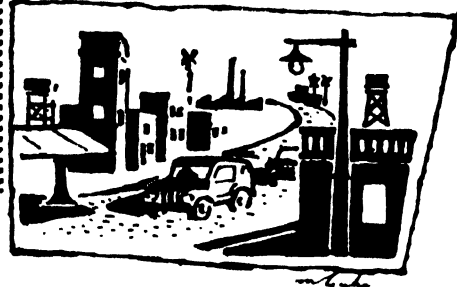
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পূবদিকের আকাশে দুর্গাপুর স্লাগব্যাঙ্ক এর আলো—লালাভ প্রচণ্ড জ্বালার দীপ্তি সব মুছে ফেলেছে। তারই দিকে চেয়ে বলে ওঠে অশোক।

—ওই দিকে চেয়ে কি মনে হয় জানো ?

—কি ! অবাক হয়ে প্রশ্ন করে শিখা।

বলে ওঠে অশোক—ওই যন্ত্রদানবের নীরব চোখরাঙ্গানো দেখে বলি, তুমি জয় করতে পারবেনা আমাদের, তোমার আগুনের তাপে শুকিয়ে আমাদের অন্তর—ঘর—সবকিছু সবুজ, ছাই করে দিতে পারবেনা। তোমাকে অগ্রাহ্য করে নয়—তোমাকে স্বীকার করে, তোমার পাশেই আমরাও নোতুন ঘর গড়ে তুলবো।

—বলে ওঠে শিখা—শিল্প বিপ্লবও মানবেন না ?

—মানবো। তবে তার ধ্বংসটাকে ঘটতে দেবো না। মানুষ যদি সব দিক দিয়ে এগিয়ে যায়, অন্তরের তার পুঁজি কিছু থাকে শিক্ষার পুঁজি, মানবিকতার পুঁজি, যন্ত্র তাকে অমানুষ করে দিতে পারেনা। অশোক কথাগুলো বলে চুপ করে। কি ভাবছে। বেশ জোরের সঙ্গেই বলে।

—কিছু ধুয়ে মুছে যাবে। কতক বদলে যাবে, কিন্তু বাকী যারা থাকবে তারা জীবনকে সুন্দর সহনীয় করে তুলবে প্রাণের স্পর্শ দিয়ে, ভারতের সেই পুঁজি আছে শিখা।

…শিখা ওর কথাগুলো শুনে চলেছে। বাতাসে বকুলগন্ধ ; তারার আলো কাঁপে দীঘির জলে। রাতজাগা ডাহুক পাখী একবার ডেকেই থেমে গেল।

—রাত হয়ে গেল !

শিখা বলে ওঠে—আজ মুডে আছেন দেখছি।

—চল এগিয়ে দিয়ে আসি।

হাসে শিখা—না, একাই যেতে পারবো। রাত বেড়ানো অভ্যাসটি এখনও আছে।

হালকাকণ্ঠে বলে অশোক—তাতো দেখতে পাচ্ছি।

বের হয়ে গেল শিখা। কথাগুলো সেও ভাবছে। কোথায় যেন তার মনেও অশোকের চিন্তার সংক্রমণ দেখা দেয়।

দেখেছে কেমন যেন কালোছায়ার মত একটা হতাশা আর ক্লান্তি এদের আকাশ ঘিরে এসেছে।

…নির্জন পথটা দিয়ে আসছে বাসার দিকে, হঠাৎ কাদের আসতে দেখে দাঁড়াল পথের ধারে। প্যান্টপরা কয়েকটা মূর্তি—মুখে বিড়ি না হয় সিগ্রেট। ওকে দেখেই একজন দাঁড়াল।

—মীনাকুমারী নাকি বাবা ! 'মহল' দেখছি না কি ? আয়েগা আয়েগা ! সরে যাবার চেষ্টা করছে শিখা, কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে !

…ওদের বেসুরো কণ্ঠের চীৎকারে ভয় লাগে তার। এগিয়ে আসছে একজন এই দিকেই।

হঠাৎ কাকে আসতে দেখে সরে যাবার চেষ্টা করে, লোকটা আঁধার ফুঁড়ে সামনে এসেছে দুজনকে দুহাতে ধরে আসমানে তুলে প্রচণ্ড ভাবে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দেয়; গর্জাচ্ছে।

—হারামজাদারা, দুগ্‌গোপুরের পাইপের জল পেটে পড়ে সাহেব হয়েছিস!

প্রচণ্ড দুই চড়ে ছিটকে পড়ে দুজনে দুদিকে, উঠতে যাবে লাথির চোটে গড়িয়ে চলে ঢালু পাড় দিয়ে; সশব্দে ছিটকে পড়ল জলে। অন্যজন উঠে পড়ে দৌড়মারে সামনের দিকে বনবাদাড় ভেদ করেই।

—আপনি।…লোকটা ভয়ে জড়সড় শিখার দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। শিখা বলবার চেষ্টা করে।

আপনি না এসে পড়লে—

—কোন ভয় নাই আপনার। এমোকালীকে এ চাকলার লোক চেনে। একটু অবাক হয় শিখা—আপনি কালীবাবু! গ্রামপ্রধান!

হাসছে কালী—আজ্ঞে আমি এমো কালী। ওসব বলে লজ্জা দেবেন না। চলুন এগিয়ে দিই পথটা!

—না, এসে গেছি। আর দরকার হবে না।

হঠাৎ দাঁড়াল কালী—শুনুন!

—কি!

—এ সব কথা ওই সেক্রেটারীবাবু মানে অশোকবাবুর কানে যেন না ওঠে, তালে লজ্জার আর শেষ থাকবেনা। ছিঃ ছিঃ এ আর হবেনা কুনদিন। জলে পড়া লোকটা উঠে আসছিল, চকিতের মধ্যে আর একটা লাথি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে জলে অস্ফুট আর্তনাদ করে। গজরাচ্চে কালী।

—শালো উঠবি কি! অ্যাঁ! কোঁৎ কোৎ করে জল গিলে হাবুডুবু খা চোপ্পরাত। উঠেছিস কি ফের লাথিতে প্যাট-ফাটাবো শালোর—আম্মো ওরইলাম দীঘির ধারে ঠায় বসে। আয়েগা-আয়েগা! দেখ শালো তুর যম এ্যয়েছেন ইবার। শিখা হাসিচেপে বাড়ীর পথধরে। প্রহরীর মত কালীর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে আবছা তারাজ্বলা অন্ধকারে।

…অশোকের কথা মনে পড়ে। কিছু লোকও বেঁচে থাকবে—এই দুর্দিনে তারা অত্যন্ত নোতুন করে বাঁচতে শিখবে—মানুষের মত।

তারকরত্ন রায় কথাটা শোনে ওদের। ফণী অবনী আরও কারা এসেছে। নীচের বৈঠকখানায় আর সলা-বৈঠক বসেনা। তারকবাবু নীচে নামে না—শরীর খারাপ। আর সেই তালবেতালও নেই যে রাজাবিক্রমাদিত্য পূর্ণ-বিক্রমে নিজের সিংহাসনে বসে বিচার করবে। তাদের কথাগুলো শোনেমাত্র। অবনী গজরাচ্ছে।

—যা ছিল সরকার নিয়েছে জমিদারী উচ্ছেদের মানে, বাকী যা আছে সেটুকু নেবে ওই লীডাররা যৌথকৃষি ফার্ম-এর হুমকিতে। ঘরের ঢেঁকি কুমীর তোমার ওই ভাগ্নে অশোকের এসব বদবুদ্ধি।

ধরণী টাকে হাত বুলিয়ে মন্তব্য করে—যম জামাই ভাগ্‌না, তিন নয় আপ্‌না॥ খালকেটে কুমীর ঢুকিয়েছ এখন ঠ্যালা বোঝ এইবার। আমার বাবা জমি পড়ে জলখাবে সেবি আচ্ছা—ওসব ফাঁদে পা দিতে যাবো নাই।

তারকবাবু কথা বলেনা। সারা মনে তার একটা দুঃসহ ব্যথা। এতদিনের প্রেসিডেন্টগিরি ছেড়ে দিতে হল। কামারদের কালী হল কিনা গ্রামপ্রধান। নিজের এত-দিনের চেষ্টার ফল ওই ইস্কুল, সরকারী ডাক্তারখানা সব গড়ে তুলেছে অশোক।

লোকে তাকে ভুলে গেছে সেই লজ্জায় বের হয়না। জমিদারী যথাসর্বস্ব যাবার চেয়ে এ দুঃখ কম নয়। চোখের উপর দেখেছে তার একমাত্র প্রাণের নাতনী মরেছে বিনা চিকিৎসায় একরকম তিলে তিলেই।

ছেলেকে বের হতে হয়েছে লোহাকারখানার কাযে, কি কায সে করছে সেখানে তা দেখেই অনুমান করতে পারে। বৌমার কাছে মুখদেখাতে লজ্জা হয়।

ঘরে বাইরে তার দুঃসহ লজ্জা।

একটু আগেই দেখেছে স্কুলের নোতুন মিসট্রেসকে ভিতরে যেতে মণিমালার বন্ধু। অশোকও কথাটা পেড়ে-ছিল বৌদিরও মত আছে আপনি মতদেন এখানের ইস্কুলের একটা চাকরী ওঁকে দিই।

কথাটা শুনে খানিকক্ষণ ওর দিকে অসহায়ের মত

চেয়েছিলেন তারকবাবু! জবাব দেয় পরে—এখানে মাষ্টারী করা ওর চলবে না অশোক।

—কেন?

—তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আমার মত চেয়েছিলে সেইটাই জানিয়ে দিলাম। উনি যদি রাজী থাকেন—ওর মতেই চলুক। আমি কে?

মণিমালা দরজার বাইরে থেকে শ্বশুরের কথাটা শুনেছিল, মনে মনে অসহায় রাগে গুমরে উঠেছিল।

...তারকবাবু তাও দেখেছিল চুপ করে।

আজ ওরা এসেছে। অবনী বলে ওঠে—

—একটা প্রটেষ্ট করা দরকার। ওরা নাকি বলেছে কেউ জমি না দিলে আইন বলে তা দখল করতে পারে। ব্লাডি—ফুলস্।

তারকবাবু জবাব দেয়—এ সম্বন্ধে আমার মতামত কিছুই নেই অবনী। যে ক'বিঘে জমি আমার আছে ক্রমশঃ সবই তা বেচে দোব।

—তারপর!

হাসে তারকবাবু—তারপর! দারু ভূতো মুরারি। ওরা অসহায়ের মত বের হয়ে এল। অবনী বলে ওঠে।

—তখনই বলেছিলাম হি ইজ এ ডেড ম্যান নাও।

নীচে অপেক্ষা করছিল ছানুদাস, ভাঙ্গা থামের আড়াল থেকে সে বের হয়ে আসে।

—হল কিছু?

—কচু! তুই যা করবি কর ছানু।

—দেখা যাক। ছানুই কর্তৃত্ব নেবার জন্য এগিয়ে আসে।

তারকবাবু একাই স্তব্ধ হয়ে জীর্ণ তক্তপোষটার উপর বসে আছে। রাত্রি নেমে এসেছে—ম্লান তেলেরবাতিটা জ্বলছে। স্ত্রীকে দেখে মুখ তুলে চাইল। ক' বছরেই তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। হাতের সব চুড়িগুলো গেছে—গেছে মোটা হার,গহনা সবকিছু। মাত্র শাঁখা আর লালপাড় শাড়ী তাই পরণে।

—ওরা কি বলছিল?

—কিছুনা!

ভাবিনী স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। কোনদিনই কোন প্রতিবাদ করেনি স্বামীর কথায়। ভয় করে এসেছে আজও সেই ভয় করে।

—জীবন কি বলছিল। বৌমাও জেদ ধরেছে। আমি বলি যা ভালো বোঝে ওরা করুক।

তারকবাবু কথা কইলনা, স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ হাসতে থাকে তারকরত্ন।

—বুঝলে, বুড়ো মা বাপকে আজ ওদের বোঝা বলে মনে হয়। তাই সরে যেতে চাইছে?

ভাবিনী কথা কইল না। জীবনকে ঢুকতে দেখে তারকবাবু চাইলো।

—সাইকেল করে এতটা পথ যাতায়াত করে শরীর টিকছে না। কাযেরও অসুবিধা হচ্ছে।

—মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তারকবাবু বলে।

—তাই ওখানেই বাসা করতে চাও?

—কোম্পানীই কোয়ার্টার দিচ্ছে।

তারকবাবু ছেলের দিকে চেয়ে থাকে; ওপাশে মণিমালার মুখখানাও দেখা যায়।

...ওর মনের ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে চাউনিতে। দুর্নিবার কোন বাঁচার প্রয়োজনের তাগিদ আজ ওদের সব কর্তব্যও ভুলিয়েছে। শুধু বেঁচে থাকা—এবং সেটা মুখ্যত নিজেকে কেন্দ্র করেই। ওদের নিষেধকরা মানেই নিজের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাওয়া।

তারকবাবু এত অসহায় বোধ করতে পারেনা নিজেকে। বলে ওঠে—বেশ, সেইখানেই যাও।

বলে ওঠে জীবন—মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করবো।

তারকবাবু বলেন বৌমাও যাবে তো? হ্যাঁ সেইই ভাল। যাচ্ছো কবে?

—ভাবছি কাল সকালেই।

ভাবিনী চমকে ওঠে। তারকবাবু জবাব দেয়।

...বেশ!

জীবন এত সহজে কায হাসিল হবে ভাবতে পারেনি। খুশী হয়েই বের হয়ে আসে। মণিমালাও খুশী হয়েছে। দুচোখে তার আনন্দের আভা। এই কারাগার থেকে মুক্তিপত্র পেয়েছে সে। বাইরের জগতে নোতুন করে বাঁচতে পারবে।

...ভাবিনী আর্তনাদ করে ওঠে—এ তুমি কি করলে?

তারকবাবু শান্ত ভাবেই জবাব দেয়—ঠিকই করেছি বড়বৌ। যে পাতা ঝরে যাবে তা যেতে দিতেই হবে। জীর্ণ বাস ত্যাগ করে নোতুনকে নিতেই হবে।

—তাই বলে মা-বাবাকে ফেলে এই সময়ে চলে যাবে তারা?

—ওদের বাঁচতে দাও বড়বৌ, ওরা এখনও এ যুগের মাঝে বাঁচবার পথ পেতে পারে। তুমি আমি আজ বাতিলের দলে; অন্ধকার ধ্বসে-পড়া এই বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যে রায় বংশের ইতিহাস শেষ হয়ে যাবে। আমরা সেই রায় বংশের শেষ পুরুষ।

কাঁদছে ভাবিনী। দুঃখে আতঙ্কে ভীত একটি নারী। তার সব যেন হারিয়ে গেল। তারকবাবু কথা বলেনা—জানলার বাইরে চেয়ে থাকে। আকাশে আকাশে সেখানে শুধু আগুন আর তার লাল তীব্র শিখা।

…কদমবৌ কদিন নোতুন বাসায় এসে হাঁপিয়ে উঠেছে। বিশ্রী কদর্য পরিবেশ। জানলা দিয়ে দেখেছে ধানকলের মজুর আর কামিনদের মধ্যে কি কুশ্রী সম্পর্ক। আকাশ বাতাস ভরে ওঠে ওদের কদর্য ভাষায়।

জানলা বন্ধ করে দিয়েছে নিদারুণ ঘৃণায়।

রোদপোড়া ডাঙ্গার একদিকে ছোট্ট বাড়ীখানা, ওদিকে একটা পুকুর। অনেক খাদ করে তবে এই ডাঙ্গায় জল বের করেছে। চারিদিকে উঠেছে কাঁকুরে খাদ, ধারে নরম মাটির পাড়ের উপর কলাগাছ—দু একটা কাঁঠাল গাছ।

জায়গাটা একটু ছায়াঘন সবুজ।

ভুবন সারাদিন কায নিয়ে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে মাল আনতে—বা চালান দিতে ট্রাকে করে দুর্গাপুর—বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর যায়।

লোকটা কেমন বদলে গেছে। সেই আগেকার সহজ সরল মানুষটি আর নেই কেমন কঠিন রুক্ষতা এসেছে চেহারায়। কথাবার্তায় ফুটে ওঠে কর্কশ ভাব।

—ভাত হয়েছে?

…কোনমতে একটু তেলচান করে ভাতের থালায় বসে ভুবন। বলে ওঠে—বুঝলি, ভাবছি মাল যা তৈরী হচ্ছে তা পড়তায় কামারপাড়ার কো-অপারেটিভকে দোব লাটে তুলে। ওরাতো শুনলাম মিইয়ে গেছে। তাছাড়া গদাই ষষ্ঠীও কাল এসেছিল।

—কেনে? কেমন যেন ভাল লাগেনা কথাটা কদমের।

—কেনে আবার, কাযের ধান্দায়। রস যে শুকিয়ে আসছে। গ্রামপ্রধান এমোকালী আর অশোকবাবু। সব ব্যাটাকে দেখবো। তালাই গুটোন করে দোব। দাসমশাই তো আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছে কারখানা—

মাথা নীচু করে কদম ডাল ঢালতে থাকে। ভুবন বলে ওঠে—চুপ করে রইলি যে। কথাটা পানি পানি লাগছে না।

—জাত জিয়াতের সর্বনাশের কথা কারই বা ভাল লাগে।

ভুবন কি একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। মাঝে মাঝে দেখেছে কেমন বদলে যায় কদম।

—এখানে তুর ভাল লাগেনা লয়?

একটু বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলে ওঠে কদম—কেনে ভালো লাগবেক নাই? এত সুখে আছি। খেছি দেছি পাকাবাড়ী!

—হাঃ হাঃ বাব্বাঃ তবে! থাকতিস উথানে এমনি?

—না, এত দুখে থাকতাম নাই, তবে—

—তবে কি?

—শান্তি ছিল, স্বস্তি ছিল।

কথাটা বলে দাঁড়াল না কদম, ভিতরে চলে গেল।

—ধ্যাত্তোর!…ভুবন বিরক্ত হয়ে ভাতগুলো কোন-রকমে গোগ্রাসে গিলতে থাকে। সদরে যেতে হবে তাকে। এ যেন তার বেশ লাগে।

বেশ রঙ্গীণ জীবন। কেনাবেচার ফাঁক থেকে একরাত জাঁকালো ফুর্তি করার খরচটা উঠে আসে। ধেনো আর ভাল লাগে না, সহরের দামী মদই খায়; এখান ওখানে একটু ঢু মারে—সেই উন্মাদনা আর চাঞ্চল্যের সামনে বিচিত্র কোন নারীমাংস ভালোই লাগে, তাঁদের তুলনায় কদম অনেক ঠাণ্ডা—হিম। ক্লান্তি এসেছে তাই।

কদমও এটা অনুভব করেছে, জেনেছে ওর অন্তরের স্বরূপ। ক্রমশঃ তাই ভিতর বাইরে বেপরোয়ার মত বদলে চলেছে ভুবন।

—কখন ফিরবে ?

ভুবন বের হয়ে যাচ্ছিল, ওর ডাকে দাঁড়াল, বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—

—ধ্যাত্তোর। দিলে তো পিছু ডেকে। যাচ্ছি শুভ কাযে—সদরে।

—খুব শুভ কায যাহোক।

—ফিরতে না পারলে কাল সকালে আসবো।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কদম, কথা বলেনা। ডাঙ্গার ধারে এই বাড়ীতে একলা থাকতে ভয় করে, লোকজন নেই একটা কথা বলবার। মুখ বন্ধ করে থাকতে হাঁপিয়ে ওঠে। বলে ওঠে কদম।

—একা থাকতে ভয় করে।

—মাইরী। হাসছে ভুবন বিশ্রী কদর্য হাসি। আরও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। ঘৃণাভরে সরে গেল কদম। ওর দুচোখে দেখে কি একটা সেই আগেকার অবিশ্বাস—ঘৃণা আর অপমান করা চাহনি। ওকে আজও অবিশ্বাস করে—ঠিক তাও নয়, যেন মনে মনে সেটাকে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়ে ও চলেছে।

কদম কথা বলল না। লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। বের হয়ে ভুবন কেঁদগাছের নীচে ট্রাকখানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ীর নীচে একটা গদি পেতে গোকুল কি ঠোকাঠুকি করছিল—রোগা লিকলিকে লোকটা বের হয়ে আসছে ওর দিকে।

সদরে যাবার মালপত্রও চাপান হচ্ছে তাতে।

...জানলাটা বন্ধ করে দিল কদমবৌ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জোনাকজ্বলা তারাজ্বলা সন্ধ্যা। সারা আকাশ জুড়ে আঁধার রাজ্যি নামছে—দূরে দুর্গাপুর-বাঁকুড়ার হাইওয়ের উপর দিয়ে দুটো জোরালো হেডলাইট জেলে লরীখানা ছুটে যায়। ওদের ইঞ্জিনের শব্দ আর মাটি কামড়ানো টায়ারের একটানা গর্জন কানে আসে। একপাল দৈত্য যেন দাপাদাপি করে বনের অতলে হারিয়ে গেল—আবার বের হয়ে আসে দুএকটা।

মিলের কাযও বন্ধ হয়ে গেছে, আজকের মত ছুটি।

স্তব্ধ বিশাল কলবাড়ী—বাসনের কারখানা। এদিক ওদিকে দু একটা আলো জ্বলছে, মিটমিটে কম-পাওয়ারের বাল্ব মাত্র, ঠাঁই ঠাঁই আলোর আভাষ—আবার চারিদিকে অন্ধকার ভিড় করে আছে।

রাত কত জানে না ; হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয় কদম বৌ—ওকে এখানে দেখবে বিশ্বাসই করতে পারে না। পানুদাস ঢুকছে।

...অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে কদম। দূর থেকে মাঝবয়সী লোকটাকে দেখছে কদম, আগেও দেখেছে।

আজ সে যেন অন্য মানুষ। আদ্দির পাঞ্জাবী—পায়ে পামসু—গলার দামী বোতামগুলো আলোয় ঝিকমিক করছে। বাতাসে একটা মিষ্টি সুবাস পানুদাস সেন্ট ছড়িয়েছে গা ময়। তীব্র তার সৌরভ।

হাসছে পানু—একলা আছ তাই খবর নিতে এলাম।

জবাব দিল না কদম, লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। বন থেকে বের হয়ে আসা ধূর্ত শিয়ালকে দেখছে কেমন সন্তর্পণে লোকালয়ের দিকে এগিয়ে যায় পলাতক হাঁস মুরগীর সন্ধানে—তেমনি লোভ আর লালসায় দুচোখ জ্বলছে লোকটার। পানু বলে চলে।

—ভুবনও বলছিল, এখানে নাকি মন টিকছে না তোমার। তা সত্যিই তো, ছেলেপুলেও নেই। আর বয়সই বা কি ? মন উতলা হবারই কথা। তা একটা রেডিও আনতে বলেছি ভুবনকে—ওটা রেখো—গান-বাজনা শুনবে।

—কদম তখনও চুপ।

পানুই নির্লজ্জের মত বলে ওঠে—কই এলাম, বসতে বল্লে না ? চুপ করে আসনটা পেতে দেয় কদম, ঘোমটা একটু টেনেছে—কালো ডাগর দুচোখে কেমন সরম মাখানো একটু চাহনি—পানু দাস অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

পানুদাস চেপে বসলো—নিজের দাপে দখল করা মাটিতে তার অধিকার যেন কায়েম করতে চায় সে।

—আজ রাতে বোধহয় ভুবন ফিরবে না। এত কি কায—আমার ঠিক ভাল বোধহয় না।

—ভালই ছিল আগে। বলে ওঠে কদম।

হাসছে পানু—এ মাটির দোষ বলছ ? তা বলতে পারো। কিন্তু কই তুমি তো বদলাও নি।

কথা কইল না কদম। ওর দিকে চেয়ে থাকে। পানু বলে ওঠে।

—দিন বদলের সঙ্গে মানুষও বদলায়, মানুষের স্বভাব ও। ফস্ করে কদম জবাব দেয়।

—তাই দেখছি। পায়ের কাদাও ধুলো হয়ে মাথায় ঠেকে।

পানুদাস চুপ করে কথাটা শোনে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কেমন একটা কালো ছায়া ফুটে ওঠে।

দাঁড়াল পানুদাস—চলি্ কদম বৌ।

—আসুন।

পানু পিছন ফিরে বলে ওঠে—আসতে বলছ? কেউ যদি আবার দেখে ফেলে। অবশ্য তোমার তাতে মনে হয় সুনামের বেশ কম কিছুই হবে না।

কদমের সারা শরীরে রক্ত বয়ে যায়। সামনেই পড়েছিল ঝাঁটাটা, মনে হয় তাই তুলে নিয়ে আগাপাশ্তালা ধোলাই করে দেয়! বলে চলে পানু।

—গোকুলও এজলাসে দাঁড়িয়ে বলেছিল কথাটা। তা ছাড়া ভুবনই বলছিল মানে এমোকালী—ওই যে লীডার তোমাদের অশোকবাবু!

·· কঠিনকণ্ঠে বলে ওঠে কদম—যাবেন? দরজাটা বন্ধ করবো।

—যাই। দরজাটা ভালো করেই বন্ধ কর কদমবৌ—বাইরের লোক অবশ্য রাতে এখানে ঢুকতে পারবে না। পাহারাদারও রয়েছে তো! আচ্ছা—।

…পানু বের হয়ে গেল। জিবের ডগা দিয়ে যতটুকু গরল ছড়ানো সম্ভব সবটুকুই ছড়িয়ে গেল, নীল হয়ে আসে সারা দেহ বিষের জ্বালায়।

ভুবন আর পানুদাস! ওরা দুজনেই এক সুরেই বাঁধা; আজ মনে হয় ভুবন ইচ্ছা করেই মালিককেও লেলিয়ে দিয়েছে। খুশী করতে চায় তাকে · নিজের হীন জঘন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ হিসাবেই ব্যবহার করতে চায় তাকে—স্ত্রীর মর্যাদাটুকুও পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।…হু হু বয় রাতের বাতাস নির্জন প্রান্তরে—বাধাবন্ধহীন বাতাস।

ভুবনের উপরই রাগ হয় কদমের। এতদিনে ও এতখানি নীচে নেমেছে কল্পনাও করতে পারে না। মনে মনে আজ কদমও তৈরী হয়। অনেক সহ্য করেছে—এবার সব কিছু তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করবার পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে।

…লোকটা হাওয়ার মত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—উপে গেল কর্পূরের মত। কারিগর লোকটা।

মিষ্টির মন কাঁদেনা—যদিও একটু মন কেমন করে আর মনে হয় ভালোই করেছে সে। ওকে আর সহ্য করতে পারতো না। পাকা বাঁশে ঘুণ ধরার মত লোকটার অন্তরে ঘুণ ধরেছিল; এতদিন চাপা ছিল—সুযোগ পেতেই প্রকাশ পায় তার স্বরূপ। অনেকের মাঝেই খুঁজেছিল মনের মানুষ—একজন সঙ্গী; চেয়েছিল শূন্য মনকে পূর্ণ করতে কারো প্রীতিস্পর্শে—কিন্তু এমনিভাবে ঠকবে তা জানতো না।

—আমি নিজের কাছে নিজে ঠকেছি মিতে।

বহু দুঃখেই কথাটা প্রকাশ করে মিষ্টি।

শূন্য ঘর। সাজানো ঘর। অবিনাশ দেখেছে কেমন করে তিলে তিলে লোকটা বদলে গেল, সব হারালো তার।

—তা একবার খোঁজ-খপরও করবেনা তার?

হাসে মিষ্টি—বাসি ফুলের মালা আর গলায় নাইবা পরলাম।

—তবে?

বহু আক্ষেপের সঙ্গে যেন কথাগুলো বলে মিষ্টি—কলসী আর ভরা হোলনা মিতেন, যে ঘাটেই গেলাম জল ভরতে, দেখলাম কাদাগোলা জল আর তাতে থিকথিকে পোকা, কলসী তাই শূন্যিই রয়ে গেল।

অবিনাশ ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ডোমপাড়ার বাইরে ঝুপড়িগুলো আঁধারে হারিয়ে গেছে, বন থেকে হাওয়া ভেসে আসছে—কুর্চি ফুলের গন্ধমাখা হাওয়া।

সানাইএর অন্তরে কি সেই ব্যাকুল সুর তোলে।

—না আওয়ে বালম্।

ক্যা করু—সজনী।

…অর্থ বোঝেনা মিষ্টি, তবু ওই সুরের আকুল কান্না—সারা ব্যথাবিধুর মন ব্যাকুলতায় ভরিয়ে তোলে। অবিনাশের অন্তরেও তেমনি আকুতির ছায়া।

বলে ওঠে মিষ্টি—বিয়ে সাদী করে সংসারী হও মিতে। এমনি বিবাগী হয়ে ঘুরে মরোনা।

—কেনে ?···

—ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়ানোর বড় জ্বালা ভাই, বড়ো জ্বালা।

মিষ্টির মনে সেই চাপা বেদনাটা ফুটে উঠেছে—দু চোখের চাহনিতে তারই প্রকাশ।

কাল বৈশাখী নেমেছে। যত দূর চোখ যায় এদিকে লাল রুক্ষ প্রান্তর—আর সবুজহলুদে মেশা শালবন সীমা —কাছিমের পিঠে জিরি জিরি বিড়ালের লোম-ক্রমশঃ উঠে গিয়ে দিগন্ত সীমা স্পর্শ করেছে। বাটির মত উপুড় হয়ে নামা ধূসর আকাশ ছেয়ে আসে কালো জমাট পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ—এক কোণ থেকে অন্য কোণ অবধি ছেয়ে ফেলে—দূরে কোথায় গোঁ গোঁ করছে বন্দী বাতাস।

···জনহীন প্রান্তর আর বনের মাথায়—শান্ত জনপদকে আক্রমণ করার চক্রান্ত চলেছে। গরুগুলো ছুটে ফিরছে গ্রামের পানে। ত্রস্ত পথচারী আশ্রয়ের জন্য দৌড়চ্ছে।··· সারা গ্রাম নিস্তব্ধ।

·· তৃষিত ধরিত্রী উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে,···ওর কঠিন বুক খরতাপে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে কাঁকুরে ডাঙ্গার প্রান্তে কোন রকমে টিকে আছে গাছ-গুলো।

···অতুলকামার—অতুলকামার কেন গ্রামের অনেকেই বৎসরের প্রথম মেঘসম্ভারের দিকে চেয়ে আছে। বাউরী-পাড়ার অনেকেই। বৃষ্টি নামুক—ঠাণ্ডা হোক বসুমতী। ···মাটির বুকে বতর আসুক।

···কালো মেঘ জমা আকাশ হঠাৎ লাল গেরুয়া বর্ণ হয়ে ওঠে। শিখা দাঁড়িয়েছিল বাসার বাইরে, থমথমে বাতাস। স্তব্ধ হয়ে গেছে তার প্রবাহ; গরম আর গুমোট চারিদিক।

শিখা লাল আগুনলাগা আকাশের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, বিচিত্র এর পরিবেশ। রুদ্র আর ধ্বংস এর চারিদিকে। প্রকট হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাসে সেই ভয়াল রূপ।

···গর্জন শোনা যায়—অদৃশ্য কোন সৈন্যবাহিনীর কলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে ওঠে আকাশ বাতাসে।···দূরে বনের বুকে দেখা যায়—আকাশকোলে কি এক ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলী, পাখীগুলো ছোট্ট কালো বিন্দুর মত উড়ছে। গাছের মাথাগুলো ধরে যেন সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে উপড়ে ফেলবে তাদের মাটি থেকে—এগিয়ে আসছে ঝড়।

লাল ধূলোর আভায়—কালো আকাশ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কাঁপছে ডাঙ্গার বুকে ঘর ক'খানা।

সারদা ডাক্তার হেঁকে ওঠে—শিখামা, ঘরের ভিতর যাও।

ঝড়ের বেগে ওর গলাটাও যেন শোনা যায় না, কাঁকরগুলো তীব্র বাতাসের বেগে ছুটে এসে জানলায় লাগছে পট পট শব্দে, গায়ে মুখে বেঁধে।

···লাল ধুলোয় সব ঢেকে গেছে—আচ্ছন্ন হয়ে যায় দৃষ্টি। সব ওই ধ্বংসলীলার মাঝে হারিয়ে যায়। সারা গ্রামকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেবে ওই ঝড়।

বৃষ্টি নামল—তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

ঝড় থেমে গেছে—কালো বৃষ্টিধোয়া আকাশ শালবন সীমায় থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিমিলি শিখা ঝলসে ওঠে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি।

···শাল কেঁদগাছ এর বন ভিজছে—ভিজছে ফুলে ভরা মহুয়া গাছগুলো, আকাশেরও বিরাম নেই। বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ।

···সোঁদা মাটি ভেজা অদ্ভুত নেশা লাগানো একটি বিচিত্র সুবাস, বাতাসে মৃত্তিকার বুক থেকে ওঠে তৃপ্তির আবেশ; নীরব সেই রহস্যময়ী ধরিত্রীর বুকে খুশীর আভা।

মাটির এত কাছে কখনও থাকেনি শিখা।

ঝড়ের পর—ধ্বংসের পর বৃষ্টি বিধৌত মৃত্তিকা আকাশ বনানীর এই সুন্দর অনুভূতি আর নবরূপের সঙ্গে পরিচিত হয় নি।

···হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতিঢাকা কাকে এগিয়ে আসতে দেখে চাইল শিখা। সামনের বাগানের গাছগুলো শুকিয়ে গেছল, উর্বরা মৃত্তিকা বৃষ্টির জলে আবার সতেজ হয়ে উঠেছে ফুটন্ত গোলাপ—রজনীগন্ধা স্থলপদ্মের গাছগুলো।

—তুমি!

অবাক হয়ে যায় শিখা অশোককে আসতে দেখে ভিজে গেছে—

—সদর থেকে ফিরেই এলাম এদিকে।

—কেন ভেবেছিলে আমরা বুঝি উড়েই গেলাম।

—না! এই বৃষ্টি খুব ভালো লাগলো। বেরিয়ে পড়লাম।

জানো শিখা—কাল থেকেই ফুল-সুইংএ কাষ সুরু করতে পারবো। কাল থেকে আমাদের কো-অপারেটিভের কাষ সুরু।

শিখা ওর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে মুখে ওর খুশির দীপ্তি।

…সেই খবরটাই তাকে জানাতে এসেছে। তার পরিশ্রম আর তার সাফল্যের সংবাদ।

—একটু চাও খাবেন না?

—না। সময় নেই। ওদের সবাইকে খবর দিতে হবে।

—বের হয়ে গেল অশোক অন্ধকারেই বৃষ্টির মধ্যে।

গজরাচ্ছে আকাশ—বিদ্যুতের ঝলকে আর মেঘের গর্জনে। অন্ধকার আকাশকোল, ওদিকে দুর্গাপুর কোক ওভেনের বাড়তি গ্যাস জলার আগুন আর ব্লাষ্ট ফার্ণেসের লালাভ আলোয় ভরপুর; এরই মাঝে বেঁচে থাকার স্বীকৃতি নিয়ে একটি মানুষ যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

…দাঁড়িয়ে আছে শিখা, হঠাৎ সারদা ডাক্তারকে দেখে ওর দিকে চাইল।

—অশোকবাবু না?

—হ্যাঁ। ছোট জবাব দেয় শিখা।

—পাগল মা; ওরা খুশীতে পাগল। নোতুন মাটির বুকে ফসল জাগে যে খুশীতে—সেই খুশী ওর মনে। সব ছেড়ে সেই খেয়ালেই রয়ে গেল।

শিখা কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—ও কি ভুল করেছে ডাক্তারবাবু?

সারদাবাবু জবাব দেন।

—ভুল! না মা—ওই লোহাকারখানা—গাঁয়ের এই অবস্থা। ধ্বসেপড়া জীবনযাত্রা দেখে মনে হয়—এরও দরকার। খুব দরকার। একটাকে ছেড়ে অন্যটা নয়; একটাকে অস্বীকার করে অন্যটা নয়, দুটোর সমন্বয়ে যে নোতুন জীবন গড়ে উঠবে ওই অশোকবাবু সেই মতেই বিশ্বাসী। তাই যে সত্য সেই পরীক্ষা করছে মা।

ও ভুল করেনি। 'কিন্তু বড্ড একা—চারিদিকে এত বাধা ঠেলে এগোনো বড় কঠিন।

চুপ করে ওর কথাগুলো শোনে শিখা। একটি লোকের উদ্যমেই আজ নোতুন গ্রাম—তাকে কেন্দ্র করে কৃষি-জীবনও আধুনিক পর্যায়ে উঠতে চলেছে। এ একা পাতাজোড়ার সমস্যা নয়—আমাদের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি মানুষেরই সমস্যা।

সারদা ডাক্তার বলে ওঠে—দেখছ না চারিদিকে শুধু ভাঙ্গছে আর ভাঙ্গছে। এই ঝড়ের পর যেমন নোতুন ফসলের সম্ভাবনা আনে বৃষ্টি, তেমনি এই ভাঙ্গাটাই সব নয়—গড়ার পর্বও আছে এই মতে ও বিশ্বাসী শিখা মা।

·· শিখা কথা বললো না। নিজের জীবনেও দেখেছে—সেও কোথায় এই মতে বিশ্বাস করে। নইলে নিজের বাড়ী-ঘর—বাবা-মা সবাই গেল; ভাই কোথায় কোন অসামাজিক অপরাধে জেলে। খবর নিতে পরিচয় দিতেও ঘৃণা করে। শুধু বাঁচবার জন্যই আজও সংগ্রাম করে চলেছে শিখা; আজ মনে হয় তারও সার্থকতা আছে।

হারাণো পথের বাঁকে তাই অশোককে দেখে সেই কঠিন শপথে আজ আবার বিশ্বাস ফিরে পায় সে।

…ভুবনকে পান্নু দাস অনেক উপরে তুলছে। কতকটা নিজের ব্যবসার খাতিরে, কতকটা বা অন্য প্রয়োজনে। ভুবন সে খবর রাখে না, দুর্গাপুরেই বেশ খানিকটা জমি নিয়ে ফলাও কারখানা করছে পান্নু দাস। ভুবনকে সেই-খানেই প্রমোশন দিয়ে পাঠাবে।

ভুবন খুশীতে ভরে ওঠে। মনে মনে স্বপ্ন দেখে দুর্গা-পুরের জীবনের। সেই বিলাসব্যসন আর কর্মব্যস্ত জীবন। সেখানে অন্য কিছু ভাববার নেই—শুধু কাষ আর কাষ, অবসর সময়টুকু ভোগের স্রোতে ভেসে যাওয়া। মাইনেও পাবে মোটা।…নিজের কথাই ভাবে। পান্নুকে তাই আমন্ত্রণই জানায়—যদি বাড়ীতে একবার পায়ের ধুলো দেন দাসবাবু।

হাসে পান্নু। তার মনে সেই রাত্রের একটু বুভুক্ষু ছবি ফুটে ওঠে লালসার শিখা মনে মনে জ্বলছে তুষের আগুনের মত মনের অতলে।

কদম!…যৌবনপুষ্ট কামনামদির দেহ।

—কিন্তু!…বাড়ীতে একবার শুধিয়ে দেখো—

—হ্যাঁ। আপনার পায়ের ধুলো পড়বে, অন্নদাতা, সে আবার কি বলবে। উদ্ধার হয়ে যাবে সে মাগী।

হাসছে পান্নু—কি জানি।

তবু রাজী হয় পান্নু।

দিনের শেষে কাজটাও তাই মনে পড়ে। একবার সদরে গিয়ে কয়েকটা মেসিনের লাইসেন্স আনতে হবে। ছুটতে হবে বর্দ্ধমানে। গাড়ী অবশ্য তৈরী।

ভুবনই অতি উৎসাহে বলে ওঠে—ঠিক আছে। যাবো, আজ সন্ধ্যা নাগাদ ফিরবো না হয়।

পান্নু যেন অগত্যা ওর কথাতেই রাজী হয়। —দেখ। না হয় পরেই হবে।

ভুবন কাযের নেশায়—ভবিষ্যতের উন্মাদনায় মেতে উঠেছে।

—না, না। কায আগে। আপনি কিন্তু দয়া করে যাবেন। আপনারই তো বাড়ী।

পান্নু আমতা আমতা করে—দেখা যাক।

কথাটা কদম শোনে মাত্র, জবাব দেয় না। দুর্গাপুরের প্রমোশনের কথাও শুনেছে কদম। প্রাণবল্লভবাবু যে কত ভালো লোক—ভুবনকে কেমন ভালবাসে, সে কথাও শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গেছে। ভুবন বলে ওঠে।

—আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি যেন না হয় বুঝলি, মুনিব—অন্নদাতা। কোত্থেকে কোথায় এসেছি—আরও কোথায় উঠবো দেখবি।

কদম জবাব দেয়—হ্যাঁ, তা তো দেখছিই।

—গাঁয়ের ওই অন্ধকার পাঁদাড়ে পড়ে থাকলে হতো ইসব? ফিঁচের উপর ট্যানা একখানা জড়িয়ে শালে হাতুড়ী পেটা। রামচন্দর।

ভুবন মনে মনে তাই পান্নুদাসের কাছে অত্যন্ত ঋণী, কৃতজ্ঞ। কদমের দিক থেকে ঋণ কারো প্রতিই নেই, কর্তব্য ওটুকু—যেটুকু ছিল স্ত্রীর কর্তব্য, স্বামীর দুর্ব্যবহারে তাও সহ্যের সীমাপ্রান্তে এসে পৌচেছে।

ভুবন বলে ওঠে—বাবুকে আজ নেমতন্ন করে এসেছি।

কদম ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল। প্রশ্ন করে। —তা আমাকে কি করতে হবে?

—সহজভাবে ওকে নিজের দলে, মতে আনবার চেষ্টা করে ভুবন। এটাও ক্রমশঃ শিখেছে সে—এই মাটিতে, এই জীবনে এসে চালাকিটাও রপ্ত করেছে গোঁয়াতুঁমি ছেড়ে। বলে ওঠে ভুবন।

—বাঃ রে, তোর বাড়ীতে আসবে কত ভাগ্যির কথা—একটু কথাবার্তা কইবি, আমিও ফিরে আসবো রাতেই। আর হ্যাঁ—একটু খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়ও করবি। মাছ মাংস গোকুল কিনে দিয়ে যাবে—বলে গেলাম।

কদম কথা বলে না, ক্রমশঃ ওই লোকটার মনের নীচেকার কুটিল অভিসন্ধিটাও বেশ বুঝতে পেরেছে। পান্নুদাসও আজ ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে জীবনের কিছুটা সময় শান্তি আর ভোগের ইন্ধন খোঁজে। আগে এসব কথা শোনেনি তার সম্বন্ধে।

ভুবনও বদলেছে—বদলেছে পান্নুদাসও।

কিন্তু কদম! মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র সায় পায় নি। এগিয়ে যাবার—নিজেকে পণ্য করে অনেককিছু অর্জন করার অপরিসীম কাঙ্গালপনা থেকে তার সেই আগেকার খড়ো ঘরে অভাব দুঃখ আর তার মাঝে শান্তি-টুকুই ছিল অনেক ভালো।

সে বদলাতে পারেনি, শুধু পারেনি নয়। এ জীবনকে সহ্য করতে পারেনি—পারেনি নিজেকে সেই লোভ মোহ আর অন্ধকামনাময় জীবনের সামিল করে নিতে।

…হঠাৎ গলার শব্দ শুনে ফিরে চাইল কদম।

দুপুরের রোদ ম্লান হয়ে আসছে। ছায়া পড়েছে লম্বা হয়ে—কদর্য বিকৃত একটা ছায়া। গোকুল ঢুকছে কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলান। একটু চমকে ওর দিকে চাইল কদম। প্রায় বছর কয়েক পর ওকে দেখছে কাছ থেকে—আগেকার এমনি একটি বৈকালের ছবি কদমের চোখের উপর ভেসে ওঠে। একটি বুভুক্ষু রাস্তার ভিখারী সেদিন গোকুল, চোখে মুখে একটি অসহায় পাণ্ডুর ভাব। তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অতুল।

খাইয়ে ছিল কদম—ক্ষুধার অন্ন জুগিয়েছিল, তৃষ্ণায় দিয়েছিল পানীয়; সেই স্বাভাবিক মানবিক ব্যবহারের মূল্য দিয়েছিল গোকুল—কোর্টে দাঁড়িয়ে তার নামে দুর-পনের কলঙ্ক দিয়ে।

…আজও যা ভুবনের মনের অতলে রয়ে গেছে, তাই

হয়তো ভুবন সাহস করেছে—পান্নুদাসের সামনে তাকে বিকিয়ে দিয়ে নিজের চাকরীর উন্নতি করতে।

—এগুলো রাখো বৌদি ; গোকুল দাওয়ায় চেপে বসে ঝুলি থেকে শালপাতা মোড়া রক্ত লাগা মাংস বেশ কিছুটা বের করে দেয়, কিছু আনাজপত্র—আর কাগজ জড়ানো একটা বোতলের মত।

দেখে কদম চমকে ওঠে—ওটা কি!

হাসে গোকুল—পান্নুবাবুর ওসব আজকাল এক আধটুর দরকার হয়। ওটা উঠিয়ে রাখো সামনে থেকে।

কদমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন জলছে। গোকুলের মুখ চোখ কেমন চোয়াড়ে হয়ে উঠেছে। একটু কুৎসিৎ ভঙ্গীতে হাসবার চেষ্টা করে—ভুবনদা এসব বলেনি কিছু তোমাকে? মানে যে পূজোর যে মন্তর আর কি!

কদমের দুচোখ ফেটে লজ্জায় আর অপমানে কান্না আসে। বুকের ভিতরটা হু হু জলছে। গোকুল বলে ওঠে—এক গেলাস জল দেবা? ওই সুন্দর হাতের একটু মিষ্টি জল।

—জল! চমকে উঠে কদম। আবার আজও এসেছে ওই দৈত্যটা তৃষ্ণায় জল চাইতে। সবাই তাকে কি মনে করে!

আখের শালের কথা মনে পড়ে, ভেসে ওঠে সেই গুড়-জ্বালানী কড়াই আর রসের হাঁড়িগুলোর কথা; মুনিব আর চাষী গুড়গুলো তুলে নিয়ে চলে যায়—পড়ে থাকে গুড়মাখানো কড়াইটা। কুকুর আর কাক চিলে ঠুকরে খায়।

গোকুলও যেন এমনি এসেছে—পান্নুদাস মুনিবের পাত চাটার পর যদি কিছু অবশেষ থাকে—চেটে-পুটে খাবে। কুকুরের দল—ঘেয়ো নোংরা কুকুর ওরা সব। কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয় কদম।

—বাইরের কলে গিয়ে খাওগে। যাও।

গোকুল উঠে পড়লো, বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে, কেমন যেন ভয় পেয়েছে। পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে বলে ওঠে।

—ওসব কথা বলেছিলাম—দাসমশাইএর কানে যেন না ওঠে মাইরী। যা রেগেছ তুমি, বাবুকে যদি বলে দাও বিলকুল নোকরী খতম করে দেবে। হাজার হোক বাবুর মেয়েমানুষকে—

চাবুক খেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে কদম-বৌ। থরথরিয়ে কাঁপছে সারা দেহ। প্রতিবাদ করবার, চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাবার সামর্থ্যটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বের হয়ে গেল গোকুল।

উঠোনে আমগাছের ছায়াটা আঁধার হয়ে আসে। বেলা পড়ে এল। রোদ গেল—এল অন্ধকার। দুঃখ হতাশা আর অপমানের অন্ধকার। বলির পাঁঠার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে কদম।

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে, অভিযোগ জানাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কেঁদে লাভ কি? অভিযোগই জানাবে কার কাছে? পালাবে?…তাই বা পালাবে কোথায়?

কি করে জানাবে বৃদ্ধ অসহায় অতুলকামারকে তার স্বামীর অমানুষিক পাশবিকতার কথা, লোভের জঘন্য কাহিনী। নিজেরই দুঃসহ এ লজ্জা—দুস্তর এ দুঃখ আর অপমান।

হঠাৎ কি যেন ভেবে…কঠিন হয়ে ওঠে। ভাবনার হারাণো খেইগুলো একটা সিদ্ধান্তের শেষ সূত্রে এসে গ্রথিত হয়ে ওঠে। স্তব্ধ হয় এলোমেলো চিন্তার জটগুলো।

[ক্রমশঃ

হিন্দুত্ব

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ভারতে আজ যত ধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল—পরমব্রহ্ম নিরাকার মহাপুরুষসহ তাঁহার আশ্রিতা নিরাকারা মহাশক্তি (রাধা) হিন্দুর একমাত্র উপাস্য দেবতা। কারণ ঐ নিরাকার মহাপুরুষ মহা-প্রকৃতির সহায়তায় সমগ্র জগৎ এবং তাঁহার আশ্রিত সজীব নির্জ্জীব, স্থাবর-অস্থাবর সকল বস্তুই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিছুদিন পরে ঐ মহাপুরুষ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ঐ সঙ্গে মহাশক্তিরূপিণী মহাপ্রকৃতিও তিনভাগে বিভক্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিলেন সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী। প্রকৃতি সাবিত্রী আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিলেন সাবিত্রী ও গায়ত্রী, ইহাদের দ্বারাই জীব-জগতের বৃদ্ধি পাইল। ইতিপূর্ব্বে মহাশক্তিরূপিণী মহা-প্রকৃতি রাধা অপর একটি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন লক্ষ্মী। এক্ষণে পুনরায় অপর একটি নাম গ্রহণ করিলেন সীতা। ইহারা জগৎকে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ বিষ্ণু, নাম গ্রহণ করিলেন নারায়ণ, কৃষ্ণ ও রাম। এই কৃষ্ণ যদুপতি হইতে স্বতন্ত্র এবং এই রামও রঘুপতি হইতে স্বতন্ত্র। আর সীতা স্বয়ং রাধা বা লক্ষ্মীরই নামান্তর, ইনি জনকনন্দিনী হইতে স্বতন্ত্র।

রসময় পাগল মহাদেবও বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে বিভিন্ন নাম ধারণ করিলেন। অপরদিকে তাঁহার মহাশক্তি পার্ব্বতী আদিতেই পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। পরে তিনি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া হিন্দুর দ্বারে দ্বারে পূজিত হন। মহাদেবের সংস্পর্শ কামনায় চিরযৌবনা পার্ব্বতী তাঁহার নিত্য কলেবরকে বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ওদিকে রসময় ভোলানাথও তাঁহার শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কেবলই তাঁহার নিকট হইতে সরিতে থাকেন। আর ঐ সঙ্গে পার্ব্বতীর অপর ভগিনী বা সতিনী পার্ব্বতীর শক্তি বৃদ্ধির জন্যই হউক বা মহাদেবের সঙ্গলাভের ইচ্ছাতেই হউক পিতৃ-সঞ্চিত ধনরাজি বহন করিয়া আনিয়া মহাদেবের বক্ষোপরি স্থাপন করেন। ফলে মহাদেবের বক্ষে একের পর একটি করিয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি হয়। ঐ বিস্ফোটকের যন্ত্রণায় মহাদেব পার্ব্বতীকে আহ্বান করেন। আর পার্ব্বতী নিজ অঙ্গকে মহাদেবের বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া ঐ বিস্ফোটক নিজ অঙ্গে ধারণ করেন, এইরূপভাবে মহাদেব পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে মহাকালীকেও দূরে রাখিয়া মহাকাল ভৈরব সাজিয়া যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। কাজেই পার্ব্বতী তাঁহার যোগভঙ্গের অপেক্ষায় কালযাপন করিতেছেন। আর গঙ্গাদেবী বহু-অপেক্ষা করিয়া শেষে পিতৃগৃহে ফিরিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সুতরাং আদি নিরাকার পরম ব্রহ্মকে লইয়াই প্রথমে হিন্দুর হিন্দুত্ব আরম্ভ হয়। তৎপরে যেমন যুগের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে তেমনি হিন্দুত্বের মধ্যে নানা বিভাগের সৃষ্টি হয়। মহাভারতীয় যুগ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব, শৈব ও ব্রাহ্মণ্য—এই তিনটি মতই প্রচলিত ছিল, তবে সেই সঙ্গে তাঁহাদের শক্তিরও আবির্ভাব ঘটিত।

বৈষ্ণবগণ ভাবিতেন তাঁহাদের ইষ্টদেবের অবস্থিতি বৈকুণ্ঠে, শৈবগণ ভাবিতেন তাঁহাদের ইষ্টদেবের আসন কৈলাসে আর ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীগণ ভাবিতেন তাঁহাদের ইষ্টদেবের আসন সৌরজগতের সর্ব্বত্র। বৈষ্ণবগণ নারায়ণ-সহ তাঁহার শক্তি ও উপশক্তির পূজা করিতেন, শৈবগণ শিবসহ তাঁহার শক্তি ও উপশক্তির পূজা করিতেন, আর ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীগণ ব্রহ্মা ও গায়ত্রী সহ ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহের উপাসনা করিতেন।

অনুমান, আদিতে মহাব্যাস, হিমালয় ও মহাসমুদ্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ঐ হিমালয় পর্ব্বতই হইতেছেন ব্রহ্মা, তাঁহার এবং তাঁহার শাখা প্রশাখাবৃন্দের দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। হিমালয়ের বক্ষেই সর্ব্বপ্রথমে জীব জগতের সৃষ্ট হয়। তাঁহারা চক্ষুরুন্মেলন করিয়াই

দেখিলেন ব্রহ্মার বক্ষোপরি নিজেরা অবস্থান করিতেছেন, আর ঊর্দ্ধে দেখিলেন, মহাব্যাসকে আশ্রয় করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্ররাজি বিরাজ করিতেছে এবং ঐ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্ররাজি হিমালয়ের পূর্ব্বপার্শ্ব হইতেই উর্দ্ধলোকে গমন করিতেছে। কাজেই হিমালয়ের পূর্ব্ব অংশকে তাঁহারা বৈকুণ্ঠ (বিষ্ণুর আসন) নামে গ্রহণ করিলেন। হিমালয়ের ঐ অংশ বৈভ্র নামেও পরিচিত। আসামের উত্তরে ছিল গন্ধর্ব্ব দেশ (চিত্ররথের দেশ) এবং ঐ গন্ধর্ব্বদেশের পার্শ্বেই ছিল বৈভ্রাজ নামক দেবোদ্যান, আর ঐ দেবোদ্যানের সংলগ্নই ছিল বৈকুণ্ঠ বা বৈভ্র। ইহার যথেষ্ট সমর্থন মিলে যেমন—

"পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণে নন্দনং বনন্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমে শৈলে সাবিত্রীশ্চোত্তরাঞ্চলে॥"

(বিশ্বকোষ, বৈভ্রাজশব্দ)

অনুমান, বর্ত্তমান দার্জ্জিলিংএর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বৈকুণ্ঠ নামে আখ্যাত হইয়াছিল। আর দার্জ্জিলিং ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী স্থান, যাহা আদিতে সমুদ্রোপকূলে ছিল, তাহাই কৈলাস নামে পরিচিত হইয়াছিল। কেন না উহাই ছিল মহাসমুদ্রের (মহাদেবের) আসন। পরবর্ত্তী কালে ঐ প্রদেশ নাগবংশীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় মহাদেব নাগভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। ঐ কৈলাস প্রসঙ্গে বিশ্বকোষ বলেন—

"বর্ত্তমান তিব্বতদেশে মানস সরোবরের নিকটও কাশ্মীররাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বে কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বত হইতেই সিন্ধু, শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান কৈলাসের অপর নাম গাঙ্গরী, সিন্ধু সাগর নদের উৎপত্তি স্থান হইতে সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণে লাধক, বলতি, রঙ্গদো এবং উত্তরে রথেদ্, কুভ্রা, শিথর ও হূণজানগর। এই শৈলে ১০ হাজার হইতে ১২ হাজার হাত উচ্চে ৬টী গিরিপথ আছে। ভোট জাতি ইহাকে 'তিসি' বলে। তাহাদের মতে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ।" (বিশ্বকোষ, কৈলাস শব্দ)

অনুমান, আর্য্যঋষিগণ সর্ব্বপ্রথমে সমগ্র হিমালয়কে—পরম-ব্রহ্ম নিরাকার মহাপুরুষের আসন রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা কল্পনা করেন। পরে ঐ হিমালয়কে তিন ভাগে ভাগ করিয়া পূর্ব্বভাগকে বিষ্ণুর আসন, পশ্চিম ভাগকে ব্রহ্মার আসন, আর মধ্যভাগকে মহাদেবের আসনরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান আর্য্যঋষি এবং প্রধান প্রধান নায়কগণও সম্মানিত হইতেন। তাহারই ফলে প্রজাপতি, অগ্নি, যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতি ঋষি এবং গণপতি (গণেশ), দেবসেনাপতি কার্তিক, ভূস্বামী জমিদার বাস্তপুরুষ (বাসভূমির প্রতিষ্ঠাতা) প্রভৃতিও অর্চ্চিত হইতেন। এখনও ঐ অর্চ্চনাধারা প্রচলিত আছে। অর্চ্চনা ধারাটি যতদূর সম্ভব রামায়ণের যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কেননা সীতার বনবাস-দণ্ডাদেশ হইতে অনুমিত হয় যে, ঐ সময়ে ঋষি-শক্তি, রাজ-শক্তি ও প্রজাশক্তি সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ক্ষাত্রধর্ম্ম সম-আচারী পরশুরামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হিন্দুর পুরুষ ও প্রকৃতি সমভাবে সকল বিষয়েই স্বাধীন ছিলেন। পরদারগ্রহণে বা পরপুরুষসঙ্গলাভে কোন দোষত্রুট ছিলনা। কুমারীপ্রকৃতির সন্তানগণ বা জারজ সন্তানগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জনক-জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজসরকারে রাজশক্তি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া হয়ত দেবসেনাপতির আসন লাভ করিতেন, নতুবা মুনিঋষিগণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া ঋষিত্বপ্রাপ্ত হইতেন। ঐরূপ জননপ্রসঙ্গে স্থলবিশেষে কুশপুত্তলিকা বা গাত্রময়লার ও অবতারণা ঘটত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কার্ত্তিক দেবসেনাপতি এবং ঋষি ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ ঋষি। ধন্বন্তরি ছিলেন বৈশ্যদুহিতা কুমারীবীরভদ্রার পুত্র, আর ঋষি ভরদ্বাজ ছিলেন বৃহস্পতিঋষির ঔরসজাত এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর উতথ্য ঋষির পত্নী মমতার গর্ভজাত। কার্ত্তিক গণেশ নাকি পার্ব্বতীর গর্ভজাত সন্তান নহেন। অনুমান, কার্ত্তিক ছিলেন জারজ সন্তান। রাজশক্তি তাঁহাকে শরবনে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর গণপতি রাজবংশে জন্মলাভ করিয়া পার্ব্বতীর বক্ষোপরি ভূমিষ্ট হন এবং জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য প্রকাশ করেন। পরে রাজদণ্ড লাভ করিয়া শীর্ষস্থানীয় হইলে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে শনির আবির্ভাবে সাধারণের সুখসুবিধাদানে অক্ষম হইয়া মহামূর্খ আখ্যালাভ করেন। গজমুণ্ড তাহারই প্রতীক।

যদুবংশের প্রতিষ্ঠাতা যদুর পুত্র ও পৌত্রগণ কর্ত্তৃক পরশুরামের পিতা জমদগ্নি ঋষি নিহত হইলে পরশুরাম

ক্ষত্রিয় নিধন-যজ্ঞ আরম্ভ করেন। আর বিধবা ক্ষত্রিয়াণী-গণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও অনার্য্য গোষ্ঠীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। দেশময় সামাজিক ব্যভিচার দেখা দেয়। তখন কশ্যপ মুনি পরশুরামের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বহু স্তবস্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষত্রিয়নিধন যজ্ঞ হইতে নিরস্ত করেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে হিন্দু জাতির মধ্যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। এই কশ্যপ মুনি সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সূর্য্যের পিতা হইতে স্বতন্ত্র। ইনি কাশ্যপ গোত্রের প্রবর্ত্তক।

আদিতে আর্য্যজাতি কর্ম্মগুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ঋষি ধন্বন্তরির আবির্ভাবে অর্থাৎ বৈবস্বত মনু বা সপ্তম মনুর সময়ে (যে সময়ে গালব ঋষি সপ্তর্ষি মধ্যে গণ্য ছিলেন) বৈদ্য জাতির সৃষ্টি হয়। তৎপরে পরশুরামের প্রভাবে ব্রাহ্মণ ঔরসজাত ক্ষত্রিয়াণী গর্ভস্থ সন্তান কায়স্থ আখ্যা লাভ করে, আর বৈশ্যের ঔরসজাত ক্ষত্রিয়াণী গর্ভস্থ সন্তান মাহিষ্য নামে পরিচিত হয়। আর অনার্য্য গোষ্ঠীর ঔরসজাত ক্ষত্রিয়াণী গর্ভস্থ সন্তানগণ হিন্দু জাতির নিম্নতর স্তরে (অনুমান, নবশাক সম্প্রদায় ব্যতীত) গমন করে। এই সময় হইতে নপুংসক বা বন্ধ্যাত্বগ্রস্ত ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীগণের নিকটে স্বামীর অনুমতিক্রমে অতি সঙ্গোপনে স্বর্গের দেবতাগণের (মুনি ঋষিগণের) আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। তাহারই ফলে পঞ্চপাণ্ডবের জন্মলাভ ঘটে। আর কুমারীর সন্তান অতি সঙ্গোপনে যাহাতে শিশুর কোন অনিষ্ট না হয় সেইরূপ কোন ভাসমান পাত্রে স্থাপন করিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। তাহারই ফলে মৎস্যগন্ধারপুত্র ব্যাসদেব এবং কুন্তিপুত্র দাতাকর্ণের আবির্ভাব ঘটে। অনেক সময় নিজপুত্রসহ পালিতপুত্রও নিজপুত্র মধ্যে গৃহীত হইত। সেই হেতু ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্রের পিতা হইয়া ছিলেন। আবার অনেক সময় সুশাসকগণের প্রজাও পুত্ররূপে পরিচিত হইত। অনুমান, সগর রাজা নিজ পুত্রসহ ঐরূপ ষাট হাজার পুত্রের পিতা ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্মধারা ও সামাজিক ধারা প্রচলিত ছিল। ইহার পরে দলে দলে বৈদেশিকগণের আবির্ভাব ঘটিতে থাকে, আর ঐ সঙ্গে সমাজ বন্ধন আরও দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে আরম্ভ করে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তে মগধের বার্হদ্রথ বংশীয় জরাসন্ধপুত্র সহদেব শীর্ষত্ব লাভ করেন। পূর্ব আর্য্যাবর্ত্তে দাতাকর্ণের পুত্র বৃষকেতুর প্রভাব অর্থাৎ কায়স্থ প্রভাব বিস্তৃত হয়। আর আসাম প্রদেশে শৈব-মতাবলম্বী নাগবংশীয় বভ্রুবাহন অপরাজেয় শক্তি লাভ করেন। অপর দিকে কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ ছিলেন নাবালক। বৃষকেতু তাঁহার আত্মীয় সাজিয়া তাঁহাকে পরম বৈষ্ণবে পরিণত করেন। কাজেই হস্তিনাপুরীর রাজবংশ কালক্রমে একেবারেই হীনবীর্য্য হইয়া কৌশাম্বীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর যদু-বংশীয়গণ ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে পলাইতে আরম্ভ করেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। তাঁহার রোগবিমুক্তি জন্য সূর্য্য-গোত্র বৃষকেতুর প্ররোচনায় শাকদ্বীপ (পারস্য) হইতে সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ আনীত হয়। তাঁহারা আসিয়া মূল শাম্বপুরে (বর্ত্তমান মূলতান সহরে) সূর্য্যপূজা করিয়া শাম্বকে রোগ-মুক্ত করেন। কাজেই সকলেই সূর্য্য আরাধনার দিকে আকৃষ্ট হয়। এখন হইতে ভারতে সৌরধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে। আর ঐ সঙ্গে ভারতবাসী ও পারস্যবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সেই সূত্রে শাকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ দলে দলে ভারতে আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা পারস্যবাসী বলিয়া এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে অবহেলার চক্ষে গ্রহণ করিয়া "রাজপুত" আখ্যা দান করেন। অপরদিকে আবার কলির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে বর্ত্তমান জলপাইগুড়িতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই। পারস্যদেশীয় ক্ষত্রিয় (রাজপুত) শিবভক্ত পৌণ্ড্র বাসুদেব ঐ সময়ে জলপাইগুড়ির রাজ্যশাসন করিতেন। ইহার সময়েই প্রথম জৈনমতের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু উহার বিকাশ পায় বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে। কাজেই বুদ্ধদেবের আগমনের পূর্ব্বে হিন্দুর হিন্দুত্ব বহুভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ঐ প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, মালদহের উত্তর সীমান্তে কলিগ্রামে আদি জিনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

বুদ্ধদেব সকল মতের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিজ ধর্ম্মমত প্রকাশ করেন। কিন্তু

সাধারণে তাঁহার মতের উদ্দেশ্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া নানা ব্যভিচারে মত্ত হয়। কাজেই শঙ্করাচার্য্যকে নিজ শৈব মত লইয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইতে হয়। এই সময় হইতে শৈব, সৌর এবং বৌদ্ধ, এই তিনটি মত পাশাপাশি চলিতে থাকে, আর অপরাপর মতগুলি কোণঠাসা হয়। ইহার পরে আবার মহম্মদের আবির্ভাব ঘটিলে ভারতীয় এবং এদেশে আগত পারশ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা দ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে যত্নবান হইতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে আদিশূরের সময়ে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য মত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মগধ এবং উত্তরবঙ্গ তখনও বৌদ্ধ ব্যভিচারে মত্ত ছিল। সেই কারণেই পালবংশের (পারস্যবাসী কায়স্থ) উত্থান লাভ ঘটে। পালবংশ পতনের পর বল্লালসেন কর্ম্মগুণানুসারে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির সংমিশ্রিত জাতিবর্গকে নবশাক সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। আর ঐ সঙ্গে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য মত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু নিজ চরিত্র দোষে (ভৈরবী চক্রের প্রভাবে) ব্রাহ্মণ্য মত প্রতিষ্ঠায় অকৃতকার্য্য হন। শেষে মৃত্যুকালে রাজ্য হইতে বৌদ্ধ-মতকে বিতাড়নজন্য নিজ পুত্র লক্ষ্মণসেনের উপর ভারঅর্পণ করিয়া যান। লক্ষ্মণ সেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পশুপতিও হলায়ুধের সাহায্যে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব প্রণয়ন পূর্ব্বক শাক্ততন্ত্র-বাদের প্রচার দ্বারা বৌদ্ধতন্ত্রবাদকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। লক্ষ্মণসেনের পর হইতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

একদিকে মুসলমান নৃপতিগণ রাজসম্মান ও ধন-দৌলতের মোহ দেখাইয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন। অপরদিকে হিন্দুসমাজ কোনরূপ দয়া-দাক্ষিণ্য না দেখাইয়া নিজ পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজনকে সমাজচ্যুত করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছিলেন। এইরূপে কালাপাহাড়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বহু কালাপাহাড়ের সৃষ্টি হয়। পরে কালাপাহাড়ের আবির্ভাবে সুদূর উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া কাশীধাম পর্য্যন্ত তাঁহার পদাবনত হয়। তাহার ফলে ঐ দুই প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কালাপাহাড় বাদশাহজাদীকে বিবাহ করার পূর্ব্বেই মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই বা বাদশাহও তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই। কালাপাহাড় বাদশাহজাদীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে বাদশাহজাদীসহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিজধর্ম্মে স্থির থাকিবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পণ্ডিতদের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন। যখন তাঁহার কাতর ক্রন্দনে কেহই সাড়া দেন না, তখন তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হন। হোসেনশাহ বাদশাহের সময়ে দুই বিভিন্ন সহজ মত ও সহজ পথ লইয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। একজন শ্রীরঘুনন্দন, অপরজন শ্রীশ্রীচৈতন্য। তৎপরে বাঙ্গলার বুকে আবির্ভূত হইলেন দাক্ষিণাত্যনিবাসী ব্রাহ্মণতনয় মুর্শিদকুলী খাঁ। তাঁহার প্রযত্নে বাঙ্গলা মুসলমান গরিষ্ঠতা লাভ পূর্ব্বক আজ দ্বিধা বিভক্তরূপে পরিণত হইয়াছে। মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতিও তৎকালীন হিন্দুসমাজ উদারতা দেখাইতে বিমুখ হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই তিনি প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিলেন। এই ত গেল মুসলমান ধর্ম্মের কথা। অপরদিকে ঢাকার নবাবী আমলে বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইলেন কুমারী মেরীর পুত্র যীশুর চেলা চামুণ্ডাগণ। আড্ডা গাড়িলেন শ্রীরামপুরে। আরম্ভ করিলেন যীশুর শ্রীমধুবাণী প্রচার করিতে। তাঁহাদের বাণীতে বিগলিত লইয়া যুবকেরদল মাতিয়া উঠিলেন নব উত্তেজনায়। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণের ভয় হইল। কাজেই হিন্দুর হিন্দুত্ব সঠিক রাখার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটিল। অপরদিকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ হিন্দু সমাজে মৃতসঞ্জীবনীসুধা বর্ষণ করিয়া হিন্দুর মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

বর্ত্তমানের হিন্দু কোন্ পথে ধাবিত হইতেছেন, তাহার কোনই ঠিকানা নাই। মনে হইতেছে, হিন্দু যেন নিজ পথ ভুলিয়া গিয়া আলেকজাণ্ডারের মত বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি দুইটি বিভিন্ন নীতি হইলেও একটি অপরটির সহায়ক। ধর্ম্মনীতি বা সামাজিক নীতি যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজনীতিও কি পথভ্রষ্ট হইতে পারেনা? বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ যেন সর্ব্বদার জন্যই উচ্ছৃঙ্খলতার মাধ্যমে রাজনীতিকে পথভ্রষ্ট করিয়া নিজ

অনুচর করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বর্ত্তমান রাজনীতি অবশ্য হিন্দুসমাজনীতির উপর কোন কোন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, তাই বলিয়া এমন কথা বলেন নাই যে, সমাজ-বন্ধন নীতি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে হইবে। যে যুগে কোন বৈদেশিকের আবির্ভাব ঘটে নাই, সেই যুগে যাহা প্রচলিত থাকা সম্ভব ছিল, বর্ত্তমানে যদি তাহাই প্রচলিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা পাইবে কি ?

সকল ধর্ম্মেরই গন্তব্যস্থল নিরাকার পরম ব্রহ্ম। কাজেই ধর্ম্মমত লইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করা মোটেই উচিত নহে। নিজ ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া অপরাপর মতবাদকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে, ইহাই ধার্ম্মিকের নীতি। এই নীতি পালন জন্যই আমাদের রাষ্ট্র 'ধর্ম্মনিরপেক্ষ' নামে পরিচিত হইয়াছে, অপর কোন উদ্দেশ্যে নহে। হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সামাজিক বন্ধন একেবারেই শিথিল করা কর্ত্তব্য কি ? আজ হিন্দুজাতির মধ্যে কোন জাতিরই সমাজ বন্ধন নাই। তজ্জন্য হিন্দুসমাজ নানা ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইতেছে। এরূপ চলিতে দিলে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্ষিত হইবে কি ? বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজ যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অতি সত্বর যদি কোন উদারভাবাপন্ন হিন্দুসমাজসংস্কারকের আবির্ভাব না ঘটে তবে হিন্দুর হিন্দুত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

মধ্যযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে কুমারী এবং বিধবাগণের গর্ভে সন্তান জনন জন্য তৎকালীন সমাজপতিরা তাঁহাদের লজ্জানিবারণোপযোগী নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তৎকালে উহা সাধারণের নিকট দোষনীয় ছিলনা এবং তজ্জন্য কোন শিশুরও অনিষ্ট ঘটিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে সেরূপ কোন উদারতা-প্রণোদিত বিধির ব্যবস্থা হইয়াছে কি ? যতদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ বিধি ব্যবস্থা না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত শত শত হিন্দু নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণ ও হিন্দু শিশুকুমার চিকিৎসা শাস্ত্রের উদার আশ্রয়ে অকালে বৃন্তচ্যুত হইতে থাকিবে। প্রকৃতির উপরে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তারও হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি নাই। কাজেই বিধবা বা কুমারীগণকে গৃহপ্রাঙ্গণে আবদ্ধ রাখিলেই উহা রদ হইবে না। তাহাদের লজ্জা নিবারক উপায় উদ্ভাবন করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

যখন শত শত হিন্দু নারী গর্ভস্থ ভ্রূণ সহ নিজ সমাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অপর সমাজে গৃহীত হইতেছিল, সেই সময়েই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। তিনি হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে "বৈরাগী" জাতির সৃষ্টি করেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক যুগেই সমাজপতিগণ হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কালোপযোগী হিন্দুবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। পুনরায় সমাজ সংস্কারের সময় আসিয়াছে। অনতিবিলম্বে হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজপতিগণের কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নবীনচন্দ্রের কবি স্বভাব

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

নবীনচন্দ্র সংগঠনাত্মক কবি। সে সংগঠন আধুনিক দেশাত্মবোধ নয়। তা এক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ। ওরই ওপর আধুনিক দেশাত্ম-প্রীতির নব জাগরণ। জাতীয়তাবাদের এই সূত্র স্পষ্টভাবে নবীনচন্দ্রের এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এদিক হতে তিনি চারণকবি। আধুনিক যুগে একজাতি-ভিত্তিক যে মানব-সমাজ গঠনের ধুয়া উঠেছে নবীনচন্দ্র তার নবীন উদ্গাতা। পৌরাণিক পটভূমিকার ওপর জাতিত্ব বোধক কাব্যমূলে একটা আদর্শ থাকবেই। এই আদর্শের মূলে আছে পৌরাণিক মহিমা। এই মহিমাকে প্রকাশ করতে গিয়ে ত্রয়ীকাব্যে এসেছে নাটকীয়তা। এ নাটকীয়তা আকস্মিক অপ্রত্যাশিত নয়। নয় এই কারণে, পৌরাণিক আখ্যানকে আধুনিক ধাঁচে পরিবেশন করতে গেলে অভিনবত্বের আশ্রয় অপরিহার্য। এই অভিনবত্বই ত্রয়ীকাব্যের প্রস্তাবিত নাটকীয়তা।

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যে পরিমিতিহীন লিরিক উচ্ছ্বাস একটা অ-কবি জনোচিত ত্রুটি বলে স্বীকৃত। এ স্বীকৃতি যথার্থ হলেও অ-যথার্থ। যে আদর্শবাদের ওপর 'ত্রয়ীর' সাম্রাজ্যবিস্তার তাতে ব্যাপক ও মহান দৈবী শক্তি কাজ করেছে। ওরই ওপর নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক আখ্যানের আধুনিক ভাষ্য রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস। যে কোন ভাষ্যে আত্ম-ভাব অ-কল্পনীয় নয়। নয় বলেই কবিকে এইটুকু ছাড় দিতে হবে।

কবিরা আত্ম-ভাবুক। ঐ ভাবনা লিরিকের সংহত—গ্রথিত রূপে নয়; অন্তর ব্যাকুলতার অ-পরিত্যজ্য তীব্রতায় গানের সুরে তার অভিব্যক্তি। ওই ছাড়্‌টুকে স্বীকার করে নিলে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে সংযমহীনতার অভিযোগ টেকে না। যে ধাতুতে তিনি তৈরী, তার স্বরূপটাও বিচার করতে হবে। হিন্দু চিন্তার অলোকিকত্ব এবং ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বজীবনের আদর্শে নবীনচন্দ্র অনুপ্রাণিত। মানুষী ভাবনায় কৃষ্ণের যে কোন কাজ ভাবের আধারে, অক্ষরের বেড়ীতে গ্রথিত করতে গেলেই তা ওই বিরাট পুরুষের মহৎ কীর্তির মত অলৌকিক এবং ব্যাপক হয়ে উঠবে। হিমালয়কে নগাধিরাজ বল্‌লে সব বলা হয়না। তাকে কৈলাসও বলতে হয়। বলতে হয়—উমা-মহেশ্বরের বাসভূমি হিমালয়। তাই ত্রয়ীকাব্যে অলৌকিকতার সঙ্গে এসেছে উচ্ছ্বাস। পদাবলীতেও সেই অনুসৃতি। মঙ্গলকাব্যেও অলৌকিক মাহাত্ম্যের সঙ্গে মানুষীভাবনার একাত্মতা। ফলে দেবচরিত্রে মানুষের ছায়াপাত। তাই পাশ্চাত্য কবির সৃষ্ট 'সেটানের মুখে পার্লামেণ্ট বিরোধিতা!

শিল্পী বড়কে পরিমিত ক্ষেত্রে রং তুলির কারবার দিয়ে প্রতিফলিত করেন। নবীনচন্দ্রও শিল্পী। শিল্পীর মধ্যে তারতম্য থাকে। নবীনচন্দ্র এক বিশেষ ধাঁচের শিল্পী। তিনি ক্যামেরাম্যান। ফটোর ওপর 'রি-টাচ্ করেন। সেই 'রি-টাচ্' এর ফলশ্রুতি ত্রয়ীকাব্য। ঐ 'রি-টাচ্-টাই তাঁর আত্মভাবনা।

মহাকাব্যের বিশালতাকে কবি ধরেছেন ক্যামেরার বন্ধনে। তাই কোথাও আলোর আধিক্য। কোথাও আলো আঁধার; কোথাও দূর নিকট হয়েছে, নিকট হয়েছে বিলম্বিত। মানুষের হাতের তৈরী কাজে ব্যতিক্রম স্বাভাবিক। শিল্পীও মানুষ। মানুষ বলেই তাতে নানা ত্রুটি ঘটে।

শিল্পী দু'জাতের। পরিণত ও অপরিণত। নবীনচন্দ্র পরিণততম আর্টিষ্ট। কিন্তু তাঁর ধাতু'ত ও মজ্জায় একটা বিশেষত্ব আছে। ধর্ম্ম তাঁতে মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত। ধারণ করে তাই সে ধর্ম্ম। নবীনের ধর্ম্ম আবেগ প্রাবল্য। ওর সঙ্গে দৈব মহিমার 'ছিটান' আছে। অতিমানবিক ঐশ্বর্য ও শক্তি বলতে গিয়ে কবিকেও অতি মানবীয়-ধর্ম পেয়ে বসেছিল। এ থেকে নিষ্কৃতি পেলে ত্রয়ীকাব্যের ভাবনা পুঞ্জ অস্বাভাবিক হয়ে উঠত। হতো না 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত'।

গীতিবাহুল্যকে কবির আত্ম চিন্তার গান বলে ধরতে হবে। ওকে অন্যভাবেও উপস্থিত করা চলে। একে 'ড্রামাটিক রিলিফ' বললে ক্ষতি কি? বরং বলা চলে, নবীনচন্দ্র ড্রামাটিক রিলিফ সংযোজনে প্রথানুসরণ না করে গীতের ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছেন। যে গান তিনি গেয়েছেন সে সংগীত কবি চিত্তের গান। এ সংগীত না থাকলে ত্রয়ীকাব্য একঘেয়ে হয়ে যেত। আর ওই গানের মজলিসে কবি মহাভারতীয় পাত্র-পাত্রীর মুখে স্থূল পরিহাস তুলে দিয়েছেন, যা সমালোচকদের মতে লৌকিক। হ্যাঁ, এদিক থেকে কবি লৌকিক। দূরের মানুষকে কাছে এনেছেন ঘরের কথা তাঁদের মুখ দিয়ে বলিয়ে। নবীনচন্দ্র লোক-কবি। লৌকিক কবির যে স্বভাব, এ কবিরও তাই। এই জন্যেই ত্রয়ীকাব্যে লোক পরিহাস, 'হায় দিদি তুই বড় হবি'—ইত্যাদি যখন সত্যভামার মুখে শুনি, তখন সত্যভামা যে আমাদেরই তাতে কোন ভেদ চিন্তা করিনা। এ পরিহাস থেকে কালিদাসও মুক্ত নন। তাই আপন জগৎ-সভার চার পাশে কবি যা দেখেন, ক্যামেরায় তাকেই ধরেন। ছোট জগতের এই ছোট ছোট কথা ত্রয়ীকাব্যে (রৈবতক) যদি না থাকত, তবে তার অস্বাভাবিকতা মাত্রাধিক্য হয়ে উঠত। মহাকাব্যের নায়িকার মুখে লৌকিক কথা শিল্পের আভিজাত্য নষ্ট করেছে—এ অভিযোগ সত্য। সত্য ওইটুকু অর্থাৎ মহাকাব্যের নায়িকার মুখে লৌকিক কথা। কিন্তু আভিজাত্যের ব্যত্যয় হয়েছে কি? ত্রয়ীকাব্য লৌকিক। ত্রিলোকের মধ্যে মর্ত্য একটা লোক। এ লোক ঊনবিংশ শতকের। যুগ ভাবনা এখানে অভিক্ষেপিত হয়েছে। হওয়াই ঠিক। না হওয়াই অ-স্বাভাবিক। ব্যাসের মহাভারত সেই যুগের কাহিনী। অথবা যুগ পরম্পরার বিধৃত রূপ। ওরই ওপর 'ত্রয়ীর' ভিত্তি। তার মাল-মশলা সবই পৌরাণিক। তবে চুন সুরকি সিমেণ্ট মিশ্রণ আধুনিক রাসায়নিক রীতির। তাই এতে লৌকিক জীবনাবেগ, ছোট জগতের পরিহাস, আধুনিক কালের বাগ্মিতার স্থান হয়েছে। হয়েছে বলেই 'ত্রয়ীকাব্য' সার্থক।

নবীনচন্দ্রের মেজাজ ধ্রুপদী নয়। 'নাদ-পরম ব্রহ্ম' বলে ত্রয়ীকাব্যের সুর তোলেন নি। তিনি ঋতুর কবি, সে ঋতু ঊনবিংশ শতাব্দী। যেকালে মিশ্র-ভাবনার প্রয়োজন ছিল। তাই ধ্রুপদীতে তান না ধরে মিশ্রসুরে ধরেছেন। সে সুর মিশ্র হলেও জাগরণের ঝঙ্কার গতির সৃষ্টি করেছে! চারণের মত আত্ম-জাগৃতির গান গেয়েছেন। গাইতে গাইতে হয়ে পড়েছেন আত্ম-বিহ্বল! এই আত্ম-বিহ্বলতাই তাঁর ওপর আরোপিত গীতোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য।

এ কবি শিল্পী। কিন্তু তত্ত্বের ব্যাখ্যাকার শিল্পী। ব্যাখ্যার রীতিও স্বতন্ত্র। চারণের ভঙ্গিতে কবি তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় মেতেছেন। চারণ কবি জাগান। নবীনও জাগ্রত করেছেন। জাগরণের সংগীতে উদাত্তভাবই অধিক। আমাদের কবির মধ্যেও তাই গীতের উদাত্ত আহ্বান। একাধারে তিনি চারণ কবি, তত্ত্বব্যাখ্যাকার এবং বড়ো পর্বের শিল্পী। সে শিল্পী 'ফোক আর্টিষ্ট'। জাত্যাভিমানের আবেগে যে কাব্যের জন্ম, আদর্শের ভিত্তিতে যার প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মের ভাবনায় যার বয়ন-বিস্তার, সে কাব্যের বিচার-প্রণালী স্বতন্ত্র। ক্যামেরায় ধরে তিনি ছবি আঁকেন। সে ক্যামেরা তাঁর কবি-চিত্ত। যা আছে, তারই ওপর আত্মভাবনাপূর্ণ, তত্ত্বময় অলৌকিকতার পট-চিত্র আঁকতে তুলি ধরেন। এই জন্যেই তিনি পটুয়া! পটুয়ার শিল্পে তাই স্থানিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে লৌকিক ভাবের গলাগলি। এ ব্যতিক্রম স্বাভাবিক।
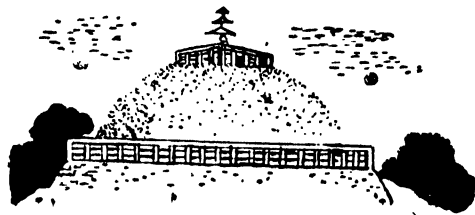
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আট

কিন্তু রাত্রে প্রহ্লাদের চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসে না। বুকের মধ্যে টনটন করতে থাকে। স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী দিদির মূর্তি ফুটে ওঠে, আর চোখে জল উথলে ওঠে। কিছুতেই সামলাতে পারে না। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ ক'রে শেষে বেরিয়ে পড়ে। গঙ্গার একটি ঘাটে ব'সে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে। অদূরে গঙ্গার উদার প্রসার চাঁদের আলোয় কী সুন্দর দেখায়! সামনে গঙ্গার জলে সোনার থাম ঝিকমিক করছে। বাতাস উঠেছে, পায়ের কাছে ছল ছল ছলাৎ ক'রে ঢেউ ভাঙছে। একটা নৌকায় পাল তুলে এক মাঝি ভাটিয়ালি গেয়ে চলেছে—গানটি ওর পরিচিত :

দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা,
(তারে) ধরি ধরি মনে ধরি, ধরতে গিয়ে
মিলিল না।
সে-মানুষ চেয়ে চেয়ে
ঘুরছি ফিরে পাগল হ'য়ে
মরমে জ্বলছে আগুন নিভিল না।
(ওগো) তারে আমার আমার মনে করি
(সে যে) আমার হ'য়েও আর হ'ল না।
বাউল কয় : ভেবো না রে!
ডুবে যাও রূপসাগরে।
ডুবিলে পাবে তারে, আর ভেবো না।
(ওগো) এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ ছেড়ে
দিতে আর দিও না।

প্রহ্লাদের বুকের মধ্যে হঠাৎ বিষাদ ছেয়ে যায়। এতদিন যোগ করছে—কী পেল? মনের মানুষের আভাষ পেয়েছে তো কতবারই, কিন্তু তাকে ছুঁতে না ছুঁতেই যে সে মিলিয়ে যায়! "ধরতে গিয়ে মিলিল না"—ঠিক এই-ই তো ওর অবস্থা—বিরহের আগুন নিভেও নেভে না—এক আধবার শান্ত হয়, ফের জ্ব'লে ওঠে আরো দাউ দাউ ক'রে।

কিন্তু এ-ও তবু সওয়া যায়। অসহ্য শুধু এই বেদনা যে সে "আমার হয়েও আর হ'ল না।" তাই তো আজও এত ব্যথা বাজে প্রিয়বিয়োগে। মনে খেদ মিশকালো হ'য়ে ওঠে : পিতা শান্তি পেলেন, দিদিও ধন্য হ'ল, এমন কি ছোট্ট রমাও দীক্ষার আলো হাওয়ায় এমন ফুলটি হ'য়ে ফুটে উঠল, কেবল প্রহ্লাদই র'য়ে গেল যে-তিমিরে সেই তিমিরে!

ওর বুকে অশ্রুসাগর দুলে ওঠে। শুধু বেদনা নয়, ধিক্কার। কাকে ঠকাচ্ছে ও? পায় নি, তবু পাওয়ার ভঙ্গি করছে না কি? একটু কৃপার পরশ, জ্যোতিদর্শন, মূর্তি দর্শন—এ তো কত সংসারীরও হয়। কিন্তু গৃহী যোগী হ'য়ে এমন মহাগুরুর আশ্রয় পেয়ে—সবচেয়ে আশ্চর্য—গুরুর কাছে বার বার আশ্বাস পেয়েও—ওর মনের কালি তো ঘুচল না আজো! কথায় কথায় আজো মনে হয় নিজেকে বড় আধার! ধিক্! বড় আধারই বটে! ওর মুখে নিষ্করুণ আত্ম-তিরস্কারের হাসি ফুটে ওঠে : রমা যা পারল ও পারল না—শোকে এখনো যে চোখে অন্ধকার দেখে তার নাম যোগী, বড় আধার! না, গুরুদেবের ভুল হয়েছে। স্নেহবশে ভুল করেছেন। যে নিজে ভালো সে সবাইকে ভালো দেখে।

দেখতে দেখতে ওর মনে ক্ষোভও বেদনা ফুলে ওঠে। ওর মনে দৃঢ় ধারণা হয় ও পারে না। বুকের মধ্যে যেন নিশ্বাস জমাট হ'য়ে যায়। কেবল মনে হয় মাতৃসমা দিদির কথা—শিবতুল্য পিতার কথা। মহাদেব নাম তাকেই মানায়—যে পরের জন্যে দুঃখ সয়। কিন্তু এতে গৌরব হ'লেও সঙ্গে সঙ্গে অবসাদে মন নুয়ে পড়ে—দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শিশুর ম'ত।

হঠাৎ আবেশ মতন আসে, শুনতে পায় নূপুরের শব্দ। কী অপরূপ! শুধু নূপুর না—সঙ্গে সঙ্গে বাঁশির সুর! এত স্পষ্ট!···তার পরেই চোখের সামনে দুটি মূর্তি—আলোগড়া তনু···দিদি! কী অপরূপ কান্তি! পাশে পিতৃদেব! জ্যোতিতে ঝলমল করছে!···ও কি স্বপ্ন দেখছে? না তো! চোখ খুলে দেখে গঙ্গা তেমনিই চলেছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে সোনার পতাকা জ্বেলে। অদূরে সেতু। আর একটা নৌকা পাল তুলে দিয়ে ভেসে চলেছে। পায়ের কাছে ঢেউ সামনেই আছড়ে আছড়ে ভেঙে পড়ছে···ছল ছল ছলাৎ। ও চোখ বোঁজে। অমনি ফের দিদির মুখ··· কী অপরূপ কান্তি! এলোচুলে চাঁদের আলো ঝরছে যেন! পাশে মহাদেব···মুখে সে কী অপূর্ব হাসি! হঠাৎ মিলিয়ে যায় দুটি মূর্তি। এ কী! গুরুদেব!

ও নত হ'য়ে প্রণাম করে। মূর্তি ওর মাথায় হাত রাখে। এ কী! এত আলো···আকাশে আলো, বাতাসে আলো, জলে আলো, স্থলে আলো···শুধুই আলো আর আলো। ওর শিরায় রক্ত বয় না তো—শুধু আলোর প্রবাহ! সামনে নৌকার পাল তো পাল নয়—আলো দুলে উঠেছে আনন্দে। আনন্দ আনন্দ আনন্দ! দিগন্তে একটি কালো মেঘ··ঘন কালো···হঠাৎ আলো হ'য়ে উঠল। চাঁদের দিকে তাকায়। চন্দ্রসভার মাঝে চাঁদ হাসছে! হঠাৎ এ কী! চাঁদের পাশে ও কে? গোপী না দেবী?

হঠাৎ কে যেন বলে—শ্রীরাধা।

দেবীমূর্তি নেমে আসে···ওর মাথায় হাত রাখে। ওর সমাধি হয়।

যখন সমাধি ভাঙল, তখন পূর্বদিকে অগণ্য সোনার ঝালর ভাসছে। আর সামনে—স্বয়ং গুরুদেব! মুখে তাঁর বরাভয় হাসি। সঙ্গে সঙ্গে ও নত হয়। কিন্তু পায়ে মাথা ঠেকতেই দেখে গুরুদেবের পা নয়। দুটি নীল পদ্ম যেন। মুখ তুলে দেখে: ঠাকুর, মুখে হাসি হাতে বাঁশি!

ও জড়িয়ে ধরে ঠাকুরের পা। ঠাকুর ওর মাথায় বাঁশি ছোঁওয়ান।

শুধু সুরের ঢেউ: অশ্রান্ত সুরের ঢেউ: লক্ষ কণ্ঠে বেজে উঠল আলোর গান:

গুরুপদরজ মৃদু মঞ্জুল অঞ্জন
নয়ন-অমিয় মৃগ দোষবিভঞ্জন···
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়···
জয় হরি জয়, দিলে দৃষ্টি-অভয়!

প্রহ্লাদ সমাধিতে ডুবে যায় ফের।

নয়

সহজ সম্বিতে ফিরে এল কতক্ষণ পরে কে জানে? গঙ্গা থেকে উঠে বিষ্ণুঠাকুর মৃদু হেসে বললেন: "বিশ্বাস হয়েছে কি এবার—যে আমি ভুল করি নি?"

ও পায়ে মাথা রেখে কাঁদে—কিন্তু বিষাদের কান্না নয়—অঝোর আনন্দাশ্রু।

*　　*　　*

প্রহ্লাদ মাথা তুলতেই বিষ্ণুঠাকুর বললেন: "এবার ঘরে চলো বাবা, কথা আছে।"

প্রহ্লাদ ঘরে ঢুকেই চমকে বলল: গুরুমা বিগ্রহের সামনে হাত জোড় ক'রে ব'সে···অনড়, অচল···মুখে হাসি···ধ্যানস্থ···একটি সরু অশ্রু জলধারা গাল বেয়ে ঝরছে···

বিষ্ণু ঠাকুর ফিশ ফিশ ক'রে বললেন: "এই দেখ—ভাবসমাধির অবস্থা। দেখতে চেয়েছিলে না?"

প্রহ্লাদ (নিচু সুরে): এই অবস্থায়ই কি মা-র দর্শন-টর্শন হয়?

বিষ্ণু ঠাকুর (নিচু সুরে): না, অন্য অবস্থায়ও হয়—জাগ্রত অবস্থায়ও। (মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে) আহা! কী সুন্দর! বলছিলাম না—অসামান্য আধার! অথচ এম্নি সহজ চালে চলেন—সকলের সঙ্গেই আছেন তাদের সহ-চারিণী হ'য়ে—যে, তারা ভাবে ইনি তো আমাদেরই এক-জন, নয় কি?

প্রহ্লাদ (আরো চাপা স্বরে) : চুপ...মা গাইছেন...

গুরুমা (মৃদু স্বরে—চোখ মেলে বিগ্রহের পানে চেয়ে) : অন্তরযামী ! আর কিছু আমি বলিতে যেন গো নাহি চাই, বলি যেন শুধু :

"এ-জীবনে বঁধু, তোমারি চরণে দিও ঠাঁই।
তুমি পিতা জানি, করো নিতি শুভকামনা,
তুমি মাতা—আছ দিতে কোল দিন-অন্তে,
তুমিই বন্ধু, শিখাও আলোকসাধনা
জ্বালি' প্রেমারুণ-শান্ত ছায়াদিগন্তে।
তুমিই করুণাসিন্ধু,
সন্ধ্যায় পূর্ণেন্দু,
দেবদেব প্রিয়, চিরবরণীয়, তব তারা বিনা দিশা নাই,
পরাজয়ে জয়, প্রলয়ে নিলয়—তুমি বিনা কে বা
সুখদায়ী ?

* * * *

প্রহ্লাদ গড় হয়ে প্রণাম করল গুরুমাকে। গুরুমা ওর মাথায় হাত রেখে খানিকক্ষণ কৃষ্ণমন্ত্র জপ ক'রে স্নিগ্ধ হেসে বললেন : "কেমন ? বলি নি ?"

প্রহ্লাদ (আশ্চর্য হ'য়ে) : আপনি জানেন ?

গুরুমা (হেসে) : সবটুকু জানি বললে বেশি বলা হবে. তবে তোমার কী দর্শন হয়েছে ঠাকুর আমাকেও দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রহ্লাদ : কখন মা ?

গুরুমা (প্রফুল্ল স্বরে) : সে জেনে তোমার কী হবে বাবা ?—কিন্তু যখনকার যা—আমি তোমার চা ও ফল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্ণু ঠাকুর : তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

গুরুমা : যেতে হবে যে অনেক কোথাও। আশ্রমের ঝক্কি তো বইতে হ'ল না তোমাকে। তবে (নিজের কপালে করাঘাত ক'রে) যে যেমন কপাল নিয়ে এসেছে। বিপিনের অসুখ, সুরেশেরও অসুখ। ওদের ডাক্তারের ব্যবস্থা ক'রে আসছি—তোমরা কথা কও।

* * * *

একটু বাদে প্রসন্না চা ও ফল নিয়ে এল। বিষ্ণুঠাকুর ও প্রহ্লাদ চাপানের শেষে সামনের গঙ্গামুখী বারান্দায় বসলেন। বিষ্ণুঠাকুর বললেন : "এবার বলো তোমার মনে যে-প্রশ্ন জমেছে।—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমি জানতে পারি অনেক কিছু—পাও নি কি পরিচয় ? আজ আমারো বিশেষ কিছু বলবার আছে। তবে তার আগে তোমার কথা হ'য়ে যাওয়া দরকার।"

দশ

প্রহ্লাদ (খানিকক্ষণ মুখ নিচু ক'রে চুপ ক'রে থেকে মুখ তুলে) : গুরুদেব ! আমি এটুকু জেনেছি যে গুরু-কৃপা ইষ্টের করুণা থেকে ভিন্ন নয়, ঠাকুর যে তাঁর কৃপার আলো গুরুপ্রসাদের আতশী কাঁচের মধ্যে দিয়ে আরো উজ্জ্বল ও জীবন্ত ক'রে ধরেন এও চাক্ষুষ করেছি—শুধু আমার জীবনেই নয়, দিদির পিতৃদেবের সাবিত্রীর রূপান্তর দেখেও যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছি বারবারই। তবু আঘাত যখন আসে—বিশেষ ক'রে এমন পরিবেশে যার 'পরে মানুষের কোনোই হাত নেই—তখন মন কেমন যেন খুঁটি পায় না, কেমন এমন হ'ল ভেবে। নিজের কর্মফলে যখন ভুগি, তখন বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, কর্মভোগের দরকার ছিল মনকে আরো সজাগ ও একান্তী করতে। কিন্তু এমন সব বাইরের যোগাযোগ অনর্থ ঘটে পদে পদে যে, বিশ্বাসের ঊষার পরেও মনে ফের সংশয়ের সন্ধ্যা আসে ঘনিয়ে—ঠাকুরের কৃপা কেন বাঁচালো না ভেবে।

বিষ্ণুঠাকুর (স্নিগ্ধ হেসে) : বাবা, কৃপা বলতে অর্থার্থীরা যা বোঝে, জ্ঞানীরা তা বোঝেন না। আর কেন শুনবে ? অর্থার্থীরা কামনা বাসনার চোখে সত্যের যে-রূপ দেখে জ্ঞানী বা ভক্তের দৃষ্টি সত্যকে ঠিক সে-রূপে দেখে না। কিন্তু এই জ্ঞানদৃষ্টি বা প্রেমেরদৃষ্টি যখন খুলেও খুলতে চায় না, তখন অনেক সময় আঘাত এসে দেখিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে—কেন দুঃখ কষ্ট বেদনা না পেলে চেতনা জাগত না, নানা রিপুর পিছু ডাকে কান দেওয়ার পরে অনুতাপের আগুন না জ্বললে মনের কালিও ঘুচত না, চোখের ঠুলিও খ'সে পড়ত না। এককথায়, ঠাকুর বাঁচান বৈ কি, কেবল সেভাবে নয় যে-ভাবে আমরা চাই।"

প্রহ্লাদ : ক্ষমা করবেন গুরুদেব, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—আপনি কী বলতে চাইছেন ! নানা রিপুর পিছু ডাকে যখন কান দেই,তখন তো জেনেশুনেই দিই যে,

স্খলনের পরে অনুতাপে তনু দগ্ধ হবে। তবু কেন দিই ?— এই চেতনা জাগাতে, না মনের কালি ঘোচাতে ?

বিষ্ণুঠাকুর : বাবা পাটনায় আমাদের কাছে গঙ্গাতীরে এক মাঝি থাকত। সে চমৎকার ডিঙি বানাত। কিন্তু প্রতি ডিঙিকে বার বার জলে ভাসিয়ে দেখত কোথায় কোন্ জোড় ঠিক লাগে নি। এজন্যে তাকে কখনো কখনো মাঝ দরিয়ায়ও যেতে হ'ত, জেনে শুনে যে সেখানে হঠাৎ বানচাল হ'লে ডিঙিকে তীরে ভিড়োতে বেগ পেতে হবে। ঠিক তেম্‌নি, জীবনের নানা পরীক্ষা রকমারি পরিবেশে রকমারি বিপদে ফেলে আমাদের দেখিয়ে দেয়—চরিত্রের কোথায় খুঁৎ আছে, কোন সূক্ষ্ম ফাটল চোখে দেখা যায় না ব'লেই আরো সর্বনেশে, কেন না মিত্রচোখ না টের পেলেও শত্রু দল খবর পেয়ে চড়াও হ'য়ে করে ভরাডুবি—ঠিক যখন নদীতে নৌকা তর তর ক'রে চলেছে ভরা পালে। এই আকস্মিক বিপদ-আপদ থেকে ঠাকুর আমাদের বাঁচান আঘাত দিয়ে চোখের ঠুলি খসিয়ে দিয়ে —আর তখন সেই খোলা চোখের দৃষ্টিতে আমরা শুধু যে আমাদের চরিত্রের নানা অদৃশ্য ফাটল দেখতে পাই তাই নয়, আর একটি অভাবনীয় আবির্ভাবও ফুটে ওঠে—যাকে চলতি ভাষায় বলা হয় করুণার অঘটন, ওরফে দিব্যশক্তির রক্ষাকবচ। আর তখনই সত্যি জীবনকে দেখতে শিখি জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে—from the focus of knowledge—কামনা বাসনার ঝাপসা দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। এই জন্যই জ্ঞানীরা বলেন—স্খলন চ্যুতি পরাজয় চিত্তগ্লানি এ সবের ফলে দুঃখ আসে গুরু হয়েই—সত্যদর্শনের দীক্ষা দিয়ে বলের পাথেয় দিতে। দার্শনিকেরা এই প্রাপ্তির নাম দেন জ্ঞান, ভক্তেরা—কৃপা। কালীয় নাগের নাগিনীরা বলেছিল কৃষ্ণকে যে তাদের দুর্দান্ত স্বামীর মাথায় নৃত্য ক'রে পদাঘাতে তার ফণাগুলিকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে শাস্তি দেওয়াও কৃষ্ণের করুণা—"ক্রোধো হি তে অনুগ্রহ এব সম্মতঃ—ঠাকুর! তোমার ক্রোধও আসে প্রসাদ হ'য়ে।" ঠিক তেম্‌নি, যখন আমরা আলো ছেড়ে পড়ি অন্ধকারের কবলে তখন সে-আঁধারও আসে তাঁর করুণার দিব্য-দীপ্তিকে আরো উজ্জ্বল স্নিগ্ধ ক'রে তুলে ধরতে। ফলে দৃষ্টিগোচর হয় আলোকালোর এক চিত্রবিচিত্র দ্বন্দ্ব বা গলাগলি, যাই বলো।

প্রহ্লাদ : কালো মানে ? পাপ ?

বিষ্ণুঠাকুর : শুধু পাপ নয়—পাপের পেট্রনদেরও ধরছি ঐ সঙ্গে—যাকে বুদ্ধ নাম দিয়েছেন মার, ভাগবত বলেছেন কলি, খৃষ্ট—শয়তান, ঋষিরা—আসুরিক শক্তি।"

প্রহ্লাদ : এই শক্তিরা কি সত্যিই আছে গুরুদেব ? আমার তো মনে হয় যে আমরা ভুগি বিপথে পা দেওয়ার কর্মফলেই—খানিকটা অতিভোজনের পরে শূল্যব্যথার মতন।

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে) : আছে ব'লে আছে বাবা! পদে পদেই তারা আসে লোভ দেখিয়ে নিপুণ কুতর্কে কালোকে সাদা দাঁড় করিয়ে আমাদের বিপথে টেনে নিয়ে যেতে। আচ্ছা, তবে বলি আমার নিজের দুএকটি অভিজ্ঞতা। কারণ দৃষ্টান্তের আলোয়ই সত্যের চেহারা সত্যি সত্যি জীবন্ত দেখায়—থিওরির ছায়ায় দেখায় কেমন যেন আবছা—unconvincing, বলে না বুদ্ধিমন্তেরা ?

প্রহ্লাদ (উৎসুক কণ্ঠে) : বলুন গুরুদেব—আর বেশ ফলিয়ে।

বিষ্ণুঠাকুর (খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে থেকে) : আমার চোখে ভেসে উঠছে একটি পরিষ্কার ছবি। কিন্তু তার আগে একটু ভূমিকা করতে হবে। (একটু থেমে) তোমাকে বোধহয় বলেছি—পিতৃদেব আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন বিধবাবিবাহ করার অপরাধে। আমার সত্যিই এতটুকু ইচ্ছা ছিল না—তাঁকে চটিয়ে আমার চলার পথকে আরো দুর্গম ক'রে তুলবার। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে ? না, ঠিক্ নিয়তিও নয়। আমার গুরুদেব প্রায়ই বলতেন তাঁর স্বপ্নে-পাওয়া তিব্বতীগুরু মিলারে-পার একটি জীবনবাণী : "যা তোমার সত্য মনে হয় তাকে মানতে হ'লে সমাজ এমন কি শাস্ত্রের কথাও যদি অমান্য করতে হয় করবে, কারণ নিজের কাছে যদি খাঁটি থাকো তবে সারাজগৎ বাধা দিলেও তুমি লক্ষ্যে পৌছবেই পৌছবে।" আরো, কে না জানে—রামের কাছে যা বিষ শ্যামের কাছে তা তো অমৃত হয় অনেক সময়েই, আর হয় ব'লেই বিশ্বলীলা আজো পুরোনো কি একঘেয়ে হয় নি। তাছাড়া মোক্ষদাকে বিবাহ করার পরে আমি দেখতে পেয়েছিলাম একটি আশ্চর্য সত্য : 'যে, ভালোবাসা যদি সত্য হয়,—অর্থাৎ যাকে ভালোবাসা যায় তার সুখদুঃখ

আমার কাছে সত্যি আমার নিজের সুখদুঃখের চেয়ে বেশি জরুরি ও দামী মনে হয়—তাহ'লে সে-ভালোবাসার ফলে অনিবার্য কারণে নানাদিকে দুঃখ বেদনার ঝড়ঝাপটা এলেও প্রতি ঝাপটাই আমাদের থেই ধরিয়ে দেয় লক্ষ্যচূড়ার, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় না রসাতলে।

কিন্তু মোক্ষদাকে সহধর্মিণী ব'লে বরণ করার পরে সাধনা একদিক দিয়ে হ'য়ে উঠল যেমন সমৃদ্ধ, অন্যদিকে তেম্‌নি জটিল! একজন মানুষের সাধনার যে-সমস্যা দুজনের—অর্থাৎ দম্পতীর—মিলিত জীবনের সমস্যা তার দুগুণ হয় না. অন্ততঃ দশগুণ কঠিন হ'য়ে ওঠে পাটীগণিতকে দুয়ো দিয়ে। আর সে দুটি মানুষ যদি প্রতিপদে নিজের বিবেকবাণীর সঙ্গে গুরুবাক্য ও ইষ্টমন্ত্রের সামঞ্জস্য ক'রে এগুতে চায় বিবাদী বেসুরকে কাটিয়ে সুরেলা ঝংকারের নির্দেশ পেতে—তাহ'লে সে-তীর্থযাত্রী জীবন হ'য়ে ওঠে আরো দায়িত্ব-সঙ্কুল ও আনন্দময়, গুরুভার ও বিচিত্র। প্রতিপদে একজনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আর একজনের দৃষ্টি ভঙ্গির গরমিলের মধ্যেও মিলের দিশা খুঁজে পাওয়ায়, এর ইচ্ছার সঙ্গে ওর বিপরীত ইচ্ছার সমন্বয়—এককথায়, গরমিলের মধ্যে দিয়ে সুষমাসুন্দর আত্মজয়ের সাধনা—সে অপরূপ নাট্যলীলার নানা বিচিত্র অভাবনীয় গর্ভাঙ্ককেই তোমার সামনে ফলিয়ে তুলতে সাধ যায়। কিন্তু এখন সময় নেই তো, তাই কেবল তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই—বিরুদ্ধ শক্তিরা সত্যিই আছে না, শুধু কবিকল্পনা—কথার কথা?

এগারো

বিষ্ণুঠাকুর: বলেছি—মোক্ষদা ছিল নানা দিকেই অসামান্যা। রূপসী ছিল না, কিন্তু ওর অন্তরের আলো ওকে এমনই শ্রীমস্তিনী ক'রে তুলেছিল যে, নানা থাকের লোকই ওর কাছে আসতে না আসতে আকৃষ্ট হ'ত—আরো এই জন্যে যে, হাজার দুঃখে, দুর্দৈবে, দুর্দশায়ও কারুর কাছেই হাত পাতত না দরদ বা সহানুভূতির মুষ্টিভিক্ষা পেতে। কিন্তু না, গোড়া থেকেই বলি আমাদের বিবাহের আগেকার কথা—নৈলে ঠিক বুঝতে পারবে না কী গভীর দুঃখে ওকে বছরের পর বছর একলা কাটাতে হয়েছিল।

মোক্ষদার বাবা ছিলেন নবদ্বীপের একজন নামকরা কীর্তনী। তাঁর ইচ্ছা ছিল—শৈশবেই মাতৃহারা মেয়েকে ভালো করে কীর্তন শেখাবেন, কারণ মোক্ষদার শুধু কণ্ঠলাবণ্য নয়—সেই সঙ্গে ছিল সঙ্গীত প্রতিভা। কিন্তু ওর দশবৎসর বয়সে তিনি হঠাৎ মারা যেতে, তাঁর কয়েকটি শিষ্য টাকা তুলে অনাথা গুরুকন্যার বিবাহ দেয়—কাশীতে এক ডাক্তারের সঙ্গে। শ্বশুরের সচ্ছল অবস্থা—মোটা পেন্সেন পেতেন। সবাই সানন্দে বলল মেয়েটার একটা গতি হ'ল। কিন্তু হা অদৃষ্ট! বিবাহের ঠিক পরদিনই মোক্ষদার স্বামী সর্পাঘাতে মারা গেলেন।

এহেন ক্ষেত্রে প্রায়ই যা ঘটে তাই হ'ল। সংসারের সকলের রাগ পড়ল মোক্ষদার 'পরেই—বিশেষ ওর দজ্জাল শাশুড়ীর। উঠতে বসতে তিনি ওকে খোঁটা দিতেন "অপয়া অলুক্ষুণে স্বামীখেকো ডাইনী" ব'লে। এ-দুঃখ ওকে আরো বেশি বেজেছিল এই জন্যে যে, ওর এক ননদ ছিল সেও বিয়ের পরে বিধবা হয়, কিন্তু সে পেত শুধু সকলেরই স্তবস্তুতি। তার নাম নন্দিনী তার ছিল রূপসী ব'লে নামডাক—বিশেষ ক'রে তার দুধে-আলতা রঙের জন্যে। মোক্ষদা ও তার একদিনেই বিয়ে হয়। বিয়ের এক বৎসর পরেই তার স্বামী যায় বিলেতে। কুসঙ্গে পড়ে নানা কুকীর্তির পরে একদিন এক নৌকাবিহারে মদ খেয়ে বেটক্করে জলে প'ড়ে মারা যায়।

নন্দিনী স্বামীকে ভালোবাসে নি একটুও, স্বামীর জন্যে এক ফোটা চোখের জলও ফেলেনি। কিন্তু সে শুধু যে—মোক্ষদার ভাষায়—"দুধে ভাতে থাকত তাই নয়—হাসি গল্প পান মাছ থিয়েটার সিনেমা কিছুই তার বাদ যেত না এমন কি গহনাও পরত।" মোক্ষদার শাশুড়ীও মেয়ে বিধবা হওয়ার জন্যে শুধু যে কান্নাকাটি করেন নি তাই নয়, রূপের ডালি আদরিণী পিতৃগৃহে ফিরে এলে বলতেন জাঁক ক'রেই; "নন্দিনীর আমার ভাবনা কি? ওকে লুপে নেবে রাজপুত্তুর মন্ত্রীপুত্তুররা।" না বলবেন কেন? শুধু তো রূপ নয়, ওর এক নিঃসন্তান মামা উইলে ওকে একটি বাড়ি ও লক্ষাধিক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গল্পটাকে ঠিক বলা হচ্ছে না। গুছিয়ে বলতে হ'লে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। বলতে হবে আগে নন্দিনীর কথা একটু ফলিয়েই।

ছেলেবেলা থেকে বাপমার প্রশ্রয় পেয়ে নন্দিনী হ'য়ে

উঠেছিল স্বভাবে রঙ্গিণী ও চঞ্চলা। সকলের কাছেই রূপের সুখ্যাতি শুনতে শুনতে ধরাকে দুদিনেই সরা জ্ঞান করল। সাহেব পুরাণে যাকে বলে, spoilt child, তার উপর বিধবা হবার সঙ্গে সঙ্গে হাতে এল টাকা। ম্যাট্রিক্ পাশ ক'রে কলেজে ভরতি হ'য়ে ওর মাথা আরো গরম হয়ে উঠল। যার তার কাছে বলত অকুণ্ঠেই: "আমার ভাবনা কি? রোসো না, একবার বি-এ পাশ ক'রে বিলেত ঘুরে আসি তো—তারপর ভিড় জ'মে যাবে···" ইত্যাদি। সে চাইত শুধু বিলাস আর রূপের যুগলপাখায় খুশখেয়ালে উড়ে চলতে। সম্বন্ধ এসেছিল তিন চারটি, কিন্তু হ'লে হবে কি—নন্দিনীর পণ—ময়ূর বাহন না হ'লেও চলতে পারে, কিন্তু কার্তিক না হ'লে সে স্বয়ম্বরা হবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, জগতে কার্তিক ময়ূরের চেয়েও বিরল—কাজেই তার ভাগ্যে ঈপ্সিত নাগরের দেখা পাওয়া হ'য়ে উঠল ভার।

"কিন্তু বলে না অতি দর্পে হতা লঙ্কা? নন্দিনীর অহংকারে ঘা পড়ল এক বিলেতফেরৎ ফ্যাশনেবল স্মার্ট ছেলের পাল্লায় প'ড়ে। তার নাম মাণিক।

মাণিকের বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিস। সে লণ্ডনে পাশ ক'রে ফিরেছিল এঞ্জিনিয়র হয়ে। পসার হয়েছিল, গান গাইতে পারতও চমৎকার—তাছাড়া মেয়েদের পটাবার আর্টটা আয়ত্ত করেছিল বিলেতে নানা স্বৈরিণীর সঙ্গে মিশে। তারাও ছিল কাশ্মীর বাসিন্দা—বর্ধিষ্ণু পরিবার।

কাজেই মাণিককে নন্দিনীর মার পছন্দ হ'য়ে গেল। তাকে তিনি মাঝে মাঝেই নিমন্ত্রণ করতেন ও মেয়েকে তার সঙ্গে অকুণ্ঠেই থিয়েটারে বা পিকনিকে পাঠাতেন। কিন্তু মাণিক নন্দিনীর রূপে আকৃষ্ট হ'লেও স্বভাবে ছিল বিষম গর্বী। তাই নন্দিনীর কাছে এসেও ধরা দিল না। আর ঠিক সেই জন্যেই নন্দিনীর রোখ চাপল ওর গুমর ভাঙতে হবে একটু শিক্ষা দিয়ে—একটু খেলিয়ে তবে গেঁথে তুলবে। ওদিকে মাণিকও ছিল শেয়ানা ছেলে, মনে মনে হেসে বললে—বেশ দেখাই যাক না কে কাকে খেলায়।

বলেছি, মাণিক গান গাইতে পারত চমৎকার। নন্দিনী ধরল: মাণিকদা, গান শেখাতেই হবে আমাকে।" গানে তার প্রতিভা না থাকলেও মোটামুটি গাইতে পারত —অর্থাৎ আধুনিক ড্রয়িংরুম-সঙ্গীত। মাণিকের ভালোই লাগত রূপসী তরুণীকে গান শেখাতে—বিশেষ যখন দু-জনেই জানত গানটা উপলক্ষ্য মাত্র।

কিন্তু মানুষের নানা চালই ভেস্তে যায় বিধাতার কিস্তিতে। মাণিক যখন নন্দিনীকে গান শেখাতে যেত প্রায়ই মোক্ষদা শুনত পাশের ঘর থেকে। কাজেই মাঝে মাঝে মোক্ষদার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হ'ত বৈ কি। নন্দিনী যে চঞ্চল প্রকৃতির অসার মেয়ে, মাণিক এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছিল। রূপ আছে তাই মিশতে ভালো লাগত বয়সের ধর্মে, কিন্তু ওর মন টানল মোক্ষদার ভাবেভরা চাহনি ও কমনীয় মুখ। চটক ও রূপকে হার মানতে হ'ল চরিত্র ও শ্রীর কাছে।

মোক্ষদাকে ওরা দূর ছাই করত—সবাই জানত। তাই মাণিকের প্রথমদিকে দয়া হয়। তারপরে মোক্ষদার সঙ্গে মাঝে মাঝে চকিতে দৃষ্টি বিনিময় হ'তে হ'তে এবং ওর গান শুনে তার ভালো লাগছে টের পেতে না পেতে ও ছুতো খুঁজতে লাগল মোক্ষদার সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার। কিন্তু মোক্ষদা ওকে এড়িয়ে এড়িয়েই চলত, হঠাৎ দেখা হলে একবার স্থিরনেত্রে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে দূরে স'রে যেত। ফলে মাণিকের মনে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা জাগল। ওর একটা ধারণা জন্মেছিল যে, বিবাহ-যোগ্যা যে-কোনো মেয়েকে ইচ্ছে করলেই পটিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মোক্ষদার মতন মেয়ের সংস্পর্শে ও কখনো আসে নি তো, তাই জানত না এ-জাতের স্বভাব-সংযমী মেয়েরা কী ধাতুতে গড়া। তাই ঘা খেল তাকে নানা-ভাবে ইসারা করা সত্ত্বেও সাড়া না পেয়ে। বিশেষ ক'রে মোক্ষদার কালো চোখের চাহনিতে ও ক্রমশঃ বিষম চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

এরূপ ক্ষেত্রে গর্বী মানুষের মনে প্রায়ই রোখ চেপে ওঠে। মাণিক মৎলব আঁটল। একটু সুবিধা হ'ল এই জন্যে যে, নন্দিনী মোক্ষদাকে মাঝে মাঝে ওর পাশে এসে বসতে বলত গান শিখবার সময়ে। ভাবটা: দেখ্, এমন কেতাদুরস্ত সুদর্শন ছেলে কিরকম আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। মাণিক নন্দিনীর রূপে আকৃষ্ট হ'য়েছিল দেখে সে মনে মনে ঠিক করেছিল তাকে নাজেহাল ক'রে তবে হবে বরদাত্রী। আর কী ভাবে মাণিক ওর পায়ে লুটোয় মোক্ষদা দেখুক—ভাবত রূপগর্বিণী।

কিন্তু এই ভুল চালেই নন্দিনী বাজি হারল—নিজের রূপের অভিমানে। মাণিক পাশাপাশি দুজনকে দেখে আরও বুঝতে পারল মোক্ষদা কী ধাতুতে গড়া। ফলে নন্দিনী ওর চোখকে মুগ্ধ করলেও ওর মন টানল মোক্ষদা। হাতের পাঁচকে ছেড়ে প্রেমে পড়ল অনধিগম্যার।

নন্দিনীকে ও একটি গান শিখিয়েছিল জ্ঞানদাসের—ঠুংরির তান বসিয়ে ভক্তিকে পাশ কাটিয়ে আদিরসেরই হাবভাব এনে—যাকে সাহেবরা বলে erotic :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

মোক্ষদা শুনে শুনেই এ-গানটি শিখে নিয়েছিল, যদিও ওরা কেউই জানত না।

এর পরে খুঁটি নাটির নানা গর্ভাঙ্ক বাদ দিয়ে নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সে আসি।

মোক্ষদা খুব ভোরে বাগানে গিয়ে ঠাকুর ঘরের জন্যে ফুল তুলত। মাণিক খবর নিয়ে একদিন ভোরবেলা খিড়কিদোর দিয়ে বাগানে ঢুকল—কারণ সে জানত নন্দিনী ও আর সবাই অনেক বেলায় ওঠে।

মোক্ষদা ফুল তুলতে তুলতে গুন গুন ক'রে গাইছিল এ-গানটি ও সঙ্গে সঙ্গে আঁখর দিচ্ছিল—ছেলেবেলায় কীর্তনী পিতার কাছে আঁখরের দোয়ার দিত তো, তাই আঁখর ওর সহজেই আসত। ও গাইছিল আঁখর দিয়ে :

পরশমণি……
নীলমণি ওগো পরশমণি…
ছুঁতে না ছুঁতেই করেছ ধনী…
কী জাদু জানে মধু চাহনি…ইত্যাদি।

অলক্ষিতে পিছনে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে মাণিক সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কী অপরূপ কণ্ঠলাবণ্য ও ভাব! আর সবার উপরে ওর নিজের শেখানো ঠুংরির খোঁচের লাবণ্যের সঙ্গে এ কী অভাবনীয় আঁখরের ফুলঝুরি! মোক্ষদা একটু থামতেই ও এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বলল : "এমন গাইতে পারো তুমি? আর এসব আঁখর কোত্থেকে পেলে? এসব তো আমি নন্দিনীকে শেখাই নি!"

মোক্ষদা চমকে গিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়াল, বলল : "আপনি! এমন অসময়ে?"

মাণিক চটুল হেসে বলল : "রসময় কি অসময় মানে সখী?"

মোক্ষদা ওর প্রগল্‌ভতা গায়ে না মেখে বলল : "এত ভোরে নন্দিনী ওঠে না—জানেন না কি?"

মাণিক বলল : "এ-ভান কেন মোক্ষদা? তুমিও জানো তুমি আমাকে চাও, আমিও জানি আমি তোমারে চাই।"

মোক্ষদা বলল : "কী বলছেন আপনি মাণিকবাবু? আপনার সঙ্গে আমার একটা কথাও হয়নি আজ পর্যন্ত—"

মাণিক বলল হেসে : "মোক্ষদা, ছেলেবেলায় একটা টপ্পা শিখেছিলাম—খুব নামজাদা টপ্পা—তুমিও নিশ্চয় শুনেছ"—ব'লেই স্বর ক'রে : 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।'

মোক্ষদাকে কে যেন মাথায় বাড়ি মারল, জুগুপ্সায় শিউরে উঠে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলল : "আপনি জানেন না কী বলছেন—"

মাণিক বলল পিঠ পিঠ : শুধু যে আমি জানি তাই নয় সখী, তুমিও জানো যে সব কিছু মুখে বলার দরকার হয় না। এও জানো তুমি যে মুখে মেয়েরা যা বলতে চায় না, তা চোখের মধ্যে দিয়ে ঠিকরে বেরোয়।"

মোক্ষদা কেঁপে উঠে বলল : "ছি ছি, এ সব কী বলছেন আপনি?"

মাণিক এবার স্বর বদ্‌লে বলল জোর দিয়েই : "কী বলছি একটু ভেবেই দেখ না। একদিন দুদিন নয়, পর পর পাঁচ দিন তোমার চোখ কথা কয় নি? ডাকে নি আমাকে? দিন কয়েক আগে আমার গান শুনে উঠবার সময় ফিরে চাও নি তুমি? সখী, আমি আর যাই বুঝি বা না বুঝি, ইসারা বুঝি।"

মোক্ষদা বলল : "আমাকে বার বার সখী বলবেন না। আপনি জানেন বেশ ভালো ক'রেই যে আমাদের দেশ বিলেত নয়—যেখানে যে কোনো মেয়েকে সখী ব'লে কাছে ডাকা যায়। "তাছাড়া আমি—মানে আমার চোখে—"

মাণিক বাধা দিয়ে এবার পুরোপুরি গম্ভীর হ'য়ে বলল : "শোনো মোক্ষদা, আমি ভেবেছিলাম হাসি মস্করার মধ্যে দিয়ে অপরিচয়ের আড়ালটা কেটে যাবে সহজে। সখী ব'লেও হয়ত ভুল করেছি। তবে এ-অসময়ে এসেছি আমি

খোঁজ নিয়েছি যে, এত ভোরে কেউ ওঠে না—তোমাকে একলা পাব বাগানে। আর এসেছি তোমাকে সখী সম্বোধন করতে নয়—তার চেয়েও কিছু মরমী কথা বলতে, যা সখীকেও বলা যায় না—বলা যায় কেবল তাকে—যে সখী হ'য়ে এসে রাখী পরিয়েই খুসি হয় না।"

মোক্ষদা বলল বিরস কণ্ঠে: "আমাকে আপনার কীই বা বলার থাকতে পারে? আমি শুনব না।"

ব'লে পিছন ফিরতেই মাণিক্ ওর আঁচল চেপে ধরল: "লক্ষ্মীটি মোক্ষদা, শোনো। তোমাকে শুনতেই হবে, নইলে আমি পারব না। গোলমাল করলে সবাই জানবে—তখন আমি পার পেয়ে যাব, পুরুষের সাত খুন মাপ, কিন্তু তোমার কী অবস্থা হবে বুঝতেই তো পারো। তাই শোনো। আমি তোমাকে নিয়ে ফুরতি করতে চাই না, চাই তোমাকে বিবাহ করতে—শপথ ক'রে বলছি।"

মোক্ষদা এবার সত্যিই চমকে গেল, বলল: "বিবাহ? আপনি—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন মাণিকবাবু?"

মাণিক ফের হাসল, বলল: "কী হয়েছি—তার ইতিহাস তো তোমার ঐ গানেই রয়েছে: রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর—"

মোক্ষদার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে ঝিলিক খেলে গেল, সে বলল রুক্ষ স্বরে: "আমি নন্দিনী নই মাণিকবাবু। যান আপনি।"

ব'লে ফুলের সাজি নিয়ে ফিরতেই মাণিক দুপা এগিয়ে এসে খপ্ ক'রে ওর হাত চেপে ধরল, বলল: "শোনো মোক্ষদা, আমি সত্যিই তোমার প্রেমে প'ড়ে গেছি বিশ্বাস কোরো, লক্ষ্মীটি!"

মোক্ষদা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল: "প্রেম? নন্দিনীকে গিয়ে বলুন একথা। সে বিশ্বাস করবে।"

মাণিক এবার ওর দুহাতই চেপে ধ'রে বলল উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে: "ভগবানের নাম নিয়ে বলছি মোক্ষদা—এ চোখের মোহ নয়। তোমাকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছি। নন্দিনীকে আমি এক আঁচড়ে চিনে নিয়েছি। আমি চাই খাঁটি সোনা, গিল্টি নয়। তুমি শুধু একবার বলো যে তুমি আমার হবে। তারপর সব ভার আমার। আমি তোমাকে বিবাহ করব—না, শুধু বিবাহ করা নয়—মাথায় করে রাখব।

মোক্ষদা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: "হাত ছাড়ুন।"

মাণিকের চোখে মুখে কেমন যেন একটা মত্ততার আভা উঠল ফুটে, সে বলল: "না, ছাড়ব না।—টানাটানি কোরো না, আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। এ আমার চোখের নেশা নয়। এদেশে ওদেশে আমি অনেক মেয়ের সঙ্গেই মিশেছি—সত্যি বলছি তোমায়: রূপসী রঙ্গিনীদের রঙ্গ দেখে দেখে আমার মনে গভীর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আমি চাই এখন চরিত্র, গুণ, সংযম। আমি বড় মানুষের ছেলে, তার ওপর রোজগেরে। তোমাকে এরা কষ্ট দেয় আমি জানি—তাই আরো আমার মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে তোমাকে কাছে পেতে, সুখী করতে। কিন্তু না—শোনো। এসবও অবান্তরই বটে। আসল কারণ হচ্ছে যে, তুমি হচ্ছ তুমি—মানে এমন মেয়ে যে আমার প্রাণে হঠাৎ বান ডাকিয়ে দিয়েছ—কেমন ক'রে দিলে—জানি না। এরকম ভালোবাসার অনুভবও আমার কখনো হয়নি। আমি কেবল জানি একটি কথা, যার ওপরে আর কথা নেই: তোমাকে আমি ভালো-বেসেছি—আর এ মোহ নয়, সত্যিই প্রেম।" ব'লেই তাকে জোর করে কাছে টেনে নিতে যাবে, এমন সময়ে উপরের জানলা দিয়ে নন্দিনী মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় ক'রে বলল: "মা—মা! দেখবে এসো তোমার ভিজে বেড়াল বৌয়ের ছেনালি। বলিনি তোমায় যে, ও ডুবে ডুবে জল খায়?"

এর পরে হ'ল—যা ভবিতব্য। মোক্ষদার লাঞ্ছনার আর অবধি রইল না। নন্দিনী আগুন হ'য়ে উঠল: যাকে করত এত অবজ্ঞা, সেই কিনা হ'ল ওর কাল! এক-চক্ষু হরিণের মৃত্যুবাণ এসেছিল কানা চোখের দিক থেকে—উপমা আছে না? লজ্জায় অপমানে তার যেন মাথা কাটা গেল। মোক্ষদার বাগানে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেল।

বারো

বিষ্ণুঠাকুর (একটু থেমে): কিন্তু এখানে তোমাকে বোঝাবার জন্যে একটু ব'লে নিই প(?)র কথা—মানে মোক্ষদার কাহিনী যা তার কাছে আমি শুনেছিলাম তাকে বিবাহ করার পরে। ওর ভাষায়ই বলবার চেষ্টা করব যতটা পারি। ও বলেছিল:

"মাণিককে আমার সত্যিই ভালো লাগত বিশেষ ক'রে ওর গানের জন্যে। এমন সুকণ্ঠ ভালো না লেগে পারে? তাই এজন্যে আমার মনে কোনো গ্লানি নেই। তাছাড়া আমি যে পরে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম—কোন্ কর্মফলে আমার হ'ল এ-কর্মভোগ। আমার মনের কোণে কোথায় একটা ঈর্ষা ছিল—নন্দিনী ও আমি দুজনেই বিধবা, কিন্তু একই দুর্দৈবের ফল ফলল উল্টো। ও হ'ল আদরিণী—শুধু আদরিণী নয়, পেল মামার যৌতুক—সঙ্গে রূপও যোগ দিল এ-যৌতুকের মান বাড়াতে—কেবল বিনা অপরাধে একা আমারি হ'ল লাঞ্ছনার একশেষ—রটল দুর্নাম! তাই সময়ে সময়ে মনে মনে সত্যিই চাইতাম শোধ তুলতে, নন্দিনীকে হার মানাতে—যদি ধরো ওর কোনো নাগর ওকে ছেড়ে আমাকেই চায়। এ-কুচিন্তার ফলে মনে গ্লানি হ'ত খুবই—ছি ছি, এমন অশুচি কামনাকে কেমন ক'রে মনে ঠাঁই দিচ্ছি! কিন্তু মন বোঝে তো প্রাণ বোঝে না, বলে না? কেন আমাকে সকলেই মাড়িয়ে যাবে—পাপোষের মতন—যখন ইচ্ছে? ঠিক এম্‌নি সময়েই মাণিকের উদয় হ'ল। আমারও মনে জেগে উঠল রেষা-রেষির ভাব। লজ্জার কথা বটেই তো—কিন্তু যখন সত্য, তখন না মেনে উপায় কি? আমি প্রায়ই কল্পনা করতাম মাণিক যদি আমাকে বিবাহ ক'রে এ অপমান থেকে বাঁচায়…তাহ'লে ওদের শিক্ষা হয়…এই ধরণের আরো যে কত হাবিজাবি চিন্তা!

"ঠিক এই ফাঁক দিয়েই এল কলি। ছেলেবেলায় শুনেছিলাম বাবার কাছে যে, যা-তা প্রার্থনা করতে নেই—অনেক সময় ঠাকুর বলেন—তথাস্তু, দিয়ে বসেন যা আমরা চাই। কথাটা সত্যি কি না জানি না, কিন্তু যা ঘটল তাকে 'প্রার্থনা পূরণ' নামই দিতে হয় বৈকি: মাণিক আমাকেই বরণ করল—হয়ত কোনো হঠাৎ-জেগে-ওঠা নেশার ঝোঁকে যে ধোপে টিকত না। তবু করল তো। কেন করল? সে যাই হোক, আমি এ সূত্রে বুঝলাম একটি কথা হাড়ে হাড়ে: যে মনেও কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই—কুচিন্তার চেয়ে বড় শত্রু কেউ নেই। কুকর্মও নয়। কারণ কুকর্মের তবু কাটান আছে—অনুতাপ, কিন্তু কুচিন্তার মধ্যে আছে শুধু বিলাস—অন্ততঃ কোনো শাস্তি নেই বাইরের দিক থেকে। কেবল সে-সময়ে একটা কথা আমি ঠাহর করি নি: যে, কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে সে ক্রমশঃ চিন্তার কোঠা থেকে নামতে চায় হানাহানির কুরুক্ষেত্রে—তাই আমি মাণিকের দিকে কয়েকবার না তাকিয়েই পারি নি, যে-চাহনির মধ্যে একটা ডাক মতন ছিল—মানতেই হবে। মেয়েরা আস্কারা না দিলে যে পুরুষেরা এগুতে পারে না, এটুকুও আমি জানতাম বৈ কি। তাই কেমন করে শুধু মাণিককে দায়িক করব চড়াও হ'য়ে বেলেল্লামি করার জন্যে? কেবল এইটুকু মাত্র আমার বলবার আছে যে, সে সময়ে এত কথা সজাগভাবে ভেবে দেখি নি। তবে জানাজানির ওপারে যে মন আছে সে বুঝি জানত।"

(একটু থেমে প্রহ্লাদের দিকে তাকিয়ে): আমার কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরে যে এ-ধরণের গভীর বোধ ওর মধ্যে প্রতি পদেই ফুটে উঠত; তার প্রধান কারণ—সত্যনিষ্ঠা ছিল ওর মজ্জাগত। দুঃখের চাপে হীন মানুষ আরো হীন হ'য়ে যায়, কিন্তু সত্যাশ্রয়ীরা আরো মহৎ হ'য়ে, উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠে—বিশেষ ক'রে সেই সব সাধক-সাধিকারা যারা নিজের রূপান্তর চায় ব'লেই মিথ্যার সঙ্গে রফা করতে রাজি হয় না। তাই তো মাণিকের একটুখানি অশুচি স্পর্শেই ওর মধ্যেকার ব্রহ্মচারিণী জেগে উঠল ওর ঈর্ষাকে নামঞ্জুর করে। কুন্তীকে কৃষ্ণ এই কথাই বলেছিলেন, বাবা: "সর্বং বলবতাং পথ্যং, সর্বং বলবতাং শুচিঃ'—যার মনের জোর আছে সে সব কিছু থেকেই আরো বল পায়, আরো শুচি হ'য়ে ওঠে। অন্যভাষায়: সত্যে যার নিষ্ঠা আন্তরিক ঠাকুর তাকে স্খলনের মধ্যে দিয়েও আকাশে টেনে তোলেন। ওর একটি কথা আমি কখনো ভুলব না। ও বড়গলা ক'রেই বলত আমাকে: "মিথ্যা বলা বোকামি, সত্যকে মিথ্যা ব'লে বরখাস্ত করা আরো বোকামি, কিন্তু সবচেয়ে বড় বোকামি হ'ল—গুরুর কাছে অসত্য ব'লে তাঁর প্রিয় হ'তে চাওয়া। কারণ শিষ্যশিষ্যারা সদ্‌গুরুর মনের মতন হ'তে পারে কেবল তখনই যখন গুরু যে-সত্যের সাধক, তারাও সেই সত্যের টানেই তাঁর আশ্রয় চায়। তাই তোমাকে তুষ্ট করতে যদি আমি মিথ্যার আশ্রয় নিই, তাহ'লে শুধু যে কে হারাব তাই নয়, তোমাকেও হারাব—আরো এই জন্যে যে, ইষ্ট ও গুরু যে ভিন্ন নয়

এ-সত্যের দেখা পেতে হ'লেও সব আগে চাই সত্যনিষ্ঠার সাধনাকে মনে প্রাণে বরণ করা।"

প্রহ্লাদ (আর্দ্র কণ্ঠে): কী চমৎকার কথা!

বিষ্ণুঠাকুর (স্নিগ্ধ হেসে সায় দিয়ে): আর চমৎকার এই জন্যেই যে, ওর মনের প্রাণের মূল গড়নটা'ই চমৎকার —যাকে অন্যভাবে নাম দিই আমরা—"বড় আধার।" কিন্তু ফিরে আসি ওর কাহিনীতে।

(একটু থেমে) বলছিলাম কি যে, ও স্বভাবে সত্যনিষ্ঠ ছিল ব'লেই আমার কাছে নিজের চ্যুতি বা' দুর্বলতার কথাও কখনো গোপন করত না। করবেই বা কেন বলো? আমাকে ও গুরুবরণ করেছিল তো ভেবেচিন্তে কি জোর ক'রে নয়—করেছিল যেমন সহজে পাখী বরণ করে আকাশকে, মাছ জলকে। আমি প'রে একদিন একথা ওকে বলেছিলাম সাবাস দিয়েই। বলেছিলাম: "যোগীরা এই জন্যেই বলেন যে, কোনো মিথ্যা শক্তিই আমাদের পেয়ে বসতে পারে না, যদি না তারা কোনো -না কোনো আস্কারার ছিদ্র পায়—ঠিক যেমন নৌকায় কোনো ফাটল না থাকলে জল ঢুকতে পারে না হাজার চেষ্টা করলেও। এ-উপমাটি সব দিক দিয়েই সুপ্রযুক্ত, কারণ কোনো ফাটলের মধ্যে দিয়ে জল একবার প্রবেশের পথ পেতে-না পেতে, যেমন হু হু করে ফাটল বেড়ে যায়, ঠিক তেমনি একবার কোনো অশুচি কামনার স্ফুলিঙ্গকে জ্বলতে না জ্বলতে যদি নিভিয়ে না দেওয়া যায় তাহ'লে সে স্ফুলিঙ্গ নানা অনুকূল যুক্তির হাওয়ায় দেখতে দেখতে গনগনে আগুন হ'য়ে ওঠে। এই জন্যেই মুনি-ঋষিরা পই পই ক'রে মানা করেছেন, পাপ চিন্তাকে কোনো অছিলায়ই মনে ঠাঁই না দিতে। কারণ কুচিন্তা স্বভাবে থানিকটা মাইক্রোবেরই মতন, একবার আশ্রয় পেলে দেখতে দেখতে বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু যা বলছিলাম: মোক্ষদা যদি তার গোপন ক্ষোভকে পুষে নন্দিনীর প্রতি ঈর্ষাকে কুচিন্তা দিয়ে লালন না করত তাহলে তার মতন মেয়ে মাণিকের দিকে ধরি-মাছ-না-ছুঁই পানি গোছের ইসারা করতেই পারত না—গহন মনে কামনার ফুলকিও ঝিকমিকিয়ে উঠতে পারত না। তবে এ ফুল্‌কি যে কামনার আগুনেরই সগোত্র এ-সত্যকেও ও প্রথম দিকে ঠিক সজাগভাবে উপলব্ধি করে নি, করেছিল তখনই যখন মাণিক হঠাৎ এসে ওর হাত চেপে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের দুর্বলতার কুয়াশা কেটে গেল সত্যমুখী আত্ম-ধিকারের আলোয়—ওর দেহও ছি ছি ক'রে ওকে দেখিয়ে দিল যে মাণিককে ও একটু আস্কারা দিয়েছিল বৈ কি। খুব সামান্য সে ইসারা—বটে। কিন্তু বিধাতা যাদের ছোট উপাদান দিয়ে গড়েন নি—তাদের ক্ষেত্রে সামান্য স্খলনও আনে গভীর চ্যুতির অবসাদ, কেন না তাদের সাধনা ভগবদ্‌মুখী ব'লে দেবদ্রোহী শক্তিরা তাদের পথ আগলে দাঁড়াতে চায় প্রাণপণে। মোক্ষদা ছিল স্বভাবে ধর্মিষ্ঠা—বড় আধার। দেবদ্রোহী শক্তির অন্য নাম কলি—যিনি সমস্তক্ষণই ছিদ্র খোঁজেন পেয়ে বসতে। এই দুষমণ কলি খুব শেয়ানাও বটে, তাই জানে যে, মোক্ষদার মতন আধারের মধ্যে সে ধরণের কোনো গভীর চ্যুতি বা দারুণ স্খলনের ছিদ্র পাওয়া অসম্ভব, যে-ধরণের চ্যুতি স্বভাব-স্বৈরিণীদের রোজই ঘটে—প্রায় স্বাভাবিক বললেই হয়। তাই বড় আধারের ক্ষেত্রে শয়তানকে আরো ওঁৎ পেতে ব'সে থাকতে হয়—যাতে একটু ছিদ্র পেতে-না-পেতে টুক ক'রে ঢুকে বসতে পারে। আর কলি ঢুকতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিল পরিমাণ চ্যুতির ফলে ঘটে তাল পরিমাণ দুঃখ-তাপ। এই জন্যেই মহৎ সাধকের বা যোগীদের সামান্য স্খলনের ফলেও আসে প্রায় অন্তহীন আত্মগ্লানি—যে-ধরণের গ্লানির সিকির সিকিও আসে না অসাধক বা অযোগীদের মারাত্মক কুকর্মের ফলে। (একটু থেমে) কিন্তু এ তো সবে কলির সন্ধে। তার পর কী হ'ল শুনলে তোমার মনে আর সংশয়লেশও থাকবে না যে, ঠাকুরের লীলালোকে তাঁর কৃপাশক্তিও যেমন অকাট্য সত্য তেম্‌নি অকাট্য সত্য—নেপথ্য কলিশক্তির মায়াতন্ত্র, ওরকে বিপথে টানবার অভাবনীয় প্রতিভা। শুধু তাই নয়, এ-নেপথ্য-শক্তিদের খবর কিছুই না জানলে দৃশ্যমান অনেক অঘটনেরই তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

(একটু থেমে) বলেছি, নন্দিনী মোক্ষদাকে নেক-নজরে না দেখলেও মাণিকের সঙ্গে গান শেখবার সময়ে তাকে ডাক দিত নিজের গৌরব বাড়াতে। কিন্তু দর্প-হারীর চতুর চালে হ'ল উল্টো উৎপত্তি—মোক্ষদার চোখে বড় হব র গর্বলোভে নন্দিনী ছোট হ'য়ে গেল মাণিকের চোখে। ফল যা হবার: ওর আক্রোশের আর সীমা

রইল না—বিশেষ ক'রে মোক্ষদার'পরে। রূপে গুণে অসামান্যা হ'য়েও একদিকে এক লাঞ্ছিতা নগণ্যার কাছেও হার মানতে হ'ল, অন্যদিকে যে-মাণিককে খেলাচ্ছিল এই ভেবে যে-কাছে ডেকে দূরে ঠেলে তাকে আরো উস্কে দেবে, ক্ষেপিয়ে তুলবে—সেই মাণিক কিনা ওর স্বপ্নের তাসের ঘর ভেঙে দিয়ে "আমার নাগর যায় পরঘর, আমার আঙিনা দিয়া।" ছি ছি! কী লজ্জা! আর লজ্জার উল্টো পিঠে বিষম জলুনি: নন্দিনী হ'য়ে দাঁড়াল মোক্ষদার সবচেয়ে বড় শত্রু। মায়ে ঝিয়ে ঠিক করল ওকে শিক্ষা দিতেই হবে। ওর বাগানে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হ'ল।

ঠিক এই সময়েই আমি এলাম কাশী। এও ঠাকুরের চাল বৈ কি। কেন—বলছি। কিন্তু ছবিটা ফুটিয়ে তুলতে হ'লে আগে একটু বলতেই হবে আমার কাহিনী—যাকে সাহেবরা বলায় back ground, সংক্ষেপেই বলব। [ক্রমশঃ

বৈশিষ্ট্যের সন্ধানে

(ভাগবতী কথা)

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রায় সমানার্থক ভাগবতের দুইটি শ্লোক লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমটি (১০-৯-২০) এইরূপ (শুকোক্তি)—

নেমং বিরিঞ্চো, ন ভব ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥

মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যেরূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, বিমুক্তিদাতা ভগবানের কাছে বিরিঞ্চ, ভব বা বক্ষবাসিনী লক্ষ্মীরও সেরূপ লাভ হয় নাই।

আবার অপর শ্লোকটিকে (১০-৪৭-৬০) লক্ষ্য কর (উদ্ধবোক্তি)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ

স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-

লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্।

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজদণ্ডগৃহীত অনুগ্রহপ্রাপ্তা গোপীগণের যেরূপ প্রসাদ লাভ হইয়াছিল, নলিনগন্ধদেহা কোন স্বর্গীয়-দেবী, এমন কি বিষ্ণুবক্ষোলগ্না লক্ষ্মীদেবীও সেরূপ প্রসাদ লাভে ধন্যা হন নাই।

দেখা যাইতেছে যে প্রসাদলাভ মা যশোদারও হইয়াছিল, গোপীদিগেরও হইয়াছিল। যেরূপ উপমা রহিয়াছে তাহাতে প্রসাদের উৎকর্ষের তারতম্য স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছেনা। অথচ শ্রীউদ্ধব, যাহাকে ভগবান চরমতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন,—(৯-২৪-৬৭) গোপীদের প্রসাদের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়াছেন এভাবে যে, মা যশোদা যে অঙ্গের সেবা কৃষ্ণকে দিতে পারেন নাই, গোপিকাগণ সেই "নিজাঙ্গ" দিয়া কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই ত প্রসাদের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

আচ্ছা, কুব্জাও সেই নিজাঙ্গ দিয়াই কৃষ্ণসেবা করিয়াছিল। তবুও ভাগবতকার তাহাকে "দুর্ভাগা" বলিয়া তিরস্কৃত করিলেন কেন ? (১০-৪৮-৮) উত্তরে দাবী করা হয় যে কুব্জার যে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমসেবা তাহা শুধু আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্যই। পক্ষান্তরে গোপিকাগণের নিজাঙ্গ দিয়া কৃষ্ণসেবার মধ্যে কৃষ্ণপ্রীতি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য ছিলনা। চৈতন্যচরিতামৃতে ঘোষণা করা হইতেছে যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির আকাঙ্ক্ষাকে কাম ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির কামনাকে প্রেম নাম দেওয়া হয়। গোপীগণ যখন রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন, ভাগবতের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়না যে, তাঁহারা নিছক কৃষ্ণপ্রীতির জন্যই অঙ্গসঙ্গের লোভে নানা "বিল্পবিত" বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ", একথা ভাগবতে আছে। পরীক্ষিতেরও সংশয় হইয়াছিল যে যিনি ধর্ম্মস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি পর-দারাভিমননিরূপ জুগুপ্‌সিত কর্ম কেন করিলেন? শ্রীশুকের উক্তিও ঐ ব্যাপারের সমর্থন করে; সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে তেজস্বী অনলসদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সব কার্য্য দূষণীয় হয়না, যেরূপ অগ্নি, পবিত্র বা অপবিত্র, সমস্ত বস্তুকেই আত্মসাৎ করিয়াও নিজে অপবিত্র হয়না।

এখানে আর একটা দিকও দেখিবার আছে। শ্রীউদ্ধবের যে উক্তিটি পূর্ব্বে উল্লিখিত করা হইয়াছে, সেখানে বলা হয় নাই যে কৃষ্ণ-সঙ্গমে ব্যভিচারদুষ্টা গোপীদের যে দুর্লভ প্রসাদ লাভ হইয়াছিল, অন্যের সেরূপ হয় নাই। সেখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে ঐ প্রসাদ উদ্ভূত হইয়াছিল, যখন ভগবান বহু হইয়া দুই বাহুদ্বারা দুই দুইজন গোপিনীর কণ্ঠ-ধারণ করিয়া রাসনৃত্যোৎসবসম্পন্ন করিয়াছিলেন। যদি উদ্ধববাক্যে বিশ্বাস করি তবে, রমণাদি ইন্দ্রিয়-প্রীতির প্রশ্নই এখানে উঠে না। এখানে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের সমন্বয় এভাবে হইতে পারে যে, ভগবান কণ্ঠাশ্লিষ্ট হইলে মা যশোদার যে প্রসাদ লাভ হয়, গোপীগণেরও তাহাই হয়, ততোধিক নহে। কাজেই গোপীপ্রেমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হইলেও চলে। অধিকন্তু দেখা যায় যে, ভগবান উদ্ধবকে ভক্তি-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে একাদশ স্কন্ধে যে সব অনবদ্য তত্ত্ব বলিয়াছেন, সেখানে ঐরূপ গোপীভাবে নিজাঙ্গ দিয়া কৃষ্ণসেবার উল্লেখমাত্রও করেন নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তশ্রেষ্ঠগণের কেহই গোপীভাবে ভজন না করিয়াই চরম পুরুষার্থলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং "এহ বাহ্য" প্রভৃতি না ভাবিলেও চলে।

আর ও একটি বিষয় বলিবার আছে। তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকার সাধনের মদ্য, মাংস ও সম্ভোগের পরে ক্লেশকর মুদ্রাদ্বারা দেহক্ষয়ের পূরণ ও মনঃস্থৈর্য্য সাধন করার পরে মৎস্যভাবে একাত্মভাবে লীন হইবার বিধান রহিয়াছে। রাসপঞ্চাধ্যায়েও দেখা যাইতেছে যে তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত গোপীগণ একান্ত কামাতুরা হইয়া কৃষ্ণসঙ্গম লাভ করেন। তার পরের অধ্যায়ে বিলাস (পঞ্চমকারের কৃচ্ছ্র সাধন মুদ্রা) এবং পঞ্চম অধ্যায়ে দেখি যে রিরংসাপ্রবৃত্তির অবসান হইয়াছে এবং সকলে কৃষ্ণকণ্ঠলগ্না হইয়া অলৌকিক রাসনৃত্যে বিভোরা। ভাগবতে নারদ বলেন, "কামাৎ গোপ্যঃ" গোপীগণ কাম হইতে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন। এখানে "কামাৎ" শব্দটিকে অপাদান কারক বলিয়া ধরিলে ব্যাকরণগতভাবেও শুদ্ধ ব্যাখ্যা করা যায় এই ভাবে যে, বিশ্লেষের বেলায় যাহা স্থির থাকে, তাহাই অপাদান। "কামাৎ" কাম হইতে বিশ্লেষবশতঃ কাম নিজস্থানে স্থির রহিল, আর কাম হইতে বিশ্লিষ্ট বা মুক্ত হইয়া গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের চরম সত্তায় লীন হইলেন।

সুতরাং গোপীপ্রেমকে বাৎসল্য প্রেমের উপরে স্থান দিতে গেলে অন্যায় ও অবিচার হইবে না কি?

আজকের বৃটেন

ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য পি এইচডি (লণ্ডন)
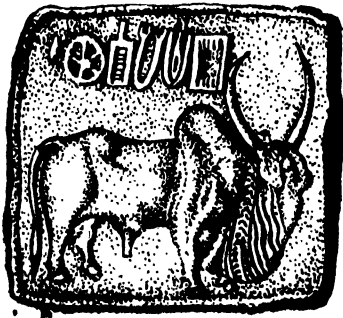
বৃটেনের মাটিতে প্রথম পা দিয়েছিলাম ১৯৫২ সালে। সাধ ছিল তাকে ভাল করে দেখবো জানবো, কিন্তু পরিচয় নিবিড় হ'তে না হ'তেই বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো। মনে পড়ে সেদিনের কথা ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস। চারিদিকে পাতা ঝরা স্থরু হয়ে গেছে। তারপর ভারতের বুকে আরও সাতবছর কাটলো দুঃখসুখের দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি পুনর্মিলনের। একদিন সে স্বপ্ন বুঝি বাস্তব হ'য়ে দেখা দিল। সাত বছর বাদে আবার বৃটেনকে দেখলাম মনে পড়ল প্রথম শুভদৃষ্টির কথা। গোধূলি লগ্নে সে পরিচয় হোয়েছিল। আজ তার মাদকতা হারিয়ে গেছে। কিন্তু হারিয়ে যায়নি তার প্রতি ভালবাসা।

সরমজড়িত দৃষ্টিতে দেখলাম তার দিকে। কত-দিনের বিরহ বিচ্ছেদের অন্তরালে হৃদয় দুরু দুরু করে উঠলো। বুঝলাম দীর্ঘদিনের ব্যবধানে কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন শুধু বাইরের। এই সাতবছরে অন্তরের ভাবমূর্ত্তি কিছু পাল্‌টায়নি—এই আশা নিয়ে আরও নিবিড় করে জান্‌তে চাইলাম বৃটেনকে।

একটা দেশকে জান্‌তে হ'লে,জানতে হয় তার সংস্কৃতিকে, জানতে হয় তার মানুষকে। প্রথম যখন এদেশে এসে-ছিলাম তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারেনি এদেশ। তার সমাজ অর্থনীতি শিক্ষা ছিল সঙ্কুচিত। একে একে এদেশের ওপর দিয়ে অনেক পরিবর্ত্তনের ঢেউ চলে গেছে। অনেক মতবাদের তুফান এরা পেরিয়েছে। এতদিন ধরে সারা পৃথিবীতে যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, একে একে তাকে গুটিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু তবুও এজাত মরেনি। তার চারিত্রিক বলে সে আবার নতুন করে সংসার পেতেছে। অনেক সমস্যার মুখোমুখী তাকে হতে হয়েছে, কিন্তু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার গুণে স্থির বুদ্ধি দিয়ে সে তার সমাধান করে নিয়েছে। এর ফলে আজ বৃটেনের দৃষ্টিভঙ্গী হ'য়েছে অন্তর্মুখী। একদিন যেমন সে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল সারা বিশ্বে—আজ তেমন তার সমগ্র দৃষ্টি পড়েছে তার নিজের ঘর সংসারে। কি করে তার ছোট্ট ঘর-সংসার গুছিয়ে নিয়ে তার মধ্যেই লক্ষ্মীর আড়ি পাত্‌তে পারে সে দিকে তার দৃষ্টি আজ সজাগ।

এ কথা কয়েকদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছি-লাম, অনুভব করেছিলাম তার হৃদ্‌স্পন্দনকে। সে যেন আজ দ্রুতগতিতে চলেছে প্রাণের তাগিদে। বুঝেছিলাম যে এবার বৃটেনের বাইরের রূপে আর ভুলে থাকা ঠিক হবে না। তার অন্তরাত্মার সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে। সেই আশা নিয়ে ছুটেছি এদিক ওদিক সেদেশের মানুষকে বুঝবার জন্যে, তাদের মনের কথা জানবার জন্যে। অনেককে প্রশ্নই করে বসেছি, "তোমাদের কেমন কাটছে এখন, আগের চেয়ে ভাল?" একগাল হাসি হেসে শ্রমিক-দম্পতি উত্তর দিয়েছে "তা আর বলতে"। আজ আমাদের আয় অনেক বেড়ে গেছে, খাদ্যের অভাব নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঋণের বোঝাও বেড়েছে। প্রথমটা শুনে অবাক লাগলো পরে বুঝলাম—এদের জীবনের প্রয়োজন আজ বেড়ে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন কিছু অর্থ সংস্থানের আশা নিয়ে এখানকার বেতার বিচিত্রার আসরে এসে হাজির হ'লাম। মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে আগেকার অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে এবারও কিছু মিল্‌বে। এদেশের রীতি অনুযায়ী বিচিত্রার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম দূর-ভাষণের মাধ্যমে। কথা শুনে মনে হ'ল ভদ্রলোক রাশভারী, ভাবলাম গিয়ে তো দেখি। তাঁর নির্দ্দেশ মত শনিবারের বারবেলায় গিয়ে হাজির হ'লাম, দেখ্‌লাম খুব ব্যস্ত, আলাপ আলোচনার অবসর নেই। বেশী বাক্যব্যয় না ক'রে আমার বৃটেনের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সম্বলিত একখানি বই তাঁর হাতে তুলে দিলাম, আর বললাম "যদি লেখা পছন্দ হয় তা হলে ডাকবেন বা ফোন করবেন।" রোজই

ফোনের আশায় থাকি দু' একদিন ফোন যে বেজে ওঠেনি তা' নয়। কিন্তু সে বাজে ফোন। ধৈর্য্য রাখতে না পেরে আবার ফোন করে বস্‌লাম। সোজাসুজি প্রশ্ন—কেমন লাগলো আমার বইখানি? এর মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার পড়া হ'য়ে গেছে। ভদ্রলোক কোনও ভূমিকা না ক'রে বললেন "আরে আপনাকেই তো খুঁজ্‌ছিলাম। যাক্‌ ভালই হ'ল। একদিন আসুন, অনেক কথা আছে।" এই আশ্বাসবাণীর জন্যে মনে মনে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তারপর থেকে আমাকে আর কোনও কথা বলতে হয়নি। যতখানি সম্ভব তিনি আমাকে কাকে লাগিয়েছেন। সত্যি কথা বল্‌তে কি—ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার একটা কৌতুহলই ছিল। কোথায় এমন একটি মানুষ আগে দেখেছি মনে মনে খুঁজছিলাম। সে খোঁজার আজও শেষ হয়নি। ভদ্রলোকের নাম বিনয় রায়। নামের সঙ্গে আচরণের সামঞ্জস্য আছে বই কি। যতই তাঁর সঙ্গে মিশেছি ততই আকৃষ্ট হ'য়েছি। কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা বুদ্ধির দীপ্তি। আচরণে সপ্রতিভ ভাব। এই মানুষটিকে আজও ভুলতে পারিনি। যাক্‌, যে কথা বল্‌ছিলাম—এমনি আরও অনেক মানুষের সঙ্গে এদেশে আমার পরিচয় হ'য়েছে তারা বেশীর ভাগই ইংরেজ।

ইংরেজ বন্ধুদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে মিঃ ডানষ্টলের কথা। এক সবজীর দোকানে গিয়ে এঁর সঙ্গে আলাপ হোয়েছিল। ভদ্রলোকের বোন ছিলেন এই সবজীর দোকানের মালিক। ভদ্রমহিলাটি খুব অমায়িক। স্বামী অফিসে কাজ করেন। আর স্ত্রী সব্‌জীর দোকান চালিয়ে স্বামীকে সাহায্য কর্‌তে চেষ্টা করেন। লণ্ডন থেকে একটু বাইরে এবার আমার আস্তানা মিলেছিল। বেশ পল্লীপরিবেশ, তাই সকলের সঙ্গেই একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠ্‌তে এই সব পরিবেশে দেরী হয়না। এক দিন ঘরোয়া কথা বল্‌তে বল্‌তে নিজের থাকার অসুবিধার কথা প্রকাশ করে ফেললাম। ভদ্রমহিলা প্রশ্ন কর্‌লেন "তা হ'লে আমাদের তুমি ছেড়ে যেতে চাও, কেন এখানে কি অসুবিধে হচ্ছে?" আমি বল্‌লাম—অসুবিধা আর কিছুই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জায়গাটা বড় দূরে তাই। ভদ্রমহিলা একটু চিন্তা করেই বল্‌লেন "ভাল কথা, আমার এক ভাই-এর এক বাড়ী আছে, জায়গাটা ভাল আর কাছাকাছিও হবে। সেই প্রসঙ্গেই মিঃ ডানষ্টলের সঙ্গে ঐ সব্‌জীর দোকানে প্রথম আলাপ। একে একে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। পড়ে দেখ্‌লাম যে বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটের সম্পর্ক ছাপিয়ে যেন একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠ্‌ছিল। বেশ কিছুদিন তাঁর বাড়ীতে অতিথি ছিলাম, অবসর পেলেই তাঁর বসবার ঘরটিতে একবার উঁকি দিয়ে যেতাম। একদিন ঘরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছি, কারণ, ঘরের মধ্যে এক মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, কিন্তু about turn নেবার আগেই ভদ্রলোক আমার নাম ধরে ডেকে একটি বস্‌বার জায়গা দিয়ে বল্‌লেন "Will you take your seat and be comfortable?" আমি একটু ইতস্ততঃ করে জড়-সড় হোয়ে এক কোণে গিয়ে বস্‌লাম। সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দ্দন করে বল্‌লেন "তোমাকে এক কাপ চা দিতে পারি কি?" বুঝলাম, আমার সম্বন্ধে আগেই আমার land lord এর কাছ থেকে কিছু খবর ইনি নিয়েছেন। বসে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি, ভদ্রলোক মহিলাটির পরিচয় দিয়ে বল্‌লেন—এটি আমার মেয়ে। শুনে একটু অবাক হ'লাম। আগে তো কই একে কোনদিন দেখিনি। পরে মেয়েটি চ'লে গেলে ডানষ্টল তাঁর জীবনের এক করুণ অধ্যায়ের কথা আমাকে বল্‌লেন। আমিও অলক্ষ্যে একটু সহানুভূতি প্রকাশ করেই ফেলেছিলাম। এই হোল আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের সূত্রপাত, তারপর কত সন্ধ্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিঃ ডানষ্টলের সঙ্গে গল্প করেছি। কত ঘরোয়া সুখদুঃখের কথা। বিদেশী হলেও যেন কোথায় একটা মিল খুঁজে পেয়েছিলাম। এমন অনেক দিন গেছে যখন ভদ্রলোকের সঙ্গে ডিনারও খেয়ে নিয়েছি। একে দেখে মনে হয়েছে যেন ইনি নিঃসঙ্গ—কোথায় একটা ব্যথা রয়ে গেছে কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যের গুণে সেই ব্যথা কোথায় তা তিনি অনেকদিন প্রকাশ করেননি। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় ৬৫র কাছাকাছি কিন্তু এখনও অক্লান্তকর্ম্মী—ছুটির দিনেও তাঁকে বাড়ী বস্‌তে দেখিনি। খুব দরিদ্র অবস্থা থেকে শুধু কর্ম্মের বলে আজ লণ্ডন সহরের একখানি বাড়ীর মালিক হয়েছেন। মুখের মধ্যে অমায়িকতার ছাপ, মনে হয় জীবনে ব অভিজ্ঞতা আহরণ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীব

সম্পর্কে আমার কৌতুহল প্রকাশ করা ঠিক হবে কিনা এই প্রশ্ন আমাকে বহুদিন সঙ্কুচিত করে রেখেছে। কিন্তু একদিন সব সঙ্কোচের বাঁধন আলগা করে দিয়ে জিজ্ঞেস করেই বল্লাম। হয়ত এই প্রশ্ন আমার কাছ থেকে তিনি আশা করেছিলেন একদিনকার আলাপের পর। তাই আমার প্রশ্নটিকে সহজে স্বীকার করে নিলেন। লক্ষ্য করলাম—উত্তর দেবার সময় তাঁর চোখদুটি ছল ছল করছে, তিনি বল্লেন "আমার সবই ছিল, আমার একমাত্র ছেলে আজ বিয়ে করে পর হোয়ে গেছে, আর মেয়েটি মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসে, তবু বুড়ো বাবাকে তার মনে পড়ে। আমি বললাম, "তোমার মেয়ের বিয়ে হয়নি বুঝি?" বল্ল, "না। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগলো তা হলে ও কোথায় থাকে—প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মিঃ ডানহল বেশ খানিকটা ইতস্ততঃ করছিলেন পরে সামলে নিয়ে বল্লেন আমার স্ত্রী বহুদিন আমাকে ছেড়ে গেছে, মেয়েটি এখন তার কাছেই থাকে।" শুনে মনে প্রমাদ গুনলাম। সমবেদনা জাগলো এই অমায়িক ভদ্রলোকটির ওপর। এবার লণ্ডন থেকে বিদায় নেবার আগে ডানহলকে আমার লেখা ছোট্ট একখানি বই দিয়ে বল্লাম, "তুমি আমায় যা দিয়েছ তার পরিশোধ করবার শক্তি আমার নেই। আমার এই ছোট্ট উপহারটি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে তোমাকে দিচ্ছি।" ভদ্রলোক বইখানি পেয়ে যে খুবই খুশী হলেন, তা তাঁর দু একটি কথায় বোঝা গেল। বল্লেন "চিরদিন হাতের কাজ করে এসেছি, বস্তুসর্ব্বস্ব দৃষ্টি নিয়ে। কিন্তু জীবনে শান্তি পাইনি। তোমার লেখা এই বইখানি যদি আমাকে কিছুটা ভুলিয়ে রাখে তা' হলে সেটাই হবে আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার।

এতে লণ্ডনের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হ'তে থাকে। একদিন লণ্ডনের টিউবে চলেছি। সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে গাড়ী ছুটেছে বিদ্যুৎ গতিতে। হঠাৎ একটু থমকে উঠে দেখি, গাড়ী এসে পড়েছে মুক্তপ্রকৃতির কোলে। সেই কামরায় প্রায় সব আরোহী নেমে গেছে। এক কোণে শুধু এক ভদ্রলোক বসে আছেন—দেখে মনে হল বেশ অভিজাত। আমার দিকে একটু কটাক্ষে তাকিয়ে বললেন —"Are you from India"? আমি একটু হেসে ঘাড় নাড়লাম। তিনি একটু এগিয়ে এসে আমার সামনের সিটটিতে ব'সলেন। কথায় কথায় জানা গেল ভদ্রলোক ভারতবর্ষে বহুদিন ছিলেন Armyতে। তিনি আমাকে বললেন যে তাঁর ছেলের জন্ম নাকি ভারতের মাটিতে—আর তাঁর স্ত্রী নাকি ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাবান।

কথায় কথায় কথা বেড়ে উঠল। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন যে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে আসার পর ভারতের কি কোন উন্নতি হ'য়েছে? আমি বললাম নিশ্চয়ই। হঠাৎ দেখি তাঁর গন্তব্যস্থান এসে গেছে। বিদায় নেবার আগে—ভদ্রলোক একখানা কার্ড দিয়ে ব'ললেন "একদিন আসবেন—খুব খুশী হব।" আমি একটা ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলাম। এই হ'ল Mr Chapman এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। একদিন টেলিফোনে appointment করলাম। Dinner এর নিমন্ত্রণ। যথারীতি গিয়ে পৌছলাম। লণ্ডনের বাইরে স্থলিং এ নেমে আসার বাসে চাপতে হয়। প্রায় ১ ঘণ্টা লাগে যেতে। আমার জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। যাওয়া মাত্রই Home fire এর কাছাকাছি কুশনটি আমাকে দিলেন। আগুনকে ঘিরে সমস্ত পরিবার তখন গালগল্প করছিলেন। Mrs Chayman এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—অনেক দিন থেকে আমার গিন্নী একজন ভারতীয় বন্ধুকে খুঁজছিলেন!...হঠাৎ কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। মনে কৌতুহল র'য়ে গেল। তখন ছিল খ্রীষ্টমাসের সময়। সব ঘর-দোর জানলা দরজা পরিষ্কার করা সুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে খ্রীষ্টমাস বৃক্ষের আয়োজন। Mr Chapmanএকে একে তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বড় ছেলেটির বয়স প্রায় ২১ বছর—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বাবা মার কাছে খ্রীষ্টমাস উপলক্ষ্যে এসেছে। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। তার কথা ব'লতে ব'লতে বললেন, এর জন্ম হ'ল ভারতবর্ষে Bombay শহরে। কথায় কথায় বঙ্গের খুব সুখ্যাতি ক'রলেন। ছোট্ট মেয়েটার বয়স মাত্র ৫ বছর। বেশ সুখের সংসার। Mr Chapman ভারতীয় দূতাবাসেরই একজন পদস্থ কর্মচারী। খুব ভদ্র ও দরদী। ডিনার সেরে আবার গল্প। আমি প্রশ্ন করলাম,—"আচ্ছা, ইংরেজ ত ভারত ছেড়ে চ'লে এসেছে—এখনও তাদের ভারতীয়দের প্রতি মনোভাব কি একই রকমের আছে?" Mr Chapman একটু অমায়িক হেসে বললেন—তাই যদি হবে, তবে আমি কি করে ভারতীয় দূতাবাসে কর্ম্মচারী হ'তে পারি? হ্যাঁ তবে ভারতীয়দের প্রতি এ জাতির ধারণা খুব ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। বহুদিনের সংস্কার ও আভিজাত্যবোধ তারা একদিনে ছাড়তে পারবে কি ক'রে?"

উক্তিটির মধ্যে সারল্যের পরিচয় পেয়ে ভালো লাগল। কথায় কথায় বেশ রাত্রি হ'য়ে গেছে। লণ্ডনের ত্রস্ত কোলাহল থেকে বেশ খানিকটা দূরে। Mr Chapman Carএ ক'রে আমাকে Tube-Stationএ পৌঁছে দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরাধাবল্লভ দে

শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনকথা অতি পুরাতন এবং বহুবার বহুভাবে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি এই অমিয় জীবন বৃত্তান্তের অতি সংক্ষিপ্ত বিবৃতির একটি ভক্তি-পূর্ণ অর্ঘ্য তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিবার এক অদম্য প্রেরণা অন্তরে অনুভব করিতেছি। তাই এই নৈবেদ্য।

আবির্ভাব—তাঁহার ধরাধামে আবির্ভাব সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা বেশ রহস্যময়। পৈত্রিক ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহার পিতা ধর্মশীল ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ৺গয়াধামে যাইয়া স্বপ্নে জানিতে পারেন শ্রীশ্রীগদাধর তাঁহার পুত্ররূপে উদিত হইবেন। ইত্যবসরে তাঁহার পতিব্রতা পত্নী চন্দ্রাদেবীও নিকটস্থ যুগীদিগের শিবালয়ে গিয়া দেখিলেন যে শিবালয় হইতে একটি ঘূর্ণীবায়ু ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তদবধি তাঁর মনে হইতে লাগল, তিনি গর্ভধারণ করিয়াছেন। উপরোক্ত দুইটি ঘটনা তাঁহার ধরাধামে আবির্ভাবের পূর্ব্ব-সূচনা।

বাল্য জীবন—তাঁহার বাল্যজীবনের লীলাভিনয় হইতে মাত্র তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। মাত্র সাত বৎসর বয়সে নিবিড় মেঘের কোলে বলাকা শ্রেণী দেখিয়া ভাবতন্ময়তায় তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে আলুড়ের মাঠে বিশালাক্ষীর ভাবাবেশে আবার একবার ঐরূপ অবস্থা হয়। তার পর কামারপুকুর গ্রামে একদিন যাত্রাভিনয়ের সময় যিনি শিবের অভিনয় করিবেন তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। গদাধরকে (গদাধর স্বপ্ন দেখাইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া বালকের নামকরণ হইয়াছিল গদাধর) শিবের অভিনয় করিতে হইয়াছিল। ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত ডমরু সাপ হস্তে যেন সাক্ষাৎ শিব আসরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু একেবারে স্থির, চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ যেন সাক্ষাৎ শিব ধ্যানে মগ্ন। যাত্রার আসর ভাঙ্গিয়া গেল, বহুক্ষণ পরে বালকের সংজ্ঞালাভ হইয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—পিতৃবিয়োগের পর সাংসারিক অভাব অনাটনের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার কর্তৃক কলিকাতায় আনীত হন। বাংলা কিছুদূর পড়িয়া ও সময়ে সময়ে ভ্রাতার সহায়তায় পূজাদি কর্মে নিযুক্ত হইয়া বুঝিলেন, বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষাদানের লক্ষ্য অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ। তাই তিনি ভ্রাতাকে একদিন বলিয়াছিলেন 'এ চালকলা বাঁধা বিদ্যায় আমার প্রযোজন নাই।' রামকুমার তখন রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমাতার পূজারির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভ্রাতা গদাধরকেও এই পূজাকার্যে ব্রতী করিলেন। এই সময় স্বাভাবিক প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া তাঁহার মনে কেবলই জাগিতে লাগিল—এ কাহার পূজা করি? কেন করি? এই পূজার দ্বারা আমার কি লাভ হইবে? ইনি কি বাস্তবিকই জগন্মাতা অথবা কেবলমাত্র পুত্তলিকা? চিন্তার প্রাবল্যে, প্রাণের ব্যাকুল আবেগে আহার গেল, নিদ্রা গেল, সময় কোন দিক দিয়া যাইতে লাগল ঠিকও পাইতেন না। এই সুতীব্র ভাবের উত্তেজনায় হৃদয়ের আবেগ যখন চরমে উঠিল, মা আর অমন স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া দর্শন দিলেন। ভগবদ্দর্শনের পর শাস্ত্রোক্ত মতে সাধনা এবার আয়ত্ব হইল। শ্রীশ্রীজগন্মাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভৈরবী ব্রাহ্মণী শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় তন্ত্র মতেই সিদ্ধ-সাধিকা—প্রধান প্রধান তন্ত্রের বিধানানুযায়ী সকল অনুষ্ঠান শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা সম্পাদন করাইয়া লইলেন। অতঃপর তিনি তোতা নামক এক অদ্বৈতবাদী সাধুর সান্নিধ্যলাভ করেন। তিনিই তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন রামকৃষ্ণ। ইনি ব্রহ্ম মানেন, কিন্তু শক্তি মানেন না। জগজ্জননী তোতাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলে তিনি যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি এই স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়া সজল নয়নে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট

হইতে বিদায় লইলেন। অতঃপর তিনি গোবিন্দরায় নামক জনৈক মুসলমান দরবেশের নিকট মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সেইমতে সাধনা দ্বারা হজরত মহম্মদের দর্শনলাভ করেন। সময়ান্তরে আবার তিনি যীশুর পবিত্র দিব্য ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় শরীরে প্রবিষ্ট হইতে দেখেন। এই রূপে দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল তীব্র ও কঠোর সাধনার দ্বারা তিনি জানিতে পারিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণ রূপে জগতের হিতকামনায় শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তিনিই এবার রামকৃষ্ণ রূপে নব শরীরে উদিত হইয়াছেন। বিবেকানন্দ প্রমুখ নব্যবঙ্গ যখন শিক্ষা লইয়া উপযুক্ত হইলেন তখন তিনি অন্তর্হিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম আবির্ভাব আজও তদধীন ভক্তগণকে অনুগৃহীত করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈচিত্র্যবহুল সাধনলব্ধ জীবনের আচরণও ছিল অদ্ভুত। দুইটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। কাঞ্চনাসক্তি নিঃশেষে ত্যাগ করিবার জন্য এক হাতে টাকা ও অন্য হাতে মাটীর ঢেলা লইয়া—টাকা মাটী, মাটি টাকা—বলিতে বলিতে উভয়কে জলে নিক্ষেপ করিবার পর ধাতু স্পর্শ করিলে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। এই অদ্ভুত সাধক জ্ঞান অজ্ঞান ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীচরণে অর্পণ করিলেন, কিন্তু সত্য দিতে পারেন নাই। সত্য দিলে মাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণের সত্য রক্ষিত হইবে কি উপায়ে? কামিনীতে আসক্তিত্যাগ যাচাই করিবার জন্য পূর্ণ-যৌবনা স্ত্রীর সহিত মাতৃজ্ঞানে এক শয্যায় একাদিক্রমে ৮ মাস শয়নের পরও অবশেষে আজীবনের জপ ধ্যান সাধনার যা কিছু সাফল্য যা কিছু শক্তি জগদম্বার অংশ জ্ঞানে তাঁহার পায়ে নিবেদন করিয়াছিলেন। মন মুখ আচরণ—এই তিনকে এক করার কি সত্য সুন্দর উদাহরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলব্ধ জীবনের অগণিত অবদান-গুলির কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। দুরূহ জটিল সমস্যার সমাধানগুলি অতুলনীয়, সহজ সরল দৃষ্টান্ত সহজভাবে বুঝাইবার কি অদ্ভুত কৌশল তিনি জানিতেন!

যত মত, তত পথ—সকল প্রকার সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—সব মতই পথ, কিছু ভিন্ন নয়। হিন্দুরা এক পথে এক ঘাটে জল নিচ্ছে বলছে জল, খৃষ্টানরা অন্য ঘাটে অন্য পথে জল নিচ্ছে বলছে ওয়াটার, আবার মুসলমানরা অন্য পথে অন্য ঘাটে জল নিচ্ছে বলছে পানি—কিন্তু সেই এক বস্তুই সকলে নিচ্ছে।

অদ্বৈতজ্ঞান—অদ্বৈতজ্ঞান আমাদের এক জটিল সমস্যা। তিনি সংসারীদের বললেন—অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসার কর। অর্থাৎ যতদিন সংসারে দেহাভিমান ততদিন অদ্বৈতজ্ঞানের সম্ভোগ হৃদয়ে নিরুদ্ধ রেখে ভূতে ভূতে তিনিই বিরাজিত আছেন—এই ভাব লইয়া জীবন যাপন করিতে বলেছেন। কারণ ইন্দ্রিয়াতীত, দেহাতীত অদ্বৈতভাব দেহাভিমান থাকিতে আসেনা। সেইজন্য শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিবার নির্দ্দেশ তিনি দিয়াছেন।

সগুণ-নির্গুণ—ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ—এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন তখন তিনি সগুণ, আর যখন এ সকল কার্য্য কিছু নাই তখন তিনি নির্গুণ। সাপটা এঁকে বেঁকে চলছে আবার কখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। অন্য উদাহরণ দিয়ে আবার বল্‌ছেন—সমুদ্র কখনও প্রশান্ত স্থির আবার কখনও উত্তাল তরঙ্গময়।

সাকার কি নিরাকার—ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এ তর্কের মীমাংসা তিনি করেছেন এক অতি সহজ উপমার দ্বারা। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু ইচ্ছা করিলে প্রেম ভক্তি শেখাবার জন্য মানুষ দেহ ধারণ করে আসেন অবতার হয়ে। গাভীর সার বস্তু দুধ আসে গাভীর বাঁট দিয়ে। সেই রকম ঈশ্বর তাঁহার সারবস্তু পাঠান মানুষের মধ্য দিয়ে। অবতার হচ্ছেন গাভীর বাঁট। আর এক উপমা দিচ্ছেন, সাগর অসীম অনন্ত হলেও হিমে বরফ হয়ে কোথাও কোথাও সাকার মূর্ত্তি ধারণ করে। নিরাকার ঈশ্বরও সেইরূপ ভক্তি হিমে বরফ হয়ে সাকার আকার ধারণ করেন।

স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টি—এ দু'টিই সত্য, এ জটিল সমস্যা বুঝালেন একটি বেলের উপমা দিয়ে। বেলটা ওজনে কত জানতে হলে খালি শাঁস ওজন করলে ঠিক ওজন পাওয়া যায় না। তার বীচি খোসা সব নিতে হয়। খোলাটা জগৎ আর বীচিগুলি সব জীব। বিচারের সময় শাঁসকে সার বলা হয়, কিন্তু যে সত্তাতে শাঁস সেই সত্তাতে খোলা আর বীচি। যিনি স্রষ্টা তাঁর ঐশ্বর্য্যই তাঁর সৃষ্টি।

যখন ভগবান সম্বন্ধে নানা মতবাদ এবং ধর্মাবলম্বীদের ভিতর দারুণ সংঘর্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হলেন উদার উন্মুক্তির এক বিশ্বজোড়া আসন নিয়ে। ভবতারিণীকে প্রণাম নিবেদন করিবার পর তিনি প্রণাম নিবেদন করলেন—সাকারবাদীদের, নিরাকারবাদীদের সর্ব্বভূতে, সর্ব্ব জীবে! তিনি দ্বৈতবাদীদের দুই, প্রভেদ-বাদীদের বহু, নাস্তিকের নাস্তি, আস্তিকের আস্তি সবের সমন্বয় করে দিলেন, এক অপূর্ব্ব কৌশলের তাহার এই সর্বধর্ম্ম-সমন্বয় জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ।

তিমির রাত্রি পোহাল

শ্রীঅমিয়কুমার সেন
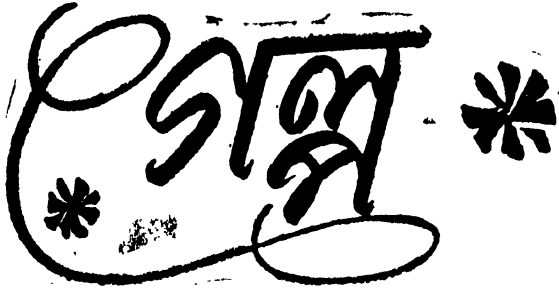
গল্প লিখ্‌ছে অরুণা। লেখে ভালই। বাজারে ওর লেখার বেশ চাহিদাও আছে। সংসারের চাপে ওকে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু ছাড়তে পারে নাই শুধু এই লেখার অভ্যাসটুকু। জীবনে আছে মাত্র এইটুকুই বিলাস। আর সবই ত গেছে।

কিন্তু কেন গেল? এর মধ্যে জীবনের সব মাধুর্য কেন গেল নিঃশেষ হয়ে? বিয়ের আগের সেই মধুর স্বপ্ন রচনা, কল্পনায় বুনেছিল যে মোহজাল—সত্যিই সবই গেল নিঃশেষ হয়ে!

লেখা ছেড়ে অরুণা ভাবে।

ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে তারই জীবনের প্রতিচ্ছবি।

স্বামী দিব্যেন্দুর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় তারই এক বান্ধবীর বাড়ীতে। তারপর তাদের সেই পরিচয় গাঢ় হতে হল গাঢ়তর। ওরা নিজেরাই নিজেদের করল নির্বাচন। অরুণা বোস হল অরুণা রায়।

ফলে, বড়লোক আর গোঁড়া বাপের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে, সবে পাশ করা ডাক্তার দিব্যেন্দুকে অরুণার হাত ধরে বাঁধতে হল নতুন ঘর।

ঘরই হল। অরুণা ভাবে, সত্যিকারের ঘরণী হতে পারল কই সে! এই চার বছরের মধ্যে স্বামী প্রতিষ্ঠিত হতে পারল কই!

অরুণা ভাবে, একি তাদের বাপমায়ের দীর্ঘশ্বাসে—না তার নিজেরই অদৃষ্ট দোষে!

একটা নিশ্বাস ফেলে অরুণা আবার কলম তুলে নেয়।

ছোট সংসার।

স্বামী, স্ত্রী আর তাদের একমাত্র তিন বছরের ছেলে।

এই ছেলে—লিক্‌লিকে রোগা পট্‌কা দেহ, হাত পা যেন নীরস কাঠির প্রতিমূর্তি, দীনতার খরচাপে শুকাতে বসেছে রোগাতুর একটি কোমল কচি প্রাণ!

অথচ এই ছেলেই পিতামাতার ভবিষ্য আশাস্থল—সুখ স্বপ্নের বনিয়াদ গড়ে এই ছেলের দিকেই চেয়ে চেয়ে তারা।

হায়রে!

অরুণা ভাবে—

ভাবে, তাদের দুঃখের জীবনে সন্তান কেন এল, এল যদি তাকে সুস্থ সবল করে বাঁচিয়ে রাখবার এতটুকু অধিকার ভগবান তাদের জীবনে দিলেন না কেন?

অভাব—অভাব চারদিক দিয়ে রাক্ষসীর মত হা করে তাদের সর্বস্ব গ্রাস করে নিয়ে যেতে চায়—কি এর প্রতিকার?

ভেবেই চলে—এ ভাবনার শেষ যেন আর হয় না।

দুঃখ হয় স্বামীর জন্য—ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ, কিন্তু সে সম্মান দুঃখ, দারিদ্র্য আর ভাগ্য বিপর্যয়ে ঘূরপাক খেয়ে কোন অতলে তলিয়ে গেল।

লজ্জা হয় নিজের কথা ভেবে, দুর্ভাগিনী বলে নিজেকে দেয় ধিক্কার—দুর্ভাগিনীই ত, নইলে স্বামীর সৌভাগ্য সে কেন পারল না ফিরিয়ে আনতে?

ছেলেটা কেঁদে ওঠে—কান্নায় অস্পষ্ট জড়িয়ে যায়, মা—মা—

অরুণা সযত্নে ছেলেকে কোলে তুলে নেয়—মাতৃস্তন ছেলের মুখে দিয়ে তাকে শান্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টাই প্রকাশ হয়ে পড়ে—মাতৃস্তন যোগাতে পারে না ছেলেকে শান্ত করবার উপকরণ—ছেলে শান্ত হবে কেন?

হয় না—অশান্ত ছেলে কেঁদে কেঁদে মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

অরুণা জানে, অভাব আর দারিদ্র্য মনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়, জীবনের হাসি গান আনন্দের আলো চিরতরে

করে নির্বাপিত, মানুষকে করে ক্রোধী, চিত্তচাঞ্চল্যে অস্থির—বেঁচে থাকবার আশা বুকে নিয়ে মানুষের জীবনের গতি হয় এমনি ধারাই।

কিন্তু তার স্বামী। অভাব আর দারিদ্র্য তাকে ত জয় করতে পারে নাই। তার নিকট থেকে সে প্রায়ই এই কথা শুনতে পায়—অরুণা বাইরের অভাবে মনের আনন্দকে রিক্ত ক'রো না, আমরা বাঁচার মত বাঁচতে চাই, তুমি, আমি আর খোকা।

অরুণা কতদিন চোখের জল ফেলে বলেছে, কেমন করে মনে আনন্দ আনব, তোমার কষ্ট, খোকার কষ্ট, আমি যে সহ্য করতে পারিনা।

স্বামী অরুণার চোখের জল মুছিয়ে হেসে বলেছে, কিন্তু মনে আনন্দই আনতে হবে অরু, এই আনন্দের মাঝেই বেঁচে থাকে জীবনের চলার মোহন ছন্দ; অভাবে ভেঙে পড়লে, মুষড়ে পড়লে ভগবানের সৃষ্টির হয় অবমাননা, তিনি চান তাঁর সৃষ্টি-স্থিতির স্তরে স্তরে জীবনের আনন্দ বেঁচে থাকে—

অরুণা বলেছে, সবই বুঝি, কিন্তু এমন করে বেঁচে থেকে লাভ!

স্বামী বলেছে, লাভ লোকসানের মাপযন্ত্র ত আমাদের হাতে না অরু, এ যাঁর হাতে তিনি তাঁর বিচার করবেন।

শুনে অসংলগ্ন প্রশ্ন করেছে অরুণা, আমার মনে হয় কি জান? তোমার এ সংসারের অভাবের ছায়া হয়ত আমি—এ ছায়া অপসারিত হলে—

তার অসমাপ্ত কথাটাকে শেষ করতে না দিয়ে বলেছে, স্বামী, কিন্তু একথা কেন অরুণা?

ম্লান হাসি হেসে বলেছে অরুণা, তোমার বিয়ের আগে কি এত অভাব ছিল?

হয়ত ছিল না, তখন বাবার সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকা হাতে ছিল, কিন্তু চিরদিন কারো সমান যায় না, জগতের এ চিরন্তনসত্যকে কি তুমি অস্বীকার করতে পার অরুণা?

না।

তবে?

স্বামীর কথা শুনে নিরুত্তর রয়েছে অরুণা।

ভেবে চলে অরুণা।

তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অরুণা এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাইরের আকাশ-পানে। আকাশে চাঁদ উঠলেও মাঝে মাঝে এক এক খণ্ড কালো মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে, কিন্তু সে মেঘ সরে গিয়ে চাঁদের স্নিগ্ধ মাধুরী নীলাকাশে হেসে উঠ্‌ছে বারবার।

দুর্দিনের কালো মেঘে ছেয়ে ফেলেছে অরুণার মনও কিন্তু সে মেঘ অপসারিত হয়ে নির্মেঘ মনের আকাশে সুদিনের আলো প্রতিফলিত হয় কই?

কেন এত বড় অভিশাপ তাদের জীবনে?

উপযুক্ত ডাক্তার স্বামী, মেডিকেল কলেজের ছাত্ররূপে একদা সুপ্রকাশ রায়ের ছিল কত সুনাম। কলেজের প্রিন্সিপাল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ডাক্তারী জীবনে সুপ্রকাশের পশার ও প্রতিপত্তি তাকে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

অরুণা একথা জানে শুনেছে সবই সে স্বামীর কাছে।

রাত্রি অনেকটা হয়েছে।

ডাক্তার দিব্যেন্দু রায় ঘরে ফিরতেই তার স্ত্রী তার কাছে এসে বল্‌ল্‌, আজ তোমাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, অনেক দূর গিয়েছিলে বুঝি?

মুখে একটু শুষ্ক হাসি এনে বল্‌ল দিব্যেন্দু, হ্যাঁ, অনেক দূরেই গিয়েছিলাম, একটা কল্ পেয়েছিলাম এবং ভেবেওছিলাম, দূরের রাস্তা চ'লে কিছু বেশী টাকা পাব কিন্তু—

অরুণা ব্যগ্র ভাবে বলে, কিন্তু কি?

তেমনি শুষ্ক হাসি হেসে বলল দিব্যেন্দু, আমার সে জায়গায় পৌছান মাত্রই বাড়ীতে উঠল কান্নার রোল, সংবাদ পাওয়া গেল—রোগীর মৃত্যু হয়েছে, তাই ডাক্তারের প্রয়োজন তখন আর ছিলনা।

কিন্তু সে জন্য ত তুমি দায়ী নও, তোমার ভিজিট তারা দেয়নি? উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করে অরুণা।

তারা তাদের কর্তব্য করেছিল, টাকা দিতে গিয়েছিল কিন্তু আমার দ্বারা যাদের প্রয়োজন মিটলনা, তাদের কাছ থেকে সে টাকা আমি হাত পেতে গ্রহণ করতে পারিনি, রিক্ত হাতেই ফিরে এসেছি, এই বলে অরুণাকে কাছে টেনে বলে দিব্যেন্দু, টাকাটা পেলে সংসারের অনেকটা সাশ্রয় হত-না অরু?

হয়ত হ'ত, কিন্তু সেই সুবিধাটুকু সংসারে বড় পাওনা নয়, পাওনা যা আমার কাছে তা তোমার মনের নির্লোভ

পরিচয়, স্ত্রীর কাছে ঐ বড় গৌরব—বড় পাওনা, এই বলে অরুণা স্বামীর বুকে মাথা রাখে।

একটু পরে দিব্যেন্দু প্রশ্ন করে, এতক্ষণ কি করছিলে অরু?

অরুণা সলজ্জ হাসে। বলে, গল্প লিখ্ছিলাম।

হাসে দিব্যেন্দুও। বলে, অভাবের তাড়নায় তা হলে তোমার রসসাহিত্য বিদায় নেয়নি?

মৃদু হেসে বলে অরুণা, সে যাই হোক, কিন্তু তুমি এ গল্প পড়তে পারবে না, এ আমার একান্ত নিজস্ব কিন্তু।

বেশ ত তোমার গল্প তোমারই থাকবে, আমাকে শুধু একটু পড়তে দাও—এই বলে হেসে টেবিলের কাছে গিয়ে লেখা কাগজগুলি উঠিয়ে নিল এবং সবটুকু পড়ে বল্‌ল, আরে বাপ্‌রে বাপ্‌, এ করেছ কি, এ যে নিজেদের জীবনের একেবারে হুবহু প্রতিচ্ছবি।

অরুণা হাসে। বলে, কেন প্লট যত রিয়েলিষ্টিক হয়, গল্প ততই হয় ইন্‌টারেষ্টিং, নয় কি?

দিব্যেন্দু হেসে বলে, সব জায়গায়ই ত রিয়েলিস্‌মের ছড়াছড়ি, কিন্তু ডাক্তার দিব্যেন্দুকে হটিয়ে সেখানে ডাক্তার সুপ্রকাশকে প্লেস্ দিলে কেন?

লজ্জায় লাল হয়ে বলে অরুণা, তুমি আমার জীবনের পরম সত্য, তোমার নামকে নিছক গল্পে স্থান দিতে আমার নারীত্ব হয় সঙ্কুচিত।

স্ত্রীর কথায় দিব্যেন্দু নিজেকে মনে করে ভাগ্যবান। ভাবে, জীবনের কঠোর সত্যকে প্রকাশ করতে অরুণা সাহস সঞ্চয় করেছে, কিন্তু পারেনি তার স্বামীর নামটুকুকে গল্পের কাহিনীর মাঝে প্রকাশ করতে—হয়ত লজ্জায়, হয়ত ভালবাসার গভীরতায়।

অরুণা ভাবে, কেন এমন হল? এই একই ভাবে গড়িয়ে যাবে তাদের জীবন? দুঃখকে জয় করবার কোন অস্ত্র, কোন শক্তিই তাদের নেই?

নিশ্চয়ই আছে। স্বামীর শক্তিকে কঠিন জগৎ অস্বীকার করেছে, করুক, কিন্তু সে কেন করবে? সে জানে, তাঁর শক্তি, সেই শক্তির কোন পরিচয়ই কি তাদের জীবনে এসে দেখা দেবে না? কেন দেবে না? কি অপরাধ করেছে তারা?

হয়ত অপরাধই করেছে, নইলে দুর্দিনের কালো মেঘের যবনিকা তাদের জীবন নাট্যমঞ্চ থেকে কেন অপসারিত হয়না?

ভাবনার ঘন জালে জড়িয়ে যায় অরুণা।

ভগবানের পরীক্ষায় তারা কিভাবে উত্তীর্ণ হবে জানে না, এ অনিশ্চয়তার দোলায় দুলে জীবন হয়রান হয়ে পড়েছে, ক্লান্তির এ বিষণ্ণতা আর ত সহ্য করা যায় না! কিন্তু কিছুই কি করতে পারে না সে? কোন এক দুঃসাহসিক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে জীবনের ভাগ্যবিপর্যয়ের বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ফেনিল আবর্তকে স্থির প্রশান্তির স্তব্ধতায় পরিণত করতে পারে না?

স্বামী সুপ্রকাশ গৃহে ফিরেই প্রশ্ন করে অরুণাকে, কি ভাবছ বসে অরু? সন্ধ্যা যে কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ঘরে আলো জ্বালোনি যে?

সত্যিই ত, স্বামীর কথায় ত্রস্তে অরুণা উঠে দাঁড়ায়, বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখে পড়ে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ক্ষণপূর্বের আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর চেহারা বদলিয়ে দিয়েছে।

আলো জ্বালা হতেই সুপ্রকাশ প্রশ্ন করে, খোকা কি ঘুমুচ্ছে?

হ্যাঁ।

ওর জ্বর কি আর বেড়েছে?

না, দেখ না একবার।

সুপ্রকাশ ছেলের গায়ে হাত দেয়। বলে, এখন অনেক কম। কিন্তু বড্ড দুর্বল, একটু—বলতে গিয়ে সুপ্রকাশ হঠাৎ থেমে যায়।

কি বল না?

না, থাক্।

বল না গো, ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে অরুণা।

বলব? শোন—বলছিলাম কি একটু দুধ ও আঙ্গুর-বেদানার ব্যবস্থা করতে পারলে দুর্বলতা কমত, জ্বরটাও যেত। বলে, একটু শুষ্ক হেসে বলল সুপ্রকাশ, বুঝেছ, অরু, এই!

বুঝেছে অরুণা, এ যে অক্ষম পিতার মুখে রুগ্ন ছেলের উদ্দেশ্যে কত কষ্টের উক্তি তা অরুণার বুঝতে এতটুকুও

বাকী রইল না। একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকখানাকে সজোরে আলোড়িত করে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল।

দুপুরের বেলা শেষ হতে চলেছে। অস্তায়মান সূর্য পশ্চিম আকাশ প্রান্তে বিদায়ের মুখে তার শেষ রক্তিম আভা ধীরে ধীরে একটু একটু করে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ডাক্তার দিব্যেন্দু রায়ের ঘরের ভেতর টেবিলের ওপর একখণ্ড কাগজ পড়ে রয়েছে।

সেই কাগজের ওপরের লেখাটুকু পড়ে যাচ্ছিল দিব্যেন্দু —অরুণার হাতের লেখা—একথা বলতে গেলেই অপরিসীম ব্যথার আঘাতে বুক ভেঙ্গে যায় যে এ সংসারের চিরন্তন দাবীদাওয়া ভগবান তোমার কাছে আমার যতখানি তার সবটুকু আশা বুকে নিয়েই দিনের পর দিন আমার চলে গেল। না পাওয়ার এ নিরাশা আমার জীবনের চরম নির্বেদ, তাই সংসারের আমার দেনাপাওনা, হিসাব নিকাশের সমস্ত ভার তোমার ওপর দিয়েই আমি এ জীবনের অবসান করতে চাই প্রভু! তুমি আমায় ক্ষমা ক'রে আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ করে দাও। খোকাকে সঙ্গে নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি প্রভু। ও বেঁচে থাকলে স্নেহশীল পিতা পুত্রের প্রতি কর্তব্যের অক্ষমতায় যে অস্থিরতা, অশান্তিও অবসাদ নিয়ে জীবনের শক্তি ক্ষয় করে ফেলবে তা ভাবতে গেলে মন আমার পাগল হয়ে যায়। ভগবান স্বামীকে দুশ্চিন্তার হাত হতে দূরে রাখুন—অভাবের জাল হতে মুক্ত হয়ে তার একক জীবন স্বাধীন, সুন্দর হোক। তবুও তাকে ছেড়ে যেতে সমস্ত মন বারবার বিদ্রোহী হয়ে পড়ছে যে—

লেখাটুকু পড়তে পড়তে দিব্যেন্দু সমস্ত অবস্থা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল। পড়া শেষ হতেই তার সমস্ত শরীর অবসন্ন, অনড় হয়ে পড়ে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। কান্নার আবেগে সমস্ত চিন্তা উদ্বেলিত হয়ে তাকে অস্থির করে ফেলে।

আজ একথা সে বার বার বুঝতে পেরে সতীসাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে সুখ আর শান্তি দেবার আশায় তাকে দুঃখকষ্টের অভাব থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেল।

কিন্তু এ যে অরুণার কত বড় ভুল, সে কথা ভাবতে গিয়ে দিব্যেন্দু অতিমাত্রায় অধীর হয়ে পড়ে।

প্রিয়তমা পত্নী, প্রিয়তম সন্তান হারিয়ে কেউ যে জগতে সুখী হতে পারে, তা দিব্যেন্দু বিশ্বাস করতে পারে না।

সে ভাবে, শেষ পর্যন্ত অরুণা এমনি করে নিজেকে উৎসর্গ করে বসল—শুধু নিজে নয়, খোকাকে পর্যন্ত তার সঙ্গে নিয়ে গেল।

ভেবে পায় না দিব্যেন্দু, অরুণার এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সে কি দিয়ে করবে? কেমন করে তাকে সে বোঝাবে, তার ভুল কত বড় মিথ্যা, কত মর্মন্তুদ।

কিন্তু তাকে যে বোঝাতেই হবে—

কিন্তু কোথায় সে?

দিব্যেন্দু তন্ন তন্ন করে সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করল, পাশের দু একটা বাড়ীতে খোঁজ নিল, কিন্তু কোন সন্ধানই ত মিলল না।

কোথায়ই বা খুঁজবে তাকে? কোথায় পাবে? আত্মীয়-স্বজন বলতে তাদের কাকেও ত মনে পড়ে না।

কলকাতার এই বিরাট জনসমুদ্রে ক্ষুদ্র দুটি প্রাণী জলবুদ্বুদের ন্যায় হয়ত মিলে গেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল অরুণার দূর সম্পর্কের এক বোনের কথা। কলকাতায়ই থাকে তারা। তাদের ঠিকানা জানে অরুণা। সেখানে খোঁজ করবে কি?

চিন্তার দোলায় দোলে দিব্যেন্দুর মন।

বড়লোকের বাড়ী।

অরুণার দূরসম্পর্কের বোনের বিশেষ পরিচিত দিব্যেন্দু।

সন্ধ্যার একটু পরেই সে উপস্থিত হয় সেই বাড়ীতে।

বাড়ী ঢুকতেই পায় এক বিপদের সংবাদ। অরুণার বোনের একমাত্র ষোল বছরের ছেলে সুবিমল কাল রাত থেকে পেটের এক অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় সে চীৎকার করছে—আবার মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। আবার জ্ঞান হতেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চীৎকার করেই চলেছে—কাল রাত থেকেই এই একই অবস্থা চলছে।

অরুণার ভগ্নিপতি সতীপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি অস্থির হয়ে বললেন, আসুন দিব্যেন্দুবাবু, সুবিমলের অসুখের খবর কার কাছে পেলেন? অরুণা এসেছে কি?

সতীপতিবাবুর কথায় দিব্যেন্দু সত্যি বিস্মিত হল— যখন জানতে পারল অরুণা এখানে আসেনি। তবে?

দিব্যেন্দু ভেবে পায়না, কি করবে সে এখন।

তবুও নিজেকে স্থির করে নিয়ে সে সতীপতিবাবুর কাছ থেকে সুবিমলের অসুখের ইতিহাস একটু একটু করে জেনে নেয় এবং এও জেনে নেয় সুবিমলের মার একান্ত ইচ্ছায় তাকে হাসপাতালে পাঠান সম্ভব হয়নি—বাড়ীতেই ডাক্তার দেখান হচ্ছে। কাল রাতে ডাক্তার এসেছিলেন, আজও এসেছিলেন, এখনও তার কাছে বসে ডাক্তার মুখার্জি ওষুধের ব্যবস্থা কচ্ছেন। কিন্তু রোগের কোন পরিবর্তনই পাওয়া যাচ্ছেনা। অবশ্য ডাক্তার সেনগুপ্তকে খবর পাঠান হয়েছে, তিনি একটু দূরে গেছেন হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।

সতীপতিবাবুর অনুরোধে দিব্যেন্দু রোগীর ঘরে গিয়ে তাকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে পরামর্শ করে গোটা দুই ওষুধ আনিয়ে নিল এবং তা মিশিয়ে ওষুধ তৈরী করে সুবিমলকে একটা ইন্‌জেক্‌সন দিতেই কয়েক মিনিট পরে সকলের আকুল আগ্রহ ও অধীর অপেক্ষার মাঝে সুবিমল ক্ষীণতম কণ্ঠে—'আঃ' বলে যেন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতেই দিব্যেন্দু বলে উঠল, সুবিমল, আর ব্যথা টের পাচ্ছ?

সুবিমল বল্‌ল, কৈ না ত।

সঙ্গে সঙ্গে দিব্যেন্দুও বলে উঠ্‌ল, আর ভয় নেই, আর কোন ওষুধের দরকার নেই। আজ রাতে কয়েকবার একটু একটু বার্লি ওয়াটার দেবেন, আমি কাল খুব ভোরে এসে আবার দেখে যাব।

এই বলে দিব্যেন্দু ওঠে দাঁড়িয়ে বাইরে আসতেই সতীপতিবাবু তার হাত দুখানি দুহাতে জড়িয়ে ধরে বার বার এই কথায় বলতে লাগ্‌লেন, আপনার ঋণ জীবনে শোধ করবার নয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও নেই আপনার প্রতি। তবুও জানুন দিব্যেন্দুবাবু, এবার থেকে আপনিই হলেন আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। দর্শনী মাসে আপনার দুশ টাকা। শুধু তাই নয়, এখন থেকে সমস্ত বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধ করব, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত যে চিকিৎসক ছিলেন লুকিয়ে তাঁকে চিকিৎসকরূপে গ্রহণ করতে। তারপর সতীপতিবাবুর স্ত্রী দিব্যেন্দুর হাতে কয়েকখানি নোট গুঁজে দিয়ে বল্‌লেন, আজকের ফী দিব্যেন্দুবাবু।

দিব্যেন্দু বলল, একি! না—না—পাগল নাকি, আপনারা। আমি আত্মীয়, এ আমি নিতে পারি না—এই বলে নোট ক'খানি ফেরৎ দেবার চেষ্টা করতেই সতীপতিবাবু নোটশুদ্ধ তার হাতখানি সজোরে চেপে ধরে বল্‌লেন, পাগল আমরা নই, না নিলে বড্ড দুঃখ পাব দিব্যেন্দুবাবু—এ আপনাকে নিতেই হবে—না নিলে আমার কর্তব্যের ত্রুটি হবে—আমি অপরাধী হব।

দিব্যেন্দু আর আপত্তি করবার সুযোগ না পেয়ে নোটগুলি নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। সতীপতিবাবুর স্ত্রী কাছে এসে জানালেন, কাল যখন খোকাকে দেখ্‌তে আস্‌বেন অরুণাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন—ওদের অনেকদিন দেখিনা।

উত্তরে দিব্যেন্দু অস্ফুটস্বরে কি যে বলে গেল—তা না পারলেন সতীপতিবাবু বুঝতে, না পারলেন তার স্ত্রী।

সুদীর্ঘ পথ নয়।

তবুও সে পথের যেন শেষ হয় না। আর কয়েক পা গেলেই ত নিজের বাড়ী-ঘর চোখের সামনে দেখা দেবে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে কি লাভ? শূন্যগৃহ ভরে সেখানে আছে হতভাগ্য এক জীবনের মর্মঘাতী ইতিহাসের ছিন্ন-ভিন্ন কাহিনীর স্মৃতি—ভাবতেই বুক ভেঙ্গে দিব্যেন্দুর বেরিয়ে আসে করুণ দীর্ঘশ্বাস।

হায়, যে দারিদ্র্যের, অভাবের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তাদের জীবন, সে কশাঘাত হয়ত আর আস্‌বে না। কারণ টাকা পেয়েছে সে, টাকার উপায়ও হয়েছে—ভবিষ্যতের হাজার রঙীণ কল্পনা তার মনশ্চক্ষে বার বার ফুটে ওঠে—

কিন্তু? কি হবে আজ রঙীণ কল্পনার এই চিন্তায় বিভোর হয়ে? সেখানে আসে ব্যর্থতা, আসে ট্রাজেডি, চারদিকে জড়িয়ে থাকে শূন্য মনের হাহাকার ধ্বনির সূক্ষ্ম রেশ—

এতবড় পৃথিবী থেকে অরুণা যদি বিদায় নিতে পারে খোকাকে নিয়ে, সে কি বিদায়ী পথের কোন সন্ধানই জানে না?

জানে একটু তার পূর্বে—সে আর একবার অরুণাদের পৃথিবীর বুকে সন্ধান করে দেখ্‌বে—এবং দেখবার পূর্বে

যাদের নিয়ে সে এতকাল যেখানে কাটিয়েছে সেই বাড়ী থেকে জন্মের মত বিদায় নিয়ে যাবে—

বাড়ীতে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ের প্রাচুর্য নিয়ে যখন তাভ দৃষ্টির সুমুখে অরুণা সত্য হয়ে দেখা দিল, তখন দিব্যেন্দু শুধু বিস্মিত নয়, অনেকদিনের হারানো প্রিয়তম বস্তু হাতের কাছে পেয়ে সত্যিই মানুষ যেমন আনন্দে অতিমাত্র উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, সেই অবস্থাই হল আজ দিব্যেন্দুর।

অরুণা তখন ঘরময় কি যেন খুঁজে বেড়ায়, সেই অবস্থায় হঠাৎ দিব্যেন্দুকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, ওগো, টিবিলের ওপর একটা কাগজ ছিল, সেটা দেখেছ কি? খুঁজে পাচ্ছি না।

—তোমার লেখা সেই কাগজখানাই বুঝি আমার দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটিয়েছে নাটকীয়ভাবে। কিন্তু তুমি খোকাকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে এভাবে…?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরুণা বলল—চরম দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল আমার জীবন। রুগ্ন খোকার মুখে আমি দিতে পারিনি এতটুকু পথ্য,…… এতটুকু ওষুধ। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস, একজন ডাক্তারের ছেলে তারই সামনে একফোটা ওষুধের জন্য তিলে তিলে মৃত্যুকে করছে বরণ—এ দৃশ্য মা হয়ে আমি সহ্য করতে পারলুম না। তাই চরম উত্তেজনায়, পরম দুঃখে আমি সত্যিই সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলুম। আমাদের দুটি জীবনকে শেষ করে দিয়ে তোমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলুম এই অসীম জীবন-যন্ত্রণা থেকে।

দিব্যেন্দু হতভম্ব হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অরুণার মুখের দিকে। অরুণা বলে যায়—কিন্তু পেরে উঠিনি আমার সংকল্প রাখতে। প্রতি মুহূর্তে মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল তোমার অসহায় মুখখানা। তাই আমার সংকল্প ত্যাগ করলাম, ভুল আমার ভাঙল, তাই ফিরে এলাম। এবার মনটাকে আমি আরও কঠোর করেছি, ভগবান যত আঘাতই দিন আমি তা তাঁর আশীর্বাদ মনে করেই হাসি-মুখে সহ্য করব। কথাগুলো বলে যেন হাফাতে থাকে অরুণা।

মৃদু হেসে এবার দিব্যেন্দু বলে—দেখ অরু, কোন মানুষের ভাগ্যেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা দুঃখ থাকে না। আকাশ থেকে ঘনকৃষ্ণ কাল মেঘ একদিন সরে যায়… দেখা দেয় নতুন সূর্য্যের রক্তিমা। ঠিক তেমনি এবার মনে হচ্ছে, আমাদের তিমির রাত্রির বুঝি অবসান হোল; এবার দেখা দেবে সোনালী সূর্য্য। এই তো চিরন্তন রীতি।

এই নাও দুইশত টাকা। এ ভিক্ষা করা অর্থ নয়, আমার চিকিৎসা-প্রতিভার স্বাক্ষরে অর্জিত, আমাদের এই বাস্তব ঘটনা নিয়ে তোমার লেখা অসমাপ্ত গল্পের পরিণতি ঘটিয়ে দাও।

দুশো টাকার নোটগুলি হাতের মুঠিতে চেপে ধরে অরুণা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে। ভাবে, এ স্বপ্ন না সত্যি!

আমৃত্যু

শ্রীপ্রশান্ত মৈত্র

শিউলি-ফোটা সকালবেলা আসল ঘন-যৌবনে,
স্বপ্ন-ঝরা মৃত্যু-হরা অচল বুকে বাসনা।
নৃত্য-মধুর চিত্তহারী কামনা-হীন নয়নে,
নিশ্বাসে তাই অশ্রু-ঝরা আপন-হারা কামনা।

পৃথিবী ভরা ব্যাকুল-বায়ু-বসনে
ললনা-বধূর আঁচল-আঁখি-সীমানা।
এই জীবনের স্বপ্ন নেই : মিথ্যা দীন-নয়নে,—
দেবতা বিহীন দেউলে কাঁদে ব্যর্থ-পূজা-কামনা।

সত্যেন্দ্রনাথের "মহাসরস্বতী"

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দত্ত

ঋগ্‌বেদের ধ্যানতন্ময় ঋষি কবি মধুচ্ছন্দা ঋকে ভাবাকৃতির পঞ্চপ্রদীপে একদিন যে "নদীরূপা দেবীরূপা" সরস্বতীর আরতি ক'রেছিলেন—"যজ্ঞং দধে সরস্বতী" (১ম মণ্ডল, ৩য় সূক্ত) নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁকেই মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী উত্তরচরিতে "ত্রিজগতামাধারভূতাং মহাপূর্বাম্" চিদ্রূপা মহাসরস্বতীরূপে ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। ছন্দ-রূপা সরস্বতীর বরপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় জ্ঞানের শুভ্র আলোকে সেই পরম জ্যোতিই—ভাবে ও রূপে বর্ণময় হ'য়ে উঠেছে। "নির্ধূত নিখিলধ্বান্তে" ও "ব্রহ্মাণীরূপ-ধারিণী" এই দেবী শুধু "সর্বস্যবুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি-সংস্থিতা"ই নন, তিনি "শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ-পরায়ণা সর্বস্যার্তিহরা"ও। সত্যেন্দ্রনাথের "জ্যোতিষ্মতী, মহীয়সী মহাসরস্বতী"ও শুধু নিষ্ক্রিয় "শক্তির বিভূতি" কিংবা "মহাকাব্যধাত্রী" মাত্রই নন, তিনি "জগতের জড়ত্বের নাশ" করেন, মানবের "সর্বচেষ্টা সর্ব ইচ্ছা"কে "ঐক্য সুরে সুপ্তচিত্তপুরে" গেঁথে দেন। এক কথায়, "সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতা সনাতনী"-র মতই সত্যেন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় তিনি "জন্মমৃত্যুরহস্যগুর্বিণী"ও "সব-বিধা-বার্তাংবিধি"। তিনি একদিকে যেমন "দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্রতালে" জেগে ওঠেন, অপর-দিকে তেমনি "সিদ্ধির প্রসূতি···ঋদ্ধি আরাধিতা" রূপে "লক্ষকোটী চিত্তে প্রাণে" বুলিয়ে দেন তাঁর কোমল-মধুর পরশ—ঋষিকবির ধ্যানমুগ্ধ ভাষায় "ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি" (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ৩য় সূক্ত)।

শুধু ভাব-প্রেরণা নয়, রূপ-কল্পনার দিক থেকেও বিশ্ব-বিকাশ ধারার গতিচ্ছন্দে "নব নব সৃষ্টির উন্মেষ" বিধায়িত্রী মহাসরস্বতী, মার্কণ্ডেয়-সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সরস্বতীকে "চিত্তময়ী" বলার মূলে যেমন "মনো বৈ সরস্বান্" এই অর্থটি আছে, তেমনি মনোময়ী কুলকুণ্ডলিনীর ধারণাটিও এসে যায়। শুধু শংখ-চক্র-শূল-ধনু-হল-ঘণ্টা-মূশল প্রভৃতি প্রহরণগুলিই নয়, "ছিন্ন-মেঘ-অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা" কথাটী পর্যন্ত ঘনান্ত-বিলসচ্ছীতাংশুতুল্য-প্রভাম্"-এর প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। কবি যখন বলেন, "ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্রনীল-পদ্ম বিভূষণা" তখন 'মূর্তিরহস্যের'র "তেজোমণ্ডল দুর্ধর্ষা" "চিত্রভ্রমরপাণিঃ" কথাটাই আমাদের মনে পড়ে যায়।

"সবিতৃসম্ভবা দেবী সাবিত্রী" এবং "ব্রহ্মচ্ছায়া···গায়ত্রী" শাশ্বতী পরিকল্পনার মধ্যে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের সুসমঞ্জস বাগর্থেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—"গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ। সবিতৃদ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্তিতা। জগতঃ প্রসবিত্রীত্বাৎ বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী"। এ ছাড়া সরস্বতীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রও তাঁর কবি-কল্পনাকে আকৃষ্ট করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, কারণ কবি এর বাইরেও তাঁর উদার-দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন। ভারতের ঋষিকবির ধ্যান নেত্রে একদিন যেমন বিশ্বের মূলীভূত বাণী ভারতের অধিষ্ঠাত্রী ভারতীর সংগে মিলে এক হ'য়ে গেছেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি ছন্দরূপা সরস্বতীর সংগে চিদানন্দ-ময়ীর লীলাবিলাসকে অভিন্নরূপে কল্পনা করেছেন—তাঁর রুদ্র-ও-শান্তরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যরূপ, জ্ঞান-ইচ্ছা-কর্মশক্তি, সমস্ত কিছুই সেই পরম জ্যোতির কল্পনায় একাকার হয়ে গেছে। অথচ এরই মধ্যে বিবর্তনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক ভাব-মহিমাকে নতুন ক'রে রূপ দেবার প্রয়াস—জীবন-নিষ্ঠ আধুনিক কবি-মানসের এই সংজ্ঞান চেতনাটীও "রক্তরশ্মি রুষ্ট তারা ভালে" ইত্যাদি খুঁজে নিতে আমাদের বিলম্ব হয় না। কবি সমালোচক মোহিতলালের সংগে সুর মিলিয়ে বলতে পারি—"বিহারী-লালের 'সারদা' ও রবীন্দ্রনাথের 'লীলা সহচরী—জীবন-দেবতা' সত্যেন্দ্রনাথের মানসে আর এক মূর্তিতে আর একরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

কিন্তু সুন্দরের ধ্যানতন্ময় হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ শুধু কবি-চিত্তে তাঁর শুভ-অধিষ্ঠানই কামনা করেন নি, সর্বমানবের কল্যাণকল্পে ঋষিকবির মতই তাঁকে আবাহন করেছেন—

"বীণাধ্বনি ঘণ্টা রোলে যুক্ত হোক মূর্ত রুদ্ররোষ
শঙ্খের নির্ঘোষ,
পুণ্যে কর মৃত্যুঞ্জয়ী—পাপে ছন্নমতি,
মহাসরস্বতী।"

ঠিক একই সুরে বৈদিক কবিও যজ্ঞবেদীতে ব'সে প্রার্থনা করেছেন—"চেতন্তী সুমতীনাং"। 'অঞ্জলি' কবিতায়ও দেখি, বস্তুপুঞ্জের অভ্রকে, অন্তর-আবীরে রাঙিয়ে কবি তার আরাধ্যা দেবীর চরণে উৎসর্গ করেছেন—

"আবির্ আবির্ মন্ত্র রাবে
করগো সফল আবির্ভাবে
অশ্রুহাসির অভ্র-আবীর আঁখির আলোয় উজ্জলি।"

তবে জ্ঞানের সেই শুভ্র আলোক যে-অনুভূতির আবেগে রঙীণ হ'য়ে উঠেছে, তাও জাগ্রত অনুভূতির আবেগ—স্বপ্ন-কল্পনার রঙ নয়। এই যে সমন্বয়ী দৃষ্টি—এটাই ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য এবং সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে এখানে সেই বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট।

ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ এখানে ভাবানুসারী ভাষার প্রয়োগে অপূর্ব শক্তি ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটী শব্দের গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি যেন কবিচিত্ত থেকে উত্থিত হ'য়ে সেই জ্যোতির্ময়ী দেবতার উদ্দেশে যাত্রা করেছে, রঙ্ ও রেখার কারিগরিতে সেই মহিমময়ী দেবী যেন এই ধূলি-মাখা ধরণীর বুকে নেমে এসেছেন, অথচ বিরাট সৃষ্টি প্রবাহের গতিচ্ছন্দে মিলিয়ে আমাদের কল্পনা তাঁর স্বরূপকে ধারণা করতে পারে না। রূপের মহিমা ও বিরাটের ব্যঞ্জনার এই যে সুমেল সমন্বয়, ভাব ও রসের নিবিড় মেশামিশি –এটা নিঃসন্দেহ যে শিল্পী-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে, তিনি "কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ"।

এইতো সেদিন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এইতো সেদিন ছিলে নববধূ,—
কখন সেজেছ গৃহিণী!
আলোকে পুলকে তুলিছ ছলকি'
ভবন আমার শ্রীহীন-ই!
অন্নপূর্ণা, তোমারি জন্য
ছন্নছাড়ার জুটেছে অন্ন!—
চির ভবঘুরে হ'ত কিগো গৃহী—
তোমার পরশ বিহীন-ই!
ছিলে লীলাসাথী,—পোহাতেই রাতি
হ'লে পরিণত জায়াতে!
মদবিহ্বল কোথা যৌবন,—
ইন্দ্রজালের মায়া এ!
ভুলিয়া কুণ্ঠা, পরিহরি'লাজ
ধরেছ দয়িতা, সেবিকার সাজ;—
সংসার-খররৌদ্রদহনে
রেখেছ আমারে ছায়াতে।
কোথা সেই ভীরু হরিণীর চাওয়া
কজ্জল-কালো নয়নে?
বাঁকাইয়া গ্রীবা হংসীর মতো
চুপিসাড়ে আসা শয়নে!
খোঁপায় আজিকে নাহিপরো ফুল,
কাঁচপোকা টীপ লাগাতেই ভুল!—
আজ দিন যায় সবার সেবায়,
পূজার পুষ্প চয়নে!

সকাল সন্ধ্যা কাজ আর কাজ,—
নেই হাসিগান অকারণ—
চাবির গোছাটি ভুলে বুঝি গেছে
ছল ক'রে বাজা ঝন্‌ঝন্!
কলসী-কাঁকনে কহেনাকো আর
কানে কানে কথা—চলায় তোমার!
ঝুরু ঝুরু বায় বসি' নিরালায়
উড়ু উড়ু নাহি করে মন!
এটা সেটা নিয়ে কাটে গোটা বেলা,—
নেই একতিল অবকাশ;
রাহুর মতন করে সংসার
লাবণী তোমার সব গ্রাস!
কতো মায়াময় রাতি যায় চ'লে,
কতো যে সন্ধ্যা যায় গো বিফলে;—
কবিতা এখন নীরস গদ্য,—
একী নির্মম পরিহাস!
হৃদয় হরিতে এসেছিলে কবে,—
আজ তুমি হ'লে ঘরণী
দুখের পাথারে আনিলে সাঁতারি'
কূলে মোর ভাঙা তরণী!
রোগে আর শোকে জানিয়াছি সই,
কেউ নেই মোর আর তোমাবই!—
আর নহো দেবী—হইয়া মানবী
দেখাও জীবন সরণী!

অসমাপ্ত

শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

জয়ন্তী আজ নিজেই গাড়ীটা চালাচ্ছে। ড্রাইভার মতিলাল সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু জয়ন্তী সঙ্গে নিতে চায়নি। হেসে বলেছিল, অনেকদিন নিজে ড্রাইভ করিনি—দেখি ভুলে গেছি কিনা বলে, এ্যাক্সিলেটারের উপর চাপ দিয়ে ষ্টার্ট নিয়ে এ্যাসফল্টের রাস্তা মাড়িয়ে এসে নামলো বড় রাস্তার বুকে। তারপর দিল স্পিড বাড়িয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে শুরু করেছে চারিদিকে, বিজলী আলোয় ঝলমলিয়ে উঠছে রাতের কোলকাতা।

হাতের রেডিয়াম ডায়েলের ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল জয়ন্তী—সাতটা বাজে প্রায়। বিরক্তি ফুটে উঠলো তার মুখে। বড্ড দেরী হয়ে গেছে—ছয়টার মধ্যে দেখা করতে হবে সুধন্যর সঙ্গে। ভীষণ ব্যস্ত মানুষ—বিশেষ অবসর তার থাকেই না। গাড়ীর স্পিড আরো একটু বাড়িয়ে দিল।

সুধন্য রায়। দশ বৎসর আগেকার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের ছাত্র সুধন্য রায়কে দীর্ঘদিন পরে খুঁজে পেয়েছে জয়ন্তী বসু। তবে, আজকের সুধন্য রায় আর দশ বৎসর আগেকার সুধন্য রায়ের মধ্যে ঘটে গেছে অনেকখানি পার্থক্য। আজকের সুধন্য রায়ের রয়েছে এক বিশেষ পরিচিতি—সাহিত্যিক সুধন্য রায়। যার সাহিত্য-সৃষ্টি আলোড়ন জাগিয়ে দিয়েছে দেশে। অনেক কষ্টে পাবলিসার্সের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সুধন্যর সঙ্গে দেখা করতে চলেছে জয়ন্তী। কতকটা হাতে চাঁদ পাওয়ার মত আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল সে। দশ বৎসর আগেকার পরিচয় নিয়ে সুধন্যর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কেমন যেন একটু সঙ্কোচ কুণ্ঠা লাগছিল জয়ন্তীর।

দশ বৎসরে জয়ন্তীর যে পরিবর্তন হয়নি তা নয়, হয়েছে বৈকি। কল্পনাতীত পরিবর্তন হয়েছে। বিরাট ধনী রায়বাহাদুর অতীন বসুর কন্যা জয়ন্তী বসু—স্কুল-মিসট্রেস হয়েছে। হেড মিসট্রেস্। বয়সও কিছু বেড়েছে। যৌবন প্রায় বিদায় নেব নেব। সেই বিদায়ী যৌবনকে ধরে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় সচেতন জয়ন্তী বসু। একটা লোভনীয় লাবণ্য তখনো ছড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যদেহে—যা পুরুষকে আকর্ষণ করে।

ভাগ্য ভাল, সুধন্যর বাড়ীতে পৌঁছে তার দেখা পেয়েছিল জয়ন্তী। সুধন্য সাদর আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল নিজের ষ্টাডিরুমে। দীর্ঘদিন পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়ায় প্রথমে কিছুটা সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল উভয়েরই, তারপর, কিছুক্ষণ আলাপের পর সে সঙ্কোচ সরে গিয়েছিল। তারা যেন নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়েছিল দশ বৎসর পূর্ব্বে ফেলে-আসা উজ্জ্বল আনন্দভরা ছাত্র-জীবনের দিনটিকে।

সত্যি আমি ভাবতে পারিনি—আজকের স্বনামধন্য সাহিত্যিক সুধন্য রায়ের কাছ থেকে এমন অভ্যর্থনা পাবো। হতাশা নিয়ে ফিরে যাবার জন্যই তৈরী হয়ে এসেছিলাম। অল্প একটু হাসলো জয়ন্তী।

এমন কথা ভাবতে পারলে কি করে জয়ন্তী? আমার আজকের পরিচয় ছাড়া এর আগে কি তোমার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না? একটা ক্ষীণ বিস্ময়ের সুর কেঁপে উঠলো সুধন্যর কণ্ঠে।

ডোন্ট টেক ইউ সিরিয়াসলি। কিছু মনে কোর না সুধন্য—তোমার সে পরিচয় আর যে কেউ ভুল করুক, জয়ন্তী অন্ততঃ ভুল করবে না। উঃ, বাপরে! কি জ্বালাতনই না করে মারতে। এখন সে সব দুষ্টামীগুলো সেরেছে তো?

একসঙ্গে হেসে উঠলো সুধন্য আর জয়ন্তী।

এতদিন তো সেরেই গিয়েছিল, এখন তোমাকে দেখে যদি সেগুলো নতুন করে মাথা চাড়া দেয়—পারবে না আগের মত সহ্য করতে? কৌতুকের হাসি ফুটে উঠলো সুধন্যর মুখে চোখে।

বহুদিন পরে একটা খুশীর শিহরণ সঞ্চারিত হতে লাগলো জয়ন্তীর রক্তে রক্তে! তবে কি আজো সুধন্য তাকে তেমনি করেই ভালবাসে? এই দীর্ঘদিনের মধ্যেও কি সুধন্যর মনের পরদায় ঘটেনি অন্য কোন নারীর মুখের ছায়াপাত? আজো কি সুধন্য অবিবাহিত? নানান ধরণের প্রশ্ন একসঙ্গে এসে ভীড় করতে লাগলো জয়ন্তীর মনের মধ্যে।……

জয়ন্তীর কোন উত্তর না পেয়ে সুধন্য জিজ্ঞাসা করলো, কি, কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন?

চমক ভেঙ্গে উত্তর দিল জয়ন্তী, ওসব বাজে কথা থাক সুধন্য, নতুন কি বই লিখছো?

এখনো শুরু করিনি।

কেন?

ভাল প্লট পাচ্ছি না বলে।

আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে একটা প্লট দেই, নেবে? একেবারে সত্যিকারের ঘটনা। অবশ্য, সে কাহিনীকে সাহিত্যে রূপ দেবার ভার তোমার।

বেশ তো, নতুন প্লট আমার দরকার জয়ন্তী। বলনা শুনি?

আজ নয়, আর একদিন বলবো। ভীষণ দেরী হয়ে গেছে—বাড়ী ফিরতে হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জয়ন্তী। তারপর সুধন্যর সঙ্গে এসেছিল সদর গেট পর্যন্ত।

আচ্ছা, সুধন্য তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলে না? গাড়ীতে উঠে বসে বললো জয়ন্তী।

মঞ্জু বাপের বাড়ী গেছে, পরের বারে এলে আলাপ হবে।

ও, আচ্ছা চলি সুধন্য। বলে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল জয়ন্তী।

সুধন্য বিবাহিত! বুকের মধ্যে এক ঝলক রক্ত চল্‌কে উঠলো জয়ন্তীর। মুখখানা আশ্চর্য রকম মৃত মানুষের মুখের মত রক্ত সরে যাওয়া ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেল। ষ্টেয়ারিং-এর উপর রাখা হাতটা অল্প অল্প কাঁপতে লাগলো। বুদ্ধি করে গাড়ীর স্পিডকে অনেক কমিয়ে ফেললো সে। নয়তো এ অবস্থায় কোন এ্যাকসিডেণ্ট করে বসা বিচিত্র নয়। একি হোল! তার কয়েক মুহূর্তের আগের স্বপ্ন, শুধু কয়েক মুহূর্ত আগের কেন, তার এই দীর্ঘ দশ বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে গড়ে তোলা স্বপ্ন, সব ব্যর্থ হয়ে গেল! সুধন্য তার জীবনকে মিলিয়ে দিয়েছে আর একটি মেয়ের জীবনের সঙ্গে। সেখানে জয়ন্তীর ঠাঁই কোথা? না থাক, সে আর চিন্তা করবে না। জীবনে শুধু তার দেখবারই পালা—পাবার নয়।

বাড়ী এসে পৌছল জয়ন্তী। একটা বিশ্রী অবসাদ যেন নেমে এসেছে তার সারা দেহ-মনে। সুধন্যর সঙ্গে তার দেখা না হলেই বোধ হয় তার পক্ষে ভাল ছিল। কিন্তু না, এটা যে ঘটে গেল, এরও প্রয়োজন বোধহয় আছে জীবনে। নিষ্ঠুর একটা ঘা দিয়ে সুধন্য তার মোহ-ভঙ্গ করে দিল। আজ জয়ন্তী নিজেকে বড্ড বেশী রকম অসহায় বোধ করতে লাগলো। কেউ নেই এমন একজন—যে তার মনকে সঙ্গ দিতে পারে এখন, একটা গুরুভার নামিয়ে দিতে পারে চেতনার উপর থেকে।

বারান্দার ডেক চেয়ারে এসে গা এলিয়ে দিল জয়ন্তী। তাকিয়ে রইলো সামনের বাগানের অর্কিড্ কুঞ্জটার পানে। মিষ্টি ফুলের সুরভিতে বাতাস ভরে উঠেছে। একটা অলস দৃষ্টিতে সব কিছু দেখছে জয়ন্তী। এই বাড়ীর সেই আজ মালিক। বাবা, মা বছর পাঁচেক হোল গত হয়েছেন। এত বড় বাড়ীতে একাকা তপস্বিনীর মত বাস করছে জয়ন্তী। সময় কাটে না বলে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে। জীবনে সব কিছু ভোগ করবার উপাদান পেয়েও নিজেকে এমন করে সব কিছু থেকে সরিয়ে রাখলো কেন জয়ন্তী? থাক সে কথা।

ঝি এসে দাঁড়াল সামনে, মা, আপনার কফিটা এনে দেবো?

আনো।

ঘরে উঠে গিয়ে রেডিওটা খুলে দিল জয়ন্তী।

সুধন্যকে কথা দিয়েছিল বলেই জয়ন্তীকে পুনরায় আসতে হ'ল সুধন্যর বাড়ীতে। প্রথমে ভেবেছিল আসবে না, কিন্তু পরে চিন্তা করে ঠিক করলো—তার আসাটা

প্রয়োজন। অন্ততঃ গল্পের প্লটটুকুর জন্য। এ প্লটে সুধন্যর কোন উপকার হবে কিনা জানে না—কিন্তু সে তো মন খুলে বলতে পারবে তার মনের কথা। সুধন্যকে এ কথা বলবার যে একান্তই প্রয়োজন জয়ন্তীর।

জয়ন্তীর আসার সংবাদ পেয়ে সুধন্য নিজেই এসে নিয়ে গিয়ে বসাল তার ঘরে। পরিচয় করিয়ে দিল স্ত্রী মঞ্জুর সঙ্গে। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই কিছুটা আলাপ করতে হোল জয়ন্তীকে মঞ্জুর সাথে—কিন্তু মনের অবস্থা ছিল ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত। কথায় কথায় জানতে পারলো জয়ন্তী, পল্লীগ্রামের এক স্কুল মাষ্টারের মেয়েকে বিবাহ করেছে সুধন্য। শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তী—উন্নাসিক সহুরে শিক্ষিত ছেলে সুধন্যর পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হোল!

সুধন্য উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে, জয়ন্তীকে বললো, চলো, ষ্টাডিরুমে গিয়ে বসা যাক। তারপর, স্ত্রীর পানে তাকিয়ে বললো, মঞ্জু, আমাদের চা'টা ওঘরে পাঠিয়ে দিও।

দু'জনে এসে বসলো ষ্টাডিরুমে। জয়ন্তী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো সুধন্যর মুখখানিকে। সেখানে যেন শান্তির অপরূপ ছোঁয়া লেগে রয়েছে। সুখশান্তিতে ভরে আছে সুধন্যার ছোট্ট সংসার। এ রাজ্যের গণ্ডিতে সে ভাগ্যবান্ রাজা।

চা এলো। দু'জনে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শুরু হোল গল্প। টুকরো টুকরো এলোমেলো কথা। যেমন করে দু'জনে একদিন ক্লাসের শেষে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে 'কফি হাউসে' গিয়ে কফি খেতে খেতে গল্প করতো। স্বপ্ন রচনা করতো জীবনের ভবিষ্যৎ দিনগুলি নিয়ে। সে দিনগুলো যেন জীবন থেকে কুয়াশার মত মিলিয়ে গেছে। আজকের জয়ন্তী ও সুধন্য যেন সম্পূর্ণ নতুন দু'জন দু'জনের কাছে।

শুরু কর তোমার প্লটের কাহিনী। নিঃশেষিত চায়ের কাপটাকে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে দেহটাকে অলস ভঙ্গীতে চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বসলো, সুধন্য।

একটু চিন্তা করে নিল জয়ন্তী কি ভাবে শুরু করবে। তারপর, দেওয়ালের একটা ল্যাণ্ডস্কেপ ছবির পানে তাকিয়ে শুরু করলো। গলার স্বরটা একটু কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো জয়ন্তীর। সংযত করে নিল নিজেকে।

…একটি মেয়ে বিরাট ধনী এবং অভিজাত পরিবারে যেদিন সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করলো, সেদিন বাড়ীতে একটা মহা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তারপর, পরম আদর যত্নের আওতায় থেকে মেয়েটি ধীরে ধীরে বাল্য কৈশোর জীবন অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালো যৌবনের পদপ্রান্তে। সেদিন তার চোখে ছিল স্বপ্নের অঞ্জন—পৃথিবীটা তার কাছে রামধনুর দেশ বলেই মনে হয়েছিল। ক্রমে স্কুলের পাঠ শেষ করে এলো কলেজে। এলো একটা ভিন্ন জগতে। ফোটা ফুলের পাশে যেমন ভ্রমরের গুঞ্জন হয়—তেমনি মেয়েটির কাছে এসেও ভীড় করতে লাগলো স্তাবকের দল। উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলতে লাগলো তার মনকে। কলেজের এক সহপাঠিনীর ভায়ের সঙ্গে মেয়েটির আলাপ পরিচয়টা একটু অন্তরঙ্গ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত টিকলো না—মেয়েটিরই ভাল লাগেনি। নিজেকে সে সম্পূর্ণ করে সরিয়ে নিয়েছিল। ছেলেটির ভালবাসার নামে হীনতা শঠতা আর নোংরামো দেখে মেয়েটির মন বিশ্রী ঘৃণায় ভরে উঠেছিল। তারপর সে আর কাউকে আমল দিতে চায়নি।

তারপর কেটে গেল চারটি বছর।

জয়ন্তী একটু থামলো। তাকিয়ে দেখলো সুধন্য নির্বিকার মুখে বসে সিগারেট টানছে। কাহিনীটা হয়তো তার মনের মত হচ্ছে না। একটা বহু পুরাতন বস্তাপচা জিনিষের মত মূল্যহীন। সামনের জানলা দিয়ে জয়ন্তী বাহিরের দিকে তাকাল, তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। সহরতলীর পথে ছায়া ঢাকা বিষণ্নতা। আকাশের কোণে কোণে ধোঁয়ায় তৈরী নানা আকারের মেঘ উড়ে যাচ্ছে অতিকায় ফানুষের মত। ঘরের ভিতরের হাওয়াটা কেমন যেন ভারী ভারী মনে হচ্ছে!

চেয়ার ছেড়ে উঠে সুধন্য ঘরের আলোটা জেলে দিয়ে বললো, একটু তাড়াতাড়ি শেষ কর জয়ন্তী, আজ আবার একটা সাহিত্যসভায় বেরুতে হবে।

চমক খেয়ে ঘাড়টাকে ঘুরালো জয়ন্তী, ইচ্ছা হোল শেষটা আর বলবার দরকার নেই। সেও উঠে বেরিয়ে যাক এখান থেকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হোল—এসেছে যখন কাহিনীটা বলতে, তখন শেষ করেই যাবে।

হ্যাঁ, প্রায় শেষ হয়ে এলো। একটু ধৈর্য ধর লক্ষ্মীটি।

তারপর শোন, মেয়েটি এম-এ পড়তে এলো য়ুনিভারসিটিতে, তখন সে ভালবাসলো একটি ছেলেকে। নিজেকে প্রায় উজাড় করে। ছেলেটি যে তাকে কতটুকু ভালবাসে সে বিচার সে সেদিন করেনি—নিজেকে সে ভাসিয়ে দিয়েছিল কূলপ্লাবিনী ভালবাসার স্রোতে। ছেলেটি শপথ করেছিল সেই মেয়েটিকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। মেয়েটি সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করেছিল।

এম-এ পাশ করবার পর ছেলেটি এক মফঃস্বল কলেজে প্রফেসারী নিয়ে চলে গেল। সেখান থেকে মাঝে মাঝে আশা জাগিয়ে রাখবার জন্য চিঠি লিখতো। ধীরে ধীরে সেটাও বন্ধ করলো সে! মেয়েটির মনে জাগলো প্রচণ্ড অভিমান—সেও চিঠি বন্ধ করলো। যদি ছেলেটি কোন-দিন তার কাছে ফিরে আসে, তবেই সে তাকে ক্ষমা করবে।

ধীরে ধীরে কেটে গেল দশটি বছর, ছেলেটি ফিরে এলো না। এদিকে আকুল আগ্রহ নিয়ে শবরীর মত প্রতীক্ষায় থাকে মেয়েটি। তার ভালবাসা কি ব্যর্থ হয়ে গেল? যাক, তবু সে একটি ছেলেকে সারাটি অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে এই তার পরম পাওয়া। পরে, সে ছেলেটি হয়েছে খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বিবাহ করে শান্তিতে ঘর সংসার করছে। কিন্তু, যে মেয়েটি তাকে ভালবেসেছিল সে? সে সমস্ত সুখ ভোগ ছেড়ে সেজেছে সন্ন্যাসিনী। বলতে পারো সুধন্য, মেয়েটির এই দণ্ড ভোগের অপরাধটা কোথায়?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো জয়ন্তী, শত চেষ্টাতেও নিজেকে সামলে নিতে পারলো না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি প্লট চেয়েছিলে না সুধন্য—তাই সত্য-ঘটনাই একটি বলে গেলাম। হয়তো কাহিনীটা অসমাপ্ত থেকে গেল—সত্যিকারের কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যায়। যদি তোমার ভাল লেগে থাকে, নিজের ইচ্ছা মত তুমি এ কাহিনী শেষ কোর। তুমি সাহিত্যিক, এই কাহিনীতে যতটা পারো ভেজাল দিয়ে রং চড়িয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি কোর। দেশ জুড়ে সম্মান—বাহবা পাবে। কিন্তু এটুকু অন্ততঃ জেনে রেখো—মেয়েটির ভালবাসায় কোন ভেজাল ছিল না। সেটা সত্যিকারের খাঁটী। আচ্ছা, এবার চলি, সুধন্য।

মুহূর্তে চমকে উঠলো সুধন্য—একি বলছে জয়ন্তী। সেদিনের একটা মিথ্যা প্রেমের খেলাকে সত্য বলে জীবনে মেনে নিয়েছে? তারই জন্য পথ চেয়ে বসে আছে নিজের সমস্ত কামনা বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে ধনীর দুলালী—সন্ন্যাসিনীর ব্রত নিয়েছে! আর সুধন্য? কতটুকু মূল্য দিল জয়ন্তীর এই নীরব সর্বত্যাগী প্রেমের—যে প্রেম ধূপের মত তিলে তিলে নিজেকে দহন করে শেষ হতে যাচ্ছে।

জয়ন্তী আমাকে ক্ষমা কর—ভুল করে তোমার উপর অবিচার করেছি। জয়ন্তীর হাত দুটিকে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিতে চাইল।

জয়ন্তীর কণ্ঠ ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোন কথা সে বলতে পারলো না। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। তারপর তড়িৎ বেগে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে মোটরে উঠে ষ্টার্ট দিল। অনেকদিনের জমে থাকা বুকের বোঝাটা তার হাল্কা হোল। হয়তো তার এ জীবনে সুধন্যকে পাওয়া হোল না, কিন্তু এই না-পাওয়ার মধ্যেই সে অনেক বেশী করে সুধন্যকে পেয়েছে—যেভাবে মঞ্জু কোনদিন তাকে পাবে না, পেতে পারে না। অন্ততঃ নিজের প্রেমের কাছে সে নিজে শঠতা করেনি। সত্যিকারের নিষ্ঠায় তাকে জীবনে মেনে নিয়েছে। এ পাওয়া অনেক বেশী পাওয়া।

সামনের রাস্তার উপর দিয়ে জয়ন্তীর মোটরটা এগিয়ে চলেছে, আর উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্তব্ধ বিমূঢ়ের মত দেখছে সুধন্য। বিবেক তাকে আজ বারবার ধিৎকার দিচ্ছে—সুধন্য তুমি প্রতারক, তোমার উপন্যাসে গল্পে তুমি প্রেমের যতই গুণগান গাও না কেন—সত্যিকারের প্রেমকে তুমি জীবনে অস্বীকার করেছো। জয়ন্তীকে তুমি ঠকাবার চেষ্টা করলেও সে ঠকে যায়নি—নিজের জায়গায় সে আজ বিজয়িনী। তুমিই নিজেকে নিজে ঠকিয়েছ।

ক্ষিপ্র হাতে নিজের মাথার চুলগুলিকে সে মুঠো করে চেপে ধরলো। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, জয়ন্তীর মোটর ততক্ষণে পথের বাঁকে মোড় নিচ্ছে।

কবি শ্রীমধুসূদনের কাব্যমহত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

াঙলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক ধারার ভগীরথের ়মিকায় আবির্ভাব ঘটেছিল কবি শ্রীমধুসূদন দত্তের। াশ্চাত্য কবি-কল্পনার বৈশিষ্ট্যকে তিনি তাঁর রসবুদ্ধির ারা গ্রহণ ক'রে নিয়ে এমন একটি অপূর্ব সমন্বয় সাধন রেছিলেন যে, তাতেই বাঙলা কাব্য সাহিত্যের এক তন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছিল। এই দিগন্তের দ্বারমুক্তির া-কিছু উল্লেখনীয় পুরস্কার, তা কবি মধুসূদনেরই প্রাপ্য, াবং তিনি তা' পেয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত রেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,—'কাল প্রসন্ন'—ইউরোপ হায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা ড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।' যে পবনের কথা সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন, া হচ্ছে আমাদের বিশাল এক জাতীয় ঐতিহ্যের সুপবন, াহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির বীজ দিয়ে বইয়ে য়েছিলেন কবি শ্রীমধুসূদন, আর দেশীয় ঐতিহ্যের য়যাত্রার পতাকায় বাঙলা দেশের বুকে নবযুগের ভ্যাগমের উদ্গাতা হিসাবে অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে বি শ্রীমধুসূদনের নামই লেখা হয়েছে। মধুসূদন বাঙলা াহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি হতে চেয়েছিলেন, আমরা ার মধ্যে মহাকবিকেই পেয়েছি।

মহাকবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজ কবিপ্রতিভার পর তাঁর আত্মপ্রত্যয়ও ছিল অপরিসীম। সেই আত্ম- াত্যয়কে মূলধন করে নিয়ে তিনি মহাকাব্য-রচনার একটি সাধ্য ব্রতকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য েশের কয়েকটি ভাষাতেই তার অসাধারণ দখল ছিল, বং বিভিন্ন ভাষার কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ল সুগভীর। সেই পরিচয়ের পথ ধরেই তিনি তাঁর বিকল্পনাকে ভার্জিল, হোমার, দান্তে, ট্যাসো, মিলটন ভৃতি ইউরোপীয় কবির ভাব-কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে য়ে ভারতীয় পুরাণ থেকে চরিত্র গ্রহণ ক'রে নূতন ঙ্গীতে সেগুলিকে রূপায়ণ দিলেন। তা' ছাড়া বাঙলা কাব্যের প্রথম আধুনিক যুগে মহাকাব্য রচনাই লোভনীয় ছিল। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যও অনেকটা মহাকাব্যধর্মী, সেই ঐতিহ্যও যে সেই যুগে মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ ক'রে গিয়েছে, তা' বললে হয় তো অসংগত হবে না। কিন্তু কবি মধুসূদন রেণসাঁ যুগের মানবতা-বোধের নূতন জীবনবাদে দীক্ষিত ছিলেন। নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলেন; সেই বিস্ময় আনন্দিত হ'য়ে উঠেছিল তাঁর প্রতিভার মহৎ ফলশ্রুতিকে লাভ ক'রে।

বাঙলা ভাষায় যে মহৎ সৃষ্টি সম্ভব এই বিশ্বাসও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মনের গভীরে জেগেছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর আবেগদীপ্ত আলোচনাই এই বিস্ময়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। তাঁর মধ্যে উনিশ শতকের যুগ-চেতনার সঙ্গে জাতীয়-চেতনার একটি সার্থক সম্মেলন ঘটেছিল এবং সেই জন্যেই কাব্যে যুগচেতনার স্বাক্ষর দিয়েও জাতিত্ব গৌরবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাশীল মানসিকতা ধরা পড়েছে। এখানেও তাঁর কাব্যের এক অবিস্মরণীয় মহনীয়তা।

মহৎ কাব্য রচনায় একটি গভীরতর জীবন বোধ যেমন থাকতে হ'বে, তেমনি কাব্যমহত্ত্ব নির্ভর করে চিরকালীন একটি অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধির উপর, যুগচেতনার সংশয়হীন প্রকাশভূমিতে। মধুসূদনের কাব্যে তার প্রকাশ ঘটেছে পটভূমি সৃষ্টির নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশালতায় এবং বিভিন্ন চরিত্রায়নের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে। আমাদের এই উক্তিকে সমর্থন দিতে গেলে প্রথমেই তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাব্য 'মেঘনাদ বধ'কে গ্রহণ করতে হয়। কারণ যুগোত্তীর্ণ কবিধর্মটির অমর প্রতিষ্ঠা তাঁর এই কাব্যের সৃষ্টি কল্পনায়।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপাদান বিদেশের অনেকগুলি

কাব্য থেকে গ্রহণ করলেও এর মধ্যে কবি মধুসূদন যে-মৌলিক সৃষ্টির পরিচয়-চিহ্ন রেখে গিয়েছেন, তা' নিঃসন্দেহে কালজয়ী। তিনি যে বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন বিদ্রোহী রূপে (literary rebel) দেখা দিয়েছেন তা' তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণের কাছে লিখিত পত্রে অত্যন্ত সজাগ ভাবেই ঘোষণা করে গিয়েছেন; তাঁর যে আবির্ভাব ঘটেছে বাঙলা কাব্যধারার নূতন এক পথসৃষ্টির জন্য, এই অনুভূতি এবং নিজ প্রতিভার নিঃসংশয় প্রত্যয়কে মূলধন ক'রে নিয়েই জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি রচনার পক্ষে এই নিঃশঙ্ক ঘোষণার সঙ্গে তিনি অভিযাত্রা করেছিলেন। আর এই জন্যেই মধুসূদনের কাব্য যুগ-বিদ্রোহেরই সার্থক বাণীরূপ। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি গ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে ক্রমানুসারে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান না লাভ করতে পারেন তবে তিনি তাঁর গ্রন্থ ভস্মসাৎ করতেও কুণ্ঠিত হবেন না বলে' সদৃপ্ত ঘোষণা করেছিলেন। এইখানেই দেখি তাঁর কবিব্যক্তিত্বের মহৎ প্রতিভার প্রতি নিঃসংশয় ধারণা এবং এই সঙ্গে কাব্যের মহত্ত্ব সৃষ্টির জন্য অনলস সাধনা ও উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। তাই তিনি বলেছিলেন, বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রচণ্ড উল্কার মতো নিঃসংশয় গতিতে নেমে আসবেন। ১ অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁকে এই বলিষ্ঠ উক্তির উচ্চারণে প্রবুদ্ধ করেছিল।

উনিশ শতকের বাঙালী মনে যে একটি বিপ্লবাত্মক ভাবপ্রেরণা জেগেছিল, তার প্রাকভূমি সৃষ্টি ক'রে গিয়েছিলেন একজন বিদেশী শিক্ষাবিদ,—নাম তাঁর হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও। মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজে পড়েন, তখন ডিরোজিও জীবিত ছিলেন না বটে, কিন্তু তরুণদলের মধ্যে তাঁর বিঘোষিত ভাবধারার প্রভাব ত'নও বেশ নিঃশব্দ-সঞ্চারী হয়ে ছিল। মধুসূদনের কাব্য সেই বিপ্লবাত্মক ভাব প্রেরণারই বহিঃ প্রকাশ।

মধুসূদনের কবিবৃত্তিতে যে বিদ্রোহের ভাব, সে পাশ্চাত্য সাহিত্য দার্শনিকদের মনন চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফল। উনিশ শতকের যে-জীবন-তৃষ্ণা উচ্চাভিলাষী সকলের হৃদয়কে আকুল ক'রে তুলেছিল, সেই জীবন তৃষ্ণাই অবিচল সৃষ্টিকল্পনার সঙ্গে সঞ্চারিত হ'য়ে মধুসূদনের রাবণ চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছিল। অনুভূতির গভীরতার পিছনে যে একটি যুগচেতনা আছে, সেই যুগচেতনার স্বাক্ষরই তাঁর রাবণ চরিত্র চিত্রণে। উনিশ শতকের নবজাগরণের উষালগ্নে নারীহৃদয়ে যে আত্মসচেতনার স্বাক্ষর পড়েছিল, মধুসূদনের প্রমীলা, চিত্রাঙ্গদা, তারা, জনা প্রভৃতির চরিত্রায়নে এই আত্মচেতনারই প্রকাশ মুখরতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাব্যমহত্ত্বের পিছনে যে অতি-সজাগ ব্যক্তিত্বস্বীকৃতি ছিল তারই পরিচয় এই নারীব্যক্তিত্বকে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দান করার মধ্যে। স্বকীয় ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতায় প্রত্যেকটি চরিত্রই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। বিশেষ ক'রে সুগভীর মানবতা বোধের মধ্য থেকে নারী ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর কবিমানসে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জেগেছিল, তারই প্রকাশ তাঁর প্রমীলাচরিত্রে। এই প্রমীলাচরিত্রটির রচনা-মুহূর্তে কবির ভাবকল্পনার রাজ্যে যে কয়টি নারী চরিত্র এসে কবিমনকে রাঙিয়ে দিয়েছিল তাদের মধ্যে যেমন আছে ট্যাসোর ক্লোরিডা, সিলভিপে, তেমনি আছে ভার্জিলের ক্যামিলা, হোমারের অ্যামিনী, বায়রণের মেড অফ সারাগোসা। কাশীরাম দাসের 'প্রমীলা' নামটিকেও তিনি গ্রহণ করলেন বীরত্ব ও কোমলতার সংমিশ্রণে এই তুলনাহীন নারীচরিত্রটিকে কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার বেলায়। প্রেমই প্রমীলাচরিত্রের কেন্দ্রীয় বীজ, এবং এই প্রেমের মর্মকোষ থেকেই তাঁর বীরত্ব ও সুকোমল নারীত্বের বিকাশ এবং এই বিকাশের মধ্যেই তাঁর কাব্যমহত্ত্বের অক্ষয় স্বাক্ষর চিহ্নিত হ'য়ে আছে। মেঘনাদ চরিত্রকে আরও সুন্দর, উজ্জ্বল করার জন্যই প্রমীলাকে নিজস্ব রঙ্গলোকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে এই রূপে অঙ্কিত করার প্রয়োজন ছিল, যেমন ছিল রাবণ চরিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রথমেই চিত্রাঙ্গদাকে সৃষ্টি করার। যেখানে রাবণের কথায় প্রকাশ পেয়েছে তিনি দৈবাহত, আর চিত্রাঙ্গদা তাঁকে তীব্র ভাষায় দিয়েছেন সীতাহরণের অন্যায়ের যে পাপ, তার ফল তাঁকে ভোগ করতেই হবে, ন্যায়ধর্মের বিজয়বার্তা সর্বপ্রথম চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়। কাব্যের ফলশ্রুতির দিক দিয়েই একদিকে

---

(১) you may take my word for it, Raj, that I shall come on like a tremendous comet and no mistake. (রাজনারায়ণ বসুর কাছে চিঠি)

শোকাহত ও অভিমানাহত নারী হৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত অথচ সুতীব্র ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। আর রাবণে যেন তাঁর নিজের ব্যক্তি হৃদয়েরই সমুজ্জ্বল প্রকাশ। জীবনের বহু দুঃখ বেদনার মর্মজ্বালাকে রাবণের বিলাপের মধ্যে শিল্প সংযম রূপায়ণে তিনি বাণীবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। মেঘনাদ বধে মধুসূদন শুদ্ধ মহাকাব্য রচনার জন্যই আত্মনিয়োগ করেন নি, তিনি এখানে জীবন-শিল্পী। রাবণের প্রতিটি উক্তিই হয় বীরব্যক্তিত্বের মর্মমূল থেকে উচ্চারিত, নয় বেদনা-মথিত জীবন-অভিজ্ঞতার অশ্রু ভারাতুর আর্তনাদ। মমতাকুল গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহরসে কাব্যের প্রায় প্রতিটি সর্গই অভিষিক্ত হয়েছে; এমন কি অষ্টম সর্গেও দেখতে পাই, পরলোকগত দশরথ তাঁর পুত্রস্নেহাতুর হৃদয়ের অপরূপ প্রকাশ ঘটিয়েছেন প্রতিটি কথায়। এই ভাবেই একটি জীবন-অভিজ্ঞতার রসনিষেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন মহাকাব্যধর্মী সৃষ্টিকর্মাকে; নিজের প্রত্যয়সিদ্ধ মানসক্ষেত্রের অনেকখানি সংবাদ পরিবেশন করেছেন তাঁর কবিহৃদয়ের প্রেরণা, সাধনা ও জীবনদর্শনজাত মহৎসৃষ্টির রূপকল্পে। তাঁর কাব্যমহত্বে একদিকে তাই যেমন প্রবল হৃদয়াবেগ, অন্যদিকে তেমনি বিষাদময়তার শান্ত গম্ভীর শিল্পস্বাক্ষর। মধ্যযুগের দেববন্দনা মূলক কাব্যভঙ্গীকে ত্যাগ করে মানব রস সিঞ্চিত ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা রচনার যে-প্রকাশ লীলাকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অল্প কিছু দিন পূর্বে মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, সেই পথেই আরও একটি নূতন সৃষ্টির যুগান্তকারী প্রতিভা নিয়ে পদচারণা ঘটল মহাকবি মধুসূদনের। মানবপ্রীতির এক সুস্নিগ্ধ নির্ঝর-ধারা ঝ'রে পড়লো তাঁর উদার কাব্যভূমিতে। তখনকার যুগধর্ম ও ইউরোপীয় দার্শনিকদের মানবতাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে, ও গ্রীক কবির সৌন্দর্যপ্রীতিকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি ও ভালোবাসা বর্ষণ করলেন আর্যপ্রীতিবঞ্চিত অনার্য বা রাক্ষসদের উপর। তাদের মধ্যেই উজ্জীবিত ক'রে তুললেন তাঁর নিজের অন্তর-রাজ্যের স্বদেশপ্রেমকে। কিন্তু তা' হ'লেও তিনি এটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর এই সুস্পষ্ট অনার্য বা রাক্ষস প্রীতির জন্য জনসাধারণ হয়তো অসন্তোষ প্রকাশ করবেন এবং বলবেন যে, মেঘনাদ বধের কবিচিত্ত রাক্ষসদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন; এবং তিনিও নিঃসংকোচে জানিয়ে গিয়েছেন এ একান্ত সত্য।২ তাঁর চিন্তার জগতে রাবণ যে একজন মহৎব্যক্তি (grand fellow) এবং রাবণ যে তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে তাও জানাতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই সঙ্গে এও তিনি জানিয়েছেন রামচন্দ্র এবং তাঁর সঙ্গী নিম্নশ্রেণীর লোকগুলিকে তিনি ঘৃণা করেন। কাব্য সংগঠন এবং তাঁর নিজের এই উক্তিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে অতি সহজেই এটা উপলব্ধি করা যাবে যে, যে কালভূমিতে তাঁর কবিমানস ও জীবন প্রতীতির বিকাশ সাধন ঘটেছে এবং বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে ব্যাপকতর পাঠকৃতি আছে, তাতেই পাশ্চাত্যের humanism positivism প্রভৃতি নূতন ভাববাদ তার মনকে পুরোপুরিভাবে মানবমুখী করে তুলেছে। তা' ছাড়া, অপরিমিত ঐশ্বর্যের প্রতি যার আবাল্য পক্ষপাতিত্ব, তিনি ভিখারী রাঘবের কাছে তার প্রত্যাশা করবেন কি ক'রে? অন্তরে রসধর্মই তাকে রামায়ণের বিজয়ী পক্ষকে ত্যাগ করে বিজিত পক্ষের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ক'রে তুলেছিল।

মধুসূদনে আর যাই থাক, কোনরূপ রক্ষণ-শীলতা ছিল না। তিনি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ রূপ গঠনের দিক ছাড়াও যে একটি অন্তরতর রহস্যময় দিক আছে, সেই দিকটির প্রতিই তিনি বহুবার অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, এবং এইখানেও তাঁর কাব্য সৃষ্টির মহত্ত্ব। গীতিপ্রাণতা (Lyricism) তাঁর কবি মানসের একটি লক্ষণীয় দিক এ-কথা তিনি কয়েক-বারই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ-দিকটি তাঁর কাব্যকে যে বিশেষ সমুন্নতি দান করেছে সে কথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। 'মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গকে বাদ দিলে যেন অনেকখানিই বাদ পড়ে যায়। এই সর্গে মধুকবি যেন একেবারে আমাদের অন্তরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। অলংকার প্রিয়তাকে মাঝে মাঝে প্রশ্রয়

(২) এই প্রসঙ্গে কবি মধুসূদন তাঁর বন্ধু রাজ নারায়ণ বসুর কাছে একটি চিঠিতে লিখেছেন—'People here grumble and say that the hearl of the poet in meghnad is with the rakshasas and that is the real truth.

দিলেও, বহুক্ষেত্রে নিরলংকার ধ্বনিব্যঞ্জনার ভিত্তিভূমিতেই তার উপলব্ধ জীবনসত্যকে বা অন্তরতর অনুভবকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। নূতন যুগের কাব্যধর্মকে আবাহন জানিয়ে যে প্রাচীন কবিকর্মের দিকসীমাকে লঙ্ঘন করতে হবে, এ-বোধটি মধুসূদনের কবিমানসে খুব বেশি রকমই ছিল; এবং এইজন্যই তিনি যুগস্রষ্টা কবি বলে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধারা যেখানে ভারতচন্দ্রে এসে পরিণতিলাভ করেছে, তার পরবর্তী স্তরে মধুসূদনের মহাকাব্যই যেন স্বাভাবিক। কারণ বাঙলা সাহিত্যে ঐ জিনিসটিরই অভাব ছিল।

'মেঘনাদবধের শিল্পকৃতিতে একটি ক্লাসিক মহিমাই সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হ'য়ে আছে; যদিও তার মর্মলোকে প্রবাহিত হচ্ছে একটি স্নিগ্ধ সুন্দর গীতিরসের ফল্গুস্রোত। মহাকাব্যের ভাবকল্পনায় এই গীতিফল্গুধারার রসসৃষ্টিতেই যুগ ধর্মানুসারী তাঁর কাব্যমহত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। মানবরস-পিপাসু যে-যুগচিত্ত তাতে মহাকাব্যের গাম্ভীর্যের সঙ্গে গীতি মাধুর্যের রসলীলাও মিশাতে হবে ব'লে তিনি হয়তো মনে করেছিলেন। তাই তাঁর এই অপরূপ সৃষ্টি। বিশ্বনাথের আলংকরিক নির্দেশানুযায়ী বর্তমান কালের যুগ হয়তো একমাত্র বীররসাশ্রয়ী মহাকাব্যকেই অশান্ত মনে গ্রহণ করতো না। তা ছাড়া তিনি জানতেন, যা' সুন্দর, কোমল এবং করুণ তাই কেবল কালপ্রবাহের অফুরন্ত ধারায় মহৎ গাম্ভীর্য বা উদাত্ততার সঙ্গে নিজের বিজয়ী অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে পারে; করুণ রসের সৃষ্টিসুন্দর কবিকে সর্বযুগের পাঠকরাও অর্পণ করেন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার অম্লান মালিকা।৩ তার মধ্যে যে একটি গীতিপ্রাণতার উচ্ছল সুর আছে, সেদিকেও কবি বেশ সজাগ ছিলেন; এবং এর পরে যে তিনি গীতিকাব্যের বিস্তৃত রসলোকেই প্রবেশ করবেন সে আভাসও তিনি চিঠিতে দিয়েছিলেন। গ্রীক পুরাণের সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন পুরাণের সৌন্দর্যকে অকুণ্ঠভাবে মিশিয়ে দিয়ে তিনি 'তিলোত্তমা সম্ভব' ও 'মেঘনদেবধ কাব্যে' এই ক্লাসিক মহিমার একটি অপরূপ রসলোক সৃষ্ট ক'রে গিয়েছেন। 'তিলোত্তমা সম্ভব' তো লিরিক মাধুর্যের একটি অপরূপ প্রতিমার মতো পরিস্ফুটরূপ নিয়ে সর্বকালের বাঙলী পাঠকের নয়ন সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই কাব্যে তিনি কেবল তাঁর নিজের ভাষা ছন্দসৃষ্টির মৌলিক প্রতিভার উৎসমূলকেই আবিষ্কার করলেন না, তিনি একজন সৌন্দর্যধ্যানী নিপুণ শিল্পীর মতো সৌন্দর্যের আদিতত্ত্বকে উপলব্ধি ক'রে একটি কালবিজয়িনী সৌন্দর্যপ্রতিমাকে বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা দিয়ে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই কাব্যটি যে আমাদের জাতীয়কাব্যকে একটি বহুবাঞ্ছিত সমুন্নতির স্তরে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেবে, এই নিঃসংশয় বিশ্বাসও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। একটি কৌতুকালাপ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মনোবৃত্তিকে কেন্দ্র করে যে কাব্যের জন্ম, তার মধ্যে এত রসধারা বিলসিত হ'য়ে উঠবে, এ স্রষ্টা কবিও বুঝতে পারেন নি। 'অপূর্ব নির্মাণক্ষমা' যে শক্তি, সে বুঝি এমনি করেই সৃষ্ট করেই যায়। এই কাব্যে একদিকে অন্তরের সৌন্দর্যসাধনার আরতিপ্রদীপটিকে জ্বালিয়ে নিয়ে বিশ্বের হৃদয়স্থিতা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যান করেছেন কবি, অন্যদিকে সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সৃষ্টি বর্ণনায় বিভিন্ন উপাদানকে অবলম্বন ক'রে যে-রূপকল্পনার প্রয়োগ করেছেন, এবং বস্তুধর্মিতার বেশ কিছুটা বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, তাই এই কাব্যকে অনেকটা মহকাব্যধর্মী ক'রে তুলেছে। এই কাব্যের চরিত্র-সৃষ্টিতে যথেষ্ট দুর্বলতা আছে, কিন্তু সৌন্দর্যধ্যানের উদাত্ততায় একটি সমুজ্জ্বল মহত্বও সঞ্চারিত হয়েছে। এবং এইখানেই কাব্যটির সার্থকতা। তা' ছাড়া, সেই যুগচিত্ত-আকাঙ্ক্ষিত যে-মানবতাবোধ মধুকবির অন্তরলোকে সঞ্চিত হচ্ছিল, তার প্রকাশ এই প্রথম কাব্যটিতেই বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেইখানে, যেখানে তিনি দেবতাদের শত্রু ক'রে সুন্দ-উপসুন্দ নামক দুটি দানবভ্রাতাকে অঙ্কিত করেছেন। মহাভারতকারের রূপচিত্রণে এই দানব ভ্রাতা দুটি যেমন অধর্মাচারী তেমনি কামুক; কিন্তু মধুসূদনের তুলিতে যে রূপ ফুটে উঠেছে—তাতে তারা ধ্যানী ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। তারা ধর্মাচারী দেবতার শত্রু হ'লেও কবি হৃদয়ের সহানুভূতির অমৃত-

(৩) He who is 'beautiful' 'tender' and the 'pathetic' with a dash of sublimity, is sure to float down the stream of time in triumph All readers are sure to unite in loving and adoring him [রাজনারায়ণ বসুর কাছে চিঠি]

নিজেকে উনিশ শতকের বাঙলা কাব্যলোকে একটি বিশিষ্ট আসনে অভিষিক্ত হয়েছে। যেটুকু তাদের কামনা-পঙ্কিল-রূপ, সেইটুকুকেই অবলম্বন ক'রে যুগন্ধর কবিপ্রতিভার ধ্যানসম্ভূতা একটি অপরূপা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পদসঞ্চার ঘটেছে। এই দিক দিয়েই মধুসূদন গ্রীককবির স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য-প্রীতিতে প্যাগান-দৃষ্টির অধিকারী। সব সময়ই দেখা যায়, দেবচরিত্রের মধ্যে তিনি একটি মানবীয় ভাবরস (human interest) সঞ্চার করতে চেয়েছেন, এবং এই সঞ্চারের ফলেই দেবচরিত্রগুলি হিন্দুর পুরাণাশ্রয়ী দেবচরিত্র না হ'য়ে পাঠক-মনকে বেশ কিছুটা মানবরসের মাধুর্য লীলায় অভিষিক্ত ক'রে তোলে। তাঁরা একদিকে সীমাহীন সৌন্দর্যের প্রতীক, অন্যদিকে অপরিসীম শক্তিশালী। এই জন্যই কোন ধর্মীয় তাৎপর্য তাঁর কবি-আত্মাকে জাগ্রত ক'রে তোলে নি, যা করেছে, সে হচ্ছে তাঁর সৌন্দর্যবোধ। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল একটি সুগভীর নীতিবোধ; সেই জন্য প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হ'য়েও মহাদেব রাবণের কর্ম-ফলকে রোধ করতে পারেন না। 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' কথাটির মধ্যে যে-একটি চিরদিনকার নৈতিক-বিধান আছে, ইউরোপীয় বিদ্রোহাত্মক ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কারকে অন্তরে লালন ক'রে সেই বিধানেরই জয়ধ্বনি তিনি দিয়ে গিয়েছেন। এই জন্যই হয়তো তিনি তাঁর বন্ধুকে জানিয়েছিলেন, হিন্দু-বাতাবরণ তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে যতটা সম্ভব রক্ষা ক'রে যাবেন।৪ তাঁর কবিমানসে এই সদাজাগ্রত নীতিবোধ ছিল বলেই সুতীব্র সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তাঁর কাব্যলোকে একটি সংযমের মহত্ত্ব এসে যুক্ত হয়েছে; ঐশ্বর্যের বিপুলতার সঙ্গে জীবন অভিজ্ঞতার সংযত পদক্ষেপ কাব্যের গভীরে একটি মহত্তর ধ্বনির সৃষ্টি করেছে। তাঁর কাব্যজগতের এই সমন্বয়ের সুরই একটি সার্থক ফল-শ্রুতির দ্বারদেশে আমাদের মনগুলিকে এনে উপস্থিত করে। তিলোত্তমায় কোন সুগভীর জীবনবোধের প্রকাশ নেই বটে, কিন্তু সৌন্দর্যবোধের আনন্দময় অভিব্যক্তি আছে; মেঘনাদবধে সৌন্দর্যবোধ ও জীবনবোধের একটি সুগভীর সমন্বয়ের রসলোক সৃষ্টি হয়েছে। তিলোত্তমায় যে-ছন্দ-সৃষ্টি করতে যেয়ে ছন্দটির ভবিষ্যৎ সার্থকতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে একটি পরম আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে-ছিলেন, সেই ছন্দ 'মেঘনাদবধে' এসে কাব্যের ললাটে একটি অক্ষয় মহত্ত্বের উজ্জ্বল তিলক এঁকে দিয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে তার পদযাত্রায় একটি সার্থকতম ঐতিহ্য সৃষ্টি ক'রে চলেছে, এ তিনি প্রথমেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি বন্ধুকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন,—'অমিত্রাক্ষর এখন একটি প্রচলিত রীতি হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃদ্ধ রণজিৎসিংহ যেমন ভারতের মানচিত্রের দিকে চেয়ে বলতেন,—সব লাল হো যায়েগা,'—তেমনি আমিও বলি 'সব অমিত্রাক্ষর হো যায়েগা।'৫ আর যাঁরা এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের যথার্থ মহত্ত্বকে ধরতে পারেন নি, অথচ পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন, তাঁরা তাঁর কাছে barren rascals। তিনি জানতেন, যে ছন্দ মহাকাব্য রচনার উপযোগী হ'য়ে একটি অপূর্ব ধ্বনিনির্ঘোষ ও ভাষাদর্শ সৃষ্টি করার সহায়তা করে, সেই ছন্দের মধ্যেই একটি মহত্ত্ব আছে; এই মহত্ত্বেরই অনুধ্যান করেছেন কাব্যরচনার মাহেন্দ্রলগ্নে এই যুগান্তকারী ছান্দস কবি।

এই অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই গম্ভীর মধুর সার্থকতম শিল্পরূপ দেখি আমরা তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে। এই কাব্যেরও মহৎ প্রকৃতির মধ্যে আছে তাঁর নূতন আলো জাগানো কবিব্যক্তিত্ব। প্রাচীন রোমক কবি ওভিদের Heroides এর অনুসরণে ভারতীয় পুরাণের কয়েকটি নারী চরিত্রকে গ্রহণ ক'রে তিনি এই কাব্যের কাঠামোটি রচনা করেছেন বটে, কিন্তু এর মর্মলোক সঞ্চারী যে-কাব্যভাবনা আছে তা' আধুনিক যুগের। এ-কাব্যেরও চরিত্র-চিত্রণে তিনি আধুনিক কালের দাবীকেই সব চেয়ে বড় ক'রে মেনে নিয়েছেন, এবং নারীপ্রেমের যে-শিল্পরূপটি এ-কাব্যে

(৪) I only hope I have given the Episode (মেঘনাদবধ কাব্য) as thorough Hindu air as possible. রাজনারায়ণ বসুর কাছে আবার অন্য একটি চিঠিতে লিখেছেন—You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem.

(৫) Blank vese is the 'go' now. As old Ranjit singh used to say, when looking at the map of India—'sub lol ho jaga, I say 'sab Blank verse ho jaga'

প্রকাশ পেয়েছে, তা' লিরিকের প্রাণব্যাকুলতাকে সঙ্গী ক'রে জীবনের এক চিরন্তন পিপাসাকে চিত্রিত করেছে। গম্ভীর ও মধুরের এক অপরূপ সম্মেলন এই কাব্যে। 'মেঘনাদ বধের' প্রমীলা চরিত্রে নারীহৃদয়ের প্রেমবৃত্তির যে সোচ্চার বলিষ্ঠতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটালেন এই কাব্যে। প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই একটি নাটকীয় রসসঞ্চারও ঘটেছে। নারী চরিত্রে এক আত্মসচেতন প্রেম প্রকাশ ঘটেছে বলেই এই কাব্যসৃষ্টিরও সঙ্গে একটি অপরূপ প্রজ্ঞার স্বাক্ষরও সমুজ্জ্বলরূপ লাভ করেছে। কারণ, ভাবীকালের যুগোপযোগী নারী চরিত্র কল্পনার তিনিই প্রথম উপাদান জুগিয়ে গিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয়না। Ovid যেমন দুই একটি পত্রে সমাজ বিরুদ্ধ প্রেমের অকুণ্ঠ অবতারণা ক'রে গিয়েছেন, কবি মধুসূদনও মনোজগতের সত্য দিয়ে দুই একটি পত্রিকাকে ভূষিত করতে চেয়েছেন। অন্তরের সত্যকে সব সময়েই কাব্যজগতের সত্য বলে গ্রহণ করা হয়। রোমান্টিক প্রণয়াবেগের চিরকালীন রূপচিত্রই 'বীরাঙ্গনা কাব্যের বিশিষ্ট কয়েকটি পত্রিকায়, এবং এই রূপচিত্রের সঙ্গে যুগচেতনা মিশ্রিত হ'য়ে এই সৃষ্টিকে একটি দীপোজ্জ্বল কাব্যমহত্ত্ব দান করেছে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র শূর্পণখার প্রেমে নীড় বাঁধার বিশেষ কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না বলেই মনে হয়; ছিল শুধু রূপমুগ্ধ-নারীমনের ভোগলালসার তীব্রতা। এইজন্যই সে কেবল লক্ষ্মণকে তার ঐশ্বর্যের সমারোহের কথাই বলেছে, কোন স্নিগ্ধ ও বিশ্বস্ত প্রেমের আশ্বাস ছিল না তার মধ্যে। আর শকুন্তলা কিংবা তারার মধ্যে ঐশ্বর্যের কোন প্রকাশ নেই, আছে শুধু আন্তরিক প্রেমের বিনীত প্রকাশ, নিঃসন্দিগ্ধ প্রেম-প্রত্যয়ের ব্যাকুল উচ্চারণ। কিন্তু তারার প্রেমে প্রতিকূল সমাজসম্পর্কের জন্য তার নারী হৃদয়ে একটি পৃথক ধরণের জটিল এবং প্রচণ্ড আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। তার বহুদিনকার প্রচ্ছন্ন প্রেম-তরঙ্গ অতর্কিতেই হৃদয়ের তটভূমিতে আঘাত হানছিল, আর সেই প্রাণচাঞ্চল্যের রন্ধ্রপথ ধরেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের তারার মতো ক'রে মধুসূদন যদিও তারার চরিত্র অঙ্কিত করেননি, কিন্তু তার চরিত্রে নারীপ্রেমের যে-ভীতিহীন বলিষ্ঠ প্রকাশের উজ্জ্বলতা দেখিয়েছেন, তারই অনুসারী হয়েছেন পরবর্তী যুগের কবিসাহিত্যিকেরা নারী চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে। যিনি মহৎ প্রতিভার অধিকারী, তিনি এমনি করেই প্রতি যুগে পথিকৃৎ হ'য়ে দেখা দেন। প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে বাঙলা দেশে প্রথম পুরোধা তিনিই। যুগচেতনাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে এও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। রঙ্গলাল পদ্মিনী-উপাখ্যানে পয়ার ত্রিপদীকেই অবলম্বন ক'রে মৃত্যুবরণের মধ্যে নারীর বিজয়িনী-রূপকে পরিস্ফুট করেছিলেন, মধুসূদন তার স্বাতন্ত্র্যকে স্বাক্ষরিত করলেন ছন্দোমুক্তির উজ্জ্বল প্রয়াসে ও নূতন যুগের নব জাগৃতির মুক্তিমন্ত্রকে নারীচরিত্রের প্রাণ চেতনার মধ্যে ঠাঁই দিয়ে। এইজন্যই তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র তারা অন্তরের প্রেম প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশ একটু প্রগল্‌ভা। নারীহৃদয়ের সুগভীর রহস্যানুভূতিকেও কাব্যের নূতন গঠন সৌকর্যের মাধ্যমে তিনি এক নূতন রসরূপায়ণ দিয়েছেন। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অধিকাংশ নায়িকাদেরই একটি সুগভীর প্রেম-বিহ্বলতা আছে, এবং তাদের নারী-হৃদয়ের প্রেম-বিহ্বলতাকে অবলম্বন করেই এক অপরূপ গীতি মাধুর্যের রসধারা উৎসারিত হয়েছে এই কাব্যে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' বিদেশী ভাবকল্পনার প্রেরণা যেমন বেশি কাজ ক'রে গিয়েছে কবি মনে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বেশ কিছুটা কাজ করেছে দেশীয় ভাব। কিন্তু তা' হ'লেও স্তবক নির্মাণের প্রেরণা তিনি পেয়েছেন ইটালী দেশের Ovid-এই স্তবকরূপ Oltava Rima থেকে। কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' কবি মধুসূদনের কল্পনা-মাহাত্ম্য মৌলিকতা অর্জন করেছে সেইখানে, যেখানে তিনি রাধাকে M.s রূপে দেখেও ভারতীয় মানস-সংস্কারকে বর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু এই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, বাঙলা গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে স্তবক-রচনার যে-কুশলী স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন, তাতে প্রাচীন প্রথার ত্রিপদীর ঐতিহ্য স্বীকৃতি পেয়েও তাঁর মৌলিক কবিপ্রতিভা অবিস্মরণীয় সৃষ্টি মহত্ত্বের এক সোচ্চার ছন্দরূপ লাভ করেছে। নিত্য নব নব ছন্দ সৃষ্টির জন্যও যে মধুকবির একটি মানসিক প্রবণতা ছিল, তারও এক সংবেদন-ভরা প্রকাশ দেখি 'ব্রজাঙ্গণা'র কবিকর্মে। তিনি এখানে নবতম ছন্দবিন্যাসরীতিকে অত্যন্ত সজাগ

ভাবেই আবাহন ক'রে এনেছেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করা যায় বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর কাছে ode সম্বন্ধীয় কয়েকটি লিখিত পত্রে।

এই কাব্যর-নার ক্ষেত্রে আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কাব্যটি লিখিত হচ্ছিল 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার সমকালেই। একটিতে ছিল সমুদ্রের বজ্রগম্ভীর উদাত্ত ছন্দমুখরতা, অন্যটিতে যেন শান্ত বাঁশরীর স্নিগ্ধ মধুর তান। মধুসূদনের মধ্যে সে একটি উচ্ছ্বসিত গীতি কবির মন লুকিয়ে ছিল, তাই নূতন ক'রে মুক্তির পথ রচনা করতে চেয়েছে এই কাব্যে। কল্পনা ও ভাব-প্রবাহের স্বচ্ছন্দতায় এবং মানবীয় অনুভূতির সুফল ছন্দের সাবলীলতায় বহিরঙ্গ দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে একটি প্রেমাকুল নারীহৃদয়ের যে অপরূপ আকুলতার প্রকাশ ঘটেছে, এবং এই প্রকাশের মধ্যেই যে ব্রজাঙ্গনার যথার্থ কাব্যমহত্ত্ব তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। রাধার প্রেমানুভূতি উদ্দীপন বিভাগ রূপে মধুকবি যে 'প্রতিধ্বনি' 'জলধর' প্রভৃতিকে এনেছেন, তার সঙ্গে রয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকারীনী কবিকল্পনারই অম্লান স্বাক্ষর।

এই কাব্যটির রচনাকালে পত্রে যখন বন্ধুর কাছে লেখেন, Mrs Radha was not a bad woman, তখনই বুঝা যায়, এই কথা কয়টির উচ্চারণে ধ্বনিত হয়েছে কবির একটি চরিত্রসৃষ্টির বাসনা, যে-নারী চরিত্রটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক পটভূমিতে নিজের চিত্তকে দাঁড় করিয়ে প্রিয় বিরহের বেদনার বিধুরতার মধ্যে নিখিল বিরহিনী-নারীর প্রতিনিধি স্বরূপা হ'য়ে দেখা দেবে। মধুসূদন কোনদিনই আধ্যাত্মিকতাবাদী ছিলেন না, পরিপূর্ণ জীবনধর্মী মানবতাবাদের উপর ভিত্তি ক'রে তাঁর মানসিক গঠনটি গ'ড়ে উঠেছিল। এই জন্যই তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা একেবারে মানবী হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নারীমন যেন একই সহমর্মিতার সূত্রে বাঁধা এবং এইজন্যই একজন বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন—'বিশ্বসংসারকে আপন বিরহের দিব্যোন্মাদময়ী দৃষ্টিতে গ্রহণ করাই ব্রজাঙ্গনার বিশেষত্ব।' চিরদিনকার বিরহের কথা রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গকে অবলম্বন ক'রে এই কাব্যে আরও একটু সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে এবং বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ গীতিকবিতা হ'য়ে উঠেছে। এই কাব্যের আনন্দ অনুভবের মধ্যে সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে প্রকৃতিরস। মানবরস ও প্রকৃতিরসের সম্মিলিত মহিমায় এই কাব্যের মহত্ত্ব।

'ব্রজাঙ্গনা'র রাধা বৈষ্ণব সাধনার আশ্রয়স্বরূপা মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা নয়, কারণ বৈষ্ণব কবির তপস্যাধৃত যে-অধ্যাত্মলোকের মানসতৃষ্ণা, তা' এর মধ্যে এতটুকুও নেই ; বৈষ্ণব কবিতার গঠনভঙ্গী ও বৈষ্ণব কবির শ্রীরাধার প্রেমকল্পনায় ক্রমবিকাশের স্তরবাদী অধ্যাত্ম-পরিণতির শান্তমাধুর্য নেই। এখানে দেখি শুধু কেবল ইন্দ্রিয় নির্ভর প্রেম-প্রকাশের সুগভীর আর্তি। এইজন্যই বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাব-মাধুর্যের যে-গভীরতা তা' এই কাব্যে একেবারেই অনুপস্থিত। পদাবলী সাহিত্যের বিশিষ্ট আসন গানের জগতে, আর মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা'র একান্ত স্থান পঠন-পাঠনের মধ্যে। চণ্ডীদাসের রাধা নিসর্গ-প্রকৃতির মেঘ ও ময়ূরীর মধ্যে তাঁর প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের রূপ মহিমাকে দেখে ভাবোন্মাদিনী হয়েছেন ; কিন্তু মধুসূদনের রাধা প্রকৃতি-জগতের 'জলধর', 'ময়ূরী', 'উষা', 'গোধূলি', 'কুসুম', প্রভৃতিকে তাঁর বিরহ-বিধুর প্রাণের অংশভাগিনী রূপে গ্রহণ করেছেন ; তাদের অপার্থিব রূপের মধ্যে চিরারাধ্যের একাগ্রতাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই বৈষ্ণব কবির ভাবগভীরতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য'কে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারেনি ; যদিও তিনি বৈষ্ণব রীতিতে ভণিতা প্রয়োগের দিকটি সজ্ঞান প্রয়াসের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। ভাষা বিন্যাসের সঙ্গেও ভাব মাধুর্যের যেন তন্ময়তা সাধিত হয়নি। এইজন্যই মনে হয়, কবি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণকে ধর্মীয় মনোভাব (religious bias) ত্যাগ ক'রে এই কাব্য পাঠ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। 'ব্রজাঙ্গনা'র 'মিসেস রাধা' কথাটিই এই ইংগিত করে যে, বৈষ্ণব কবিতার পূর্বতন ধর্মীয় ভাবমণ্ডল থেকে কবি মধুসূদন শ্রীরাধাকে কেবল রসসৌন্দর্যের রূপপদ্মে প্রতিষ্ঠা দিয়ে নূতন যুগের নায়িকা ক'রে তুলতে চেয়েছেন।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বৈষ্ণব কবিতার মতো অতলস্পর্শী গভীরতা থাক আর নাই থাক, এর বক্তব্য বা চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে বিদেশী কাব্যের ছায়ামাত্র স্পর্শ করতে পারে নি, কবির ভাবকল্পনা দেশীয় ভাবসংস্কৃতির মধ্যে

অবগাহন ক'রে নিজ দেশের সাহিত্য ঐতিহ্যের প্রতি অত্যন্ত স্পষ্ট শ্রদ্ধাশীলতার স্বাক্ষর রেখেছে, এখানেও 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে'র উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই তৎকালীন বৈষ্ণব-ধর্মানুরাগী ও কাব্যানুরাগী ব্যক্তিগণ এই কাব্য পাঠে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এও সত্য যে, কবি মধুসূদনের নিজ অন্তর বেদনার রোমাণ্টিক ব্যাকুলতা রাধার বিরহ-বিলাপের মধ্য দিয়ে একটি মুক্তির পথ খুঁজে নিতে চেয়েছে।

এর পরের কাব্যসাধনায় তাঁর চতুর্দশপদী কবিতা। অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিচেতনাময় জীবন জিজ্ঞাসার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর চিহ্নিত হ'য়ে আছে তাঁর এই কবিতাগুলিতে। যখন তিনি সনেটগুচ্ছ রচনা করেন, তখন মহাকাব্যের কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি বাঙলা দেশে সুদূর প্রসারী হ'য়ে দেখা দিয়েছে। সুদূর ফরাসীদেশে বসে জীবনের এক নিরাশ্বাস দুর্যোগময় দিনে এই 'সনেট' রচনার মানসিকতাকে তিনি লাভ করেছিলেন। অবশ্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার সমসাময়িক কালে তিনি একটি সনেট রচনা ক'রে বাঙলা সাহিত্যে সনেটের রূপৈশ্বর্যের যে একটি প্রতিশ্রুতি আছে, সে-কথা তাঁর রসজ্ঞ বন্ধুকে জানিয়েছিলেন। তাঁর কবিআত্মা কাব্যবীণার তারে বিচিত্র ভাবরসে ভরা মর্ম-সংগীত গাইবার সাধনা করেছিল সেদিন এবং ব্যক্তি-মধুসূদনকে পুরোপুরিভাবে আমরা পাই এই কাব্যটিতে। সনেটের দৃঢ়বদ্ধ আঙ্গিক এবং বাগবন্ধের গাঢ় প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ক'রে যে-রসঘন পরিপূর্ণতা কবির মানস-বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে তা' মধুসূদনের কয়েকটি সনেটে রূপময় হ'য়ে উঠেছে বটে, কিন্তু সবগুলো সনেট যথার্থ রসরূপ এবং বাকসংযমের নিবিড়তায় সার্থক হ'য়ে উঠতে পারেনি। সনেটের প্রাণস্পন্দন গাঢ়বদ্ধতার রসসৃষ্টিতে। অনেকগুলি সনেটে মহাকাব্যিক লক্ষণ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে ব'লে সনেটের এই গুণটিকে বহু পরিমাণে নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু কল্পনার বিশালতার স্পর্শ একটি পৃথক রসাস্বাদও সঞ্চারিত করেছে। এই সনেট রচনার সময়েই দেখতে হবে, তিনি প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে লিরিক-মাধুর্যের এক অপরূপ সুর সংযোজন ক'রে রোমাণ্টিক ভাবাবহ দৃষ্টিতে বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে একটি সত্যকার আধুনিক গীতিকাব্যের যুগকে আবাহন জানিয়ে যাচ্ছেন। রোমাণ্টিক কল্পনা-কুশলতার দিক দিয়ে 'বঙ্গভাষা' 'তারা', 'ব্রজবৃত্তান্ত' 'নূতন বৎসর' প্রভৃতি সনেটগুলি একটি আশ্চর্য সুন্দর রসশ্রী লাভ করেছে। রোমাণ্টিক ভাবাকুলতাই গীতিকবিতার প্রধানতম সুর, এ-সত্যটি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; এই জন্যই চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি বহুক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে দেখা দিয়েছেন। অন্তরের গভীরতম উপলব্ধি এবং জীবন-পিপাসার সার্থকতম সম্মেলনেই মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে একটি মহৎ কাব্যরূপ দেখা দিয়েছে। দুই একটি সনেটে (যেমন 'নূতন বৎসর', 'বঙ্গভাষা' প্রভৃতি) রসপরিণতির আত্মস্থতাও অতি সুন্দরভাবে এসেছে। তাঁর কবিকল্পনার সবচেয়ে বড় মহত্ত্ব যদিও ক্লাসিক ভাবনার সমুন্নতিতে, তবুও এই দিক দিয়ে তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে রোমাণ্টিক গীতি কবিতারও পথিকৃৎ।

সনেটগুচ্ছ রচনার বেলাতেও অবশ্য তিনি বিদেশী কবিতার গঠন-রীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বাঙলা কাব্যদেহে একটি নূতন উজ্জ্বল ভূষণ পরিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর মাতৃভাষা কতটা সুমিষ্টতার অধিকারিণী তাও তিনি গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন এই সনেটগুচ্ছ রচনার সময়েই। তিনি একটি চিঠিতে বলেছিলেন,—'এর (বঙ্গ-ভাষা) মধ্যে একটি মহতী ভাষার উপাদান লুকিয়ে আছে',৬ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিস্পর্শে এর সমুন্নত রূপকেও দেখা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। মাতৃভাষার ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে তিনি নিজের প্রতিভাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই ইতালির কবি পেত্রার্কের অনুসরণে সনেট রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন, আমার বিনীত অভি-মত অনুযায়ী এই বলতে চাই যে, যদি যথার্থ প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা চর্চা করেন, তবে আমাদের বাঙলা ভাষার সনেট একদিন ইটালী দেশের সনেটের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়াবে।৭

(৬) Our Bengali is a very beautiful language, it only wants man of genious to polish it up. * * It is, or rather it has the elements of great language in it.

(৭) In my humble opinion, if cultivated by men of genious,our sonnet in time would rival the Italian.

কাব্যক্ষেত্রে তাঁর একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি সনেট সম্বন্ধে বলতে পেরেছিলেন এই কথাগুলি, আর কাব্যমহত্ত্বের একটি উৎসবমালা রচনা ক'রে গিয়েছেন বঙ্গ-ভারতীর মন্দির প্রাঙ্গণে। মধুসূদনের কাব্যমহত্ত্ব তাই বহু পরিমাণে নিজের কাব্যোপলব্ধির স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তার মধ্যে নিহিত। বক্তব্যের গাম্ভীর্য অনুযায়ী শব্দসৃষ্টি ক'রে ভাষাকে ঐশ্বর্যশালিনী ক'রে তোলা মহৎ কবিরই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মধুসূদন ঠিক সেই শ্রেণীর কবি। বাঙলা সনেট সত্যিই আজ যে-কোন দেশের যে-কোন শ্রেষ্ঠভাষার সনেটের পংক্তিতে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়াতে পারে। সনেটের মধ্যে তাঁর যে কাব্যমহত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে, তাতে আলোকরশ্মি সংযোজন করেছে তাঁর কবি-মানসের দেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি, দেশ-বিদেশের অবিস্মরণীয় প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা, এবং নিজ জাতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব।

জগৎ এবং জীবনের প্রতি মধুসূদনের যে-দৃষ্টি, সে হচ্ছে মহাকবির দৃষ্টি। ভাষাকে সত্যিকার ক্লাসিক মর্যাদায় ভূষিত করতে চেয়েছিলেন তিনি এবং সেইজন্যই উপমা প্রয়োগে এবং চিত্রকল্পের প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টতার দিক দিয়েও তিনি চিরদিনই ক্লাসিকধর্মী। কাব্যদেহ নির্মাণে তাঁর একটি ভাবগাম্ভীর্য আছে, মহাকাব্যিক রস-আবেদন সৃষ্টিতে সমুন্নতি আছে, কল্পনার বিশালতা আছে, ভাস্কর্যসুলভ সৌকর্যের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্যও প্রকটিত হয়েছে, এবং রোমান্টিক কবিসুলভ সংবেদনশীলতা থাকলেও ভাবাকুলতার যে সুদূরাভিসার তা' নেই : কাব্য কল্পনায় যেমন তিনি বিদেশীভাবের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারতীয় সংস্কারের এক শিল্পসুন্দর সমন্বয়-সাধন করেছেন, উপমা-প্রয়োগেও হোমারের প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারতীয় আদর্শকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। উপমানের বিস্তৃতির দ্বারা মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছেন; আবার বীরত্ব-ব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করার জন্য যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, দাবাগ্নিকে গ্রহণ করেছেন, তেমনি কখনো কখনো শিবের ললাটস্থিত অগ্নিকেও উপমান হিসেবে গ্রহণ ক'রে তাঁর অন্তরের ভারতীয় সংস্কারকেই জয়ী ক'রে তুলেছেন। উপমান শিল্পের এক অপরূপ প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাঁর কাব্যে।

নূতন একটি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেমন মহিমোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে বাঙলা কাব্যজগতে তাঁর স্রষ্টারূপে, তেমনি তাঁকে রসধর্মে কালোত্তীর্ণ করার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে তাঁর কাব্যমহত্ত্ব। মহৎ কাব্য দেশের লোককে নিজ অন্তরের গভীর সত্যকে নিবিয়ে দেয়, দেশের ঐতিহ্যকে চিরন্তনত্বের আদর্শে প্রতিষ্ঠা দিয়ে বিশ্বের দৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রে আনে; মধুসূদনের কাব্যমহত্ত্ব আমাদের বাঙলায় ঠিক তাই করেছে। তাঁর ভাবকল্পনা এবং তাঁর অংকিত প্রত্যেকটি চরিত্রই বাঙালী-হৃদয়ের গভীর আবেগ নিয়ে গড়া; চরিত্রগু'লিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেন অনেকটা বাঙালী হ'য়ে উঠেছে। তাই তাঁর কাব্যগুলি আমাদের চিরদিনকার প্রাণের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মহৎকাব্যের আধুনিকত্ব চিরকালের। মধুসূদনও বাঙলা সাহিত্যের দেউল-অঙ্গনে চিরদিনকার আধুনিক কবি।

চণ্ডালিনী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

হেথা উদাসীন শ্মশানে বসিয়া
কি হেরো গো তুমি চণ্ডালিনি ?
অঙ্গারে-ভরা ভয়াল প্রদেশে,
বিবাগিনী বেশে আলুথালু কেশে,
বিবিক্ত হাসি হাসিয়া কি শেষে
শ্মশানেশ্বরে ল'বে গো জিনি' ?
তাই ব'সে থাকো চণ্ডালিনি !

(২)

শ্মশান-বন্ধু খাটে-খাটিয়ায়
বহি' আনে শব শ্মশান-দেশে।
চিতায় চিতায় কাষ্ঠ সাজায়,
'হরি'-ধ্বনিতে আকাশ বাজায়,
বৈশ্বানরের লোল রসনায়
সঁপে দেয় দেহ হায় রে শেষে।

(৩)

ক্রন্দ-নরোল—'বল হরি'-বোল
অ-বাক্ শ্মশানে স-বাক্ করে।
ভস্মের ভারে, পোড়া অঙ্গারে
নির্ব্বেদময় দেখায় চিতারে ;
তুমি ব'সে একা তা'রই একধারে
প্রতীক্ষা করো কাহার তরে ?

(৪)

সে কি মহাশিব ? হেরিবারে তা'রে
তন্দ্রাও তব নয়নে নাই ?
মড়া-পোড়াবার জনতার ভিড়—
শ্মশান-বিষয়ে অন্ধ—বধির ;
দেহ নিয়ে তা'রা নিত্য অধীর ;
বোঝে না যে দেহ—চিতার ছাই।
পৃথিবী শ্মশান,—বোঝে না তো তা'রা—
শ্মশান ব্যতীত জীবনও নাই।

(৫)

বুঝি সবই বোঝো, এত তাই খোঁজো
চিতা-রহস্য সংগোপনে !
মুণ্ডমালিনী কালেশ্বরেরে
এ ভাবেই শুনি শুধু খুঁজে ফেরে ;
চণ্ডালিনি গো, তুমিও কি কেড়ে
নিতে চাও তা'রে জীবন-পণে ?

(৬)

শ্মশান-সুধার স্বাদ পেলে বুঝি !
শ্মশানে কি তাই নিয়েছ বাসা ?
চণ্ডালিনি গো, চিতা যত জ্বলে
দেহ-দাহ-করা বিলোল অনলে
মহাকালে বুঝি হেরো পলে পলে
চির-অপরূপ—মূর্ত্তি নাশা !

(৭)

শিখাও—শিখাও—মোরেও শিখাও
চিতার শিখায় পড়িতে পাঠ।
দেহ পুড়ে গেলে, বি-দেহ যা' থাকে—
চিনে নিতে দাও সেই আত্মাকে ;
সূতিকা-শিয়রে—চিতা-ফাঁকে ফাঁকে
লীলায় চলেছে তাহারই নাট।
চণ্ডালিনি গো, শিখাও আমারে
চিতার শিখায় পড়িতে পাঠ।

(৮)

চিতা শাশ্বত ;—জীবন সতত
সজ্ঞানে সেথা জ্বালাতে হবে।
পাবকে পুড়িলে যাহা ভঙ্গুর,
মোহ-মহামায়া সবই হবে দূর ;
শ্মশান-শিবের ডম্বরু-সুর
শ্রবণের দিনও আসিবে তবে।
—সজ্ঞানে সবই জ্বালাতে হবে।
সর্ব্ব সত্তা শ্মশানেশ্বর
সহজে তখন ল'বে গো জিনি'।
শ্মশান-পাগল করগো আমারে
নির্ব্বেদময়ী চণ্ডালিনি !

পদাঙ্ক

ফটো : চঞ্চল মিত্র

মধ্যমা
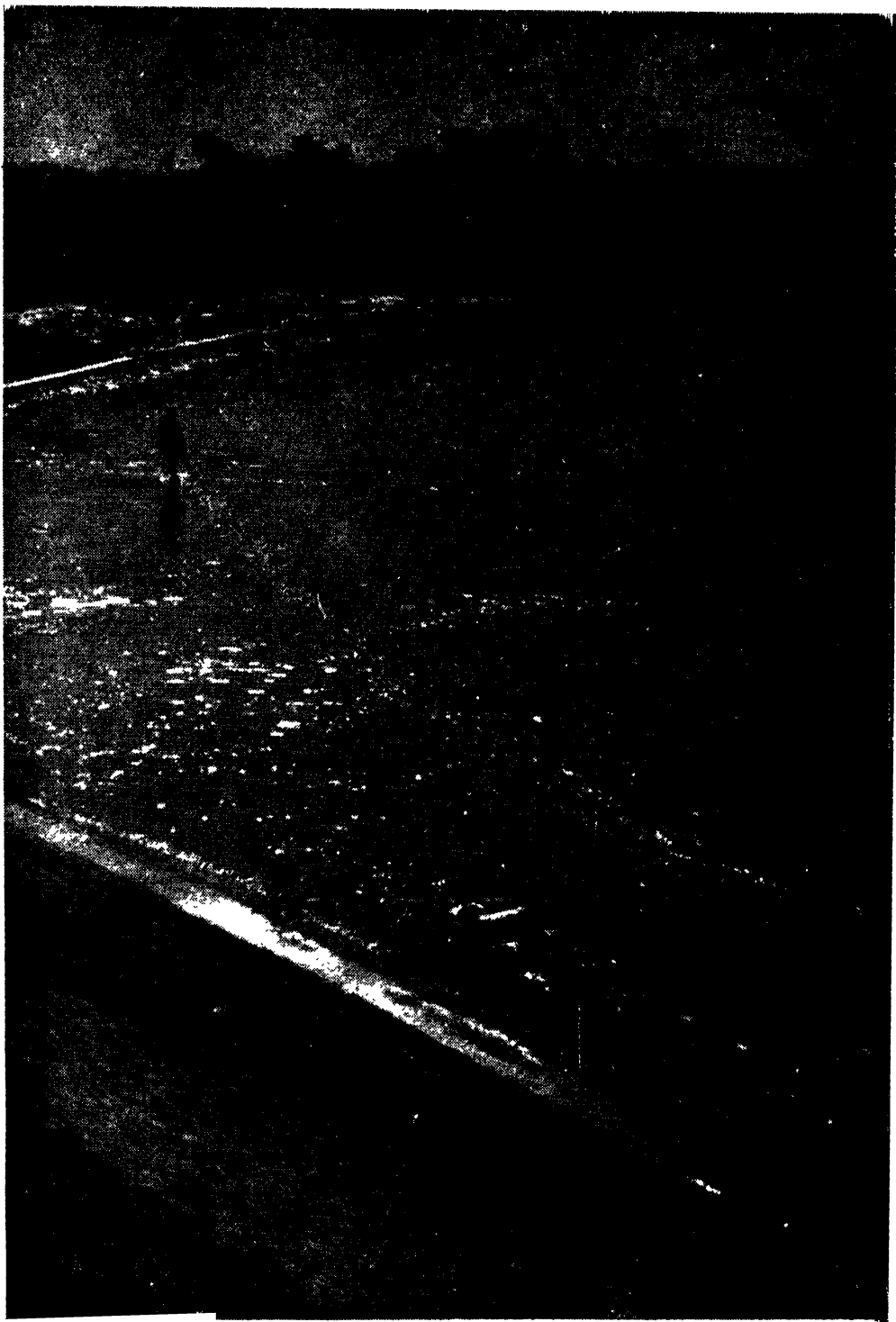
ফটো : প্রাণগোপাল পাল

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
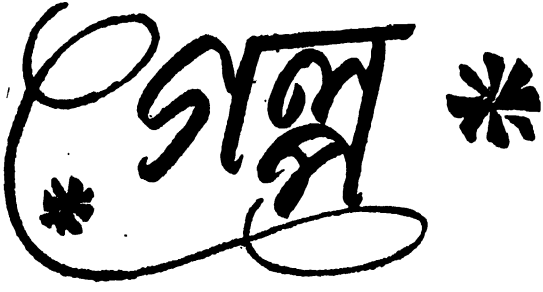
শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী

সহরের উপকণ্ঠে একটি চমৎকার ছোট্ট বাড়ী দেখে কেমন ইচ্ছে হলো—দেখি বাড়ীটি কেমন! এইরকম একখানি বাড়ীই আমার চাই। বৃদ্ধবয়সে জীবনের বাকী ক'টা দিন কাটানোর পক্ষে এইরকম পরিবেশই তো দরকার। মোটর থামিয়ে রাস্তা পার হ'য়ে একটি ছোট বাঁশের গেট ঠেলে গিয়ে দাঁড়ালুম একটি ছোট বাগানের মধ্যে। বাড়ী ও বাগান—দুইই নতুন। নানারকম বাহারী ফুলের চারা। দুটি কলমী আমগাছ, পেয়ারাগাছ আর কলাগাছ। একপাশে একটি কুয়ো।—বাঃ, বাড়ীটি সুন্দর বটে। কেমন এক শান্তির ভাব যেন বাড়ীটিকে ছেয়ে আছে। খানিক দ্বিধার পর এগিয়ে গিয়ে সম্মুখের দরজায় টোকা দিলুম। খানিক পরে এক যুবক দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এবং আমায় অভ্যর্থনা কোরে নিয়ে গিয়ে ঘরের মেঝেয় আসন পেতে বসালো। ঘরখানি ধূপ আর বেল-ফুলের গন্ধে ভরা—কোনো খ'নে কোনো জিনিষ নেই—কেবল দেওয়ালে দুটি বড়োবড়ো ছবি। সে বললে—তার স্বর্গগত বাবা মার ছবি।

আমাদের আলাপ গভীর হতে দেরী হলো না—জানতে পারলুম বিমল অর্থাৎ যুবকটি সংসারে সম্পূর্ণ একা। তার একমাত্র সম্বল এই বাড়ীটি ছেড়ে কিছুদিন বাইরে থাকতে চায়—তবে কোথায় পাবে তেমন এক জনকে যে ঠিক তার মতোই যত্নে রাখবে বাড়ীটি।

আমিও যে বাড়ীর সন্ধানে আছি, আর এই ছোট্ট চমৎকার বাড়ীখানির টানেই যে আমি হাজির হয়েছি—তা কথায় কথায় বিমলের অজানা রইলো না। বিমল খুবই আন্তরিকভাবে বললে—'আমি' একান্ত সুখী ও নিশ্চিন্ত হবো যদি আপনি আমার বাড়ীটির ভার নেন। টাকার জন্যে আমি মোটেই ভাবছি না—ভাবছি যোগ্য মানুষের জন্যে—যার হাতে আমার এই পরম প্রিয় নীড়টি সঁপে দিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে পারি।—তারপর আমি ফিরে এলেও আপনার জায়গার অভাব হবে না।'

'তোমার এমন ইচ্ছে কেন হলো?' অবাক হয়ে বলি।

'সে কথা পরে জানতে পারবেন।'

যাই হোক বিমলের আন্তরিক অনুরোধ আর আমার ঐ শান্তির নীড় থাকার প্রলোভনে তার কথামত কদিন পর জিনিষ পত্র সমেত চলে এলাম 'স্নেহ-নীড়' এ। পরদিন বিমল তীর্থযাত্রায় বার হয়ে পড়লো—আমার হাতে দিয়ে গেলো একখানি পুরানো খাতা, বললে—'আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন এতে।'

* * 'পেছন হ'তে দেখলে দেখাবে দুটি মাথা—প্রায় ঠেকে আছে। একটি আমার আর অন্যটি আমার মার। আমরা প্রায়ই বসে কাগজ নিয়ে বাড়ীর নক্সা আঁকি। ছোট্ট একটি ছবির মতো বাড়ী হবে। সামনে একটুখানি জমিতে ফুলবাগান—চাঁপা, টগর, বাঁধানো বকুল-তলা থাকবে—একটি গোলাপঝাড় তো অবশ্যই থাকবে। ফলের মধ্যে পেঁপে, পেয়ারা, লেবু আরও কতো কি গাছ থাকবে। আমাদের মধ্যে প্রায়ই এই নিয়ে মতান্তর হয়ে যায়। আমি এখন হ'তেই আমাদের স্কুলের মালীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছি ও হরেক রকম গাছের চারা আর বীজ যোগাড় করতে পারবো মনে করি। কিন্তু অতো রকম গাছগাছড়ায় ছোট জমিটা জঙ্গল করতে মা চান না। সাপ-খোপের ভয় হবে—পাতা পড়ে পড়ে নোংরা হবে। যে সব গাছ নিয়ে আমাদের কোনও ঝগড়া নেই—তাদের কোথায় লাগাতে হবে তা নিয়েও কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ মনের মিল হয়নি। মা হতাশ করুণ সুরে বলেন,—'না বিলু, তুই কিছুই বুঝিস না—ওদিকে একটা মস্ত ঝাঁকড়া মাথা বকুল গাছ উঠলে অন্য ফুলে আর শাক

সব্জী রোদ না পেয়ে মিইয়ে যাবে।'—আমি আমার কথাটা বোঝাতে থাকি। নক্সার ওপর লাল পেন্সিল দিয়ে আঁকজোক করি, আর বলি—'মা' একটু ভেবে ত্যাখো—জমীটা ন্যাড়া কোরে রাখলে কিরকম দেখাবে বলো তো।'

দুটো পাকা ঘর হলেই চলবে। টিনের চালের রান্না আর স্নানের ঘর।. সামনে কুয়ো। আমি রোজ বালতী-বালতী জল তুলবো। সংসারের যা প্রয়োজন তা ছাড়াও বাগানের সব জল আমি একাই তুলবো। ভাড়া বাড়ীতে সকাল থেকে পাশের বাড়ীর বাসন মাজার শব্দে আর উনুনের ধোঁয়ায় আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাড়ীতে একটুও আলো-বাতাস পাইনা। তার ওপর বাড়ীয়ালা কলের জল নিয়ে নিতাই অশান্তি ক'রে। সুতরাং আমি আর মা প্রায়ই নিজেদের একটি মনের মতো বাড়ীর স্বপ্ন দেখি। ছোটো একটি বাড়ী, সহর থেকে একটু দূরে গ্রামাঞ্চলে—এমন কি খরচ পড়বে? আমি গ্রামের স্কুলে পড়তে রাজি। নিজেদের বাড়ী, ফাঁকা জায়গা—এর একটা আকর্ষণ আছে আমার কাছে।

—'কতো খরচ পড়বে গো?' মা বাবার দিকে আশা—ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন। বাবা নক্সা দেখে একটু ভেবে বলেন,—'এই হাজার চারেক তো পড়বেই।' মা বলেন,—'আমার গয়না আছে হাজার দেড়েকের—বাকীটা তুমি অফিস হ'তে ধার পেতে পারো না?' আমি বাবার দিকে গোল গোল চোখ কোরে চেয়ে থাকি। বাবা একটু চুপ কোরে থেকে বলেন,—'ধার শুধবে কি কোরে? সুদও আছে।' আমরা বলি,—'খুব টেনে চালাবো। বাগানে শাক-সব্জী হবে—কেবল চাল ডাল মশলা কিনলেই হবে।' বাবা হেসে বলেন, 'আমার অফিস যাবার খরচ বেড়ে যাবে যে।' আমরা ভড়কে যাই। বাবা তখন সাহস দিয়ে বলেন,—'ত্যাখোনা—দু এক বছরের মধ্যে অবস্থার উন্নতিও হ'তে পারে।'

অবস্থার উন্নতির বদলে অবনতিই হলো। মার হঠাৎ অসুখ হলো ভয়ানক রকমের। ডাক্তারে ওষুধে যথাসর্বস্ব গেলো ও দেনাও প্রচুর হয়ে গেলো। শেষের কদিন মা আমায় বলতেন,—'বিলু, আমাদের আর নিজের বাড়ী হলো না রে।...আমিই সব নষ্ট কোরে দিলুম—কি রোগই যে ধরলো।...তোর বাবার এই কষ্ট। তুই মানুষ হোস্ তো আগেই বাড়ী করবি, আর বাবাকে সেই বাড়ীতে রাখবি।'

এ আজ প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। আজ বাবা ও মা কেউ নেই। বাবার জীবনবীমাটি জানি না সেই দুর্দিনে কি কোরে টিকে গিয়েছিল। সেই টাকাতেই লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ালুম—আর বাকী টাকায় এই বাড়ীটি করলুম মায়ের নক্সা অনুযায়ী, আর তাঁর নামেই বাড়ীর নাম রাখলুম—'স্নেহনীড়'।

—প্রায় এক বছর হ'তে চললো একা এখানে বাস করছি। এখন আর পারছি না। চিরকাল বাবা মা সহরের সেই দো গলির ঘিঞ্জি ছোট্ট বাড়ীতে কি কষ্ট কোরেই কাটিয়েছেন। তবু বাড়ীটি প্রাণপণ কোরে তৈরী করালুম মায়ের আত্মার শান্তির জন্য। বাবাও অল্পদিন পরেই মায়ের কাছে চলে গেলেন—আমার বাড়ীতে তাঁর থাকা হয়নি। এ বাড়ী কি তাঁরা দেখছেন কোথাও থেকে?—এই প্রশ্নই আজ সঙ্গী আমার তীর্থ-যাত্রাপথে।'

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

"ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী
গরজে সিন্ধু চলিছে তরণী।" দ্বিজেন্দ্রলাল।

প্রায় ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে সাগর সন্নিকটে, বরিশালের বিশাল তরঙ্গাকুল নদীবক্ষে, রাত্রিকালে তণ্ডুলপূর্ণ একখানা নৌকা অনুকূল বায়ু ও স্রোতে তীরবেগে ছুটিতেছিল। তরণীর একমাত্র আরোহী একজন তরুণ স্বেচ্ছাসেবক। হঠাৎ একদল জলদস্যু নৌকা আক্রমণ করিল। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দশকে বরিশালের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে অসংখ্য নদীনালায় দিবাভাগেও ডাকাতের দল নৌকা আক্রমণ করিয়া, আরোহীদের হত্যা করিয়া, অর্থ ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত। তখন সেখানে জলে কুমীর ও ডাকাত, এবং ডাঙ্গায় বাঘ ও সাপ একসঙ্গে বাস ও বিচরণ করিত।

ডাকাতের অতর্কিত আক্রমণে নৌকারোহী যুবক কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া দস্যুদের উদ্দেশে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"এ বাবুর নৌকা।" অবস্থা বিশেষে মানুষ হিংস্র জন্তু মাত্র। কিন্তু নির্ভীক যুবকের মুখে 'বাবু' নাম উচ্চারণে ডাকাত দল মন্ত্রমুগ্ধ এবং মুহূর্ত্তমধ্যে শান্ত হইল এবং যুবকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া দস্যুদলপতি নিবেদন করিল "এই আকালের সময় নদীভর ডাকাত নামিয়াছে। আমরা বাবুর নৌকা পাহারা দিয়া আপনার গন্তব্যস্থল পর্য্যন্ত যাইব এবং বাবুর নৌকা অপর কোন দস্যুদলের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিব।

প্রত্যুষে নৌকা নদীতীরে সংলগ্ন হইলে যুবক বলিলেন যে তাঁহার গন্তব্যস্থল অদূরবর্ত্তী একটি গ্রামের ত্রাণকেন্দ্র এবং সেখানে স্থলপথে চাউলের বস্তা পৌছাইতে হইবে। ডাকাতেরা স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে বস্তা বোঝাই চাউল স্কন্ধে বহন করিয়া ত্রাণকেন্দ্রে পৌছাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ কালে "বাবুর" উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

উপর্যুক্ত ঘটনা বাংলা ১৩১৩ সালের। তখন বরিশালে দারুণ দুর্ভিক্ষ। যে "বাবুর" নামে ডাকাত দল চাউল লুণ্ঠনকারী ও ভক্ষক না হইয়া রক্ষক হইয়াছিল তিনি—"অশ্বিনীবাবু"—বরিশালের মুকুটহীন রাজা, দেশসেবক, নিখিল ভারতের সর্বজনবরেণ্য নেতা, পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমার দত্ত। তৎকালে 'বাবু' নাম শুনিলে বরিশাল জিলায় সর্বত্র যে কোন লোকের চিত্তদর্পণে অশ্বিনীবাবুর প্রেমঘন মূর্ত্তিই প্রতিভাত হইত এবং স্বতঃই তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত হইত। নৌকারোহী তরুণ স্বেচ্ছা-সেবকের নাম ডাঃ নিশিকান্ত বসু।

বরিশালপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের প্রভাব ছিল অপরিসীম। স্বদেশী যুগে তাঁহার নির্দ্দেশে বরিশাল জিলার ৫২টি আবগারী সুরা বিপণির ৫১টিই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সালিশীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেন। ফলে গ্রামে গ্রামে জাতীয়বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার ও সালিশী সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। সরকারী বিচারালয়ের মোকদ্দমাসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অনেকগুলি কোর্ট বা আদালত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সর্বোপরি তাঁহার বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। তখন বিলাতী লবণ দেশের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। অশ্বিনীবাবুর নির্দ্দেশে হাট বাজারে বিলাতী লবণ বিক্রয় নিষিদ্ধ হয় এবং ক্রেতৃগণ বিলাতী লবণ দেখিলেই নদী নালায় ফেলিয়া দিতেন। অনেকগুলি হাট বাজারের মালিক ছিলেন প্রতাপান্বিত ঢাকার নবাব বাহাদুর। তিনি হুকুম জারি করিলেন, তাঁহার জমিদারী এলাকার হাট বাজারে লবণ বিক্রয় বাধ্যতামূলক। কিন্তু তাঁহারই মুসলমান প্রজাবৃন্দ প্রতিবাদ ঘোষণা করিলেন—

"বাবুর হুকুমে লবণ নিষিদ্ধ হইয়াছে; তিনি দুর্ভিক্ষে সকলকে অন্নদান করেন এবং রোগীদের চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত করিয়া পথ্য দিয়া নিরাময় করেন ও বাঁচাইয়া রাখেন—সুতরাং কেবলমাত্র খাজনা আদায়কারক ভূম্যধিকারীর আদেশ অমান্য করা অপরাধ নহে, কিন্তু "বাবুর আদেশ সর্ব্বথা শিরোধার্য্য।" সর্বত্র লবণের কারবার বন্ধ হইল। সরকার এবং জমিদার উভয় পক্ষ পরাস্ত হইলেন। ১৯০৪—০৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ইংলণ্ড হইতে ২,৫৮,২৭০ মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল। পর বৎসর মাত্র ৮১,৪৪৪ মণ আমদানী হয়, কিন্তু তাহাও অবিক্রীত অবস্থায় নদী নালায় নিক্ষিপ্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ লবণ সরবরাহ ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কেবলমাত্র তমলুক নিমক এজেন্সীতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ৯৮১,৮৩৫৴ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল। বাংলার লবণ শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আজ পর্যান্তও বাংলার লবণ শিল্পের আংশিক পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নাই। অথচ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে কুটীরশিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুত হইলে সমগ্র দেশের চাহিদা পূরণ হইতে পারে। ১৯০৫ ৬ সালে বিলাত হইতে লৌহজাত দ্রব্যের আমদানী ৮৬ লক্ষ টাকা কমিয়া যায়। বিলাতী চিনি লোপ পাইয়া দেশীয় গুড় চিনির স্থান অধিকার করে। স্বয়ং জিলা শাসকের চা প্রস্তুতির জন্য চিনি সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। সালিশী সংস্থাগুলি এতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল যে পূর্ব্ববঙ্গ আসামের লাট ফুলার সাহেব এই সংস্থাগুলিকে ফরাসী ও মার্কিণ বিপ্লব যুগের 'কমিটি অব্ পাবলিক সেফ্টি' সংস্থার ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ এবং সম্পূর্ণ বিপজ্জনক মনে করিতেন এবং এগুলিকে নিষিদ্ধ ও ধ্বংস করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত লাটসাহেব যখন পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার ১৪।৮।১৯০৬ তারিখের লিখিত পত্রে অশ্বিনীকুমারের সততা, দেশপ্রীতি, স্বার্থত্যাগ ও মহচ্চরিত্রের অজস্র প্রশংসা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন যে তিনি বৃটিশ সরকারের সহযোগিতা করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। বলা বাহুল্য, অশ্বিনীকুমারের পক্ষে এই অযাচিত উপদেশ পালন করা সম্ভব হয় নাই। ফুলার সাহেবের পদত্যাগের পর বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী আন্দোলন এত সাফল্যমণ্ডিত হয় যে বৃটিশ আইন সভায় বরিশাল সম্বন্ধে আলোচনার সময় ভারত-সচিব এবং পার্লামেণ্ট বরিশাল সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করেন। লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকায় অশ্বিনীবাবুর একচ্ছত্র আধিপত্য ও তথাকথিত স্বেচ্ছাচারের ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়। তাঁহার নির্দ্দেশ সামান্যরূপেও অমান্য করার শক্তি কাহারও ছিল না। কেহ করিলে সমাজচ্যুত হইতেন। জেলাশাসকের ভৃত্যদের জিনিসপত্র ক্রয় করিবার স্বাধীনতা ছিলনা। এই প্রকার অনেক খবর বিলাতের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অবশেষে ভারত-সচিব মর্লিসাহেব অনিচ্ছাস্বত্বেও মহা প্রাজ্ঞ, ধীমান, দেশ-সেবক, অশ্বিনীবাবুকে ভারতসরকারের সুপারিসক্রমে ১৮১৮ সালের ৩ আইনে ধৃত ও অন্তরীণ করার প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে বাধ্য হন।

১৯০৮ সালে অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ কারাগারে নির্ব্বাসিত হইলেন। যুক্তপ্রদেশের লাটসাহেব ও তাহার অধীনস্থ বড় বড় কর্ম্মচারীরা অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় আলাপ করিতেন। স্বয়ং লাট সাহেব এ বিষয় প্রশ্ন করিলে অশ্বিনীবাবু জেলখানায় তাঁহার বাসগৃহের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণের প্রান্তে অবস্থিত একটি পুরাতন পায়খানা ও তৎসংলগ্ন একটি নিম্ববৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লাট সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "পায়খানা সরাইয়া নিম্ববৃক্ষমূলে একটী বেদী নির্ম্মিত হইলে সুশোভন হয়।" পরদিনই পায়খানা ভূমিসাৎ হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যে নিম্ববৃক্ষমূলে একটি সুন্দর বেদী নির্ম্মিত হয়। অশ্বিনীকুমার বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ শীতকালে তাঁহার ব্যবহারের জন্য বেনারসী সাড়ির পাড় সংগ্রহ করিয়া জোড়া দিয়া লেপ তৈরী করিয়াছেন। উচ্চতম বৃটিশ রাজপুরুষগণ স্বেচ্ছাচারী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে মহানুভবব্যক্তির আবির্ভাব দেখা যাইত। তাঁহারা প্রকৃত দেশভক্ত নেতাদের অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন।

অশ্বিনীকুমারের প্রধান কীর্ত্তি ব্রজমোহন বিদ্যালয়। শিক্ষাব্রতী হিসাবে বাংলাদেশে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজ সত্য, প্রেম, পবিত্রতা

বাণী ও পতাকা গ্রহণ করিয়া প্রকৃত মানুষ তৈরী করিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের এক বিশিষ্ট পরিচয় আদর্শ স্কুলশিক্ষকরূপে। তাই ভগিনী নিবেদিতা দুর্ভিক্ষ সময়ে অশ্বিনীকুমার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ত্রাণকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া সোৎসাহে বলিয়াছিলেন—"স্কুলমাষ্টার অত্যুত্তম ও বিস্ময়কর সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং সেবা ও ত্রাণব্রত গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করিয়াছেন।" প্রাক্ স্বদেশী যুগ পর্য্যন্ত শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে অশ্বিনীবাবুর স্কুল ও কলেজের অকুণ্ঠিত প্রশংসার উল্লেখ দেখা যায়। রাজধানীর প্রেসিডেন্সী কলেজের সমকক্ষ শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে ব্রজমোহন কলেজের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের শিক্ষা প্রভাবে ছাত্রদের নৈতিক মান এত উন্নত হইয়াছিল যে পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করার প্রয়োজন ছিল না। ছাত্রগণ ছাপাখানা হইতে প্রশ্নপত্র আহরণ করিয়া শিক্ষকদের হস্তে প্রদান করিতেন।

বরিশালবাসী অশ্বিনীকুমারকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, নিঃসন্তান অশ্বিনীকুমারকে রোপিত বৃক্ষের প্রথম ফলটি উৎসর্গ করা হইত। তিনি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। তন্মধ্যে বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, উর্দ্দু, আরবী, পারসী, পালি, মারাঠী, হিন্দি ও গুরুমুখী ভাষায় তাহার রীতিমত পাণ্ডিত্য ছিল। এতদ্ব্যতীত তেলেগু, উড়িয়া, ফরাসী ও লাতিন ভাষায়ও অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভক্তিযোগ গ্রন্থের দেশেবিদেশে বহুল প্রচার হইয়াছে। তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা ভক্তিযোগ গ্রন্থেরও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

আনন্দময় পুরুষ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ১৯২৩ সালের দিপালীর সন্ধ্যায় অনবরত হাততালি দিয়া ভগবন্নাম স্মরণ করিতে করিতে আনন্দসাগরে চিরতরে মিলিয়া গেলেন। সমস্যাসঙ্কুল বঙ্গদেশে বিশেষতঃ বর্ত্তমানের শিক্ষা সঙ্কট সময়ে পূতঃচরিত্র এবং আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তাঁহার কর্ম্মপন্থা সার্থক পরিকল্পনা ও কার্য্যাবলী যত অধিক আলোচিত হইবে এবং আদর্শরূপে গৃহীত হইবে, ততই দেশের কল্যাণ সাধনের পথ প্রশস্ত ও সুগম হইবে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অশ্বিনীবাবুর ঘটনাবহুল বিরাট জীবনের কোন ইতিবৃত্ত লেখা সম্ভব নহে। তাঁহার মহাপ্রয়াণের তিথি উপলক্ষে, তাই তাঁহাকে ভক্তিভরে স্মরণ করিয়া এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের প্রয়াস। তাঁহার জীবনই "সত্যমেব জয়তে"—মহাবাণীর অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

ঐ শিখা

মসৃউদ আর-রহমান

অই শিখা জ্বলে নেভে বার বার সভ্যতার ঘরে
স্থির হয়ে, কেঁপে কেঁপে। পৃথিবীকে কতবার আলো
দিল আর নিভে গেল ; সব আলো নিঃশেষে ফুরালো !
তবু অই শিখা ফের জ্'লে ওঠে আশার উপরে।
অই শিখা কোন রাতে নীলনদ-সিন্ধু-গঙ্গা তীরে
অ্যাসিরিয়া-গ্রীস-রোমে জ্বলেছিল। তবুও ত কালো
সর্বনাশা ঝড় বয়ে বয়ে এনে ও'শিখা নিভালো
অ্যাটিলারা, চেঙ্গিসেরা ; অন্ধকার ঘরে এল ফিরে।
ঝড়ের বাহক যা'রা, তা'রা আসে, কালের অতলে
কালো হয়ে ডুবে যায়। বুদ্ধ-যিশু-মহম্মদ কেন
আলো হয়ে রয়ে যায় ?—রক্তের প্রদীপে লাল শিখা
জেলে দেয় ভালোবেসে ; তাই বুঝি কালোর কবলে
কেউ ওরা যায় না'ক। আলোর দূতেরা এসে যেন
খুঁড়ে যায় পৃথিবীতে কল্যাণের গভীর পরিখা।

খজুরাহের স্মৃতি

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

রিক্‌শওয়ালা ছেলেটি নিবিষ্ট মনে, একের পর এক, পাতা উল্‌টে যাচ্ছিল।···আমাকে ফিরতে দেখেই তাড়াতাড়ি বইটা মুড়ে রাখল।

বইখানা আর রেলের টাইম্‌-টেবল্‌টা ওর জিম্মায় রেখে, একটা দোকানে খেতে ঢুকেছিলাম।

একটু বিরক্তির সঙ্গেই ব'ললাম—'ক্যা, তুম্‌ য়হ পঢ় সকতে হো?' (তুমি কি এটা পড়তে পার?)

ছেলেটি মাথা নেড়ে জানাল—না।

—'তো ক্যা ফোটো ঢুঁড় রহে থে? (তবে কি ছবি খুঁজছিলে?)···অগর য়হ কৌন ভাষা কী পুস্তক মা'লুম হোতা, তো সমঝ জাতা কী, য়হ ফিল্মি নহীঁ।' (বইটার ভাষা জানা থাকলে বুঝতে যে, এটা সিনেমা পত্রিকা নয়।) মাথা নীচু করে, গুম হয়ে, ছেলেটি কিছুক্ষণ বইটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

হঠাৎ, তার চোখ হ'তে দু' ফোঁটা জল, বইয়ের মলাটের ওপর গড়িয়ে প'ড়ল।

—'ক্যোঁ, ক্যা বাত হো গয়া?' (কি হ'ল?) প্রশ্ন ক'রলাম। তাড়াতাড়ি নিজের শার্টের খুঁট দিয়ে মলাটের জলটা মুছে সে ব'লল—'জানি বাবু এটা বাঙ্গলা ভাষার বই। লেখা চিনি, কিন্তু আমি বাঙ্গলা পড়তে পারি না। হিন্দী প'ড়তে শিখেছি।'

ব'ললাম—'তুমি তো বেশ বাঙ্গলা বলতে পার দেখছি!'

ছেলেটি উত্তর দিল—'আমি তো বাঙ্গালী, তাই বল্‌তে পারি।'

—'তুমি বাঙ্গালী!'

—'হ্যাঁ বাবু। আমরা রিফিউজী। আরও অনেক রিফিউজী আছে। এখানে বেশীর ভাগ রিক্‌শাওলাই বাঙ্গালী। সবাই আমরা রিফিউজী।···আমার বাবা দেশের কথা বলতো, বাঙ্গলা বই পড়তে পা'রত। বাবা মরে গেল, তাই এখন রিক্‌শা চালাই।··বাঙ্গলা দেশ অনেক দূরে,···খুব সুন্দর দেখতে, না? বাঙ্গলা বইয়ে খুব ভাল ভাল কথা থাকে, তাই না?'

গলার স্বর বেরোতে চাইছিল না। কোনও রকমে ব'ললাম—'হুঁ।'

ছেলেটির চোখ দু'টিতে জল চিকচিক করে উঠল, মুখে খেলে গেল হাসির ঝিলিক।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম—'তোমার নাম কি?'

—'হরি।'

রাজনৈতিক প্রয়োজনেই হ'ক, অবশ্যম্ভাবী কারণেই হ'ক, আর অদৃষ্ট গুণেই হ'ক, এরা বাস্তু হ'তে উৎপাটিত। এই ছিন্নমূল তরুদের যত ভাল মাটিতেই রোপনের আয়োজন হয়ে থাকুক না কেন, এদের মূল রয়ে গেছে বাঙ্গলারই মাটিতে। দেশ বিভাগের সময় যে ছিল এক বছরের শিশু হরি, সেও তাই আজ জানতে চাইছে, তার বাপ-ঠাকুরদা'র আবাস ভূমির কথা।···তার মাতৃভাষার জ্ঞান ভাণ্ডারে কি সম্পদ সঞ্চিত আছে, আর তা' থেকে সে কতটা বঞ্চিত তাই ভেবে কাঁদছে!

পেটের ক্ষুধা মেটানোর মত পুনর্ব্বাসন তার হয়েছে,—কিন্তু মনের ঐ ক্ষুধার?

সে ক্ষুধা কে মেটাতে পারে?

বোধহয় একমাত্র বাঙ্গলারই মাটি।···

বাঙ্গলার হরি কি আবার কোনও দিন বাঙ্গলার মাটিতে ফিরে আসবে? বাঙ্গলা দেশ কি আবার হরিদের ফিরে পাবে?

ঘটনাটার স্থান,—পান্নার বাস্‌ স্ট্যাণ্ড। সাতনা থেকে খজুরাহ যাওয়ার পথে পান্না, পূর্ব্বতন বিন্ধ্যপ্রদেশের একটি করদ রাজ্য। এখানে বাস্‌ প্রায় আধঘণ্টা থামে। তাই নেমে পড়েছিলাম। আর তখনই ওই কাণ্ড।

এর পর পথে প'ড়ল বারণবাবার স্থান। একটি বেদী

কাণ্ডারীয়া শিব মন্দির

বাঁধা গাছতলা। এখানে এক সাধু-পুরুষ ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে স্থানটির নামকরণ হয়েছে।

এ পথে গেলে প্রত্যেক গাড়ীর ড্রাইভার বেদীটিতে একটি নারকেল ভেঙ্গে অর্ঘ্য দিয়ে যায়। এটি অবশ্য কর্ত্তব্য। যে তা' না করে তা'র গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়ে,—এরূপ একটা প্রবাদ আছে।
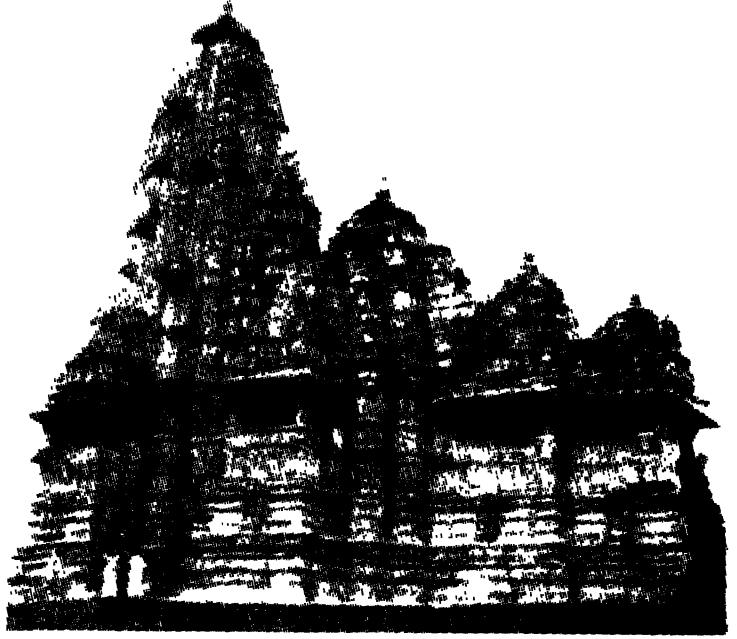
বেলা সাড়ে বারোটায় খজুরাহতে পৌছলাম। সাতনা হ'তে খজুরাহ, প্রায় ৭২ মাইল পথ।

খজুরাহের দর্শনীয় বলতে কতকগুলি মন্দির।···মোট পচাশীটি মন্দির ছিল,যার মধ্যে মাত্র কুড়িটির অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে।

সব মন্দিরই খৃষ্টীয় দশম হ'তে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হয়েছিল।

চৌসট যোগিনীর মন্দিরটিই সর্ব্বপ্রাচীন। দেবী দুর্গার চৌষট্টি সখীকে চৌষট্টি যোগিনী বলা হয়। ঐ যোগিনীদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলেই 'চৌসট-যোগিনী' নামকরণ হয়েছে। মন্দিরটির নির্ম্মাণকাল আনুমানিক ৯০০ খৃষ্টাব্দ।

কণ্টক নিষ্কাশন

মাতৃশক্তির উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য মন্দিরটি জগদম্বার।

অধিষ্ঠাত্রী দেবী মূর্ত্তিটির রং কাল হওয়ায়, স্থানীয় অধিবাসীরা এটিকে কালী বলে মনে করেন। আসলে কিন্তু ওটি পার্ব্বতী। [পার্ব্বতী প্রথমে কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। পরে তপশ্চর্য্যার ফলে বিদ্যুদ্বর্ণা গৌরাঙ্গী হ'ন।]

চতুর্ভুজ বা রামচন্দ্র মন্দিরটি অপূর্ব্ব দর্শন। একটি শিলালিপি হ'তে জানা গেছে যে, মন্দিরটি রাজা যশোবর্ম্মণ দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

খজুরাহের সবচেয়ে বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য, সুবিশাল কাণ্ডারীয়া শিব মন্দির। মনে হয়, এর সঠিক নাম কাণ্ডারী-শিব মন্দির।

হিন্দীভাষীদের গ্রাম্য উচ্চারণ ভঙ্গীতে হরিকে হরিয়া, মতিকে মতিয়া, কানাইকে কানাইয়া বলার মতই 'কাণ্ডারী' হয়তো কাণ্ডারীয়া হয়েছে। (পরমেশ্বর শিবের নামের সঙ্গে পারের কাণ্ডারী, ভবতারণ ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত হ'তে দেখা যায়।) এই মন্দিরটির আকর্ষণীয় বিষয়, এর অঙ্গসজ্জা। মন্দিরটির গায়ে অলঙ্করণী হিসাবে যে মূর্ত্তি-গুলি আছে তাদের সংখ্যা প্রায় ৮৭৫টি।

বংশী বাদিকা

অঙ্গ ধৌতি

খজুরাহের বাকী মন্দিরগুলির মধ্যে বিশ্বনাথ মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য।

রাজা যশোবর্ম্মণের পুত্র ধঙ্গ, মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেছিলেন। তিনি 'মরকতেশ্বর' নামে, পান্না বা মরকতমণির তৈরী, যে লিঙ্গ-মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি বহুকাল পূর্ব্বেই অন্তহিত, অর্থাৎ অপহৃত হয়েছে।

কাণ্ডারীয়া-শিব, জগদম্বা ও অন্যান্য কয়েকটি মন্দিরে, বৃষস্কন্ধ পুরুষ মূর্ত্তি ও তাদের যুগল বা পার্শ্ববর্ত্তিনী স্ত্রীমূর্ত্তিগুলির দেহবল্লরী, নির্ম্মাতাদের অত্যুচ্চ ছন্দবোধের পরিচয় দিচ্ছে।

কতকগুলি নারী মূর্ত্তির ক'টিদেশে পাক দেওয়া এক ভঙ্গিমার সাহায্যে, নিম্ন ও উর্দ্ধ উভয় অঙ্গের সৌষ্ঠব যে ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে তা' রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতুলনীয়। শান্ত, বীভৎস, ভয়ানক, বীর, অদ্ভুত, করুণ, হাস্য এবং আদি রসের, অর্থাৎ সকল রসের চিত্রণ, স্থান পেয়েছে মন্দিরের গায়ে। সংশ্লিষ্ট ভাস্কররা যেন মন্দিরগুলির অঙ্গসজ্জার ভিতর দিয়ে, মানব জীবনের রূপ, রস ও ছন্দ সম্ভারের মহোৎসব করে গেছেন।

পৌরুষদৃপ্ত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

অধ্যাপক অজয়কুমার ঘোষ

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার অন্তরালে তাঁর কাব্যপ্রতিভা অনেকখানি আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের একাধিক ক্ষেত্র তাঁর কৃতিত্বে ভাস্বর এবং নতুন সৃষ্টিতে উর্বর। তিনি কবি, নাট্যকার, হাসির গান ও দেশ-প্রেমাত্মক গানের রচয়িতা। এসব বিষয়ে তিনি অ-পূর্বপ্রভাবিত। এদের টেকনিক তাঁর সম্পূর্ণ স্বকীয়। তাঁর কাব্যের ভাষা, ছন্দ, বিষয়বস্তু ও দৃক্‌ভঙ্গিও অনন্যপরতন্ত্র। এসব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। কেউ কেউ সে আলোচনা করেওছেন। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গ সে আলোচনার বাইরে। আলোচ্য নিবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত ও কাব্যগত চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে গ্রহণ করা হয়েছে। তা' এই প্রবন্ধের শিরোনামেও সঙ্কেতিত। অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের ও কাব্যের অন্যতম লক্ষ্য ও লক্ষণ এদের ঋজু, শুভ্র অনমনীয় পৌরুষ। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে একটা পৌরুষদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যে, নাটকে ও গানের পশ্চাতে যে কণ্ঠস্বর শুনি—সেটি পুরুষকণ্ঠ।

আজ বাঙালী জীবনের সর্বব্যাপী কাপুরুষতা ও নির্বীর্যতার দিনে পৌরুষের উদ্গাতা দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশে আমাদের বিনত চিত্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কাছ থেকে ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

বিলেত প্রত্যাগত তরুণ দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাঙালী সমাজের চারদিকের হীনতা, মূঢ়তা ও অনাচারে আক্রান্ত হ'লেন তখন তাঁর মধ্যে ব্যাহত ব্যক্তিত্ব বিদ্রোহের রূপ ধ'রে গর্জে উঠল, ফুঁসে উঠ্‌ল। সেই ঝাঁঝ ফুটে উঠেছে 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'এক ঘরে' নামে অপরিণত যুগের সাহিত্য গুণহীন দু'টি রচনায় আর সেই তেজের ঘনীভূত ও শিল্পমহিম রূপ দেখতে পাই তাঁর ব্যঙ্গমূলক অজস্র হাসির গানে, নাটকে, দেশাত্মবোধক গানে ও অন্যান্য কবিতায়।

ব্যক্তিজীবনে তিনি চিরদিন স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবাদী (ফলে অপ্রিয় সত্যভাষী) ও ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী—কি সাহিত্য ক্ষেত্রে, কি চাকুরী ক্ষেত্রে—উভয়ত্রই। তাঁর চাকুরী জীবনের একটি প্রধান ঘটনা থেকেই তা' বোঝা যবে। নবকৃষ্ণ ঘোষের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে (৫১—৫৫পৃঃ) এবং দেবকুমার রায় চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে (পৃঃ ২৪১) বর্ণিত আছে সে ঘটনা। তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর স্যর চার্ল্‌স্ ইলিয়টের সঙ্গে জমির জরিপ সংক্রান্ত আইন নিয়ে প্রচণ্ড বিতণ্ডা হয়। সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টভাষী দ্বিজেন্দ্রলাল মুখের ওপর সাফ ব'লে দিলেন যে ছোটলাট সাহেব বাঙলা দেশের জরিপের আইনজ্ঞ নন্ ব'লেই দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তি নাকচ করতে চাইছেন। সামান্য বাঙালী ডেপুটী হয়ে সাক্ষাৎ লাটসাহেবকে আইন-অনভিজ্ঞ বলার সৎসাহসের মূল্য দ্বিজেন্দ্রলালকে দিতে হয়েছিল। তাঁর প্রমোশন বন্ধ হ'ল। দ্বিজেন্দ্রলালও ছাড়বার পাত্র নন! এক প্রকাশ্য সভায় তিনি ব্যঙ্গ ভাষণ দিলেন, Honesty is not the best policy. স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট চ'টে লাল। ব্যাপারটি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ালো। জজসাহেব দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বপক্ষেই রায় দিলেন। তা'তে চাকরী গেল না ব'টে কিন্তু প্রমোশন বন্ধ হয়ে রইল।

তাঁর পুত্র দিলীপকুমারকে তিনি বল্‌তেন, "আর যাই করিস্ বাবা, দুটি কাজ করিস নি : মিথ্যাচার আর খোসা-মোদ।......আর একটি কথা সর্বদাই মনে রাখিস্—যে ঠিকে-ভুল হ'লে ভয় নেই যদি সত্যনিষ্ঠা থাকে, কিন্তু সত্যে যদি আঁট না থাকে তবে শেষে দেউলে হতেই হবে। কারণ জীবনের বনিয়াদই সত্য। তাকে ছাড়লে দাঁড়াবি কোথায়?" (স্মৃতিচারণ ১।২ খণ্ড—পৃঃ ১৫)

এই সত্যনিষ্ঠা ও স্পষ্টভাষিতাই তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্ররোচক। নিজে তিনি স্পষ্টবক্তা, সাহিত্যের মধ্যেও তাঁর সেই স্পষ্টভাষণধর্মিতাকে অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব'লে মনে করতেন।

রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধ আজ বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়। এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না ক'রে এ'টুকু বলা যায় যে,রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রবিরোধ ব্যক্তিগত বিরোধ নয়, আসলে তৎসাময়িক দুই কাব্যাদর্শের বিরোধ। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময়তার কবি, (দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় অস্পষ্টতার) আর দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষার কবি। 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি যে ভাবের ধারণা করতে পারি সেই ভাব সম্বন্ধেই লিখি—আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝতে পারি।' কথাটার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট এবং খুব তাৎপর্যবহ। রবীন্দ্রযুগের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় কল্পনাদীপ্ত কাব্যরীতির পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের স্পষ্ট ঋজু, খানিকটা অমসৃণ, অমার্জিত গদ্যায়িত কাব্যরীতি একটি বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। এই স্পষ্ট-ভাষিতা ও অপ্রিয়সত্যনিষ্ঠা তাঁকে লোকসমাজে অনেক-খানি অপ্রিয় এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে খানিকটা হীনপ্রভ ক'রে ফেলেছে, তবু এ'কথা অনস্বীকার্য যে বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁর অনমনীয় পৌরুষদৃপ্ত কবিব্যক্তিত্ব স্বমহিমায় অপূর্ব ভাস্বর।

বাঙালী জীবনের যতকিছু হীনবীর্যতা, নষ্টামি, দুষ্টামি, ভণ্ডামি, গোঁড়ামির তিনি জীবন্ত প্রতিবাদ। এই একমাত্র কারণেই তাঁকে ব্যঙ্গকবির কলম ধরতে হয়েছে। 'ভক্ত' কবিতায় তিনি বলেছেন,

"ব্যঙ্গ-করি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধ্?
নিন্দা করি শুধ্ সকলে?
কভু না, আসলে ভক্তি করি আমি
ঘৃণা করি শুধ্ নকলে।"

তাই 'হিন্দু' চণ্ডীচরণ, বিরহ যাপন, গীতার আবিষ্কার, বদলে গেল মতটা, এমন ধর্ম নাই, Reformed Hindoos, বিলাত ফের্তা, হ'ল কি,ইত্যাদি কবিতায় আমাদের জাতীয় চরিত্রের ভণ্ডামি ও অন্ধ পরাণুকরণ ও কাপুরুষতাকে রসিকতার মোড়কে তীব্র নিন্দাবাণে বিদ্ধ করা হয়েছে। 'বিলাতফের্তা' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু অপূর্ব—

আমরা—বিলিতি ধরণে হাসি
আমরা—ফরাসী ধরণে কাশি
আমরা—পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালোবাসি।

'গীতার আবিষ্কার' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশে বাঙালী চরিত্রের ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে তুলে ধরা হয়েছে—

দেখি যদি গৌরমূর্তির রক্তবর্ণ আঁখি
অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা' ব'লে ডাকি
পালাই ছুটে উর্ধ্বশ্বাসে যেন বাঘে খেলে
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে।

কিংবা অন্যত্র,

সাহেব তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলস্থ স্ত্রীর
ভূত ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর
যবে সব কলম ধ'রে, গলার জোরে দেশোদ্ধারে ধায়
তথন আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে হয়ে
ওঠা দায়।
(বলি ত' হাসব না)

(এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার' ব্যঙ্গ কাব্যের বিপিন চরিত্রের কথা আমাদের মনে পড়ে।)

'জিজিয়া কর' কবিতা থেকেও উদ্ধার করা যায়—
পড়ে আমি চরণ তলায় নাকটি গুঁজে অনেক কাল
সইব সবই, নইত মানুষ; আমরা সবাই ভেড়ার পাল
যে যা' করিস্ দেখিস্ চাচা মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা
শাঁসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে দিস্‌রে দুটো দু'বেলায়।"

নির্বীর্য বাঙালীর ভীরুতাকে 'বাঙালী মহিমা' কবিতায়ও বিদ্রূপ করা হয়েছে। বাঙলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকেও তিনি অব্যাহতি দেননি।

"খোলো ইতিহাস: সতের তুরস্ক প্রবেশিল
যবে গৌড়েতে
লক্ষ্মণ সেন ত' দিলেন চম্পট কচুবনে এক দৌড়েতে।
সে অপূর্ব সুমধুর আধ্যাত্মিক দীর্ঘ পলায়ন কাহিনী
যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধহয় আজো ভালো ক'রে
কেহ গাহেনি।"

নির্বীর্য বাঙালী তথা ভারতবাসীকে তিনি বীরধর্মে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন,

"ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে—শুন ঐ ডাকে
ভারতমাতা।

*　　*　　*

সমরে নাহি কভু ফিরাইব পৃষ্ঠ, শত্রু করে কভু
হব না বন্দী
ভরি না থাকে যা-ই অদৃষ্টে অধর্ম সঙ্গে করিনা সন্ধি
রব না, হব না দস্যুর ভৃত্য
সম্মুখ সমরে হয় বা মৃত্যু।"

উদ্ধৃত গানটিতে,, তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের বহু স্থলে, তাঁর দেশপ্রেমাত্মক গান এবং কোন কোন হাসির গানের সুরে এমন একটা বলিষ্ঠ গতিপ্রবাহ এবং পৌরুষ ফুটে উঠেছে যে সে যুগে তা সম্পূর্ণ অভিনব। বহুখ্যাত 'আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা, নহি ত মেষ'—কথাটাও খুব তেজের, খুব জোরের। 'হ'তে পারতাম' কবিতায় বাক্যবীর বাঙালী চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

'দেখ, হতে পারতাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির
তাই বাক্যবীরই রয়ে রইলাম চ'টে মটেই ত',
ইত্যাদি।

বহুখ্যাত 'নন্দলাল' কবিতায় ভীরু, দুর্বল মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ বাঙালীর জীবন্ত চিত্র তীব্র কশাঘাতে অপূর্ব শিল্পসুন্দর ভঙ্গিতে অঙ্কিত হয়েছে।

পৌরুষের মূলভিত্তি উচ্চ চারিত্র্যশক্তিতে ও মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'মেবার পতন' নাটকে তিনি মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করতে চেয়েছেন। মেবার পতনের বেদনা-সঞ্চার নয়, পরন্তু তার কারণ অনুসন্ধান নাট্যকারের লক্ষ্য। হিন্দু জাতির অনুদার সঙ্কীর্ণতা, অন্ধ জাতিবৈরিতা, গৃহযুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা, কাপৌরুষ ক্লীবতা ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। সগরসিংহ, গজ সিংহের মতো উচ্ছিষ্টভোজী অ-মেরুদণ্ডী নির্বীর্যের দল এবং মহাবৎ খাঁর মতো স্বজাতিদ্বেষী চরিত্রের মাধ্যমে পরোক্ষে তিনি বাঙালী তথা ভারতীয় চরিত্রের দুর্বলতারই সমালোচনা ক'রেছেন। পরাধীনতার বেদনা ও গ্লানির চেয়েও পৌরুষের তথা মনুষ্যত্বের অভাব তাঁর কাছে চরম বেদনার কারণ হয়েছিল। 'মেবার পতনে' তাই তাঁর বক্তব্য, 'গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'।' তিনি বুঝেছিলেন যে পরাধীনতার কারণ শুধু বাইরের শত্রু নয়, আমাদের নিজেদের মধ্যেই সে কারণ বা বীজ নিহিত। সে বীজ পৌরুষহীনতা ও মনুষ্যত্বহীনতার। ব্যক্তিত্বহারা, হতচেতন, পরপদানত, কাপুরুষ বাঙালীর জাতীয় জীবনে তিনি মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন।

জীবনাচরণেও তিনি ছিলেন পৌরুষের পূজারী। তাঁর পুত্র দিলীপকুমারের গ্রন্থ থেকে সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে—"পিতৃদেব ছিলেন নিজে অমিতবল, পৌরুষদৃপ্ত প্রতিভাধর —কথায় কথায় উদ্ধৃত করতেন মহাভারতের 'সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্বং বলবতাং শুচিঃ'—অর্থাৎ বলবান কোন্ পথ্যে না পুষ্ট হয়, এমন কি আছে, যা পারে তাকে অশুচি করতে? এফিমিনেট বিশেষণটি উচ্চারণ করতে তাঁর ওষ্ঠাধর অবজ্ঞায় বাঁকা হয়ে উঠত।"

(স্মৃতিচারণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫)

অন্যত্র, "পিতৃদেব ছিলেন যাকে ইংরাজীতে বলে Masculine বাঙ্‌লায় পুরুষসিংহ। যা কিছু মেয়েলি, পুরুষের মধ্যে তার বরদাস্ত করতে পারতেন না।"

(ঐ, পৃঃ ১২১)

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার, বরিশালের জমিদার দেবকুমার রায়চৌধুরী কপালের ওপরে দীর্ঘ বিলম্বিত চুল রেখেছিলেন ব'লে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর তীব্র সমালোচনা করতেন। 'সোরাব ও রুস্তম' নাটকের সারিয়ার মুখদিয়ে তিনি বলিয়েছেন, "পুরুষগুলো যদি স্ত্রীলোকের মতো লম্বা চুল রাখে, নাকি সুরে কথা কয়, অপাঙ্গে চায়, তাহলে স্ত্রীলোকদের একটা উপায় করতে হয়। যে-পুরুষ কেশের বেশের বেশি পারিপাট্য করে, তাদের দেখে আমার ভারি দুঃখ হয়।"

যেমন জীবনাচরণে, তেমনি সাহিত্যেও—কি ভাষায়, ছন্দে, বিষয়বস্তুতে ও প্রকাশভঙ্গির ঋজুতায় তিনি পৌরুষের পূজারী। ভাষায় অনতিললিত অমসৃণতার মধ্যে তাঁর কাব্যের পৌরুষ দীপ্যমান। তাঁর কাব্যের ভাষা মোটেই রমণীসুলভ রমণীয় নয়, তার সৌন্দর্য পুরুষের সৌন্দর্য। গদ্যগন্ধী অমসৃণ, অপেলব ও দৈনন্দিনজীবনে

ব্যবহৃত সাধারণ চল্‌তি ভাষায় তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন। শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায়ের ভাষায় বলা যায়—"এই মৃদু মোলায়েম ভাষায় যে দুন্দুভি বাজাইতে পারা যায়, মধুসূদনের পূর্বে কেহ তাহা জানিত না বা বিশ্বাস করিত না। এই কৃশাঙ্গী ভাষার ভিতর হইতে যে ড্রমের ঝর্ঝর রব বাহির করা যাইতে পারে…পূর্বে কাহারও ধারণা ছিল না।"

(নবকৃষ্ণ ঘোষের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থের ৩০৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি থেকে)

পরিশেষে, ভাষার প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। সেটি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যভাষার পার্থক্য। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের ভাষার বৈশিষ্ট্য কেবল তার রমণীসুলভ লাবণ্য। এ'কথা সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষার দার্ঢ্য, পৌরুষ ও ওজঃশক্তির তুলনা নেই। তাঁর পূরবী ও বনবাণীর অনেক কবিতা, বীথিকা, প্রান্তিক, সেঁজুতি, পুনশ্চ, পত্রপুট, কাব্য-গ্রন্থের ভাষা কি পুরুষোচিত দার্ঢ্য শক্তিতে সুন্দর নয়? তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষার পৌরুষ রাজপুত্রের মতো, তার সৌন্দর্য রাজসৌন্দর্য, তার বেশ রাজবেশ। আর দ্বিজেন্দ্র-লালের ভাষা যোদ্ধবেশী। এ'ভাষা সৈনিকের ভাষা। সমাজের অনাচার, অবিচার, ভণ্ডামি, নষ্টামি, দুষ্টামি ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ। যোদ্ধার পোষাক যেমন অস্ত্রসজ্জিত, আটোসাঁটো ও বাহুল্যবর্জিত, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষাও তেমনি শাণিত, সংক্ষিপ্ত ও পৌরুষদৃপ্ত। এখানে তাই অলঙ্করণসৌন্দর্য মুখ্য নয়, যুযুধান ব্যক্তিত্বের প্রকাশক ব'লেই এর সৌন্দর্য।

উদ্বেজিতা

অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

হৃদয়ের তীরে তীরে ভাবনার ঢেউ
তুমি এলে দীপালিকা।
গভীর বেদনা কোথা জানিল না কেউ
তবু জ্বলে তনু শিখা।
পরম প্রেমের পেয়ে জ্বালা
কেন ছিঁড়ে দিলে ফুলমালা
কোন প্রতিদান চাহিলে না মুখ ফুটে
মরমের সম্পুটে!

চোখে মুখে বুকে তব যৌবন ছায়া
বাসনার রাঙারেখা।
মনের পাপ্‌ড়িগুলি মেলিয়াছে মায়া,
নয়নে অশ্রুলেখা।
সাথে লয়ে ঘাত প্রতিঘাত
শেষ হয়ে গেছে কত রাত!
এখনো বাতাসে লাগে ক্ষণ শিহরণ,
তবু কেন ক্রন্দন!

সুস্থ মনের সাথে আজো পরিচয়
কেন যে হোলোনা মোর!
ভাবি তাই অবিরল, প্রাণে ভয় হয়।
এখনো মোহের ঘোর
ঘিরে রয় নিশিদিন ধরি;
নানাসুরে আলাপন করি
যায় চলে, আসে যারা খেয়ালের স্রোতে
দূর বহু দূর হোতে।

জীবনে অনেক কথা ছিল কহিবার,
সময় ফুরায়ে যায়।
এই ধরণীতে সাধ ছিল রহিবার
প্রণয়ের সুষমায়।
বুকে নিয়ে প্রীতি ভালোবাসা,
করেছিনু অন্তরে আশা
এ চেতনা চিরতরে হবেনাকো হারা
নিবে আসে আঁখি তারা।

তবুও তোমারে পেয়ে হেথা নিরালাতে,
লভিনু পুলক মোর ঘুম-ভেজা রাতে।

বিদেশী

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বিদেশী যেদিন প্রথম এখানে এলো সেই দিনই কালীপদর মতো আরো অনেকেরই লোলুপদৃষ্টি পড়লো তার উপর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালীপদর জয় হোল। বিদেশীকে কালীপদই পেলো।

বিদেশীর বয়স তেইশ চব্বিশ বছর। পাত্‌লা গড়ন, শ্যামলারং। মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল। তার দেহটি ঘিরে বেশ একটি চিকণ শ্রী আছে। বাদামি রং-এর সাড়ি পরে বাজারের মধ্য দিয়ে সে যখন চলে, তখন তার চোখে বিদ্যুৎ চমকায়।

বিদেশী পাকিস্তানে চোরাকারবার করে। তাকে দেখে প্রথম প্রথম সকলেই অবাক হয়েছিলো। এমন ভরা-যৌবন নিয়ে সে কেমন করে এমন ভয়ানক কাজ করবে। কিন্তু প্রথম প্রথম সকলে বিস্মিত হলেও তাদের বিস্ময় শেষ পর্যন্ত ফিকে হয়ে এসেছিলো। বিদেশীর দলে আরো কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিলো। তারা সকলেই বিদেশীর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাদের দলে বিদেশীকে যেন একেবারে বেমামান বলে মনে হয়।

বিদেশীর হাবভাবে নোংরা চটুলতা কিছু নেই। চোরাকারবার করলেও তার কথাবার্তা বেশ শান্ত এবং সংযত। তাকে কোনদিন সংযমহীনতার পরিচয় দিতে দেখিনি। অথচ বিদেশীর কাজ বেশ দুঃসাহসের কাজ।

সীমান্ত অতিক্রম করে সে নির্বিবাদে পাকিস্তানে চলে যায়। যাবার সময় বেআইনীভাবে মাল নিয়ে যায়। পাকিস্তান থেকে ফিরে আসবার সময়ও মাল নিয়ে আসে। এই সব মাল উচ্চমূল্যে বিক্রি ক'রে প্রচুর মুনাফা করে সে। সাধারণতঃ রাত্রেই চলে এদের গোপন গতায়াত। রাত্রি গভীর হোলে এরা দল বেঁধে চলে যাবে নিস্তব্ধ মাঠটি পারিয়ে পাকিস্তানে। কোন কোনদিন দিনের আলোতেও ওরা বেরিয়ে পড়ে। সীমান্তের জামগাছটা পিছনে ফেলে হন হন করে ঢুকে পড়বে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের ভিতরেও অনেক দূর চলে যাবে। কোন কোনবার তিন চারদিন পাকিস্তানে কাটিয়ে আসে ওরা। হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মতো মালের বোঝা কাঁকালে ফেলে হিন্দুস্থানের ডেরায় এসে হাজির হয়।

পাকিস্তান থেকেও লোক আসে সীমান্তে। আবার কেউ কেউ সরাসরি হিন্দুস্থানের মধ্যেও চলে আসে। এখানে তিন চারদিন পর্যন্ত থাকে এবং মাল সংগ্রহ করে। শেষে বিভিন্ন মাল নিয়ে রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। উভয় দলের মধ্যে বেশ সৌহার্দ্য আছে। এমনি করে চলে এদের গোপন ব্যবসা। এই ব্যবসার ক্ষেত্রে পুরুষও নেমেছে, স্ত্রীলোকেরাও নেমেছে। পেটের দায়ে অনেক ভদ্রঘরের মেয়েও এই দুঃসাহসিক কাজে নেমেছে। মাঝে মাঝে এরা ধরাও পড়ে। তবে এদের পরিচিত পুলিশেরা এদের ধরে না। কখনো-সখনো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন পুলিশ সীমান্তে কর্তব্য করতে এসে এদের পাকড়াও করে। ধরে নিয়ে যায়, কিছুদিন আটকা পড়ে থেকে আবার চলে আসে এবং গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়।

বিদেশী বিধবা। একেবারে বাল্যাবস্থায় নাকি একবার বিয়ে হয়েছিলো তার। কিন্তু দেহের ভাঁজে ভাঁজে দুরন্ত যৌবন ভাল করে ফুটতে না ফুটতেই স্বামী পরপারে চলে গিয়েছিলো। স্বামীর স্মৃতি বিদেশীর কাছে একেবারেই ফিকে হয়ে এসেছে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে বিদেশী আর বিয়ে করেনি। ওকে দেখে এখনো কুমারী বলে মনে হয়। বয়স তার তেইশ চব্বিশ হলেও দেখতে আরো অল্প বয়স্কা বলে মনে হয়। দুর্মুখো যারা—তারা বলে বিদেশী

এর মধ্যে আরো একবার বিয়ে করেছিলো, তবে সে সে-কথা স্বীকার করে না।

শেষ পর্যন্ত কালীপদর কাছেই ধরা দিল বিদেশী। সে রাত্রি অন্ধকার ছিলো। হু হু করে হাওয়া বইছিলো। বাতাসে স্নেহের স্পর্শ ছিলো। বাতাসে মদিরতা ছিলো। মদিরতা ছিলো কালীপদর চোখে। শিহরণ ছিলো বিদেশীর মনে। ছোট্ট ঝোঁপটার মধ্যে ঝির ঝির করে হাওয়া দুলছিলো। অন্ধকারে আশে-পাশে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। শীত শীত বাতাসে কেমন ভয় ভয় ভাব ছিলো। আকাশে চাঁদ ছিলো না, আকাশে মেঘ ছিলো না। অনেক তারা ছিলো, অনেক—অনেক তারা। বিদেশী হারিয়ে গিয়েছিলো কালীপদর মধ্যে, বিদেশী ধরা দিয়েছিলো কালীপদর হাতে। কালীপদ পেয়েছিলো তাকে, সম্পূর্ণ করে পেয়েছিলো।

প্রথম প্রথম বিদেশী কিছুতেই ধরা দেয়নি। ধরা দিতে চায় নি। তবুও অন্যান্য সকলের চেয়ে কালীপদর প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব তার ছিলো। কালীপদ দায় দায়িত্বহীন পুরুষ—তিনকুলে তার কেউ নেই। বয়স তার বত্রিশ তেত্রিশ বৎসর। নাদুস-নুদুস কালো চেহারা। চুলগুলি ওলটানো এবং মুখখানি গোল। কালীপদ যাত্রাদলে প্রায়ই ঘাতক বা দৈত্যের পার্ট করতো। তাতে মানাতোও তাকে বেশ। দৈত্যের পার্ট করে করে ইদানীং কালীপদর হাবভাবেও দৈত্যপনা এসে গিয়েছিলো। গলার স্বর তার স্বাভাবিকভাবেই একটু চড়া ছিলো, ইদানীং আরো একটু বেশি চড়া হয়েছিলো। তবে সব মিলিয়ে তার মধ্যে একটি সতেজ পৌরুষভাব ছিলো। তবু বিদেশী প্রথম দিকে তাকে আমলই দেয় নি।

বিদেশী পাড়ার মধ্যেই থাকতো। একটা ঘর ভাড়া নিয়ে তারা কয়েকজন স্ত্রীলোক এক সঙ্গে থাকতো। ওরা সকলেই পাকিস্তানে যাতায়াত করে। বেশ কিছু মাল নিয়ে ওরা এক সঙ্গে পাকিস্তানে চলে যায়। ক'দিন আর ফেরে না। তারপর একদিন বিরাট মাঠটি পেরিয়ে হঠাৎ চলে আসবে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। কোন কোনদিন ওদের ভাষায় 'লাইন ক্লিয়ার' না থাকলে একেবারে গভীর রাত্রিতে ওরা বেরিয়ে পড়ে। তাও নিঃশব্দে যেতে হয় ওদের। বাগানপাড়াটা পেরিয়েই খোলা মাঠ। খোলা মাঠের মধ্যে পড়লে ওদের আর তেমন ভয় নেই। আধমাইলটাক পথ হেঁটে গেলেই জাম গাছটা পড়বে—ভারতের শেষ সীমা। তারপরেই পাকিস্তান। একেবারে সোজাসুজি ঢুকে পড়বে মালের বোঝা কাঁকালে নিয়ে অথবা কোমরে কাপড়ের নীচে জড়িয়ে বেঁধে। পাকিস্তানের পুলিশেরাও ওদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। কেউ কোন আপত্তি করেনা, নির্ব্বিবাদে চলেছে এদের ব্যবসা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। এতে যোগ দিয়েছে অনেকেই—ভদ্র, ইতর আবার বিদেশীর মতো স্ত্রীলোকেরাও। একটু ভদ্র এবং ভীতু গোছের যারা তারা সরাসরি পাকিস্তানে যায় না; সীমান্তের এ পার থেকেই মাল পাচার করে। তবে এদের মুনাফা একটু কম। নির্ভয়ে যারা পাকিস্তানে চলে যেতে পারে মাল নিয়ে, তাদের মুনাফা অনেক বেশি। কালীপদ এই বেশি মুনাফা ভোগকারিদের একজন। এই ক'রে কালীপদ টাকাও করেছে কিছু। এইভাবে টাকা উপায় করার অবশ্যম্ভাবী ফল যেগুলি সেগুলিও তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। সে মদ খাওয়া ধরেছে। তবে সে ব্যভিচারী নয় বলেই শুনেছি। তার এখন অভাব একটি মেয়েমানুষের—স্ত্রীর নয়, মেয়েমানুষের। কালীপদ বিয়ে করতে চায় না।

একদিন সরাসরি কালীপদ বিদেশীকে বললে, চলো আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকি। এমন কথা বিদেশীকে অনেকের কাছ থেকেই শুনতে হয়েছে। তার শরীরটায় বেশ মাদকতা মেশানো ছিলো। সে যখন চটুল ভঙ্গিতে রাস্তা দিয়ে চলতো অনেকেরই চিত্তে দোলা লাগতো। বিদেশীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার বাসনা অনেকেই মনে মনে পোষণ করেছিলো। এমন কি ঘরে যাদের স্ত্রী আছে তাদের মধ্যেও অনেকে এ প্রস্তাব করেছিলো। বিদেশী হেসে উড়িয়ে দিয়েছে তাদের প্রস্তাব। কাউকে কাউকে চটুল ভঙ্গিতে বলেছে, আবার বললে বৌদির কানে তুলে দেবো। কাউকে কাউকে রেগে গিয়েও অনেক কথা বলেছে। তারা নিরস্ত হয়েছে। কিন্তু কালীপদকে নিরস্ত করতে পারে নি বিদেশী। সেদিন পাকিস্তানের পথে মাল নিয়ে যেতে যেতে কথাগুলি বললে কালীপদ।

কালীপদ এখন এদের সঙ্গেই পাকিস্তানে যায়। আগে

সে একাই যেতো। এখন বিদেশীর দলের সঙ্গ নিয়েছে। এতে এরাও খুশি হয়েছে। কালীপদ এবং আরো দুই একজন পুরুষ এদের দলের সঙ্গ নিয়েছে। দুই একজন পুরুষসঙ্গী এদের দলে থাকাতে এদের মনের জোর বেড়েছে। এতে দলের বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকটিও কোন আপত্তি করে নি।

দলের সঙ্গে যেতে যেতে কালীপদ ও বিদেশী যেন একটু সঙ্গত কারণেই পিছিয়ে পড়লো। বাগানপাড়ার মাঠটার অর্দ্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে তারা। আরো অর্দ্ধেক অতিক্রম করতে হবে তাদের। তারপর পড়বে জামগাছটা। জামগাছটার তলা দিয়ে হনহন করে চলে যাবে ওরা। তারপরই পাকিস্তান। ওদিকে পৌছুতে পারলেই এদিকের কোন ভয় থাকবে না। আস্তে আস্তেই কথাগুলো বললে কালীপদ।

ওর কথাতে বিদেশী হাসলো। চোখে বিদ্যুৎ হানলো। বললে, সে আর হবে না গো। বিয়ে করা বরই যেখানে কপালে টিকলো না, সেখানে আর নকল বর নিয়ে কী হবে?

খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। হাসির উচ্ছ্বাসে তার লতার মতো দেহটা দুলে উঠলো। কাঁকালের মালগুলো একবার ফসকে পড়ে যেতেই সেগুলো চেপে ধরলো বিদেশী। তার হাসির শব্দে পিছনে ফিরে তাকিয়েছিলো অনেকে। দলের বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকটি ধমক দিয়ে বললে, আ' মর, রঙ্গ করার আর সময় পেলিনে। পুলিশের তাড়া খেলে রঙ্গ করা তোর মাথায় উঠে যাবে। পা চালিয়ে আয় বিদেশী!

স্ত্রীলোকটির ধমকানি খেয়ে বিদেশী কালীপদকে ফিস ফিস করে বললে, ও বুড়ি ঢ্যামনি আমাদের সন্দ করতে আরম্ভ করেছে গো। চলো আমরা পা চালিয়ে যাই।

এরপর বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকটি কালীপদকে উদ্দেশ্য করেই বললে, তুমিই বা কেমন কালীপদ! ওর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কী সব কথা বলছো!

কালীপদ হেঁকে বললে, ওই সব পুলিশের কথাই বলছিলাম গো।

বিদেশী আর একবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। তার চোখের তারায় কৌতুক চিক চিক করে উঠলো। কালীপদর দিকে একবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে চটুল গতিতে এগিয়ে চললো সে। এগিয়ে চলতে চলতে বিদেশী আর একবার আপনমনেই খিলখিল করে হেসে উঠলো। বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকটি ধমক দিয়ে বললে, আঃ মর, অতো হাসি কেনে!

পাড়াঘরে বিদেশীকে নিয়ে আজকাল বেশ গুঞ্জন উঠেছে। সে যে অনেক পুরুষের মন ভুলিয়ে বেড়াচ্ছে, এ সম্বন্ধে পাড়াঘরের মেয়েদের অনেকেরই বদ্ধ ধারণা জন্মেছে। বিশেষ করে যে সমস্ত কুলকামিনীরা তাদের স্ব স্ব স্বামী সম্বন্ধে বিবাহের প্রথম দিন থেকেই সন্দিহান, তাদের সন্দেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কোনদিন যদি স্বামী-বেচারীরা একটু বেশি রাত করে বাড়ি ফেরে তাহলে সেদিন তাদের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বামী নামধারী ব্যক্তিগুলোকে থেতলে থেতলেও যখন তাদের মনের জ্বালা জুড়োল না, তখন প্রত্যক্ষভাবেই একদিন তারা দল বেঁধে বিদেশীকে আক্রমণ করলো। পাড়ার মধ্যে যে কুলকামিনীর কণ্ঠ-বিষের খ্যাতি (কুখ্যাতি?) সর্বজনবিদিত (অনেকে আড়ালে একে খড়্গধারিণী দেবী চামুণ্ডা বলে থাকেন) তিনি সরাসরি বিদেশীর উপর চড়াও হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরে চোখখাকী ভাতারপুতের মাথাখাকী, বলি পুরুষগুলোর মাথা চিবোবার কি আর জায়গা পেলি নে? না, এতোবড় দেশটায় আর জায়গা নেই? বলি বেরোস কাঠের মতো ওই তো চেহারা। অতো দেমাক আসে কিসে লো তোর? আর পুরুষগুলোরও বলিহারি যাই। এর চেয়ে একটা ঘাটের মড়া নিয়ে……

লম্বা লম্বা পা ফেলতে ফেলতে চলে এসেছিলো এই স্বামীগর্বিতা কামিনী। বলা বাহুল্য এর স্বামী ব্যক্তিটি সুযোগ্যা সহধর্মিণী ছাড়াও আরো দুই একজনের কাছে নিত্য যাওয়া আসা করে থাকেন। ঈষৎ লাল জাতীয় যে পানীয় আছে তাও নাকি তিনি নিয়মিত পান করে থাকেন।

বিদেশী সেদিন কারো কথারই কোন উত্তর দেয়নি। মুখবুজে সকলের কথা সহ্য করেছিলো। তার দলের অনেকে ঝগড়া করতে উদ্যত হয়েছিলো, বিদেশী থামিয়ে দিয়েছিলো সকলকে। সকলে চলে যাবার পর সে

কেঁদেছিলো। আকুল হয়ে কেঁদেছিলো। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়েছিলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। জানালার ফাঁক দিয়ে শেষ আলো এসে পড়েছিলো ঘরে। পাশের জিওল গাছটায় রোজকের মতো ফিঙেটা শেষ ডাক দিয়ে চলে গিয়েছিলো। বিদেশী ওঠেনি, আলো জ্বালেনি। সেদিন সারাদিন ধরে পেটেও কিছু দেয় নি।

সারারাত ধরে সেদিন অনেক ভেবেছিলো বিদেশী। এসব কাজ যারা করে—বিশেষ করে মেয়ে মানুষের পক্ষে এ ধরণের কথা শোনা নতুন কিছু নয়। তবু বিদেশীর মনে কথাগুলি বেজেছিলো বড়। সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেললো। যতোদিন সে একা একা থাকবে ততোদিনই তাকে এ দুর্নাম সহ্য করতে হবে। যেমনই হোক তাকে একটা আশ্রয় অবলম্বন করতে হবে। সঙ্কল্প স্থির করার পর সে মনে একটু শান্তিও পেয়েছিলো। শেষ রাতের দিকে ঘুমও এসেছিলো চোখে।

পরের দিনই পাকিস্তানে গেলো বিদেশী। সঙ্গে গেলো কালীপদ এবং তার দলের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা। কালীপদ এখন মাঝে মাঝেই বিদেশীকে আসল কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে এতোদিন বিদেশীর সম্মতি পায় নি। তার কথায় ফিকফিক করে হেসেছে সে, আসল কথাটাকে এড়িয়ে গেছে প্রত্যেক দিনই।

সেদিন পাকিস্তানে গেলো প্রচুর মাল নিয়ে। মাল বিক্রি করে লাভও করেছিলো প্রচুর। পাকিস্তান থেকে ফিরতে সেদিন ওদের একটু রাতও হয়েছিলো। খুশিমনে ফিরছিলো। নিঃশব্দে ফিরছিলো। কেবল মাঝে মাঝে কালীপদ ও বিদেশীর ফিস ফিসানি শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকার রাত। আকাশে অগুণতি তারা। তারার মটরমালা। আশে পাশে ধানক্ষেত। ধূ ধূ প্রান্তরে একটানা ঝিল্লির ঝনক। ওরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলছিলো।

সীমান্তের জাম গাছটা পেরিয়ে এলো ওরা। দীঘিটার কাছে কাছে চলে এসেছিলো। এ দীঘিটাও সীমান্তের দীঘি। খুব বড় দীঘি। এ দীঘি যে কবে খনন করা হয়েছিলো তা কেউ বলতে পারে না। এখন অবিশ্যি এতে জল বেশি থাকে না। মাঝখানটায় বেশ খানিকটা জল চিকচিক করে। বর্ষাকালে এর দেহে যৌবন আসে। অনেক ঢোলকলমী, শালুকফুল ফুটে থাকে এর দেহে। দীঘিটার বাঁ' পাশ দিয়ে সরু এক ফালি পায়ে হাঁটা রাস্তা চলে গেছে সোজা পাকিস্তানের দিকে। এ রাস্তায় রাত বিরেতে ওরাই চলে মালের বোঝা ঘাড়ে করে। এ ওদের গুপ্ত রাস্তা। বড় বেশি লোক এ রাস্তার খোঁজ রাখে না। ওরা বড় খেজুরবাগানটা পেরিয়ে সরু রাস্তাটার উপর এসে পড়েছে। রাস্তাটার আশপাশ ছোট ছোট ঝোপে ঝাড়ে ভর্ত্তি। হঠাৎ সামনে টর্চের আলো পড়লো। ওরা হকচকিয়ে গেলো। ভয়ও পেলো। পুলিশ ছাড়া এই রাত্রে এভাবে টর্চের আলো আর কেউ ফেলবে না। তাও বোধ হয় স্থানীয় ফাঁড়ির পুলিশ নয়। তাদের দেখে ততো ভয় নেই! তবে এ কারা? নিশ্চয়ই অন্য কোন স্থান থেকে এসেছে গোপনে এদের ধরার জন্যে। পুনরায় টর্চের আলো জ্বলে উঠলো। সামনের ঝোপটায় আলো আটকে গিয়েছিলো তাই রক্ষে। একটু দূরে বাজখাই গলার আওয়াজও পাওয়া গেলো।

আর এগুতে সাহস হোল না ওদের। যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। মাথায় ও কাঁকালে কিছু কিছু মালও ছিলো। পলায়নী কাজটাকে সহজ এবং দ্রুততর করে নেবার জন্যে অনেকে মালগুলি ফেলে দিয়েই পালালো। এসব পরিস্থিতিতে দ্রব্যাদি ফেলে না পালালে বিপদে পড়তে হয় আরো বেশি। মালশুদ্ধ ধরা পড়লে মালও যাবে, জেলেও পচতে হবে। তার থেকে মালের উপর দিয়ে যাওয়াই ভাল। সেই ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে কে কোথায় পালালো তার হদিশ পাওয়া গেলো না। মাঠের মধ্য দিয়ে কেউ দৌড়ে পালালো কেউ ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

বিদেশী বেশখানিকটা ছুটলো। রাত্রির অন্ধকারে দীর্ঘ পথ হাঁটার ক্লান্তিতে বেশি ছুটতে পারলো না। ছোট ছোট বনের মধ্য দিয়ে ছুটতে গিয়ে একবার হোঁচট খেয়ে পড়েও গেলো। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে 'মাগো' বলে একবার ডুকরে উঠলো। আবার পরক্ষণেই ছুট। তার সঙ্গীরা যে কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তার সংবাদ পেলো না। শরীর যখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন পরিষ্কার দেখে একটি ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লো বিদেশী। ঝোপটি বেশ ফাঁকা। আশেপাশে জোনাকিরা

জ্বলছে। বিদেশী বসে বসে হাঁপাতে লাগলো। জোরে কাউকে ডাকবারও উপায় নেই। কি জানি পুলিশেরা যদি পিছু নিয়ে থাকে। বিদেশী একা। নির্মেঘ আকাশের নীচে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের পাশে একটি ঝোপের মধ্যে সে একা। আচম্বিতে তার গা ছমছম করতে লাগলো। এর আগেও সে দুই একবার এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এমনতরো নয়। এই মুহূর্তে কালীপদকে মনে পড়ে তার। কালীপদ যদি এই সময় তার পাশে থাকতো!

ঝোপের বাইরে যেন মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেলো। হ্যাঁ, পায়ের শব্দই বটে। শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বিদেশী ভয়ে ভয়ে বসে থাকে। তবে কি পুলিশ এখানে তার অবস্থিতি টের পেয়েছে? সে ঝোপের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু একটানা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না। অথচ পায়ের শব্দ ক্রমেই নিকটে এগিয়ে আসছে—একেবারে কাছে এসে গেছে। বিদেশী চরম মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলো। তার বুকের সঙ্গে আঁটা ছোট একটি মালের পুটুলীও ছিলো। সেটিকে একপাশে ঠেলে রেখে দিল।

ঝোপটার কাছে এসে পদশব্দ থেমে গেলো। ফিস-ফিস কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—'বিদেশী এখানে আছ নাকি?' চকিতে বিদেশী বুঝতে পারে এ কার কণ্ঠস্বর। মাঠের মধ্যে একা থাকতেও তার ভয় করছে। তাই পরিচিত কণ্ঠস্বরে তার সাহস বাড়ে অনেকখানি। বেরিয়ে পড়বারও উপায় নেই। পুলিশেরা কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে হয়তো। বিদেশী ছোট্ট করে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, আছি।

কালীপদ ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করলো। বিদেশীর পাশটিতে টুপ করে বসে পড়ে বললে, উঃ কি তাড়াটাই না খেয়েছি আজ!

বিদেশী গলার স্বর একেবারে নামিয়ে বললে, আমি এখানে আছি, তুমি জানলে কেমন করে?

কালীপদ বললে, তোমাকে এই দিকেই একবার ছুটতে দেখলাম কিনা। তোমাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেলে আর ধরতে পারলাম না। তবে এখানে এসেছি আন্দাজে আন্দাজে। তুমি সেদিন এই ঝোপটা দেখিয়ে বলেছিলে না—যে কোনদিন যদি তাড়া খাই তবে এখানে এসে লুকিয়ে থাকবো। বেশ জায়গাটা, তাই না?

বিদেশী একথার উত্তর না দিয়ে বলে, উঃ তুমি আসার আগে কী ভয়ই না লাগছিলো!

কালীপদ আবেগভরে বললে, আমি যখন এসে গেছি, তখন আর তোমার ভয় নেই।

কালীপদ বিদেশীর হাত ধরলো। শক্ত সবল হাত দিয়ে বিদেশীর নরম হাতখানা চেপে ধরলো। বিদেশী আজ আর বাধা দিল না। বাধা দিতে চাইলো না। বিদেশী বুঝলো আর বাধা দিয়ে লাভও নেই। বিদেশী চিৎকার করতে পা'তো, কালীপদকে তাড়িয়ে দিতে পারতো। কিন্তু গতকালের ঘটনার পরে বিদেশী নিজেই অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে মনে মনে একটি বলিষ্ঠ আশ্রয় কামনা করছিল।

আকাশের তারাগুলি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। হাজার তারা, অসংখ্য তারা। ঝোপের মধ্য দিয়ে লতাগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় আকাশটাকে। একটা উল্কাপাত হোল আকাশে। একটা আগুনের পিণ্ড বিদ্যুৎ-গতিতে নীচের দিকে নামতে নামতেই মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলো। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো বিদেশী, দেখলো কালীপদ।

কালীপদ বিদেশীকে কাছে টানলো। একেবারে কাছে। কালীপদর উষ্ণ নিঃশ্বাস বিদেশীর মুখের উপর এসে পড়লো। বিদেশী বাধা দিল না। বাধা দেবার সামান্যতম আগ্রহও দেখালো না। তার বেদনার্ত যৌবন আজ যেন সার্থকতা খুঁজে পেলো। আবেগভরে কালীপদ ডাকলো, বিদেশী!

বিদেশী উত্তর দিল, বলো।

—এতোদিন এতো ডাকেও সাড়া দাওনি কেন?

—সময় হয় নি বলে।

—আজ কি সময় হয়েছে?

—সময় হয়েছে বলেই তো সাড়া দিয়েছি।

—এখন থেকে আমাকে গ্রহণ করতে আর আপত্তি থাকবে না বলো॥

—আপত্তি থাকার আর পথ রইলো কই। আমার উপর সব অধিকারই তো তোমাকে দিলাম।

কালীপদ নির্ভয়ে বিদেশীকে কাছে টেনে নিল আর একবার। বিদেশী চোখ বুজে কালীপদর বুকের উপর মাথাটা রাখলো।

ভোর হবো-হবো। পূবের আকাশটা ফিকে হয়ে এসেছে। পাশের ঝোপে ঝাড়ে নাম-না-জানা পাখিরা ডাক দিতে সুরু করেছে। মাঠের কোল জুড়িয়ে ঝুরু ঝুরু হাওয়া। এখানে আকাশে অনেক তারা। বিদেশী আর কালীপদ বেরিয়ে পড়লো। তারা হাত ধরাধরি করে পূবের আকাশটার দিকে বিনম্র দৃষ্টিতে তাকালো। তারপরে বাড়ির দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে চললো।

কবি-দ্বিজেন্দ্র

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

কবির ইন্দ্র তুমি দ্বিজেন্দ্র এ মহাদেশের শ্রেষ্ঠগুণী
গম্ভীর তব কণ্ঠ-নিনাদ কর্ণকুহরে আজিও শুনি।
আজিও তোমার মর্মের বাণী গর্জনগানে গাহিছে ওই,
নূতন প্রভাতে বন্দনা-গানে আনন্দ সুরে মত্ত রই।
বাণীর দেউলে বেজেছে শঙ্খ উঠেছে সূর্য আলোকধারা
দিকে দিকে তার জ্যোতির কিরণ জাতিরে ক'রেছে
চিত্তহারা।
হে মহাতাপস! সঙ্গীতে তব ভক্তি বিতরে মুক্তি-প্রাণা
গরিমা-লুপ্ত দেশের ললাটে মন্ত্রের বলে শক্তি আনা।
ভ্রূকুটি তোমার বহ্নি জেলেছে পাপতাপ যত
দিয়েছ মুছে
জাতির দুঃখ বেদনা পুঞ্জ ইঙ্গিতে তার গিয়েছে ঘুচে।

* * *

সেদিন তোমার জাদুর লেখনী নাট্যে-কাব্যে
তুলেছে ঢেউ
বঙ্গ-বাণীর অঙ্গন তলে তোমারে কখনো
ভুলেছে কেউ!
যাদের প্রাণের প্রাঙ্গণ মাঝে ঢেলেছিলে
তুমি আলোকধারা
জননীর গানে তুমি যে পাগল: আশিস তোমারে
ক'রেছে মাতা।
শত বরষের শুভখনে তাই তোমা-লাগি তাঁর আসন পাতা।
ভাবীকালে যদি নব কবি দল ভুলে গিয়ে তব কাব্য-প্রীতি
আপন মহিমা করিতে প্রচার ঢেকে রাখে তারা
তোমার স্মৃতি,
বঙ্গ-ভাষার জননী সেদিন মলিন আননে রহিবে চাহি:
"কোথা দ্বিজেন্দ্র! কবির ইন্দ্র, ইন্দ্রধনু সে আকাশে নাহি।"

* * *

শত বরষের কত অভিশাপে দেখেছিলে মা'র বিষাদ ছবি
অন্তর তাই উঠেছিল কেঁদে গিয়েছিলে ক্ষেপে পাগল কবি।
জাতিরে ডাকিয়া অভয় বাণীতে আশ্বাস তারে দিয়েছো মুখে
স্মরণ করালে আত্ম-গরিমা বিশ্বাস আনি দেশের বুকে।
সমুখে তাহার ইতিহাস তুলি ব'লেছিলে পুনঃ মানুষ হ'তে
দিকে দিকে তাই জেগেছে হৃদয় দুর্বার কোন্ জীবন
স্রোতে।
দামামা তোমার বেজেছিল বুকে জেগেছিল দেশ নতুন গানে
সুপ্তির ঘোরে জাগ্রত বাণী ঝঙ্কারি ওঠে নবীন প্রাণে।
মরিয়া যাহারা হ'য়েছে অমর তাদের প্রেরণা জাগালে তুমি,

ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস—

গত ৯ই ও ১০ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ২ দিন ভুবনেশ্বরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৮তম অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম দিন নূতন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার তামিল ভাষায় সংক্ষিপ্ত সভাপতির অভিভাষণ দান করেন। তিনি সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গঠনের সার্বজনীন দায়িত্বের অংশ গ্রহণের জন্য ভারতের জনগণকে আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণের পর মৃত নেতাদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইলে শ্রীএস-কে-পাতিলের প্রস্তাবে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়—তাহাতে বলা হয়—সক্রিয় সদস্যদিগকে বার্ষিক ১২ টাকা চাঁদা দিতে ও ৫০ জন প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। শ্রীএন-ভি গ্যাডগিল ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয়। শ্রীঅজিতপ্রকাশ জৈন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরদিন সকালের অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বিকালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণের পর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥০টায় শ্রীনাদারের সমাপ্তি ভাষণের পর কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হয়।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা—

১০ই জানুয়ারী ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রস্তাবের আলোচনা কালে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গে হিন্দু নির্যাতন ও হিন্দুনিধনের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন—বিশ্বের অন্যান্য দেশে যখনই কোন মানবগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার হয়, তখনই ভারত তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ও অত্যাচার বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করে। আজ যখন পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চলিতেছে, তখন ভারত কি বসিয়া থাকিবে? পাকিস্তান এই নির্যাতন বন্ধ না করিলে— ভারতসরকার যাহাতে কঠোর ব্যবস্থা (চীনের বিরুদ্ধে যেমন করা হইয়াছে) অবলম্বন করেন, সে জন্য ভারতসরকারকে অনুরোধ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের অপর প্রতিনিধি শ্রীধীরেন ঘটকও শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের কথা সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কন্যাকুমারীতে স্বামীজির মূর্তি

কেরলের খ্যাতিমান রাজনীতিক নেতা শ্রীমন্নাথ পদ্মনাভনের নেতৃত্বে বিবেকানন্দ রকে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সংসদের তিন শতাধিক সদস্যের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও মাদ্রাজ সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ঐ আবেদনে কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দশিলার উপর স্বামী বিবেকানন্দের এক মূর্তি নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে। লোকসভার ও রাজ্যসভার যে ৩২৩ জন সদস্য ঐ আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাতে দেশের সকল রাজ্যের ও সকল রাজনীতিক দলের প্রতিনিধি আছেন। কাজেই জাতির অধিকাংশ লোক ঐ দাবীর সমর্থক। মাত্র একদল খৃষ্টান ধীবরের বিরুদ্ধতায় মাদ্রাজসরকার ঐ স্থানে মূর্তি প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান আবেদন কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার অনুমোদনে অসম্মত হইবেন না।

কাশ্মীরে কেশ চুরিতে হাঙ্গামা—

কাশ্মীরের শ্রীনগরে হজরতবাল মসজিদে পয়গম্বর মহম্মদের পবিত্র কেশ রক্ষা করা ছিল। একদল দুর্বৃত্ত কাশ্মীরে গণ্ডগোল সৃষ্টির জন্য ২৬শে ডিসেম্বর ঐ কেশ স্থানান্তরিত করিয়াছিল। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান রাজ্য হইলেও অধিকাংশ মুসলমান জাতীয়তাবাদী, তাহারা স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের সহিত যুক্ত না হইয়া ভারত রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইয়া আছে। তন্মধ্যে কয়েকজন দুর্বৃত্ত

মুসলমান সর্বদা কাশ্মীরের মুসলমানদিগকে মিথ্যা কথা বলিয়া উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। তাহারাই গণ্ডগোল সৃষ্টির জন্য কেশ চুরি করে। পরে ভয় পাইয়া ৪ঠা জানুয়ারী আবার ঐ পবিত্র কেশ যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। কাশ্মীর পুলিস ও দিল্লীর পুলিশ জোর তদন্ত করায় দুর্বৃত্তরা ভয় পাইয়া কেশ ফিরাইয়া দিয়াছে। ফলে কাশ্মীরে কয়েক দিন গণ্ডগোল হইলেও তাহা থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানে একদল অবাঙ্গালী মুসলমান হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করায় আবার ভারতে সম্প্রদায়িক অশান্তির আগুন জলিয়া উঠিয়াছে। ভারতরাষ্ট্র কঠোরতার সহিত দাঙ্গা দমন করিতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ দাঙ্গা দমনে তৎপর হয় নাই।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্মরণে—

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৪ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৮-তম জন্মদিবস উপলক্ষে ভারত সরকারের ডাকবিভাগ ২ প্রকার নূতন টিকিট বাহির করিবেন—১৫ নয়া পয়সার টিকিটে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতীকের সহিত নেতাজীর ছবি ও ৫৫ নয়া পয়সার টিকিটে দিল্লী চলো লেখা চিত্র ছাপা হইয়াছে। নেতাজী আজও জীবিত আছেন কি না তাহা কেহ জানে না। ভারত সরকার নেতাজীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, ইহাই আনন্দের সংবাদ।

ঐ দিন ২ খানি রেকর্ডে তাঁহার ভাষণ প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের ২৫শে ও ২৬শে জুন টোকিও হইতে নেতাজী দেশবাসীকে যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহার এক খানি বাংলা ও একখানি ইংরাজী রেকর্ড ২৩শে জানুয়ারী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দিন নেতাজীর লেখা ১২০টি পত্র সম্বলিত এক পুস্তক প্রকাশিত হইল—চিঠিগুলি ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত লেখা। নেতাজীকে এই এই ভাবে স্মরণ করিয়া ভারতবাসী যেন নব শক্তি লাভ করে।

শ্রীজহরলাল নেহরু—

উড়িষ্যা তালচের হইতে ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া ৫ই জানুয়ারী শ্রীজহরলাল নেহরু অসুস্থ হইয়া পড়েন। পরদিন ৬ই জানুয়ারী অসুস্থ শরীর লইয়াই তিনি কংগ্রেস-সভায় যোগদান করেন। ৬ই রাত্রিতে তাঁহার জ্বর হয় ও রক্তের চাপ বাড়িয়া যায়—কাজেই ৭ই হইতে তাঁহাকে ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার রাজ্যপাল ভবনে শয্যায় থাকিতে হয়। তিন দিন পূর্ণ বিশ্রামের পর তিনি সুস্থ হন ও ১০ই সকালে ঘরের বারান্দায় বসিয়া বই ও সংবাদপত্র পাঠ করেন। শ্রীনেহরুর অকস্মাৎ এই অসুস্থতায় দেশবাসী শঙ্কিত—তাঁহারা শ্রীনেহরুর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সর্বদা সর্বত্র প্রার্থনা করিতেছেন।

বার্তাজীবী সংঘে শ্রীনেহরু—

২৫শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বোম্বায়ে ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের একাদশ বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি তথায় বলেন—দেশে বহু নূতন সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়া তিনি আনন্দিত—তিনি বার্তাজীবিগণকে অনুরোধ করেন—সকলে যেন গ্রামের সংবাদ অধিক পরিমাণে প্রকাশ করেন—গ্রামগুলিকে নূতন জীবন দান না করিলে ভারত সমৃদ্ধ হইবে না। তাহা ছাড়া সরকারী উদ্যোগে যে সকল উন্নয়ন কার্য সম্পাদিত হইতেছে, সেগুলির প্রচারও অধিক প্রয়োজন। বার্তাজীবীরাও নিজ কর্তব্যে অবহিত হইলে দেশ উন্নত হইবে এবং বার্তাজীবীরাও ব্যক্তিগতজীবনে উপকৃত হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা—

শ্রীএম-সি-চাগলা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোবিদ এবং বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্বেই নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ১১ই জানুয়ারী কলিকাতায় আসিয়া সাংবাদিকদের নিকট বলেন—পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতি কোন মতেই সন্তোষজনক নহে। রাজ্যের অস্বাভাবিক জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও শরণার্থীদের অবিরাম আগমনই এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। শ্রীচাগলার এই স্পষ্টোক্তিকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার মত মনীষী অবশ্যই উহার প্রতিকার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন।

তালচেরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র—

৫ই জানুয়ারী রবিবার প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু উড়িষ্যারাজ্যের তালচেরে যাইয়া ২৫০ এম-ওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঐ কেন্দ্র নির্ম্মিত হইবে—তন্মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সি ৩ কোটি টাকা সাহায্য দিবেন। শ্রীনেহরু ঐ দিন তালচের হইতে টিকেরপাড়া যাইয়া একটি বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় ১০০ মাইল পশ্চিমে টিকেরপাড়া—মহানদীর উপর এই বাঁধ উড়িষ্যাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিবে। ২৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ঐ বাঁধ নির্ম্মিত হইবে—উহা ৪১৭০ ফিট দীর্ঘ ও সমুদ্রস্তর হইতে ৪৫০ ফিট উচ্চ হইবে। ঐদিন ভুবনেশ্বরে ফিরিয়াই শ্রীনেহরু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বারুণী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র—

বারুণী উত্তর বিহারে অবস্থিত—স্থানটি কলিকাতা হইতে ২৫০ মাইল ও পাটনা হইতে ৬০ মাইল দূরে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার অর্থ-সাহায্যে যে বিরাট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, গত ২রা জানুয়ারী হইতে তথায় বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। ঐ কেন্দ্র হইতে ১৫ হাজার কিলোওয়াট পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। দেশে যত অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। ভারতের প্রতি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইলে এরূপ বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

কলিকাতা বাকুলিয়া হাউসের সন্তান, মেসার্স গঙ্গাধর ব্যানার্জি কোম্পানীর কর্মকর্তা শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৬৪ সালের জন্য কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও গবেষক এবং ব্যবসায়ী মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি কাণ্ডি ও টোকিওতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ত্রিগুণা সেন—

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটার (প্রধান কর্মকর্তা) ডাঃ ত্রিগুণা সেন সম্প্রতি পুনরায় ৪ বৎসরের জন্য রেকটার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্বে ৩ বারে ১২ বৎসর ঐ পদে কাজ করিয়াছেন। এক সময়ে তিনি কলিকাতার মেয়র ছিলেন। আমরা তাহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন রেজিষ্ট্রার—

শ্রীসরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, এটর্ণী-এট্‌-ল কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আইনের কৃতী ছাত্র শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন যাবৎ হাইকোর্টের কাজে নিযুক্ত আছেন এবং নিজ কর্ম্মদক্ষতার গুণে সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া-

শ্রীসরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেন। এতাবৎকাল তিনি হাইকোর্টের আদিম বিভাগের মাষ্টার ও অফিসিয়াল্ রেফারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

সদালাপী, ক্রীড়ানুরাগী, অক্লান্তকর্মী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্বনামখ্যাত পরলোকগত এটর্ণী শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এবং "ভারতবর্ষ" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও অন্যতম স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা।

আমরা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত—

পাকিস্তানের যশোহর ও খুলনা জেলায় পাকিস্তানী মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুরা নির্য্যাতিত ও নিহত [illegible]

১০ই জানুয়ারী শুক্রবার কলিকাতার ছাত্রসমাজ সভা ও মিছিলের মাধ্যমে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিন গড়িয়ায় দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের প্রাঙ্গণে পুলিশ ছাত্রগণের উপর গুলী বর্ষণ করায় বি-এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ভূদেব সেন গুলীবিদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। ভূদেবের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর—সে দক্ষিণ কলিকাতার বিশিষ্ট এডভোকেট শ্রীসত্যেন সেনের পুত্র। ঘটনাটি এমন শোকাবহ যে এ সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। কে, কেন ঐ তরুণ ছাত্রকে হত্যা করিল, সে সম্বন্ধে ব্যাপক তদন্ত করিয়া অপরাধীর শাস্তি বিধান প্রয়োজন। স্বাধীন দেশের পুলিশ কর্তৃক এই উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আমরা ভূদেবের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

আর এম্ এস কর্মীর মৃত্যু—

৯ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রিতে দাঙ্গার সময় আনন্দবাজারপত্রিকা অফিসের নিকট সুতারকীন ষ্ট্রীটে আনন্দবাজার পত্রিকা পোষ্টাফিসের আর, এম্, এস কর্মী শম্ভুনাথ শর্মা আততায়ী দ্বারা ছুরিকাহত হয় ও পরদিন শুক্রবার রাত্রি ৮টা নাগাদ সে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ডিউটি দিবার জন্য বাড়ী হইতে অফিসে আসার সময় সে আহত হইয়াছিল।

মহেশ্বরপাশা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত—

খুলনা সদরের অতি নিকটস্থ মহেশ্বরপাশা গ্রাম সর্বজন পরিচিত। গত ৫ই জানুয়ারী বা উহার কাছাকাছি কোন দিনে পাকিস্তানের দুর্বৃত্তেরা ঐ গ্রাম এমনভাবে পুড়াইয়া দিয়াছে যে তাহার চিহ্নও এখন দেখা যায় না। বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া এক হিন্দু এই খবর দিয়াছে। যশোহর খুলনা জেলার আরও কত গ্রাম পুড়িয়াছে কে জানে ?

দিল্লীতে শ্রীনেহরু—

অসুস্থ অবস্থায় কয়দিন ভুবনেশ্বরে থাকার পর শ্রীজহরলাল নেহরু বিমানযোগে ১২ই জানুয়ারী রবিবার দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। ডাক্তারগণ তাঁহাকে ১৫দিন পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি কলিকাতার হাঙ্গামা সম্বন্ধে সরকারী কাগজপত্র দেখিতে চাহিলেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহাকে সে কার্যে বিরত করিয়াছেন।

১০ জন মনোনীত সদস্য—

নূতন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার ১১ই জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ১০ জন মনোনীত সদস্যের নাম ঘোষণা করিয়াছেন—পরে আরও তিনজন মনোনীত সদস্যের নাম ঘোষণা করা হইবে। ১০জন হইলেন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, মোরারজী দেশাই, জগজীবনরাম, এস-কে পাতিল, ডি-সঞ্জীবায়া, সঞ্জীব রেড্ডী, অতুল্য ঘোষ, ফকরুদ্দীন আলি আমেদ, এস-নিজলিঙ্গাপ্পা ও গুলজারীলাল নন্দ। সি-রাজা গোপালন জেনারেল সেক্রেটারী ও অতুল্য ঘোষ কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। মোট ২১জন সদস্য লইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইবে—তন্মধ্যে ৭জন নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সদস্য হইয়াছেন।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটি—

ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে শ্রীকামরাজ নাদার কংগ্রেসের নূতন সভাপতি হইয়াছেন -তিনি ২০জন সদস্য লইয়া নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি করিবেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৭ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণ কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন (১) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (২) শ্রীচ্যবন (৩) শ্রীরাজা গোপালন্ (৪) ডাঃ রামসুভগ সিং (৫) শ্রীসাদিক আলি। ইহারা ৫জন পূর্বেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ছিলেন—নূতন নির্বাচিত হইলেন ২জন (১) শ্রীবিজু পট্টনায়ক ও (২) শ্রীসুখদিয়া। নির্বাচনে দাঁড়াইয়াছিলেন —১৩ জন— পরাজিত হইলেন ৬জন (১) শ্রীচন্দ্র ভানুগুপ্ত (২) শ্রীমহাবীর ত্যাগী (৩) শ্রীকে-ডি মালব্য (৪) এস-এন-মিশ্র (৫) কে হনুমন্তিয়া ও (৬) ডাঃ এস্-কে-মহতাব। শ্রীদরবারা সিং নির্বাচনে দাঁড়াইয়া শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ১৪ই মার্চ হইতে ১৭ই মার্চ (১৯৬৪) ৪দিন বারাসতে ২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ঐ সম্মিলনে উদ্বোধকরূপে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, বিশেষ বক্তারূপে কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ, প্রদর্শনীর উদ্বোধকরূপে শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধকরূপে লেডী রাণু

মুখোপাধ্যায় যোগদান করিবেন। বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিবেন শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবীর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীঅশোককুমার সরকার ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশি, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীঅখিল নিয়োগী, ডাঃ শ্রীরমা চৌধুরী, শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রভৃতি। সম্মিলনের জন্য বিশেষ সদস্য ২৫ টাকা, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ১০ টাকা ও প্রতিনিধি ফি ৩ টাকা চাঁদা ধার্য হইয়াছে। শ্রীঅশোক-কৃষ্ণ দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কোষাধ্যক্ষ ও শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সকল সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কলিকাতা-১, ১০ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ২৪ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ কার্যালয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পাঞ্চেন লামা বন্দী—

২৫শে ডিসেম্বর গ্যাংটকে খবর আসিয়াছে যে তিব্বতের ধর্মগুরু পাঞ্চেম লামা চীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নজরবন্দী হইয়া আছেন ও তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। তিনি কোথায় আছেন, কেহ জানে না—তাঁহাকে পিকিংয়ে চীনা জাতীয় সম্মিলনে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। দালাই লামা তিব্বত ত্যাগ করিয়া ভারতে আসার পর পাঞ্চেন লামা তথায় ধর্মগুরু ও দেশনেতা হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ কি তাঁহার রক্ষায় অগ্রসর হইবেন?

পরলোকে রাজেন্দ্র সিংজী—

ভারতের স্থলবাহিনীর প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক রাজেন্দ্র সিংজী গত ১লা জানুয়ারী বোম্বায়ের সামরিক হাসপাতালে হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যা হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৯ সালে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি রাজ-কোট রাজকুমার কলেজে, বিলাতে মেলবোর্ণে ও পরে স্যাণ্ডহার্ষ্টে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৯৪১ সালে উত্তর আফ্রিকায় জার্মাণ ও ইতালীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তিনি খ্যাতি ও উচ্চপদ লাভ করেন এবং পরে হায়দ্রাবাদ-অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়া সর্বাধিনায়ক হন। ১৯৫৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৪শে ডিসেম্বর পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মূল সভাপতি খ্যাতি-মান লেখক ও সাধক শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁহার ভাষণে বলেন—পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শনে মুক্তি নাই। ভারতের সনাতন আদর্শকে আজ সাহিত্যে গ্রহণ করতে হবে। ভগবানের করুণাকে সাহিত্যে আবাহন করার সময় আজ
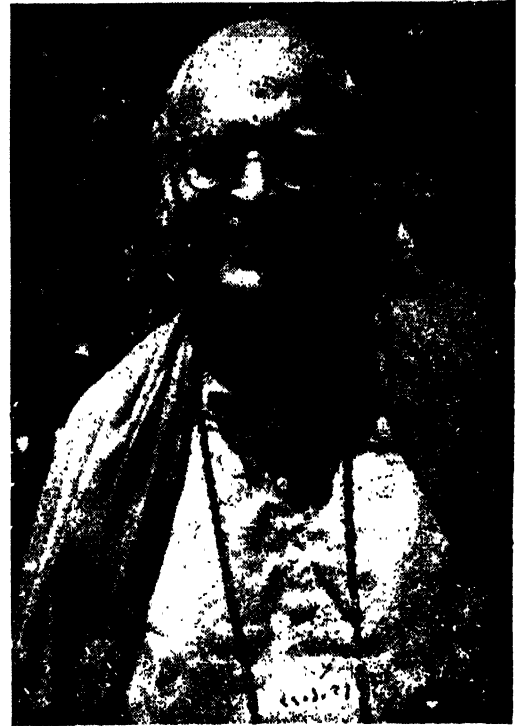
শ্রীদিলীপকুমার রায়

এসেছে। কি ভাবে মানুষ অমৃত হয় তার দিশা পেতে হলে, নানা দেশের মহাসাধক মহাপুরুষদের জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ একটি উপায়। আর একটি উপায় যাঁরা ঋষিদৃষ্টি লাভ করেছেন—সেই তত্ত্বদর্শীদের প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা করে আশীর্বাদ লাভ করা। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীথানু পিলাই সম্মিলনের উদ্বোধন করে বলেন—জাতীয় সংহতির জন্য সারা ভারতে এক ভাষা চলা প্রয়োজন।

তিনি ইংরাজি ও মাতৃভাষা ছাড়া আর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষার কথা বলেন। সম্মেলনসভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ ঐ দিন তাঁহার ভাষণে পাঞ্জাব ও বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ঐতিহাসিক প্রমাণসহ বিবৃত করেন। মূল সভাপতি বহু সঙ্গীত গান করিয়া তাহার ভাষণকে সকলের মনোমুগ্ধকর করায় তাঁহার অপূর্ব সঙ্গীত শুনিয়া সকলে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু—

গত ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যায় কলিকাতা মহাজাতি সদন হলে জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বসু মহাশয়কে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতিত্ব করেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবীর সভার উদ্বোধন করেন, আচার্যের শিক্ষক ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব ও শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সত্যেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ও বিজ্ঞান জগতে তাঁহার দানের কথা বিবৃত করিয়া ভাষণ দেন। আমরা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রদ্ধাভিবাদন জানাই ও প্রার্থনা করি তিনি শতায়ু হইয়া বিজ্ঞানের সেবা করুন।

ইতিহাস রচনার গুরুত্ব—

গত ২৮শে ডিসেম্বর পুণা সহরে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আধুনিক ইতিহাস শাখায় সভাপতি হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী-কমিশনের উন্নয়ন অফিসার অধ্যাপক সুকুমার ভট্টাচার্য বলেন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ ঐতিহাসিকদের রচনা উৎসাহব্যঞ্জক নহে। কিন্তু দেশী লেখকদের রচিত ইতিহাস পুস্তকও সাধারণ পাঠক বা শিক্ষাব্রতীদের মনে কোনপ্রকার অনুপ্রেরণা জাগাইতে পারে না। তিনি স্বাধীনতাসংগ্রামে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবদানের কথা ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে লিখিবার জন্য সকল ঐতিহাসিকের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্মৃতি সভা—

গত ৫ই জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা মহাবোধী সোসাইটী হলে বিপ্লবী নায়ক স্বর্গত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ৮৫তম জন্ম দিবস উপলক্ষে এক জনসভা হইয়াছিল। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং সাংবাদিক শ্রীঅনিলধন ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীমাখনলাল কুণ্ডু প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। স্থায়ীভাবে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমারের স্মৃতিরক্ষার জন্য সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীআনন্দপ্রাণ গুপ্ত—

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজির (খড়্গপুর) লেকচারার ইঞ্জিনিয়ার শ্রীআনন্দপ্রাণ গুপ্ত রাশিয়া-সরকারের দুই বৎসরের বৃত্তি পাইয়া সে-দেশে গিয়াছেন।
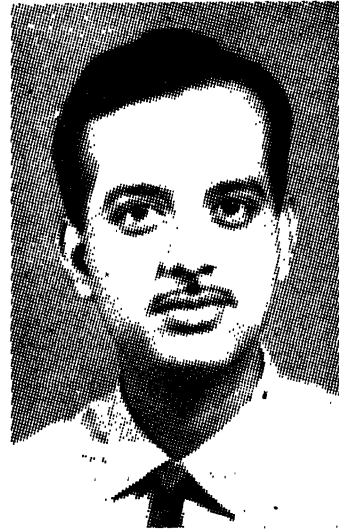
আনন্দপ্রাণ গুপ্ত

কংক্রিট বিদ্যার সর্বাধুনিক পরিণতি ও বৃহত্তম গৃহনির্মাণের আধুনিকতম পদ্ধতি শিক্ষার জন্যই অধ্যাপক শ্রেণীর এই বৃত্তি। শ্রীআনন্দপ্রাণের বয়স ২৬ বৎসর। ইনি সাহিত্যিক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তের পুত্র ও স্বর্গত ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের পৌত্র।

রসিক মোহন স্মরণোৎসব—

গত ২৬শে নবেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা বাগবাজার হরনাথ শিক্ষা সংঘ ভবনে বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের ষোড়শবার্ষিক তিরোভাব উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রভুপাদ শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন এবং সুকবি শ্রীপান্নালাল মাইতি প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবাচার্য রসিকমোহনের

ইরাণের মহামান্যা রাজকুমারী আসরাফ পালভী ও তাঁহার স্বামী ডঃ বুশেরীকে নয়াদিল্লীস্থ কুটীরশিল্প-বিপনীতে দেখা যাইতেছে

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে চ্যান্সেলার ডঃ জাকির হোসেন, প্রঃ এ. আবুবকর, ৫ঃ বরিশ বরিশোভিক পিওট্রোভস্কি ও প্রঃ ইব্রাহিম পুরডাবুডকে অনারারী ডক্টর অব লেটার্স উপাধি এবং স্যার উইলিয়াম লরেন্স ব্রাগ স্যার সি, ভি রমণ ও ৫ঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে অনারারী ডক্টর অব সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত করেন।

ছবিতে দেখা যাইতেছে ডঃ জাকির হোসেন স্যার সি, ভি রমণকে উপাধি পত্র প্রদান করিতেছেন।

গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিলে তদ্দ্বারা দেশবাসী উপকৃত হইবে।

২৪ পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘ—

গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার বসিরহাট টাউনহলে ২৪ পরগণা জেলাসাংবাদিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হইয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার বলেন—অন্যান্য দেশে জাতীয় সংবাদপত্র ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রের ভূমিকা পৃথক। সে সব দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য আছে অসংখ্য ছোট ছোট সংবাদপত্র। বাংলাদেশে দৈনিকগুলিকে উভয় কর্তব্য পালন করিতে হয়—সে জন্য নাগরিক রাজনীতি ও পৌর সমাচারের চাপে গ্রামের বার্তা অস্ফুট থাকিয়া যায়। সম্মিলনের প্রধান অতিথি হইয়া দৈনিক বসুমতীর বার্তা-সম্পাদক শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—মফঃস্বল সংবাদকে বাদ দিয়া সংবাদপত্র চালানো সম্ভব নহে। অশোককুমার যে আঞ্চলিক সংবাদপত্রের কথা বলিয়াছেন, আমাদের দেশে প্রতি মহকুমা সহর হইতে সেরূপ পত্র প্রকাশের চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানের আঞ্চলিক পত্রগুলিকে অঞ্চলের মুখপত্র করিতে পারিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

যোগক্ষেম উদ্বোধন—

গত ২৬শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বোম্বায়ে যাইয়া জীবন বীমা কর্পোরেশনের নূতন কেন্দ্রীয় অফিস ভবনের উদ্বোধন করেন—ঐ ভবনের নাম দেওয়া হইয়াছে—"যোগক্ষেম"। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত উদ্বোধন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। দেশে জীবন বীমা রাষ্ট্রীয়করণের পর সর্বভারতীয় এই কেন্দ্রীয় কার্যালয় খোলার প্রয়োজন হইয়াছিল। এখন আর শুধু জীবন বীমা নহে, সাধারণ সকল বীমাই রাষ্ট্রীয়-করণের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। বক্তৃতায় শ্রীনেহরু বলেন যে, তিনি কখনও জীবন বীমা করার পান নাই।

অধ্যাপক সত্যেন বসুর জন্মজয়ন্তীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথবসু ৭১ বৎসরে পদার্পণ করলেন। তাঁর এই জন্মদিনে তাঁর ৭০ বৎসর বয়সপূর্তির এক উৎসব তাঁর গুণগ্রাহীরা আয়োজন করেছিলেন। ১লা জানুয়ারী হতে আরম্ভ করে ৭ দিন ধরে সভা চলেছিল এবং রামমোহন লাইব্রেরীতে বিজ্ঞানের এক প্রদর্শনী হয়েছিল।

উৎসবের প্রথম দিন, ১লা জানুয়ারী, মহাজাতি সদনে অপরাহ্নে যে জনসভা হয়েছিল, এই নিবন্ধে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

মহাজাতি সদনে অনেক জনসভা দেখেছি। কিন্তু সেদিনের সভায় অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছিল, তিল-ধারণের স্থান ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের রাজনীতিক জীবন নাই, সরকারী কোন ক্ষমতা, ব্যবসায়ের কোন জাল তাঁর হাতে নেই। তাঁর জন্মদিনের এই শ্রদ্ধাঞ্জলির সভায় গুণগ্রাহীরা এসেছিলেন নিতান্তই মনের টানে, গুণের আকর্ষণে। আমাদের মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল-চন্দ্রের পর ইনিই বাঙ্গালীর মনের মানুষ; জ্ঞান, কর্ম্ম ও হৃদয় দিয়ে তিনি সাক্ষাতে ও পরোক্ষে বহু বাঙ্গালীর চিত্তকে স্পর্শ করেছেন।

মঞ্চের উপর তাঁকে সম্মুখে রেখে পাশে পাশে বসে-ছিলেন সভার সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও ভারত সরকারের ভূতপূর্ব কৃষিমন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর। সমস্ত মঞ্চ পূর্ণ হয়েছিল বহু গুণিজনের দ্বারা। সত্যেন্দ্র-নাথের সহধর্মিণী উষাদেবী তাঁর কন্যা ও নাতি-নাতনীকে নিয়ে কাছেই বসে দেখছিলেন স্বামীর স্নিগ্ধমুখচ্ছবি—গুরু, ভক্ত, শিষ্য, বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর সপ্রেম মধুর ব্যবহার।

বেদগান দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হল। দেশ বিদেশের প্রথিতযশা মানুষদের চিঠি পড়ে শোনালেন অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়। সবাই সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক জীবনের যশের সুখ্যাতি করে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

তারপর আসতে থাকল মালা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা, যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মালা দিলেন। বিজ্ঞান কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, বসু-বিজ্ঞান মন্দির, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, সিরামিক ইনষ্টিটিউট, পদার্থ বিজ্ঞান সমিতি—আরো অনেকে মালা এনে সত্যেন্দ্রনাথকে দিলেন। যাঁরা প্রতিভূ হয়ে এসেছিলেন, দেখলাম, সকলেই মালা এনে পায়ের কাছে রাখলেন, প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ নিলেন। মালা ও তোড়ায় মঞ্চের সম্মুখ ভাগে একটি উচ্চ-স্তূপ হল। অধ্যাপক বসুর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা উষাদেবীকেও মালা ও পুষ্পস্তবক দেওয়া হল।

বান্ধবদের পক্ষ হতে প্রশস্তিপত্র পাঠ করলেন শ্রীগিরিজা-পতি ভট্টাচার্য। উৎসবের উদ্যোক্তাদের পক্ষ হতে একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি পঠিত হল। সমস্ত সভাক্ষেত্রের সমবেত জন-মণ্ডলী উপরে ও নীচের সকল আসন পূর্ণ হয়েও আরও বেশী জনতা ছিল—পরম ঔৎসুক্যে শান্ত হয়ে এসব পাঠ শুনে পাঠান্তে জয়ধ্বনি করেছিল। তারপর আবার শান্ত হয়ে পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য উৎকর্ণ হয়েছিল।

অধ্যাপক শ্রীহুমায়ুন কবীর সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের গবেষণা ও তাঁর ব্যক্তিজীবনের বৈশিষ্ট্যের বিষয় আলোচনা করেন। শ্রীকবীর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে অধ্যাপক বসুর গবেষণা বিজ্ঞানের জগৎসভায় ভারত ও বাংলাকে সম্মানের আসন এনে দিয়েছে। তাঁর জীবনে বিজ্ঞানের সাধনার সঙ্গে জনকল্যাণের যে চেষ্টার মিশ্রণ হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা করে শ্রীকবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন সত্যেন্দ্রনাথের সমাজ-সেবার

উল্লেখ করেন। উৎকৃষ্ট ছাত্র, বিজ্ঞানের সেবক, জন-কল্যাণকর কর্ম্মী, বিখ্যাত অধ্যাপক, মানবদরদী, আত্ম-ভোলা, বন্ধুবৎসল, হৃদয়বান অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি নিজের ও বাংলার গুণগ্রাহী জনসাধারণের পক্ষ হতে সম্বর্ধনা জানান। তাঁর এই জন্মদিন উৎসবে সকলের প্রার্থনা "তিনি যেন শতায়ু হন। তাঁর অবশিষ্ট জীবন যেন সুস্থ ও শান্তির জীবন পায়, ভারতের তথা বিশ্বের মঙ্গল সাধনায় যেন তাঁর জীবন আরও কর্মময় হয়ে ওঠে।"

শ্রীহারীতকৃষ্ণদেব সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র বয়স হতেই বন্ধু। শ্রীদেব সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধুপ্রীতি ও পরদুঃখকাতরতার উল্লেখ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীমল্লিকও নানা প্রশস্তি উচ্চারণ করেন।

অধ্যাপক ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বসু সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানী জীবনের সূচনার মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করেন। প্রবন্ধ-লেখকের লিখিত "অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু"র জীবন তে এই বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র বয়স হতে আরম্ভ করে স্মৃতিকথা বলেন। তাঁর পরি-সংখ্যান কাজেও যে সত্যেন্দ্রনাথ মূল্যবান সহায়তা করেছিলেন সে বিবরণ দিয়ে তিনি তাঁর মেধা, বুদ্ধি ও গবেষণা ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই মনোজ্ঞ বিবরণের পর তিনি বিশেষ প্রীতিকর বর্ণনা দেন। তার মর্ম এই যে তিনি নানা কাজে যখন বিদেশে যান, তখন লক্ষ্য করেন, সে-দেশের অনেক বিখ্যাত মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের খবর জানতে চান এবং এমন প্রীতিপূর্ণ-ভাবে তার সম্বন্ধে আলোচন করেন যেন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের কত আপন জন। এমনি ঘটে'ছল, ফ্রান্স, জার্মাণী, ইংলণ্ড ও ইজিপ্টে। ওসব দেশে থাকার সময় সত্যেন্দ্র-নাথের সহৃদয় ব্যবহার ও বিস্তীর্ণ জ্ঞান তাঁকে এমনি জনপ্রিয় করেছে। সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ হতে অধ্যাপক বসুকে মূল্যবান বস্ত্রাদি উপহার দেওয়া হয়।

সভাপতির অনুরোধে সত্যেন্দ্রনাথ এক ভাষণ দেন। অতি সহজ সুন্দর বাংলায় তিনি প্রায় আধঘণ্টা ধরে তাঁর জীবনের নানা কথা বলেন। সংক্ষেপে এখানে তার মর্ম দিচ্ছি।

"বিজ্ঞানীর জীবন আমরা যাঁরা বেছে নিয়েছিলাম তাঁদের অনেকে এখন বেঁচে নেই। সে একটা যুগ, যখন দেশের মঙ্গলের জন্য কত আলোচনা, কত উৎসাহ, কত কাজ আমাদের ছাত্রদের দ্বারা হত। ছাত্রজীবনের পর আমরা এদেশে বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য কাজে লেগে গেলুম। কতখানি হয়েছে জানিনে।

অনেক যে বাকী আছে, তা জানি। আর জানি, বিজ্ঞানের পথই পথ। ধর্মের সাথে তার বিরোধ নেই। মানুষের মঙ্গলের সহায়ক, জীবন ও জীবিকার পোষক এই বিজ্ঞানকে কোন কোন মানুষ অমঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করেন এই অভিযোগ সত্য হলেও সব মানুষ লোভী স্বার্থ-পর পরদ্বেষী নয়। ভাই বিদেশ হতে খাদ্য আসে, যন্ত্র আসে, শিক্ষা আসে। সারা দুনিয়ার মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে। নিজ নিজ মনের কথা, দ্বন্দ্ব, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করে অপরকে জানাচ্ছে। আমরা তাঁদের চিন্তা, আবিষ্কারবুদ্ধি হতে ফল পাচ্ছি। আমরাও দিচ্ছি কিছু কিছু।

এই মৈত্রী প্রীতি মানুষকে বেঁচে থাকার ইচ্ছা, আশা দেয়। আবার সংসারের দুঃখতাপে কত মানুষ জীবন আর রাখতে চাচ্ছে না; কেউবা অনাহারে, কেউবা অপরের অত্যাচারে, কেউবা ঈশ্বরের দেখা পাননি বলে। সব জানবার বোঝবার চেষ্টা করেছি, কেবল বিজ্ঞান ধরেই থাকিনি, ছাড়িনিও বিজ্ঞান—কিন্তু সব কি জানা যায়—সব কি বোঝা যায়!

এ দেশের ধর্ম-নেতারা জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে একতাবদ্ধ সমাজ গড়েন নি। তাই কি আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে! ব্রাহ্মণেতর সমূহ চেষ্টা করেছিলেন জ্ঞান বৃদ্ধির। ফলে হল রামচন্দ্রের হাতে তাঁর শিরশ্ছেদ। জাতিও থাকল তলায় পড়ে।

দুর্দিন এসেছে বাংলায়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্রের আদি জীবন ছিল সমাজ সেবার। আজ তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শুনেছি শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজা হয়ে বৃন্দাবন ভুলেছিলেন। আশা করি, আমার প্রফুল্লভায়া বাঙ্গালীর দুঃখ ভুলবেন না।

আমাকে একশত বৎসর বেঁচে থাকতে আপনারা বলেছেন। ৭০ পূর্ণ হল। এখন অবসান হলে ক্ষোভ নেই। যদি বেঁচে থাকি তবে তা হবে উপরি পাওনা। সকলে আমাকে অনেক ভালবেসেছেন, অনেক পেলাম। আপনারা আমার প্রীতি অভিবাদন গ্রহণ করুন।

সভার শেষে কৃতজ্ঞতা জানাতে উঠলেন ডাক্তার বিষ্ণু চাটার্জি। সুন্দর ইংরাজী ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে বহুজনের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

তারপর একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হল। কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীতের আসর। সত্যেন্দ্রের বন্ধু ডাঃ পশুপতি ভট্টাচর্যের বয়স ৭৫। তাঁর মিঠা গলার "ওহে সুন্দর' গানটি দিয়ে এই আসরের সুরু হল।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের মনের মানুষ। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালীর কৃষ্টি ধারার দীপ আজ তাঁরই জীবনে আছে। সেই দীপমূলে আবার আমি আমার প্রণাম রাখলেম

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

শর্ম্মিষ্ঠায় যিনি যে অংশের ভার লইয়াছিলেন, তাহার তালিকা,—

যযাতি	প্রিয়নাথ দত্ত (পিতৃবিয়োগ হওয়ায় যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়)
মাধব্য	কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
মন্ত্রী	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কপিল	শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
বকাসুর	ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙায় তারাচাঁদ গুহ অভিনয় করেন।)
দৈত্য	তারাচাঁদ গুহ (তৎপরিবর্ত্তে নৃত্যলাল দে অভিনয় করেন।)
নগরবাসী	১ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২ রসিকলাল লাহা, ৩ ব্রজদুর্ল্লভ দত্ত।
পারিসদ্বর্গ	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ), প্রিয়নাথ শেঠ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
চোপদার	দ্বারকানাথ মল্লিক ও মহেশচন্দ্র চন্দ্র (তৎ-পরিবর্ত্তে কৃষ্ণগোপাল ঘোষ অভিনয় করেন।)
দ্বারবান	যদুনাথ ঘোষ।
দেবযানী	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শর্ম্মিষ্ঠা	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।
পূর্ণিকা	কালিদাস সান্যাল।
দেবিকা	অঘোরচন্দ্র দীঘড়িয়া।
নটী	চুনিলাল বসু।
পরিচারিকা	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
নর্ত্তকী	(রত্নাবলীর নর্ত্তকীগণ) এবং মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
নট	ব্রজদুর্ল্লভ দত্ত।

সাহেবদিগের জন্য শর্ম্মিষ্ঠার ইংরাজী অনুবাদ মাইকেলই করেন। শর্ম্মিষ্ঠার আখড়াই ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হয় এবং ১২৬৬ সালের ৩রা ভাদ্র প্রথম অভিনয় হয়। ইহার সাত আটবার অভিনয় হইয়াছিল। শর্ম্মিষ্ঠার বীণা বাজাইয়া গান গাইবার ব্যবস্থা বড় কৌশলে নিষ্পন্ন হইত। শর্ম্মিষ্ঠার অভিনেতা সেতার হাতে করিয়া পরদার উপর কেবল হস্ত চালনা করিয়া মুখে গাইয়া যাইতেন, আর নেপথ্য হইতে একজন সুপটু বাদক সেতার বাজাইতে থাকিতেন। কেবল রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইবার জন্য একদিন শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় হয়।

যখন পাইকপাড়ায় রাজাদিগের উদ্যোগে বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী অভিনয় হয়, সেই সময়ে আহীরীটোলায় শকুন্তলার আখড়াই চলিতে থাকে। ১২৬৬ সালের প্রথমে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে) জনাই-এর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের উদ্যোগে তাঁহাদের কলিকাতার আহীরী-টোলার বাড়ীতেই ইহার অভিনয় হয়। ৺জয়রাম বসাক ইঁহার রঙ্গালয়াধ্যক্ষ ছিলেন ও ৺অভয়চরণ গুপ্ত শিক্ষা

দিতেন। এই অভিনয়ের জন্য আহীরীটোলায় চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বর্ত্তমান বাজারের পাশের হল প্রস্তুত হয়। অভিনেতৃদিগের নাম যথা—

দুষ্মন্ত	অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বিদূষক	অঘোরনাথ পণ্ডিত (?)
কণ্ব	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শার্ঙ্গরব	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
সারস্বত	নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কঞ্চুকী	কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সারথি	মহাদেব ঘোষাল।
শকুন্তলা	অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
অনসূয়া	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রিয়ংবদা	গোপালচন্দ্র দত্ত।
গৌতম	রামগোপাল সুর।
মেনকা	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এই অভিনয় দর্শনার্থ ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ, ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং হুগলী ও শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেবাদি উপস্থিত ছিলেন। প্রভাকর ও ভাস্করে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহার পর ১২৬৬ সালের মধ্যকালে এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষে, প্রথমে বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী অভিনয়ের পর ও শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়ের পূর্ব্বে মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে রাজা সার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কঞ্চুকীর অংশ লইয়াছিলেন। বেলগাছিয়ায় এই নাট্যশালা তখন এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

যে সময়ে শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় চলিতেছিল, সেই সময়ে ৺কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে ও চেষ্টায় সিন্দুরিয়াপটিতে "বিধবা-বিবাহ নাটকের" অভিনয় করিবার অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও আখড়াই চলিতেছিল। সিন্দুরিয়াপটির ৺গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে ইহার স্থান হইয়াছিল। কেশববাবুই এখানকার শিক্ষক। ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

অভিনেতৃবর্গের নাম—

কৃত্তিরাম ঘোষ	মহেন্দ্রনাথ সেন।
মন্মথ	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
রামকান্ত	কৃষ্ণবিহারী সেন।
গুরুমহাশয়	হারাণচন্দ্র মজুমদার।
রামদেব তর্কালঙ্কার	অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার।
বর	যাদবচন্দ্র রায়।
বিধবাবিবাহের পক্ষীয় ব্যক্তি	ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।
সুলোচনা	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
পদ্মাবতী	গোপালচন্দ্র সেন।
সুখময়ীর পুত্রবধূ	নরেন্দ্রনাথ সেন।
রসবতী নাপিতানী	রাখালচন্দ্র সেন।

এই অভিনয়ে তিন জন প্রসিদ্ধ গায়ক গান করিয়াছিলেন—উমেশচন্দ্র ভদ্র, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ক্ষেত্রমোহন বসু এবং নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন যন্ত্রের বাদক ছিলেন,—পঞ্চানন মিত্র, গদাধর মিত্র, রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেণীমাধব সোম। বেলগাছিয়ার অভিনয়ের ন্যায় এই অভিনয়ও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পাইকপাড়ার উত্তেজনায় এই অভিনয় খোলা হয়। প্রথমে "এডেলফি থিয়েটার" ভাড়া করিয়া এই অভিনয়ের প্রস্তাব হয়। ১০০৲ মাসিক ভাড়া চাওয়ায় সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া হলবিন সাহেবকে রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহাতে চারি হাজার টাকা খরচ পড়ে। ৺মুরলীধর সেনই অধিক টাকা দেন, অবশিষ্ট টাকা চাঁদায় উঠে। তখনকার হরকরা পত্রে এই অভিনয়ের বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল।

ইহার পর শোভাবাজার-রাজবাড়ীতে নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব, গোপালচন্দ্র রক্ষিত, চন্দ্রকালী ঘোষ ও কালীকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি ইহার উদ্যোক্তা। ১২৭১ সালে ৺চমৎকারকৃষ্ণ ঘোষের বৈঠকখানায় ইহাদের আখড়াই প্রথম বসে। এই সময়ে প্রিয়মাধব বসু-মল্লিক, প্যারীমোহন দাস, মণিমোহন সরকার প্রভৃতি যোগ দেন। মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা" অভিনয় হয়।

শোভাবাজার "থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি সাধারণ না হইলেও ইহার কার্য্যাদি সোসাইটির উপযুক্ত নিয়মে সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইত। তজ্জন্য সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৺চন্দ্রকালী ঘোষ ইহার সভাপতি এবং ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। রাজা দেবীকৃষ্ণের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হইত। তিনটি প্রকাশ্য অভিনয় হইয়াছিল। কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অভিনয়দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখনকার প্রধান সংবাদপত্র হিন্দু-পেট্রিয়টে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। অভিনেতৃবর্গের নাম—

নববাবু	মণিমোহন সরকার।
কালীবাবু	কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
কর্ত্তা	প্যারীমোহন দাস (বৈষ্ণব)
মাতাল	ঐ
যন্ত্রিগণ	ঐ
বাবাজী	প্রিয়মাধব বসু মল্লিক।
বৈদ্যনাথ	
পাহারাওয়ালা	
খানসামা	জীবনকৃষ্ণ দেব।
চৌকিদার	
সার্জ্জন	কালীকৃষ্ণ বসু।
বারবিলাসিনী (১ম)	হরলাল সেন।
ঐ (২য)	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
প্রসন্নময়ী	ঐ
মুটে	কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব।
কমলা (১)	ঐ
ঐ (২)	গোপালচন্দ্র রক্ষিত।
বাবু (১)	ঐ
ঐ (২)	কুমার ভুপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
দ্বারবান	ঐ
পয়োধরী (নর্ত্তকী)	কালিদাস সান্যাল।
নিতম্বিনী (ঐ)	রামকুমার মুখোপাধ্যায়।
মালী (বেলফুলওয়ালা)	উমেশচন্দ্র মিত্র (ডাক্তার)
বরফওয়ালা	অতুলকৃষ্ণ দেব।
গৃহিণী	জয়কৃষ্ণ বসু।
হরকামিনী	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
নৃত্যকালী	কুমার ববেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

শোভাবাজার রাজবাটির এই দলে পরে "কৃষ্ণকুমারী" অভিনয় হইবে বলিয়া আখড়াই আরম্ভ হয়। এই সময়ে বাগবাজার মদনমোহন-তলানিবাসী ৺নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বন্ধুতাসূত্রে যাতায়াত করিতেন। ১২৬৪ সালের শেষে যখন কৃষ্ণকুমারী খুলিবার উদ্যোগ হয়, সেই সময়ে ৺কালিদাস সান্যালের সহিত রাজাদিগের মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি এবং গোপালবাবু দল ত্যাগ করিয়া আসেন। শেষে উভয়ের চেষ্টায় গোপালবাবুদিগের বাড়ীতে এক নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কালিদাসবাবু নিজে নলদময়ন্তী নাটক রচনা করেন এবং তাহারই আখড়াই আরম্ভ হয়। গোপাল বাবুর নাট্য চেষ্টা যে এই প্রথম স্ফুরিত হয় তাহা নহে। ইহার বৎসরেক পূর্ব্বে সিমলা-নিবাসী জয়গোপাল মিত্র ও নবগোপাল মিত্র মহাশয়েরা শ্রীবৎসচিন্তা-যাত্রার দল করিয়াছিলেন। সেই যাত্রার গাওনা গোপালবাবুদিগের বাড়ীতে একবার হইয়াছিল। এই যাত্রা শুনিয়াই গোপালবাবুর অভিনয়-স্পৃহা বলবতী হয় এবং শোভাবাজার রাজবাটীর কৃষ্ণকুমারীর দলে যোগ দেন। তাহার পর নিজবাটীতে থিয়েটারের দল বসাইয়া, মহা উৎসাহে শিক্ষা দিতে থাকেন। কর্তৃকর্ম্মা কালিদাস সান্যাল মহাশয়ই

এখানে শিক্ষকতা করেন। গোপালবাবু নিজেও শিখাইতেন। ১২৭১ সালের মধ্যকালে (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষে) নল-দময়ন্তীর অভিনয় হয়। এই সম্প্রদায়ের অভিনেতা-দিগের নাম,—

নল	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বিদূষক	কালিদাস সান্যাল।
মন্ত্রী	নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভীমসেন	গগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
কঞ্চুকী	শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী।
ব্যাধ	রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্রাহ্মণ	গিরীশচন্দ্র মিত্র।
ঋষি	গিরীশচন্দ্র ঘোষ। *

* [বেঙ্গল থিয়েটার সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসের অভিনেতা স্থূলকায় গিরীশবাবুই এই ব্যক্তি। ৺বিহারীবাবুর প্রথম অভিনয় ৺কালীসিংহের বাড়ীতে, আর তাঁহার সহযোগী গিরীশবাবুর প্রথম অভিনয় বাগবাজারে]

দ্বারবান	অভয়চরণ পাল।
নট	ক্ষেত্রমোহন বসু।
দময়ন্তী (১)	আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
(২য়)	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সখিত্রয়	গোপালচন্দ্র মজুমদার, আনন্দলাল মিত্র, হরিদাস সরকার।
নটী	হরিশ্চন্দ্র কর্ম্মকার।

এই দল চারিবৎসর চলিয়াছিল। দুই বৎসর "নল-দময়ন্তী" অভিনয় হইয়াছিল। চৌদ্দ বা পোনের বার ইহার অভিনয় হয়। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে ভাটপাপাড়ায় ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ীতে, শিবপুরে চৌধুরী-দিগের বাড়ীতে যে সকল অভিনয় হয়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন পাথুরিয়াঘাটায় বীরনৃসিংহ মল্লিকের বাড়ীতে, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে, ও বসু-পাড়ায় গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। এতদ্ভিন্ন গোকুল মিত্রের বাড়ীতে ও গোপালবাবুর নিজ বাড়ীতে কয়েকবার অভিনয় হইয়াছিল। পাথুরে-ঘাটার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে ইহার যে অভিনয় হয়, তাহাই ইহার ড্রেস্ রিহার্সাল। এই অভিনয়ের এত সুখ্যাতি হইয়াছিল যে লোকে শকুন্তলা অভিনয়ের ন্যায় ইহার আদর করিত। মহারাজ মহাতাব্ চাঁদ বাহাদুর ইহার অভিনয় দেখিয়া এত প্রীত হন যে, তদবধি গ্রন্থকার ও অভিনেতা কালিদাস বাবু মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইয়া পড়েন। কালিদাসবাবু বর্দ্ধমানের রাজসরকারে চাকুরী করিতেন। দুই বৎসর পরে এই দলে "ইন্দুপ্রভা" নামে এক নাটক অভিনীত হয়। চটামহেশতলা-নিবাসী গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা; ইন্দুপ্রভাও পাঁচ সাতবার অভিনীত হইয়াছিল, তবে ইহা গোকুল মিত্রের বাটী ও গোপাল বাবুর নিজ বাটী ভিন্ন অন্যত্র অভিনীত হয় নাই।

এপর্য্যন্ত অনুষ্ঠাতা কোন ধনীর বাড়ীতে বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাট্যাভিনয় সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র গিয়া অভিনয় করার প্রথা তৎকালে ছিল না। বাগ্‌বাজারের এই নল-দময়ন্তীর দল প্রথম বিদেশে যাইয়া সে প্রথা পরিবর্ত্তন করেন। ইন্দুপ্রভা গ্রন্থের বিচিত্রবাহুর অংশ গোপালবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই দলের পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী দলের পরিচয় এই স্থলেই দিতে হইতেছে। উত্তর কালে এই শেষোক্ত দলের সঙ্গে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের বিশেষ সংস্রব ঘটিয়া-ছিল। এই দলের অন্যতম অভিনেতা গিরীশচন্দ্র মিত্র ও আনন্দলাল মিত্র ৺গোকুল মিত্রের বংশধর। এই গিরীশ বাবু একজন উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। নলদময়ন্তীর সহিত যে ঐকতান-বাদ্য বাজিয়া ছিল, তাহার বাদকদল অভিনেতৃ-গণ হইতে ভিন্ন নহে। অবশেষে গিরীশবাবু একটি স্বতন্ত্র বাদকদল গঠন করেন। এই দলে বাগ্‌বাজার ও শ্যাম-বাজার-নিবাসী কতিপয় যুবক যোগ দেন, তন্মধ্যে বসুপাড়া নিবাসী ৺গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ৺নগেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ডাক্তার দুর্গাদাস করের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রাধামাধব করের নাম উল্লেখ করিতে হইতেছে। এই দুই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে বাঙ্গালার আদি সাধারণ রঙ্গা-লয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। এই বাদক দলে এক জন মুসলমান যুবক যোগ দেন। তিনি হিঙ্গুল খাঁ ওরফে হেম বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি এক-

জনসঙ্গীতজ্ঞ ও রহস্যরসপটু অভিনেতা ছিলেন। উত্তর-কালে ন্যাশানাল থিয়েটারে ইনি অভিনয়ও করিতেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

যখন গিরীশ মিত্রের এই বাদকদল গঠিত হয়, সেই সময়ে ভবানীপুরে "অবৈতনিক নাট্য মন্দির" নামে একটি থিয়েটারের দল গঠিত হয়। এখানে উমেশচন্দ্র মিত্রের রচিত সীতার বনবাস নাটক অভিনীত হয়। ১২৭২ সালের চৈত্র মাসে (১৮৬৬। মার্চ্চ মাসে) ৺ নীলমণিমিত্রের বাটীতে (সার রমেশচন্দ্র মিত্রদিগের পুরাতন বাটীতে) ইহার প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের সঙ্গে ভবানীপুরের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বাদক সর্ রমেশচন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা কেশবচন্দ্র মিত্রের ঐকতান-বাদক সম্প্রদায় বাজাইয়া ছিলেন।

এই সময়ে বাগ্‌বাজারের গিরীশচন্দ্র মিত্রের বাজনার দলের খুব সুনাম হইয়াছিল। ভবানীপুরে ৺জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এই বাগ্‌বাজারের দল একদিন বাজাইতে যান। বাজনায় স্থানীয় কেশববাবুর দলের অপেক্ষা বাগ্‌বাজারের দল সুযশ অর্জ্জন করিয়া আসেন। এই সুখ্যাতির পর নগেন্দ্রবাবু গিরীশবাবুর দল ত্যাগ করিয়া বসুপাড়ায় নিজবাটীতে এক বাজনার দল বসান। রাধামাধববাবু ও হিঙ্গুল খাঁ নগেন্দ্রবাবুর দলে মিলিত হন। ক্রমশঃ গিরীশবাবুর দল ভাঙ্গিয়া নগেন্দ্রবাবুর দল পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এই বাগবাজারের একতান-বাদন দলের দুই এক বৎসর অগ্রে শ্যামপুকুরনিবাসী ৺ব্রজনাথ দেব "শ্যামপুকুর একতান-বাদন সম্প্রদায়" নামে এক বাজনার দল করেন। ইঁহারই দলে প্রথম ক্ল্যারিওনেট বাঁশী বাজান আরম্ভ হয়। তখনও কর্নেট বাজান হইত না। তাঁত ও তারের যন্ত্র সমস্ত, পিকলো, ক্ল্যানেটবাঁশী, জলতরঙ্গের বাটীও এই দলে একত্র বাজান হইত। এতদ্ভিন্ন শঙ্খ বাজাইয়া সুর দেওয়া হইত। ডি-সুরে কনসার্ট বাজান হইত, বাছিয়া বাছিয়া ডি-সুরের শাঁখ আনা হইয়াছিল। যতক্ষণ বাজনা হইত, শানাইয়ের পোঁ-ধরা হিসাবে এই শাঁখে সেইরূপ সুর দেওয়া হইত। এই দল হইতে রাধামাধববাবু ক্ল্যারিওনেট বাঁশী ক্রয় করিয়া আনেন। বাগ্‌বাজারের দলে এই বাঁশী বাজিত। ব্রজবাবুর বাজনার দল প্রথম চৈত্র মেলায় বাজাইয়াছিলেন। নাটক-কার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ এই ব্রজবাবুর ভগিনীপতি।

এই সময়ে নানাদিকে নাট্য-চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে যেমন কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব ও শকুন্তলার একটা যুগ গিয়াছিল। এই যুগে সেইরূপ "পদ্মাবতীর" আদর বাড়িয়াছিল।

[ক্রমশঃ
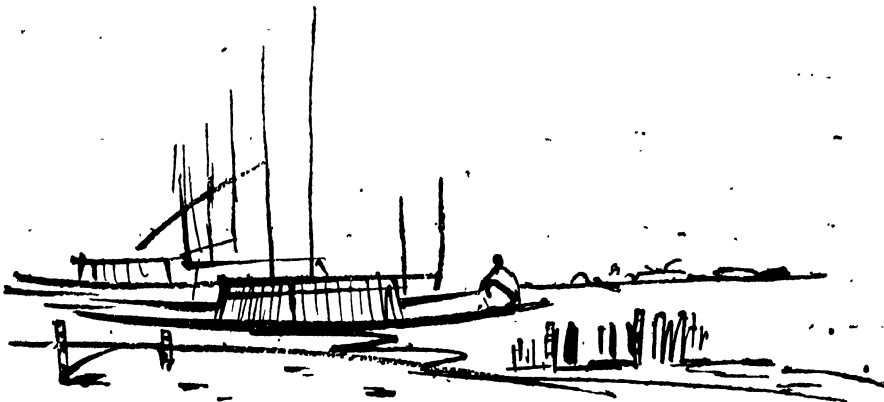
বাপুজি-স্তুতি

জয়তি জয়তি ভারতগতি বাপুজি মুনীশ্বরঃ।
সুখনিদান মোচনদিন মোহন সৃষ্টিকরঃ ॥১
বিহগগান সিন্ধুতান ঝঙ্কৃত পূতস্বরঃ।
সত্যধর্ম কৃত্যমর্ম বিঘোষণ তৎপরঃ ॥২

ভেদবুদ্ধি নাশসিদ্ধি দৃপ্তজীবন ধরঃ।
আত্মশুদ্ধি প্রেমবৃদ্ধি নিত্য বিভূতিচরঃ ॥৩
জয়তি জয়তি জনগণনতি প্রাণপাত্রবরঃ।
রামনাম পরমকাম মায়া মোহহরঃ ॥৪

কথা ঃ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল

স্বরলিপি ঃ শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

ন ন র্স ধ ধ প | প মধ প মজ্ঞ ম জ্ঞ | জ্ঞ - ম প ন র্স | নধ মা ধ প - - |
জ য় তি জ য় তি ভা - র ত- গ তি বা - পু জি মু নী - - শ্ব রঃ - -
ন ন র্স ধ - প | প মধ প মজ্ঞ ম জ্ঞ | জ্ঞ - ম প ন র্স | নধ প ধ প - - |
সু খ নি দা - ন মো - চ ন- দি ন মো - হ ন সৃ ষ্ টি- - ক রঃ - -
প প প জ্ঞম জ্ঞ ম | প - প প - প | প - ন ন র্স র্জ্ঞ | র্জ্ঞ - র্র র্স - - |
বি হ গ গা - ন সিন্ - ধু তা - ন ঝং - কৃ ত পূ - ত - স্ব রঃ - -
র্স - র্র র্র - র্জ্ঞ | র্র র্স র্র ন - র্স | র্স র্স ন ধ ধ ন | ন - ন র্স - - |
স - ত্য ধ - র্ম কৃ - ত্য ম - র্ম বি ঘো - - ষ ণ তৎ - প রঃ - -
ন ন র্স ধ - প | প মধ প মজ্ঞ ম জ্ঞ | প প মপ জ্ঞ মপ | জ্ঞ - স স - - |
স - ত্য ধ - র্ম কৃ - ত্য ম- - র্ম বি ঘো - - ষ ণ তৎ - প রঃ - -

জ্ঞ - জ্ঞ জ্ঞ র জ্ঞ | র স র স ণ্ স | র গ র গ ম প | জ্ঞ জ্ঞ র স - - |
ভে - দ বু - দ্ধি না - শ সি - দ্ধি দৃ - প্ত জী - ব ন - ধ রঃ - -
প - প জ্ঞম জ্ঞ ম | প - প প - প | প - ন র্স জ্ঞ´ জ্ঞ´ | জ্ঞ র্র র্র র্স - - |
ভে - দ বু - - দ্ধি না - শ সি - দ্ধি দৃ - প্ত জী - ব ন - ধ রঃ - -
ন - র্র র্র জ্ঞ´ র্র জ্ঞ´ | র্স নর্র র্স ণ ধ ম | জ্ঞ ম - পর্স ধর্র র্স জ্ঞ´ | জ্ঞ´ র্র র্স র্স র্স - - |
আত্ মশু দ্ধি - - প্রে -- ম বু - দ্ধি নি ত্য - বি - ভূ - - তি - - চ রঃ - -
ন ন ন ন ন ন | ন ন র্স ন র্স র্স | র্স র্র র্স র্র ণ ধ - | র্স র্র জ্ঞ´ র্র - - |
জ য় তি জ য় তি জ ন গ ণ ন তি প্রা - - ণ পা - ত্র - ব রঃ - -
র্র - র্গ র্গ র্ম র্ম | র্ম জ্ঞ´র্ম জ্ঞ র্র র্স র্স | ন - - র্স - র্র | ন র্স র্র নর্স ধ ম |
রা - ম না - ম প র - ম কা - ম মা - - য়া - - - - - - - -
প - - ম ধ ধপ | মজ্ঞ - - - - - | জ্ঞ ম প ন র্ম জ্ঞ´ | জ্ঞ´ - র্র র্স - - ||
মো - - হ - হ রঃ - - - - - মা - য়া - মো - হ - হ রঃ - -

বাউল গান

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

বাউলের গান অনেকেরই ভাল লাগে। আমার লাগেনা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। সেদিন একটি সভায় বাউল গান হইতেছিল। বন্ধুর অনুরোধে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে হইয়াছিল। এই আমার প্রথম শ্রবণে বাউলের প্রতি প্রথম অনুরাগ তাহা নয়। বাউল গান বাউলের মুখে আরও অনেকবার শুনিয়াছি, বাউল দেখিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে তাহাদের অনেকেরই যে এক একটা বিশেষ সাধন-প্রণালী আছে তাহার সম্বন্ধে আমার সন্দেহ এখনও দূরীভূত হয় নাই।

ছেলেবেলায় দেখিয়াছি আমার ঠাকুরদাদার কাছে এক বাউল মাঝে মাঝে আসিতেন। তাঁহার নাম ছিল আশানন্দ বাউল। খুব সাধারণভাবে থাকিলেও তাহার ভাব ছিল উত্তম, আর তিনি ছিলেন অসাধারণ সাধক পুরুষ। একখণ্ড হলুদে রংএর কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। একগাল দাড়ি তাঁহার মুখশ্রীকে যেন মুনি-ঋষির গাম্ভীর্য দিয়াছিল। অথচ তিনি যখন কথা বলিতেন তখন মনে হইত—এক সরলচিত্ত বালক যেন তাহার সরল প্রাণের কথা বলিতেছে। আমরা খুব অল্পবয়সের ছিলাম, তাঁহার অনেক কথাই বুঝিতাম না—তবু মনে ভাবিতাম তিনিও আমাদের মতই একজন। আমাদের মতই অল্পজ্ঞ আর অতি অল্প বয়সের, তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ, তিনি ছিলেন গভীর ভাব নিষ্ঠ। তাঁহার একটি আখড়াবাড়ী ছিল। সেখানে রাজা ছিলেন আশানন্দ বাউল। আশে-পাশে যত প্রতিবেশী তারা ছিল আখড়াবাড়ীর প্রজা, আর আনন্দ উৎসবে অংশীদার উদ্‌যোগী কর্মী। গোবর্ধন যাত্রা উপলক্ষে সেখানে পাহাড় সাজানো হইত, কৃষ্ণলীলার সং প্রদর্শনী হইত। কদিন পর্যন্ত যাত্রাগান কীর্তন প্রভৃতি আনন্দে হাজার হাজার লোক তৃপ্তিলাভ করিত। বাউল বড় দেখা দিতেন না। তাঁহার অন্তরঙ্গ কয়েকটি শিষ্য লইয়া প্রায় তিনি ঘরের মধ্যে থাকিতেন। দেখা যাইত ভোগ আরতির সময় বাউল বাহিরে আসিয়াছেন। তাঁহার হাতে তেল মাখা বংশদণ্ডসার দোতারা বা গোপীযন্ত্র। মাঝে মাঝে বৈষ্ণবী ও ক্ষুদ্রাকৃতি মধুর প্রকৃতি-

মূলক খঞ্জনী হাতে তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দিতেন। বাউল যখন কীর্তনে আপনভোলা হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিতেন, মনে হইত দিব্যলোকে আনন্দলগ্ন উপস্থিত হইল। শ্রোতা ও দর্শক অনেকে অধৈর্য হইয়া সেই নৃত্যে যোগ দিত। তখন শতকণ্ঠে কৃষ্ণ-গোবিন্দ-গোপাল নামে আখড়া মুখরিত হইয়া উঠিত—মঙ্গল রোলে। এইতো তাঁহার বহিরঙ্গ দর্শন।

কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। বাউলের গুণে তাহারা মুগ্ধ, আর মহিমা কীর্তনে সহস্র মুখ। তাহারা বলিতেন—আশানন্দ হাত দিয়া বাতাসা হরির লুট দিতেথাকিলে পাত্র আরশূন্য হয় না, বাতাসা ফুরায় না, যত দেন ছড়াইয়া ততই পাত্র ভরিয়া উঠে। ভোগের পর মন্দিরে যাইয়া একবার তিনি দৃষ্টিপাত করিলে যত লোক প্রসাদ গ্রহণ করুক না কেন প্রসাদের আর অভাব হয় না। কত রোগী তাহার ঔষধ নয় শুধু জলপড়াতে সুস্থ নীরোগ হইয়াছে। তিনি এমন সব গাছের মূল জানেন যে তাহা ধারণ করিলে কঠিন কঠিন ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। একবার একটা লোক সর্পদংশনে মরিয়াই গিয়াছিল, বাউলের কাছে আনার পর তিনি লোকটির কানে কি একটা পাতার রস দিলেন আর সেই মৃত লোক যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। কোথায় কোন্ প্রসূতি গর্ভবেদনায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ, কে যেন ছুটিয়া আসিয়া বাউলকে সেই সংবাদ জানায়—আর সঙ্গে সঙ্গে বাউল হাতে তুড়ী দিয়া বলেন 'যা যা খালাস হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরকে হরির লুট দিতে বলিস্। এমন সব অদ্ভুত ঘটনা বাউলের আখড়ায় নিত্য ঘটিত। সেদিন কে একটি মরা বাছুর টানিয়া আনিয়া আখড়া বাড়ীর দোর গোড়ায় ফেলিয়াছে। সকাল বেলা বাউল ফুল তুলিতে বাহির হইবেন দেখিলেন সেই গোবৎসটিকে। তাহার দয়া হইল, তিনি কাছে গিয়া বলিলেন 'ওঠ ওঠ'। বাছুর ছুটিয়া তাহার মায়ের কাছে গেল।

কয়েকজন গঞ্জিকাসেবী সন্ধ্যার অন্ধকারে আসিয়া আখড়ার ছোট একটি ঘরে বসিত। কোনো কোনো দিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে স্থানটি ধোঁয়াটে হইয়া থাকিত। বাউলের কিন্তু স্বভাব-আরক্ত চক্ষু কোনোদিন অধিকতর আরক্ত বলিয়া দেখা যায় নাই। এমনি করিয়া তাহার দিন কাটিত।

একদিন আসিলেন দূরদেশযাত্রীর একটি দল। তাহারা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে অসিয়াছেন, আশানন্দের গুরু-ভ্রাতার শিষ্য ও শিষ্যা ইহাদের কয়েকজন। সেদিন উৎসব চলিল সারাদিন। খাওয়া-দাওয়া আদর-আপ্যায়ন চন্দন আর ফুলের মালার ছড়াছড়ি। কত ফুল যে আঙ্গিনায় ছড়ানো হইল, আর কতবার সেই বিহ্বল নরনারীর প্রেমালিঙ্গন দেখিয়া যেন কেমনতর লাগিল। তাদের প্রমত্ত-চিত্তের ঐকান্তিক আনন্দ সঙ্গীত লহরী, তাহাদের সহনৃত্য, মধুর কণ্ঠে কীর্তন উন্মাদনা একটি অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করিল সেদিন। বুঝলাম বাউল তাহার নিজের একটা বিশেষ ধরণের ভাব বহন করে—যেটি অন্য সাধারণের কাছে সর্বদা বোদ্ধব্য নয়। তাহাদের এই প্রাণঢালা প্রীতির ভূমিকায় উন্নীত হওয়ার জন্য যে সহজ সাধনা, তাহা অতীব গূঢ় রহস্যাবৃত অথচ অফুরন্ত প্রাণময়।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনায় প্রেমোন্মাদনার আদর্শ বলিতে প্রবৃত্ত কৃষ্ণদাস বাউল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর চরণে আকৃষ্টহৃদয় রঘুনাথের পরিচয়ে 'চৈতন্যের বাউলকে রাখিতে পারে' বলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া অদ্বৈতপ্রভু জগদানন্দকে দিয়া যে তর্জা সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন তাহাতে দেখা যায়, তিনি বলেন—

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

বাউল বলিয়া অদ্বৈত সদগৃহস্থ নিজেরও পরিচয় দিয়াছেন। সন্ন্যাসী-শিরোমণি মহাপ্রভুকে 'বাউল' বলিয়া তাঁহার মত্ততার সূচনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, সংসারাসক্ত সাধারণ আত্মভোলা জীবগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি 'আউল' কথাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তৎকালেও আউল বাউলের পার্থক্যের একটা সন্ধান করা যাইতে পারে। প্রাচীনকাল হইতেই আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সহজীয়া, কর্তাভজা প্রভৃতি বহু গোষ্ঠীর কথা শুনা যায়। ইহাদের নিষ্ঠা ও চরিত্র শাস্ত্রীয় সাধনার পথ হইতে ব্যতিক্রম। সাধনচর্যায় এমন কতগুলি ব্যবহার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত যাহা কোনো সুসংগঠিত সমাজে অচল। শাস্ত্র সদাচার দার্শনিকপ্রসিদ্ধ মতবাদ ছাড়াই ইহাদের নিজস্ব-

নিয়ম মীমাংসা ও আচারক্রম দেখা যায়। তাহাদের বেশ, ভাব, চর্যা প্রভৃতির পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটি রাধাকৃষ্ণ ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবের মতই জীবনধারণ করেন। কোথাও পীত বহির্বাস কৌপীন, আর কখনও আলখাল্লা জাতীয় অঙ্গাবরণ ধারণ করিয়া কোনো এক তারের যন্ত্র হাতে বাউলকে দেখা যায়। ভাবপ্রমত্ততা তাহাদের বিশেষ লক্ষণ। গান করেন বাউল—

তাইতো বাউল হৈনু ভাই
এখন বেদের ভেদ বিভেদের
আরতো দাবি দাওয়া নাই।

সহজীয়া সম্বন্ধে আধুনিকতম গবেষণায় বৌদ্ধ সহজযানের কথা স্বীকার করিতে হয়। বাংলার তান্ত্রিক রূপায়ণে বৌদ্ধপ্রভাব সহায়তা করিয়াছে বহুলাংশে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত প্রদেশগুলি অনেকাংশে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াই ছিল। ভাবপ্রবণ বাংলার মাটিতে অনুকরণধর্ম স্বাভাবিক মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে সহজযানের চর্যা নানাকারে অনুসৃত ও অনুকৃত হইয়া ফলে সংসারবিরাগী বিভিন্ন প্রকার সাধকগোষ্ঠী দেখা দেয়।

চৈতন্যের আবির্ভাব সামাজিক ও ধার্মিক জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল। মেলা মহোৎসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্মেলন সংকীর্তন ধর্মান্তরগ্রহণ মতান্তর পরিবর্তন শুদ্ধীকরণ বেশান্তরগ্রহণ ত্যাগ বৈরাগ্যআদর্শ-সংপ্রসারণ প্রভৃতি বিশেষ করিয়াই নিয়মিতভাবেই ঘটিতেছিল। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরেও শ্রীনিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র সেই সমাজের অধিনায়ক স্বরূপে অদ্ভুত পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। আর্যেতর সমাজের বা সমাজচ্যুত মতবাদ নির্মুক্ত বহু লোক বীরভদ্রের প্রচেষ্টায় সাধুসমাজে স্থান লাভ করিবার সুযোগ পায়। বারহাজার নাঢ়া ও তেরহাজার নেঢ়ী তাহার সঙ্গে ছিল বলিয়া প্রবাদ। এই সমাজে গান্ধর্ব-রীতিতে বিবাহ প্রচলন করিয়া তিনি একটি নতুন গোষ্ঠীর পত্তন করেন। হিন্দুসমাজ তাহার প্রচেষ্টায় আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল এবং এই গোষ্ঠীকে আত্মসাৎ করিয়া লয়। সমাজসংস্কারকগণের অগ্রদূত বীরভদ্রের কথা আমরা অনেকে ভুলিতে বসিলেও বৈষ্ণবগোষ্ঠী ভুলিতে পারে না। বাউলেরা আজও গৌর-নিত্যানন্দ সঙ্গে বীরভদ্রকেও স্মরণ করেন।

তাহারা গান করেন,নিত্যানন্দের ঘাটে অদান খেয়া বয়, সেখানে পার হইতে কাহাকেও আর কড়ি দিতে হয় না। গুরুর কৃপা বাউলের কাছে পরম সম্পদ। গুরুবাদের প্রাচীন পন্থা হইতে ইহারা নতুন একটি দিক্ আবিষ্কার করিয়াছেন। জাতিবর্ণনির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি গুরু হইতে পারে। এখানে হিন্দুমুসলমানেরও কোন বিচার নেই। আত্মনাথ বাউল বলেন "গুরুর হাতের প্রদীপ লইয়া দেখ্‌রে অথাই গুহায় বইয়া, আত্মযোগে সতেজ হইয়া তবে পরম মরম পাবি"। এই মরমিয়ার আত্মকথা তাহার গুরুবাদের ভিত্তি। এই গুরুকে পাইবে বলিয়া সে বসিয়া থাকে। সে গান গায়—

"গুরুর চরণ পাব বলেরে বড় আশা ছিল।
আশা নদীর তীরে ব'সে আশায় আশায় জনম গেল।
চাতক রইল মেঘের আশে
মেঘ বরিষে অন্য দেশে
বল চাতক বাঁচে কিসে।"

এই গান চিরন্তনী আশার গান, প্রাণের গান, মর্মের বাণী। গুরুর কাছেই পরপারের টিকিট পাওয়া যায়। এখানে না আসিলে তাহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় না। তাহার ভোলা-মন বৃথাই অন্যত্র ঘোরাফেরা করে। সে গান করে—

"ইষ্টিশন হয় গুরুর চরণ
টিকিট কর ও ভোলামন"।
টিকিটে না করলে পরে
কেমনে যাবি বৃন্দাবন।"

মানুষের মধ্যে যে আরও একটি প্রাণময় পুরুষ আছে তাঁহাকেই সে খোঁজে। সে বলে—

তত্ত্বেফত্ত্বে মন মানে না
মনের মানুষ চাইই চাই।"

এই মানুষ খুঁজিবার আশায় তাহার গতির বিরাম নাই। সে আক্ষেপ করিয়া বলে "মানুষের মধ্যে মানুষ আছে, আরে তারে চিন্‌লি না।" তাঁহাকে কোথায় পাইবে এই বলিয়া সে অস্থির। সে বলে "আমার মনের মানুষ যেরে, আমি কোথায় পাব তারে"। নিত্য মানুষের সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ভোলামন শান্ত হইয়া অন্তরতম সত্তার দিকে

উন্মুখ হয়। এই ভাবোন্মুখীকরণ ধর্ম—বাউলের সঙ্গীতেই ইহার প্রতিষ্ঠা। সহজিয়ার গান আর বাউল সঙ্গীত দুইএর মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান আছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলেই উহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। পদাবলীকীর্তন বা রসকীর্তনের সহিত একতারার যে স্থূল পার্থক্য তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। লীলা বর্ণনপ্রধান রসকীর্তন, আর ভাববর্ণনপ্রধান বাউল সঙ্গীত। বাউলেরা রাধাকৃষ্ণ প্রেমসঙ্গীত করেন না—একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে যে গানই তাঁহারা করুন না কেন, উহার মধ্যে ভাবাংশকে রঙ্গিণ করিয়া তোলাই বাউলের চাতুর্য। কীর্তন রচনার প্রধানতম অভিব্যক্তি লীলারসপরিবেশদক্ষতায় মিলন, বিরহ, ভাবরচনা, সঙ্গীত-লহরীর সংযোজনা, রসকীর্তনের পুর্ণাবয়ব চিত্রসৃষ্টি চিত্ত-মনোহারী খণ্ড খণ্ড ভাবমাধুর্য সংমিশ্রণে বাউল সঙ্গীত মর্মনাটিকায় বিচিত্র শোভায় সমৃদ্ধ করিয়া থাকে। সহজিয়া পদে বহু প্রকার গ্রন্থি যোজনা দেখা যায়। এইগুলি তাহাদের সাধন সঙ্কেত।

মানব দেহেই তাহারা চোদ্দভুবন কল্পনা করেন। দেহই তাহাদের ক্ষেত্র ও বৃন্দাবন। এই দেহেই তাহাদের স্বর্গ ও নরক। ইহা লইয়াই সাধন এবং সিদ্ধি। দেহজাত কোন পদার্থ ইহাদের দৃষ্টিতে অপবিত্র নয়। সাধনায় অটলভাব অভিলষিত। গোপন সাধনার কথার সঙ্গে দেহ সম্বন্ধকে তাহারা কোথাও অস্বীকার করেন নাই অথচ দেহাতিরিক্ত সত্তায় উন্নীত হওয়ার জন্যই তাহাকে অটল হইতে হইবে। "জলেতে নামিবি জল না ছুঁইবি" প্রভৃতি সাধনার উপদেশ রহিয়াছে। সে স্নান করিয়াও চুল ভিজাইবে না। রান্না করিয়াও হাঁড়ি ছুঁইবেনা। সে সতী হইতেও চাহে না, অসতীও হইতে চাহে না, পতির সঙ্গে প্রেম করিবে অথচ জানিতে দিবে না। সহজিয়া ও বাউল এই দুইয়ের মধ্যেই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য। তবে একটি দেহকে লইয়া, অপরটি ভাবকে লইয়া বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। শেলী এবং কিটস্ এই দুই কবির মধ্যে যে পার্থক্য পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে উহার সমালোচনা করিয়াছে। কিন্তু সহজিয়া ও বাউলের ধারাবাহিক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতীয় দর্শন প্রাণ সত্তা, জৈবসত্তা ও অধ্যাত্মসত্তার যে নিপুণ বিচার করেন কোন দেশে সেরূপ বিচার নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। অন্তর্জগতের লুকানো সত্তাকে বাহিরে আনিয়া ভোগের লালসা অধ্যাত্মবাদীর সহজাত. দেহে আত্মার ব্যাপ্তি দেহা-ভিন্ন রূপেই তাহার অভিব্যক্তি; কাজেই দেহকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আবার অনিত্য দেহকে অবলম্বন করিয়া যে প্রচেষ্টা উহাও যে ভঙ্গুর তাহাও অজানা নাই। এই জন্যই দেহভিন্ন এমন এক অভিব্যক্তির প্রয়োজন, যেটি দেহ হইয়াও দেহধর্মী নয়, আত্মসত্তা হইয়াও দেহের ন্যায় ব্যবহার্য। এই আত্মঅনাত্ম যোগাযোগেই বাউল গানের তাৎপর্য। ইহাদ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, অসম্ভব বস্তুর সন্ধানেই বাউল বাতুল হইয়াছেন।

বাউল বাতুল নয়, বাউল ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতা তাহার সঙ্গীতে একটি মধুর মঞ্জীর ধ্বনির রণনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার আশা, উৎকণ্ঠা, লালসা এবং আর্তি অন্তরে বিরামবিহীন সঞ্চারে ঝংকার তুলিয়াছে। তাহার থমকে গমকে দোতারার ঝংকার আর খঞ্জরির চাঞ্চল্য মিলিত হইয়া অন্তরে প্রেমের মঞ্জরীকে নাচাইয়া তুলিয়াছে। সহজিয়ার সহজ দৃষ্টিতে ভিতর বাহির একাকার হইয়া গিয়াছে। সে অভিলষিত কিশোরীকে দেখিতে পাইয়াছে। তাই শুনি "উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী নয়নতারা"। বাউলের চোখে বাহির দুয়ারে লেগেছে তালা, তোর ভিতর দুয়ার খোলা। মায়া নদীর এপার ওপারের ব্যবধান তাহাকে আকুল করিয়াছে। প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সে গান করে—

> "তুমি ওপার হতে বাজাও বাঁশী
> আমি এপার হতে শুনি
> অভাগিয়া নারী আমি
> সাঁতার নাহি জানি।"

নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরভূমের আশেপাশে বহু প্রসিদ্ধ বাউল বাস করিতেন। জীবনে ঔদাস্য, সংসারে বিতৃষ্ণা, বিষয়ে অনভিনিবেশ, আর জনসঙ্গত্যাগ ছিল তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। লৌকিক ব্যবহার হইতে জীবনটিকে তুলিয়া একপাশে ধরিয়া রাখাই ছিল তাহাদের স্বভাব। এই নিরালা প্রাণের মাধুরী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রেখাপাত করিয়াছে। একটানা সকল সুখদুঃখনিরপেক্ষ

বাদল ধারার মধ্যে তিনি বাউলকে আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার একতারার গান শুনিয়াছেন।

"বাদল বাউল বাজায় বাজায়রে
বাজায় রে একতারা।"

শান্তিনিকেতনে একাধিকবার তিনি বাউলের গান শুনিয়াছেন। বাউলের ছন্দ, সুর তিনি সঙ্গীতে, কাব্যে রূপ দিয়াছেন। ব্রহ্মসঙ্গীতে বাউল সুরের অনেক গান আছে। কীর্তন, ঢপ, রামপ্রসাদী, প্রভৃতির মত বাউলসুর নিজস্ব মাধুর্যে একক। ভাটিয়ালি পল্লীসঙ্গীত, জারী, তরজা, প্রভৃতি বাউলের মধুরতা হরণ করিতে পারে নাই। উদাস প্রাণের একটানা প্রেরণা কোন্ সুদূরের সংবাদ বহন করিয়া আনে বাউল সঙ্গীত, তাহা সহসা বুঝিয়া ওঠা যায় না।

লিরিক কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিলেও দেখা যাইবে ইহার মধ্যে যে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম সংবেদন উহা অন্যত্র দুর্লভ। ফকিরের কেরামতি আছে, ঝাড়, ফুক্, জড়ি, বুটি, দোয়া আছে কিন্তু তাহার এরূপ মনমাতানো পাগলকরা গান নেই। আমাদের বাউলের অভাবনীয় ক্ষমতার সঙ্গে তার সঙ্গীত আছে, আর আছে, প্রাণের অতলে আনন্দ শিহরণ আনিয়া দিবার মত দিব্য বল।

তারের যন্ত্রে সুর সমন্বয়ের বাতায়ন চিরমুক্ত। একতারার একটি তারেই বাউলের বিভিন্ন রাগিণী ও ছন্দের সমন্বয় হয়। আবার অনুরূপ ভাবেই তাহার মনের দেউলে 'বাউল' বিভিন্ন দেবতার পূজার সমারোহ করেন। এখানে কোন জাতি, গোষ্ঠী বা সমাজের সীমা তাহার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, আর করেও না। তাহার মন-পাখী অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় মুক্তির গান গাহিয়া, আর মর্ত্যের মানুষকে তাহার জীবনের স্বচ্ছন্দ গরিমায় লুব্ধ করিয়া। মাটিতে লুটাইয়াও ধূলি লাগে না তাহার গায়। দেহের গান গাহিয়াও সে অনাসক্তির প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয় প্রতিটি মানুষের মনের কোণে। ইহকাল, পরকাল, বন্ধন ও মুক্তি, আসক্তি ও অনাসক্তির দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ জীবনই বাউলের আদর্শ।

এত মৃত্যু মাঝে

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

মৃত্যু! শুধু মৃত্যু!
চারিধারে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
বিদ্বেষের বিষাক্ত ছুরিকা
হাতে নিয়ে ফিরিছে দুশ্‌মন।
তার বক্ষে ঠাঁই নেই
মায়া মমতার।
মৃত্যুর বিমূর্ত প্রতীক!
জানে না সে কেন হত্যা করে!
আদিম ঘাতক বুঝি হননের
আনন্দে মাতাল।

আছে ব্যাধি, আছে জরা,
আছে লক্ষ রোগের বীজাণু,
আসে ঝড়, আসে ঝঞ্ঝা
অপঘাত, ভূকম্পন
প্রলয়ের মহাকলরোল
মৃত্যুর জয় ডংকা বাজে অবিরাম
দশ দিকে।

মৃত্যুর এ মহা শ্মশান
দগ্ধ ধরিত্রীর বুকে
তবু জন্ম নেয়
শ্যাম-শস্য ফুল-ফল।
সবুজ ঘাসেরা স্নান করে
রাত্রির শিশিরে।

তবু জ্বলে সৌন্দর্যের আলো।
গোলাপের রাগে
সুন্দরীর রক্তিম কপোলে।
মানুষের বুকে
দয়া-মায়া প্রেম-ভালবাসা
তবু জেগে রয় মৃত্যু-হীন।
এত মৃত্যু মাঝে!

বেতারে টেষ্ট-ক্রিকেটের সংবাদ

ক্রীড়া-কৌতুকের জের

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
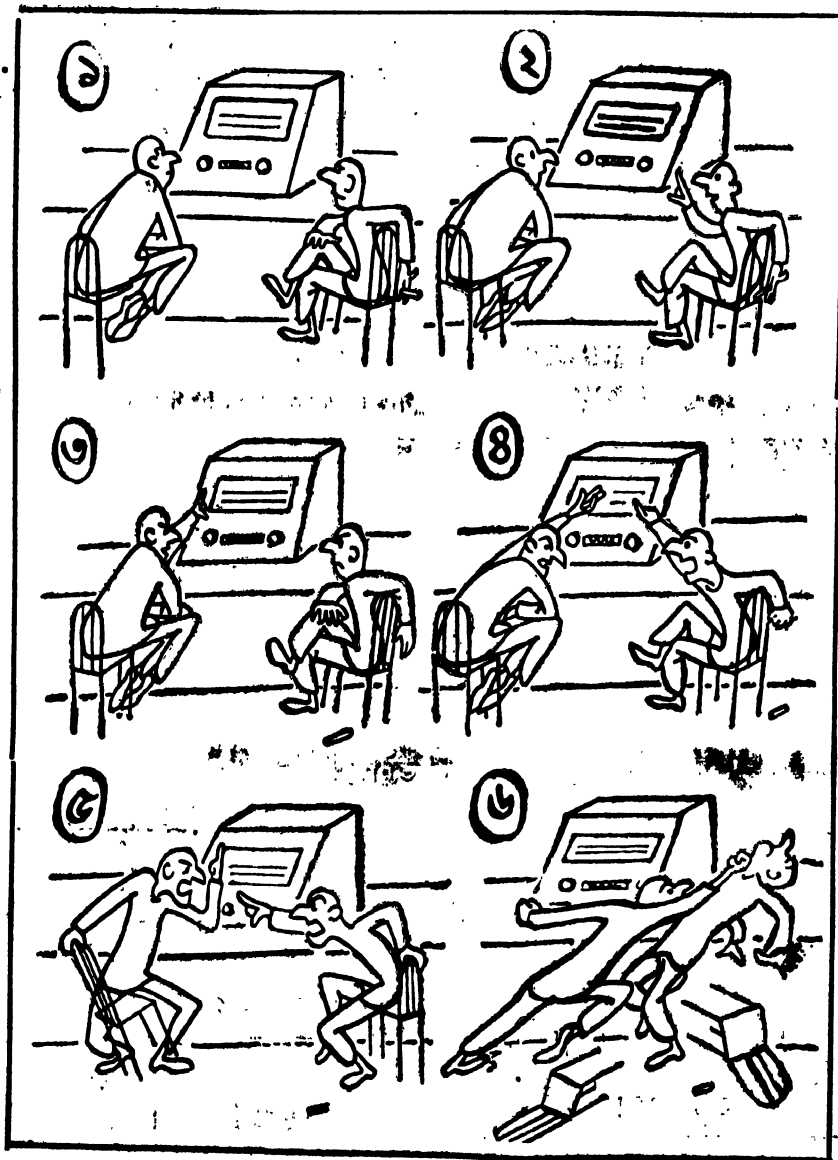
রণ-বিধ্বস্ত জার্ম্মাণ জাতি

উপানন্দ

দূর কোন্ অতীতের অন্ধকারা যুগে ধীরে ধীরে মানুষ বেরিয়ে এলো তার অরণ্য জীবন ত্যাগ করে, তারপর তার মনে এলো নানা কল্পনা আর পরিকল্পনা। স্ফুরণ হোতে লাগলো তার বুদ্ধিবৃত্তি। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সুরু হোলো সভ্যতার আলোকে তার পদক্ষেপ। ক্রমে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী—সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে ব্যাপক ভাবে নানা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো, শেষে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে আরম্ভ করলো বসতি স্থাপন করতে। ভাষাগত ভিত্তিতে গড়ে উঠ্‌লো এক একটি স্বতন্ত্র সমাজ। স্বাতন্ত্র্য বজায় করে এক একটি সমাজবদ্ধ জাতি অগ্রসর হোতে সুরু করলো আপনার বৃদ্ধি বিস্তারের দিকে। ইন্দোজার্ম্মান পরিবার এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এর টিউটানিক শাখা থেকে জন্মলাভ করেছে জার্ম্মাণ উপজাতিবৃন্দ। এই সব উপজাতি ছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে। নিম্নপর্য্যায়ভুক্ত স্যাক্‌সন আর ফ্রিসিয়ারা ছিল উত্তরে, ফ্রাঙ্করা ছিল পশ্চিমে, থুরিন্‌-গিয়ানরা ছিল মধ্য জার্ম্মাণীতে, এ্যালেম্যান্নিরা ছিল সোয়াবিয়াতে, আর ব্যাভেরিয়ানরা ছিল দক্ষিণে। ইউ-রোপের ভূখণ্ডে এদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর আলোক সম্পাত করলেন শার্লমেন। তিনি রাজনৈতিকতার প্রয়োজনে এদের সকলকে কাছে টেনে নিলেন। ঐক্যবদ্ধ হোলো তারা শার্লমেনের অধিনায়কতায়।

ষোড়শ শতাব্দী এদের কাছে হয়ে উঠ্‌লো গুরুত্ব-ব্যঞ্জক। ১৬১৮ খৃঃ থেকে ১৬৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ত্রিশটী বছর ধরে চল্‌লো যুদ্ধবিগ্রহ, কিন্তু নিষ্পত্তি হোলোনা ধর্ম্মসংক্রান্ত দ্বন্দ্বকলহ। এলো ভয়াবহ পরিস্থিতি, ধ্বংস আর উচ্ছেদে ব্যাহত হোলো মানুষের অগ্রগমনের অভীপ্সা। জার্ম্মাণী হয়ে উঠ্‌লো ইউরোপের সামরিক রঙ্গভূমি। এই ভূমি আজও অবলুপ্ত হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এখনও আত্মগোপন করে আছে সামরিক বহ্নি।

এই সম্মিলিত জাতি যে রাষ্ট্রমণ্ডল গড়ে তোলে, তাকে 'রাইখ' বলা হয় অর্থাৎ জার্ম্মাণ রাষ্ট্রমণ্ডল। মধ্যযুগে যুদ্ধের সমাপ্তির পর নেদারল্যাণ্ড রাইখের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলো। অষ্টাদশ-শতাব্দী জার্ম্মাণ জাতির ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সভ্যতার নব নব উন্মেষ ও জ্ঞান-প্রজ্ঞানের নব নব ভাবধারা জাতির জীবনে সৃষ্টি করলো স্বর্ণ যুগ। এই সময়ে এলেন অনন্য-সাধারণ মনীষিরা জার্ম্মান জাতিকে উন্নত করবার জন্যে. এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাক্, কান্ট, গোয়েটে, শীলার প্রভৃতি। তখন ব্রাণ্ডেনবুর্গ প্রাসিয়া ক্রমবর্দ্ধমান, সুরু হয়েছে তার উন্নয়ন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এলো আবার দুর্দ্দিন। যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হবার সুযোগ হোলোনা জার্ম্মাণ জাতির। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বত্রিশ জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-কর্ণধার যোগ দিলেন দিউৎসার-বাণ্ড পরিমণ্ডলে। উন্মুক্ত রাজকীয় মর্য্যাদাসম্পন্ন সহরগুলি

উঠ্‌লো গড়ে। পরবর্ত্তীকালে দেখা দিল নরদিউৎসার বাণ্ড ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। এই পরিমণ্ডল হোলো রাইখের অগ্রদূত। এর সম্রাট হোলেন প্রাসিয়ার অধিপতি। পাঁচশো বছর ধরে অষ্ট্রিয়াই জুগিয়ে এসেছে জার্ম্মাণ সম্রাট। এই অষ্ট্রিয়াই শেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, রাইখের সঙ্গে ত্যাগ করলো সমস্ত সম্পর্ক।

এর পর গড়ে উঠলো নূতন জার্ম্মাণ রাষ্ট্রমণ্ডল। এর প্রথম চ্যান্সেলার বা রাষ্ট্রপতি হোলেন অটো ভন বিসমার্ক। এঁরই আবির্ভাবের ফলে জার্ম্মানীর জাতীয় শক্তি সুদৃঢ় হোলো। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাতির দ্রুত অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হোতে লাগ্‌লো, সৌভাগ্য লক্ষ্মী হোলেন জাতির উপর সুপ্রসন্ন—শ্রমশিল্পোৎপাদনেও এলো সাফল্যগৌরব। জার্ম্মাণীর জীবনযাত্রামানও হয়ে উঠলো খুব উঁচু। সমগ্র পৃথিবী রাইখকে জানালো অভিবাদন। জ্ঞানবিজ্ঞানে শিল্পকলায় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে জার্ম্মানীর দ্রুত অগ্রগমন পরিলক্ষিত হোলো। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আদর্শ সমাজ বিধান প্রবর্ত্তন করলো জার্ম্মানজাতি।

নব্যশিল্পের প্রবর্ত্তক ছিলেন বয়েট (১৭৮১-১৮৫৩) গোয়েটের আমলের লোক। আলফ্রেড ক্রুপ (১৮১২-১৮৮৭) রূঢ় অঞ্চলে ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। রেলওয়ে শিল্পের প্রবর্ত্তক বজ্জিশ (১৮০৪-১৮৫৪), তড়িৎশিল্পের প্রবর্ত্তক হব্যানার ফন্ জীমেন্স। ক্রুপকেও ছাপিয়ে উঠেছে হুগো ষ্টিন্নেসের নাম। তড়িৎশিল্পে জীমেন্স পরিবার বার্লিনকে জগৎপ্রসিদ্ধ করেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালেন ডাক্তার বিয়ার।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও আমরা দেখেছি জার্ম্মানীর অসাধারণ শক্তি। সেদিন এ জাতি মানব মনের মহাসম্ভাবনাকে আশ্রয় করে বহুদূর এগিয়ে গেছে, অর্জ্জিত হ'য়েছে সেদিন তার পর্ব্বতবিচূর্ণকারী মহাশক্তি। প্রথম মহাযুদ্ধে সে স্বপ্ন দেখেছিল বিশ্বজয়ের, কিন্তু বিধাতা বিরূপ হোলেন। ১৯১৪ খৃঃ থেকে ১৯১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত চল্‌লো মহাযুদ্ধ। জার্ম্মান-একতা যুদ্ধে পরাজয়ের পরও শিথিল হোলো না। উল্লেখযোগ্য রাজ্যক্ষেত্র সে হারালো। এর পর জার্ম্মান রাষ্ট্রমণ্ডল রাইখ হোলো গণতান্ত্রিক। এ যুদ্ধে হৃতসর্ব্বস্ব হয়েও জার্ম্মানরা নতুন তেজের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল। কিন্তু আবার জাতির অন্তরে রক্তাক্ত বেদনায় জন্মগ্রহণ করলো অসন্তোষ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিস্থিতিতে দুর্ব্বল হয়ে পড়লো জার্ম্মানীর 'উইমার রিপাব্‌লিক'। দ্রুত বেকারসমস্যা বৃদ্ধি হোতে থাকে। ১৯৩২-৩৩ সালে ষাট লক্ষ লোকেরও বেশী বেকার দেখা গেলো জার্ম্মানীতে। এ সুযোগ নিয়ে এলো একটি ক্ষুদ্রতম মানুষ ঝঞ্ঝার মত, যার পশ্চাতে ছিল শুধু একটি শক্তিসম্পন্ন দল। এই দলের নেতা গণবক্তা এডল্‌ফ হিটলার। জার্ম্মানীর ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মতই এসে দাঁড়ালো হিটলার। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রাইখের অধিনেতা হোলো হিটলার। গণতান্ত্রিক আনুকূল্যে ভোটের প্রহসনের মাধ্যমে রাইখের সর্ব্বাধিনায়কত্ব পেয়ে একেবারে রাইখের রূপ পরিবর্ত্তন করলো। ক্ষমতা-প্রমত্ত প্রতিষ্ঠিত হিটলারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে এলো জার্ম্মানীর চরম দুর্দ্দৈব। বিশ্বযুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় একান্তভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো উৎকট জাতীয়তাবাদ। উৎকট জাতি প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে এলো উৎকট জাতিবিদ্বেষ হিটলারের নাৎসী দল কী অমানুষিক বর্ব্বরতার আশ্রয় নিয়েই না ইহুদী নির্য্যাতন ও বিতাড়ন সুরু করলো। মানুষ মারা আর মাটি দখল করা এই হোলো পরম লক্ষ্য। কল্যাণ ধর্ম্মের আদর্শ হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন। জার্ম্মানী রাজনৈতিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হোতে পারলো না। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হোলো ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ হোলো ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। শোচনীয় শোকাবহ পরিস্থিতির মধ্যে সম্পূর্ণ পরাজিত জার্ম্মান জাতি আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লো। এই জাতির ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দী থেকে সুরু করে বিংশ শতাব্দীর উপর্যুপরি দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিধ্বস্ত না হোতো, তা হোলে আজ জার্ম্মান জাতি মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুরোধা হয়ে বিশ্বের বহু কল্যাণ করতে পারতো। প্রাচীন আর্যজাতির মহান্ ঐতিহ্যকে এরা আরও মহিমান্বিত করতে সক্ষম হোতো।

১৯৪৫ সালের জুন মাসে জার্ম্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি বিভক্ত হয়ে চতুঃশক্তির অধিকারে এলো। অধিকারীর দল পেলো সার্ব্বভৌম শক্তি জার্ম্মানীর ওপর কর্তৃত্ব করবার। ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত বার্লিন ছিল জার্ম্মান রাইখের রাজধানী। দ্বিখণ্ডিত হোলো। পূর্ব্ববার্লিনের

কর্তৃত্বভার নিল সোভিয়েট শক্তি। ১৯৬১ সালের আগষ্ট থেকে পূর্ববার্লিনের সঙ্গে পশ্চিম বার্লিনের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটলো—কাঁটা তার, প্রাচীর আর মৃত্যুজাল দিয়ে পূর্ব্ব বার্লিন কর্তৃপক্ষ জার্ম্মানীর প্রাণপ্রবাহকে দিল শুষ্ক করে। সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে গণতান্ত্রিকতার আবহাওয়া নেই, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিলোপ সাধন ঘটে গেছে। পশ্চিম বার্লিন হামবুর্গ সহরের চেয়ে ও বড়ো, কুড়িলক্ষ লোকেরও বেশী এখানকার অধিবাসী। জার্ম্মানীর পশ্চিম অঞ্চল ব্রিটিশ, মার্কিণ ও ফ্রান্সের অধীনে রইলো ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। সেপ্টেম্বরেই গঠিত হোলো জার্ম্মানীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—'দি ফেডারেল রিপাব্লিক অব জার্ম্মানী।' এর রাজধানী হোলো বন। এই যে ১৯৫৫ সালে জার্ম্মানীর নব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুরোপুরি স্বাধীনতা পেয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে। আজ সে পেয়েছে সর্ব্বাধিকার। পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে সে আজ মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ। আজ সে দ্রুত এগিয়ে চলেছে উন্নতির উচ্চশিখরে বিশ্বমানবের কল্যাণ সম্ভাবনার অবশ্যম্ভাবিতাকে রূপ দেবে যারা, এই জার্ম্মানী তাদের একজন হবে কিনা কে-ই বা সে কথা বলতে পারে!

—

কাউণ্ট লিও টলষ্টয়
রচিত

দি লঙ্‌ এক্সাইল্‌
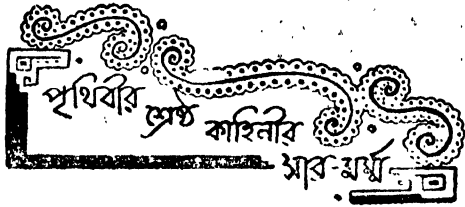
(The Long Exile)

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরের দিন সকালে প্রহরী এসে কয়েদখানার লোহার ফটক খুলে দিতেই অন্য কয়েদীদের দলে যোগদান না করে একাকী চুপচাপ বেরিয়ে এলো বাইরের উন্মুক্ত-আঙ্গিনায় ...ঘৃণায় সঙ্গী মিকারের পানে ফিরেও তাকালো না সে একবার। কিন্তু জেলখানার উন্মুক্ত-আঙ্গিনায় বেরিয়ে এসেও আক্‌শ্যেনকের মনের দ্বন্দ্ব-অশান্তি ঘুচলো না... মিকারের উপর ঘৃণা-আক্রোশও মিটলো না কিছুতেই। এমন কি, ভগবানের নাম-গান করেও, তার মনের সন্দেহ-গ্লানির উপশম হলো না এতটুকু...দিবারাত্রই আক্‌শ্যেনকের মন পাথরের মতোই ভারী হয়ে রইলো—কোনোমতেই ভুলতে পারলো না সে মিকারের আচরণের কথা।

এমনিভাবেই মর্ম্মান্তিক-অশান্তির মধ্যেই কেটে গেল সুদীর্ঘ পনেরো দিন। একদিন নিশুতি-রাতে...তালা-বন্ধ কয়েদখানার বিরাট কামরায় মিকার আর অন্য কয়েদীরা সবাই তখন সারাদিনের হাড়ভাঙা-খাটুনীর পর গভীর নিদ্রায় অচেতন...শুধু আক্‌শ্যেনকের চোখে ঘুম নেই... একা-একা অন্ধকার-কামরায় সে চিন্তাকুলভাবে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ তার নজরে পড়লো কয়েদখানার নিরালা এক কোণে কয়েদীদের শোবার-জায়গার তক্তার নীচে একরাশ মাটি কাঁকরের স্তূপ জড়ো হয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি ভালো করে দেখবার জন্য কৌতূহল-ভরে আক্‌শ্যেনক ঘরের মেঝেতে জড়ো-করা সেই মাটি কাঁকরের স্তূপের কাছে এগিয়ে আসতেই হঠাৎ লক্ষ্য করলে যে মিকার অতি-সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে কয়েদীদের সেই শোবার-জায়গার তক্তার নীচে থেকে বেরিয়ে এলো। এমন নিঝুম-রাতে মিকারকে এভাবে চোরের মতো চুপি-চুপি জেলখানার কয়েদীদের শোবার-জায়গার তক্তার তলা থেকে আচমকা বেরিয়ে আসতে দেখে আক্‌শ্যেনক তো অবাক! ব্যাপার কি?...এত রাতে সকলের দৃষ্টির অগোচরে মিকারের এই অদ্ভুত-আচরণের মানে কি?... কোনো বদ্‌-মতলব নেই তো ওর মনে?...বিস্ময়াভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আক্‌শ্যেনক মনে মনে এ সব কথা চিন্তা করছে...এমন সময় মিকারের হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো তার দিকে! তাকে দেখেই মিকার ক্ষণেকের জন্য হকচকিয়ে গিয়ে শুব্ধ হয়ে রইলো। আক্‌শ্যেনক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে, মিকারকে যেন আদৌ দেখতে পায়নি সে—এমনি ভাণ করে, নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে

পড়ছিল…এমন সময় মিকার হঠাৎ তার সজোরে হাতখানা চেপে ধরে তাকে আটকালো…আকৃশ্তেনকের কানের কাছে মুখখানা এগিয়ে-এনে চাপা-গলায় সে বললে,—চুপ !…এইমাত্র চোখের সামনে যে সব ব্যাপার ঘটতে দেখলে, এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ কোরো না ! তাহলেই সর্ব্বনাশ !…আমি মতলব করেছি পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে সাইবেরিয়ার এ কয়েদ-খানা থেকে চম্পট দেবো ! তাই সকলের চোখের আড়ালে রাত নিশুতি হলে রোজ আমি এমনিভাবে চুপিচুপি কয়েদ-খানার মেঝে খুঁড়ে সুড়ঙ্গ-পথ বানাচ্ছি…আর সকাল হলেই অন্য কয়েদীদের সঙ্গে জেলের কামরা ছেড়ে কাজ-কর্ম্মের জন্য বাইরে বেরুনোর সময়, সবাইকার দৃষ্টির অগোচরে জুতো-জামার ফোকরের মধ্যে লুকিয়ে এ সব মাটি-কাঁকর সন্তর্পণে বয়ে নিয়ে গিয়ে বাগানের কোণে ফেলে দিয়ে আসি ! অন্য কেউ বুঝতেই পারে না যে রোজ রাতে আমি কি কীর্ত্তি করছি ! কাজেই কয়েদ-খানার কারো মনেই কোনো সন্দেহ জাগে না আমার সম্বন্ধে !…বুঝলে এখন ব্যাপারটা !

মিকারের আজব কাণ্ড-কারখানা আর কথাবার্ত্তা শুনে আকৃশ্তেনক তো স্তম্ভিত ! আকৃশ্তেনককে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাপা-গলায় মিকার তাকে শাসিয়ে বললে, শোনো ভায়া…সাফ্ কথা বলে রাখছি তোমায় !…আমার কথামতো কাজ করো তো তোমাকেও আমি কয়েদখানার এই বন্দী-জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারি…কামরার কোণের ঐ সুড়ঙ্গ-পথের ফোকর দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে সোজা জেলখানার বাইরে চম্পট দিতে পারবে। কাজেই এখানে কারো কাছে এ সব কথা ফাঁশ না করে যদি তুমি চুপচাপ থাকো তো প্রাণে বাঁচবে ! না হলে তোমার রক্ষা নেই !…কারো কাছে এ কথা ফাঁশ হলে, শুধু যে আমি ধরা পড়ে সাজা পাবো তাই নয়…তোমারও দফা শেষ করে ছাড়বো আমি…যে উপায়েই হোক্—তোমাকে খুন করে আমি তার শোধ তুলবো…কথাটা মনে রেখো কিন্তু !

মিকারের শাসানী শুনে রাগে ঘৃণায় আকৃশ্তেনকের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো ! চাপা-স্বরে তীব্র-প্রতিবাদ জানিয়ে সে জবাব দিলে,—ইতর…শয়তান কোথাকার ! প্রাণ বাঁচানোর লোভে তোমার মতো এভাবে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে পালানোর চেয়ে আজীবন কয়েদখানায় পচে মরাও ঢের ভালো ! এমন কাপুরুষের মতো পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর এতটুকু বাসনা নেই আমার !…তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় কাতর নই আমি !…খুনের ভয় কি তুমি দেখাবে আমায় ?…বহুদিন আগেই তো তুমি আমার জীবন-নাশ করেছো…কাজেই আজ আবার নতুন করে খুনের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই ! মিথ্যা ও ভয় দেখিয়ে আমাকে টলাতে পারবে না তুমি !…তোমার এই জঘন্য-কীর্ত্তির কথা সকলের সামনে ফাঁশ করবো কি না—সেটা আমার খুশী !…ভগবান আমাকে দিয়ে যেমনটি করাবেন…সেই কাজ আমি করবো ! তোমার ঐ মিথ্যা হুমকীতে ভয় পেয়ে আমার পথ আমার কর্ত্তব্য থেকে আমি এতটুকু সরে দাঁড়াবো না !…

এ কথা বলেই দৃপ্ত-ভঙ্গীতে এক ঝটকায় মিকারের কবল থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে আকৃশ্তেন ঘৃণায়-বিরক্তিতে দূরে সরে গিয়ে কয়েদখানার কোণে তালা-আঁটা লোহার-কপাটের গরাদের পাশে একা দাঁড়িয়ে বাইরে নিশুতি-রাতের অন্ধকার আকাশের পানে দৃষ্টি মেলে দিয়ে আপন-মনে অতীত-দিনের নানান্ পুরোনো কথা চিন্তা করতে লাগলো !

আকৃশ্তেনকের আচরণ দেখে মিকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো …কিন্তু সাহস করে তার সঙ্গে আর ঘাঁটাতে এগুলো না …আড়চোখে আকৃশ্তেনকের পানে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টি হেনে নিঃশব্দে ফিরে গেল কয়েদখানার নিরালা-কোণে নিজে শয়ন-তক্তার আশ্রয়ে ! [ক্রমশঃ
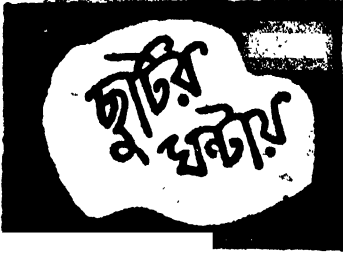
চিত্রগুপ্ত

ধরো, বার্ষিক পরীক্ষার পর বড়দিনের ছুটিতে তোমরা দল বেঁধে পিকনিকে বেরিয়েছো···এমন সময় যদি তোমাদের কেউ প্রশ্ন করে যে জলন্ত-উনানের উপর কাগজের তৈরী ঠোঙা বা পাত্র রেখে সেই পাত্রে চায়ের জল গরম করতে পারো? তাহলে তোমরা সকলেই হয়তো বলবে—এ কাজ অসম্ভব!···উনানের আগুনের আঁচে কাগজের ঠোঙা বা পাত্র বসালেই তো নিমেষে সেটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে··· কাজেই সে পাত্রে জলন্ত-উনানের উপর চায়ের জল গরম করা আদৌ সম্ভব নয়! কিন্তু বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে যাঁদের অল্প-বিস্তর ধারণা জ্ঞান আছে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বলবেন,—মোটেই না! এ কাজ এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন নয়···সামান্য বুদ্ধি খরচ করলেই অনায়াসেই হাসিল করা যায়!

কথাটা বাস্তবিকই ঠিক! কারণ, বিজ্ঞানের দৌলতে এমন কাজ খুব সহজেই হাসিল করা যায়!·· কিন্তু কি উপায়ে?···শোনো তাহলে - তোমাদের আজ সেই বিশেষ উপায়ের আসল-রহস্য শিখিয়ে দিই। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে ধৈর্য্য ধরে সামান্য চেষ্টা করলেই, খুব সহজে তোমরা এমন অদ্ভুত-মজার খেলা দেখিয়ে অনায়াসে নিজেদের আত্মীয়-বন্ধুদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।
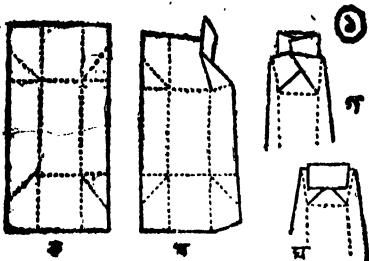
উপরের ১নং ছবিতে যেমন নমুনা দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমন-ধরণে ঈষৎ-পুরু এবং বেশ শক্ত-মজবুত এক টুকরো কাগজ নিয়ে উপরোক্ত-ছাঁদে ঠোঙা বা পাত্র বানিয়ে নাও। উপরোক্ত-প্রথায় নিখুঁত-ছাঁদে ও পরিপাটিভাবে কাগজের ঠোঙা বা পাত্রটি রচনা করবার পর, সেটির দুইপাশের কিনারায় দুটি কাগজ-আঁটার উপযোগী তারের 'ক্লিপ্' (Metal Paper-Clip) এঁটে দাও। তবে
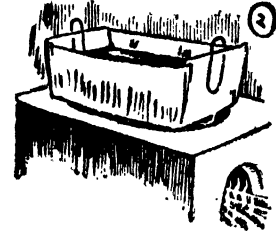
হুঁশিয়ার···'ক্লিপ্' আঁটবার সময়, সর্ব্বদা খেয়াল রেখো যে ঠোঙা বা পাত্রের কোথাও যেন জল-প্রবেশের এতটুকু ফাঁক না থাকে! কারণ, অসাবধানতা অথবা তাড়াহুড়ো করে তৈরী করার ফলে, কাগজের পাত্র বা ঠোঙার কোথাও কোনো ফাঁক থাকলেই, সে ফাঁকের ভিতর দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা করে জল বেরিয়ে গেলেই—মজা মাটি!··· এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত এই খেলা দেখানোও সম্ভবপর হবে না! সুতরাং গোড়া থেকে এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

যাই হোক, এমনিভাবে সুষ্ঠু-ছাঁদে কাগজের ঠোঙা বা পাত্রটি তৈরী করে নিয়ে, সেটিতে জল ভরে দাও। তারপর খুব সন্তর্পণে জল-ভরা ঐ কাগজের ঠোঙা বা পাত্রটিকে তুলে নিয়ে সযত্নে বসিয়ে রাখো—জলন্ত-উনানের আগুনের আঁচে। তবে খেয়াল রেখো—আগুনের আঁচে বসানোর সময়, জলন্ত লেলিহান-শিখার কোনো স্পর্শ যেন কাগজের ঠোঙার বা পাত্রের উপরাংশে ও কোণায়···অর্থাৎ, যে-অংশে জল-ভরা নেই, সেখানে না লাগে কোনো রকমে। কারণ, কোনো কারণে সে সব অংশের কোথাও আগুনের লেলিহান-শিখার ছোঁয়াচ লাগলেই, কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের এই আজব-খেলার মজাও পণ্ড হবে আগাগোড়া। সুতরাং খেলা দেখানোর সময় এদিকে নজর রাখতে ভুলো না। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারলেই দেখবে, জলন্ত-উনানের আঁচে-বসানো জল-ভরা ঠোঙা বা পাত্রটি বেমালুম অক্ষত-অদাহ

অবস্থায় রয়েছে এবং আগুনের তাপের ফলে, কিছুক্ষণ পরেই চোঙা বা পাত্রের ভিতরকার জল বুদ্‌বুদ্‌ তুলে দিব্যি ফুটন্ত হয়ে উঠেছে। তোমাদের এই আজব কেরামতি দেখে তখন আত্মীয়-বন্ধুরা সবাই যে শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হবেন তাই নয়, বিজ্ঞানের বিচিত্র কারসাজিতে খেলায় এতখানি গুণীয়ানা দেখানোর জন্যও সবিশেষ তারিফ করবেন তাঁরা সকলে। • •

এমন আজব-কাণ্ড কেন ঘটে—জানো ?…উনানের আঁচে জল গরম হবার সময়, আগুনের শিখা থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেটুকু সবই আকর্ষণ করে নেয় কাগজ…এবং সেই উত্তপ্ত-কাগজ থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয়—সেটি আগাগোড়া শুষে নেয় চোঙা বা পাত্রে-রাখা জল। আগুনের শিখা থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তার মাত্রা কোনোমতেই ২১২° ফারেন্‌হিটের (212°) Fahrenheit বেশী হয় না। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে চোঙা বা পাত্রের কাগজের তাপমাত্রাও কোনো সময়েই এর চেয়ে বেশী হয় না…এবং এই কম তাপমাত্রার ফলেই, জলন্ত-আগুনের আঁচে উত্তপ্ত হলেও কাগজ সহজেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় না। এবারের মজার খেলাটির এই হলো আসল বৈজ্ঞানিক-রহস্য।

মনোহর মৈত্র

১। ছবির হেঁয়ালি ঃ

উপরের ছবিতে এলোমেলো-ছাঁদে একরাশ রেখা আঁকা রয়েছে। একরাশ এই এলোমেলো-রেখাগুলির মাঝে চিত্রকর-মশাই সুকৌশলে এঁকে রেখেছেন—ছুটন্ত একটি কুকুরের ছবি। বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করে ছাখো তো—তোমরা কেউ সেই ছুটন্ত-কুকুরের ছবিটির সন্ধান পাও কিনা! এ ধাঁধার উত্তর পাঠানোর সময় তোমরা কিন্তু সঠিক ভাবে কুকুরের দেহের অংশে আগাগোড়া রঙীণ-পেন্সিলের দাগ এঁকে ভরাট করে পাঠিও। চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা আসল-ছবিটির সঙ্গে তোমাদের মধ্যে যার রঙ-করা ছবিটি হুবহু মিলে যাবে, পরের মাসে আমরা ছাপার হরফে তার নাম প্রকাশিত করে দেবো—মনে রেখো!

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। রাত্রির পরে যদি তুমি
হাত রাখো ভাই…
তার তরে বিজ্ঞানীদের
জানার অন্ত নাই!

রচনা ঃ—দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর ঃ

১।
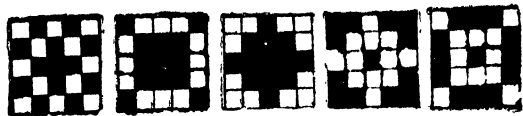
উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেই উপায়ে কায়দা করে নানান্ ছাঁদে কালো ও শাদা রঙের টালি-গুলিকে ঠিকমতো সাজাতে পারলে, অন্ততঃপক্ষে আরো ২০ রকম ছাঁদের বিচিত্র-সুন্দর নক্সা রচনা সম্ভব হবে।

২। কপি

৩। আনাতোল ফ্রান্স

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুলা ও সুজিত রায় (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা) পুতুল, সুষমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), কুলু মিত্র (কলিকাতা), সত্যেন, সঞ্জয়, সুরা ও সুনীল (ভিলাই), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), রিণি রনি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), দেবকী সিংহ (নওয়াদা) মিঠু ও বুবু গুপ্ত (কলিকাতা), পিণ্টু, বুতাম ও বাপি গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), শর্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (বোড়াল) কার্ত্তিক ও ভবানী (কাশীপুর, পুরুলিয়া)

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পিণ্টু হালদার (বালী), সুনীরা ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), ইন্দুবালা ও সুবর্ণলতা দেবশর্মা (কলিকাতা) জয়তী, সুরভী, সুজিতা, জয়নী চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) রণজিৎ দাস (পাটনা),

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বাণী, শুভ্র ও পার্থ হাজরা এবং অলক কুণ্ড (আড়ুই) শাশ্বত ও শর্মিলা গোস্বামী (যাদবপুর)।
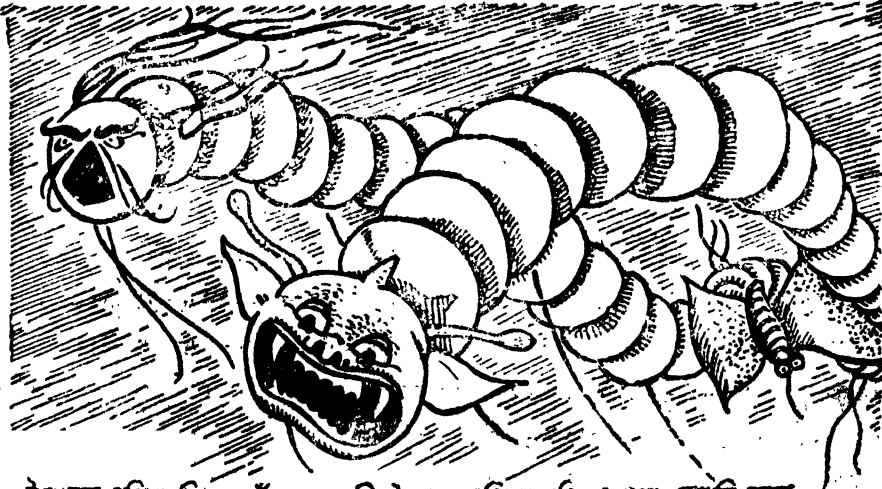
উপরের ছবিতে কিম্ভূত-ছাঁদের যে বিরাটাকার ঘুড়ি দুখানি দেখছো, সেগুলি হলো চীনদেশের 'ড্রাগন-ঘুড়ি' (THE DRAGON-KITES)। ওদেশী প্রাচীন পুরাণ-রূপকথার কাহিনী অবলম্বনে বিচিত্র 'ড্রাগনাকৃতিতে এই সব ঘুড়ি রচিত হয় বলেই, এগুলির নাম রাখা হয়েছে — 'ড্রাগন-ঘুড়ি'। নানা ছাঁদের রঙীন কাগজের টুকরো দিয়ে এমনি ঘুড়ি তৈরী করা হয় অভিনব কৌশলে। এ সব ঘুড়ি দেখতেও যেমন অপরূপ-সৌখিন… আকাশের বুকে ভেসে থাকতেও তেমনি পটু। তবে এ ঘুড়ি ওড়ানোর কায়দা-কানুন রপ্ত করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার… দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলেই এ কাজ আয়ত্ত করা যায়। সাধারণতঃ পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যেই ওদেশী লোকজনেরা
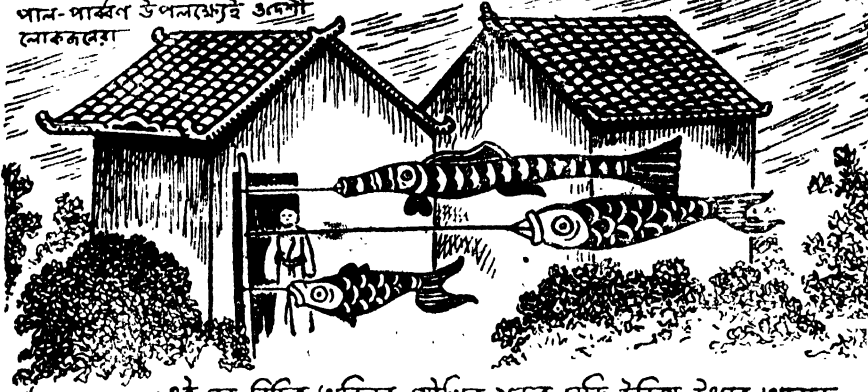
এই সব বিচিত্র-অভিনব সৌখিন-সুন্দর ঘুড়ি উড়িয়ে উৎসব-আনন্দে মেতে ওঠে। 'ড্রাগন-ঘুড়ির' মতোই আরেক-ছাঁদের ঘুড়ি হলো — রঙ-বেরঙের কাগজ দিয়ে তৈরী 'মাছ-ঘুড়ি' (THE FISH KITES)। আমাদের দেশের মতো চীনদেশেও ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ চলে আসছে অতি প্রাচীন-আমল থেকে। ওদেশী লোকজনের কাছে ঘুড়ি হলো আত্মার প্রতীক… মুক্ত-বিহঙ্গের মতো মানুষের আত্মাও স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ্যগতিতে অনন্ত-উন্মুক্ত আকাশের অবাধে ভেসে বেড়াক — এই তাঁদের ধারণা। চীনদেশের মতো জাপানেও এমনি বিচিত্র ঘুড়ি ওড়ানোর রীতি সুপ্রচলিত হয়েছে। আমাদের দেশে 'বিশ্বকর্ম্মা পূজা'-উপলক্ষ্যে যেমন দেখা যায়, জাপানেও তেমনি 'চেরী-ফুল ফোটার' উৎসবে এমনি ধরনের

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন চণ্ডীগড় অধিবেশন

শ্রীপথিক

দিবে আর নিবে
মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে

এই বাণী ভারত-আত্মারই বিকাশের সাধনার মন্ত্রবীজ। এই মন্ত্রই নানাভাবে বিচিত্রতার মধ্যে ঐক্য অনুভব করে ও জাতির মর্মলোকে ছন্দায়িত, রসায়িত। ভারতের সাহিত্য সেই রসের পরিবেশন করে আসছে ব্যাস-বাল্মীকির যুগ হতে।

বাঙ্গালীর সবচেয়ে গর্ব তার ভাষা ও সাহিত্য। বাঙ্গালী তার সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্ব-আত্মীয়তার কথা যত প্রকাশ করেছে, এমনটা খুব কম দেখা যায়। উনিশ শতকের বাঙ্গালী-প্রতিভা প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আলিঙ্গন করেছে। সেই গৌরব বাঙ্গালীর, বাঙলা সাহিত্যের বিশ্ব-জয়ের জয়টীকা।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, সেই তিলকে পরিশুদ্ধ হ'য়ে বছর বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষার সম্মান প্রদর্শন ক'রে আসছে। নানা ভাষার সহিত নিজের ঐক্য অনুভব করেছে, মিলেছে—ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পরস্পরে আবদ্ধ হয়েছে।

এ কাজ আরম্ভ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে।

তারপর হ'তে বহু চিন্তাবিদ-পণ্ডিত-সর্বজনশ্রদ্ধেয়দের পরিচালনায় সম্মেলনের যাত্রা হয়েছে মুখর, নানাভাবের আদান-প্রদানে জেগেছে নব নব পরিকল্পনা ও শক্তি।

এবার সম্মেলনের ৩৯তম অধিবেশন হয়ে গেল চণ্ডীগড়ে, পাঞ্জাবের নব রাজধানীতে। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব, একদিকে প্রেরণা, অপরদিকে হুংকার—যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ আবিষ্কার ক'রেছিল।

চণ্ডীগড়—নূতন পরিকল্পনার নূতন নগর। ফরাসী-স্থপতির চিন্তাধারায় নগরীর শোভা—জ্যামিতিক রূপকল্পনা দর্শকদের মন প্রসন্ন হয় কিনা জানি না, তবে বিস্ময় জাগে—অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকতে চায়। নানা রংয়ের মশলা সর্বত্র ছড়ান। তবে খুবই নির্জন, একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন। সাধারণের ভীড় নেই, বিরাট বিরাট পাষাণের ছড়িয়ে পড়া এক একটি রাস্তা আর বাড়ী। তবে সবটাই সুপরিকল্পিত—একদিন ভারতের সবচেয়ে সুন্দর নগরী বলে বিবেচিত হবে বলে আমাদের মধ্যে অনেকে বলেছেন। ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় টেগোর থিয়েটার হলে' অধিবেশন আরম্ভ হয়। জাতীয় সংগীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডক্টর এ, সি, জোশী (উপাচার্য, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়) উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন,

"It is hoped that the Chandigarh Session of the Nikhil Bharat Banga Sahitya Sammelon will serve to forge new links between the literary and cnltural circles of Punjab and Bengal for the mutual benefit of both. From this stawdpoint the inclusion in the Programme of the conference of a Punjabi Literary Session and a joint Kavi Darbar of Bengali and Punjabi poets should be of special interest."

সম্মেলনের কর্মপন্থা ও চণ্ডীগড়ের তথা পাঞ্জাবের তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণও ডক্টর জোশী ভাষণে উল্লেখ করেন।

উদ্‌বোধনী ভাষণে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীপত্তম এ থানু পিল্লাই বলেন,

"We hear a good deal now-a-days of national integration. The Bengali Literary Conference acted on the basis of this idea and

held its annual meetings in states and parts of the country other than Bengal, almost from its very inception,......"

তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে জাতি কত বড় সম্পদ দান করতে পারে সে সম্পর্কে বলেন।

পরিশেষে বলেন,

"I would suggest that the idea of holding such conferences be taken up by literateurs in other Indian languages also."

স্বাধীন ভারতের সমৃদ্ধি ও গৌরবের প্রেরণা সাহিত্যের মধ্যে রূপ লাভ করার জন্য শ্রীপিল্লাই বাঙালী সাহিত্যিকদের পথ-প্রদর্শক হবার জন্য আবেদন জানান। তারপর সম্মেলন সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। ভাব ও তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণে শ্রীদাশ উপস্থিত সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করেছেন।

বাঙলা ও পাঞ্জাবের বিভিন্নমুখী মিলনের কথা উল্লেখ করে শ্রীদাশ বলেন, "অন্ধকার পুরাকালে বৈদিক গাথা রচনা করতে করতে আর্যরা পঞ্চনদে প্রবেশ করেছিলেন। ক্রমে পূর্বাভিমুখে এগোতে এগোতে পশ্চাতের সঙ্গে সংযোগ প্রায় ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আজ আমরা আবার নূতন গাথা নিয়ে চিরন্তনের নব রচনার সন্ধানে সেই দেশে এসেছি। অতিথিরূপে নয়, আত্মীয়রূপে। আজ আমাদের পুরাবৃত্ত হোক সম্পূর্ণ, হোক সার্থক।"

মূল সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর বিরাট ভাষণ কখনও পাঠে, কখনও গানে (বাংলায়, ইংরাজীতে, হিন্দীতে, জার্মানিতে, ফরাসীতে) সকলকে একটা বিশেষ লোকে নিয়ে যান। বেদ, উপনিষদ হ'তে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ পর্যন্ত নানা তথ্য উত্থাপনে ভারতবর্ষের মর্মসত্যের পরিচয় দান করেন।

সাহিত্য সেই সত্য হ'তে যদি বিচ্ছিন্ন হয়, ভ্রষ্ট হয়, তবেই সাহিত্যের মৃত্যু। ভারত-আত্মার বাণীকে যুগোপযোগী করে সাহিত্যে পরিবেশন করার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে বলেন। শ্রীযুত রায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু ঘটনা এবং বহু মনীষীর সম্পর্ক ভাব-তন্ময়-চিত্তে বর্ণনা করেছেন।

সমাজ ও সংস্কৃতি অধিবেশনের উদ্‌বোধনে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বলেন, সমাজ ও সংস্কৃতির 'চিন্তাধারায় সাহিত্য বিশেষ স্থান লাভ করেছে।'

পুরাতন বিধি ব্যবস্থাকে নূতন ও বৈজ্ঞানিক সূত্রধারায় মানব কল্যাণের দিকে পুনরায় নিয়োজিত করতে হ'বে। শ্রীচন্দ্র জীবনের সহ-অবস্থানের কথা গভীরভাবে তাঁর ভাষণে বর্ণনা করেন। উক্ত অধিবেশনের সভাপতি শ্রীকেশবচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে নূতন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগীর উপর মানব সমাজের কল্যাণ-পথ নির্দেশ করতে অনুরোধ নিয়েছেন।

পাঞ্জার কলা-একাডেমি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শ্রীএইচ, সি, খান্না সমাজ ও সংস্কৃতিতে সর্ব-ভারতীয় মনোভাবের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবার জন্য তাঁর বক্তৃতায় বলেন। তিনি উপস্থিত সকলকে, চিন্তাবিদদের অনুরোধ করে বলেন, আজ আর কোন একটি প্রাদেশিক চিন্তাধারায় সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশে সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ একান্ত প্রয়োজন। ভারতের সভ্যতার মর্মমূলে যে সত্য এতদিন উচ্চস্তরে বিরাজিত ছিল, আজ প্রয়োজন তার সম্পূর্ণ রূপায়ণ গণ-জীবনে—প্রত্যেকটি কর্মপ্রবাহের মধ্যে জাগ্রত করা।

ঐদিনই বিকালের অধিবেশন হয় বঙ্গ সাহিত্য শাখার। উদ্‌বোধনী ভাষণে ডক্টর লাল সিং বলেন, নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের চণ্ডীগড় অধিবেশনকে বাঙ্‌লা ও পাঞ্জাবের বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া ঐক্যসূত্রটিকে স্বাধীন ভারতে পুনরায় স্বর্ণ-অক্ষরে চিহ্নিত করে। বাঙ্‌লার সাহিত্যের দিক্‌পালদের নাম উল্লেখ করে শ্রীলাল পাঞ্জাবের সাহিত্য স্রষ্টাদের প্রেরণা লাভ করতে বলেন। সভাপতি শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর ভাষণে গুরু নানকের একটি বাণী উদ্ধার করে বলেন—"যে কবি হতে চায় তাকে নির্ভয় ও নির্বৈর হতে হবে। অর্থাৎ সে কাউকে এবং কিছুকে ভয় করবে না, তেমনি কারও সম্বন্ধেই তার কোন বিদ্বেষ বা বৈরিতা থাকবে না।" শ্রীমিত্র ভারতের রাষ্ট্রপতির একটি কথা উল্লেখ করে বলেন—No great literature can be produced unless men have the courage to be lonely in their minds, to be free in their thoughts and to express what-

ever occurs to them.” উক্ত দুইটি বাণীকে কেন্দ্র করে শ্রীমিত্র সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের পরিচয় দান করেছেন।

শ্রীমিত্র পাশ্চাত্য চিন্তার অনুকরণের প্রতি সবিশেষ কটাক্ষপাত করেন। আমাদের রামায়ণ মহাভারতের চিন্তাধারায় ভারতের জনগণমানস তৃপ্ত—সে সম্পর্কে ‘শ্রীমিত্র’ বলেন।

তিনি আরও বলেন—‘সাহিত্যের কাছে আমাদের আশা অনেক। সে আশা নির্ভর করছে আগামীকালের শক্তিমান্ লেখকদের উপরই। আজকে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত কীর্তিমান্ লেখক—তাঁরা আর কদিন এ দায়িত্ব বহন করতে পারবেন? আজকের তরুণদেরই বংসে ও কীর্তিতে আর একটু এগিয়ে এসে এ ভার গ্রহণ করতে হবে।”

পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমোহনলাল মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা বিস্তার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ৩ দফা ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করে ঘোষণা করেন যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

সম্মেলনের শেষের দিনের অধিবেশন পাঞ্জাব সাহিত্য শাখা। ডক্টর সুকুমার সেনের অনুপস্থিতিতে সম্মেলন সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ অধিবেশনের উদ্‌বোধন করেন। সভাপতি ডক্টর ভাই যোধসিংহ। বাঙ্‌লার মনীষার প্রভাব পাঞ্জাবের কবি ও সাহিত্যিকদের কি ভাবে কার্যকরী হয়েছে তা বর্ণনা করেন। পাঞ্জাবের বীর্যবত্তাও কি-ভাবে বাঙ্‌লার কবি ও সাহিত্যিকদের নূতন রূপ দান করেছে শ্রীসিংহ উল্লেখ করেন।

বিকালের অধিবেশন হয় চারুকলা শাখার। ডক্টর এম, এস, রণধো উদ্‌বোধন করেন। সভাপতি শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য নাটকের সূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে করতে আধুনিক যুগে বিশ্বরূপার স্থান ও গৌরব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

ঐদিন রাত্রিতে কবি সম্মেলন হয়। পাঞ্জাবের প্রায় ১৭জন কবি এবং বাঙ্‌লার ২।৩জন এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

তিন দিনের অধিবেশনে যথাক্রমে পাঞ্জাবের কেন্দ্রীয় নাট্য সংস্থা; বাঙ্গালী ক্লাব কর্তৃক ‘কাঞ্চন রংগ’ এবং বিচিত্রানুষ্ঠান (কাবুলিওয়ালা, হিন্দী) অনুষ্ঠিত হয়।

গোচর ফল

উপাধ্যায়

গ্রহরা রাশিচক্রে অনবরত এক রাশি থেকে অন্যরাশিতে সঞ্চারের মাধ্যমে পরিভ্রমণ করে চলেছে। যখন যে রাশি আশ্রয় করে যে রকম ফল দেয়, তখনই তাকে বলা হয় গোচর ফল। জাতকের জন্মরাশি থেকে গ্রহরা যখন যে রাশিতে থেকে যে ধরণের ফল দেয় তাই বলা হয় গ্রহের গোচর ফল। এরকম জন্মরাশি থেকে গ্রহের গোচরফল, সমস্ত পঞ্জিকাতেই প্রদত্ত হয়ে থাকে। এসব ফল অতিস্থূল, সকলের পক্ষে মিলেনা, আর মিল্‌বার ও সম্ভাবনার অবকাশ কম। তারও কারণ আছে, সাধারণ গোচর ফল গণনার সময় অষ্টবর্গশুদ্ধি দেখা হয়না। ব্যক্তিগত কোষ্ঠীর ভেতর থাকে অষ্টবর্গ গণনার ফলাফল, গোচর ফল গণনায় অষ্টবর্গ শুদ্ধি দেখা আবশ্যক, তাছাড়া নব তারাচক্রও ফল নির্ণয়ের সময় আবশ্যক। তনু ভাবাধিপতি শুভ তারায় থাক্‌লে দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, ধনভাবপতি শুভতারায় থাকলে ধনাগমাদি হয় ইত্যাদি, কারণ যদি কোন গ্রহ গোচরে (তাৎকালিক আশ্রিত রাশিতে) শুভ থাকে, আর যদি নব তারা চক্রে অশুভ নক্ষত্রে অবস্থান করে, তা হোলে কথিত শুভ ফল দেবেনা, সেইরূপ গোচরে অশুভ থাকলেও গ্রহ যদি নবতারা চক্রস্থ শুভ তারা গত হয়, তা হোলে গোচর নির্দ্দিষ্ট অশুভ ফলের নাশ হবে। গ্রহের মধ্যে শনি, রাহু, কেতু ও বৃহস্পতি যথাক্রমে ২॥, ১॥, ১ বৎসর ব্যাপী এক রাশিতে থাকে এজন্য এরা মন্দগামী গ্রহ। চন্দ্র, বুধ, রবি, শুক্র, মঙ্গল এরা প্রতিরাশিতে ২।০ ১৮, ৩০, ২৮, দিন থাকে বলে শীঘ্রগামীগ্রহ। গোচর গণনা করতে হোলে গ্রহগণের তাৎকালিক অবস্থান জানা আবশ্যক। এক্ষেত্রে পঞ্জিকা দেখে আগে ঠিক করে নিতে হবে গ্রহরা কোথায় কি ভাবে আছে। পঞ্জিকার প্রত্যেক মাসের প্রথমে একটি রাশিচক্রে গ্রহ বিন্যস্ত থাকে, আর তার নীচে থাকে মাস মধ্যে গ্রহগণের সঞ্চার। প্রত্যেক দিনের বাম পার্শ্বে থাকে দৈনিক গ্রহস্ফুট। গোচর ফল নির্ণয়ের সময় এগুলি অত্যাবশ্যক। তাছাড়া জন্মকুণ্ডলীর দশাদি ফলের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোচর বিচার উচিত। বলবান শুভপ্রদ গ্রহের দশান্তর্দ্দশা কালে গোচরোক্ত অশুভ ফলের নাশ ও হ্রাস হয়ে থাকে। রাশি প্রবেশ কালে এক একটি গ্রহ এক এক রকম ফল দেয়।

রবি ও মঙ্গল প্রবেশ কালে, বৃহস্পতি ও শুক্র রাশি গমনের মধ্য সময়ে, চন্দ্র ও শনি রাশি ত্যাগ কালে, আর বুধ সকল কালে ফল প্রদান করে। রবিদগ্ধ গ্রহের ফল সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সামান্য, রবি থেকে দ্বিতীয় রাশিতে স্থিত গ্রহের ফল সঞ্চার কালে, তৃতীয়স্থ গ্রহ সমস্ত রাশিতে ভোগ কালে, চতুর্থস্থ রাশি ভোগাবসান কালে, পঞ্চমে ও ষষ্ঠে—স্থিতগ্রহ সর্ব্বকালে অধিক ফল, সপ্তমে ও অষ্টমে স্থিত গ্রহের ফল অস্থির, নবম ও দশমস্থ গ্রহের ফল অবসান কালে, একাদশ ও দ্বাদশ স্থিত গ্রহ সঞ্চার কালে আশুফলপ্রদ হয়।

যে রকম চন্দ্র থেকে গোচর গণনা হয়ে থাকে, সেই রকম ভাবে লগ্ন ও রবি থেকেও সেই প্রকারে গোচর ফল

গণনা করা হয়, আর অন্যান্য গ্রহ থেকেও সেইরূপ হোতে পারে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে লগ্ন থেকে জাতকের নিজের, চন্দ্র থেকে মাতার, রবি থেকে পিতার, মঙ্গল থেকে ভ্রাতার, বুধ থেকে মাতুলের, বৃহস্পতি থেকে পুত্রের আর শুক্র থেকে স্ত্রীর শুভাশুভ গণনা করা যেতে পারে। এই গোচর গণনায় এক রাশিতে দীর্ঘকাল স্থায়ী বৃহস্পতি, শনি ও রাহুর অবস্থান বিচার্য্য। চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশিকে চন্দ্র লগ্ন বলে। জন্ম নক্ষত্রের প্রারম্ভ থেকে এই লগ্নের আরম্ভ, প্রত্যেক নক্ষত্রের মান ১৩ অংশ ২০ কলা।

চন্দ্র থেকে অংশগত বার্ষিক সঞ্চার ও তার ফল জানতে হোলে, দেখতে হবে চন্দ্র কোন্ রাশির কত অংশে অবস্থিত, সেই অংশ থেকে পর পর পরবর্ত্তী অংশকে জীবনের এক এক বৎসর কল্পনা করে নিতে হয়। চন্দ্র প্রত্যেক বৎসর এক এক অংশে চলেছে মনে করতে হবে। প্রথম অংশে প্রথম বৎসর, দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয় বৎসর, তৃতীয় অংশে তৃতীয় বৎসর, এম্নিভাবে চিন্তনীয়। চন্দ্র ঐ ভাবে গমন কালে যে অংশে শুভগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হবে, সেই অংশ নির্দ্দিষ্ট বৎসরে শুভ ফল, আর যে অংশে পাপ গ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হবে, সেই বৎসর অশুভ আর মিশ্রে মিশ্র ফল হবে।

অংশ গণনা অসুবিধা হোলে যে নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থিত সেই নক্ষত্রাবলম্বনে ঐ রকম গণনা হোতে পারে। তবে কোন নক্ষত্রের শেষভাগে বা চতুর্থ চরণে চন্দ্র থাকলে তার পরবর্ত্তী নক্ষত্র থেকে গণনা সুবিধাজনক, অথবা অনুপাতে যে কয় মাস হয়, ধরে নিলেও চলতে পারে। আর এক রকমে উক্ত গণনা সমাধা হোতে পারে। জন্মদিন থেকে প্রত্যেক দিনকে এক এক বৎসর মনে করে ঐ প্রকারে ফল ঠিক করা যায়।

সূর্য্য থেকে ৬০ অংশ বা ডিক্রির মধ্যে গ্রহরা শীঘ্রগামী হয়। ৬১ থেকে ৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত সমগামী, ৯১ থেকে ১২০ পর্য্যন্ত মৃদুগামী, ১২১ থেকে ১৮০ ডিক্রি পর্য্যন্ত বক্রগামী, ১৮১ থেকে ২৪০ ডিক্রি পর্য্যন্ত অতি বক্রগামী, ২৪১ থেকে ৩০০ ডিক্রি পর্য্যন্ত সরলগামী, ৩০১ থেকে ৩৬০ ডিক্রী পর্য্যন্ত শীঘ্রগামী। রাহু ও কেতু সর্বদা বক্রগামী। চন্দ্র ও রবি সর্বদাই শীঘ্রগামী। মঙ্গলের বক্রগতিকাল ৭৬ দিন, বুধের ২১ দিন, শুক্রের ৪২ দিন, বৃহস্পতির ১০০ দিন, শনির ১৮৪ দিন।

কর্কট রাশিতে রবি যুক্ত চন্দ্র নিস্ফল হয়। লগ্ন থেকে চতুর্থে বুধ, পঞ্চমে বৃহস্পতি, দ্বিতীয়ে মঙ্গল, ষষ্ঠে শুক্র ও সপ্তম স্থানে শনি অবস্থান করলে শুভাশুভ ফল কিছুই দেয় না। সুতরাং নিস্ফল হ'য়ে থাকে।

মনুষ্য দেহের মধ্যে নাদ চক্রে রবি, বিন্দু চক্রে চন্দ্র, চক্ষুতে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, উদরে বৃহস্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভি দেশে শনি, মুখে রাহু আর হস্ত ও চরণে কেতু অবস্থিত।

——

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

অশ্বিনীজাত ও ভরণী জাত ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক, কৃত্তিকা জাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্টফল। পিতার রোগ, ভোগ, আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা। ধনভাব শুভ। বাত স্ফোটকাদি রক্তপাত ও বায়ু প্রকোপের আশঙ্কা। মাতৃ হানি যোগ। প্রতিপত্তি, স্বাচ্ছন্দ্য। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। কিন্তু সম্পত্তি সংক্রান্ত নূতন সমস্যার উদ্ভব হোতে পারে। চাকুরি জীবীর পক্ষে শত্রুবৃদ্ধি ও নানারকম গোলমালের দরুণ চিত্তের উদ্বেগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে শুভ। বিক্রয় অপেক্ষা ক্রয়বাণিজ্যে অধিকতর শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

বৃষ রাশি

মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট, রোহিনী জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, কৃত্তিকা জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। ভ্রাতার রোগভোগ, কর্ম্মোন্নতি, অশান্তি, অধীন ব্যক্তি হোতে প্রতারণালাভ, নূতন কোন পরিকল্পনায়লাভ যোগ। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে স্বাভাবিক। মামলা মোকর্দ্দমায় জয়লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ, চাকুরিক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্ত্তন যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উন্নতি যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ

কিন্তু আকস্মিক কারণে অর্থনাশের কারকতা আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন রাশি

পুনর্ব্বসুর পক্ষে নিকৃষ্ট। আর্দ্রা ও মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম। পত্নী ও সন্তানের পীড়া। গুরুস্থানীয়ের সঙ্গে মনান্তর। দেহভাব শুভ। আত্মীয় বিয়োগ। মামলা মোকর্দ্দমায় অর্থনাশ। ধনভাব উত্তম। সম্পত্তি বিষয়ে জটিল সমস্যা। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অধিক শুভপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয় ভঙ্গ। বিদ্যার্থীর পক্ষে বাধা।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। অশ্লেষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুষ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসটি বিশেষ ভালো নয়। স্ত্রীর আকস্মিক রোগ ভোগ। গুরুজন থেকে অশান্তিলাভ। সন্তানের ভাগ্যোন্নতি। দেহভাবশুভ, পুরাতন কোন সূত্র ধরে অর্থোপার্জ্জনে সাফল্যলাভ। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। চাকুরি ক্ষেত্রে উন্নতি বিলম্বিত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ সাফল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে ক্ষতি মনস্তাপ ও অখ্যাতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ রাশি

মঘাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তর ফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। বিবাহাদি যোগ। দেহ ভাব স্বাভাবিক। লটারিতে বা অন্যভাবে অর্থপ্রাপ্তি যোগ। প্রতিযোগিতামূলক কার্য্যে জয়। ভ্রাতৃস্থানীয় বা নিকটাত্মীয়ের মারাত্মক পীড়াযোগ। মামলা বা কলহের দরুণ কিছুক্ষতি। বাসস্থান সংক্রান্ত গোলযোগ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। চাকুরিজীবীর উন্নতির আশা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে পরোপকার-পরায়ণতার জন্য তীব্র মানসিক আঘাত প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

কন্যা রাশি

চিত্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। হস্তার পক্ষে উত্তম। উত্তর ফল্গুনীর পক্ষে মধ্যম। দেহভাব শুভ। স্বাস্থ্যোন্নতি। গুরুস্থানীয়ের বিয়োগাশঙ্কা। অপ্রত্যাশিত লাভ ও অর্থ-প্রাপ্তি। সম্পত্তি বিষয়ে শুভ। কর্ম্মস্থলে বিশৃঙ্খলতা। সন্তানের জন্য অশান্তি। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারীও কৃষিজীবীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে একই ভাবে যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে আশানুরূপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ক্ষতির আশঙ্কা। চাকুরিজীবী নারীর কর্ম্মোন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

তুলা রাশি

চিত্রার পক্ষে উত্তম, স্বাতীর পক্ষে মধ্যম, বিশাখার পক্ষে নিকৃষ্ট। ভাগ্যলাভে বাধা। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। পারিবারিক অশান্তি। শত্রুবৃদ্ধি। মাতার রোগ ভোগ। গৃহনির্ম্মাণে বাধা। আয় অব্যাহত। নূতন ঋণের সম্ভাবনা। নূতন ভাবে কর্ম্মপ্রবর্ত্তনের কারকতা আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। চাকুরি জীবির পক্ষে খ্যাতি ও মর্য্যাদাবৃদ্ধি, কিন্তু আর্থিকোন্নতি নেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

জ্যেষ্ঠার পক্ষে উত্তম, অনুরাধার পক্ষে মধ্যম, বিশাখার পক্ষে নিকৃষ্ট। দেহভাব শুভ। পত্নী ও গুরুস্থানীয়ের পীড়াযোগ। পুত্রসন্তান লাভের যোগ। সন্তানের উন্নতি। কর্ম্মস্থল শুভ, বুদ্ধির বলিষ্ঠপ্রভাবে কর্ম্মসাফল্য। গৃহনির্ম্মাণ। আয়ভাব শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দনয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু রাশি

মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে উত্তম, উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যমন্দ নয়। ধনভাব শুভ। বাসস্থান সংক্রান্ত গোলযোগ। উন্নতির যোগ। যানবাহন ও ভৃত্যসংক্রান্ত

গোলযোগ ও অশান্তি। নিজের শৈথিল্য হেতু একাধিক সুযোগ নষ্ট হোতে পারে। ব্যবসাক্ষেত্রে আশাতীতভাবে সুযোগ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে নিকৃষ্ট, ধনিষ্টার পক্ষে উত্তম, শ্রবণার পক্ষে মিশ্র। দেহভাব শুভ। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি ও ধনক্ষয়। কর্ম্মস্থলে পরিবর্ত্তন যোগ। বক্রপথে অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ। সন্তানের পীড়া। বাড়ীওয়ালা, ভুমাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে দম্পত্যকলহ ও প্রণয়ভঙ্গ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্র পদজাতব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। দেহভাব শুভ। ব্যয় সঙ্কোচ সত্বেও অপরিমিত ব্যয় হেতু ঋণ। পত্নী ও সন্তানের পীড়া। সম্পত্তিনাশের সম্ভাবনা। অতি লোভের পরিণতি অপ্রীতিকর ঘটনা সৃষ্টি করবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ নয়; চাকুরিজীবির পক্ষে মধ্যম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অর্থনাশ ও যশোহানি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন রাশি

রেবতীর পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। দেহভাব শুভ। অর্থাগমযোগ প্রবল। এতদসত্বেও ব্যয়াধিক্যহেতু দুশ্চিন্তা। সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা। নিকটাত্মীয়ের বিয়োগ। মাতার পীড়া। স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি। পুত্রকন্যার বিবাহে বাধা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে সাংসারিক সূত্রে সমসাময়িক অশান্তি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উন্নতির যোগ।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

দেহভাব শুভ। ভাগ্যোদয়। শত্রুবৃদ্ধি। বন্ধু দ্বারা ক্ষতি। পিতার রোগভোগ। ধনাগম। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ লগ্ন—

ভ্রাতার রোগভোগ, নিজের স্বাস্থ্যোন্নতি। আর্থিক উন্নতি। কর্ম্মোন্নতি। পদমর্য্যাদা লাভ। ব্যবসায় উন্নতি। মানসিক অবস্থা ও পারিবারিক অবস্থা উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রীতিপদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মিথুন লগ্ন—

নানাপ্রকার বাধা ও বিশৃঙ্খলা, কাজকর্ম্মে অশান্তি। আর্থিক উন্নতি। সন্তানভাব শুভ। বন্ধু বিয়োগ। আত্মীয় বিরোধ। কর্ম্মক্ষেত্র শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মনস্তাপ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

কর্কট লগ্ন—

গুরুজন থেকে অশান্তি লাভ। স্ত্রীলোকের জন্য ক্ষতি। সন্তানের ভাগ্যোন্নতি। সম্মান ও খ্যাতি। কর্ম্মোন্নতি। বেকার ব্যক্তির কর্ম্ম লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহ লগ্ন—

শরীর ভাব শুভ। সন্তান পীড়া। ভাগ্যোন্নতি। তীর্থ পর্য্যটন। নূতন গৃহনির্ম্মাণ। ব্যবসা বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা।

কন্যা লগ্ন—

স্ত্রীর সহিত মতবিরোধ। পারিবারিক অশান্তি। কর্ম্ম সাফল্য। শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা। শত্রুবৃদ্ধি যোগ। সন্তানের উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

তুলা লগ্ন—

স্নায়ুগত পীড়া। পীড়াদি কষ্ট, চিকিৎসা বিভ্রাট। ব্যয়াধিক্য। ধনাগম। বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতির অভাব। কর্ম্মস্থানে বাধা বিঘ্ন। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ ও প্রণয়ভঙ্গ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

বৃশ্চিক লগ্ন—

শারীরিক অবস্থা মন্দ নয়। মানসিক উদ্বেগ ও ও অশান্তি। বৈষয়িক ব্যাপারে ভ্রাতার সহিত মতানৈক্য। সন্তানসন্ততির স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় চাকুরিপ্রাপ্তি বা পদোন্নতি। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি। পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নতি। দাম্পত্য সুখ। চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম সুযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক সুখস্বচ্ছন্দতা। দাম্পত্য সুখ। সন্তানসন্ততির বিদ্যায় উন্নতি লাভ। পিতার উন্নতি। আর্থিক অশান্তি। পারিবারিক সুখ। চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীর উন্নতি ও সাফল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মকর লগ্ন—

দেহপীড়া। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। ধনাগম। সম্বন্ধু লাভ। সন্তান সন্ততির বিবাহ। কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মীদের সহিত মতানৈক্য হেতু কিছু অশান্তি ভোগ। ব্যবসা বাণিজ্যে আশানুরূপ ফল লাভের অভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টি ভালো নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভ লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। বাত বেদনা। হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্তির যোগ। উত্তম বন্ধু লাভ। ধনাগম। কর্ম্মক্ষেত্র শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে ভালমন্দ মিশ্র। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন লগ্ন—

রক্তঘটিত পীড়া বা বেদনাসংযুক্ত পীড়া। ধনলাভ যোগ। আকস্মিক অর্থলাভ। সন্তানসন্ততির লেখাপড়ায় উন্নতি। ভাগ্যস্থানের ফল মধ্যবিধ। মাতৃরিষ্টি, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।
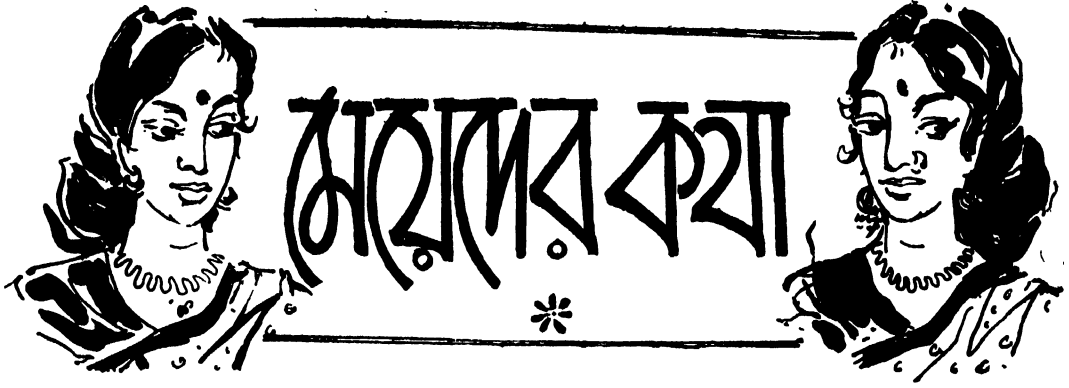
তুলসীকৃত রামায়ণোক্ত নারীধর্ম

নির্বাণপ্রিয়া

রাম-সীতা অরণ্যে প্রবেশ করিলে ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিলেন। মুনীশ্বর বিনয়পূর্বক প্রণাম জানাইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো, আমার বুদ্ধি যেন তোমার চরণকে কখনও ত্যাগ না করে। সুশীলা বিনীতা সীতা ঋষি-পত্নী অনসূয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অনুসূয়ার হৃদয় প্রসন্ন হইল। তিনি সীতাকে নিকটে বসাইয়া মিষ্টবাক্যে নারীর ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন :

মাতাপিতা ভ্রাতা হিতকারী।
মিতপ্রদ সব শুনু রাজকুমারী॥
অমিতদানী ভর্তা বৈদেহী।
অধম সো নারী জো সেব ন তেহী॥

হে রাজকুমারী, তুমি শোন, মাতা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি হিতকারীরা যাহা দিতে পারেন তাহার সীমা আছে। কিন্তু স্বামী অমিত দাতা, তাঁহার দানের সীমা নাই। সেই নারী সকলের অধম—যে সেই স্বামীর সেবা না করে।

ধীরজু ধরম মিত্র অরু নারী।
আপদকালে পরখিয়হি চারী॥

ধৈর্য্য, ধর্ম, মিত্র ও স্ত্রী আপদকালে চারটিকেই পরীক্ষা হইয়া থাকে।

ঐ সেহু পতিকর কিয়ে অপমানা।
নারী পাব জমপুর দুখ নানা॥
একই ধরম এক ব্রত নেমা।
কায় বচন মন পতিপদ প্রেমা॥
জগ পতিব্রতা চারি বিধি অহহীঁ।
বেদ পুরাণ সন্ত সব কঁহী॥

এই প্রকার স্বামীর অপমান করিলে নারী যমালয়ে গিয়া নানা দুঃখ ভোগ করে। নারীর একই ধর্ম একই ব্রত-নিয়ম হইতেছে কায়মনোবাক্যে—পতির চরণে প্রেম রাখা। জগতে চার জাতীয় পতিব্রতা নারী রহিয়াছে, এ কথা বেদ পুরাণ ও সাধুরা বলেন :—

উত্তম কে অস বস মন মাহীঁ।
সপনেহুঁ আন পুরুষ জগ নাহীঁ॥
মধ্যম পরপতি দেখই কৈসে।
ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসে॥

উত্তম পতিব্রতা নারীর স্বপ্নেও মন এই ভাবে বিভাবিত থাকে যে আর অন্য পুরুষ জগতে নাই। মধ্যম পতিব্রতা নারী অপরের স্বামীকে নিজের পিতা, ভ্রাতা বা পুত্রের মত দেখেন।

ধরম বিচারি সমুঝি কুল রহঈ।
সো নিকিষ্ট তিয় শ্রুতি অস কহঈ॥
বিনু অবসর ভয় তে রহ জোঈ।
জানহু অধম নারি জগ সোঈ॥

যে নারী শুধু ধর্ম ভয়ে কুলে থাকে সে নিকৃষ্ট। আর যে—

শুধু সুযোগের অভাবে কুলত্যাগ থেকে বিরত থাকে সে সকলের অধম।

পতি বঞ্চক পরপতি রতি করঈ
রৌরব নরক কলপ মত পরঈ॥
ছন সুখ লাগি জনমসত কোটী।
দুখ ন সমুঝ তেহি সমকো খোটী॥

যে নারী পতিকে বঞ্চনা করে, পরপতির সঙ্গে রতিসুখ ভোগ করে, সে শতকল্প রৌরব নরকে কষ্ট পায়। ক্ষণিকের সুখের জন্যে যে শত কোটী জন্মের দুঃখ অগ্রাহ্য করে, তাহার মত অধম আর কে আছে?

বিনু শ্রম নারি পরম গতি লহঈ।
পতিব্রত ধরম ছাড়ি ছল গহঈ॥
পতি প্রতিকূল জনম জহঁজাঈ।
বিধবা হোই পাই করুণাঈ॥

যে নারী পাতিব্রত্য অকপটে পালন করে, বিনাশ্রমে সে পরমপতি প্রাপ্ত হয়। যে নারী পতির প্রতিকূল, সে পর-জন্মে যেখানেই জন্ম লয় সেখানে তরুণ বয়সে বিধবা হয়।

পতিব্রতা রমণীর পক্ষে তুলসীদাসের বাণী সর্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

২

কাপড়ের উপর 'বাটিক্‌'-পদ্ধতিতে রঙীণ নক্সা-চিত্রণের জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, ইতিপূর্বেই (অগ্রহায়ণ, এবারে 'বাটিক্‌'-শিল্পের নক্সা-চিত্রণের' পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করাছি।

উপরের 'নমুনা-চিত্রে' (Pattern-Design) দেখানো নক্সানুসারে, 'বাটিকের' কাজের উপযোগী সুতী বা রেশমী কাপড়ের টুকরোটির ঠিক মাঝখানে প্রয়োজনমতো আকারে ও নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে যথাযথভাবে ১নং নক্সার প্রতিলিপি' এঁকে অথবা 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নিন। এ কাজ সারা হলে নিম্নের ২নং চিত্রে যেমন
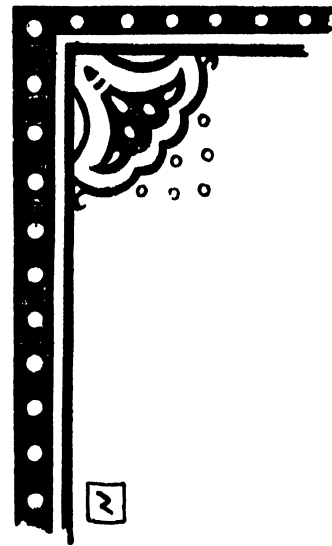
দেখানো হয়েছে ঠিক তেমনি ধরণে 'বাটিকের' কাজের উপযোগী কাপড়ের চারিদিকের কিনারায় আগাগোড়া সুষ্ঠু-ছাঁদে 'পাড়' বা 'বর্ডারের' (Border) 'নক্সা-প্রতিলিপি

পরিপাটি-ছাঁদে 'বাটিকের' কাপড়ের উপর 'নক্সা-চিত্রণের কাজ শেষ হবে। বলা বাহুল্য কাপড়ের কিনারায় 'পাড়ে' বা 'বর্ডার' রচনার জন্য উপরে যে 'নক্সা-নমুনাটি' দেওয়া হয়েছে, সেটি কিন্তু 'আংশিক-চিত্র' বা Sectional Design'। এটিতে দেখানো আছে, দুই কিনারার 'পাড়ের' কোণ (Corners) কি ছাঁদে রচনা করতে হবে—তারই নমুনা। এই নমুনা অনুসারে কাপড়ের চারিদিকের কিনারায় আগাগোড়া লম্বালম্বি-লাইনে পুরো 'পাড়' বা 'বর্ডার' রচনা করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়··· যাঁরা নিজের হাতে শিল্প কাজকর্ম করেন, তাঁদের পক্ষে এ কাজ নিতান্তই সহজসাধ্য···এমন কি সামান্য চেষ্টা করলেই শিক্ষার্থীরাও অনায়াসে এই ধরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সেরে নিতে পারবেন।

কাপড়ের উপরে 'নক্সা-চিত্রণের' কাজ শেষ করবার পর, 'মোমের প্রলেপনী' (Waxing-Procedure) দেবার পালা। এ কাজটি কাপড়ের উপরে 'বাটিক্' পদ্ধতিতে শিল্পকারুর পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য অঙ্গ। কাজেই এ কাজটুকু আগাগোড়া সুষ্ঠু এবং নিখুঁত-পরিপাটিভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে কারুশিল্পীর সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় পণ্ড হবারই সম্ভাবনা। সুতরাং 'বাটিক্'-শিল্পের কাজের সময় এ ব্যাপারে সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

'বাটিক'-পদ্ধতিতে কাজের জন্য কি ধরণের মোম ও মোম দেবার সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সে প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই (অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) আলোচনা করেছি, তাই তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আপাততঃ, 'বাটিকের' কাজ করবার সময় কি পদ্ধতিতে 'মোমের প্রলেপনী' দিতে হয়, তারই মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি।

প্রয়োজনমতো পরিমাণে 'মোম' সংগ্রহ হবার পর, গোড়াতেই উনানের আঁচে পরিষ্কার একটি পাত্র বসিয়ে সেই পাত্রে মোমটুকু গলিয়ে তরল করে নিন। আগুনের তাপে মোমটুকু আগাগোড়া গলে তরল হয়ে গেলে পাত্রের সেই 'তরল-মোমেতে প্রয়োজনমতো পরিমাণে 'রজন' (Resin) মিশিয়ে দিন এবং এই 'মিশ্রণটিকে' কিছুক্ষণ উনানের আঁচে রেখে বেশ ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন। খানিকক্ষণ ফোটানোর পর, ফুটন্ত মোম ও রজনের 'মিশ্রণ-টিতে' যখন দেখবেন যে বুদ্বুদ বা ফেনা ওঠা থেমে গেছে, তখনই বুঝবেন—মোমটি 'বাটিক্' কাজের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

এবারে প্রয়োজনানুযায়ী সরু, মোটা বা মাঝারি ধরণের ভালো তুলিতে অল্প একটু 'তরল মোম' তুলে নিয়ে 'বাটিকের' কাজের উপযোগী সূতী বা রেশমী কাপড়ের যে সব অংশে কালো রঙের 'নক্সা' চিত্রিত করা রয়েছে, সেই সব জায়গায় সযত্নে ও পরিপাটিভাবে 'মোমের-প্রলেপন' দিন। এ কাজের সময় বিশেষ নজর রাখবেন—তুলিতে যেন বেশী পরিমাণে 'তরল মোম' ব্যবহার করা না হয়। কারণ নক্সার উপরে 'তরল-মোম' প্রলেপনের সময়, অল্প-মোমের বদলে যদি বেশী মোম ব্যবহার করা হয়, তাহলে কাপড়ের বুকে আঁকা 'নক্সা চিত্রটি' প্রয়োজনাতিরিক্ত মোম লাগানোর ফলে, ধেবড়ে গিয়ে রীতিমত বেয়াড়া-অসুন্দর দেখাবে। এছাড়া আরো একটি বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। সেটি হলো—তুলির সাহায্যে 'বাটিকের' কাপড়ের উপর 'তরল মোমের' প্রলেপন দেবার সময়, সর্বদা মোম বেশ গরম-অবস্থাতেই লাগাবেন···কারণ, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কাপড়ের উপর 'মোমের-প্রলেপনের' কাজটুকুও আবার সুষ্ঠুভাবে করা চলে না। সুতরাং মনে রাখবেন—'বাটিক্'-পদ্ধতিতে কাজের সময় কাপড়ের উপর খুব শীঘ্র শীঘ্র 'মোমের-প্রলেপন' দিতে হবে··· দেরী হলেই, মোম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবং শিল্পকর্ম্মেরও নানান অসুবিধা ঘটবে। 'ঠাণ্ডা-মোমের' প্রলেপ লাগালে, অচিরে এবং অতি সহজেই সেটি নিশ্চিহ্ন হয়ে কাপড়ের উপর থেকে উঠে যাবে। পক্ষান্তরে, খুব বেশী 'গরম-ফুটন্ত' হয়ে উঠলেও আবার কাপড়ের উপরে সে মোমের প্রলেপন লাগানোর নানান অসুবিধা দেখা দেবে। বহুক্ষণ উনানের আঁচে উত্তপ্ত হবার ফলে, পাত্রের 'তরল-মোম' যদি খুব বেশী 'গরম-ফুটন্ত' হয়ে ওঠে, তাহলে সেটি থেকে ধোঁয়া জাগবে। এ ব্যাপার ঘটলেই বুঝবেন যে অতিরিক্ত-উত্তপ্ত হবার দরুণ, পাত্রের মোমটুকু জ্বলে যাচ্ছে। অতিরিক্ত-উত্তপ্ত হবার ফলে, মোম জ্বলে গেলে, সে মোম দিয়ে সুষ্ঠুভাবে 'বাটিক্-শিল্পের' কাজ করা যায় না। কারণ, 'জ্বলা-মোমের' প্রলেপ লাগালে, কাপড়ের

বুকে রঙের ছোপ ধরা রোধ করা সম্ভব নয়···'পোড়া মোমের প্রলেপ লাগানো স্থানগুলির ভিতর দিয়ে সহজেই রঙ প্রবেশ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত 'বাটিকের' শিল্পকাজটিও আগাগোড়া ধ্যাবড়া অসুন্দর দেখায়। কাজেই 'বাটিক'-শিল্পের কাজের সময় কতখানি গরম 'মোম' ব্যবহার করে তুলির সাহায্যে কাপড়ের উপর প্রলেপ দিতে হবে, তার সঠিক-ধারণা থাকা প্রয়োজন। সে ধারণা অবশ্য কয়েকদিন সযত্নে অনুশীলন করলে অনায়াসেই সঞ্চয় করা সম্ভব। তবে মোটামুটিভাবে হদিশ দিয়ে রাখি যে অতিরিক্ত-উত্তপ্ত হবার ফলে, 'তরল মোম' থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলেই, পাত্রটিকে সাঁড়াশীর সাহায্যে সন্তর্পণে ধরে উনানের আঁচ থেকে কিছুক্ষণ নামিয়ে রেখে দেবেন এবং কাজের ফাঁকে মোমটুকু খুব বেশী ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগেই সেটিকে পুনরায় পূর্ব্বপ্রথানুসারে উনানে বসিয়ে প্রয়োজনমতো 'গরম-ফুটন্ত' করে নেবেন। যথাযথ গরম অবস্থায় থাকলে, 'বাটিকের' কাপড়ের একদিকে সেই 'তরল মোমের' প্রলেপ লাগালে, অপরদিকেও সেটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে···অন্যথায় এমন ব্যাপার ঘটে না সচরাচর। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা যায় যে সুষ্ঠু পরিপাটিভাবে কাজ করতে হলে, সর্ব্বদাই 'বাটিকের' কাপড়ের দুই দিকেই সমানভাবে 'তরল মোমের' প্রলেপ দেওয়াই সমীচীন। মোটা কাপড় হতে এ প্রথা অনুসরণ করা একান্ত দরকার···মিহি কাপড়ের উপর 'বাটিকের কাজ করবার সময় অবশ্য সর্ব্বদা দু'পিঠে 'তরল-মোমের প্রলেপন' না দিলেও চলে। নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদে 'বাটিকের' শিল্প করতে হলে কিন্তু মিহি মোটা উভয়ধরণের কাপড়েরই দু'পিঠে 'তরল মোমের প্রলেপন' দেওয়া সেরা উপায়।

আগামী সংখ্যায় 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে সূতী ও রেশমী কাপড়ের উপর রঙ করার বিষয় আলোচনার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ

এমব্রয়ডারীর নতুন নক্সা

সুলতা মুখোপাধ্যায়

সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্মের অবসরে সৌখিন সেলাইয়ের নানা রকম বিচিত্র সুন্দর শিল্প-কাজ করে গৃহ-সজ্জার বিবিধ উপকরণ রচনার দিকে প্রত্যেক সুগৃহিণীরই বিশেষ আগ্রহ আছে। তাই আজ তাঁদের সূচী-শিল্পের কাজের সুবিধার জন্য বিশেষ এক ধরণের অভিনব নক্সা-নমুনার প্রতিলিপি সাদরে উপহার দিচ্ছি। এবারের এই নক্সা-নমুনাটিকে এমব্রয়ডারীর কাজ করে সহজেই 'টেবিল-ক্লথ', 'পর্দ্দা', সোফা কৌচের ঢাকা, বিছানার বালিশ, কুশন ঢাকা প্রভৃতি নানান উপকরণ অলঙ্করণের ব্যাপারে 'রানার' (Runner) বা 'পাড়' হিসাবে ব্যবহার করা চলবে।
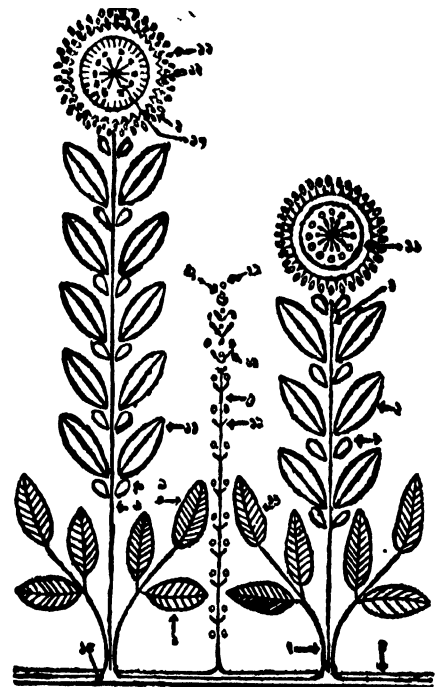
উপরে ফুল-পাতার বিচিত্র নক্সাদার যে নমুনাটি প্রকাশ করা হলো, এমব্রয়ডারী-প্রথায় সূচী-শিল্পের কাজ করে সেটিকে 'রানার হিসাবে নিখুঁত-ছাঁদে ফুটিয়ে তোলার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন—গোড়াতেই

তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। সূচী-শিল্পের এই বিচিত্র নক্সা-নমুনাটিকে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন—৪৮″ ইঞ্চি × ১৬½″ ইঞ্চি মাপের খদ্দর, লিনেন-জাতীয় কাপড়ের টুকরো, ৬ লচ্ছি (Skeins of Beige Coloured Embroidery Chords) হাল্কা-বাদামী রঙের এমব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের উপযোগী রেশমী সুতো, ৩ লচ্ছি টিয়াপাখীর পালখের মতো সবুজ রঙের রেশমী এমব্রয়ডারী সুতো, ২ লচ্ছি গাঁদা ফুলের রঙের মতো হলদে রেশমের এম্‌ব্রয়ডারী সুতো, ১১ লচ্ছি গাঢ়-সবুজ রঙের রেশমী এম্‌ব্রয়ডারী সুতো এবং ১ লচ্ছি কালো রঙের রেশমের এমব্রয়ডারী সুতো। এছাড়া আরো দরকার—½″ ইঞ্চি মাপের ও ৫০″ ইঞ্চি চওড়া শাদা রঙের ৬ লচ্ছি রেশমী এম্‌ব্রয়ডারী সুতো, ভালো মজবুত গড়নের ৫ নং এম্‌ব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের উপযোগী একটি ছুঁচ এবং কাঁচি।

উপরোক্ত উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, সেলাইয়ের কাপড়টিকে যথাযথ-ছাঁদে (৪৮″× ১৬½″) ছাঁটাই করে নেবার পর, সেটিকে পরিপাটিভাবে ইস্ত্রি চালিয়ে আগাগোড়া সমান বা সমতল করে নেবেন। ইস্ত্রি চালিয়ে এভাবে সমান করে নেবার সময়, কাপড়টির চার পাশে অন্ততঃপক্ষে ২¼″ ইঞ্চি কিনারা মূড়ে আগাগোড়া সমান-ছাঁদে 'পটি' বানিয়ে নেবেন। এ কাজটুকু সেরে নেবার পর, সূচী-শিল্পের কাপড়টির লম্বালম্বি দিকের দুই প্রান্তে ১″ ইঞ্চি মাপের 'পটি' বা 'কিনারা' মূড়ে সুচারু-ছাঁদে 'হেমিং' সেলাইয়ের (Hem Stitch) কাজ করুন এবং অন্য দুই পাশের 'কিনারায়' ½″ ইঞ্চি মাপে 'পটি মূড়ে উপরোক্ত প্রথায় 'হেম' সেলাই দিন। এমনিভাবে সূচী-শিল্পের কাপড়টির চার প্রান্তে 'কিনারা' বা 'পটি' রচনার পর, সেটিকে আগাগোড়া পরিপাটিভাবে ইস্ত্রি করে নিন। তাহলেই কাপড়ের টুকরোটি পুরোপুরি এম্‌ব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের কাজের উপযোগী হয়ে উঠবে।

এ কাজের পর, কাপড়ের উপরে নক্সার প্রতিলিপি মুদ্রণের পালা। নক্সার প্রতিলিপি-মুদ্রণের জন্য প্রথমেই পরিচ্ছন্ন একটি শাদা কাগজের উপরে ফুল-পাতার প্যাটার্ণটি নিখুঁত-ছাঁদে এঁকে নিতে হবে এবং তারপর সেটিকে কাপড়ের উপরে সুষ্ঠুভাবে বসিয়ে রেখে ও তার নীচে কার্বন-কাগজ পেতে পেন্সিলের রেখার দাগ টেনে পুরো নক্সা-নমুনাটিকে এঁকে নিতে হবে। এ কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে সারতে পারলেই, কাপড়ের বুকে আগাগোড়া নিখুঁত ছাঁদে নক্সা-নমুনার প্রতিলিপিটিকে চিত্রিত করা যাবে।

এবারে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে কাপড়ের বুকে নক্সা-নমুনা প্রতিলিপি ফুটিয়ে তোলার পালা। এ কাজের সময় নিম্নোক্ত-পদ্ধতি অনুসারে সেলাই করতে হবে। অর্থাৎ—উপরের ছবিতে দেখানো বিভিন্ন সংখ্যা-চিহ্নিত অংশগুলিকে যথাযথ-রঙের রেশমী সুতোর সাহায্যে নিম্নোক্ত রীতিতে সূচী শিল্পের কাজ করতে হবে। যথা, –

হালকা বাদামী রঙের সুতো—১নং চিহ্নিত অংশ—(পাতা) --'সাটিন-ষ্টিচের' (Satin Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

গাঁদা ফুলের রঙের সুতো ২ হালকা বাদামী রঙের সুতো ৩ নং চিহ্নিত অংশ –(ফুলের কুসুম ও পাতার কিনারা) —'ব্ল্যাঙ্কেট-ষ্টিচের' (Blanket Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

টিয়াপাখীর পালকের মতো সবুজ রঙের সুতো ৪, কালো রঙের সুতো ৫, গাঢ় সবুজ রঙের সুতো ৬, হাল্কা-বাদামী রঙের সুতো ৭ নং চিহ্নিত অংশ –(পাতার ডাঁটা, জমির কিনারা, ফুলের ডাঁটা ও পাতার ডাঁটা)—'ষ্টেম্-ষ্টিচের' (Stem-Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

টিয়াপাখীর পালকের মতো ৮ সবুজ রঙের সুতো ৯ নং চিহ্নিত অংশ—ছোট পাতার নিচয়—'ডবল ডেজী-ষ্টিচের' (Double Daisy Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

কালো রঙের সুতো ১০, গাঁদা ফুলের রঙের সুতো ১১নং চিহ্নিত অংশ—ফুলের পাপড়ির বহিরাংশ—'ডেজী-ষ্টিচের' (Daisy Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

কালো রঙের সুতো ১২ নং চিহ্নিত অংশ—ফুলের পাপড়ির মধ্যভাগের অংশ—'ফ্লাই-ষ্টিচের' (Fly-Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

গাঢ় সবুজ রঙের সুতো ১৩নং চিহ্নিত অংশ—পাতার অংশ—'ওপন-ফিশবোন্ ষ্টিচের (Open Fishbone Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

টিয়াপাখীর পালকের মতো সবুজ রঙ ১৪ হাল্কা বাদামী রঙের সুতো ১৫ কালো রঙের সুতো ১৬ নং চিহ্নিত অংশ—(পাতার অংশ, নিম্নাংশের পাড় বা কিনারা, ও ফুলের পরাগ)—'চেন ষ্টিচের' (Chain Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

হাল্কা বাদামী রঙের সুতো ১৭, গাঢ়-সবুজ রঙের সুতো ১৮, কালো রঙের সুতো ১৯নং চিহ্নিত অংশ—(ফুলের কেশর, নবোদ্ভুত-পাতার অংশ)—'ষ্ট্রেট-ষ্টিচের' Straight Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

টিয়াপাখীর পালকের মতো সবুজ রঙের সুতো ২০, গাঁদা ফুলের মতো হলদে রঙের সুতো ২১, কালো রঙের সুতো ২২নং চিহ্নিত অংশ—ফুলের পরাগ, ফুলের কুঁড়ি ও পাতার কুঁড়ি)—'ফ্রেঞ্চ-নট্' পদ্ধতিতে সেলাই করবেন।

সুষ্ঠুভাবে উপরোক্ত পদ্ধতিতে এম্‌ব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের কাজ করলেই সহজ সুন্দর উপায়েও পরিপাটি-ছাঁদে ফুটে উঠবে এবারের এই অভিনব সূচী-শিল্পের নক্সা নমুনাটি।

বারান্তরে, আরো কয়েকটি নতুন নক্সা-নমুনার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

——

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের পরম-প্রিয় সুস্বাদু-মুখরোচক অপরূপ একটি আমিষ-খাবার রান্নার কথা।

এ খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ এই অভিনব আমিষ খাবার রান্নার জন্য চাই—একসের মাংস, একপোয়া পেঁয়াজ, একপোয়া পালংশাক, একপোয়া বড়-সাইজের পুরুষ্টু লাল টোম্যাটো, বড় বড় সাইজের পাঁচ-কোয়া রসুন, গোটা আষ্টেক বা দশেক শুকনো লঙ্কা, চায়ের চামচের দু'চামচ চিনি, আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি, গরম-মশলা, নুন এবং অল্প খানিকটা কাশ্মিরী-লঙ্কার গুঁড়ো।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগেই টোম্যাটোগুলিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে কিছুক্ষণ গরম-জলে চুবিয়ে রেখে পরিপাটিভাবে সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে রাখুন। তারপর ডেকচিতে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি দিয়ে, সেটিকে উনানের আঁচে বসিয়ে পেঁয়াজকুচিগুলিকে বেশ বাদামী-রঙের করে ভেজে নিন। পেঁয়াজকুচি ভেজে নেবার পর, অনুরূপ-প্রথায় উনানের আঁচে ডেকচি বসিয়ে রসুন-বাটা ও লঙ্কা-বাটা দিয়ে ভালো করে ভেজে ফেলুন। কিছুক্ষণ এভাবে ভাজার ফলে, রন্ধন-বস্তু থেকে বেশ সুগন্ধ বেরুতে থাকলেই, উনানের আঁচে বসানো ডেকচিতে খোসা-ছাড়ানো টোম্যাটোগুলিকে ছেড়ে হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে কয়েকবার ভালোভাবে নাড়াচাড়া করুন। এবারে রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা চিনি মিশিয়ে দিন এবং পুনরায় দু'চারবার হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে রান্নাটিকে নাড়াচাড়া করেই, উনানের আঁচে বসানো ডেকচিতে পালংশাক ও মাংসের টুকরোগুলিকে আগাগোড়া সুষ্ঠুভাবে কসে নেবার পর, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু নুন ও জল মিশিয়ে দিয়ে রান্নাটিকে উনানের আঁচে দমে বসিয়ে রাখুন। খানিকক্ষণ নরম-আঁচে দমে বসিয়ে রাখার ফলে, মাংসের টুকরাগুলি আগাগোড়া বেশ নরম ও সুসিদ্ধ হলে, অল্প-অল্প ঝোল থাকতে থাকতেই রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে সামান্য গরম-মশলা মিশিয়ে দিন এবং কিছুক্ষণ আগুনের তাপে ফুটিয়ে নেবার পর, ডেকচিটিকে উনানের উপর থেকে নামিয়ে ফেলুন। তাহলেই রান্নার পালা শেষ হবে।

রান্নার কাজ শেষ হলে, রন্ধন-পাত্রে রাখা খাবারটির উপর সামান্য একটু কাশ্মিরী লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে ডেকচির মুখটি ঢাকা চাপা দিয়ে বন্ধ রেখে দিন। তাহলেই প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণের সময় খাবারটি খেতে যে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আর এতটুকু সন্দেহের কারণ থাকবে না।

পরের সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি বিচিত্র-উপাদেয় ভারতীয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

বিলাতের চিত্রজগতে চিত্র প্রযোজক

শ্রীউমেশ মল্লিক (লণ্ডন)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এখানে কাজের নানা ভাগ এমন করে ভাগ করা থাকে যাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পা ফেলে একই তালে এগিয়ে চলে। কোথাও গণ্ডগোল হবার যো নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পদ মর্য্যাদাকে শ্রদ্ধা ও স্বীকার করে চলে। যেমন পরিচালক lighting camera manকে আদেশ দেন তিনি আবার সে আদেশ দেন camera operaterকে—বৃটিশের সেই নীতি proper channel—এ ক্ষেত্রেও বজায় আছে, সুতরাং কোথাও কোন গণ্ডগোল হয় না।

Art Directorএর কাজ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলেছি যে এখানে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্য এদের সব কিছুই studioএর ভেতর করতে হয় সুতরাং ডাক পড়ে Art directorএর সর্ব প্রথম। তাঁকে script দিয়ে দেওয়া হয়। সেই script থেকে তিনি directing boardএ দৃশ্যগুলো আঁকার পর মডেল্ তৈরী করেন; তারপর সেই মডেল নিয়ে পরিচালক-প্রযোজকদের আলাপ-আলোচনা হয়,এমন কি কোন দৃশ্যের কোন অংশে কোথায় camera বসান হবে সে সম্বন্ধেও বিচার হয়ে থাকে।

Art directorএর গুরুত্বটা আরও বেশী করে উপলব্ধি করা যায় যখন matchingএর ব্যবস্থা হয়। যেমন ডেন্‌হাম্ স্টূডিওতে একটা Monticarloর দৃশ্য তোলা হচ্ছিল, আমি সে ছবিতে কাজ শিখছিলাম। নাম হ'লো Look before you love,অভিনেত্রী ছিলেন Margaret Lockwood অভিনেতা হলেন "সেক্‌সপিরিয়ান অভিনেতা" নরম্যান ও ল্যাণ্ড।

ঘটনার বিষয় বস্তু হ'লো চাঁদনী রাত্রে Monticarloর বড় বাগানের বারান্দায় নায়ক-নায়িকা প্রেমালাপ করছেন; দূরে সমুদ্রের জল চাঁদের আলোতে চিক্ চিক্ করছে। দূরে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে বাড়ীগুলো থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথমে এর establishing shotএ অর্থাৎ আবহাওয়া monticarloর সৃষ্টি করবার জন্য আসল ছবিটা সমুদ্রের ধারের—"পেনারমিক ভিউ" তুলে নিয়ে এলেন। তারপর পয়সা বাঁচাবার জন্য সেই আসল দৃশ্যের নকল দৃশ্য করলেন studioর ভেতরে। যখন বারাণ্ডার চত্বরে প্রেমালাপ হচ্ছে সেটা Montecarloতে সত্যিকারের করতে গেলে অভিনেতা অভিনেত্রী প্রভৃতি সদল বলে unit নিয়ে গেলে গাড়ী ভাড়া, হোটেল ভাড়া, union fee ইত্যাদিতে পড়ে যাবে ছবির খরচ অত্যন্ত। সুতরাং আসল monticarloর দৃশ্যের সঙ্গে match করে নকল monticarlo করা হ'লো studioতে।

এক্ষেত্রে দেখলাম প্রায় তিনতলার সমান একটা monticarloর দৃশ্য আঁকা হয়েছে ঠিক আসল দৃশ্যের মত। তারপর এই আঁকা দৃশ্যের ঘর-বাড়ীগুলোর জানালা দরজাগুলোকে ফেশ তুলি দিয়ে গাঢ় করে দেওয়া হচ্ছে। Arc lamp দিয়ে তারপর চাঁদ সৃষ্টি করা হচ্ছে আসল দৃশ্যের মত করে। সমুদ্রের জল চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে দেখাবার জন্য এই তিনতলার দৃশ্যের যেখানে যেখানে সমুদ্রের জল আঁকা আছে সেখানে লাইলনের মশারী অতি সূক্ষ্মভাবে বসিয়ে দেওয়া হ'লো। সেই মশারীতে দেওয়া হ'লো কেতা দুরস্তভাবে studiosএর নকল আলোর ছটা। আসল দৃশ্যের খোলা জানলা থেকে আলো ঠিকরে পড়বার আভাস দেখাবার জন্য এরা নকল

দৃশ্যের জানলাগুলো blade দিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে কেটে তার পিছনে ছোট ছোট ইলেক্‌ট্রিকের "বাল্ব" এমন কায়দা করে বসিয়ে দিল যে বলবার কথা নয়।

পটভূমিকায় এই দৃশ্যকে Stndrios তে রেখে নকল বারাণ্ডা বসিয়ে Montecarloর matching দৃশ্য করে ছবি হ'তে লাগলো। পরদিন Rushes এ আমরা ছবি দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। establishing shot এর আসল দৃশ্যের সঙ্গে নকল দৃশ্যের লুকোচুরি মোটেই ধরা গেল না। এখানে বলে রাখি Rushes মানে Rush work অর্থাৎ রোজকার কাজ রোজ বিনা সম্পাদনায় ছবি Print করে দেখে নেওয়া হয় কেমন ছবির কাজ চলছে। আগের আগের দৃশ্যের সঙ্গে continuity অর্থাৎ সমতা বজায় আছে কিনা ইত্যাদি, জামা কাপড় সাজ পোষাক, কো'থায় কে কিভাবে কাকে কি কথা বলেছিল, তা দেখে নেওয়া আর কি? আর এক ক্ষেত্রে আমি কাজ শিখছিলাম আর একটা ছবিতে—নাম তার—Sleeping car to Trieste. Trieste হ'লো ইটালীর একটা সহর। চিত্রের গল্পাংশটা হ'লো একটা ফ্রান্স থেকে ইটালী যাওয়ার ট্রেণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রায় ৯০ ভাগ ছবি এই ট্রেণের মধ্যেই নেওয়া। করলে কি এরা—ডেল্ হতাম ষ্টুডিওতে প্রায় হাওড়া স্টেশনের মত একটা নকল স্টেশন। বাকী প্রায় ৫।৬টা নকল Engine সমেত তৈরী করলো ষ্টুডিওর মধ্যেই। এতে বাইরে গিয়ে রেলের লাইনের ছবি নিতে যেতে হ'লো না দল বলে। আসল স্টেশনে না গিয়ে নকল স্টেশন ষ্টুডিওজ্‌এর মধ্যে তৈরী করে ছবিটা অল্প খরচে শেষ করা এই উদ্দেশ্য।

গাড়ী ছুটে যাচ্ছে রেলওয়ে লাইনের ওপর দিয়ে যখন', তখন আসে পাশের ঘর বাড়ী ছুটে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করলো যে ভাবে Studios এর মধ্যে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। করলে কি এরা—প্রকাণ্ড ঢোলক্ যা আমরা দেখে থাকি বাজনার সঙ্গে, সেই রকম একটা প্রকাণ্ড ঢোলকের ওপর শিল্প নির্দ্দেশক আঁকলেন ঘর বাড়ী মাঠ খেত খামার ইত্যাদি। Studioএ তারপর ঐ ঢোলকের মত জিনিষটাকে গাড়ীর আসবাব জানলার বাইরে রেখে দিল। অর্থাৎ ঐ পটভূমিকাকে পিছনে রেখে চিত্র অভিনেতাকে নকল ট্রেণের বগীর জানালার কাছে বসতে বলা হ'লো। কথাবার্ত্তা তিনি যখন বলছেন বা বাইরে তাকিয়ে দেখছেন তখন ঐ পটভূমিকায় আঁকা ঢোলকের মত জিনিষটাকে ধীরে ধীরে একজনকে চক্রাকারে ঘোরাতে বলা হ'লো।

ছবিতে যখন দেখা গেল চিত্রের এই অংশটি পরের দিন Rushesএ, তখন ঐ আবহাওয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতা-টাকে স্বীকার না করে থাকতে পারা গেল না।

এ ছাড়া Bacon proiection তো আছেই।

এই সঙ্গে বলে রাখি এ দেশের পেশাদারী ছুতোর বা কামার জাতীয় লোকদের—যাদের এ বিষয়ে কাজে নেওয়া হয় তাদের অদ্ভুত কাজ করবার ক্ষমতা।

দেখতে দেখতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নকল একখানা ট্রেণের বগীকে যেমন বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে অর্থাৎ নকল বগীর জানলা দরজা জোড়া দিয়ে একটা নকল ট্রেণের বগী তৈরী করতে পারে, ঠিক তেমনি দেখতে দেখতে সেই ট্রেণের বগীর জানালা দরজা খুলে আর একটা জিনিষ চাহিদা মত হুকুম তামিল করতে পারে।

এদের বলতে হয় না—ওরে হাত চালিয়ে কাজ কর বা বাইরে গিয়ে কাজের সময় বিড়ী ফুঁকো না যখন কাজের দরকার।

সব সময়ে এরা তটস্থ হয়ে বসে থাকে কখন তার কাজের ডাক পড়বে। এজন্যে কাউকে তাড়া-হুড়া চীৎকার করতে হয়না। কাজ চলে ঘড়ীর কাঁটার মত। সব নিজের নিজের বিভাগের দায়িত্বকে এরা মাথা পেতে স্বীকার করে নেয়, সম্মান করে। এর আর একটা কারণ হ'লো এরা ক্ষেত্র বিশেষে মাইনে পায় প্রায় হাজার টাকারও বেশী, তাছাড়া আছে এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

এদের যেখানে একজনের কাজের দরকার হয় সেখানে কাজের মান যাতে উঁচু ধরণের হয় সে জন্যে এরা এক জন লোকের পরিবর্ত্তে দুজন লোককে নিযুক্ত করে থাকে।

কলকাতায় অধিকাংশই আমরা একজন লোককে নিযুক্ত করে তাকে খাটিয়ে নেই গাধার মত এবং পয়সা দেবার সময় তাকে চেষ্টা করি যত কম পয়সা দিতে। এরা এখানে তা করেনা। কারণ এরা মনে করে এরকম মনোবৃত্তি আত্মঘাতী। এতে আন্তরিক ভাবে কাজ কর-

মুক্তি প্রতীক্ষিত "বিভাস" চিত্রে উত্তমকুমার ও ললিতা চট্টোপাধ্যায়

বার যে আগ্রহ তা কাজের চাপে মাঠে মারা যায় এবং ফলে ইচ্ছা থাকলেও তারা তাদের প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না—সুতরাং কাজের ক্ষতি হয়ে থাকে।

আর একটা হলো Stuido এর মধ্যে শৃঙ্খলতা বজায় রাখার অদ্ভুত ব্যবস্থা। দায়ী এর জন্য পরিচালকের প্রধান সহকারী। আমাদের মত কলকাতায় পরিচালককে এখানে সব বিষয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছুটো ছুটি করতে হয়না। যার যা কাজ সে তার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে থাকে, ফলে চিৎকার, হৈ-হৈল্লা চেঁচামেচির কোন প্রকার বালাই নেই এখানে। তবে কোন প্রকার কোন বিষয়ে কাজের খেলাপ হ'লে এদের বিধিব্যবস্থা ও ঝগড়া করেনা। আকারে প্রকারে এরা কথা বার্ত্তার মধ্যে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় ভদ্রভাবে—কে কার কাজে গাফিলতী করছে। তাও প্রকাশ্যভাবে নয় পরোক্ষভাবে। ছোট কাজ করছে বলে যে কথায় বার্ত্তায় বাপ-পিতামহ করবে সে প্রকার মনোবৃত্তি এখানে নেই। এরা মানুষ, মানুষের সমান অধিকার দেয়—বরং একজন ঘটনা চক্রে আর একজনের থেকে যে বড় কাজ করে বলেই যে মাথা কিনে নিয়েছে তা নয়।

যে বড় কাজ করে সে নিজের ব্যবহারে অপরকে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে—সে ঐ পদ মর্য্যাদার যোগ্য ব্যক্তি। Unionএর যে নিবাচিত প্রাণ্ডা হয়তো সে

মালিক তাকে সম্মান করে বলে। এক্ষেত্রে বলে রাখি যে Union যে কড়া—এ কথাটা আমি যে শুনেছিলাম তা পদে পদে সত্য।

একটা উপমা দিলেই বুঝতে পারবেন। Sleeping car to trieste এই চিত্রে একদিন স্টেশনের ভীড়ের দৃশ্যে কোম্পানী আড়াইশো লোকের মধ্যে ২০০ আসল লোক নিল এবং ৫০ জন মানুষ প্রমাণ কাঠের মানুষের মূর্ত্তি wood cut figureকে তৈরী করে ভীড়ে বসিয়ে দিল মানুষের বদলে, স্টেশনের দৃশ্যে। হঠাৎ শুনা গেল কানা ঘুষায় যে—সে দিনের কাজ Unionএর পর বন্ধ হয়ে যাবে, কেন না Unionএর লোক strike করবে।

তাদের দাবী ৫০ জন মানুষ প্রমাণ wood cut figure ভীড়ের দৃশ্যে ব্যবহার করায় unionএর সভ্যদের নেওয়া না হওয়ায় সভ্যদের যোগ্য দাবী থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সভ্যদের নেওয়া হ'লে সভ্যরা পয়সা পেতো এ ক্ষেত্রে তাদের না নেওয়া হওয়ায় কর্তৃপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। শুনে প্রসিদ্ধ পরিচালক John Paddy Carstaior এবং বিশেষ প্রযোজক George H. Brown এরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এর আগে আমাকে নিয়ে গোলযোগ হয়েছিল। ভীড়ের দৃশ্যে আমি আর পাঁচজনের মত যাত্রী হিসাবে ছবিতে ট্রেনে গিয়ে উঠেছিলাম শুধু মজা করবার জন্য।

যা হোক পরিশেষে সেই wood cutএর মূর্ত্তিগুলোকে ফেলে দেওয়া হ'লো। unionএর সভ্যদের তার বদলে দাঁড় করান হ'লো। ক্ষতি হ'লো একটা দিনের কাজের। আর্থিক ক্ষতি মোট ৪০ চল্লিশ হাজার টাকা। মাত্র এক দিনের কাজ বন্ধ থাকায় ঐ টাকার ক্ষতি।

এই রকম নানা ভাবে নানা ছল ছুতো করে union তাদের নিজের কর্ত্তৃত্ব বজায় রেখে থাকে, যার ফলে এ বিষয়ে প্রত্যেকে unionকে মেনে চলে মনে প্রাণে। কখন কোন সভ্যর মাথায় ভূতচেপে বসবে কে জানে? তাকে কেন্দ্র করে সুরু হয়ে উঠবে একটা প্রচণ্ড ঝড়। যতক্ষণ না union এর দাবী মেনে চলা হয়েছে, ততক্ষণ চলবে strike সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ এক রকম তাদের union

তাই ব্যক্তি বিশেষের কাউকে আন্তরিকভাবে বিলাতের Sludio গুলোতে কাজ শেখবার সুযোগ দেবার ইচ্ছা থাকলেও এই union এ বিষয়ে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কেউ চায় না তারই জন্য Studioতে strike চলবে, ফলে মাত্র এক জনের জন্য হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে থাকবে। সুতরাং সাধু সাবধান। আজ কাল ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের এদেশে উজাড় করে এসে ঢোকায় প্রতি union এর মনোবৃত্তি আরও রক্ষণশীল হয়ে উঠেছে—এরা ভাবে সব সময়ে আজ কাল সে যে কোন কাজই হোক না কেন—যে বিদেশী লোকের পরিবর্ত্তে নিজেদের লোক ইংরাজদের গ্রহণ করা উচিত কিনা? দেখা গেছে বিদেশীর গুণ শতগুণের হ'লেও জাতীয়তার দিকে দৃষ্টিদিয়ে এরা নিজেদের লোক কে প্রথমে গ্রহণ করে।

কাজ শেখবার পর আমার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল A. C. T অর্থাৎ Association of Cinematograph Technician এর সভ্য হওয়ার। আসল হলো এই Union যে বিষয়েই চিত্র জগতের লোক কাজ করাল, এক প্রযোজক ছাড়া এ Union এর সভ্য হতে হবে—কেননা আকারে প্রকারে অক্টোপাসের মত এর বাহু বন্ধনকে স্বীকার না করে উপায় নেই। এদের হুকুম তামিল না করলে কোন প্রযোজকের সাধ্য কি যে কাউকে চিত্র জগতে কাজ দেয়। প্রায় কুড়ি বছর হ'লো এ প্রতিষ্ঠানের সেই একই সেক্রেটারী এবং একই প্রেসিডেন্ট। নিজস্ব আমার মত যে, এ প্রতিষ্ঠান একদলীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এদের যুক্তি অদ্ভুত। ইংরাজ ছেলেদের প্রবেশ পত্রের কোন বালাই নেই। বিদেশী হ'লেই নানা প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং নানা অছিলায় এরা বিদেশীদের সিনেমা জগতে ঢুকতে দিতে রাজী নয়। জাহাজের সেই ইংরেজদের মত এরাও বলে যে, ইংরেজ বহু চিত্রজগতের লোক "অনাহারে অনিদ্রায়" মারা যাচ্ছে কাজের অভাবে, সুতরাং তাদের কর্ত্তব্য প্রথমে এই ভাগ্যহত ইংরেজদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা। সম্প্রতি এই Union এর সঙ্গে ২১৪ জন প্রযোজকের মামলা মকদ্দম হয় Union

প্রযোজকরাও এঁদের তাঁবে কাজ কর্ম করবে। যা অনেক নাম-করা প্রযোজক রাজী হন না।

যা হোক A, C, T এর এখন নাম বদল হয়েছে টেলিভিশনের গোড়া পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এতে টেলিভিশনের লোকেদেরও সভ্য হবার Unlon নির্দ্দেশ হয়েছে—যার ফলে A, C, T এখন A, C, T, T নামে প্রচলিত। মধ্যে মধ্যে এরা বিদেশীদের কোন নির্দ্দিষ্ট ছবির জন্য Union এর সভ্য নিযুক্ত করে, ফলে ব্যক্তি বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট ছবিতে কাজ করতে পারে।

এখানে সিনেমা জগতের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন Union আছে, যা A, C, T, Tর অন্তর্গত। যেমন Hairdresser দের Union ইত্যাদি। এক Union এর লোক অপর Union এর কাজে হাত দেয়না। ধরুন "আলোর স্নুইচটা নিভিয়ে দিতে হ'লে সেই Union এর লোককে ডাক দিতে হবে, আপনি বা আমি ঐ Union এর সভ্য না হলে সামান্য মাত্র এ কাজটাও Studio তে করতে পাব না বা করবো না। এই হ'লো চিত্র জগতের Union এর বিধি নির্দ্দেশ। এর এতটুকু ব্যতিক্রম হলেই Strike চলবে। এ Strike হবার আগে কোন প্রকার হৈ চৈ হয় না।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সভ্যরা মিটিং এর কথা জানিয়ে দেয় নিজের নিজের বিভাগে। Lunchএর সময় meeting বসে। দু চার কথায় সংক্ষেপে সেক্রেটারী জানিয়ে দেয় Union এর মনোভাব। দেখতে দেখতে Studio ছেড়ে বার হয়ে যায় সব কালের পুতুলের মত। এদের কাজ চলে ঘড়ীর কাঁটার মত। Unionই হ'ল সেখানে মালিক। ইচ্ছা অনিচ্ছা তাদের ওপর কাজ চলে। এ হেন Unionকে ঠকিয়ে রাখা ভীষণ ব্যাপার।

এ দেশে ছবি করা ভারতবর্ষ থেকে অনেক সোজা। এর কারণ নানা রকম।

এ দেশে ছবি করবার একটা বিধি নির্দ্দেশ আছে। মেনে চললে তা ছবি করবার নানা প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। তবে মিলে মিশে ইংরাজদের সঙ্গে এ বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। তাও নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের ওপর প্রধানতঃ।

এ ক্ষেত্রে একটা কথা উপলব্ধি করা সহজ হবে যে এরা নিজের লোকের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। মেলা মেশায় আদব কায়দায় এদের সঙ্গে এক হয়ে না গেলে, এঁরা কোন দিনই বিদেশীর সঙ্গে কাজ করতে রাজী হবেনা। যা হোক এদের তাঁবে থাকলে এখানে ছবি করা সোজা, তার কারণ আগেই বলেছি পরিবেশক প্রথমে ৬০।৭০ ভাগের টাকা আগাম দিয়ে থাকে। অবশ্য এ টাকা পেতে গেলে প্রথমে চিত্র নাট্য, দ্বিতীয় বাজেট, তৃতীয় চিত্র-তারকা—এ বিষয়ে পরিবেশকের সঙ্গে মতের মিল হ'তে হবে। এক মত হ'লে তবে টাকা পাবার সম্ভাবনা থাকে। বাদ বাকী ৩০ ভাগ প্রযোজক যোগাড় করে বিদেশ থেকে—যেখানে ছবির বাহির দৃশ্যের কাজ হবে সেখান থেকে।

অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশক ৭০ ভাগ টাকা দিতে রাজী হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে এ টাকা পাওয়ার ভাগ নির্ভর করে। যদি পরিবেশক ৬০ ভাগ টাকা দিতে রাজী হয় তা হ'লে ৪০ ভাগ টাকা যোগাড় হ'তে পারে অন্য রকমে। গভরণমেণ্টের তহবিল National Film Finance Corporationএর কাছে ২০ ভাগ নিয়ে আর বাদ বাকী ২০ ভাগ দেখাতে হয় নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে আপোষে একটা নিষ্পত্তি হয় যে ১০ ভাগ টাকা ছবি মুক্তি হওয়ার পর আদায় করার দাবী—যা কেউ এখন করবে না। আর বাদ বাকী ১০ ভাগ দেখাতে হয় কাগজে কলমে প্রযোজকের fee হিসাবে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে পয়সাওয়ালা লোক কিছু টাকা উপরি fee নিয়ে তার Bankএর টাকা ছবি করার জন্য জামিন দাঁড়ায়। ফলে প্রযোজকদের fee ইত্যাদিতে প্রথমে হাত পড়ে না। আমার ছবিতে যেমন দাঁড়িয়েছিল ক্রোড়পতি লোক বন্ধু মাননীয় ডেরিক উইল।

যা হোক এ সমস্ত নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের টাকা পয়সা যোগাড়ের বুকের পাটার ওপর। আর একটা বিষয় এদেশে আছে, যাতে কোম্পানীর টাকা মারা না যায় অথবা হৈ হৈ করে। মহরত ইত্যাদির পরে এবং টাকা ছবি তৈরী হওয়ার আগেই ফুঁকে যাতে না যায় সেদিকে কড়া দৃষ্টি দেওয়ার। সরকারের এখানের নিয়ম ছবি আরম্ভ করবার পূর্ব্বে একজনকে দাঁড় করান, যিনি মুক্ত

কণ্ঠে গভর্ণমেণ্টকে জানাবেন যে ছবি শেষ হওয়ার যা টাকা লাগে তা তিনি দিতে প্রতিশ্রুত আছেন।

কোন ব্যক্তিবিশেষকে এত বড় জোর গলায় বলতে দেখা যায় না। কারণ এখানের ছবির এই যে ৫০।৬০ লক্ষ টাকার জামিন এটা খুব কম লোকই দাঁড়াতে পারেন যাঁর আর্থিক সঙ্গতি সরকারকে সন্তুষ্ট করতে পারে। বিলাতে এ জন্যে এক কোম্পানী নাম তার Film Finance Corporation এরা হলেন Insurance companyর মত এবং এরা জামিন দাঁড়াবার জন্য যথেষ্ট টাকা দাবী করে বসেন। কারণ এদের দায়িত্ব সব থেকে বেশী। এলিজাবেথ টেলারের "ক্লিওপেট্রা" ফিল্ম এক্ষেত্রে নজির হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ছবি যদি নির্দ্দিষ্ট টাকার মধ্যে শেষ হয়, তাহ'লে এরা এদের প্রাপ্য টাকা কম নিয়ে থাকেন।

Film Finance Corporationকে ভয় করে চলে সকলে। খুঁটিয়ে তারা "বাজেটের" প্রতিটি বিষয়ে যাচাই করে দেখে। পরিবেশক গভর্ণমেণ্টের তহবিলের লোক রাজী হ'লেও এরা যদি প্রযোজকের প্রাপ্য টাকা কম করবার আদেশ দেয় তাহ'লে কোম্পানীকে সে আদেশ মাথা পেতে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ জামিন না দাঁড়ালে ছবি হওয়া সম্ভবপর নয়।

তবে এদেশেও নানা বখেড়া আছে ছবি করায়। যেমন চিত্র তারকাদের কেন্দ্র করে। পরিবেশক টাকা আগাম দেওয়ার আগে চিত্রতারকাকে সে সম্বন্ধে চুটিয়ে দেখে নেন। চিত্রতারকা সম্মতি দেবার আগে চিত্রনাট্য পড়ে থাকেন।

চিত্রনাট্য পড়বার সময় এদেশের চিত্রতারকরা সব চিত্রনাট্য নিজে প'ড় থাকেন না। যে যে পাতায় চিত্র-তারকার অংশ আছে তা তাঁরা প্রথমে "পিন্" দিয়ে এঁটে নেন এবং দেখেন সারা ছবিতে তাঁর অংশ কত মিনিটের আছে, কতকগুলো Close up আছে ইত্যাদি। পড়ে এগুলো চিত্র তারকা তাঁদের Agent বা সহকারীদের সবটা চিত্রনাট্য পড়বার অনুরোধ করবেন। এই সব লোক যদি চিত্র তারকার সঙ্গে ছবির অভিনয়ের অংশ গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে একমত হন, তখন চিত্র তারকা সেই মতামত ব্যক্তিবিশেষকে জানিয়ে দেন। অনেকক্ষেত্রে এই মতামত নির্ভর করে অভিনেত্রীর ওপর। অনেকে চিত্র অভিনেত্রীকে প্রথমে জেনে নেন এবং চিত্র-অভিনেত্রী মনোমত না হ'লে চিত্র-অভিনেতা প্রথমেই এ বিষয়ে অমত করে থাকেন।

আর একটা বখেড়া আছে যে চিত্রতারকা মত করলেন প্রযোজক তাঁর সঙ্গে ঠিকঠাক করলেন, কিন্তু হয়তো পরিশেষে ছবিটা হ'লো না সে ক্ষেত্রে চিত্রতারকা বা তাঁর Agent এ "অপরিসীম" ক্ষতি বলে মকদ্দমা প্রযোজকের বিরুদ্ধে করতে পারেন। আবার চিত্রতারকা না হ'লে পরিবেশনা পাওয়া সম্ভাবনা হয় না। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে চিত্র-প্রযোজক টাকা যোগাড় করতে পারলেন না সময়মত কোন কারণে, চিত্রতারকা অন্য ছবির তাগিদে হাত ছাড়া হয়ে গেল ফলে ছবি বন্ধ হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সে ক্ষেত্রে প্রযোজকের প্রাণপণ পরিশ্রমই হ'লো সার।

চা পান ও ঠোঁটের ব্যবধানের দূরত্বের মধ্যে শত অঘটনের যে ইঙ্গিতের ইংরেজী প্রবাদ আছে তার সারবত্তা বোধ হয় এক মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় ছবির জগতে।

তা হ'লেও কি আতিশয্যে, কি আড়ম্বরে, কি অনিশ্চয়-তার রহস্যে কি দুঃসাহসের প্রলোভনে চিত্র জগতের তুলনা হয় না।

* * *

ই, আই, এম, পি কর্ত্তৃক সাংবাদিক পুরস্কৃত

ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন বিগত ১৪ই নভেম্বর তাদের কার্যকরী কমিটীর এক জরুরী বৈঠকে বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পে গবেষণা ও 'বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস' পুস্তকরচনার জন্য 'রূপমঞ্চ' সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়কে ২০০১৲ (দুই হাজার একটাকা) পুরস্কারে ভূষিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এসো-সিয়েশনের এক বিশেষ সভায় শ্রীমুখোপাধ্যায়কে উক্ত পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে। স্মরণ থাকতে পারে যে সর্বভারতে বাঙলাদেশেই স্বর্গতঃ হীরালাল সেন প্রথম চিত্র নির্মাণ করেন—শ্রীমুখোপাধ্যায় এই তথ্য তাঁর ইতি-হাসে প্রমাণ করেন এবং রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি পায়। সর্বভারতে চিত্র প্রতিষ্ঠান থেকে এই সর্বপ্রথম একজন সাংবাদিককে এই সম্মানে ভূষিত করা হলো।

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতবর্ষ—ইংল্যাণ্ড ১ম টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৪৫৭ রান (৭ উইকেটে ডিক্লে: বি কুন্দরাম ১৯২, ভি এল মঞ্জরেকার ১০৮, ডি এন সরদেশাই ৬৫ এবং এম এল জয়সীমা ৫১ রান। টিটমাস ১১৬ রানে উইকেট পান)

ও ১৫২ রান (৯ উইকেটে ডিক্লে: কুন্দরাম ৩৮। টিটমাস ৪৬ রানে ৪ এবং মর্টিমোর ৪১ রানে ২ উইকেট।)

ইংল্যাণ্ড ঃ ৩১৭ রান (জে বি বোলাস ৮৮, কেন ব্যারিংটন ৮০। বোরদে ৮৮ রানে ৫ এবং দুরানী ৯৭ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ২৪১ রান (মাইক স্মিথ ৫৭, মর্টিমোর ৭৩ নট আউট এবং ফিল সার্প ৩১ নট আউট। কৃপাল সিং ৬৬ রানে ২ এবং নাদকার্ণী ৬ রানে ১ উইকেট)—৫ উইকেটে।

মাদ্রাজে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলা ড্র গেছে। এই নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৩০টি খেলায় ১২টি খেলা ড্র গেল—ভারতবর্ষে ৮টি এবং ইংল্যাণ্ডে ৪টি। অপরদিকে জয়লাভের সংখ্যা ইংল্যাণ্ডের ১৫ এবং ভারতবর্ষের ৩।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব টসে জয়লাভ করেন ভারতবর্ষ—ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজে ৩০টি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের টসে জয় এই নিয়ে ১৭ বার।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ২৭৭ রান দাঁড়ায় ২ উইকেট পড়ে। উইকেটে অপরাজিত থাকেন বুধি কুন্দরাম (১৭০ রান) এবং বিজয় মঞ্জরেকার (২০)। কুন্দর'মের শতরান করতে ১৯৭ মিনিট সময় লাগে। শেষের ১০ রাণ করতে তিনি বেশী সময় নিয়েছিলেন—৪০ মিনিট। টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় উইকেট-কীপারদের মধ্যে কুন্দরামই প্রথম সেঞ্চুরী করলেন। ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট শিরিজে উইকেট-কীপার হিসাবে কুন্দরামের সেঞ্চুরী নজির। ইংলণ্ডের উইকেট-কীপার ইভান্স ১৯৫২ সালে লর্ডস মাঠে ভারতবর্ষের বিপক্ষে সেঞ্চুরী ক'রে প্রথম নজির স্থাপন করেছিলেন। সরদেশাই এবং কুন্দরম দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১৪৩ রাণ তুলেন ; এই রান ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড। পূর্ব্ব রেকর্ড ১৩১ রান—জয়সীমা এবং মঞ্জরেকার (বোম্বাই, ১৯৬১-৬২)।

দ্বিতীয় দিনে ৪৫৭ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। কুন্দরম ৯২ রান ক'রে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেন। আর ৮ আর করলেই কুন্দরমের ২০০ রান পূর্ণ হ'ত। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এক

ইনিংসের খেলায় কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ই ২০০ রান তুলতে পারেন নি। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ১৭৯ রান—বিজয় মঞ্জরেকার (দিল্লী, ৮৯৬১-৬২)।

ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় দিনে চা-পানের পর থেকে ব্যাট ক'রে ৬৩ রান করে, উইকেট পড়ে ২টো।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ২৩৫ (৪ উইকেটে)। অর্থাৎ সারা দিন ব্যাট ক'রে ইংল্যাণ্ড আরও দুটো উইকেট খুইয়ে পূর্ব্ব দিনের ৬৩ রানের সঙ্গে মাত্র ১৭২ রান যোগ করে। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় এই রান খুবই কম।

চতুর্থ দিনে ৩১৭ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করেন জে বি বোলাস, ৮৮। বোরদে চতুর্থ দিনে মাত্র ২৬ রানে ৪টে উইকেট পান এবং ১৪ ওভার মেডেন পান ২৭ ওভার বল দিয়ে। চা-পানের ৫০ মিনিট আগে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু হয়—ভারতবর্ষ তখন ১৪০ রানে এগিয়ে ছিল। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ভারতবর্ষের ১১৬ রান দাঁড়িয়েছে, উইকেট পড়েছে ৬টা।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতবর্ষ তার ১৫২ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষনা করে। তখন খেলা শেষ হ'তে আর ২৭০ মিনিট সময় বাকি ছিল। ইংল্যাণ্ডের জয়-লাভের জন্যে ২৯৩ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই রান উঠেনি; ইংল্যাণ্ডের ২৪১ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলা ভেঙ্গে যায়।

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ৩য় টেষ্ট ঃ

অস্ট্রেলিয়া ঃ ২৬০ রান (বুথ ৭৫ এবং সিম্পসন ৫৮ রান। পোলোক ৮৩ রানে ৫ এবং পারট্রিজ ৮৮ রানে ৫ উইকেট)

ও ৪৫০ রান (৯ উইকেটে ডিক্লে:, বোনো ৯০, লরী ৮৯, ও'নীল ৮৮ এবং ম্যাকেঞ্জী ৭৬। পোলোক ১২০ রানে ২ এবং পারট্রিজ ১১৩ রানে ৫ উইকেট)।

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ৩০২ রান (পোলক ১২২, গডার্ড ৮০ এবং ব্লাণ্ড ৫১ রান। ম্যাকেঞ্জী ৭০ রানে ৩ এবং বেনো ৫৫ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ৩২৬ রান (৫ উইকেটে। ব্লাণ্ড ৮৫, গডার্ড ৮৪ এবং পিথে নট আউট ৫৩ রান। হক ৪৩ রানে ২ উইকেট)।

সিডনীতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা বে-সরকারী তৃতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলা ড্র রেখে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ৬ ঘণ্টারও বেশী সময় ফিল্ডিং ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট পায়; তাদের দ্বিতীয় ইনিংস নামিয়ে দিতে পারেনি।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করে। খেলার প্রথম দিনেই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৬০ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি সামান্য সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ১১ রান করে, উইকেট পড়ে একটা।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার রান দাঁড়ায় ২৯৪ (৮ উইকেটে)।

তৃতীয় দিনে ৩০২ রানের মাথায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ৪২ রানে অগ্রগামী হয়। এই দিনের বাকি খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেট খুইয়ে ২৪৩ রান করে।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া ৪৫০ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ১ উইকেটে এই দিনের বাকি খেলায় ৬১ রান তুলে দেয়।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ পর্য্যন্ত ৩২৬ রানে গিয়ে দাঁড়ায় (৫টা উইকেটে)।

রোহিণ্টন বারিয়া ট্রফি ঃ

মাদ্রাজ ঃ ১১৯ রান (এ জি সত্যেন্দর সিং নট আউট ৫০ রান। অজয় দিভেচা ৬৪ রানে ৫ এবং সূর্যকান্ত মোর ১৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪১১ রান (মুরারী ৮০, বল্লাল ৭৭ নট আউট, সত্যেন্দর সিং ৭০ এবং এন রাম ৬৩ রান। এম হাই ৮৩ রানে ৪)

বোম্বাই ঃ ৪৫৭ রান (অশোক মানকড় ১৫২, সুধীর নায়েক ৭০, ইউ কে রাও ৬৩ এবং এ ভি দিভেচা ৫৬ রান। টি আর রঘুরমন ৫৪ রানে ৪ এবং সত্যেন্দর সিং ১২০ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ৭১ রান (১ উইকেটে। নায়েক ৪৫ নট আউট)

রোহিণ্টন বারিয়া ট্রফির ফাইনালে (আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা) বোম্বাই ৯ উইকেটে মাদ্রাজ দলকে পরাজিত করে। এই নিয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল ১৯ বার রোহিণ্টন বারিয়া ট্রফি জয়ী হ'ল।

খেলার চতুর্থ দিনে মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৪১১ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয় লাভের জন্যে বোম্বাই দলের আর মাত্র ৭৪ রানের প্রয়োজন হয়। বোম্বাই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১টা উইকেট খুইয়ে ৭৫ রান তুলে ৯ উইকেটে জয়ী হয়।

রোভার্স কাপ ফুটবল ঃ

১৯৬৩ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা মাঝপথে বন্ধ রাখা হয়েছিল। ফাইনাল খেলা হয়েছে ১৯৬৪ সালে। ফাইনালে অন্ধ্র পুলিস দল ১—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে। গত বছরের ফাইনাল খেলাটি ড্র যাওয়াতে অন্ধ্রপুলিস এবং ইষ্টবেঙ্গল দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।

আলোচ্য ১৯৬৩ সালের ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল দল দুর্ভাগ্যের দরুণ পরাজয় স্বীকার করেছে। প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হ'তে চার মিনিট বাকি, ইষ্টবেঙ্গল দলের গোল মুখে বল গেল। অন্ধ্র পুলিস দলের আক্রমণভাগের একজনের অফ সাইড হয়েছে এই ধারণায় ইষ্টবেঙ্গলদলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা রেফারীকে আবেদন জানিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এই সুযোগে অন্ধ্র পুলিশ দল গোল দেয়। এই গোলটি রেফারী বাতিল করেননি। এই গোলের আগে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলের একাধিক গোল করার সুযোগ নষ্ট হয়—বারে এবং গোল পোষ্টে বল লেগে ফিরে এসেছে এমন ঘটনা তিন চারটি ছিল। সুতরাং দুর্ভাগ্যের দরুণ ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে বললে বিজয়ী অন্ধ্র পুলিস দলের উপর কোন অবিচার করা হয় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অন্ধ্র পুলিস দল (পূর্ব্বনাম হায়দারাবাদ পুলিস) উপর্যুপরি ৫বার (১৯৫০-৫৪) রোভার্স কাপ জয় করে উপর্যুপরি সর্ব্বাধিকবার রোভার্স কাপ জয়ের রেকর্ড করেছে। এই নিয়ে অন্ধ্র পুলিস দল ৯বার কাপ পেল।

শকুন্তলা ঃ শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা।

শিল্পী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ লাহার 'শকুন্তলা' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ দেখে চমক লাগল। এর প্রথম মুদ্রণেই মহাকবি কালিদাসের অনন্য নাটকটির সরল-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দেখে মন খুসি হয়েছিল, দ্বিতীয় সংস্করণ একেবারে রাজমহিমায় দেখা দিয়েছে। কালিদাসের গল্পটি তো চমৎকার করে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পীর আঁকা অসংখ্য রঙিণ ছবি, কমলারঞ্জন ঠাকুরের বর্ণ-বিচিত্র প্রচ্ছদপট, পাতায় পাতায় স্কেচের অবারিত সমারোহ। অথচ এই চিত্রসজ্জা স্থূল রুচিহীন নয়—উপহার পাওয়ার এবং দেবার মতো অতি মনোরম একটি শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

তুলি আর কলম একসঙ্গে মিললে যে মণি-কাঞ্চন যোগ হয়, শ্রীযুক্ত লাহার 'শকুন্তলা'য় তায় আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল। গদ্যে পদ্যে তাঁর হাত সমান খোলে—পড়তে পড়তে তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। এ বইয়ের আরো বৈশিষ্ট্য এই যে বাড়ীর ছোটদের হাতে যেমন অসঙ্কোচে তুলে দেওয়া যায়, তেমনি বড়োরাও এ বই সমান আনন্দে পড়তে পারেন।

বইখানির সমাদর অবশ্যম্ভাবী। শোভনতার দিক থেকে দাম আশাতীত সুলভ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[প্রকাশক : আর্ট ইউনিয়ন। রঙিণ ছবিগুলি স্বয়ং লেখকের আঁকা, প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র শিল্পী কমলারঞ্জন ঠাকুর। দাম ছয় টাকা।]

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফুল-সজ্জা

শিল্পী : ভি, মেহে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ফাল্গুন—১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

কবির দৃষ্টিতে

কালীচরণ ঘোষ

সাকার ও নিরাকার ভগবান্ লইয়া মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিভেদের ইহা এক মূলীভূত কারণ। আবার একই ধর্ম্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভগবানের এই দুইরূপ লইয়া বিতণ্ডার অন্ত নাই। মূর্ত্তি-পূজা আছেই এবং একেবারে তাহা কোনওদিন তিরোহিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। নিরাকার দেবতার কল্পনা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু মূর্ত্তিতে অধ্যাত্ম-গুণ আরোপ করিয়া গ্রহণ করা এক শ্রেণীর জ্ঞানী বিচার-শীল লোকের পক্ষে দুরূহ। এ সকল কলহের উপরের বস্তু সাকার বা নিরাকার দেবতাকে আঁকড়াইয়া রাখিবার মত যে মন, তাহা হইল অচলা দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন বিশ্বাস। তাহারই সাহায্যে মানুষের মনের একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা, তীব্র অভাব দূর হইয়া থকে।

দুই পক্ষের যুক্তি আপাতদৃষ্টে বিপরীতমুখী। এক মত, নিরাকারবাদীদের উদ্দেশ্যে লিখিত, "মানিলাম, তাঁহারা মূর্ত্তিপূজা করেন না, কিন্তু তাঁহারা নিরাকারের উপাসনা করেন। একথা হইতেই পারে না। কারণ জ্যোতিবাচক ও গুণবাচক পদার্থের জ্ঞান সাকার।" (যতীন্দ্রমোহন সিংহ : সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব)।

উত্তরে বলা হয় "কোনও স্বভাবভক্ত যখন মূর্ত্তিপূজার

মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি আপন অসামান্য প্রতিভাবলে মূর্ত্তিকে অমূর্ত্ত করিয়া দেখিতে পারেন। তাঁহার প্রত্যক্ষবর্ত্তী কোনো সীমা তাঁহাকে অসীমের নিকট হইতে কাড়িয়া রাখিতে পারে না; তাঁহার চক্ষু যাহা দেখে তাঁহার মন বিদ্যুৎবেগে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, বাহিরের উপলক্ষ তাঁহার নিকট কেবল অভ্যাসক্রমে থাকে মাত্র। তাহাকে দূর করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না; বিশ্বসংসারই তাঁহার নিকট রূপক, প্রতিমার ত কোনো কথাই নাই—যে লোকের অক্ষরজ্ঞান আছে সে যেমন অক্ষরকে অক্ষররূপে দেখে না, সে যেমন কাগজের উপর 'গা' ও 'ছ' দেখে তখন ক্ষুদ্র গ'এ আকার ছ দেখে না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনশ্চক্ষে শাখাপল্লবিত বৃক্ষ দেখিতে পায়। তেমনি তিনি সম্মুখে স্থাপিত বস্তুকে দেখিয়াও দেখিতে পান না, মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তঃকরণে সেই অমূর্ত্ত আনন্দ উপলব্ধি করেন। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। (রবীন্দ্রনাথ—"সাকার ও নিরাকার"—রচনাবলী ১৩শ খণ্ড পৃঃ ৯৬৭)

বঙ্কিমচন্দ্র "হিন্দু কি জড়োপাসক" প্রবন্ধে এ তর্কের একটা মীমাংসা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কথায়, "যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়, কিন্তু অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলে, উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহাতে আর চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ।

"এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তির আধার সকল অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকল সেই দেবতার অঙ্গ বিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতন্যময় পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জানি, অগ্নিকে যদি সেই চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বুঝিব। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না তাঁহার কাছে অগ্নি জড়পদার্থ।

* * * *

"হিন্দুরা জড়োপাসক নহে। * * * আজকাল যাহাকে জড়পদার্থ বলা হয়—যেমন অগ্নি, বায়ু, নদ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি, ইহারা হিন্দুদের কাছে চৈতন্যময় চেতনাযুক্ত পদার্থ।"

এইরূপ বাদানুবাদ সাহিত্যের ভার বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু সাকার বা নিরাকার কোনোটাই নয় অথচ ইহার দুইটি কবিরা একই সঙ্গে দেখিয়াছেন। স্বামীজীর একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখা যাইতে পারে। যখন তিনি বলিলেন 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার'। তবে কেন অন্ধকারে হাতড়াইয়া পথ আবিষ্কারের নিদারুণ প্রচেষ্টা। তর্ক আর মাথা ফাটাফাটি করার প্রয়োজন কোথায়? চক্ষুর ঝাপসা আবরণ দূর হইলে সাকার বা নিরাকার রূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। মন তাহা গ্রহণ করিবার মত প্রস্তুত হইলে সকল বিতর্কের অবসান সম্ভব।

এ সম্বন্ধে বাঙ্গলার কবিদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা চারিদিকে ভগবানের অস্তিত্ব দেখিতেছেন, কোথায় কিভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যুক্তিতর্কের অবকাশ নাই।

তাহার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে একজন অক্লান্তকর্ম্মী, দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনার সময় যাঁহার ছিল না, তাঁহার একটা মতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

একদিন সম্রাট নেপোলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাদরী ধর্ম্মযাজক নয়, তাঁহার এক সেনাপতি (Bernhard) যে তিনি ভগবান্ বিশ্বাস করেন কি না। তাহা যদি হয়, ভগবান্ বস্তু কি? তাঁহার স্বরূপ জানার উপায় আছে কি না? তিনি কি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন?

প্রতিটি মুহূর্ত্ত যাহার রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা চিন্তা করিতে হইতেছে, শত্রুর আক্রমণ রোধ করিবার জন্য সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য সমরক্ষেত্রের কথা চিন্তা করিতে হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন-মরণ যাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে, তাঁহার উত্তর তদুপযোগী সহজ এবং ত্বরিত।

নেপোলিয়ান বলিলেন, তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও চলিত। তাঁহার কথায় বলিতে গেলে দাঁড়ায়—আমি নিজেই কি জানি আমি কি বিশ্বাস করি? মানুষের প্রতিভা কি কেহ চক্ষে দেখিয়াছে—কর্ম্ম ক্ষেত্রে তাহার প্রকাশ হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। ভগবান্

সেইরূপ, আছেন চক্ষে দেখা যায় বা যায় না, তাহার আলোচনা অবান্তর।

"What is God. Do I know what I believe? Very well, I will tell you. Answer me: How do you know that a man has genius? Is it anything that you have seen? Is it visible—genius? what then can you believe of it? We see the effect, from the effect we pass to the cause. we find it, we affirm it, we believe it. Is it not so? Thus upon the field of battle, when the action commences though we do not understand the plan of attack, we admire the promptitude the efficiency of the manoeuvers, and exclaim, 'a man of genius!' where in the heat of the battle victory wavers, why do you first turn your eyes towards me? yes, your lips call me. From all parts we hear but one cry, 'The Emperor, Where is he? his orders?' what means that cry? It is the cry of instinct, of general faith in me, in my genius.

Very well. I have also an instinct, a knowledge. a faith, a cry, which involuntarily escapes me. I reflect. I regard nature with her phenomena. and I exclaim god? I admire the cry. there is a god.

এই কথাই কবিরা বলিয়াছেন, "চোখ থাকে ত, ত্থাখ না চেয়ে।" সকল কবি একই ভাব প্রকাশ করিলেন। ভাবের সমতা এবং প্রকাশমাধুর্য্য লক্ষ্য করিলে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তাহারই কয়েকটি উদ্ধৃত করিলে বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল মন্দিরে প্রতিমা পূজার কথা ভাবিয়া বড়ই সংশয়াকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন—

"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে,
এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা।
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো।
মন্দির যার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী তারা রবি,
সাগর নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জ ভবন, বসন্ত পবন,
তরু, লতা, ফল, ফুল মধুরিমা।

*   *   *

যে দিকে তাকাই এ নিখিল ভূমি
শতরূপে মা গো বিরাজিছ তুমি,
বসন্তে কি শীতে, দিবসে নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।'

অতুলপ্রসাদ বুঝিতেছেন যে তিনি নানারূপে নিজেকে ধরা দিয়াছেন। তবুও প্রশ্ন আছে—

কে তুমি হে সুন্দর?

সে সুন্দরের রূপের প্রকাশ:

কভু নবীন ভানু ভালে, কভু ভূষিত নীরদ মালে
কভু বিহগ কুজিত কুহক কণ্ঠে গাহিছ অতি সুন্দর।
কভু নির্ম্মল নীল প্রাতে,
কনক কিরীট মাথে,
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর।
কভু পুষ্পিত নব কুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে
কভু পীত জ্যোৎস্না বসন শ্যাম,
মূরতি অতি সুন্দর।"

রজনীকান্ত প্রকৃতির অলঙ্কারের মধ্যে বিভিন্ন রূপগুণের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন:—

পূর্ণ জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি
বিহঙ্গম গায় তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল।
উদ্বেলিত সিন্ধু তরঙ্গ উত্তাল,
প্রকাশে তোমার মূরতি করাল।
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল
শিশির কহিছে তুমি নিরমল।

পুষ্প কহে তুমি চির শোভাময়,
মেঘবারি কহে মঙ্গল আলয়,
গগন কহিছে অনন্ত অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল।
নদী কহে তুমি তৃষ্ণা নিবারণ,
বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন।
নিশীথিনী কহে শান্তিনিকেতন,
প্রভাত কহিছে সুন্দর উজ্জ্বল ॥"

কবির উপলব্ধি হইয়াছে—

"আছ, অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে,
আছ, বিটপী লতায় জলদের গায়,
শশী তারকায় তপনে ॥

অজ্ঞাত কবি দেখিয়াছেন—

"কুসুম বিতরে তব মধুরিমা,
সমীরণ কহে তোমার সুষমা,
নদ নদী গিরি বন উপবন
মহিমা তোমার প্রচারে গো—"

অন্য এক কবি নানা ভাবে তাঁহার আত্মপ্রকাশ দেখিতেছেন, কিন্তু মনের দ্বন্দ্ব কাটে নাই; সন্দেহে মন আকুল হইতেছে—

"কোথায় লুকায়ে একাকী বসিয়ে
করিতেছ নাথ লীলা অভিনয় ?

কিন্তু তিনি এ বিশ্বাস রাখেন—"তুমিই ত
ফুটাইছ রবি শশী নীলাকাশে
অযুত অগণ্য তারা তার পাশে,
বন উপবন কুসুম বিকাশে,
হাসে মাতৃকোলে মানব তনয়।"

প্রকৃতি, নেপোলিয়নের 'গড্' নিজ মহত্ত্ব প্রকাশে ব্যক্ত। যাহা বিরাট, তাহা আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সে সকলের প্রকাশের পরিচয় দিতেছেন:

"তাঁহার আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব শরণ
তাঁর জগত মন্দিরে।

অনাদিকাল, অনন্ত গগন
সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি—
কতই বরণ, কতই গন্ধ,
কত গীত, কত ছন্দরে ॥
বিহগ গীত গগন ছায়,
জলদ গায় জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়,
গাহে গিরিকন্দরে ॥"

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন প্রতিটি জাগতিক বস্তুর সাহায্যে। তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন ঘটিয়াছে। যেখানে যে রূপটি দিলে বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি চক্ষের সমক্ষে ভাসমান হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়া কবি আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন। বলিতেছেন ধরিত্রীকে

"বিবিধ বরণে বিভূষিত করে,
তার উপরে তোমার নামটি লিখেছ।"

কোথায় কোনরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার পরিচয়ে পাই—

"পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা
রেখা নয় সে তোমার দয়াল নামটি লেখা।
'সুন্দর নামটি তোমার বিহঙ্গ অঙ্গে আঁকা
'প্রেমানন্দ' নাম নয়নে লিখেছ।
চন্দ্রাতপ তুল্য গগনমণ্ডল
দীপালোকে যেন করে ঝলমল
তার মাঝে ইন্দুক্ষরে সুধাসিন্ধু
'সুধাসিন্ধু' নাম 'তায় অঙ্কিত করেছ।
জলেতে লিখেছ 'জগত জীবন'
পবন হিল্লোলে হয় দরশন
জলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
'জ্যোতির্ম্ময়' নামে জগৎ দেখাতেছ।
ভূস্তরে প্রস্তরে তাবত চরাচরে,
'সর্ব্বব্যাপী" নাম লিখেছ সাক্ষরে—"

কবিরা ভগবানের কোনও বাঁধাধরা রূপের জন্য কাঁদিয়া আকুল হন নাই। এই জগৎ প্রপঞ্চে বিবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দ, পরম পরিতৃপ্তি, চরম সূক্ষ্ম অনুভূতি লাভ করিয়াছেন।

অতি সরলভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

"বিরাজিত তিনি আকাশে ভুবনে
　　বিশাল বিশাল নীল পারাবারে।
তেজস্বী যাঁর তেজে প্রভাকর
যাঁহার সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক সুন্দর,
মধুরতা যাঁর রয়েছে বিস্তার
　অযুত অযুত তারকার হারে।
যাঁর অপারতা অনন্ত গগনে,
গাম্ভীর্য্য যাঁর জলদ জীবনে,
করুণা যাহার নিত্য অনিবার
　　নিরখি নিরখি অখিল সংসারে।
কোমল কুসুমে যাঁর কোমলতা,
নির্ম্মল নীহারে যাঁর নির্ম্মলতা,
পবিত্র নির্ঝরে যাঁর প্রেম করে,
　　মহিমা যাঁহার জীমূত প্রচারে।"

কবি যোগেন্দ্রনাথ সেন, ভাবগম্ভীর ভাষায় জানাইতেছেন—

"সুমহান বিশ্বচন্দ্রে উঠিছে ঝঙ্কার যাঁর
যাঁর প্রেমে মাতোয়ারা চন্দ্রসূর্য্য পারাবার।
যাঁর শ্রীচরণ স্পর্শে শুষ্ক হৃদে ফুল ফুটে,
মরুভূমে নদী ধায় পাষাণেও উৎস ছুটে।
কবিতা প্রসূনে যাঁর বিমণ্ডিত নীলাম্বর,
ভাবের তরঙ্গে যাঁর তরঙ্গিত চরাচর,
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ যাঁহারে গায়,
হৃদয়ের যন্ত্র বাজে প্রেম মন্দাকিনী ধায়।
বিরাট অসীম যিনি, বিশ্বরূপ ব্যোমকেশ,
আদি নাই অন্ত নাই, যাঁহার নাহিক শেষ;
সময় পয়োধি পারে যাঁর সিংহাসন রাজে,
যথায় মঙ্গল করে প্রকৃতির বীণা বাজে।
মধ্যাহ্ন প্রদোষ উষা গাইছে আরতি যাঁর

*　　　চ　　　*

বাসুদেবকে সহচর করিয়া বেচারা অর্জ্জুন—হে কৃষ্ণ, যাদব, সখা সম্বোধনে বেশ আনন্দে দিন যাপন করিতে ছিলেন। তাহার পর যখন তাঁর প্রকৃতরূপ দর্শন করিলেন, তখন বিহ্বল হইয়া ফুকারিয়া উঠিলেন, "অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে"—অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া মনে খুব আনন্দ হইতেছে বটে, কিন্তু ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইতেছে। এ রূপ তুমি সম্বরণ কর।"

এই রূপের বিবরণে আছে, তোমার আদি অন্ত মধ্য কিছুই ত পাওয়া যায় না (শশী সূর্য্য নেত্রং), স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, এই উভয়ের অন্তর, অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, এবং সমুদয় দিক একমাত্র তোমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে (দ্যাবা-পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি, ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ)। এখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সে সবই ত প্রকৃতির রূপ। তারই মধ্যে সুন্দরকে নয়নগোচর করিবার জন্য প্রাণের কতই না ব্যাকুলতা! তাহাতেই অনাবিল অবসাদহীন অক্ষয় আনন্দ লাভ হইতে পারে। সাধারণ বুদ্ধিতে যাহাকে 'অসুন্দর' ভীষণ নির্ম্মম বলা হয়, তাহার মধ্যেও সৌন্দর্য্য আছে, কোনও মহদুদ্দেশ্য তাহাদের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। তাহা অবিমিশ্র অকল্যাণ নয়, সীমাবদ্ধ বুদ্ধির নিকট এইরূপ প্রতিভাত হয় মাত্র।

এই আনন্দ আকারে নিরাকারে সকলের মধ্যে পাওয়া যায়। আকার নিরাকার ব্যাপ্ত করিয়া "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" বসিয়া আছেন। যে যাহার সাধন মত, বিশ্বাস মত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। আর প্রকৃতি ত সাক্ষাৎ সাকার ও নিরাকার, তাহার মধ্যে মনোনিবেশ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলে সচ্চিদানন্দ রূপ একাধারেই নয়নগোচর হইয়া থাকে।
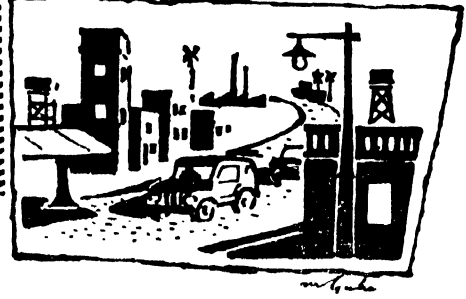
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

…রাত হয়ে আসে।…আঁধারে জলে ওঠে দু একটা তারার আলো। বনের বাইরের ডাঙ্গায় শিয়ালগুলো ডাকছে, ক্ষুধা আর লালসা ভরা সেই চীৎকার।

…হঠাৎ কার জুতার শব্দ শুনে ফিরে চাইল।

…একি আলোও জ্বালোনি যে বৌ।

—চমকে ওঠে কদম। শন শন হাওয়া বইছে গাছ গাছালির মাথায়। শিয়ালের ডাকও থেমে গেছে আতঙ্কে। অন্য বড় কোন জানোয়ার বন থেকে বের হয়েছে। নিস্ফল আক্রোশে সে বসে বসে ল্যাজ ঝাপ-টাচ্ছে, গায়ের বিশ্রী বোটকা গন্ধে শিয়ালগুলো পালিয়েছে।

…এগিয়ে আসছে পানুদাস।

—ভুবন অনেক করে বলল। তা কেমন আছো।

কদম স্থির কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়—আসুন।

ঘরের ভিতরেই পানুদাস আবছা অন্ধকারে বসল। কি কাযে বের হয়ে যায় কদম। গলাতুলে বলে—কাছে এসে বসো, একটু গল্পগাছা করা যাক।

আর আলো নাই বা জ্বাললে—বেশ তো মুখ, আঁধারি রাত—

মহাজন প্রাণবল্লভ দাসও ধান পিতলের হিসাব ভুলে কাব্যিক হতে চায়। কি এক ব্যাকুল কামনার আগুনে জ্বলছে তার সারা দেহ মন। কদমকে দেখেছে—আবছা অন্ধকারে দেখেছে রূপবতী অফুরানযৌবনা কোন মোহময়ী নারীকে।

…পানু দাসের সারা দেহে কেমন অসহ্য তীব্র একটা জ্বালা। ওদিক থেকে কোন সাড়া নেই।

অপেক্ষা করছে পানুদাস—ওৎ পেতে আছে বুভুক্ষু কোন জানোয়ার অন্ধকার বনের আড়ালে।

ওদিক থেকে কোন সাড়া নেই।

…রাত কত জানে না।

নিশুতি গাঁ—কোনদিকে যাবে জানে না কদম। পালাচ্ছে।

বাঁশবনের মাথায় জ্বলছে জোনাকীর আলো—কাঁপছে সে পাতা কাঁপার মতই।

হঠাৎ কাকে দেখে যেন ধরা পড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

—তুমি!

…অশোক ফিরছিল কোঅপারেটিভ অপিস থেকে বাড়ীর দিকে, হঠাৎ নির্জন পথের ধারে ওকে দেখে একটু অবাক হয়। চমকে ওঠে কদমবৌ—ছোটবাবু!

—এতরাত্রে?

কদম যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে, আর সহ্য করতে পারছে না সে এই নিদারুণ দুঃখ আর অপমান। অশোক ওকে চুপকরে থাকতে দেখে একটু বিস্মিত হয়।

—কি হয়েছে কদম ?

কি করে জানাবে কদম এতবড় অপমানের কথাটা, কিইবা করতে পারবে ও। বিরাট একটা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওর শক্তি কতটুকু! সহজ কণ্ঠে বলে—এমনি বাড়ীতে এসেছিলাম, বাসায় ফিরছি।

—এই পথে ? প্রশ্নকরে অশোক।

কেমন যেন ধরা পড়েগেছে কদম। মূহূর্তমধ্যে রহস্যময়ী নারী সহজভাবেই বলে ওঠে—ভাবলাম এসেছি যখন গাঁয়ে একবার তোমার সঙ্গে দেখাই করে যাই।

আমার সঙ্গে কেন ?

…অশোকের দিকে চেয়ে থাকে কদম।

নির্জন মিশমিশে কালো অন্ধকার। বাঁশবনে হুহু বাতাসের লুটোপুটি। কেমন আজ নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্যই মেতে উঠেছে সর্বনাশা নারী।

হাসছে! হাসি আসে। জীবনকে ব্যঙ্গ করার তীব্র মধুর হাসি।—জানিনা। কোনদিনই তোমাকে বোঝাতে পারিনি। সময় ও পেলামনা। সময়ও যে আমার নাই ছোটবাবু।

কদম দাঁড়ালনা। এতক্ষণ যে কান্নাটাকে চেপে রাখবার চেষ্টা করেছিল—দুর্বার বেগে সেই চাপাকান্নাই যেন ফেটে পড়বে এই বার। ভয়ে সরে গেল কদম। পালিয়ে গেল।

…আলেয়ার আলোর কোন স্নিগ্ধতা নেই, তাকে ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ করা যায় না। ও আশা তাই কোনদিন করতে সাহস করেনি কদম।

…তাই দেখাদিয়েই প্রকাশ করবার আগেই সরে গেছে বার বার। আজ ও তাই গেল।

—কদম!

অশোক ডাকছে ওকে। দূর থেকে কদম দাঁড়াল না। আঁধারেই মিলিয়ে গেল!

কিন্তু যাবে কোথায়! রুদ্ধশ্বাসে এসে দাঁড়াল কাজলা দিঘীর উচু পাড়ের উপর,যেখানে এসে পথটা শেষ হয়েছে। তারপরই ওই দিঘীর অতলকালো জল—ছায়া নামা জল। কালো জলে হাজারো তারার চিকমিকি!…

—কেমন শুদ্ধ কোন শান্তির দিকে এগিয়ে চলেছে কদমবৌ। অন্ধকারে একটা শব্দ ওঠে জলের বুকে। তলিয়ে যাচ্ছে—হিম হয়ে আসে।

কদমের সব জ্বালা একটা কালো যবনিকা, অতল কালো আঁধার দুচোখ ভরিয়ে দেয়। হারিয়ে যাচ্ছে সে!

হারিয়ে গেল দিঘীর অতলে।

পালাল—এই দুঃখ, কামনার আগুন জ্বালা জীবন থেকে সরে যাচ্ছে অনেক দূরে—কোন নাল স্বপ্নের দেশে।

সকালের আলো ফুটে উঠেছে। ভুবন তখনও অসাড়ে পড়ে আছে। পানুদাস ক্ষুব্ধ ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। ভুবনও এসে গর্জায়—আসুক সে মাগী, সতী! কেটে ফেলাব ছাপ।

…তখনও নেশার ঘোরে পড়ে আছে—স্বপ্ন দেখছে কদমকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছে সে। বেদম প্রহারে জর্জরিত করে তুলেছে। সকালের রোদ এসে পড়েছে।

হঠাৎ কাদের ডাকাডাকিতে নেশার জড়তা ভেঙ্গে গেল। এমোকালী—ষষ্ঠীচরণ ডাকছে।

—একবার এসো গাঁয়ে!

—কেনে ?

—দরকার আছে। বিশেষ দরকার—এখুনিই।

গর্জে ওঠে ভুবন—বৌটা পালিয়েছে উথানেই বোধ হয়। অ্যাঁ—চল মাগীর চুলের মুঠি ধরে তুলে আনবো। সতী! গাঁ-ময় পিরীতের নাগর ছড়ানো তার—ঘরবসত করবে ক্যানে ?

টলতে টলতে আসছে ভুবন। চোখ দুটো তখনও লাল করমচার মত।

কাজলা দিঘীর কাঁকুরে পাড়ে রীতিমত ভিড় জমে গেছে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেই জুটেছে। মিষ্টি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দুচোখে জল।

… কদম ডুবে মরেছে। হয়তো নিষ্কৃতি পেয়েছে কুকুর শিয়ালের টানা ছেঁড়া থেকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশোক।

গত রাত্রের সেই কথাটা মনে পড়ে। কি যেন বলতে চেয়েছিল কদম—কিন্তু পারেনি। একটা পুঞ্জীভূত অভিযোগ জমা হয়েছিল—কিন্তু কেন ? কার বিরুদ্ধে—কি সেই নালিশ—কেউ জানল না।

...অতুলকামার ছানিপড়া চোখ মুচছে আর স্তব্ধ মৈনাকের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ভুবনকে আসতে দেখে জ্যামুক্ত ধনুকের মত লাফ দিয়ে উঠে ওর গালেই সজোরে বসিয়ে দেয় একটা চড়। গর্জন করছে বুড়ো।

—তুই! তুই-ই মেরে ফেললি আমার ঘরের লক্ষ্মীকে। তোর লোভ আর পাপই হল কাল। সেই পাপেই সব হারালাম আমি! ছেলে!...শত্তুর! কাল-শত্তুর।

ওকে সরিয়ে নিল অশোক। বৃদ্ধ তখনও ফুসছে অসহায় রাগে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভুবন।

দুচোখে তার বিস্মিত চাহনি, দেখছে কদমকে।

সুন্দর সুঠাম দেহটা ফুলে উঠেছে—তবু দুচোখের দৃষ্টি তার তখনও তেমনি। সেই নীরব ঘৃণা আর অভিশাপ ফুটে উঠেছে।

...ধিক্কার দিয়ে গেল এই জীবনকে—কুৎসিত ওই মানুষগুলোকে।

পানুদাসও এসেছিল।

ওই মৃতের তীব্র চাহনির দিকে চেয়ে—সরে গেল সে। ভয় পেয়েছে পানুদাস!

একজন শুধু আর্তনাদ করছে—ওই নারাণঠাকুর।

আধপাগল অসহায় ভাষাহীন লোকটা চীৎকার করছে—অব্যক্ত ভাষায়। তারও সব গেছে ওই কারখানার আগুনে।

ঘর গেছে—গেছে জীবনের সব আশা ভরসা। সনাতনও তাকে ফেলে গেছে। অমানুষ করে দিয়েছে তার সব আত্মীয় পরিজনকে।

আর কদম! সে শুধু দিয়ে গেল এ দিনের উপর তীব্র অভিশাপ—আর নীরব ধিক্কার।

...সরে এল মিষ্টি লোহার। ওর মৃত্যুর কারণটা সে একমাত্র কিছুটা জানে। ...তাই নিজেও শিউরে উঠেছে অজানা আতঙ্কে আর ভয়ে।

কদমের মৃত্যু তাই স্তব্ধ এই পল্লীর বুকে নীরব তীব্র একটা আলোড়ন এনেছে।

...কাঁদছে অতুলকামার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক। নিষ্ফল রাগে ফুলছে এমোকালী।

...ভুবন ফিরে চলেছে গ্রামের বাইরে কারখানার দিকে। সারামন বিষিয়ে উঠেছে। একটু তীব্র উষ্ণ পানীয় চাই—কেমন সব চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে আসে। কি যেন হারিয়ে গেল তার—হ্যাঁ কিছু একটা হারিয়ে গেল এতদিন যা তার ছিল খুব নিকট হয়ে।

সকালের গেরুয়া রোদ গাঢ়তর হয়ে উঠছে।

রোদের তাপ বাড়ছে—ধূ ধূ জালাপোড়া রোদ উঠবে রুক্ষ কাঁকুরে ডাঙ্গার বুক ফুঁড়ে, কেমন এমনি একটা জ্বালার সংক্রমন ভুবনের অসাড় মনে। পাখীর ডাকও কানে আসেনা।

পিছনের ওরা চেয়ে রয়েছে তার দিকে—বিচিত্র প্রশ্নভরা চাহনিতে।

অবনীবাবুর কণ্ঠস্বর কানে আসে।

—ব্লাডি ফুল।

...লাল চোখ দুটো মেলে ওর দিকে একবার চাইবার চেষ্টা করে মাত্র ভুবন। আবার চলতে থাকে।

কেমন যেন অমানুষের মত চলছে—পা দুটোর উপরও নিজের বশ নেই। তবু চলছে—চলছে ভুবন।

একদিকে মৃত্যু আর হতাশার অন্তহীন অন্ধকার, তবু এদের চলাও থামেনি। নোতুন উদ্যমে—নোতুন উৎসাহে এরা লেগেছে।

এমোকালীর মনে কদমবৌ এর মৃত্যুটা কঠিন আঘাত হেনেছে—স্তব্ধ হয়ে গেছে অশোকও। অতুল কামার অসহায় দর্শকের মত দেখেছে আর কেঁদেছে নিস্ফল অভিযোগে।

অশোক এই আঘাতটাকে—অপমানকে সহজ ভাবেই নেবার চেষ্টা করেছে।

এমনি অপমৃত্যু—জীবনের এমনি অপচয় সে ইতিপূর্বেও দেখেছে। প্রীতিও আজ তার কাছে মৃত—মৃত অতীত; কারিগর লোকটাকে দেখেছিল—সেও বদলে গেছে। এই পরিবেশ থেকে কলের মানুষ কলের জগতেই ফিরে গেছে।

হারিয়ে গেছে সনাতন—গঙ্গামণি নারাণ ঠাকুরের জগৎ থেকে, তারকরত্ন অতীতের একটি প্রবল প্রতাপান্বিত জীবনধারা—তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। জীবন মণিমালাও সরে গেছে নোতুন ভাবে বাঁচবার আশায়। ভুবন মেনে নিয়েছে এই জীবনকে—কদম বৌ পারেনি সহ্য করতে এর তীব্র নীলাভ গরল জ্বালা।

কেবল সংঘাত আর পরাজয়ে ভরা এই জীবন।

তবু বাঁচতে হবে—বাঁচবার পথ খুঁজতে হবে, এই জীবনকেই সহনীয় করে তুলে।

…ওদের পরাজয়ের আঘাত তাই অশোকের মনে আনে উৎসাহ—এমোকালীও তারই উত্তাপে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

—বুকটা জলে ওঠে ছোটবাবু। বৌদি মরে গেল—কি অপমান আর জালায়।

অশোক জবাব দেয়—ওতে জলুনি থামবেনা কালী, আগামী দিনের গ্রামে তার মানুষকে অন্যসুন্দর ভাবে বাঁচবার পথ যদি দেখতে পারো—এই জ্বালা থেকে অনেকে নিষ্কৃতি পাবে।

—কিন্তু এই সহ্য করে কায করতে হবে?

বলে অশোক—হবে। নিজে জলে ছাই হ'য়ে ধূপ গন্ধ বিলোয়। গন্ধ দিয়ে ফুলও ফুরোয়। তুমি আমিও ফুরিয়ে যাবো ওই জালা নিয়েই। জালা আছে বলেই তো কায করি—ঝর্ণার নুড়ি পাথর আছে বলেই তো স্রোত।

অতুল চুপকরে বসেছিল, বলে ওঠে—ঠিক বলেছ ছোটবাবু।

বৃষ্টির পর মাটির বতর এসেছে। আকাশ বাতাসে কাল বৈশাখীর বিগত চিহ্ন, মাঠময় ছড়িয়ে আছে সার গোবর।…ভিজে রসবতী মৃত্তিকা। দুএকজন মাত্র মজুর নেমেছে মাঠে। বাকী অনেকের হালগরুও নেই।

ফণীবাবু অবনীরায় মাঠের আলে দাঁড়িয়ে কি দেখছে। —ধরণী বলে ছানু যে বল্লে—ঝিলিবাদ থেকে সাঁওতাল আনবেক।

অবনী গজগজ করে—বতর চলে যাচ্ছে, তারা আসবে কবে? ব্লাডি ফুলস্।

ধরণী থামিয়ে দেয়—থামো অবনী, ইংরিজি ছেড়োনা। কি হবে তাই ভাবো।

হঠাৎ কিসের শব্দে ওরা পিছন ফিরে চাইল। কালো বাদামী রং এর একটা বিকট যন্ত্র মাঠের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কয়েকজন লোকও দেখাযাচ্ছে আশে পাশে।

চমকে ওঠে অবনী—ট্রাক্টর!

দামোদরের ব্যারেজ হবার সময় ওরা দেখেছে যন্ত্রগুলো—কি তার ক্ষমতা তাও দেখেছে, কিন্তু তাদের গ্রামের মাঠে ওই সব দেখবে কল্পনাও করেনি। ধরণী আর্তনাদ করে।

—তবে কি জমি-জারাত আবার ক্যানেলে যাবে ফণী?

এগিয়ে যায় তারা।

ঠিক নিজেদের চোখকেও তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

…এমোকালীই হবে! হ্যাঁ কালীচরণই মাথায় একটা ন্যাকড়ার টুপি লাগিয়ে ট্রাকটার চালাচ্ছে—ধারালো ফলার ধারে উঠে আসছে চাপ চাপ নরম ভুসভুসে মাটি।

বাতাসে তারই মিষ্টি সোঁদা গন্ধ।

নিঃশ্বাস নিতে বুক ভরে আসে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অনেকখানি জমি চাষ দেওয়া, মই ঘোরান হয়ে গেছে।

বীজ ছড়াচ্ছে ওরা সরস ভুরো মাটিতে।

…পা দেবে যাচ্ছে।

—অঁ অঁ! চীৎকার করছে নারাণ ঠাকুর।

দুহাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছে চন্দনের মত মিহি মাটি, ছিটুচ্ছে সামনের দিকে—আর চীৎকার করছে খুশিতে পাগলের মত।

…সব হারাবার দুঃখ সে ভুলেছে।

মাটির ভুলে যাওয়া সেই মিষ্টি সৌরভ—যৌবন স্বপ্নকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

…যৌথ চাষের প্রথম পর্য্যায় সুরু হয়েছে।

আলের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে অশোক।

ওপাশ দিয়ে ফণী অবনী ধরণীর দল নীচু পগার দিয়ে নেমে গেল। দূর পথের দিকে চেয়ে থাকে।

—ছানু সকালের বাসেই ফিরবে লোকজন নিয়ে?

চিন্তিত মনে জবাব দেয় ধরণী—তাইতো বলেছিল।

ফণী সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতেই বলে—বতর দু তিনদিন থাকবে দাদা, আর মাঝিরা ও পাকা চাষী একবার মাঠে নামলে হয় দেখবা হালের বজার।

অবনী পুরোনো ইংরেজীর বুলি ঝাড়ে।

—ফারো ফলোড ফ্রি। বুঝলী। ছানু—লেট আস সি ছানু।

এরা ঘাবড়ে গেছে ওদের তোড় জোড় দেখে।

ফণী বলে—শেষকালে ধামাও যাবে,রাজ্যিও হারাবে নাকি মামা।

ধরণী চিন্তায় পড়েছে—জানি না বাবা। তবে ওদের ওই প্যাচে পা দোবনা।

অবনীও সায় দেয়—অল্ রাইট্। দেখনা মারামারি লাঠালাঠি বাধলো বলে ওদের মধ্যে।

···রোদের তাত বাড়ছে। ধূ ধূ রোদ। গরু বাছুরও টিকতে পারবে না। কিন্তু ওদের ট্রাক্টর ঠিক চলছে।

···খালে-খন্দে জমা জল পাম্প দিয়ে তুলে শুকনো মাটিকে সরস করে বতর আনছে—আবার চাষ দিয়ে চলেছে।

নীচেকার কুমারী মৃত্তিকা বহু যুগ পর দেখছে আলো হাওয়ার মুখ মুক্তির আনন্দে তারা নীরব খুসির সুবাসে ভরে তুলেছে আকাশ।

···মিষ্টি চমকে উঠেছে। শিউরে উঠেছে কদমের এই নিষ্ঠুর মৃত্যুতে। আজ মনে হয় সে একা—জীবনের কোন আশা আলো নেই। কোন পথ নেই।

হঠাৎ তাই আজ নোতুন করে চেনে জীবনকে। চলার পথে থমকে দাঁড়িয়ে চারি দিকে চাইছে—নোতুন করে আবিষ্কার করে পথের ধারেই কি এক অবলম্বন তার জন্য রয়ে গেছে।

·· যৌবনের উন্মাদনা দিয়ে দেখা এ পৃথিবী নয়, ভাল লাগা—আর ভালবাসার মাঝে ফিরে ফিরে নিজেকে আবিষ্কার করার আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে।

কি তিথি জানেনা, চাঁদ উঠেছে বেণু বনসীমায়, কুচলে গাছের সবুজে লাল টুকটুকে ফলগুলোয় ছেয়ে গেছে ওর বুক।

পাখী ডাকা রাত্রি।

মহুয়া সৌরভ মাখা বাতাস।

—মিতে, বড় ডর লাগে মিতে।

অবিনাশও ওর দিকে চেয়ে থাকে। ফিসফিসানি বাতাসে কিসের কান্নার শব্দ। কদমের অতৃপ্ত আত্মা যেন কাঁদে চিরন্তন নারীর মাঝে।

—একা বোঝা বওয়ার বড় জ্বালা মিতে। আজ রূপ নাই, গুণ নাই, বাতিল পুঁজির মেয়ে মানুষ তাকে কিসের আশায় ভালবাসবে বলো ?

ওকে আজ কাছে টেনে নেয় অবিনাশ।

···বহু দিন পর শূন্যমন পূর্ণ হয়ে ওঠে—মিষ্টির। তবু হু হু করে মন।

—ভয় কিসের মিতেন!

বলে ওঠে মিষ্টি—সহরের ভয়—দুগ্‌গোপুরের ডর। ওই আমাদের সব খাবে, ঘর—সুখ—শান্তি—সব। তোমাকে ও কুনদিন টেনে লেবে, একজনের মত তুমিও সেদিন সব ফেলে পালাবে ওরই নেশার টানে।

হাসে অবিনাশ সেদিন মরেই যাবো মিষ্টি।

—কেনে ?

বলে চলেছে অবিনাশ—ধড়ে বেঁচে থাকবো, মনটা মরে যাবে। আমার বাঁশীতে সুর জাগে এই মাটির সুর—এই মাটিতে কালবৈশাখী নামে—ঝড় ওঠে, তারই সুর বাজে আমার বাঁশীতে মেঘরাগে, রাগের তারায় তারায় নিঝ্‌ঝুম বনে কান্না জাগে, কত জনের কত মনের কান্না—ললিত রাগে তাই বেজে ওঠে; ফুলফোটা বনে ভ্রমরের গুনগুনানি নানা রংএর রংবাহার সানাইএ বসন্তের সুরে আমেজ আনে। গোঁসাই প্রভুর নাম শুনেছিস্ মিতেন—জ্ঞান গোঁসাই বিষ্ণুপুরের!

মিষ্টি ভক্তিভরে মাথা নোয়ায়—অয় বাপ, শুনবো নি ?

—তিনি বলতেন—শালগাছ দেখেছিস অবা—বনের ভিতর থেকে মাটিতে শিকড় গেড়ে মাথাতুলে আকাশে বনের সীমানা ছাড়িয়ে; তেমনি সহরে যাবি মাথা তুলতে - জয় করতে, মুল শেকড় থাকবে তোর মাটিতে পে তা—সেই ত যোগাবে তোকে বেঁচে থাকবার রস—সব সবুজ।

আমি দেখেছি মিতেন—এই আমার ঘর, সহরের ভাড়াটে আমি, দুদিনের যাত্রী।

চুপ করে থাকে মিষ্টি! ওর চোখের কোলে কি এক মধুর স্বপ্নের আবেশ। ক্লান্ত পথহারা দুজনে আজ যেন একটী মনের গহনে নিজেদের একাত্ম করে তোলে। বলে ওঠে মিষ্টি।

—ভেবেছিলাম ঠকে গেছি।

—কিন্তু!

—দেখলাম বাঁচবার জন্য ভালবাসার দরকার মিতে, ঠকে ঠকেও মানুষ ভালবাসে। বেঁচে আছি ভালবাসাটা তারই সাবুদ।

হাসে অবিনাশ—আবার ঠকবে তুমি!

—নিজেকে আজ ওর আমন্ত্রণে সঁপে দেয় মিষ্টি। ফুরিয়ে ফুরিয়ে দিয়েও নিজেকে যেন ফিরে পেতে চায়, বাঁচতে চায়; অফুরাণ প্রাণমন তাই ভরে ওঠে প্রীতির প্রসাদে। হাসছে মিষ্টি—ঠকেও জিতবো মিতে।

কদমের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি, অনেককে কাযের মাঝে এগিয়ে দিয়েছে। মিষ্টির মনে নিবিড় হতাশার মাঝে বাঁচবার আগ্রহ এনেছে।

জীবন সেদিন বাড়ী গিয়ে অবাক হয়ে যায়। সদর রাস্তা থেকে গ্রাম অবধি কাকুঁরে ডাঙ্গার অস্তিত্ব আর নেই। তারকবাবু জমিদারী যাবার আগে পাঁচ টাকা নামমাত্র সেলামীতে যে ডাঙ্গা বন্দোবস্ত করেছিল একে তাকে—সেই ডাঙ্গার বুকে দুতিন হাত মাটি ফেলে দিয়ে জমি তৈরী করা হয়েছে—তাতে চাষ দিয়ে পাকা করে টিউবওয়েল থেকে জল তোলা হচ্ছে।

তৃণবিহীন বন্ধ্যা প্রান্তরে ফুটে উঠেছে সবুজ স্বপ্ন। মাঝ দিয়ে চলে গেছে পথটা—বন থেকে বের হয়েই সবুজের স্পর্শ; পিচ পড়ছে রাস্তায়—পাশে বসেছে ইলেকট্রিক পোষ্ট।

থমকে দাঁড়াল পথের ধারে—চেনা যায় না। কি এক সম্ভাবনায় ওর শূন্য বুক ভরে উঠেছে।

চুপ করে গাছের নীচে দাঁড়াল জীবন—এ মাটির এই থানের আর যেন সে কেউ নয়। তার জীবনে সব শুধু হারাবার পালা। ঘর গেছে—গেছে খুকিও।

···মণিমালাও চলে গেছে! দুর্গাপুরে তার বাসায় গিয়ে কয়েকদিন ছিল মাত্র। ছোট বাড়ীখানা পুরোনো গ্রামের সামিল।

—কি কায করো এখানে?

—কেন? প্রশ্ন করে জীবন।

দূরের ষ্টিলটাউনের সুন্দর বাংলো, বাসাবাড়ীর দিকে আঙ্গুল দেখায় মণিমালা—ওগুলো কাদের জন্য।

—ষ্টাফ্ কোয়ার্টারস্।

মণিমালা জবাব দেয় না, ওর পোষাকের দিকে চেয়ে থাকে। ময়লা খাকি প্যাণ্ট-সার্ট, তেলকালিমাখা। পরণে ভারি বুট। খানিকটা পদমর্য্যাদা অনুমান করে।

ক'দিন পরই চিঠিখানা দেখায়, বর্দ্ধমান টাউনে একটা চাকরী পেয়েছে মণিমালা।

—যাবো ভাবছি।

কথা বলে না জীবন। ওর দিকে চেয়ে বেশ অনুভব করে ওকে বাধা দেওয়া যাবে না। এমন একটা জায়গায় মণিমালা অপমানিত হয়েছে—সে কোন কথাই শুনবে না।

শোনেও নি।

মণিমালা চলে গেছে। এ যাবার অর্থ বোঝে জীবন।

চুপ করে বাড়ী আসছে।

---দাদাবাবু।

পাম্প মেসিনএর কাছ থেকে এগিয়ে আসছে কালী।

—বড়বাবুর অসুখ।

—হ্যাঁ, কেমন আছেন জানো।

—সারদাবাবু বলছিলেন কাল। একটু যেন সামলেছেন।

এগিয়ে চলে জীবন। ক্লান্ত পরাজিত একটি মানুষ।

···কালো পুরোনো ধ্বসে-পড়া বাড়ীখানা হারিয়ে গেছে নোতুন বাড়ীর ভিড়ে। ইলেকট্রিকের তারে বাতাস কাঁপে—রোদ জ্বলে।

বেলা বাড়ে। আকাশের সীমায় বনের দিগন্তে মেঘ জমেছে—পুঞ্জ কালো কালো মেঘ।

বর্ষা আসতে দেরী নাই।

···স্তব্ধ হয়ে যায় জীবন।

গ্রামের জীবনে কোন স্তব্ধতা আসে নি। জীর্ণ গাছ থেকে একটি পাতা ঝরে গেল।

মণিমালার চলে যাবার কথা ও বলতে পারেনি।

· কাউকেও বলেনি।

তারকবাবু মারা গেছেন। পাতাজোড়ার একটি অতীতের গৌরবময় অধ্যায় নিঃশেষ হয়ে গেল।

নীরবে—নির্জনে।

অশোকও কায ফেলে এসেছিল—এসেছিল শুদ্ধ পরাজিত ফণী—অবনীরায়—ধরণী মুখুয্যে। ওরা দাঁড়িয়ে দেখল শুধু।

পানু দাসও একবার উঁকি দিয়ে দেখেছিল তার পূর্বসূরীদের।

বলে ওঠে মিষ্টি—মাথাটা একবার নোয়াও দাসজী মশোয়। দোষে গুণে তবু একটা মানুষ ছিলেন। তোমার পুঁজি তো ওই আগেকার টুকুই। গুণের ভাঁড়ার তো বাড়ন্ত।

পানুদাস কথা কইল না। চুপকরে গিয়ে জিপে উঠলো। কি কাযে সদরে যাচ্ছিল—সেই দিকেই চলে গেল। সামান্য স্বাভাবিক একটা ঘটনা—তার মনকে বিন্দুমাত্র নাড়া দেবার সামর্থ্যটুকুও এর নেই।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে জীবন। এতদিন ধরে এতবড় বাড়ীটার সব স্পন্দনটুকু যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তুলে এসেছে একটি মানুষকে কেন্দ্র করে, সবই নিঃশেষ হয়ে গেল।

সন্ধ্যার থমথমে অন্ধকার নেমেছে ধ্বসে-পড়া বাড়ীটার সর্বত্র। উঠোনে বাড়ীর বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুলগাছগুলো অযত্নে মরে গেছে—গজিয়ে উঠেছে কাঁটা গাছ কুক্‌সিমা—কালকাসিন্দের ঝোপ; হলদে ফুলগুলো আঁধারে কেমন ম্লান চাহনিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

এ বাড়ীর একমাত্র বংশধর; কিন্তু সেও পারবে না এই ধ্বংসপুরীকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে। ধ্বসে পড়ছে এর সব ইট কাঠ দালান খিলান।

এরই কাঠ ইটে গড়ে উঠছে অন্য কোন নোতুন মানুষের ইমারত। সতীশ ভটচায তাই দিয়ে দালান তুলেছে।

...একদিকে ভাঙ্গে—গড়ে অন্যদিকে।

মায়ের চাপা কান্নায় জীবন একটু বিব্রতবোধ করে।

এতদিন সব চলে যাবার দুঃখ, অভাব সহ্য করেছে মা, কিন্তু বাবার মৃত্যুর আঘাত সে সইতে পারেনি, চাপাপড়া দুঃখের বোঝা আজ ওর সারা মনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে।

কাঁদছে গুমরে গুমরে।

—বৌমাকে খবর দিবি না? সেও আসুক।

মা জেনেছে কোথায় ছেলের মনেও ভাঙ্গন ধরেছে। জীবন একটু চুপ করে থেকে জবাব দেয়।

—খবর দিয়েই বা কি হবে মা?

—কেন?

—সে আসবে না।

মা অসহায় দৃষ্টিতে ছেলের দিকে মুখ তুলে চাইল। সব চারিদিকে কেমন ভেঙ্গে পড়ছে—অন্ধকারে একটা চামচিকে উড়ে গেল, ঝুরঝুর করে বালি চুণ খসছে। কোথায় একটা ইটএর চ্যাংড়া খসে পড়ল।

চারিদিকে খসা আর ঝরার পালা। বাড়ীঘর—বিষয়-আশয় গেল। স্বামী গেল—বাইরের জীবনেও দেখেছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—গৃহস্থের সব বন্ধন শুধু খসেই পড়ছে।

তারই মাঝে বাঁচবার সাধনা করে মানুষ।

মা তাই পরম স্নেহভরে জীবনের মাথায় হাত বোলাতে থাকে।

—মায়ে পোয়ে ওখানেই থাকবো গিয়ে বাবা।

জীবন অবাক হয়—সেখানে থাকতে পারবেন মা। নোংরা বাড়ী—মানে কলে কারখানায় কায করে—

হাসে মা—হোক বাবা। আমার তো সব গেল তবে আর মান অপমান বোধ এত কিসের। ছেলে যেখানে থাকে—মাও সেখানে থাকতে পারে। তোকে ভাবতে হবে না।

জীবন মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। মণিমালা আজকের যুগের মানুষ, প্রতিবাদ বিক্ষোভ তার রক্তে। জ্বালা তার সারা মনে।

মা যেন সে যুগের ঊর্ধ্বে একটি মানুষ।

পরম তৃপ্তিভরে বলে জীবন—তবে চলো সেখানেই।

...দূরের দিকে চেয়ে থাকে; দুর্গাপুরের ব্লাষ্টফার্ণেসের আলোর সেই চোখ ধাঁধানো জ্বালাময় দীপ্তি অনেকটা যেন ম্লান হয়ে এসেছে।

গ্রামের পথে—হাসপাতালে—স্কুল বোর্ডিংএ জ্বলে উঠেছে বিজলী বাতি; কোথায় বাজছে রেডিওর সুর।

গ্রাম—সেই অন্ধকার গ্রামও যেন জাগছে নোতুন জীবনের জোয়ারে।

কানে আসে ডাঙ্গার বুকে ট্রাকটরসেড থেকে হাতুড়ির শব্দ—ইঞ্জিনটা চালু করে ওরা পরীক্ষা করছে।

...কেমন ভালো লাগে জীবনের।

শুধু তেল কালি—চিমনীর ধোঁয়া আর যন্ত্রের গর্জনই এখানে শোনা যায় না! কোথায় একটা গরু ডাকছে পরম স্নেহভরে তার বাছুরকে, বাঁশ বনে পাখী ডাকে, বাতাসে ওঠে আখের শালের গুড় জ্বালানী মিষ্টি গন্ধ।

…উয়া ফুল ভরা ডাঙ্গা থেকে বাতাস আসছে—অন্ধকার সেই দিনগুলো মনে পড়ে।

সমৃদ্ধির দিন।

সেদিন ছিল তাদের একান্ত অজানার।

আজ যেন সেই সমৃদ্ধির ব্যক্তিবিশেষের জীবন থেকে এসেছে সামগ্রিক জীবনে—তারই প্রকাশ চারিদিকে।

…জীবন কথাটা ভাবছে—এখানে ঠাঁই তাদের ফুরিয়েছে। কেমন যেন পালাতে ইচ্ছে করে এখানে। চলেই যাবে।

মাকে তাই বলে ওঠে—তাহলে অশোকদাকে বলি—মত আমাদের আছে। এ বাড়ী রাখতে পারবো না মা, তার চেয়ে বেচেই দিই, দুর্গাপুরের আশপাশে গিয়ে ছোট একটা ঘর করবো।

মাও ভেবেছে কথাটা।

স্বামীর স্মৃতিতে তবু একটা পুণ্যপীঠ গড়ে উঠবে। ওরা কলেজ গড়বার চেষ্টা করছে—ওরা যদি কিছু দাম নিয়ে বাগান ছেড়ে দেয় কথাটা অশোকও জানিয়েছিল পরম সঙ্কোচভরে।

—মা আজ মত দিতে দ্বিধা করে না।

—তাই বল অশোককে। ধ্বসে ভেঙ্গে ভিটে নষ্ট হওয়ার চেয়ে কাযে লাগুক, সত্যিকার কাজে লাগুক, তিনিও খুসী হবেন।

…পাকাপাকিভাবেই যেন ওরা এ মাটি থেকে নিজেদের উৎখাতনামায় সই করে দিয়ে—অন্য জীবনে গিয়ে ঠাঁই খুঁজে নিতে চায়।

জীর্ণ পরিধান পরিত্যাগ করে যেমন নোতুন বাস গহণ করে মানুষ—সহজ স্বাভাবিক গতিতে, আজ তারকও কেন তার উর্দ্ধতন সাতপুরুষের প্রতিষ্ঠিত রায় বংশ পাতাজোড়ার নোতুন মহীরুহ থেকে একটি ঝরাপাতার মত অনায়াসেই স্বাভাবিক গতিতে ঝরে পড়ল।

এতবড় ঘটনাটাও আজ সহজ হয়ে গেছে, তাদের সকলের কাছে।

রাতের আকাশে দূরে কোথায় পাখী ডাকছে—রাতজাগা একক একটি পাখী। জাগর রাত্রির প্রহরে ও মন হারিয়ে গেছে।

আঁধার নেমেছে আবছা অন্ধকার।

গাঁয়ের এদিকটায় এখনও বিজলী বাতি আসেনি। নুইয়ে পড়া খড়ের ঘরগুলো মাটি নেবার জন্য তৈরী হয়েছে—কেমন দুর্বার সংগ্রাম করে এখনও তারা টিঁকে আছে। বাঁশবনে হু হু করে বাতাস।

…আকাশে দেখা দিয়েছে গ্রীষ্মশেষে বর্ষার মেঘ। ছেয়ে আসছে আকাশ জুড়ে। হঠাৎ কাদের ঢুকতে দেখে নারাণঠাকুর দাওয়ায় শুয়েছিল উঠে বসে।

…পিদিমটা জ্বালতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নারাণঠাকুর।

অব্যক্ত সেই আর্তনাদ মেশে গঙ্গামণির বুক-ফাটানো কান্নায়।

সনাতনকে ওরা নিয়ে আসছে। রুগ্ন বিকৃত পঙ্গু একটা মানুষ। গঙ্গামণির জমানো কান্নাটা আজ স্বামীর ভিটেতে এসে ফেটে পড়ে খান খান হয়ে মাথা ঠুকছে।

—ই আমার কি হলো গো। কেনে গেলাম। কেনেই যেতে দিলাম…ছেলেকে।

…লোকজন জুটে গেছে অনেকেই।

সনাতন দাওয়ায় বসে হাঁপাচ্ছে ক্লান্তিতে।

কিছুদিন আগে কারখানায় কায করতে গিয়ে বেকায়দায় মেসিনে পড়ে ডান পাখানা পিষে গেছে—হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলতে হয়েছে পাটাকে।

কাঠের ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটছে যোয়ান সমর্থ মানুষটা। কাজ করবার ক্ষমতা নেই, বাতিল মানুষটাকে তাই আজ ওই জগৎ ফেরৎ পাঠিয়েছে—যেমন করে আখমাড়াই কলএর বাতিল ছিবড়েটুকু—সামান্য কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করে।

গঙ্গামণির সেই তেজ কোথায় কর্পূরের মত উবে গেছে।

কে বলে—ঢেঁকি যতই মাথা নাড়ুক, আবার সেই গর্তেই ফিরে আসে দিদি। বাপ পিতেমোর ভিটে একে ছেড়ে গিয়েছিলে এখন?

চুপ করে থাকে গঙ্গামণি। ভুলটা সেও বোঝে।

একটি লোক উঠে বসেছে—অবচেতন মনে মনে ইতি কর্তব্যও স্থির করে ফেলেছে। তার জীর্ণ দেহে আবার নারাণঠাকুর ফিরে পেয়েছে আগেকার সেই বল। আজ সে বাঁচবার, ওদের বাঁচাবার সাহসও সে অর্জন করেছে।

জীর্ণ বিছানাটায় শুইয়ে দেয় ক্লান্ত সনাতনকে।

নেমে আসছে—হঠাৎ ভিড় ঠেলে অশোককে এগিয়ে আসতে দেখে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা দেখেই বুঝতে পেরেছে অশোক—চমকে উঠেছে।

এ যেন নোতুন অভূতপূর্ব সমস্যা তাদের গ্রামজীবনে। একা সনাতন নয়—আরও কারা ফিরে আসবে এমনি সব হারিয়ে—কে জানে। তাদের দিতে হবে আশ্রয়—জীবিকার সংস্থান।

গঙ্গামণি কাঁদছে—কোথায় দাঁড়াবো বাবা, খাবো কি!

ভাবছে অশোক; অবাক হয়ে ব্যথাভরা চাহনি মেলে চেয়ে থাকে সনাতনের দিকে এমোকালীও।

অন্তরে বাইরে ওরা নানা আঘাতে জর্জর হয়ে উঠবে সমস্যাবহুল জীবনে—নোতুন এই যুগের অভিশাপ না আশীর্বাদ এ—কে জানে।

তবু সইতে হবে। পথ খুঁজতে হবে সমাধানের।

বলে ওঠে অশোক—কেঁদোনা সোনার মা, একটা ব্যবস্থা যা হয় হবেই। ফিরে এসেছো—ভালই করেছ।

—ওখানে থাকলে যে ভিক্ষে করতে হতো বাবা!

গঙ্গামণি কান্নাভিজে কণ্ঠে বলে—চমকে ওঠে কালী।

—ভিক্ষে করতে হতো?

হাসে অশোক। ম্লান হাসি একটুকু। কালীচরণ জানেনা—সেখানে জাত মান সম্মানের কি দাম—কিসের মাপকাঠিতে তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়—বলে ওঠে অশোক।

কায করবার সঙ্গতি যেদিন সেখানে ফুরোবে—সেদিন এ ছাড়া আর পথ কি? যে কোন সহর কলকারখানার আশেপাশে এমনি অনেককে খুঁজে পাবে, যাদের একদিন কোন পাঁড়াগাঁয়ে ঘর জমিজারাত ছিল, মান সম্মানও না থাকা ছিলনা। কিন্তু আজ সেখানে পথের ভিখারী।

—হ্যাঁ বাবা।

গঙ্গামণি ও কথাটা মানে। দুর্গাপুর আসানসোলেও এমন অনেককে দেখেছে সে।

নারাণঠাকুর এসব বোঝেনা, অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকারে সে ঘোষণা করে তার দুঃখ।

সান্ত্বনা দেয় অভয়—দেয় অশোক ইসারা করে।

—সব ঠিক হয়ে যাবে।

গঙ্গামণিও যেন ভরসা পায় তার কথায়।

রাত হয়ে আসে। একাই অশোক ফিরছে বাড়ীর দিকে। কোথায় জাগছে তখনও রাতজাগা পাখী। তারকবাবুর অন্ধকার পরিত্যক্ত বাড়ীটার কাছে এসে দাঁড়াল।

শূন্য বাড়ীটা আঁধারে ডুবে গেছে।

জীবন ওর মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু যাবার আগেও এবাড়ীর শেষপুরুষের মতই কায করে গেছে। [ক্রমশঃ
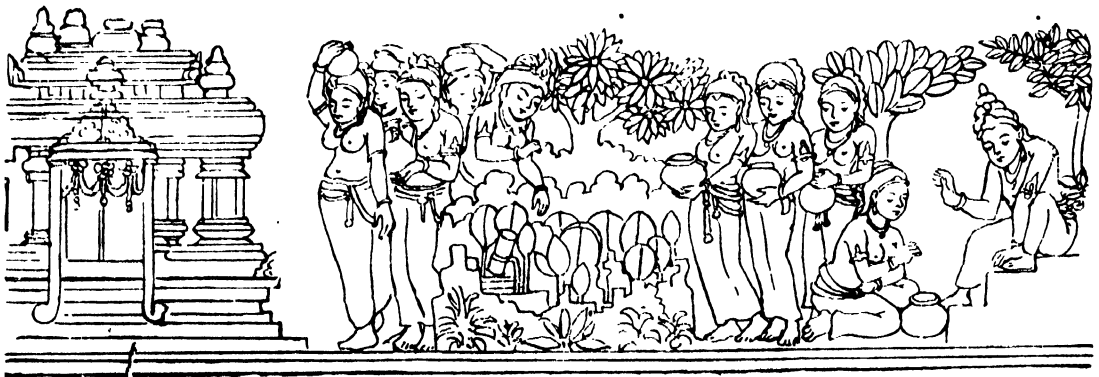
বর্ধমানে বাংলার মনীষী সঙ্গম

অজিত ভট্টাচার্য

প্রাচীন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বর্ধমানের ঐতিহ্য চিরদিন জড়িত, বর্ত্তমানের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে যদি আমরা দুইশত বছর পূর্ব্বে থেকেও বর্ধমানকে দেখি তাহলেও তার গৌরববাহী ঐতিহ্যকে অনুভব করে আমরা আজও গৌরবান্বিত না হয়ে পারি না।

যে সব মনীষীর অবদান বর্ধমানের ইতিহাসের সাথে সমসূত্রে গ্রথিত তাঁদের কিছু কিছু ঘটনার অবতারণাই প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র হতে আরম্ভ করে এখানে বহু গুণী জ্ঞানী সাহিত্য রসিকের আবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগে। বর্ধমানের রাঙ্গামাটি তাই ধন্যা।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ধমান জেলায় ভুরসুট পরগণায় কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক এক ব্রাহ্মণ রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ফুলিয়ার এই মুখটি বংশে বাংলার প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায়ের বংশধর হলেন রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র। ১১০৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া ওরফে রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। প্রচলিত কিংবদন্তী ভারতচন্দ্রের পুর্ব্বপুরুষ লছমি নারায়ণের সাথে বর্ধমান রাজবংশের বেশ সদ্ভাব ছিল না, বর্ধমানরাজ কর্ত্তৃক লছমি নারায়ণের রাজ্য কয়েকবার আক্রান্ত হলেও তিনি সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। কিন্তু গৃহ-শত্রুর চক্রান্ত তাঁর সমস্ত শক্তিকে ব্যাহত করে।

ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য রাজবল্লভ রায়ের চক্রান্তে ১৭১৩ খৃঃ বর্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র ভুরসুট আক্রমণ ক'রে ভারতচন্দ্রের পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। এর অল্পকাল পরেই ভারতচন্দ্র মঙ্গলঘাট পরগণার অন্তর্গত নওয়াপাড়া মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন এবং এরই সন্নিকটে তাজপুরে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। যতদূর জানা গেছে তিনি বর্ধমান মহারাজের অধীনে সম্পত্তি-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে তদ্বির ও তদারকের জন্য ১৭৩৯ খৃঃ বর্ধমানে আসেন। এই কার্যকালে তিনি চার বছর অতিবাহিত করেন। সম্ভবতঃ বর্ধমানরাজ কীর্ত্তি-চন্দ্রের মাতার সাথে ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনাথের বিবাদ ও সম্পত্তির ব্যাপারে কোন গোলমালের জন্য এই সময়ের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে বর্ধমান রাজবাটী (বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের) সন্নিকট বোরহাট মহল্লায় তৎকালীন বর্ধমানরাজ-কারাগারে কিয়ৎকালের জন্য বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্রকে বন্দীজীবন অতিবাহিত করতে হয়।

কবির জীবনের এক স্মরণীয় ও ভয়াবহ জীবনের দিনপঞ্জীকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্রকে ঘিরে বর্ধমানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা তাই এক বিশেষ দিক দাবী করতে পারে।

ভারতচন্দ্র ছিলেন অদ্ভুত ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষ। তিনি কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে বর্ধমান রাজকারাগার হতে পলায়ন করেন। ভারতচন্দ্রের জীবনের এর পরবর্ত্তী ঘটনা নজির রেখেছে। কিন্তু বর্ধমানের মানুষ আজও ভুলতে পারেনি বিদ্যাসুন্দরের ভারতচন্দ্রকে। একটা চিরস্থায়ী আসন তাই সন্নিবিষ্ট হয়েছে ভারতচন্দ্রকে কেন্দ্র করে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায়।

বৃটিশ আমলে প্রথমদিকেও বর্ধমান শহর অস্বাস্থ্যকর ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বায়ু পরি-বর্ত্তনের জন্য বর্ধমানে এসেছিলেন। রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হয়, আর সেই কারণেই বর্ধমান শহর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

এই শহরে কিছুদিন অতিবাহিত করে গেছেন মহা-কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বর্ধমানের অন্যতম প্রসিদ্ধ

জলাশয় শ্যামসায়রে স্নান করে পরম তৃপ্তি পেতেন তিনি। যে সময়ের কথা বলছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সে সময় বর্ধমানে ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন এখানে এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের অতিথি হিসাবে। মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রায়ই বলতেন, বর্ধমানের শ্যামসায়র দেখে আমার কপোতাক্ষীর কথা মনে পড়ে। অবগাহন স্নান করে মাইকেল মনের তৃপ্তিতে সাঁতার কাটতেন। বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন—"ওঠ কবিবর! এ জন্যই দেখছি তুমি রাজসভাকবি হতে পারনি"। বর্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল ও রাজকলেজের তীরবর্তী ভূমিখণ্ডে অবস্থিত শ্যামসায়র তাই পবিত্র হয়ে আছে মহাকবি মাইকেল ও ঈশ্বরচন্দ্রের পূত পবিত্র স্পর্শে। বাংলাদেশের ভূগোলে পুরোণো একটা নাম বর্ধমান, এক গৌরবময় ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে রেখেছে বর্ধমানের কথা।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূত পুণ্য স্পর্শও বর্ধমানের ধূলিকণায় ধন্য হয়ে আছে। তেজগঞ্জ কালী-মন্দির ও ভুলভা কালীমন্দিরে একাধিকবার ঠাকুর এসেছেন।

প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির দিকেও একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ অবদান বর্ধমানের আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীগণ ব্যতীত জন কয়েক ইংরাজ জনসাধারণকে জ্ঞানদানের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টিওয়ার্টের নামই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তাঁরই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বর্ধমানে প্রথম মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৬ খৃঃ ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের চেষ্টায় চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বর্ধমানে দুটি বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়। বর্ধমানে এই হল সর্ব্বপ্রথম ইংরাজপরিচালিত স্কুল। ১৮১৮ খৃঃ স্কুলের সংখ্যা হয় দশ এবং ছাত্র সংখ্যা প্রায় একহাজার। বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া ষ্টিওয়ার্টকে বর্ধমানে স্কুল পরিচালনায় অগ্রসর হতে হয়।

বিরুদ্ধবাদীরা রটনা করে শিশুদের বিদেশে রপ্তানীর জন্য সাহেব স্কুল খুলেছেন। স্বনামখ্যাত তারাচাঁদ দত্ত মহাশয় বর্ধমানে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ পণ্ডিতপ্রবর রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় যখন বর্ধমানের ডেপুটী কালেক্টর তখন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমানে কোন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বর্ধমানে তখন আর বিদ্যালয় না থাকায় ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের পরিচালনাধীন কোন স্কুলে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষকতা করেছিলেন ইহাই মনে হয়।(১)

তৎকালীন ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের প্রতিষ্ঠিত মিশনারী স্কুলের যথেষ্ট সুনাম ছিল। কলকাতা স্কুল সোসাইটির কিছুসংখ্যক শিক্ষক এই স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য এসে-ছিলেন। বর্ধমান শহরের অদূরবর্ত্তী পুলিশ লাইনের সন্নিকটে কানাইনাট্‌শাল নামক স্থানে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ধমানে শিক্ষা বিস্তারকল্পে যাঁদের অবদান আমাদের কাছে স্মরণীয় নিঃসন্দেহে আমরা ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করতে পারি।

স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ করে বর্ধমান জেলায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার এক জটিল সমস্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮৫৭ খৃঃ ৩০শে মে বর্ধমান জেলার জৌ গাঁয়ে। (২)

বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ধমান জেলায় নারো গ্রামে আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ থেকে ১৮৫৮ খৃঃ মাত্র এক বছরের মধ্যে তিনি বর্ধমান জেলায় ১১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বর্ধমান জেলায় শিক্ষা বিস্তারে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টিওয়ার্ট ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম অনেকেই হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু বর্ধমানের ইতিহাসে শিক্ষা বিস্তারে এঁদের দান ছিল অপরিসীম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বঙ্গভারতীর একজন কৃতী সন্তান বর্ধমানের পবিত্র ভূমিতে সাহিত্য আলোচনা করে গেছেন, বর্ধমানের মানুষের কাছে তাই তাঁর স্মৃতি চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, তিনি হলেন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের দেশ-

ব্যাপী বিক্ষোভ যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সে সময়ে আবির্ভাব ঘটেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি হাসির গানে। ১৮৮৪ খৃঃ কবি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম্, এ, পাশ করেন। তার পর তিনি সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য বিলাত যান। ১৮৮৬ খৃঃ এফ্, আর, এ, এস্ ডিগ্রী নিয়ে বিলাতের কৃষি কলেজ ও কৃষি সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। বিলাত থেকে ফিরে অল্প কিছুদিন কৃষি বিভাগে চাকুরী করেছিলেন তিনি। এই সময়ে সামাজিক বিরোধিতা ও জাতি আচারের কুসংস্কার কবির মনকে উদ্বেল করে, তারই ফলে কবির ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কবিতা সমাজকে সুতীব্র আঘাত করবার প্রেরণা যুগিয়েছিল। বর্ধমানের রাঙ্গামাটীতে কবির লেখনী রূপ পেয়েছিল বিভিন্ন ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গানের মাধ্যমে। কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন ছিলেন বর্ধমান স্টেটের সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার। ধন্য বর্ধমানের পূতপবিত্র ভুমিখণ্ড, যেখানে একাধিক সাহিত্যরসিক ও কবির আবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগে, কত ভাঙ্গা-গড়া ও উত্থান পতনের মধ্যে এগিয়ে চলেছে বর্ধমানের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি। * উনবিংশ শতকের সাহিত্য প্রবাহে এক বিশেষ দিকের সন্ধান দিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সাহিত্যের উন্মেষ বর্ধমানের পবিত্র ভূমিতে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁর যে বিশেষ সাহিত্য কীর্ত্তি "পালামৌ"কে কেন্দ্র করে আজও বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা আছে, বর্ধমানে বসেই তিনি সে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত বঙ্গ-দর্শনে প্র, না, ব, এই ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবজীবনীতে সে কথা উল্লেখ করে বলেছেন—"বর্ধমানে থাকবার সময়েই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে।" তৎকালীন সঞ্জীব-চন্দ্রের সম্পাদনায় ভ্রমর নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ হত। তিনি বর্ধমানে থেকেই ভ্রমরের সম্পাদনা করতেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গ-দর্শন পুনঃ প্রকাশ হলে বর্ধমানে থেকেই তিনি তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবজীবনীতে এ বিষয়ের উল্লেখ করে লিখেছেন—"১২৮৪ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্র বর্ধমানে বসেই বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা করেন।" অবশ্য সঞ্জীবচন্দ্রের পিতা যাদববাবু পত্রিকা ও যন্ত্রালয়ের তত্ত্বাবধান করতেন বলে বর্ধমানে থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা করা সহজ হয়েছিল। কেননা যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর দু'বছরের মধ্যে বঙ্গদর্শনের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন বর্ধমানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, সঞ্জীবচন্দ্র তখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য বর্ধমানে আসেন। এর আগে তিনি পড়তেন হুগলীতে। সেখানে সঙ্গ দোষে অল্প বয়সেই লেখা পড়ার প্রতি অমনোযোগী হয়ে ওঠায় তাঁর পিতা বিদ্যাশিক্ষার জন্য সঞ্জীবচন্দ্রকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তাঁর ধারাবাহিক জীবন ইতিহাস আমরা তেমন পাই না, যা থেকে নির্দ্দিষ্ট করে বলতে পারা যাবে বর্ধমানে এসে তিনি কতদিন ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী বলতে আমরা যতটুকু পাই তা হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা "সঞ্জীবজীবনী" পত্রিকার কয়েকটি খণ্ড। ছাত্র জীবনে আমরা যেমন তাঁকে একবার বর্ধমানে দেখি, তেমনই আর একবার তাঁকে দেখি চাকুরী জীবনে। চাকুরী নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম বর্ধমানে আসেন স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রার হয়ে। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী প্রসঙ্গে বঙ্কিম চন্দ্র সেকথা উল্লেখ করে বলেছেন—"কিছুদিন পরে হুগলীর সাব রেজিষ্ট্রার পদের বেতন কমিলে গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হওয়ায় তিনি বর্ধমানে প্রেরিত হইলেন।" এখানে তিনি ছিলেন বেশ আনন্দে। কারণ বর্ধমানের পরিবেশের সঙ্গে তিনি নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে বলেছিলেন, "বর্ধমানে সঞ্জীব চন্দ্র বেশ সুখেই ছিলেন। শৈশব থেকেই সঞ্জীবচন্দ্রের বেশ ঝোঁক ছিল ফুলের বাগানের উপর, আর নেশা ছিল সাহিত্য ও প্রাচীন পুঁথি পত্র নিয়ে আলোচনা করা। বিকালে অধিকাংশ দিনেই বাগানে নিজ হাতে মাটি খুঁড়ে ফুলের যত্ন করতেন তিনি। আর ঐ বাগানই ছিল তাঁর নিত্য বৈকালের সঙ্গী। সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন অদ্ভুত খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। প্রকৃত শিল্পীর মন ছিল তাঁর। তিনি দিনরাত আত্ম দর্শন, সাহিত্য চিন্তা ও বিভিন্ন পুঁথি পত্রের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন। বড় একটা কারো সঙ্গে মেশবার

সুযোগ তাই তাঁর ঘটে উঠতো না। বর্ধমানে তাঁর একমাত্র বন্ধু বলতে ছিলেন পড়শী বিধুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্য সঞ্জীবচন্দ্র তৎকালীন বর্ধমানের জনসাধারণের কাছে দেমাকী বলে পরিচিত হয়েছিলেন। ১২৮৩ সালে কবি নবীনচন্দ্র সেন জর্জ ফিল্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বর্ধমানে এসেছিলেন। "আমার জীবনে" সেকথা উল্লেখ করে লিখেছেন—"আমি জর্জ ফিল্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, রাস্তার পাশে বৃহৎ হাতা শোভিত একটি বাংলোর বারান্দায় এক তেজঃপূর্ণ, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ব্রাহ্মণ, অনাবৃত দেহে বেড়াইতেছেন দেখিলাম। মূর্ত্তিটিকে দেখিয়া কোচোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই লোকটি কে? সে বলিল সঞ্জীব বাবু। আমি প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। গাড়ী হাতায় লইয়া টিকিট পাঠাইয়া দিলাম, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—কি জানি কি রূপ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কার্ড পাইবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিয়া চিরপরিচিতের মত আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন।"

নবীনচন্দ্র তাঁর "আমার জীবনে" সঞ্জীবচন্দ্রের কথা লিখে না গেলে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের অজানা থেকে যেত। বর্ধমানে এসে নবীনচন্দ্র শুনেছিলেন চাটুজ্জ্যে পরিবারের দেমাকের কথা। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের সাথে পরিচিত হয়ে সে ধারণা তাঁর দূরীভূত হল। "আমার জীবনে" সে কথার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—"আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই কি সেই ডেমাকি সঞ্জীব বাবু"। সঞ্জীবচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবন স্মৃতিতে" বলেছেন—"সঞ্জীবচন্দ্র আলাপী লোক ছিলেন, গল্প করায় তার আনন্দ ছিল।"

অনুমানের উপর নির্ভর করে বলতে হচ্ছে, সম্ভবতঃ সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮৫ সাল পর্য্যন্ত বর্ধমানে ছিলেন। কারণ বর্ধমান হতে যশোহরে বদলি হবার পর তিনি আর বেশী-দিন চাকুরী করেন নি।

১২৮৭ সালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তিনি যশোহরে বদলি হয়েছেন। অপর দিকে দেখি ১২৮৫ সালে বঙ্গদর্শন ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ হলেও ১২৮৭ সালে বঙ্গদর্শনের

বর্ধমান রাজবংশের পটভূমিকায় রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের "জাল প্রতাপ" তৎকালীন বর্ধমানের এক ঐতিহাসিক চিত্রের অবতারণা করেছে। সঞ্জীবচন্দ্র তাই বর্ধমানের গৌরব। বর্ধমানবাসীর কাছে তাঁর স্মৃতি তাই অম্লান হয়ে থাকবে।

বাংলা সাহিত্যের রসরাজ (পঞ্চানন্দ) ইন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত পূত পবিত্র ভূমি বর্ধমান। জীবনের এক বিরাট অংশ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিবাহিত করেছিলেন বর্ধমানের বুকে। তাই "বর্ধমানে বাংলার মনীষী সংগমে" তাঁর কথা না বললে অপূর্ণ হবে সে আলোচনা।

এখানে ইন্দ্রনাথ প্রথম আসেন সম্ভবতঃ ১৮৭৭ খৃঃ হাইকোর্ট ছেড়ে বর্ধমানের কোর্টে ওকালতি করতে। কেন তিনি হাইকোর্ট থেকে বর্ধমান কোর্টে এসেছিলেন তার সঠিক কোন ইতিহাস আমরা পাই না। তবে তাঁর সাহিত্য স্ফুরণ যে এখানেই বহুলভাবে হয়েছিল একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ১৮৭৭ খৃঃ ইন্দ্রনাথ কলকাতায় একখানি ব্যঙ্গাত্মক মাসিক পত্র "পঞ্চানন্দ" পরিচালনা করতেন। পঞ্চানন্দের সম্পাদক থাকা কালীন ইন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে বর্ধমানে আসেন, বর্ধমানে এসেও বৎসরাধিককাল পঞ্চানন্দ চালিয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বর্ধমানে তাঁর ওকালতির পশার জমে যায়। এই সময়ে বন্ধ হয়ে যায় "পঞ্চানন্দ"। এর পর তিনি ৺যোগেশ চন্দ্রের অনুরোধে "বঙ্গবাসীতে" লিখতে আরম্ভ করেন। বহুকাল তিনি "বঙ্গবাসীতে" লিখেছিলেন। পরে যোগেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে সংকলনের ইচ্ছা প্রকাশ করে ইন্দ্রনাথের কাছে অনুমতি আদায় করে নেন। যাহা উত্তরকালে "পাঁচুঠাকুর" প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথের রসানু-শীলন প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। তিনি ছিলেন সমজদার রসিক। বৈঠকী-গল্পে তখনকার দিনে তাঁর জোড়া ছিল অল্প। ইন্দ্রনাথ বর্ধমানে থাকাকালীন প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য বৈঠক বসত। তাঁর জীবনের বহু অংশ কেটেছে এই বর্ধমানে। আদালতে মোকর্দ্দমা করতে গিয়েও তিনি রসিকতার অবহেলা করতেন না। বর্ধমানের কোর্টে এক তন্তুবায় হাকিমের এজলাসে এক দিন ভীষণ গণ্ডগোল

একেবারে সুতোহাটের গোল"। আর একদিন পদ্মমণি নামে এক মহিলা সাক্ষী দেবার পর আর এক ভদ্রলোক সাক্ষ্যদিতে কোর্টে উঠলে সে পক্ষের উকিল তাঁর নাম ধাম পেশা জিজ্ঞাসা করায় ইন্দ্রনাথ বললেন—"দেখছেন না? উনি পদ্মমণির অলি"। এরকম রসিকতা আদালতে নিত্যই হত। ইন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে একবার বর্ধমানের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হয়েছিলেন। বর্ধমানে জলের কলের পত্তন তখনও হয়নি। ইন্দ্রনাথের অভিমত কিন্তু এই জলের কলের বিপক্ষেই ছিল। কারণ নানা সুবিস্তৃত ও সুগভীর সায়র শোভিত বর্ধমানে জলের কলের প্রয়োজন নাই, এই ছিল তাঁর অভিমত। কিন্তু ভোটে ইন্দ্রনাথের মতামত টিকল না। পরে তিনি পদপ্রার্থী না হয়ে সঙ্গীতের মাধ্যমে বলে ছিলেন—

"আমি চাই মিউনিসিপ্যাল মান
(যদি বল তা কেন চাই?)
আমায় কেউ জানে না, কেউ মানে না
আমায় কেউ ডাকে না ভাঙ্গতে ধান,
(তাই) আমি চাই মিউনিসিপ্যাল মান।'

বর্ধমান শহরে জলের কলের প্রবর্ত্তন হল। তখন এল আর এক বিপদ। রাস্তার কলে অধিকাংশ বড় বড় ঘরের লোকেরা জল নিতে নারাজ। গৃহ সংযোগের জন্য মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রত্যহই দরখাস্ত পড়তে লাগল। চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর তো ভেবেই অস্থির, এত লোকের জল সরবরাহ তিনি করবেন কি উপায়ে?

একদিন বারে রায় বাহাদুরকে এ নিয়ে চিন্তা করতে দেখে ইন্দ্রনাথ এক খানি কবিতা লিখে রায়বাহাদুরকে শুনালেন—

—"একি হল উপসর্গ, ঘরে ঘরে সংসর্গ
জল যোগান হল বুঝি দায়
রায় বাহাদুর! টাক্ ফুর ফুর
গাড়ু, গামছা হাতে করে ভাবছেন উপায়"।

ইন্দ্রনাথের কথায় হাস্যরোল উঠল। রায় বাহাদুরও এথেকে বাদ গেলেন না।

বর্ধমানের সাহিত্য ইতিহাসকে জুড়ে ইন্দ্রনাথের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসন তাই আজও রয়েছে। তাঁর জন্মভূমি গঙ্গাটিকুরীর নাম তাই এক নূতন ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে বর্ধমান জিলার ভৌগোলিক তত্ত্বে।

১৩২১ সালে সাহিত্যানুরাগী বর্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহাতাবের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু জ্ঞানী ও গুণীর পদস্পর্শে বর্ধমানে এক ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসের পাতায় অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত সম্মেলন রূপে যা লিপিবদ্ধ আছে।

১৩২০ সালের চৈত্র মাসে ইষ্টার পর্ব্বের ছুটির সময় কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের শেষ দিনে বর্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহাতাব বর্ধমানবাসী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বর্ধমান শাখার পক্ষ হতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনকে আগামী বর্ষে বর্ধমান নগরে আমন্ত্রণ করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন মহারাজের প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করায় ৩২১ সালে ১০ই শ্রাবণ বর্ধমান বংশগোপাল টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বর্ধমান শাখার আহ্বানে বর্ধমান জনসাধারণের এক সভা হয়। এই সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক, পরামর্শ ও অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। সম্মেলন পরিচালন সমিতির পরামর্শ অনুসারে ২০শে, ২১শে ও ২২শে চৈত্র ইষ্টার পর্ব্বের ছুটির সময় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার দিন স্থির হয়।

এই ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনের মূলসভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তদ্ব্যতীতও শাস্ত্রী মহাশয় এই সম্মেলনের সাহিত্য শাখার কাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করেছিলেন।

এ ব্যতীত ইতিহাসশাখায় শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার, দর্শনশাখায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, বিজ্ঞানশাখায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সভাপতির আসন অলংকৃত করে সম্মেলন পরিচালনা করেছিলেন।

বর্ধমান রাজবাটীর বিশাল সরস্বতী প্রাঙ্গণ জুড়ে সম্মেলনের মূল মণ্ডপ নির্মিত হয়েছিল। মণ্ডপের উৰ্দ্ধদেশ ও চতুষ্পার্শ্ব নানাবিধ মনোরম শ্বেত, রক্ত, নীলবস্ত্রে সুশোভিত করবার ব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন স্বয়ং বর্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহাতাব। দক্ষিণ পার্শ্বের মধ্যভাগে ছিল সভাবেদী। তার পাশেই অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের স্থান, সম্মুখে প্রতিনিধিবর্গের, তার দুই পার্শ্বে দর্শকদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল।

সম্মেলনের ২য় দিন অর্থাৎ ২১শে চৈত্র মূল মণ্ডপকে দুই ভাগে বিভক্ত করে সাহিত্য ও দর্শন শাখার পৃথক ভাবে স্থান করা হয়। সরস্বতী প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে রাসমঞ্চের সন্নিকটে ইতিহাস শাখার জন্য এক তাঁবু খাটান হয়েছিল।

রাজনাট্যশালায় বিজ্ঞানশাখার স্থান করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সম্মেলন হয়েছে ; কিন্তু বর্ধমানের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। একথা শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বীকার করে গেছেন, বর্ধমানে অনুষ্ঠিত অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মণ্ডপে দাঁড়িয়ে।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের ব্যবস্থাপনায় অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে রূপায়িত হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা বাড়াবার জন্য এক সাহিত্য ও ইতিহাসের গবেষণা মূলক এবং ঐ সঙ্গে এক কৃষি প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল।

সরস্বতী মন্দিরের, রাসমঞ্চের ও রাজ বাড়ীর বহির্ভাগের কিছু অংশেও প্রদর্শনী দ্রব্যাদি রক্ষিত হয়েছিল। প্রস্তর ধাতু মূর্ত্তি, তাম্রশাসন, হস্তলিখিত পুঁথি, দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা, রাজবাটীর প্রাচীন অর্থশাস্ত্র এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হয়। তদ্‌ব্যতীত বর্ধমান কৃষিপ্রধান স্থান বলে এখানে এক কৃষি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। জনসাধারণের শিক্ষাপ্রদ আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ইতিহাস শাখার মণ্ডপে ছায়াচিত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা দানেরও ব্যবস্থা হয়েছিল।

পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক 'সমসাময়িক ভারত' প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বিহারের বৌদ্ধ কীর্ত্তি সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ভূতত্ত্ববিদ্ শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বর্ধমানের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বরাকরের শ্রদ্ধেয় মন্মথনাথ রায় কয়লা খনির উপর ছায়া চিত্রযোগে বিবিধ তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা ক'রে এই সম্মেলনের গুরুত্ব বর্ধিত করেছিলেন। সারা ভারতবর্ষ হতে লক্ষ লক্ষ সাহিত্যরসিক ও তথ্যানুসন্ধানী মানুষ সমবেত হয়েছিলেন এই সম্মেলনে।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের ব্যবস্থাপনায় বর্ধমানের ঐতিহাসিক গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখে এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

বর্ধমান আজও সেই গৌরবে গৌরবান্বিত যে, বর্ধমানের এই অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন দেশের সাহিত্য প্রচার সম্বন্ধে এক নূতন চেতনার সঞ্চার করে এক নব আদর্শের পথ দেখিয়েছিল। রাঢ়ের শাশ্বত বাণী তাই এই বর্ধমানকে ঘিরে। বাঙ্গলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গ এই বর্ধমান, যার ঐতিহ্য স্মরণাতীত কাল হতে ইতিহাসের ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্যেও কালের কষ্টি পাথরে এক অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে রয়েছে। বর্ধমানবাসীর কাছে এটুকুই আজ সান্ত্বনা।

---

(১) ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ড, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) স্ত্রীশিক্ষায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৫
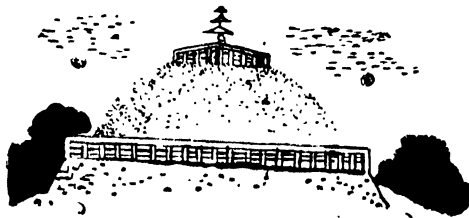
সেকালের বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থা

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। তাই বুঝি মানুষ যুগে যুগে চেয়েছে বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই তার ভাগ্য ফেরাতে। স্মরণাতীত কাল থেকেই তাই মানুষের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয় পরিবহনের সহজ পন্থা—মালপত্র দেওয়া নেওয়া আর ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধার জন্য। অবশ্য এক দিনেই তা হয়ে ওঠেনি। বহু যুগ বহু বছরের চেষ্টায় এ সম্ভব হয়েছে। প্রথম যুগে মানুষের পরিবহনের প্রধান উপায় ছিল পশু। যার উপর মানুষ তার সম্ভার চাপিয়ে নিজের-ও জায়গা করে নিয়েছিল! কাঠের গুঁড়ির ওপর চেপেই বোধ হয় মানুষ প্রথম জলে ভাসতে শেখে। তখন সাঁকো বা ব্রিজের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। ঐ গাছের গুঁড়িই সেই সাঁকোর কাজ করেছে। আধুনিক চক্রের ধারণাও বোধ হয় আসে ঐ গাছের গুঁড়ির গড়িয়ে যাওয়া দেখে। যাই হোক না কেন মানুষ তার নিজের অবস্থায় কোনদিন সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই যুগে যুগে সে ছুটে চলেছে দূরান্তের নেশায় বহু দূরের পানে। সে চেয়েছে অপরকে জানতে আর জানাতে। তাই বিপদ ভয় তুচ্ছ করে সে পার হয়েছে দুস্তর মরু, খরস্রোতা নদী আর উত্তুঙ্গ পর্বত। এই ভাবেই বুঝি জাঁকজমকপূর্ণ প্রাচ্যের দ্রব্যসম্ভার আর পাশ্চাত্ত্যের দ্রব্যগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। পথের দুর্গমতা আর এই বাণিজ্যের দুস্তর বাধাই মানুষকে করে তুলেছিল আগ্রহী তার দেশের সম্ভারকে অন্যদেশে প্রচার করার।

বহু প্রাচীন আর কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পথই প্রথমে ছিল এই বাণিজ্যে পরিবহনের একমাত্র উপায়। এই সব সম্ভার পরিবহনের পথ ছিল অতি দুর্গম। তার ওপর ছিল ভয়ানক বিপদ, আর করভার। পরে মানুষ তাই জলপথকেই তার পরিবহনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মেনে নিয়েছিল। ব্যবসায়ীদের চাপেই বোধ হয় সে যুগে ভাস্কো ডা গামা আবিষ্কার করেন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে প্রাচ্যে গমনাগমনের সহজ পথ। সে যুগে তাই বর্ত্তমানের মতই স্থলপথের চেয়ে জলপথকেই গ্রহণীয় বলে মনে করা হয়েছিল শ্রেষ্ঠ পরিবহনের উপায় হিসাবে।

প্রাচীন যুগের পরিবহনের কাহিনীতে দেখা যায় দলে দলে সওদাগর চলেছেন তাদের বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার নিয়ে। কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও গরুর গাড়ীতে, আবার কখনও বা উটের পিঠে চড়ে। মাঝে মাঝে তাদের জন্য পথের পাশে রয়েছে ছোট ছোট সরাইখানা বা চটি। এই সব চটিতে মেলে আহার, রাত্রিবাসের উপায়, আর ভারবাহী পশুদের খাদ্য ও পানীয়। রাত্রিতে বিশ্রাম করে আবার ভোরের আলো ফুটে উঠলেই শুরু হয় যাত্রা। সারারাত চলে পাহারা। গান আর আনন্দে কেটে যায় সময়।

ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন পথেরও সৃষ্টি হয়। ক্রয়বিক্রয়ও চলত নানা দ্রব্যের। নানা ধনী আর রাজা মহারাজার প্রয়োজনেও দেওয়া নেওয়া চলত নানা বিলাসদ্রব্যের। বিখ্যাত ছিল সার্দিনিয়ার মেষের লোমে তৈরী ফ্লোরেন্টাইনের গরম কাপড়। জাভা, সুমাত্রা আর ভারতবর্ষ থেকে আসত কত রকমের রঙ। প্রাচীন গির্জার জন্য প্রয়োজন হত মিশরের স্বর্ণখচিত রেশমী কাপড়। আবার মিশরের মসজিদের জন্য প্রয়োজন ছিল ভেনিসিয়ার কারখানায় তৈরী আলোকাধারের বা লণ্ঠনের। কর্ণওয়ালের টিন, রাশিয়ার পশুলোম, চীনের পোর্সিলেন—সব কিছুরই চাহিদা ছিল অসামান্য। দক্ষিণ সাগর সৈকতের নুনের চাহিদা ছিল অত্যন্ত বেশী। বাল্টিক সাগর কূলের কড আর হেরিং মাছের ব্যবসায়ে ঐ নুনের প্রয়োজন হত। সমগ্র পৃথিবী জুড়েই চাহিদা ছিল প্রাচ্যের নানা মুখরোচক মশলার—যেমন লবঙ্গ, এলাচ দারচিনি ইত্যাদির। আর

চাহিদা ছিল নানা আকৃতির মণিমুক্তার। তাই পাশ্চাত্যের লোভী ব্যবসায়ীরা দস্যুর মত ছুটে আসতে চেয়েছে যুগে যুগে প্রাচ্যের ভাণ্ডার লুঠ করতে।

সময়ের আবর্ত্তনে আর অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের ফলে কতকগুলি পথ হয় নির্দিষ্ট আর চিহ্নিত। প্রাচ্যের কোন সুদূর শহর থেকে তাই একটি পথ চলে গেল এশিয়া মহাদেশে সর্বত্র। চীন আর পারস্যের রেশম বস্ত্রের সুনাম ছিল অত্যন্ত বেশী। তাই চীনদেশের কানসু থেকে গোবি-মরুভূমির দুর্গমতাকে অগ্রাহ্য করে স্থাপিত হল সেকালের শ্রেষ্ঠ রেশম ব্যবসায়ের পথ। মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে জানা যায় এই পথ তের শতকেরও আগে থেকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা জানত। কাশগর নামক জায়গায় ঐ রাস্তা মিলিত হয়েছিল অন্য আর একটি রাস্তার সঙ্গে। যে রাস্তা চলে গিয়েছে সেকালের বিখ্যাত কার্পেট ব্যবসায়ে কেন্দ্র বুখরায়। আবার দক্ষিণের আর একটি পথ গিয়েছে ইয়ারখণ্ড হয়ে পারস্য আর মেসোপটেমিয়ায়।

মধ্যযুগে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল মধ্যপ্রাচ্য, বাণিজ্য আর পরিবহনে। এর কারণ প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যস্থলে এর অবস্থিতির জন্য। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ ছিল চীনের, জাবার, সুমাত্রার আর ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের। যে পথের শেষ হয়েছিল বিখ্যাত আতরের জন্মস্থান বসরায়। প্রাচীন সে যুগেও, কালিকট, ব্রোচ আর ক্যাম্বের রঙ, মশলা আর দামী পাথরের চাহিদা ছিল অসামান্য। এই সব জিনিসের প্রধান বাজার ছিল প্রাচীন ঐতিহাসিক ব্যাবিলনে। আশ্চর্য্য আর অকল্পনীয় মনে হলেও সে যুগে পশ্চিম এসিয়ার প্রধান বাণিজ্যের বাজার ছিল জাঁকজমকপূর্ণ মেসোপটেমিয়া আর পারস্যের অন্যান্য সহর। এই সব সহরের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল আরব্য রজনীর বিখ্যাত সহর বাগদাদ—মুসলিম ধর্মের পীঠস্থান। এইখানেই বাস করতেন খলিফা হারুণ-অল রসিদ। যার নাম অমর হয়ে আছে কাব্যে আর কাহিনীতে। এখান থেকেই পশ্চিমে চলে গিয়েছিল দুটি বিখ্যাত পথ। একটি অটোমান সাম্রাজ্যে বিস্তৃত, আর অন্যটি ইউফ্রেটিস নদীর তীর হয়ে দামস্কাস পর্য্যন্ত। এইটিই ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম পথ। দামাস্কাস থেকে পথটি চলে গেছে জেরুজালেম ও কায়রোর দিকে। মাসে মাসে এনসেভ বা ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য পথটি ব্যবহার না হওয়ায় অন্য আর একটি পথের সৃষ্টি হয়। এই পথ চলে যায় প্রাচীন কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত। এখানেই জমা হত প্রাচ্যের বহু বহু বাণিজ্য সম্ভার! প্রাচীন রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় কনস্টান্টিনোপল। এখানে প্রস্তুত হত বিখ্যাত জরির আর বোনার কাজ।

বর্ত্তমানের মত সে যুগেও ছিল বাণিজ্যের প্রতি-দ্বন্দ্বিতা। প্রাচ্যের ব্যবসায়ের স্থান ছিল কনস্টান্টিনোপল আর প্রতীচ্যের ভেনিস। কালের সঙ্গে সঙ্গে ভেনিসের সুনাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কনস্টান্টিনোপলের সুনাম ব্যাহত হয়ে যায়। ফলে নষ্ট হয়ে যায় বিশ্বের একটি প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র।

বর্ত্তমান কালের মতই সে যুগের বাণিজ্যে ছিল জল-পথই প্রধান। কারণ পরিবহন খরচ এতে ছিল কম। যদিও বিপদ ছিল অসীম। খারাপ আবহাওয়া আর জলদস্যুর আক্রমণ ছিল সাধারণ ঘটনা। বন্দরে বন্দরে করের হার ছিল অত্যধিক। কায়রোর সুলতান এর ফলে বাৎসরিক চার কোটি টাকা কর আদায় করতেন। অন্যান্য জায়গাতেও ছিল বহু কর আদায়ের কেন্দ্র।

এইভাবেই মানুষ নতুনের আহ্বানে চিরকাল ছুটে চলেছে। তার চাহিদার ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছে বাণিজ্য আর পরিবহনের নতুন নতুন উপায় আর পথ। আবিষ্কৃত হয়েছে বাষ্পীয় পোত, মোটর আর বিমান। সহজ হয়েছে গন্তব্যস্থল। তবুও স্বীকার করতেই হবে প্রাচীন সে যুগেই শুরু হয় মানুষের জয়যাত্রা।

আমার মনে পড়ে

শ্রীপান্নালাল ধর এম-এ; আই-পি-এস্

প্রাতরাশে বসিয়াছি। স্ত্রীর প্রতি তাকাইয়া দেখিলাম মুখে যেন একটু বেশী হাসি। অকারণে একবার হাসিয়াও উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, না কিছু না। অকারণে চামচ দিয়া পেয়ালায় টুন্‌টুন্ আওয়াজ তুলিলেন। লক্ষ্য করিলাম, শাড়ীটি যেন আজ একটু বেশী পরিপাটি। চুড়ীগুলিও যেন একটু বেশী ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মস্তকের বামপার্শ্বে একটি পুষ্পগুচ্ছ গোঁজা আছে দেখিলাম। এবার চশমার ফাঁক দিয়া তীর্য্যগ্ দৃষ্টি হানিয়া দেখিলাম—খোঁপাটিও বেশ শক্ত করিয়া বাঁধা অর্থাৎ কাঁটাগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবার ভয় নাই। তদুপরি খোঁপাটিকে জড়াইয়া একটি শুভ্র যুঁই ফুলের মালা।

চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। খবরের কাগজে ইহার কারণ নিশ্চয় লেখা হইবে না। কাজেই উহা সরাইয়া রাখিলাম। ইত্যবসরে আমার ত্রয়োদশীয়া কন্যা দুইটি পুষ্পস্তবক দিয়া কহিল, "Dad and Mum, congratulation on your 15th marriage anniversary" দ্বিতীয়া কন্যা যোগ দিয়া কহিল, "And many happy returns."

চম্‌কিয়া কন্যাদ্বয়ের প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে ১৫ বৎসর পূর্ব্বের একটি দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া গেলাম।

খর সূর্য্য দিল্লীর বারখাম্বা রোড পুড়াইয়া দিতেছিল। মোটর সাইকেলে যাইতেছিলাম। হঠাৎ কল বিকল হইয়া গেল। দৈত্যটাকে টানিতে টানিতে রাস্তার পাশে দাঁড় করাইয়া কপালের ঘাম মুছিতেছিলাম। এমন সময় শুদ্ধ হিন্দীতে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন শুনিলাম, "ক্যা, ম'য় কুছ্ মদৎ কর্ সেকতী?" জনমানবশূন্য রাস্তায় নারীকণ্ঠ শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। প্রশ্ন কর্ত্রীকে দেখিলাম শালোয়ার কামিজ পরিহিতা অষ্টাদশী তরুণী, দক্ষিণ হস্তে পুস্তক দিয়া রৌদ্রতাপ এড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। ভঙ্গীমাটি ভাল লাগিয়াছিল। নিজেকে সামলাইয়া সাইকেলটিকে দেখাইয়া কহিলাম। "জী, আগর মেহের-বানিসে দোচার মিনিট ইস্‌কো দেখ্‌ভাল্ করে তো এক মিস্ত্রী বুলালুঁ।" মিস্ত্রী আনিয়া দেখিলাম শ্রীমতীজী বিকল সাইকেলটি সম্পূর্ণ দখল করিয়া উহার pilion seat অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আজ মনে পড়িতেই হাসিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু।

১৫ সেকেণ্ড, ১৫ মিনিট, ১৫ দিন, ১৫ মাস, ১৫ বৎসর। মহাকালের বড় ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া চলিয়াছে। সে ঘড়িতে দম লাগে না। সে ঘড়ি কোন দিন বিগড়ায় না। হিমের রাতে পাতাঝরার শব্দে কাহারও ঘুম ভাঙ্গে না। পাতা দেখা যায় প্রত্যুষে, মালী যখন পাতাগুলি জড় করিতে আসে। জীবনবৃক্ষ হইতে কত পাতা রাতের পর রাত ঝরিয়া পড়িল, ঘুম কিন্তু ভাঙ্গে নাই। আজ কন্যা দুইটি যেন ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। ফুল-গুলি লইয়া কন্যা দুইটির শিরশ্চুম্বন করিয়া স্ত্রীর প্রতি তাকাইলাম। দেখিলাম উহার চক্ষু দুইটি চিক্ চিক্ করিতেছে।

চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলাম। হৃদয় কিন্তু উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। স্মৃতি-সরযূতে আজ মন্থন শুরু হইয়াছে। আজ যেন উহা উজান বহিয়া চলিয়াছে। কত বৃক্ষ, কত তীর্থ, কত দৃশ্য উহার দুইকূলে। ইহাকে স্পর্শ করিয়া, উহাকে শিরশ্চুম্বন করিয়া, কোথাও বা একটু থামিয়া কুলুকুলু কলগুঞ্জন তুলিয়া পুনরায় ছুটিয়া চলিয়াছে। বিস্মৃতির শুষ্ক বালুরাশি আজ আর উহাকে ধরিয়া রাখিতে

পারিতেছে না। দিল্লী, আগ্রা, ব্যাঙ্গালোর, পুণা, বোম্বে, পেশোয়ার, করাচী, কোহাট্, রাজমক্, পরাচীনর, আম্বালা, ইম্ফল, আরও কত জায়গা। নানা জায়গার চিত্রবিচিত্র যে মণিকোঠার অন্দর-মহলে আঁকা হইয়া রহিয়াছে আজ তাহা দেখিতেছি।

আম্বালায় আসিলেন অমলা। ভুরু ও গুম্ফের ঈষৎ সংকোচন ও বিস্তারে যে বিদ্রূপের সৃষ্টি হয় তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। লাহোরে আসিলেন মৃদুলা। অপূর্ব রূপসম্ভারে ডালি সাজাইয়া পাইপের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অনিশ্চিতের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি বিদায় লইলেন। পুণায় আসিলেন নৃত্যপরা চটুলা লাস্যময়ী ললিতা। মদিরার উচ্ছল ফেনরাশির সহিত তিনিও মিলাইয়া গেলেন। যৌবনের দ্বিপ্রহরগুলি এই-ভাবে আগুনের হলকা ছড়াইতে ছড়াইতে কাটিতেছিল।

একটি রাতের কথা আজ বেশ মনে পড়ে। পশ্চিমের এক ফৌজী ক্লাবে মহিলাটিকে দেখেছিলাম। যৌবনে শরীর সমুদ্রে যে তরঙ্গ দুইটি উঠিয়াছিল তাহা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অনর্গল কথা বলিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটি নাড়িতেছেন যেন ভারতনাট্যমের নানা প্রকারের মুদ্রা দেখাইতেছেন। মুখে যদিবা "এতটুকু" বলেন, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ একত্রিত করিয়া তাহা আবার বুঝাইয়া দেন। শাড়ীপরিহিতা হইলেও দৃশ্যভাবে একটি পা অন্য একটি পায়ের উপর রাখিতেছেন। পরে হস্তদ্বয় জানুদেশে চাপ দিয়া মুখখানি সম্মুখে আগাইয়া কথাগুলির উপর emphasis বা জোর দিতেছেন। মাঝে মাঝে চক্ষুর উপর চক্ষু রাখিয়া হঠাৎ হাসিয়া নিশ্চুপ বসিয়া থাকিতেছেন। তখন মনে হইত চক্ষু দুইটি এক কালে কথা কহিতে পারিত।

'ডান্সে'র সময় মহিলাটি যখন চোখের উপর চোখ রাখিতেন, অধরে তখন হাসি থাকিত মৃদু, ওষ্ঠ হইত ঈষৎ স্ফুরিত। শরীর তিনি সম্মুখে মেলিয়া ধরিতেন।

একদিন শেষরাতে নাচের শেষে তিনি বলিলেন, আমাকে বাড়ী রেখে আসবে নটি বয় ?

কেন জানিনা রাজি হইয়া গেলাম। বাড়ী পৌছিলে তিনি আমাকে ভিতরে ডাকিয়া বসাইলেন। Drink দিয়া ভিতরে গেলেন, "এখুনি আস্‌ছি বলে।"

গেলাসে মুখ লাগাইয়া এলোমেলো কথা ভাবিতে-ছিলাম। মধ্যরাত্রে একটি সুন্দরী মহিলাকে বাড়ী পৌছাইবার সময় যেসব দৈত্যদানব মনের আস্তাকুঁড়ে দাপাদাপি করিয়া বেড়ায় তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিবার বয়স আমার তখন হইয়াছে।

পশ্চাতে খুট করিয়া শব্দ হওয়াতে তাকাইয়া দেখিলাম, দেখিলাম, বাহিরে বারান্দায় অস্পষ্ট আলোকে একটি তরুণী দাঁড়াইয়া, হাতে আমার টুপী ও গরম ওভারকোট। বাহিরে আসিলে তরুণী কহিলেন, "যার সঙ্গে এসেছেন তিনি আমার মা। এই আপনার কোট, এই আপনার টুপী, ঐ সামনে গেট", বলিয়া অঙ্গুলী সংকেতে গেট দেখাইয়া দিলেন। অস্পষ্ট আলোকে তাহার চক্ষু দুইটি হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলিতেছিল। আজিও যেন দেখিতে পাই।

* * *

কত কথাই না মনে পড়ে। মনে পড়ে নতুনদিকে।

নতুনদি।

সেই নতুনদি, শৈশবে যাহার কথা শুনিয়াছি।

কৈশোরে যাঁহাকে দেখিয়াছি বকুল তলায়।

যৌবনে তাঁহাকেই দেখিলাম আমার গৃহপ্রাঙ্গণে। সেদিনের কথা বুঝি কোনদিনই ভুলিব না।

বর্ষা নামিয়াছে। বাংলার বর্ষা। জলভারে আকাশটা সেদিন অনেকখানি নীচে নামিয়া আসিয়া অশ্বত্থ ও তাল গাছ দুইটির মাথা প্রায় ছুঁইয়া ফেলিয়াছে। উহাদের ফাক দিয়া দূরে নারিকেল গাছটার মাথাটাত' প্রায় দেখাই যাইতেছে না। অজস্র জলধারা নামিয়াছে, তালগাছ বাহিয়া, বটগাছ বাহিয়া, কলাগাছের পাতা বাহিয়া। আকাশ নিঃশেষে নিজেকে ঢালিয়া দিয়া যেন বলিতেছে—'শান্ত হও, শান্ত হও, শান্ত হও। আমার জলে যদি তোমার মুখে হাসি ফোটে তবে তাই নাও, তাই নাও, তাই নাও।'

ক্রন্দসী বসুন্ধরার হতাশ্বাস বারিধারায় বুঝিবা ধুইয়া যাইবে। আকাশের নৈকট্যে দুঃখ, ক্লেশ, জ্বালা বুঝিবা আর থাকিবে না। সব কিছু ধুইয়া যাইবে, ক্লেদ যাইবে, ক্লান্তি যাইবে, মালিন্য যাইবে।

পূবের জানালা দিয়া বারিধারা দেখিতেছিলাম।

বুঝিবা একসময় তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। চমক ভাঙ্গিল বাহির বারান্দায় যখন কে গাহিয়া উঠিল—

ভালই যদি বাসবি ভবে
ভালবাসার লোক খুঁজে নে
(নইলে) ভাল'র ভাল পাবি না যে
আপন মনে মরবি কেঁদে।
দিন ফুরাবে সন্ধ্যা হবে
(ও তোর) কেউ যে কাছে রইবে নারে
শেষের দিনে কার কোলে তোর
ভবের বোঝা হালকা হবে।

বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুষড়াইয়া উঠিল। ছুটিয়া বাহিরে অসিলাম, দেখিলাম নতুনদি।

স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি,
হাতে একতারা।

রুদ্ধশ্বাসে ডাকিলাম, "নতুনদি তুমি?"

নতুনদির গান থামিয়া গেল।

তিনিও কম বিস্মিত হন নাই। ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিলেন। কাছে আসিয়া আমার দিকে তাকাইয়াই হাসিয়া ফেলিলেন।

কহিলেন "আরে, ভাইটি যে। আজ ত' নাড়ু নেই ভাই, কি দেব তোমায়?"

নতুনদির হাতদুটি ধরিয়া কহিলাম, "তুমি এসেছ এই আমার সৌভাগ্য। আর যখন এসেছ তখন তোমার হাতের নাড়ুও জুটবে নিশ্চয়।"

নতুনদিকে লইয়া ভিতরে আসিলাম। একবার ভাল করিয়া তাহাকে দেখিলাম। নদীতে অস্তরাগ পড়িলে স্রোতধারা যখন চিক্‌মিক্ করিতে থাকে তখন কেহ যদি প্রশ্ন করেন, সৌন্দর্যটি কাহার? অস্তরাগের না স্রোত-ধারার? তখন কোন সদুত্তর আশা করা যায় না। কিন্তু সমস্ত মিলিয়া যে একটি বিরাট শাস্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় তাহা অনুভব করিতে মোটেই কষ্ট হয় না। তেমনি জীবন স্রোতে যখন যৌবনের অস্তরাগ পড়িপড়ি করে তখন এমনি দুর্লভ ঝিলিমিলি সৌন্দর্য্যের দেখা মেলে।

মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "তুমি কিন্তু তেমনি সুন্দর আছ নতুনদি।"

নতুনদি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসি আর থামিতে চায় না। চোখ দুটিতেও বিদ্যুত খেলিয়া গেল। কিন্তু সে বিদ্যুতে জ্বালা ছিল না। মাত্র চিক্‌মিক্ করিয়াই মিলাইয়া গেল। হাসি থামিলে কেবল কহিলেন, "সত্যি?"

মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, "হ্যাঁ।"

ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। ভৃত্য বাতি দিয়া গেল। এবার নতুনদি আমাকে ভাল করিয়া দেখিলেন।

বলিলেন, "তুমি কিন্তু বেশ বড় হয়েছ ভাই।"

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাই বুঝি?

নতুনদি মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, "হাঁ।"

পরে খানিকক্ষণ মাটির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আমাকে কহিলেন, "আমাকে ত এবার যেতে হয় ভাই।"

"সে কি, কেন?" জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলাম।

কহিলেন, "এখানে থাকলে তোমার বদনাম হবে যে।"

এবার হাসিয়া ফেলিলাম। কহিলাম, "বদনাম অনেক হয়েছে নতুনদি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, নতুন করে কিছু হবে না।"

নতুনদি কহিলেন, "কিন্তু আমার যদি বদনাম হয় তবে?

কহিলাম, "যদুদাকে আনিয়ে নেব।"

যদুদার নাম শুনিয়া নতুনদি ভীষণ চমকাইয়া উঠিলেন। বাম হাতে অজান্তে ডান বুকটা চাপিয়া ধরিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তাঁকে ত আর পাবে না ভাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন পাব না? কি হয়েছে তাঁর?

নতুনদি বহুক্ষণ পাথরের মত নিশ্চল বসিয়া রহিলেন। পরে মৃদু স্বরে কহিলেন, "শিল্পী তিনি, সুন্দরের পূজারী। তোমার নতুনদির এমন কি আছে যে চিরকাল তাকে ধরে রাখতে পারবে?"

চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কহিলাম, "মিছে কথা নতুনদি, তুমি ত' তেমনি সুন্দর আছ।"

নতুনদি এবার হাসিতে চাহিলেন। কিন্তু চক্ষু দুটিতে জল আসিয়া হাসিতে বাধা দিল। বলিলেন, "দূর বোকা, ভাইয়ের কাছে নতুনদির সৌন্দর্য্য আর শিল্পীর কাছে নারীর সৌন্দর্য্য কি এক জিনিস রে।"

মাথা হেঁট হইয়া গেল। বুঝিলাম যদু বোষ্টম নতুনদিকে ছাড়িয়া গিয়াছে। মন কিন্তু একথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কেমন করে হ'ল নতুনদি ?"

নতুনদি বাহিরে অন্ধকারের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন, "ছুটির দিনে যে বকুল গাছ তলায় তুমি বসে থাকতে, একদিন দেখি তোমার যদুদা আর আন্নু বোষ্টমী সেখানে বসে আছেন! কাছে গিয়ে দেখি আন্নু বোষ্টমীর হাতদুটি তোমার যদুদার হাতে ধরা পড়েছে। এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখলাম, পরে বাড়ী ফিরে এলাম।"

নতুনদির চোখদুটি চিক্‌চিক্‌ করিয়া উঠিল। একটু থামিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ওদের বেশ মানিয়ে ছিল রে।"

দেখিলাম মুক্তার মত দু ফোঁটা জল চোখ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পর ?"

কহিলেন, "তার পর আবার কি ? বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম আমার রাখাল রাজ আছেন। আমার আবার ভাবনা কি ?"

নতুনদি থামিলেন।

বাতাসের ঝাপটায় বাতি হঠাৎ নিভিয়া গেল।

বাহিরে অজস্র বারিধারার শব্দ।

ভিতরে কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত্ত। হঠাৎ অন্ধকারে একতারা বাজিয়া উঠিল,—

একতারা তার একতারে নয়
দুই তারে সে যে বাঁধা
ও তোর একতারে গান নন্দদুলাল
অন্যতারে বাঁধা রাধা
ও তুই বাজাস যত বাজবে তত
শুধুই রাধা রাধা।

নতুনদি গাহিয়া চলিয়াছেন। কণ্ঠ হইতে স্বরতরঙ্গ একটির পর একটি বাহির হইয়া আসিতেছে। চম্পক অঙ্গুলী একতারার তারে স্বরজাল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

অতি সন্তর্পণে বাতি জালাইয়া দেখিলাম নতুনদির চক্ষু দুইটি হইতে অঝোরে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। মুছিয়া দিবার কেহ নাই। মুছিবারও তাড়া নাই। নিশ্চুপ বসিয়া রহিলাম। মন কিন্তু চলিয়া গেল ফেলিয়া আসা দিনগুলির প্রতি।

ক্ষুদ্র একটি শহর। তাহারই এককোণে ক্ষুদ্রতর একটি বাড়ী। মহাড়ম্বরে লেখাপড়া মাত্র আরম্ভ করিয়াছি। বহির্জগতে বহির্জগৎ—মনোরাজ্যে মাত্র তুলি বুলান আরম্ভ করিয়াছে। আমার মনোরাজ্যে যাহারা তুলি বুলাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যদুবোষ্টম ছিলেন অন্যতম। পাড়ার দুইমাইল দূরে যেখানে ডাকাতে জঙ্গল শুরু হইয়াছে তাহারই এককোণে যদুবোষ্টম কুঁড়ে তুলিয়া নীড় বাঁধিয়াছিলেন। কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, কি বর্ষায়, ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতেই যদুবোষ্টম নামকীর্ত্তন করিয়া পাড়া পরিক্রমা করিতেন। দূর হইতে যেমন তিনি নিকটতর হইতেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরও তেমনি অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হইত। আমিও নিদ্রা হইতে তন্দ্রায় ও তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিতাম। গলায় তুলসীর মালা, হাতে খঞ্জনী সদাহাস্যময় শ্যামবর্ণ মানুষটি চোখের সামনে যেন ভাসিয়া উঠিত। অন্যদিকে নিদ্রার মধ্য দিয়া নামধ্বনি সলিতার মত পাতলা হইয়া হৃদয়ে ঢুকিয়া তোলপাড় শুরু করিয়া দিত। পাশে ছোট ভাইটি তখনও অকাতরে ঘুমাইত। কেবল মাতা ঠাকুরাণী উঠি উঠি করিতেন। পূবের জানালা দিয়া বেলগাছটি অস্পষ্ট দেখা যাইত। ওদিকে তাকাইতাম না, পাছে ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়া ফেলি। শীতের প্রত্যুষে দক্ষিণের শিউলী গাছতলাগুলি ঝরাফুলে ভরিয়া থাকিত। গ্রীষ্মে চাঁপা গাছটি অন্ধকার থাকিতেই সুগন্ধ ছড়াইত। বর্ষার বারিধারার টিপ্‌টিপ্‌ ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দ যদুদার নামগানের সহিত সমানে তাল রাখিয়া চলিত।

যদুদার কুটীরে কোনদিন যাই নাই। কারণ ভ্রাতাদের কঠিন নিষেধ ছিল। কিন্তু কুটিরটির বাহিরে প্রাঙ্গণের দক্ষিণে যে বকুল গাছটি ছিল ছুটির দিনে দ্বিপ্রহরে তাহার তলায় বসিয়া কাটাইতাম। একদিন বসিয়া বিশ্বের ভাবনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছি। হঠাৎ চাহিয়া দেখি একটি মহিলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। চমকিয়া উঠিতেই মহিলাটি হাতের রেকাব ও গেলাস মাটিতে রাখিয়া কহিলেন। কি ভাই ধ্যান ভাঙ্গল ? নাড়ু দুটি খেয়ে নাও, তারপর গল্প করা যাবে।

সেই নাড়ুর কথাই আজ নতুনদি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন। কি গল্প সেদিন করিয়াছিলাম তাহা আজ মনে নাই। তবে তাঁহার চক্ষু দুটিতে সেই মায়া, সেই যাদু দেখিয়াছিলাম—যাহা দেখিতাম আমাদের ধবলী গরুটির দুই চোখে। মায়ের কোলে দুরন্ত শিশু বুঝি বা ঐ চোখ দুটিতে চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে আপন চক্ষু মুদিয়া ফেলে।

যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "নতুনদি, তোমাদের বাড়ী যাওয়া আমাদের নিষেধ কেন ?"

তখন ঐ চোখ দুইটি হইতে দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চকিতে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন,"সব বাড়ীতেই কি সবার যেতে আছে ভাই ?

সেদিন বুঝি নাই যে নতুনদির চোখ দুইটিতে মেঘ ঘনঘটা করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মাত্র দুফোঁটা জলই তিনি ফেলিতে দিয়াছিলেন। বাকিটুকু একটুকরো রামধনুর হাসি হাসিয়া ঢাকিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। সেদিন হাসিটুকুই দেখিয়াছিলাম। হাসির পিছনে জল দেখিবার বয়স আমার তখনও হয় নাই। আজ বুঝিতে পারি সব হাসি কিন্তু হাসি নয়।

—সেই নতুনদি।

গান কখন থামিয়াছে জানি না। নতুনদির কণ্ঠস্বরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম। নতুনদি তখন কহিতেছিলেন, "ছিঃ ছিঃ লজ্জার কথা। ভাইটির কাছেও ধরা পড়ে গেলাম।"

কিছু পূর্বে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আবার অশ্রান্ত আবেগে বৃষ্টি শুরু হইল। একতারা নামাইয়া রাখিয়া নতুনদি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। বৃষ্টির ঝাপটায় ঘর ভাসিয়া যাইতেছিল। বাতির সলিতা একটু উসকাইয়া দিতেই ঘর আলোয় ভরিয়া গেল। সেই আলোয় নতুনদি'কে নূতন করিয়া দেখিলাম। কুন্তল বাঁধা গুচ্ছে গুচ্ছে কাণ দুটির পাশ দিয়া সামনে নামিয়া আসিয়াছে। তাহার মাঝে নতুনদির মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইতেছিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, আচ্ছা নতুনদি ; তুমি যদুদাকে সত্যি সত্যি ভুলতে পেরেছ ?

নতুনদি আবার চমকাইয়া স্থির হইয়া গেলেন। মনে হইল বুকের মধ্যে কি যেন খুঁজিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "কি জানি ভাই, বুঝি বা হেরে গেলাম। প্রেমই বল, আসলে কিন্তু নিষ্প্রাণ পায়ে ফুল দিয়ে তৃপ্তি হয় না। মন চায় রক্তমাংসের দুটি পা।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তাই বুঝি ঠাকুর আসেন বারবার মানুষের রূপ ধরে।

বাহিরে বারিধারা অশ্রান্ত আবেগে পড়িতেছিল। যখন থামিল, নতুনদি তখন চলিয়া গিয়াছেন।

কলকাতা—জানুয়ারী'৬৪

অমিতাভ বসু

পাঁচটায় নীরবতা মানুষেরা আবদ্ধ খোঁয়াড়ে
শীতের সন্ধ্যাটা যেন মৃতের মতন,
চাপ চাপ ধোঁয়া আর কুয়াশায় ঘিরে
শহরের বুকে যেন ধরেছে পচন।
কার্ফু, মিলিটারী বুটে বেয়নেটে
শহরের বুকটাই গেছে যেন ফেটে,

কৈ ভাবে আজ আর মানুষের মন।
ফুলের কেয়ারী আর ধুপের স্বভাব
কাঁসর ঘণ্টা আর মসজিদে নামাজ
সব ভুলে মানুষের মনে দেখি আজ
হিংসার সে কি এক মত্ত প্রকাশ।
তবু জানি একদিন এর হবে শেষ

সেকালের বেলগাছিয়া ভিলা

সঞ্জীবকুমার বসু

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা থেকে সোজা পূব দিকে যে রাস্তা চলে গেল দমদমের দিকে, সেই পথে খানিকটা গেলেই ডান দিকে দেখতে পাওয়া যাবে বিরাট বাগান-বাড়ী সহ এই 'বেলগাছিয়া ভিলা'কে। সেকালে এই পথ দিয়ে বহু গণ্যমান্য লোক যাতায়াত করতেন, ধরতে গেলে তাঁদের মধ্যে সবাই এই ভিলাতে একবার না এসে থাকতে পারতেন না। বহু মনীষীর পায়ের ধূলো পড়েছে এই বাড়ীতে। বহু ঘটনা জড়িয়ে আছে এখানকার মাটিতে। বাঙ্গালী যতদিন বেঁচে থাকবে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ততদিন বেলগাছিয়া ভিলার নাম লেখা থাকবে। শত বছর আগে এখান থেকেই শুরু হয়েছিল বাংলা নাট্যশালার আন্দোলন। বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেছে সেই সব দিনের কথা। কিন্তু ইতিহাস তো অস্বীকার করা যায় না, সে যে যুগ যুগ ধরে কথা বলে যাবে—আর সেই কথাই পরবর্তী যুগের লোকদের শুনতে হবে।

সেক্সপীয়ার বলেছেন—এ জগৎটাই রঙ্গমঞ্চ, আর প্রত্যেক মানুষই এই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা। এই সংসার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য কোন কোন অভিনেতা এমন রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন যে, শত বছর পরেও মানুষ তাকে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে, স্মরণ করে সেই সব অভিনেতাকে—যাঁদের বৈশিষ্ট্যের কথা ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকে। বেলগাছিয়া ভিলা এই রকম একটা ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চ।

যে দিন এবাড়ীতে প্রথম এলাম—সেদিন মনের মাঝে ভেসে উঠল সেই সব দিনের কথা। সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে ফিরে দেখলাম, আর মনে হতে লাগল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নাটুকে রামনারায়ণ, প্যারীচরণ মিত্র, মহারাজা বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ও রাজা সৌরেন্দ্র-মোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনমোহন বসু এবং গৃহস্বামী প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের কথা। আরও মনে পড়ে গেল অষ্টম এডওয়ার্ড, যুবরাজ ও যুবরাণী প্রভৃতি রাজপুরুষদের এই বাড়ীতে আসা-যাওয়া ও সম্বর্দ্ধনার কথা।

১৮৫৭ সালের ১লা জুলাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ দুশো বিঘা বাগান বাড়ী সহ এই 'বেলগাছিয়া ভিলা' কিনে নেন। এই বাড়ীর পূর্ব্ব নাম ছিল 'অকল্যাণ্ড ভিলা।' তখন এর মালিক ছিলেন ওয়ারেন্ হেষ্টিংস। কোম্পানীর আমল থেকেই এই বাড়ীর ইতিহাসের সূত্রপাত। প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র দুই ভাই ছিলেন কান্দি ও পাইকপাড়া রাজকুলের বংশধর। এঁদের ডাক নাম ছিল হরিমোহন ও রামমোহন। নবাবী আমলের পর থেকেই এই রাজবংশের পত্তন হয় এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমল হতে কান্দি ও পাইকপাড়া রাজবংশ ধন-সম্পদে ফেঁপে উঠে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন খাঁটি হিন্দু। নিজের জন্মভূমি কান্দিতে তিনি 'শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ জিউ' বিগ্রহের সেবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন এবং আজও সেই বিগ্রহ কান্দিতে প্রতিষ্ঠিত আছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃভক্তি ছিল প্রবল। মায়ের শ্রাদ্ধে তিনি হাজার হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করেন। ধনী দীন সবাই এই উপলক্ষে তাঁর বাড়ীতে সমবেত হন। তখন সমস্ত দেশেই একটা বিরাট হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল যে, গঙ্গাগোবিন্দের মায়ের শ্রাদ্ধ। এই উপলক্ষে তিনি ২০ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করেন। তাছাড়া ঘোড়ার ডাক বসিয়ে সুদূর পুরী থেকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ এনে তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁর পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে সোনার পাত্রে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়ে সে যুগে কান্দী ও পাইকপাড়া রাজবংশের গৌরব বাড়িয়েছিলেন। আর সেই পৌত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ একদিন হঠাৎ রজক

কন্যার 'বেলা যে যায়' ধ্বনি শুনে রাজবংশের বিপুল বৈভব, মান-সম্ভ্রম, প্রিয়তমা পত্নী কাত্যায়নী দাসী ও শিশুপুত্র কুমার শ্রীনারায়ণ সিংহের আকর্ষণ মৃৎপাত্রের মত দুই পায়ে ঠেলে রাধা কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে চলে যান এবং 'লালাবাবু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লালাবাবু বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জিউ, শ্রীমতী রাধা ও ললিতা সখী পরিবেষ্টিত মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে রোজ অতিথি সেবার ব্যবস্থা করা হয়। লালাবাবু প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর কুঞ্জে অতিথি সেবার ব্যবস্থা থাকলেও তিনি দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত কুঞ্জের অন্ন-গ্রহণ করিতেন না। বৈরাগীর বেশে নিত্য নূতন শুধু মাত্র একটি দ্বারে "মাধুকরী" করে ভিক্ষার অন্নে জীবনধারণ করতেন এবং সেই অন্নই লালাবাবুর অন্ননামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে দিন তিনি ভিক্ষা পেতেন না সে দিন উপবাসী থাকতেন।

লালাবাবুর জীবনের আরও একটি ঘটনা শুনা যায়। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে পিতার সঙ্গে তাঁর একবার মনোমালিন্য হয়, তখন লালাবাবু শোভাবাজার রাজবাড়ীতে চলে আসেন এবং কিছুদিন সেখানে থাকার পর তিনি পুরীতে গিয়ে পুরীর রাজার অধীনে চাকরী নেন। কয়েক বছর পর লালাবাবু পুরীর রাজার সমস্ত সম্পত্তি কিনে নেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন লালাবাবু পিতার মৃত্যু সংবাদ পান, তখন রাজাকে সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বৃন্দাবনে চলে যান। পিতার মৃত্যু খবর শুনে তিনি আরো ব্যাকুল হন। জীবনের প্রাচুর্য্য লালাবাবুকে দিতে পারেনি শান্তি, তাই গৃহ ছেড়ে গৃহের বাইরে একান্ত নির্জনে ভগবৎপ্রেমে মত্ত হয়ে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন।

দিল্লীতে তখন বাহাদুর শা'য়ের রাজত্ব। লালাবাবু বৃন্দাবনে এসে শুনতে পান কিছুলোক বাহাদুর শা'কে গিয়ে নালিশ করেছেন যে, লালাবাবু দেশদ্রোহিতার কাজ করেছেন। এই অভিযোগে বাহাদুর শা তাঁকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। বৃন্দাবনে এসে বাহাদুর শা'র লোকেরা যখন লালাবাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান, সেই সময় তাঁর সঙ্গে প্রায় ২৫ হাজার ভক্ত দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। লালাবাবুর সঙ্গে এত লোক এসেছে শুনে তো বাহাদুর শা অবাক হলেন। তিনি বললেন—যে লোকের পিছনে এত জনসমর্থন থাকতে পারে তিনি তো দেশদ্রোহী হতে পারেন না। বাহাদুর শা'র নির্দ্দেশে যথাসময়ে লালাবাবুকে দরবারে উপস্থিত করা হল। তাঁর সৌম্য মূর্ত্তি দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। বাদশা বিনীত ভাবে লালাবাবুকে বললেন—আপনি আমার শত্রু নন—বন্ধু। কাজেই আমি আপনাকে কি পুরস্কার দিতে পারি? লালাবাবু তখন বললেন—আমি তো বৈরাগী মানুষ আমার কিছু দরকার নেই। কিন্তু বাহাদুর শা সে কথা শুনলেন না, তিনি কোমর থেকে তরবারী খুলে লালাবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এটাই আপনাকে পুরস্কার দিলাম। অগত্যা সেই নিয়েই লালাবাবু বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। ইতিহাসের পাতায় লালাবাবুর মত ত্যাগী পুরুষ কম দেখা যায়। 'ভক্তমাল' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুর ধর্ম্মগুরু ছিলেন। যৌবনে যে লালাবাবু সংসারের আকর্ষণ কাটিয়ে বৈরাগীর বেশ ধারণ করেছিলেন, জীবন সায়াহ্নে এই রাজ বৈরাগী তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির ও সেবাকুঞ্জের আকর্ষণ কাটিয়ে গোবর্দ্ধন গিরির নিভৃত গুহায় আত্মানুসন্ধানের সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। কলকাতায় জগন্নাথের ঘাট ও মন্দির আজও লালাবাবুর ধর্ম্মপরায়ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লালাবাবুর এক-মাত্র পুত্র তাঁর তিন পত্নীকে অপুত্রক রেখে মারা যান। তখন তাঁরা লালাবাবুর স্ত্রী কাত্যায়নী দাসীর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বেলগাছিয়া ভিলার আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবে কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ে, সেইজন্য লালাবাবুর প্রসঙ্গ এখানে একটু আলোচনা করে নিলাম। এবার গত শতকের বেলগাছিয়া ভিলার অবদানের কথা আলোচনা করব।

উনিশ শতকে বাংলা দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষ করে নাট্যশালার ইতিহাসে রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রাজ-পরিবার হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে 'বেলগাছিয়া ভিলা'তে যে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তখনকার দিনে

অনেক গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকের মতে এর মত সুন্দর নাট্যশালা ও উচ্চাঙ্গের অভিনয় ইতিপূর্ব্বে আর হয় নি। এই ব্যাপারে সে যুগের বহু ইংরেজীশিক্ষিত ও নবীন বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরাও জড়িত ছিলেন। এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের পর কলকাতার অভিজাত মহলে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা ও গীতিবাদ্য এমনই সুন্দর যে এর আগে আর কোথাও দেখা যায় নি। গৌরদাস বসাক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয় ও কাহিনী সকলের পরিচিত। তাঁর বিবরণ হতে বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই প্রথমে দেশীয় ঐক্যতানবাদনের প্রবর্ত্তন হয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল এই ঐক্যতানের দল গঠন করেন। বেলগাছিয়ার নাট্যশালার সাজসজ্জা ও ষ্টেজ প্রভৃতির জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। নাট্যশালার পরিচালনার ব্যাপারে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী ছিলেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর প্রতিভা এমন জীবন্ত বাস্তবরূপ অধিকার করেছিল যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের 'গ্যারিক' আখ্যায় অভিহিত হন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রও একটি চরিত্রে অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে কলকাতার বহু দেশী ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন। একবার সপরিবারে বাংলার লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেশববাবুর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখেন। রত্নাবলী নাটক ছয়-সাতবার বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়, পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়ে এই নাটকটি ইংরেজী অনুবাদ করান হয়। এর জন্য রাজারা মাইকেলকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেন। রত্নাবলী নাটকটি অভিনীত হয় ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই শনিবার। এর লেখক ছিলেন রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

এর পর আমরা মাইকেল মধুসূদনকে দেখতে পাই এই নাট্যশালাতে। রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দেখে তাঁর নাটক লেখার ইচ্ছা মনে জাগে। ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে মাইকেল 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকটি এখানে অভিনীত করেন। প্রকৃতপক্ষে মাইকেল মধুসূদনের নাটক সর্ব্বপ্রথম এই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হবার পর এই রাজপরিবার মধুসূদনকে বাংলায় নাটক লেখার জন্য বহু অর্থ ও উৎসাহ প্রদান করেন। একথা সত্য যে মাইকেল যদি এই রাজপরিবারের সাহায্য ও সান্নিধ্য না পেতেন তবে তাঁকে হয়ত আমরা আজ অন্য ভাবে দেখতে পেতাম। মধুসূদন যখন মাদ্রাজ থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় পুলিশকোর্টে অনুবাদকের চাকরীতে প্রবেশ করেন, সেই সময় কেউ তাঁকে চিনত না, গৌরদাস বসাক তখন এই রাজপরিবারের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় করিয়ে দেন। যে স্থানে মাইকেলের নাটকটি অভিনীত হয়েছিল সে জায়গাটা আজও আছে। এই রাজপরিবারের সংস্পর্শে আসার পর থেকে মাইকেল নিজের দিকে ফিরে তাকান এবং বুঝতে পারেন এইখানেই তাঁর বিকাশের পথ। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের দানের কথা স্বীকার করে মাইকেল বলেছেন—"যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুভ্যুত্থান হয়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুইজন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না—ইহারাই আমাদের উদীয়মান নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই পরিবারের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁরা বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরকে বিশেষ সাহায্য করেন। এই রাজবাড়ীতেই 'হুডসন' সাহেব বিদ্যাসাগর ও তাঁর মা ভগবতী দেবীর প্রথম ছবি আঁকেন।

১৮৭৫ সালে যখন অষ্টম এডওয়ার্ড, যুবরাজ ও যুবরাণী-রূপে বাংলাদেশে আসেন, তখন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এই বেলগাছিয়া ভিলায় সম্বর্দ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে অষ্টম এডওয়ার্ড যুবরাজ ও যুবরাণী এই বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করেন। অষ্টম এডওয়ার্ডের ব্যবহৃত ঘর ও শয্যা আজও অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত আছে। বেলগাছিয়া ভিলাতে এসে এই রাজ-বংশের আর দুইজন খ্যাতিমান পুরুষের নাম না করলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এঁদের একজন হলেন রাজা প্রতাপচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ

আর একজন হলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। কুমার শরৎচন্দ্র ছিলেন স্থাপত্যবিদ্যাবিশারদ, ফটোগ্রাফার ও চিত্রকলার উপাসক। কান্দি রাজপ্রাসাদ, কাশীপুরের দেবালয় ও ঐতিহাসিক বেলগাছিয়া ভিলা তাঁর স্থাপত্য বিদ্যার ও সৌন্দর্য্য বোধের পরিচয় বহন করছে। অধ্যাপক আস্কার ব্রাউনিং তাঁর 'টুর অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে 'বেলগাছিয়া ভিলা' ও তার পিকচার গ্যালারীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই গ্যালারীতে বিশ্ববিখ্যাত র‍্যাফেল, গুডরিনি, টিসেন, ডেনসিটার, কনষ্টোপন প্রভৃতি খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীদের ছবি আজও সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে। কুমার শরৎচন্দ্র কেবল ললিত-কলার উপাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও সামাজিক কাজে ছিলেন অগ্রণী। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সভা তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বর্দ্ধমান মানহানির মামলায় 'ইংলিস ম্যান' সংবাদপত্র অধুনা 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সংবাদপত্রের তৎকালীন মালিক ও সম্পাদক রবার্ট নাইট যখন বিপন্ন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে বিপদ্‌মুক্ত করেন। ওরিয়েণ্টাল বীমা কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা যখন শোচনীয় তখন তাঁরা ইন্দ্রচন্দ্রের শরণাপন্ন হন, তখনও ইন্দ্রচন্দ্র তাদের প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। সেই সময় যদি এই দুই প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য না পেতেন, তবে হয়ত তাদের অস্তিত্ব বিলুপ হবার সম্ভাবনা ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীর দরবারে কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও শরৎচন্দ্র সিংহ নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন এবং দরবারে মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর ইংরাজ সেবক হিসাবে 'কাইজার হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত হন। এই বাড়ীর আরও একটি ইতিহাস আছে তা হয়ত অনেকে জানেন না—১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বাই শহরে, কিন্তু সেই অধিবেশন সম্পর্কে প্রাথমিক প্রস্তুতি সভা বসে এই 'বেলগাছিয়া ভিলা'তে।

সেকালের এই 'বেলগাছিয়া ভিলা'তে বহুপ্রকার স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে তার জন্য একালের 'বেলগাছিয়া ভিলা'র বংশধরেরা গৌরব বোধ করেন। কলকাতার ইতিহাসের পাতায় বেলগাছিয়া ভিলা'র নাম চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। শতবছর পরেও যেন একথা সগর্বে ঘোষণা করছে।

প্রবাসী ছেলের চিঠি

শ্রীসুশীলকুমার সেনগুপ্ত

জানিস মা তুই চুপটি ক'রে ভাবিস্ যখন ব'সে—
একলা আমি কেমন আছি এই অচেনা দেশে।
ঠিক তখনই তোরই কাছে
আমার এ মন লুকিয়ে আছে,
কোলের 'পরে শুয়ে শুয়ে
মুখের দিকে দেখছে চেয়ে
হাসছে কত জড়িয়ে তোকে, নিচ্ছে খেয়ে চুমো,
ভাবছে : বুঝি ব'লবি এবার—'খোকন-সোনা ঘুমো"

সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে হাতে আঁচল দিয়ে গলে
প্রণাম করিস ঠেকিয়ে মাথা যখন তুলসী তলে
সারা আকাশ তারায় তারায়
চেয়ে থাকে আলোক মালায়
তখন তাদের পানে চেয়ে
দেখিস মাগো অবাক হ'য়ে
আঁধার-আকাশ-তারার চোখে আমার দিঠি ভাসে?
আমার কথা মা তোর কাছে বাতাস বেয়ে আসে!

পাষাণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে মা তুই ভাবিস যবে,
তোরই চোখের খোকন-মণি ফিরবে আবার কবে?
নাড়িয়ে দিয়ে তুলসী পাতা
বলি তখন আমার কথা
আঁধার বুকে লুকিয়ে থেকে
মুচকি হেসে তোমায় ডেকে—
'বল্ না মাগো বাড়ীর মত—খোকন সোনা ঘুমো;
দিয়ে আমার রাঙা ঠোঁটে মিষ্টি দুটো চুমো!'

"মালিনী"-র নাট্যদ্বন্দ্ব

অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য "মালিনী"র তত্ত্ব কথা এবং ভাবমূল্য সম্পর্কে অনেক সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু "মালিনী" নাটকের গঠন সম্পর্কে আলোচনা বিরল। প্রথমতঃ তার কারণ হয়তো এই যে "প্রকৃতির পরিশোধ" থেকে "মালিনী" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে কখানা কাব্যনাট্য লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি ভাবমূল্য বা তত্ত্ব কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে—তা হোল এক কথায় প্রথা এবং হৃদয় ধর্মের দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়তঃ "মালিনী" একাংক নাটক বলেও হয়তো গঠন সম্পর্কে সমালোচকের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। কাব্যনাট্য মালিনীর গঠন সম্পর্কে বিচারের স্বল্পতা যে কারণেই ঘটে থাক্, অনুরূপ প্রচেষ্টা আমাদের কৌতূহলোদ্দীপক ফলাফলের সম্মুখীন করে।

কোন নাটকের গঠন বিচার প্রসংগে প্রথমেই মূল নাট্যদ্বন্দ্বটি খুঁজে বের করার দিকে সমালোচকের ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক এবং দ্বন্দ্বের পর্যায়গুলি অনুসরণ করে নাটকের একটি গর্ভসন্ধি বা 'Climax' খুঁজে বের করবার চেষ্টাও তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত। আশ্চর্যের বিষয় 'মালিনী'র সমালোচক এই বিষয়ে বিভ্রান্ত হন। "মালিনী" নাটকের ভূমিকায় "ট্রেভেনিয়ানে'র গ্রীক নাট্যকলা-সম্পর্কিত মন্তব্যের উপরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"সেক্স্‌পীয়ারের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ।" "মালিনী" একাংশ নাটক বলে মূল দ্বন্দ্বের বিভিন্ন পর্যায়গুলির খুঁটিনাটির হিসেব এড়িয়ে গেলেও নাটক যখন তখন একটি মূল দ্বন্দ্ব নাটকে আদ্যন্ত বিরাজ করবে—অন্ততঃ উপরের অভিমতের আলোকেও এটুকু প্রত্যাশা সমালোচকের পক্ষে খুবই সংগত। তথাচ "মালিনী"তে কোন পূর্ণবিকশিত মূল নাট্যদ্বন্দ্ব নেই। একথা বলবার আগে অবশ্য আমাদের দেখে নিতে হবে "মালিনী"র প্রচলিত সমালোচনায় মূল নাট্যদ্বন্দ্ব সম্পর্কে কোন্ কথা বলা হয়েছে।

"বিসর্জন" নাটক "মালিনী"র পূর্বে রচিত হওয়ায় এবং "বিসর্জন" নাটকে প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্মণ রঘুপতি এবং রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বলে—এবং সম্ভবতঃ "মালিনীতেও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য এবং নবধর্মলব্ধ রাজকন্যা গোড়ার দিকে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছে বলে, "মালিনী', নাটকের মূল দ্বন্দ্ব বিসর্জনের অনুরূপ সাধারণতঃ এই রকম কথা মনে করা হয়। একজন সমালোচক লিখেছেন:—"দুটি নাটকেই চিরাচরিত সনাতন প্রথা ও ধর্মের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া নাট্যবস্তুকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।... ..."মালিনীতেও" দেখি সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে মানবধর্ম বিশ্বধর্মের প্রতীক একটি ধর্মকে দাঁড় করাইয়া দু'য়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে।১ এই সমালোচক আরও বলেছেন—"মালিনীর স্বল্পভাষণের পরিমিতি ও সংযম, আখ্যান বস্তুর সংগতি ও সংহতি "বিসর্জনে" আমরা আশাই করিতে পারি না।২ শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও "মালিনী" নাটকে আপধর্মের বিরুদ্ধে হৃদয়ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলেই মনে করেন।৩ সাধারণতঃ এই কথাই সর্বাধিক সমর্থিত।

আমাদের বক্তব্য এই যে, "মালিনী" নাটকে "দুয়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে", কিন্তু দ্বন্দ্বের কোন সমাপ্তি দেখান হয়নি। তজ্জন্য প্রথা ও সত্যের দ্বন্দ্বকে "মালিনী" নাটকের মূল দ্বন্দ্ব বলে মেনে নেওয়া যায় না। নাটকটি সেই দ্বন্দ্বের দ্বারাই বিধৃত একথাও বলা চলে না। নাটকে, সচরাচর, লেখক দুটি সত্যের দ্বন্দ্ব দেখান একটিকে জয়যুক্ত করবেন বলে। অন্ততঃ যে

১ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

২ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা-ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়,

৩ ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস

নাটকে প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব দেখান লেখকের উদ্দেশ্য সেখানে আদর্শবাদী লেখক একটি সত্যের জয় দেখানর জন্যই নাটক লিখে থাকেন। "বিসর্জনে" রবীন্দ্রনাথ যেমন করেছেন—শুধু তাই নয়, এইরূপ স্থলে লেখক আদর্শের জন্য চরিত্রকে খর্বও করে থাকেন। "বিসর্জনে" রঘুপতির চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ যেমন করছেন, "মালিনী"তে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার বরং বিপরীতই করেছেন। বিপক্ষ ক্ষেমঙ্করকেই তিনি সর্বোজ্জ্বল করে এঁকেছেন। নায়িকা 'মালিনীর' চরিত্রকেই বরং তিনি দেবী থেকে মানবীর স্তরে নামিয়ে এনেছেন। আচার-ধর্মের বিরুদ্ধে হৃদয়ধর্মকে জয়যুক্ত করবার পক্ষে এগুলি কখনো নিশ্চয় সুপ্রশস্ত নয়। "মালিনী" নাটক পরে শেষ করবার পর ক্ষেমঙ্করের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশি পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ করে থাকে। বিশেষতঃ "বিসর্জনে" প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্বকে নাটকের মূল দ্বন্দ্ব বলে মেনে নেওয়া যায়, কারণ মূল দ্বন্দ্বটি সমস্ত নাটক বিধৃত করে আছে, দ্বন্দ্বের একটি চূড়ান্ত মুহূর্তও আছে। "বিসর্জন" নাটকের শেষে মূল নাট্যদ্বন্দ্বের একটি পরিণতি বা সমাপ্তি আছে। কিন্তু "মালিনী" নাটকে প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্বের ঐরূপ কোন উপসংহার দেখান হয়নি। এখানে দ্বন্দ্বের আদি আছে, কিন্তু দ্বন্দ্বের অন্ত নেই। "মালিনী" নাটক পড়ে প্রথাধর্মের ওপর হৃদয়ধর্মের নিশ্চিত জয় হল বলে পাঠকের কোন প্রতীতি হয় না। "বিসর্জনের" মূল নাট্যদ্বন্দ্ব "মালিনী"রও মূল নাট্যদ্বন্দ্ব—একথা সুতরাং বলা যায় না। "মালিনী" নাটকের গোড়ায় কিন্তু প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের সুস্পষ্ট একটি দ্বন্দ্ব আছে। অথচ দ্বন্দ্বটি অগ্রসর হয়নি বেশীদূর। ক্ষেমঙ্করের সৈন্য আনয়নে বিদেশ যাত্রা পর্যন্ত এগিয়ে নাটকের দ্বন্দ্বটি শেষাংশে চরিত্রের ভীড়ে হারিয়ে গেছে। নাটকের শেষ দৃশ্যটি স্মরণ করুন। বিপক্ষ ক্ষেমঙ্কর জীবিত। কিন্তু শৃঙ্খলবদ্ধ। তার বিদ্রোহ হয়েছে বিধ্বস্ত। বন্ধু সুপ্রিয় মৃত। অর্ধমৃত এই ক্ষেমঙ্করের ভবিষ্যৎ পুনরভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও নেই। কেন না রাজা সজাগ হয়েছেন। অপরদিকে দেখি মালিনী জীবিত। "মালিনী" কিন্তু দেবী থেকে মানবীর স্তরে অবনমিত। এই প্রণয়ীবিমুক্ত জীবন্মৃত মালিনী হৃদয়ধর্মের প্রচার করবার আর উপযুক্ত নেই। এমতাবস্থায় প্রথাধর্ম বা হৃদয়ধর্ম কোন পক্ষেরই সুষ্ঠু জয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। বিরুদ্ধবাদী বক্তা এক্ষেত্রে অবশ্য বলতে পারেন যে "মালিনী"তেও প্রথাধর্মের ওপর হৃদয়-ধর্মের জয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—নৈতিক ভাবে। সুপ্রিয়ঘাতী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করে "মালিনী" হৃদয়ধর্মের আদর্শকে নৈতিকভাবে জয়যুক্ত করেছে। অথচ "মালিনী" ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করেছে একমাত্র হৃদয়ধর্মের অনুরোধে—একথার নিশ্চিত প্রমাণ কোথায়? একমাত্র রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে প্রমাণ আছে, সেখানে তিনি লিখেছেন—"এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতঃই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।" ৪—ইত্যাদি। বিপক্ষবাদী বক্তা বলবেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমরা আপত্তি করব কেন? বিপক্ষবাদীর বক্তব্যের দু'টি উত্তর আছে। প্রথমটি এই যে— কাব্যনাট্য ''মালিনীর" প্রথম প্রকাশ হ'ল ১৩০৩ বংগাব্দ। "মালিনীর" ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৩৪৭ বংগাব্দে। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় ৪৪ বছর বাদে ভেবেচিন্তে "মালিনী" সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, নাটক রচনাকালে নাটকের মধ্যে সেই উদ্দেশ্যটি ছিল বলে, তিনি নিজেই যে পরিষ্কার জানতেন না, তা কয়েক ছত্র আগে ভূমিকাতেই বলে গেছেন। তিনি লিখেছেন "কবিতার মর্মকথাটি তখন থেকেই যদি রচনার মধ্যে জেনেশুনে বপন করা না হ'য়ে থাকে, তবে কবির কাছেও সেটা প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠতে দেরী লাগে।" অর্থাৎ "মালিনীর" মধ্যে কোন মর্মকথা আছে, তা রবীন্দ্রনাথের কাছে পরিষ্কার হ'য়ে উঠতে ৪৪ বছর দেরী লেগেছিল। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাকে চরম হিসেবে মেনে নিলে গুণান্ধতা প্রকাশ হয়, যুক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। দ্বিতীয় বক্তব্য হোল যে,—ক্ষেমঙ্করকে ''মালিনী" ক্ষমা করেছে হৃদয়ধর্মের অনুরোধে—পাঠ্য নাটকের ভিত্তিতে পুরোপুরি সে কথা মেনে নেওয়া যায় না। যায় না ব'লেই ক্ষেমঙ্করকে 'মালিনী" কেন ক্ষমা করল তাকে ঘিরে অনবরত নতুন অনুমান গড়বার অবকাশ সকল সমালোচ-কেরা পেয়েছেন। কেউ বলেছেন, ক্ষমা করল মালিনী ক্ষেমঙ্করের প্রতি নবোদিত প্রেমে, ৫ কেউ বলেছেন ক্ষমা

৪। মালিনীর ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ

৫। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

করল মালিনী মঙ্কুকৌশলের অনুরোধে, ৬ কেউ বলেছেন, ক্ষমা করেছে মালিনী প্রতিহিংসাপরায়ণতার প্রভাবে। ৭ মালিনী ক্ষমা করেছে হৃদয়ধর্মের থেকে, একথা প্রমাণ না করলে কিন্তু মালিনী নাটকে হৃদয়ধর্ম বিজয়ী হয়েছে, এরূপ বলা যায় না। এও বলা যায় না—নাটকের দ্বন্দ্বের কোন নিষ্পত্তি হোল। অথচ রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার ব্যাখ্যাটি নিঃসর্তে স্বীকার করে না নিলে—তা প্রমাণিত করাও যায় না। তাই দেখি টমসনের মত প্রাজ্ঞ রবীন্দ্র-সমালোচকও মালিনীকে "a shadow gril", বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন। আর যে নাটকের দ্বন্দ্বের স্বরূপটি পরিস্ফুট করার জন্যে নাটক-লেখকের ভূমিকা হবে একমাত্র অবলম্বন, তার নাট্যগঠন নিশ্চয়ই ত্রুটিযুক্ত বল'তে হবে। রবীন্দ্রনাথের লেখা মালিনীর ভূমিকাটিই সবের বড় প্রমাণ যে পাঠ্য নাটকের ভিত্তিতে মালিনীর নাট্যদ্বন্দ্বে হৃদয়ধর্মের আদর্শ জয়যুক্ত হয়েছে বলে বোধ হয় না। রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন, তাই ৪৪ বছর বাদে মালিনীতে অপরিহার্য একটি ভূমিকা লিখতে ব্যস্ত হয়েছিলেন।

আসল কথা, "মালিনী" কাব্যনাট্য পড়ে, কোন ধর্মের বিজয়ের দ্বারা আমরা অভিভূত হই না, অভিভূত হই কতকগুলি চরিত্রের দ্বারা। "মালিনী" নাটকে গোড়ার দিকে একটি দ্বন্দ্ব প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্ম নিয়ে ফুটে উঠেছে-নাটকের প্রারম্ভটি তাই আদর্শমুখ্য। কিন্তু শেষাংশটি নিশ্চিতভাবে কোন আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে না। নাটকটির শেষে দ্বন্দ্বটি চরিত্রের ভীড়ে হারিয়ে গেছে। নাটকের শেষাংশটি অতএব হয়েছে চরিত্রমুখ্য। এই দ্বিধার পরে মালিনীর নাট্যদ্বন্দ্বটি বিপর্যস্ত হয়েছে। রবীন্দ্র-নাট্যসমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য "মালিনী" কাব্য-নাট্যের চরিত্রমুখ্যতা সম্বন্ধে সমালোচনা করেও ইংগিতটি পরিস্ফুট করেন নি। ৮ "মালিনী" নাটকে এ'রকম হ'ল কেন? দ্বন্দ্ব দিয়ে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ সেই দ্বন্দ্বকে কেন সম্পূর্ণ করলেন না? রবীন্দ্রনাথ "বিচিত্রপ্রবন্ধ" গ্রন্থে "নববর্ষ-" প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"যে কবির তাল আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্য শ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমাদের চিরাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি—পুষ্পিত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্য গহ্বরের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।" অনতিদূর কালবৃত্তের মধ্যে রচিত (১৩০৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা তিরস্কৃত করেছিলেন, "মালিনীতে" তা নিজেই করেছিলেন কেন? "মালিনীতে" দ্বন্দ্বের একটি শেষ দেখব ব'লে আমরা যখন উৎকণ্ঠিত, তখন দ্বন্দ্বটি তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলল কেন? কাব্যনাট্য বলে রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বকে খর্ব করেছেন এ কথা বলা চলে না। 'বিসর্জন'ও রবীন্দ্রনাথের লেখা কাব্যনাট্য।

এ সমস্ত সমালোচনা করলে সহজেই বোধ হয় যে, কাব্যনাট্য মালিনীতে "আখ্যানবস্তুর সংগতি ও সংহতি" ৯ তেমন বেশী নেই। সমালোচকবৃন্দ, ঘটনার দ্রুতিকে ঘটনার সংগতি বলে ভুল করেছেন। প্রকৃত কারণ, "মালিনী" কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত স্বয়ং একটি দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হয়েছিল। রবিচিত্ত ছিল, ঋষি এবং কবির একটি ভারতীয় সমন্বয়। ঋষি স্বরূপ তিনি "মালিনী" নাটকে দু'টি আদর্শের দ্বন্দ্ব দেখিয়ে একটিকে জয়যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বিশেষতঃ "মালিনী" কাব্যনাট্য লেখবার সময় তাঁর চিত্তটি ধর্মের স্বরূপ এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে বড় ছিল। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট একটি কাহিনীর মধ্যে কতকগুলি চরিত্র রূপায়নের কাঠামো তিনি অবলম্বন করেছিলেন। এই স্বপ্নদৃষ্ট কাহিনী এবং চরিত্রগুলির সংগে আদর্শটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাপসই হ'তে পারেনি। কারণ, কাব্যনাট্যের দ্বন্দ্ব অগ্রসর হ'লে তাঁর কবিচিত্তটি চরিত্রের মোহে পড়ে গেছে এবং চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করতে বিশেষ বেদনা পেয়েছে। ঋষির কাছে আদর্শ বড়, কিন্তু আর্টিষ্টের কাছে চরিত্র বড়। যে মুকুন্দরাম আর্টিষ্ট ছিলেন, তাঁর কাছে কালকেতুর চেয়ে ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রই প্রিয়তর ছিল। কাব্যনাট্যের দ্বন্দ্বের

৬। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা: ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

৭। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ: শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৮। রবীন্দ্রনাট্যপরিক্রমা: ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৯। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা: ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

আদর্শ থেকেও চরিত্রের বিকাশ মালিনীর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে অধিকতর অভিভূত করেছে। নাটকের নেশায় দ্বন্দ্ব দিয়ে শুরু করেও রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের মোহে তাই তাকে ফেলেছেন হারিয়ে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু আশ্চর্য ছিলনা, কেননা গতানুগতিক আদর্শ এবং চরিত্রাঙ্কনে সহজেই তিনি ক্লান্ত বোধ করতেন। এক্ষেত্রে প্রকৃতির পরিশোধ থেকে আদর্শ বিতরণ ক'রে তিনি ক্লান্ত হয়েছিলেন। তাই বিরুদ্ধাদর্শী ক্ষেমঙ্করের চরিত্র তিনি সব থেকে উজ্জ্বল ক'রে এঁকেছেন। ম্লান ও হতগৌরব হ'য়ে পড়েছে হৃদয়ধর্মের আদর্শ মালিনীর চরিত্র। "বিসর্জনের" দ্বন্দ্ব "মালিনী" নাটকের মূল দ্বন্দ্ব হ'লে তা কখনো হ'ত না। ঋষির ওপর আর্টিষ্ট এভাবে জয়লাভ করেছে। "বিসর্জনে" রবীন্দ্রনাথ আদর্শের অনুরোধে চরিত্রকে একবার খর্ব করেছিলেন। মালিনীতে তাই আদর্শের দ্বন্দ্ব দিয়ে শুরু করেও নাটকের শেষাংশে চরিত্র সম্ভাবনাকে খর্ব করতে তাঁর প্রাণে বেজেছে। তাই "মালিনীতে" দ্বন্দ্ব অপ্রধান হয়ে পড়েছে। "মালিনীতে" তাই দ্বন্দ্বের সমাপ্তি নেই, নাট্যদ্বন্দ্বের তাই চূড়ান্ত মুহূর্ত বা climax ও নেই। উদ্দেশ্যবাদী জর্জ বার্ণাড শ' একবার যেমন বলেছিলেন যে চরিত্র বেশ এগিয়ে যাবার পর—"and then I have no more control over them than over my wife !"

"মালিনী"তেও তাই ঘটেছে। তাই "মালিনী" কাব্যনাট্যে দ্বন্দ্বের পরিস্ফুট সমাপ্তি নেই। তাই climaxও নেই। এই জন্যই তা আদর্শপ্রধান ভাবে শুরু হয়ে চরিত্রপ্রধান হয়ে শেষ হয়েছে। তার জন্য আদর্শ বিচার করলে নাটকের প্রথাধর্মের ও আচারধর্মের দ্বন্দ্বটি যেন "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" বলে পাঠকের মনে হয়। এই দিক দিয়ে বিচার ক'রলে নাটকের গঠন খুব সংহত ও সংগত বলে বোধ হয় না।

আমার মাঝে উঠুক ফুটে তোমার পরিচয়

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

"তুমি সবার মাঝে আছো" বলি কিন্তু এ ঠিক নয় ;
এমনি বলে নিত্য করি মিথ্যা অভিনয়।
সবার মাঝে কই তাহলে—
তোমায় পূজি অশ্রুজলে ?
দুঃখীজনে পায়ে দলি,—কেন এমন হয় ?
জানি যদি সত্যি তুমি বিশ্বভুবনময় !
আমরা বলি—"তোমারই সব, আমার কিছুই নয়।"
(তবে) আমার আমার বলে কেন দিই গো পরিচয় ?
সত্যি আমার কিছুই তো নাই,
যা কিছু সব তোমার দেওয়াই
(আমার) কপট, মুখোস দাওগো খুলে
আমিত্ব পাক লয় ;
(তোমার) চরণতলে হোক আজিকে
আমার পরাজয়।
লোক দেখান পূজা আমার থাকনা পড়ে দূরে—
হৃদয় আমার ঝঙ্কৃত হোক তোমার বীণার সুরে।
মিথ্যা মোহের বাঁধন খুলে
ঐ চরণে নাওগো তুলে,
(আমি) হৃদয় কোণে হেরি নিতি
রূপ তব চিন্ময়—
আমার মাঝে উঠুক ফুটে
তোমার পরিচয়॥

কোণারক

শ্রীমতী সাধনা সেন

সাহিত্যের ক্লাশে একদিন "বলেন্দ্রনাথ" পড়তে গিয়ে 'কোণারকের' কথা প্রথম মনে রেখাপাত করেছিল। লেখক বলেন্দ্রনাথের অনবদ্য ছন্দময় ভাষায় সে বর্ণনা যেন জীবন্ত রূপ নিয়ে আমার মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত ছিল। সেদিনই মনে মনে আশা করেছিলাম যদি কখনও সুযোগ আসে, এই বিপুল অতীতের পুরাতন কাহিনীর গৌরব আমার মনের চিত্রশালায় অঙ্কিত করে নেব।

তারপর অন্ততঃ বেশ কয়েকবছর কেটে গেছে। জানিনা লেখকের রচনাশৈলীর অনবদ্য অনুপ্রেরণায়, অথবা কোণারকের ভাবময় চিত্রশিল্পের বর্ণনায়—, আমার ভাব-লোকের আলোকে কোণারকের চিত্রটি প্রতিনিয়তই আমাকে হাতছানি দিয়ে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে এসেছে। তাই অবশেষে রওনা হয়ে পড়লাম এই অর্ক-ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে একসময়—।

পুরী থেকে কোণারকের বাস ছাড়লো যখন—তখন সবে সকাল সাতটা। সূর্য্যদেব তাঁর সাতঘোড়ার রথ তখন আকাশের দিকে জোরকদমে ছুটিয়ে দিয়েছেন। এমনি এক মনোহর দিনে আমাদের রথও ছুটে চল্‌ল উড়িষ্যার নবনির্ম্মিত হাইওয়ে দিয়ে কোণারকের পথে। দুধারের দৃশ্যে চমৎকারিত্ব এমন কিছু না পেলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপ্রতুলতা ছিল না। বিশেষ করে বাংলার গ্রামের সাথে যাদের যোগাযোগ কিছুটা ছিল বা এখনও আছে, তাদের কাছে এ সৌন্দর্য্য সত্যিই অভিনন্দিত হবে।

বেশ কিছুটা চলবার পর এল বালিয়াড়ির পথ। পুরী থেকে সোজা সমুদ্রপথে কোণারকে গেলে মাত্র সতের মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু বাসের পথ একটু ঘুরপথ হওয়ায়, এ দুরত্ব দ্বিগুণত্বে পর্য্যবসিত হয়েছে। এই বালিয়াড়ি দেখে মনে হয়, এক কালের সমুদ্র আজ দূরে সরে গিয়ে যে ভূমির সৃষ্টি করেছে তা আজও উষর ধূসর থাকলেও দু একটা বাব্‌লা গাছের আবির্ভাবে সুদূর ভবিষ্যতে তার শ্যামল অবস্থিতির আশ্বাস দিচ্ছে। একদা হাস্যলাস্যময়ীতরঙ্গমালাসুশোভিত চন্দ্রভাগা নদী যেন অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতির মতই ক্ষীণকায়া হয়ে প্রবাহিতা। এখন যেন তার বুকে গৈরিক আঁচলের স্পর্শ লেগেছে। শুধু বন-শাপলার দল তার সাদা ফুলের পাপড়িগুলো মেলে দিয়ে কি এক শ্বেতশুভ্র প্রাণের আকৃতি প্রকাশ করতে প্রয়াসী।

খানিকবাদে আমাদের গাড়ী এসে থামল একেবারে কোণারকের সামনে। এক অদ্ভুত উন্মাদনা নিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে সেই বিশাল কীর্ত্তিকে জানালাম আমার হৃদয়ের অনাবিল ভক্তিশ্রদ্ধা। সেই বিশালতা, সেই সুমহান উদারতা, সেই সুবিস্তৃত পাষাণমন্দির আমার হৃদয়ে যে বিমূঢ় ভাব এনে দিল তার প্রথম চমক কাটলে প্রথমেই দেখতে পেলাম নাটমন্দিরের দ্বারদেশ। একদা সমগ্র উড়িষ্যা দেশ জুড়ে যে ধর্ম্মযুদ্ধ চলেছিল বহুযুগ ধরে, এখানে রয়েছে তারই ভাব-প্রকাশ। তখন নরসিংহ দেবের রাজত্ব। সে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। উড়িষ্যার বৌদ্ধ জনসাধারণের দাবীকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে তিনি এই সৌরমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। তাই নাটমন্দিরের দ্বারদেশে রূপায়িত করেছেন তাঁর রাজকীয় ধর্ম্মের এই ইচ্ছাকে। নাটমন্দিরের দ্বারদেশে দেখি দুটি হাতীর উপর দাঁড়িয়ে আছে দুটি সিংহমূর্ত্তি। এই সিংহমূর্ত্তি যদিও কিছুটা বৈদেশিক স্থাপত্যের ভাবকল্পরূপে রূপায়িত, কিন্তু তবুও অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে নিতে এতটুকুও কষ্ট হয় না। হাতী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতীক। তাই জনসাধারণ যে ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাকে রাজকীয় ধর্ম্ম পরাস্ত করে উন্নত গৌরবে সমুদ্ভাসিত হবে, এতে আর বিচিত্র কি? যুগে যুগে সবলের প্রকাশ এই ভাবেই হয়। নাট-মন্দিরের গায়ে বহু নারীমূর্ত্তি বিভিন্ন নৃত্যছন্দে বিরাজিত। ওড়িসি নৃত্যকলার বিভিন্ন প্রকাশসহ স্তম্ভগুলি পাষাণ ছাদভার একদা বহন কোরত। সেই ছাদ আজ মিউজিয়মের সংগ্রহশালায় ভগ্ন অবস্থায় শোভা বর্দ্ধন করছে।

একদা এই নাটমন্দিরে ওড়িসি নৃত্যে কুশলী দেব-নর্ত্তকীর দল নানা ভঙ্গিমায় দেবতাকে নৃত্যে-লাস্যে-ছন্দে বন্দনা জানাত, তখন ধর্ম্ম ও সমাজ দেবতাকে পরিতুষ্ট করতে লৌকিক জীবনের লৌকিক আনন্দকে উপেক্ষা করেনি। পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মের অন্তরাল থেকে এই দেবনর্ত্তকীদের দেবতার প্রতিভূস্বরূপ পুরোহিতবৃন্দ অসামাজিক কাজ করাতে বাধ্য করত। ক্রমে সমাজ ব্যবস্থা একে মেনে নিলেও অসংশয়ী জনগণের মনে অবিশ্বাস আসতে বাধ্য হয়েছিল। পরে এইসব দেব-নর্ত্তকীর দেবভাবে আর তারা আস্থা রাখতে পারে নি। তাই পুঞ্জীভূত ঘৃণা এত ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যকলা ওড়িসি নৃত্যের অবলুপ্তি একান্ত অপরিহার্য্য হয়ে পড়ল। দেবতার অলৌকিকত্ব লৌকিক তত্ত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়ায় সংশয়ী জনমন সমাজেও তার আলোড়ন তুলেছিল। তাই ওড়িসি নৃত্যকলার নানা ভঙ্গিমার আত্মপ্রকাশ এখন এই নাটমন্দিরের গায়েই শুধু সীমিত থাকত—যদি না এই বিংশ শতাব্দীতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভারতের নটরাজ উদয়শঙ্কর তার উদ্ধারসাধন করতেন।

মূল মন্দিরটি এই নাটমন্দিরের পরেই অবস্থিত। চব্বিশটি তেজী রজ্জুবদ্ধ ঘোড়া যেন একটি সুন্দর রথ টেনে নিয়ে চলেছে। রথের চাকায় যে পাথরের জালির কাজ আছে তা দ্রাবিড়-স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। মন্দিরটি অসামান্য তবু মিথুন মূর্ত্তিগুলিতে শিল্পকলার যে বাস্তব অথচ কুৎসিৎ প্রকাশ রয়েছে তাতে শিল্প গৌরব ক্ষুণ্ণ ও সংকুচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। বিরাট পাষাণ মন্দিরের চারিদিকটাই নিটোল। তখনও কলিঙ্গবাসীরা খিলানের কাজ জানত না। তাই সিঁড়িগুলিও নিটোল। সূর্য্যদেবের নানারকম মূর্ত্তি নাকি মন্দিরের চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন শুধু দুটি আছে। একটি অশ্বারোহী মূর্ত্তি। অপরটি দণ্ডায়মান সূর্য্যমূর্ত্তি চন্দ্রভাগা নদীর দিকে তাকিয়ে আছে বরদাতারূপে। মূর্ত্তিগুলির অনুপম সুষমাময় দেহসৌষ্ঠব ও নিখুঁত গড়ন প্রাচীন ভাস্কর্য্যের উন্নত অনুশীলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিটি কারুকার্য্য, বেশবাস, অলঙ্কার-সমৃদ্ধি প্রাচীন কলিঙ্গের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন বহন করে। সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উঠলে দেখা যায় ঐ দূরে সমুদ্র সরে গেছে। একদা সমুদ্রের শুভ্র ফেনরাশি শুভ্রভক্তি নিবেদন করত প্রতিদিন তার তরঙ্গমালার উচ্ছল প্রকাশে। সেদিন এই মন্দিরের পদতলেই তরঙ্গমালা বারবার আছড়িয়ে পড়ে জানাত হৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা। মনে পড়ে যায় পুরাণের কথা—যেদিন রাজকুমার শাম্ব পিতার অভিশাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে এই স্থানে বারো বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন ও রোগমুক্ত হয়েছিলেন সূর্য্যদেবের অসীম দয়ায়। সেদিনের তাঁর সেই অন্তরের আকুতি ও ভক্তি সমুদ্রের তরঙ্গমালার শীর্ষদেশে বিরাজিত শুভ্র ফেনের মত উচ্ছল অথচ সংহত ছিল। তাই তো তিনি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন এমনভাবে—যাতে করে সেই তরঙ্গমালার শুভ্র প্রকাশ প্রতিদিন এই মন্দিরের পদতলে আছড়িয়ে পড়ে।

মন্দিরের চূড়া থেকে দেখা যায় কিছুদূরে প্রবাহিতা চন্দ্রভাগা নদীকে। আর তখনই ধর্ম্মপদের কথা মনে পড়ে যায়। বারোবছর তার পিতা বাড়ী থেকে নিখোঁজ। পিতা তখনকার কলিঙ্গ দেশের শ্রেষ্ঠ স্থপতি ছিলেন। রাজ আহ্বানে এই মন্দির নির্ম্মাণের ভার পড়ল তাঁর উপর। পিতা এই কাজ গ্রহণ করায় দ্বাদশ বৎসর পুত্রের সাথে পিতার হয়নি কোন সাক্ষাৎ। অতঃপর লোকমুখে খবর পেয়ে ধর্ম্মপদ এইখানে এসে বৃদ্ধ পিতাকে অতি চিন্তাকুল দেখেন। মন্দিরের সব কাজই শেষ হয়েছে—শুধু সোনার কলসটি বসাবার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হচ্ছে জ্যামিতির শাস্ত্র অনুযায়ী তা ঠিক নির্ভুল হচ্ছে না। অথচ রাজাদেশ আগামী দিনের সূর্য্যাস্তের মধ্যে মন্দির সমাপ্ত না হলে প্রাণদণ্ড অবধারিত। ধর্ম্মপদ জ্যামিতিক অঙ্ক কষে নির্ভুলভাবে কলসী স্থাপন করলেও পিতার বিষাদময় মুখমণ্ডল তার অন্তরে নিদারুণ ব্যথা দিল। তিনি জানতে পারলেন যে আজকের এই একটি শিল্প নির্দ্দেশনায় পিতার এই দ্বাদশ বৎসরের শিল্প সাধনা নাকি ব্যর্থ হতে চলেছে। এই মন্দির-চূড়া থেকে তাই ধর্ম্মপদ লাফিয়ে পড়লেন ঐ চন্দ্রভাগার সলিলে—এইভাবে এক মহান্ ভবিষ্য-শিল্পীর হল মহান জীবনের অবসান।

এই মন্দিরকে ঘিরে এমন নানা জনরব, নানা উপকথা আজও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে শোনা যায়। শোনা যায় বারো বছরের রাজস্ব সমুদ্রের বালুতটে এই মন্দির নির্ম্মাণে নিঃশেষিত হয়েছে।

আজ এই মন্দির শুধু পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দূরদূরান্ত হতে ভ্রমণকারীর দল এই মন্দিরের অপরূপ শিল্পকলা দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে চলে যান। কোণারক পড়ে থাকে শুধু অসীম অনন্ত আকাশতলে স্মৃতিভার নিয়ে—যেন কোন অতীত কাহিনীর উপসংহার।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আবার আমি ফিরে এলাম বাস্তবের কঠোর ক্ষেত্রে। বাস কণ্ডাক্টর হেঁকে চলেছে—"সন্ধ্যা হয়ে এল, আপনারা সব আসুন চলে।" সামনে তাকিয়ে দেখি, দূর দিগন্তে সূর্য্য অস্তমিত, আর তার লাল রশ্মির আভা মন্দিরের গায়ে যেন একমুঠো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার মনে হল সে যেন কোন করুণ চিতা-দৃশ্যের রক্তিম আভা!!

(পূর্বপ্রকাশিতেরপর)

তেরো

বিষ্ণুঠাকুর (একটু থেমে চোখ বুজে থেকে): আমার পিতৃদেব ছিলেন পাটনার সংস্কৃত অধ্যাপক। আমার দেবভাষায় হাতে খড়ি হয় প্রথম তাঁর কাছে। তার পর কলেজে সংস্কৃতে এম্-এ পাশ করি বাইশ বৎসর বয়সে। এম্-এতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই ও প্রথম হই। তার পরের বৎসর ইংরাজীতে এম্-এ দিয়ে ডবল—এম্-এ হই। ফলে আমার বাজারদর বেড়ে গেল হু হু ক'রে। নানা জায়গা থেকে আসতে লাগল সম্বন্ধ। আসবে না কেন? শুধু যে পিতৃদেবই সঙ্গতিপন্ন ছিলেন তাই নয়, মাও ছিলেন ধনী পিতার একমাত্র কন্যা ও সন্তান। সবাই জানত তাঁর টাকা আমিই পাব।

আমার একদিকে যেমন রূপসী স্ত্রীকে ঘরণী পাবার লোভ ছিল সাড়ে পনের আনা, অন্যদিকে ঠিক তেম্নি দারুণ ভয় ছিল—বিয়ে থা ক'রে একরাশ ছেলেমেয়ের বাপ হ'য়ে সাংসারিয়ানার চাপে যদি হাঁপিয়ে উঠি! আরো পরিষ্কার ক'রে বলি: আমার মধ্যে পাশাপাশি দেখতে পেতাম দুটি স্ববিরোধী প্রবণতা: একটি—মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার প্রবল ইচ্ছা—বিশেষ ক'রে রূপসী বা গায়িকা মেয়েদের—অন্যটি হ'ল সাধুসঙ্গের বিপর্যয় আকাঙ্ক্ষা। ঠাকুরের বিচিত্র লীলায় এ-আত্মবিরোধ ঘটে অনেক সাধকেরই ক্ষেত্রে: যে-অনুপাতে তারা ভগবানের দিকে ঝোঁকে, ঠিক সেই অনুপাতেই তাদের টানে নারীর সঙ্গলিপ্সা। আমার গুরুদেবের মুখে শুনেছি-এ অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে তাঁকেও যেতে হয়েছিল, এবং তিনি বল পেয়েছিলেন প্রধানতঃ তাঁর স্বপ্নলব্ধ গুরুদীক্ষার শক্তিতেই। আর এ-উল্টোপাল্টামির লীলাখেলা শুধু যে আমাদের দেশের সিদ্ধ মহাত্মাদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাই নয়, ওদের দেশেরও নানা ধর্মপ্রচারক সেণ্ট ও মনীষীর মধ্যেও দেখা যায়। যথা, সক্রেটিস, প্লেটো, সেণ্ট পল, লয়েলা, সেণ্ট ফ্রান্সিস, সেণ্ট থেরেসা, গেটে, রুসো, শেলি, নেপোলিয়ন, টলস্টয়, ওয়েল্‌স্ আরো কত মহাপ্রাণ কীর্তিমন্ত মনীষী কবি গুণী যাঁদের কীর্তির গুণে এ-জাতীয় নানা কুকীর্তির কথা মানুষ ভুলে গেছে। (একটু থেমে হেসে) The old old story বাবা! মানবচরিত্রের মূলধারা দেশে দেশে ও কালে কালে একই খাতে ব'য়ে চলেছে—আর সে-খাত আঁকাবাঁকা—কখনো সত্যার্থীকে দেয় এগিয়ে – কখনো পিছিয়ে। আমাদের মহাভারত রামায়ণ ভাগবত ও নানা পুরাণের ঋষিকবিদের প্রজ্ঞার সাক্ষ্যও এই: যে দেবাসুরের সংঘাতের মধ্যে দিয়েই মানুষের আত্মা পিছুটান কাটিয়ে উর্ধ্বচারী হয় – বাধার মধ্যে দিয়েই বিকাশ। যাক্ শোনো।

গান গাইতে পারার দরুণ আমার ক্ষেত্রে মেয়েদের সঙ্গলাভের পথ যেন আরো খুলে গেল—শুধু তাদের সাম্‌নে গান গেয়েই নয়, অনেককে গান শেখাতে গিয়েও বটে। ফলে নানা অশুচি চিন্তার জন্যে চিত্তগ্লানি হ'ত খুবই, অথচ মেয়েদের ছোঁয়াচ কাটাবার মতন মনের জোর খুঁজে পেতাম না নিজের মধ্যে। আরো একটা জিনিষ দেখতে পেতাম এই সূত্রে: যে, মেয়েরা আমার সংস্পর্শে আসতে

না আসতে আমার এই দুর্বলতার খবর পেত, যেমন বাতাসে পরিমলের মধ্যে দিয়ে মৌমাছিরা খবর পায় কোন্ গাছে ফুল ফুটেছে। এ-গ্লানিকর অধ্যায়ের কথা বেশি বলতে চাই না, কেন না এ-দুর্বলতা বিশ্বজনীন। তবু এ-প্রসঙ্গ পাড়লাম—তুমি দেবদ্রোহী শক্তিদের কারসাজির কথা তুললে ব'লে। কারণ আমি বারবার লক্ষ্য করেছি যে, সাধুদের সঙ্গ পেয়ে যেম্নি মনে হয়েছে নিজেকে পবিত্র, যেম্নি মনে জোর পেয়ে আত্মপ্রসাদকে প্রশ্রয় দিয়ে ভাবতে শুরু করেছি বেশ এগিয়ে চলেছি তর তর ক'রে—সেই পিছুডাকের টানও প্রবল হ'য়ে উঠে নানা ফুশলানিতে চেয়েছে আমাকে দ'-য়ে জমাতে। তবু যে কয়েকবার হোঁচট খেয়েও মুখ থুবড়ে পড়ি নি, টোপ খেয়েও বঁড়শিকে এড়াতে পেরেছি -সে শুধু সাধুদেরই কৃপায় আর গুরুশক্তির জোরে—আমার নিজের চরিত্রবলে নয়। কিন্তু ঐ সঙ্গে একটা মস্ত লাভও হয়েছিল এই যে, আমার কৈশোরেই সাধুসঙ্গের মহিমায় আমার বিশ্বাস গভীর হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছিল। তাই তো নারীসঙ্গ আমাকে উতলা করার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটতাম তাঁদের আশীর্বাদে দুর্বলতা জয় করতে—আর প্রতিবারই অন্তর্দ্বন্দ্বের গহন লগ্নে তাঁদের কাছে দরবার করতে না করতে আমার মানস-কুরুক্ষেত্রে বেজে উঠত মা-ভৈঃ-এর দেবশঙ্খ। (একটু হেসে) বাবা, সাধুসঙ্গের মহিমার প্রথম ও শেষপাঠ আমি পেয়েছি মনের প্রাণের তপোবনে, কোনো বাইরের বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পুরাণ থেকে নয়। আমার কাহিনীটা আর একটু এগুলেই এ কথার ভাষ্য পাবে যে, এ সংসারে শাস্ত্রের শাস্ত্র হ'ল সাধুবাণী ও গুরুসঙ্গ।

আমি শৈশবেই দেবভাষাকে ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু আরো ভালোবেসেছিলাম গান। পাটনায় রীতিমত কীর্তন শিখতাম এক নামজাদা কীর্তনীর কাছে। কিন্তু একটু শিখে আমার সাধ মিটত না। আমার তৃষ্ণা ছিল অফুরন্ত। কাজেই কলেজের ছুটি হ'লেই বেরিয়ে পড়তাম ভবঘুরে হ'য়ে ছুটতাম—যেখানেই গাইয়ের খবর পেতাম—দুদিন তিনদিন একসপ্তাহ একমাস। আর সর্বত্র শুধু যে গান শুনতাম তাই নয়, নিজেও গাইতাম ভজন কীর্তন ও বাউল নানা আসরে।

চোদ্দ

বিষ্ণুঠাকুর (একটু থেমে): আমার এক বিধবা পিসিমা থাকতেন কাশীতে তাঁর একটি মাত্র ছেলেকে নিয়ে। তাঁর অবস্থা বেশ ভালো ছিল। পিসেমহাশয় ছিলেন জমিদার—যথেষ্ট টাকা রেখে গিয়েছিলেন। পিসিমা আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, আরো ভালোবাসতেন আমার গান। আমি এম্-এ পাশ করার পরেই তিনি খুসি হ'য়ে উঠে আমাকে তাঁর কাছে এসে মাসখানেক কাটিয়ে যেতে নিমন্ত্রণ করলেন। লিখলেন: "কিন্তু বাবা, সপ্তাহে তিনচারদিন কীর্তন গাইতে হবে আমার ঠাকুর ঘরে।"

আমি গাইতাম মহানন্দেই, কারণ পিসিমার গঙ্গামুখী ঠাকুর ঘরটিতে আমার গান জ'মে উঠত দেখতে দেখতে। কাশীর জ্ঞানী গুণী ভক্ত ও ভক্তিমতীরা আসতেন ভিড় ক'রে।

নন্দিনীদের বাড়ী ছিল পিসিমার বাড়ীর কাছেই—দুটো মোড় বাদে…পাঁচ মিনিটের রাস্তা। কাজেই বলা বাহুল্য সেও আসত—প্রথম প্রথম তার মার সঙ্গে, তারপরে —মানে একটু ঘনিষ্ঠ মতন হ'তেই—একাই। ফলে গানের পরে একটু একটু ক'রে আলাপও জমল বৈ কি।

পিসিমার কাছে এসেই শুনেছিলাম মাসখানেক আগে মাণিকের কাণ্ড: সে সত্যিই মোক্ষদাকে চেয়েছিল প্রবল ভাবে, তাই নিজে এসে পিসিমাকে সব কথা খুলে ব'লে তাঁকে হাতেনাতে ধরেছিল—মোক্ষদাকে ছাড়া আর কাউকেই মালা দেবে না এইই ছিল তার পণ। পিসিমা ঘটকালি করতে রাজি হন নি, কারণ তিনি ছিলেন দারুণ গোঁড়া হিন্দু, বিধবা বিবাহের নাম শুনলেও উঠতেন জ'লে। কিন্তু মোক্ষদাকে তিনি সত্যিই স্নেহ করতেন, তাই বলতেন মাঝে মাঝেই নন্দিনী ও তার মার অত্যাচার উৎপীড়নের কথা—বলতে বলতে তাঁর চোখে জল ভ'রে আসত।

শুনে প্রথমদিকে আমার ওদের উপর খুবই রাগ হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু নন্দিনীর রূপমোহে পড়তে না পড়তে সব রাগ গেল উবে—আরো এই জন্যে যে, সে দুদিনেই আমার কীর্তনের—ও বিশেষ ক'রে কণ্ঠস্বরের—দারুণ ভক্ত হয়ে উঠল। একে রূপসী, তার উপর আমার

গানের—বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায়—"নব অনুরাগিণী।" ফল যা হবার: ভবিতব্য—আমরা পরস্পরের দিকে ঝুঁকলাম—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে "প্রেমে পড়া।" পড়াই বটে—তবে এমন পড়া যে ওঠা ভার!

সংস্কৃত কবিদের উপমায় সুন্দরী যুবতীর রূপকে বলা হয়েছে দীপশিখা, যুবককে—পতঙ্গ। শাস্ত্রীদের উপমা—আগুন ও ঘি। গন্থের ভাষায়, যৌবনের রক্তে নেশার আবেশ হয় দেখতে দেখতে। আমাদেরও হ'ল। নন্দিনীর মন আমার দিকে আরো ঝুঁকল মাণিকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার ঘা খাওরার ফলে। তাছাড়া সে সত্যিই ভালোবাসত—আর আমি যে যৌবনে গান গেয়ে আসর জমাতে পারতাম একথা তোমরা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করবে না। নন্দিনী প্রায়ই বলত—আমার গান আর মাণিকের গান—"কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে!"

পিসিমা ছিলেন বুদ্ধিমতী। আমাকে অনেক বোঝালেন একদিন। আমিও বুঝলাম বৈ কি। কিন্তু মন বুঝলেও যে প্রাণ বোঝে না—কে না জানে? আর বোঝে না কেন তার ভাষ্য অনাবশ্যক, কেবল ভবভূতির একটি শ্লোক মনে পড়ে:

"তব স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণা
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ—
অর্থাৎ
তোমার পরশনে বিবশ ইন্দ্রিয়ে আবেশ ছায়।
চেতনা শিহরিয়া অমনি মূর্ছিয়া পড়ে নেশায়।"

এমনি সময়ে একদিন দুপুরবেলা পিসিমা বললেন যে, সকালে নন্দিনীদের এক দাই এসে খবর দিয়ে গেছে—মোক্ষদাকে ওরা সকালে খুব মেরেছে। "বেচারী!" বললেন পিসিমা গাঢ় কণ্ঠে, "ওকে বেঁধে মারা হচ্ছে, কিন্তু উপায় কী বল?"

আমার মনে এবার সত্যিই বিতৃষ্ণা জাগল। রুখে উঠে পণ নিলাম—এমন মেয়ে ও মার সঙ্গে মিশব না কিছুতেই। আরো, নন্দিনী যে চপল প্রকৃতির মেয়ে সেটা বুঝতে তো দেরি হয়নি। ফলে ফের কাশীতে দু একটি সাধুর কাছে যেতে আরম্ভ করলাম বল পেতে। বলও পেলাম বৈ কি। গানের সময় নন্দিনীর দিকে তাকানো পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম। খেদ যে হ'ত তা নয়, কিন্তু নন্দিনীর রূপের হাতছানি মনকে দুর্বল করলেও ওদিকে সাধুসঙ্গের-ফলে-পাওয়া বিবেকবুদ্ধি এসে হাজিরি দিত বল দিতে। সুরু হ'ল ফের কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র ক'রে তোলার সেই সনাতন যুদ্ধ।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তবু পিসিমার ওখান থেকে চ'লে যেতে পারলাম না কিছুতেই। কথায় বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। কিন্তু যেখানে শত্রু উর্বশী মেনকার ছদ্মবেশে হানা দেয় সেখানে নানা কুযুক্তি এসে সৎসঙ্কল্পকে নাকচ ক'রে দেয় সহজেই। দেবদ্রোহী শক্তিরা আমার মনে এ-যুক্তি পেশ করল পৌরুষের অছিলায়, বললাম আমি সঘনে: "পালিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা—ও কাপুরুষেরই সাজে। তাছাড়া মোহিনীকে যখন মায়া ব'লে চিনতে পেরেছি তখন আর ভয় কি? আমি যদি না ঝুঁকি, কেউ কি আমায় টলাতে পারে?

এই ধরণের আরো কত মনভোলানো বীর বাণী!

নন্দিনীর বুঝতে দেরি হ'ল না। হঠাৎ পেলাম ওর এক চিঠি: "লোকের কথায় বিশ্বাস করবেন না—একটিবার অন্ততঃ আসুন আমাদের এখানে, বিশেষ কথা আছে—তবে নিরালায় নৈলে হবে না।"

অমনি ফের মন বিষম দুর্বল হ'য়ে গেল—সব সাধু সংকল্প গেল উবে উষার আলোয় কুয়াশার মতনই—এক মুহূর্তে। মহাভারতের একটি শ্লোকও মনে পড়ে স্বয়ং ভীষ্ম বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে—(ভীষ্ম কি মহাজ্ঞানী ছিলেন না?)—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাৎ চাপি বিষাদাপ্যমৃতং পিবেৎ।"*

শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের সেই সনাতন দ্বন্দ্বকে জীইয়ে রাখতে এইভাবে কতশত কুযুক্তিই না মোহিনী সুবুদ্ধির ছদ্মবেশে এসে কলিঠাকুরের তল্পি বয়, বাবা! নচিকেতাকে যম সাবধান করেছিলেন এই ব'লে যে, শ্রেয়োমার্গ ধরলে স্বর্গলাভ হয়। আর প্রেয়োমার্গ ধরলে সর্বনাশ। কিন্তু কলিঠাকুরের মোহিনী যুক্তি এই সূত্রটিকে উলটে বলে: "প্রেয়ই সরস, শ্রেয় নীরস। (একটু হেসে) কাজেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রইল না—জেনে শুনেই শ্রেয়কে বিদায়

---

* দুষ্কুল থেকেও স্ত্রীরত্ন আহরণ করবে—বিষ ছেঁকেও করবে সুধাপান।

দিয়ে বরণ করলাম প্রেয়কে—ফাঁদকে ফাঁদ জেনেও পা বাড়ালাম বীরভঙ্গিতে—গেলাম নন্দিনীদের ওখানে তার সঙ্গে নিরালায় আলাপ করতে। অমনি নন্দিনী মোহন হেসে আমাকে টলিয়ে দিল—রাজী হ'লাম তার ওখানে গান গাইতে।

একটা মিথ্যা যেমন দশটাকে টেনে আনে, তেমনি একটা চ্যুতির ফলে ঘটে আরো দশটা স্খলন। আমারো ঘটল: নন্দিনীর ওখানে গানের নিমন্ত্রণ নেবার সময় কলিঠাকুর কানে ফুশলেছিলেন: "মাত্র একদিন গাইছ তো—এতে এত ভয়ের কী আছে? তাছাড়া সামনের মাসে তো ফিরে যাবেই পাটনায়—যখন ওকে বিবাহ করবে না জানো তখন একটু মেলামেশার রস চাখ্‌লেই বা—তুমি তো আর ধনুর্ধর দত্তাত্রেয় মুনির চেলা নও যে নারীকে 'কৌটিল্যদম্ভসংযুক্তা সত্যশৌচবিবর্জিতা' ব'লে দূর ছাই করতে বাধ্য?"·· ···ইত্যাদি ইত্যাদি সে কত চমৎকার চমৎকার যুক্তি!

কিন্তু মজা এই যে, কোনো যুক্তিকে শুভবুদ্ধি কু ব'লে চিনলেও তার আফিংকে একটু সেবন করতে না করতে আবেশ আসে ঘনিয়ে, ফলে গীতার পরিভাষায় সেই "তামসী বুদ্ধি"—ই জয়ী হয়ে যার প্ররোচনায় "অধর্মকেই ধর্ম মনে হয়—অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তামসাবৃতা—সর্বার্থান্ বিপরীতান্ চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।" আমারও হ'ল: প্রথমে নন্দিনীর ওখানে একদিন, তারপর আর একদিন···তারপরে সপ্তাহে তিন চারদিন ক'রে আসর জমাতে সুরু ক'রে দিলাম অকুণ্ঠেই। বোঝালাম নিজেকে: "দোষ কী? ঠাকুরের নামই তো করছি?" দেখেও দেখলাম না কার কাছে করছি ঠাকুরের নাম! পিসিমার ওখানে আসত ভক্ত সাধু সন্ত, নন্দিনীর ওখানে—নানা জাতের সৌখীন শ্রোতা—ফ্যাশেনেব্‌ল্ নবকুলকামিনী। কিন্তু গান গাইতাম আমি এমন চমৎকার যে, তারাও মুগ্ধ হ'ত। খুসি হয়ে বোঝালাম নিজেকে: এইই তো চাই অভক্তদের মধ্যেও ভক্তির গান করা। বিপরীত বুদ্ধি আর কার নাম?

পিসিমার বুঝতে বাকি রইল না—হাওয়াটা কোন্ দিকে বইছে। শেষে বললেনও একদিন আমাকে যে, নানা লোকে নানা কথা বলছে। আমি পিঠ পিঠ উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে জবাব দিলাম: "পিসিমা! বিবেকানন্দ বলতেন 'লোক না পোক', জানো তো? লোকে কী না বলে? তাছাড়া আমি তো আর দিন পনেরোর মধ্যেই প্রস্থান করব···তুমি ভেবো না, আমি সজাগ আছি।" পিসিমা মুখ ভার করে বললেন: "কিন্তু এত ঘন ঘন গাওয়া বাবা"—আমি তাঁকে খুসি করতে অন্য সুর ধরলাম: "কি জানো পিসিমা? আমি রূঢ় হ'তে চাই না। তাছাড়া মোক্ষদার সঙ্গে আমার দেখা হয় গানের আসরে। সেও গান শুনে আনন্দ পায়। কালও নন্দিনী ফের বলছিল: আহা, ও-বেচারীর তো আর কোনো পথ নেই একটু শান্তি পাবার—আপনার কীর্তন শোনা ছাড়া···।" পিসিমা এর পরে আর কীই বা বলবেন? কারণ কথাটার মধ্যে কিছু সত্যের মিশেল ছিল—মোক্ষদা নিজেও তাঁকে ঠিক এই কথাই বলেছিল একদিন—যে, আমার ভজনই তার মরুজীবনে একমাত্র তৃষ্ণার জল। আর ঠিক এই সময়ে নন্দিনী চালও বদ্‌লে ছিল—আরো আমাকে বোঝাতে চেয়ে যে, মোক্ষদাকে ওরা যত্নেই রেখেছে। তাই আমার সামনে সে বারবারই মোক্ষদাকে সাদরে ডেকে বসাত নিজের পাশে, বলত: "বৌ ভারি গান ভালোবাসে বিষ্ণুদা! ওর কণ্ঠস্বরও এমন মিষ্টি যে কী বলব! কিন্তু হ'লে হবে কি, এমন বিষম লজ্জা যে কারুর সামনেই গাইবে না।" এই ধরণের অতি নরম স্তুতি। গানের পরেই কিন্তু ওকে ভিতরে পাঠিয়ে দিত—পাছে সে আমার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পায়। কিন্তু যতক্ষণ আমি গাইতাম মোক্ষদা এমন তন্ময় হ'য়ে শুনত যে প্রতিবারই আমার মন গৌরবী তৃপ্তিতে ভ'রে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে আমি মনকে বোঝাতাম: "না না, নন্দিনীরা ওকে মারধোর করবে কেন? লোকে কত মিথ্যাই না রটায়—কে না জানে?" ···ইত্যাদি।

থেকে থেকে ওর বিষণ্ণ কমনীয় মুখখানি মাঝে মাঝেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত—সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ উদাস রেশে। কিন্তু এ-ভাবে সে-কল্পনাকে আমি উড়িয়ে দিতাম 'কবিয়ানা' নাম দিয়ে। দেওয়া কঠিন হ'ত না, কারণ ঠিক এ সময়ে আমার জাগ্রত মনের সাড়ে পনের আনা জুড়ে বসেছিল নন্দিনীর রূপ, হাবভাব হাসি চাহনিই বলব।

আমি মনে মনে জানতাম পিসিমার কথাই ঠিক—আমার আর কালবিলম্ব না ক'রে সোজা পাটনা ফেরা উচিত ছিল। কিন্তু মনে হ'ত—নন্দিনী ও মোক্ষদা দুজনেই কষ্ট পাবে—আহা! তাছাড়া দুদিন পরে তো যাচ্ছিই, এত তাড়া কী? নন্দিনীর সঙ্গে যে আমার বিবাহ হ'তে পারে না ওরা তো ভালো ক'রেই জানে। নন্দিনীর মাকে পিসিমা বলেছিলেন দুতিন বার জোর দিয়েই যে, আমার পিতৃদেব গোঁড়া হিন্দু—বিধবা বিবাহের বিরোধী।

নন্দিনী একথায় আরো একটু উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে থাকবে—বাধা পেলে কামনারা প্রবল হয় কে না জানে? কেবল আমার কাটান্ ছিল সাধুসঙ্গ—সাধুরা এ-জগতের রঙ্গিণী মেয়েকে বিবাহ করার বিরোধী জানতাম তো, তাই আমার মন কামনায় দুবল হ'লেও বিবশ হয়নি। বিবাহ করব না স্থির ক'রে ফেলেছিলাম।

এমন সময়ে একদিন নন্দিনী আমার গানের আসর বসালো ওদের সুন্দর বাগানে—চাঁদের আলোয়। আমার গান খুব জ'মে উঠল। ঘণ্টা দুই গাইবার পর তার মা অন্য সব অতিথিদের বিদায় দিয়ে আমাকে নন্দিনীর ওদারকে রেখে ভিতরে গেলেন আমার খাবারের ব্যবস্থা করতে।

চাঁদের আলোয় ফুলবাগানে এমন পরমাসুন্দরীকে কাছে পেয়ে আমার মনে আবেশ জেগে উঠল—বিশেষ যখন পরমাসুন্দরী গাঢ়কণ্ঠে ব'লে বসলেন: "এমন কণ্ঠ কোথায় পেলেন আপনি?"

আমি হেসে বললাম: "কিন্তু তুমি তো শুনেছি কীর্তন তেমন পছন্দ করো না।"

নন্দিনী বিরস কণ্ঠে বলল: "কে বলল? মাসিমা?"

আমার পিসিমাকে সে মাসিমা ডাকত।

আমি মিথ্যা বললাম: "না। তবে লোকমুখে শুনেছি—তুমি চটকদার টপ্পা ঠুংরি গজল কাওয়ালিই বেশি ভালোবাসো।"

নন্দিনী বলল: "লোকে কী না বলে বিষ্ণুদা? তাদের তো এমন অপবাদ রটাতেও বাধে না যে আমরা মোক্ষদাকে অষ্টপ্রহর পিষে মারছি তিলে তিলে। আমরা এত আদর যত্ন করি ওকে—কিন্তু কয়লাকে কে কবে ধুয়ে শাদা করতে পেরেছে বলুন? স্বভাবে যে অকৃতজ্ঞ সে নিন্দুক আর মিথ্যুক হবে না তো কী হবে বলুন?"

আমার মনটা একটু বিমুখ হ'ল, বললাম: "কি রকম? ও তো শুনেছি কথাই কয় না।"

নন্দিনী বলল বাঁকা হেসে: "কয় না আবার! ডুবে ডুবে জল খায়। চায় নি ও এক নাগরকে ফাঁদে ফেলতে? কিন্তু ওর কথা যেতে দিন। আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।"

আমার বুকের রক্ত দ্রুত বইল: "কি?"

ও বলল: "আমাকে আপনার কয়েকটি গান শেখাতে হবে। আমি ছাড়ছি নি।"

ইতিপূর্বে পাটনায় একটি সেন্টিমেণ্টাল মেয়েকে গান শেখাতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম – মেয়েটির অন্য জায়গায় বিবাহ স্থির হ'তে সে জলে ডুবে মরতে চায়। তার উপর নন্দিনীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতায় পিসিমা বিরোধী ছিলেন তো, কে জানে হয়ত বাবাকে লিখে বসবেন এবার? মোট কথা, নন্দিনীকে গান শেখাবার লোভ জাগলেও এ নিয়ে ফের একটা গণ্ডগোল হয় এ আমি চাইতাম না সত্যিই। তাই একটু আম্‌তা আম্‌তা করে শেষে বললাম: "কিন্তু আমি শুধু কীর্তন গাই—তা আবার সেকেলে পদাবলী, জানোই তো।"

নন্দিনী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল: "আপনি যাই গান আমার কানে মধু ঢালে। আপনি যা শেখাবেন তাই শিখব আমি।" বলেই আমার দুহাত চেপে ধরল: "না করবেন না, লক্ষ্মীটি। আপনি তো মেয়েদের গান শেখান—তার উপর এখন আপনার পড়াশুনোও শেষ হয়েছে।

ওর স্পর্শে আমার অঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনে কেমন যেন একটা আশঙ্কারও ছায়াপাত হ'ল। আমি ওর মুঠো থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম: "মেয়েদের গান শেখাতাম বটে—কিন্তু···মানে··· আজকাল আর শেখাই না।"

নন্দিনী হেসে বলল: "কেন? ভয় করে?"

আমি বললাম লজ্জা পেয়ে: "ঠিক ভয় নয়, তবে—"

নন্দিনী এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল, বলল: "ভরসা পাই না—এই তো? কিন্তু আমি ভরসা দিচ্ছি যে, বিপদে

ফেলব না। শুধু গানই শিখব। না, দুটি পায়ে পড়ি আপনার—অন্তত দুতিনটি কীর্তন আমাকে শেখাতেই হবে। কথা দিন - শেখাবেন ?”

ব'লেই আমার কাঁধে মাথা রাখল। সঙ্গে সঙ্গে কী যে হ'ল ব'লে বোঝাতে পারব না—যার ঈষৎ স্পর্শেও আমার বুকে ডমরু বেজে উঠেছিল তার উষ্ণদেহের ছোওয়ায় প্রবল কামনা উঠল জেগে। ভুলে গেলাম এক সাধুর কথা “বাবা! আমাদের দুর্নাম রটেছে যে আমরা মেয়েদের মজাই—কিন্তু সত্যি কথাটা এই যে মজাবারজন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকে সব আগে ওরাই।”

কিন্তু শুধু দেবদ্রোহী শক্তিরাই যে পাকে ফেলতে হানা দেয়, তাই তো নয়, ঠাকুরের কৃপাশক্তিও আসে ত্রাণ করতে। তাই ঠিক এই সময়েই নন্দিনীর মা এসে বললেন—খাবারের জায়গা হয়েছে।

সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম হ'ল না। ওকে কাছে পেতে মন চাইছিল বৈ কি—কিন্তু নেশার আবেশ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত বুদ্ধির ধুক্তিকে কু ব'লে চিনতে পারলাম—আর অমনি শুভবুদ্ধি ব'লে উঠল: “না না না, উপযাচিকাকে প্রশ্রয় দিলে ডুববে। “উপযাচিকা” মনে হতেই কি একটা অশুচিভাব যেন মনকে বাড়ি মারে। যা চাই তাকে বেশি কাম্য মনে হয় যখন তাকে ছুঁতে পেরেও ধরতে পারি না। উল্টোদিকে যে নিজে থেকে গায়ে ঢ'লে পড়ে তার বাঞ্ছনীয়তা কমে যায়ই যায়—যদি না অবশ্য মানুষ কামনার সঙ্গে মাতাল হয়ে উঠে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারায়। আমার সে-অবস্থা হয় নি। সবে গোলাপী নেশা জ'মে উঠছিল—এম্‌নি সময়ে এ কী বেসুরার উৎপাত।

মন অধীর হ'য়ে উঠল। তাছাড়া নারী সম্পর্কে আমার দুর্বলতা থাকলেও বলেছি—আমি চাইতাম না স্বৈরিণীর হাতের খেলার পুতুল হ'য়ে শেষটায় দশচক্রে ভগবান্ ভূতের অবস্থা—কি না ঘোর সংসারী। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দুঃখ পেয়েছি প্রচুর, কিন্তু হারমানার মুখেও আশ্চর্য ভাবে বেঁচে গেছি বারবার—বিশেষ ক'রে বহু সাধুসঙ্গের সঞ্চিত পুণ্যফলেই বলব। সে সব ঘটনা ফলিয়ে বলতে গেলে একমাসেও কুলুবে না তাই শুধু এই পর্বেরই ইতি করি আরো কয়েকটি উপলব্ধির খবর দিয়ে।

সেদিন রাত্রে আমি নানাদিক থেকেই মনকে যাচিয়ে নিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম তিনটি সত্য; এক, শুধু আমার নিজের মনের জোরে আমি আমার শুভ সংকল্পে অটল থাকতে পারব না; দুই, নন্দিনীর আহ্বান একবার উপেক্ষা করলেও দুর্বলতা ফের আমাকে পেয়ে বসলে ঠেলতে পারব কিনা সন্দেহ: তিন, পালিয়ে আত্মরক্ষা করব ভাবতেও পৌরুষের অভিমানে বিষম লাগে। কাজেই এ-সমস্যার একমাত্র সমাধান: রক্ষাকবচ চাই—অর্থাৎ গুরুকরণ: যে-ক'রেই হোক দীক্ষা এবার আমাকে নিতেই হবে। সাধনা নেব এ তো আমি ঠিকই করেছিলাম, কেবল গুরুর মত গুরু পাই কোথায়—এই ছিল দুর্ভাবনা। কিন্তু শুনেছিলাম সময় হ'লেই গুরু আসেন, আর সময় আসে চাওয়ার মত চাইলে তবেই। তাই ঠিক করলাম—প্রার্থনা করতেই হবে সদ্‌গুরুর জন্যে। শুধু এ-সাধু ও-সাধু ক'রে বহূদক হ'লে চলবে না, হ'তে হবে স্থিতধী কুটীচক। আর কুটীচক গুরুর খুঁটি বিনা হ'তে পারে কে? এই সূত্রে দেখতে পেলাম আরও একটা আশ্চর্য জিনিষ: যে, যে-দেবদ্রোহী শক্তিরা রূপমোহে মত্ত ক'রে আমার সাধনার আদর্শ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল তারা আমাকে পাকে ফেলতে গিয়েই হ'য়ে দাঁড়ালো মুক্তিদিশারি—দেখিয়ে দিল যে, গুরু বিনা গতি নাই! করুণার নামই তো অঘটন ঘটানো।

পনেরো

বিষ্ণুঠাকুর (গাঢ়কণ্ঠে): আমি পরদিন গঙ্গাস্নানে গিয়ে অনেকক্ষণ কৃষ্ণনাম জপ করলাম, শেষে প্রার্থনা করলাম চোখের জলে: “গুরু বিনা যদি আমার পতন হয় তবে গুরুর কাছে আমায় পৌছে দাও প্রভু!”

প্রার্থনার পরে চোখ খুলতেই দেখি—এক জ্যোতির্ময় দিব্যকান্তি জটাজূটধারী মহাপুরুষ! তিনি আমাকে ইসারা করলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁর পিছু পিছু গিয়ে তাঁর কুটীরে পৌছতেই তিনিববললেন: তিনি ফের যাবেন মানস সরোবরে—শুধু তিনটি শিষ্যকে দীক্ষা দিতে তাঁর কাশীতে আসা। তাঁর রামনগরের আশ্রমেই থাকবেন তিনি আট মাস। শেষে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন: “অবিশ্বাস কোরো না বাবা,

মনে রেখো গীতার কথা যে, শ্রদ্ধাবান্‌ই জ্ঞানের অধিকারী হয়।"

তাঁর জাদুস্পর্শে মুহূর্তে আমার সব সংশয় গ'লে আলো হ'য়ে গেল। কৃতজ্ঞ চোখের জলে বললাম তাঁকে সব কথা—কিছুই না লুকিয়ে। তিনি বললেন মৃদু হেসে: "জানি বাবা! আর তাই তো তোমাকে শক্তিদীক্ষা দিতে এসেছি।" ব'লে আমার কানে মন্ত্র দিলেন। আমার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে এক অসহ বিদ্যুৎপুলক ব'য়ে গেল। আমি সম্বিৎ হারালাম।

সম্বিৎ ফিরে এলে পর আমি ধীরে ধীরে গুরুদেবকে বললাম সব কথা। তিনি হেসে বললেন—তিনি সব দেখতে পেয়েছেন। অনেক কিছু ব্যাখ্যা ক'রে শেষে বললেন: নন্দিনীকে আমার কাছে পাঠিয়েছে দেবদ্রোহী শক্তিরা আমার সাধক জীবনকে ধ্বংস ক'রে দিতে। তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতেই হবে। কিছুদিনের জন্যে বদরী-নারায়ণে তাঁর আশ্রমে থাকলে মনের জোর ফিরে পাব—ইত্যাদি। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "বদরীতে অনেক কিছু দেখতে পাবে যা অভাবনীয়" কিন্তু পিতৃদেবের মত নিতে গেলে সব পণ্ড হবে, কারণ তিনি কিছুতেই মত দেবেন না—যেতে হবে পালিয়ে 'এক কাপড়ে' যাকে বলে।

হিমালয়ের নানা তীর্থদর্শনের ইচ্ছা আমার অনেকদিন থেকেই ছিল, কাজেই মহা উৎসাহে পরদিনই ধরলাম হরিদ্বারের ট্রেন। সেখান থেকে বাসে যাব বদরীনারায়ণ। পিতৃদেবকে তার করলাম লক্ষ্ণৌ থেকে: "মাসতিনেক হিমালয় ঘুরে পাটনায় ফিরব আমার জন্যে যেন খোঁজাখুঁজি না করা হয়।"

প্রায় তিনমাস বদরীনারায়ণ কাটিয়ে যখন পাটনায় ফিরলাম বাবা সাগ্রহে বুকে টেনে নিলেন। মা কেঁদে সারা। সে এক সীন! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে সন্ন্যাসী না হয়ে! কী আনন্দ! ধুম পড়ে গেল। বাবা মাকে বললেন: এবার ছেলের বিয়ে দিতে হবেই হবে। আর গড়িমসি নয়।

আমি তাঁকে এতদিন বলি নি আমার গুরুদেবের কথা। কিন্তু বিবাহের প্রসঙ্গ উঠতে বলতেই হল যে গুরুদেবের অমতে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বাবা শুনে বিষম রেগে গেলেন। গুরু ফুরু বুঝি না। আমার কথা শুনতেই হবে।

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে সেইদিনই রাতের ট্রেন ধ'রে পরদিন সকালে হাজির হলাম রামনগরে গুরুদেবের আশ্রমে। তিনি বললেন বিবাহ আমাকে করতে হবে বটে, কিন্তু কবে ও কাকে তিনি পরে বলবেন। আরো অনেক কথা বলে শেষে বললেন: "তুমি এখন কিছুদিন আমার কাছেই থাকো—কিন্তু তোমার পিসিমাকে খবর দিও না যে তুমি এসেছ কাশীতে!"

আমি একটু দুঃখিত হলাম বৈ কি, কিন্তু মনে মনে সত্যিই তো চাইতাম আমার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে তাই গেলাম না পিসিমার ওখানে। কে জানে নন্দিনী যদি ফের চেপে ধরে—ভয়ও করে আবার লোভও হত। বলতে গুরুদেব হেসে বলেছিলেন: "বাবা, যেখানে মন বেশি দুর্বল সেখানে প্রলোভনকে দূরে রাখাই বিধি। যেখানে বুকে জোর নেই সেখানে বজ্রধ্বজ বিরাটবক্ষ ব্রহ্মচারীর ভঙ্গি করা মূঢ়তা। তাছাড়া তুমি জানো না তো—গুরুমন্ত্র নেবার পরে কতরকম অভাবনীয় অনর্থ এসে বাদ সাধে। তাই এখন শুধু সাধনা ক'রে চলো যাতে সেই কৃষ্টিলাভ করতে পারো। নৈলে শুধু যে বিপদ কাটবে না তাই নয়—আরো বিপদে পড়বে জেনো। কারণ তুমি না জানলেও আমি জানি যে, তুমি সাধনা নিয়েছ ব'লেই বিরুদ্ধশক্তিরা আরো জোট বেঁধেছে তোমার তপোভঙ্গ করতে। বাবা, অপ্সরারাও এই সব শক্তির চর হ'য়েই আসত মুনিঋষিদের যোগভ্রষ্ট করতে—এ রূপকথা বা কবিকল্পনা নয়—অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"

আমি একটু দমে গিয়ে বললাম: "কিন্তু সাধনাই যদি আমার স্বধর্ম হয় তবে আমাকে বিবাহ করতে হবে কেন গুরুদেব? মোর সংসারী হ'তে আমার বিষম ভয় করে।" গুরুদেব হেসে বললেন: "সাধনা নেবার পরে সাধককে সব আগে শিখতে হয় একটি জিনিষ—স্বেচ্ছাবিহারের নির্দেশে চলতে না চেয়ে গুরুর ইচ্ছাকেই বরণ করতে। আমি তোমাকে তোমার চেয়ে অনেক বেশি চিনি, তাই বলছি যে, তুমি বিবাহ না ক'রে সাধনা করতে পারবে না—গৃহী হ'য়েই তোমাকে যোগসিদ্ধ হতে

হবে। কিন্তু কী হবে বা হওয়া উচিত এসব জল্পনা-কল্পনা নিয়ে মিথ্যে ভেবেচিন্তে এ-প্রশ্নের কোনো কূলকিনারা হবে না জেনো। তাই আত্মসমর্পণের মন্ত্র জপ ক'রে—পরমহংসদেবের ভাষায়—বেচারী গুরুকেই বকল্‌মা দিয়ে দেখ না একবার—পরিণাম শুভ হয় কি না। তাছাড়া তুমি তো সংস্কৃতে পণ্ডিত, মহাভারতের ভক্ত, মনে নেই ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে কী বলেছিলেন: 'পর্যায়যোগাৎ বিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ' * তাই তুমি এখন থেকে পণ নেও—ঝোঁকের মাথায় চলা ছেড়ে দেবে। কোন্ পথে কী ভাবে সিদ্ধিলাভ হবে সে-দুর্ভাবনা রেখে, ঠাকুরকে ডেকে ও গুরুবাক্য মেনে শুধু নিজের চিত্ত-শুদ্ধির দিকে ষোলো আনা মন দাও—বুঝলে?"

আমি ঠিক খুসি হ'তে না পারলেও গুরুর কথা শিরোধার্য ক'রে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলাম। কিছুদিন পরে পাটনায় ফিরে গেলাম। মা বাবা পাছে বেশি বললে আমি বিবাগী হয়ে যাই এই ভয়ে আমাকে আর বিবাহ করতে বলতেন না। আমি নিজের মতন থাকতাম —তাঁরা বাধা দিতেন না। কোথাও যেতাম না—শুধু মাঝে মাঝে রামনগরে যেতাম গুরুসঙ্গ ও তাঁর নির্দেশ পেতে। ফলে সাধনায় বেশ মন ব'সে গেল—গুরুর কৃপায়ই বলব। নৈলে হঠাৎ একলা হ'তে পারলাম কেমন ক'রে?

ষোলো

বিষ্ণুঠাকুর (একটু চুপ ক'রে থেকে): এখানে ফের একটু পিছিয়ে গিয়ে বলতে হবে, নন্দিনীদের কাহিনী—যা পরে শুনেছিলাম মোক্ষদার মুখে।

আমি হঠাৎ পিসিমার ওখান থেকে কাউকে না ব'লে নিরুদ্দেশ হ'তে পিসিমা ব্যস্ত হ'য়ে বাবাকে তার করেন। তিনি উদ্বিগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নিরুপায় হ'য়ে শান্ত সুরেই পিসিমাকে আমার টেলিগ্রামের খবর জানিয়ে আশ্বাস দেন যে, আমি হিমালয়ে ঘুরতে বেরিয়েছি, মাস তিনেক বাদে ফিরব কথা দিয়েছি, খোঁজ ক'রে ফল নেই।

আমি চ'লে যেতে নন্দিনী রাগে জ্বালায় ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠল। তার মাও বলা সুরু করলেন যে, মোক্ষদাই গোপনে চিঠি লিখে আমার মন ভাঙিয়েছে। ফলে হ'ল এই যে—এর পরে তিনি ওকে পিসিমার সঙ্গেও আর দেখা করতে দিতেন না—কেবল ঘরের কাজে নির্দয়ভাবে খাটাতেন দাসীর মতন।

এম্‌নি সময়ে এলো অর্ধোদয় যোগ। আমি পাটনা থেকে গেলাম ফের রামনগরে গুরুদেবের আশ্রমে। ওদিকে নন্দিনীর মা মেয়েকে নিয়ে গেলেন গঙ্গাস্নানে। কিন্তু যাবার আগে মোক্ষদাকে রেখে গেলেন তার শোবার ঘরে তালা চাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে।

ও আর সইতে পারল না। ঠিক করল গঙ্গায় ডুবে মরবে। বিছানার চাদর ছিঁড়ে ঝুলিয়ে দিয়ে সেই দড়ি বেয়ে জানলা টপ্‌কে রাস্তায় প'ড়ে সোজা এল দশাশ্বমেধ ঘাটে।

এদিকে গুরুদেব আমাকে বললেন—দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে। তখনও তত ভিড় জমে নি। তাই সহজেই চোখে পড়ল মোক্ষদা গঙ্গাজলে হাতজোড় ক'রে প্রার্থনা করছে চোখ বুঁজে—দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে···শুনতে পেলাম না ও মৃদুস্বরে কী বলছে, কিন্তু ওর চিন্তার ছবি ভেসে উঠল হঠাৎ আমার মনে—যাকে তোমরা বলো টেলিপ্যাথি। কিছুদিন যোগ করবার পরেই আমার মনে সময়ে সময়ে এর ওর তার চিন্তা উঠত ভেসে—কখনো কখনো দূরের অনেক ঘটনাও পরিষ্কার দেখতে পেতাম। কাজেই আমি অকুণ্ঠেই ওর হাত চেপে ধরলাম দশাশ্বমেধ ঘাটে—তত লোক হয়নি ব'লে একটু সুবিধাও হ'ল কথা বলবার। "না, জেনে শুনে পাপ করলে মা কোলে টেনে নেন না। তাছাড়া তুমি মরবে কেন? আত্মহত্যা মহাপাপ।"

ও আমার পানে তাকিয়েই দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। পরে বলল মুখ তুলে ধরা গলায়: "না, আমি বাঁচতে চাই না। আমি অপয়া অলক্ষ্মী—যেখানেই যাই আসে অশান্তি। আমার মরাই ভালো। মা গঙ্গা আমাকে নিন আজ। আমি পালিয়ে এসেছি। আমার আর কোথাও ঠাঁই নেই।" আমি ওর কবজি দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধ'রে বললাম: "আছে। আমার

* যে ভাবে ঘটবার বিধাতাই তার বিধান করেন—মানুষ সব কিছুই পায় যথাপর্যায়ে।

গুরুদেবের আশ্রমে। এসো।" গুরুদেবের আশ্রমের কথা এত জোর দিয়ে কেন বললাম কে বলবে ?

সতেরো

বিষ্ণুঠাকুর (ধরা গলায়) : গুরুদেব ওকে দেখেই গভীর স্নেহে ব'লে উঠলেন : "এসো এসো মা, আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।" ও আশ্চর্য হ'য়ে বলল : "আমি·· আমি আসব আপনি জানতেন ?" গুরুদেব হেসে বললেন : "হ্যাঁ মা, এবং আরো অনেক কিছু জানি, শুধু তোমার অতীত জীবনের নয়—তোমার ভবিষ্যৎ জীবনেরও। তাই বলছি—তোমার শুধু যে দুঃখের রাত কেটে গেছে তাই নয়, ভবিষ্যতে তুমি অনেকেরই দুঃখের রাতে উষা হ'য়ে এসে দাঁড়াবে।"

শুনেই ও তাঁর পায়ে মাথা রেখে ভেঙে পড়ল। শুধু কান্না আর কান্না।

তারপরে কত কী যে ঘটল বাবা—সে সব বলার সময় নেই। কেবল মনে পড়ে একটি সাহেবি প্রবচন: "Truth is stranger than fiction" আর সে যে কী সব অঘটন—পরে বলব একদিন ফলাও করে। এখন বাকিটুকু বলি শোনো—যতটা পারি সংক্ষেপেই বলব।

মোক্ষদাকে আমি গুরুদেবের আশ্রমে নিয়ে তুলেছিলাম খানিকটা বাধ্য হ'য়েই বৈ কি। কারণ বলাই বাহুল্য যে, ওকে নিয়ে বাবার কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না—পিসিমার কাছে তো নয়ই। কিন্তু গুরুদেবের কাছে পৌছতেই তিনি ওরই অপেক্ষা করছিলেন—একথা শুনে আমি থ হ'য়ে গেলাম। গুরুদেব তারপরে বললেন অনেক কথা প্রায় একঘণ্টা ধ'রে—কী ভাবে দুঃখ আমাদের খেই ধরিয়ে দেয় অমৃতলোকের, কোন্ পথে গুরু শক্তি পান ইষ্টের কাছ থেকে, বড় আধার কাকে বলে, আর কেন বড়কে আরো বড় হ'তে হ'লে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—এই ধরণের সে যে কত চমৎকার চমৎকার কথা! সবশেষে বললেন : "আর একটি রহস্যের শুধু আভাষ দিয়েই থামব মা! এ দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা পেতে হ'লে যা চোখে দেখা যায় না তার অন্ততঃ কিছুটার খবর পাওয়া দরকার—যাকে বলা যেতে পারে নেপথ্যতত্ত্ব জটলা। আমরা, যোগীরা, তাদের ক্রিয়াকলাপ ও গতিবিধির খবর রাখি ব'লে এজগতের অনেক কিছুর শুধু যে ভাষ্য করতে পারি তাই নয়, এ জ্ঞানের আলোয় তাদের অনেক কালের পাল্টা চাল চেলে বাজি জিৎতে পারি। তাই আমি বিষ্ণুকে পাঠিয়েছিলাম দেখতে পেয়েছিলাম ব'লে যে, তুমি লক্ষ্মী মা আমার দশাশ্বমেধ ঘাটে জলে ডুবে মরতে আসছ। নেপথ্যশক্তিরা তোমাকে মারতে চেয়েছিল কেবল এই জন্যেই নয় যে, তুমি বড় আধার—এজন্যেও বটে যে, তোমার সঙ্গে বিষ্ণুর শুভদৃষ্টি হ'লে সে-মিলনের ফলে তোমাদের উভয়ের সাধনার সিদ্ধিও সমৃদ্ধ হবে এবং তার ফলও হবে ব্যাপক। একথা তোমরা জানো না—কিন্তু নেপথ্যশক্তিরা হাড়ে হাড়ে জানে ব'লেই চেয়েছিল যাতে তুমি মরো এবং বিষ্ণু নন্দিনীর ফাঁদে পড়ে। অবিশ্যি, বিষ্ণুর দুর্বলতার ছিদ্র দিয়েই তারা এসেছিল ও নন্দিনীকে ঠেলেছিল তার দিকে। কিন্তু শুধু তারাই যে কিস্তি দিতে পারে তা তো নয়, সাধুরাও পারেন—আর বিষ্ণু সাধুসঙ্গ চাইত ব'লে এবং তুমি তার শক্তি হবে ব'লে তাঁদের আশীষশক্তি তোমাদের রক্ষা করবার খানিকটা সুযোগও পেয়েছিল। এই ভাবে আবহমানকাল তাঁর লীলার বিকাশ হয়ে এসেছে প্রতি মানুষের মনের কুরুক্ষেত্রে দৈবী ও আসুরী শক্তির লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। আর যেখানেই দৈবী শক্তিরা বেশি প্রকট হয়, সেখানেই আসুরিক শক্তিরাও আরো জোট বেঁধে হানা দেয় বাদ সাধতে যুক্তি, তর্ক, নিরাশা, অবিশ্বাস, মোহ, বিজ্ঞতা, অভিমান, আত্মপ্রসাদ আরো কতরকমের মুখোশ প'রে। কিন্তু শেষমেশ তাদের হার হয়ই হয়—যদিও প্রথম দিকে তারা জেতে অনেক সময়েই। তাই উপনিষদে বলেছে : 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' - অর্থাৎ জগতে আখেরে সত্যের দেবদূতরাই বাজি জেতেন, মিথ্যার চরেরা নয়।' এসব তোমাদের বলছি আজ শুধু একটি উদ্দেশ্যে : তোমাদের এ মিলন ঠাকুর চান ব'লেই এই মিথ্যার চরেরা চায় ভাংচি দিতে। তাই তোমাদেরও অবহিত হ'তে হবে—তাদের ফুশলানিতে কান দিলে চলবে না—আর জিৎতে হলে আত্মসমর্পণ করতে হবে ঠাকুরের কাছে—চলতে হবে গুরুর নির্দেশে। কারণ কেবল তাহলেই বাধারা বাদ সাধতে

দিতে চেয়ে দেবে আরো এগিয়ে। কারণ প্রাণলীলার যত সত্য আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্য হ'ল এই যে, ঠাকুরের হাতে লাগাম দিলে তিনি রথ চালাবেন—যে-পথে ধর্ম ডাকে, জয় নিশ্চিত আর সিদ্ধির ফল ফলতে বাধ্য: অর্থাৎ, সার্থক পরার্থ নিষ্ঠায়।"

গুরুদেব একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। মোক্ষদার সঙ্গে তাঁর আশ্রমেই আমার বিবাহ দেবেন স্থির করবার সঙ্গে সঙ্গেই একের পর এক বাধা এসে পথ আগলে দাঁড়ালো। প্রথম পিতৃদেবকে লিখতেই হ'ল এবার যে, গুরুদেব আমার ভার নিয়েছেন, আমি স্থির করেছি—দিন পনেরো বাদে গুরুদেবের আশ্রমেই মোক্ষদাকে বিবাহ করব। তিনি তৎক্ষণাৎ পিসিমাকে টেলিফোন করলেন আশ্রমের ঠিকানা দিয়ে ও বললেন যেকোনো উপায়ে এ বিবাহ ঠেকাতেই হবে। পিসিমা মোটর পাঠালেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে। ঠিক সেই সময়ে গুরুদেব আমাকে আশ্রমে রেখে গিয়েছিলেন প্রয়াগে এক শিষ্যের মৃত্যুশয্যায়। যাবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন দুতিন দিন বাদেই ফিরবেন ও তারপরের পূর্ণিমায় আমাদের বিবাহ দেবেন। আমি পিসিমার সারথির হাতে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম যে, গুরুদেবের অনুমতি না নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারব না। চিঠি পেয়ে এবার তিনি নিজেই ছুটে এলেন। মোক্ষদা ঠিক সেই সময়ে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল। পিসিমার সুবিধা হ'য়ে গেল, আমাকে একলা পেয়ে বললেন —পিতৃদেব টেলিফোনে তাঁকে বলেছেন এ-বিবাহে তাঁর মত নেই। আমি বললাম: "তাঁর মত হবে না আমি জানতাম।" পিসিমা তখন কেঁদে ফেলে আমার হাত ধ'রে বললেন: "ওরে, বাপের মনে কষ্ট দিতে নেই, লক্ষ্মী বাবা আমার! এমন কাজ করিস নে।" আমি বললাম: "তুমি কী বলছ পিসিমা? মোক্ষদাকে আমি কথা দিয়েছি যে!" পিসিমা এবার রেগে উঠে শাপমন্যি দেওয়া সুরু করলেন। বললেন: "আমি জানি ঐ অলক্ষ্মীই যত নষ্টের মূল—" বলে যা মুখে আসে তাই ব'লে ওকে গালমন্দ করা সুরু করলেন। আমি কানে আঙুল দিয়ে বললাম: "ছি ছি, ও নিষ্কলঙ্ক মেয়ে—তুমি তো নিজেই বলতে। পিসিমা বলতেন: "আমার ভুল হয়েছিল। নন্দিনী ঠিকই বলত: 'ও ডুবে ডুবে জল খায়। ও এক স্বামীকে খেয়েছে তোকেও খাবে।" ব'লে ফের কান্না সুরু করলেন: "লক্ষ্মী বাবা আমার—কথা রাখ্—ওকে ছাড়। তোর জন্যে কত ভালো ভালো মেয়ে পথ চেয়ে আছে। 'তুই কেন এমন অপয়া বিধবাকে বিয়ে করতে যাবি?" আমি মুস্কিলে পড়ে বললাম: "ও গঙ্গায় ডুবে মরতে এসেছিল পিসিমা। ওর ভার নিয়েছি আমি! ওর আর তো ঘরে ফিরবার পথ নেই—" পিসিমা বাধা দিয়ে বললেন: "ওর ভার আমি নেব কথা দিচ্ছি—যদি ও তোকে ছেড়ে দেয়।" ব'লে তিনি চোখে আঁচল দিয়ে বললেন: "তোর মা লিখেছেন—তুই বিধবা বিবাহ করলে তিনি বিষ খাবেন। এমন পাপ-কর্ম করিস নে বাবা।" তখন আমি প্রথম দুর্বল বোধ করলাম, বললাম: "আচ্ছা পিসিমা, গুরুদেব ফিরে আসুন, সব কথা তাঁকে জানিয়ে তোমাকে বলব—মানে যদি তোমার প্রস্তাবে তিনি রাজী হন।"

আঠারো

বিষ্ণুঠাকুর (একটু হেসে): পিসিমা চ'লে যাবার পর সত্যিই ভাবনায় পড়লাম। কারণ আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি যে পিসিমা মিথ্যা বলতে পারেন। তাই বিশ্বাস করেছিলাম তাঁর কথা যে, মা বলেছেন আমি এ-বিবাহ করলে তিনি বিষ খেয়ে মরবেন।

মোক্ষদা গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে আমার মুখ দেখেই ভয় পেয়ে গেল। বলল: "কী হয়েছে?" আমি বললাম: "কিছু না।" ও বলল: "রাস্তায় মাসিমার মোটর দেখলাম। তিনি আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কী হয়েছে বলো। কিছু লুকিয়ো না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।" অগত্যা তখন সব কথা বলতে হ'ল। শুনে খানিকক্ষণ ও গুম্ হ'য়ে রইল, তার পরে বলল: "না। আমি এর পরে কিছুতেই তোমাকে বিবাহ করব না। মাসিমা সত্যিই বলেছেন—আমি অলক্ষ্মী অলক্ষ্মী অলক্ষ্মী—তাই যেখানেই যাই, আসে অমঙ্গল অশান্তি।" ব'লেই ভেঙে পড়ল কান্নায়: "কেন আমাকে বাঁচালে তুমি? কেন আশ্রয় দিলে আমার মতন অলক্ষ্মীকে? কেন কেন কেন?"

(একটু হেসে) কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তিরাই তো একমাত্র সত্য নয় বাবা। তার চেয়েও বড় সত্য হ'ল ঠাকুরের কৃপা, গুরুর প্রসাদ। হল কি, গুরুদেবের শিষ্য তাঁর প্রসাদে

সেরে ওঠাতে তিনি ফিরে এলেন—আর ঠিক এই সময়েই।

সব শুনে গুরুদেব মৃদুহেসে ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন: "তুমি অলক্ষ্মী নও মা, লক্ষ্মীপ্রতিমা। আরো বড় কথা—তুমি বিষ্ণুর শক্তি।" ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "তোমার মা বিষ খেয়ে মরবেন বলেছেন—একথা সম্পূর্ণ বানানো বাবা। কিন্তু এসবও অবান্তর। আসল কথা হ'ল—ঠাকুরের নির্দেশ, তাকেই তোমাদের মেনে চলতে হবে দীক্ষা নেওয়ার পরে। আর আমি তোমাকে বলছি—ঠাকুরের নির্দেশ এই যে, তুমি বিষ্ণুর সহধর্মিণী হ'লে ও শুধু যে গৃহী যোগী হ'য়ে কৃতকৃত্য হবে তাই নয়—বহু লোককে দিশা দেবে পরম সার্থকতার।"

মোক্ষদা মুখ তুলে বলল: "কিন্তু গুরুদেব, উনি বাপের ত্যাজ্যপুত্র হ'লে আমাদের চলবে কী ক'রে? গুরুদেব হেসে বললেন: "মা, ঠাকুরের 'পরে যে নির্ভর করে তার চলাচলের ভারও তিনিই নেন। এ শুধু আমার কথা না—গীতায় বলেছেন তিনি নিজে। তাই বলছি: তোমাদের সংসার রথের চাকা অচল হবে না—নিশ্চিন্ত থাকো। আর আপাততঃ বিবাহের পরে তোমাদের যোগজীবন সুরু হবে আমারি আশ্রমে—এই তাঁর নির্দেশ। তার পর তোমাদের কখন কী করতে হবে, কী ভাবে চলতে হবে আমি ব'লে দেব।" ব'লে আমাকে বললেন: "অবশ্য যদি গুরুশক্তিতে আস্থা না থাকে, কি গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হয় তো চলো। তোমার নিজের ইচ্ছায়—এ মা-টির ভার আমিই নেব।"

আমার বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর দুলে উঠল, গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে বললাম: "এই গঙ্গার সামনে শপথ করছি গুরুদেব যে আপনার নির্দেশেই চলব এখন থেকে।"

প্রহ্লাদ (উদ্দেশে প্রণাম ক'রে): ধন্য আপনি!

বিষ্ণুঠাকুর (একটু চোখ বুঁজে থেকে): না বাবা, ধন্য আমি নই। আমি সেসময়ে যে কী দুর্বল ছিলাম জানো না তো। ধন্য বলো সেই গুরুশক্তিকে, যে এই দুর্বলের বুকেও আত্মসমর্পণের বল সঞ্চার করেছিল। ধন্য তাঁর দৃষ্টিশক্তি—যার আলোয় তিনি যে শুধু পথের দিশা দিতেন তাই নয়—সে-আলোয় দেখিয়ে দিতেন আমাদের পদে পদেই—আমরা কী ভাবে না জেনে এই নেপথ্য-শক্তিদেরই বাহন হয়ে চলি, কেন মোক্ষদাকে আমার কাছছাড়া করার স্বপক্ষে এতশত প্রাজ্ঞ যুক্তি বন্ধুভাবে এসে আমাদের মন ভাঙাতে চাচ্ছে। কিন্তু সে পরের কথা, বলব আর একদিন। আজ বলি তার পর কী হ'ল।

(একটু হেসে) আবার দুজনে তাঁকে প্রণাম করে উঠে বসার পরে তিনি বললেন আমাদের মাথায় হাত রেখে: "বাবা, একটু কথা নিশ্চয় জেনো: যে, যদি মোক্ষদা বড় আধার না হ'ত, যদি সে তোমার যোগ সাধনার সহায় না হ'ত, তবে দেবদ্রোহী ব্যক্তিদের মহলে তাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার এতশত চেষ্টা নাট্যরঙ্গ ঈর্ষাদ্বেষ ক্রোধ কেঁপে উঠত না—এত ঢিঢিক্কার পড়ত না—বন্ধুরাও মুখ ফেরাত না—তোমাদের নিরাশ্রয় করবার ভয় দেখিয়ে।

(একটু থেমে) কিন্তু দিনে দিনে শুধু যেএই দেবদ্রোহী শক্তিদের লীলাখেলাই প্রত্যক্ষ করতাম তা নয় বাবা। এই সূত্রে আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করতাম পদে পদেই যে, আমাদের ধারণ ক'রে আছে ঠাকুরের অদৃশ্য কৃপা প্রত্যক্ষ গুরুশক্তির বজ্রমুষ্টি দিয়ে। সেবিচিত্র লীলার কাহিনী আর একদিন বলব। আজ শুধু আর একটু বলবার আছে: সেটা এই যে, কৃপা এসেও আসে না—আমরা তাকে ধুলো পায়েই বিদায় করতে চাই ব'লে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) বাবা, এমনিই আমাদের স্বভাব যে, কৃপা যদি উঁকিও মারে খিড়কি দোরে, তো আমরা সিংদরজা খুলে ডাক দিই কৃপার বিরুদ্ধে ব্যূহবদ্ধ আসুরিক শক্তিদের। মানুষের চরিত্রের মধ্যে এ-আত্মবিরোধের কবে কিনারা হবে কে বলবে?

[ক্রমশঃ

মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী

প্রাতঃস্মরণীয় মহান্‌-সন্ন্যাসী স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মানসপুত্র তপোমূর্ত্তি আনন্দপীঠাচার্য্য মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ আর ইহলোকে নাই। বিগত ৫ই অক্টোবর, ১৯৬২ তারিখে মহাসপ্তমী তিথিতে শেষ রাত্রি ৫টা ১৫ মিনিটের সময়ে সজ্ঞানে প্রণব জপ করিতে করিতে নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলীন হন। ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের প্রথম প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি দীর্ঘকাল আশ্রমের সাধুসেবা, দেব সেবা ও গোমাতা সেবায় ব্রতী ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটি ছিল কর্ম্মময় এক উজ্জ্বল আদর্শপূর্ণ। তিনি ছিলেন মহান্‌ আদর্শের প্রতীক। মুখে বলার চেয়ে কর্ম্মের দ্বারা আদর্শ প্রচারের ছিলেন পক্ষপাতী। তাই সর্ব্বদা তাঁহার বাক্যে ও কর্ম্মে ছিল গরমিলের অভাব। ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের সকল প্রকার উন্নতির মূলে ছিলেন তিনি ও তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ।

বঙ্গজননীর প্রথম সুসন্তানরূপে তিনিই পরমহংস সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শিরোমণি মণ্ডলেশ্বরপদ অলঙ্কৃত করেন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি বিদেহ মুক্ত হওয়ায় একটি প্রায় শতাব্দীর ইতিহাসের অবলুপ্তি ঘটল। স্মৃতির পৃষ্ঠায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখার চেষ্টা মন্দমতির পক্ষে একটি অপ-প্রয়াস মাত্র। ধরা না দিলে যাঁহাকে ধরা যায় না—বোঝা যায় না, তাঁহাকে প্রকাশের চেষ্টা বালসুলভ চপলতা আর কি?

জীবনমাত্রেই মৃত্যুভয়ে ভীত। কিন্তু "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"—যাঁহারা ভাবেন তাঁহারা সাধারণের বোধগম্যের বাহিরে। অল্পবুদ্ধি পুরাণো ক্ষয়িষ্ণু তুলাদণ্ডে মাপিতে যাইলে তাঁহার মূল্য হ্রাস করিয়া ফেলার সম্ভাবনা অধিক। অন্তিম দিন পর্য্যন্ত ভাবেতে ও শাস্ত্রোক্ত বিধিতে অচল ও অটল থাকিয়া অনেকের তথাকথিত পাণ্ডিত্যে মুদ্‌গরাঘাত করিয়াছেন তিনি। অকপট জিজ্ঞাসুর নিকট তিনি ছিলেন কুসুমাদপি কোমল; আর পাষণ্ডের নিকট বজ্রাদপি কঠোর।

সন ১২৭৮ সালে ২৭শে ফাল্গুন শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহাকুমার অন্তর্গত পাথরাইল গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম পরেশচন্দ্র। পাথরাইল টাঙ্গাইল হইতে চারিমাইল দক্ষিণে অবস্থিত। তাঁহার পিতামহ ৺রামরুদ্র লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পাবনা জেলার অন্তর্গত সাটিয়া গ্রামের বসতবাটী যমুনার গর্ভে বিলুপ্ত হইলে পাথরাইলে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—ঈশানচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র। ঈশানচন্দ্র একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। পত্নী-বিয়োগের পর হইতে তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। তিনি নিরামিষভোজী, একাহারী ও একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। কনিষ্ঠ গিরীশচন্দ্র স্বগৃহে টোল স্থাপন করিয়া ১৫।২০ জন বিদ্যার্থীর অধ্যাপনা কার্য্য করিতেন। ইনিই পরেশচন্দ্রের পরমপূজ্য পিতৃদেব। তাঁহার চারিপুত্র—যোগেশচন্দ্র, পরেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, ও দুর্গেশচন্দ্র। মাতা শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণা ও শীলস্বভাবযুক্তা দয়ালু মহিলা। ৺গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় ইংরাজী—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

পরেশচন্দ্র ময়মনসিংহ জেলাস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই ছাত্রজীবনেই তাঁহার সহিত ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামের নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, পরবর্তী কালের স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তিনি পরেশচন্দ্র হইতে নিম্ন-শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। অনন্তর পরেশচন্দ্র রাজসাহী কলেজে এক বৎসর অধ্যয়নের পর কলিকাতা সিটি

কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে তিনি এফ-এ পাস করেন।

এফ-এ পাস করিবার পর তাঁহার বিবাহ হয় পাবনা জেলার সাপল্লার ৺কাশীশ্বর রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বনমালা দেবীর সহিত। পরবৎসর স্ত্রী বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার পাবনা জেলার পেঙ্গুয়ার ৺ব্রজসুন্দর মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। তাঁহার চারিটি কন্যার জন্ম হয়। তাঁহাদের মধ্যে দুইটির বিবাহ ঘটে ও দুইটি অকালে পরলোকগমন করেন।

তাহার পর তিনি কাশীমবাজারের মহারাজা ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সহায়তায় পি-এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতে থাকেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে লক্ষ্ণৌতে ডেড্‌-লেটার অফিসে চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কয়েক মাস পরে উক্ত চাকরি পরিত্যাগ করিয়া 'আউধ'-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে' অফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলায় যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত রেলের চাকরিও ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার দ্বারাই তাঁহার সাধু মহাত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সৎসঙ্গপ্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে তিনি লাহোর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে হরিদ্বারে প্রথম আগমন করেন। তিনি ছিলেন লাহোর কংগ্রেসের ডেলিগেট।

চাকরি চলিয়া যাওয়ায় তিনি পুনরায় পি-এল পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং ময়মনসিংহ জেলা আদালতে যাইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁহার জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি না হওয়ায় তিনি অধ্যয়নও করিতে থাকেন। তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি এম-এ এবং বি-এল ডিগ্রীও লাভ করেন।

কয়েক বৎসর প্র্যাক্‌টিস করার পর তিনি তাঁহার সিনিয়ার উকিল শ্রীপ্রসন্নকুমার গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সহিত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পুরীধাম ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আগমন করেন এবং ৪৭নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের এক ছাত্রাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়েই পুণ্যপুঞ্জের উদয়ে ২১১নং হ্যারিসন রোডেস্থ বাটীতে তাঁহাদের সহিত স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মিলন হয় এবং কয়েকদিন পরে প্রসন্নকুমার ও পরেশচন্দ্র উভয়েই তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

পরেশচন্দ্র অনুশীলন সমিতিরও সভ্য ছিলেন। সেই সময়ে মহান যোগী স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের যশোগানে বাংলাদেশ মুখরিত। স্বদেশী আন্দোলনের অনেকেরই ধারণা ছিল সিদ্ধযোগীর নিকট যোগশক্তি ও দৈবীশক্তি লাভ করিয়া আসুরিক শক্তিকে পরাভূত করিবেন—বিদেশীকে সাগরপারে তাড়াইয়া দিবেন। তাই অনেকেই এবম্বিধ মহান উদ্দেশ্য লইয়া পুণ্যশ্লোক তপোমূর্ত্তি অসীম শক্তির অধিকারী স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট আগমন করেন। কিন্তু দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন শ্রীগুরুদেব যাহার দ্বারা যে কার্য্য সম্ভব তাহাকে সেই কার্য্যেই অনুপ্রেরিত করেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যতীন মুখার্জীকে স্বদেশী আন্দোলনের নেতারূপে জীবনের অন্তিমদিন পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে অমিতবিক্রমে সংগ্রাম করিতে। কিন্তু পরেশচন্দ্র ও তাঁহার বাল্যবন্ধু নিখিলেশ্বরের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় ভিন্নমুখে। আচার্য্যদেবের সংস্পর্শে তাঁহারা ধীরে ধীরে দ্বিতীয় আশ্রম হইতে চতুর্থ আশ্রমের হন অধিকারী।

সন ১৩২৩ সালে কার্ত্তিকমাসে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী কুমুদিনী দেবী ডিপথিরিয়া রোগে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হরিদ্বারে আগমন করেন এবং একমাস অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুর নিকট তত্ত্ববোধ মণিরত্নমালা পাঠ করেন। উক্ত পুস্তক তিনি শ্রীগুরুর আওতায় বোম্বাই হইতে আনয়ন করেন। এই সময়ে বেদান্ত আলোচনাই ছিল তাঁহার একমাত্র ধ্যানের বস্তু। অনন্তর তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় এবং বিষয় বিষবৎ হওয়ায় কয়েকমাস পরে হরিদ্বারে পুনরায় গমন করেন ও শ্রীগুরুর নিকট বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তখন হইতে তিনি বাণপ্রস্থী পরেশ নামে গণ্য হন। এই সংবাদ বৃদ্ধ পিতা গিরীশচন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট অবিলম্বে তাঁহার পুত্রকে ফেরত পাঠাইতে পত্র দেন। কিন্তু পুত্র পিতৃভক্ত হইয়াও শ্রীগুরুর আশ্রয় ত্যাগ না করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ভারতীজীর সহিত বিকানীর ও

বোম্বাই পরিভ্রমণ করিয়া নাসিক কুম্ভে যোগদান করেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পেটের ঘায়ের জন্য তিনি কলিকাতায় ক্যাম্পবেল হাঁসপাতালে ডাঃ কে, কে, ব্যানার্জীর চিকিৎসাধীনে ভর্ত্তি হন। তিনবার তাঁহার পেট অপারেশন করা হয়। কিন্তু তথায় নীরোগ না হওয়ায় টি, বি, সন্দেহে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই সময় রায়সাহেব শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার খাবার পাঠাইতেন। এই বৎসরেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত স্বামীজী মহারাজের আদেশে তাঁহাকে পুরীধা ম পাঠান হইল। যাইবার পূর্বে তিনি শ্রীগুরুমহারাজকে বলিয়াছিলেন,—"আজও আমার সন্ন্যাস হইল না।"

পুরীধামে তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। "স্বামিজীর নিকট তার এলো—বাণপ্রস্থী পরেশের শেষ অবস্থা।' তখন সন্ধ্যার সময়, স্বামিজী মহারাজ স্বামী মহানন্দজী, নাগেশানন্দজী, ময়মনসিংহের উকিল প্রসন্ন কুমার গুহঠাকুরতাকে পুরী পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের সঙ্গে ১০০৲ টাকা দিলেন; আর বলে দিলেন—বাণপ্রস্থীর দেহকে সন্ন্যাসীর দেহ বলে যেন ব্যবহার করা হয়; ইহা দ্বারা সমুদ্রে তার মৃতদেহের জল সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থা যেন করা হয়। বাণপ্রস্থী হলেও সে সন্ন্যাসী।

সে রাত্রি কেটে গেল, স্বামিজী মহারাজ ভোরে সরোজ বাহাদুরকে ডেকে বল্লেন, 'সরোজ, কিছু বেদনা, আঙুর, আপেল কিনে পরেশের জন্য তৈয়ার রাখ, যেন বিকেলবেলা কোনো লোকের সঙ্গে উহা পাঠানো যেতে পারে।' সরোজ বাহাদুর সেই কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করলেন না; তিনি মনে করেছিলেন, এতক্ষণে ব্রহ্মচারীর দেহান্ত হয়ে গিয়ে থাকবে।

মধ্যাহ্নে ভোগের পর স্বামিজী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ফলাদি কিনে রাখা হয়েছে কিনা? সরোজ বাহাদুর বল্লেন, মহারাজ, গতদিন যাঁর জলসমাধির ব্যবস্থা করেছেন, এই ফল কি তাঁর কোনো কাজে লাগবে?' স্বামিজী তাকে জোরের সহিত বল্লেন,— 'যে ভোলাগিরি পরেশের জলসমাথির কথা বলেছিল, সে ভোলাগিরিই তাকে এখন পরেশের জন্য ফল কিনতে বলছে। সংশয় কিসের? যা' এখনি ফল কিনে নিয়ে আয়।'

এটা হলো কলিকাতা হ্যারিসন রোডের দৃশ্য। আর ওদিকে রোগী যখন মৃত্যুর কবলে পড়ে অসাড় অবস্থায় ডবল নিউমোনিয়ার যন্ত্রণায় মুমূর্ষু, তখন শেষরাতে দেখা গেলো—রোগীর ফুসফুস দু'টিই রোগমুক্ত হয়ে পড়েছে। ইহাই শ্রীগুরুর কৃপা। ক্রমে আরোগ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মচারী পরেশ ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতায়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শীতকালে শ্রীগুরু স্বামী ভোলানন্দজী মহারাজ ছিলেন অসুস্থ। সেবারে প্রয়াগে ছিল অর্দ্ধকুম্ভ। স্বামিজী মহারাজ বাণপ্রস্থী পরেশকে ২২৲ টাকা দিয়া প্রয়াগকুম্ভে মণ্ডলেশ্বর স্বামী জনার্দ্দন গিরিমহারাজের নিকট হইতে তাঁহারই নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পাঠাইলেন এবং তিনিই 'মহাদেবানন্দ' নাম মনোনীত করিয়া বলিয়া দেন।

অনন্তর হরিদ্বারে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর তিনি মণ্ডলেশ্বর স্বামী মঙ্গলগিরি মহারাজের প্রেরণায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক জীবন আরম্ভ করেন। একেবারে পাণিপাত্র হইয়া তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, রাজপুতানার তীর্থ সমূহ, দ্বারকা, বোম্বাই ও রামেশ্বর ভ্রমণ করেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় বিদেহমুক্ত সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজীর নিকট নিবাস করেন। সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে নিরন্তর শাস্ত্রালোচনা হ'ত এবং উভয়ে পরস্পরের গভীর প্রেমে আবদ্ধ হন। পরে তিনি ভেরাবল (সৌরাষ্ট্র) হইতে জলপথে বোম্বাই সহরে আগমন করেন। সেখানে রাঘবানন্দ (গুলালবাড়ী মহল্লায়) মঠে একদিন অবস্থানের পর স্বামী বৈদ্যনাথজী ও স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজীসহ রামেশ্বর তীর্থে শুভাগমন করেন।

রামেশ্বর প্রভৃতি দক্ষিণ দেশের তীর্থ ভ্রমণান্তে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ পর্বান্তে তিনি নিঃস্ব অবস্থায় যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী পরিভ্রমণ করেন। সাথী ছিলেন স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ। পরে উভয়েই উক্ত বৎসরেই কাশ্মীর গমন করেন। কাশ্মীর হইতে স্বামী শিবানন্দজীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী তিনি লাহোর গমন করিয়া শীতলা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথা হইতে বিকানীরে তিন মাস

বাস করিয়া পশুপতিনাথ হইতে যাত্রা করিয়া আসামের নানা স্থান দর্শনান্তে তিনি পরশুরাম কুণ্ডে উপস্থিত হন। অনন্তর ১৯২৮ সালে বর্দ্ধমান জেলার আমোদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশ মুখার্জী মহাশয়ের নিকট কিছুকাল কাটাইয়া বিহার প্রদেশে গোরখপুরের নিকট হরপুরে যাইয়া চাতুর্মাস্য ব্রত করেন।

এই সময়ে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ ছিলেন ভীষণ অসুস্থ ও আশ্রম সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত। তিনি সর্বদাই শরীর ত্যাগের কথা প্রকাশ করিতেছিলেন। তিনি ১২ই জুলাই এক পত্রে লিখলেন, 'এখানে গদীতে বসে গুরুকুল রক্ষা করার মতো উপযুক্ত ব্রাহ্মণ শরীর, বিদ্বান্ সাধু চাই, যে উপদেশ দিতে পারে, এমন সাধুর প্রয়োজন।'

পরের দিন এক পত্রে শ্রীযুত যতীশচন্দ্র মিত্রের নিকট লিখলেন,—'তোমাদের ভার তোমরা নাও। এ শরীরটাকে রেহাই দাও। গৃহস্থের ধন গৃহস্থ রাখ।

দশদিন পরে (২৩শে জুলাই ১৯২৮) তিনি আবার কলকাতায় ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথের নিকট লিখিতেছেন,—'মোহান্ত চাই। বিনা অধিপতিতে চলিবে না। গদী রক্ষাকর্ত্তা থাকা চাই। দীক্ষা দেয়া, উপদেশ করা, কণ্ঠী দেওয়া, গদী রক্ষা করার মতো যোগ্য, বিদ্বান, ব্রাহ্মণ-শরীর, সন্ন্যাসী মোহন্তের প্রয়োজন।' এই পত্রের শেষে লিখিলেন—'মহাদেব গিরিকে গদীতে বসাইতে পারিলে তোমাদেরই সুবিধা হইবে। কারণ ভাষা, বুলি, আচার, ব্যবহার, তোমাদের সঙ্গে মিলিবে, সেও লায়েক আছে। সেইজন্য যদি তোমাদের সুবিধা চাও ত, মহাদেব গিরিকে বিশেষভাবে অন্বেষণ করিয়া উপস্থিত কর।

উক্ত পত্রের ৯ দিন পরে (২।৮।২৮) লিখিতেছেন,—'প্রথমে মহাদেব গিরিকে স্বীকার ও সন্তোষ করাও। সে যাহাতে এখানকার ভার নিতে স্বীকার করে, সেইমত কাজ কর। যদি সে ভার নিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার পরামর্শ মতো ট্রাষ্টি বা কমিটি কর। যেমন তোমাদের গুরুকে অধিষ্ঠাতা করিয়া তাঁহার আদেশ মতো তোমরা সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছ, সেইরূপ মহাদেব গিরিকে অধিষ্ঠাতা করে, তাহার সহিত মিল মিশ করে তাহার সন্তোষ ও পরামর্শ মতো যেমন ভাবে ট্রাষ্ট ডিড্ করিলে চলিতে পারে, তাহাই কর।"

হরপুর হইতে তিনি যতীশবাবুর পত্র পাইয়া হরিদ্বারে শ্রীগুরু সমীপে উপস্থিত হন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহাকে মোহান্ত পদে অভিষিক্ত হইতে অনুরোধ করা হয়। তিনি এক পত্রে ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জীকে লিখিয়াছিলেন যে,—"I am the disciple of a Sannyasi and not of a Mohanta." কিন্তু যথাসময়ে শ্রীগুরুর ইচ্ছায় উপযুক্ত শিষ্যের এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হয়।

কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে যাইবার তাঁহার ইচ্ছা হইল প্রবল। কিন্তু স্বামিজী মহারাজ তাঁহাকে হরিদ্বারে রাখিয়া স্বয়ং হাওড়ায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সামন্তের সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। লাহোরে মালের-কোটলা, খুরদা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া তিনি হরিদ্বারে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামান্তে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন। কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি অসুস্থ অবস্থায় চৈত্রমাসে এক বড় ভাণ্ডারা দেন এবং সমাগত মণ্ডলেশ্বরগণের পূজার ভার অর্পণ করেন স্বামী মহাদেবানন্দজীর উপর। সেই সময় স্বামিজী মহারাজ স্বয়ং স্বামী মহাদেবানন্দজী মহারাজকে ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মোহন্তপদে মনোনীত করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৮ই মে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে হরিদ্বারে প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ ব্রহ্মলীন হন। স্বামী মহাদেবানন্দজী মহারাজ সেই সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীগুরুমহারাজের আদেশে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। কলিকাতার মর্গান কোং এর সলিসিটর একটি উইল লিখিয়া হরিদ্বারে স্বামিজী মহারাজের নিকট পাঠান। ভুলের জন্য তাহাতে বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি প্যারা বাদ পড়ে। তাহার সংশোধনের নিমিত্তই তাঁহার কলিকাতায় গমন।

১১ই মে, ১৯২৯ তারিখে মোহন্ত মহারাজ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ২২শে মে দিবসে শ্রীগুরুমহারাজের ভাণ্ডারা দেন। স্বামিজীর দেহান্তে আশ্রম পরিচালনা বিষয়ে মতের গরমিল হওয়ায় শিষ্যদের মধ্যে তিনটি দল হইয়া যায়। মোহন্তজী মহারাজের অনেক চেষ্টায় তিন-দলকে মিলাইয়া এক ট্রাষ্ট ও এক ডেডিকেসন ডিড কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীব্রজলাল

শাস্ত্রী মহাশয়ের সহায়তায় ও সৌজন্যে প্রস্তত করেন। এদিকে মোহন্ত স্বামী শিবদয়াল গিরিজী লালতারাবাগ ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য উকিলের চিঠি দেন। তিনি আশ্রমের বিরুদ্ধে মোকর্দমা করিতে প্রস্তত। তখন শ্রীগুরুকৃপায় ও মোহন্ত মহারাজজীর বিলক্ষণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ৪০,০০০৲ (চল্লিশ হাজার) টাকায় উক্ত লালতারাবাগ ক্রয় করা হয়।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীর কুম্ভে স্বামী নরসিংহগিরিজী মহারাজ নিরঞ্জনী আখড়ার আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগ কুম্ভে মণ্ডলেশ্বর স্বামী নরসিংহগিরি মহারাজজী ও মোহন্ত স্বামী জয়কৃষ্ণগিরিজীর শুভ প্রচেষ্টায় স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ আনন্দ আখড়ার আচার্য্য পদ অলঙ্কৃত করেন। সেই সময়ে সাধুসমাজের উপর তৎকালীন সরকারের কুদৃষ্টি পড়িয়াছিল। স্বামী মহাদেবানন্দজী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, আইনজ্ঞ ও বঙ্গ দেশীয় বিধায় সাধুসমাজ তাঁহাকে যোগ্য সম্মান প্রদান করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, তিনি সাধু সমাজের হিতার্থে সরকারের সহিত জোরদার সংগ্রাম করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাকে সেভাবে পাওয়া গেল না—পাওয়া গেল একজন উচ্চকোটী সন্ন্যাসীরূপে। বলা বাহুল্য সাধুসমাজ ইহাতে তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্নই হইয়াছিলেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভের পূর্বেই ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মূখ্য মন্দির তিনটি নির্মিত হয়। পশ্চাৎ মন্দিরের বারান্দা ও মহাবীরজীর মন্দির তৈয়ারী হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভের সময়েই সন্ন্যাসিগণের বাসের নিমিত্ত অনেকগুলি পাকা ঘর এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভোলানন্দ সাঙ্গবেদ বিদ্যালয় ভবনটি নির্মিত হয়। ইহার পূর্বে বিদ্যালয় ছিল ভোলাগিরি ধর্মশালায়। এই বিদ্যালয়ে মধ্যমা পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। বিদ্যার্থীগণের মধ্যে সাধুও গৃহস্থ উভয়েই থাকিতে পারেন। সংস্কৃত ভাষা ও বেদ প্রচার এবং বিদ্বান সাধুসৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

সুদীর্ঘকাল ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের অধ্যক্ষ ও আনন্দ আখড়ার পীঠাচার্য্যরূপে শ্রীগুরুমহারাজের গুরুদায়িত্ব জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত গভীর নিষ্ঠা ও সতর্কতার সহিত পালন করেন। তিনি ক্ষয়িষ্ণু বাংলার অগণিত গণমানসে আশার আলো প্রজ্বলিত করেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগের অর্দ্ধকুম্ভে বার্দ্ধক্য হেতু গদীত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুমহারাজের গুরুদায়িত্ব তদীয় গুরুভ্রাতা মণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দগিরি মহারাজের স্কন্ধে ন্যস্ত করেন।

তিনি একজন অসাধারণ বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি বলিতেন,—"এসব শ্রীগুরু মহারাজের অসীম কৃপায় সম্ভব।" শাক্ত ও বৈষ্ণবপ্রধান বঙ্গদেশে বেদান্ত প্রচারে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর হইতে এই মহতী উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় সমগ্র ভারতে মণ্ডলী সহ বহুবার পরিভ্রমণ করেন। বিশেষ করিয়া অবিভক্ত বাংলা, বিহার, আসাম ও উত্তরপ্রদেশই ছিল তাঁহার ধর্মপ্রচারস্থল। তিনি বিলাতের বড় বৈদিক পণ্ডিত মিঃ কিথের (Mr. Keith) এক সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণ করেন। মিঃ কিথ অবশ্য পত্রদ্বারা ইহা স্বীকার করেন। তিনি বিংশাধিক পুস্তক রচনা করিয়া শাস্ত্রের অনেক জটিলতত্ত্ব সাধারণের বোধগম্যের উপযোগী করিয়াছেন। তিনি আনন্দবাজার, উদ্বোধন, ভারতবর্ষ, শিবম্, হিমালয় প্রভৃতি ভারতের ইংরাজী ও বাংলা পত্রপত্রিকায় বহু মূল্যবান নিবন্ধাবলী প্রকাশ করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মুখপত্র অধুনালুপ্ত 'শিবম্' মাসিক পত্রিকার তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

কলেজে অধ্যয়নকালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের লেকচার হইতে জ্ঞাত হন যে, "বেদ চাষার গান।" শ্রীগুরু মহারাজের সংস্পর্শে আসিবার পর তাঁহার সে দৃঢ় সংস্কার বিদূরিত হয়। বেদই একমাত্র নিত্য সত্য এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে। তিনি শ্রীগুরুমহারাজের আদেশেই বেদাঙ্গ সহিত সমস্ত বেদ ও ষড়দর্শনাদি সকল ধর্মশাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়া সমগ ভারতে বেদের প্রচারে আত্মোৎসর্গ করেন। সমস্ত ঋগ্বেদ তাঁহার অধিগত ও কণ্ঠস্থ ছিল। অন্তিম সময়ে শিষ্য ভক্তগণকে বলেন,—"আমি আমার গুরু মহারাজের আদেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছি। এখন আমার কর্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তোমাদের যথেষ্ট উপদেশাদি দিয়াছি এবং তোমাদের জন্যই অনেক পুস্তকও লিখিয়াছি। উক্ত উপদেশাদি পালনের দ্বারা তোমরাও স্ব স্ব জীবন সার্থক কর।" ইহা হইতে তাঁহার পঠনপাঠনের রুচিবোধের নিদর্শন পাওয়া

যায়। ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের পুস্তকালয় তাঁহারই এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইহা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল।

সাধুজীবনে অনেক সময় অনেকের নানাপ্রকার সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। একদা হরিদ্বারে গীতার ক্লাসে প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁহার জীবনের এক পুরাণো ঘটনা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন,—"একবার আমার মনে হইল—তাইতো সাধু তো হইলাম, কিন্তু খাইব কি? কোথা হইতে অন্ন জুটিবে? তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি বলিল—আরে তুমি তো আর মূর্খ নও; কয়েকটি ছাত্র পড়াইলেই তোমার একার উদরপূর্ত্তি হইয়া যাইবে। যুক্তিটি মনঃপুত হইল। তাই নিশ্চিন্ত রহিলাম। কিন্তু জানি না যে, ইহা আমার ভ্রান্ত ধারণা। অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—'কি সন্ন্যাসী হইয়া ছাত্র পড়াইয়া খাইবে! ইহা সন্ন্যাসীর কর্ম—কোন শাস্ত্রে আছে? সন্ন্যাসীর পক্ষে এরূপভাব পোষণ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। যাও বেটা, এখনই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গঙ্গায় স্নান করিয়া পবিত্র হও।' আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া শ্রীগুরুসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ তাঁহার আদেশ পালন করি।"

জ্যোতিষশাস্ত্রে সাধারণতঃ পঞ্চম দশায় জাতকের মৃত্যু বর্ণিত থাকে এবং শুভাশুভ কর্ম্মানুযায়ী আয়ুর হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব। পূজ্যপাদ স্বামিজী জ্যোতিষীগণের ভবিষ্যৎ বাণী প্রত্যেক বারেই ব্যর্থ করিয়া অপর একটি পার্থিব বসন্তের অধিকারী হইতেন। তিনি তাঁহার সেবক, স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য স্বামী অচ্যুতানন্দ গিরি মহারাজকে ডাকিয়া বলিতেন,—"অচ্যুত, জ্যোতিষীরা আমায় সর্বংসহা বসুন্ধরার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না।" তিনি বলিতেন,—"আমাদের পূর্বপুরুষগণ ৺দুর্গাপূজার সময়ই সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমার পক্ষেও সমুচিত।" তাই বর্তমান বৎসরে সমুচ্চকণ্ঠে তিনি পূর্বেই তাঁহার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন এবং পূর্ণ কুম্ভের পর হইতে তিনি ধীরে ধীরে পার্থিব বিষয় হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিস্পৃহ হইতে থাকেন। বিপুল ঐশ্বর্য্যের উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহার মত নিরহঙ্কার ও বিরক্ত মহাপুরুষ অধুনা অত্যন্ত বিরল। প্রথমে তিনি প্রভাতকালীন জলযোগ গ্রহণ বন্ধ করেন। মাসাধিককাল পরে রাত্রাহার বন্ধ করেন এবং দ্বিপ্রহরের ভোজনের মাত্রাও কমাইতে থাকেন। অনন্তর তিনি সকলের সহিত সর্ব্বপ্রকার বাক্যালাপ ও অন্নগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখেন।

এইরূপ একটি আকস্মিক সংবাদ চতুর্দিকে প্রচারিত হইলে শিষ্য, ভক্ত ও গুণমুগ্ধগণ তাঁহার দর্শনে হরিদ্বারে সমবেত হইতে থাকেন। তাঁহাদের সকলের অনুরোধে পুনরায় স্বল্পমাত্র আহার করিতেন। তাহাও দুই একদিন অন্তর। তাঁহার মুখে কেবল প্রণবমন্ত্রও শিবনাম ধ্বনিত হইতে থাকে। তখন তিনি সর্বত্র শ্রীগুরুমহারাজের অমরাত্মার দর্শন করিতেন। শাস্ত্রের 'সর্বং গুরুময়ং জগত' তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে প্রকাশিত। তিনি বলিতেন,—"গুরুদেবের অসীম কৃপা আমার উপর নিহিত।" তাঁহাকে প্রায়ই নিম্নোক্ত কবিতাটি উচ্চারণ করিতে দেখা যাইত—

"গুরুদেব বিনা নাহি ভাগজাগে।
গুরুদেব বিনা নাহি প্রীতি লাগে॥
গুরুদেব বিনা নাহি শুদ্ধহৃদম্।
গুরুদেব বিনা নাহি-মোক্ষ পদম্।

তিনি কখনও কখনও ভোলানন্দ সাঙ্গবেদ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণদত্ত শাস্ত্রী মহোদয়ের সহিত শাস্ত্রালাপও করিতেন। কিন্তু ইহা ভিন্ন জাগতিক চর্চ্চা ছিল তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ বিষবৎ ও উপেক্ষিত।

তাঁহার শরীর শান্তের পূর্ব্ব একবিংশ দিবস তিনি কোনপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র পুণ্য সলিলা পতিত পাবনী গঙ্গাজল বিন্দু বিন্দু পান করিতেন। কিন্তু কোনপ্রকার ঔষধ গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে অনেকেই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু এস্থলে স্বামী অচ্যুতানন্দজী, ব্রহ্মচারী চিন্ময়ানন্দজী ও পুরাতন ভাণ্ডারী ও শিষ্য শ্রীশোভারামজীর সেবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামিজী মহারাজের এইপ্রকার ভাবাবেশে অনেকেই নানাপ্রকার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। অনশনে শরীর ত্যাগ আত্মহত্যার নামান্তর। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—আত্মাকে না জানিয়া যাহারা কুমার্গে গমন করে ও কুক্রিয়ায় আসক্ত; তাহারাই আত্মার হননকারী। আর যাঁহারা আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া জাগতিক সকল বস্তুর, নশ্বরত্ববোধ

করিয়া প্রায়োপবেশনে, দেহত্যাগ করেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। জাবাল উপনিষদে এইরূপ সমর্থন পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা জানিয়া জলে বা অগ্নিতে বা অনশনে শরীর পরিত্যাগ করিতে পারেন।

মহারাজ থাকিয়াও আর আমাদের মধ্যে নাই। সে স্নেহের স্পর্শ পাইবার উপায়ও নাই। আজ নাই সে তাপিতের বিশাল মহীরুহ। অশ্রুপাতে বক্ষ ভাসাইলে, হাহাকারে দিগন্ত কাঁপাইলে ব্যর্থতা ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। মহাপুরুষের জীবনই বেদ। সেই বেদাদর্শ স্ব স্ব জীবনে পালন করিতে পারিলে অনন্ত-দুঃখে নিবৃত্তি ও পরমা-শান্তির প্রাপ্তি সম্ভব। ভাগ্যবান্ তাঁহারা যাঁহারা প্রাণের টানে সেই বিশ্বাত্মাকে আজও ধরিয়া রাখিতে সক্ষম।

যুগাচার্য্য মহাপুরুষদিগের মধ্যে ব্যবহৃত যে "শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ" বিশেষণদ্বয় শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা মহারাজের সমগ্র জীবনে বিশেষ করিয়া শেষের কয়মাসে মূর্ত হইয়া ওঠে। শঙ্করভাষ্যে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "শ্রোত্রিয়ম্—অধ্যয়নশ্রুতার্থসম্পন্নং, ব্রহ্মনিষ্ঠং—হিত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য সোঽয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।"

শোনা যায় স্বামী অমলানন্দগিরিমহারাজ ও 'শোভারামজী ভাগ্যবান্। ইঁহারাই মহারাজের অন্তিম বিদায়ের সময় ছিলেন উপস্থিত। এক চামচ গঙ্গাজল পান করিয়া প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি মহাশান্তি লাভ করেন। চিকিৎসকগণের ভবিষ্যৎ বাণী সবই ব্যর্থ হইয়া যায়। বিদায় বেলার ভৈরবী রাগিণী উঠিল গগনে —ভূমার ক্রোড়ে ভূমা পড়িলেন ঘুমায়ে। পূজ্যপাদ মহারাজের ঘটনাবহুল জীবনচরিতের ইহা একটি ক্ষুদ্র আলেখ্য মাত্র। মহারাজের প্রকাশিত জীবনী, পুস্তকাবলী এবং লোকমুখে শ্রুত কাহিনীর ইহা সংকলন। তিনি এত বিশাল ও এত গভীর যে তাঁহাকে বলিয়া শেষ করা অসম্ভব। কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হয়,

"বলবো কত তাঁহার কথা
ব'লে কথা ফুরায় না কো ?
সৃষ্টি তাঁহার চির কিশোর
কোন কালেই বুড়ায় না কো।"

বাঙ্গলা কাব্যে ছন্দের বন্ধন-মুক্তি ও মধুসূদন

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলাভাষায় সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনের কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদনের। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনার সময়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত না হলে বাংলা নাটকের উন্নতি একরকম অসম্ভব। তাই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ওপর ভিত্তি করে তিনি 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনা করেন এবং তা পড়ে কাব্যানুরাগী মাত্রেই তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এক কথায় বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মধুসূদনের পূর্বেকার কবিগণ চরণের মধ্য মিল ও অন্ত্য মিল ব্যবহার করতেন এবং ভাবকে নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের গণ্ডীর মধ্যে প্রকাশ

করতে হত। মধুসূদন ছন্দের এই কৃত্রিম বাধাগুলিকে দূরে সরিয়েছিলেন, প্রবর্তন করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। 'মেঘনাদবধকাব্যে' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের চূড়ান্ত সাফল্য দেখা যায়।

'মেঘনাদবধকাব্য' প্রকাশিত হবার পর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' মধুসূদনকে যে মানপত্র দিয়েছিল, তাতে তাঁর এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসা জানিয়ে লেখা হয়েছিলো: 'আপনি বাঙ্গলা ভাষায় যে অনুপম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে।'

সাধারণতঃ প্রবহমান পয়ারকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে। এখানে একটি ভাব প্রথম চরণে শেষ না হয়ে পরবর্তী চরণে প্রসৃত হয়, অর্থানুসারে আসতে হয় বলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ এবং যতির বিচ্ছেদ ঘটে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান গুণ প্রবহমানতা, মিল থাকা বা না থাকা এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য নয়। পয়ারের মত অমিত্র ছন্দেও আট ও ছয় মাত্রার চরণ: তবে পয়ারের মত এখানে প্রতি চরণে অর্থের সমাপ্তি ঘটেনা। তাই এক চরণ থেকে অন্য চরণে অর্থ বাহিত হয়। যতির স্বাধীনতাই মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'মেঘনাদবধ কাব্যের একটি উদ্ধৃতি দেখা যাক্—

'এই কথা শুনি আমি। আইনু পূজিতে॥
পা দুখানি * *। আনিয়াছি। কৌটায় ভরিয়া॥
সিন্দুর*; করিলে আজ্ঞা।* সুন্দর ললাটে॥
দিব ফোঁটা * *।

এখানে অর্থানুসারে না থেমে যদি মিত্রাক্ষরের ভঙ্গীতে যতি চিহ্ন অনুসরণ করি, তা হলে দ্বিতীয় চরণে পা দুখানি কৌটায় ভরেআনবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদ্‌কম্প হবার সম্ভাবনা। কবি বুদ্ধদেব বসুর মতে—"মাইকেলের যতি-স্থাপনের বৈচিত্র্যই ছন্দের ভূত-ছাড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিলো 'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল'র এক ঘেয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ যতির উর্মিলতা।......যতিপাতের এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে ছন্দে প্রবহমানতা এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলো, এ কথাটা তৎকালীন অনুসন্ধানীর দৃষ্টিগোচর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন কারণে যদি নাও হয়, শুধু বাঙ্গালা ছন্দে প্রবহমানতার জনক বলেই মাইকেল উত্তর পুরুষের প্রাতঃস্মরণীয়।

সংস্কৃত অনুপ্রাস ব্যবহার অমিত্রচ্ছন্দের অন্যতম প্রধান অলঙ্কার। একটি চিঠিতে মধুসূদন লিখেছিলেন—'I have used more অনুপ্রাস and যমক than I like, but I have done so to deceive the ear as yet unfamiliar with Blank Verse' সমালোচক দীননাথ সান্যাল বলেছেন—'মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দী কবিতার সংযত অনুপ্রাস পাঠকের কানে মিলের অভাবটি সুন্দর রূপে পূরণ করিয়াছে।"

'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে' অমিত্রাক্ষরে ছন্দের প্রথম পদক্ষেপ বলে তাতে যথেষ্ট শৈথিল্য দেখা যায়, কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সেই শৈথিল্যের অনুপস্থিতিই সব নয়, এই কাব্যে তা পরিণত, গতিশীল এবং সুরসমৃদ্ধ। এ সম্বন্ধে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: 'See the difference in language and verrification, if in nothing else, between Tilottama and Meghnad.

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন যুগোপযোগী অসাধারণ শব্দসম্পদ। Milton-এর 'Grand Style'-এর উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান 'Poetic Diction'। মধুসূদনও Milton ও Tosso-র Poetic Diction" স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য অনেকখানি নির্ভর করে যুক্ত অক্ষরের ওপর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'মাইকেল মধুসূদনও ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণধ্বনি এবং তরংগিত গতি অনুভব করা যায়।'

মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করলেও তাঁরা কেউ মধুসূদনের মত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হননি।

এ্যাক্সিডেণ্ট

শ্রীসুনীলচন্দ্র সেন

১
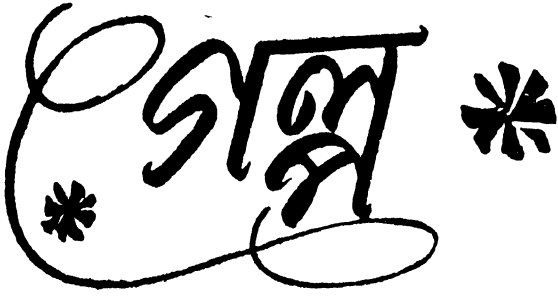
এ্যাক্সিডেণ্ট ! এ্যাক্সিডেণ্ট !

রাস্তায় লোকের ভীড় জমে যায়।

সোমনাথবাবু প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরেও এ্যাক্সিডেণ্টটা এড়াতে পারলেন না।

রোজকার মত রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান বিপত্নীক সোমনাথ সান্যাল সন্ধ্যার সময় গাড়ী করে লেকে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে একমাত্র মেয়ে পাহাড়ী। সোমনাথবাবু যখন দার্জিলিংয়ের ডেপুটি কমিশনার তখন তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্ম হয়। বড় আদরের ধন। তিনি ওর নাম রাখতে চেয়েছিলেন মণিকা। কিন্তু পাহাড়ী দেশে জন্ম বলে স্ত্রী নাম রাখলেন পাহাড়ী। স্ত্রী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন মেয়ের স্বভাবের সঙ্গে নামটি খুব সুন্দর মিলে যায়। পাহাড়ী গাছে ওঠে, ঘোড়ায় চড়ে, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এক কথায় খুব ছটফটে ও চটপটে। সোমনাথবাবুর বিয়ের অনেক পরে পাহাড়ীর জন্ম হয়। কিন্তু পাহাড়ী অল্প বয়সেই মাতৃহীনা হয়। তাই পাহাড়ী বাধাহীনভাবে বেড়ে ওঠে। বিপত্নীক সোমনাথবাবুর একমাত্র সম্বল এই মেয়ে। অধুনা রিটায়ার করে ল্যান্সডাউন রোডের ওপর প্রকাণ্ড বাড়ী করেছেন। এখন একমাত্র চিন্তা পাহাড়ীকে পাত্রস্থ করা। তিনি একটু উন্মনা হয়ে গাড়ী চালাচ্ছিলেন। রাসবিহারী এভেনিউ ও ল্যান্সডাউন রোডের জংসনে হঠাৎ একটা লোক জাম্প দিয়ে তাঁর গাড়ীর সামনে এসে পড়ে। সোমনাথবাবু প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরেন। গাড়ী একটু জাম্প করে থেমে যায়। লোকটি বেঁচে যায়। কিন্তু গাড়ীর কাচে মাথা ঠুকে পাহাড়ীর মাথা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে। সোমনাথবাবু দিশাহারা হয়ে নিজের গায়ের সাদা পাঞ্জাবী ছিড়ে পাহাড়ীর মাথায় পট্টি বেধে জনতার জঞ্জাল সরিয়ে কোন রকমে পাশের ডাক্তার খানায় পাহাড়ীকে নিয়ে হাজির করেন। পাহাড়ীর মাথার সাদা পট্টি মুহূর্তে লাল হয়ে যায়।

—ডাক্তারবাবু, শীঘ্র আমার মেয়েকে দেখুন।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ডাক্তার রমেন মৈত্রকে বলেন সোমনাথবাবু।

রমেন পাহাড়ীর মাথার ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। পাহাড়ী রমেনের দিকে খানিক তাকিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

—একি হোল ডাক্তারবাবু, আমার মেয়ে যে অজ্ঞান হয়ে গেল। ও আমার একমাত্র মেয়ে। ওকে আপনি বাঁচান ডাক্তারবাবু, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

হাত কচলিয়ে বিনীতভাবে বলেন সোমনাথবাবু।

রমেন পাহাড়ীর নাড়ী পরীক্ষা করে একটা ইঞ্জেকসন দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ীর জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ চেয়ে একবার রমেনের দিকে ও একবার বাবার দিকে তাকায়।

সোমনাথবাবুর চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

—আপনার মেয়ের কিছুই হয়নি। এখন বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। কাল সকালে একবার কেমন থাকেন খবরটা দিয়ে যাবেন।

মৃদু হেসে বলে রমেন।

—আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ ডাক্তারবাবু। কাল সকালে যদি একবার দয়া করে আমাদের বাড়ী গিয়ে

আপনার রোগীকে দেখে আসেন তো আমাদের খুব উপকার হয় ডাক্তারবাবু।

অনুনয়ের সুরে বলেন সোমনাথবাবু। রমেনের দিকে তাঁর নাম ঠিকনার একটা কার্ড এগিয়ে দেন।

—আমার যাবার কোন প্রয়োজন নেই মিঃ সান্যাল। তবে আপনি যখন বিশেষ অনুরোধ করছেন তখন আমি নিশ্চয়ই যাব।

কার্ডটা পকেটে রেখে হেসে বলে রমেন।

—এই তো দিব্যি উঠে বসেছেন। মাথায় কোন যন্ত্রণা নেই তো?

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে রমেন।

—আসুন ডাক্তার মৈত্র। আমি বেশ ভালই আছি। কাল যে-আমার এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল আজ তা একটুও বুঝতে পারছি না।

খসে পড়া বুকের কাপড় ঠিক করে হেসে বলে পাহাড়ী।

—শুনে খুব খুশি হ'লাম। আপনার বাবা কাল যে রকম ভয় পেয়েছিলেন তা দেখে প্রথমটা আমিও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

পাহাড়ীর চোখে চোখ রেখে হেসে বলে রমেন।

—আমার বাবা অল্পেতেই নার্ভাস হয়ে পড়েন। আমি একমাত্র মেয়ে কিনা।

হেসে জবাব দেয় পাহাড়ী।

—তাই খুব আদুরে।

কথার পৃষ্ঠে কথা ছোঁড়ে রমেন।

—এই যে ডাক্তারবাবু, আপনি এসেছেন। আমি খুবই খুশি হ'লাম। ও যে আমার কি দুরন্ত মেয়ে তা আপনি জানেন না। তাই ওর জন্যে আমার সব সময় ভয়। ওর নামেতেই বুঝতে পারবেন ওর প্রকৃতি।

হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকেন সোমনাথবাবু।

হঠাৎ সোমনাথবাবুর উপস্থিতিতে রমেন ও পাহাড়ী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

—আপনার মেয়ে দুরন্ত প্রকৃতির জন্যই কালকের এ্যাক্সিডেণ্টটা সামলে নিতে পেরেছেন। উনি যদি ললিত লবঙ্গলতা হতেন তাহলে ভয়ের কারণ ছিল।

সোমনাথের হাসির সুরে সুর মিলিয়ে বলে রমেন। পাহাড়ীর চোখে মুখেও হাসি দেখা দেয়।

—আপনি ওকে আপনি' বলছেন কেন ডাক্তারবাবু? ও আপনার থেকে বয়সে ছোট এবং আপনার রোগী।

আবার হেসে বলেন সোমনাথবাবু।

—আর আমি বুঝি আপনার থেকে বয়সে বড় তাই আপনি আমাকে 'আপনি' বলছেন?

হেসে প্রশ্ন করে রমেন। হেসে ফেলেন সোমনাথবাবু। হেসে ফেলে পাহাড়ী। ঘরময় হাসির তুবড়ি ফাটে।

—আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে অপারগ মিঃ সান্যাল। আপনি ধনী। আপনার শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের জন্য আপনি অনেক ধনী ও কৃতী পাত্র পাবেন। আমি সবে ডাক্তারী পাস করে প্র্যাক্টিস শুরু করেছি। রোজগার নেই বললেই চলে। দেশ থেকে বিতাড়িত। থাকবার স্থানও নেই। অতএব আমার মত এক সহায়-সম্বলহীন ডাক্তারের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে কেন দেবেন? না না এ হতে পারে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মিঃ সান্যাল।

সোমনাথবাবুর প্রস্তাবের উত্তরে একদিন মাথা নীচু করে নিজের অক্ষমতা জানায় রমেন।

—আমি তিরিশ বছর সিভিলিয়ানের চাকরি করেছি রমেন। ধনী এবং কৃতীপাত্র হয়ত অনেক পাব; কিন্তু চরিত্রবান পাত্র সত্যই দুর্লভ। চরিত্রই মানুষের অলঙ্কার। তাছাড়া তুমি নিজেকে ছোট মনে করছ কেন রমেন। তুমি গরীব হতে পার; কিন্তু তুমি ছোট নও। আমার একমাত্র মেয়ে। ওকে বিয়ে করে তুমি বিলাত চলে যাও। নিজের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ করে 'সো। সমাজের পাঁচজনের একজন হও।

বেশ আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলেন সোমনাথবাবু।

২

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজে। 'স্টাডি'তে বসে একখানা নতুন মেডিকেল জার্ন্যাল পড়ছেন বিলাত

ফেরত বিখ্যাত ডাক্তার রমেন মৈত্র। ঘড়ির ঘণ্টার শব্দে বইয়ের পাতা থেকে চোখ গিয়ে পড়ে ঘড়ির দিকে। নাঃ, বারোটা বেজে গেল এখনও পাহাড়ী ফিরল না। দিন দিন ফেরার সময়টা বেড়েই যাচ্ছে। এর একটা বিহিত করা দরকার। জার্নালটা বন্ধ করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পেছনে চোখ ফেরাতেই পাহাড়ীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। দরজায় দাঁড়িয়ে পাহাড়ী। মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

—বাড়ীতে ফিরবার কি দরকার ছিল। বাকী রাত-টুকু বাইরে কাটিয়ে এলেই তো পারতে।

রমেনের স্বরে ঘৃণা।

—তুমি কি আমার চরিত্রে সন্দেহ কর নাকি ?

রুখে দাঁড়ায় পাহাড়ী।

—তোমার চরিত্রে আমি সন্দেহ করি না। সোমনাথ-বাবুর মেয়ে বন্য হতে পারে ; কিন্তু চরিত্রহীনা নয় তা আমি জানি। কিন্তু আমি বিলাতফেরত ডাক্তার। সমাজে আমার একটা 'পজিসন্' আছে। তোমার কুৎসায় আমি সমাজে কান পাততে পারি না তা জানো ?

বেশ জোরের সঙ্গে বলে রমেন।

—বিলাত ফেরত ডাক্তার! ভারী অহঙ্কার দেখছি! বলি বিলাত তো গিয়েছিলে আমার বাবার পয়সায়। তার এত অহঙ্কার আসে কোথা থেকে শুনি!

ব্যঙ্গের সুরে বলে পাহাড়ী।

—যদি তোমার আমাকে পছন্দ না হয় তো তোমার পথ দেখতে পার পাহাড়ী। আমার সঙ্গে থেকে সমাজে আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না। আর আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। মেয়েটার প্রতিও কি তোমার একটুও মায়া মমতা নেই ? ওকে একলা ফেলে রেখে পরপুরুষের সঙ্গে রাত দুপুর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না তোমার ?

কর্কশস্বরে প্রশ্ন করে রমেন। তার চোখে টাটা ফার্নেসের আগুন জ্বলে।

—তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটাই আমার জীবনে একটা 'এ্যাক্সিডেণ্ট'। তুমি ভুলে যেয়ো না সিভিলিয়ান সোমনাথ সান্যালের 'সোসাইটি গার্ল' পাহাড়ীরও সোসাইটিতে একটা দাম আছে। আমার বাবা আজ বেঁচে নেই কিন্তু আমার সামাজিক 'পজিসন্' এখনও অটুট। মধ্যবিত্ত ঘরের বৌদের মত স্বামীত্বের পদতলে আমার নিজস্ব সত্বাকে বিলিয়ে দিতে পারব না। তুমি তোমার সামাজিক 'পজিসন্' নিয়ে থাকো আমি চললাম।

গলায় ঝাজ ও চোখে বিদ্যুৎ হেনে পাশের ঘরে ঢোকে পাহাড়ী।

চার বছরের ঘুমন্ত মেয়ে বনশ্রীর কপালে একটা চুমো দিয়ে গট্‌মট্‌ করে রাস্তায় নেমে পড়ে পাহাড়ী। বনশ্রী একবার চোখ মেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বিলাতফেরত ডাক্তার রমেন মৈত্র।

৩

বৃষ্টি থেমে গেলেও রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় বন্ধ। আকাশ মেঘে ভরা। যে কোন সময় আবার ভারী বৃষ্টি নামতে পারে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ফুলস্পীডে গাড়ী চালাচ্ছে বনশ্রী।

—গাড়ীর স্পীড কমিয়ে দে মা এ্যাক্সিডেণ্ট হবে।

রমেনবাবুর স্বরে ভীতি।

—আমার মা এ্যাক্সিডেণ্টে মরতে পারলে আমাদের এ্যাক্সিডেণ্টে মরতে ভয় কি বাবা!

বি-এ পাশ বনশ্রীর ঠোঁটে হাসি। চোখ রাস্তার দিক থেকে ফেরায় পাশে উপবিষ্ট পিতার দিকে। মুহূর্তের মধ্যে পাশের গলি থেকে একটা গাড়ী বেরিয়ে ধাক্কা দেয় ওদের গাড়ীটাকে। বনশ্রী রাস্তায় ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। রমেনবাবু ও রাস্তার লোকে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। একটি কেবিনে ভর্তি করে দিয়ে রাত্রের মত একজন নার্স এর জন্যে নিযুক্ত করে বাড়ী ফেরেন রমেনবাবু।

—মা, মাগো, একটু জল।

রাত চারটে। বনশ্রীর জ্ঞান হয়।

—এই নিন জল।

নার্স ওর মুখে জল ঢেলে দেয়।

—মা, মাগো, আমি কোথায় ?

জল খেয়ে বনশ্রী এদিক ওদিক তাকায়।

—আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন। আপনার মা কাল সকালেই এসে পড়বেন।

রোগীকে সান্ত্বনা দেয় সেবিকা নার্স।

বনশ্রী একটু কাত হয়ে উঠে ভাল করে তাকায় নার্সের দিকে।

—আপনি উঠবেন না। শুয়ে পড়ুন। নাহলে আপনার কষ্ট বেড়ে যাবে। নার্স বনশ্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

—এই তো আমার মা। মা, তুমি তাহলে বেঁচে আছ? 'এ্যাক্সিডেন্টে' তুমি মরনি? আর তো আমি তোমাকে ছাড়ব না মা। তখন আমি ছোট ছিলাম। তাই তুমি আমাকে ছেড়ে চলে এসেছিলে। এখন আর তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না মা।

নার্সের হাতে পরিচিত ছোঁয়া পেয়ে বনশ্রী বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে।

—কি যা তা বকছেন আপনি। আপনার মা কাল সকালেই এসে পড়বেন। আপনি এখন ঘুমোন।

নার্স বনশ্রীর হাত ছাড়িয়ে বনশ্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিতে চায়।

বনশ্রী ব্লাউজের ভেতরের বুকের খাঁজ থেকে একটা ছোট ব্যাগ বের করে তার ভেতর থেকে পাহাড়ীর একখানা ফটো বের করে।

—এখনও কি তুমি স্বীকার করবে না যে তুমি আমার মা? যে রাত্রে তুমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়ে চলে যাও তখন আমি ঘুমিয়ে থাকলেও আমার কিছুটা জ্ঞান ছিল। পরদিন সকালবেলা বাবাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে 'এ্যাক্সিডেন্টে' তুমি মারা গেছ।

আমার শিশুমন সেকথা বিশ্বাস করে নি। মায়ের চুমার পরশ যে মেয়ের কাছে পরশমণি। ড্রয়ার থেকে তোমার এই ছোট্ট ফটোটা আমি বের করে নি। সেই থেকে এই ফটোটা আমার নিত্যসঙ্গী। আমাকে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে তুমি দূরে রেখেছ। আজ যে এতবড় 'এ্যাক্সিডেন্ট' হোল তাও আমার বিশেষ কিছু হয়নি। তোমার বয়সী কাউকে দেখলেই আমি ফটোটার সঙ্গে মিলিয়ে নি। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি তোমাকে ফিরে পাবোই। আজ 'এ্যাক্সিডেন্টের' ভেতর দিয়ে ভগবান আমার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

নার্সের হাতে ফটোটা দিয়ে বলে বনশ্রী। তার চোখে মুখে পূর্ণ দীপ্তি।

—আমার মা। আমার হারানো রতন।

ফটোটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে চোখেমুখে অনির্বচনীয় আনন্দ ফুটিয়ে বনশ্রীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে পাহাড়ী। চুমোয় চুমোয় গাল ভরে দেয়।

মেঘ কেটে গিয়ে পূব আকাশে সূর্য দেখা দেয়।

অশান্ত চিত্তে কেবিনে ঢুকে রমেন এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব।

পাহাড়ী দু'হাতে রমেনের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ছোঁয়ায়।

রমেন পাহাড়ীর মাথায় হাত রাখে।

সকালের মিষ্টি রোদের মত তিনজনের মুখেই মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে।

আলো আর কালো

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো, আলো, আরো আলো
আমি চলেছি, পূর্বাস্য হয়ে
যাত্রাপথের শপথ নিয়ে
ভোরের আগের যে প্রহরে আলোর সুরে
কিঙ্কিণী বাজে কালো রাতের বাঁকে
উদয় পথের নেপথ্যে
অরুন্ধতী জাগে সপ্তর্ষিদের মাঝে
দিব্যদ্যুতিতে কাঁপে শুকতারা আর জ্যোতিষ্কের দল
কাকজ্যোৎস্নার শেষ আবেশে প্লাবন চঞ্চল
আদেশ শুনেছি ঋষির শতপথ ব্রাহ্মণের
উপনিষদকার বলেছেন অন্ধকার থেকে আলোয়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
স্নান করেছি কণ্ঠে নিয়েছি মন্ত্র
জীবনের অমৃতধ্যানে হয়েছি কল্যাণব্রত
করেছি অন্নদান নিরন্নদের, ভীতত্রস্তদের অভয়
সমাহিতসত্ত্ব মূর্ত বোধিসত্ত্বের মত
এসেছে মৈত্রী-ভাবনা করুণা
জৈবিক প্রেরণায় আর নেই মত্ততা
অর্থ উপার্জনে নেই মন
নামের মোহে ধরেছে বিতৃষ্ণা
জ্ঞানের চর্চায় হতে চেয়েছি প্রশান্ত
যোগাসনে বসেছি তৎপর,
সবাই বললে—সাধু, সাধু, ধন্য তুমি বরেণ্য
তবু নশ্বর হয়ে উঠলো দিন
প্রখর হয়ে উঠলো জীবনবোধ
মুখর হলো মনের অলিগলি সীমার সীমানা
কী পাইনি তার হিসাবনিকাশে নয়
কী পেয়েছি তার পাওনা মেলাতে,
নেমে পড়লাম পথে. মাখলাম ধূলি গায়ে
তুলে নিলাম জঞ্জাল. অভিশপ্ত বিষাক্ত বীজ
রাত্রির গভীরে তার পেলেম দেখা
তামসীর গহিন গিরিকন্দরে
মনের অরণ্যের বন্দন মর্মরে
আকাশময় সপ্রত্যয়ে, অগ্রণী অগ্নিশিখার মত
জলছে সে স্বয়ম্প্রভা ভিতরে বাহিরে
ডাকছে তনুতট শিখরের উদগ্র চূড়ায়
ভোগবতীর তীরে, মর্মান্তিক প্রগলভতায়
সব কিছু তুচ্ছতায়, লুব্ধতায়
শর্বরীর স্বপ্ন তখনও ভাঙেনি
কামনা'র বাড়বানলে পূর্ণ আহুতি পড়েনি
প্রতীকের উপাসনায় পঞ্চ-মকারের উপচার,
রাতের কোলাহলে রতিজ মুহূর্তগুলি
রভস উচ্ছ্বাসে তখনও উদ্বেল ;
তাকে দেখলাম রংএ রেখায়, চাকচিক্যে
ঋতুরঙ্গরসিকার দ্রুত ঝঙ্কৃত সুরে
দেখলাম লালসার অবারিত আরতিতে
লোভন আবিষ্কারের শোভন অভিসারে
দেখলাম ধরা দিচ্ছে সে বাহুর আলিঙ্গনে
অধরের মদির আলিম্পনে,
মৃত্যুনীল উন্মাদনার স্পন্দনে ;
আমার ব্রহ্মচারী দেহ শিউরে উঠলো
সেই কদর্য কঠোর অশুচি স্পর্শ দেখে
কই বিচ্ছুরিত হলো না ত হরকোপানল
রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্রের বহ্নিবাণ
পঞ্চশরে যা দগ্ধ করেছিলো,
হাসলে সে খলখল করে
আমার গলিত মনের শবাসনা
সন্ধ্যার সান্ত্রক্ষণে কাণে কাণে বললে
অন্ধকার থেকে আলোই শেষ কথা নয়
মৃত্যু থেকে অমৃতত্বই গতির পরিণতি নয়
আলো থেকে অন্ধকারেও যাতায়াত করতে হয়
জীবন মানেই দুই, উভয় ভারতীর উভয় তীর
যাত্রা যেখানে হবে একত্তর
শংকরীর আর ভয়ঙ্করীর
কালের আর আলোর
যাওয়ার আর আসার
ছাড়ার আর পাওয়ার
পূরবীর আর বিভাসের
সূর্যদেব হাত ধরে মিলিয়ে দেন যাদের
সকালে সন্ধ্যায় জীবনের নগ্ন নিকষে
আমি কবি, শুনেছি তার কথা,
সকল কালের জীবন দেবতার ব্যথা
তাই চলেছি ফিরে, মিল থেকে অমিলে
মাত্রা থেকে অমাত্রায়
আলো থেকে অন্ধকারে
কপালিনী উলঙ্গিনীর খোঁজে
সেই কালোরূপেই আমি আজ মজবো
সব আলো যেখানে ডুবেছে,
সবশেষের সমাধি মন্দিরে
সব আরম্ভের যেখানে সুরু।

"ম্যাথু-আর্ণল্ড প্রতিভার রূপরেখা"

ডাঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

ভিক্টোরীয় যুগ বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও বৈষয়িক উন্নতির যুগ। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ঊনবিংশ শতাব্দী উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এই যুগেই সূচিত হয়েছিল। ধর্ম ও বিশ্বাসের বনিয়াদ আস্তে আস্তে শিথিল হ'য়ে আসছিল। অতীতের ঐতিহ্যকে মানুষ বাসি-ফুলের মালার মত ছুঁড়ে নূতনের আবাহন গীতি গাইতে সুরু ক'রল। কবি টেনিসন ভিক্টোরীয় যুগের সমস্ত হাসি-কান্না আর চাওয়া-পাওয়াকে তার রূপ দিয়েছেন। তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞান, বিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদ, যুক্তি ও কল্পনার সমন্বয়সাধন করতে পেরেছিলেন। ব্রাউনিং তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের বনিয়াদে যাতে কোন ফাটল না ধরে তাই ইটালীকেই তাঁর যৌবনের লীলানিকেতন, তাঁর বার্দ্ধক্যের বারাণসী করে ফেললেন। কিন্তু ম্যাথু আর্ণল্ড তাঁর স্পর্শকাতর চিত্ত নিয়ে একান্ত অসহায়ের মত দেখলেন যে অবিশ্বাসের ঢেউ বারে বারে এসে ইংল্যাণ্ডকে আঘাত করছে। যতবার তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন অতীতের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে, ততবার দেখলেন তাঁর যুগের অধিকাংশ লোকই কালাপাহাড়ের মত বিশ্বাসের বনিয়াদকে খানখান করে চুরমার করেছিল। এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানায় পড়ে আর্ণল্ড পর্যুদস্ত হ'য়ে যাচ্ছিলেন। আর্ণল্ড চেয়েছিলেন তাঁর স্বরচিত "পলাতক জিব্‌সির" মত ভিক্টোরীয় যুগের কুহেলিকা ও মায়া-মরীচিকা থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে—কিন্তু সেটা যখন সম্ভব হ'ল না তখন তিনি বেদনাবিহ্বল চিত্ত নিয়ে দর্শক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই বেদনার প্রকাশ পেল তাঁর কাব্যে ও তাঁর সমালোচনায়।

ম্যাথু আর্ণল্ড জন্মেছিলেন অত্যন্ত নীতিপরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে। তাঁর বাবা ডাঃ টমাস আর্ণল্ড ছিলেন খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক। তিনি ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, লেখাপড়ার চেয়েও নৈতিক চরিত্রের মূল্য অনেক বেশী। এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ম্যাথু আর্ণল্ড নৈতিক উন্নতিকে জীবনের চরম অভীষ্ট বলে মনে করেছিলেন। ডাঃ আর্ণল্ড যখন রাগবি স্কুলের হেডমাষ্টার, তখন ম্যাথু আর্ণল্ড উইনচেষ্টার স্কুলে পড়ছিলেন। আর্ণল্ড-তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। উইনচেষ্টার স্কুল ছেড়ে তিনি তাঁর বাবার স্কুলে ভর্তি হলেন। স্কুলে থাকাকালীন তার কবিপ্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল। সমস্ত ছাত্রদের সঙ্গে কাব্য প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। "এল্যারিক এ্যাট রোম" তাঁর প্রথম কাব্য।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে আর্ণল্ড অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালিয়ল কলেজে ভর্তি হলেন। আর্ণল্ড ও তাঁর বন্ধুরা "ডিকেড" নামক একটি মজলিসের প্রতিষ্ঠা করেন। দশজন সদস্য ছিলেন বলে মজলিসের নাম হ'ল ডিকেড। তখন অক্সফোর্ড মুভমেণ্টের ঢেউ সারা ইংল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর্ণল্ডের বন্ধু ক্লাফ সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে গেলেন। কিন্তু আর্ণল্ড তাঁর বিশ্বাস অটুট রাখতে পেরেছিলেন। প্রথম যৌবনে ধর্ম ও অধর্ম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রশ্ন তাঁর মনে বিশেষ সাড়া জাগায় নি। তাঁর জীবনের মালঞ্চে বসন্তের প্রথম আবির্ভাব দেখা দিয়েছে। রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ ভরা পৃথিবী তাঁর কাছে এক নূতন বারতা এনে দিয়েছিল। অক্সফোর্ডের ছাত্রদের মধ্যে কাব্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন 'ক্রমওয়েল' কবিতা লিখে। তখন ম্যাথু আর্ণল্ডের বয়স পুরো একুশ হয়ে উঠেনি। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সংবাদ এল ডাঃ টমাস আর্ণল্ড দেহত্যাগ করেছেন। ম্যাথু আর্ণল্ডের জীবনের আলো আর রং এক মুহূর্তে মুছে গেল।

ছোট ছোট আট জন ভাই বোন আর বিধবা মা। ভাই-বোন সকলেই ছাত্রছাত্রী। কিন্তু ডিগ্রী না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সমীচীন নয়। তাই তিনি বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। অমন মেধাবী ছাত্র, কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে তাঁর স্থান হ'ল না। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্লাক বলেছিলেন, ম্যাথু যতই কম পড়াশুনো করুক না কেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচে সে কখনো নামবেনা, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই তার স্থান হ'ল।

কয়েক মাস বাবার স্কুলে শিক্ষকতা করলেন। যিনি ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করেছিলেন তার অজস্র রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর নিজের কিন্তু শিক্ষকতা বেশীদিন ভাল লাগল না। লর্ড ল্যান্সডাউন তখন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা। আর্ণল্ড তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। বড়লোকের বাড়ীর আদব কায়দার জৌলুসে চোখ একটু ধাঁধিয়ে গিয়েছিল বৈ কি। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আর্ণল্ড-এর অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি স্তরের লোকের তিনি সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছিলেন এই অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হিসাবে।

কাজের চাপ কম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কবিতার স্বর্ণ অঞ্জলি। সাতাশ বছরে প্রথম কাব্য সঞ্চয়ন প্রকাশিত হ'ল "ষ্ট্রেড রেভেলোর এ্যাণ্ড আদার পয়েমস্" নামে। ভিক্টোরীয় যুগ রোমান্টিক যুগ। সে যুগে মানুষের জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। কিন্তু তিনি হারিয়ে যাওয়া গ্রীক কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গ্রীক আর্টের সংযম ও সুমিতি নিয়ে এলেন তাঁর কাব্যে। তাই সেযুগের পাঠক ও পত্রিকাগুলি আর্ণল্ডকে সমাদর জানালেন না। এতবড় কবিপ্রতিভা এতটুকু স্বীকৃতি পেলে না।

নিঃসন্দেহে একটু দমে গেলেন আর্ণল্ড। কিন্তু তখন তার জীবনে মধুমাস দেখা দিয়েছে। মার্গারেট তখন তাঁর জীবনের রঙ্গমঞ্চের নায়িকা। একটুকু ছোঁয়া লেগে, একটুকু কথা শুনে তাঁর দিন কাটছে সুইজারল্যাণ্ডে বেল ভিউ হোটেলে। বন্ধু ক্লাফকে লিখলেন যে তিনি তখন এক জোড়া নীল চোখের রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই মোহ কেটে গেল। আর্ণল্ড বুঝলেন, মার্গারেট উর্ব্বশীর মত—নহে মাতা, নহে কন্যা, প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ানই তার কাজ। গৃহলক্ষ্মী হবার মত তার বাসনাও নেই, সাধ্যও নেই। "টু মার্গারেট" কবিতায় বিদায়ের সুর বেজে উঠেছে। শুধু বিদায়ের সুর নয়, বেদনার সুর।

ফিরে এলেন লণ্ডন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হ'ল দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—"এম্পিডোক্‌ল্‌স অন্ এটনা"। ভিক্টোরীয় পাঠক আগের বারের মতই মুখ ফিরিয়ে রইলে। এই সময় তাঁর দেখা হ'ল ফ্যানীনলুসী ওয়াইট-ম্যানের সঙ্গে। ফ্যানীর বাবা হাইকোর্টের জজ। আর্ণল্ড আগে নিজেকে ভুলেছিলেন একজোড়া নীল চোখের মোহিনী মায়ায়। এবার একজোড়া ধূসর শান্ত চোখ। তাতে মোহিনী মায়া নেই। আছে কল্যাণস্পর্শ আর নীড় রচনার আমন্ত্রণ। আর্ণল্ড বিয়ের প্রস্তাব কর্লেন। জজ সাহেব শুধু বল্লেন, চাকরীতে উন্নত না হলে কিছুই হবে না।

আর্ণল্ড চাকরীর উন্নতির জন্য লর্ড ল্যান্সডাউনকে ধর্লেন। প্রাইমারী স্কুলের ইন্‌স্পেক্টরের চাকরী জুটল। ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে জীবন দেবতার পায়ে আত্মবিসর্জন কর্তে হ'ল। পাঁচ থেকে এগারো বছরের ছেলেমেয়েদের অংক, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য আর্ণল্ডকে সারাদিনই ঘুরে বেড়াতে হ'ত। সারা জীবনই তাঁকে এই কাজ কর্তে হয়েছে। যখন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী আর্ণল্ডের কাছে শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতেন বা পরামর্শ চাইতেন, তখনও আর্ণল্ড সামান্য বেতনভুক্ স্কুল-ইনসপেক্টর মাত্র।

বিয়ে করার জন্য তাঁকে ইনস্পেক্টর হ'তে হয়। মস্ত বড় মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল। কিন্তু মূল্য দিয়ে তিনি পারিবারিক সুখ শান্তি দুই-ই পেয়েছিলেন। ফ্যানী লুসী—যাঁকে আর্ণল্ড আদর করে ফ্লু বলে ডাকতেন—তিনি তাঁর জীবন পাত্র মাধুরী দিয়ে কানায় কানায় ভরে দিয়েছিলেন। তাঁদের বিবাহিত জীবনের প্রত্যেকটি দিন ছিল মধুচন্দ্রিকা।

আর্ণল্ডের চারটি ছেলে ও দুটী মেয়ে হয়েছিল। সামান্য

কিছু দিনের ব্যবধানে তিনটি ছেলে মারা গেল। বাড়ীতে যখন শোকের ছায়া নেমেছে তখনও আর্ণল্ড ভেঙে পড়েন নি। তাঁর ঈশ্বরের প্রতি এত গভীর বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ঈশ্বরের মঙ্গলস্পর্শ অনুভব কর্‌বার শক্তি তাঁর ছিল।

বিয়ের দুবছর বাদে আর্ণল্ড তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ কর্লেন। আগেকার কাব্যগ্রন্থ দুটির লেখক ছিলেন "এ"। সেসময় আর্ণাল্ড নিজের পুরো নাম প্রকাশ কর্তে সাহস করেন নি। এবারের লেখক ম্যাথু আর্ণল্ড। কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে তিরিশ পাতার একটি দীর্ঘ ভূমিকা প্রকাশিত হল। ভূমিকাটি শুধু রোমান্টিক পাঠক দের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ার মাত্র নয়। কাব্যসমালোচনার ইতিহাসে ভূমিকাটি অপূর্ব অবদান। তিনি গীতিকাব্য এবং স্বানুভূতি-প্রধান সাহিত্যের যুগে জন্মগ্রহণ করে গীতি কাব্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কর্লেন। আর তাঁর কাব্যও তাঁর ঘোষিত নীতির বাহন হয়ে উঠল। এবার জনগণ তাঁর কাব্য সহজেই গ্রহণ কর্ল। কিন্তু মজার কথা যে আর্ণল্ড সবসময় নিজের ঘোষিত নীতি অনুসরণ কর্তে পারেন নি। অনেকসময় গীতিকাব্যর দেবীর হাতের কাঁকনের স্পর্শে তাঁর কল্পনা হাজার গানে মুখর হ'য়ে উঠেছিল।

দুটি বছর বাদে চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল। কিন্তু এবার পাঠকেরা ততটা সমাদর দেখালেন না। আর্ণল্ডের কবিপ্রতিভা ছিল। কিন্তু পাঠকের ঔদাসীন্যেই হোক বা জড়বাদী ভিক্টোরীয় যুগে তাঁর কবি প্রতিভার সম্পূর্ণ উন্মেষ সম্ভব হয়নি বলেই হোক, আর্ণল্ডের কবিতা কল্পনার পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ লাভ করে নি। ক্রমেই ধারা বিশীর্ণ হ'য়ে আসছিল। বস্তুতঃ চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বার বছর বাদে শেষ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শেষ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর তিনি একুশ বছর বেঁচে ছিলেন। এই একুশ বছরে তিনি সাতটি কবিতা মাত্র লিখেছিলেন। আর্ণল্ডের প্রত্যেকটি কবিতায় বেদনার আভাস। মৃত্যু, বিরহ, বিচ্ছেদ—এই হ'ল তাঁর কবিতার মূল সুর। অন্যান্য সমসাময়িক কবি যখন তাঁদের কাব্যে আশার বাণী—উচ্চারণ করছিলেন, আর্ণল্ড তখন যুগের ব্যাধি ও মৃত্যুর কথাই বারে বারে উল্লেখ কর্‌ছিলেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর সম্বন্ধে লিখলেন "রাগবি চ্যাপেল", যুগের মৃত্যু সম্বন্ধে লিখলেন—"ওবারম্যান", "স্কলার জিপসি", এবং "সাটারিউস"; ছোটভাই এর মৃত্যু উপলক্ষে লিখলেন "কার্নাক" এবং "সাদার্ন নাইট"। হাইনের মৃত্যুতে রচিত হল "হাইনেজ গ্রেভ"। গ্যাটে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং বায়রনের মৃত্যু উপলক্ষে লিখলেন—"মেমোরিয়াল ভার্সেস" চার্লট ব্রন্টির মৃত্যু উপলক্ষে লিখলেন-"হাওয়ার্থস্ চার্চ-ইয়ার্ড' ক্লাফ সম্বন্ধে লিখলেন—"থার্সিস"। এ সবত শুধু মৃত্যুর কবিতা। তাঁর সব কবিতায়ই বেদনাতে চিত্তের করুণ প্রকাশ।

অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতার অধ্যাপক এর পদ খালি হল—আর্ণল্ড নির্বাচিত হলেন। এর মানে এই নয় যে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইনস্‌পেক্টরের পদের গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পেলেন। নাবিক সিন্ধুবাদের কাঁধে যেমন ভূত চেপেছিল ঠিক তেমন ইনস্‌পেকটরের পদ জগদ্দল পাথরের মত তার বুকে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে চেপে ছিল। অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল যে কবিতার অধ্যাপক কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বছরে কয়েকদিন কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। পাঁচ বছর এই চাকরীর মেয়াদ। আর্ণল্ডের প্রথম বক্তৃতা হল—আধুনিক সাহিত্য। আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক সাহিত্য তাঁর বিষয় হলেও তিনি প্রাচীন গ্রীক কাব্য ও সাহিত্যের উপযোগিতা সম্বন্ধেই আলোচনা করেন।

কিছুদিন বাদেই প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম ও শেষ নাট্যকাব্য "মেরোপি"। মিল্টন প্রমুখ কয়েকজন ইংরেজ কবি গ্রীক্ নাট্যকারদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের নাটকেই গ্রীক কাঠামোর মধ্যে আধুনিকতার সুর কিছুটা ধ্বনিত হয়েছিল। আর্ণল্ড গ্রীক্ সাহিত্যে পারঙ্গম। গ্রীক ভাবধারায় তিনি অনুপ্রাণিত। তাই তিনি গ্রীক আঙ্গিক গ্রীক্ সুর গ্রীক্ ভাবধারাকে তাঁর নাটকে রূপায়িত করলেন। কিন্তু পাঠকেরা অনড়, অচল হয়ে রইলেন। আর সুইনবার্নের "আটালাণ্টা ইন ক্যালিডন" নাটক পড়ে গদগদ হ'য়ে উঠলেন।

আর্ণল্ড এ সময় কিছুদিন সখের রাজনীতি করেছিলেন। তার ফলশ্রুতি হ'ল "ইংল্যাণ্ড এ্যাণ্ড দি ইটালীয়ান্ কোয়ে-

শেন"। তিনি ভেবেছিলেন এই বই লিখে গ্লাডষ্টোন তাঁকে কোন অ্যাম্বাসাডার পদে নিযুক্ত কর্বেন। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। গ্লাডষ্টোনের করুণা হলনা। কিন্তু শিক্ষা-মন্ত্রী তাঁর অকৃপণ দাক্ষিণ্য দেখালেন আর্নল্ডকে শিক্ষা-বিষয়ক কমিশনার নিযুক্ত করে।

আর্ণল্ড ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ভ্রমণ করে সে সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্য-বেক্ষণ করে এলেন। তারই বিবরণ প্রকাশিত হল— "পপুলার এডুকেশন ইন ফ্রান্স" বই এ। শিক্ষাজগতে একটা সাড়া পড়ে গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগতেও সাড়া পড়ে গেল তাঁর হোমার বিষয়ক বক্তৃতা-মালায়। এ, ই, হাউসম্যান বলেন যে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত সমালোচনার বই একদিকে রেখে আর্ণল্ডের শীর্ণকলেবর "হোমার"কে অন্যদিকে রাখলে দেখা যাবে যে "হোমার" ধারে ও ভারে সবার চেয়ে বড়। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ হোমার অনুবাদকগণের অনুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে আর্ণল্ড অনুবাদ সম্বন্ধে নিজের মূল্যবান্ মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু আর্নল্ডের তিক্ত সত্যকথা প্রকাশে দুজন অনুবাদক ফ্রান্সিস নিউম্যান ও ইচাবড রাইট ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন। তাঁদের ক্ষ্যাপামি প্রকাশ পেল তাঁদের আর্ণল্ডের বিরূদ্ধে রচনায়। আর্ণাল্ড পরের বছর "হোমার সম্বন্ধে শেষকথা" বইএ এ আলোচনার উপর যবনিকা পাত কর্লেন।

কবিতা সৃষ্টিধর্মী। আর্ণল্ডের সমালোচনাও সৃষ্টিধর্মী। তার সমালোচনা তাজা ফোটা ফুলের মত। বর্ণে, গন্ধে, রূপে, মাধুর্য্যে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে, চৈতন্যের মহিমায় মহীয়ান হ'য়ে উঠেছে তাঁর সমালোচনা সাহিত্য। শুধু সাহিত্য সমালোচনা নয়, শিক্ষা বিষয়ক সমালোচনা কয়েকবছর বাদে প্রকাশিত হ'ল। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা "এ ফ্রেঞ্চ ইটন" মাধ্যমিক শিক্ষা জগতে এই ছোট বইখানা একটা বিরাট আলোড়ন জাগাল।

পরের বছর প্রকাশিত হ'ল সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচনার বই, "এসেজ ইন্ ক্রিটিসিজম" বা প্রবন্ধ-সংগ্রহ। আরিষ্টটলের যুগ থেকে শত শত সমালোচক হাজার হাজার প্রবন্ধ লিখেছে। কিন্তু আর্ণল্ড সমালোচনার সংজ্ঞাই পরিবর্ত্তিত কর্লেন। তিনি স্পষ্টভাবে বল্লেন সমালোচনা মানে একটা শিল্পকার্য্যের দোষগুণ বিচার নয়। সমালোচনার অর্থ বিশ্বের সুন্দর ভাবধারাকে সম্যকরূপে জানা ও সেই ভাবধারাকে প্রচার করা। আর্ণল্ডের বিশ্বাস, ইংল্যাণ্ডে ভাবধারা শুকিয়ে এসেছে। তাই ফ্রান্স, জার্মাণী ও অন্যান্য দেশ থেকে নতুন ভাব নিয়ে আসতে হবে।

সমালোচকদের হ'তে হবে বস্তুলীন। বাইরের ভাব দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে—এই ছিল আর্ণল্ডের ঈপ্সিত। ইংল্যাণ্ড এইভাবেই ভাবরসপুষ্ট হবে, সমালোচকদের গীতাবর্ণিত অনাসক্তি অর্জন কর্তে হবে। বস্তুত আর্ণল্ড গীতার অনাসক্তির কথা তাঁর প্রথম প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্ণল্ডের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, কিছু নিন্দাও জুটল। কিছু তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সোরগোল তুল্ল এই কারণে যে—আর্ণল্ড ইংল্যাণ্ডকে ছোট করে ফ্রান্সকে বড় করে তুলে ধরেছেন। যতদিন আর্ণল্ড বেঁচে ছিলেন, কিছুসংখ্যক ইংরেজদের কাছে তিনি এই অপবাদ পেয়েই গেছেন। কিন্তু পরে সকলেই বুঝেছিলেন যে আর্ণল্ড ইংল্যাণ্ডকে ব্যাকুলভাবে ভালবেসেছিলেন বলেই ইংল্যাণ্ডের দোষক্রটি দূর কর্তে চেয়েছিলেন।

সাহিত্য সমালোচক থেকে নৃতত্ত্বের সমালোচক। মস্ত বড় ব্যবধান। কিন্তু দুইএর সমন্বয় সাধন কর্লেন আর্ণল্ড তাঁর "স্টাডিস্ ইন্ কেল্টিক লিটারেচার"এ। কেল্ট জাতি অর্থাৎ ওয়েলস ও আয়র্লাণ্ডের অধিবাসীদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য পর্য্যালোচনা করে তাদের সাহিত্যিক অবদানের কথা সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ কর্লেন। শুধু কেল্ট নয়, জার্মান ও ফরাসী জাতির বৈশিষ্ট্যও সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেন। তাঁর প্রধান উপপাদ্য বিষয় হোল যে একজন ইংরেজে ৩টি ধারার সমষ্টি—ফরাসী, জার্মান ও কেল্টিক।

নৃতত্ত্বের সমালোচক থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমালোচক। "কালচার এ্যাণ্ড অ্যানার্কি" বা "সংস্কৃতি ও অরাজকতা" রাজনৈতিক ও সামাজিক সমালোচনার—ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থানাধিকার করে আছে। অক্সফোর্ডে কবিতার অধ্যাপকের পদ তিনি দশবছর অলংকৃত করে ছিলেন। "কালচার অ্যাণ্ড অ্যানার্কি"র প্রথম অংশ

অক্সফোর্ড বক্তৃতামালার শেষ বক্তৃতা। তখন লণ্ডনবাসী সকলেই ভোটাধিকার পাবার জন্য বিশেষ উত্তেজিত। হাইড পার্কে ক্ষিপ্ত জনসাধারণ রেলিং বেঞ্চি প্রভৃতি চুরমার করে ফেল্ল। সৈনিকগণ নীরব দর্শক হয়েই রইল। ম্যাঞ্চেস্টার, গ্লাসগো ও লীডস প্রভৃতি স্থানে জন ব্রাইট জনসাধারণকে জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তেজিত করলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্য্যয়ের আভাস দেখা দিল। তাই তিনি "কালচার এ্যাণ্ড এ্যানার্কি"তে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতার কথাই তিনি বলেন নি। বুদ্ধি ও নীতির বিপর্য্যয় দেখা দেবে, এই আশংকা তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। এই বিপর্য্যয় থেকে মুক্তি পাবার একটিমাত্র উপায় কালচার বা সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে চিরকাল নানা মুনির নানা মত প্রচার হয়েছে। আর্ণল্ড-এর মতে 'কালচার' এবং 'ক্রিটিসিজম' অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশ্বের ভাবরাজ্যের সঙ্গে পরিচয় 'কালচার'এর অন্যতম লক্ষ্য। প্রত্যেক মানুষকে সম্পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। শুধু বৈষয়িক উন্নতি ভিক্টোরীয় যুগের জনসাধারণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। উপকরণের দুর্গ গড়ে তোলার প্রয়াসে তারা জ্যোতির্ম্ময় আত্মার স্বরূপ ভুলে যাচ্ছিল। দেহসর্ব্বস্ব জাতি দেহের সুখের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করছিল। কিন্তু মন তাদের কাঙাল, বুভুক্ষু হয়েই রইল। আর্ণল্ড ইংরেজজাতিকে তিন ভাগে ভাগ করলেন –'বার্বেরিয়ান' বা 'অভিজাত সম্প্রদায়', 'ফিলিষ্টিন' বা 'মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়' এবং 'পপুলেস' বা 'জনসাধারণ'। এই তিন সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ভালটুকু নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

আর্ণল্ড ইংরেজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু মোহাবিষ্ট জাতির এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। আর্ণল্ড জাতির গুরু বা 'প্রফেট' হয়ে উঠলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর প্রিয় পুত্রকে স্বীকৃতি দিলেন। লর্ড স্যালসবারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আর্ণল্ডকে ডি, সি, এল উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে "মূর্ত্তিমান 'কালচার এ্যাণ্ড এ্যানার্কি'তে 'মাধুরী ও আলোকের' প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলেন। তাই এই সম্বোধন।

কিছুদিনের মধ্যেই 'ফ্রেণ্ডসিপস্ গার্ল্যাণ্ড' বা বন্ধুর উদ্দেশ্যে মালিকা রচনা করেন। এখানেও ইংরেজ জাতিকে মোহাবেশ থেকে জেগে ওঠার আমন্ত্রণ। কিন্তু এখানে আঘাতের সঙ্গে হাস্যরস আছে। আর্ণল্ডের হাস্যরস যে কত মধুর আর কত নিষ্করুণ হতে পারে তারই পরিচয় রয়েছে প্রতি পংক্তিতে।

সামাজিক সমালোচনা থেকে এবার ধর্মসংক্রান্ত সমালোচনা। এখানেও মনীষীর দৃঢ় বলিষ্ঠ প্রত্যয়পূর্ণ পদক্ষেপ। এত বিভিন্ন বিষয়ে পরিক্রমা বোধ হয় সমসাময়িক কেউই করেননি। এমনকি কার্লাইল ও রাস্কিনও নন। এই পর্য্যায়ে তার লেখা—'সেইণ্ট পল্ এ্যাণ্ড প্রটেস্ট্যান্টিজম", "লিটারেচার এ্যাণ্ড ডগমা", "গড এ্যাণ্ড দি বাইবেল" এবং "চার্চ এ্যাণ্ড রিলিজন।" সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আর্ণল্ড ধর্মালোচনা করেছেন। কবি যখন ধর্মালোচনা করেন তখন বাইবেল একখানা কাব্য হয়ে ওঠে। আর্ণল্ড যীশুর অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বাস করেছেন সেই মানবপুত্রের মনুষ্যত্বকে, কাঁটার মুকুট পরা দরদী মানুষকে। গোঁড়া পুরোহিত দল এমন কি গ্লাডষ্টোন পর্য্যন্ত ক্ষেপে উঠলেন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ আর্ণল্ড তাঁর বিশ্বাস থেকে একচুলও নড়লেন না।

এর পর আর্ণল্ড মাত্র ৪ খানা বই লিখেছিলেন। "আইরিশ এসেজ", "ডিসকোর্সে'স ইন অ্যামেরিকা", এবং 'এসেজ ইন ক্রিটিসিজম" (২য় পর্য্যায়) এবং "মিক্সড এসেজ" সাহিত্য ও রাজনীতি এই বইগুলির উপজীব্য। 'ডিসকোর্সে'স্ ইন আমেরিকা' আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতামালা। 'এসেজ ইন ক্রিটিসিজম" প্রকাশিত হল আর্ণল্ডের মৃত্যুর পর। এই প্রবন্ধগুলি মোটামুটি ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে। এই বইয়ের প্রথম এবং প্রধান প্রবন্ধে আর্ণল্ড কবিতার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা লিখেছেন। সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন—"জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য – জীবনের মূল্যায়নের জন্য, দুঃখ বেদনায় সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য, কবিতার একান্ত প্রয়োজন হবে। কাব্যহীন বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ। আজকালকার ধর্ম্ম ও দর্শন কবিতাকে

মৃত্যুর দু'বছর আগে আর্ণল্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইনস্পেক্টরের পদ থেকে অব্যাহতি পেলেন। গ্লাডষ্টোন চিরকালই আর্ণল্ডের বিরোধিতা করে এসেছিলেন। আজ তিনি আর্ণল্ডকে "ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য ও কাব্যলক্ষ্মীর সেবার স্বীকৃতি হিসাবে" আড়াইশ' পাউণ্ড পেনসনের ব্যবস্থা করেন।

বড় মেয়ে লুসীর বিয়ে হয়েছিল আমেরিকায়। মেয়ে আর নাতনী বাপের বাড়ী আসছেন। লিভারপুলে জাহাজ ভিড়বে। তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য একটা বেড়া ডিঙিয়ে লাফ দিলেন। বৃদ্ধের পক্ষে হঠকারিতা। কিন্তু পিতৃস্নেহ নিয়ম মানে না। সেই খানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না। একটি বিরাট প্রতিভামাত্র নয়, একটি যুগ, একটি মহৎ ঐতিহ্য, একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের অবসান হল। না, অবসান হয়নি। আর্ণল্ডের নশ্বর দেহ ধূলোয় মিশে গেল! কিন্তু তাঁর অবদান জাতির অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল। আজও তাঁর বাণী নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অম্লান। অম্লান আলোক-তীর্থের চিরযাত্রী হয়ে তিনি অনাগত যুগের পথিকৃৎ হয়ে রইলেন।

ইংরেজী সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ও জন ষ্টেইন্ বেক

ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম্-এ (লণ্ডন) পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় যাঁরা ফুল ফুটিয়েছেন তাঁদের নাম কালের বালুচরে চিরদিন আঁকা থাকবে কিনা কেউ বল্‌তে পারে না। তাঁদের অনেকের সাহিত্যসৌরভ কালের গণ্ডী পেরোতে পারবে কি না কে জানে? তবে স্থানের গণ্ডী পেরিয়ে এই সব মনীষীর অবদান যে মানবমনে দোলা দেয় এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এমনি সাহিত্যিকের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। আর তাঁদের সাহিত্যপ্রতিভার অন্যতম স্বীকৃতি হিসাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এবছরে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন John Stein Beck. সম্প্রতি তিনি এই পুরস্কার ও সম্বর্দ্ধনা লাভের জন্যে স্টকহলমে আমন্ত্রিত হন। সেখান থেকে ফিরবার পথে তিনি কয়েকদিন লণ্ডনে ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্যে বিশেষ বিশেষ মহলে বিপুল আগ্রহ দেখা দেয়।

কিন্তু এমনি আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি। যাই হোক বি, বি, সি থেকে David Stride এর উদ্যোগে এই বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ আলোচনার সুযোগ ঘটে। তাঁকে দেখেই মনে হয় যে লেখক বিশেষ শক্তির অধিকারী— দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও প্রাণময়। পুরুষোচিত তাঁর করমর্দন। মুখে যেন দৃঢ়তার ছাপ। কমনীয়তার কোন চিহ্ন নেই। মাথায় অল্প অল্প চুল, মুখে ছোট্ট একটুখানি দাড়ি। বেশভূষার কোন সমারোহ নেই—সাদাসিদে কালো একটি স্যুটই তাঁকে যেন বেশ মানিয়েছিল। কথায় বার্ত্তায় একটা দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। দৃষ্টি গভীর ও মর্ম্মভেদী।

নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে অবাক হ'তে হয়। নিজের সম্বন্ধে খুব একটা উচ্চধারণা তাঁর কথায় প্রকাশ পায় না। বরঞ্চ নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে তিনি বিচার করতে চান। সত্যিই এই গৌরবের অধিকারী কে? তাঁর মতে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর সাহিত্যিক হলেন Carl Sandburg। তিনি একাধারে কবি ও সাহি-

তিক। Lincolnএর যে জীবনী তিনি সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই অপূর্ব্ব। নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা অহমিকা তাঁর নেই—তাই তিনি মুক্তকণ্ঠে যুগের মনীষীদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল—বিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে কার প্রভাব উত্তরকালের সাহিত্যিকদের ওপর সবচেয়ে বেশী? তখন তিনি নিঃসংশয়ে উত্তর দিলেন—'আমার বিশ্বাস Sherwood Andersonই হ'লেন এযুগের সাহিত্যসম্রাট। কারণ তার লোকোত্তর প্রতিভা সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন পথের নিশানা দিয়েছে।

Steinbeck প্রতিভার পূজারী, তাই Sherwood Andersonএর মনীষার কাছে তিনি বার বার তাঁর সশ্রদ্ধ নতি জানিয়েছেন। সেখানে তাঁর নিরপেক্ষ স্বচ্ছ সমালোচক মন সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সাহিত্যিক Steinbeck এর জন্ম হয় ক্যালিফোর্নিয়ার ছোট্ট একটি পল্লী Salinusএ—১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

বাবার দিক থেকে জার্ম্মান রক্ত তাঁর ধমনীতে রয়েছে—আর তাঁর মায়ের জন্ম হ'ল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে। তাই দুই জাতির সংমিশ্রণে এই মনীষার অভ্যুদয়। অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ার মুখর পরিবেশে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, যুক্ত-রাষ্ট্রের সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি সুপরিচিত—আর তাঁর সাহিত্যেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট। আবার ইংল্যাণ্ডেও তিনি অপরিচিত আগন্তুক নন—গ্রেট বৃটেনের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ। তাঁর সাহিত্য সাধনার ধন তিনি আহরণ ক'রেছেন Somersetএর সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির কোলে। ১৯৫৯ সালের বেশীর ভাগ দিন কেটেছে এইখানে। লেখক সস্ত্রীক এই নিভৃত পল্লী পরিবেশে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটিয়েছেন। খ্যাতির নেশা তাঁর মধ্যে ছিল না—সাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনের অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেছেন তিনি। এখন তাঁর দৃষ্টি প'ড়েছে বৃটেনের King Arther and His Knights-এর দিকে। তাই তাঁর রচনার বহুলাংশ উদ্দিষ্ট হয়েছে সেই দিকে। এ ছাড়া তিনি আরও বই লিখেছেন—যেমন Torfilla Flat, of Mice and Men, The Grapes of Wrath, The man is down can never Row ইত্যাদি তাঁর Grapes of Wrath একটি বিশিষ্ট রচনা। কিন্তু এই রচনায় তাঁর রচনাশৈলী উপযোগী হয়েছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠিত হননি যে এই রচনাশৈলী ঠিক পরিবেশের উপযোগী নয়। তবে আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখায় তিনি পৌছিয়েছেন—এই বয়সে তাঁর রচনাভঙ্গী বদলান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে লেখার আনন্দেই তিনি এই রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সাহিত্য ও রাজনীতি প্রসঙ্গেও তিনি তাঁর মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন। রাজনীতির কুপ্রভাব তাঁর জীবনে কম বিড়ম্বনা আনেনি। সাহিত্যিক মন নিয়ে তিনি যা রচনা করেছেন—নানাভাবে তার রাজনৈতিক ভাষ্য যোজনা ক'রতে চেয়েছেন বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী। সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের জন্যেই রাজনীতির দিকে তার দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে। রাজনীতি তার পেশা নয়।

নানাকারণে Stein Beck আত্মপ্রচারের বিরোধী। বোধহয় সত্যিকারের সাধক মন কোনদিনই প্রচারের পক্ষ-পাতী হয় না। তাই সাংবাদিক অধিবেশনে কোন কিছু বলতেও তাঁর এত দ্বিধা। বিশেষ কুণ্ঠার সঙ্গেই তিনি লণ্ডনের এই অবিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে কোন কিছু মন্তব্য পেশ করা ধৃষ্টতা মাত্র। অনেকে এটা হয়ত তার বৈষ্ণব-বিনয় বলতে পারেন—কিন্তু ষ্টেইনবেকের এই সন্তর্পণশীল মনোভাবকে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ উপাদান বলা চলে। সত্যকে তিনি বোধ হয় আপেক্ষিক বলে মনে ক'রেছেন—তাই সুদূর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছু বলাকে সঙ্গত বলে তিনি মনে করেন না। সাহিত্যিকের যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে—দ্রষ্টা ও মনীষী Stein beck তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। আর তিনি বিশ্বাস করেন যে আত্মগৌরব বা আত্মপ্রচার যেকোন সাধনারই অন্তরায়। কবির কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—"নিজেরে করিতে গৌরবদান, আপনারে শুধু করি অপমান" মনীষী লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে এই সত্য যেন ধরা দিয়েছে।

অভ্যাস হেরে যায় যা'র কাছে

দীপ্তি সেন গুপ্তা

'নিয়ে যান আপনার মেয়ে। আর এক মুহূর্তও আমরা এ'ধরণের মেয়ে রাখতে রাজী নই। নার্সিং-কলেজের নামে কলঙ্ক।' ক্রুদ্ধ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গর্জে উঠেছিলেন।

ভদ্রলোকের কিছু বলার ছিলো না। তাঁর গম্ভীর, থম্‌থমে মুখটার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিলো যে আঘাতটা এ মুহূর্তে পেলেন্ তা অতি অপ্রত্যাশিত।

ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো করবী। মুখ তার বিবর্ণ, ভয়ে অপমানে, দামী শাড়ী পরণে। তখনো এক মুখ লাল্‌চে প্রলেপ মাখানো। কিউটেক্সের একটা ফোঁটা এখনো জল্‌জল্ করছে। আর ঠোঁটের রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে লিপষ্টিক ঘষা। দেহ সজ্জাটাও তার যেন একটা নিয়মিত অভ্যাস—অপর কয়েকটা অভ্যাসের মতোই। ঘটনাগুলো ক্ষণিকের জন্যেই যেন ওকে স্পর্শ করে যায়। তারপর আবার চলে এক নিয়মে। দেখে বোঝা যায় না, ঘটিত ব্যাপারটার কোন জট পড়েছে ওর মনে।

কেউ বলে—'ও কিছুটা বোকা। কেউ বলে, দেহ-সজ্জার জন্যে ও কিনা করতে পারে--দেখনা, প্রায়ই হঠাৎ কোথায় চলে যায়।'

কিন্তু ওই দেহ-সজ্জাও আজ কিছুটা এলোমেলো। ...খের প্রলেপ আর কিউটেক্সের ফোঁটা-টাও কেমন জলো-জলো হয়ে আছে ঘামে। হওয়া স্বাভাবিকই। মেয়ের রূপ আর প্রসাধনের দিকে চেয়ে তীব্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন মোহিতবাবু।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের জ্বলন্ত দৃষ্টি তখন পিতার উপর থেকে সরে গিয়ে কন্যার উপর নিবদ্ধ। মাথা তুলতে পারে না করবী। বড়ো একটা আঘাতের প্রত্যাশায় ও নত হয়ে থাকে। কিন্তু সব পক্ষই তখন নীরব। হঠাৎ মোহিতবাবু উঠে দাঁড়ান। প্রতিনমস্কার জানাতে বোধ হয় ভুলে গেলেন। বেরিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে—যেন সত্ত্বাবিহীন একটা নীরেট প্রাণী।

আর তখনো করবী দাঁড়িয়ে আছে পুতুলটির মতো। নীরব—নিথর। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্রোধ এবার মুষ্ট্যাঘাতে ভেঙ্গে পড়ে—'যাও। শিগ্‌গির চোখের সাম্‌নে থেকে চলে যাও। নার্সিং-কলেজের আর ছায়া মাড়িওনা। নিজের ব্যবসা চালাও গে।'

ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে করবী। রুম্‌এ এসে স্যুট্‌কেস্ আর হোল্ডল গুছোতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রুম্-মেটরা সব স্তব্ধ হয়ে দেখছিলো। আজ একজন সঙ্গী ওদের কমে যাচ্ছে, এ ভেবে মন খারাপ হয়নি ওদের। ওদের মনে বিরাট আঘাত হেনেছে করবীর অপরাধের গুরুত্ব। দেখলে মনে হয় রীতিমতো ভালো মানুষ। আজ ওই নির্দোষ মুখটা ঘৃণা ছাড়া আর কিছু কুড়োতে পারল না। মীরার বাক্যাঘাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে তা। 'দেখো আমাদের জিনিষপত্র যেন সরিয়ে নিও না। কড়া নজর রাখ্‌বি গীতা।'

অবশ্য গীতাকে আর কড়া নজর রাখতে শিখিয়ে দিতে হয়না। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো ওই মেয়েটির জন্যেই।

করবী নির্বাক হয়ে গেছে। অনেক দিক থেকে অনেক আঘাত আসে, আর তা'র নীরবতার মধ্যে চুর-মার হয়ে আবার শুদ্ধ হয়ে যায়। সাংঘাতিক অপরাধে অপরাধিনী করবী। ব'ড়ো ব'ড়ো দুটো নতুন কাঁচি ও সরিয়ে নিয়েছে। আর সঙ্গে একটা ব্লাড্-প্রেসার-মাপক যন্ত্র। ডাক্তার, বেয়ারা সবাই যখন চলে গিয়েছিলো রুম্ থেকে ঠিক সেই মুহূর্তেই। কখন থেকে জিনিসগুলো

আঠার মতো আটকে রেখেছিলো তার দৃষ্টি। তারপর একবার চিরদিনের অভ্যাস বসেই ঝক্‌ঝকে কাঁচিগুলোর ওপর ওর অবাধ্য হাতটা এসে পড়েছিলো।

মোহিতবাবু মুখ রাখবার জায়গা পান্‌নি।

তিনি যখন ষ্টেশনে পৌঁছে গেছেন করবী তখন সুটকেস, হোল্ডল নিয়ে রিক্‌'য় চেপেছে। পিতাও যেমন চান্ না মেয়ের সাক্ষাতে থাকতে, মেয়েও বাবার চোখের আড়ালে থাকতে পার্‌লে বাঁচে। বাড়ীতে এসেও এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল করবী।

স্বস্তি পাচ্ছিলেন না মোহিতবাবু। এক সময় ওকে ডেকেই বল্‌লেন—তোমার ভালো চেয়েছিলাম। তা' যখন কর্‌তে পার্‌লাম্ না—আর করতে দিলেনা তুমিই, বরঞ্চ আমার মুখে চুণ-কালি লেপে ঘৃণ্য করে তুল্‌লে মানুষের চোখে, তখন তোমার উপায় তুমিই দেখো।'

কোন সাড়া না পেয়ে আবার বললেন—'নইলে আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। দোষ যখন আমারই।'

সবটা দোষ আজ মোহিতবাবু নিজের গায়ে মেখে নিচ্ছেন। কারণ, তিনি বুঝতে পারছিলেন ছোট থাক্‌তেই যে অভ্যেসটা গড়ে উঠেছিলো করবীর, তা তাঁর সস্নেহ-প্রশ্রয়েই বেড়ে উঠেছে।

কতোদিন সার্ট বা কোটের পকেট থেকে অদৃশ্য হয়েছে এক টাকা, দু' টাকার নোট। কিন্তু তিনি ততো খেয়াল করেননি। পরে মাঝে মাঝে যখন দশ টাকার নোট পকেটের মায়া ছাড়াতে লাগ্‌লো, কুঞ্চিত হ'ল তাঁর ললাট। দু'জনার সংসারে মেয়ে ছাড়া আর কে-ই বা নেবে? ঝি-চাকরেরা তো আর এ'দিকটায় আসেই না। আর তা ছাড়া, সারাদিনই তো মেয়ে ঐ ঘরটায় খেলছে, পড়ছে। ওর চোখের সামনে কে-ই-বা নিয়ে যাবে? মেয়েকে জিজ্ঞেস করে অবশ্য কোন সুফল পাননি। তবে যেদিন দেখেন, মেয়ের গলায় ঝুলানো একটা ঝুটো মুক্তোর মালা বা হাতে একরাশ নতুন কাঁচের চুড়ি—মেয়ের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।

মনে মনে হেসেছেন মোহিতবাবু—'ওর চাহিদা মতো ঠিক সময়ে কিছু দিতে পারিনে। তবে ও করবে না কেন এমনটা।' স্ব-কৃত খাম-খেয়ালিপণার খেসারৎ হিসেবে পছন্দ মতো জিনিস কিনে নিও। আর টাকা হাতে না থাকলে আমায় বল্‌বে, কেমন?'

ভুল করেছিলেন মোহিতবাবু এই ভেবে যে, তাঁ'র দেওয়া জিনিস মেয়ের পছন্দ হবে না। আরো ভুল করেছিলেন—পকেট শূন্য করে কখনো রাখেন নি। নিজ পছন্দ মতো জিনিস কেনবার জন্যে মেয়ে হাতের কাছে বাবার পকেটে যা' পেয়েছে তাই নিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাবার সপ্রশ্ন দৃষ্টির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ও বুঝতে পারতো—বড়ো অন্যায় করেছে। দোষ স্বীকার করাটা তখন লজ্জাকর বলে মনে হ'ত। তাই ও এড়িয়ে যেতো বা মিথ্যে বলতো। সেই করবী আজ পর্যন্ত পুরনো অভ্যাসটা ছাড়তে পারল না। এত পেয়েও পরিবর্তন তা'র হলো না।

ঝিমিয়ে-পড়া সুরে মোহিতবাবু বলেছিলেন আবার—'যথাসাধ্য দেখে-শুনে তোমায় পাত্রস্থ করবো। ওখানে যদি তুমি নিজ সুখ-সুবিধাটুকু বুঝে নিতে না পার, মানিয়ে নিতে না পার সবার সঙ্গে, তবে আমার কিছু করণীয় নেই। এরপর থেকে তোমার ভাগ্য তোমার হাতে। ক্ষণিকের লোভে পড়ে তোমার সর্বনাশ করো না করবী। সবই তো তোমার জিনিসই হ'বে। আজ না হোক্, কাল।'

সত্যি! অল্পদিনের মধ্যেই মা-বাবা, ভাই-বোনের হাসি-কোলাহলে পূর্ণ এক সুন্দর সংসারে চলে এল করবী। সুন্দর স্বামী পেলো ও। রূপে গুণে, স্বভাবে-চরিত্রে কোনোদিকেই হেয় নয়।

ভাবতে চেষ্টা করে করবী। এরা সব তার নিজের লোক। এদের সুখ-দুঃখের নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যেমন, তেমনি এদের প্রতিটি জিনিসপত্রেও তা'র অধিকার। ঘর-বাড়ী থেকে আরম্ভ করে অনেক চোখ-জুড়োনো জিনিসও নিত্য ভোর হ'লে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ঐ তো টেবিলের ওপর ঝক্‌ঝকে রূপোর ফুলদানীগুলো। ঐ তো কাচের সরবৎ সেটগুলো, কিংবা ঐ যে জলজল করছে ওর স্বামীর হাতে হীরের আংটিটা—এ' সবই তো ওর বিয়ের সময়ের পাওয়া উপহার। 'সব। স-ব আমার' বারবার আবৃত্তি করে করবী।

.গুলো কেন ওর ঘরে নয়? আর সরবৎ-সেট্‌গুলোই বা কেন সবাই ব্যবহার করছে? কেউ মুখেও বল্‌ছে না 'এ জিনিস করবীর।' যে যখনই ব্যবহার করছে এমন অমর্যাদার সাথে এগুলো ধরছে যে মনে হচ্ছে কারো কেনা সম্পত্তি নয় এগুলা। সেদিন ছোট-ননদ যখন একটা কাচের গ্লাস নিজ অসতর্কতা-বশতঃ ভেঙ্গে ফেললো, মৃদু ধমকের স্বরে শাশুড়ী ডেকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তবে সবগুলো জিনিস কি ওর শাশুড়ীরই? ভাবটা তো এমন-ই করেন। অথচ এগুলো আমার বিয়েতে দেওয়া।" করবীও এবার একটা কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে। এ' তার ইচ্ছাকৃত। কিছু বললেন না এবার শাশুড়ী। করবী মনে মনে দগ্ধ হ'ল—আমি কি পর? ওঁর মেয়ের মতো আমাকেও সাবধান করে দিলে আমি কি রাগ করতাম?' 'বোধ হয় জিনিসগুলো আমার বলেই কিছু বলতে সাহস পান্‌নি।' শেষ পর্যন্ত এমন একটা ধারণা করে তৃপ্তি পেলো করবী।

সেদিন ওদের বাড়ীটা বেশ গমগমে হয়ে উঠেছিলো। তা'র সম্পূর্ণ অপরিচিতা কে একজন এসেছে। খাওয়া-দাওয়া হ'ল প্রচুর। চমৎকার গান গাইলে মেয়েটা। ওর স্বামীর প্রশংসা-ধন্য চোখ বারবারই ওই মেয়েটির চোখে মিলিত হচ্ছিলো। অবাঞ্ছিত দৃশ্যটা করবীর দৃষ্টি এড়ালো না। করবী স্বামীকে এ'ভাবে নিজের দৃষ্টির আড়ালে ফেলে যেতে ইতস্ততঃ করছিলো। তবুও শাশুড়ীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বৈকালিক খাবার প্রস্তুতির জন্যে যেতে হ'ল ওকে। 'এই ফাঁকে বোধ হয় কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে। কি করছে ও এখন?' বারবারই খুঁচিয়ে তুল্‌লো ওকে এ ধরণের চিন্তা, মেয়েটির তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া কামনা করলো। অবশ্য সন্ধ্যে হ'লেই স্নমিতা বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে হাসি-খুসী-মাখা হয়ে গেছে। 'সকলের মন জয় করে গেছে যেন ঐ মেয়েটি'। মনে মনে বলে করবী।

রাতে স্বামীর কাছে এসে এ কথাটাই শুনবে ও' আশা করেছিলো, কিন্তু হঠাৎই দৃষ্টি পড়লো স্বামীর হাতের ঐ আঙ্গুলে। চম্‌কে উঠে করবী—আংটিটা কই? হীরের আংটিটা?

উত্তরে চুপ করে শুয়ে থাকে দীপঙ্কর।

করবীর বুক দপ্‌দপ্‌ করে উঠে। তবে কি? তবে কি ঐ মেয়েটি? ঐ মেয়েটিকেই ওর স্বামী উপহার দিয়েছে? ওঃ! অক্লেশে একটা হীরের আংটি দিয়ে দিতে পারলো যা'কে, ও যে কি বস্তু স্বামীর চোখে—তা' বুঝে উঠতে ওর বাকী রইল না। নিশ্চয় দিয়ে দিয়েছে। নইলে এতো চুপ্‌চাপ্‌ কেন?

—'কি করেছো আংটিটা? বলো?'

—'আমার যা ইচ্ছে তাই করেছি। এখন কথা বলো না।'

—'তোমার ইচ্ছে? এটা কি তোমার জিনিস যে তোমার ইচ্ছে ফলাবে?'

—'অযথা প্রশ্ন করোনা করবী। এটা তোমার জিনিসও নয় যে তোমার ইচ্ছে ফলাবে।'

—'ওঃ। এগুলো আমার জিনিস নয়? আমার বিয়েতেই দিয়েছেন আমার বাবা। ছিঃ ছিঃ। লজ্জা করেনা পরের জিনিসকে নিজের বলে ভাব্‌তে?'

—কি বল্‌লে? তুমি আমার পর? অর্থাৎ আমি তোমার পর। তাই তো বোঝাতে চাইছো? ওঃ। বুঝেছি। একটা হীরের আংটির মূল্য তোমার কাছে বেশী হয়ে উঠেছে। তোমার মন যে এত নীচু তা জানতাম না।'

বিছানা থেকে ছিটকে ওঠে যায় দীপঙ্কর। একটা বাণাহত প্রাণী যেন। সার্টের পকেট থেকে একতাড়া নোট নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে ওর কোলের ওপর। 'নাও। এর দাম। এর দামের চেয়ে বেশীই বরং দিয়ে দিচ্ছি।'

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে করবী। এত তেজ? আর এতো দেমাক? কিসের এত দেমাক? একটা অদ্ভুত জেদ করবীকেও পেয়ে বসে। দানে প্রতিদান। সারা শরীর জ্বল্‌তে থাকে। চোখে ঘুম নেই। চোখের সাম্‌নে ঝুলছে ব্রাকেটে ঝুলানো সার্টটা এই মাত্র যা'র গহ্বর থেকে একতাড়া নোট এসে পড়্‌লো। এ' সার্টটা থেকেই ও অনেক টাকা পরম যত্নে আলমারীতে তুলে রেখেছে লোক-চক্ষুর অগোচর এক জায়গায়। বুকপকেটে দামী পার্কার পেন্‌টি আর বুকের ঐ সোনার চেন-ওয়ালা বোতামগুলো নিয়ে এখনো অসহায়ভাবে একটু একটু ঝুল্‌ছে সার্টটা।

মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ভাবতে ভাবতে। ওর কোন অধিকারই নেই এই ঘরের সব জিনিসপত্রে। তা'র স্বামী নিজ ইচ্ছা-বশে সবই করতে পারে। আর ও পারেনা। পারে না কি ও? করবীও যদি দামী কোন জিনিস ওর স্বামীর মত না নিয়ে দিয়ে দেয় কাউকে? ওর স্বামী ওর মত না নিয়ে দিয়ে দিলো আংটিটা! দিয়ে দিলো তার পরম কাম্য জনকে। আর ও দিবে না কেন? কেমনই বা লোকটি, চট করে আংটিটা দিয়ে দিলো? আবার বলতে মাত্র চট্ করে প্রতীকার করে ফেললো। ওর টাকা আছে। প্রতীকার করতে পারে। কিন্তু করবীর কি আছে?

যতোক্ষণ জেগে রইলো বাজে চিন্তা আচ্ছন্ন করে রইল মনটা। একবার ফিরে চায় স্বামীর পানে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্চে বোধ হয়। করবী একা জেগে আছে। এলোমোলো চিন্তা সব। হঠাৎ করে আবার চোখের সাম্‌নে ঝকঝক করতে থাকে ঝুলানো সার্টটার বুকে সোনার বোতামগুলো আর পার্কার-পেনটা।

পরদিন বেরোনোর সময় গায়ে সার্টটি চড়িয়ে বোতাম লাগাবে যখন, স্তম্ভিত, বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করে দীপঙ্কর সোনার বোতামগুলো নেই। সঙ্গে পার্কার পেন্‌টিও উধাও। এ আবার কি খেলা করবীর? করবীর কাছে এসে বলে—'এই। আবার কি মজা দেখ্‌ছো? দাও ওগুলো।

'—'কোন্‌গুলো?'

—'বাঃ। বোতাম, পেন্?'

—'তুমি কি ভেবেছো আমি চুরি করেছি?'

—'ছিঃ ছিঃ। ও কথা আমি ভাবতে যাবো কেন? তুমি মজা দেখছো এই বলছিলাম।'

—'মজা দেখছি?'—'হ্যাঁ, মজা দেখছো।' সন্দেহ বিশ্বাসের স্বর তার কথায়।

করবী কিছুক্ষণ কৌতুহলী চোখ দুটো মেলে ধরলো। কি তাকিয়ে দেখলো দীপঙ্করের চোখে মুখে। হঠাৎই ত'র মনে হয়, 'সব দীপঙ্করের অভিনয়। ওর পরিচয় কালই পেয়ে গেছে করবী।

—'দাও। আমার লেট করিয়ে দিচ্ছ যে।'

—'আমি নিইনি।' চির অভ্যস্ত স্বরে বলে ওঠে করবী।

—'নাওনি? কী আশ্চর্য্য।'

—'না।' মিইয়ে আসে করবীর কণ্ঠস্বর।

অফিসে নিজস্ব রুমে বসে ভেবে ভেবে কোন কিনারা করতে পারছিলো না দীপঙ্কর। ভাব্‌লো বাড়ী গিয়ে না হয় আবার আলমারী স্যুটকেস খুঁজে দেখা যাবে। ও বোধ হয় মনের ভুলে এ'গুলোও আলমারীতে রেখে দিয়েছিলো। অবশ্য করবীর পক্ষেও রেখে দেওয়া খুবই সম্ভবপর ছিলো। আরো তো এমন করেছে ও। টাকা, পয়সাও তো অনেকবার লুকিয়ে রেখে রেখে ও মজা দেখেছে। শেষ পর্যন্ত হয়রাণ হয়ে আল্‌মারী, স্যুট্‌কেস্ নাড়া দিলেই সব পেয়ে গেছে। করবীকে ঐ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলেই ও বল্‌তো—'এতো অসতর্ক কেন তুমি? সাবধান যাতে থাকো তাই এই করেছি।' কিন্তু আজ ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। প্রথম কথাগুলোতে করবীর তীব্র ঝাঁজ মেশানো ছিলো! ওকে আর ঘাঁটাতে চায়না দীপঙ্কর। আবার না হয় খুঁজেই দেখা যাবে। তবে আপাততঃ একটা সস্তা দামের পেন্‌ই কিনে নেওয়া যাক।

আগেকার চিন্তা ভাব্‌না মনের গ্লানিমা সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঝর্‌ঝরে হয়ে ও বাড়ীর পথে রওনা হ'ল। বাড়ীর গেটে পৌছে বোন্‌টাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্ফূর্তির স্বরে হেসে হেসে কথা বল্‌তে থাকে—কিরে? বন্ধুরা বুঝি এখনো কেউ আসেনি? এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?'

—'বাঃ। বৌদি যে এইমাত্র চলে গেলেন। তাই—'

'চলে গেলেন? কোথায়?'

—বাড়ী থেকে নাকি চিঠি এসেছে, তাঐ মশায়ের শরীর ভালো নয়। তাই তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন বৌদি।'—'ওঃ।—'জানো দাদা। বৌদি যাওয়ার সময় আমাকে এই পেন্‌টা দিয়ে গেছেন।' জামার কলারে আঁটা পেন্‌টা বের করলে ও।

—আরো জানো। বৌদি না শুভোকে একটা সোনার বোতামের চেন্ প্রেজেন্ট করেছেন।'

শক্ত হয়ে উঠে দীপঙ্করের চোয়ালের হাড়।

মহাশ্বেতা

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

উন্মীলন

*

ফটো : রথীন চ

—'বৌদি খুব ভালো। না দাদা? আমরা কিন্তু বৌদির সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। মা'ও বলেছিলেন, কিন্তু বৌদি কাউকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না।'

কিছু না বুঝতে পেরে দীপঙ্কর ঘরে এলো। দেখে টেবিলে অনাদৃতভাবে চাবিটা পড়ে আছে। কেউ কি ঘরে আসেনি এর মধ্যে? চাবিটাও কেউ গুছিয়ে রাখতে পারলো না? আবার ভাব্‌লো। কেউ তো এদিকটায় বড় একটা আসেনা। তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে এক হেঁচকা টানে আলমারিটা খুলে ফেলে। সাম্‌নেই এক তাড়া নোট্। যেমন বাঁধা ছিলো ঠিক তেমনটিই আছে। কি নিয়ে তবে করবী গেল। পথ-খরচা তো কিছু নিতে পারতো? ক্ষিপ্র হাতে ও টাকাগুলো পকেটে ফেলে একটা দামী বাক্স বের করে হীরের আংটিটা গলিয়ে নিলো আঙ্গুলে। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবে—'কি দরকার ছিলো কথা বাড়ানোর? সোজা, সরল উত্তরটা দিয়ে দিলেই হ'ত তখন।'

কিন্তু দীপঙ্কর কোনোদিনও বুঝতে পারবেনা স্মিতার ব্যাপার নিয়ে ওদের দু'জনার মধ্যেই যে মন-কষাকষিটা হয়ে গেছে, তা'র ফলে কতদূর রূপান্তরিত হয়ে গেল করবী।

স্বামীজি-স্মরণে

বিমলকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঁদিছে ক্রন্দসী ধরা দীর্ণ-হাহাকারে;
ক্ষুধিতের, পীড়িতের অশান্ত চীৎকারে,—
পূর্ণ আজি' দিক্‌বিদিক্। দুঃশাসন
টানে বস্ত্র ধরি' অহর্নিশ। ক্রন্দন,—
সে অরণ্যে রোদন মাত্র। কপটতা
আজি' কুটিল শার্দূল সম মানবতা
করিছে সংহার। তীব্র লোভ দানবের
অক্টোপাশ সম,—অহরহ মানবের
রক্ত করে পান। দুর্নীতির অন্ধকার
রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজি'। সবলের অত্যাচার,—
ভয়াল-লোলুপ-ক্ষুধা—তোলে হাহাকার
অসহায় পীড়িতের। অধম-বিলাস
রচিয়াছে শয্যাজাল। হেরি রুদ্ধশ্বাস
আজিকে বিচার।
কোথায় উদ্গাতা-ঋষি!—
যে শোনাবে বাণী কম্বুনাদে; দিবে নাশি'
সর্ব আবিলতা শোনায়ে অভয়-বাণী;
জাগাবে "মাভৈঃ" মন্ত্রে;
পুঞ্জীভূত-গ্লানি—
হ'বে অবসান বক্ষ হ'তে ধরণীর।
কোথায় বিবেক তুমি,—ভারত-বাণীর
মূর্তি!—"জীব-প্রেম" মহামন্ত্র শোনাও
আবার; হে সাগ্নিক!—আবার জ্বালাও
কর্ম-যজ্ঞ—হোমানল!
দেশ দেশান্তরে—
জন্মশতবর্ষ তব আজি' পালিবারে
করিয়াছে আয়োজন। এ শুভ-লগন—
যাবে কি বৃথাই শুধু,—না করি' অর্পণ
নবীন-শাশ্বত কিছু?—খধূপের আলো
ধাঁধিবে নয়ন শুধু,—না নাশিয়া কালো
অন্ধকার?—ভাবীকাল করুক বিচার!
তোমা স্মরি' আমি শুধু করি নমস্কার।

মৌর্যযুগে ভারতের বৈদেশিক কর্মতৎপরতা

কৃষ্ণা মিত্র

আধুনিক পৃথিবীতে সরকারের কর্মদক্ষতা যে অনেকাংশেই বৈদেশিক কর্মতৎপরতার উপর নির্ভরশীল তা সর্বজনবিদিত। আর এই বৈদেশিক নীতির সাফল্যের উপরই দেশের সুনাম অনেকটা নির্ভরশীল। আধুনিক ভারতের বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বশান্তির জন্যে সর্বৈব চেষ্টা হচ্ছে ও হ'য়েছে। বিশ্বের যে কোন অঞ্চলেই শান্তি ব্যাহত হ'য়েছে সেখানেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আক্রমণকারীকে বলিষ্ঠস্বরে নিন্দা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বারবার এই কথা ব'লেছেন যে ভারতের নীতি হ'ল শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান এবং এই নীতি ভারতের শাশ্বত চিরন্তন নীতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পুরাকালের বৈদেশিক কর্মতৎপরতার বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতের সব যুগের বৈদেশিক কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে আলোচনা এক সুদীর্ঘ বিষয়। তাই এই প্রবন্ধে শুধু মাত্র মৌর্যযুগের বৈদেশিক কর্মপদ্ধতির সামান্য পরিচয় দেওয়া হ'ল। মৌর্যযুগই প্রাচীন ভারতের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা সংহতির যুগ। খৃষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৮৪ অব্দ পর্যন্তই মৌর্যশাসনের যুগ। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ত উত্তর ভারত অধিকার করে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেছিলেন। গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত ক'রে তাঁর রাজ্যসীমা আফ্‌গানিস্তান ও বেলুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়েছিল। তাঁর পৌত্র অশোকের সময়ে এই সীমা আরও বহুদুর বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে, যার পরিধি ছিল কাবুল নদী থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত আর শ্রীনগর থেকে শ্রীরঙ্গপত্তন পর্যন্ত। বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা সংস্থা, পৌরসভা, আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সমস্ত বিষয়েই এক অভূতপূর্ব প্রগতি এই যুগে সূচিত হ'য়েছিল। সাধারণতঃ দুটি বিষয়ের উৎস থেকে এই যুগের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। প্রথমটি হ'ল গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ, আর দ্বিতীয়টি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'। এ'ছাড়া অশোকের শিলালিপিগুলো থেকেও সে সময়ের অনেক মূল্যবান্ খবর সংগ্রহ করা যায়।

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস ছিলেন গ্রীক-রাজদূত। মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্রে তিনি আনুমানিক ৩০৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বসবাস ক'রেছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত বিবরণী 'ইণ্ডিকা'তে তিনি সে যুগের ভৌগোলিক বিবরণ, জনসাধারণ ও তাদের আচার ব্যবহার, বিভিন্ন শাসন সংস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' পুস্তকটি সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রথম অর্থনীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত রচনা। বহুযুগ আগের রচনা হ'লেও এর মধ্যে যে অসাধারণ জ্ঞান ও ধীশক্তির পরিচয় আছে তা অতুলনীয়। তাঁকে প্রাচ্যের 'ম্যাকিয়াভেলি' নামে অভিহিত করা হ'য়ে থাকে।

কৌটিল্যের অনুশাসনে রাজাই রাজ্যের সর্বেসর্বা এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাজা মন্ত্রী নিয়োগ ক'রতেন এবং শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ ক'রতেন। মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্য দু'ধরণের মন্ত্রীর উল্লেখ ক'রেছেন, এক মন্ত্রী. আর এক অমাত্য। এ'ছাড়া মন্ত্রীপরিষদ সমষ্টিগতভাবেও রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ ক'রতেন।

আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা ছাড়াও বৈদেশিক দপ্তরের কর্মতৎপরতার জন্যে বিশেষ সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যের রাজনীতিতে যুদ্ধ, শান্তি ও নিরপেক্ষনীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সাম (Negation) দান (Persuation) ও ভেদ (Conciliation)

প্রভৃতি নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের ভাষায় বৈদেশিক নীতির আর এক নাম 'ন্যায়' এবং একথাও তিনি ব'লেছেন যে, যে রাজা সুষ্ঠু পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা ক'রতে পারেন তিনি পৃথিবীজয়ী হ'তে পারেন। রাজা প্রয়োজনবোধে নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন ক'রতে পারেন যদি তিনি দেখেন যে কোন অংশে যোগদান ক'রে তাঁর রাজ্যের কোন বিশেষ লাভ হবার সম্ভাবনা নেই অথবা তাঁর শত্রুবিলোপের সহায়তা হবে না। কৌটিল্য ব'লেছিলেন যে রাজা তাঁর পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয় ক'রে নিজের শক্তিবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবেন। রাজা অশোকের সময়ে এই নীতির কিছুটা পরিবর্তন হ'য়েছিল তাঁর ধর্ম জয়ের ভিত্তিতে।

বৈদেশিক দপ্তরের কর্মীদের কৌটিল্য সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ ক'রেছেন যথা—দূত, নিস্রস্তার্থ (Nisrantartha), পরিমিতার্থ (Parimitartha) ও শাসনহর (Sasanhara)। প্রথম পদটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পদ এবং একমাত্র বিশেষ দায়িত্ব ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই এই পদে নিয়োগ করা যেতে পারে এবং তাঁদের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যতুল্যই বিচার করা হ'ত। দ্বিতীয়পদের অধিকারী সাধারণ মন্ত্রী সমতুল্যই ছিলেন। তৃতীয় পদাধিকারী কর্মচারীদের বিশেষ ধরণের বৈদেশিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হ'ত। চতুর্থ কর্মচারীদের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন সংবাদাদি বিভিন্ন সরকারীমহলে আদানপ্রদান করা। দূতের প্রধান কাজ ছিল পররাষ্ট্রের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান, চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি। তবে তখন স্থায়ী দূত নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। দূত পররাজ্যের জনসাধারণের অবস্থা, রাজার জনপ্রিয়তা, সৈন্য সংস্থা প্রভৃতির বিস্তারিত খবর সংগ্রহ ক'রতেন। এক কথায় তখন দূতকে গুপ্তচরও বলা যেতে পারত' অনেক সময়েই। কৌটিল্য সংবাদসংগ্রহের জন্যে দূতকে বিভিন্ন ছদ্মবেশধারণের পরামর্শও দিয়েছেন। এ' ছাড়া গুপ্তচর বিভাগের ভাগ ছিল দু'রকম, সমস্থা বা স্থায়ী এবং সঞ্চারী বা ভ্রাম্যমাণ।

বৈদেশিক নীতিতে সম্মানীয় পদ্ধতিই সাধারণতঃ অনুসরণ করা হ'ত। একটা সাধারণ বিশ্বাস ছিল এই যে, যে রাজা দূতকে বধ করেন তিনি সপারিষদ নরক বাস করেন। বৈদেশিক কর্মচারীরা রাজ্যের মধ্যেও বহু রকম সুবিধে ভোগ ক'রতেন এবং শত্রুদের হাতে বিশেষ লাঞ্ছনা পেতে হ'ত না। মেগাস্থিনিস ব'লেছেন যে দেশের জনসাধারণ শান্তিপূর্ণভাবেই জীবনযাপন করতেন এবং সৈন্যবাহিনী কোন অত্যাচার বা পীড়ন ক'রত না। এক কথায় বলা যেতে পারে যে মৌর্যযুগে যে সুসংবদ্ধ বৈদেশিক কর্মপদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছিল তা' ভারতের ইতিহাসে প্রথম এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাসেও আগে অনুরূপ দেখা যায় নি'।

চোখের দুখ

শ্রীরাম্য

বধূ বিরহিত আঁখি মোর,
পারেনা সম্বরিতে লোর ;
তার প্রিয় স্বামী, হয়ে গেছে চুরি
পালায়ে গিয়েছে চোর।
যেই—নররূপে কাছে পায়,
শুধু তার পিছে পিছে ধায় ;

"এস এস প্রিয়া", বলে ডাক দিয়া,
সাড়া কেবা দিবে তায় ?
কিসে তারে দিব সান্ত্বনা ?
সে যে হয়ে থাকে আনমনা,
অশ্রু কণার, গাঁথে শুধু হার
করি প্রিয়া কল্পনা।

্যক্ষ শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। ৃাদের আদর যত্ন কোনদিন ভুলিবার নহে।

বার্ণপুরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

বার্ণপুরের "ভারতী-ভবন" একটি সুবিখ্যাত সাংস্কৃতিক স্থা। শিল্পনগরী বার্ণপুরের বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইহার তি সুন্দর হলে হয়। আমাদের "ভারত-বিবেকম্" স্কৃত নাটক ইহার উদ্যোগে প্রাচ্যবাণী কর্ত্তৃক বিশেষ ফল্যের সহিত অভিনীত হয় বিগত ২৪শে ডিসেম্বর ৬৩। "ভারতী-ভবনের" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীঅনাদি-থ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহযোগিগণ আমাদের হারবিহার এবং অভিনয়াদির অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া মাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। হাদের এবং বার্ণপুরের উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রী এ কে ত্র ও তাঁহার নামে বিদেশিনী, অথচ প্রাণে ভারতীয়া ীর সস্নেহ আতিথ্যের তুলনা নাই। এই আভিজাত্যপূর্ণ ী, শিল্পনগরীর বিদেশীভাবাপন্ন অধিবাসীগণও যে মনে ণে কিরূপ সংস্কৃত জননীর সেবক, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া শেষ ধন্য হইলাম।

পুরুলিয়ায় সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পরের দিন সকালেই বার্ণপুর হইতেই পুরুলিয়ায় চলিয়া ই পুরুলিয়াস্থ স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব িতির সাদর আহ্বানে। তাঁহারা বহু সমাদরে পুরুলিয়া তে আমাদের জন্য একটি "বাস" প্রেরণ করেন! দুই রের অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা পরমানন্দে তিন ার মধ্যে পুরুলিয়াস্থ রামকৃষ্ণমিশনের "রামকৃষ্ণ দ্যাপীঠে" উপস্থিত হইলাম। কি অপূর্ব সুন্দর, শান্ত গ্ধ স্থান এইটী! অতি বিস্তৃত, উদার উন্মুক্ত ভূমিভাগের ধ্য মধ্যে বিদ্যালয়, আবাস ভবন, অতিথি-ভবন প্রভৃতির ম্য হর্ম। অতিথি ভবনের ব্যবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট। আশ্রমের ধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীমৎ স্বামী ভীরানন্দ এবং অন্যান্য স্বামীজীর আদরাপ্যায়ন চির-ণীয়। ইহাদের প্রদর্শনীটীও অতি চমৎকার হয়।

সুবিস্তৃত সভাস্থলে দ্বিসহস্রাধিক জনসমাগম হয়। থমে মহিলা সভার উদ্বোধন করেন শ্রদ্ধেয়া ডাঃ রমা ধুরী। তাঁহার স্বভাব সুলভ সুললিত ভাষণে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। পরিশেষে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ।

তাহার পরে, সন্ধ্যাকালে (২৫শে নভেম্বর ১৯৬৩) ঐ স্থলেই আমাদের সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" সুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হয়। আশ্রমটী সহর হইতে বহু দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, অতি শীতের মধ্যেও বহু ভক্তজন শেষ পর্যন্ত থাকিয়া পরমানন্দভরে অভিনয়ের রস উপভোগ করেন। সত্যই সে এক অদ্ভুত, প্রাণোদ্দীপক দৃশ্য। পরের দিন প্রত্যুষে আমরা বাস্-যোগে কলিকাতাভিমুখে রওয়ানা হই। পথের দৃশ্য অতি সুন্দর।

পাটনায় সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পাটনার "রাজেন্দ্র-স্মৃতি সমিতি" প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রপ্রসাদের পূত জীবনী অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমলকে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে সাদর আমন্ত্রণ জানান। ইহাতে সকলের মধ্যেই বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার হয়, যেহেতু এরূপ অত্যাধুনিক বিষয়ে সংস্কৃত নাটক রচনা ও অভিনয় রসোত্তীর্ণভাবে করা সম্ভবপর কিনা, তাহাই প্রশ্ন। কিন্তু ডক্টর যতীন্দ্রবিমল এরূপ কার্যে সিদ্ধহস্ত, এবং অত্যাধুনিক বিষয়ে তাঁহার রচিত সংস্কৃত-নাটক "ভারত-জনকম্", "দেশবন্ধু-দেশপ্রিয়ম্" ও "সুভাষ-সুভাষম্" বহুবার বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে। সেজন্য তিনি অত্যল্প সময়ের মধ্যে "ভারত-রাজেন্দ্রম্" নামক সংস্কৃত নাটক রচনা ও অভিনয়ের ব্যবস্থাদি করিয়া ফেলিলেন। অভিনয় হইল স্বর্গত রাজেন্দ্রপ্রসাদের জন্ম-তিথি ৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৩, পাটনার সুবিখ্যাত রবীন্দ্র-ভারতী হলে। পৌরোহিত্য করেন রাজ্যপাল শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার। স্বর্গত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ ও শ্রীধনঞ্জয়প্রসাদ প্রমুখ বহু গণ্যমান্য, জ্ঞানীগুণীজনের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে আমাদের অভিনয় সেদিন বিশেষ জমিয়া উঠে।

নাটকাভিনয়ের সকলপ্রকার সুবন্দোবস্ত করেন রাজেন্দ্র স্মৃতি সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সহায় এবং বিহার নাট্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীজ্ঞান সহায়। তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য। বিহার বিশ্ববিদ্যা-

৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে "প্রাচ্য-বাণী"র সংস্কৃত-পাঠন নাট্যসঙ্ঘের সদস্যমণ্ডলীকে পাটনাস্থ রবীন্দ্র-ভবনে শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল এম, অনন্ত-শয়নম্ আয়েঙ্গার মহোদয়ের সঙ্গে ডক্টর যতীন্দ্র বিমলের "ভারত-বিবেকম্" অভিনয়ের পরে স্বামীজির মূর্তির ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ডান পার্শ্বে পাটনাস্থ রামকৃষ্ণাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বীত-শোকানন্দ উপবিষ্ট আছেন।

দণ্ডায়মান (রাজ্যপালের বামপার্শ্ব থেকে) অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তী ; শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মিত্র ; অধ্যক্ষ ডাঃ রমা চৌধুরী ; শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীঅসীমসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ; (বিবেকানন্দের ভূমিকায়) শ্রীঅনিল কান্ত দত্ত ; গায়ক শ্রীপূর্ণেন্দু রায় ; গায়ক শ্রীগৌরী কেদার ভট্টাচার্য ; উপবিষ্ট : (রাজ্যপালের বাম পার্শ্ব থেকে) শ্রীমৃণাল-কান্তি দত্ত, বালকসহ স্থানীয় অভিনেতৃদ্বয় ; শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীমতী উর্মি চট্টোপাধ্যায় ; অধ্যক্ষ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীজ্ঞান সাহা (বিহার সংস্কৃত নাট্য-পরিষদের সম্পাদক)

লয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী অদিতি দে নানাভাবে আমাদের সাহায্যদানে সাগ্রহে অগ্রসর হন।

৬ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৩ ঐ একই "হলে" পাটনা স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমিতির উদ্যোগে আমাদের সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" অভিনীত হয়। ইহার পুরোভাগে ছিলেন পাটনা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রীবীতশোকানন্দ। তাঁহার স্নেহ ও উৎসাহ সত্যই অতুলনীয়। প্রারম্ভে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী যথাক্রমে অতি সুন্দর সংস্কৃত এবং ইংরেজী ও বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দিয়া সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করিলেন। ঐদিন সভায় পৌরোহিত্য করেন রাজ্যপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিদ্বদাগ্রগণ্য শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার এবং তিনি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সানুগ্রহে বসিয়া থাকিয়া সমগ্র অভিনয়টী পরম তৃপ্তির সহিত দর্শন করেন।

পরমশ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গারে মহাশয়ের অতি সহজ সরল, সুমধুর ব্যবহারের কথা কোনও দিন ভুলিবার নহে। তিনি তাই একজন মাটির মানুষ—যা' প্রকৃত পণ্ডিতের হওয়া উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ সর্বজনবিদিত; এবং সে জন্য সমগ্র দেশের পণ্ডিত সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। অভিনয় দর্শনে তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার আশীর্বাদস্বরূপ যে দুইশত টাকা প্রাচ্যবাণীকে দান করিয়াছেন, তাহা আমাদের চিরকালের পাথেয় হইয়া রহিল॥

সেইদিন পাটনা সহরের বহু জ্ঞানী গুণী ভক্ত সাধুজন সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই উভয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন। সভান্তে শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল মহাশয়, ডাঃ বিমান-বিহারী মজুমদার প্রমুখ অনেকে ডক্টর চৌধুরীদম্পতীদ্বয় এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণকারিগণকে হার্দিক অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন।

পার্লামেণ্ট্ অফ্ রিলিজিয়নে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের পরিসমাপ্তি-

রূপে পার্কসার্কাসে নিখিল বিশ্ব বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে বিশ্বধর্ম—মহাসম্মেলনে "ভারত-বিবেকম্" নাটকের অভিনয় হয় ২রা জানুয়ারী, ১৯৬৪। সুবিশাল সভামণ্ডপে পাঁচ হাজারেরও অধিক দর্শক আড়াই ঘণ্টাকাল নীরবে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া এই সংস্কৃত অভিনয়ের রস উপভোগ করেন। তাহাতে আমরা বড়ই অনুপ্রাণিত হইলাম। এই সভায় বহু বিদেশী জ্ঞানিগুণী, ভক্তজন উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় নাটকটির উৎকর্ষ এবং অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য সাধুবাদ প্রদান ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন।

হুগলীতে সংস্কৃত-নাট্যাভিনয়।

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪, স্বামী বিবেকানন্দ শততম জন্ম-বার্ষিক উৎসবের তত্ত্বাবধানে আমাদের "ভারত-বিবেকম্" সংস্কৃত নাটক অতি সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু, অধ্যক্ষা শান্তিসুধা ঘোষ প্রভৃতির সস্নেহ ও সাগ্রহ সহযোগিতায় নাটকটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

ডক্টর রমা চৌধুরীর স্বামীজী সম্বন্ধীয় ভাষণ চিত্তাকর্ষক ও সকলের বিশেষ আনন্দের কারণ হয়।

উপসংহার

অতি আনন্দের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্ধারিত হউক বা না হউক, সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও প্রচার-প্রকাশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হউক বা না হউক, সংস্কৃত কোনদিনই ভারতবাসীর চিত্তকেন্দ্র থেকে অপসারিত হয় নাই, হইতে পারেনা। উপরন্তু সংস্কৃতকেও যে সর্বজন-বোধ্যই কেবল নয়, সর্বজনোপভোগ্যও করা যায়, তাহাও নিঃসন্দেহ। এই উভয় বিষয়েরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা বারংবার আমাদের সমগ্র দেশব্যাপী ভ্রমণ হইতেই পাইতেছি। একটি সংস্কৃত সংস্থা যে বৎসরের পর বৎসর এইভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সাদর আমন্ত্রণ লাভ করিয়া গড়ে ২০।২৫ টি করিয়া সংস্কৃত অভিনয় প্রতি বৎসর করিতেছে সহস্র সহস্র দর্শককে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দেয়, তাহাতে সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়॥

এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ স্বামী বীতশোকানন্দজীর পত্রখানা একান্ত উৎসাহপ্রদ। তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া এবং সকলের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিতেছি।

৭-১২-১৯৬৩

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী রামকৃষ্ণ মিশন,
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ পাটনা।

মান্যবরেষু,

আশা করি ভগবৎকৃপায় মঙ্গলমত কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। আমাদের বহুবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য আমরা আপনাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

"ভারত-বিবেকম্" অভিনয় সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হইয়াছিল। অভিনয় দর্শনে বিহারের রাজ্যপাল ছাড়াও পাটনা সহরের সর্বশ্রেণীর বিশিষ্ট নাগরিকেরা উপস্থিত ছিলেন। পাটনা হাই-কোর্টের বিচারপতি, বিশিষ্ট আইনজীবী, পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা প্রভৃতি যাঁহারা অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে 'ভারত-বিবেকম্' অভিনয় পাটনার সংস্কৃতি জীবনে একটি বিশিষ্ট ঘটনা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর আশীর্বাদ আপনাদের উপর নিত্য বর্ষিত হউক এবং আপনারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারত সংস্কৃতির গৌরব বর্ধন করুন।

আপনি ও শ্রীমতী চৌধুরী আমার আন্তরিক প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করিবেন এবং নাট্যপরিষদের অপর সভ্য ও সভ্যাদের দিবেন। ইতি

আপনাদের

বীতশোকানন্দ।
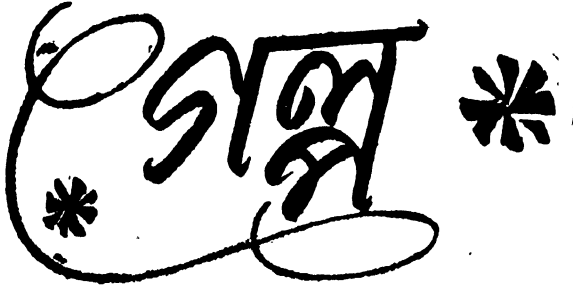
রূপান্তর

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

আমি এক রূপোপজীবিনী।

বলা প্রয়োজন যে ঐ বৃত্তি আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়। একরূপ বল প্রয়োগেই আমার মা-ঠাকুমা আমার স্কন্ধে তুলে দিয়ে গেছে এ পেশা। বিরক্তিবোধ করেছি প্রথম, এমনকি রাগ করেও অনেকদিন পালিয়ে বেড়িয়েছি।

কিন্তু শেষটায় হার মান্‌তে হোলো নিজের কাছে নিজেকে। একদিন দু'দিন করে অভ্যাসে দাঁড়ালো।

অভ্যাসই সব। তারপর আর কাউকে বল্‌তে হোতো না। মেয়েরা যেমন পূজোর উপকরণ ধীরে ধীরে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠাকুরের সাম্‌নে তুলে দেয়, ঠিক তেমনি করেই নিজের সামান্য রূপকে নানা অংগরাগের অলংকারে অসামান্য করে তুলে সাঁঝের বেলা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তুম দরজার একপাশে।

ঐ মায়ামৃগের ফাঁদে পা' বাড়াতে দেখেছি অনেককে। যেমন এসেছে—তাদের মনোরঞ্জনও করেছি সাধ্যমত। তারাও উপযুক্ত নগদমূল্য দিয়ে এ'তুচ্ছ দেহপশারিণীর জীবনকে সার্থক ও ধন্য করেছে।

ক্ষণবসন্তের মত ভঙ্গুর যৌবনের কেটে গেল কয়েক বছর।

কোন একদিন এক 'নাগরের' সঙ্গে এক কারখানা দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। দেখ্‌লাম, জিনিষগুলো আপনা-আপনি তৈরী হ'য়ে বেরিয়ে আসছে। অদ্ভুত লাগ্‌লো। এই অদ্ভুতভাব যে কখন আমার মনের কোণেই বাসা বেঁধেছিল, তা' কি করে জানবো?

অভ্যাসের শেষ পরিণতিই কি যান্ত্রিকতা? আমার মনোভাব হ'য়ে দাঁড়ালো ঠিক এ রকম। হয়তো দেহের-ও।

নিজেই অনেক সময় বুঝতে পারতুম না, সন্ধ্যাটি লাগার মুখে কখন নিজেকে পণ্য-রূপে সাজিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গেছি। বুঝ্‌তেও পার্‌তুম না কখন খরিদ্দারকে চোখের ইসারায় ডেকে নিয়ে নিজের এই রঙ্‌মাখানো রূপকে তাদের সম্মোহিত দৃষ্টির সাম্‌নে তুলে ধরে কৃত্রিম অভিনয়ের দ্বারা মনোরঞ্জন করে তুলেছি! বুঝ্‌তে যখন পেরেছি, তখন গেছি আশ্চর্য হ'য়ে। শুধু ভেবেছি, ঐরূপ কি করে সম্ভব হোলো!

একদিন······

বাঁধা সময়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আশে-পাশে আমারই মত আরো কত হতভাগিনী। মাঝে মাঝে অকারণ তাদের বিশ্রী প্রগল্‌ভ হাসি। এমনি হাসি তাদের যেন ব্যাধি।

ফুল-ওয়ালা মালা সাজিয়ে হেঁকে গেল। অনেকেই কিন্‌লো সে মালা,—আমিও নিলাম একগাছি।

কিছু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, এক তরুণ সুপুরুষ দাঁড়িয়ে আমার সাম্‌নে। এক দৃষ্টিতেই তাকে চেনা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। চমৎকার উজ্জ্বল তার গায়ের রঙ্। সৌম্য বলিষ্ট চেহারা। সুকুমার মুখ। অভিজাত বেশবাস। ক্ষণিকের জন্যে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম হয়তো। বিস্ময় ভাঙ্গলে মনে হোলো, ভদ্রলোক বোধহয় ভুল করে এসেছেন। কিন্তু আমাকেই যখন তিনি ইংগিত কর্‌লেন, তখন-ও মনে হোলো, এ হয়তো আমারই দৃষ্টিভ্রম। কিন্তু দৃষ্টিভ্রম যে নয়, একটু পরেই বুঝ্‌তে পারলুম।

আবার তিনি ঈসারা কর্‌লেন।

এবার আমার বুক কাঁপতে লাগলো। সেই ভাবেই পেছন ফিরে ঘরের দিকে চল্‌তে লাগলুম। তিনি আমার

ঠিক পেছনেই আস্‌তে লাগলেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস আমার চুল স্পর্শ কর্‌তে লাগ্‌লো।

ঘরে এলুম। তিনিও এলেন।

তাঁর আগমনের ফলে আমার ঘরের দীনতা চারিদিক থেকে প্রকট হয়ে উঠে আমাকেই চেপে ধরলো যেন। এতদিনের এত নোঙ্‌রামি আমার চোখেই পড়েনি। বিছানা মলিন, তাকিয়া বালিসের ওয়াড়গুলো তালি দেয়া, ঘরের চারপাশের দেয়ালে লালরঙের দাগ, পিক ফেলার চিহ্ন, গোটা দুই সস্তাদরের অর্দ্ধ-উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তির ছবি দেয়ালের গায়। দেখে নিজেই শিউরে উঠলুম।

ভদ্রলোক কিন্তু এসব ফিরেও তাকালেন না। বসলেন না কোথাও। সোজা আমার মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন। যা কোনদিন হয়নি, তাই হোলো। আমি অমনি মুখ নীচু কর্‌লুম। বুক তেমনি ঢিবঢিব কর্‌ছে। সহসা মনে হোলো, এমনি রঙ্‌ পাউডারে এনামেল করা মুখ আর যার কাছেই হোক—এঁর কাছে তোলা যায় না। আমার ভেতরের দৈন্য আমি ছাড়া আর কে জান্‌বে?

এবার ওঁর কথা কানে এলো, গলা যেন ভারী-ভারী।

বল্‌লেন: মুখ তোল, আমি শুধু দেখেই চলে যাব।

তুললুম মুখ। কিন্তু অনেক দেরীতে। ঠোঁট দুটো যেন অকারণ কাঁপতে লাগ্‌লো। হাতের তালুদুটো ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা। কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

তিনি দেখ্‌লেন। অপলক চোখেই দেখতে লাগলেন। সে দৃষ্টিতে কি ছিল, মনে কর্‌তে পারিনে, আর ঠিক বোঝাও গেল না।

অনেকক্ষণ পর এক দীর্ঘশ্বাস পড়লো। আমি মুখ নীচু করে নিলাম। তারপর পকেট হাতড়ে কি বের কর্‌লেন। যা' বের কর্‌লেন, তার খস্‌খসে আওয়াজ আমার পরিচিত।

এবার শান্ত স্নিগ্ধ গলায় বল্‌লেন: নাও ধরো। এবার আমি চলে যাব।

হাত দুটো অনড় হয়ে রইলো আমার। কিছু একটা বল্‌তে চাইলেম, কথা খস্‌লো না।

এত আনন্দ, এত বিস্ময় বোধহয় আমার এই বিশ-বছরের জীবনে হয়নি।

হাত দুটো এক করে তুললুম এবার। যেন ভিক্ষা চাইছি।

যা পকেট থেকে তুলেছিলেন, তার সবগুলো আমার দু'হাতের মধ্যে ঢেলে দিলেন।

লক্ষ্য কর্‌লুম, তিনি আমার স্পর্শ দোষ থেকে দূরে থাক্‌তে চাইছেন।

তারপর তিনি যা' বলেছেন তাই কর্‌লেন। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তবে যাবার আগে এক টুকরা কাগজ আমার বিছানার ধারে রেখে শুধু বলে গেলেন, আমার ঠিকানা। যদি প্রয়োজন বোধ কর, সংবাদ জানাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাবার শব্দ কানে এলো। তখনো ঘরের মধ্যে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জড়তা কেটে যেতে আমি ছুটে বাইরে এলুম। হাতের মুঠির মধ্যে একতাড়া নোট ধরাই আছে। চিৎকার করে কাকে ডাক্‌তে গেলুম,—গলায় স্বর ফুটলো না। সে কি অসহ্য পুলকের উন্মাদনায়, না, হঠাৎ ওঁর চলে যাবার ব্যথায়—ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লুম না।

একটা স্বপ্নের মত মনে হোলো—যেন ঘুম থেকে এই-মাত্র জেগে উঠলুম।

এই সময় নীচু থেকে একরাশ তীক্ষ্ণ বিশ্রী হাসি ছুরির ফলার মত আমার কানে যেতে আমার পরিচয় আর পরিস্থিতি নতুন করে প্রকটিত হয়ে উঠলো যেন।

আশ্চর্য, উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে আমি সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেলুম।

আমার ব্যবসা, আমার পশার, সব বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হ'লো। প্রয়োজন না হলে নীচে নামি না আমি। সন্ধ্যার দেহ-পশারিণীর দল থেকে আমার নামটা কেটেই দিলাম একরকম।

সঙ্গিনীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ অত্যন্ত বিশ্রী আর অভদ্র বলে মনে হয়। আমার ঘর থেকে মদের গ্লাস বোতলগুলো সরিয়ে ফেলেছি একদিকে। অন্য দিকে মার্জিত করে ফেলেছি ঘরখানা। সেইদিনের পর থেকে আমার মন যেন অসম্ভব রকমের ভদ্র আর শুচিবাই-গ্রস্ত হ'য়ে উঠেছে।

একটা কথা সেই থেকে মনে উঁকি মার্‌ছে! আবার হয়তো উনি আসবেন। এজন্যে আমার প্রস্তুত হয়ে থাকা

চাই এবং প্রস্তুত হওয়া চাই। যা ইতর, যা কুৎসিত, যা অমার্জিত, সে সবের উর্দ্ধে উঠতে হবে আমাকে। সর্বক্ষণের জন্যে এই ধ্যান, এই চিন্তা আমাকে সব কাজে ভুলিয়ে রাখলো!

এমনি করে দিন গেল। দিনের পর মাস। মাসের পর বছরও ঘুরে গেল।

তিনিও এলেন না।

অনেক প্রতীক্ষা যখন ব্যর্থ হ'তে চললো, তখন একটা কথা মনে হোলো। সে কথাটা ভুলিনি। তাঁর ঠিকানাটি। এইটি-ই ছিল আমার শেষ সম্বল। পাছে তিনি কিছু মনে করেন, এই ভয়েই দেইনি। কিন্তু আর অপেক্ষা করলুম না।

তবু অনেক ভয়ে-ভয়ে চিঠিটা দিলুম। বেশি কথা নয়, মাত্র দুটি ছত্র। বেশী লিখলে পাছে তিনি কিছু মনে করেন। তবে উত্তরের আশা মোটে-ই করিনি।

কিন্তু আশ্চর্য, উত্তর এলো। এলো বেশ তাড়াতাড়ি। তা'তে শুধু একটি কথা লেখা:

'আসবো।'

এবং এলেন ও।

যে বেশে এলেন, তার ব্যাখ্যা আমি করতে পারবো না। কী দীন, শ্রীহীন চেহারা। ছিন্নভিন্ন পরিধেয়। একমাথা রুক্ষ চুল একগাল দাড়ি। পরিচয় না দিলে হয়তো চিনতেই পারতুম না। আমার ঘরে ঢুকেই তিনি বিছানায় আর মেঝেয় দুবার বমি করলেন। পকেট থেকে বোতলটা ছিটকে পড়ে যেতে গোটা ঘর মদে ছড়াছড়ি হ'য়ে গেল। বিশ্রী দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে গেল।

স্থাণুর মত নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভুলে গেলাম, আমার এখন কি করা উচিত।

একবছর আগের ঘটনা মনে হোলো। ঠিক এমনি ভাবেই ত সেদিনও এমনি দুর্বার বিস্ময়ে দাঁড়িয়েছিলুম, কিন্তু সেই বিস্ময়ের সঙ্গে আজকের এমনি বিস্ময়ের কত বড়ই না পার্থক্য! কি ভিতরে, কি বাইরে।

শিল্পী

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম. এ,

ব্যথাতুর নীরব বিস্ময়ে প্রশ্ন জাগে মনে—
বিজ্ঞানের অবদানে বিশিষ্ট এ যুগে,
যন্ত্রের কারাগারে রুদ্ধশ্বাস প্রেম যেথা,
শিল্পীর স্থান কোথা?

দানবের আরণ্যক জিঘাংসার বলি
আজ তুমি, আমি—সকল পৃথিবী।
কালের দিগন্তে যেন সঞ্চারিত
শ্বাপদের হিংস্রতার অশুভ সংকেত।

সত্যকার সর্ব্বনাশা বিষে নীল—এ পৃথ্বীর
শিল্পিসত্বা নিঃশেষিতপ্রায়,
বিদ্বেষের বিস্ফোরণে
মানুষের বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে।

অনুচ্চার ক্রন্দনে, নিশ্চল
নিশ্চুপ কেন তুমি?
দীপ্তিময় আলোর পরশে, শিল্পি!
শীতার্ত্ত এ মনে বসন্তের ইসারা আনো।
অশ্রুভাঙা ভাষায় কর সঞ্জীবন
সত্য-শিব-সুন্দরের মূর্ত্তি চিরন্তন।

স্বপ্ন চারণা শুধু নহে, চিরায়ত চৈতন্য স্পন্দনে
তোমার ছবিতে কবি, কাহিনীতে
কায়ালাভ করে-
যেন ইতিহাস হয়ে ওঠে সমুজ্জ্বল দিন।
প্রাণান্তিক প্রতীক্ষার হোক্ অবসান।
মিথ্যা কবি মৃত্যু বিজ্ঞাপন।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১২৭০ সালে পাথুরেঘাটায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (তখনও রাজা হন নাই) বাড়ীতে একটি নাট্য-সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। যতীন্দ্রমোহনের পৈতৃক বাটিতে (৬৫ নং পাথুরেঘাটায়) ইহার রঙ্গমঞ্চ হয় নাই। পাথুরেঘাটার ঠাকুর গোষ্ঠির আদি বাড়ীতে (৺গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে ৬৬নং পাথুরেঘাটায়) অর্থাৎ তখনকার ৺ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর হলে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। এই স্থানে ১২৭১ সালে (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) "মালবিকাগ্নিমিত্র" অভিনীত হয়। পাইকপাড়ার রাজাদিগের যত্নে ১২৬৬ সালে ইহার অভিনয়ে যে সকল অভিনেতা অভিনয় করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই অভিনয়ে যোগদিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ই এখানে শিক্ষক হইয়াছিলেন। ঠিক কোন্ তারিখে "মালবিকাগ্নিমিত্র" প্রথম অভিনীত হয় এবং কাহারা কোন্ অংশ লইয়া অভিনয় করেন, তাহা জানা যায় নাই। ইহার পর যতীন্দ্রমোহন রামনারায়ণ তর্করত্নের নূতন নাটক "কংসবধ" অভিনয় করিবার উদ্যোগ করেন, কিন্তু অসুবিধায় উহা পরিত্যাগ করা হয়। এই সময়ে পুস্তকাভাবে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজে "বিদ্যাসুন্দর" নাটক রচনাপূর্ব্বক আখড়াই দেওয়ান। নয় দশ বার অভিনয়ের মধ্যে নিম্নে একটি তারিখ দেওয়া গেল,—

১ম	১২৭২।২৩শে পৌষ,	শনিবার	(১৮৬৬।৬ জানুয়ারী)
২য় ,,	২৭শে পৌষ,	বুধবার	(১৮৬৬।১০ জানুয়ারী)
৩য় ,,	২৯শে মাঘ,	শনিবার	(,, ১০ ফেব্রুয়ারী)
৪র্থ ,,	৭ই ফাল্গুন	"	(,, ১৭ ,,)
৫ম ,,	১২ই ফাল্গুন	,,	(,, ২৪ ,,)

এই অভিনয়ের সময়ে রেবার রাজা কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের মরকতকুঞ্জ নামক উদ্যানে বাস করেন। বিদ্যাসুন্দরের আখড়াই তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, খুলিবার উদ্যোগ হইতেছিল। ১২৭২ সালের ১৯এ পৌষ (১৮৬৫।৩০ ডিসেম্বর) তারিখে যতীন্দ্রমোহন তাঁহাকে স্বভবনে নিমন্ত্রণ করেন। ইঁহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য এই দিনই বিদ্যাসুন্দরের ড্রেস-রিহার্সালের ব্যবস্থা করা হয়। এই দিন যতীন্দ্রমোহনের নিজ পরিজন ও রেবার রাজার দলবল ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত ছিল না। তৃতীয় অভিনয়ে বিজয়নগরম্‌এর মহারাজ দর্শক ছিলেন। এই সময়ে য়ুরোপ হইতে নবাগত থেরেস পুশার্ড নামক এক প্রসিদ্ধ বাদক টাউনহলে স্বীয় বাদ্যকৌশল শুনাইয়া লোককে চমৎকৃত করিতেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ যতীন্দ্র ও শৌরীন্দ্রমোহনের সহিত তিনি পরিচিত হন। বিদ্যাসুন্দরের তৃতীয় অভিনয়ে পুশার্ড্ নিমন্ত্রিত হইয়া বেহালা বাজাইয়াছিলেন। তখনকার য়ুরোপীয় বাদ্যযন্ত্রবিক্রেতা "বার্কিষ্

ইয়ং” কোম্পানীর দোকানের অধ্যক্ষ রিজলে এই চতুর্থ অভিনয়ে পুশার্ডের বাজনার সহিত পিয়ানো বাজাইয়া ছিলেন।

বিদ্যাসুন্দরের অভিনেতৃগণের নামাদি,—

রাজা বীরসিংহ	রাধাপ্রসাদ বসাক।
মন্ত্রী	হরিমোহন কর্ম্মকার।
গঙ্গাভাট	গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সুন্দর	মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
ধূমকেতু	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিদ্যা	মদনমোহন বর্ম্মা।
হীরামালিনী	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুলোচনা	ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়।
চপলা (১)	যদুনাথ ঘোষ।
ঐ (২)	ফটিক ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
বিমলা	নারায়ণচন্দ্র বসাক।
প্রতিবাসী	অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
প্রহরী	ব্রজদুর্লভ বসাক।

এই সঙ্গেই প্রথমাভিনয় হইতেই “যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল” নামক একখানি প্রহসনেরও অভিনয় হয়। ১৩ জানুয়ারী তারিখের “বেঙ্গলী” পত্রে তাহার তদানীন্তন সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ এই অভিনয়ের সুখ্যাতি করিয়া এক বিবরণ লেখেন।

এই বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের সঙ্গে বাঙ্গালা সাধারণ নাট্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের একটু সম্বন্ধ ছিল। এই অভিনয়ের সময়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু আত্মীয়তাসূত্রে যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে থাকিতেন। এই তাঁর প্রথম অভিনয় দর্শন। তিনি এই-খানে থাকিয়াই অভিনয়বিদ্যার সমস্ত ব্যাপারগুলি দেখিবার ও বুঝিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়িতেন তখনও তিনি নাট্যের কোন সম্পর্কে ছিলেন না।

যতীন্দ্রমোহনের এই নাট্যসম্প্রদায়ে ক্রমশঃ ১ “মালবিকাগ্নিমিত্র”, ২ “বিদ্যাসুন্দর”, ৩ “যেমন কর্ম্ম-তেমনি ফল” ৪ “বুঝলে কি না,” ৫ “মালতীমাধব”, ৬ “উভয়-সঙ্কট”, ৭ “চক্ষুদান”, ৮ “রুক্মিণীহরণ”, ৯ “রসাবিষ্কারবৃন্দক” অভিনীত হইয়াছিল এবং এই দল অনেক দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। রুক্মিণীহরণের অভিনয় পর্য্যন্ত যতীন্দ্র-মোহনের নাট্য সম্প্রদায় একটানে চলিয়াছিল। তাহার পর বন্ধ থাকে, পুনরায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে “রসাবিষ্কারবৃন্দক” নামক ক্ষুদ্র দৃশ্য কাব্য রচিত ও অভিনীত হয়। এই সকল অভিনয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত একতান-বাদন-সম্প্রদায় বাজাইতেন। তাহাতে অধিকাংশ দেশী যন্ত্র বাজিত। বেহালা ব্যতীত বিদেশীয় অন্য কোন যন্ত্র ছিল না, ফুঁদিয়া বাজাইবার কোন যন্ত্রও ছিল না। ইহা “শৌরীন্দ্রমোহনের কনসার্ট” নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় হইতেই নাটক ও প্রহসন একত্র অভিনয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

পাথুরেঘাটায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে চতুর্থ পুস্তক “মালতীমাধব” নাটক ১২৭৪ সালের ১৫ই আশ্বিন (১৮৬৭।৩১ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার প্রথম অভিনীত হয়। ইহা আট দশ বার অভিনীত হইয়াছিল। এক রাত্রিতে কেবল সাহেববিবিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভিনয় দেখান হয়। এইদিন লর্ড লরেন্স উপস্থিত ছিলেন। মালতী-মাধবের গানগুলি বনওয়ারী লাল রায় নামক একব্যক্তি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি “কৃষ্ণকুমারী” নাটকের আখড়াই বসান। ১২৭২ সালের ১০ই শ্রাবণ (১৮৬৫।২৪ জুলাই) সোমবারে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। সে অভিনয় কেবল বন্ধুবান্ধবের দর্শনার্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১২৭৩ সালের ১লা পৌষ (১৮৬৭ ১২ ফেব্রুয়ারী) শনিবারে ইহার প্রকাশ্য অভিনয় হয়। * [এই প্রকাশ্য অভিনয়ে ছোটলাটের বাদক-দল বাজাইয়া ছিল।] এই অভিনয়ের সময়ে এই নাট্যসমিতির ব্যবস্থা অতি সুন্দর ছিল, নিম্ন তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহার একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ছিল,—

কালীপ্রসন্ন সিংহ	(সভাপতি)
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সহকারী সভাপতি।
কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	সদস্য।
কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	”
চন্দ্রকালী ঘোষ	”

রূপলাল মিত্র	"
বরদাকান্ত মিত্র	"
মণিমোহন সরকার	"
কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	ধনাধ্যক্ষ।
" আনন্দকৃষ্ণ " "	সম্পাদক।
প্যারীমোহদ দাস (বৈষ্ণব)	সহকারী সম্পাদক।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি কর্ম্মচারী ছিলেন,—

কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ।
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীমোহন দাস	শিক্ষক
রূল (প ?) লাল মিত্র কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর শ্রীবরদাকান্ত মিত্র প্যারীমোহন দাস	মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত কর্মচারী
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র বাহাদুর শ্রীবরদাকান্ত মিত্র	একতান-বাদন সম্প্রদায়ের নেতা।
কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ " " কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ " "	"হলের" তত্ত্বাবধায়ক
বরদাকান্ত মিত্র রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতুলকৃষ্ণ দেব	সাজঘরের তত্ত্বাবধায়ক
চন্দ্রকালী ঘোষ রূপলাল মিত্র	অভ্যর্থনাকারক
বরদাকান্ত মিত্র কালীকমল নস্কর জীবনকৃষ্ণ দেব অতুলকৃষ্ণ দেব মণিমোহন সরকার	কর্ম্মচারী-প্রধান

প্রতি মঙ্গল, শুক্র ও রবিবারে ইহাদের নাট্যাভ্যাস হইত। ১৮৬৭।১১ ফেব্রুয়ারী হিন্দু-পেট্রিয়টে এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই অভিনয়ে প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন মাত্র, নাট্যসম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন না।

এই অভিনয়ে যাঁহারা যে ভূমিকা লইয়া অভিনয় করেন তাহার বিবরণ,—

সূত্রধার	ক্ষেত্রমোহন বসু
ভীমসিংহ	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বলেন্দ্রসিংহ	প্রিয়মাধব বসু মল্লিক
সত্যদাস	কুমার আনন্দকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
জগৎ সিংহ	কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
নারায়ণ মিশ্র	বেণীমাধব ঘোষ
ধনদাস	মণিমোহন সরকার
দূত	বেণীমাধব ঘোষ
ভৃত্য	জীবনকৃষ্ণ দেব
কৃষ্ণকুমারী	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
অহল্যাবাই	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
তপস্বিনী	কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
মদনিকা	রামকুমার মুখোপাধ্যায়
১ম সহচরী	শ্রীহীরালাল সেন
২য় সহচরী	নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের ঠিক পরেই পটলডাঙ্গা আড়পুলিতে "আড়পুলি-নাট্যসমাজ" স্থাপিত হয়। এখানে প্রথমে "মহাশ্বেতা" পরে "শকুন্তলা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" অভিনীত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই দুই নাটক ছাতুবাবুর বাড়ীতে অভিনীত নাটকদ্বয় হইতে বিভিন্ন এবং এই সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত। ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে) এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় হয়। ইহার পর এইদলে শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ শীলের "চন্দ্রাবলী" নাটক ও "এঁরাই আবার বড় লোক" নামক প্রহসন অভিনীত হয়। "প্রাণীবৃত্তান্ত" প্রণেতা সাতকড়ি দত্ত এই দলের [illegible] (সেক্রেটারী) ছিলেন।

যে সময়ে বাগবাজারে নগেন্দ্রবাবুদিগের বাজনার দল খুব জোরে চলিতেছিল, সেই সময়ে সিমলা শুঁড়ীপাড়ায় শুঁড়ীদিগেরই বাড়ীতে পদ্মাবতী অভিনয়ের এক অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বাগবাজারের বাজনার দলের নগেন্দ্রবাবু আসিয়াই এখানে শিক্ষকতা এবং নিজে কঞ্চুকী সাজিয়া অভিনয় করিতেন। উত্তর কালের ন্যাশানাল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রবাবুর প্রথমাভিনয়ের পরিচয় এই। ১২৭৩ সালের প্রথমে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেই) এই দলের প্রথমাভিনয় হয়।

এই সময়ে কলিকাতায় নাট্যামোদের একটা প্রবল স্রোতঃ বহিয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। তন্মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই, হওয়াও সুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে। এই সময়ে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুর এবং শিবপুরেও নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল।

পাথুরেঘাটায় বিদ্যাসুন্দর অভিনয় হইবার সময়ে জোড়াসাঁকো ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে এক নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। ইহার নাম "জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ।" গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উভয় পুত্র ৺গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠপোষক। কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ বিহারী সেন ও প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র হীরালাল মিত্র এবং গুণেন্দ্রবাবু পরামর্শ করিয়া মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। আখড়াই ও রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। শেষে গণেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে কোন সমাজ-হিতকর নাটকাভিনয়ের কল্পনা হয়। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি নাটকের ন্যায় নূতন কোন সামাজিক নাটকের জন্য ইহারা চেষ্টা করেন। শেষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে ২০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বহু বিবাহ সম্বন্ধে নাটক লেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। তখনকার অগ্রণী নাটককার রামনারায়ণ তর্করত্ন "নবনাটক" লিখিয়া আনেন। ১২৭৩ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ৺প্যারীচাঁদ মিত্র সভাপতি ছিলেন। ইহার পর গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ একটি কমিটি করিয়া সেই নাটকের অভিনয় করিতে অগ্রসর হইলেন। কমিটিতে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺শ্রীনাথ ঠাকুর, (৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রাধানাথ ঠাকুরের পৌত্র), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীল কমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন। ১২৭৩ সালের ২২ পৌষ (১৮৬৭৷৫ই জানুয়ারী) ইহার প্রথম এবং ১২৭৩৷১২ ফাল্গুন (১৮৬৭৷২০ ফেব্রুয়ারী) ইহার শেষ বা নবম অভিনয় হয়।

অভিনেতৃবর্গের নাম

গণেশবাবু	অক্ষয়কুমার মজুমদার।
সুধীর	সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
বিধর্ম্মবাগীশ	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
চিত্ততোষ	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।
গ্রাম্য	শৈলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মোধো	ঐ

নাগর	নীলকমল মুখোপাধ্যায়।
নট	ঐ
দণ্ডাচার্য্য	ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
কৌতুক	মতিলাল চক্রবর্ত্তী।
সুবোধ	বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
সাবিত্রী	সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
চন্দ্রলেখা	অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
অচলা	থাকভূষণ মুখোপাধ্যায়।
কমলা	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
বিমলা	রাধাবিনোদ চট্টোপাধ্যায়।
চপলা	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
চন্দ্রকলা	মণিলাল মুখোপাধ্যায়।
সাধ্বী	রামগোপাল মজুমদার।

এই অভিনয় এপর্য্যন্ত অভিনীত সমস্ত পুস্তকের অভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুসঙ্গত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী মহাশয় বলেন, এই অভিনয় দেখিয়াই তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিবার শুনিবার ও জানিবার বাকী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। এই অভিনয়ের সুখ্যাতি কলিকাতার সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

[ক্রমশঃ

শোপেনহয়ারের দুঃখবাদ

শ্রীমনীন্দ্র দত্ত

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক অর্থার শোপেনহয়ারের বিচিত্র জীবনী পর্যালোচনা করলে জানা যায়, তরুণ বয়সে পিতার আত্মঘাতী হবার পরে মায়ের উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রার প্রতিবাদে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং তারপরেও তার মা আরও দীর্ঘ চব্বিশ বছর বেঁচে থাকা সত্বেও একটি দিনের জন্যও মার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। তিনি কখনও দারপরিগ্রহ করেন নি। পারিবারিক জীবনের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেছেন একটি বোর্ডিং হাউসে। বন্ধুবান্ধব তাঁর কেউ ছিল না। একটি মাত্র সঙ্গী ছিল তাঁর প্রিয় কুকুর—যার নাম আদর করে রেখেছিলেন 'আত্মা।' শহরের বাচালরা অবশ্য কুকুরটির নাম দিয়েছিল 'ইয়ং শোপেনহয়ার।'

ছাত্রজীবনে ইওরোপে থাকা কালে তৎকালীন ইওরোপের বীভৎসতা পাষাণের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল তরুণ শোপেনহয়ারের মনের পটে। ফ্রান্সের মহাবীর নেপোলিয়নের ইওরোপ আক্রমণ ও তাঁর প্রতি-আক্রমণের ফলে সারা ইওরোপের তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। মস্কো পুড়ছে। সুদূর সেন্ট হেলেনার নির্জন দ্বীপে ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে নেপোলিয়নের বিশ্বজয়ী কামনা। বোলোন থেকে মস্কো পর্যন্ত প্রতিটি দগ্ধ শস্যক্ষেত্র, প্রতিটি ভস্মীভূত গৃহ আর প্রতিটি সৈনিক-কবর যেন আর্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে—জগৎ ও জীবনের চরম ব্যর্থতার বাণী।

ব্যক্তিগত জীবন ও পারিপার্শ্বিক জগতের এই পটভূমিকায়ই শোপেনহয়ারের দার্শনিক দুঃখবাদ ও জীবন-বিতৃষ্ণার জন্ম। দর্শনের ইতিহাসকার রাইট লিখেছেন : It was the sight of the great distress

economic depression subsequent to the Napoleonic wars that made him a pessimist. আবার উইল ডুরাণ্ট লিখেছেন : A man who has not known a mother's love—and worse, has known a mothers hatred—has no cause to be infatuated with the world. কিন্তু শোপেনহয়ারের দুঃখবাদ কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা ব্যর্থতার প্রতিফলন, এ ধারণা করা সমীচীন হবে না। দর্শনশাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য। বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীসের প্লেটো আর আধুনিক জার্মেনীর কাণ্ট—এই দুই দিক্‌পাল দার্শনিকের দর্শন-গ্রন্থসমূহ তিনি পাঠ করেছেন সত্যসন্ধানীর গভীর মনোনিবেশ সহকারে। তাই তাঁর দুঃখবাদের কারণ তিনি অনুসন্ধান করেছেন জগৎ ও জীবনের মূলতত্ত্বের গভীরে। একটা বিস্তারিত দার্শনিক বিশ্লেষণের উপরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ The word as will and idea-র প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি অধ্যায়ে প্রগাঢ় মনীষা ও প্রখর বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আর সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য তাঁর প্রদীপ্ত ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী। যেন দর্শনশাস্ত্রের জটিল আলোচনাই নয়। সহজ সরল ঋজু। তাঁর সামগ্রিক মতবাদের মূল কথা : জগতের মূলাধার হচ্ছে ঈপ্সা। ঈপ্সা থেকে সঞ্জাত হয় সংঘর্ষ। আর সংঘর্ষ থেকে দুঃখ। কি সেই দুঃখনাশের প্রকৃষ্ট পন্থা ? ঈপ্সার বিনাশ। নির্বাণ। সহসা শুনলে মনে হবে—কাণ্ট, হেগেল, স্পিনোজার দেশের মানুষের কণ্ঠ নয়, কথা বলছে যেন প্রাচ্য ভারতের বোধিসত্ব বুদ্ধ!

শোপেনহয়ারের ঈপ্সা-দর্শনের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এ প্রবন্ধে নেই। শুধু তার বিচিত্র প্রাণবান বক্তব্যের একটা সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

শোপেনহয়ার বলেছেন, এযাবৎকাল দার্শনিকরা একটা মৌলিক ভ্রান্তির বশবর্তী ছিলেন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন, চিন্তা এবং চৈতন্যই মনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাই মানুষকে তাঁরা বলেছেন rational animal. কিন্তু এ ধারণা ভুল। সচেতন বুদ্ধির অন্তরালে থেকে যে শক্তি মানুষকে প্রতি পদক্ষেপে পরিচালিত করছে সে তার দুর্বার সংগ্রামী ঈপ্সা বা will. যুক্তিসিদ্ধ বলেই একটা জিনিষ আমরা চাই না। বরং বলা চলে—জিনিষটি চাই বলেই তার স্বপক্ষে আমরা যুক্তি খুঁজি। ঈপ্সা যেন "একটি শক্তিমান্ অন্ধ মানুষ যে তার কাঁধে বয়ে বেড়ায় একটি চক্ষুষ্মান্ পঙ্গু লোককে।" লজিক দিয়ে কি কোন মানুষকে দিয়ে কিছু করানো যায় ? যায় না। কাজ যদি চাও—তাহলে আবেদন কর মানুষের স্বার্থের কাছে, তার ইচ্ছার দরবারে। খাদ্য সংগ্রহে, জীবন-সঙ্গীর সন্ধানে, আর সন্তানসন্ততির কামনায় যুগ যুগ ধরে মানুষের যে রক্তাক্ত সংগ্রাম, সে তো তার বিচার বৈদগ্ধ্যের পরিচয় বহন করে না, তার একমাত্র নিয়ামক বেঁচে থাকবার ইচ্ছা, পরিপূর্ণ জীবনের তাগিদ—will to live and to live fully.

এই জীবন-ঈপ্সা শুধুমাত্র মানুষেরই অন্তরশায়ী মূল সত্তা নয়। মনুষ্যেতর যত জীব, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, এমন কি জড় পদার্থেরও মৌলিক সত্তা এই ঈপ্সা। একেই আমরা বলতে পারি মানবসাধনার বহু-আকাঙ্ক্ষার ধন পরম সত্তা। বিশ্বজগতের যত কিছু আকর্ষণ-বিকর্ষণ,—চৌম্বিক, বৈদ্যুতিক, মাধ্যাকর্ষণি,—সবই এই ঈপ্সার লীলামাত্র। যে-টানে গ্রহ-নক্ষত্র ঘোরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, যে-টানে জীব-জগৎ এগিয়ে চলে নব নব রূপ-পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে, যে-টানে প্রিয়তমা আকর্ষণ করে প্রিয়তমকে, সব—সবই সেই এক ঈপ্সারই বিচিত্র প্রকাশ।

বাঁচবার এই ইচ্ছা সর্বত্রগামী। এর একমাত্র শত্রু মৃত্যু। কিন্তু সেই সর্বধ্বংসী মৃত্যু পর্যন্ত এই ঈপ্সার কাছে পরাভূত হয়। 'মৃত্যু তার চরণ-বন্দনা করি মাগে পরাজয়। জীবমাত্রই মরণশীল। তবু নব নব জন্মের ভিতর দিয়ে মৃত্যুকে সে অতিক্রম করে। ব্যক্তির বিনাশ হয়। কিন্তু জীবন মৃত্যুহীন। তাই দেখতে পাই, প্রজনন-জীবনের অনিবার্য ধর্ম—তার প্রধানতম প্রবৃত্তি। এই প্রজনন-ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈপ্সা মৃত্যুকে জয় করে।

কিন্তু হায়! জীবনের এই সাধিক ঈপ্সাই জগৎকে দুঃখের আগার করে তুলেছে। সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্। প্রথমতঃ অভাব থেকেই ঈপ্সার জন্ম। সাধ্যের চেয়ে সাধ সব সময়ই বড়। একটি সাধ যদি মিটল, দশটি সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুঞ্জীত হল ব্যর্থ-বাসনার বেদনা। তৃষ্ণা সীমাহীন, তৃষ্ণাপূরণের ক্ষমতা

বড়ই ক্ষুদ্র। শোপেনহয়ার লিখেছেন: এ যেন ভিখারীর ভিক্ষালাভ। সে ভিক্ষা তাকে আজ বাঁচিয়ে রাখে শুধু কাল পর্যন্ত তার দুঃখকে প্রসারিত করে দিতে।"

শুধু কি তাই? জীবন মানেই তো জীবন-সংগ্রাম। কবি টেনিসনের ভাষায়: Nature is red in tooth and claws. প্রকৃতির বুক জুড়ে চলেছে অবিশ্রাম রক্তাক্ত সংগ্রাম। অন্নের সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, রাজ্যের সংগ্রাম। Homo homini lupus, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নেকড়ের সম্পর্ক। সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্।

কিন্তু এই সর্বব্যাপী দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই? কোন পথ খোলা নেই ঈপ্সার এই রক্তাক্ত নখর থেকে আত্মরক্ষার? হয় তো আছে। সে পথ মৃত্যু—প্রয়োজন হলে আত্মহত্যা। এক কথায় ঈপ্সার বিলুপ্তি সাধন। কিন্তু হায়! আত্মহত্যাকে ভয় করে না জীবন। মৃত্যুকে দেখে সে হাসে। এক একটি স্বেচ্ছা-মৃত্যুকে অতিক্রম করে শত শত নব জন্ম। আত্মহত্যা অর্থহীন নির্বোধের কাজ। ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কিন্তু পরম সত্তার? জীবনের? ঈপ্সার? সার্বিক নির্বাণের কোন পথ আছে কি?

একমাত্র পথ জীবনের উৎসমুখকে অবরুদ্ধ করা—ঈপ্সাকে জয় করা—ঈপ্সার প্রধানতম প্রকাশ প্রজনন-বাসনার বিনষ্টি সাধন করা। শোপেনহয়ারের নিজের কথায়: 'The satisfaction of the reproductive impulse is utterly and intrinsically reprehensible because it is the strongest affirmation of the lust for life' তাই মানুষ যত স্ত্রীজাতি সম্পর্ক রহিত হবে, ততই তার মঙ্গল। নারী-রূপের মোহ হতে মানুষ যতই মুক্তি লাভ করবে প্রজননের এই হাস্যকর অর্থহীন নাটকের ততই দ্রুত যবনিকা নামবে। কেন একই ব্যর্থ নাটকের পুনঃভিনয়ের এই হাস্যকর খেলা? কবে মানুষ এই ঈপ্সার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারবে: জীবনের মোহ মিথ্যা—মৃত্যুতেই পরম শান্তি? সেই দিন ঈপ্সার সার্বিক ক্ষান্তি আর মনুষ্যজাতির চরম বিলুপ্তির ভিতর দিয়ে আসবে তার মোক্ষ।

স্বল্প কথায় এই হলো দার্শনিক শোপেনহয়ারের দুঃখবাদের ভূমিকা। শোনা যায় প্রথম জীবনে শোপেনহয়ার স্বেচ্ছাচারী যৌবনের পুজারী ছিলেন। কয়েকটি ব্যর্থ-প্রণয়ের ঘটনাও নাকি ঘটেছিল তার জীবনে। তাই কি তার রচনায় কৌমার্যের এত স্তুতিগান? তাই কি বিবাহিত জীবনের প্রতি তাঁর এত বিরাগ? তাই কি নারীজাতির প্রতি এত উষ্মা ও বিদ্বেষের ঝড় বয়েছে তাঁর লেখনীমুখে?

আরো শোনা যায়, পরিণত বয়সে ইন্দ্রিয় মোহমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই সব উচ্ছ্বাস অনেক পরিমাণে পরিমিত হয়েছিল—নিরংকুশ দুঃখবাদ ও জীবন-বিতৃষ্ণার উপরেও লেগে ছিল আশা ও আশ্বাসের প্রলেপ। শোপেনহয়ারের জীবনেতিহাস থেকেও এই ধরণের কিংবদন্তীর সমর্থন পাওয়া যায়। জীবনের একেবারে শেষের অধ্যায়ে এসে তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। খ্যাতি ও যশের মুকুট উঠেছিল তার শুভ্র শিরে। ১৮৫৮ সালে তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিবসে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকেই তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে অভিনন্দন এসেছিল। মাত্র কয়েকটি লাইনে তাঁর এ সময়কার একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন উইল ডুরান্ট: 'The great pessimist became almost an optimist in his old age; he played the flute assiduously after dinner, and thanked time for ridding him of the fires of youth,'

কবি সুরদাসের কাব্যের উৎস

গোপী ভট্টাচার্য

এমন কিছু আছে ভারতের মাটিতে—যার জন্য এখানকার মানুষ যুগ যুগ ধরে অনুসন্ধান করে চলেছে কোন আনন্দ-ঘন পরমাত্মাকে, যিনি সকল রসের আকর, নিজেকে দুর্লভ করবার জন্যে মানুষের ভীড় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে লক্ষ লক্ষ কামনা বাসনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন মানুষকে। তথাপি জলহাওয়ার গুণেই বোধহয় এখানকার মানুষ সেই অরূপরতনকে লাভ করবার জন্যেই জাগতিক মায়ার বন্ধনকে তুচ্ছ করে তাঁর দিকেই ধাবিত হচ্ছে। শিশুকে রঙীণ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখার মতই এ জগতের কামনা-বাসনা। কিন্তু যেশিশু সেই রঙীণ খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেঁদে চলে সে পাবেই মাকে। অর্থাৎ সেই শিশুর জননী নিজেই আর স্থির থাকতে পারবেন না। শিশুকে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে তাকে শান্ত করবেনই। ভারতের মাটিকে সিক্ত করেছে এই সরল বিশ্বাস। এই শিশুদের কান্নায় জগত জননী কি না এসে থাকতে পারেন? কাজ ফেলে তাঁকে ছুটে আসতেই হবে।

আবার আর এক ধারা হোল প্রেম। চোখের জল এ পথেরও পাথেয়। চোখের জলে ভালোবেসে যাওয়া। নীরবে নির্জনে নিরন্তর প্রেম নিবেদন করা। এ প্রেমের টানও এমনি যে প্রেমঘনকে ছুটে আসতেই হবে প্রেমিকের কাছে। কোন ফাঁকি নেই এ বিশ্বাসের মধ্যে। সহজ সরল সত্য বিশ্বাস। তবে কাঁদার মত কাঁদতে হবে। ভালোবাসার মত ভলোবাসতে হবে। যুগে যুগে ভারতের মাটিতে এই পথে কত মানুষ লাভ করেছে বিশ্বজননীকে, প্রেমঘনকে। যে পাওয়ার মধ্যে আছে অনন্ত শান্তি, অনাবিল আনন্দ। যার ছোঁয়ায় মনে প্রাণে উথলে ওঠে রসের সাগর। এমনি এক প্রেমিক হলেন কবি সুরদাস। অষ্টছাপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আনুমানিক ১৪৮৪ খৃঃ (১৫৪০ বিক্রমাব্দ) রুণকতা গ্রামে জন্ম হয় তাঁর। সাত ভাই এর মধ্যে কনিষ্ঠ সুরদাস। বংশ পরিচয়ে জানা যায় সুরদাস পৃথ্বীরাজের সভাকবি বিখ্যাত রাসো রচয়িতা সারস্বত ব্রাহ্মণ কবি চন্দের বংশ সম্ভূত। সুতরাং সুরদাসের মধ্যে বাল্যকাল হতে যে কবিত্ব শক্তির উন্মেষ হয় তার মূলে রয়েছে তাঁর পূর্বপুরুষের সংস্কার। শোনা যায় যে, সুরদাসের ছয় ভাই ও আত্মীয়স্বজন যুদ্ধে নিহত হন। সেই সময় মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের যুগ। সুরদাস একরকম নিরাশ্রয় হয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকার রাতে এক কূপের মধ্যে পড়ে যান। সেখান থেকে উদ্ধার পাবার আশায় তিনি একান্তভাবে ভগবানকে ডাকতে থাকেন। শেষে ভক্তের ডাকে ছুটে আসেন ভগবান। এই ঘটনায় অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় সুরদাসের। মুখে মুখে শ্রীহরির লীলা মাহাত্ম্য রচনা করে সুর সংযোগে তা গেয়ে শোনাতে থাকেন সকলকে।

বল্লভাচার্য এই সময়কার একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত। বেদ ও উত্তর মীমাংসার ভাষ্যকাররূপে তিনি তখন বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধাভাজন। তিনি প্রতিপন্ন করলেন নিরুপাধি ব্রহ্মই সৃষ্টি লীলার অন্যতম কারণ। জীবের জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ বিশেষ। জড় শুধু সৎময়। চিৎ ও আনন্দ নেই এখানে। কেবল পরব্রহ্ম কৃষ্ণই নিত্য ও সচ্চিদানন্দময়। কৃষ্ণ লীলা আদি অন্তহীন। জীবনকাল একমাত্র তাঁর "পুষ্ট"তেই (অনুকম্পাতেই) গোলকের নিত্য বৃন্দাবনে গমন করতে পারে। তাই বল্লভাচার্য ঘোষণা করলেন "পুষ্টিমার্গ" একমাত্র পথ। যা ভিন্ন জীবের সচ্চিদানন্দ অনুকম্পা লাভের আশা নেই। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যাকে পোষণ করতেন তার আর অন্য বিগ্রহ তোষণের আবশ্যক কি? কৃষ্ণের অনুকম্পা লাভই

জীবের একমাত্র আশ্রয়। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে নিজের পুষ্টিমার্গের কথা প্রচার করলেন বল্লভাচার্য।

আগ্রা মথুরার কাছে গউঘাট নামে এক গণ্ডগ্রামে তখন সুরদাস হরিকীর্তন করে চলেছেন নিত্য। বৃন্দাবনের পথে যেতে বল্লভাচার্য শুনলেন সুরদাসের মধুঢালা কণ্ঠের লীলা সঙ্গীত। মুগ্ধ হলেন আচার্য। দেখলেন ভজনরত ভক্তকে। তাঁর দুচোখে অবিরাম ধারা। আচার্য ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন সুরদাসকে। আচার্য বললেন—আমার সারাজীবনের পরিশ্রম আজ সার্থক। এতদিনে একজন সত্যিকার প্রেমিকের দেখা পেলাম। বুঝতে পারছিনা আজ আমি—কে ধন্য।

বল্লভাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন সুরদাস। তারপর গুরু আর শিষ্যে অতিবাহিত করলেন কয়েকদিন কৃষ্ণ গুণগানে। আচার্য অবশেষে বুঝলেন মহার্ঘ রত্ন এই সুরদাস। যে জন মুখে মুখে অজস্র পদ রচনা করে সুললিত সুর সংযোগে নিবেদন করতে পারে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে, তার স্থান লোকচক্ষুর অগোচর এই গউঘটে নয়—তাঁকে বসাতে হবে কৃষ্ণের লীলা নিকেতন বৃন্দাবনে। যেখানে প্রেমিকের অশ্রুযমুনায় কেলী করবেন কালোবরণ।

গুরুর আদেশে বৃন্দাবনে চলে এলেন সুরদাস। বল্লভাচার্যের আদেশে তাঁর শিষ্য পুরণমল ছত্রী ১৫২০ খৃঃ নির্মাণ করে দিয়েছেন শ্রীনাথজীর বিরাট মন্দির। এই মন্দিরে এসে উঠলেন সুরদাস। দিনরাত কৃষ্ণলীলা কীর্তনে মেতে উঠল গোবর্ধন। সুরদাসের সুরের টানে শ্রীনাথজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণ ভক্তসমাগমে পূর্ণ হয়ে উঠল।

সারাটি জীবন সুরদাস এখানেই অতিবাহিত করেন। এখানে বসেই তিনি নিত্য নতুন পদ রচনা করেছেন আর তাতে সুর সংযোজনা করে শুনিয়েছেন সমাগত রসিক জনকে। তাঁর রচিত পদাবলীর সংখ্যা প্রায় তিন সহস্রের কাছাকাছি। সেই সমস্ত পদাবলীর একমাত্র বিষয় বস্তু হোল বালক কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা। ভাব ও ভাষার লালিত্যে পদগুলি এত উচ্চাঙ্গের ও এত মর্মস্পর্শী যার আর তুলনা হয় না। শেষজীবনে আবার তিনি অন্ধ হয়ে যান। আজীবন শ্রীনাথজীর মন্দিরে ভজনা করে ১৫৬৪ খৃঃ গোবর্ধনের কাছে পারসৌলী গ্রামে তাঁর দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুকালে বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্‌লনাথ গোস্বামী ভক্ত প্রেমিকের চির বিদায় গ্রহণে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:—

এতদিন তোমার প্রেমের ছত্র ধরে আমাদের বিরহ আতপ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলে—তোমার তিরোধানে আজ থেকে বৃন্দাবন ছত্রহীন হোল।

এই বিঠলনাথ গোস্বামী যে আটজন কৃষ্ণভক্ত কবিকে শ্রেষ্ঠ বলে 'অষ্টছাপ' ঘোষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন সুরদাস। তারপর যথাক্রমে নন্দদাস, কুম্ভনদাস, তাঁর পুত্র—কৃষ্ণদাস, পরমানন্দ দাস ছীতস্বামী, গোবিন্দ দাস ও চতুর্ভুজ দাস।

ভারতীয় সাহিত্যে ভক্তি কাব্যের যুগে যে সব কবি নিজেদের রচনা নৈপুণ্যে অমর হয়ে আছেন সুরদাস তাঁর মধ্যে অন্যতম প্রধান। সুরদাস কবি হবার জন্যে সাধনা করেননি। যে কাব্য প্রবাহ তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ঝরণা ধারায় বেরিয়ে এসেছে তার জন্যেও তাঁকে সাধনা করতে হয়নি। তিনি যেন একখানি বীণাযন্ত্র। বীণকার স্বয়ং কৃষ্ণ। সুরদাসরূপী বীণায় দিনরাত সেই পরম বীণকার ঝংকার তুলেছেন।

সুরদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি একজন সাধক কবি। তাঁর নিষ্কাম ভক্তির মধ্যে দিয়ে, সুর ও সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে যে কাব্যপ্রবাহ নির্গত হয়ে এসেছে, কাব্য জগতে তা আজ অমূল্য হয়ে আছে। সুরদাস জন্মকবি। তাঁর মুখ দিয়েই যেন পূর্ণব্রহ্ম নিজের বাল্যলীলা বর্ণনা করে গেছেন। সংসারের মধ্যে বাস করেও সুরদাসের রচনার মধ্যে কোথাও দৈহিক কামনা বাসনার ছায়া মাত্র পড়েনি। পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি। পদাবলীর পর পদাবলীতে শুধু—বৈচিত্র্য আর নূতনত্ব। ভারতীয় সাহিত্যে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনার যে মাধুর্য সুরদাসের রচনার মধ্যে আছে তার সমকক্ষ আর কোন রচনা আছে বলে মনে হয় না। সুরদাস তাই কবি হিসেবে অদ্বিতীয়—অতুলনীয়। কবির সমস্ত রচনাই ব্রজভাষায় রচিত। সুরদাসের হাতে পড়ে ব্রজভাষা এক নূতন সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়। সুরদাসের পরবর্তী কবিরা প্রায়ই ব্রজভাষার কাব্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছেন।

সুরদাসের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে সুরদাস কোন দীর্ঘ কাব্য গ্রন্থ রচনা

করেননি। খণ্ড খণ্ড আকারে কৃষ্ণের বাল্য-লীলাকে বিষয়-বস্তু করে অজস্র সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর সহস্রাধিক পদাবলী যে গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার নাম সুরসংগ্রহ বা "সুরসাগর"। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম—"সাহিত্যলহরী" এবং তৃতীয় গ্রন্থের নাম "সুরসারাবলী"। এই সুর-সারাবলী গ্রন্থ কবির ৬৭ বৎসর বয়সের রচনা একথা সুরদাস নিজেই স্বীকার করে গেছেন। উক্ত তিনখানি পদাবলী গ্রন্থের মধ্যে "সুর সাগর" সমধিক প্রসিদ্ধ ও রসিক-চিত্তহারী। নন্দ-যশোদার বাৎসল্য, কৃষ্ণের প্রতি গোপ-বালাদের প্রেম, কৃষ্ণদর্শনের জন্য আকুলতা প্রভৃতি মধুর দিকটি সুরসাগরের সহস্রপদের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে—

"মৈয়া করহি বঢ়েগী চোটী
কিতীবার মোহি দুধ পিয়ত ভঈ
য়হ অজহুঁ হৈ ছোটী।"

বালক কৃষ্ণ মা যশোদাকে বলছেন, মাগো! আমার কেশচূড়া কতদিনে বড় হবে বল না? দুধ খেয়ে খেয়ে কতদিন হয়ে গেল, কিন্তু আমার কেশ-চূড়া সেই আগের মত ছোটই রয়ে গেল। বলনা মা কবে আমার কেশ লম্বা হবে। বেণী বাঁধার মত হবে?

"তূ জো কহতি বল কী জেঁ্যা,
কৈহৈ লাঁবী মোটি।
কাঢ়ত গুহত অহ্বাবত ওঁছত,
নাগিন সী ভূঁই লোটি।"

—তুমি রোজই বল দাদার (বলরামের) মত আমারও বেণী হবে। আঁচড়াতে, বিনুনী করতে, ধুতে, মুছতে. নাগিনীর মত মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, কিন্তু কোই? কিছু হচ্ছে না তো? আর কবে হবে?

"কাঁচো দূধ পিয়াবত পচি-পচি
দেত ন মাখন রোটী।
সুর শ্যাম চির জিব দৌউ ভৈয়া
হরি হলধর কী জোটি।"

—দাদার মত আমার বেণীও লম্বা হবে বলে রোজ তুমি আমাকে ঘটি ঘটি কাঁচা দুধ খাওয়াও। আমার কাঁচা দুধ খেতে একটুও ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে শুধু মাখন আর রুটি খেতে। তা তুমি কিছুতেই খেতে দাও না আমাকে। সুরদাস বলছেন, হরি আর হলধর এই দুই ভাই যেন চিরজীবী হয়।

"মৈয়া মোহি দাউ বহুত খিনায়ো
মোসো কহত মোল কো লীনী
তোহি জসুমতি কব জায়ো?
গোরে নন্দ যশোদা গোরী,
তুম কত শ্যাম শরীর?"

—একদিন বালক কৃষ্ণ অভিমানভরে মা যশোদার কাছে নালিশ জানালেন—দাদা আমায় যা তা বলেছে। আমাকে বলে আমি নাকি তোমার ছেলে নই। আমাকে নাকি তুমি কিনে এনেছ? আর বলেছে বাবা (নন্দ) ফর্সা, তুমি ফর্সা, দাদাও ফর্সা—তবে আমি কালো হলাম কেন? দাদার কথা কি সত্যি মা?

সহস্রপদের মধ্যে বালক কৃষ্ণের এমনি কত মান-অভিমান, এদের আব্দারের নিখুঁত চিত্র মধুর ভাষায় অঙ্কন করা আছে—যা পড়তে পড়তে মনপ্রাণ আপনা হতেই অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীর মত সুরদাস এইরূপ মাধুরী বর্ণনা করেছেন।

প্রেমভক্তিই কবি সুরদাসের কাব্যের উৎস একথা নিঃসন্দেহে বলা হয়। প্রেমের স্পর্শ আছে বলেই সুরদাসের কাব্য বিশ্বের রসিক মনকে সিক্ত করতে পেরেছে। শুধু ভারতীয় সাহিত্যে কেন, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে সুরদাসকে একজন উচ্চপর্যায়ের মহাকবি আখ্যায় ভূষিত করলেও বোধহয় তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হয় না। তিনি সর্বকালের সর্বজাতিরও সর্ববর্ণের চির-অমর কবি। তাঁর মত আদর্শবান্ প্রকৃত কবির কাব্য আরো ব্যাপকভাবে অনুশীলন করবার দিন এসেছে। সুরদাসের কাব্য বিশ্বের ঘরে ঘরে নিত্য পূজার বস্তু।

গুজব ও হুজুক

শ্রীজয়দেব রায়

সাধারণ মানুষ গুজব ও হুজুক ভালবাসে। এ বাতিকটি সামাজিক মানুষের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। একসঙ্গে কয়জন মিললেই নিজেদের মধ্যে যেসব আলোচনা হয়, সেগুলির মধ্যে গুজবই থাকে বেশী। ক্রমে বৈঠকে বৈঠকে গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রতিবেশীদের কুৎসা, সরকারের নিন্দা, সিনেমা অভিনেত্রীদের রূপগুণ—এগুলিও লোকমুখে শোনা গুজবের উপরেই নির্ভর করে।

রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে সামাজিক জীব এই কুৎসা-গুজব রটনা করে আসছে। শ্রীরামচন্দ্রকে স্বয়ং এই গুজবের ভয়ে সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করতে হয়। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 'অশ্বত্থামা হত' এই গুজব প্রচার করেই দ্রোণাচার্যকে ঘায়েল করা হয়।

এই শ্রেণীর গুজব ঐতিহাসিক যুগে বহু চলিত ছিল—মহারাজ লক্ষ্মণ সেন সপ্তদশ পাঠান অশ্বারোহীর ভয়ে সিংহাসন ছেড়ে নাকি পালিয়ে যান—এ গুজব বহুদিন ধরে চলে এসেছে। অন্ধকূপহত্যাটা ইংরেজ লেখকদের রটানো একটা গুজব—সিরাজকে মহাদুর্জন বানানোর জন্যে। এই গুজবের উপর নির্ভর করে স্মৃতিস্তম্ভও তোলা হয়েছিল। সিপাই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় একটি গুজব থেকে—বুলেটের কার্তুজে গোরু-শূকরের চর্বি আছে বলে রটে গেল—দাঁত দিয়ে তা কাটতে হত, সিপাইরা ধর্ম যাবে এই ভয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল।

যুদ্ধের সময়ে প্রচার বা 'প্রপাগ্যাণ্ডা' একটি বিরাট অস্ত্র—যত রকম ভাবে শত্রুপক্ষকে হেয় ক'রে তার পরাজয় সংবাদকে ফলাও করে বর্ণনা করা হয়, তাদের অত্যাচারের কল্পিত কাহিনী প্রচার ক'রে প্রতিপক্ষের মনোবলকে দুর্বল ক'রে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়।

গত যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার নিয়ত প্রচার করত 'গুজবে কান দেবেন না'। সে সময়ে গুজব ছড়ানোর জন্যে শাস্তিও দেওয়া হত। কিন্তু অত বিপুল পরিমাণ গুজব আর কোন সময়ে উৎপাদিত হয় নি। মানুষের মন তখন শঙ্কিত, জাপানী বোমা পড়বার বেশ সম্ভাবনাও ছিল, কাজেই জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে গুজব রটে গেল—জাপানীরা এগিয়ে আসছে, অমনি কলকাতা ফাঁকা হয়ে গেল। সমস্ত লোক যেভাবে প্রাণ ভয়ে দিগ্‌বিদিকে ছুটেছিল আজ তা ভেবে বিস্ময় লাগে। কিন্তু গুজবেরও একটা সময় আছে—মানুষ তিক্তবিরক্ত হয়ে যখন আবার কলকাতায় ফিরে আসতে লাগল তখন সত্যিই বোমা পড়ল। কিন্তু ভয় তখন ভেঙে গিয়েছে।

হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার সময়ে যতটা সত্যিকারের সংঘর্ষ হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছিল এই গুজব। বলতে কি দাঙ্গা হাঙ্গামাকে জিইয়ে রেখেছিল এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত গুজব। খুন-জখম, দাঙ্গাহাঙ্গামা, চুরিডাকাতি, রাহাজানি আকসারই হয়—এগুলির সম্বন্ধে যতটা গুজব রটে ততটা কিন্তু নয়।

গুজবের মূলে কতকটা সত্য হয়তো থাকে, এই সত্য লোক মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হতে থাকে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে গল্প বানাবার একটা লিপ্সা আছে, সামান্য ঘটনা কি হলে তার মনোমত হত সে তাই কল্পনা করে নেয়। সুরেন-বাবুর পায়ে পিঁপড়ে কামড়ালে তিনি পা চুলকাচ্ছিলেন—কথাটা অতিরঞ্জিত হতে হতে জনার্দনবাবুর কানে গিয়ে পৌছালো যে তাঁকে কাল কেউটে কামড়েছে, বাঁচার আর আশা নেই। কথায় বলে যা 'রটে তার অর্ধেক তো বটে—' কিন্তু অর্ধেক সত্যের উপর এত প্রলেপ পড়ে যে, তা আর চিনবার উপায় থাকে না।

নির্বাচনী যুদ্ধের সময়েও এই গুজব অস্ত্র দিয়ে প্রতি-পক্ষকে হেয় করার চেষ্টা করা হয়। উভয় পক্ষ উভয়-পক্ষকে বিদেশী রাষ্ট্রের বা মুনাফাখোরদের দালাল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। গণপতিবাবু শেঠ চমনলালের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন—খবরটা এমনভাবে রটতে লাগল যে, সবাই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেও ফেল্‌ল। শেষকালে গণপতিবাবু হেরেও গেলেন, কপর্দকশূন্য হয়ে

পড়লেন, না খেতে পেয়ে মারাও গেলেন। কিন্তু তখনও লোকের বিশ্বাস তিনি সেই দেড়লাখ টাকা পেয়েছেন।

গুজব মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে এমন ভাবে বিকল ক'রে দেয় যে, কেউ বিচার ক'রে ভেবেচিন্তে দেখে না, সত্যের সন্ধান বা উদ্ধার করবার চেষ্টাও করে না। আগে বিশ্বাস ছিল—বুঝি অশিক্ষিত লোকের মধ্যে এসব গুজব সৃষ্টি হয়, কিন্তু তা নয়। তবে শিক্ষিত লোকেদের গুজব শিক্ষিত ধরণের।

পরীক্ষার সময়ে ছাত্রদের মধ্যে নানা গুজব রটে, বহুবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে এই ধরণের গুজব রটায় অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছে। ছাত্রদের অবচেতন মনে প্রশ্নপত্র ফাঁস হোক এই ধরণের একটা ইচ্ছা থাকে—আর তা থেকেই এ শ্রেণীর গুজবের জন্ম হয়। এই গুজবে ক্ষতি হয় খুব, অনেক ছেলে ঐ গুজবের প্রশ্ন নিয়েই পরীক্ষার আগের ২৪ ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, অন্য কিছু পড়ে না।

কতকগুলি গুজবের সৃষ্টি এইভাবে মনোগত ইচ্ছা আর চিরকালীন বিশ্বাস থেকে। মেয়েদের মনে এই ধরণের গুজবের চলন খুব বেশী। শাশুড়ী বউকে পছন্দ করবে না—এটাই তারা স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়, তা থেকে বুড়ী বউটাকে খেতে দেয় না—এমন কি বুড়ী ভালমানুষ বউটাকে ধরে ধরে ঠেঙ্গায়', 'খুন্তি গরম ক'রে ছেঁকা দেয়' ইত্যাদি গুজবের সৃষ্টি।

অনেক সময়ে রাগ, রোষ বা হিংসা থেকে এ শ্রেণীর অপবাদের সৃষ্টি হয়। যে লোকটার উপর আমার আক্রোশ আছে তাকে যতদূর সম্ভব অসৎ, ধূর্ত, দুর্জন প্রমাণ করবার জন্য তার বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজবের সৃষ্টি করা হয়। এধরণের অকারণ আক্রোশ থাকে বিত্তশালীদের উপর দরিদ্রদের; পণ্ডিতদের উপর মূর্খদের। দরিদ্র চেষ্টা ক'রে ধনীকে কঞ্জুষ বানাবার, মূর্খেরা চেষ্টা ক'রে পণ্ডিতদের চরিত্রহীন বানাবার। অপরের টাকা সকলেই বেশী দেখে।

গুজব রটল ঘুষ নিয়ে শিবদাসবাবু ৫ লাখ টাকা জমিয়েছে, মারা গেলে দেখা গেল দেনার দায়ে তার বিক্রি হয়ে গিয়েছে মাথার চুলও। রথীনবাবুও ঘুষের চার্জে পড়েন—পুলিশ তদন্ত হয়, ব্যাঙ্কে তাঁর সামান্য কিছু টাকা ছিল, তিনি বেকসুর খালাস পেলেন, কিন্তু সেই যে রটে গেল ব্যাঙ্কে তাঁর ৬০ লাখ টাকা ছিল, তা থেকে তাঁকে বিশ লাখ খরচ করতে হয়েছে।

গুজব রটানোর মধ্যে অনেক সময়ে স্বার্থ থাকে। গুজব রটিয়ে বাজারদরের তারতম্য ঘটায় স্বার্থপ্রণোদিত ব্যক্তিরা। গুজব যারা শোনে তাদের কাছে বিষয় বস্তুর গুরুত্বের তারতম্য আছে। যেমন, মনোজবাবু লটারিতে তিনলাখ টাকা পেয়েছেন—মনোজবাবুকে যদি আপনি না চেনেন এই গুজব নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। প্রকৃত তথ্য পরীক্ষার অভাবে অনেক সময়ে গুজবের গুরুত্ব কমে যায়। ফিনল্যাণ্ডে একটি লোকের দুটি মাথা—এ ধরণের খবর কাগজে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তথ্য নির্ণয় সহজ নয় বলে কেউ বিশেষ গুরুত্ব দেয় না।

গুজবের প্রসঙ্গে হুজুকের কথা ওঠে—এক এক সময়ে দেশে এক একটা হুজুক আসে—দেশের সবাই তাতে মেতেও ওঠে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র এরকম দেখা যায়। যেখানে কোন লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই, হৃদয়ের যোগ নেই, আন্তরিকতা নেই, লাভ ক্ষতির হিসাব নেই—বিচার বিবেচনা ছাড়া কিছু নিয়ে গতানুগতিক মাতামাতি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসান তাই হুজুক।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর হুজুক, শতবার্ষিকীর হুজুক, রবীন্দ্রনাথের লেখা না পড়ে, না বুঝে! অসহযোগ আন্দোলনে কতকটা হুজুক ছিল, কারণ, জাতীয়তা বোধ বা প্রকৃত দেশভক্তি তখন ছিল না। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস, ট্রাম পোড়ানো, বাস পোড়ানো হুজুক। নব্য কবিদের কবিতা না বুঝে নির্বিচারে তাই নিয়ে মাতামাতি, কাগজে কাগজে বাড়াবাড়ি করা এবং আগেকার কবিদের গালাগালি করাও হুজুক ছাড়া কিছু নয়।

সার্বজনীন পূজার নামে হুজুক—কারণ, এ পূজায় ভক্তি নেই, ধর্মজ্ঞান নেই। নগরকীর্তনের হুজুক, দোলের হুজুক—সবাই মিলে রাস্তায় রাস্তায় উর্দ্ধবাহু হয়ে কীর্তন করা হুজুক ছাড়া আর কিছু নয়! বাজি পোড়ানোর হুজুক লাগে প্রত্যেক বৎসর কালীপূজার সময়ে। পুণ্য যোগে গঙ্গাস্নানের হুজুকে সারা দেশ এসে জোটে কালীঘাটে।

প্রতি বৎসর কলিকাতায় ফুটবল খেলার এক হুজুক আসে, ছেলেবুড়ো সবাই রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, পুলিশের গুঁতো খেয়ে ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে—এ-ও তো হুজুক।

হুজুকের প্রধান যোগানদার খবরের কাগজ, তারা নানাভাবে পাঠকদের হুজুকে মাততে উৎসাহিত করে। 'জন অভিমত' সৃষ্টি করার মালিক তো তারাই।

কলকাতা হচ্ছে হুজুকের একটা প্রধান আড্ডা—তা না হলে এমন সব তুচ্ছ কারণে সহরে শোভাযাত্রা বা মিছিল বেরোত না। খাদ্য আন্দোলন কিংবা উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য মিছিল বা'র হলে তার একটা সঙ্গত কারণ আছে, কিন্তু 'লেবাননে মার্কিন সেনা অপসারণ চাই' কিংবা 'কাটাঙ্গার দাবি মানতে হবে—জাতীয় মিছিল শুধু মাত্র হুজুকের নিদর্শন।

ফুটবল খেলা দেখার মধ্যে না-হয় খেলোয়াড়ী মনোভাব আছে, কিন্তু বক্সিং বা কুস্তীর লড়াই দেখবার জন্যে ভিড় করাকে হুজুক না বলে কি উপায় আছে? একটা মানুষকে পিটছে কিংবা দলছে দেখে সবচেয়ে মনে আমরা বোধহয় পুলকই অনুভব করি! নারীহরণ বা বলাৎকারের মামলা দেখবার জন্যে আদালতে ভিড় করিও ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে।

জলসা হচ্ছে আর একটা হুজুক—আমাদের দেশ এত গীতরসিক হয়ে পড়েছে যে সারা বৎসর ধরে পাড়ায় পাড়ায় জলসা হচ্ছে। শীতের দিনে সারারাত প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকে গান শুনছে দেখেছি। সিনেমার নটনটী ও গায়কগায়িকাদের দেখবার জন্যে লোকের আকুলতা দেখে অবাক লাগে।

বোম্বাই-এর কোন নটশেখরকে দেখবার জন্যে রাস্তায় এত ভিড় হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত পুলিশকে নাকি লাঠি চার্জ করতে হয়েছে। ভি-আই-পি-দের দেখবার জন্যে দমদম থেকে রাজভবন পর্যন্ত সারা পথের দুধারে কাতারে কাতারে লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করে—এ-ও তো হুজুক।

কে দেবে উত্তর?

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

যে নিজে জাগিয়া রয়
সেই যে জাগাতে পারে পরে।
ঘুমন্ত যে-জন
তার সাধ্য কোথা
অপরে জাগায়?
যদি সে নিদ্রার ঘোরে
কিংবা স্বপ্নমাঝে
কহে 'জাগো' কহে 'ভাঙ্গো ঘুম'
সেই ডাকে নিদ্রিত কি জাগে?

আজি এই উপ মহাদেশে
কিংবা পৃথিবীর বুকে
কেউ কি জাগিয়া আছে?
যদি থাকে, কেন সে ডাকে না?
যদি ডাকে কেন তার ডাকে সাড়া নেই?

কেন এই অনাচার? কেন অত্যাচার?
মানুষের মুণ্ড নিয়ে খেলা?
কেন কেউ দেখে নাকো চেয়ে
কোন বর্বরতা মাঝে শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক
দিল প্রাণ?

কেউ জেগে নেই!
তবে কে জাগাবে জনতায়?
কে জাগাবে আশা? কে ভাঙ্গিবে ভুল?
কে জানাবে 'অভীঃ' মন্ত্র?
সুপ্ত মানবতা বোধে কে দেবে চেতনা?
কে রোধিবে প্রাণ নিয়ে খেলা?
কে আনিবে শান্তি স্বস্তি?
এ প্রশ্নের
কে দেবে উত্তর?

সমুদ্রের তলায় উপনিবেশের কল্পনা

উপানন্দ

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে চাঁদে যাওয়ার গল্প লিখেছিলেন জুলভার্ণে। তখন ওটিকে মানুষ নিছক কাল্পনিক কাহিনী রূপে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু আজ মানুষ একশো বছরের মধ্যে চাঁদে যাবার উদ্যোগ পর্ব্ব সুরু করেছে, একদিন হয়তো একদল মানুষ চাঁদের মধ্যে ঢুকে যাবে। চাঁদের ভিতর গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে মানুষ যেমন উঠে পুড়ে লেগেছে, তেম্নিভাবে সে সমুদ্রের তলায় গিয়ে বসবাস করবার দিকেও খুব ঝোঁক দিয়েছে। আজ তাকে ডাকছে মহাকাশ, তাকে ডাকছে মহাসমুদ্র। একদিন সে পাখীর মত উড়তে চেয়েছিল মহাকাশে, আজ তা সম্ভব হয়েছে। সে চেয়েছিল সমুদ্রের ভেতর ডুব দিয়ে তার গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত তোলপাড় করতে, তাও বাস্তবে রূপ নিয়েছে। রূপোলি মাছের মত চলেছে সে সাগরের ভেতর ঘুরে বেড়াতে। ঋষি বলেছেন—চরৈবেতি, এগিয়ে চলো। মানুষ ঋষিবাক্য অবহেলা করেনি। আজকের মানুষ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

সমুদ্রের অতল গর্ভে চলেছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সমুদ্রের ভেতর তার কার্য্যকলাপ। এ সম্পর্কে বহু প্রতিষ্ঠান গবেষণাকার্য্যরত। তা ছাড়া গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা। ওয়ার্লড কংগ্রেস অন আণ্ডার ওয়াটার এ্যাকটিভিটিস—এর এক অধিবেশনে বলেছেন ফরাসী সমুদ্রবিজ্ঞানী জ্যাক্ ইভকুস্তো অত্যাশ্চর্য্য কথা। তিনি বলেছেন, আগামী পঞ্চাশ বছর মধ্যেই মানুষ জলের নীচে সুরক্ষিত সহর তৈরী করে বাস করবে। এই সব জলমানুষ স্থলচরের মতই অক্লেশে ঘোরা ফেরা করবে, কাজ কর্ম্ম করবে, ঘর সংসার করবে, আর নিঃশ্বাস নিতে পারবে। এখন সমুদ্রের নীচে নামতে গেলে ডাঙ্গার মানুষকে কৃত্রিম বিশেষ শ্বাসপদ্ধতিতে কাজ চালাতে হয়, তখন আর তা হবে না। যে শ্বাসক্রিয়া স্থলচরের পক্ষে এনে দেয় শ্বাসরোধজনিত মৃত্যুর অবস্থা, তা ক্রমাগত দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটনের মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ স্বাভাবিক গতিতে চালাতে থাকবে। মানুষ তখন আজকের মত ডুবুরির স্তরে থাকবে না, জল থেকে অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা চালাবে। তখন ঘট্বে তার দৈহিক বিবর্ত্তন। নাম হবে জলমানুষ। তাঁর কথা সমুদ্রতত্ত্ব-বিদ্ আর জীববিজ্ঞানীরা মন দিয়ে শুনলেন। কুস্তো আজীবন সমুদ্রসন্ধানী, নৌবিভাগে কাজ করবার সময় সমুদ্রের নীচে ডুবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কত ফটোই না তুলেছেন, সমুদ্রের অতলান্ত রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন তিনি, কাজেই সভার সকলেই তাঁর কথাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারলেন না।

সার আলিষ্টার হার্ডি আগেই সমগ্র বিশ্বকে শুনিয়েছেন সম্ভবত ষাট হাজার বছর আগে—প্রাণীরা জলের ভিতর জীবন যাত্রা অবলম্বন করেছিল, আবার তারই পুনরাবৃত্তি

হবার সময় হয়েছে, কেননা সকলের অগোচরে প্রাণী জগতে দেখা দিয়েছে অনুরূপ অবস্থার পটভূমি। সেই ষাট হাজার বছর কি তারও আগে আমরা যখন জলে বাস করতাম তখন ভগবান মৎস্য অবতার হয়েছিলেন। এম্নি ধারণা স্বভাবতই মনে জাগে। মানুষ হয়ে উঠবে হোমো একোয়াটিক্স—পায়ে চল্‌া পথ ধরে আর চলবে না, সমুদ্র তলে চলে যাবে, ডাঙ্গাতে নাও ফিরে আসতে পারে। জলের তলে গড়ে উঠবে সহর—আর নতুন সভ্যতা নতুন দিনের জল-মানুষের চেষ্টায়। এ কথাই বলেছেন কুস্তো। মন দিয়ে শুনেছেন সমুদ্রতত্ত্ববিদ আর জীববিজ্ঞানীরা। কুস্তো আজীবন সমুদ্রসন্ধানী, নৌবিভাগে কাজ করবার সময় সমুদ্রের নীচে ডুবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কত ফটোই না তুলেছেন, আর পেয়েছেন সমুদ্রের বহু রহস্যের সন্ধান। সার আলিষ্টর হার্ডি আগেই শুনিয়েছেন, সম্ভবতঃ ষাট হাজার বছর আগে প্রাণী জগতের জীবন যাত্রা সুরু হয় জলের ভেতর, আবার তারই পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আছে, কেননা সকলের অগোচরে প্রাণীজগতে বিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। সেই ষাট হাজার বছর কি তার আগে আমরা যখন জলে বাস করতাম, তখনই বোধ হয় ভগবান মৎস্য-অবতার হ'য়েছিলেন আমাদের জন্যে। সাগরমন্থনের কথা আমাদের শাস্ত্রে আছে।

যা হোক মানুষ হয়ে উঠবে হোমো-একোয়াটিক্স, স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ চলবে জলের ভেতর পায়ে চলা পথ ধরে, হেটে হেটে পা ব্যথা করতে হবে না—সমুদ্রতলে মানুষ চলে যাবে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে, ডাঙ্গাতে নাও সে ফিরে আসতে পারে। গ'ড়ে উঠবে সহর জলের তলে, আর দেখা দেবে নতুন সভ্যতা—কুস্তো এই সব কথাই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন। এঁর লেখা বই 'দি' সাইলেণ্ট ওয়ার্লড' ১৯৫৩ সাল থেকে খুব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। এই বই থেকে ছবি তুলেছে হলিউড। ছবিখানি দেখবার জন্যে বিশ্বের নানা দেশের সিনেমা হল ভরে উঠেছে অসংখ্য দর্শক জনতায়। মানুষের মনে দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য। জলের ভিতর বাস করবার কী আগ্রহই না মানুষের মনে!

কুস্তোর এখন বয়স তিপান্ন বছর। অল্পবয়স থেকেই ইনি সমুদ্রের সঙ্গে আত্মীয়তায় আবদ্ধ হয়েছেন। ওয়ার্লড আণ্ডার-ওয়াটার ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট কুস্তো বলেছেন—আপাততঃ বাস্তব চিন্তার খাতিরে মেনে নিতে হচ্ছে যে একমাইলের নীচে আমাদের শারীরিক কাঠামো নাও টি'কতে পারে। তবে আমাদের শরীর বদলে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সমুদ্রের তলায় ঘরবাড়ী তৈরী করে নতুন সংসার পাতাতে। নতুন পরিবেশের উপযোগী দৈহিক পরিবর্ত্তন কোন সাবমেরিনের ক্লিনিকে ঘটানো সম্ভব হবে বলেই কুস্তোর ধারণা ও বিশ্বাস। ইনি বলেন, পরিবর্ত্তনটা শিশু দেহে অস্ত্রোপচার করেও সম্ভব হবে।

এরই মধ্যে কুস্তোর বক্তৃতার পর সমুদ্রতত্ত্ববিদ্ ও জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান যখন হিন্দু নিধনে ব্যস্ত, তখন এঁরা সমুদ্রের তলায় কি ভাবে উপনিবেশ স্থাপন হবে সে সম্বন্ধে গবেষণায় রত। কুস্তো বলেছেন জলমানুষ কথাটার মানে হচ্ছে' মাছ-মানুষ। এর বেঁচে থাকার কোন অসুবিধে হবেনা। বাতাসে যে ভাবে আমরা অক্সিজেন নিই, জল থেকে তা সে একই ভাবে নেবে। ইনি বলেন, বৈজ্ঞানিকরাই এর ব্যবস্থা করবেন। তাঁদের আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করছে সমুদ্রের তলায় বাস করার পরিকল্পনা। ভারশূন্য অবস্থা মহাকাশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টিকরে, অনুরূপ পরিস্থিতিও ঘটতে পারে গভীর সমুদ্রতলে। দীর্ঘকাল ধরে সমুদ্রতলে প্রচুর পরিমাণে পরমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে, তেজস্ক্রিয়তা স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে মাত্রার বাহিরে চলেগেছে। আকাশে মাটিতে বা জলে এভাবে বিস্ফোরণ যে ভয়াবহ পরিস্থিতি এনে দেবে, এরূপ অভিমত ও ব্যক্ত করেছেন কুস্তো।

কুস্তোর মতামতের গুরুত্বই যে, সকল সমুদ্রতত্ত্ববিদ্ ও গবেষকই দিচ্ছেন এরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না, তবে সবাইকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমুদ্রতলে বাস করার পক্ষে সম্ভব হবে কি না অনুসন্ধান চালিয়ে গবেষণারত রয়েছেন বহুসংস্থা। সমুদ্রতলে স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা সম্ভব হোলে অনেক গুপ্তধন যে খুঁজে পাওয়া যাবে, এ সম্পর্কে সকলেই একমত। মূল্যবান ধাতুর খনির অস্তিত্ব আছে বলে অনেকের ধারণা, তা ছাড়া

পক্ষে প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়ম এমন পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে পৃথিবীর ভৌগোলিক খবরাখবর, সম্ভব হ'বে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, সম্ভব হবে অধুনালুপ্ত আদিম প্রাণীদের সন্ধান, সহজ উপায়ও বেরিয়ে পড়বে আন্ত- র্জাতিক পরিবহন বা যোগাযোগের—সামুদ্রিক গুপ্তধনের অধিকার নিয়েও চলেছে লোভাতুর মনের অনুচিন্তন।

সমুদ্রের ভিতরটা যেন স্বপ্নের দেশ—পাতালপুরীর কাহিনী শুনি আমরা অবাক হয়ে। জলপরী, শঙ্খমালা, মৎস্যকন্যা, নীল-অরণ্য, সোনালি-পাহাড় শৈশবে আমাদের মনে কতই না রেখাপাত করে। বিজ্ঞানের আনুকূল্যে আমরা যদি পাতালপুরীতে গিয়ে উপনিবেশ গড়তে পারি, মন্দকি? ডাঙার মানুষগুলো তো আজ আমাদের ধ্বংসের চেষ্টা করছে দাঙ্গাকরে, যুদ্ধ বাধিয়ে না খেতে দিয়ে, আর নরমেধযজ্ঞ করে। এদের জন্যে সুখস্বচ্ছন্দে আর শান্তিতে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে কুস্তোর পরিকল্পনা সার্থক হোলে, আমরা চলে যাবো সমুদ্রের তলায়, এদিকে তো গ্রহ নক্ষত্রে যাবারও ব্যবস্থা হচ্ছে—দেখাযাক্ কোন্ দিকে পাড়ি দেওয়া যায়।

—

কাউন্ট লিও টলষ্টয়

রচিত

দি লঙ্ এক্সাইল্

(The Long Exile)

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কথায় বলে—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে! কাজেও তাই ঘটলো! পরের দিন সকালে কয়েদখানার কুঠরীর গরাদ- আঁটা দরজা খুলে নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মে কয়েদীদের বাইরের উঠানে নিয়ে যাবার সময় ঘটনাচক্রে ঘরের কোণে গতরাত্রে মিকারের খোঁড়া সুড়ঙ্গ-পথের ফোকরটি সরকারী-পেয়াদাদের চোখে পড়ে গেল। দেখা মাত্রই তারা কয়েদখানার অধ্যক্ষের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে এ খবরটি জানালো। খবর শুনেই কয়েদখানার অধ্যক্ষ এলেন তদারকে একের পর এক সকল কয়েদীকেই কড়া-ধমক দিয়ে শাসালেন—পাজী…শয়তান কোথাকার! ভালো চাস্ তো বল্ শীগগির তোদের মধ্যে কোন্ হতভাগা এ কাজ করেছে!…খাঁটি জবাব কবুল না করলে, এমন সাজা দেবো যে…

বেশীরভাগ কয়েদীই জবাব দিলে যে তারা এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানে না…কেবল দু'চারজন কয়েদী, যারা মিকারের এই বে-আইনী কাণ্ড-কারখানার কথা একটু- আধটু জানতো তারা সবাই কঠোর শাস্তির ভয়ে কয়েদ- খানার অধ্যক্ষের কাছে সে কাহিনী বেমালুম চেপে গেল! মিকারও ঝানু-কয়েদী…সরাসরি তাকে প্রশ্ন করেও কয়েদখানার কড়া-অধ্যক্ষ গর দ-ঘেরা কুঠরীর মেঝেটি বে-আইনি ফোকর-খোঁড়ার কোনো হদিশই আদায় করতে পারলেন না। এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো আক্শ্যেনকের পানে…আক্শ্যেনক্ বেচারী তখন একা কয়েদখানার এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছিল। কয়েদখানার পেয়াদা থেকে সুরু করে কর্ত্তারা কয়েদীরা সকলেই আক্শ্যেনক্কে ধীর-শান্ত, ধার্ম্মিক আর সত্যবাদী বলে বিশেষ সুনজরে দেখত। তাই তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কয়েদখানার অধ্যক্ষ সরাসরি তার কাছে এগিয়ে এসে শুধোলেন—ওহে বুড়ো…তুমি তো শুনেছি ভারী খাঁটি-ধার্ম্মিক লোক…বলতে পারো…এই সব চোর-ছ্যাচোড় পাজী বদমাইসগুলোর মধ্যে যে হতভাগা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবার মতলবে কুঠরীর মেঝেতে ফোকর খুঁড়েছে?…

আক্শ্যেনকের খানিক দূরেই দাঁড়িয়েছিল মিকার কয়েদখানার অধ্যক্ষের শাসানী শুনেই তার বুকের ভিতরটা আতঙ্কে কেঁপে উঠলো…এই বুঝি আসল-কথাটা ফাঁস হয়ে যায় শেষ পর্য্যন্ত! এতটুকু টুঁ-শব্দটি না করে উদ্বিগ্ন- দৃষ্টিতে সে তাকালো আক্শ্যেনকের পানে!

কয়েদখানার অধ্যক্ষের প্রশ্ন শুনে আক্শ্নেক্ পড়লো মহা-সমস্যায়! মনে-মনে সে ভাবলো,—তাই তো···কি করি!···আসল কথা সব যদি খুলে বলি তো মিকারের আর রক্ষা নেই···শাস্তি অনিবার্য্য!···অথচ সত্য কথা না বললেও ওদিকে ঈশ্বরের কাছেও অপরাধী হতে হয়, আর কয়েদখানার চাবুক-প্রহারের শাস্তি থেকেও নিস্তার মিলবে না! কাজেই উপায় কি?···তবে মিকার যে অপরাধী—সন্দেহ নেই! শুধু লুকিয়ে কয়েদখানার কুঠুরীর মেঝেতেই যে সে অন্যায়ভাবে পালানোর পথ খুঁড়ে অপরাধ করেছে তাই নয়···বিনা দোষে আমার সারা জীবনটাও এই কয়েদখানার কয়েদী হয়ে কলঙ্ক-দুর্দ্দশার গ্লানিতে সর্ব্বনাশ করে দেবার জন্যও পুরোপুরি দায়ী সে!···মিকারকে ক্ষমা···তাকে রক্ষা করবো আমি! ···কেন?···কি জন্য?···তার অপরাধের ফলে, দীর্ঘ এতগুলো বছর মুখ বুজে যে অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে আসছি আমি···এবারে মিকার নিজে হাড়ে-হাড়ে সে জ্বালা অনুভব করুক! তবেই সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করবে—অন্যায়ভাবে অকারণে অপরের জীবন চির-বিপন্ন করার প্রতিফল!···না মিকারের অন্যায়-অপরাধের ক্ষমা নেই···আমার এই দুর্দ্দশা-ভোগের দাম তাকেও দিতে হবে তিলে-তিলে দুর্দ্দশা-ভোগ করেই···তবেই কড়াক্রান্তিতে উশুল হবে তার অন্যায়-আচরণের বাকী-বকেয়া হিসাব!

বুড়ো আক্শ্নেক্‌কে এমনি গভীর চিন্তায় বিভোর হয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কয়েদখানার অধ্যক্ষ বিরক্তি-ভরে ধমকে উঠলেন,—কৈ হে···কোনো জবাব দিচ্ছো না যে?··কথাটা কানে যায়নি বুঝি?···চটপট বলে ফেলো তো সত্যি কথাটা···কোন হতভাগা শয়তান এই কয়েদখানার কুঠুরীতে এমন ফোকর খুঁড়ে রেখেছে!···

কয়েদখানার অধ্যক্ষের কড়া-ধমকে আক্শ্নেকের চমক ভাঙলো···ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে সে যেন কি ভাবলো!···তারপর শান্ত-কণ্ঠে ধীরে ধীরে জবাব দিলে,—এ কাজ কে করেছে—আমি জানি!···কিন্তু তার নাম আমি বলবো না কারো কাছে!

আক্শ্নেকের জবাব শুনে কয়েদখানার অধ্যক্ষ বিরক্তিভরে রুষ্ট-কণ্ঠে শুধোলেন,—তার মানে?···

অবিচলিত কণ্ঠে স্থিরভাবে আক্শ্নেক্ বললে,—ভগবানের আদেশ নেই···তাই তার নাম আমি প্রকাশ করবো না কোনোমতেই! এজন্য আপনি আমাকে যে শাস্তি দিতে চান···দিন—মাথায় পেতে নেবো···আপনার শাসনাধীন কয়েদী আমি!···তবে কয়েদখানার কুঠুরীতে লুকিয়ে ফোকর খুঁড়েছে যে, তার নাম আমি বলবো না!

আক্শ্নেকের স্পষ্ট জবাব শুনে কয়েদখানার অধ্যক্ষ রাগে-আক্রোশে জ্বলে উঠলেন···ক্ষিপ্তকণ্ঠে ধমক দিলেন,—বটে! এতখানি স্পর্দ্ধা!···এখনি শায়েস্তা করছি তোমায়···

অবাধ্যতার অপরাধে কয়েদখানার অধ্যক্ষের আদেশে আক্শ্নেকের নির্ম্মম-শাস্তির ব্যবস্থা হলো···কিন্তু শান্ত্রী-পেয়াদাদের প্রবল পীড়ন ও শত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তার মুখ থেকে কোনোমতেই মিকারের নাম প্রকাশ করা সম্ভবপর হলো না! এমন কি জুলুম চালিয়ে ভয়-দেখিয়ে, ফন্দী-ফিকির খাটিয়ে কোনো কৌশলেই কয়েদখানার কর্ত্তা-পেয়াদারা কেউ আক্শ্নেকের মুখ থেকে একতিল খবর আদায় করতে না পেরে অবশেষে হাল ছেড়ে দিলেন।

এত হাঙ্গামা-ঝঞ্ঝাটের ফলেও, আক্শ্নেকের ধীর-শান্ত ধার্ম্মিক-স্বভাবের এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটলো না···আগের মতোই সে একা চুপচাপ কয়েদখানার নিরালা-কোণে আপন-মনে নিত্য-নৈমিত্তিক হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর কাজ আর অবসর-সময়ে ঈশ্বরের নাম-গান করেই দিন কাটাতে লাগলো।

একদিন নিশুতি-রাতে কয়েদখানার তালাবন্ধ কুঠুরীতে তক্তার শয্যায় শুয়ে কয়েদীরা সবাই তখন নিদ্রায় অচেতন···আক্শ্নেকের চোখেও সবেমাত্র তন্দ্রার আমেজ এসেছে, এমন সময় হঠাৎ তার হুঁশ হলো, কে যেন চুপিচুপি এসে শয্যার পদ-প্রান্তে দাঁড়ালো। আক্শ্নেকের তন্দ্রা গেল ঘুচে······অন্ধকারের মাঝেই আগন্তুকের পানে ভালো করে তাকিয়ে দেখে—মিকার! এত রাতে মিকারকে চুপিচুপি শয্যার প্রান্তে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখে আক্শ্নেক্ চমকে উঠলো···চাপা-

গলায় পরুষকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কি মতলব তোমার? এত রাতে…এভাবে চোরের মতো?

মিকার কিন্তু নিস্তব্ধ…কোন জবাব দিলে না সে… যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই রইলো!

তার এই অদ্ভুত আচরণ দেখে আক্‌শ্যেনক্ ধড়মড় করে শয্যা ছেড়ে উঠে বসলো…চাপা-গলায় ধমক দিয়ে বললে, —কি চাও তুমি?…শীগগির বলো…নাহলে এখনি শান্ত্রী-পেয়াদাদের ডেকে…

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই, মিকার আক্‌শ্যেনকের আরো কাছে সরে এসে চাপা-স্বরে মিনতি জানিয়ে বললে, —ইভান্ দিমিত্রিচ্…আক্‌শ্যেনক্…আমাকে ক্ষমা করো …ক্ষমা করো!

মিকারের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে আক্‌শ্যেনক্ তো অবাক্! বিস্ময়-দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে সে বললে,—ক্ষমা?…তোমায় ক্ষমা করবো?… কেন?…

মিকারের দু'চোখ অশ্রু-সজল…আক্‌শ্যেনকের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ে অনুতপ্তভাবে সে বললে,— তোমার এই কলঙ্ক…এতখানি দুর্দ্দশা…সারা জীবনটা তোমার যে এভাবে তছনছ হয়ে গেল…সে সবই আমার জন্য…আমারই দোষে! আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে, সেবার নিজনিহির-শহরের মেলায় বেশাতী-বেচতে যাবার পথে নিশুতি রাতে গাঁয়ের সরাইখানায় সহচর-সঙ্গী সেই ঘুমন্ত সদাগর বেচারীকে আমিই খুন করেছিলুম—নিজের হাতে তার বুকে ধারালো ছোরা হেনে!…পাছে ধরা পড়ি, এই ভয়ে আমার হাতের সেই রক্ত মাখানো ছোরাখানাকে চুপিচুপি লুকিয়ে রেখেছিলুম তোমার তোরঙ্গের ভিতরে।…তোমাকেও খুন করতে এগিয়েছিলুম…কিন্তু, এমনই বরাত জোর তোমার যে বুকে ছোরাখানা গেঁথে দেবো…হঠাৎ বাইরে কি যেন একটা শব্দ শুনলুম…তাই তাড়াতাড়ি হাতের ছোরাখানা তোমার তোরঙ্গের মধ্যে গুঁজে রেখে ঘরের জানলা টপ্‌কে সোজা চম্পট দিয়েছিলুম…কেউ এতটুকু ধারণাও করতে পারেনি যে আসল-খুনী কে!…

মিকারের কথা শুনে আক্‌শ্যেনক্ স্তম্ভিত হয়ে গেল …কি বলবে, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারলো না… পাথরের মূর্ত্তির মতো স্তব্ধ হয়ে সে অপলক-দৃষ্টিতে মিকারের পানে তাকিয়ে রইলো।

মিকারের চোখে তখন জলের ধারা নেমেছে…আবেগ ভরে দু'হাতে আক্‌শ্যেনকের পা দুটি জড়িয়ে ধরে সে মিনতি জানালো,—ইভান্…ইভান্…আমাকে ক্ষমা করো …আমাকে ক্ষমা করো…মিথ্যা-অপরাধে তোমাকে দোষী বানিয়ে যে অপরাধ আমি করেছি—তার ক্ষমা নেই· জানি!…তবু…তবু…তুমি আমায় ক্ষমা করো!…ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—কয়েদখানার কর্ত্তাদের কাছে সব কথা আমি খুলে বলবো…নিজের দোষ কবুল করবো… বলবো—সে রাতে সরাইখানায় আমিই সেই ঘুমন্ত-সদাগরের বুকে ছোরা বসিয়ে খুন করেছি…আমিই আসল খুনী…আসামী…শাস্তি আমারই পাওয়া উচিত—তোমার নয়! সব কথা শুনলে, তাঁরা জানবেন—তুমি নির্দ্দোষ… মিথ্যা-অপরাধে অকারণেই এতকাল কয়েদখানায় বন্দী হয়ে রয়েছো!…তাঁরা তোমায় মুক্তি দেবেন…তুমি আবার ফিরে যেতে পারবে দেশে…তোমার নিজের ঘরে… তোমার বৌ আর ছেলেমেয়েদের কাছে!

মিকারের কথা শুনে উদার-দৃষ্টিতে কয়েদখানার গরাদ-আঁটা ফটকের বাইরে রাতের অন্ধকার আকাশের পানে তাকিয়ে হতাশভাবে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে আক্‌শ্যেনক্ বললে—আমার বৌ…আমার ছেলেমেয়ে!…তারা আজ কোথায়…কে জানে!…ফিরে যাবো…তাদের কাছে!… এতকাল পরে! কোথায় যাবো!…স্ত্রী স্ত্রী আমার বেঁচে নেই আজ!…আর ছেলেমেয়েরা…তারাও সবাই এতদিনে ভুলে গেছে আমায়!…নিজের ঘর…তাও নেই আমার… সবই হারিয়েছি আমি—এখানে এই কয়েদখানায় কয়েদী হয়ে এসে! কোথাও যাবার আজ জায়গা নেই আমার এতটুকু—এই বিরাট দুনিয়াতে!…কয়েদখানার এই কুঠরী ছেড়ে কোথাও যাবার কোনো বাসনা নেই আমার!… জীবনের বাকী দিনগুলো এমনিভাবে এখানে পাথর-ঘেরা এই কয়েদখানার কন্দরেই…

অ্যাক্‌শ্যেনকের বাকী কথা শেষ হবার সুযোগ মিললো না…অঝোর-ধারে কাঁদতে কাঁদতে আকুলভাবে অ্যাক্‌শ্যেনকের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে মিকার বললে,—না, না, না ইভান্…আমায় ক্ষমা করতেই হবে! তোমার উপর

যে অন্যায় আমি করেছি, তার জন্য সারাক্ষণ কি অসহ্য অন্তর্জ্জ্বালা যে ভোগ করছি, তা তুমি বুঝবে না! প্রতি মুহূর্ত্তে এ যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে, আজীবন কয়েদখানায় বন্দী হয়ে মুখবুজে হাড়ভাঙা খাটুনীর কষ্ট আর পেয়াদাদের চাবুক-প্রহারের জ্বালা সহ্য করা অনেক ভালো! দুঃসহ এই অন্তর্জ্জ্বালা থেকে আমায় মুক্তি দাও, ইভান্ দিমিত্রিচ্ ··ক্ষমা করো আমাকে!··পাপের বোঝা আর আমি বইতে পারি না·আমায় বাঁচাও···মনে শান্তি পেতে দাও!···আমি শয়তান···ক্ষমারও অযোগ্য···তবু···আমায় ক্ষমা করো তুমি!···ক্ষমা করো···দোহাই!

মিকারের কান্না দেখে অ্যাকৃশ্বেনকের দু' চোখেও জল ভরে এলো। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে, মমতা-ভরে মিকারের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে শান্তকণ্ঠে সে বললে,—তুচ্ছ মানুষ আমি···আমি তোমাকে ক্ষমা করবার কে!·· মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন, ভাই··তাঁর কাছেই শুধু ক্ষমা মেলে!

ঈশ্বরের কথা মনে জাগতেই, অ্যাক্শ্যেনকের অশান্ত-বিক্ষুব্ধ মন অপূর্ব্ব শান্তিতে ভরে উঠলো···কয়েদখানার উঁচু পাঁচিলের ওপারে অন্ধকার আকাশের কোণে চুম্‌কীর মতো জল্‌জলে শেষ-রাতের ছোট্ট তারাটির পানে অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে একমনে ঈশ্বরের নাম-গান করতে লাগলো!

* * *

পরের দিন সকালে পেয়াদারা এসে কয়েদীদের কুঠরীর গরাদ-আঁটা লোহার ফটক খুলতেই মিকার ব্যাকুলভাবে ছুটে গেল কয়েদখানার কর্ত্তার কাছে। সেখানে হাজির হয়ে সে তার পুরোনো অপরাধের কাহিনী আগাগোড়া খুলে বলে কয়েদখানার কর্ত্তার কাছে নিরপরাধী অ্যাক্-শ্যেনক্‌কে বেকসুর মুক্তিদানের জন্য আবেদন জানালো।

মিকারের কৈফিয়ৎ শুনে কয়েদখানার কর্ত্তা অবশেষে আসল খুনী-আসামীর সঠিক পরিচয় পেয়ে মনে মনে খুবই অনুতপ্ত হলেন···মিকার আর শান্ত্রী-পেয়াদাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আর একমুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে সটান এসে হাজির হলেন কয়েদখানার কুঠরীতে—বৃদ্ধ কয়েদী অ্যাকশ্যেনকের কাছে।

কিন্তু মুক্তি দেবেন কাকে?···কয়েদখানার কুঠরীতে এসেই সবাই দেখেন—কঠিন কাঠের তক্তার শয্যায় পরম শান্তিতে চোখ দুটি মুদে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে বৃদ্ধ-কয়েদী অ্যাক্শ্যেনক্···প্রাণের তিলমাত্র স্পন্দন নেই তার দেহে, তবু ঠোঁটের কোণে তখনও সুস্পষ্ট ফুটে রয়েছে ম্লান হাসির রেখা··· যেন স্বপ্নের ঘোরে অপরূপ আনন্দে ভরে উঠেছে তার মন।

সমাপ্ত
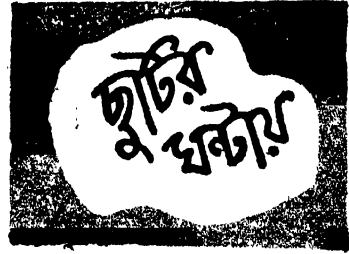
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের আরেকটি আজব-মজার খেলার কথা বলছি। এ খেলাটির নাম দেওয়া যেতে পারে—'ঘূর্ণীজল আর ছিপির কারসাজি'। খেলাটি খুবই অভিনব···সামান্য চেষ্টা করলেই, তোমরা অনায়াসেই এ কারসাজি দেখিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের অনায়াসেই তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

এ খেলাটি দেখানোর জন্য বিশেষ কিছু সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই··শুধু একটি ছিপি-সমেত বড় সাইজের কাঁচের বোতল, লম্বা একটি লোহার তার কিম্বা পশম-বোনার কাঠি, 'কর্কের' (cork) তৈরী পাত্‌লা ছাঁদের আরেকটি ছিপি এবং একপাত্র জল জোগাড় করলেই কাজ
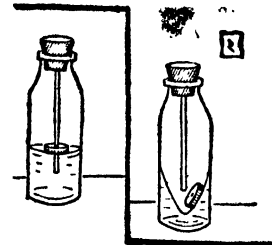
মিটবে। ফর্দ্দমতো এই সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ হবার পর, উপরের ১নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে,

ঠিক তেমনিভাবে বোতলটি অর্দ্ধেক জলে ভরাট করে নাও। তারপর বোতলের ছিপির নীচে গর্ত্ত করে সেই গর্ত্তে লম্বা লোহার তার অথবা পশম-বোনার কাঠিটিকে এঁটে দাও। তবে নজর রেখো—বোতলের ছিপির নীচে গর্ত্তের ভিতরে লম্বা লোহার তার বা পশম-বোনার কাঠিটি এঁটে দেবার সময়, সেটিকে এমন কায়দায় বসাতে হবে যে তার প্রান্তভাগটি যেন জল-ভর্ত্তি কাঁচের বোতলের তলদেশ থেকে অন্ততঃপক্ষে ইঞ্চিদুয়েক উপরে থাকে বরাবর। এ কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে সারা হলে, অপেক্ষাকৃত ছোটসাইজের অন্য ছিপিটির মাঝখানে পরিপাটি ছাঁদে বেশ বড় একটি গর্ত্ত রচনা করে, সেই গর্ত্তের মধ্যে দিয়ে উপরের ১নং ছবির ভঙ্গীতে বোতলের ভিতরে-রাখা ঐ লম্বা লোহার তার বা পশমের কাঠিটি পরিয়ে দাও। তাহলেই উপরের ১নং ছবির ছাঁদে বোতলের ভিতরে-রাখা লম্বা ঐ লোহার তার বা পশম-বোনার কাঠিটির নীচের প্রান্তে ছোট সাইজের 'কর্কের' ছিপিটিকে সহজেই এঁটে বসানো যাবে। 'কর্কের ছিপিটিকে এভাবে এঁটে বসানোর সময় কিন্তু বিশেষ নজর রাখতে হবে—'কর্কের' ছিপির মাঝখানে যে গর্ত্তটি রচনা করেছো, সেটির ভিতর দিয়ে লোহার তার বা পশমবোনার কাঠিটি যেন অবাধে অনায়াসেই উপরে ও নীচে যাতায়াত করতে পারে। কারণ, এ কাজে ত্রুটি ঘটলেই, কারসাজির মজাটুকু একেবারে পণ্ড হয়ে যাবে। সুষ্ঠুভাবে এ সব কাজ সারতে পারলেই—উদ্যোগ-পর্ব্বের ব্যবস্থাদি শেষ হবে।

এবারে আসরে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে খেলার আজব-কারসাজি দেখানোর পালা। খেলা-দেখানোর সময়, ম্যাজিসিয়ানদের মতো বেশ মুরুব্বী-ভঙ্গীতে দর্শকদের সাদরে আহ্বান জানিয়ে বলবে যে তাঁদের মধ্যে এমন কেউ আছেন, যিনি জল-ভর্ত্তি কাঁচের বোতলের ভিতরকার লোহার ঐ লম্বা তার বা পশম-বোনার কাঠির নীচের প্রান্তে এঁটে বসিয়ে-রাখা 'কর্কের' ছিপিটিকে কোনোভাবে হাতে দিয়ে স্পর্শ না করে সুকৌশলে সেটিকে কাঠি থেকে খুলে এনে সহজেই জলের বুকে ভাসিয়ে দিতে পারেন! খেলার কলা-কৌশলের মর্ম্ম অজানা থাকার ফলে, দর্শকদের সকলেই যখন বারবার চেষ্টা করেও এ কাজ হাসিল করতে পারবেন না···তখন হাসিমুখে এগিয়ে এসে আসল-কারসাজিটি দেখিয়ে তাঁদের তাক্ লাগিয়ে দাও। অর্থাৎ,—সটান আসরে দর্শকদের সামনে-রাখা টেবিলের কাছে সরে এসে ছিপি-আঁটা জল-ভর্ত্তি কাঁচের বোতলটিকে সযত্নে হাতে তুলে নাও এবং উপরের ২নং ছবির ভঙ্গীতে বোতলটিকে ধরে বারকয়েক বেশ সজোরে ঘূর্ণীপাক দিয়ে ঘুরিয়ে, পুনরায় সেটিকে টেবিলের উপরে খাড়াখাড়িভাবে বসিয়ে রেখে দাও। তাহলেই দেখবে—এভাবে ঘূর্ণীপাকের ফলে, বোতলের ভিতরকার জলটুকুও সজোরে ঘুরতে সুরু করেছে এবং সেই ঘোরার দরুণ—উপরের ২নং ছবির ভঙ্গীতে বোতলের ভিতরে কাঁচের-দেয়ালের গায়ের দিকের জল ক্রমশঃ উচ্ছ্বলে উঁচু হয়ে উঠছে, আর বোতলের মাঝখানের জল নীচে তলিয়ে চলেছে। ঘূর্ণীপাকের ফলে বোতলের ভিতরকার জল যত বেশী জোরে ঘুরবে, মাঝ-খানের নিম্নতা ততই বেশী গভীর হবে এবং এই কারণেই লম্বা লোহার তার বা পশম-বোনার কাঠিতে এঁটে-রাখা ফুটো-সমেত 'কর্কের' ছিপিটিও ক্রমশঃ জলের ঘূর্ণীপাকের এই উর্দ্ধ-নিম্নগতির স্রোতাকর্ষণে বোতলের মাথার উপরকার ছিপিতে-আঁটা লম্বা লোহার তার বা পশম বোনার কাঠির প্রান্তদেশ থেকে নিজেনিজেই দিব্যি সহজেই উন্মুক্ত হয়ে আসবে—কারো হাতের স্পর্শমাত্রও প্রয়োজন নেই!

'ঘূর্ণীজল আর ছিপির কারসাজির' এই হলো আসল রহস্য।

মনোহর মৈত্র

১। আজব হেঁয়ালি

উপরের ঐ গোলাকার-চক্রের ছবিটির ভিতরে এলো-মেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে বাংলা ভাষায় লেখা মোট ৪৮টি বিভিন্ন ধরণের হরফ। বুদ্ধি খাটিয়ে এই হরফগুলি যদি যথাযথভাবে সাজাতে পারো। তাহলে সহজেই খুঁজে পাবে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিশিষ্ট-অংশ গ্রহণ করেছিলেন এমন পাঁচজন বিখ্যাত দেশ-সেবক ও দেশ-সেবিকার নাম। এখন চেষ্টা করে ছাখো তোমরা—যদি ঐ উপরের ছবিতে দেখানো 'হেঁয়ালি-চক্রের' ভিতর থেকে ভারতের বিশিষ্ট নেতা ও নেত্রীদের প্রত্যেকের নাম সঠিকভাবে খুঁজে বার করতে পারো।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

এক পায়ে দাঁড়িয়ে
ঘোরে বনবনিয়ে,
শিশুদের প্রিয় খেলা…
বলে ফ্যালো এই বেলা!

রচনা : দিলীপকুমার ও রঘুনাথ দত্ত
(বাঁশবেড়িয়া)

৩। দেখিতে সুন্দর অতি, বনমাঝে রয়,
মস্তক উপরে তার ডালপালা হয়।
নিরামিষভোজী সে যে—খায় ঘাস-পাতা,
ল্যাজটি কাটিলে হন—আরাধ্য-দেবতা!

রচনা ঃ—চম্পারাণী ধর
(কলিকাতা)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র
উত্তর ঃ

১। উপরের ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে, ঠিক তেমনি-ভাবে 'হেঁয়ালী-ছবির' বিশেষ-বিশেষ জায়গাগুলি রঙীণ কালি বা পেন্সিলের দাগ টেনে ভরাট করে দিলেই, সহজেই চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা 'ছুটন্ত-কুকুরের' চেহারার সন্ধান মিলবে।

২। নিশাচর

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক
উত্তর দিয়েছে ঃ

সুষমা, পুতুল, টাবলু ও হাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), কুলু মিত্র (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), পুপু ও ভুটন (কলিকাতা), সত্যেন, মুরারি, সঞ্জয় ও সুনীল (ভিলাই), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক
উত্তর দিয়েছে :

শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), পিণ্টু, বুতাম ও বাপি গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক
উত্তর দিয়েছে ঃ

পুলিন, রহমান, সন্তোষ ও মজিবর (বড়ফালিমারি), চৈতালী ও মিঠু বসু (কলিকাতা), বাণী, গদাই, খোকা, বুলু, বুড়ো, গোপা, মুনি ও মঞ্জু (কলিকাতা)।

সিমলার পথে

শতদল গোস্বামী

শীতকালে সাধারণত কেউ সিমলায় বেড়াতে যায় না। তা সত্ত্বেও আমি যে যাব সে বিষয়ে অনেকদিন আগেই মন স্থির করে রেখেছিলাম। নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতা থেকে চণ্ডীগড় যাচ্ছি—আর সেখান থেকে সিমলা ঘুরে না এলে ভ্রমণ তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং প্রচণ্ড, সাংঘাতিক, কল্পনাতীত ইত্যাদি নানা বিশেষণে শীতের ভয়াবহ ভয়ঙ্কর রূপটি ফুটিয়ে তোলা সত্ত্বেও আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে না পারায় হিতৈষীরা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল।

বলাবাহুল্য, শীতকালে শৈল শিখরে বাস করার অভিজ্ঞতা আমার এই হিতৈষীদের কারো ছিল না। আমারও না। তবে মনে জোর রেখেছিলাম এই ভেবে—শীতকালে সিমলা-বাসীরা যদি সেখানে কাটাতে পারে, আমিই বা পারবনা কেন। এই যুক্তিটা অবশ্য সর্বজনগ্রাহ্য নয়, এ-নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী তর্কাতর্কিও চলতে পারে। আমি অবশ্য যুক্তিতর্কের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি সিমলা যাওয়াই স্থির করলাম।

চণ্ডীগড়ে এবার ডেলিগেটের সংখ্যা প্রচুর হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সিমলা বেড়াতে যাবেন শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। পুরনো এম-এল-এ হোস্টেলের তিনতলার একটি কক্ষে আমরা পাঁচবন্ধু স্থান পেয়েছিলাম। শচীন দত্ত, অনিল সেন, সজল সিংহ, বৈদ্যনাথ মাহাতো এবং আমি। আমরা এই পাঁচজন একত্রে সিমলা ভ্রমণ করব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিল ছাড়া আর তিন বন্ধুর মত পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁরা এ-যাত্রায় আর সিমলা ভ্রমণে যেতে পারছেন না। কেননা, ওঁরা খবর পেয়েছেন সিমলায় নাকি এখন দারুণ বরফ পড়ছে, অত্যধিক ঠাণ্ডায় তাঁরা কাহিল হয়ে পড়তে রাজী নন। বেঁচে থাকলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্ধুদের মত পরিবর্তনে কিছুটা নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। উৎসাহ দিল অনিল। বলল, ঘাবড়াবার কারণ নেই। এ-দেশের শীতের সঙ্গে কয়েক দিনেই আমাদের

'সিমলার পথে' প্রবন্ধের ফটোগ্রাফ লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

বেশ হৃদ্যতা জমে গেছে। এ-শীতে অসুখ করেনা। আর করলেও, তার দাওয়াইও সঙ্গেই আছে। অমোঘ এবং অব্যর্থ—মকরধ্বজ। সর্দি কাসি জ্বরজ্বর ভাব, এক পুরিয়াতেই যথেষ্ট। তা ছাড়া হার্টের পক্ষেও এটা ধন্বন্তরী।

শুনে ভরসা হল।

২৬শে ডিসেম্বর সম্মেলন শেষ হল। ঐ দিন সকালে ভাখরা ও নাঙ্গল বাঁধ দেখতে গিয়েছিলাম, ফিরলাম অনেক

রাতে। পরদিন বন্ধুত্রয় আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন। অনিলকে সঙ্গে নিয়ে চললাম বাস-স্ট্যাণ্ডে। কিন্তু সিমলার টিকেট সেদিন মিলল না। পরদিন সকালের বাসের টিকেটও বিক্রি হয়ে গিয়েছিল—অগত্যা দুপুরের বাসে দুটো সীট অগ্রিম রিজার্ভ করে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

২৭শে সারাদিন এবং ২৮শে একবেলা চণ্ডীগড়েই থাকতে হবে। সম্মেলন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব বাসস্থানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। ল' কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সরকার মশায় আশ্বাস দিয়েছিলেন—ডেলিগেটরা ইচ্ছে করলে তাঁর কলেজ হোস্টেলে যতদিন খুশি কাটাতে পারেন। অতএব আমরা দু-জন ল' কলেজ হোস্টেলে গিয়ে উঠলাম। কয়েকজন ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন, চা খাওয়ালেন।

গত পাঁচদিনে চণ্ডীগড়ের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেছি। পাহাড়সংলগ্ন এলাকায় পাঞ্জাবের নতুন রাজধানী গড়ে উঠছে। সর্বত্রই কর্মচাঞ্চল্য। শহরটি নানা এলাকা বা সেক্টরে ভাগ করা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথ ঘাট, নানা ডিজাইনের ঘরবাড়ি, প্রতিটি বাড়িতে ফুল বাগান। ইউনিভার্সিটি, সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট, বিধান সভা, রবীন্দ্রভবন, হাসপাতাল প্রভৃতি ইমারতগুলি দেখবার মতো। ডাল-হ্রদের অনুকরণে এখানে একটি আকর্ষণীয় লেক তৈরি করা হয়েছে। বেড়ানোর পক্ষে এই পরিকল্পিত শহরটি অদূরভবিষ্যতে ভারতের অন্যতম প্রধান শহরের মর্যাদা পাবে—সে বিষয়ে দ্বিমতের কারণ নেই।

২৮শে ডিসেম্বর। সিমলার বাস ছাড়বে বেলা ১টা ১৫ মিনিটে। বেলা ১২টার মধ্যেই আমরা বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে হাজির হলাম। ডেলিগেটদের প্রধান অংশ পূর্বেই বাস বা ট্রেন যোগে সিমলা রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। আমরাই বোধ হয় শেষ দল। না, শেষ মুহূর্তে আরও কিছু ডেলিগেটের দর্শন পাওয়া গেল।

এই বাস-স্ট্যাণ্ড বা বাসের আড্ডা থেকে বিভিন্ন শহরে বাস যাতায়াত করে। পাতিয়ালা, কাল্কা, সিমলা, আম্বালা, দিল্লি, জলন্ধর, অমৃতসর প্রভৃতি নিকট ও দূরপাল্লার পথে যেতে হলে এই বাস ভ্রমণ যেমন অপরিহার্য, তেমনি আরামদায়ক। এখানে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ওঠা নামা লক্ষ্য করছিলাম, এমন সময় স্যুট-কোট পরিহিত এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে জিগ্যেস করলেন, আপনারা কি সবাই সিমলা যাচ্ছেন?

যাচ্ছি শুনে তিনি শিউরে উঠে বললেন, আমার কথা শুনুন, যাবেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধ দম্পতি যাচ্ছিলেন, তাঁদের দিকে ইসারা করে এই হিতৈষী-ভদ্রলোক বললেন, ঠাণ্ডা মশায়, ঠাণ্ডা। সিমলায় বরফ পড়ছে, সে যে কি নিদারুণ ঠাণ্ডা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি কলকাতার 'অমুক' ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভ—বছরে তিনবার আমাকে এ-অঞ্চলে ঘুরতে হয়। এখানকার শীতের অভিজ্ঞতা আপনাদের নেই, আমার আছে। তাই বলছি ফিরে যান। এই শীতে সিমলায় গেলে নির্ঘাৎ ওঁরা 'কোলাপ্‌স' করবেন।

এই দম্পতির দুই পুত্রও সঙ্গে যাচ্ছিলেন। একজন বললেন, সোয়েটার-কোট-ওভারকোট-গরমচাদর-মাঙ্কি-ক্যাপ-মাফলার ইত্যাদি আটরকম গরম পোশাক পরেছেন বাবা, তা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা লাগবে?

ভদ্রলোক গর্জন করে বললেন, লাগবে। আপনাদের অভিজ্ঞতা নেই, কিছু জানেন না। সিমলায় গিয়ে বুঝতে পারবেন—সে কি বরফের রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। রাতে যখন হিমপ্রবাহ বইবে, আর লেপ-কম্বলের তলায় শুয়েও যখন ঠকঠক করে কাঁপবেন—তখন ঠ্যালা বুঝতে পারবেন।

হঠাৎ চেয়ে দেখি পাশে অনিল নেই। কোথায় গেল? না, বেশিদূর যায়নি। একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে এক পুরিয়া মকরধ্বজ বের করে মুখে ঢেলে দিল। তারপর এক টুকরো আদা কচকচ করে চিবুতে লাগল। চোখাচোখি হতে বলল, শিল-নোড়াও সঙ্গে আছে, কিন্তু এখন আর ওষুধ ঘষার সময় নেই।

নির্দিষ্ট সময়ে বাস ছাড়ল। চণ্ডীগড় থেকে সিমলার দূরত্ব ৭২ মাইল। যেতে ছ'ঘণ্টা লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পিঞ্জোরের বিখ্যাত মোগল উদ্যানের পাশ কাটিয়ে কাল্কায় গিয়ে পৌঁছুলাম। এখান থেকে কিছু

কমলালেবু, কলা ও লজেন্স কিনলাম। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে বাস পুনরায় চলতে শুরু করল। এইবার সত্যিকার পর্বত আরোহণ আরম্ভ হল।

যতই উপরে উঠছি নতুন বিস্ময় আর চমকে অভিভূত হয়ে পড়ছি। পাহাড়ের অনুপম সৌন্দর্য, নির্মেঘ ঘোলাটে আকাশ, কখনও সূর্য পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে, কখনও বা প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত সূর্য-কিরণের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে পাহাড়ের চূড়া আলোকিত হয়ে উঠছে। সতর্ক হাতে বাস চালাচ্ছে সর্দারজি, তার হাতেই আমাদের পঞ্চাশজন প্রাণীর ভাগ্য নির্ভর করছে। একটু অসতর্ক হলে আর কথা নেই, যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রতি মুহূর্তে বাসের গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে—কখনও উপরে উঠছে, কখনও নিচে নামছে, আর অনবরত বাঁক ঘুরছে। এই বাঁকের মুখে কতবার যে আমাদের বাস উপর থেকে আগত মিলিটারি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে হতে 'একটুর জন্য' রেহাই পেয়েছে, তার হিসেব নেই। কোথাও দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কুটির, কোথাও বা বহু নিচে সঙ্কীর্ণ জলাশয়। কোনো পাহাড় রুক্ষ কর্কশ, কোনোটায় বা সবুজের সমারোহ। উঁচু নিচু পাহাড়ের গাত্র কি ভাবে যে এ-দেশী লোকেরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, না দেখলে কল্পনা করা যায় না। পাইন ও অন্যান্য দীর্ঘদেহী বৃক্ষশ্রেণী সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গলা আর পা দুটি যত দূর সাধ্য সম্মুখে প্রসারিত করে গোরু-ছাগল সন্তর্পণে ঘাস পাতা অন্বেষণ করে চলেছে। উল্লেখযোগ্য ফুলের সমারোহ চোখে না পড়লেও বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি ও নানা জাতীয় পাখির দেখা মাঝে মাঝেই পাওয়া যাচ্ছে। শুকনো ডাল পালা মাথায় করে ঘরে ফিরে চলেছে পাহাড়ী মেয়ে পুরুষ। হৃষ্ট-পুষ্ট কুকুর পথের পাশে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে বাসের দিকে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়ছে। কোনো কোনো উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মাথায় বরফ জমেছে। কখনও বা রেল লাইনের পাশ কাটিয়ে কখনও বা তাকে উঁচু বা নিচু রেখে বাস এগিয়ে চলেছে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় পাহাড়-গুলিকে মনোরম দেখাচ্ছে। আর কাঁচের জানালার ফাঁক দিয়ে অবাঞ্ছিত শীতল হাওয়া ঢুকে যাত্রীদের সন্ত্রস্ত করে তুলছে।

এ-পথে ধরমপুর একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে পাহাড়ের গায় প্রচুর ঘরবাড়ি ছবির মতো সুন্দর দেখায়। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে কসৌলীতে একটি আদর্শ স্বাস্থ্য-নিবাস গড়ে উঠেছে। এরপর সোলন, সোলনেও অনেক ঘরবাড়ি দোকান চোখে পড়ল। এখানে বাস বেশ কিছুটা সময় বিশ্রাম নেয়। আমরা বাস থেকে নামলাম। চা খেলাম। বাদাম ভাজা, মিষ্টি এবং মুড়ি কিনলাম। কলের জলে হাত ধুতে গিয়ে টের পেলাম বরফ জলে হাত দিয়েছি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম, এবার কাঁপুনি শুরু হল। তাড়াতাড়ি বাসে গিয়ে ঢুকলাম।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে হেডলাইট জ্বালিয়ে বাস সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাসভ্রমণের প্রথম পর্বে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার যে আনন্দ আর উত্তে-জনা ছিল, দীর্ঘক্ষণ বাসে থাকার ফলে তার যে অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে, যাত্রীদের অসহিষ্ণু মনোভাবই তার সাক্ষী। যদিও পথের ধারে মাইল-পোষ্ট পোঁতা আছে, তা লক্ষ্য করেও নবাগত যাত্রীদের কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হচ্ছে—কত দূর? আর কত দেরি?

অকস্মাৎ আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠের উল্লসিত জয়ধ্বনিতে নিস্তব্ধ পাহাড় উপত্যকা বনভূমি মুখর হয়ে উঠল। আলো আলো আলো! সিমলা শহরের আলো দেখা যাচ্ছে দূরে। এ যে কি বিস্ময়কর দৃশ্য—না দেখলে কল্পনা করা যায় না। মনে হচ্ছিল—মণিমুক্তা খচিত নীলাম্বরী শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে আকাশবধূ যেন আমাদের দিকে লাজুক চোখে চেয়ে আছে। নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে দেহ মনের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে শুধু দেখতে লাগলাম হরেক রকম আলোয় উদ্ভাসিত শৈলপুরীর আশ্চর্য সৌন্দর্য! এ আগাগোড়া অবাস্তব বলে ভ্রম হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমরা যেন পথ ভুলে কোন্ এক স্বপ্ন রাজ্যে হঠাৎ এসে প্রবেশ করেছি। এই হঠাৎ পাওয়া সম্পদ, হাজার আলোর ফুলঝুরি, স্বপ্নময় পরিবেশ আমার মনে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ এনে দিল। একটি অবর্ণনীয় অবিশ্বাস্য এবং অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা আমার মনের মণি-কোঠায় চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে গেল।

স্বপ্নের ঘোর কাটতে না কাটতেই বাস গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেল। কুলিদের চিৎকার, হট্টগোলে আর ভিড়ের

মধ্যে ব'স থেকে নেমে একটু ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের মালপত্রের তদারক করছিল অনিল। একটি অল্পবয়সী কুলির পিঠে দুটো বেডিং, সুটকেস, ব্যাগ ইত্যাদি চাপিয়ে দিয়ে তার পিছু পিছু চলতে লাগলাম। আমরা কালীবাড়িতে উঠব। সেখানে পূর্বেই চিঠি দিয়ে স্থানসংগ্রহের ব্যবস্থা করে রেখেছিল অনিল। তা না হলে ডেলিগেটদের অপ্রত্যাশিত ভিড়ে, অনেকের মতো আমাদেরও চরম অসুবিধায় পড়তে হত।

কিন্তু কালীবাড়ির পথ যে এত ঘোরালো এবং ওঠা যে এত কষ্টসাধ্য, জানা ছিল না। শুধু কালীবাড়ির পথই বা বলি কেন, এখানকার অধিকাংশ পথই গগনস্পর্শী। সুতরাং এ ধরণের অপরিচিত ও অনভ্যস্ত খাড়াই পথে আমাদের মতো সমতলবাসীর পক্ষে ওঠা যে কতখানি শ্রম সাধ্য—তা এবার মর্মে মর্মে টের পাচ্ছি। সারাদিনের বাস ভ্রমণে ক্লান্ত চরণ দুটি পদে পদেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। কাজেই, দু'এক মিনিট চলার পরেই রাস্তার উপর সটান বসে পড়ে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। ভাগ্যিস, রাস্তায় লোক চলাচল করছিল না, তা হলে তাদের সামনে রীতিমত হাস্যাস্পদ হতে হত। দু মণের উপর বোঝা পিঠে বেঁধে আমাদের কুলি অনায়াসে উপরে উঠতে লাগল। আমরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধীরে ধীরে বিশ্রাম নিতে নিতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময়ে কালীবাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। আর নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই যখন ধূমায়িত চায়ের কাপ হাজির হল, দেহ মনের অবসাদ এক মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। রাতে মাংস ভাত খেয়ে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসতে বিলম্ব হল না।

পরদিন বেশ একটু বেলাতেই ঘুম থেকে উঠলাম। আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন। সূর্যের ক্ষীণ আলো দেখতে না দেখতেই চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা কনকনে শাণিত হাওয়া ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। কালীবাড়ির ছাত থেকে কুয়াসার আবরণে ঢাকা ছন্দোবদ্ধ পাহাড়গুলিকে অতিকায় নিদ্রিত প্রাণীর মতো দেখাচ্ছিল। আকাশের এক কোণে রক্তিম বর্ণের রেখাগুলি যে সূক্ষ্ম কারু-কার্যের বৈচিত্র্যময় আলপনা আঁকছিল, সেই রমণীয় বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী মশায়ের তুলি সক্রিয় রয়েছে দেখলাম।

ভারতে যতগুলি স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাস আছে, উচ্চতায় সিমলা তাদের মধ্যে দ্বিতীয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৭২০০ ফুট। প্রথম স্থান অধিকার করেছে উটি—এর উচ্চতা ৭৫০০ ফুট। কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে সিমলা ইংরেজদের আমলে শুধু যে অদ্বিতীয় ছিল তাই নয়,বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের প্রধান শহর হিসেবেও সিমলা এ যুগেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর পরিচ্ছন্ন পথঘাট, নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী, ঘরবাড়ি, হোটেল, রাষ্ট্রপতি ভবন, ফুটবল মাঠ, স্কেটিং গ্রাউণ্ড, বড় বড় অফিস, ব্যাঙ্ক, স্কুল, কলেজ, বাজার, চার্চ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশ-বিদেশের ট্যুরিস্টদের ভিড়ে সিমলার পথ ঘাট মুখর হয়ে ওঠে।

এখানকার প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র মল রোডে অবস্থিত। এই স্থানটি বেশ প্রশস্ত এবং কিছুটা সমতল। বেড়ানো এবং বিশ্রামের পক্ষে আদর্শ। এই পথের দুধারে বেঞ্চ এবং গ্যালারি পাতা আছে। স্বাস্থ্যান্বেষীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে বসে রৌদ্রসেবন করে। এখানথেকে পাহাড়ের দৃশ্যাবলী খুব চমৎকার দেখায়। এই পথের প্রবেশ মুখে লালা লাজপত রায়ের স্ট্যাচু আছে—এটি পূর্বে লাহোরে ছিল, ১৯৪৮ সালে এখানে আনা হয়। এই পথের অন্যপ্রান্তে মহাত্মা গান্ধীর মর্মরমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মল রোডের নিচে স্কেটিং গ্রাউণ্ড। আবহাওয়া ভাল থাকলে সকাল এবং সন্ধ্যায় স্কেটিং দেখতে প্রচুর ভিড় জমে। হিমাচল প্রদেশের 'ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস' এই মল রোডে। টুরিষ্টরা এখান থেকে ভ্রমণ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে। রবিবারে এখানকার দোকানপাট বন্ধ থাকলেও, সকালে এই অফিস খোলা আছে দেখে সেখানে ঢুকে পড়লাম।

সিমলার 'অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান'-এর মধ্যে 'জাকো হিল' এবং 'প্রসপেক্ট হিল' উল্লেখযোগ্য। এদের উচ্চতা এবং মল রোড থেকে দূরত্ব যথাক্রমে ৮,০৫০ ফুট ও এক মাইল; এবং ৭,১৩৭ ফুট ও তিন মাইল। আমরা প্রথমটাতে আরোহণ করব, স্থির করলাম।

দীর্ঘ খাড়াই পথ ভেঙ্গে উপরে উঠছি তো উঠছি। দুধারের বাড়িঘর ছাড়িয়ে পথ এঁকেবেঁকে বড় বড় গাছের সারির ভিতর দিয়ে কোথায় যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে, নিচে থেকে তার হদিশ মেলে না। পাহাড়ের মাথা গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। রোদের চিহ্ন নেই, গাছগুলির আড়ালে কুয়াসা যেন পথ হারিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। বাতাসে শীতের তীব্রতা থাকলেও, আমাদের ক্লান্ত শরীরে তখন ঘাম ঝরছে। ইতিমধ্যে ক্ষণস্থায়ী মৃদু বর্ষণও হয়ে গিয়েছিল। পথের স্থানে স্থানে বরফ জমে রয়েছে দেখলাম। বৃষ্টির জল এবং বরফের মিতালির ফলে যে কোনো মুহূর্তে পা পিছলে যেতে পারে। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে পা টিপে টিপে এগুতে হচ্ছিল। এ-সব ক্ষেত্রে লাঠি উপযুক্ত অবলম্বন; তা জানা সত্ত্বেও আমরা লাঠি কিনতে ভুলে গিয়েছিলাম। এই 'জাকো-হিল'এ উঠে মনে পড়ল ছোটবেলায় পড়া একটা কবিতার কথা:

'উঠিয়া পর্বত চূড়ে ধরণীরে হেরি দূরে
পথের তো দুঃখ কষ্ট ভ্রম মনে হয়।'

সত্যিই তাই। পথের দুঃখ কষ্টের কথা এক মুহূর্তে ভুলে গিয়ে অপলক চোখে শুধু দেখতে লাগলাম ঢেউ-খেলানো পাহাড়গুলির আশ্চর্য সমাহিত রূপ। সিমলায় এসে এই পাহাড়ে না উঠলে ভ্রমণের আনন্দ থেকে অনেকখানি বঞ্চিত হ'তে হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পক্ষে এই স্থানটি পরম রমণীয়। এখানে একটি মন্দির আছে—হনুমান মন্দির। মন্দিরের চত্বরে এবং এর আশে পাশে মিশ্রির দানার মতো জমাট বেঁধে বরফ পড়ে আছে। বহুদূরে উচ্চশ্রেণীর পাহাড়গুলি বরফের টুপি প'রে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছে। বেলা ১১টা বাজে। সূর্য তখনও যথারীতি কুয়াসার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। তার সেই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে কোন্ কোন্ ভাগ্যবান পাহাড়ের চূড়া আলোকিত হয়ে উঠবে, তা আগে থেকে আন্দাজ করা শক্ত। ক্যামেরা হাতে উপযুক্ত আলোর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছি, কিন্তু বৃথাই। এখানকার পটভূমিকায়, সূর্যের অসহযোগিতার জন্য মনের মতো ফোটো তোলা সম্ভব হল না।

তারপর কালীবাড়িতে ফিরে এসে স্নানাহার শেষ করে পুনরায় যখন শহর প্রদক্ষিণে বেরুলাম, আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল পথঘাটে শীতল আবহাওয়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে চমৎকার লাগছিল। আর সন্ধ্যায় কালীমন্দিরে গায়কদের সুরেলা কণ্ঠে শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচিত গানগুলি যখন ধ্বনিত হচ্ছিল, পুণ্যার্থী বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর ভিড়ে, প্রসাদ বিতরণে, আরতি এবং ধূপ চন্দনের গন্ধে—এ-পরিবেশ মধুর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু যে-প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম,—অর্থাৎ সিমলায় 'স্নো' পড়তে দেখব,—তা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের মতে এখন যে-কোনো মুহূর্তে তুষারপাত শুরু হতে পারে। তাপ-মাত্রা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, শুভ লগ্নের জন্য হিমপ্রবাহ বিনিদ্র প্রহর গুণছে—আবহাওয়ায় একটা থমথমে ভাব—হয়ত তুষারপাত শুরু হবার গোপন প্রস্তুতি চলছে তলে তলে।

সিমলায় এসে তুষারপাত দেখা হল না। হিংস্র হিম-প্রবাহের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটল না আমাদের। স্বাভাবিক ঠাণ্ডার মধ্যে দুটো সোয়েটার এবং একটা গরম চাদর সম্বল করে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা সিমলার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। একটিমাত্র লেপ গায়ে জড়িয়ে রাতেও আরামে নিদ্রা গেছি। শীত অসহ্য মনে হয়নি।

তুষারপাত না দেখলেও, পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই কাঁচের জানালার মধ্য দিয়ে অভিনব দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বরফ বরফ বরফ! পাহাড়ের চূড়ায়, বাড়ির ছাতে কার্নিশে, পথে ঘাটে, গাছের মাথায়, বরফের প্রলেপ পড়ে এই শৈলপুরীকে অনন্যসাধারণ মহিমায় ভূষিত করেছে। আজ কুয়াসার চিহ্নমাত্র ছিল না, সূর্য-কিরণের অপার দাক্ষিণ্যে পাহাড়-উপত্যকা-বনভূমি রহস্য-ময় হয়ে উঠেছে। রিক্ত ঋতুর এই অভিনব শ্বেত-সজ্জা দেখে হৃদয় মন কানায় কানায় ভরে গেল।

সিমলায় প্রথম সন্ধ্যা দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, আজকের সকালে পাওয়া এই অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চটুকু তার সঙ্গে যোগ করে নিলাম।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্দ্দশা—

কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ হইতে মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরি করিয়া কাশ্মীরবাসী একদল মুসলমান তথায় দাঙ্গা হাঙ্গামা করিলে তাহার পরই পূর্ব পাকিস্তানবাসী অবাঙ্গালী মুসলমানগণ পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাহার ফলে হাজার হাজার হিন্দু পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে আরম্ভ করে। সে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। তাহার পর হইতে গত দেড় মাস কাল সমানে পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলিতেছে। ইহার পর পাকিস্তানীদের প্ররোচনায় পশ্চিমবঙ্গবাসী একদল মুসলমান এখানকার হিন্দুদের সহিত বিবাদ বাধাইয়া পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে কয়েকদিন কলিকাতা সহরেও মানুষ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোর হস্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের চেষ্টা পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই দেড় মাসের হাঙ্গামায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সরকার মুসলমানদিগকে ক্ষতিপূরণ দানে যত অধিক আগ্রহ ও তৎপরতা দেখাইয়াছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদিগকে ক্ষতিপূরণ দানে তত তৎপর হন নাই। এ জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ দেখা যাইতেছে। পূর্ববঙ্গে এই দেড় মাসে ২০ হাজার বা তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী হিন্দু নরনারীকে হত্যা করা হইয়াছে—কত নারীকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। হিন্দুর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। যে সকল হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার একাংশ নিহত হইয়াছে, অপরাংশ কপর্দকহীন অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। পাশপোর্ট ভিসা প্রভৃতির অজুহাতে পথে কত হিন্দু যে অসহায় অবস্থায় না খাইয়া জীবন মাত্র লইয়া আছে, তাহারও হিসাব নাই। প্রথমে খুলনা জেলায় হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, তাহার পর তাহা পাবনা, ঢাকা, মৈমনসিংহ, এমনকি চট্টগ্রামে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। সে হাঙ্গামা আজও চলিতেছে (২০শে ফেব্রুয়ারী)—কবে যে বন্ধ হইবে, কেহ বলিতে পারে না। এ সম্পর্কে কয়েকজন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকবার কলিকাতায় আসিয়াছেন ও কয়েকহাজার উদ্বাস্তু হিন্দুকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া তথায় তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দণ্ডকারণ্যের বর্তমান পরিচালক শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত খুব তৎপরতার সহিত এই সকল উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া গিয়া পুনর্বাসন দান করিয়াছেন। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত—এমন কি মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র রাজ্যেও যাহাতে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়, সে জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করিতেছেন। পূর্বপাকিস্তান হইতে শুধু উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা চলিয়া আসিতে বাধ্য হয় নাই—বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু, এমন কি সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতিও অত্যাচারিত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। আসামের দিকের লোক আসামে প্রবেশ করিয়াছে—তবে অধিকাংশ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চলিয়া আসিয়াছে। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দেশের নেতারা সর্বদা আলাপ আলোচনা করিতেছেন—তাঁহারা পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের সহিত এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কোন আপোষের কথা শুনিতে চান না।

সবার উপর পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার পাকিস্তানী গুপ্তচর প্রবেশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী মুসলমান অধি-

বাসীদের উত্তেজিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে পাকিস্তানী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। অতীব পরিতাপ ও দুঃখের কথা—পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্তারা তাহাদের কঠোর হস্তে দমন না করায় তাহাদের কাজ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এমনও শুনা যায় যে বহু মুসলমান সরকারী কর্মচারী এই সকল পাকিস্তানী গুপ্তচরদিগকে গোপনে সাহায্য দান পর্য্যন্ত করিয়া চলিয়াছেন। এমন কি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবীর সম্বন্ধে একখানি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রত্যহ যে সব সংবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহার কিয়দংশ সত্য হইলেও সে সংবাদে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিপন্ন মুসলমানদিগকে সাহায্য দানের ব্যপদেশে তাহাদের প্রতি যে অত্যধিক আনুকূল্য প্রকাশ করা হইয়াছে, এ বিষয়ে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি একমত—সকলে একবাক্যে সে কাজের নিন্দা করিতেছেন।

২।৪ দিন পূর্বেও কলিকাতায় একদল মুসলমান অধিবাসী যে ভাবে সরকারী কার্য্যে বাধা দিয়াছে, তাহার পরও সরকার কেন নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন—তাহা বুঝা যায় না। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইদের দিন পশ্চিমবঙ্গবাসী হাজার হাজার মুসলমান কোন্ সাহসে ভারত সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখাইয়া পাকিস্তান সরকারের প্রতি আনুকূল্য দেখাইয়াছে এবং সেই রাজদ্রোহিতার পরও তাঁহাদের প্রতি সরকার কেন কোন কঠোর ব্যবস্থা করেন নাই—তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায় না।

প্রাক্তন বিচারপতি, বর্তমানে এম-পি শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক বিশিষ্ট কোবিদ ডাঃ ত্রিগুণা সেন প্রভৃতির মত লোকও সরকারের অনাচারের প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল পাইতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটি মুসলমান বাস করে। যদি তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা এইভাবে বাড়িতে দেওয়া হয়, তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা চিন্তাও করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গবাসী যে সকল মুসলমান অন্যায় আবদার করিয়া চীৎকার করিতেছেন বা প্রকাশ্যে ও গোপনে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কেন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে না? অন্য দিকে, মুসলমান পল্লীর মধ্যে যে সকল হিন্দু বাস করে, কলিকাতার মত সহরেও কেন তাহাদের সর্বদা ভীতির মধ্যে বসবাস করিতে হইবে? যে সকল হিন্দুর আত্মীয়-স্বজন পাকিস্তানে নিহত বা নিখোঁজ হইয়াছে বা সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য আজও পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাদের কি উত্তেজিত বা দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই? পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা এ সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। এক দিকে যেমন সকল উদ্বাস্তুর উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনই দুষ্ট-মনোভাবাপন্ন মুসলমান অধিবাসীদের কঠোর হস্তে দমনের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দিনে শাসন কর্তৃপক্ষ কঠোর না হইলে সমগ্র জাতি একদিন দারুণ বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৭তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভারতসরকার দুইটি স্মারক ডাক-টিকিট বাহির করেন এবং এই উপলক্ষে গত ২৩শে জানুয়ারি নূতন দিল্লীতে যে অনুষ্ঠান হয় তাহাতে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সীতা বিশ্বাসকে নেতাজী ডাক-টিকিটের একটি বিশেষ অ্যাল্‌বাম্ উপহার প্রদান করেন।
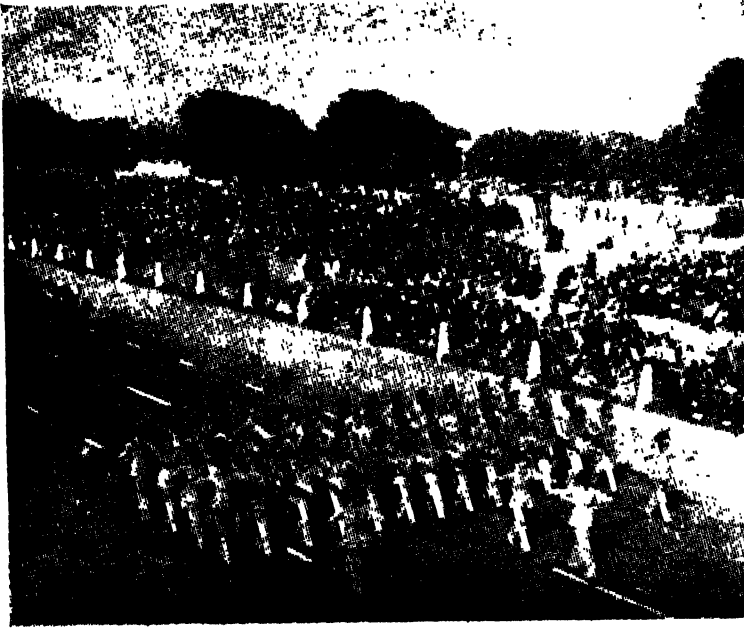
গত ২৬শে জানুয়ারীর "রিপাবলিক দিবসে" নূতন দিল্লীর রাজপথে যে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল তাহাতে অংশগ্রহণকারী এন্, সি,সি বালিকা দলকে মার্চ্চ করিতে দেখা যাইতেছে।

নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—

গত ২৫শে জানুয়ারী—রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুকে সাহায্য করিবার জন্য ২জন নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন (১) প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে দপ্তরবিহীন মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে—তিনি সকল দপ্তরের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ও সকল মন্ত্রীর কাজে সাহায্যদান করিবেন (২) প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীদামোদর সঞ্জীবায়াকে শ্রম ও কর্মসংস্থান বিভাগের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীশাস্ত্রী গত দেড়মাস কাল যেরূপ দক্ষতা, তৎপরতা ও শ্রমশীলতার সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাজ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে শ্রীজহরলালের স্থান পূর্ণ করিতেই দেখা যায়। তাঁহার বয়স মাত্র ৬০ বৎসর—তিনিই হয় ত পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিবেন।

কলিকাতা শহরে গুণ্ডামী—

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা সহরের মধ্যে বেনেপুকুরে কলিকাতার পুলিস্ কর্পোরেশনের কাউন্সিলার সালাউদ্দীনকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিতে গেলে প্রায় একহাজার মুসলমান পুলিসকে বাধা দেয় ও আক্রমণ করে। ফলে পুলিশের গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। অবশ্য সালাউদ্দীনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ হাঙ্গামা করার জন্য বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই হাঙ্গামা দমনে পুলিশের যতটা কঠোর হওয়া উচিত ছিল পুলিশ তাহা হয় নাই। এই ঘটনায় কলিকাতার অধিবাসীরা আতঙ্কিত হইয়াছে। যদি কলিকাতাবাসী মুসলমানদিগকে এইভাবে হাঙ্গামা করিতে দেওয়া হয় এবং অধিকতর কঠোর হস্তে হাঙ্গামা বন্ধের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে কলিকাতা অচিরে এক অরাজকতাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়িবে, সন্দেহ নাই। আমরা কলিকাতার শাসন কর্ত্তৃপক্ষকে অধিকতর কঠোরতার সহিত হাঙ্গামা দমন করিতে অনুরোধ করি।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বাংলার একজন খ্যাতিমান দেশকর্মী ও স্বাধীনতালাভের পর কয়েক মাস তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান ছিল ঢাকা জেলার মালিকান্দা গ্রামে। পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচারের সংবাদে বিচলিত হইয়া তিনি নিজে তথায় যাইয়া দেশবাসীর অবস্থা দেখিবার জন্য পাকিস্তান সরকারের অনুমতি প্রার্থনা

করিয়াছিলেন। পাক সরকার সে অনুমতি দেন নাই। তাঁহার মত ধীর, স্থির, পণ্ডিত ব্যক্তিকেও পাক-সরকার বিশ্বাস করেন না—ইহাই তাঁহাদের কার্য্যধারা।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের অসুস্থতার জন্য উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন অস্থায়ী-ভাবে রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রীপি, বি, গজেন্দ্রগাদকর নূতন দিল্লীতে ডঃ জাকির হোসেনকে শপথ গ্রহণ করান।

বেলগাছিয়া এলাকার উন্নয়ন—

কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত পরামর্শ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা বেলগাছিয়ার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নয়নের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ এঞ্জিনিয়ার শ্রীসুধাংশু মিত্র এ বিষয় সি-এম্-সি-ও'র চিফ এঞ্জিনিয়ার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক হেল্থ এর চিফ এঞ্জিনিয়ারের সহিত এক যোগে এ কাজে হাত দিয়াছেন। আগামী বর্ষায় জল জমা বন্ধ হইলে লোক উপকৃত হইবে।

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি—

কেন্দ্রীয় সরকারের যে সকল কর্মচারীর বেতন মাসিক ৩৯৯ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সকলের মহার্গ ভাতা মাসিক ২ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে—৭ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে এ সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই হইতে কর্মচারীরা বর্দ্ধিত হারে ভাতা পাইবেন। ২৫ লক্ষ কর্মী এ সুযোগ পাইবে ও এ জন্য সরকারের মাসিক ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িবে। আশা করা যায়, রাজ্য সরকারসমূহ কেন্দ্রের মত তাঁহাদের কর্মীদের ভাতা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি—

রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণের চক্ষু রোগের জন্য তিনি অসমর্থ হওয়ায় গত ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কয় দিনের জন্য উপরাষ্ট্রপতি ডাক্তার জাকীর হোসেনকে রাষ্ট্রপতির কাজ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। যে সময়ে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সকলকে আতঙ্কিত করিয়াছে, সে সময়ে একজন মুসলমান রাষ্ট্রপতি হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। পাকিস্তান যাহাই করুক না কেন, ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ভারত-বাসী মুসলমানদিগকে সর্ব-প্রকার সুবিধাদানে কখনও কুণ্ঠিত হন না ইহা ভারতরাষ্ট্রের বিশেষত্ব।

সরোজিনী নাইডু—

স্বর্গতা কংগ্রেস-নেত্রী সরোজিনী নাইডুর ৮৫তম জন্ম দিবস উপলক্ষে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতসরকার তাঁহার

স্মৃতিতে ১৫ নয়া পয়সার ডাক টিকিটে তাঁহার ছবি ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর মেয়ে, উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া মাদ্রাজী ডাঃ নাইডুকে-বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি তাঁহাকে কংগ্রেসে নেতৃত্বদান করে--তাহা ছাড়া ইংরাজীতে লিখিত তাঁহার কবিতা ও সাহিত্যে তাঁহার স্মরণীয় দান। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা সরোজিনীর কন্যা।

"রিপাবলিক্ দিবসে" নূতন দিল্লীর ন্যাশনাল্ ষ্টেডিয়ামে যে নৃত্য-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে অংশগ্রহণকারী পাঞ্জাব প্রদেশের নর্তক-দলকে পাঞ্জাবের বিখ্যাত "ভাঙ্গরা" নৃত্য প্রদর্শন করিতে দেখা যাইতেছে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী--

প্রবীণ রাজনীতিক ও অর্থনীতিক পণ্ডিত শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পরিবহন নীতি ও সংযোগরক্ষা কমিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনের অসহযোগিতা, কয়েকটি রাজ্যসরকারের সহযোগিতার অভাব ও বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুসন্ধানে বিরূপতার জন্য তিনি সভাপতি পদ গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির পদত্যাগে দেশের ক্ষতি হইবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

কাশ্মীর সমস্যা--

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ঐ রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। স্বাধীনতালাভের পর উহার একটি ছোট অংশ নিজেদের স্বাধীন কাশ্মীর বলিয়া ঘোষণা করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে গিয়াছিল। সেখানকার অধিবাসীরা পাকিস্তানীদের প্ররোচনায় মধ্যে মধ্যে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যকে পাকিস্তানের মধ্যে পাইবার আবদার করে ও সে জন্য চীৎকার করে। কাশ্মীরে কয়েক দিন দাঙ্গা হাঙ্গামার পর কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর চেষ্টায় সেখানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সেখানে গোলমাল ধরিয়া রাখিতে চায়। পাকিস্তানের পক্ষ হইতে তাহাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভুট্টো জাতিসংঘের সভায় কাশ্মীর সম্বন্ধে আলোচনার প্রস্তাব করিয়া তথায় গমন করে ও কাশ্মীয়সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। বলা বাহুল্য কাশ্মীর সমস্যার সমাধান বহুদিন পূর্বে হইয়া গিয়াছে এবং কাশ্মীর ভারতের অন্যতম রাষ্ট্ররূপে ভারত রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতেছে। শ্রীভুট্টোর প্রস্তাবের উত্তর দিবার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা জাতিসংঘের সভায় যোগদান করিতে যান। প্রথম দিকে আমেরিকা ও ইংলণ্ড শ্রীভুট্টোকে সমর্থন করে। চাগলা শুধু সুপণ্ডিত নহেন, সুবক্তা। তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ও ইংলণ্ডে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি এবার জাতিসংঘে পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্তরে যে ভাষণ দেন, তাহা নানা কারণে তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন, কাশ্মীর সমস্যা বলিয়া কোন সমস্যা নাই। পাকিস্তান ভারতের সহিত বিবাদ করিবার জন্য সর্বদা কাশ্মীরে গোলমাল করিবার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য শ্রীচাগলা নিজে একজন মুসলমান। তাঁহার মুখে শ্রীভুট্টোর কথার উত্তর শুনিয়া সমগ্র পৃথিবীর লোক স্তম্ভিত হইয়াছে। শ্রীভুট্টো শ্রীচাগলার কথার উত্তর দিতে না পারিয়া

কোন এক অছিলায় জাতিসংঘের সভা ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে ফিরিয়া আসিয়াছে। কাশ্মীর সমস্যা বলিয়া যে কিছু নাই, তাহা এবার ভাল করিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ওদিকে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে পয়গম্বরের চুল যে পাকিস্তানী গুপ্তচররা চুরি করিয়াছিল. তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে ও দুষ্কৃতকারীরা ধরা পড়িয়াছে। কাশ্মীর এখন ভারতের মধ্যে থাকিয়া শান্তিপূর্ণ আব-হাওয়ার মধ্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হউক, সকলেই ইহা প্রার্থনা করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট—

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈল-কুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও বিধান পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৪-৬৫ সালের আয়ব্যয়ের খসড়া হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন। এ বৎসর রাজস্ব খাতে ব্যয় অপেক্ষা আয় ৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা অধিক হইলেও মূলধন নিয়োগ খাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। কাজেই বাজেটে মোট ঘাটতি হইবে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। সরকার ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রি ফি বাড়াইবেন ও ভূমিরাজস্ব হইতেও অতিরিক্ত এক কোটি টাকা আয় করিবেন। অন্যদিকে সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা বাড়াইয়া ব্যয়ের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হইবে। নূতন অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার বাবু এবার বাংলা ভাষায় ৮০ মিনিট বক্তৃতা দিয়া বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় বাজেট বক্তৃতা এই প্রথম।

প্রজাতন্ত্র দিবসে উপাধি লাভ—

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যাঁহাদের উপাধি দানে সম্মানিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। পদ্মবিভূষণ হইয়াছেন (১) লেখক কাকাসাহেব কালেলকার ও ২) কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ। কবিরাজ মহাশয় বাঙ্গালী ও ভারতবর্ষের লেখক। তাঁহার এই উপাধিলাভে বাঙ্গালী জাতি গর্বিত এবং সকলের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে প্রণাম জানাই। ১৮জন পদ্মভূষণ ও ১০জন পদ্মশ্রী উপাধি পাইয়াছেন—পদ্মভূষণ দলে আছেন—ইস্পাত, খনি ও ভারী এঞ্জিনিয়ারিং মন্ত্রণালয়ের উপদেশক শ্রীঅনিলবন্ধু গুহ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দিল্লীর সংবাদ-বিভাগের অধিকর্তা শ্রীভোলানাথ মল্লিক, কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তনমন্ত্রী ডাঃ রফিউদ্দীন আমেদ ও অমৃতবাজার পত্রিকা ও অমৃত সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। পদ্মশ্রী উপাধি পাইয়াছেন—বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর—শ্রীপি-সি (প্রতুলচন্দ্র) সরকার ও দিল্লীর নিউক্লিয়ার মেডিসিনের ভারপ্রাপ্ত লেঃ কঃ সন্তোষকুমার মজুমদার। লেঃ কঃ নিখিলেশ বসু রাষ্ট্রপতির সেবাপদক লাভ করিয়াছেন। আমরা ডাঃ আর-আমেদ, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীপি-সি সংকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। শ্রীপি-সি-সরকারের সহিত গত প্রায় ২০ বৎসর ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্তন উৎসবে বাংলার প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিক কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়কে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করা হইয়াছে। আমরা কবিবরের এই সম্মানলাভে তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই ও তাঁহার সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করি।

গোপন-কথা

আধুনিকা-তরুণী—অপদার্থ!···পই-পই করে বললুম তোমাকে যে আমাদের বিয়েটা ভালোয়-ভালোয় চুকে যাবার আগেই এ খবর যেন ক্ষুণাক্ষরে বাবা-মা বা বাড়ীর কারো কানে না পৌছায়···আর এদিকে তুমি কিনা শেষে সব কথা ফাঁশ করে ··

প্রেমিক-তরুণ—বারে···তোমার কথামতোই তো সবাইকে আমি সেই কথাই বলে আসছি এত'দন—কেউ যেন আমাদের বিয়ের কথা কোনোভাবেই ফাঁশ না করে!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
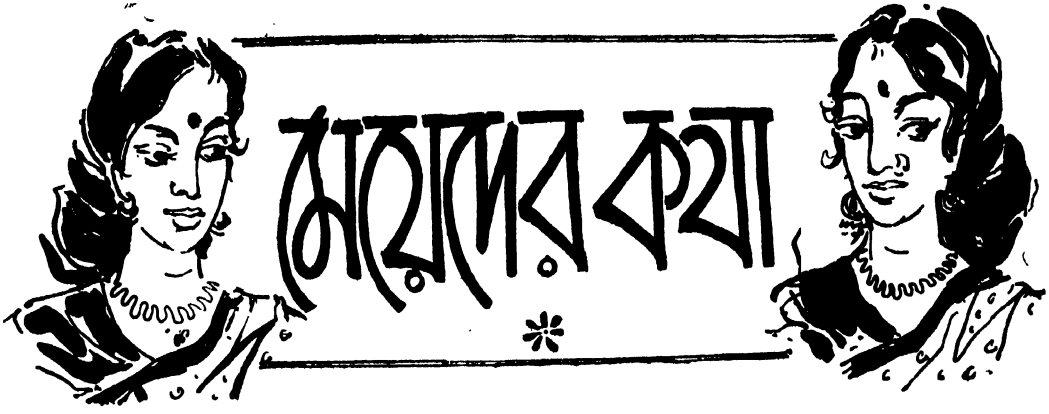
"তুলসীকৃত রামায়ণোক্ত নারী ধর্ম"

(আলোচনা)

বাসবী দত্ত

ভারতবর্ষের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত নির্বাণপ্রিয়া দেবীর প্রবন্ধ পড়ে আমাদের আনন্দ ও কৌতুক যুগপৎ উৎপন্ন হয়েছে। আনন্দ হয়েছে এ জন্য যে নির্বাণপ্রিয়া দেবী সংসার ধর্মে নিস্পৃহ হইয়াও সংসারধর্ম পালনের জন্যে এমন উপদেশরাশি তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে আহরণ করেছেন। আর কৌতুক বোধ করছি এ জন্যে, সেই নারীধর্মকে ভুলতে পারাই যে যুগের কৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই যুগের নারী হয়ে তিনি কেমন করে সেই নারী ধর্মের গুণগান করতে সাহস পেয়েছেন?

নারীর ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই ভাবতে হবে, নারীর ধর্ম পুরুষের ধর্ম থেকে সম্পর্কমুক্ত নয়। পুরুষের ধর্ম যেখানে যথারীতি পালিত হয়, সেখানে নারীর সংশ্লিষ্ট কর্তব্য-অবহেলা সত্যি সত্যি দোষের। কিন্তু যেখানে পুরুষ তার কর্তব্যে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবান নয়, সেখানে নারীকে একতরফা পতিধর্ম পালনের উপদেশ উন্মত্ততার লক্ষণ। অপহৃতা সীতার জন্যে রাম জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু এ যুগের রামেরা অপহৃতা সীতার জন্যে কী কর্তব্য পালন করছেন? তাঁরা তো অপহৃতা সীতাদের কথা ভুলে থাকতে পারলেই ভাল থাকেন, আর অপহর্তাদের শাস্তিদান, আর অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার করা যে তাঁদের মহান্ কর্তব্য সে কথা কখনও ভাবতেও প্রস্তুত নন। এ হেন রামেদের প্রতি রামায়ণোক্ত নারীধর্ম পালনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ যুগের রামেরা সত্যের ধার ধারে না, প্রজারঞ্জনের বদলে ওরা প্রজাশোষণ করে। ভ্রাতৃপ্রেমের বদলে ওদের বুকে ভ্রাতৃহিংসার অনল দাউ দাউ করে জলছে। পত্নী প্রেমের বদলে ওদের হৃদয়ে পরনারী লালসার লেলিহান শিখা। এ সকল রামের প্রতি পতিভক্তির উপদেশ অসার প্রলাপ বাক্য নয় কি?

সে যুগের রাম ছিলেন বীর। এ-যুগের রামেরা কাপুরুষ। তাদের ভাই লক্ষ্মণেরা শুধু উদাসীন নয়, ক্লীব। তারা ভ্রাতৃজায়াহরণের দুঃখে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়। তারা ভাবে কেন শুধু শুধু রাবণের সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের শান্তি নষ্ট করি? নিজের জীবন বিপন্ন করি? নিজের প্রাণ তাদের কাছে নারী জাতির সম্মান মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশী প্রিয়। তারা শুধু কয়টি শান্তি বাণী আউড়ে বা রাবণের সঙ্গে কোলাকুলি করে নিজের সুখ শান্তি বজায় রাখতে চায়!

এ সকল রাম আর লক্ষ্মণের প্রতি এ যুগের সীতা আর ঊর্মিলারা কি রকম আচরণ করবে তা অবশ্য চিন্তা করে দেখবার মত নয়। যেরকম আচরণ তারা পতিদের প্রতি করছে, তাই বরং যথেষ্ট মনে হবে।

আসল কথাটা এই—পতিধর্ম পালনের উপদেশগুলি যে-সব স্বামী নিজ নিজ স্ত্রীকে পড়ে শুনিয়েছেন তাদের একথা স্মরণ রাখবার দিন এসেছে। একতরফা নারীধর্ম পালনের উপদেশ ছড়িয়ে পুরুষের রাজত্ব করবার দিন আর নেই। নারীর কাছ থেকে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হ'লে পুরুষকে বীর হতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল হ'তে হবে, নারীর মর্যাদার জন্যে জীবনপণ করতে হবে, তখনি আপনা হতে নারীর হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি জাগ্রত হবে। কতকগুলি ভীরু কাপুরুষ, আত্মসুখনিরত, অপদার্থ পুরুষকে ভক্তি আর সেবা করে নির্বাণ লাভ করা যাবে, এ যুগের নারীরা আর তাতে বিশ্বাস করে না।

হাতের কাজ

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

'বাটিক্'-পদ্ধতিতে মিহি ও মোটা সূতী আর রেশমী কাপড়ের উপর নক্সা চিত্রণের জন্য সচরাচর যে সব বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়, সেগুলির প্রস্তুত-প্রণালী বিশেষ ধরণের—সাধারণ-নিয়মানুযায়ী জল-রঙ বা তেল-রঙ দিয়ে 'বাটিক্' কারুশিল্পের কাজ করা চলে না।

ইতিপূর্ব্বে যেমন হদিশ দিয়েছি, সেইভাবে 'বাটিক্'-শিল্পের কাজের উপযোগী মিহি বা মোটা কাপড়ের দু' পিঠেই সুষ্ঠুভাবে 'তরল-মোমের প্রলেপন' দেবার পর, বিশেষ-ধরণে তৈরী বিভিন্ন রঙ ব্যবহার—ভালো তুলির সাহায্যে সযত্নে ও নিখুঁত-পরিপাটি-ছাঁদে সেই কাপড়ের উপর নক্সা-চিত্রণের কাজ করতে হবে। 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে নক্সা-চিত্রণের জন্য বিশেষ ধরণের যে সব রঙ ব্যবহার করা রীতি, সেগুলি তৈরী করতে হলে দরকার—মঘি-খয়ের, তুঁতে, বাইক্রোমেট প্রভৃতি উপকরণ। 'বাটিক্'-শিল্পের জন্য একান্ত-প্রয়োজনীয় এই সব রঙ কি উপায়ে তৈরী করা যাবে, আপাততঃ, তারই মোটামুটি হদিশ দিই।

রঙ তৈরী করার সময়, গোড়াতেই উপরোক্ত উপকরণ-

গুলি, অর্থাৎ মঘি-খয়ের, তুঁতে আর বাইক্রোমেটের টুকরো গুলিকে আলাদা-আলাদাভাবে মিহি-ছাঁদে গুঁড়ো করে ফেলুন। এগুলি যথাযথভাবে গুঁড়িয়ে নেবার পর, তুঁতে এবং বাইক্রোমেটের মিহি-গুঁড়ো আলাদা করে দুটি বিভিন্ন
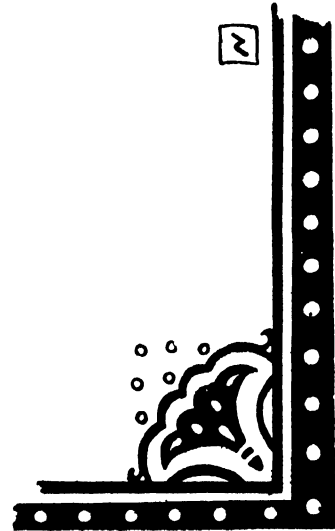
রঙের পাত্রে রেখে দিন ও মিহি-ছাঁদে গুঁড়ানো মঘি খয়েরটুকু অপর একটি পাত্রে তুলে আলাদা সরিয়ে রাখুন। এবারে উনানের আঁচে হাঁড়ি বা ডেকচি বসিয়ে সেই পাত্রে

আড়াই সের পরিমাণ জল ফুটিয়ে নিন। জলটুকু গরম ফুটন্ত হলে আলাদা-আলাদাভাবে তুঁতের ও বাইক্রোমেটের গুঁড়ো-রাখা রঙের পাত্র দুটিতে চায়ের কাপের তিন-কাপ পরিমাণ ফুটন্ত-জল মিশিয়ে দিন এবং পরিচ্ছন্ন দুটি—কাঠির সাহায্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বিভিন্ন পাত্রে-রাখা ফুটন্ত-জল-মেশানো তুঁতে আর বাইক্রোমেটের গুঁড়ো আগাগোড়া ভালোভাবে গুলে নিন। এমনিভাবে গুলে নেবার ফলে, তুঁতে আর বাইক্রোমেটের মিহি-গুঁড়ো জলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেলেই বুঝবেন—এ কাজ শেষ হয়েছে। এবারে তুঁতে আর বাইক্রোমেট মেশানো রঙের পাত্র দুটিকে সযত্নে আলাদা সরিয়ে রেখে, উনানের আঁচে-বসানো ফুটন্ত-জলের পাত্রে মঘি-খয়েরের গুঁড়ো ঢেলে দিয়ে অন্ততপক্ষে আধঘণ্টাকাল রেখে এই 'মিশ্রণটিকে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন। 'মিশ্রণটি' এইভাবে ফোটানো হলে, উনানের উপর থেকে পাত্রটিকে নামিয়ে কিছুক্ষণ খোলা-বাতাসে রেখে জুড়োতে দিন। তারপর বিভিন্ন পাত্রে রাখা তিনটি 'ফুটন্ত-মিশ্রণই' জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে, 'বাটিক'-পদ্ধতিতে সুতী কিম্বা রেশমী কাপড়ের উপর তুলির সাহায্যে বিভিন্ন রঙ ফলিয়ে নক্সা-চিত্রণের কাজ সুরু করবেন।

রঙ-তৈরীর মতোই, 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে নক্সা-চিত্রণের কাজও করতে হবে বিশেষ ধরণের উপায়ে। আপাততঃ তারই মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি।

'বাটিক্'-পদ্ধতিতে কাপড়ের উপর রঙ ফলিয়ে নক্সা-চিত্রণের সময় বিশেষ একটি রীতি অনুসরণ করলে, কাজের সুবিধা হবে অনেকখানি। এই বিশেষ-রীতি অনুসারে, কাজের সময় বিভিন্ন রঙের পাত্রগুলিকে পাশাপাশি সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখা দরকার। অর্থাৎ, সারির প্রথমেই সাজিয়ে রাখবেন মঘি-খয়েরের রঙ গোলা পাত্র, মাঝখানে থাকবে তুঁতে-গোলা পাত্রটি এবং তার পাশেই রেখে দেবেন বাইক্রোমেটের গুঁড়ো মেশানো রঙের পাত্রটিকে। কারণ 'বাটিক্' শিল্প কার্য্যের সময়, কাপড়ের টুকরোটিকে সর্ব্বপ্রথমে ছুপিয়ে নিতে হবে ঐ মঘিখয়েরের 'মিশ্রণে'। মঘিখয়েরের পাত্রে অন্ততপক্ষে প্রায় আধঘণ্টাকাল রেখে কাপড়ের টুকরোটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ছুপিয়ে নেবার পর, সেটিকে প্রথম পাত্রের 'মিশ্রণ' থেকে তুলে, ঐ পাত্রের উপরেই ধরে রেখে সযত্নে হাতের মৃদু চাপ দিয়ে নিঙ্ড়ে সম্পূর্ণরূপে 'খয়েরী জল' ঝরিয়ে ফেলুন। এভাবে জল-ঝরানোর সময়, কাপড়ের টুকরোতে সঞ্চিত রঙ যেন এতটুকু ঐ পাত্রের বাইরে পড়ে আদৌ অপচয় না হয়...অর্থাৎ, সব রঙটুকুই যেন মঘি-খয়েরের পাত্রের ভিতরেই ঝরে পড়ে। কারণ, অসাবধানতার ফলে, এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করে তৈরী রঙ পাত্রের বাইরে পড়ে নষ্ট হলে, শুধু লোকসানই নয়, কাজের অসুবিধাও ঘটবে সবিশেষ। কাজেই গোড়া থেকে এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। মঘি খয়েরের মিশ্রণে ছুপিয়ে নেবার ফলে, কাপড়ের টুকরোটি আগাগোড়া বেশ হাল্কা-খয়েরী রঙের রূপ ধারণ করবে। এমনিভাবে কাপড়ের টুকরো থেকে মঘি-খয়েরের রঙটুকু সম্পূর্ণরূপে ঝরিয়ে নেবার পর, সেটিকে পুনরায় অবিকল ঐ আগের মতো প্রথায় দ্বিতীয় রঙ...অর্থাৎ, তুঁতের গুঁড়ো-মেশানো পাত্রের 'মিশ্রণে' আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ছুপিয়ে নিতে হবে। তবে এ 'মিশ্রণে' কাপড়ের টুকরো-টিকে আগের বারের মতো আধঘণ্টাকাল ছুপিয়ে রাখার আবশ্যক নেই...আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে অন্ততপক্ষে মিনিট পনেরোকাল ছুপিয়ে নিলেই চলবে। যাই হোক, কাপড়ের টুকরোটিকে এমনিভাবে দ্বিতীয় বা তুঁতের গুঁড়ো মেশানো পাত্রের রঙে ছুপিয়ে নেবার পর, পুনরায় আগের বারেরই অনুরূপ-প্রথায় সম্পূর্ণরূপেই সেটি থেকে রঙ ঝরিয়ে নেবেন। দ্বিতীয় রঙে, অর্থাৎ তুঁতের গুঁড়ো মেশানো পাত্রে ছোপানোর ফলে, কাপড়ের টুকরোর হাল্কা-খয়েরী বর্ণ আরো গাঢ়-সুন্দর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। অতঃপর, কাপড়ের টুকরোটিকে পুনরায় পূর্ব্ব-প্রথানুসারে তৃতীয় বা বাইক্রো-মেটের গুঁড়ো-মেশানো রঙের পাত্রে প্রায় মিনিট পনেরো-কাল নাড়াচাড়া করে আগাগোড়া ভালোভাবে ছুপিয়ে নেবার ফলে, সেটির খয়েরী-বর্ণ যখন আগের চেয়ে আরো উজ্জ্বল-গাঢ় ও পরিপাটি-সুন্দর হয়ে উঠবে, তখন রঙের পাত্র থেকে তুলে সেটিকে সযত্নে নিঙড়ে 'মিশ্রণ'-মুক্ত করে নিলেই মোটামুটিভাবে 'বাটিক'-পদ্ধতিতে কাপড়ের জমীতে রঙ-ফলানোর কাজ শেষ হবে। তবে 'বাটিক'-পদ্ধতিতে কাজের সময়—বিশেষ করে হাতের চাপ দিয়ে

নিঙড়ে কাপড়ের টুকরো থেকে রঙ-ঝরানোকালে প্রতিবারই সজাগ-দৃষ্টি রাখতে হবে যে সেটি যেন কোনো-মতেই বেশী জোরে চাপ দিয়ে নিঙড়ানো বা অযথা চটকানো না হয়। কারণ, তার ফলে, কাপড়ের দু'পিঠে 'তরল-মোমের যে প্রলেপন রয়েছে, তাতে ফাট ধরে যায় এবং সেই ফাটলের ভিতর দিয়ে রঙের 'মিশ্রণ' সেঁধিয়ে 'বাটিক'-শিল্পের উপকরণটিকে বেয়াড়াভাবে অসুন্দর করে তোলে। কোনো কোনো 'বাটিক্'-কারুশিল্প বিশেষজ্ঞের মতে অবশ্য 'তরল-মোমের' প্রলেপনে অল্পস্বল্প সূক্ষ্ম-ধরণের ফাটল সৃষ্টি হওয়া ভালো···কারণ, শিরা-উপশিরার ছাঁদের সেই সব সূক্ষ্ম সুন্দর ফাটা-দাগের ভিতর দিয়ে এলোমেলো-ভাবে রঙ প্রবেশ করে কাপড়ের বুকে বিচিত্র অভিনব যে রেখা রচনা করে তার বৈশিষ্ট্যগুণেই 'বাটিক্-শিল্প সামগ্রীটি আগাগোড়া অপরূপ শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তবে কথায় বলে—'সর্ব্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্'···সকল বিষয়েই আধিক্য দোষ যেমন অমার্জ্জনীয় অপরাধ···এ ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং 'বাটিক্' কারুশিল্পের কাজ করতে হলে এদিকে সচেতন-দৃষ্টি রাখা যে একান্ত প্রয়োজন—সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি দরকারী কথা বলে রাখি। ইতিপূর্বে 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে শিল্প-সামগ্রী রচনার উপকরণাদি যে তালিকা ও পরিমাণ দেওয়া হয়েছে সেটি উপরোক্ত নক্সানুযায়ী ছোট খাট জিনিষের উপযোগী। বড় বড় সামগ্রী রচনায় সব কিছুই যে সেই অনুপাতে বেশী লাগবে—সে হিসাব 'বাটিক্'-কারুশিল্পী নিজেই অনায়াসে নির্দ্ধারণ করে নিতে পারবেন। কাজেই সে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই আপাততঃ। বরং যে কথা বলছিলুম, তারই জের টানা যাক্!

রঙ-করা কাপড়ের টুকরোটিকে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে নেবার পর, সেটির দু'পিঠে যে মোমের প্রলেপ রয়েছে সেই প্রলেপ মুছে ফেলার পালা। মোটামুটিভাবে সুতী বা রেশমী কাপড়ের জমী থেকে মোমের প্রলেপ মুছে ফেলতে হলে—রঙ-করা কাপড়ের টুকরোটিকে বেশ খানিকক্ষণ গরম-ফুটন্ত জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে দিলেই দেখবেন—কাপড়ের জমীর প্রায় বেশীর ভাগ অংশ থেকেই মোমের পাতলা আবরণ বেমালুম মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে ···যেটুকু বাকী রয়েছে, গরম জল আর সাবান দিয়ে কেচে নিলেই সেটুকুও সহজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কাপড়ের জমী থেকে মোমের আস্তরণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর, 'বাটিক্-কারুশিল্পের নক্সাদার সৌখিন-সামগ্রীটিকে সযত্নে রৌদ্রতাপহীন ছায়া-শীতল স্থানে খোলা-বাতাসে মেলে রেখে আগাগোড়া শুকিয়ে নিতে হবে।

[ক্রমশঃ

——

সৌখিন ব্লাউশের প্যাটার্ন

মৃন্ময়ী দেবী

শীতকাল শেষ হয়েছে—দিকে-দিকে আবার জেগেছে নবীন-বসন্তের সাড়া! আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, ফুলে-ফলে, তৃণে-পল্লবে নিখিল-বিশ্বের সর্ব্বত্রই আজ আনন্দের জোয়ার বইছে—চারিদিকেই বিচিত্র রঙের খেলা···বসন্ত-সমাগমে সবার রঙে রঙ-মেশানোর আগ্রহে মানুষের মনে জেগে উঠেছে—বসন-ভূষণ, অলঙ্কার-আভরণ, প্রসাধনী-রূপচর্চ্চায় নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর সুসজ্জিত করে তোলার সৌখিন বাসনা। চিন্তাশীল-কবি-শিল্পীদের মতে, নারী-জাতিই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতীক ·· তবে নারীজাতির এই রূপ সৌন্দর্য্যের অনেকখানি নির্ভর

করে সুচারু, সুরুচিশীল যথাযোগ্য বসন ভূষণ ব্যবহারের

উপর। এবারে তাই বসন্তকালে মহিলাদের পরিধানো-পযোগী বিচিত্র-অভিনব সৌখিন ছাঁদের দুটি বিভিন্ন ব্লাউশের নক্সা-নমুনা প্রকাশিত করা হলো। এ দুটি ব্লাউশের জন্য মিহি অথবা মোটা ধরণের সূতী ও রেশমী কাপড় উভয়ই ব্যবহার করা চলবে।

৩৯২পৃষ্ঠায় ১নং চিত্রে যে ব্লাউশের নমুনাটি দেখানো হয়েছে—সেটি পাশ্চাত্যপরিচ্ছদের রীতি অনুসরণে পরিকল্পিত এবং অপেক্ষাকৃত সাধাসিধা প্যাটার্ণের। সাধারণভাবে, অফিস, স্কুল, কলেজ, বাজার প্রভৃতি স্থানে কাজে বেরুনোর সময় মহিলাদের পরিধানোপযোগী পরিচ্ছদ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। এ ধরণের ব্লাউশের পাটার্ণটি রেশমী এবং সূতী দু'ধরণের কাপড়েই বানানো যায়, তবে আমাদের মনে হয়—এ পোষাকটির পক্ষে নক্সাদার সূতীর কাপড়ই আরো বেশী মানান সই দেখাবে।

উপরের ২নং চিত্রে যে বিচিত্র ব্লাউশের নমুনাটি দেখছেন, সেটি বেশ অভিনব সৌখিন-ছাঁদের। এ নমুনাটি পরিকল্পিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় পোষাকের আদর্শানুসারে—আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলে সাবেকী আমলের দেহাতী পুরুষেরা বিশিষ্ট ধরণের পাঞ্জাবী জাতীয় যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকেন, সেই পোষাকেরই ছাঁদে রচিত হয়েছে প'শের ব্লাউশটি। মহিলাদের পক্ষে এ ধরণের ব্লাউশ, 'আটপৌরে' হিসাবে ব্যবহারের চেয়ে, 'পোষাকী' হিসাবেই আরো বেশী মানানসই হবে। এ ব্লাউশটি লিনেন ও খদ্দর জাতীয় সুতীর কাপড় এবং সাটিন প্রভৃতি রেশমী কাপড়ের সাহায্যে বানানো হলেই সুশ্রী ও সুন্দর দেখাবে। চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, সেইভাবে ব্লাউশের হাতার প্রান্তে এবং বুকের পটিতে সরু বা ঈষৎ চওড়া রঙীণ কাপড়ের নক্সাদার 'পাড়' বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। চওড়া পাড়ের বদলে মানানসই ধরণের যে কোনো এক রঙা কাপড়ের সরু 'পাইপিং' সেলাই করেও এই ব্লাউশটিকে অলঙ্কৃত করা চলবে।

আপাততঃ মহিলাদের পরিধানোপযোগী 'পোষাকী' এবং 'আটপৌরে' দুই ধরণের ব্লাউশের নমুনা দেওয়া হলো—পরের মাসে এমনি ধরণের আরো কয়েকটি নতুন প্যাটার্ণের পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।
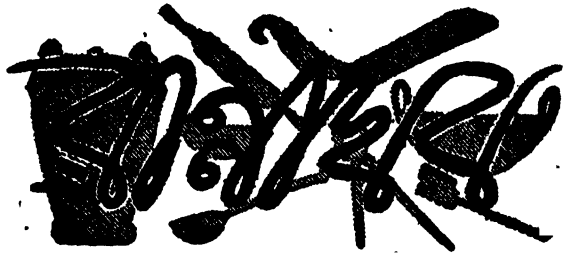
সুধীরা হালদার

এবারে বলছি, ভারতবর্ষের পাঞ্জাব-অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয় অভিনব-সুস্বাদু এক-ধরণের আমিষ-খাদ্য রান্নার বিচিত্র পদ্ধতির কথা। এ খাবারটির নাম দেওয়া যেতে পারে—'পালং-টোম্যাটো গোস্ত'!

পাঞ্জাবী-প্রথায় এই অপরূপ-মুখরোচক আমিষ-খাদ্যটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—একসের মাংস, একপোয়া পালং শাক, একপোয়া লাল-রঙের বড় টোম্যাটো, এক-পোয়া পেঁয়াজ, বড়-বড় পাঁচকোয়া রসুন, আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি, চায়ের চামচের দুই চামচ পরিমাণ চিনি,

আন্দাজমতো পরিমাণে নুন, খানিকটা কাশ্মিরী লঙ্কার গুঁড়ো, আট-দশটি শুকনো লঙ্কা এবং আন্দাজমতো পরিমাণে গুঁড়ো বা আস্ত গরম-মশলা।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, প্রথমেই পেঁয়াজগুলিকে কুচিয়ে নিন এবং টোম্যাটোগুলিকে কিছুক্ষণ গরম-জলে ডুবিয়ে রেখে. সেগুলির খোশা ছাড়িয়ে ফেলুন। তারপর পরিষ্কার একটি ডেকচিতে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি দিয়ে, রন্ধনপাত্রটি উনানের-আঁচে বসিয়ে ফুটন্ত-ঘিয়ে পেঁয়াজ-কুচো ছেড়ে, সেগুলিকে ভালোভাবে ভেজে নিন। ফুটন্ত-ঘিয়ে ভাজার ফলে, পেঁয়াজের কুচোগুলি আগাগোড়া বেশ বাদামী-রঙের হয়ে উঠলে. উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে লঙ্কা-বাটা ও রশুন-বাটা ছেড়ে, হাতা বা খুন্তির সাহায্যে রান্নার মশলাটিকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বেশ ভালোভাবে ভেজে নিন। তবে হুঁশিয়ার, এভাবে রান্নার মশলা ভাজার সময় সর্বদা নজর রাখতে হবে যে সেটি যেন যথাযথভাবে নাড়াচাড়ার অভাবে রন্ধনপাত্রের তলদেশের গায়ে সেঁটে গিয়ে 'ধরে' না যায়।

এমনিভাবে ভাজার ফলে, রান্নার মশলা থেকে সুগন্ধ বেরুতে সুরু করলেই, রন্ধন-পাত্রে খোশা-ছড়ানো টোম্যাটোগুলিকে ছেড়ে দিয়ে হাতা বা খুন্তির সাহায্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে, আন্দাজমতো পরিমাণে কিছু চিনি মিশিয়ে দিন। তারপর রন্ধন-পাত্রের এই 'মিশ্রণটিতে' পালংশাক ও মাংসের টুকরোগুলি ছেড়ে দিয়ে রান্নাটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে কষে নিন। মাংস-কষা হলে, উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো নুন ও ফুটন্ত-জল মিশিয়ে রান্নাটিকে কিছুক্ষণ 'দমে' বসিয়ে দিন।

খানিকক্ষণ এভাবে 'দমে' বসিয়ে রাখার ফলে, মাংসের টুকরোগুলি আগাগোড়া বেশ নরম ও সু-সিদ্ধ হবার পর কাই-কাই ধরণের অল্প-অল্প 'ঝোল' থাকতেই রান্নাটিতে আন্দাজমতো পরিমাণে গুঁড়ো বা আস্ত গরম-মশলা মিশিয়ে উনানের আঁচের উপর থেকে সযত্নে রন্ধন-পাত্রটি নামিয়ে রাখুন। তাহলেই অভিনব পাঞ্জাবী-প্রথায় 'পালং-টোম্যাটো-গোস্ত' খাবার রান্নার কাজ শেষ হবে।

অতঃপর, পরিবেশনের পালা! সুষ্ঠুভাবে রান্না করতে পারলে, অপরূপ সুস্বাদু-মুখরোচক আমিষ-জাতীয় এই পাঞ্জাবী খাবারটি খেয়ে আপনাদের আত্মীয়-বন্ধু-প্রিয়জনেরা সকলেই যে পরম-পরিতৃপ্ত হবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য!

নান্য পন্থা

শান্তশীল দাশ

তবু এই অন্ধকার পার হয়ে যেতে হবে—
পার হয়ে যেতে হবে অপমৃত্যু ভয় :
জীবনের কাছে এসে মানবেই তারা পরাজয়,
দূরে দূরে থাকে যারা—অশরীরী ভীরুতার ছায়া,
ছুঁড়ে দেয় অসংখ্য সংশয়।

এ-জীবন অমৃতের অংশ এক—অপমৃত্যু নেই :
ভুলে গেছি একেবারে। ভুলিয়েছে এই
বিংশ শতাব্দীর দম্ভ। আড়ম্বর, শুধু আড়ম্বর—
[illegible] মাত্রাতীত আয়োজন। তবু মৃত্যুকেই—
মেনেছি সমাপ্তি বলে—হেরে গেছি মৃত্যুর কাছেই।
বারে বারে মৃত্যু তাই আসে আর হানা দিয়ে যায়;
ভরে দেয় এ-জীবন চরম গ্লানির ব্যর্থতায়।
খোঁজেনাকো তবু কেউ সেই পথ, স্থির অচঞ্চল,
জ্যোতির্ময়—দিকে দিকে ওঠে তাই ক্ষুব্ধ বেদনার
দীর্ঘশ্বাস, ঝরে অশ্রুজল।

সেই পথে যেতে হবে; নেই আর অন্য কোন পথ :
শুনতেই হবে সেই ডাক আর
নিতে হবে নতুন শপথ।

লগ্নানুসারে গ্রহগণের শুভাশুভ ফল নির্ণয়

উপাধ্যায়

মেষ লগ্নে জাতকের পক্ষে শনি বুধ ও শুক্র অশুভফলদাতা। রবি ও বৃহস্পতি শুভদাতা। বৃহস্পতি ও শনির সাধারণ ভাবে যোগাযোগ হোলে রাজযোগের ফল দেয় বটে, তবে তা আংশিকভাবে পাওয়া যায়। শুক্র দ্বিতীয়াধিপতি ও সপ্তমাধিপতি, বুধ তৃতীয়াধিপতি ও ষষ্ঠাধিপতি এবং শনি দশমাধিপতি ও একাদশাধিপতি। তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশের অধিপতি অশুভদাতা। বুধ তৃতীয়াধিপতি ও ষষ্ঠাধিপতি হেতু মন্দ। শুক্র দ্বিতীয়াধিপতি ও সপ্তমাধিপতি। শুক্র নৈসর্গিক শুভগ্রহ। কেন্দ্রাধিপতি শুভগ্রহ হওয়ার দরুণ শুক্র অশুভফলদাতা। দ্বিতীয়াধিপতি হেতু প্রধান মারক। এজন্য মেষলগ্নের ব্যক্তির পক্ষে শুক্র আদৌ শুভদাতা নয়। শনি দশমাধিপতি ও একাদশাধিপতি। দশমাধিপতি পাপগ্রহহেতু শনি শুভদাতা এবং একাদশাধিপতি হেতু অশুভদাতা। কিন্তু মেষজাতব্যক্তির পক্ষে অশুভ হবে, কেননা মেষলগ্নের অধিপতি মঙ্গলের শত্রু বুধ শনি ও শুক্র। অত এব দশমাধিপতি হওয়া সত্বেও শনি মেষলগ্নের ভালো করতে সক্ষম নয়। বৃহস্পতি ও রবি শুভ। রবি পঞ্চমাধিপতি এবং বৃহস্পতি নবমাধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি। রবির একটি ক্ষেত্র। পঞ্চমস্থান তার ত্রিকোণ। এ জন্য গ্রহটি সম্পূর্ণ শুভফল দাতা। বৃহস্পতি ত্রিকোণাধিপতি হওয়ার দরুণ শুভ, দ্বাদশাধিপতি হওয়ার দরুণ অশুভফলদাতা হোলোনা। কেননা মেষলগ্নের অধিপতি মঙ্গল বৃহস্পতির মিত্র। বৃহস্পতি নবমাধিপতি এরং শনি দশমাধিপতি ও একাদশাধিপতি। বৃহস্পতির সঙ্গে শনি সম্বন্ধ করায় বিশেষ রাজযোগ হবারই কথা, কিন্তু শনি একাদশাধিপতি হওয়ায় কিছু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ রাজযোগের ফল পাওয়া যাবেনা। জ্যোতিষীরা বলেন, কোন গ্রহের ভালোমন্দ প্রভাব যখন সমতুল্য হয়ে পড়ে তখন তার কাছ থেকে ভালো আশা করা যায়না, মন্দ ফলই সে দেয়।

যখন কোন গ্রহ দুইটি মারকস্থানের অধিপতি হয়, তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেই গ্রহই জাতকের জীবন হানি করবে। যেমন মেষ লগ্নের পক্ষে শুক্র দ্বিতীয় ও সপ্তমাধিপতি। সুতরাং এর দশা অন্তর্দ্দশায় জাতকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বৃষলগ্ন জাতকের পক্ষে বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র অশুভফলদাতা। শনি ও রবি উত্তম। বৃষলগ্নের জাতব্যক্তির পক্ষে শনি একাই রাজযোগকারক। বৃহস্পতি অষ্টমাধিপতি ও একাদশাধিপতি এজন্য অশুভ। শুক্র শুভগ্রহ হয়ে কেন্দ্রাধিপতি ও ষষ্ঠাধিপতি হওয়ার দরুণ অশুভ। চন্দ্র তৃতীয়াধিপতি, এ জন্য অশুভ। রবি নৈসর্গিক অশুভগ্রহ, কেন্দ্রাধিপতি হওয়ার দরুণ শুভ। শনি একাই নবম ও দশমাধিপতি অর্থাৎ কেন্দ্র ও ত্রিকোণের অধিপতি হেতু শুভ। বুধ দ্বিতীয়াধিপতি ও পঞ্চমাধিপতি। গ্রহটি শুক্রের মিত্র। বুধ ও শনির সহাবস্থান বা সম্বন্ধ হোলে উত্তম রাজযোগ। দশা ও অন্তর্দ্দশা অশুভ ও মারক না হোলে গ্রহরা যত অশুভই হোক্ না কেন, জাতকের মৃত্যুদাতা হয় না। শুক্রের মিত্র হওয়ার জন্যই বুধ দ্বিতীয়াধিপতি হওয়া সত্বেও শুভ ফলদাতা। মঙ্গল সপ্তমাধিপতি

ও দ্বাদশাধিপতি। কিন্তু শুক্রের শত্রু। এজন্য অশুভ গ্রহ হয়ে কেন্দ্রাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও দ্বাদশাধিপতি হেতু দোষযুক্ত। অতএব গ্রহটি বৃষলগ্নে জাত ব্যক্তির মারক। বৃহস্পতি উত্তম ভাবে অবস্থিত ও দৃষ্টিযুক্ত হোলে মৃত্যুদাতা হবে না।

মিথুনলগ্নের পক্ষে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবি অশুভ। বৃহস্পতি সপ্তম ও দশমাধিপতি হেতু অশুভ। কেননা শুভগ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হোলে অশুভ এবং জাতকের মারক হয়। বৃহস্পতির অপেক্ষা মঙ্গল বিশেষ মারক। কেননা একে মঙ্গল নৈসর্গিক অশুভগ্রহ, তার ওপর ষষ্ঠ ও একাদশাধিপতি। চন্দ্র অশুভ। শুক্র একাই শুভদাতা। শুক্র ও বুধের উত্তমভাবে সংযোগ হলে রাজযোগ হয়। শনি বৃহস্পতির সঙ্গে সম্বন্ধ করলে মেষলগ্নের মত ফল দেবে। চন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে মারক হবে না। শুক্র বুধের মিত্র। এজন্য দ্বাদশাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও ত্রিকোণাধিপতি হেতুশুভ। বৃহস্পতি ও শনির সম্বন্ধ রাজযোগকারক নয়। নিষ্পাপ বুধ অশুভদায়ক। শনি অষ্টমাধিপতি ও নবমাধিপতি। এজন্য এর কাছ থেকে শুভ ফল আশাকরা যায়না। মিথুনলগ্নের পক্ষে শনি একাই রাজযোগ ভঙ্গকারক ও অশুভপ্রদ।

কর্কটলগ্নের পক্ষে শুক্র শনি ও ও বুধ অশুভ। বৃহস্পতি ও মঙ্গল শুভ ফলদাতা, মঙ্গল একাই রাজযোগ কারক। গুরুভৌম সংযোগ রবি মারক নয়। শনি প্রভৃতি অশুভ, প্রদ গ্রহরা মারক হবে। শুক্র চতুর্থ ও একাদশাধিপতি। শুক্র নৈসর্গিক শুভ গ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হওয়ার দরুণ অশুভ একাদশাধিপতির জন্য ও অশুভ। শনি সপ্তম ও অষ্টমাধিপতি। কেন্দ্রাধিপতি হেতু শুভ হোলেও অষ্টমাধিপতি হওয়াতে অশুভপ্রদ। বুধ তৃতীয় ও দ্বাদশাধিপতি হেতু অশুভ। কর্কট একটি শুভলগ্ন, এখানে চন্দ্র ও বৃহস্পতি থাকলে জাতকের জীবনে সর্কোত্তম সাফল্য ঘটে। জলরাশি হওয়াতে এলগ্নের জাতক হৃষ্টপুষ্ট ও উদার হয়। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম লগ্ন ছিল কর্কট, আরলগ্নে ছিল চন্দ্র ও বৃহস্পতি।

সিংহলগ্নের পক্ষে শনি, শুক্র ও বুধ অশুভ। মঙ্গল একাই শুভ ফল দাতা। শুক্র ও গুরুর সম্বন্ধে রাজযোগ কারক। বৃহস্পতির সঙ্গে মঙ্গলের সম্বন্ধ হোলে উত্তম ফল দেয়। শনি মারক হোলেও জাতকের মৃত্যুকারক হবেনা। মারক লক্ষণাক্রান্ত হোলে বুধ ও অন্যান্য অশুভ গ্রহ জাতকের মৃত্যু ঘটায়। শুক্র ও বুধ সম্পূর্ণভাবে অশুভ। চন্দ্র দুর্ব্বল ও দুঃস্থানগত হোলে সিংহ লগ্নের জাতকের প্রবল মারক হয়, আর চন্দ্রের দশায় মৃত্যু ঘটে। শুক্র ও মঙ্গলের সম্বন্ধ হোলেও রাজযোগ হবে।

কন্যালগ্নে জাত ব্যক্তির পক্ষে চন্দ্র মঙ্গল ও বৃহস্পতি অশুভ। শুক্র শুভ গ্রহ। বুধ এবং শুক্র মুখ্য যোগ কারক। শুক্র দ্বিতীয়াধিপতির জন্য প্রধান মারক, কিন্তু ত্রিকোণের অধিপতি হেতু রাজযোগ কারক। মঙ্গল প্রভৃতি মারক লক্ষণাক্রান্ত অন্যান্য পাপগ্রহ মারক। শনি পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাবের অধিপতি। ত্রিকোণপতি অপেক্ষা ত্রিষড়ায় পতি প্রবল, এজন্য শনি অশুভদায়ক। নৈসর্গিক শুভগ্রহ বৃহস্পতি চতুর্থ ও সপ্তম ভাবের অধিপতি অর্থাৎ কেন্দ্রাধিপতি, এজন্য অশুভ। চন্দ্র একাদশাধিপতি হেতু অশুভ। মঙ্গল তৃতীয় ও অষ্টমাধিপতি এজন্য অশুভ। রবি দ্বাদশাধিপতি, কিন্তু অন্য কোন রকম অশুভ সংযোগ না হোলে গ্রহটী বিরুদ্ধ হবেনা।

তুলা লগ্নে জাতকের পক্ষে বৃহস্পতি, রবি ও মঙ্গল অশুভ। বুধ ও শনি শুভদাতা। শনি একাই রাজযোগ কারক। চন্দ্র ও বুধের সমাবেশে রাজযোগ হয়। মঙ্গল মারক হোলেও জাতকের জীবন হন্তা হবেনা। বৃহস্পতি ও অন্যান্য পাপগ্রহগণ মারক লক্ষণাক্রান্ত হোলে মৃত্যুদাতা হবে। বৃহস্পতি তৃতীয় ও ষষ্ঠাধিপতি এজন্য অশুভ। মঙ্গল দুইটি নিধন স্থানের অধিপতি দ্বিতীয় এবং সপ্তম। তা ছাড়া মঙ্গল তুলার অধিপতি শুক্রের শত্রু, এজন্য নৈসর্গিক পাপগ্রহ হয়ে কেন্দ্রাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও শুভ ফল দাতা হবেনা। চতুর্থ ও দশমাধিপতি শনি বৃষলগ্নের নবম ও দশমাধিপতি শনির ন্যায় প্রবল রাজযোগ কারক হোতে পারেনা। বুধ দ্বাদশাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও তুলাধিপতি শুক্রের মিত্র ও নবমাধিপতি হওয়ায় শুভ। রবি একাদশাধিপতি হেতু অশুভ। বুধ ও চন্দ্রের সম্বন্ধ সংযোগে শুভ হবে। তুলালগ্নের শুক্র অশুভ। কেননা শুভগ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হেতু অশুভ এবং নিধনাধিপতি হেতুও অশুভ। মীন, বৃষ, তুলা ও ধনু লগ্ন শুভ, কেননা এদের অধিপতিগণ শুভ গ্রহ।

বৃশ্চিক লগ্নে জাতকের পক্ষে বুধ, শুক্র, শনি ও মঙ্গল অশুভ। বৃহস্পতি ও চন্দ্র শুভ। রবি ও চন্দ্রের সম্বন্ধে রাজযোগ কারক। বৃহস্পতি প্রধান মারক। বৃহস্পতির দশায় মৃত্যু। বুধ প্রভৃতি পাপগ্রহগণও মারক লক্ষণ-যুক্ত হোলে মারক। শনি মঙ্গলের শত্রু এবং তৃতীয় ও চতুর্থাধিপতি। কেন্দ্রাধিপতি হওয়া সত্বেও নৈসর্গিক পাপ-গ্রহ শনি তৃতীয়াধিপতি হওয়ার জন্য অশুভ। শুক্র মঙ্গলের শত্রু। এজন্য বৃশ্চিক লগ্নের জাতকের পক্ষে আদৌ শুভ নয়, কেন্দ্রাধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি হেতু বিশেষ অশুভ। যে সব গ্রহ পঞ্চম ও নবমাধিপতি, তারা সব চেয়ে জাতকের শুভানুধ্যায়ী। যদি দ্বিতীয়াধিপতি শুভগ্রহ হয়ে নবম কিম্বা দশম গৃহে থাকে, অথবা উত্তম যোগাযোগে বলবান হয়, তা হোলে সে জাতকের মৃত্যু দেবেনা—অথবা জীবনে বিপদের কারকও হবেনা।

ধনুলগ্ন জাতকের পক্ষে শুক্র একাই অশুভ। বুধ ও রবি শুভগ্রহ। বুধ ও রবির সম্বন্ধ রাজযোগকারক। শনি প্রবল মারক। শুক্রাদি পাপগ্রহগণ মারাত্মক দোষ-যুক্ত হোলে মারক হবে। বৃহস্পতি কেন্দ্রপতির জন্য অশুভ দায়ক। দ্বিতীয়পতি হোলেও পঞ্চমপতি হেতু জাতকের পক্ষে মঙ্গল শুভ হবে। রবি ও বুধের সহাবস্থান, পূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় প্রভৃতি হেতু রাজযোগ। শনি, রবি ও মঙ্গলের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে, মারকতাদুষ্ট হোলেও মৃত্যুদাতা হবেনা। মঙ্গল বৃহস্পতির মিত্র। সুতরাং দ্বাদশাধিপতি হওয়া সত্বেও পঞ্চমাধিপতি হেতু মঙ্গল শুভদাতা। রবি ভাগ্যাধিপতি হেতু শুভ। চন্দ্র অষ্টমাধিপতি হেতু অশুভ হয়নি, কেননা রবি চন্দ্র মারক সম্পর্কে ব্যতিক্রম।

মকর লগ্ন জাতকের পক্ষে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও চন্দ্র পাপ গ্রহ। শুক্র ও বুধ শুভগ্রহ। শনি স্বয়ং মারক, মঙ্গলাদি পাপ গ্রহগণও মারক লক্ষণ বিশিষ্ট হোলে মারক হয়। শুক্র প্রবল রাজযোগকারক। রবি অষ্টমপতি হোলেও অশুভপ্রদ হবেনা, কিন্তু শুভ ফল দাতাও হবে না। কেন্দ্রাধিপতি হওয়া সত্বেও একাদশাধিপতি হওয়ার দরুণ পাপগ্রহ মঙ্গল অশুভপ্রদ। বৃহস্পতি তৃতীয়াধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি হেতু অশুভ। চন্দ্র সপ্তমাধিপতি হেতু অশুভ। শুক্র পঞ্চমাধিপতি ও দশমাধিপতি এজন্য উত্তম, কোণাধিপতি হওয়ায় কেন্দ্রাধিপত্য দোষ নষ্ট হয়েছে। বুধের সঙ্গে শুক্রের যোগ শুভপ্রদ। কুম্ভ লগ্নেজাত ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও চন্দ্র পাপগ্রহ, একমাত্র শুক্র শুভ গ্রহ। মঙ্গল ও শুক্র রাজযোগকারক। বৃহস্পতি প্রবল মারক। বুধাদি গ্রহগণ মারক দোষ দুষ্ট হোলে মারক হয়। রবি মারকপতি হোলে ও মারক হয়না, শনি দ্বাদশপতি হোলেও লগ্নপতি কেন্দ্রপতি হওয়ার জন্য শুভ। মঙ্গল তৃতীয়াধিপতি ও শনির শত্রু হওয়ায় কেন্দ্রাধিপতি হওয়া সত্বেও শুভপ্রদ নয়। বৃহস্পতি দ্বিতীয়াধিপতি ও একাদশাধিপতি, এজন্য অশুভ। চন্দ্র ষষ্ঠাধিপতি, এজন্য অশুভ। শুক্র চতুর্থ ও নবমপতি এজন্য শুভ। যেখানে গ্রহগণ ভালোমন্দ সমতুল্য, জ্যোতিষের মতে সেখানে তারা মন্দ ফলই দেয়।

বহু জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বলেছেন, বৃষলগ্নে নানাপ্রকার অশুভগ্রহ সংযোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ অপেক্ষাকৃত ভালো, কুম্ভ-লগ্নে উত্তম গ্রহসংযোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও দুঃখকষ্ট তাকে পেতেই হবে, কুম্ভলগ্নজাত ব্যক্তিকে অপমান, লাঞ্ছনা, সমাজে অপবাদ ও নিন্দা, দুরারোগ্য ব্যাধি, গুরুতর ক্ষতি, সমাজ সংসার থেকে নির্ব্বাসন প্রভৃতি কোন না কোন ঘটনায় জীবনে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে। কুম্ভলগ্নের ব্যক্তির জীবন স্বচ্ছন্দ গতিতে চললেও শেষে পতনও অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ হবেই। যত ভাল যোগই থাকুক না কেন রাশিচক্রে, তার জীবনের পরিণতি হবে অশ্রুজলে। এজন্যেই কুম্ভলগ্নকে নিন্দিতলগ্ন বলা হয়েছে। কিন্তু বৃষলগ্নে জাতব্যক্তির রাশি চক্রে যত খারাপই গ্রহ সমাবেশ হোক্ না কেন, সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করলেও শেষে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই। বরাহমিহির যবনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই কথাই বলেছেন।

মীনলগ্নের জাত ব্যক্তির পক্ষে শনি, শুক্র, রবি ও বুধ পাপ। মঙ্গল ও চন্দ্র শুভ। গুরুভৌম যোগে রাজযোগ। দ্বিতীয় পতি হোলেও মঙ্গল মারক হবে না। শনি প্রভৃতি পাপগ্রহগণ মারকলক্ষণাক্রান্ত হোলে মারক হবে। বৃহস্পতি প্রথম ও শেষ কেন্দ্রাধিপতি, কোন মারকস্থানে থাকলে গ্রহটি জাতকের হন্তা হোতে হবে। কোন শুভ গ্রহ কেন্দ্রাধিপতি মারকলক্ষণাক্রান্ত হোলে সর্ব্বাপেক্ষা নিহন্তা হবে। রবি ব্যতীত শনি, শত্রু ও বুধ বৃহস্পতির শত্রু। রবি বৃহস্পতির মিত্র। রবি বৃহস্পতির মিত্র। রবি একটি

মাত্র গ্রহ এবং তা ষষ্ঠ। ষষ্ঠাধিপতি হেতু রবি শুভদাতা হোতে পারে না। শনি একাদশ ও দ্বাদশাধিপতি এজন্য সম্পূর্ণ অশুভ। শুক্র তৃতীয় ও ষষ্ঠাধিপতি, এজন্য অশুভ। বুধ চতুর্থ ও সপ্তমাধিপতি। পাপসংযুক্ত বুধ শুভদাতা। চন্দ্র পঞ্চমাধিপতি এবং মঙ্গল দ্বিতীয়াধিপতি ও নবমাধিপতি মঙ্গল বৃহস্পতির মিত্র, এজন্য দ্বিতীয়াধিপতি হোলেও মারকত্ব দুষ্ট হবে না, ত্রিকোণাধিপতি হওয়াতে অত্যন্ত ফল দেবে।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষ রাশি

অশ্বিনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম ও ভরণীজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। গুরুজন বিয়োগ, আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা। ধনভাব মধ্যম। বায়ু প্রকোপের আশঙ্কা। প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তৃতি। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। রোহিণীজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। কর্ম্মোন্নতি। অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মন্দ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে বাধা ও আশাভঙ্গ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম। আর্দ্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। পত্নীর জীবন সংশয় পীড়া। শারীরিক অসুস্থতা। ধনভাব উত্তম। সম্পত্তি লাভের সুযোগ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী, ভূম্যধিকারী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক অশান্তি ও মনস্তাপ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট রাশি

অশ্লেষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পুষ্যার পক্ষে মধ্যম, পুনর্বসুজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা মধ্যে মধ্যে শারীরিক কষ্ট, সন্তানের উন্নতি, ভ্রাতার পীড়া। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

সিংহ রাশি

উত্তর ফাল্গুনী জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বফল্গুনী ও মঘাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। দৈহিকভাব শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কন্যারাশি

উত্তরফল্গুনীর পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে মধ্যম। চিত্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। দেহ ভাব আংশিক শুভ, মধ্যে মধ্যে অসুস্থতা। স্ত্রীর পীড়া। স্বজনহানি। কর্ম্মস্থল শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে স্বাভাবিক। চাকুরিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা রাশি

বিশাখার পক্ষে উত্তম, চিত্রার পক্ষে মধ্যম, স্বাতীর পক্ষে নিকৃষ্ট। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শত্রুবৃদ্ধি। আয়ভাব উত্তম। ভূমিক্রয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আংশিক ক্ষতি। চাকুরির ক্ষেত্র মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশানুরূপ নয়। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধার পক্ষে উত্তম, জেষ্ঠ্যের পক্ষে মধ্যম, বিশাখার পক্ষে নিকৃষ্ট। দৈহিক ও মানসিক ভাব শুভ। পুত্রসন্তানের উন্নতি, গৃহনির্ম্মাণ। কর্ম্মসাফল্য, বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে উন্নতিযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম, মূলার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যোন্নতি ধনভাব শুভ, কর্ম্মে আংশিক বাধা, পারিবারিক অশান্তি, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাভঙ্গ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মনস্তাপ ও শত্রু বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মকর রাশি

শ্রবণায় পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম, ধনিষ্ঠার পক্ষে নিকৃষ্ট। দৈহিক ও মানসিক কষ্ট, অর্থাগম, লটারীতে প্রাপ্তিযোগ। পারিবারিক অশান্তি, ব্যয় প্রবণতা, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে পীড়াভোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

কুম্ভ রাশি

শতভিষার পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতব্যক্তির পক্ষে মধ্যম, ধনিষ্ঠার পক্ষে নিকৃষ্ট। দৈহিক ও মানসিক কষ্ট। ধনাগমে বাধা। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আয় বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, রেবতীর পক্ষে মধ্যম। পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। দেহভাব আশানুরূপ নয়। পীড়াদি কষ্ট। ধনাগম। ব্যয়বৃদ্ধি। স্বজন বিয়োগ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

কর্ম্মক্ষেত্রে গোলযোগ। শত্রুহানি। আয়বৃদ্ধি। দাম্পত্যকলহ ও মানসিক অশান্তি। পুত্রকন্যার পীড়া। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাভঙ্গ। ব্যবসায়ীর পক্ষে অর্থদণ্ড। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

বৃষলগ্ন—

শারীরিক সুস্থতা। ভাগ্যোদয়। কর্ম্মখ্যাতি। কর্ম্মোন্নতি। ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ বাধা। পারিবারিক কলহ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা। ভাগ্যোদয়ে বাধা, ব্যয়বৃদ্ধি, স্বজন-বিরোধ, আশাভঙ্গ শেষার্দ্ধে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। প্রণয়বৃদ্ধি। স্বজন-বিয়োগ। অর্থাগম। পুত্রকন্যাদির পীড়া, স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

সিংহ লগ্ন—

শারীরিক কষ্ট। মনস্তাপ। স্ত্রীর পীড়া। কর্ম্মক্ষতি ব্যবসাবাণিজ্যে কিঞ্চিৎ দুর্ভোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কন্যা লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। পারিবারিক অশান্তি। স্বজনবিরোধ। পুত্রকন্যাদির জন্য দুশ্চিন্তা। শত্রুহানি। সন্তানের উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

তুলা লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা, আয়বৃদ্ধি, মানসিক কষ্ট, কর্ম্মস্থলে অশান্তিবৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

বৃশ্চিক লগ্ন—

মানসিক উদ্বেগ, শারীরিক উন্নতি। কর্ম্মক্ষেত্র শুভ, উন্নতির লক্ষণ আছে। দাম্পত্যপ্রীতি। ব্যবসায়ীর পক্ষে সুযোগ সুবিধার অভাব, স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক স্বচ্ছন্দতা। মানসিক উদ্বেগ। পারিবারিক অশান্তি। অর্থাগম। কর্ম্মপরিচালনায় বিশৃঙ্খলতা। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা, ব্যয়বৃদ্ধি, আশাভঙ্গ, আর্থিক উন্নতি, ভ্রমণ, স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভ লগ্ন—

কর্ম্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট, দৈহিক ও মানসিক অবনতি। নানাপ্রকার অশান্তি। স্বজনবিয়োগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন লগ্ন—

শত্রুবৃদ্ধি, ব্যয়বৃদ্ধি, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। সন্তান-সন্ততির উন্নতি। পারিবারিক অশান্তি। কর্ম্মক্ষেত্রে গোলযোগ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

শ্রী'শ'—

॥ বিভাস ॥

ডাক্তার তারকেশ্বর রায়—অগ্নিপুর গ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তা
অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী আর বিভাসের ভাগ্য-

ষ্টুডিওর বাইরে বাংলা চলচ্চিত্রের সমুজ্জ্বল তারকা

শর্ম্মিলা ঠাকুর।

সিংহ লগ্ন—

শারীরিক কষ্ট। মনস্তাপ। স্ত্রীর পীড়া। কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যবসাবাণিজ্যে কিঞ্চিৎ দুর্ভোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কন্যা লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। পারিবারিক অশান্তি। স্বজনবিরোধ। পুত্রকন্যাদির জন্য দুশ্চিন্তা। শত্রুহানি। সন্তানের উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

তুলা লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা, আয়বৃদ্ধি, মানসিক কষ্ট, কর্ম্মস্থলে অশান্তিবৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

বৃশ্চিক লগ্ন—

মানসিক উদ্বেগ, শারীরিক উন্নতি। কর্ম্মক্ষেত্র শুভ, উন্নতির লক্ষণ আছে। দাম্পত্যপ্রীতি। ব্যবসায়ীর পক্ষে সুযোগ সুবিধার অভাব, স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

খবরাখবর ঃ

ভারত সরকারের উদ্যোগে এবং তথ্য ও বেতার দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় আগামী নভেম্বর মাসে ভারতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমে দিল্লীতে পরে কলিকাতা, বোম্বাই, ও মাদ্রাজে সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠানে পৃথিবীর নানা দেশের কয়েকটি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শিত হবে।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ জীবনীচিত্র "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ" শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। সেবক চিত্র-প্রতিষ্ঠানের এই চিত্রটি পরিচালনা করেছেন মধু বসু এবং কাহিনী রচনা করেছেন কথা-সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সুর যোজনা করেছেন অনিল বাগচী এবং নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অমরেশ দাস। অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে আছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি। চিত্রটির একটি সম্পদ হচ্ছে ত্রিবান্দ্রম, মাদ্রাজ, মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী, গোলকোণ্ডা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি দক্ষিণের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির দৃশ্যাবলী এতে স্থান পেয়েছে।

* * *

উত্তমকুমার ফিল্মস"-এর "জতুগৃহ" চিত্রটি আগামী মুক্তিলাভ করবে। সুবোধ ঘোষের গল্প অবলম্বনে রচিত এই চিত্রটির পরিচালনা করেছেন তপন সিংহ এবং ভূমিকালিপিতে উত্তমকুমার ছাড়াও আছেন অরুন্ধতী, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত প্রভৃতি।

* * *

খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী মঞ্জু দে পরিচালিত "স্বর্গ হতে বিদায়" চিত্রটিও শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রধান চরিত্র দুটিতে আছেন এবং পার্শ্বচরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন অনুভা গুপ্ত, বিকাশ রায়, সুমিতা সান্যাল, জহর রায়, দীপক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

"উত্তম চিত্র"-র পরবর্ত্তী ছবিটি ইষ্টম্যান্ কলারে তোলা হবে। বিশ্বজিৎ ও রাজশ্রী নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন এবং চিত্রটি পরিচালনা করবেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়।

*　　*　　*

রাশিয়ায় "রামায়ণ"

ভারতের মহাকাব্য "রামায়ণ"কে রাশিয়ায় নাটকাকারে প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়েছিল ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে। তারপর দীর্ঘ তিন বৎসর এই নাটকটি অভিনীত হয়েছে এবং গত ২৬শে জানুয়ারী

"রামায়ণ" নাটকে সীতার ভূমিকায় সোভিয়েট শিল্পী M. Kupriyanova

ভারতের রিপাব্লিক্ দিবসে মস্কোতে এই "রামায়ণ" নাটকের শততম অভিনয় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নাটকটি রচনা করেছেন Madame Gusseva-P...benko. তিনি এখন ভারতেই আছেন এবং ভারতীয়-দের রাশিয়ান্ ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করেন এবং সংস্কৃত ও রাশিয়ান্ ভাষায় তুলনামূলক বিষয় নিয়ে পড়াশুনাও করেন।

রামায়ণের মতন বিরাট মহাকাব্যকে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে মঞ্চে দেখান সহজ নয়। কিন্তু Madame G...seva এই দুরূহ কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেছেন। রাশিয়ান অভিনেত্রীদের কাছে শাড়ী পরা-... একটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়! তার ওপর ভারতীয় ভঙ্গী ও প্রকাশ রীতিও অভ্যাস করা রীতিমত কঠিন হয়ে ওঠে। মস্কোস্থিত ভারতীয় দূতাবাস অবশ্য এই দিক থেকে অনেক সাহায্য করেছেন ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য চিত্র প্রভৃতি দিয়ে। সোভিয়েট শিল্পীরাও লাইব্রেরীতে গিয়ে ভারতীয় সাহিত্যের থেকে সযত্ন পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কিছু শিক্ষালাভও করেন।

সঙ্গীত নৃত্য ও নাটকের মাধ্যমে এই নাটকটি পরিবেশিত হয়। শুধু সোভিয়েট শিল্পীরাই এই নাটকে অভিনয় করেছেন এবং রাশিয়ান ভাষার মাধ্যমেই। শুধু একটি সংস্কৃত শ্লোক "সত্যমেব জয়তে" তিন বার রামের মুখ দিয়ে বলান হয়েছে। প্রথম যখন দশরথ রামকে সাবধান করে দেয় তাড়কা রাক্ষসীর সঙ্গে যুদ্ধের আগে তখন রাম উত্তরে এই কথা বলে। দ্বিতীয়বার রাম বলে বালীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় এবং তৃতীয় বার রামকে দিয়ে "সত্যমেব জয়তে" বলান হয় যখন রাম রাবণকে নিহত করে। এই কথাটি রাশিয়ান বালকবালিকাদের এতই ভাল লেগেছে যে অনেক স্কুল ও পাইওনিয়ার ভবনে লিখে রাখা হয়েছে। ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক মৈত্রীতে এই "রামায়ণ" নাটকটি একটি বিশিষ্ট অবদান বলেই সবাই মনে করেন।

সোভিয়েটে "শকুন্তলা"

রাশিয়ার রিগা ব্যালে থিয়েটারও আর একটি ভারতীয় কাব্যকে রুশ ভাষায় নৃত্য-নাট্যে রূপায়িত করেছেন। ভারতের মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকটিকে সম্প্রতি এঁরা নৃত্য-নাট্যের রূপ দান করেছেন। ল্যাটভিয়ার প্রধান শহরে এই নৃত্য-নাট্যটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয় এবং রুশ সমালোচক ও দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই নৃত্য-নাট্যটির সাফল্যের অনেকখানি কৃতিত্ব হচ্ছে রুশ নৃত্যবিদ সার্জির এবং তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী মায়া রাও ও শিবশঙ্কর নামে দু'জন ভারতীয় নৃত্যশিল্পী।

রুশ ও ভারতীয় নৃত্য-রীতির এক সুন্দর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে এই নৃত্যনাট্যে। ব্যালে রীতির সহিত ভারতীয় নৃত্যের 'মুদ্রা,' 'ভাব' ইত্যাদি আঙ্গিকও অনুসরণ করা হয়েছে নিষ্ঠার সঙ্গে। সাজসজ্জা এবং মঞ্চপরিকল্পনাতেও ভারতীয় ভাব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের 'ময়ূরনৃত্য,' উত্তর ভারতের 'মার্গনৃত্য' এবং মধ্যপ্রদেশের 'ঢোলক-নৃত্য'র সাহায্যে "শকুন্তলার" নৃত্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। সুরকার বালসানিয়ান্ ভারতীয়-রাগ ও লোক সঙ্গীতের সুরের সাহায্যে 'সিম্ফনি' রচনা করেছেন। ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের সুর, সঙ্গীত, নৃত্য ও আঙ্গিকের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণে মহাকবির শকুন্তলা এক নবরূপ ধারণ করেছে।

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড

দ্বিতীয় টেষ্ট—বোম্বাই ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৩০০ রান (সেলিম দুরাণী ৯০ এবং চান্দু বোরদে ৮৪ রান। প্রাইস ৬৬ রানে ৩, নাইট ৫৩ রানে ২, লার্টার ৩৫ রানে ২ এবং টিটমাস ৫৬ রানে ২ উইকেট পান)।

২৪৯ রান (৮ উইকেটে ডিক্লে:। দিলীপ সরদেশাই ৬৬, এম এল জয়সীমা ৬৬ এবং বিজয় মঞ্জরেকার নট আউট ৪৩ রান। টিটমাস ৭৯ রানে ৩, নাইট ২৮ রানে ২ এবং প্রাইস ৪৭ রানে ২ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড : ২৩৩ রান (ফ্রেডী টিটমাস ৮৪ নট আউট, মাইক স্মিথ ৪৬ এবং প্রাইস ৩২ রান। চন্দ্রশেখর ৬৭ রানে ৪ এবং দুরাণী ৫৯ রানে ৩ উইকেট পান) ও ২০৬ রান (৩ উইকেটে। বোলাস ৫৭, বিঙ্কস ৫৫, স্মিথ নট আউট ৪০ রান। চন্দ্রশেখর ৪০ রানে ১, দুরাণী ৩৫ রানে ১ এবং জয়সীমা ৩৬ রানে ১ উইকেট)।

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়। ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব টসে জিতেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট পড়ে ২২৫ রান দাঁড়ায়। উইকেটে অপরাজিত থাকেন বোরদে (৫৮ রান) এবং দুরাণী (৭৩ রান)

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের কিছু আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩০০ রানের মাথায় শেষ হয়। সেলিম দুরাণীর শত রান পূর্ণ হ'তে ১০ রান বাকি ছিল। এই দিন ভারতবর্ষ শেষ ৪টে উইকেটে ৭৫ রান করে। সপ্তম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং দুরাণী ১৫৩ রান যোগ করেন— ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে নতুন রেকর্ড এবং যে কোন দেশের বিপক্ষে ভারতবর্ষের পক্ষে পূর্ব্ব রেকর্ডের সমান।

পাতৌদির নবাব
ভারতের অধিনায়ক

মাইক স্মিথ
অধিনায়ক—ইংল্যাণ্ড

বাপু নাদকার্নী

প্রথম রেকর্ড স্থাপন করেন মানকড় এবং আপ্তে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে, পোর্ট অব্ স্পেন, ১৯৫৩ সালে।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ১৪৪ রানের মধ্যে ৬টা উইকেট পায়। উইকেটে অপরাজিত থাকেন টিটমাস (১৯ রান) এবং প্রাইস (২১ রান)।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় পড়ে যায়। খেলার বাকি ১৩১ মিনিট সময়ে ভারতবর্ষ একটা উইকেট হারিয়ে ৯১ রান তুলে—ফলে ভারতবর্ষ ১৫৮ রানে অগ্রগামী হয়। উইকেটে অপরাজিত থাকেন মেহেরা (৩১ রান) এবং সারদেশাই (৪২ রান)।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষ ২৪৯ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হ'তে ২০ মিনিট বাকি ছিল। সুতরাং ইংল্যাণ্ড দল মোট ৩৫০ মিনিটের খেলা হাতে পেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। জয়লাভের জন্যে তাদের ৩১৭ রানের প্রয়োজন ছিল। চতুর্থ দিনের ২০ মিনিটের খেলায় তারা কোন উইকেট না খুইয়ে ৯ রান করে

পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ডের খেলায় জয়লাভের **কোন** চেষ্টা ছিল না। সাড়ে ৫ ঘণ্টা ব্যাট করে তারা **তিনটে** উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৮৯ রান করে—মোট রান দাঁড়ায় ২০৬ (৩ উইকেটে)।

তৃতীয় টেস্ট—কলকাতা ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ২৪১ রান (দিলীপ সরদেশাই ৫৪ এবং বাপু নাদকার্নী ৪৩ নটআউট। জন প্রাইস ৭৩ রানে ৫ এবং ডোনাল্ড উইলসন ১৭ রানে ২ উইকেট পান)

ও **৩০০ রান** (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এম এল জয়সীম ১২৯ রান। লার্টার ২৭ রানে ২, টিটমাস ৬৭ রানে ২ এবং পারফিট ৭১ রানে ২ উইকেট পান)।

ইংল্যাণ্ড ঃ ২৬৭ রান (কলিন কাউড্রে ১০৭ এবং জে বি বোলাস ৩৯ রান। দেশাই ৬২ রানে ৪, দুরানী ৫৯ রানে ২ এবং নাদকার্নী ৩৮ রানে ২ উইকেট পান)

ও **১৪৫ রান** (২ উইকেটে। মাইক স্মিথ ৭৫ নটআউট এবং কলিন কাউড্রে ১৩ নটআউট)

ক'লকাতায় ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়।

এম এল জয়সীমা

ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়ে প্রথম দিনের খেলায় ৯টা উইকেট হারিয়ে ২৩০ রান করে। উইকেটে অপরাজিত থাকেন নাদকার্নী (৩৩) এবং চন্দ্রশেখর (১৫)। দ্বিতীয় দিনে ৪১ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। নাদকার্নী ৪৩ রান করে নটআউট থাকেন। ১০ম উইকেটে নাদকার্নী এবং চন্দ্রশেখরের জুটি ৫১ রান যোগ ক'রে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের ১০ম উইকেট জুটির নতুন রানের রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল—৪৩ রান (রুশী মোদী এবং এস জি সিন্ধে, লর্ডস, ১৯৪৬)। প্রথম ইনিংসে দলের সর্ব্বোচ্চ ৫৪ রান করেন দিলীপ সরদেশাই—উইকেটে ছিলেন ১৩৭ মিনিট এবং বাউণ্ডারী করেছিলেন ৬টা।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৪৯ রান করে, ৩টে উইকেট খুইয়ে। নটআউট থাকেন কলিন কাউড্রে (২১ রান) এবং জিম পার্কস (২৯ রান)।

তৃতীয় দিন ঝির ঝিরে বৃষ্টির দরুণ ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট খেলা বন্ধ রাখা হয়েছিল। ৩ ঘণ্টা ৫ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড আরও ৪টে উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান যোগ করে। ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ২৩৫ (৭ উইকেটে)। অপরাজিত থাকেন কলিন কাউড্রে (৯০ রান) এবং ফ্রেডী টিটমাস (১২ রান)।

চতুর্থ দিনে ২৬৭ রানের মাথাতে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের অত্যন্ত মন্থর গতিতে রান করার দরুণই তৃতীয় টেষ্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের ২৬৭ রান তুলতে ৫১৩ মিনিট সময় নেয়। দ্বিতীয় দিনে ২৯৫ মিনিট খেলে মাত্র ১৪১ রান তুলেছিল। কলিন কাউড্রে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেন। নিজের ১০৭ রান তুলতে তাঁকে ৩৭১ মিনিট উইকেটে থাকতে হয়েছিল। বাউণ্ডারী করেছিলেন ১৭টা। চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষ বোলিং এবং ব্যাটিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ভারতবর্ষের রমাকান্ত দেশাই মাত্র ১১টা বল দিয়ে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসেয় শেষ তিন জন খেলোয়াড়কে (কাউড্রে, টিটমাস এবং লার্টার) আউট করেছিলেন, এ দিকে ইংল্যাণ্ডকে মাত্র ২ রান করতে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা থেকেই দ্রুত গতিতে রান করে। ৩৫ মিনিটে দলের ৫০ রান ওঠে—জয়সীমা একাই ৪০ রান করেছিলেন। চতুর্থ দিনের খেলায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮০ রান দাঁড়ায় (২ উইকেটে)। উইকেটে অপরাজিত থাকেন জয়সীমা (১০৩ রান) এবং মঞ্জরেকার (৪ রান)। জয়সীমা তাঁর ৯৮ রানের মাথায় পারফিটের বলে বাউণ্ডারী ক'রে ১০ রান পূর্ণ করেন। এই শত রান করতে তাঁকে ২৪০ মিনিট উইকেটে থাকতে হয়েছিল। বাউণ্ডারী মেরেছিল ১৩টা। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় জয়সীমার পক্ষে এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। তিনি তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী (১২৭ রান) করেন ইংল্যাণ্ডেরই বিপক্ষে (দিল্লীর ৩য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২)। ইডেন উদ্যানে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট খেলায় জয়সীমাকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত তিনজন সেঞ্চুরী করলেন। অপর দু'জন—ডি জি ফাদকার (১১৫ রান) ১৯৫১—৫২ এবং কলিন কাউড্রে (১০৭ রান, ১৯৬৪)। কাউড্রের সেঞ্চুরী ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ইডেন উদ্যানের টেস্ট খেলায় প্রথম সেঞ্চুরী।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের পর আধঘণ্টা খেলে ভারতবর্ষ

দিলীপ সারদেশাই

সেলিম দুরাণী

৩০ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন খেলার সময় ছিল ১৭০ মিনিট। ভারতবর্ষ ২৭৪ রানে অগ্রগামী ছিল। ইংল্যাণ্ড ১৭০ মিনিটের খেলায় দুটো উইকেট খুইয়ে ১৪৫ রান তুলেছিল।

চতুর্থ টেষ্ট—দিল্লী ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৩৪৪ রান (হনুমন্ত সিং ১০৫, জয়সীমা ৭৭, সরদেশাই ৪৪ এবং কুন্দরন ৪০ রান। টিটমাস ১০০ রানে ৩ এবং মর্টিমোর ৭৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪৬৩ রান (৪ উইকেটে। পাতৌদির নবাব ২০৩ নট আউট, চান্দু বোরদে ৬৭ নট আউট, কুন্দরন ১০০ এবং জয়সীমা ৫০ রান। উইলসন ৭৪ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড ঃ ৪৫১ রান (কলিন কাউড্রে ১৫১, পিটার পারফিট ৬৭ এবং জে বি বোলাস ৫৮ রান। চন্দ্রশেখর ৭৩ রানে ৩, কৃপাল সিং ৯০ রানে ৩ এবং নাদকার্নী ৯৭ রানে ৩ উইকেট।

দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ টেষ্ট খেলা ড্র যায়।

টসে জয় লাভ ক'রে ভারতবর্ষ প্রথম দিনের খেলায় ৪টে উইকেট খুইয়ে ২৪৭ রান করে। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন হনুমন্ত সিং (৭৯ রান) এবং বোরদে (২২ রান)।

দ্বিতীয় দিনে বেলা ২টা ২০ মিনিটে ৩৪৪ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। এইদিনে বাকি ৬টা উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিনের ২৪৭ রানের সঙ্গে মাত্র ৯৭ রান যোগ হয়। ভারতবর্ষ মন্থর গতিতে রান ক'রে। প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৪৪ রান তুলতে ৫১০ মিনিট সময় লেগেছিল।

হনুমন্ত সিং ৩১৫ মিনিট উইকেটে থেকে শত রান করেন—বাউণ্ডারী করেন ১৫টা। হনুমন্ত সিংকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত এই ৭ জন ভারতীয় তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছেন ঃ

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লালা অমরনাথ (১১৮ রান, বোম্বাই, ১৯৩৩), আব্বাস আলি বেগ (১১২ রান, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯) এবং হনুমন্ত সিং (১০৫ রান, দিল্লী, ১৯৬৪) ; পাকিস্তানের বিপক্ষে দীপক সোধন (১১০ রান, ক'লকাতা, ১৯৫২) এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে এ জি কৃপালসিং (১০০ নট আউট, হায়দরাবাদ, ১৯৫৫)। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড দলের পক্ষে রঞ্জিৎ সিংজী (১৫৪ নট

কলিন কাউড্রে

আউট, ম্যাঞ্চেস্টার ১৮৯৬) এবং পাতৌদির স্বর্গীয় নবাব ইফতিকার আলী (১০২ রান, সিডনি, ১৯৩২-৩৩) সেঞ্চুরী করেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ১২৪ রান করে, উইকেটে পড়ে দুটো। উইকেটে অপরাজিত থাকেন মাইক স্মিথ (১৬ রান) এবং উইলসন (২ রান)।

তৃতীয় দিনে অত্যন্ত ধীরগতিতে ব্যাট ক'রে ইংল্যাণ্ড আরও তিনটে উইকেট খুইয়ে পূর্ব্বদিনের ১২৪ রানের সঙ্গে মাত্র ২৩০ রান যোগ করে—রান দাঁড়ায় ৩৫৪ (৫ উইকেটে । কাউড্রে এই সিরিজে তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরী করেন, কমপক্ষে চারবার আউট হ'তে গিয়ে বেঁচে যান। এইদিনে উইকেটে অপরাজিত থাকেন কাউড্রে (১০২

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৪৫১ রানের মাথায় শেষ হয়। তৃতীয় দিনে রান ছিল ৩৫৪ (৫ উইকেটে) এবং এইদিনে বাকি পাঁচটা উইকেটে মাত্র ৯৭ রান ওঠে দু'ঘণ্টার খেলায়। ভারতবর্ষ ১০৭ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ১৬৬ রান করে। উইকেটে অপরাজিত থাকেন কুন্দরন (৭৩ রান) এবং পাতৌদির নবাব (৩১ রান)।

পঞ্চম দিনে ভারতবর্ষ হাত থেকে ব্যাট ছাড়েনি। ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৪৬৩ (৪ উইকেটে)। পাতৌদির নবাব ডাবল সেঞ্চুরী (২০৩ নটআউট) করেন—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের এই প্রথম ডাবল সেঞ্চুরী এবং এক ইনিংসের খেলায় সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ১৯২ (কুন্দরন, মাদ্রাজ, ১৯৬৪)। তবে

পেয়েছিলেন এবং চা-পানের পর ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে না দেখে ইংল্যাণ্ড দলও খেলায় হাল ছেড়ে দেয়—খেলাটা একটা প্রহসনে দাড়ায়। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রাণ ছিল ৩৩৫ (৪ উইকেটে)—পাতৌদির নবাব ১১৫ এবং বোরদে ২৭ রাণ। চা-পানের পর খেলা কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল তার একটা উদাহরণই যথেষ্ট হবে। পারফিটের এক ওভারে ছ'টা বলের মধ্যে পাঁচটা বল খেলে পাতৌদির নবাব ২০ রাণ করেন (২-৪-৪ ৬-৪)। দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেট-কিপার বুধি কুন্দরণের সেঞ্চুরী রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষের টেস্টে উইকেট-কীপার হিসাবে কুন্দরনই দু'টি সেঞ্চুরী করেছেন। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে উইকেট-কীপার হিসাবে সেঞ্চুরী করেছেন গড্‌ফ্রে ইভেন্স—১০৪রান (লর্ডস, ১৯৫২)। পাতৌদির নবাব এবং চান্দু বোরদে পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ১৯০ রাণ তুলে অপরাজিত থাকেন—যে কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে পঞ্চম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রাণ।

পঞ্চম টেষ্ট—কানপুর ঃ

ইংল্যাণ্ড ঃ ৫৫৯ রান (বেরী নাইট ১২৭, পিটার পারফিট ১২১, ব্রায়ান বোলাস ৬৭, জিম পার্কস ৫১ নট আউট। জয়সীমা ৫৪ রানে ২ এবং নাদকার্নী ১২১ রানে ২ উইকেট পান)।

ভারতবর্ষ ঃ ২৬৬ রান (দিলীপ সরদেশাই ৭৯ এবং বাপু নাদকার্নী ৫২ নট আউট। টিটমাস ৭৩ রানে ৬ এবং প্রাইস ৩২ রানে ২ উইকেট পান)।

ও ৩৪৭ রান (৩ উইকেটে বাপু নাদকার্নী ১২২ নট আউট, সরদেশাই ৮৭, দুরাণী ৬১ নট আউট এবং কুন্দরম ৩১। টিটমাস ৫৯ রানে ১, পারফিট ৬৮ রানে ১ এবং পার্কস ৪৩ রানে ১ উইকেট পান)।

কানপুরে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের পঞ্চম টেস্ট খেলাও ড্র গেল—ফলে ১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাই অমীমাংসিত থেকে গেল। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এইভাবে একটা টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলাই অমীমাংসিত থেকেছে ইতিপূর্বে দু'বার ঃ ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তান এবং ১৯৬০-৬১ সালে ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তান।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব পঞ্চম টেস্ট খেলাতেও টসে জয়ী হন—ফলে ১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজের পাচটি খেলাতেই তিনি টসে জয়ী হন। তাঁকে নিয়ে এইভাবে একটি সিরিজের পাচটি খেলাতেই টসে জয়ী হ'লেন ৭ জন অধিনায়ক। পূর্ব্বের ৬ জন অধিনায়ক যথাক্রমে ঃ এফ এস জ্যাকসন (ইংল্যাণ্ড), অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯০৫ সালে, এম এ নোবল (অষ্ট্রেলিয়া), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯০৯ সালে, এইচ জি ডিন (দক্ষিণ আফ্রিকা), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯২৭-২৮ সালে, জে ডি সি গডার্ড (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ), ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৪৮-৪৯ সালে, এ এল হ্যাসেট (অষ্ট্রেলিয়া), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৩ সালে এবং কলিন কাউড্রে (ইংল্যাণ্ড), দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৬০ সালে। এক দলের অধিনায়ক সিরিজের পাঁচটা খেলারই টসে জয়ী হয়েছেন কিন্তু একটা খেলাতেও জিততে পারেননি এবং সিরিজের পাচটা খেলাই ড্র—টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের ১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজ সেই দিক থেকে প্রথম নজির সৃষ্টি করলো।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯২৭-২৮ সালের টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এইচ জি ডিন পাঁচটা খেলাতেই টসে জয়ী হয়েছিলেন এবং এই সিরিজও অমীমাংসিত ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের ১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজের মত নিস্ফলা ছিল না—দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যাণ্ড দুটো ক'রে টেস্টে জয়ী হয়েছিল আর একটা খেলা অমীমাংসিত ছিল।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক টসে জয়ী হয়ে ইংল্যাণ্ডকে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ ছেড়ে দেন, ভেবেছিলেন কানপুরের উইকেটে প্রথম ব্যাট করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ড খুবই অসুবিধায় পড়বে। কিন্তু ফল উল্টো হয়। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ড ৩টে উইকেট হারিয়ে ২৫২ রান করে এবং দ্বিতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার দশ মিনিট আগে ৫৫৯ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতবর্ষ বাকি সময়ে এক উইকেট খুইয়ে ৯ রাণ করে। তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম

ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৪৫ (৪ উইকেটে)। ফলে ফলো-অন থেকে ছাড়ান পেতে ভারতবর্ষের ২১৫ রানের প্রয়োজন হয়—হাতে জমা থাকে ৬টা উইকেট।

চতুর্থ দিনে চা-পানের ১৫ মিনিট আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৬৬ রানের মাথায় শেষ হয়। ভারতবর্ষ শত চেষ্টা করেও ফলো-অনের হাত থেকে রেহাই পেল না। বাপু নাদকার্নী ৫২ রান ক'রে নট আউট থাকেন। দলের ১৮৮ রানের মাথায় সারদেশাই দলের সর্ব্বোচ্চ ৭৯ রান ক'রে আউট হ'লে তাঁর শূন্য স্থানে নাদকার্নী খেলতে নামেন। দলের অতি সঙ্কট সময়। হাতে আর মাত্র তিনটে উইকেট, এ দিকে 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও ১৭২ রানের প্রয়োজন ছিল। লাঞ্চের সময় রান দাঁড়ায় ২০৭ (৭ উইকেটে)—উইকেটে ছিলেন দুরানী এবং নাদকার্নী। অর্থাৎ 'ফলো অন' থেকে ছাড়া পেতে তখনও ভারতবর্ষের ১৫৩ রানের প্রয়োজন ছিল। দলের ২২৯ রানের মাথায় দুরানী, ২৪৫ রানের মাথায় বালু গুপ্ত এবং ২৬৬ রানের মাথায় শেষ উইকেট চন্দ্রশেখর আউট হ'ন। নাদকার্নী তাঁর নট আউট ৫২ রান তুলেছিলেন ১৪২ মিনিট উইকেটে থেকে—বাউণ্ডারী করেছিলেন ৭টা।

ভারতবর্ষ ২৯৩ রানের পিছনে পড়ে চতুর্থদিনের বাকি ১০৫ মিনিট সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় একটা উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান তুলেছিল। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন নাদকার্নী (৩৯ রান) এবং কুন্দরন (৩০ রান)।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষদিনে ইংল্যাণ্ড অনেক পরিশ্রম এবং থলিতে যতরকম খেলার কৌশল ছিল তা প্রয়োগ করেও ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করতে পারেনি। নাদকার্নী ভারতবর্ষের পরিত্রাতার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। কুন্দরণ, সারদেশাই এবং দুরাণীর সহযোগিতায় তিনিই পরাজয়ের মুখ থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করেন। প্রথম ইনিংসে ৫২ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১২২ রান ক'রে নাদকার্নী নট আউট ছিলেন। টেষ্ট ক্রিকেটে নাদকার্নীর এই প্রথম সেঞ্চুরী। এই নিয়ে তিনি ২৬টা টেস্ট ম্যাচ খেললেন ; টেস্ট ক্রিকেটে বর্ত্তমানে তাঁর পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে মোট রান ১০৮৮, এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান ১২২ (নটআউট) এবং ১৬৪৫ রানে ৫০টা উইকেট। আলোচ্য পঞ্চম টেষ্ট খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে নাদকার্নী-কুন্দরনের দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ৫০৯ রান, নাদকার্নী-সারদেশাইয়ের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ১৪৪ রান এবং নাদকার্নী-দুরাণীর অসমাপ্ত চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দলের ৭৭ রান উঠেছিল।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের ১৯৬৪ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যাটিংয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন বাপু নাদকার্নী (মোট রান ২৯৪ এবং গড় ৯৮.০০)। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কলিন কাউড্রে (মোট রান ৩০৯ এবং গড় ১০৩.০০)। উভয় দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক মোট রান করেছেন বুধি কুন্দরন (মোট রান ৫২৫ এবং গড় ৫২.৫০)। বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ভারতবর্ষের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন রমাকান্ত দেশাই (৯৭ রানে ৪ উইকেট, গড় ২৪.২৫) এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে জন্ প্রাইস (৩৮৩ রানে ১৪ উইকেট, গড় ২৭.৩৫)। ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাধিক উইকেট পান সেলিম দুরানী (৪৭১ রানে ১১ উইকেট, গড় ৪২.৮১) এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ফ্রেড টিটমাস (৭৪৭ রানে ২৭ উইকেট, গড় ২৭.৬৬)। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্ব্বাধিক মোট রান করেন ব্রায়ান বোলাস—৩৯১ রান (গড় ৪৮.৮৭)।

টেষ্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজ নিয়ে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ৯টা টেস্ট সিরিজ খেলা হ'ল। ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৬ বার, ভারতবর্ষের ১ বার (১৯৬১-৬২) এবং সিরিজ অমীমাংশিত ২ বার (১৯৫১-২ এবং ১৯৬৪)। টেস্ট খেলার ফলাফল : খেলা ৩৪, ইংল্যাণ্ডের জয় ১৫, ভারতবর্ষের জয় ৩ এবং ড্র ১৬।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২।৩।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চৈত্র—১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ঋগ্বেদের দেবী অদিতি

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ

শাল ঋগ্বেদ সংহিতার বহুস্থানে দেবী অদিতির কথা পাওয়া যায়। বহু সূক্তেই তিনি নানা ভাবে স্তুত হইয়াছেন। কোথাও আকাশ বা মর্ত্তা পৃথিবীরূপে কোথাও দেবমাতা রূপে, কোথাও দেবীবাক্ রূপে, আবার কোথাও বা দক্ষকন্যা বা দাক্ষায়ণী রূপে তিনি উপাসিত হইয়াছেন। দেবী অদিতির এই সব দেবীরূপ ছাড়া একটি ঋষিরূপও ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তিনি স্বয়ং ঋক্মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলস্থ ২৮শ সূক্তের কয়েকটি মন্ত্র তাঁহার বলিয়া বেদাচার্য্যগণ মনে করেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন বেদাচার্য্যের মতে ১০ম মণ্ডলের ৭২ সংখ্যক সূক্তটিও দেবী অদিতিরই। ইহা ছাড়াও ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলেরই ১৫৩ সংখ্যক সূক্তের ঋষি হিসাবে ইন্দ্রমাতাগণের মধ্যে দেবী অদিতিও একজন, ইহা সহজ বুদ্ধিতেই ধরিয়া লওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই অদিতি দেবীকে ঋষি হিসাবে এবং দেবমাতা ও দক্ষকন্যা হিসাবে কি কি ভাবে পাই, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দেবী অদিতির নাম বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থানে, উল্লিখিত হইলেও স্পষ্টভাবে তাঁহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়না। বেদ-মন্ত্র-ব্যাখ্যাতা আচার্য্য যাস্ক। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব

৭ম-৮ম শতাব্দী) তদীয় নিরুক্ত গ্রন্থে দেবী অদিতিকে দেবমাতা এবং মধ্যস্থানবর্ত্তী দেবীগণের মধ্যে "প্রথমগামিনী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (নিরুক্ত ৪।২২ এবং ১১।২২)। যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী বেদাচার্য্য ও নিরুক্তকারগণের (অন্ততঃপক্ষে ২৫।২৬ জনের কম হইবেনা) রচিত গ্রন্থসমূহ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের মতামত জানিবার উপায় নাই। নিরুক্তের পরবর্ত্তী বিখ্যাত গ্রন্থ "বৃহদ্দেবতায়" অদিতি দেবীর জন্মবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। বৃহদ্দেবতা শৌনকের রচিত বলিয়া জানা যায়। বেদে ব্যবহৃত শব্দসমূহের এবং সেই হেতু বেদমন্ত্রসমূহের অর্থ যাঁহারা সম্যকরূপে জানেন, তাঁহারাই হইলেন নিরুক্তকার বা শব্দার্থবিৎ মন্ত্রার্থবিদ্। বৃহদ্দেবতাকে নিরুক্ত গ্রন্থ বলা না হইলেও ইহা এক প্রকার নিরুক্তগ্রন্থই বটে। কারণ এখানে শব্দার্থ এবং মন্ত্রার্থ নির্ণয়ের সূত্রাদিও আছে (দ্বিতীয় ও অষ্টম অধ্যায়)। আর আছে সমগ্র ঋগ্বেদের সূক্ত ও মন্ত্রসমূহের কোন্ কোন্ সূক্তে বা মন্ত্রে কোন্ কোন্ দেবতা উদ্দিষ্ট ও স্তুত হইয়াছেন, তাহার ধারাবাহিক বিবরণী। মন্ত্রাদির সঙ্গে জড়িত ঋষিগণের মধ্যেও অনেকের নাম বৃহদ্দেবতায় উল্লিখিত আছে। সুতরাং বৃহদ্দেবতা একাধারে নিরুক্ত এবং দেবকোষ ও মন্ত্রকোষ, একথা বলা চলে। এতদ্ব্যতীত বেদ-মন্ত্রাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও আর্য্য পরম্পরায় প্রাপ্ত ইতিবৃত্তসমূহও বৃহদ্দেবতায় যথাসম্ভব বিবৃত আছে। দেবী অদিতি সম্পর্কিত ইতিবৃত্তটি ঠিক এরূপই একটি কাহিনী। অতীত যুগের প্রখ্যাত এক বেদাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত বেদগ্রন্থে ইতিহাস বা আখ্যানের একটি বিশেষ মূল্য অবশ্যই আছে। সুতরাং বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে বর্ণিত আখ্যানবা ইতিহাসকে ঠিক এই ভাবেই দেখিতে হইবে। ... । এর মধ্যে বৃহদ্দেবতায় বিবৃত ঋক্-মন্ত্র ... আখ্যানগুলিই এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা সংগ্রহের প্রাচীনতম নিদর্শন। তিনি বলেন :—

The comparatively large proportion (one-fourth) of narrative which it contains, in illustration of the hymns of the Rig-vedas, is thus the earliest collection of epic matter which we possess, dating as it does from a period when the Mahabharata could only have been in an embryonic state—(Introduction to brihaddevat p XXIII)। কথাটি খুব সত্য হইলেও, বৈদিক ব্রাহ্মণ অরণ্যক উপনিষদসমূহেও মাঝে মাঝে আখ্যায়িকার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এক সঙ্গে এতগুলি আখ্যায়িকা আর কোনও গ্রন্থেই নাই। যাস্কের নিরুক্তে আখ্যায়িকার সংখ্যা সে তুলনায় নগণ্যই বলিতে হয়। macdonell vedic mythology নামক বিখ্যাত গ্রন্থের উৎস এই বৃহদ্দেবতা। কিন্তু প্রভেদ এই যে, যে স্থলে যাস্ক ও শৌনক "ইতিহাস" কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, macdonell সেখানে ইতিহাস অর্থে বুঝিয়াছেন "mythology ও epic matter", বা প্রকারান্তরে প্রাচীন যুগের কল্পিত বা কিংবদন্তীমূলক কাহিনী। অনুবাদের যথার্থতা এখানেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মূলগ্রন্থ পড়া না থাকিলে এ সব অনুবাদগ্রন্থদ্বারা প্রতারিত বা ভুলপথে চালিত হওয়ার সম্ভবনাই অধিক।

বৃহদ্দেবতার একটি সংস্করণ পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন prof macdonell আমেরিকা হইতে ইংরেজী ১৯০৪ সালে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৃহদ্দেবতা যাস্ক-কৃত নিরুক্তের পরবর্ত্তী। কারণ বৃহদ্দেবতার বহুস্থলে যাস্কের মতামতের উল্লেখ ও সমালোচনা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আচার্য্য কাত্যায়ন কৃত বেদের সর্ব্বানুক্রমণী ও বাজসনেয়ি অনুক্রমণীতে বৃহদ্দেবতার মতামত বহুস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং বৃহদ্দেবতার স্থান, নিরুক্ত ও সর্ব্বানুক্রমণীর মধ্যবর্ত্তী। বৃহদ্দেবতা ও সর্ব্বানুক্রমণী, উভয়ই আবার পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ উভয় গ্রন্থই প্রাচীন বৈদিক রীতি অনুযায়ী রচিত, অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রাদির নিয়ম কানুন অনুযায়ী নহে। অধ্যাপক macdonell এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। এবারে পাণিনির কাল নির্দ্ধারিত হইলেই সর্ব্বানুক্রমণী ও বৃহদ্দেবতার কাল নির্দ্ধারণ সহজসাধ্য হয়। পাণিনির প্রসিদ্ধ বর্ত্তিককার কাত্যায়ন পাটলিপুত্রের শেষ নন্দরাজের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অতএব এই বার্ত্তিক-কার কাত্যায়ন নিঃসন্দেহে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকের লোক ছিলেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী রচনার সঙ্গে সঙ্গেই

বা অব্যবহিত পরেই বার্ত্তিক বা Supplementary রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, একথা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়। উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুকাল অবশ্যই গত হইয়াছিল। এ কারণেই ঐতিহাসিক ডঃ হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী, পাণিনি খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর লোক ছিলেন, বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন (Materials for the Study of the Early history of the Vaisnava Sect)। এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে, সর্ব্বানুক্রমণী রচয়িতা আচার্য্য কাত্যায়নকে অন্ততঃপক্ষে খৃঃ পূঃ ৫ম শতকের প্রথম পাদে ফেলিতে হয়। বৃহদ্দেবতা সর্ব্বানুক্রমণীর পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং বৃহদ্দেবতার রচনা-কাল নিঃসন্দেহে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোন এক সময়, রচিত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসমীচীন হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে দুইটি সূত্রে (২।৪।৬৩ এবং ৮।৩।১০৬) যাস্ক ও শৌনক প্রবর্ত্তিত দুই বেদচর্চা-কারী সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং এই দুই বেদাচার্য্য নিঃসন্দেহে পাণিনির বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। সম্প্রদায় গঠিত হইয়া তাহা সুপরিচিত হইতে বেশ কিছু সময় সে যুগে লাগিত। অধ্যাপক Macdonell পাণিনিকে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতকের লোক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ বার্ত্তিককার কাত্যায়নের কাল জানিতেননা। আর জানিলেও কাত্যায়ন যে নন্দরাজবংশের মন্ত্রী ছিলেন, এ খবরটি রাখিতেন না। সুতরাং তাঁহার নির্দ্ধারিত পাণিনির কাল, এবং সেই হেতু বৃহদ্দেবতার রচনাকালও (অন্ততঃপক্ষে খৃঃ পূঃ ৪০০ সাল) নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৃহদ্দেবতা ব্যতীত অনুবাকানুক্রমণী, আর্ষানুক্রমণী, ছন্দোঽনুক্রমণী এবং ঋগ্বিধান নামক শৌনক রচিত আরও ৪টি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন পণ্ডিত বেদাচার্য্য যাস্ককে খৃঃ পূঃ ৫ম শতকে বা চতুর্থ শতকেও ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন না যে যাস্কের নাম কেবল পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতেই নহে, শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণেও উল্লিখিত আছে। সুতরাং যাস্ক সম্পর্কে ছেলেখেলা না করাই ভাল। যাস্করচিত নিরুক্ত যে বৃহদ্দেবতারও পূর্ব্ববর্ত্তী, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অবশ্য যাস্ক একটি গোত্র-নাম বটে। নিরুক্তকার যাস্ক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি যাস্ক না হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি তিনি নিঃসন্দেহে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

ঋগ্বেদের ঋষি অদিতি

এবার আমরা ঋষিরূপী অদিতি দেবীকে ঋগ্বেদে কি কি ভাবে পাই, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ঋগ্বেদ ৪।১৮ সূক্ত :—এই সূক্তের দেবতা এবং ঋষি উভয়ই হইলেন ইন্দ্র ও অদিতি, মতান্তরে ইন্দ্র অদিতি ও ঋষি বামদেব। সমগ্র সূক্তটি এ তিনজনের বাক্যালাপের কথোপকথনে পূর্ণ। সুতরাং সূক্তের ইতিহাস সম্পর্কে অতীতে কিছু মতভেদ ছিল বলিয়া মনে হয়। বৃহদ্দেবতার মতে ইহা দেবরাজ ইন্দ্রের জন্মবিষয়ক সূক্ত। মাতৃগর্ভস্থ ইন্দ্র গর্ভ হইতে চিরাচরিত সহজ পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, দেবী অদিতি (ইন্দ্র-মাতা) ইহা জানিতে পারিয়া প্রাণভয়ে গর্ভস্থ সন্তানকে তিরস্কার করেন। আচার্য্য সায়ণ অন্য এক প্রাচীন মত অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা ঋষি বামদেবের জন্মবিষয়ক বৃত্তান্ত। বামদেব মাতৃগর্ভ হইতে মাতার পেট চিরিয়া বাহির হইতে সঙ্কল্প করিলে, তাহার মাতা ইহা জানিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও ইন্দ্র-মাতা অদিতির স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া উভয়ে আসিয়া বামদেবকে তিরস্কার করেন, এবং তাঁহাকে মাতৃগর্ভ হইতে সহজপথে বাহির হইয়া আসিতে পরামর্শ দেন।

ঋগ্বেদ ১০।৭২ সূক্ত। এই সূক্তটির ঋষি বৃহস্পতি, মতান্তরে দেবী অদিতি দাক্ষায়ণী। সূক্তটির আরম্ভ এরূপ :—দেবতাগণের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্ট রূপে বলা হইতেছে। ভবিষ্যতে যখন স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইবে, তখনও দেবগণ স্তুতিবাক্য দেখিবেন, ইত্যাদি। সূক্তটিতে দেবী অদিতির ৮ পুত্রের কথা বলা হইলেও তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

ঋগ্বেদ ১০।১৫৩ সূক্ত। এই সূক্তের ঋষি ইন্দ্রমাতাগণ (ইন্দ্রমাতরঃ), দেবতা ইন্দ্র। সদ্যঃপ্রসূত ইন্দ্রের নিকট যাইয়া তাঁহার মাতাগণ সেবা করিতেছেন, এবং তাঁহারই প্রসাদে উৎকৃষ্ট ধনলাভ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র, তুমি তেজ ও বলবীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; তুমি বৃত্রহন্তা ও সুখ্যসখা; তুমি স্বীয় শক্তিতে সমুদয় জগৎ অভিভূত করিয়া রাখিয়াছ ইত্যাদি।

এই সূক্তটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইলেও ভাষ্যকারগণ ইহার তাৎপর্য্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ইন্দ্রের দেহান্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ হইয়াছিল। নতুবা সদ্যোজাত শিশু ইন্দ্র ধনদানের অধিকারী, বৃত্রহন্তা, সূর্য্য-সখা ইত্যাদি কিরূপে হইলেন ?

এই ইন্দ্রমাতাগণের মধ্যে (সংখ্যায় মোট ১৩জন) যে প্রসূতি অদিতি দেবীও ছিলেন, তাহা আমরা একটু পরেই দেখিতে পাইব।

ঋগ্বেদে আদিত্যগণ :—উপরে উদ্ধৃত সূক্তগুলি ব্যতীত ঋগ্বেদের ২।২৭ সূক্তে ৬জন আদিত্যের নাম পাওয়া যায় :—যথা, মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ, দক্ষ, ভগ ও অংশ। ৯ম মণ্ডলের ১১৪ সংখ্যক সূক্তে আবার ৭জন আদিত্যের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কোন নামের উল্লেখ করা হয় নাই। এই সূক্তের ঋষি স্বয়ং কশ্যপ। আদিত্য নাম হইতে বুঝা যায়, অদিতির সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ আছে।

দাক্ষায়ণী বা দক্ষকন্যা অদিতি

এবার আমরা বৃহদ্দেবতা হইতে দেবী অদিতির পিতৃ-পরিচয়, বিবাহ, এবং সন্তান-সন্ততির বিবরণী দিতেছি। বৃহদ্দেবতার ৫ম অধ্যায়ের ১৪৩—১৪৮, এই ৬টি শ্লোকে কাহিনীটি সংক্ষেপে নিবদ্ধ আছে। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রাজাপত্যো মরীচির্হি মারীচঃ কশ্যপো মুনিঃ।
তস্য দেব্যোঽভবজ্জায়া দাক্ষায়ণ্যস্ত্রয়োদশ ॥১৪৩
অদিতি দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ।
ক্রোধা বিশ্বা বরিষ্ঠা চ সুরভির্বিনতা তথা ॥১৪৪
কদ্রূশ্চৈবেতি দুহিতৃঃ কশ্যপায় দদৌ স চ।
তাসু দেবাসুরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ ॥১৪৫
বয়াংসি চ পিশাচাশ্চ জজ্ঞিরেঽন্যাশ্চ জাতয়ঃ।
তত্রৈকা ত্বদিতি র্দেবী দ্বাদশাজনয়ৎ সুতান্ ॥১৪৬
ভগশ্চৈবার্যমাংশশ্চ মিত্রো বরুণ এব চ।
ধাতা চৈব বিধাতা চ বিবস্বাংশ্চ মহাদ্যুতিঃ ॥১৪৭
ত্বষ্টা পুষা তথেন্দ্রো দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে।
দ্বন্দ্বং তথাস্তু তজ্জজ্ঞে মিত্রশ্চ বরুণশ্চ হ ॥১৪৮

অর্থাৎ প্রজাপতির পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ মুনি বা ঋষি। এই কশ্যপের ১৩জন দেবপত্নী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন দাক্ষায়ণী বা দক্ষকন্যা। যথা :—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধা, বিশ্বা, বরিষ্ঠা, সুরভি, বিনতা ও কদ্রূ। দক্ষ এই তেরজন কন্যাকে কশ্যপের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সকল পত্নীর গর্ভে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, বয়াংসি, পিশাচ এবং অন্যান্য জাতীয় সন্তানসন্ততি জন্ম-গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা অদিতির গর্ভে দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহারা হইলেন :—ভগ, অর্য্যমা, অংশ, মিত্র, বরুণ, ধাতা, বিধাতা, মহাদ্যুতিমান্ বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র এবং সর্ব্বশেষে বিষ্ণু। ইঁহাদের মধ্যে মিত্র ও বরুণ ছিলেন যমজ। অদিতিকশ্যপের এই দ্বাদশ পুত্রই বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে (ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ইত্যাদি) এবং মহাভারত ও পুরাণাদিতে দ্বাদশাদিত্য নামে খ্যাত। বিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া তাঁহার এক নাম হইয়াছিল উপেন্দ্র। বৃহদ্দেবতায় দেববংশ ও ঋষিবংশ সম্পর্কিত এ জাতীয় বহু আখ্যান বর্ণিত আছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত মহাভারত ও প্রাচীনতম কয়েকটি পুরাণ বৃহদ্দেবতার পরে রচিত হইয়া থাকিলে, এসব গ্রন্থে বর্ণিত দেবতা ও ঋষি সম্পর্কিত আখ্যানসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস হিসেবে বৃহদ্দেবতাকে মনে করা অযৌক্তিক হইবে না। কশ্যপপত্নী ত্রয়োদশ দক্ষ কন্যার নাম মহাভারতের আদিপর্ব্বে প্রায় অবিকলভাবেই পাওয়া যায় (২৫২০ শ্লোক) যথা :—

অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা তথা।
ক্রোধা প্রধা চ বিশ্বা চ বিনতা কপিলা মুনিঃ ॥
কদ্রূশ্চ…ইত্যাদি—

শ্লোক দুইটির রচনাভঙ্গী ও শব্দ-বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তফাৎ এই যে, বৃহদ্দেবতায় উল্লিখিত বরিষ্ঠা ও সুরভির বদলে মহাভারতে প্রধা ও কপিলার নাম পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, কোনটি আগের, আর কোনটি পরের। রচনাভঙ্গী ও ভাষার দিক হইতে বিচার করিলে বৃহদ্দেবতা নিঃসন্দেহে প্রচলিত মহাভারত হইতে প্রাচীনতর। সুতরাং মহাভারতের এই শ্লোকটি বৃহদ্দেবতা হইতেও গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে। তবে এ ব্যাপারের আর একটি দিকও আছে। দেবতা ও ঋষি সম্পর্কিত আখ্যানগুলি বৃহদ্দেবতা রচয়িতার মত শাকপূণি, ঔর্ণবাভ,

ভাগুরি, যাস্ক প্রভৃতি প্রাচীনতর বেদাচার্য্যগণও জানিতেন, এই অনুমান সঙ্গত কারণেই করা যায়। যাস্কের নিরুক্তের বহু স্থলে মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "তত্রেতিহাসমাচক্ষতে" কথাটি লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই যে, প্রাচীন বেদাচার্য্যগণ এসব স্থলে ইতিহাস আছে বলিয়া মনে করিতেন। আর ইতিহাস ও পুরাণ প্রবক্তাগণের (যাহাদের কথা কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে) কাছেও যে এ সমস্ত কাহিনী অপরিজ্ঞাত ছিল না, ইহাও অনুমান করা যায়। সুতরাং আখ্যানগুলি পৃথক্ পৃথক সূত্র হইতেও মহাভারত ও পুরাণাদিতে আসিয়া থাকিতে পারে।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদিতি-পিতা দক্ষ কে ছিলেন? বৃহদ্দেবতা মতে তিনি দেববংশীয় একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সন্দেহ নাই, যাঁহার কন্যাগণও সকলেই দেবী ছিলেন। বৈদিক গ্রন্থসমূহে, এবং মহাভারত ও পুরাণাদিতে দক্ষকে একজন প্রজাপতি বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রাজা বা সম্রাটস্থানীয় পুরুষ। কিন্তু তিনি কি সত্য সত্যই একজন প্রজাপালক (প্রজাপতি) ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন? না একজন কল্পিত পুরুষমাত্র ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায়, দক্ষপ্রজাপতির বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে কোন এক প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, এবং এই গ্রন্থের রচনাকালেও সেই বংশ সগৌরবে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং দক্ষপ্রজাপতি সত্যই একজন কল্পিত পুরুষ বা রাজা ছিলেন না। দাক্ষায়ণ যজ্ঞ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের ২ কাণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত Eggeling লিখিয়াছেন :—

This peculiar modification of the new & full moon sacrifice seems to have been originated and generally to have been practised among the dakshayanas, a royal family which was evidently still flourishing at the time of our author—Satapatha Brahmana—Translated by Eggeling—S. B. E. series. অর্থাৎ দাক্ষায়ণগণ বা দক্ষবংশীয়গণই বিচিত্ররূপে রূপায়িত এই পৌর্ণমাসীয় নূতন যজ্ঞটির প্রবর্ত্তক এবং প্রধান অনুষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাও সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই রাজবংশ এই গ্রন্থরচনার কালেও সগৌরবে রাজত্ব করিতেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমরা শতপথ-ব্রাহ্মণের ৪র্থ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত কয়েকটি মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ নিম্নে দিতেছি :—

প্রথম মন্ত্র :—আদিতে প্রজাপতি সন্তান কামনায় এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় মন্ত্র :—তিনিই দক্ষ, এবং যেহেতু তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই যজ্ঞ করেন, সেহেতু ইহার নাম হয় দাক্ষায়ণ যজ্ঞ। ইত্যাদি—

তৃতীয় মন্ত্র :—পরবর্ত্তীকালে ঋষি প্রতিদর্শ শৈব্র এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং তিনি এ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া সে যুগে বিবেচিত হইতেন। ··

৪র্থ মন্ত্র :—সৃঞ্জয় দেশীয় সুপ্লন্ সাঞ্জয় শৈব্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই যজ্ঞ বিধি আয়ত্ব করেন। তিনি আরও একটি নূতন যজ্ঞ-বিধি আয়ত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুপ্লন এগুলি আয়ত্ব করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা মাত্র সৃঞ্জয়গণ (পরবর্ত্তী যুগের পাঞ্চালগণ) বলিতে লাগিলেন, "এই সুপ্লন্ দেবগণের সহিত এ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।" সুতরাং তদবধি সুপ্লনের নাম হইল সহদেব-সার্ঞ্জয়, এবং এই নামেই পরবর্ত্তীকালেও পরিচিত ছিলেন। এই সুপ্লনের যজ্ঞের ফলে অচিরকাল মধ্যেই সৃঞ্জয়গণের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি ঘটিল। তাহারা ধনে ও জনে বিশেষভাবেই পরিবর্দ্ধিত হইলেন।···

৫ম মন্ত্র :—এই দাক্ষায়ণ যজ্ঞ পরবর্ত্তীকালে ঋষি দেবভাগ শ্রৌতর্ষ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। এই দেবভাগ শ্রৌতর্ষ কুরু ও সৃঞ্জয়, এই উভয় রাজ্যেরই রাজপুরোহিতের পদে বৃত হইয়াছিলেন। একটি মাত্র রাজ্যের রাজ-পুরোহিতের পদই যথেষ্ট সম্মানের বস্তু। তায় আবার একই সঙ্গে দুই দুইটি রাজ্যের প্রধান পুরোহিতের পদ! ইত্যাদি—

ষষ্ঠ মন্ত্র :—(আরও) পরে দাক্ষায়ণ পার্বতি পুনরায় এই একই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং অদ্যাবধি তদ্-বংশীয়

দাক্ষায়ণগণ রাজ-সম্মানের অধিকারী। সুতরাং প্রকৃত মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া যে কেহ এই যজ্ঞ করিবেন, তিনিই নিঃসন্দেহে রাজ-সম্মানের অধিকারী হইবেন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের প্রধান ঋষি ছি'লন সুপ্রসিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রমাণ অনুসারে এই যাজ্ঞবল্ক্য কুরুরাজ পরীক্ষিতের পৌত্র শতানীকেরও কিছুকাল পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা যায় (তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ;—জনক সভায় জারৎকারব আর্ত্তভাগ বনাম ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য)। শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি খুব সম্ভবতঃ তাঁহার নিজের রচিত নয়, তাঁহার কোন শিষ্য প্রশিষ্যের রচিত হইবে। সুতরাং এই দক্ষবংশীয় রাজাগণ যে অন্ততঃপক্ষে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেরও পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ দেখা যায়না। দক্ষবংশের প্রতিষ্ঠাতা দক্ষপ্রজাপতি ও পরবর্ত্তী যুগের দক্ষ-পার্বতি যে দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। একজনের উপাধি প্রজাপতি, অপর জনের শুধু "পার্বতি"। এই দুইজনের অন্তর্বর্ত্তীকালে শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণ অনুসারেই প্রতিদর্শ শৈক্ল ও তৎশিষ্য সুপ্লন্ সাঞ্জয়, এবং দেবভাগ শ্রৌতর্য, অন্ততঃপক্ষে এই তিনজন ঋষি বর্ত্তমান ছিলেন। শেষোক্তজন আবার একই সঙ্গে কুরু ও সৃঞ্জয়, এই উভয় রাজ্যেরই রাজপুরোহিতের পদে বৃত ছিলেন। ঋষি দেবভাগ শ্রৌতর্ষ প্রতিদর্শ শৈক্লের অন্যতর শিষ্য ছিলেন কিনা, তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে তাঁহারা তিনজন, এবং দক্ষবংশীয় রাজা দক্ষ-পার্বতি, সকলেই যে প্রাচীন বৈদিক যুগের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দাক্ষায়ণ যজ্ঞ-বেত্তা আদি মানব-ঋষি প্রতিদর্শ শৈক্ল সম্ভবতঃ দক্ষ-রাজবংশেরই কোন এক পুরোহিত ছিলেন, এবং তিনি রাজাদের রাজধানীতেই সাধারণতঃ বসবাস করিতেন। কারণ তিনি নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া সেখানকার কোন রাজবংশের পৌরোহিত্যে বৃত হইয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ নাই। তৎশিষ্য সুপ্লন সাঞ্জয়, এবং পরবর্ত্তীকালের দেবভাগ শ্রৌতর্ষ, উভয়েই এই যজ্ঞবিধি জ্ঞাত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা মাত্রই রাজপুরোহিতের পদে বৃত হন, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সে যাহা হউক, দক্ষ-পার্বতি নামটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া প্রদেশের রাজা, পার্বতি শব্দের এই সরলার্থ ধরা হইলে, প্রজাপতি দক্ষ-বংশীয় দক্ষ-পার্বতি নিশ্চয়ই কোন এক পার্বত্য প্রদেশের রাজা ছিলেন। পুরাণাদিতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী, হরিদ্বার-সংলগ্ন কনখলেই দক্ষ প্রজাপতির রাজধানী ছিল বলিয়া লিখিত আছে। হরিদ্বার-বাসীগণ আজও পর্য্যন্ত এই কনখলকেই দক্ষরাজার রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং আদি রাজা প্রজাপতি দক্ষ ও তদ্‌বংশীয় দক্ষ-পার্বতি ও অন্যান্য দক্ষ বা দাক্ষায়ণগণ এই কনখলেই রাজত্ব করিতেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। কনখলের কতকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে আদি দক্ষ-রাজার প্রাচীন প্রাসাদ বলিয়া পাণ্ডাগণ ও স্থানীয় লোকেরা দেখাইয়া থাকেন। ইহা সত্য না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আদিরাজা দক্ষ প্রজাপতি ত দূরের কথা, তাঁহার বহুকাল পর র্ত্তী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে কিংবা তৎপরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত প্রাসাদও এত দীর্ঘকাল মাটির উপরে থাকিতে পারেনা। এগুলি হয়, আরও অনেক পরবর্ত্তীকালের দক্ষ রাজবংশ কর্ত্তৃক, নতুবা তৎস্থানে রাজ্যস্থাপনকারী অপর কোন রাজবংশ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকিতে পারে। মহাভারতের যুগের পরবর্ত্তীকালে রচিত একমাত্র শতপথব্রাহ্মণেই সম্ভবতঃ এই রাজবংশের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অন্যত্র কোথাও এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। মহাভারত এবং পুরাণাদিতেও এই রাজবংশাবলীর কোন ধারাবাহিক উল্লেখ চোখে পড়ে নাই। সুতরাং ইতিহাসের কোন্ অধ্যায়ে দেবতা প্রতিষ্ঠিত এই মহাকুলীন রাজবংশের পতন ঘটিয়াছিল, তাহা আজ আর জানিবার উপায় সম্ভবতঃ নাই। এমনও হইতে পারে যে, সমতল ভূমির প্রবলতর কুরু ও সৃঞ্জয় রাজ্যের চাপে পড়িয়া এই রাজবংশ অধিকৃত রাজ্য পরবর্ত্তীকালে হিমালয় প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং এজন্যই মহাভারত ও পুরাণাদিতে উদ্ধৃত রাজবংশ তালিকায় তাঁহাদের নাম নাই। বস্তুতঃ এই সমস্ত গ্রন্থে হিমালয়ের কয়েকটি তীর্থস্থান ব্যতীত কোন রাজবংশাবলীর উল্লেখ দেখা যায় না। কারণ ইহাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল সমতলভূমির রাজবংশসমূহ।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ঋষি দেবভাগ শ্রৌতর্ষ

ঋষি প্রতিদর্শ শৈক্লের প্রত্যক্ষ শিষ্য তিনি খুব সম্ভবতঃ ছিলেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কারণ শৈক্লের সাক্ষাৎ শিষ্য সুপ্লনের মৃত্যুর পরই তাঁহার কুরু-পাঞ্চাল দেশে আগমন ও পৌরোহিত্য গ্রহণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যত দূর মনে হয়, তিনি শৈক্লের পরবর্ত্তী অপর কোন দক্ষবংশীয় পুরোহিতের নিকট হইতে এই বিদ্যা লাভ করেন। শ্রুতর পুত্র এই দেবভাগ শ্রৌতর্ষের নাম ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় (৮।৩৯।৯)। এই উল্লেখকে তাঁহার প্রাচীনত্বের দ্যোতক বলিয়া মনে করা যায়। সেখানে লিখিত আছে যে, ঋষি দেবভাগ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় এক অতি বিচিত্র পশু বিভাগ জানিতেন। কিন্তু তিনি এই বিদ্যা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ স্বীয় অর্জ্জিত বিদ্যার ফল-ভোগ তাঁহার অদৃষ্টে বেশীদিন ঘটে নাই, এবং তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কোন উপযুক্ত শিষ্য তৈরী হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি কুরু ও সৃঞ্জয় বংশের কোন্ কোন্ রাজার পৌরোহিত্যে বৃত হইয়াছিলেন, তাহা লিখিত থাকিলে তাঁহার সময় নির্দ্ধারণ করা কিছুটা সহজসাধ্য হইত। এই দেবভাগ শ্রৌতর্ষ বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্লনের পিতৃভূমি উত্তর প্রদেশ হইতে হিমালয়ের প্রান্তদেশে অবস্থিত হরিদ্বারের দূরত্ব খুব বেশী ছিলনা।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করিবার পূর্ব্বেদক্ষের জামাতা ঋষি কশ্যপের সন্তান-সন্ততির পুনরুল্লেখ করিব। বৃহদ্দেবতায় শুধুমাত্র দেবী অদিতির দ্বাদশ পুত্রের কথাই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কশ্যপের অপর দ্বাদশ পত্নীর গর্ভে যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের নাম (দেবতা?), অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, বয়াংসি, পিশাচ ও অন্যান্য জাতিরূপে সাধারণভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদ্দেবতার অনু-বাদক অধ্যাপক Macdonell উরগ ও বয়াংসি অর্থে পুরাণের সর্প এবং পক্ষীই বুঝিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। ঋষির ঔরসে, দেবীর গর্ভে দেবতা গন্ধর্ব্ব রাক্ষস—পিশাচ ইত্যাদির সঙ্গে সর্প এবং পক্ষীর জন্ম বিচিত্র বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ঋষি কশ্যপকে প্রজাপতি আখ্যা দেওয়া হইলেও তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি অবশ্যই ছিলেন না। সুতরাং তাহার পক্ষে দেবতা-মনুষ্য ইত্যাদি ব্যতীত অন্য জাতীয় জীবসৃষ্টি যুক্তিসঙ্গত বা শ্রুতি সঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ত লিকায় কোন পশুর উল্লেখ নাই। পশু কি সর্প এবং পক্ষী হইতেও অধম? সুতরাং এই উরগ এবং বয়াংসি অর্থে শৌনক সম্ভবতঃ মানুষই মনে করিয়া থাকিবেন, যাহারা হয়ত সর্পরূপী ও পক্ষীরূপী কোন কোন দেবতার উপাসক হইয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে প্রতীকেরই পদবী-লাভ করিয়া ছিলেন। এই ভাবে নাগ-দেবতার উপাসকগণ নাগ বা সর্প উপাধি, এবং পক্ষী দেবতার উপাসকগণ পক্ষী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃত রহস্য সম্ভবতঃ ইহাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে বৃহদ্দেবতার কোন প্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থ পাওয়া যায়না। তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই বেদাচার্য্যের প্রকৃত মনোভাবের কিছুটা আন্দাজ করা যাইত। পরবর্ত্তী কালে মহাভারত ও পুরাণাদিতে নানা আখ্যায়িকার মধ্যে এই নাগ ও পক্ষী জাতীয়গণ সর্প এবং পক্ষীরূপেই চিত্রিত হইয়াছেন, দেখা যায়। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে সার্পরাজ্ঞী নামে এক অতি উচ্চ পর্য্যায়ের ঋষিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শৌনকের বৃহদ্দেবতায় সার্পরাজ্ঞী বা নাগরাণীর দৃষ্ট সূক্তের (১৮৯তম সূক্ত) সবিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। বাসুকী নামে একটি গোত্রের সাক্ষাৎও আমাদের দেশে পাওয়া যায়। আক্ষোভ্য, অনন্ত ও বাসুকী এই গোত্রের তিনটি প্রবর। তথাকথিত সর্প-প্রধান গণের নামের সঙ্গে এই ঋষিগণের নাম সাদৃশ্য তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়না কি? নাগো-পাধিক বাসুকী ও অনন্ত ঋষিকে পুরাণাদিতে পরবর্ত্তী যুগে সর্প হিসাবেই চিত্রিত করা হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে নাগবংশীয় ঋষি আস্তিক কর্ত্তৃক রাজা জনমেজয়ের নাগবধে (সর্পবধে) বাধাদানের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। কশ্যপ-বংশীয় নাগগণের কেহ কেহ সম্ভবতঃ কাশ্মীর অঞ্চলে বসবাস করিতেন। কাশ্মীরের অনন্তনাগ, ভেরী-নাগ প্রভৃতি স্থান হয়ত প্রাচীন যুগের সেই নাগ-প্রধান গণের স্মৃতিই বুকে লইয়া বর্ত্তমান আছে। তবে তাঁহাদের অধিকাংশই সম্ভবতঃ প্রাচীন যুগসমূহে ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলেই বসবাস করিতেন, এবং পরে ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। নাগ বা শিশুনাগ বংশীয় নাগ রাজাদের সাক্ষাৎ আমরা মগধে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে পাই। পরবর্ত্তী কালে কনিষ্কের সময়ও আমরা পশ্চিম ভারতে নাগ-বংশীয় রাজাগণের উল্লেখ পাই। তাহারও কিছুকাল পরে গুপ্ত-সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সঙ্গেও মথুরা অঞ্চলের নাগরাজাদের বহু যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সুতরাং নাগ শব্দটি দেখিলেই তাহাকে সর্প বলিয়া ধারণা করা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। Cunninghamএর মতে তক্ষক নাগের বংশধরগণ তক্যাক্ বা তকিয়াক্ নামে এখনও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠান জাতির এক শাখা হিসাবে বর্ত্তমান আছেন। পক্ষী-জাতীয় মানুষের বংশধরগণও হয়ত আমাদের মধ্যেই অন্য কোন নামে মিশিয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই আদিতে দেববংশীয় বা আর্য্য পিতা-মাতারই সন্তান ছিলেন। সুতরাং বংশ-মর্য্যাদায় আর্য্যই ছিলেন, অনার্য্য নহে। মহাভারতের যুগের মহারাজ জরাসন্ধ ও তদবংশীয়গণেরও পরবর্ত্তী যুগের শিশুনাগবংশীয় রাজাগণের রাজধানী রাজগৃহে (বর্ত্তমান রাজগির) মহাভারতের সভাপর্ব্বে উল্লিখিত "মণিনাগের মন্দির" এখনও মনিয়ার মঠ নামে পরিবর্ত্তিত আকারে দাঁড়াইয়া আছে।

আমার তরী ডুবল ভাবি মনে

কুমারশঙ্কর রায়শর্ম্মা

আমার তরী ডুবল ভাবি মনে।
ঝঞ্ঝাবাতে পড়ি
উঠল ভীষণ নড়ি,
এমন বাধা এল কি কুক্ষণে।
জীবনে মোর ফাগুন যবে আসি
দিল দোলা মনে
ভুলিনি সে ক্ষণে
ভুলিনি তার অরূপ মোহ-হাসি।
আমার এ মন ঝঙ্কারিছে আজো—
স্বার্থ-কুটের রাশি
সকলি ভুল; হাসি
আবার চির ফাগুন তুমি সাজো।

হ'লনা আর মনের কথা শোনা।—
সামাল দিতে তরী
ব্যাকুল মন মরি,
হ'লনা আর সুরের জাল বোনা।
কঠিন আঘাতে শংকা দিল ভরি
আমার মনে। এল
বিপদ এবার। গেল
মালা আমার ঢেউএর জলে পড়ি।
মিলন আমার ঘুচল ফাগুন মনে।
কঠিন লোল-আঁখি
পারবে না কো সে কী?
আমার তরী ডুবল ভাবি মনে॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রহ্লাদ : তারপর গুরুদেব ? বিবাহ হ'ল ?

বিষ্ণুঠাকুর : হ'ল—কিন্তু বলে না—there is many a slip between the cup and the lip ? ঠিক যে-মুহূর্তে আত্মসমর্পণের শেষ মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে যাব : যে, আমি শুধু গুরুরই দাস, আর কারুর নই—ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার দুর্বলতা এক বিপর্যয় অনিচ্ছার রূপ ধরল। ওকে গুরুদেবের আশ্রমে টেনে তুলে যে-বিমল আনন্দে মন ছেয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দেখি সে-আনন্দ একেবারে উবে গেছে চিরদিনের জন্যে ওর ভার নিতে হবে এই দুর্ভাবনায়। এ-দুর্ভাবনার আরো একটা কারণ—ওকে তো তখন চিনতাম না, ভালোও বাসি নি। শুধু দয়া ও আশ্রয়-দানের পৌরুষগর্বই উড়ে এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে বসেছিল। ভালোবাসার মর্ম তো তখন জানতাম না, তাই নন্দিনীর জন্যে হঠাৎ প্রবল কামনা জেগে মন যেন কালো হ'য়ে গেল—বিবাহের ঠিক আগের রাতে: কিছুতেই ঘুম আসে না। সে কত আথাল পাথাল চিন্তা! অনেকক্ষণ ছটফট ক'রে শেষরাতে স্বপ্ন দেখলাম, নন্দিনী আমার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে পাগলের মত কাঁদছে: "আমাকে ছেড়ে যেও না—আমি তাহ'লে বাঁচব না।"

ভোরবেলা উঠে মন শুধু যে অস্থির হ'য়ে উঠল তাই নয়, নন্দিনীর জন্যে উদ্দাম চঞ্চল হ'য়ে উঠল। মোক্ষদা গিয়েছিল গঙ্গাস্নানে। আমি সেখানে গিয়ে ওকে সব খুলে বললাম--কিছুই গোপন না ক'রে। শুনে ও যেন পাথর হ'য়ে গেল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, বললাম: "কী হয়েছে ?" ওর সাড় এল। আমার দিকে স্থিরনেত্রে, তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল: "বেশ। কেবল এখন—আমার একটা কথা রাখবে ? গুরুদেবকে সব খুলে বলো।" আমি চমকে উঠলাম: "কী ? নন্দিনীর কথা ?" ও বলল: "হ্যাঁ।" আমি শিউরে উঠে বললাম: "সে আমি পারব না।" ও বলল: "কেন পারবে না ? যিনি তোমার জন্যে এত ভাবেন—যাঁকে তোমার গুরু ব'লে বরণ করেছ, তাঁকে সব বলতে পারবে না এ কেমন কথা ?" আমি বললাম: "তুমি পারো ?" ও বলল: "তাঁকে বলতে পারি না, কারণ তিনি আমার গুরু নন। তবে এমন কিছু নেই যা তোমাকে বলতে আমার বাধে।" আমি অবাক্ হ'য়ে বললাম: "আমি ? কী বলছ তুমি ?" ও বলল: "হ্যাঁ তুমিই আমার গুরু, কাল রাতে স্বপ্নে পেয়েছি আমি। এখন তুমি আমাকে গ্রহণ করো বা না করো, আমি তোমাকেই গুরু ব'লে জানব ও মানব—যেখানেই থাকি না কেন।" ব'লে একটু থেমে জলভরা চোখে বলল: "কাল আমি কী পেয়েছি শুনবে ? পেয়েছি মন্ত্র—আর তোমার কাছেই—না, তোমার এ-বাইরের মূর্তির কাছে নয়,—যে তুমি নন্দিনীর মতন মেয়ের জন্যেও আকুলি-বিকুলি করো—মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছি আমি তোমার অন্তর যিনি আলো ক'রে আছেন তাঁরই কাছে। সেই তুমি—অর্থাৎ আসল তুমি—কাল শেষরাতে জ্যোতির্ময় রূপ ধ'রে আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বললে যে, আমাকে শিষ্যা ব'লে তুমি পায়ে ঠাঁই দিয়েছ, আর আমি তখনি গিয়ে লুটিয়ে পড়লাম তোমার পায়ে:

একূলে ওকূলে দুকূলে গোকূলে আপনা বলিব কায় ?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ওদুটি কমল পায়।"

ব'লেই আমার পায়ে মাথা রেখে সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না!

আমার সব দ্বিধা কেটে গেল। মনে শুধু যে হঠাৎ জোর এসে গেল তাই নয়—চোখের সাম্‌নে বিছিয়ে গেল এক পবিত্র আলো—সে যে কী নীল আর সুন্দর আলো—আহা, আজও ভাবতে চোখে জল আসে ঠাকুরের অপার করুণার কথা ভেবে। কারণ সে-আলো তো যে-সে আলো নয় বাবা, সাক্ষাৎ নীলমণি ঠাকুরের শ্যামল অঙ্গের আলো। ওকে উঠিয়ে জড়িয়ে ধ'রে বললাম: "আমাকে ক্ষমা করো মোক্ষদা, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। মন যার কামনাবাসনার ডাকে অধীর হ'য়ে ওঠে, গুরুর কৃপা পেয়েও যার অন্তরে সংশয় আসে, সে পবিত্রতার মর্ম বুঝবে কেমন ক'রে বলো? আমি এখনো মনে করি—প্রতিভায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে আমি কেওকেটা নই। কিন্তু আসলে আমি আজো অজ্ঞানই বলব—কেন না যা জানলে গীতার ভাষায় 'জানার আর কিছু বাদ থাকে না' সেই পরমার্থের জ্ঞানই আমার হয় নি। কেবল এইটুকু আমি জানি যে, আমি মনেপ্রাণে সত্যজিজ্ঞাসু—এখানে আমার ফাঁকি নেই। তাই না আমার চোখের ঠুলি আজ গুরুকৃপায় খ'সে পড়ল, আমি দেখতে পেলাম তোমাকে তোমার স্বরূপে, 'আমার রক্ষাকবচ হ'য়ে তুমি যে এসেছ ঠাকুরের কৃপায় কৃপায়, কৃপায়'—বেজে উঠল আমার বুকের তারে। আমার সংশয়গ্রন্থি আজ ছিন্ন হয়েছে, তোমাকে আমি চিন্তে পেরেছি ব'লে, অস্থিরতার আঁধারে এসেছে এই বিশ্বাসের আলো যে, সত্যসন্ধানের তীর্থযাত্রায় তুমি আমার সহযাত্রিণী হ'লে আমার প্রতি বাধা হবে সহায়, শৃঙ্খলেও বেজে উঠবে নূপুর। তাই আমি গুরুদেবের নির্দেশে চলব প্রতিপদে কথা দিচ্ছি। তুমি আর কেঁদো না।"

সেদিন পুণ্য ঝুলন পূর্ণিমার আলোয় নির্জন গঙ্গাতটে আমাদের বিবাহ হ'ল—গুরুদেবের পৌরোহিত্যে। পিতৃদেব আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। বন্ধুবান্ধবেরা মুখ ফেরালো, পিসিমা মোক্ষদাকে অভিশাপ দিয়ে আমাকে লিখলেন যে আমার আর মুখদর্শন করবেন না। এককথায় আমরা হলাম পুরোপুরি অকিঞ্চন—ঠাকুরের বরে গুরুর মাধ্যমে।

উনিশ

প্রহ্লাদ (রুদ্ধশ্বাসে): তারপর গুরুদেব?

বিষ্ণুঠাকুর (গাঢ়কণ্ঠে): তারপর আর কী? ভাষায় কি তার বর্ণনা করা যায় বাবা, সে-অপূর্ব তীর্থযাত্রা?—সেই দুই অকিঞ্চনের জড়ে ঝড়ে আঁধ'রে আলোকে হাত ধরাধরি ক'রে চলা লক্ষ্যপথে—কাঁটায় ফুল ফুটিয়ে, বিষের মধ্যেও সুধার সন্ধান পেয়ে, পদে পদে গুরুর নির্দেশে চ'লে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণের আলোয় নিজেকে চিনে! গুরুদেবের আশ্রমে আমরা একবৎসর ছিলাম কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না ক'রে। তারপরে তাঁর কয়েকটি শিষ্য ক্রমে আমাদের সহায় হ'ল—বিশেষ আমার কীর্তনে আকৃষ্ট হ'য়ে। আমরা নিলাম আকাশবৃত্তি।

তারপর এমনও দিন গিয়েছে যখন দু'তিন দিন অন্ন জোটে নি—শুধু গঙ্গাজলে ক্ষুধানিবৃত্তি ক'রে কীর্তন করতে হয়েছে। কিন্তু তারপরে যখনই ও যতবারই আর সব আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ঠিক তখনই এসেছে যাকে জ্ঞানদাস বলেছেন "অচলা চপলা" আর একবার নয়—বারবার। (গাঢ়কণ্ঠে) আর···আর সব শেষে এলো পবিত্রতার চিত্তশুদ্ধির পরম উপলব্ধি—যার ছোঁওয়ায় সব কামনা বাসনার বন্ধন পড়ল খ'সে, অম্‌নি অন্তর উঠল গেয়ে: 'অনপেক্ষ' অবস্থা লাভ হয়েছে। যতবারই ঠাকুরকে ডেকেছি মনে প্রাণে যে, শুধু তাঁরই আশ্রয় চাই আর কারুর নয়—ততবারই ঘটেছে একটা না একটা অঘটন, সঙ্গে সঙ্গে মিলেছে অকূলে আশ্রয়। গুরুদেবের এক ধনী শিষ্য দিল আমাদের তাঁর গঙ্গামুখী বাগানবাড়ি। আশ্রমের পত্তন হ'ল।

তারপর সুরু হ'ল সাধন-জীবনের আর এক নতুন বিচিত্র অধ্যায়: কেবল একলা সাধনার নয়—দুজনে মিলে একমুখী সাধনার দীক্ষা—যার কথা গুরুদেব বলেছিলেন। শেষে প্রেমের আলোয় যখন কামনার কালির লেশও রইল না, তখনই প্রথম বুঝলাম প্রেম কী বস্তু। কিন্তু সে উপলব্ধি মুখে বলবার নয় বাবা, কেন না যার হয় নি তাকে বোঝানো যায় না যে, কামনার লেশ থাকলেও সে-প্রেমের উপলব্ধি হয় না, হ'তে পারে না, যার রংকে চণ্ডিদাস উপাধি দিয়েছেন "নিকষিত হেম"। আর এ উপলব্ধি আমার হ'ল আমার নিজের তপস্যায় নয়—ওর সংস্পর্শে। নারী সম্বন্ধে

…লতার আর চিহ্নও রইল না। আজো মনে পড়ে বাবা, গুরুদেবের একটি ভবিষ্যদ্বাণী: "ওঁকে তোমার হ'য়ে আমি বরণ করেছি কেন জানো? আমি দেখতে পেয়েছি ব'লে যে ও এসেছে তোমার শক্তি হ'য়ে—রক্ষাকবচ হ'য়ে। এ কথার অর্থ তুমি বুঝবে সেদিন যেদিন পূর্ণ চিত্তশুদ্ধির পরে মুক্তিলাভ করবে সব অহঙ্কার ও কামনাবাসনার গ্লানি থেকে। সেদিন বুঝবে যে, তোমার জীবনে ঠাকুরের নির্দেশ নানাভাবে এলেও তাঁর কৃপার প্রত্যক্ষ প্রতিমা হ'য়ে এসেছে ঐ একরত্তি মেয়ে—স্বভাব-যোগিনী, সাধন-সঙ্গিনী।

*　　　*　　　*　　　*

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নিটোল হ'য়ে উঠল, শুধু ভেসে আসে গাছের পাতার মৃদুমর্মর!…

একটু বাদে চোখ মুছে প্রহ্লাদ বলল: "আশীর্বাদ করুন গুরুদেব যে, কৃপার যে-উপলব্ধি আপনার হয়েছে তার কিছু প্রসাদ যেন আমরাও পাই।" ব'লে প্রণাম করল তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে। তিনি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "পাবে বাবা পাবে—যদিও আমি যেভাবে পেয়েছি সেভাবে হয়ত নয়।"

প্রহ্লাদ মুখ তুলল: "মানে?"

বিষ্ণুঠাকুর: লক্ষ্য এক হ'লেও পথ প্রত্যেকেরই ভিন্ন তো। তাই সদ্গুরুর কর্তব্য শুধু খেইটি ধরিয়ে দেওয়া! লক্ষ্যের পথে চলতে হবে কী ভাবে কোন্ ছন্দে—সে-নির্দেশ আসবে কেবল তোমার অন্তর থেকে। আমি শুধু এ সূত্রে একটি কথা তোমাকে বলতে চাই আজ: যে, আমি এতদিন তোমার যে উপলব্ধির পথ চেয়ে ছিলাম সে-উপলব্ধি তোমার হয়েছে ব'লে আমার মন আজ গান গেয়ে উঠেছে। শুধু শিষ্যই তো গুরুর মুখ চেয়ে থাকে না বাবা, গুরুও যে থাকে শিষ্যের মুখ চেয়ে। "তোমার কেবল একটি বাধা ছিল—বা আড়াল বলাই ভালো। সেটা আজ ঘুচে গেছে। তাই আজ তোমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সুরু হ'ল।"

প্রহ্লাদ: "আড়াল? কী আড়াল গুরুদেব?"

বিষ্ণুঠাকুর: তোমার মনে একটু অভিমান জমেছিল—"আমি বড় আধার।" তাই আমি পথ চেয়ে ছিলাম—কবে আঘাত পেয়ে তোমার চোখ খুলবে।

প্রহ্লাদ: আঘাত?

বিষ্ণুঠাকুর: হ্যাঁ বাবা। তোমার এ-আঘাত পাওয়ার দরকার ছিল ঠেকে শিখে যে, শুধু যে মহাদেব ও গৌরী যা পারল তুমি পারলে না তাই নয়, রমা-যে-রমা—যাকে তুমি নিজে দীক্ষা দিয়েছ—সেও গভীর শোকের বিষাদকে জয় করতে পারল শুধু তুমিই হেরে গেলে। এই দীনতার অনুভূতি তোমার যখন এল—অর্থাৎ যখন তুমি উপলব্ধি করলে যে, নিজেকে বড় মনে করলে মানুষ ছোট হ'য়েই যায়, যে অকিঞ্চন হয় সেই পায় জগন্নাথকে—তখনই তোমার শেষ আড়াল ঘুচে গেল। প্রত্যেক সাধককেই কোনো না কোনো সময়ে তার নিজের চরিত্রের সব চেয়ে বড় বাধাকে এই ভাবে জয় করতে হয় অনেক ভুগে তবে—সাহেবরা যাকে বলে crossing the last hurdle. (থেমে ঈষৎ হেসে) কিন্তু কৃপা পাওয়া আবার আর এক ফ্যাসাদ বাবা, অর্থাৎ দায়িত্ব আছে। এর ভাষ্য এই যে, এবার তোমাকে গুরু হ'তে হবে।

প্রহ্লাদ (সকুণ্ঠে): না না, এমন না গুরুদেব—মিনতি করি—অযোগ্যকে দেবেন না এ-গুরুভার।

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে): এর পরেও আত্মধিক্কার? গীতায় ঠাকুর বলেন নি কি—নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ? কিন্তু থাক এসব ফালতো কথা। আমি তোমাকে আজ বলতে চাই একটি কথা। মন দিয়ে শোনো। (একটু থেমে) আমাদের দেশে ব্রহ্মবিদ্যা—পরাবিদ্যা—আজো জীবন্ত আছে, গুরুশিষ্যপরম্পরায় তার আলো আমাদের সাধকেরা বহন ক'রে এসেছেন ব'লে। এ আলো হ'ল কর্মোজ্জ্বলা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আলো। এর জের টেনে চলা যায় না, অর্থাৎ সাধনা পূর্ণসিদ্ধির প্রসাদ পায় না, যদি শিষ্য গুরুর দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করার পরে তার অধিকারী শিষ্যদেরও সেই দীক্ষা না দেয়। বিদ্যা যে অর্জন করেছে তার একটি মস্ত দায়িত্ব আছে—সে-বিদ্যায় আরো পাঁচজনকে দীক্ষা দেওয়ার। এ-দায়িত্বকে স্বীকার করা চাই আরো ব্রহ্ম-বিদ্যার ক্ষেত্রে। কারণ যদিও ব্রহ্মবিদ্যা দেওয়া যায় কেবল অধিকারীকে—কিন্তু এ-অধিকারীকেও গ'ড়ে পিটে নিতে হয় পদে পদে। আমি গুরুর কাছ থেকে যে-আলো যে কৃপা যে-শক্তি পেয়েছি, যে-চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিসুধার স্বাদ পেয়ে অমৃত হয়েছি সে-স্বাদ কি ঠাকুর দিয়েছেন

আমাকে কেবল আমার জন্যে? না। ঠাকুর আমাদের দেন তো জমাবার জন্যে নয়—শুধু বিলোবার জন্যে খাটাবার জন্যে, বাড়াবার জন্যে। খৃষ্টদেবের সেই বিখ্যাত কথিকাটি স্মরণ করো: প্রভু বিদেশযাত্রার সময়ে তিনটি ভৃত্যকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে গেলেন রাখতে। দুজন সেটাকা খাটিয়ে বাড়ালো। প্রভু ফিরে এসে খুসি হ'য়ে তাদের বখশিশ দিলো। তৃতীয় ভৃত্যটি বলল: প্রভু, আমি কত যত্নে আপনার দেওয়া টাকাটি বাক্সে রেখেছি দেখুন। প্রভু তাকে ধম্‌কে জরিমানা করলেন সে টাকাটি কেড়ে নিয়ে। বাবা, পাবার সঙ্গে সঙ্গে দেবার দায়িত্বও স্বীকার করতেই হবে, নৈলে সে পাওয়া সত্য হ'তেই পারে না। এইজন্যেই গীতায় বলেছে—যে কেবল নিজের জন্যেই রাধে সে পাপের অন্ন মুখে তোলে। তাই যার স্বধর্ম গুরু হওয়া তাকে শিষ্যবরণ করতেই হয় আরো এই কারণে যে, শিষ্যকে দীক্ষা দিয়ে অধিকারী ক'রে তুলতে না পারা পর্যন্ত অধ্যাত্মবিদ্যার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় না। তা-ছাড়া ভাগবতে বলেছে 'গুবর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষু' কিনা শুধু গুরুরূপ সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞানচক্ষুর প্রসাদেই মানুষ সেই দিব্যদৃষ্টি পায়—যার প্রসাদে সে দেখতে পায় কিসে কী হয়—নিষ্কাম হ'তে পারে মানুষ কোন্ সাধনায়। এ-যুগের অবিশ্বাসীরা প্রায়ই ফাঁকা বৈজ্ঞানিক বুকনি আওড়ে গুরুবাদকে বাতিল করতে চায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দূরবীণ দিয়ে গুরুবাদের অনন্ত আকাশের অগুন্তি জ্ঞানের নীহারিকার কতটুকুই বা দেখতে পাওয়া বলো? গুরুবাদের মর্মজ্ঞ হ'তে পারে কেবল সেই ভাগ্যবান্ যে অনুগত শিষ্য হ'য়ে আত্মাভিমান জয় ক'রে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হয়েছে। কেমন জানো? বৈজ্ঞানিক ভাষায়ই একটি উপমা দেওয়া যায়—বিদ্যুতের প্রবাহ চালু করতে হ'লে চাই conductor, বটে তো? রবার কি কাঁচের মধ্যে দিয়ে এখানকার বিদ্যুৎ ওখানে পৌঁছে দেওয়া যায় না—ধাতুর তার চাই। ঠিক তেম্‌নি গুরুশক্তির বিদ্যুৎও কারুর হৃদয়ে পৌঁছে দিতে হ'লে চাই দীক্ষারূপী conductor; অর্থাৎ দীক্ষা নিয়ে শিষ্যের হৃদয়কে গ্রহিষ্ণু receptive ক'রে নিতে না পারলে ব্রহ্মবিদ্যাকে দাতার হৃদয় থেকে গ্রহীতার হৃদয়ে সংক্রামিত করা যায় না। আমার গুরুদেব একটা কথা প্রায়ই বলতেন যে, দীক্ষালব্ধ উপলব্ধিই সংক্রামক বুদ্ধিবাদের বাহাদুর থিওরিদের সাজিয়ে বড় জোর শোভাযাত্রার মিছিল জাঁকানো যেতে পারে, তার বেশি নয়।

কিন্তু একটা কথা: গুরু যে হবে তাকে হ'তে হবে নিষ্কাম নির্লোভ আত্মজিৎ। এর জন্যে চাই ভগবানে নির্ভর। তুমি আজ যখন সদ্‌গুরু হ'য়ে ফুটে উঠেছ তখন তোমাকে পুরোপুরি ভগবানের 'পরে নির্ভর করতে হবে। শুধু যে মনে রাখতে হবে কিছুই তোমার নয় তাই নয়—অন্নচিন্তা অর্থচিন্তাও ছাড়তে হবে, নিতে হবে আকাশ-বৃত্তি। এর নাম ভিক্ষাজীবী হওয়া নয় বাবা, এর নাম আত্মকেন্দ্রিকতা ছেড়ে ভগবৎকেন্দ্রিকতাকে বরণ করা। 'মনে রাখবে—শিষ্য বা অনুরাগীদের কাছ থেকে যা কিছু পাবে সব তিনিই দিচ্ছেন তোমাকে তাদের 'মাধ্যমে। কেন? না, তুমি তাদের দান গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদানে তাদের বিলোতে পারবে ভগবৎকৃপা। তারা দেবে তোমাকে ইহলোকের অনিত্য পাথেয়, প্রতিদানে তুমি দেবে তাদের নিত্যলোকের শাশ্বত পাথেয়—পারের পারাণি। এরি নাম সদ্‌গুরুর স্বধর্ম—গুরুরূপ সূর্যের বরে দিব্যদৃষ্টির প্রভাপ্রসাদ বিলোনো। বুঝলে?

প্রহ্লাদ (প্রণাম করে): বুঝেছি গুরুদেব। আপনার কথা শিরোধার্য।

কুড়ি

বন্দনা ও রমা প্রহ্লাদ ও সাবিত্রীকে স্টেশনে তুলে দিতে এল। রমা বলল: "মামাবাবু! আমার মনে কেবল একটি ভয় আছে, পাছে বাবা এবার আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান। আপনি বলবেন তাঁকে যে, আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে তাঁকে ভাবতে হবে না। আমি চিরকুমারী থাকব।"

প্রহ্লাদ ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বলল: "বলব, কিন্তু সে শুনবে ব'লে মনে হয় না, মা!"

সাবিত্রী টুকল: "কিন্তু বিয়ে করবে না কেন মা? গুরুদেব তো বলেন, বিয়ে না করলে পূর্ণ যোগ হয় না—বিশেষ ক'রে মেয়েদের।"

রমা: কোনো কোনো মেয়েদের তো হ'তেও পারে?

সাবিত্রী (বন্দনাকে) : পারে কি ? গুরুদেব কী বলেন ?

বন্দনা (ইতস্ততঃ ক'রে) : গুরুদেব কোনো বিষয়েই অনড় অচল বিধান দেন না। যেমন গৃহস্থকে বলেন ঘরে থেকে যোগ করলেই স্বধর্ম পালন করা হবে—তেম্‌নি এও বলেন যে, সন্ন্যাসী হবার সংস্কার নিয়ে যারা জন্মেছে তারা গৃহস্থাশ্রমে থাকলে স্বধর্ম ভ্রষ্ট হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুব জোর দিয়েই বলেন যে, এরকম বিশ্ববিতৃষ্ণ সংস্কার নিয়ে খুব কম সাধকই জন্মায়। (রমার দিকে ফিরে) কিন্তু কিছু মনে করিস নি ভাই, তুই বিয়ে করবি না কেন ? (হেসে) আমি তো ভাবতেই পারি না তুই গেরুয়া প'রে বনবাসে চিম্‌টে হাতে ক'রে হোমের আগুন উস্কে দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলছিস নচিকেতার স্ত্রীসংস্করণ ব'লে : মরার পরে মানুষ দেবতা হয় না অপদেবতা—সেই খবরই আমায় বলো, আর কোনো বর চাই না আমি। (ওর চিবুক ধ'রে) এমন রূপ এমন মুখ—কালিদাসের ভাষায় "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা"কে কি সন্ন্যাসিনীর ভেখ মানায় দিদি ?

রমা (লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হ'য়ে) : তুমি কী যে বন্দনাদি ! মুখের কোনো আগল নেই। গুরুদেবের সাম্‌নে—

প্রহ্লাদ (হেসে) : আমি সেরকম গুরু নই মা, যার নাম "মহদ্ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্।" বলতে কি, আমার বাধ্য গুরু হবার দৃশ্য যখন আমি একটু ধ্যানে দেখার চেষ্টা করি, তখন আমার মনে হয় আমার প্রিয় কবির অপূর্ব মেবারপতন নাটকে সগর সিং-এর একটি খেদ—যখন জাহাঙ্গীর বললেন তাকে উদয়পুরে রাণা হ'য়ে বসতে। সগর সিং কেঁদে বলেছিলেন : "এ ভারি অন্যায়, মুঠোর মধ্যে পেয়ে আমাকে রাণা ক'রে দেওয়া !"

সবাই হেসে ওঠে, হাসি থামলে প্রহ্লাদ রমাকে বলল : "তাই মা একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—সোজা প্রশ্ন, কিন্তু সোজা উত্তর চাই। প্রশ্নটি এই—তুমি কি মনে করো তুমি চিরজীবন সন্ন্যাসিনী থাকলে সুখী হবে ? বিয়ে করতে কি তোমার একটুও ইচ্ছে হয় না ?"

রমা মাটির দিকে তাকিয়ে আরো লাল হ'য়ে উঠল। ঠিক এই সময়ে গার্ড বাঁশি বাজালো। বন্দনা হেসে টুপ্‌ ক'রে বলল : "ঠাকুরের দয়ার কি শেষ আছে বোন্ ? দেখ্‌, কী সময়ে তিনি বাঁশি বাজালেন গার্ডের ছদ্মবেশে !"

ট্রেণে উঠে বসতেই প্রহ্লাদ সাবিত্রীকে শুধালো : "বন্দনা অমন ঠাট্টা করল কেন জানো ?"

সাবিত্রী (আশ্চর্য হ'য়ে) : তুমি জানো না সত্যি ?

প্রহ্লাদ : কী ?

সাবিত্রী : রমা ধ্রুবকে ভালোবাসে।

প্রহ্লাদ (মেঘলা মুখে) : ও: !—(একটু পরে) কিন্তু সে তো সাত হাত জলের তলে।

সাবিত্রী (বিস্মিত) : মানে ?

প্রহ্লাদ : সে তো এখন বিলেতে।

সাবিত্রী : তাতে কী ?

প্রহ্লাদ : না, কিছু না, তবে ওদেশে গেলে মানুষ যে কী বিষম বদ্‌লে যায়—সময়ে সময়ে যেন চেনাই যায় না। ও একটু চঞ্চল তো স্বভাবে।

সাবিত্রী : কী যে বলো ? আমের বীজে কখনো আমড়া ফলে ? সেদিন জাপান থেকে কী লিখেছে তোমাকে ধর্মের সম্বন্ধে ?

প্রহ্লাদ (হেসে ফেলে) : ঠিক সময়ে ধম্‌কেছ। অভিবাদন। আর ভাবব না ধ্রুবর সম্বন্ধে।

একুশ

প্রহ্লাদ কাশী থেকে ফিরেই দেহুতে দুটি ধর্মার্থী দম্পতীকে দীক্ষা দিল। কয়েকদিনের মধ্যেই রটে গেল : গুরুজি আকাশবৃত্তি নিয়েছেন, গুরুজি ঠাকুরের দর্শন পেয়েছেন গুরুজি হয়ত এবার দণ্ডকমণ্ডলু নিয়ে বনে চলে যাবেন···এমনি রকমারি গুজব।

মানুভাই খবর পেয়ে ছুটে এল—আরো এই জন্যে যে গৌরীর হঠাৎ জলে ডুবে যাওয়ার খবর পেয়ে গুরু আশ্রম ধর্ম ভগবান্ মন্ত্র তন্ত্র সব কিছুর পরেই তার ধূমল ক্ষোভ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছিল। তা ছাড়া চরিত্রহীন হ'লেও গৌরীকে শুধু যে সে ভুলতে পারে নি তাই নয়, যাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ধ'রে নিয়েছিল হাতের পাচ, সে দূরে চ'লে গিয়ে তার কাছে প্রায় একমাত্র বাঞ্ছিতার

রূপেই আসত কামনার কাঁটাবনে ও কল্পনার স্বপ্নলোকে। শুধু এই জন্যেই গৌরীর জীবদ্দশায় রমা প্রহ্লাদের শিষ্যা হয়েছে শুনে ও বিরক্ত হ'লেও মুখে প্রহ্লাদকে একটি কথাও বলে নি—গৌরী ফিরে এলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে ভেবে। কিন্তু তার হঠাৎ জলে ডুবে যাওয়ার পরে বহুদিনের নিরুদ্ধ আক্রোশকে আর সে দাবিয়ে রাখতে পারল না—স্থির করল প্রহ্লাদকে যা মুখে আসে ব'লে মনের ঝাল মেটাবেই মেটাবে।

মোটরে এসে ভোঁ ভোঁ ক'রে হর্ন দিতেই প্রহ্লাদ বেরিয়ে এল: "একী! মনুদা! বাইরে থেকে ঘন ঘন শৃঙ্গধ্বনি কেন? ভিতরে এসো।"

মনুভাই: না, আমার কাজ আছে—শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—

সাবিত্রী (ছুটে এসে): দাদা! আসুন আসুন। (ব'লেই চোখে আঁচল)

অগত্যা মনুভ ই ভিতরে এসে বসল।

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ।

সাবিত্রী: দিদির শ্রাদ্ধে কাশী গেলেন না কেন দাদা?

মনুভাই (আতপ্ত কণ্ঠে): শ্রাদ্ধ আবার কি? আপনি তো জানেন বোঠান, কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করিনা।

সাবিত্রী (চমকে): ও!

প্রহ্লাদ: তাহ'লে আমার কাছে এলে কেন? আমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তীর্ণ করতে?

মনুভাই (ঝাঝালো স্বরে): না, ওঝা হ'য়ে ভূত ছাড়াতে—ধর্মের ভূত। শুনলাম তুই না কি আকাশবৃত্তি নিয়ে গুরুগিরি সুরু করেছিস?

প্রহ্লাদ: আকাশবৃত্তি নিয়েছি সত্যি—কেবল—

মনুভাই: থাম্। আমি তোর সাফাই শুনতে আসি নি, শুধু কান মলে দিতে এসেছি—এত দেখেও তবু তোর চৈতন্য হ'ল না? আকাশবৃত্তি? পাগলামি ছাড়।

প্রহ্লাদ: ঠিক বুঝলাম না। কী এমন দেখলাম যার পরে আকাশবৃত্তি হ'য়ে ওঠে পাগলামি?

মনুভাই: কী দেখলি—দু দুটো জলজ্যান্ত মানুষ ধর্ম করতে গিয়ে অপঘাতে মোলো—মালতীটা বেঁচে গেছে কেন জানি না—বোধ হয়—এখনো দীক্ষা নেয় নি ব'লেই।

প্রহ্লাদ: পাগলামি করছে এখন কে দাদা?

মনুভাই: কে? তুই—তুই—তুই। যাকে বলে—মিডসামার ম্যাডনেস! আকাশবৃত্তি নিয়ে অনাহারে মরবি নাকি? চোখ দুটো কি মুখ সাজানো? ঘরে কি স্ত্রীপুত্র নেই? আপনি কী বলেন বোঠান? না, এতে আপনিও সায় দেন? Oh! the limit!

সাবিত্রী: দাদা, আমার কথা তো আপনার অজানা নেই। আমি চিরদিনই চেয়েছি ওঁর সহধর্মিণী হ'তে।

মনুভাই: ব্রাভো বৌঠান, ব্রাভো! এমন না হ'লে আর kindred spirit—soul mate! ভিক্ষুর হাত ধ'রে ভিক্ষুণী—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি—spectacular, per excellence! (হাততালি)

সাবিত্রী: দাদা! কেন অনর্থক রাগ করছেন? একটু ঠাণ্ডা হোন। চা ক'রে আনি?

মনুভাই: থ্যাংক্‌স্ বোঠান। না আমার সময় নেই—আমি শুধু ওকে বাঁচাতে এসেছি—যদি পারি অবশ্য। (প্রহ্লাদকে) এই শেষবার বলছি—ওরে মতিচ্ছন্ন! এবার প্রকৃতিস্থ হ—in the name of sanity and horse sense!

প্রহ্লাদ (হেসে): তোমার "অশ্বমতি"-র রায় কি এই যে, ধর্ম কর্ম সবই পাগলামি?

মনুভাই: শুধু পাগলামি নয়—পিণ্টো ঠিকই বলে—plus মাৎলামি!—এই ধর্ম ধর্ম ক'রেই আমরা ডুবেছি।

প্রহ্লাদ: আর বিজ্ঞানের বর্ম চর্ম প'রে ওরা শান্তির সমুদ্রে চিৎসাঁতার কাটছে, না?

মনুভাই: কী বকছিস পাগলের ম'ত! কোথায় ওরা আর কোথায় আমরা! They are everywhere—জলে স্থলে আকাশে, আর আমরা nowhere—মানে, পাতালে। ওরে গর্দভ! Science is salvation, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

প্রহ্লাদ: কেবল দুঃখ এই যে, অয়নটা ওদের টেনে এনেছে প্রায় চিরশয়নের রসাতলে। সেদিন পড়ছিলাম ওদের দেশেরই তিনচারজন দিক্‌পালের লেখায় যে, নাস্তিক সায়েন্সই মানুষকে আজ দিয়েছে—যে-মন্ত্র তুমি এইমাত্র

আওড়ালে তার আধুনিক সংস্করণ "ধ্বংসং শরণং গচ্ছামি।" মানুষ তাই তো নামতে নামতে শেষে পৌঁচেছে অ্যাটম বোমার নরকে। সেই সায়েন্স হ'ল কিনা স্যালভেশন! ফুঃ!

মনুভাই: ফুঃ—মানে? what do you mean, you must? সায়েন্স মানুষের উপকার করে নি বলতে চাস? প্রেস, মোটর, রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সিনেমা, রেডিও, ইলেকট্রিসিটি, এয়ারোপ্লেন, মেডিসিন, সার্জারি—এ সবই ফক্কিকারি যে বলে—

প্রহ্লাদ (বাধা দিয়ে): আমি যা বলি নি তা আমার মুখে নাই বা চাপালে দাদা! বিজ্ঞান মানুষের কোনো উপকার করে নি এমন কথা যে বলে সে মূঢ়। আমি শুধু বলতে চাই যে, বিজ্ঞান শুধু মানুষের বাইরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেরই ব্যবস্থা করতে পারে, তার এক তিলও বেশি না। স্যালভেশন? ভূতের মুখে রামনাম?

মনুভাই: শুধু বাইরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য? সায়েন্স মানুষকে কত enlightment, জ্ঞান, সাহস দিয়েছে—কত মিথ্যা ভয়ের সুপারষ্টিশনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে—অস্বীকার করতে পারিস?

প্রহ্লাদ: না। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার নতুন ভয়ের ভূত চাপিয়েছে—আর এ-ভূত যে-সে-ভূত নয়—দস্তের কবন্ধ ব্রহ্মদৈত্য—একেবারে শ্মশানশান্তি—শুধু মানুষের না, জীব জন্তু কেউই বাঁচবে না অ্যাটম দৈত্যের প্রলয়তাণ্ডবে—না, একটু অত্যুক্তি হ'য়ে গেল, হয়ত উত্তর দক্ষিণ মেরুতে কয়েকটা জলচর মাছ সগৌরবে নব জলরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারেও বা—ছত্রপতি তিমিরাজকে বরফের সিংহাসনে বসিয়ে।

মনুভাই: তুই কী প্রলাপ বক্‌ছিস বল্ তো—raving like a boozing idiot! সায়েন্সের এ-বি-সি-ও না জেনে—

প্রহ্লাদ: আশা করি বার্টরাণ্ড রাসেল সাহেব সায়েন্সের এ-বি-সি জানেন? সেদিন তিনি নিউইয়র্ক টাইম্‌সে লিখেছেন একটি প্রবন্ধে যে, এ-বৈজ্ঞানিক কুরুক্ষেত্রের অবসানে শুধু যে কোটি কোটি লোক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ্ব'লে পুড়ে মরবে তাই নয়—আসবে নিশ্চিহ্নপর্বের পর্ব—যদি দুচার কোটি বাঁচেও তাদের সন্তানরা হবে বিকলাঙ্গ, জড়ভরত, বা উন্মাদ। কিন্তু এ-কুরুক্ষেত্রের মডার্ণ ব্রহ্মাস্ত্র—হাইড্রোজেন বোমার পাহাড় তৈরি ক'রেও কাপালিক মহাবৈজ্ঞানিকদের মন খুসি হয় নি, তাঁরা রাষ্ট্রপতিদের তাঁবেদার হ'য়ে আদা জল খেয়ে লেগেছেন বার করতে—আরো কম সময়ে আরো বেশি মানুষের ভবলীলা সাঙ্গ করা যায় কী উপায়ে—আর তাকেই বিজ্ঞানরত্ন উপাধি দেওয়া হবে—যে বার করতে পারবে একটি বোমায় এক একটি প্রদেশকে এমন ভাবে উৎসাদন করতে যে শকুনি পর্যন্ত থাকবে না সে হাড়ের শ্মশানে।

মনুভাই: রাবিশ্! পিন্টো বলে এসবই ইডিয়টিক অ্যালার্মিষ্টদের ভূতের ভয় দেখানো।

প্রহ্লাদ: তোমার সবজান্তা পিন্টোর মহাবাণী করজোড়ে মেনে নিতে বাধছে শুধু এই জন্যে যে, আণবিক বোমার কীর্তিকলাপ ইতিমধ্যেই কিছু দেখেছি আমরা।

মনুভাই (সব্যঙ্গে): ফুঃ! দেহুতে ব'সে দেখেছিস তো শুধু কয়েকটা মনগড়া মূর্তি—হ্যালিউসিনেশন—আর—

প্রহ্লাদ (পাশের দেরাজ থেকে একটি চিঠি বার ক'রে): তবে শোনো, শুধু দেহুতে ব'সে দেখা নয়—ধ্রুব বিলেত থেকে আমেরিকা হ'য়ে এখন জাপানে—কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরবে। গত সপ্তাহে সে লিখেছে বৌকে (চিঠি খুলে) না, পালালে চলবে না দাদা,—বোসো শুনতেই হবে। (পড়ে):

"মা! জাপানে এসে বড় আনন্দেই ছিলাম। কী সুন্দর যে এদের দেশ! কিন্তু হঠাৎ আমার হরিষে বিষাদের কথা ব'লে একটু মন হাল্কা করতেই আজ এ-চিঠি লিখতে বসেছি—কোথা থেকে জানো? —জাপানের বিখ্যাত নাগাসাকি বন্দর থেকে। এখানে পরশুদিন এসেছি বাবার এক জাপানী শিষ্যের অতিথি হ'য়ে। তার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছে আরো এই জন্যে যে, সে বিজ্ঞানের শক্তিকে সর্বার্থসাধিকা উপাধি দেয় না। বাবার মুখে শুনতাম আমরা মনে আছে? যে, বিজ্ঞান আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে যেমন মঙ্গল করেছে তেমনি আমাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাসের ভিৎ জখম ক'রে নাস্তিকতার দীক্ষা দিয়ে ক্ষতিও করেছে প্রচুর। সেদিন কথায় কথায় বন্ধুকে একথা বলতে না বলতে বন্ধু—এঁর নাম নোগুচি—বাঁকা হেসে

বললেন : 'প্রচুর ক্ষতি কী বলছ ধ্রুব ? এই বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিক গুরুদের ধামাধরা শিষ্য হ'য়ে আমরা যে-ঢালু পথে গড়াতে সুরু করেছি সে-পথের শেষ হতে পারে কেবল আত্মঘাতের রসাতলে।' ব'লে সেদিন এই শহরে প্রথম আণবিক বোমা পড়ার কাহিনীর বর্ণনা করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্রথম বোমা শ্মশান ক'রে দেয় সুন্দরী হিরোশিমা নগরীকে। দ্বিতীয় বোমা পড়ে এই শহরে—নাগাসাকিতে —১৯৪৫ সালে, ৯ই আগষ্ট তারিখে। নোগুচি বললেন সে সময়ে তিনি ছিলেন এখানে। সে-চোখে-দেখা মুষল-পর্বের যে-বর্ণনা তিনি দিলেন মা, তার কী নাম দেব জানি না, শুনে শুধু হতভম্ব হ'য়ে যেতে হয়। ভাবো : একটি মাত্র বোমায় শহরের এক-তৃতীয়াংশ ধূলিসাৎ হ'য়ে মারা যায় ৩৯০০০ নরনারী শিশু, আহত হয় ২৫০০০—ভাবতে পারো ? আর শুধু মৃত্যু নয়, বন্ধু বললেন : সে যে কী যন্ত্রণাময় মৃত্যু ধ্রুব—ভাবা যায় না! স্বচক্ষে না দেখলে আমি নিজেই হয়ত বিশ্বাস করতে পারতাম না, কারুর হাত উড়ে গেছে, কারুর চোখ, কারুর পা—কয়েকজনের দেহে চামড়া নেই—শুধু আছে দগদগে ঘা—যেমন পশুপক্ষীদের ছাল ছাড়ালে হয় না ? —ঠিক তেমনি নোগুচি বললেন তীব্র কণ্ঠে : 'ধ্রুব! মানুষ নাস্তিক বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি করতে করতে আজ হ'তে চলেছে পিশাচ।' বলতে বলতে তাঁর দুচোখ জলে ভ'রে এল : 'আর কখন ওরা বোমা ফেলল ভাবো ভাই একটিবার : ঠিক যখন জর্মনি ও ইতালি হার মেনেছে—রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জাপানের বিরুদ্ধে। আমরা জানতাম যে, আর বড় জোর দুতিন মাস—তার পরে আমাদের মিত্রশক্তির শরণাপন্ন হ'তেই হবে। তবু যে ওরা দু'দুটো মানুষের গড়া শহরে নরকের বীভৎস ঝাণ্ডা উড়িয়ে এমন পৈশাচিক কাণ্ড করতে পারল —সে-হাহাকার এমন ব্যাপক হ'তে পারত কি যদি বিজ্ঞান তার জোগান না দিত ? মানুষ অবিশ্যি চিরদিনই মারামারি কাটাকাটি ক'রে এসেছে—কারণ ভিতরে ভিতরে আমরা আজো বর্বরই আছি। কিন্তু গথ, হুন ভ্যাণ্ডালদের মতন বর্বরেরাও এহেন বীভৎস হত্যার রক্তরাঙা দেয়ালি জ্বালতে পারে নি। তাই বুঝি এযুগের নবমুক্তিদাতা বৈজ্ঞানিক ঘাতক এগিয়ে এলেন, বললেন রাষ্ট্রপতিকে উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে : আর ভাবনা নেই মহারাজ! জানেন না তো—আহারনিদ্রা ভুলে রাক্ষসী রিসার্চ ক'রে আমি কী অপূর্ব মারণাস্ত্র বার করেছি! এর আগে আকাশ থেকে গোলা ছুড়ে নানা শহরে নানা বাড়িঘর ভেঙেছি বটে, কিন্তু হায়রে বেশির ভাগই বেঁচে গেছে বোমার সংখ্যা তথা শক্তি কম ছিল ব'লে। তাই কাপালিক তপঃশক্তির হোমানলে এমন রাক্ষসী কৃত্যাকে সৃষ্টি করেছি যে আর চিন্তার কোনো কারণ নেই—সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেব এবার। বেশি বোমার আর দরকার হবে না—এক একটা বোমায় এক একটা প্রদেশ শ্মশান হ'য়ে যাবে, নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রাণই তো আনে যত রাজ্যের জঞ্জাল—তাই প্রাণলীলার সমাপ্তিই হ'ল সত্যিকার মুক্তি। আর জ্ঞানীরা বলেন শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তার এর পরে—দেখুন না—এমন বোমা বার করলাম ব'লে—যার ধ্বংসশক্তি হিরোসিমা নাগাসাকির বোমাযুগলের লক্ষ গুণ হবে। যে কথা সেই কাজ—'। বললেন বন্ধু নোগুচি মৃদু হেসে—'এরই মধ্যে মুক্তিদাতা বৈজ্ঞানিক যে-হাইড্রোজেন বোমা বানিয়েছেন তার একটি বা দুটিতে লণ্ডন বা নিউইয়র্ক বা টোকিয়োর মতন বিরাট শহরও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছেয়ে যাবে শুধু মৃত স্ত্রী-পুরুষ জীব জন্তু শিশুদের হাড়ের ধুলোয়, রক্তের কাদায়। এ মিথ্যে ভূতের ভয় দেখানো নয় ভাই, আমেরিকার রণবীররা প্রমাণ করে দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক আক ক'ষে যে মাত্র একদিনের আণবিক যুদ্ধেই রুশ ও আমেরিকার ত্রিশ চল্লিশ কোটি মানুষ মারা যাবেই যাবে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে একজনও থাকবে না আই-উইটনেস-রিপোর্ট লিখতে। প্রিন্সটন য়ুনিভার্সিটির বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ হার্মান কাণ Hermann kahn তাঁর বিখ্যাত Thermonuclear war গ্রন্থে সম্বোধন করেছেন রণচণ্ড রাজেন্দ্রদের : মাভৈঃ! তিনশো কোটি ডলার খরচ ক'রে রাজ্যজোড়া মাটি খুঁড়লেই এমন আশ্চর্য নিরাপদ ভূগর্ভদুর্গে আশ্রয় পাওয়া যাবে যেখানে বহু আমেরিকান বেঁচে যাবে। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে এমন এক যন্ত্র বার করতে পারেন—নাম Dooms-day Machine যার প্রসাদে এক মুহূর্তে এ-দিন দুনিয়ার স্রেফ চেহারা বদলে যাবে—প্রাণের চিহ্নলেশও থাকবে না। তবে তাঁর হৃদয়-খানি নাকি মাখনের ম'ত কোমল, তাই বলছেন : "এরকম যন্ত্র তৈরি করা দুঃসাধ্য না হ'লেও এখন এরকম যন্ত্র সৃষ্টি

না করাই ভালো।" উঃ! বৈজ্ঞানিকের করুণার কি তল পাওয়া যায় ভাই?'

"ভাবছ সব বেশি বেশি ক'রে বলছি, না? কিন্তু একটুও অত্যুক্তি করিনি মা। নোগুচির কাছে কালই দেখলাম এ-বইটি—যাতে কাণ সাহেব লিখেছেন অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি সাজিয়ে—কেন আণবিক যুদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভাবতে পারো মা, কোথায় পৌঁচেছে এযুগের আশ্চর্য আশমানীরা—যারা এই ঢঙে কথা কয়, আর কোটি কোটি সত্য মানুষ সসম্ভ্রমে শোনে—কেউ ক্ষেপে উঠে বলে না: 'না, আমরা বৈজ্ঞানিক হাইড্রোজেন বোমার বা চাঁদে ঢ মারায় কীর্তি দেখে অবাক্ হ'তে চাই না, চাই শান্তির রাজ্যে সবাক থাকতে ছবি আঁকতে গান গাইতে, সুষমার আলোয় নিত্য নব আনন্দের দর্শন পেতে,সবশেষে ধর্মের পথে চ'লে প্রতিজীবকে শিবজ্ঞানে সেবা ক'রে এই মাটির পৃথিবীকে অমরাবতী করতে। নোগুচি আরো বলছিলেন মা, নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে বোমা পড়ার পরে না কি হাজার হাজার রোগী তিলে তিলে মরেছে অসহ্য যন্ত্রণায়—ক্যান্সারে, যক্ষ্মায় পক্ষাঘাতে—কত লোক পাগল হ'য়ে গেছে, কত বিকলাঙ্গ জড় শিশু জন্মেছে। কয়েকটি এখন যৌবন লাভ করেছে, কিন্তু রয়ে গেছে বামন, বীভৎস, পঙ্গু!

মন্নুভাই (অতিষ্ঠ হ'য়ে): কিন্তু কী সব ইর্‌রেলেভ্যান্ট প্রলাপ বকছিস বল্ তো। ধর্ম ধর্ম করলে ব্রেণ অকর্মণ্য হ'য়ে যায়—পিন্টো ঠিকই বলে।

প্রহ্লাদ: প্রলাপ? কিসে?

মন্নুভাই: নয় তো কী? পিন্টো বলে বিজ্ঞানের শুধু একটি মাত্র লক্ষ্য—তথ্যের নিরীক্ষা আর বস্তুজগতের নানা উপাদান অণুপরমাণুর শক্তিকে পরীক্ষা ক'রে সত্যের আলোকস্তম্ভ গড়া। এ-সত্য moral, অর্থাৎ সুনীতি দুর্নীতির উপরে—ফরাসীরা যাকে বলে: "au-dessus de la melee." কিন্তু ধার্মিকরা কী করে বুঝবে একথার মর্ম—যাদের ব্রেণ ধর্মের পাঁকে নির্জীবতার ধ্যান ক'রে পচে গেছে?

প্রহ্লাদ (হো হো ক'রে হেসে): তুমি যখন ধার-ক'রে-পাওয়া বিলিতি বুকনির আগুন নিয়ে বৈজ্ঞানিক বুলির ফুলঝুরি কেটে চলো মন্নুদা, তখন আমার কী মনে হয় শুনবে? আমি ছেলেবেলায় যখনই কোনো কিছু চেয়ে না পেয়ে কান্নাকাটি করতাম, বাবা আমাকে নিয়ে যেতেন সার্কাসে। সেখানে সবচেয়ে ভালো লাগত আমার রং চং মাখা সংদের নানা ভঙ্গি—অম্‌নি হাসতে হাসতে ভুলে যেতাম সব দুঃখ। ক্লাউনদের কাপ্তেনি আর কিছু না পারুক, এটা পারে।

মন্নুভাই (আতপ্ত): তোর এত বড় আস্পর্ধা—?

প্রহ্লাদ (করজোড়ে): ক্ষমা মন্নুদা, ক্ষমা। তোমার ধার করা-বুলি শুনে বিদূষকদের ধার-করা মুখোষের কথা মনে প'ড়ে গেল যে, কী করব বলো? কিন্তু মনে রেখো তুমিই প্রথম ছোবল মেরেছিলে, নৈলে আমি ফোঁশ করতাম না। (সুর বদ্‌লে) মরুকগে। হানাহানি ছেড়ে দুটো ভালো কথা বলি শোনো—(সুর ক'রে) বিনতি সুনো প্রভু মেরী শরণ পড়া হুঁ তেরী। আমার হাসি পেয়েছিল এই জন্যে যে, Science is moral, কথাটা শুনতে গুরুগম্ভীর হ'লেও আসলে হ'ল যাকে সাহেব-পুরাণে বলে বস্তাপচা প্ল্যাটিটিউড—অর্থাৎ যারাই একটু ভাবে তারা সবাই জানে এবং মানে যে, কোনো তথ্যলব্ধ শক্তির সঙ্গেই সুনীতি দুর্নীতির সম্বন্ধ নেই। সে-শক্তি দিয়ে যখন মানুষের হিতসাধন করি তখন সে হয় সু, যখন অনিষ্ট করি তখন সে হয় কু। একটা দৃষ্টান্ত দেই: অনেকেই দেখেছে যে কুস্তি করলে দেহের শক্তি বাড়ে। আচ্ছা। এ-তথ্য জানার পরে আমার ইচ্ছা হ'ল আমি ঠিক করলাম কুস্তি-কসরৎ ক'রে দৈহিক শক্তি বাড়ানো যাক। বেশ। অতঃপর সে-শক্তি দিয়ে আমি যখন নারীধর্ষণ করি—তখন আমি সমাজের শত্রু, পাপী; যখন কোনো সতীকে দুর্বৃত্তের ধর্ষণ থেকে রক্ষা করি তখন সমাজের বন্ধু, পুণ্যবান্। কাজে কাজেই এই বলকে পাপী বা পুণ্যবান্ বললে সেটা হ'য়ে ওঠে হাসির কথা। কেমন তো? আচ্ছা। ঠিক তেম্‌নি সায়ান্সের সাহায্যে অ্যাটমের বুক চিরতে পারলে অজস্র শক্তি—atomic energy—পাওয়া যায় এটা একটা তথ্য। এই তথ্যকে জেনে আমার মনে হ'ল—পরমাণুকে চিরে শক্তি যোগাড় করা যাক। এখন, এই শক্তি একটা জাগতিক শক্তি, সুতরাং moral অর্থাৎ না পাপী না পুণ্যবান্—এটেই তো। পাপ পুণ্যের প্রশ্ন ওঠে—যখন সে-শক্তিকে প্রয়োগ করি। যখন সে-শক্তি

দিয়ে আমি শহরে শহরে অজস্র বিজলি বাতি জ্বেলে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাই তখন আমি সমাজের বন্ধু, মহাত্মা, আর যখন সে শক্তি দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারি তখন আমি সমাজের শত্রু, দুরাত্মা। ধার্মিকরা একথা বুঝবে না কেন? এ তো নীতিসংহিতার প্রথম পাঠ।

মনুভাই: Fallacious—কুযুক্তি। বিষ্ণু ঠাকুর, ধ্রুবর মতন ধার্মিকরা বোঝে না, তাই বৈজ্ঞানিককে দোষ দেয় যখন কেউ নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফেলে। এজন্যে দায়ী কেবল সে, যে বোমা ফেলল।

প্রহ্লাদ: না—এইখানে আমি আপত্তি করব। কারণ বৈজ্ঞানিকেরা আপ্রাণ চেষ্টায় অ্যাটম বোমা তৈরি করেছেন শুধু এক উদ্দেশ্যে—লক্ষ লক্ষ মানুষ মারতে। মানুষ যুদ্ধে পিশাচ হ'য়ে ওঠে জেনেশুনে তার হাতে তুলে দিচ্ছেন এমন অস্ত্র—যা দিয়ে তার পৈশাচিক বৃত্তি চরিতার্থ হয়। আমেরিকায়, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায় হাজার হাজার বৈজ্ঞানিককে মোটা মাইনে দেওয়া হচ্ছে রিসার্চের জন্যে। কিসের রিসার্চ? না, সবচেয়ে কম সময়ে কোন্ মারণাস্ত্রে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায়। এ কাপালিক যজ্ঞের যাজ্ঞিক আজ কারা? ধর্মক্ষেত্রের শক্তিভক্তি-প্রেমবাদীরা, না কুরুক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিকেরা? আরো একটা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে দেখা যেতে পারে দাদা! বৈজ্ঞানিকেরা যখন বিদ্যুৎ-কে খাটিয়ে মানুষের নানা অভাব মোচন করতে যান তখন তোমরা তাঁদের জয়ধ্বনি করো হুহুঙ্কারে:—দেখ কী উপকারই না করছেন তাঁরা বিশ্বমানবের! এখানে ভুল বলো না—কারণ এ কুযুক্তি নয়, সুযুক্তিই বটে—এই নীতি অনুসারে যে, যে কোনো শক্তি দিয়ে কেউ মানুষের মঙ্গল সাধন করলে তাকে বলা চলে বৈকি যে, সে মানববন্ধু—

মনুভাই (সোৎসাহে): Exactly—তাই তো বলছিলাম—

প্রহ্লাদ (করজোড়ে): কী বলছিলে, পরে শুনব, কেবল তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকবো দাদা যদি আগে এ-অবোধকে একটু বুঝিয়ে বলো—তাহ'লে কেন সে-বৈজ্ঞানিকদের আমি মানবশত্রু উপাধি দিতে পারব না—যারা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে অ্যাটম বোমার পাহাড় জড়ো করে—জেনেশুনে যে এসব প্রয়োগ করা হবে কোটি কোটি মানুষকে মারতে। জেনেশুনে যে, অ্যাটম বোমার radio-active বিষবর্ষণের ফলে শুধু যে লক্ষ লক্ষ লোক অপঘাতে ম'রে ভূত হবে তাই নয়—যারা বেঁচে থাকবে তাদের মধ্যেও হাজার হাজার লোক ক্যান্সার পক্ষাঘাত যক্ষ্মায় মরবে তিলে তিলে, হাজার হাজার শিশু জন্মাবে-বিকলাঙ্গ, বীভৎস, নির্বোধ ও পাগল। তোমাদের সাহেব-পুরাণ বলে না কি দাদা—you can't have the argument both ways? বৈজ্ঞানিকদের রেজিমেণ্ট প্রকৃতির নানা শক্তিকে দিয়ে যখন মানুষের মঙ্গল করেন, তখন তাঁদের মহাপুরুষ বরেণ্য বলব—অথচ যখন তাঁরা জেনেশুনে কোটি কোটি নিরস্ত্র মানুষের জন্যে নরকযন্ত্রণার ব্যবস্থা করেন—(বলেন হারমান কান-এর মতন অম্লান-বদনে যে কেন আণবিক যুদ্ধ হ'লই বা)—তখন নরকের অস্ত্র জোগানো সত্ত্বেও তাঁদের স্বর্গের বাসিন্দা উপাধি দিয়ে পূজা করব, এ হয় না। তবু এতবড় কুযুক্তিকে আমরা সুযুক্তি ভেবে আজ ঠিক ভুল করছি শুধু এই জন্যে যে, সায়েন্সের বাইরের চেকনাইয়ে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার ফলেই বুদ্ধিও এভাবে ঘুলিয়ে গেছে। তাই না গীতার ঠাকুর বলেছেন: "সাবধান! অধর্মকে ধর্ম ব'লে যে উল্টো বোঝায় তার নাম "তামসী বুদ্ধি"। আমরা যেপথেই চলি না কেন, সময়ে সাবধান না হ'লে এই তামসী বুদ্ধির মরণদশা আমাদের পেয়ে বসেই বসে, যার ফলে সব কিছুই উল্টো দেখি—দুর্বুদ্ধির মোহান্ধকারে বা অজ্ঞানের ছায়ান্ধকারে। তাই বলি দাদা—নানা বৈজ্ঞানিক শক্তি দিয়ে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্যে বৈজ্ঞানিকদের গুণগান করতে চাও করো চুটিয়ে—কেবল দোহাই তাদের নাস্তিক কাপালিকতার সমর্থন কোরো না—আমাদের মধ্যেকার আসুরিক প্রবৃত্তির তাঁবেদার হ'য়ে। বিজ্ঞান amoral এই কুযুক্তি দিয়ে এমন বোকার ম'ত কথা বোলো না যে, ধন মান যশ প্রতিষ্ঠার লোভে প'ড়ে বৈজ্ঞানিক যে অ্যাটম বোমার নরমেধযজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন তার জন্যে দায়ী তাঁদের তামসী বুদ্ধি নয়—দায়ী কেবল তারা, যারা সে-যজ্ঞোদ্ভব রাক্ষসী কৃত্যাকে দিয়ে বিধ্বংস করতে ক্ষেপে ওঠে।

মনুভাই (কী বলবে ভেবে না পেয়ে): কিন্তু প্লেটো—

প্রহ্লাদ (পিঠে হাত রেখে) : দাদা, একটু শান্ত হও, তোমার বদ্‌গুরু এই পিণ্টো মহাপ্রভুই হচ্ছেন তোমার evil genius, তাকে ছেড়ে অনুতপ্ত হ'য়ে তোমার সদ্‌গুরু মহাগুরুর পায়ে প'ড়ে তুকারামের অভঙ্গ ধরো, কেঁদে বলো (সুর ক'রে) "তুকা ম্হণে পন্ঢরিনাথা—ক্ষমা করী অপরাধা।" তাহ'লে তোমার অজ্ঞানতিমিরান্ধ চক্ষু বেচারী তাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকার ছোঁওয়ায় দেখতে পাবেই পাবে যে, Science is amoralএ জাতীয় বুলি শুনতে ভারিক্কি হ'লেও আসলে অপল্‌কা, কেন না যেমন ধর্মের মূল্যায়ন করবার সময়েও মানুষ সব আগে জানতে চাইবে—ধর্মের ছোঁওয়ায় সে আরো মহৎ সুন্দর সহিষ্ণু ও পবিত্র হ'য়ে স্বর্গের সিঁড়িতে ওঠে না—ভণ্ড দর্পী নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হ'য়ে নরকের ঢালুপথে গড়িয়ে চলে—ঠিক তেম্‌নি বিজ্ঞানের বেলায়। শুধু বিজ্ঞানই বা কেন বলি, মানুষ যা কিছু পায় বা সৃষ্ট করে তার দাম কষতে হবেই হবে তাতে ক'রে তার অন্তর্জীবনের সম্পদ বাড়ল না কমল সেই নিকষে।

মনুভাই (একটু বিপন্ন হ'য়ে) : এ কী সব হাবিজাবি বকছিস—balderdash ! পিণ্টো বলতে চায়—অ্যাটম-চিরে পাওয়া শক্তি দিয়ে মানুষ মারার জন্যে বৈজ্ঞানিক দায়ী নয়—দায়ী মানুষের স্বভাব। বৈজ্ঞানিক শুধু এই শক্তির খবর দিয়েই খালাস।

প্রহ্লাদ : বলিহারি যুক্তি পিণ্টো প্রফেটের ! মানুষের বিলাস-উপকরণ বাড়ানোর জন্যে, বাইরের আলোর দেয়ালির জন্যে আমরা বৈজ্ঞানিকদের স্তব করব :

বিজ্ঞানী হি প্রাণধাতা, তন্নাম জপ সর্বদা
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা

অথচ যখন তারা প্রাণপণ গবেষণা ক'রে বিষাক্ত গ্যাস, গোলাগুলি—সবশেষে হাইড্রোজেন বোমা আমাদের হাতে তুলে দেবে মানবজাতির উচ্ছেদ করতে, তখন বলব এজন্যে দায়ী শুধু মানুষের স্বভাব ! তোমার পিণ্টো মহাপ্রভুকে একবার সামনাসামনি পেলে একটি মাত্র প্রশ্ন করতাম তাকে : "হে বিচক্ষণ ! মানুষের স্বভাব যে কত সহজে হিংসুক নিষ্ঠুর মোহমত্ত হয়ে ওঠে একথা জেনেও কি ভবাদৃশ বৈজ্ঞানিকেরা তার হাতে জুগিয়ে দেন নি বিশ্বমারণ অস্ত্র ?" আমাদের ঋষিরা বলেছেন—কোনো তপঃশক্তি, বা বিভূতিই তাদের হাতে জুগিয়ে দিতে নেই, যারা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য জয় করে নি। তোমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন : দূর ও সব হ'ল ধর্মের কথা, আমি ধর্মাধর্মের ধার ধারি না, আমার লক্ষ্য শুধু মানুষকে শক্তিমান্‌ করা—তার ফলে সে সার্থকই হোক বা উচ্ছন্নই যাক। শুনে গড়পড়তা অবোধরা বলল : "বাহবা !" আত্মঘাতী অন্ধরা বলল : "আমরা নরকেই যেতে চাই। বন্ধু, তুমি সহায় হ'লে আরো সহজ হবে নরকেযাওয়া।"—অম্‌নি বৈজ্ঞানিক বললেন : "বেশ বেশ ! নরকের রক্তপঙ্কিল রাজপথ আমি তৈরি ক'রে দেব যদি শুধু তুমি আমাকে বাহাল করো, ধন মান দিয়ে স্তবস্তুতি করো, মালমসলা জোগাও, ল্যাবরেটরি গ'ড়ে দাও। চুক্তি হ'ল—বৈজ্ঞানিককে সমাজ চাঁদা তুলে দেবে টাকা, আর বৈজ্ঞানিক প্রতিদানে তাকে পাঠাবে জাহান্নমে—মারণাস্ত্র জুগিয়ে ! চমৎকার চুক্তি—প্রায় গেটের ফাউস্টের সঙ্গে মেফিস্টফিলিসের চুক্তির দোসর ! আত্মা নেই, ভগবান্‌ নেই, ধ্যান নেই, করুণা নেই, বিশ্বপ্রেম নেই, সাধুসন্ত নেই, আছে শুধু ম্যাটার আর দেহসুখ, শক্তির মদ আর নাস্তিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি।

মনুভাই (রুষ্ট) : তোর মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তাই আত্মা ভগবান সাধুসন্ত গুরুগিরির জয়ধ্বনি করছিস। সাধু সন্ন্যাসীরা কী করেছে শুনি ?

প্রহ্লাদ : তাঁরা দুশ্চর তপস্যায় নিজেদের দুষ্প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়েছেন কল্যাণী বৃত্তির দিকে, করেছেন নিজেদের স্বভাবের রূপান্তর ; কিন্তু মুস্কিল এই যে, এ-স্বভাবকে ঢেলে সাজানো খুব কঠিন ব'লে সাড়ে পনের আনা মানুষই আত্ম-শোধনের এ-সাধনাকে বরণ করতে নারাজ। তবু যাদের চোখ আছে তারা দেখতে পায়—সত্যিকার সাধু সন্ন্যাসী মুনি ঋষি জীবন্মুক্তেরা মানুষের কত মঙ্গলসাধন করেছেন। শুধু কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শংকরাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, রমণ মহর্ষি, সন্তদাস, শ্রীবিষ্ণু ঠাকুর প্রমুখ মহাপুরুষের দিব্য জীবনই নয়—যুগে যুগে হাজার হাজার অখ্যাতনামা সাধকসাধিকার মধ্যেও তাঁদেরই দীক্ষার ঝলকে ফুটে উঠেছে এক অপরূপ আলোকলোকের আভাস—বিশ্বাস না হয় তোমার রমাকে দেখে এসো, কী অপরূপ হ'য়ে ফুটে উঠেছে ঐ একরত্তি মেয়ে—আর তলব করো তোমার পিণ্টোর কলেজের গবেষক পুরন্দরদেরকে—তারা

বলুক বুকে হাত দিয়ে যে, গভীর দুঃখে শোকে তারা নাস্তিক-বিজ্ঞানের বস্তুবিচারে রমার মতন শান্তি পেয়েছে।

মনুভাই (রাগে আগুন হ'য়ে): আমি শুনেছি রমার গুরু হ'য়ে ব'সে তুই তাকে সেই ড্যাম্‌ড্‌ হিপক্রিসির পথে চালাচ্ছিস—যে-পথে পা দেওয়ার পাপেই গৌরীর অকাল-মৃত্যু হ'ল। হবে না? মিথ্যাচার, pretension, ভণ্ডামি, obscurantism, কুসংস্কারের পথে কখনো সদ্‌গতি হ'তে পারে কারুর? না, শুধু সাধু সন্ত, মা গঙ্গা জয় গুরু জয়গুরু ব'লে বগল বাজালেই সশরীরে স্বর্গে পৌঁছানো যায়? আমি ভেবেছিলাম রমাকে দুদিন পরে আনাব তার শোক একটু কম্‌লে। কিন্তু আজ তোর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছি—আমি কী ভীষণ ভুল করেছি তাকে তোদের মতন মতিচ্ছন্নদের আ তায় রেখে—বিষ্ণুঠাকুরের ম'ত হামবড়া হাম্বাগ বদমায়েসরাই তো যত নষ্টের মূল—নৈলে—

প্রহ্লাদ (কানে আঙুল দিয়ে): ব্যস্‌, থামো মনুদা। গুরু নিন্দা শোনাও মহাপাপ। (উঠে সাবিত্রীকে) এসো বৌ। ইন্দ্রায়ণী নদীতে ডুব দিয়ে গুরুমন্ত্র জপ ক'রে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মনুভাই (হকচকিয়ে গিয়ে): মানে?

প্রহ্লাদ: সে তুমি বুঝবে না মনুদা, কিন্তু এর পরে আর না।

ব'লেই হতবুদ্ধি অতিথির পানে আর না তাকিয়ে সাবিত্রীকে নিয়ে সোজা ইন্দ্রায়ণী নদীতে গিয়ে ডুব দিয়ে প্রহ্লাদ প্রার্থনা করল: "মা, আমাদের কান অশুচি, মন মলিন হয়েছে গুরুনিন্দা শুনে। তুমি শুদ্ধি দাও: ওঁ জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়! তারপরে সাবিত্রীর সঙ্গে গুরুবন্দনা গাইল:

"ওঁ ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্‌।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"

[ক্রমশঃ

কাব্য ও সৌন্দর্য

শ্রীরাধাশ্যাম চক্রবর্তী

সে যুগের কবি কালিদাস আর এ যুগের রবীন্দ্রনাথ। কালের দিক থেকে বিস্তর ব্যবধান, কিন্তু কাব্যকলার দিক থেকে দূরকে নিয়ে এসেছে অতি নিকটে। সেই কোন অতীতে কবি নিপুণ হস্তে একের পর এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন; বল্কলবসনা শকুন্তলা হতে আরম্ভ করে রাজ-সভার অপার ঐশ্বর্য কিছুই বাদ পড়ল না। একদিকে মেঘের লীলাচঞ্চল গতিভঙ্গী, অন্যদিকে আশ্রম মৃগের গ্রীবাভঙ্গী সব কিছু মিলিয়ে সৌন্দর্যের অপূর্ব সমারোহ কবিচিত্তে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে কবিচিত্তের এই মূল তথ্যটি আমাদের কাছে বহুদিন অজ্ঞাত ছিল, আমরা কেবল জেনে আসছি 'উপমা কালিদাসস্য'। এতেই যেন কবি কালিদাসের সবটুকু জানা হয়ে গেল। তাই যখন পাশ্চাত্য সমালোচকেরা কবি কালিদাসের সৌন্দর্যোপলব্ধির স্বরূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তখন আমরা ভেবে বললাম—তাইত!

কবি কালিদাস যে বীজ রোপণ করলেন তা পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়ে দেখা দিল বাংলা কাব্যে। অবশ্য রবীন্দ্র-নাথের পূর্ব পর্যন্ত এর স্বরূপটি কেউ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়না। বাংলা সাহিত্যে গীতি কাব্যই হোক বা মঙ্গল কাব্যই হোক, সবই ছিল ভাবপ্রধান, সেখানে সৌন্দর্যের স্থান ছিল গৌণ। কাব্যের ভাল মন্দ বিচার করা হত তার সাধন পদ্ধতির ধারা বা আদর্শবাদ নিয়ে। তার কারণও ছিল যথেষ্ট। তখনকার দিনের সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছিল ধর্মপ্রচারের বাহক ও ধারক হিসাবে। তাই হৃদয়ের ব্যাকুলতা সেখানে মুখ্য। সেজন্য

কবিকৃতির যে সুষ্ঠু রীতি পদ্ধতির দরকার সে বিষয়ে তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন উদাসীন। তবে মাঝে মাঝে দুএকজনের ভিতর যে এর সম্যক্ পরিচয়বোধ ছিলনা এমন কথা বলা চলে না। যেমন বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও ভারতচন্দ্র। এর ভিতর দুজন ছিলেন সভাকবি, আর একজন ছিলেন সাধককবি; সেজন্য এঁদের কাব্যকলায় সৌন্দর্যানুভূতি থাকলেও সাবলীল গতিভঙ্গী কিছুটা ছিল ব্যাহত।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবন থেকেই এর সন্ধানে ফিরছিলেন, কিন্তু সত্যকারের পথ খুঁজে পেতে তাঁরও বেশ কিছুদিন সময় নিয়েছিল। তিনি খুঁজতে বের হলেন অসীম সৌন্দর্যের সন্ধানে। অরুণরাঙা পথে দেশবিদেশ ঘুরে রাজকন্যার খোঁজে চলল তাঁর সেই সাধনা। তিনি কি পেয়েছিলেন আর কি পাননি সে বিচারের ভার সমালোচকদের উপর ছেড়ে দেওয়া রইল।

এখন কাব্যের এই সৌন্দর্য কি তাই বিচার্য বিষয় The thing of beauty is joy for ever. এই beautyকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করেছি তা দেখতে হবে। আমরাও ত বুক ফুলিয়ে বলি 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে Beauty'র যে স্থান দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় আমাদের 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' একটু অন্য ধরণের। আধ্যাত্মিকবাদের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তাকে বিশুদ্ধ করা হয়েছে। সে যাই হোক, সৌন্দর্যবোধ মানুষের চিরন্তন ধর্ম। পশুদের মধ্যে সৌন্দর্য উপলব্ধির কোন বালাই আছে বলে মনে হয় না। জীবনধারণের জন্য খাদ্য লাভই তাদের চরম কাম্য। মানুষের কথা স্বতন্ত্র; জীবন ধারণের জন্য খাদ্য বস্ত্র বাড়ী ঘর প্রভৃতির প্রয়োজন থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত মনের সন্তুষ্টির প্রয়োজন না মিটছে ততদিন পর্যন্ত শান্তি নেই। থাকবার জন্য ইট কাঠ দিয়ে বাড়ীঘর তৈরী করলেই ত যথেষ্ট, কিন্তু এতেও মানুষ সন্তুষ্ট নয়; তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুদৃশ্য করে তুলতে হবে। এই সাজিয়ে গুছিয়ে সুদৃশ্য করে তোলার পিছনে রয়েছে মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি। আবার উপলব্ধির স্তরও বিভিন্ন, কখন বা দর্শনে, কখন বা শ্রবণে। এই রকম আরও কত কি! একটি ফুল দেখে বলছি কি সুন্দর ফুল বা ঘ্রাণ নিয়ে বলছি কি সুমিষ্ট গন্ধ; এক একটি গানের সুর কর্ণকুহরে অপূর্ব ঝঙ্কার তোলে; এই যে অনুভূতি, এর পিছনে কাজ করছে মানুষের সৌন্দর্যবোধ। আবার অন্যদিকে দেখতে পাই চিত্রকর তুলির টানে সৌন্দর্য সৃষ্টি করছেন; র‍্যাফেলের ম্যাডোনা বা দা ভিঞ্চির মোনালিসা তাই চিত্রজগতে অমর। দিনের পর দিন এমন কি বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে। যেগুণে চিত্রকর অপূর্ব চিত্র সৃষ্টি করছেন, সেই একই গুণে কবি তাঁর কাব্য প্রতিভায় শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন। তাই তাঁরা স্রষ্টা ও শিল্পী। বিজ্ঞান ও কলায় পার্থক্য এখানে। বিজ্ঞান শেখায় জানতে—বাস্তব জিনিষ কাজে লাগিয়েই তার কাজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কলা শেখায় সূক্ষ্ম মার্জিতবোধ ও তার প্রয়োগ কৌশল। এই যে সূক্ষ্ম মার্জিত বোধ, এর দ্বারাই জাগ্রত হয়েছে সৌন্দর্যানুভূতি।

সাহিত্যে সৌন্দর্য বলতে প্রকৃত যে কি বুঝায় তার এখনও কোন সংজ্ঞা নির্ণয় হয়নি। সবই যেন ভাসা-ভাসা। বামন অবশ্য বলেছেন—সৌন্দর্যই অলঙ্কার; এই মতই আজ পর্যন্ত চলে আসছে। অনেকের মতে অলঙ্কার বাইরের সাজ সজ্জা, তাঁরা বলতে চান অলঙ্কার স্ত্রী অঙ্গের ভূষণের ন্যায়; সোনার গহনা পরিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু ভেবে দেখলে এর সারবত্তা যে কতটুকু তা বিবেচনা সাপেক্ষ। শকুন্তলার রূপ সৃষ্টি করতে কালিদাসের কয় মণ সোনার প্রয়োজন হয়েছিল, অথবা রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতায় সোনার আলোঝলমলই বা কতটুকু? সে ত আর কেউ নয়, শাশ্বত চিরন্তন, তাই কবির মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা—

> 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
> কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।'

তাই সমস্ত সৌন্দর্যের রূপ পেয়েছে উর্বশীর মধ্যে, শকুন্তলার মধ্যে। ইংরাজীতে যাকে বলে ornament, তা দিয়ে সৌন্দর্য বিচার চলে না। রসগঙ্গাধরে তাই জগন্নাথ এই সৌন্দর্য তত্ত্বটিকে অন্যভাবে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দের নাম কাব্য। এখন এই রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দ কি তাই বিবেচ্য। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, অলৌকিক চমৎকারিত্ব বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সংসর্গ বর্জিত। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়, যা অপ্রয়োজনের কাজ। সবাই কাজে

ব্যস্ত, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই ; কিন্তু যে শিল্পী সে একমনে করছে শিল্পের সাধনা ; সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে আলস্যের সহস্র সঞ্চয়ই তার পাথেয়।

আনন্দোপলব্ধির দুটে ধারা দেখতে পাই, একটা ভাবমূলক অন্যটি সৌন্দর্যমূলক। বৈষ্ণব পদাবলী বা শাক্ত-পদাবলীতে দেখতে পাই ভাবোচ্ছ্বাসই আনন্দগানের মূল হেতু। সৌন্দর্যবোধ এখানে গৌণ। সৌন্দর্যবোধ ও ভাবাবেগ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। ভাবোচ্ছ্বাসে কোন বিচারের স্থান নেই কিন্তু সৌন্দর্যো-পলব্ধি বিচারের অপেক্ষা রাখে। এখানে চাওয়ার আনন্দ নেই আছে পাওয়ার আনন্দ। ভাব কতকটা স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হয়। দিনের পর দিন তাকে কাট ছাঁট করতে হবে। প্রয়োজন মিটে গেলেই তার কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না, তিল তিল করে তিলোত্তমার সৃষ্টি করতে হবে—নইলে সৃষ্টির সার্থকতা কি? কবি লিখছেন বসে ভাবের অনুপ্রেরণায়,কিন্তু তাকে শেষ করলে চলবেনা, তাকে সুষমামণ্ডিত করে তুলে ধরতে হবে জগতের সামনে। নবীনচন্দ্র বা বিহারীলাল—তাঁদের কি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কম ছিল! কিন্তু তাঁদের ভাবাবেগ যতটা ছিল তাঁরা ততবড় কবি হতে পারেন নি। একজন হয়ে রইলেন পাগলাঝোরা আর একজন ভোরের পাখী। আরম্ভ করলে আর শেষ নেই।

অন্যদিকে অনেকে বলে থাকেন কবিসঙ্গীত বা বাউল সঙ্গীত এদেরও ত কাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায়। যায় বই কি! তবে সৌন্দর্যের কষ্টিপাথরে মোটেই নয়। এর যা কিছু প্রয়োজন তা ভাবের দিক থেকে। প্রাণের আকূতিই একে কাব্যের পর্যায়ে টেনে এনেছে। নইলে এর মূল্য কতটুকু। কিন্তু প্রকৃত কাব্য সৃষ্টিধর্মী। সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হলে গ্রহণ বর্জনের নীতি গ্রহণ করতে হবে—পতি-ব্রতা হিন্দু রমণীর পক্ষে শাঁখা সিঁদুরই যথেষ্ট কিন্তু রাজা রাণীর ক্ষেত্রে জমকালো পোষাক পরিচ্ছদ চাই—আবার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন ও কমণ্ডলু হলেই চলে যায়। বাস্তব ক্ষেত্রের এই নিয়ম চলছে কাব্যের ক্ষেত্রে। ভাবের আবেগে অনেক কিছুই ত বলা যায়, কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে তার কতটুকু প্রয়োজন আর কতটুকু অপ্রয়োজন তাও বিচার করতে হবে। নইলে সার্থক কাব্য রচিত হবে না। সেই জন্যই দেখা যায় রবীন্দ্রকাব্যে এত পাঠান্তর। একবার লিখলেই ত চলত, কিন্তু এতে তৃপ্তি নেই ; সব সময়ই যেন মনে হচ্ছে কোথায় কোন খুঁত থেকে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে একটা মূল্যবান্ কথা বলেছেন। প্রত্যেকেরই লিখবার দিকে আগ্রহ দেখা যায় ; কিন্তু সেই লেখা ভাল হল কি মন্দ হল সেদিকে কারও খেয়াল নেই। তাই তিনি তরুণ লেখকদের একটু সৎ উপদেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক লেখকই যদি তাঁর লেখা ছাপবার পূর্বে দু চার মাস ফেলে রেখে দেন তবে খুব ভাল হয়। কেননা সেই লেখাটা ভাল হল কি মন্দ হল তা যাচাই করে নেওয়া সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথও সেই একই কারণে তাঁর মূল লেখার অনেক পরিবর্তন করেছেন।

সৌন্দর্যের মূল উৎস অন্তরের অনুপ্রেরণা কিন্তু তা প্রকাশ করবার সামর্থ্য থাকে কজনের। গলা মিষ্টি থাকলে ত চলবে না, সুর সংযোগে তাকে মূর্ত করে তোলা চাই, নইলে সবই বিফল। যাঁরা তা করতে পারেন তাদেরই দেওয়া হয় উচ্চ আসন। কুন্তক অবশ্য এটাকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে—কোন সাধারণ বস্তু নিয়ে কবি তাঁর প্রতিভাবলে সেই বস্তুকে সুন্দর ও ভঙ্গীযুক্ত বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করেন ও শ্রোতার আহ্লাদ উৎপাদন করেন। তা হলে দেখ—সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দ বা হ্লাদন ব্যাপারের সহিত বাস্তবতার একটু পার্থক্য আছে। অনেকে হয়ত বলতে পারেন—তাস, পাশা, দাবা খেলেও ত আনন্দ পাওয়া যায়। কাব্যানন্দ ঠিক এ ব্যাপার নয় তাই একে বলা হয়ে থাকে অলৌকিক ; সে জন্য অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেই করতে হবে সৌন্দর্য বিচার। অনেক সময় রুচির পার্থক্যের জন্য সৌন্দর্যবোধের তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু একথা ঠিক যে যাঁরা প্রকৃতই সোনা চেনেন তাঁরা কোনটা খাঁটি আর কোনটা নকল—তা ঠিকই দেখিয়ে দিতে পারেন। তাই সাহিত্য বিচারে প্রকৃত জহুরীর বিচার নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কাণ্ট বলেন, যা সুন্দর তা সকলেব নিকটই সুন্দর, যেটুকু মত বৈষম্য তা ইন্দ্রিয়ধর্মবোধের জন্য। ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ যে ভাল লাগা বা মন্দ লাগা তা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে জন্য আগেই বলে রাখা হয়েছে এটা অলৌকিক।

অনেকে বলে থাকেন নদীর বাঁক ফেরাতেই তার সৌন্দর্য। রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করলে এই সত্যই বিশেষ করে চোখে পড়ে। গতানুগতিক ভাবধারায় সৌন্দর্য সৃষ্টি করা কঠিন, তাই মাঝে মাঝে উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে তাকে যাচাই করে নিতে হয়। ভাল আবৃত্তি করতে হলে কণ্ঠস্বর উচু নিচু করতে হবে, নইলে তা হবে সাপের মন্তর। শেলি, কীটস্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সৌন্দর্যতত্ত্বটিকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাদের কাব্য বিশ্বজনবন্দিত। বৈচিত্র্যই সৌন্দর্যের প্রাণ, রবীন্দ্রনাথ জীবনের যে বৈচিত্র্য উপলব্ধি করেছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করে বাংলা ভাষাকে এমন এক স্তরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন যা কল্পনাতীত। বিশ্বের দরবারে তাই পেল শ্রেষ্ঠ আসন।

এই সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে পাশ্চাত্য মনীষীদের যে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল তা বেশ বোঝা যায়, তবে তাঁদের মতবৈষম্যও ছিল যথেষ্ট। সাধারণতঃ এঁদের ভিতর ছিল দুটি দল। এঁদের ভিতর এক সম্প্রদায়ের মত ছিল এই যে মানুষ যেমন নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশেও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই মতের যাঁরা সমর্থক ছিলেন তাঁদের মধ্যে বার্ক, কাণ্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য কিন্তু পরবর্তীকালে হিগেল, ক্রোচে প্রভৃতি মনীষীগণ এই মত উপেক্ষা করেছেন। তাঁদের মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন স্থান নেই ; যা কিছু সৌন্দর্য তা মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট। কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করতে পারি না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করলে কবি কালিদাসকেই অস্বীকার করতে হয় ; কেননা তিনিই ত ছিলেন স্বভাব সৌন্দর্য বর্ণনায় সিদ্ধ হস্ত। বাংলা কাব্যই হোক বা সংস্কৃত কাব্যই হোক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেই এগোতে হবে নইলে সাহিত্যের প্রকৃত বিচার সম্ভব হবেনা। তবে তার ভিতর সূক্ষ্ম কলা কৌশল কতটুকু তাই নিয়ে আমাদের সৌন্দর্যোপলব্ধির বিচার। এই গুণের জন্যই কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের এত প্রিয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা

অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ মজুমদার

প্রথমে মা মহাকালী দ্বিতীয়ে মা তারা।
তৃতীয়ে ষোড়শীরূপে পুরিলে ত্রিপুরা ॥

ষোড়শী—মাতৃকারূপ দশমহাবিদ্যারূপের একটি প্রকাশ। দক্ষদুহিতা শিবসীমন্তিনী সতী পিতার বিরাট যজ্ঞে নিমন্ত্রিতা হন নাই, কেন না দক্ষ শিবের উপর বিরূপ এবং শিবনিন্দুক। তবু দেখলেন অন্যান্য ভগিনীদিগকে, তাঁরা অলঙ্কার শোভিতা হয়ে ও নানা ধন ও পদমর্য্যাদার ঐশ্বর্যের দীপ্ত বিকাশে আকাশপথ আলোকিত করে চলেছেন। সতীও মহাদেবের অনুমতি পাবার জন্য তাঁর ধ্যানভঙ্গ করে তাঁর মত পরিবর্ত্তন করবার জন্য ব্যগ্র, শিব প্রজ্ঞাবলে সতীর মৃত্যুযোগ দেখে তাঁকে নিরস্ত করবার জন্য সচেষ্ট। শিব ও শক্তির পরস্পরের উপর আধিপত্যের দ্বন্দ্ব বড়ই আনন্দ ও শঙ্কাজনক। শেষে মায়াপ্রভাবে দশমহাবিদ্যারূপে তাঁর কাছে ভয়ানক দৃশ্য উপস্থাপিত করলেন। শিব পিছু হটলেন এবং তাঁকে যেতে দিলেন, সতীর হল জয়। তাই ষোড়শীরূপ শিবের বড়ই মনোহারিণী।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সাধন-যজ্ঞের সমাপ্তি টেনে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর সেবায় ও আশ্রয়ে দিনাতিপাত করিতেছেন। এমন সময়ে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে দেশের কতকগুলি মেয়ের সঙ্গে এবং তাঁর পিতার রক্ষণাবেক্ষণে মা দক্ষিণেশ্বরে হাজির হলেন। অনভ্যাসের পথ হাঁটা তাঁর সহ্য হয় নাই, জ্বরে কষ্ট পাচ্ছেন। ঠাকুর অত্যন্ত খুসী হয়ে দুঃখ করে বললেন,

"এতদিনে এলে বাপু, আর কি আমার সেজবাবু আছে যে তোমার পূজো করবে? যাক্ চিন্তা করো নি, এই ঘরেই বিছানা করে শুয়ে পড়ো।" হৃদয়কে ডেকে ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা করতে বললেন। শ্রীমা নিশ্চিন্ত হলেন এবং তাঁর পিতাও সুস্থ চিত্তে ২।৩ দিন থেকে দেশে ফিরে গেলেন।

এতদিনে শ্রীমা পতিদেবতাটিকে জানবার সুযোগ পেলেন। রাত্রে তাঁর কাছে থাকা বিপজ্জনক ব্যাপার, কখন কি ভাবসমাধি হয়, সর্ব্বদাই তটস্থ থাকেন। প্রথম প্রথম ভয় পেয়ে হৃদুকে ডাকাডাকি করে তুলেছিলেন রাতদুপুরে, সে জানে কি অবস্থায় কি নাম বা মন্ত্র শোনালে সংজ্ঞা ফিরে আসবে, ক্রমশঃ নিজে ওসব শিখে নিলেন। কিন্তু তাঁর খোঁজ রাখতে গিয়ে, মায়ের রাত্রে একেবারেই ঘুম হতো না। ঠাকুর জানতে পেরে তাঁকে নহবৎখানার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বনের পাখী খাঁচায় বন্ধ হলো। মা রান্নাবান্না করে সকাল সকাল ঠাকুরের স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দিতেন। মধ্যে মধ্যে স্ত্রীভক্ত কেউ এলে মায়ের সাথী হ'তেন। কোন্ ভক্ত কি খেতে ভালে-বাসেন, কে কি রকম ভুলো মন, কার পানে চুণ কম দিতে হবে, কাকে দিতে হবে লঙ্ক', মা সব ঠিক ঠিক জেনে গেলেন। তাঁর সেবা আপনা ভুলে জগৎ ভুলে—এক-মাত্র ধ্যান জ্ঞান স্বামীসেবা।

ঠাকুর দেখলেন সময় উপস্থিত হয়েছে—মায়ের মধ্যে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি ষোড়শী পূজার আয়োজন করতে চেষ্টিত হলেন। দীনু পুরোহিত ঠাকুরের কক্ষেই পূজার ব্যবস্থা করলেন একটি মৃণ্ময় ঘটে। সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হওয়ার পর, ঠাকুর শ্রীমাকে ডেকে পাঠালেন। একটী নববস্ত্র পরিধান করে মা ঘটের বাম-দিকে একটি কম্বলাসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বিধিমত ৺পূজা করলেন ধূপদীপ জেলে আরতি হলো, শাঁখ বাজলো. নৈবেদ্য হলো নিবেদিত। শ্রীমা ৺পূজা নিরীক্ষণ করতে করতে কেমন একটা প্রগাঢ় ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন, চেষ্টা করেও সংজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছিলেন না। ক্রমশঃ ঠাকুর পূজা করতে লাগলেন, ত্রিপুরেশ্বরীকে আহ্বান করে শ্রীমায়ের দেহমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। করার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ চক্ষুরুন্মিলন করে শ্রীমাকে পুষ্পাঞ্জলিসহ এতদিনের সাধনার ফল এবং মুক্তি জ্ঞান অসম্মোহ সমস্ত ডালি দিলেন শ্রীচিন্ময়ীর শ্রীচরণে।

ঠাকুরের আশঙ্কা দূরীভূত হলো। মাকে প্রথমে পরীক্ষা নিয়েছেন—"তুমি কি আমাকে সংসার পথে বাঁধতে এসেছো?" জিগ্যেস করতে সারদামণি মা বললেন—না তা কেন? আমি তোমায় ঈশ্বর লাভের সহায়তা করতে এসেছি। মা একবার ঠাকুরকে শুনিয়ে বলেছিলেন এক স্ত্রীভক্তকে—পেটের একটিও ছেলে কি মেয়ে নেই মা বলে ডাকতে—এই যা দুঃখ। শুনে রামকৃষ্ণ বললেন—ওকে বলো যে একসময় এতো ছেলেমেয়ে মা বলে ডাকবে যে, ওঁকে হাঁপিয়ে উঠতে হবে) সে কিছু নয়। ভক্তরা ক্রমশঃ মায়ের আদর যত্নে তাঁর বশ মানলেন, বুঝলেন বাপের চেয়ে মা দয়ালু। একদিন লাটু বসে ধ্যান করছেন সন্ধ্যা-বেলা। মা একতাল আটা মাখছেন। এবং এক হাতে মাখা, বেলা সেঁকা বেশ পরিশ্রম সাপেক্ষ। ঠাকুর বলছেন ওরে লেটো তুই ছোঁড়া যাঁর ধ্যান করছিস্ তিনি ঐ দেখ্ রান্নাঘরে তোদের জন্য ময়দা মাখছেন। এসব রেখে এখন তাঁকে সাহায্য কর গে যারে বোকা ছেলে। লাটু তাড়াতাড়ি উঠে সেদিকে গেলেন।

ঠাকুর যদিও সন্ন্যাস নিয়েছিলেন কিন্তু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেননি। তাঁকে কেমন করে ঘর সংসার করতে হয়, প্রদীপের সল্‌তে কেমন করে পাকাতে হয়, কেমন করে যানবাহন আরোহণ অবরোহণ করতে হয় তাও শিখিয়েছেন।

যাই হোক ষোড়শী পূজার অনেক পরে young Bengalএর আবির্ভাব হয় ঠাকুরের আসরে। সবাই প্রথম থেকে মায়ের আদরে মুগ্ধ। সারদা মায়ের দারোয়ান বলে নিজের পরিচয় দিতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অদর্শনের পর, প্রথম প্রথম সাধু ও গৃহীভক্তরা মায়ের কথা বিশেষ খেয়াল করেন নি, এক নরেন্দ্রনাথ ছাড়া। তিনি আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে ঘুষুড়ির ঠিকানায় মাকে পত্র দিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়েছিলেন এবং অনুমতি পেয়ে ছোট ছেলের মত মাঝরাতে নাচতে আরম্ভ করেছিলেন। যাই হোক মা কামারপুকুরে অতিকষ্টে—এমন কি নুনেরও অভাব

অসুখে ভুগলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁকে কলিকাতায় এসে থাকবার জন্যে ধরে পড়লে প্রথমেই রাজী হন নি। সাহাদের প্রসন্নময়ীকে ঠাকুর শ্রদ্ধা করতেন এবং জীবিত অবস্থায় তাঁর পরামর্শ নিতে বলতেন। মা এখন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন; তিনি বললেন—হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবে, তোমার অত ভক্তিমান শিষ্য রয়েছে, পুত্রের অভাবে তারাই তোমার পুত্র, সেবক এবং সেবার অধিকারী, নিশ্চয়ই তাদের কাছে যাবে।

মায়ের কলিকাতা আগমন ঠাকুরের প্রয়াণের পর একটি আনন্দজনক ঘটনা। কত ভক্ত, পুত্র কন্যা দীন তাঁর চরণে দীক্ষা নিয়ে উদ্ধার হলেন গণে শেষ করা যায় না। তিনি অত্যন্ত সহজ হয়ে সবাইকে সেবা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন স্বরূপ সম্বন্ধে। দু একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, যেমন নট গিরীশ ঘোষ। জয়রামবাটি মায়ের বাটিতে তিনি বিশ্রাম নিতে যেতেন। মা নিজহাতে তাঁর বিছানার চাদর, গায়ের গেঞ্জী পরিষ্কার করে দিয়েছেন। অতিথি সৎকার ঠিক মায়ের মত। কয়েকজন গ্রামবাসী খেতে বসেছে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে। তারা মুসলমান, নলিনী মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী—দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের পাতে তরকারী দিচ্ছে। মা দেখতে পেয়ে অসন্তুষ্ট হলেন। ছিঃ ওরকম করে কি পরিবেশন করে। আমি দিচ্ছি ওদের, তুই অন্য কাজে যা বাপু। আমার সব সন্তান। শরৎ যেমন আমজেদও তেমনি। আহা, তোমরা কিছু মনে করো না বাপ। আমি তোমাদের দিচ্ছি, পেট পুরে খাও। তবে না দেবী আবির্ভূতা মানবী কলেবরে। রাখাল মহারাজ বলতেন—আমরা কি মূর্খ হেথা সেথা তীর্থ করতে ঘুরি আর জগজ্জননী মহামায়া যে ঘোমটা টেনে আমাদের মধ্যে সবার সেবা করছেন সেটা নজরেই পড়ছে না—হতভাগ্য আমরা।

ক্রমে উদ্বোধন লেনের বাড়ী তৈরী হ'লো এবং মা গৃহ-প্রবেশ করলেন। সেখানটি একটি তীর্থস্থান, আজও শ্রীমায়ের স্নেহের পরশ সেখানের আকাশে বাতাসে পাওয়া যায়। মা বেরিয়েছেন দেশভ্রমণে। দক্ষিণ ভারতে তাঁকে দর্শন করবার জন্য হাজার হাজার মদ্রদেশবাসী সমবেত হয়েছেন এবং জানিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি, তাঁদের ভালোবাসা। তাদের ভাষা, মা নাই বা বুঝলেন সে কথা। তাঁদের দিকে অনিমেষে চেয়ে হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। সবাই হেসে কেঁদে একাকার করেছে এবং তাদের অন্তরের অন্তস্থলে শ্রীমায়ের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুধীরা দিদি, নিবেদিতা, গৌরী মা, যোগীনময়, গোলাপ মা পেয়েছেন তাঁর আন্তরিক ভালবাসা ও স্নেহ। রাধু নামে মস্তিষ্কবিকৃতা ভাইঝি কত অত্যাচার করেছে সব হাসি মুখে সহ্য করেছেন। ভাইদের ঝগড়াঝাটি, স্বার্থের জন্য সামান্য জমিজরাত নিয়ে কলহ মিটিয়েছেন। ক্রমে মা বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন। প্রায়ই জ্বরে ভুগছেন। স্বামী সারদানন্দ চিন্তিত, আর বোধহয় মাকে রাখা যাবে না। ইচ্ছাময়ী যা ঠিক করেন তাই হবে। ক্রমে রাধুর ছেলেকেও আর দেখছেন না। শ্রান্ত হয়ে দিনের শেষে ঘরে যাবার উদ্যোগ করছেন এবং মহাপ্রয়াণ করলেন।

মা যা শিখিয়েছেন নিজের কাজে, ব্যবহারে, কথায়, দৃষ্টিপরশে তার ফল সুদূরপ্রসারী, এখনও মায়ের পরিচয় সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় নি। পিতাকে যে স্বপ্নে জগদ্ধাত্রী বালিকা রূপে দেখা দিয়েছিলেন, কজন তার তাৎপর্য্য বুঝলো। আমাদের জন্য তিনি অগাধ ধনরত্ন রেখে গেছেন। আমরা যেন চিনে নিই এবং জীবন ব্যয় করি সচেতন সাহসে, এবং জীব সেবায় তাঁকে অনুসরণ করে কৃতার্থ হই।

কলিকাতা ও বার্লিন

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

জনশ্রুতি স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় একদা ইউরোপ হতে ফিরে এসে বলেছিলেন, বাংলার একটা প্রধান সমস্যা কলিকাতা। শুনে চমকে উঠেছিলাম। বহুজনেও বিদ্রূপ করেছিলেন। বাঙ্গালীর স্বর্গ ও চিন্তা কলিকাতা। মফঃস্বল অঞ্চলের লোকে দেখেছি, কলিকাতা-বাসীকে সমীহ করেন; কলিকাতাবাসীও গর্ব্বিত। সকলের টানও কলিকাতার প্রতি। বাধ্য হয়েও লোকে আসেন এখানে। লেখাপড়া শিখতে হলে কলিকাতায় আসতে হবে। চাকরি বাকরি করতে বা খোঁজ করতে হলেও কলিকাতা। ওকালতি, ডাক্তারি, ব্যবসায়বাণিজ্য, রাজনীতি অবশ্য মফঃস্বল অঞ্চলেও করা যায়, তবে কলিকাতায় ঝোঁক অনেক বেশি। এমনকি, অসুখ হয়ে চিকিৎসা করাতে হলেও কলিকাতা। আমাদের গ্রাম-সুবাদের তুলসী খুড়োর বিষয় নিজ চক্ষে দেখেছি। গ্রামে এজমালি সম্পত্তিতে সংসার চলেনা, চলে তা নিয়ে বিবাদ বা মামলা করা। সহরে এলেন চিকিৎসা উপলক্ষে। তারপর থেকে গেলেন চাকরির চেষ্টায়, পেলেনও এবং হলেন কলিকাতাবাসী। গ্রামে নিজের ঘর দোর ছিল, অর্থ না থাকলেও খাতির কিছুটা ছিল। এখানে তিনি বস্তিবাসী। ফিরে যাওয়াও সমস্যা। নগত আয় ত এখানে আছে। তাছাড়া অভ্যাসও পাল্টে গেছে। রাস্তা ঘাট পাকা, যান বাহন আছে; পাঁচটা লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়; পাঁচ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা চলে। কালে ভদ্রে সিনেমা যাওয়া আছে। নিজে দরিদ্র হলেও সহরে আছে কিছুটা ধনীর আবহাওয়া। নগর মাত্রেই থাকে বৈচিত্র্য ও জীবন চাঞ্চল্য। কলিকাতার মত চঞ্চল সহর আর কটা আছে? আর গ্রামে? একঘেয়ে জীবন, লোকজনও মাথা গুণতি, চতুর্দ্দিকেই দারিদ্র্য ও মালিন্য। উত্তেজিত বা আশ্চর্য্য হবারও কিছু নেই। অবশ্য তুলসী খুড়ো মধ্যে মধ্যে হাঁপিয়ে পড়েন; তবুও তুলনায় তিনি সহরে নিশ্চয়ই সুখী। তবে বস্তিবাসের ফলে তাঁর পরবর্ত্তী বংশধরেরা কিরূপ দাঁড়াবেন বা দাঁড়াতে পারেন, তা অনুমেয়।

স্মৃতি থেকে লিখছি। কলিকাতায় এ.সছি পড়তে। এখানে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হত, বাতাস দূষিত; রাত্রে সুনিদ্রা হয়না হট্টগোলে। তবুও কলিকাতা সামান্য জনপদ নয়। ক্রীড়া, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনীতি উপলক্ষে যা দেখা শোনা যায় এখানে, মফঃস্বলে সম্ভব নয়। তথায় লোকে সংবাদপত্রের মারফৎ সে সবের পরিচয় পান। তবুও মন পড়ে থাকত, ছুটি হলে কবে কলিকাতা ত্যাগ করে যেতে পারব। সহপাঠীদেরও সে অবস্থা লক্ষ্য করতাম। অর্থাৎ শত আকর্ষণ ও মাহাত্ম্য সত্ত্বেও কলিকাতা অসহনীয় বোধ হত তাদের, যাদের অন্যত্র মোটামুটি স্বচ্ছন্দ বসবাসের অভিজ্ঞতা আছে ও স্বতন্ত্র জীবন যাত্রা রয়েছে। পরে বিদেশে সহর নগর ইত্যাদি দেখার কিছু সুযোগ হয়েছে। তুলনা ও সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছি। প্যারিস সহরের উপকর্ষ দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস হয়নি। বার্লিন সহর যখন প্রথম দেখি, চমকে যাই। যদিও যুদ্ধের ফলে বহু ঘরবাড়ী রাজপথ তখন পর্যন্ত ভাঙ্গাচোরা ছিল, তবুও একি নগর! পথে ভীড় নেই। আর চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত, বসতবাড়ীর সম্মুখে পশ্চাতে উদ্যান। নগরের রাজপথের পাশে পাশে বা মাঝখানে ফুলের টব সাজান রয়েছে, পুলিশে দেখেছি বারি সিঞ্চন করছে। বসন্তে চোখে পড়ত, সুদৃশ্য গাছপালা, ফুলের কেয়ারি। ছবির মত সাজান নগর, রূপকথায় কই এমনটা শুনিনি, কল্পনাও করিনি। মানুষের স্বাস্থ্য, প্রাচুর্য্য ও স্ফূর্ত্তিতে ফেটে পড়ছে। আড়ম্বর যদি বাদও দেই, লোকে চায় উন্মুক্ত পরিসর, আলো বাতাস। বোধ-হয়, মানুষের প্রধান সম্পদই হল এই। নগর ও গৃহের

সৌন্দর্য্যও উপেক্ষণীয় নয়। তুলনায় প্রায় সমুদয় কলিকাতা সহরটা বস্তির পর্য্যায়ে পড়ে। ওদেশের মত সহর নগর আমাদের দেশেই বা সম্ভব নয় কেন? দেশ স্বাধীন হয়েছে। গ্রাম, সহর, নগরও মনুষ্যকৃত। ভেবে দেখেছি, দুটি সহর ও তার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কিছু বলছি।

শ্রীদাসগুপ্ত কলিকাতা হতে সরাসরি পশ্চিম বার্লিনে এলেন প্লেনে। বার্লিনে পৌঁছে চমকে যান, একি নিস্তব্ধ! এত শান্তি, একি সহর না গ্রাম! কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। সত্যই বার্লিন নিস্তব্ধ। সমগ্র ইউরোপই কম বেশি নিস্তব্ধ। কেবল হিটলার এদেশটা সরগরম করেছিলেন, সে কথা থাক। লোকেত এখানে কথা বলেই কম, তাও অস্ফুচ্চে। কাজ শেষে গৃহে ফিরে যার যার ঘরে ঢুকে রেডিও খুলে বসেন। রেডিও না চললে অনেকে শুনেছি পড়াতেও মনোনিবেশ করতে পারেন না। পাশাপাশি ঘরে বাস করেছি ২ বছর। জানতেও পারিনি পাশের ঘরে রেডিও আছে এবং তা নিয়মিত ব্যবহৃতও হয়। আমাদের দেশে লোকেত রেডিও চালান পরকে শোনাবার জন্য। বাটা কোম্পানী দোকান খুললেন। লাউড-স্পীকার যোগে রেডিও চালাতেন; যখন রেডিও বন্ধ থাকে, ২।৩টা গ্রামোফোনের গান লাউড স্পীকার যোগে পরিবেশন করতেন। লাউড-স্পীকার পরে নাকি সরকার তুলে দিয়েছেন। তবে রেডিও আছে। কাজের পর দিনের শেষে ঘরে ফিরছি, গলিতে ঢুকলাম—আর পাশের বাটি হতে গর্জ্জে উঠল। বাজার দর পড়ছেন ইত্যাদি। দুরু দুরু বক্ষে এগিয়ে যাচ্ছি—যা ভেবেছি ঠিক তাই। অর্থাৎ বাড়ীর আঙ্গিনার ভেতরও অন্য ফ্লাট থেকে তার স্বর এল—কানপুর ২৭ টাকা ৫ আনা। আর নিস্তার নেই। এরপর পরিবেশিত হবে পুরুষের কণ্ঠে একটানা মেয়েলি স্বরে নানান রকম হতাশার গান। হতাশ—লোকে আর সাধ করে হয়!

মনে পড়ছে একদা কলিকাতা ফেরত ছুটিতে সুন্দরবন অঞ্চলে ভ্রমণে বেরিয়েছি। কেষ্টবাবু বয়স্ক লোক। শুনে ধীরে বললেন হোটেলের ঝোল, না বাবা এই বনে বাদায় বেশ আছি। এই পাণ্ডববর্জিতদেশে বাস; খতিয়ান আর পরচা, বাঁধ-বন্দি আর ফসল, আদায় এইত জীবন। তবুও এত সংক্ষেপে বাতিল করতে আটকান না মহানগরীকে। পরে অবশ্য ক্রমশঃ নিজেও বুঝেছি কলিকাতার রিক্ততা। হোটেল, মেসে বহুদিন কাটিয়েছি। দোকানে ভোজনও অনিচ্ছা সত্ত্বেও করতে হয়েছে। বাঙ্গালীর ঘরসংসার প্রধানতঃ রান্নাঘর নিয়েই। একারণ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখছি। জার্মানীতে একটানা পথে থেয়েছি, নিজে রান্নাবান্নাও করেছি। তফাৎও হয়েছে। পাকের ঘরেই আমরা জীবনটাকে কতটা অকারণ ঘোরাল করে তুলি। রুচি, আস্বাদের কথা বাদ দিচ্ছি। অভ্যাসে দেখেছি, থাওয়া দাওয়া বহু সরল করা যায়। জার্মানীতে পালা পার্ব্বণেও নিমন্ত্রিত হয়েছি। খাওয়া দাওয়াটা প্রায় সর্বত্র ২।১ পদের ব্যাপার, অথচ স্বাস্থ্যপ্রদ। অবশ্য এদেশে চর্ব্ব্য চোষ্য সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করতে আমি প্রস্তুত নই। ডি, এল্, রায় ত লিখেছেন, বোকারা খাওয়ায়, আর চালাকেরা খায়। যদি আপনি বহু পরিশ্রম, প্রস্তুতি ও অর্থব্যয়ে চর্ব্ব্য চোষ্য পরিবেশন করেন, নিশ্চয়ই আমি সানন্দে গ্রহণ করব। কলিকাতায় বহুপরিবারও—শোনাযায়—আহারের আড়ম্বরে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। যা হোক, উদার লোকের অভাব না থাকলেও দৈনিক নিমন্ত্রণ পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই দৈনন্দিন বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করছি। বড় বড় সাহেবি হোটেলের কথা বাদ দিচ্ছি। বাকি যে সব হোটেল, দোকানপসার কলিকাতায় চলছে, তার অধিকাংশই কি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। অন্ততঃ পক্ষে খাবারের ব্যবসায়টা এ ভাবে চালাতে দেওয়া উচিত নয়। আর মনে করুন, আপনি ঘনবসতি অঞ্চলে বাস করেন। আপনার গৃহে কয়লার চুল্লি অনির্ব্বাণ জ্বলছে। মেয়েদের কাজই সর্ব্বক্ষণ ইন্ধন জ্বালিয়ে রাখা। আপনার ঘরদোর মায় রাস্তাপর্য্যন্ত বিষাক্ত ধোঁয়ায় ভর্ত্তি। পালাবার পথও নেই। অধিকাংশ বাসগৃহ তো কয়েকটা খুপরিমাত্র। স্বতন্ত্র রান্নাঘরই হয়ত নেই। লোকে নাকি ক্রমে সব অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। পাচকে রাঁধে বা মেয়েরা। কাজেই ধোঁয়া আর রান্না সম্বন্ধে মাথা ঘামানর প্রয়োজন কোথায়? তুলনায়, বার্লিন সহরে দেখেছি, এক পরিবারের সকল লোকই খাওয়া দাওয়া চলা ইত্যাদি বাঁধা সময়ে করেন; সাংসারিক করণীয়ও কিছুটা সবাই করেন, যার ফলে

গৃহস্থালীতে শুধু শৃঙ্খলা নয়, পরন্তু পরিশ্রম অনেক লঘু হয়ে যায়।

শুনেছি, সহর অঞ্চল, ধোঁয়া ধূলাতো হবেই। কন্টিনেন্টের সহর দেখেছি। এ জাতীয় ধোঁয়াতো নেই। বার্লিনের বাতাসই স্বতন্ত্র। কয়লা জ্বালালে ধোঁয়া হবেই। গ্যাসে বা ইলেকট্রিকে খরচা প্রায় সব দেশেই বেশি, তবুও লোকে নগরীতে কয়লার আগুনে রাঁধে না—শীতের দেশেও। জনৈক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে জানি। তাঁর কোয়ার্টারে সব প্রকার ব্যবস্থাই আছে। মাসিক পাঁচ টাকা ব্যয় কম, তিনি কয়লাই পোড়ান। অবশ্য তিনি কলিকাতায় বাড়ী তুলছেন। যার মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয়, তার পক্ষে গ্যাসের আগুন নিশ্চয়ই বড় বিলাস; কিন্তু সবলোকের আয়ও চিরদিন এদেশে এত কম থাকবে না। আর কয়লার ধোঁয়াই যদি আমাদের ধাতস্থ হয়, আয় বাড়ানর তো দরকার নেই, দরকার হাঁসপাতাল বাড়ানর।

গ্যাসটা একটা উদাহরণ মাত্র। কলকারখানা, রেল, মোটর ইত্যাদি সবই অনিয়ন্ত্রিত ভাবে সহর ও তার বাতাসকে কলুষিত করছে। বৈদ্যুতিক ট্রেণ, বৈদ্যুতিক বাস চালু হলে অবস্থা কিছু ভাল হবে। অপরদিকে বিবেচনা করুন, কলিকাতার কটা বাড়ী বসবাসের উপযুক্ত? শুধু ভাড়া বাড়ী নয়, এদেশের অধিকাংশ বসত বাড়ীও আরাম ও সৌন্দর্য্যের মান হিসাবে বর্ত্তমান ইউরোপে অচল। স্বল্প মূলধনে নগরীতে বাড়ী করা অন্যদেশে সম্ভব নয়। কারণ ঘর বাড়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তি—যদিও বা হয়, সমগ্র নগরের উৎকর্ষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। আমি অত্র কলিকাতার বস্তির কথা তুললাম না। সাধারণত যাকে আমরা মনে করি বস্তির বহির্ভূত, তার বড় অংশও বস্তুতঃ বস্তি। পুনরায় বিবেচনা করুন, কলিকাতার একটা বড় অংশ বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে থাকে। বিজ্ঞজনে বলেন, শোচনীয় পরিবেশে বসবাস শরীর ও মনের ওপর বিষের ক্রিয়া করে। ইউরোপের সঙ্গে, বিশেষ পশ্চিম বার্লিনের সঙ্গে তুলনা করে আমি ত আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে এই অবস্থাতেও কলিকাতাবাসীর কিছু কার্য্যক্ষমতা ও চিন্তা শক্তি বজায় আছে। কলিকাতা ভারতের গৌরব। এদেশে আধুনিক শিক্ষা সভ্যতার প্রচার প্রসার হয় কলিকাতার মাধ্যমে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও প্রধানতঃ কলিকাতা হতে সারা ভারতে সঞ্চারিত হয়। জগৎ সভায় কলিকাতার স্থান রয়েছে এবং জগৎসমক্ষে এই কলিকাতাকে উপস্থাপিত করার মত কালিমামুক্ত করতেই হবে।

শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয় সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন। বলেন, গঙ্গাতীরে আছি, সেইত মহা সৌভাগ্য। গঙ্গাতীরে বিচরণ করেছি। পুণ্যসলিলার তটে বহু সৎপুরুষও আসন করেছেন, আর বহুজনে ভক্তিভরে আগ্রহ নিয়ে তথায় জমায়েত হয়েছেন। বিকাল সন্ধ্যা অতিবাহিত করার পক্ষে উত্তর কলিকাতায় আর কি উত্তম স্থান হতে পারে? কিন্তু চারপাশ হতে ভেসে আসে সিমেণ্ট চুন সুড়কি আর পাট খড়ের ধূলা। পরমার্থ মাথায় থাক, বায়ুসেবন দূরে যাক, গঙ্গাতীর অসহনীয় হয়ে ওঠে। এখন ধরুন যদি গঙ্গাতীরে প্রশস্ত উদ্যান থাকত, বায়ুসেবন হোক আর বৈঠক হোক, দুটোই কি ভাল হত না? অন্যত্র এই রকমটাই দেখেছি। বার্লিন সহরের এক সীমানা ধরে বয়ে যাচ্ছে হাফেল নদী। দুপাশে প্রশস্ত উদ্যান, পরিষ্কার ঝকঝকে রাজপথ ও কৃত্রিম উপবন। নিজের মোটর গাড়ী থাকে আরামে বেড়াতে যেতে পারেন। অল্পব্যয়ে বাসে বা রেলেও যাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দৃশ্য, আলোবাতাস সকলের জন্য উন্মুক্ত, যার ইচ্ছা ভোগ করে নিন। উপভোগ করেনও বার্লিনবাসী। নদনদী, জলাশয়, বায়ু—আকাশ জল সাধারণের সম্পত্তি, সেটা তবে এজমালি নর্দ্দমা নয়। যত খুসী নোংরা ফেললে গঙ্গার পক্ষেও অসহনীয় হয়ে পড়বে। কলিকাতার বাতাস ত দূষিত হয়ে পড়েছে বহুদিন হল। শুধু একটা সহর নয়, দুকূলের সমগ্র দেশের ওপর নির্ভর করে নদীনালার স্বাস্থ্য। মধ্যইউরোপে অনেক ক্ষেত্রে নদনদী অব্যবহার্য্য হয়ে গিছল অনিয়ন্ত্রিত ময়লা নিক্ষেপের ফলে। পরে লোকের চেতনা হয় ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং অপর দিকে নষ্ট জলধারাকে উদ্ধার করার কাজও চলেছে। জার্মানীর দুর্ভাগ্য, দেশটা দু ভাগে বিভক্ত। তবুও অন্ততঃ পক্ষে পশ্চিম জার্মানীতে সকলেই এ বিষয়ে অবহিত ও বিরাট সংস্কার কার্য্য চলছে। বাতাস যাতে দূষিত না হয়ে পড়ে সে বিষয়েও আইন ও নিয়ন্ত্রণ আছে জার্মানীতে।

ভারতবাসী শোনা যায় প্রকৃতির ভক্ত। কলিকাতায় গাছপালা নেই, আছে সাইনবোর্ড। কলিকাতাবাসী গাছ-পালা দেখতে যান শিবপুর বাগানে; তথায় আবার প্রচণ্ড ভীড়, এমন কি লাউডস্পীকার যোগে গানও চলতে দেখেছি। পথে হাওড়ার ওপর দিয়ে যেতে হয়। বার্লিন সহরের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে দেখেছি বিরাট সরোবর, আর মনুষ্য রোপিত বন। কি অপরূপ দৃশ্য! গাছপালা অনেকটা দার্জ্জিলিঙের ঘুম অঞ্চলের মত। তথায় পরি-ভ্রমণ করুন, বসে থাকুন, যা আপনার অভিরুচি। চতুর্দ্দিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য ও শান্তি বিরাজ করছে। একবেলা সেখানে কাটালে সপ্তাহের শ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। তুলনা করুন, কলিকাতার জীবনটা আমাদের কোন পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কথা হল, সহরকে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব কি না? অন্তরায় অবশ্য অনেক আছে। কিন্তু অন্যদেশে সম্ভব হয়েছে রুদ্ধ নষ্টপ্রায় নগরকে পুনর্গঠন করা। যুদ্ধবিধ্বস্ত বার্লিন সহর ত কয়েক বছরে নতুন করে গড়ে উঠেছে। বিগত প্রায় পাঁচ বছরে নিজের চোখের ওপর দেখলাম কি রূপান্তর। প্রথম অন্তরায় গতির নিয়ম। চেষ্টা বিনা গতানুগতিকতা পাল্টায় না। দ্বিতীয়ত কলিকাতায় জমির দাম অত্যধিক। তৃতীয়ত কলিকাতায় লোকের চাপ দৈনন্দিন বাড়ছে বই কমছে না। কলিকাতা নগরীর বহুবিধ চরিত্র। রেল নদীপথের সংযোগস্থল, বড় বন্দর ও ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র কলিকাতা। এছাড়া কলিকাতা বাংলা সরকারের খাস দপ্তর। অসহায় উদ্বাস্তদের কলিকাতা একটা আশ্রয়শিবির। কলিকাতায় ছোট মাঝারি বহু কলকারখানাও রয়েছে। কলিকাতার বক্ষ হতে চাপ কমান আশু প্রয়োজন, অনুমান করি। যাঁরা নতুন কল-কারখানা স্থাপনে আগ্রহশীল তাঁদের প্রতি আবেদন, স্থান নির্ব্বাচনটা বেশ ভেবে দেখতে। রাস্তাঘাট, যানবাহন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রসারের ফলে অন্যত্রও কারখানা করা চলে; জমির দামও সস্তা। শুধু কারখানা নয়, লোকজনের বসবাসের জন্য জমির কথাও বিবেচ্য।

কলিকাতা হতে নিদেন পক্ষে কিছু কিছু সরকারি দপ্তরও স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি কোন মোগল বাদশাহের নকল করতে বলছি না। জমি বাড়ীর দাম কলিকাতায় খুব চড়া। সরকারি সম্পত্তি বিক্রয় করে ঐ অর্থে কলিকাতা হতে বেশ দূরে নতুন স্বতন্ত্র নগর পত্তন করা যেতে পারে। কার্য্যবশতঃ অন্য পাঁচজনেও বসবাসের জন্য তথায় যাবেন, বেসরকারি বাড়ী-ঘর দোকান পসারও গড়ে উঠবে। লাভ দ্বিবিধ। কলি-কাতার ওপর চাপ কমবে ও অন্য একটা নগর গড়ে উঠবে। বাংলা দেশেত কলিকাতার বাইরে নগর বলতে কিছু নেই। পাশ্চাত্য দেশের মাপকাঠিতে দার্জ্জিলিং এদেশে একমাত্র সুষ্ঠু সহর। যাহোক, কলিকাতায় যারা থেকে যাবেন, তাঁদের বসবাসের জন্য সহরটা ঢেলে সাজাতে হবে। বিশেষজ্ঞেরা নকসা ও পরিকল্পনা দেবেন। কলিকাতার রাস্তাঘাট, যানবাহনের ব্যবস্থা, বসবাস, খেলা-ধূলা প্রভৃতি চিত্তরঞ্জনের সকল ব্যবস্থাই শুধু উন্নততর নয়, সুন্দরও করতে হবে। করা কি সম্ভব? প্রথমেই বলেছি, ইচ্ছা থাকলে পথও পাওয়া যাবে। পাশ্চাত্যদেশেও অবাধ কলকারখানা ও বসতি স্থাপনের ফলে বহু জন-পদ বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল এবং এখন সংস্কারের ফলে নতুন কলেবর গ্রহণ করেছে ও করছে। লোকে সচেষ্ট হলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্ববার্লিন ভিন্ন রাজ্য, তথায় সাঁজে বাতি জ্বলে না, বাড়ীঘর পথঘাট এখনও পর্য্যন্ত অর্দ্ধভগ্ন। একই সহরের একাংশ এখনও হীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে, আর অপর অংশ অর্থাৎ পশ্চিম বার্লিন চেষ্টার ফলে কি প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল। উন্নত সহরের দৃষ্টান্ত এদেশেও রয়েছে। দার্জ্জিলিঙের উল্লেখ করেছি; এই কলিকাতা সহরেরই কোন কোন অঞ্চল অনেক সুষ্ঠু, কিন্তু তথায় কজনের স্থান আছে। পশ্চিম বার্লিনে ঘরবাড়ী কি পরিচ্ছন্ন, নয়নাভিরাম ও আরাম-দায়ক। বাসগৃহ, সাধারণ লোকের আয়ের পক্ষেও অপ্রাপ্য নয়। অবশ্য উল্লেখ করতে হবে তথায় এক-জনের আয়ে দশজন নির্ভরশীল নন এবং এক পরিবারে লোক সংখ্যাও কম। আর আকাশ, বাতাস, মুক্ত প্রান্তর, নদ-নদী, সরোবর, বন, উদ্যান সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত ও উপভোগ্য। কলিকাতাবাসী তথা এই দেশের লোকে কি সুন্দর বৃহৎ জীবন হতে চিরদিন বঞ্চিত থাকবে? নিজেদের পৌরুষে আমরাও কি উন্নত শহর গড়ে তুলতে পারি না—যা অন্ততঃপক্ষে ভবিষ্যৎবংশীয়দের বসবাসের উপযুক্ত হবে। একটা মহানগরী কেবলমাত্র নগরবাসী বা অতিথিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, পরন্তু সমগ্র দেশের বৃহৎ স্বার্থের সঙ্গে তার যোগ। বহুজনের সৃষ্টিশক্তি, শিল্প-কৌশল ও চিন্তাধারার সে বাস্তব রূপ। বস্তুতঃ কলিকাতা বাঙ্গালীর পরীক্ষা স্থল।
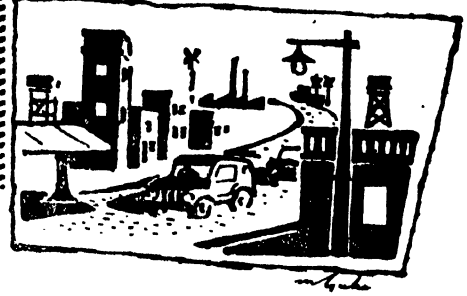
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এতখানি নীচে নামবে জীবন ঠিক ভাবতে পারেনি অশোক। কলেজের জন্য বাড়ীটা কিছু টাকা নিয়ে ছেড়েদিতে রাজী হয়েছিল তার মা। জীবনও ভেবেছিল, যা পায় তাই নিয়েই চলে যাবে।

কিন্তু ফাঁক থেকে পানু দাশ সব যেন ভেস্তে দিল। টাকা আর প্রলোভনে জীবনকে বিভ্রান্ত করতে তার দেরী লাগেনি। তার দুর্গাপুর কারখানায় ভাল কায দেবে—সেই সঙ্গে এ বাড়ীর জন্য, বাগানের জন্যও দাম দেবে ভালোই।

কথাটা গোকুলই পাড়ে চুপিচুপি, এককালে জীবনের বন্ধু ছিল, আজ এসেছে জীবনের বিপদে সাহায্য করতে।

জীবন তখনিই রাজী হয়ে যায়। সেই রাত্রেই পানুর জিপ তাকে নিয়ে চলে যায় সদরে।

কথাটা জানতে পারে যখন, তখন আর করবার কিছুই নেই। পাকা দলিলপত্র হয়ে গেছে। সাক্ষী ইসাদীও ঠিক করেছে রাতারাতি গোকুল।

ওই ধরণী মুখুয্যে আর ফণীবাবুই হল সনাক্তদার—অবনী রায় মূল ইসাদী।

···গজরায় এমোকালী।

রক্তের দোষ ছোটবাবু, শালা বেইমান। আর ওই গোকলে—কালীর অতীতের সেই দিনগুলো মনে পড়ে। সেদিন ওই পাপকে শেষ করে দিতে পারতো। তারকবাবুর খামারের আগুনে ফেলে দিলেই একটা পাপ শেষ হতো গ্রামের, কিন্তু পারেনি।

পানু দাশ! তাকেও ক্ষমা করতে পারে না। ভুবনকে কিনে নিয়েছে—কদমবৌ কেন অমনি করে মরল তা কিছুটা অনুমান করতে পারে।

···তিলেতিলে ওদের সমবেত অত্যাচার আজও বেড়ে চলেছে। তারকবাবুর দিন গেছে—ওরই প্রাসাদে তাই আর এক অভিশাপের মত আজ বাসা বাঁধতে চায় পানু দাশ—এ যুগের বনস্পতির গায়ে নোতুন পরগাছার মত।

সে দিন কিছু করতে পারেনি অশোক।

···রাত অন্ধকার। থমথমে বিরাট বাড়ীটার গায়ে ভারা বাঁধা, মেরামত সুরু করেছে পানু দাশ। ওপাশে তৈরী করছে গ্যারেজ,···বাগানের জায়গাটাও সাফ-সুতরো হচ্ছে বিদেশী গাছপত্র বসাবে। এদিক ওদিকে দু একটা আলো যেন হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। প্রাসাদের ভিত্তি-স্থাপনা হবে পানু দাসের। আবছা অন্ধকারে কাদের দেখে সরে দাঁড়াল অশোক গাছ গাছালির নীচে। ওরা এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ···হাসির শব্দ শুনে চমকে ওঠে অশোক।

···ও হাসির সুর তার চেনা। অতীতের কত স্বপ্ন-জড়ানো ওই হাসি।

প্রীতিকে আজও সে ভোলেনি।

ছায়ামূর্তিদুটো হঠাৎ যেন খুব কাছাকাছি এসে পড়ে, …চমকে ওঠে অশোক। পায়ের নীচের মাটি যেন থর-থরিয়ে কাঁপছে। পাহুর নিবিড় বন্ধনে কোথায় হারিয়ে যায় প্রীতি। সাগ্রহে কোন নবজাতক স্বৈরিণী নিজেকে ধরা দেয় ওই জানোয়ারের বন্ধনে।

দুচোখে ওদের উন্মত্ত আদিম লালসা।

…তারাগুলো চমকে ওঠে।

নিজেকে সরিয়ে নিয়ে হাঁপাচ্ছে প্রীতি অসহ্য উত্তেজনায়। বলে ওঠে,—সিলি বয়।

হাসির সুরে নিষেধ নয়—উন্মাদ আমন্ত্রণ ছড়ানো।

সরে গেল অশোক, পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে পালাচ্ছে সে, ঘৃণা আর অসহায় ক্ষোভে জ্বলছে সারা মন।

মুখের উপর কে যেন তার তীব্র কশাঘাত হেনেছে।

ওদের হাসির শব্দ তখনও ধারাল ছুরির ফলার মত সর্বাঙ্গে বিঁধছে। পালাল অশোক। নিদারুণ অপমান আর অসহ্য জ্বালায় সে আঁধারে আত্মগোপন করল।

কোথায় যেন গিয়ে পড়েছে স্বপ্নের ঘোরে।

চমক ভাঙ্গে শিখার ডাকে—তুমি! হঠাৎ কোত্থেকে!

গ্রামের ওই বুকচাপা জঘন্য পরিবেশ থেকে নোতুন-ডাঙ্গার মুক্ত হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল অশোক। কেন যে এই দিকেই এসেছিল জানেনা। একটা দুঃসহ জ্বালা, পোকায় ধরা সমাজের জীবনের সেই আদিম রূপটাকে বহুকাল পর দেখে শিউরে উঠেছিল।

তার মনের কল্পনা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে যে মহিমাময়ী মূর্তির একটু অবশেষ ছিল, সেই মানসীর আজ চরম অপ-মৃত্যুতে ব্যথাই পেয়েছে অশোক, দুচোখের চাহনিতে তারই প্রকাশ। শিখার দিকে চেয়ে থাকে। ওর কথার জবাব দিল না।

—বসো!

শিখাও অবাক হয়ে গেছে ওকে এই অবস্থায় দেখে। বলে ওঠে অশোক—সব যেন বিশ্রী ঠেকে শিখা, সর্বাঙ্গে এর দগদগে ঘা, একে বাঁচানো যাবে না। বৃথা চেষ্টা।

শিখা কথা বলেনা। ওকে দেখছে গভীর সমবেদনার চাহনিতে। অতীতের দেখা সেই মন আবার তার সুরে ভরে ওঠে।

প্রথম ভালবাসা—সেই পাটনার গঙ্গার ধারে সন্ধ্যা-গুলোকে ভেবেছিল মিথ্যা স্বপ্ন—বহু দেখা, বহু পথঘুরেও তাকে ভোলেনি।

যাচিয়ে নিয়েছে। দেখেছে অজ্ঞাতেই সে কোনদিন ভালবেসে ফেলেছে; আজ আবার নোতুন করে তাকে পরখ করতে সুরু করেছে। বলে ওঠে শিখা।

—ভালবাসার বোধ যেখানে নেই—সেখানে ওটা বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। আসল পুঁজি যার নেই—সেইতো চায় লুট করতে।

—হয়তো তাই!

অশোকও মনেমনে কথাটা বিশ্বাস করে। মনের দিকথেকে দেউলিয়া হয়ে যাওয়াটাই উচ্ছৃঙ্খলতার মূল-কারণ। ওদের দুজনেরই মন বলে কিছু নেই। তাই ওরা ক্ষণিকের লুটে নেওয়াটাই আনন্দের বলে মনে করেছে।

…মেঘ জমেছে, রাতের আকাশ ভরে উঠেছে পুঞ্জমেঘের আস্তরণে। বর্ষার ধারাস্নান নামে অতর্কিতে।

বৃষ্টি এল? ব্যস্তহয়ে ওঠে শিখা।

তাইতো! অশোক বিব্রত বোধ করে।

—একটু দেখে যাবেন না? শিখা ইতস্তত করে।

—না, ভেজা অভ্যাস আছে।

বেগে বের হয়ে যায় অশোক। শিখা ঠিক বুঝতে পারেনা। অশোক যেন তাকে এড়িয়ে গেল। রাত-নির্জনে দুজনের মনের এই সাময়িক একটা মিষ্টি সুরও শিখার মন ভরিয়ে তোলে।

জোরে বৃষ্টি নেমেছে।

ঝাপসা হয়ে আসে গাছপালা, আবছা হয়ে ওঠে আলোগুলোও।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শিখা। অশোকের অতর্কিতে আসা—ওর চোখ মুখের সেই অসহায় বেদনাহত ভাব কেমন যেন বিচিত্র ঠেকে তার কাছে। অশোকের মনের বেদনাটা যেন প্রকাশ-পথ খুঁজতে এসেছিল তার কাছেই।

…কথাটা অশোকও ভাবে। কেমন একটা ভুল করে ফেলেছিল সে। শিখার মুখটা তখনও মনে পড়ে।

শান্তমধুর একটি অনুভূতি আনা চাহনি। বহু দুঃখ কষ্ট আর পথচলার অভিজ্ঞতায় জীবনকে দেখেছে।

…সফেন উচ্ছলতা নেই—আছে তাতে শান্ত সমাহিত একটি ভাব। শিখা আজ বুদ্ধির দীপ্তিতে সংযত অথচ ভাস্বর।

…বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে—গাছে পাতায় বৃষ্টির ধারাস্নান, মাটির বুক থেকে উঠছে মিষ্টি গন্ধ।…কলকলিয়ে জল চলেছে, মাঠগড়ানী জল।

বাড়ী ঢুকে অবিনাশকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয় অশোক।

—তুমি!

অবিনাশ বলে ওঠে—ভিজে যে চুবে এসেছেন ছোটবাবু!

হাসে অশোক—বসো, কাপড়টা বদলে আসি। চলে গেল ভিতরে। অবিনাশ চুপকরে বসে আছে। মনে ওর খুশির সুর। বাইরে বৃষ্টির ধারাস্নান চলেছে, মাঝে মাঝে গর্জে ওঠে মেঘ—গুরু গুরু শব্দে। স্তব্ধ পৃথিবী কাঁপছে।

‥একটা সুর—বৃষ্টির সুরের ধ্রুপদে পড়েছে মেঘ-মৃদঙ্গের গুরু গম্ভীর বোল তেহাই। মন কোন দূর স্বপ্ন জগতে ছুটে যায়।

…অনেক দূরে। এতদূরে কোনদিনই যায় নি। কোলকাতা—আসানসোল সহরে, এলাহাবাদ—বেনারসও গেছে বাজনা শোনাতে। আজ এসেছে আর ও দূর থেকে তার স্বীকৃতি।

—কি খবর?

অশোককে ঢুকতে দেখে ওর হাতে তুলে দেয় চিঠিখানা।

—ইংরাজী ফরম একটু ভর্তি করে দিতে হবে। তা যাবো ওখানে বাজাতে?

—খুশী হয় অশোক—নিশ্চয়ই যাবে। দিল্লী থেকে ন্যাশন্যাল প্রোগ্রাম পাচ্ছো—তারপর বিভিন্ন বেতার ষ্টেশনে চেইন প্রোগ্রাম—নিশ্চয়ই যাবে তুমি।

খুশীতে অবিনাশের মন ভরে ওঠে।

বৃষ্টি ধরে আসছে। থমথমে কালো আকাশ। বৃষ্টি ভেজা আমন্থর বাতাসে ভেসে উঠেছে বকুল গন্ধ।

…তখনও বিজলী ঝলসে ওঠে মাঝে মাঝে।

—ক'দ্দিন পর ফিরবো ছোটবাবু।

—তাহোক, তবু যাবে তুমি। গ্রাম থেকে সবাই গেল শুধু নিজেদের পেটের ভাতের সন্ধানেই, ভিড়ে হারিয়ে গেছে তারা। তুমি যাবে এ মাটির থেকে জীবনের অমৃতসঞ্চয় নিয়ে দেশ-দেশান্তরের মানুষকে তারই স্পর্শ দিতে।

অবিনাশ ওর কথাগুলো শুনে চলেছে স্বপ্নাবিষ্টের মত। মন ভরে ওঠে একটি সুন্দর অনুভূতিতে, ওই তার মনের অতলের না-বলা-কথা—যে কথাটি সে বারবার বলতে চেয়েছে, প্রকাশ করতে চেয়েছে তার সুরে সুরে।

চুপকরে থাকে মিষ্টি।

দুচোখে ওর জল, বার বার জীবনে এসেছে এমনি নির্ভর, সান্ত্বনা। কিন্তু সবাই একে একে যেন তার হারিয়ে গেল।

হাসে অবিনাশ।

ফিরে আসবো মিষ্টি, তোদের ছেড়ে থাকতে পারবো না। এ মাটি এ গ্রাম এই পরিবেশ থেকে ভিন্ন আমি নই।

মিষ্টির মনে ভরসা আসে। যাদের এদ্দিন দেখেছি অবিনাশ সে জাতের নয়, এরা হারায় না।

—তোমার পথ চেয়ে থাকবো মিতে।

—আমিও।

অবিনাশ ওকে কাছে টেনে নেয়। তবু দুদিনের জন্য হারাতেও মন চায় না মিষ্টির। চোখের জল মুছে মনকে বোঝায়।

অবিনাশ চলে গেল দূর পথের দিকে।

ধরণী মুখুয্যে অবনীরায়এর দল স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঠকেছে অবনীই সব থেকে। পান্থ দাশকে ফাঁক ফিকিরে সস্তায় তারকবাবুর বাড়ীটা কিনিয়ে দেবার পরই চাহু কেমন কায গুছিয়ে নিয়ে সরে গেছে। কিছু দালালী দোব বলেছিল, তাও পায়নি। ক'দিন যাবার পর জবাবই দিয়ে দেয় পান্থ দাশ।

—অনেক পড়ে গেছে কাকা, ওসব আর দিতে পারবো না।

অবাক হয় অবনী। শেষ পাওনা পাবার আশায় বলে

ওঠে।—তবে সে সাঁওতাল কুলি কিছু ব্যবস্থা করে দেবে চাষবাসএর জন্যে।

—এ্যাঁ। আমি বলেছিলাম? পান্নু যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—না ছান্নু বলেছিল।

পান্নু বলে ওঠে—তাকেই বলুনগে।

পান্নু এড়িয়ে গেল। ছান্নুরও সময় নেই। এদিকে বৃষ্টি নেমেছে। অফুরাণ বর্ষা। মাঠে মাঠে জল বাধিয়ে গেছে। লকলকিয়ে উঠেছে ওদের যৌথ চাষের বীজ ধান। সবুজ হয়ে উঠেছে সার গোবরে।

ভালো জমি ছাড়াও কঠিন ডাঙ্গার বুক ফেঁড়ে বার করা জমিতেও চাষ পড়েছে। নরম মাটিতে ওরা পাখনা দিয়ে ধান পোতবার আয়োজন করে চলেছে। মুনিষ কামিন যারা ছিল তারাই জুটেছে। বাউরীপাড়ার নিতে বাউরী হয়েছে সর্দার। কাশী—পটু—গদাই আরও কজন বীজ পুতে চলেছে। নারাণ ঠাকুর মেঘজমা আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে খুশি ভরে, পায়ে হাতে জলকাদা—মাথায় আগেকার মত একটা গামছা জড়িয়েছে। মুখে চোখে খুশীর আভা। এই জীবনেই সে অভ্যস্ত—এ মাটির সঙ্গে আগেকার সেই হারাণো সম্বন্ধটা খুঁজে পেয়েছে।

—ছোটবাবু! অ অশোক।

অশোক বর্ষাতি চাপিয়ে আলের ওদিক থেকে আসছিল। হঠাৎ অবনী রায়ের ডাকে দাঁড়াল। পিছনে রয়েছে ধরণী।

—একটু কথা ছিল বাবা।

—বলুন। অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—মানে, একেবারে কি পথে বসবো ছেলেপুলে নিয়ে? ওই তো জমির অবস্থা। পড়ে পড়ে জল খাচ্ছে—চাষ আবাদও নাই।

নিতে বাউরী এসে দাঁড়িয়েছে। ধরণীর দিকে চেয়ে থাকে। অশোকের আগেকার সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে, ধরণী মুখুয্যেই অতীতে একদিন নিতেকে মেরেছিল খামারে, এক আঁটি ধানও দেয়নি, মেরে বের করে দিয়েছিল—অস্বীকার করেছিল তার পরিশ্রমের মূল্য।

সেই ধরণী মুখুয্যে আজ অনুনয় করে।

—কোথায় যাবো বাবা। হ্যাঁরে নিতে—এতকাল তোরাই তো সব করেছিস। এবার না দেখলে কে দেখবে। কথাটা যেন আর্তনাদের মত শোনায়।

—একটু ভেবে দেখি। সময়ও আর নেই, হাতে অনেক জমি রয়েছে।

—আমাদেরও কথা ভাবো অশোক। সব গেছে—যাদের বিশ্বাস করতে গিয়েছি—সেইখানেই ঠকেছি।

হাসে অশোক—এখানেও ঠকবেন না এই বা বিশ্বাস কি?

অবনী রায় আজ যেন খানিকটা বুঝেছে। বলে ওঠে—সবাইকে নিয়ে যারা কাষ করে চলেছে এত বড় কাষ, আরও সবাই যাদের বিশ্বাস করে—সেখানে আমাকেও বিশ্বাস করতে হবে অশোক, আমিও যে তাদের একজন।

অশোক একটু আশ্চর্য হয় ওর কথায়। ঠকে ঠকেই বুঝেছে ওরা।

—বৈকালেই যাবো ওখানে। যা হয় করো। চলে গেল ওরা।

বৃষ্টির মেঘ ঢাকা থমথমে আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক—দূরে শাল বনের মাথায় নেমেছে বৃষ্টির সাদা ছায়া; গান গাইছে মাঠের কোন চাষী।

সবুজ আর হলুদএ মেশামিশি। অশোক কি যেন দুস্তর সাধনার শপথ নিয়েছে—কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার শপথ। ওরা সবাই সুখী হবে—জীবনকে শত দুঃখ কষ্ট আর প্রলোভনের মাঝে সহনীয় করে তুলতে।

দূরে ভেসে আসে কারখানার ভোঁএর শব্দ। দুর্গাপুর কারখানার কাঠিন্যের পাশে তারা নোতুন জীবন গড়ার শপথ নিয়েছে। কঠিন এ পথ।

সবুজের মাঝে—এদের খুশীর মাঝে মাথা তুলে রয়েছে পান্নুদাশের নোতুন বাড়ীটা—সাদা ঝকঝকে চুণকাম করা বাড়ী। তারক রায়এর জায়গায় ওই যেন বহাল হয়েছে, উদ্ধত শাসন আর শোষণের প্রতীক হিসাবে।

…ওর দলেও গেছে অনেকে; গেছে ভুবন—কদমবৌ। আশ্রয় পেয়েছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, গোকুলের মত সমাজের পাপ অনেকে। বঞ্চনা করেছে জীবনরস্তকেও। বাড়ী ছাড়া উৎখাত করে মজুর হতে বাধ্য করিয়েছে।

…মাথায় তুলেছে সতীশ ভটচাযের মত ধর্মের বেসাতি করা ধূর্ত সম্প্রদায়কে; ওদের লোভের মূলে উৎসাহ দান

করেছে। গ্রহ নক্ষত্রের নজীর দিয়ে উৎসাহিত করেছে ফাটকাবাজীর খেলায়।

...বাড়ী উঠেছে সতীশ ভটচাযের। দোতলা বাড়ী। ...এখন পানুদাশ আর দুর্গাপুরের মহাজনরা তার মুখাপেক্ষী।...পোষাক আশাকও বদলেছে।

—গ্রামপ্রান্তে সেই নিরাশ্রয় গ্রামদেবতা ভৈরবনাথ তেমনিই অনাদৃত পড়ে আছে। সতীশ ভটচায ওখানে রস শাঁসের সঞ্চয় নেই দেখেই দেবতাকে আকাশের নীচে পরিত্যাগ করেই নিজের পথ দেখেছে।

তেমনি তেতুলতলাতেই পড়ে আছেন অনাদৃত শিলাভূত দেবতা। সতীশ ভটচায জানে মনে মনে—ওটা নেহাৎ পাথরই। আর কিছু নয়।

শিখাকে দেখে দাঁড়াল অশোক। বৈকালের ছুটির পর একটু বের হয়েছে বেড়াতে; ডাঙ্গার পরেই মাঠের সীমানা। মেঘ ভাঙ্গা গাঢ় হলুদ রোদ গাছগাছালির মাথা রাঙ্গিয়ে তুলেছে। পাখীডাকা বৈকাল।

—তুমি? এই জলকাদায়।

শিখা এগিয়ে আসে। অশোকের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—দেখতে এলাম। সত্যি আমিই অবাক হই মাঝে মাঝে।

—কেন?

—ক বছরেই কত পরিবর্তন ঘটেছে।

হাসে অশোক—শুধু কি বাইরেই। এর ভিতর বাইরে বদলানো সুরু হয়েছে শিখা।

সন্ধ্যার আলো নামছে।

সুন্দর পৃথিবী, সবুজ শ্যাম শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। পাখী ডাকছে, দিনশেষের পরিক্রমা সারা কুলায় ফেরা পাখীর দল এল বিশ্রাম আর নিবিড়শান্তির নীড়ে।

...ভাবছি কিছুদিন বাইরে যাই—শিখা বলে ওঠে।

—কেন? কি একটা বেদনা অনুভব করে অশোক।

এতকাল ও মিশিয়ে ছিল এ মাটির সঙ্গে—ওর অভাবটা জানতে পারেনি। অবচেতন মনে পেয়েছে একটা ভরসা—জোর। এগিয়ে গেছে তার কাছে।

বলে ওঠে—যেও না শিখা। ওর কণ্ঠস্বরে, কি এক দুর্বার আকর্ষণে একটা প্রজাপতি উড়ে চলেছে ফুলের

কথায় কথায় প্রান্তরের শেষে ঝুপিরনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে তারা চড়াইএর মাথায়। যতদূরে চোখ যায় ঢেউ খেলানো সবুজ আর সবুজ, ওদিকে নোতুন ইস্কুল হাসপাতাল গ্রামসীমা।

...দূরে সন্ধ্যা নামছে, জেগে উঠছে ব্লাষ্টফার্নেসের আলোর ঝলক।

...শিখা চমকে ওঠে—কাঁপছে।

—তুমি যাবে না শিখা, অনেক দিন অনেক পথ ঘুরে দেখলাম, আমিও বাঁচতে চাই। তাই বোধ হয় চারিপাশ—আমার পরিবেশ আগামী মানুষের পরিবেশকে সুন্দরতর করে তোলবার চেষ্টা করেছি।

শিখার সারা শরীরে কি এক বিচিত্র অনুভূতি।

চুপ করে থাকে সে। এ ভাগ্য তার কাছে কল্পনা।

বলে ওঠে অশোক—তুমি কি রাজী নও। অনেকেই হতে চায় না। টাকা—প্রভূত টাকা নেই, শুধু বেঁচে থাকা। তেমনি একটি মানুষকে কেউ স্বীকৃতি দিতে চায় না শিখা।

প্রীতির কথা মনে পড়ে। সেও ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। শিখাও তাদের জাত। আর্তনাদ করে ওঠে শিখা।

—না-না। ও কথা বলো না। কিন্তু আমার পরিচয়, আগেকার ইতিহাস—

—এ যুগের পথে অনেক বাধা, পাপ দুঃখ ছড়ানো। তাকে এড়িয়ে নয়, স্বীকার করেই পথ চলতে হবে শিখা।

শিখা কথা বলে না, দুচোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রু। কাঁদছে সে।

....ওকে আজ কাছে টেনে নেয় অশোক। সংযত কণ্ঠে বলে ওঠে শিখা।

—চল, ফেরা যাক।

—হ্যাঁ।

ব্যাপারটা একজনের দৃষ্টি এড়ায় নি। সে প্রীতি। ক'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। প্রশান্ত এখন বড় ব্যবসায়ী; পানুদাসের বন্ধু।

বাবার ওখানে নয়—পানুদাসের নোতুন কেনা ওই

বাইরে চলে গেছে। অবশ্য প্রীতির তাতে কিছু আসে যায় না।

তার পথেই চলেছে সে।…ব্যাকুল হয়ে জীবনের সব ঐশ্বর্য লুটে নেবার সন্ধানে চলেছিল—ব্যর্থ হয়েছে। হয়েছে তাই ব্যাকুল। মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে।

…আজ বৈকালের ওই দৃশ্যটা দেখে মনে হয়—জীবনে এই প্রীতি—ভালবাসার স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত। অশোককে আজ স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না। গ্রামে এসে অবাক হয়ে গেছে—এ কোন নোতুন করে গড়া গ্রাম।

…গড়ে উঠছে নোতুন ভবিষ্যৎ। মনে মনে তাই ওই অপরিচিতা শিখাকে হিংসা করে।… সরে গেল বনের অন্য দিকে।

…অশোক ফিরছে, তারকবাবুর প্রাসাদের নাম হয়েছে দাস-ভবন। বাগানের ধারে এসে থমকে দাঁড়াল। প্রীতিও দাঁড়িয়েছে ওকে দেখে।

—চলে যাবে অশোক; সেই রাত্রের নোংরা দৃশ্যটা চোখের উপর ভেসে ওঠে—আজ প্রীতি হারিয়ে গেছে। তাকে আর স্মরণেও আনতে চায় না।

প্রীতি হাসছে।—বাঃ বেশতো চাষার মত চেহারাখানা করেছ।

—দুধ ঘি খেয়ে মটর হাঁকাতে পারলাম কই। তাই রোদ জল সয়ে মাঠে মাঠেই ঘুরছি। দেখলাম—এ-ও বেশ আনন্দের।

চুপ করে গেছে প্রীতি—চোখ মুখে ফুটে ওঠে অসহায় একটা ভাব।

বলে—তাই ছিল ভালো অশোক, আগেকার সেই দিনগুলো। মনে হয় শুধু এখন দৌড়ুচ্ছি আর দৌড়চ্ছি। আশপাশের কাউকে দেখলাম না, চিনে আপন করে নিতেও পারলাম না। একদিন পথের ধারেই ব্যর্থ শূন্য হয়ে পড়ে যাবো মুখ থুবড়ে। এই দৌড়বাজীর পথে কেউ কারোও জন্য দাঁড়ায় না—দুঃখ বোধ করেনা—ভালবাসে না।

অশোক ওর কথায় একটু অবাক হয়। রাত অন্ধকারে প্রীতি যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। অসহায় এ যুগের ব্যর্থ একটি কান্না।

বলে ওঠে—কই বললেনা—বাবার ওখানে যাওনি কেন? গিয়েছিলাম—কিন্তু বাবা বললেন—আমি নাকি স্বামীকে পরিত্যাগ করেছি, তাঁর ঘরেও আমার ঠাঁই হবে না।

—তাই নাকি! চমকে ওঠে অশোক।

হাসছে প্রীতি—কে কাকে ত্যাগ করেছে—কে জানে? তার শুনেছি এ রকম বান্ধবী আরও অনেক আছে। তার জবাব বাবাকে দিই নি। দিয়ে লাভ নেই—ভাবছি ফিরেই যাবো কলকাতার বাড়ীতে।

বলে ওঠে অশোক—তাই যাও। এখানে না থাকাই ভালো।

প্রীতি বলে ওঠে—হয়তো তাই। দেখতে এসেছিলাম এখানে কোথাও এতটুকু আমার চিহ্ন আছে কিনা। দেখলাম—কোথাও নেই কিছুই।

একটু থেমে প্রশ্ন করে প্রীতি—একদিন তুমি আমাকে ভালবাসতে—

—ওকথার আজ দামকি! থামিয়ে দিতে চায় অশোক।

—না, সব দোষ আমার। তোমাকে—কাউকে—নিজেকেই ভালবাসতে পারিনি অশোক। মনের সেই দৈন্যের জন্যই আজ দেউলিয়া হয়ে গেছি। সব আমার হারিয়ে গেল।

কথার জবাব দিলনা অশোক। মনে হয় আবছা অন্ধকারে প্রীতির ডাগর দুটো চোখ ছলছলে হয়ে ওঠে।

ওরা ওই ছুটে বেড়ানোর দলের অনেকেরই যেন এ গোপন মনের কথা। সেই দৈন্য ভুলতেই তারা নিজেকে ভুলতে চায়, গা ভাসিয়ে দেয় উচ্ছৃঙ্খলতা আর বিলাসের দুর্বার স্রোতে।

সরে গেল অশোক। সারা মন কি একটা দুঃখে বিধুর হয়ে ওঠে, দেখেছে এত বাহিক আনন্দের অন্তরে অপরিসীম বেদনা, বুকজোড়া হতাশা আর কান্না।

…বাড়ী ফিরে থমকে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার মেঘমেদুর আকাশে বেজে উঠেছে একটা সুর, তৃপ্তি আর আনন্দের সুর। শূন্যতার মাঝে ওর স্পর্শ সব দুঃখকে সহনীয় বরণীয় করে তুলেছে।

অবিনাশ-এর সানাই বাজছে। এ মাটির অন্তরের

অফুরান রূপ রস বর্ণ সম্ভার—বনসীমার সবুজ সানন্দসাড়া এমাহুষের অন্তরের চিরআনন্দলোককে স্পর্শ করেছে।

…আবছা আলোয় দেখে রেডিওটা খোলা—দূর দিল্লী কেন্দ্র থেকে বাজাচ্ছে অবিনাশ, অবিনাশ বায়েন। পাতা-জোড়ার একটি মাহুষ আজ সীমা থেকে অসীমের দিকে ঘোষণা করেছে এমাটির নাবলা সুর অধরা শ্যামস্পর্শ।

—ছোট্‌বাবু!

…চেয়ে দেখে অশোক—স্বৈরিণী মিষ্টির দুচোখের জল। মুখে তার খুশির আভা।

—মিত্তে ফিরে এলে তুমি একটা মেডেল দিও উকে। হাসে অশোক, কালীচরণ আরও অনেকে।

অবিনাশকে আজ বাইরের জগৎ স্বীকৃতি দিয়েছে—অবিনাশের মাধ্যমে তারা স্বীকৃতি দিয়েছে এ মাটির মানুষের অন্তরকে—তার রূপ মাধুর্যকে।

মিষ্টির দিকে চেয়ে থাকে অশোক—ও বাঁচবার সঞ্জীবনী মন্ত্র পেয়েছে। অফুরান ভালবাসার স্বাদেস্পর্শে ও বেঁচে থাকবে, যার এতটুকু স্পর্শের জন্য কাঁদে রূপবতী ঐশ্বর্য্যবতী প্রীতি। কেঁদে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল কদম বৌ।

যার সন্ধান করেছে অশোক আর শিখা তাদের দুজনকে কেন্দ্র করে নিভৃত নিরালা কোন বনের সবুজে।

এ যুগের সব গ্লানি বেদনার গরল জ্বালা সইবার ওই যেন একমাত্র অবলম্বন।

সুরটা দুঃসহ কোন বেদনার সুরে বর্ণময় হয়ে ওঠে, বনতলে প্রজাপতি রঙ্গীণ ডানা মেলে ফিরছে ব্যাকুল বেদনায় ফুলের সন্ধানে। আকাশের তারার রোশনীতে মৃত্তিকার জন্য সেই চিরন্তন ব্যাকুলতা।

…অবিনাশ ওদের নাবলা কথা প্রকাশ করেছে সুরের স্পর্শে।

…বেঁচে আছে বৃদ্ধ অতুল কামার। চোখ দুটোতে ছানি পড়ছে। আবছা হয়ে আসে দৃষ্টি। মেজ ছেলে কার্তিকের ছোট বেটাকে নিয়ে পথে বের হয় মাঝে মাঝে।

হু হু বুক কাঁপে—মন কাঁদে।

ভুবন চলে গেছে দুর্গাপুর কারখানায়; কদমবৌ হারিয়ে গেছে কবে।

তবু বেঁচে আছে।

বর্ষার শেষ। ঢালু জমিতে সবুজের ইসারা। বনের দিকে চলেছে—চারিদিকে মাঠ, উষর প্রান্তরে আজ সবুজের স্পর্শ। রোদলেগে মেঘ ভাসা আকাশ রঙ্গীণ হয়ে উঠে—ওপাশে আবার কালো পুঞ্জমেঘ।

…নাতিটা বলে চলেছে।

—বুঝলা দাদু, সব সবুজ, লকলক করছে ধান আর ধান। দূরে ওই বনপর্য্যন্ত।

আঁধার দুটো চোখে কি যেন দেখবার চেষ্টা করে অতুল। ব্যাকুল হয়ে ওঠে—পারেনা। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার। আগামী দিনের ওই নাতির চোখেই দেখছে সে পৃথিবীকে।

—তারপর।

—উই একঝাঁক বক উড়ে আসছে দাদু, কারখানার দিক থেকে। চলেছে মাঠের উপর দিয়ে। শুনছ—

—হ্যাঁ!

বাতাসে ওই বলাকার পাখার শন শন বিধুনন। উষর মরুতীর হতে সুধাশ্যামল ধান ছায়া খেত বনতলের দিকে চলেছে তারা কালো মেঘের কোলে।

—মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে বুড়োর!…মনে উধাও ডানার ওই সুর।

সবুজ এর স্বপ্ন।

কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইল বুড়ো।

—ছোট বাবু!

—হ্যাঁ।

—ভাবছি চোখ দুটোর ছানি কাটিয়ে আসবো। না'লে নোতুন করে দেখতে পাচ্ছিনা কিছু। ভেবেছিলাম—সবই গেল যখন তখন আর বেঁচে লাভ কি! দেখলাম—বাঁচার আনন্দ ফুরোয় না ছোটবাবু। তাইতো বাঁচতে চাই—দেখতে চাই আবার নোতুন পৃথিবীটাকে।

ছোট্ট ছেলেটা চীৎকার করে ওঠে—উই দাদু! আর এক ঝাঁক—

…সবুজ ধানখেত—যতদূর চোখ যায় সবুজ আর আগামী দিনের ফসলের সম্ভাবনায় তৃপ্ত ধরিত্রী। মেঘঢাকা আকাশবলাকা চলেছে।

পিছনে ভেসে আসে কারখানার ভোঁএর শব্দ—দূর পথ আসতে আসতে ওটা যেন বাতাসের স্তরে স্তরে হারিয়ে যায়।

ঘণ্টা বাজছে—ইস্কুলের ঘণ্টা। মৃদু গম্ভীর স্বরে কোন উদার আহ্বানের মত শব্দটা বৈকালের নির্জনখেত—বন-ভূমি চড়াই এর বুক ভরে তোলে।

অতুলের পাকা চুল উড়ছে—উড়ছে ওর জীর্ণ উত্তরী। পাশে দাঁড়িয়ে খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে ছোট্ট ছেলেটা উড়ন্ত বলাকার শ্রেণীর দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে।

—আয়, আয়—আয়।

ওরা উড়ে গেল—দূরে—অনেক দূরে।

বুড়োর বুজে আসা চোখে জল নামে—কদমবৌকে মনে পড়ে। এদিনে সে রইলনা।

সমাপ্ত

কুমারসম্ভবের চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত কিরাতপর্ব্ব। মহাবীর অর্জ্জুন গিয়েছিলেন অস্ত্রের সন্ধানে হিমালয়ে। তিনি তপস্বী, বীর, মুনি, ঋষিদের নিকট শুনেছিলেন—বহু শক্তিধর দেবতা বাস করেন হিমালয়ে। ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, শূলপাণি শঙ্কর প্রভৃতি। এদের সন্তুষ্টি সাধন করতে পারলে অমোঘ-শক্তি অস্ত্র লাভ করা যাবে। জ্ঞাতিশত্রু কৌরবগণের সঙ্গে সংগ্রাম অনিবার্য্য। অস্ত্রগুরু দ্রোণ এখন কৌরব পক্ষে।

ফাল্গুনি আর কালক্ষেপ করলেন না। হিমাদ্রির উত্তর মধ্য পথ দিয়ে ক্রমশঃ পূর্ব্ব উপত্যকায় এলেন। মহাভারতকার বল্লেন, সেটি কিরাত দেশ। বড় গভীর অরণ্যে ভরা। দিবারাত্রির তারতম্য করা কঠিন। নদী প্রস্রবণ যত, আরণ্য প্রাণীও তত। ভয়াল সর্প, ভীষণ শূকর, ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা সরীসৃপ, সূচ্যগ্র শৃঙ্গ হরিণ, উগ্রচণ্ড মহিষ, বেগবান্ গম্ভীরহুঙ্কার বলীবর্দ্দ —সবারই স্থান কিরাত ভূমিতে। আবার কুসুমিত লতা, স্নিগ্ধ কোমল কৃষ্ণসার, বনরুহচারী ময়ূর ময়ূরী, মধুর কান্তস্বর কোকিল, কিরাত ভূমিতে যুগে যুগে সুখে থাকে। অর্জ্জুন এখানে এলেন শূলপাণির সাক্ষাৎ লাভের আশায়। কতদিন কেটে গেল সেখানে। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর আকৃতি বণিতাসহায় কিরাতদের দেখা মেলে। প্রাণে সাড়া পান না—এরাই শূলপাণির আত্মীয় কিনা। শুধু মেলে, প্রত্যেকের হাতেই শূল (বর্শা)। প্রায় নগ্ন দেহ, পিঙ্গল উর্দ্ধ কেশজাল, নির্লোম তাম্রাভ মুখ। কণ্ঠে অস্থিনাল মালা, বাহুগ্রন্থিতে সন্তমারিত সম্বর হরিণের চর্ম্ম। মণিবন্ধে অস্থিনাল মালিকা। আর মুখে কি এক অব্যক্ত দুরুচার্য্য সঙ্কেতের ভাষা। এমনি-ভাবেই মহাভারত বর্ণনা করে চলেছেন কিরাত দেশের, আর কিরাতি পরিবেশের কথা নিয়ে।

তা নিয়ে ভারত পুরাণের অধ্যায় ও সর্গগুলি এ যুগের পাঠকশ্রোতাদের মন আকর্ষণ করে মাত্র, মস্তিষ্কে নূতন ক'রে কোন কিছু জানার সঞ্চারণা আনেনা।

কিন্তু আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর মহাকবি কালিদাস তাঁর বিখ্যাত "কুমার সম্ভব" কাব্যে ঐ কিরাত দেশের একটি অদ্ভুতকর্ম্মা ও বরণীয় এবং ভারতীয়দের চিরপূজ্য দম্পতি জীবন নিয়ে অপরূপ এক কাব্য রচনা ক'রেছেন। সে কাব্য 'কুমার সম্ভব'। এই দম্পতি বাস করতেন কিরাত দেশ বা নাগদেশে। পর্ব্বতের একটি নাম নগ। নগের উপত্যকার বাসিন্দা নাগ। নগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় নগাধিরাজ, অপর নাম হিমালয়। নগ-রাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাকবি অনেক কথাই লিখেছেন, তার মধ্যে বহুস্থলে যথার্থ সত্যেরও পরিচয় দিয়েছেন—

নাগভূমির কিরাতবৃন্দ যায় সিংহ শিকার করতে, পথ তো নাই, আছে শুধু পার্ব্বত্য শিলার বন্ধুর উপত্যকা, অরণ্যের গাঢ় আঁধার আর মাঝে মাঝে গলিত তুষার, তা হোক, কিন্তু পথ পাওয়া কষ্ট হয়না, গজ মুক্তা পড়ে থাকে সেখানে, ঐ চিহ্ন ধরেই তারা এগিয়ে চলে সিংহ শিকারে, আরণ্য গজ নিহত করে কেশরী যে দিকে গিয়েছে সেই দিকেই পড়ে থাকে তাদের নখরপাতিত গজ-মুণ্ডের মুক্তাবলী। আবার ক্লান্ত হ'য়ে যখন কিরাতের দল ফিরে আসে, নগরাজের ঝরণাকণায় মেশান বায়ুতে তাদের শরীর স্নিগ্ধ হয়।

মহাকবি সে দেশের বাসিন্দাদিগকে স্থানে স্থানে কিরাত বলেই আখ্যাত করেছেন। এই কিরাতের দেশ অর্থাৎ নাগ দেশের একটি মাননীয় পরিবার নগ পরিবার। সে পরিবারে মাননীয়া রমণী মেনকা, স্বামী তাঁর নগাধিরাজ। এঁর প্রথম পুত্র মৈনাক। ইনি নাগ বংশেই বিবাহ করেছিলেন।

মহাকবি লিখলেন,—

অসূত সা নাগবধূপভোগ্যং মৈনাকং

মল্লিনাথ লিখলেন—

নাগবধূপভোগ্যং—নাগকন্যাপরিণেতারম্।

তারপর আর একটি কন্যা হয়, তার নাম উমা। ইনি নাগ-কুলবীর শূলপাণি শঙ্করের ঘরণী হয়েছিলেন।

যে মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি ছত্রে আর্য্যপ্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ছাপ বারে বারে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই মহাকবি কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম দিকটির বর্ণনায় নাগবংশের কোন কথাতেই এতটুকু বর্ণাশ্রমের উল্লেখ করেন নাই। তবে আর্য্য আচার দিয়ে ভূষিত করেছেন।

তারপর উমার শৈশব যৌবনের অপরূপ অঙ্গলাবণ্যের মনোহর বর্ণনা। কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্য্যন্ত, প্রতি অঙ্গের প্রতিটি ভূমিকা কি মাধুরীতে ভরা। কিন্তু বিমর্ষ হয় মন উমার নাসিকার জন্য, মহাকবি একটি অক্ষরও কোনছলেই নাসিকার জন্য পাত করেন নাই। নাগ দেশের নর-নারীর ঐ একটি অঙ্গেরই অনুল্লেখ রেখে দিতে হয়। যাঁরা নাগরমণীর যৌবনভরা মুখ দেখেছেন, তাঁদের কাছে স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যে ঐ একটি মাত্র অঙ্গকেই নির্লেপ সাম্য দেখেছেন। মহাকবিও তাই এড়িয়ে গিয়েছেন।

সমগ্র নাগভূমিতে আজও একটি প্রথা বিদ্যমান। নাগাদের মধ্যে বহু বংশ থাকলেও খোকি,কেসারি,থাপেগা, মেজুর, কেলুরি, পোকরি, নিসুরি, সোচরি, জোরি,জোহরি ইত্যাদি থাকলেও একটি ব্যাপারে প্রত্যেক বংশের মিল আছে। যৌবন আসার সঙ্গে সঙ্গেই রমণীরা আপন আপন প্রিয়তম নির্ব্বাচন করে নেয়। তারা প্রিয়তমকে বলে পণ্য, তাছাড়া তাতে যদি তারা বহুবল্লভাও হয় সে কোন দোষের নয়। মহাকবি কুমারসম্ভব কাব্যে এই ব্যাপারটি সাহিত্যের মধুররসে জীর্ণ করে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

নারদ একদিন নগরাজের কাছে উমাকে দেখে বলেই ফেল্‌লেন 'আপনার এ কন্যা বহুবল্লভা হবেনা, একপত্নী হবে এবং প্রেম দিয়ে হরের মন জয় করে নেবে।

সমাদিদেশৈকবধূং ভবিত্রীং
প্রেম্না শরীরার্দ্ধভাজাং হরস্য।

এ ইঙ্গিত নাগাদের দেশীয় প্রথাকে লক্ষ্য করেই। কারণ আর্য্য সংস্কারের কোন উচ্চ শ্রেণীর পরিবারের কন্যার জন্য এরূপ ভবিষ্যদ্ বাণী গৌরবের নয়, এবং বহুবল্লভা হবেনা একথা জানানও সম্মানজনক নয়।

মহাকবির আর একটি ইঙ্গিতও একান্ত সত্য। দেবী উমা যখন শিবসমীপে যাতায়াত করেন, তারই একটি দিনে, যেদিন মদনের বাণ নিক্ষিপ্ত হবে সেদিনের বর্ণনায় বলেছেন, পার্ব্বতী একখানি রাঙা কাপড় পরেছিলেন। সেটি মেখলা, নিতম্বের উপরে ছিল ফুলের মালা, সেটি বার বার শিথিল হয়ে পড়ছিলো।

নাগাদের মধ্যে আজও যাঁরা প্রাচীন রীতিনীতি পরিত্যাগ করেন নি, তাঁদের চল্‌তি আচারে কুমাররা পরবে—কাল রঙের পীচ্যুঙ্, অর্থাৎ—একহাত চওড়া কাল রঙের মোটা কাপড়, তার গায়ে থাকবে লাল রঙের সুতোয় বোনা ফুল, চওড়া পাড়।

আর যারা বিবাহিত তাদের পরণে থাকবে হাঁটু পর্য্যন্ত একখানি কাপড়, নাম তার জঙ্ গুপি। রঙটি হবে নীল। চারটি সাদা সুতোয় বোনা ফুল থাকবে। আর তার চারদিকে তারার মত লাল দাগ। এই 'জঙ্ গুপি' কাপড় সহজে কেউ পরতে পায় না। অর্থাৎ বিবাহিত ও ভদ্র শান্ত হ'য়ে সংসার জীবন যাপন করা বিশেষ মেহনতের ব্যাপার। আসঙ্গলাভ যতই হোক, তাতে ফলাফল কিছু নেই, বীরত্ব ব্যঞ্জনাই থাকে তাতে, কিন্তু বিবাহিত জীবনের অব্যবহিত পূর্ব্বভূমিকা স্বল্প ব্যয়ে হয়না, বিশেষ ধরণের উৎসব হবে, কয়েকটা বস্তীতে নিমন্ত্রণ যাবে তাদের কাছ থেকে, বর্শা, ধান, সম্বর মাংস বন্যশূকর ইত্যাদি উপঢৌকন আসবে। বনিতা-সখা সবাই হয়: কিন্তু দাম্পত্য জীবন সকলের ভাগ্যে হয় না।

আর যে সব মেয়ে কুমারী হয়েই রয়েছে, তাদের কটি থেকে জঙ্ঘার ওপর পর্য্যন্ত এক খানি লাল রঙের কুমারী কাপড় জড়ান থাকে, এরও নাম 'পীম্যুঙ্। খোঁপায় থাকে খাসেম ফুলের মালা। এ মালা কেউ কেউ নিতম্বেও ঝুলিয়ে দেয়। আর সাধারণতঃ সব নারীই তার অনাবৃত

বক্ষের ওপর কড়ির মালা, হরিণের সরু কাল শিঙের মালা পরে থাকে। মহাকবির উক্তি—

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগং। (কুমার)

তারপরেই—

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা
পুনঃপুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্।

এই প্রসঙ্গে মহাকবির আর একটি উক্তিও লক্ষণীয়। এই প্রবন্ধের প্রথমের দিকে সে কথার উল্লেখ করেছি। সেটি নাগকন্যাদের বহুবল্লভা হওয়া এবং নাগকুমারও বহুবল্লভ হলে তা দোষের নয়। উমা যখন শঙ্করের চরণে প্রণিপাত করলেন তখন তিনি তাঁকে আশিস বাণীতে বল্লেন,

'অনন্যভজং পতিমাপ্নুহীতি"

তুমি সেই পতি লাভকর যিনি আর কোন রমণীতে আসক্ত নন। মহাকবির লেখনীর চাতুরীতে নাগা দেশের সহজ আচারটি আর্য্য আচারের ছাঁচে নূতন রূপ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরও বল্‌তে হয়। মহাকবি উমার মাতৃপিতৃ পরিচয় দিতে পেরেছেন, এমনকি উমার ভ্রাতৃ-পরিচয়ও দিয়েছেন। টীকাকার সেখানে বলেছেন, যে মেয়ের ভাই না থাকে তাকে বিবাহ করা সমীচীন নয়, কিন্তু শঙ্করের বেলায় সে কথার উল্লেখ নাই। নাগ দেশের নিয়ম এই যে, যে মেয়েটিকে গৃহিণী করা হয় কিংবা সঙ্গিনী করা হয় তার মাতৃপিতৃ পরিচয় এমন কি বংশের পরিচয়ও জানতে হয়—বংশ বল্‌তে—খোকী, কেসারি, খাপেগা, মেজুর, বেলুরি, পোখরি, নিস্থরি, সোচরি, জোরি ইত্যাদি বংশ।

পুরুষের বেলায় তার বীরত্ব ও গোষ্ঠীমর্য্যাদাই বড়। মাতৃপিতৃ পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নাই। এ ক্ষেত্রে হয়তো অনেকে বল্‌বেন, শঙ্কর ভগবান—তাঁর মাতৃপিতৃ পরিচয়ের সম্ভাবনা কোথায়?

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, প্রভৃতি আরও অনেক ভগবৎ স্বরূপ আছেন যাঁদের মাতৃপিতৃ পরিচয় জানা তো তাঁদের পূজা উপাসনার আর একটি অঙ্গ। কিন্তু শঙ্কর কি আরও অন্য কিছু? পরবর্ত্তী যুগে শঙ্করকে রুদ্রাবতার ব'লা হ'য়েছে। এই অবতারবাদ পুরাণের একটি নিজস্ব ধারা প্রবর্ত্তন। এ প্রবন্ধে তা অনালোচ্য।

মহাকবির কাব্যে নাগদেশের এবং নাগবংশীয়দের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত ক'রেছেন,' যা আজকের দিনেও নাগা পাহাড়ে এবং নাগাদের মধ্যে হুবহু মিল।

যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্ নান্তকঃ কুসুমায়ুধঃ
রতিখেদ সমুৎপন্না নিদ্রা সংজ্ঞা বিপর্য্যয়:

অর্থাৎ নাগা পাহাড়ের অধিবাসীদের যৌবন থাকে অটুট, আর রমণীঘটিত ব্যাপার ছাড়া শত্রুতা হয় না, আর ঐ সম্পর্ক ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে নিদ্রারও অবসর হয় না।

সর্ব্বদা সতর্ক থাকৃতে হয়, সর্ব্বদা অরণ্যে ভ্রমণ করতে হয়, নইলে তাদের জীবিকা হয় না, চাষ বাণিজ্য বলে তো কিছু নাই।

আর একটি চিত্র—

ভ্রূভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠৈঃ লক্ষিতাঙ্গুলিতর্জ্জনৈঃ
যত্র কোপৈঃ কৃতাঃ স্ত্রীণাং আপ্রসাদার্থিনঃ প্রিয়াঃ।

ওখানের যুবকসম্প্রদায় রমণীলোভে আকুল হৃদয়, নাগা যুবতীদের তর্জ্জন গর্জ্জন, ওষ্ঠাধরের দংশন ভীতিতেই কবলিত মন, যুবতীদের প্রসন্নতা সাধন ছাড়া অন্য সাধনার নামও নাই সেখানে। এই বিংশ শতাব্দীতেও তা একান্ত সত্য।

গৌরীর তপস্যা বর্ণনার ভিতর দিয়ে তখনকার এবং এখনকার নাগাদের একটি চিরাচরিত আচারকেই মহাকবি অপরূপ রূপ দিয়েছেন, যদিও তা পুরাণে আছে। সেটি হ'চ্ছে স্বয়ম্বর।

নাগা রমণীর বিবাহ হয় পরে, নির্জ্জনে এসে স্বয়ম্বরা হয় পূর্ব্বে। এটি আজও ঘটে। মহাকবির আর্য্য আচার বর্ণনায় সেটি তপস্যার রূপ নিয়েছে। বিবাহের অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে—সেই কন্যাকে বিবাহ করা চল্‌বে কি না—কেউ এসে মেরাঙে মোড়লদের ব'ল্লে সে কথার যাচাই হয়, তারপর তারাই গিয়ে ঘটকালি করে এবং তীর ধনু বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র পাঠান হয়। আর সম্বর হরিণের মাংসও বিনিময় হয়। বিবাহের সময় কন্যা অন্য অলংকার পরে না, তার হাতে বর্শা, ছোরা, তীর, ধনু দেওয়া হয়, এবং খুব ধারাল খড়্গে মুখ দেখান হয়। আয়নায় নয়। এ রীতি বর পক্ষেও।

এ-কথাগুলি শুধু আজকের সত্য নয়। মহাকবিরও দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি গৌরীর বিবাহে তাঁর হাতে বাণ দেখেছেন। এ ছাড়া বিংশ শতাব্দীর নাগাকন্যারা যেমন

বিবাহের পূর্ব্বে সাদা সরষে এবং কচি দূর্ব্বার ছোট লতা ধারণ করে এবং নাভির উপরে একখণ্ড রেশমী কাপড় বাঁধে, গৌরীর বিবাহেও তাই।

সা গৌর সিদ্ধার্থ-নিবেশবদ্ভি-
দূর্ব্বাপ্রবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্।
নির্ণাভি কৌশেয় মুপাত্ত বাণং
মভ্যঙ্গ নেপথ্য মলংচকার॥

কুমারসম্ভব ৭ম।৭ শ্লোক

নাগ জাতির জাতীয়তা এখনও এই রকম যে কোন বিবাহ উৎসবে কিংবা নিজেরই বিবাহে তারা নরকপাল (মাথার খুলি) মাথায় পরে, এবং মেরাঙ্‌ থেকে আনা ধূনীর ছাই গায়ে মাখতে হয়। শূলপাণির বিবাহের চিত্রে মহাকবি লিখছেন—

বভূব ভস্মৈব সিতাঙ্গরাগঃ
কপালমেবামলশেখর শ্রীঃ।

কুমার ৭ম।৩২।

নাগারা বীরের জাত, নরকপাল, নরমুণ্ড তাদের গৃহসজ্জার অঙ্গ, ভয়ঙ্কর ময়াল, এবং বিষধর পাহাড়িয়া সাপও তাদের গৃহশোভা এবং অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করে। বিবাহ-কালীন শঙ্কর—

"যথা প্রদেশং ভুজগেশ্বরাণাং
করিষ্যতা মাভরণান্তরত্বম।

কুমার ৭।৩৪

নাগরাজের গৃহের উদ্দেশে বহির্গত হবার সময়—

"আত্মানমাসন্ন গণোপনীতে
খড়্গে নিষক্ত প্রতিমং দদর্শ

কুমার ৭।২

তীক্ষ্ণধার ও উজ্জ্বল খড়্গে মুখদর্শন করলেন।

নাগকুলবীর ভগবান শঙ্করকে মহাকবির ভাষায় যেভাবেই চিত্রিত করা হোক না কেন তাতে তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি পূর্ণ মর্য্যাদা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং নাগা জাতির পরিবেশ পরিজনেরও একটি নিছক চিত্রও কুমার-সম্ভব কাব্যে প্রদর্শন করা হ'য়েছে। বহু পুরাতন ভারতের একটি চিন্তাধারা ছিল—বিশেষ শক্তিশালী পুরুষকে ঈশ্বর ব'লে স্বীকার করা। তাঁর আধ্যাত্মিক ও শারীরিক হোতো, পূর্ব্বেই যে তা মানা হোতো তা নয় আধুনিক বা পরিবর্ত্তিত ভারতবাসীর জীবনধারাতেও সেই রেশ চলে আসছে। কালে কালে তা সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হলে তার সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রের ধারাও প্রবর্ত্তিত হোতো এবং বৈদিক সাহিত্যের নামধারার সঙ্গে অভিন্ন করে অবতার-বাদও প্রতিষ্ঠা করা হয়। তা যাক্ সে কথা। প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও নাগা জাতির পরিবেশ পরিজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এ প্রবন্ধটি সমাপ্তির দিকে আনি—

নাগলোকের ভূপ্রকৃতি

হিমালয়ের অন্যতম উপত্যকাকেই নাগা দেশ বলা হয়। এখানের ভূপ্রকৃতির বাহ্য রূপ বড় বন্ধুর ও আরণ্যক। ভারতের অন্য যে কোন প্রদেশের কৃষিজাত কিংবা গৃহলালিত ফল ফুলের চাষ আবাদ নাগাভূমিতে হয়না বল্লেই হয়, অথবা সে রকম চেষ্টাও যে লক্ষণীয় হয়েছে তা দেখা যায় না (স্বাধীন ভারতের আগে অবশ্য)। ভূমি খনন করে জল তোলা, কিংবা পুষ্করিণী করা কিংবা বাঁধ দিয়ে জলাধার করার কোন প্রয়াসই নাই সেখানে। প্রকৃতির স্বাভাবিক ঝরণাগুলিই সেখানের জীবন রক্ষয়িত্রী। নাগাভূমির আরণ্যক বৃক্ষ লতাগুলি ভারতের বৃক্ষ লতার পিতামহ পিতামহী এমনি তাদের আকৃতি। বৃক্ষলতার যে সব ফল ফুল হয় তাদের স্বাদ গন্ধও ভারতের ফল ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যায়না, অথচ ভারী মনোরম। তবে নামগুলি আমাদের মস্তিষ্কে আলোড়ন আনে। ভেরপাং, জীমূবো, আখুসী, খাপ্রুফু, খুঙ, গুঙ, এবং গুক্ আর লতাগুলির মধ্যে সাঙলিয়া, খেজাঙ, খাতাংবি, খাসেম, মেশিহেঙ, সাপেথ, খুগু ইত্যাদি।

ওখানে প্রসিদ্ধ নদীটির নাম 'টিমু্'। এই নদীর বহু ধারা আর ঝরণা বয়ে নাগলোকের জীবনকে সরস করে রাখে।

পথ ঘাট

সমস্ত দেশটাই লাল্‌চে তামাটে রঙের নুড়িতে ভরা পাহাড় ভাঙ্গা সরু সরু পথে আবদ্ধ, তাও সমানভাবে কোন একটা পথ আর একটার সঙ্গে মিশে যায়নি, একটা ঝরণায় গিয়ে শেষ হ'য়ে যায়। এসব পথ কিন্তু কারও তৈরী নয়,

তবে একমাত্র কোহিমা শহরটি সমতল, এখানে কতকগুলি বাঙ্গালী, আসামী, মাড়োয়ারী, গুজরাটি, ভুটিয়া এসে বাস করে এবং কিছু লোক নাগাদের দেশীয় জিনিষ কিনে বাণিজ্য করে।

বাণিজ্য দ্রব্য

নাগাদের আনা জিনিষ মানে পাহাড়ী শুক্‌না মরিচ, আনারস, পাহাড়ী আপেল, বাঘের চামড়া, হরিণের শিঙ্‌, কস্তুরী, ওক কাঠ আর পাইন কাঠ এবং পাহাড়ী কমলালেবু।

খাদ্য

নাগাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যদিও ভাত মাংস, কিন্তু সমতল ভূমির অর্থ না এলে এদের চাল সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, তাই এদের অধিকাংশ দিন বন্য মহিষের মাংস, বন্য শূকর মাংস, চিতা বাঘের মাংস, সম্বর হরিণ ও বন্য মুরগীর মাংস দিয়েই ক্ষুধার আহার্য্য সমাপন করতে হয়। আর প্রাকৃতিক কারণেই হোক অথবা স্বভাব-অভ্যস্ত কারণেই হোক, এরা বন্য মধু পান করে প্রায় সারাক্ষণ। সেই মধু বুনো হ'লদে মাছির তীব্র ঝাঁজ, রোহি মধু। এতে শরীরও গরম থাকে এবং পিপাসা কম লাগে

বাসস্থলী

নাগাদের মধ্যে যাদের যৌবনের তেজ কিছু কম হয়ে যাচ্ছে এমন বয়সেই এরা সাধারণতঃ ঘর সংসার করে এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে থাকতে চায়। তারা তখন গোষ্ঠীবদ্ধ হ'য়ে বাস করে। পাহাড়ের উঁচু গা কেটে কিংবা পাহাড়িয়া গুহা পেলে সেখানেই বাস করে। এরাই পাহাড়িয়া পণ্য নিয়ে বাণিজ্যে বের হয়। কিন্তু কোন সময়ই এরা রমণী-সঙ্গী না হয়ে থাকে না।

যারা কুমার এবং বৃদ্ধ তারা থাকে মেরাঙে। মেরাঙের অর্থ পবিত্র আশ্রম।

আকৃতি ও স্বাস্থ্য

নাগাপাহাড়ের রঙ যেমন খাঁটি তামার মত, তেমনি নাগা জাতিরও। চোখের রঙ্‌ পিঙ্গল। পুরুষদের মাথায় রুক্ষ ও খাঁচাখোচা চুলের বোঝা, কিন্তু চাকার মত রেখা টেনে মাথার চারদিক কামান। মাসের বেশীর ভাগ দিনই এরা কামিয়ে নেয়। মুখে গোঁপ-দাড়ি খুব কম। বুকের পরিধি প্রশস্ত, দৃঢ়, মাংসল, মধ্যস্থলে কোন লোম হয়না। বাহু দু'টি যেমনি বিশাল তেমনি তেজে ভরা। কটি থেকে উর্দ্ধাঙ্গ পর্য্যন্ত, শীত ঋতু ছাড়া অন্য ঋতুতে অনাবৃত থাকে। স্ফীত নাক, স্থূল অধর ওষ্ঠ। চোখ দুটি কারও কারও ভাসা ভাসা থাক্‌লেও সাধারণতঃ ছোট। চোখের মণিতে আদিম যুগের হিংস্রতা। কান বড়, হাতের থাবা যেমন, বড় আঙ্গুলের গাঁঠ তেমনি মোটা আর বেঁটে। নখগুলি ছাঁটে কম, হয়তো ধারাল অস্ত্রের কাজ করারই সুযোগ রাখে। হাতে বর্শা নাই এমন কেউ হাত দেখেছে বলে শোনা যায় না। পিতলের চাকা হয় এদের নারী-পুরুষের কানের অলংকার। মেয়েদের একটু বৈশিষ্ট্য রাখা হয়, সেই অলংকারের পাশে লাল রেকাটি ঝোলান থাকে।

সাধারণ নাম

সেঙাই, বেঙকিলান, রেঙ্‌কাকিল, সিজিটো, খাপেগা, জামাৎসুর, পিঙলে, লিজানু, সাঞ্চাম খাবা, ওঙলে, জেভেমাঙ, ফাসাও, নজলি, নঙলে, কাজা ইত্যাদি।

মেয়েদের নাম

বেঙসানু, সারুয়ামারু, শালুনারু, পলিঙা, উমিঙা মেহেলী, নাকপেলিবা, লিজাগু লাঙ্‌টু, ইটিভেন নজিলো, মাঙ্গেমা ইত্যাদি।

এদের সংকেত

নাগারা যখনই দূর পথে শিকারে বের হয়, সঙ্গে রমণী নিয়ে বের হ'লেও কিছুটা নিরাপদ স্থানে তাকে রেখে যায়, তার কাছে অস্ত্র তো থাক্‌বেই, আর থাকে একটি সংকেত বাঁশী। পাঁচ দশ গজের পর থেকেই অরণ্যের আড়াল পড়ে যায়, কেউ কাউকে দেখতে পায় না। তখন পরস্পর সংকেত বাঁশীতেই জানতে পারে পরস্পর নিরাপদে আছে কিনা এবং কোন দিকে কত দূরে আছে। সংকেত বাঁশীটি হচ্ছে দুখানি বাঁশের ফালি বা চোঁগাড়ি। একটুকরা কাপড় হাতে রেখে সেই বাঁশফালি দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করতে পারে। সেই শব্দেই বন্য বিপদের সংকেত করা যায় এবং শত্রুপক্ষের কোন বলাৎকার ঘটছে কিনা তাও জানা যায়। সব চেয়ে অদ্ভুত সেই শব্দের দ্বারা ওরা বলে দেয়, কোন দিক থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে।

যদি কোন সময় মেয়েরা অপর পক্ষে স্বেচ্ছায় বা

অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে তবে তখনি নিকটের ঝরণার ধারে গিয়ে বসে, আখণ্ড পাতা বিছিয়ে দেয় তাই হয় আত্মসমর্পণ। এই সময় আর কোন অত্যাচার করা নাগাদের মধ্যে জঘন্য অপরাধ। কিন্তু সেই রমণী তার হাতের মেরিকিৎসু (ছোরা), থেনিসী (হাতবর্শা) কিছুতেই হাত ছাড়া করবে না।

মেরাঙ্

নাগাজাতির কোন উপাস্য দেবদেবীর মঠ মন্দির নাই, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতির পবিত্র নির্দ্দেশ তারা পালন করে মেরাঙ্ থেকে। যে গ্রাম বড় সেখানে থাকে কয়েকটা মেরাঙ্। মেরাঙ্ না থাকলে গ্রামের মর্য্যাদা থাকেনা! মেরাঙ্ মানে আশ্রম। চারিত্রিক সৌন্দর্য্য তার ভিত্তি। মেরাঙে থাকে কয়েকজন হারান যৌবনের মানুষ। এরা মোড়ল। এরা গ্রামের কাজের উপদেশ দেয়, বিবাহের পূর্ব্বে এদের কাছ থেকে রমণীর পরিচয়, বংশমর্যাদা যাচাই হয়। অর্থাৎ কোন বাড়ীর মেয়ে এটি। যে বাড়ীতে বীর, পরপক্ষ বিজয়ী, ভয়ঙ্কর মানুষের মুণ্ডশিকারী জন্মেছে, তারই মর্য্যাদা বেশী। মেরাঙে কিন্তু মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ।

মেরাঙ তৈরী হয় পাহাড়ী বাঁশ দিয়ে। দরজাও বাঁশের। ছাউনী হয় পাহাড়ী লতা পাতায়। যেগুলিতে বন্য ধানের খড়ের ছাউনি থাকে, তার মর্য্যাদা বেশী। মেরাঙের দরজা থাকে জানালা থাকে, না। দরজার দু' পাশে বড় দুটো বর্শা থাকবেই। বর্শার মাথায় গাঁথা থাকবে বন্য মহিষের মাথা। ঘরের ভিতরে দেওয়ালে আঁকা থাকে বীভৎস জন্তুর আকৃতি। বন্য মহিষের রক্তে আঁকা। এ খুব মাঙ্গলিক চিহ্ন। ঘরগুলি ৩০ হাতেরও উঁচু হয়। দেওয়ালও বাঁশের। তাতে ঝোলান থাকে বাঘের মাথা, সম্বরের লেজ, মানুষের কঙ্কাল। কোনো কোনো মেরাঙে মানুষের মাথাও থাকে।

মেরাঙের পরিবেশ

মেরাঙকে ঘিরে—নাগারা কুটির বাঁধে। ওই তাদের গ্রাম। মাঝে মাঝে সরু সরু পাহাড়ী পথ। পথের দু-পাশে বাঁশের মাচা। এই মাচায় তারা শোয়, যারা অবিবাহিত, আর যারা ভোরে শিকার করতে বের হবে। যারা বিবাহিত তারা মাত্র শিকারের পূর্ব্বরাত্রিই মেরাঙে কাটায়, কারণ অপবিত্র দেহ বাস নিয়ে শিকার যাত্রা ঘৃণা ও পাপের।

মাচার ওপরে নীচে রাশীকৃত বর্শা, তীর, ধনু, ঢাল, কেৎসু রাখা হয়, শত্রু যেন ভুলক্রমেও এখানে এসে না পড়ে। শীত নিবারণের দড়ির লেপ ব্যবহার করা হয়। (দড়ির লেপ কুটির শিল্প, মণিপুর কোহিমায় কিনতে পাওয়া যায়)।

কৃষি

সমতল ভূমি পেলে নাগারা চাষও করে, তবে সমবায় নীতিতেই ওদের চাষ, সে সব ক্ষেত্রে ধানের চাষ, শশা, টেরিসা ফল, বন কলা, রাহমু ফল, জোয়ার।

ঘর সংসার

নাগা মহিলাদের বয়স ৩৫।৪০ পার হলেই ঘর সংসারের জন্য শিল্পচর্চ্চা রাখে। দুপুরের আলস্য তাদের কম। পুরুষরাও যোগ দেয় সে সময়টা। বাঁশের চাঁচাড়ি, এবং তাই দিয়ে তুলোর পাঁজ, সুতো, আর সেই সব সুতোর লেপ। এগুলি নিজেরা কোহিমার বাজারে বেচে এবং বিনিময়ে সূঁচ, সুতো, নুন কেনে। বেতের ঝুড়ি, বেতের মোড়াও করে।

সময় কাটাবার উপকরণ নিয়ে কুটির শিল্প গড়বার ফাঁকে ফাঁকে ওরা শোনে ধর্ম্মের অতি-কাল্পনিক কাহিনী। কাহিনী শুনতে ওদের খুব উল্লাস। কিন্তু তাতে অবিশ্বাস-মূলক একটি কথা কইলেই বিপদ। তাই নিয়ে বিষম হত্যাকাণ্ডও ঘটে যায়। কাহিনীগুলি কিন্তু সমতলবাসী হিন্দুদের ধর্ম্মীয় চরিত্রেরই উপকথা। সমতলবাসীদের বলে আসানুরা। পাদ্রী খৃষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাগারা সমতলবাসীদের সৌহার্দ্দ আগ্রহের সঙ্গে কামনা করতো, কিন্তু পাদ্রীরা তাদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছে যে নাগাদের সমতলবাসীরা পরম শত্রু।

প্রাকৃতিক বর্ণনা আর ফসল তোলা এবং দৈব কোপ নিয়ে এরা সহজ প্রকৃতির গান গায়॥ সুর যেন ভারতের সাঁওতালী। মেয়েরাই গায় বেশী। পাদ্রীদের দয়ায় নাগারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল প্রাচীন আর একদল নবীন। প্রাচীন পন্থীরা—কোহিমা, মোকচর সহরে ছেলেমেয়েদের যেতে দেয় না। তাদের বোঝান হয়—ওরা শয়তান। একান্ত আবশ্যকীয় নুনটুকুর জন্য

ওরা মেরাঙের মারফৎ সংগ্রহ করে তবুও তারা সহরে যাবে না।

আর নবীনের দল (আজকাল এদের সংখ্যাই বেশী) পাদ্রী খৃষ্টানদের আহার ব্যবহারে বিশেষ রপ্ত হয়ে পড়েছে, ফাদার তাদের জীবনে সর্ব্বময়। শিক্ষা দীক্ষা সবই ফাদারদের গড়া বিদ্যালয়ে (স্বাধীন ভারত হওয়ার পর হিন্দী ভাষা অবশ্যপাঠ্য এবং তারই মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ চলছে)।

এইভাবে নাগাদের গড়ে তুলতে পাদ্রী খৃষ্টানদের অনেক বেগ পেতে হ'য়েছে। বাণিজ্য বিনিময়ের মাধ্যমে প্রচুর টাকা ঢেলে দিয়েছে তারা, প্রলোভন ছিল টাকা। উৎকৃষ্ট কাপড়, জামা, নুন, চমৎকার রান্না-করা মাংস। এরজন্য কিন্তু অনেক ইওরোপবাসীকে প্রাণও দিতে হয়েছে, তবু তারা সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের ভূমি হ'য়েও ভারতবাসী নিজেদের কোন ধর্ম্ম, কোন সংস্কৃতি প্রচার করে নি। পাদ্রীরা শুধু একটি সর্ত্ত রাখে 'ক্রশ' আঁকো, 'ক্রশ' পর। আর সামান্য শিক্ষিত হলেই মেরী ও তাঁর পুত্র যীশুর নাম লও। পাদ্রীরা নাগাদের কাছে ফ্রেণ্ড (নাগা ভাষায় আসোহায়া) হয়ে আছে।

গৃহধর্ম্মের প্রতীক

বাঙ্গালীর বাড়ীতে যেমন উঠানের সামনে বাগানের ধারে একটি মনসা কিংবা তুলসী গাছ পোঁতার রীতিআছে, নাগাদের মধ্যে আছে একটি গোল পাথর বসান থাকে, সেটি প্রেত-আত্মার প্রতীক। কোন অশুভ কথার আলাপে কিংবা কোন নিকটআত্মীয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এরা তৎক্ষণাৎ সেই পাথরটির কাছে মুরগী বলি দেয়।

চিকিৎসা ও চিকিৎসক

প্রাচীনপন্থী নাগাদের মধ্যে চিকিৎসা ব্যাপারে একটি অদ্ভুত রকমের ব্যবস্থা আছে। নাগাদের ধারণা মানুষের শরীরে সহজে কোন ব্যাধি হয় না, ব্যাধির হেতু কোন প্রাকৃতিকও নয়। তবে যে ব্যাধি হয় তা 'অনিজা'র জন্য। অনিজা আরণ্য দেবতা। তাঁর পূজা না হ'লে কিংবা তাঁর কাছে কোন অপরাধ করলে মানুষকে তিনি কষ্ট দেন, ব্যাধি দেন, ক্ষত বিক্ষত করে দেন। এ জগতের কোন কিছুর সঙ্গে তাঁর তুলনা করলে তিনি কুপিত হন।

যখনই অনিজার কোপ হবে তখনই তামগ্যুকে ডাক্তে হবে। তামন্যু মানে চিকিৎসক। তামন্যু লতাপাতার রস খাইয়ে মাখিয়ে বলে দিতে পারেন অনিজার কোপ কমছে না বাড়ছে। রোগের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে মুরগীর বলিদানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হবে। তামন্যু অনিজার প্রতিনিধি। তাঁর সম্মাননা করতে হয় (ভিজিট) ধান, জোয়ার, বর্শা। তাঁর কথায় কোন সন্দেহ ক'রতে নাই।

মৃতদেহের সৎকার

অনিজার কোপেই যখন মানুষের ব্যাধি ও মৃত্যু; তখন তার দেহের অবশেষকৃত্য নিয়ে মানুষের করবার কিছু নাই, অলক্ষ্য শক্তি অনিজার উদ্দেশ্যেই তাকে ত্যাগ করতে হয়। তাই তারা খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে মৃতদেহকে গভীর খাদে গড়িয়ে দেয়।

তবে এমনও ঘটেছে মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ জানতে না পেরে অনেকের দেহকে এমনিভাবে গড়িয়ে ফেলে দিয়েছে—তারপর সে হয়তো কোনও রকমে বেঁচে গেলে তার আবাসভূমিতে সে আর ফিরে আসতে চায় না, ডাইনী তাকে গ্রাস করেছে এমনি কাণ্ড ঘটিয়ে দেবে আত্মীয় স্বজন। এইজন্যে অনেকে সত্যি সত্যি ডাইনী হয়ে—কোন গুহায় একা থাকে।

তাছাড়া আর এক রকম ডাইনী হয়—যে সব পুরুষ বা রমণী নিজেদের জৈবক্ষুধার বাসনায় অতৃপ্ত থাকে অথচ দেহের বল লাবণ্য আর কাউকে আকর্ষণ করে না তারা নিজদিগকে ডাইনি সংজ্ঞায় আখ্যাত করে গ্রামের একটু দূরে বাস করে। সবে মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের প্রলুব্ধ মনকে নানা রকম জড়ী-বুটীর সাহায্যে, পোড়া চুল, কিছু ছাই লোম, নখ, ইত্যাদি দিয়ে এবং অদ্ভুত উদ্ভট শব্দ করে—বলে তোর অভীষ্ট সিদ্ধি হবে। ধান, জোয়ার, বর্শা মাংস, আমার জন্যে নিয়ে আয়।

এরা আবার অনেক সময় নায়ক নায়িকার ঘটকও হয়। ঘটক মানে টেকোয়েস্ত, কেজিম্বু!

নাগাজাতির মধ্যে শ্রেণী ভাগ আছে, তাদের মধ্যে

লোহটা নাগা, আঙ্গানী নাগা, সাংটানা নাগা—এরা বংশ মর্য্যাদা অপেক্ষা শ্রেণী মর্য্যাদায় কুলীন। এদেরই বংশে রাণী গাই-ডিলিও ছিলেন শিক্ষিতা রমণী, এবং ইংরাজ বিদ্বেষী ও গান্ধীজীর অনুরাগিণী। পরে তিনি প্রকাশ্য অহিংসা সংগ্রামে যোগ দিয়ে বৃটিশের কারাবরণও করেছিলেন। তিনি নাগাদের মধ্যে প্রাচীন পন্থায় আস্থা রক্ষা ও পাদ্রীদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য নাগাদিগকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

বর্ত্তমান নাগা সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নতি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে থাক্‌লেও প্রাচীন পন্থীদের সংখ্যা কম নয়।

বাংলার লোকশিল্প

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার পল্লী চিত্রের প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নগরে দেখতে পাওয়া যায়। পটের উপর ছবি আঁকা, মাটির পাত্রের উপরে, বসবার পিঁড়ি, পাটি, কুলা, ধুনুচী, বাঁশ ও বেতের জিনিষ প্রভৃতির উপর নানা ধরণের রংয়ের মিশেল দিয়ে ছবি আঁকার অভ্যাস বাংলা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যেমন পূর্ববঙ্গে তেমনি পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের চিত্র চর্চা খুবই উল্লেখযোগ্য। ছবি আঁকার সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর নিবিড়তর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ব্রত, পূজা, ধর্মীয় উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে গ্রামের মেয়েরা দিশী উপকরণ দিয়ে ছবি আঁকতেন। নানা জিনিসের উপর ছবি আঁকা বা চিত্রকর্ম করা ছাড়াও দেওয়ালে ছবি আঁকার প্রথা গ্রাম অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম অঞ্চলে দেশজ চিত্রকর্মের অনেক সুন্দর, সুন্দর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে দেওয়ালে আঁকা ছবির অনেক নমুনা পল্লী অঞ্চলে দেখা যায়। বিলিতী মতে যাকে ফ্রেস্‌কো পেন্‌টিং বলা হয়, তেমন ধরণের ছবি সাধারণ গ্রামের লোকেরাও আঁকবার চেষ্টা করে। সেই জাতের ছবি আঁকা হয় ঘরের দেওয়ালে, ঘরের পাশে প্রাচীরের গাঁয়ে, গ্রামের কূয়োর ধারে, ইটের গাঁথুনীর কোন পাকা দেওয়ালের উপর, আবার অনেক সময় ফুল, ফল গাছের চারদিকে যে বেড়া দেওয়া ... দিয়ে তার উপরেও গ্রামীণ শিল্পীরা ছবি এঁকে থাকেন। এই ধরণের দেওয়ালের উপর আঁকা ছবি বিশেষ ক'রে বীরভূম, বাঁকুড়া ও ২৪ পরগণার পল্লী অঞ্চলে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। সাঁওতাল পল্লীগুলোতে দেখা যায় মাটির ঘরের কাঁচা দেওয়ালের উপর। সাঁওতালী গৃহস্থ পুরুষ ও মেয়েদের আঁকা চমৎকার সব ছবি, ফুল, ফল, হরিণ বাঘ, ছাগল, লতা, পাতা, পাখী সাঁওতালদের রোজ দেখা এমনি সব নানা জীবজন্তু ও বস্তুর ছবি। শিল্পীরা অব্যক্ত সৌন্দর্য্যকে কত লীলায়িত ভঙ্গীতে, কি মনোরম পরিবেশের মধ্যে প্রকাশ করেন। আর সেই প্রকাশ হয়ে ওঠে খাঁটি দেশজ শিল্পের বিচিত্র রূপায়ণ। দেওয়াল চিত্রের প্রচলন পূর্ববঙ্গে তেমন ছিল না। তার কারণ বোধহয় এই যে পূর্ববঙ্গ নদীবহুল অঞ্চল, সেখানকার মাটি খুব নরম। নরম মাটিতে শক্ত কাঠ আর বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরী করতে হয়। কারণ মাটি দিয়ে ঘর তৈরী করলে সেই ঘর খাল, বিল, নদীর জলের তোড়ে টিঁকতে পারে না। তবে দেওয়াল চিত্রের নমুনা না দেখা গেলে পূর্ববঙ্গে অন্য কতকগুলো বিশেষ ধরণের শিল্প কর্মের প্রচলন ছিল। চালের গুঁড়ো দিয়ে আল্পনা দেওয়া, কাঁথা, বালিশের ঢাকনা, বরণ ডালা, নারকেলের দড়ি, শিকা, চিত্রিত পিঁড়ি, কাঠের পুতুল ইত্যাদি বিচিত্র শিল্প তাঁরা নিজের হাতে গড়ে তুল্‌তেন। গ্রামের লোকদের নিজ হাতে তৈরী এই বিচিত্র লোকশিল্প গ্রামের হাটে, ঘাটে, মা...

গ্রামের মেলায়, বৈঠকী মজলিশে সব জায়গায় পরম আদরের সঙ্গে গৃহীত হ'তো, সবাই এই শিল্প-সৃষ্টিকে সম্মান করতো, ভালোবাসতো। পূর্ববাংলা এমনিতেই লোকসঙ্গীতের দেশ। পূর্ববাংলার আকাশে, বাতাসে, নদীর জলধারায়, মেঘের হাল্‌কা ভেলায় করুণ মধুর লোকগীতির আশ্চর্য ছায়াপাত রয়েছে, আর সেই সঙ্গে আছে সংগীতরসিক দরদী মনের শিল্পানুরাগ। পল্লী বাংলার জনসাধারণ নানা জিনিসের মধ্যে শিল্পকে রূপায়িত করে থাকেন। শিল্পের প্রভাব অক্ষর পরিচয়ের মধ্যেও আছে। সরল ও বাঁকা রেখায় রেখায়িত ক'রে অক্ষর রচনা করা হয়। যেমন 'ক' লিখতে সরল ও বাঁকা দুই জাতের রেখার প্রয়োজন। বর্ণ পরিচয়ের মধ্যেও শিল্প-বোধের পরিচিতি নিহিত আছে। পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা দেখা যায় গোবর দিয়ে মাটির ঘর লেপে, তারপর ঘরের দেওয়ালে আল্পনা দেয়, চিত্র অঙ্কন করে। দেওয়ালে আঁকবার জন্য রং হিসেবে কালো, লাল, সাদা, রঙ্গীণ মাটি প্রভৃতি তাঁরা ব্যবহার করেন। পদ্মফুল, দুর্গা মূর্তি, গণেশ মূর্তি, লক্ষ্মী মূতি, তারপর ফল, ফুল, গাছ, লতা-পাতা এমনি সব জিনিস হয়ে ওঠে ছবির বিষয়বস্তু। এই সকল বস্তুকে নানাভাবে অলঙ্কৃত করে তারপর আঁকা হয়। আবার কোন কোন ঘরের দেওয়ালে শুধুমাত্র আল্পনা দিয়েই চিত্রকর্ম করা হয়ে থাকে। আল্পনার ধরণ আবার অনেক রকমের। পদ্মফুল, লতা, ধানের ছরা আর মানুষের পা প্রভৃতি দিয়ে আল্পনার পরিকল্পনা করা হয়। অজন্তা গুহার ভিতরে দেওয়াল চিত্রগুলোর মধ্যে দেখা যায় পদ্মফুল কত বিচিত্রভাবে কত অগুনতি সংখ্যায় আঁকা রয়েছে। অজন্তার গুহাচিত্রে পদ্মফুলের অন্তহীন বৈচিত্র্য-প্রাচুর্যের জন্য অনেক বিশিষ্ট শিল্প সমালোচনা অজন্তার গুহাচিত্রের মধ্যে বাংলাদেশের শিল্প চর্চার আভাস দেখতে পান। বৌদ্ধ সাহিত্যে পদ্মফুল পবিত্রতার প্রতীক, বৌদ্ধধর্মের মূল ভাবধারার মধ্যেও পদ্মফুল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সেই কারণে অজন্তার গুহা চিত্রে প্রচুর পদ্মফুলের নিদর্শন থাকা সম্ভব। তবে অজন্তার চিত্রে বাংলাদেশের চিত্রকলার প্রতিভাস কতটুকু রয়েছে, তা আলোচনা ও বিচার সাপেক্ষ হলেও অজন্তার শিল্পকলা যে বাংলার শিল্পকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছে তা'তে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অজন্তা গুহার ভেতরে যে দেওয়াল চিত্র তা একজনের আঁকা নয়, একই সময়ে আঁকাও নয়। বহু শিল্পী বহু বছর ধরে তিল তিল করে ঐ আশ্চর্য সুন্দর চিত্রাবলী অঙ্কিত করেছেন। আর গুহার ভেতরে আঁকা বলে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরেও ঐ শিল্প অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু সাধারণ পল্লী অঞ্চলের বাসগৃহের দেওয়ালে যে চিত্র অঙ্কিত হয় তা তো এত দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে না। ঘরের দেওয়ালের চিত্রমাত্র অল্প কিছুদিন স্থায়ী থাকে। আর ঐ চিত্র সাধারণভাবে একজন শিল্পীই এঁকে থাকেন। মাটির ঘরের দেওয়ালে চকখড়ির রং, গেরি মাটির রং বা বিভিন্ন জাতের সহজ লতাপাতা পচিয়ে তার রং দিয়ে যে বিচিত্র সব ছবি আঁকা হয়, সেই ছবি বেশীদিন স্থায়ী থাকে না। বীরভূম, বাঁকুড়া ও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালী পল্লীগুলোর মাটির ঘরের মাটির দেওয়ালে এমনি অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। খুবই স্বল্পশিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর সাঁওতালী পুরুষ আর মেয়েদের শিল্পবোধ আশ্চর্য সুন্দর। মনে হয় তারা যেন নিখুঁত শিল্পকলাকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। সম্পূর্ণ দিশী মাটির রং দিয়ে ছবির চিত্রণ ছাড়াও সাঁওতালী মেয়ে পুরুষরা নৃত্য-গীতেও খুবই পটু। সাঁওতালীদের দেখে মনে হয় তারা যেন সারা জীবনটাই নাচে, গানে ও শিল্পের বিচিত্র রূপায়ণে উৎসব করে কাটিয়ে দেয়। তাদের সব কাজে গ্রামীণ লোকশিল্পের স্বতস্ফূর্ত রূপ মূর্ত হ'য়ে ওঠে। মনেহয় সাঁওতালীদের যেন সরল, সহজ গ্রাম্য প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক খুবই নিবিড় আর ঘনিষ্ঠ। বাংলা দেশের সকল অঞ্চলের লোক-শিল্পের পরিবেশ দেখ্‌লে মনে হবে এখন যেন সেই শিল্পকে আশ্রয় করে একটা পরিবর্তনের যুগ চলেছে। লোকশিক্ষা, লোক পল্লীশিল্প ও লোক সংগীতের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার নিজস্ব সত্বা ও প্রাণরস জীবন্ত হয়ে উঠে। বাংলার যে নিজস্ব শিল্প, যুগ যুগ ধরে যে শিল্পকলা বাংলার গণজীবনকে আনন্দে উপলব্ধিতে রসানুভূতিতে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে, তাই গ্রাম অঞ্চলের শিল্প কলার রূপায়ণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আর দেওয়ালে আঁকা শিল্প

চিত্রণ বাংলার নিজস্ব লোক চারুশিল্পের মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য।

দেওয়ালে, আল্পনায়, সুতোর কাপড়ে, বেত ও বাঁশের ঝুড়ি চুপড়িতে, পাথরে, কাঠে, বইয়ের মলাটে, পিতল ও তামার বাসন-পত্রে, কাঁথায়, মাটির জিনিসে বাংলার লোকচারুশিল্পের বিভিন্ন রকমের নিদর্শন রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন আঙ্গিকের সাহায্যে ও নানাবিধ পদ্ধতিতে কত রকমের যে নক্সা আঁকা হয়ে থাকে, তার সীমা-পরিসীমা নেই। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের বিভিন্ন স্বরূপ বিভিন্ন আঙ্গিককে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠে। বাঙ্গালার রূপবোধ, বাঙ্গালা জীবনের হাসি, কান্না, ব্যথা, বেদনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতের আঙ্গিককে আশ্রয় ক'রে রূপায়িত হয়ে উঠে। আর এই সব বিভিন্ন রূপায়ণের মধ্যে মাটির ঘরের দেওয়ালে আঁকা ছবির নিজস্ব একটা স্বরূপ আছে। মধ্যযুগে বাংলা দেশকে মগধের চিত্রশালা বলা হ'ত। আধুনিক কালেও বাংলার চিত্রশিল্প বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল আর তার মধ্যে লোক চারু শিল্পের বৈশিষ্ট্য আজো পর্যন্ত জীবন্ত আর শিল্পের প্রাণরসে ভরপুর।

—শিখা—

শ্রীতপন চট্টোপাধ্যায়

১

আকাশের বুকে ঐ চাঁদ আর তারাদের মেলা,
স্নিগ্ধতা আনেনা এ চোখে।
সুন্দরের স্বপ্নদেশে সবই জানি লুকোচুরি খেলা,
বাস্তবে এ জীবনভরা দুঃখ আর শোকে।

২

বিচিত্র ধরিত্রী, এই বিচিত্র সংসার,
এরই স্তরে স্তরে জানি অসংখ্য বেদনা আছে জমা।
দিনের আলোর শেষে শুধু অন্ধকার,
এখন নেমেছে বুঝি গভীর ত্রিযামা।

৩

হেথা ভালবাসা বিস্তৃত ধুঁ ধুঁ মরুভূমি,
তৃষ্ণার্ত্ত শুধু ছুটে মরে।
তবু আকাশের বুকে ঐ চাঁদ আর তারাদের মেলা—
সুন্দরের অভিনয় করে।

৪

চারিদিকে পাপ আর কলঙ্কের আগুন,
সত্য হারায়েছে তার উজল্ নয়ান।
জীবন প্রকৃতিতে তাই নেই যে ফাগুন,
শুধু হেরি দিকে দিকে মিথ্যা—প্রবঞ্চনা।

৫

সংসার সংসার নয়, বিস্তৃত সাগর—
ব্যথাতুর মানুষের সীমাহীন উষ্ণ অশ্রুজলে।
সুবিশাল জীবনক্ষেত্র আজি দিগম্বর,
আগুন লেগেছে জানি জীবনের সোনালী ফসলে।

৬

সময় হয়েছে এখন মিথ্যার চাই অবসান।
আমিও জ্বালাতে চাই আগুনের বীভৎস বিভীষিকা
অসত্যের বুক ফেঁড়েছুটে যাক্ প্রলয়ের বান,
ছুটে যাক্ চিত্তের বেগমান বিধ্বংসী শিখা।

৭

এ শিখা—বহ্নিশিখা।
কিন্তু এতে নেই জেনো বিন্দুমাত্র ধোঁয়া।
এ শিখার গতিপথে চিহ্নিত রবে জয়টিকা,
জেনো এ শিখায় আছে বিপ্লবের ছোঁয়া।

৮

অস্তমিত জীবন রবি : পড়ে এলো বেলা।
তবু বিভেদ বিস্মৃত প্রায় স্বর্গ-নরকে।
আকাশের বুকে ঐ চাঁদ আর তারাদের মেলা,
স্নিগ্ধতা আনেনা এ চোখে।

শেষ বসন্তে

রথীন সরকার

ট্রেন ছাড়তেই নজরে পড়লো মাঝপথে যে ভদ্রমহিলা উঠে ওপাশে জাঁকিয়ে বসেছেন তিনি যেন তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অপলক নেত্রে। কেমন একটা অগাধ বিস্ময় আর কৌতুহল নিয়ে।

চোখাচোখি হতেই গৌতম চোখ নামিয়ে নিল। মনে হলো কোথায় যেন ভদ্রমহিলাকে দেখেছে। অথচ কিছু মনে করতে পারছে না। তবে কি তার কোন পরিচিত কেউ? কোন আত্মীয়? যাকে গৌতম ভুলে গেছে কিন্তু ভদ্রমহিলা ভুলতে পারেননি। কিংবা কোন ফাংশানে কি কোন মিটিং-এ ক্ষণিকের পরিচিতি। তারপর সময়ের সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া হাজার হাজার চেনা অচেনা মহিলার মুখ।

কিন্তু গৌতম কিছুতেই মনে করতে পারলো না। স্মৃতির পাতা উলটিয়েও তার কোন হদিশ পেল না।

লিলুয়া আসতেই ট্রেন ফাঁকা হয়ে গেল। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো গৌতম—সাতটা দশ। অথচ এরই মধ্যে বাইরে অন্ধকার জমাট হয়ে নেমেছে। সে অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি চলে না। কেবল রেলের কামরাটুকু ছাড়া পৃথিবীর আর কোন অস্তিত্ব যেন নেই। সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে গাড়িটা যেন অন্ধকার এক মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাচ্ছে।

রাত বাড়তেই গৌতমের অস্বস্তি বাড়লো, কেবল মনে হতে লাগলো কোথায় যেন ভদ্রমহিলাকে দেখেছে। ভদ্রমহিলা যেন তার চেনা পরিচিত। অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না। ভীড়ের মধ্যে আত্মগোপন করবার তবু একটা সুযোগ থাকে—একটা স্বস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ফাঁকা ট্রেনে সমগ্র দৃষ্টি তখন শুধুমাত্র একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। ঘুরে ফিরে নজর সেখানেই থমকে দাঁড়ায়। নিজেকে বড় বেশী প্রকটিত মনে হয়। আর মুখোমুখি বসে থাকা তখন একটা মস্তবড় বিড়ম্বনা হয়ে উঠে।

—শুনছেন?

গৌতম চমকে ফিরে তাকালো। দেখলো ভদ্রমহিলা তারই দিকে ঝুঁকে পড়েছেন একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে। গৌতম নিজেকে বড় বেশী বিব্রতবোধ করলো। বললো, আমাকে বলছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, হ্যাঁ, এটা কোন স্টেশান?

—লিলুয়া।

—আচ্ছা মধুপুরে ক'টায় গিয়ে পৌছুবে ট্রেণ?

—আজ্ঞে তা তো জানিনে।

ভদ্রমহিলা চুপ করে থাকলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, আপনি কোথায় নামবেন?

—গিরিডি।

—ও।

ভদ্রমহিলা আবার চুপ করলেন। আর গৌতম এতক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেল। দেখলো: ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে, অথচ এত কাছে থেকেও তা নজরে পড়েনি। হয়তো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ কিংবা তারও বেশী। তবু কোথাও এতটুকু বার্ধক্যের ছায়া নামেনি। কেমন একটু কমনীয়তা আর লালিত্যের সুষমা তাঁর সর্বাঙ্গে। যেন যৌবন শেষবারের মতো যাই যাই করেও যেতে পারেনি।

গৌতম এবার অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলো। বললো, আপনি কি মধুপুরেই থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু কেন বলুন তো? ভদ্রমহিলা চোখ তুলে তাকালেন।

গৌতম বললো, না মানে এমনি আর কি। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হলো, মনে হলো আপনাকে যেন চিনি—কোথায় যেন দেখেছি।

ভদ্রমহিলার চোখ দুটো এবার বিস্ফারিত হলো, বললেন, তাই নাকি! আশ্চর্য তো, অথচ আপনাকে যে কোথাও দেখেছি বলে তো আমার মনে হচ্ছে না।

গৌতম বললো. হচ্ছে না, স্মরণ করতে পারছেন না তাই।

—তা হবে।

ভদ্রমহিলা দৃষ্টিটাকে আবার জানালার বাইরে ছুড়ে দিলেন। যেন জমাট বাঁধা অন্ধকারকে ভেদ করে তিনি চলমান দৃশ্যগুলোকে নিরীক্ষণ করবার চেষ্টা করছেন।

আর গৌতমের মনে হলো ভদ্রমহিলা যেন বড় বেশী রহস্যময়ী। বড় বেশী রহস্য ঘিরে রয়েছে তাঁর চতুর্দিকে। নইলে এই মুহূর্তে গৌতমের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে অমন একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাই বা বললেন কেমন করে! নাকি ভদ্রমহিলা নিজেকে গোপন করতে চান? হয়তো তাই। অথচ গৌতম তো দেখেছে সেই ব্যাকুল দৃষ্টি। অগাধ কৌতুহল আর গভীর বিস্ময়—যা গৌতমের দৃষ্টিকেও এড়িয়ে যেতে পারে নি।

কিন্তু তবু গৌতম জিজ্ঞাসা না করে পারলো না। বললো, আচ্ছা আপনি কি কখনও গিরিডি গেছেন?

—গিরিডি?

—হ্যাঁ।

—গিয়েছি। ভদ্রমহিলা বললেন, খুব ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলাম তখন আমার বয়স বারো।

—কোথায় উঠেছিলেন?

—বেনিয়াডি'তে।

—ও।

গৌতম চুপ করলো।

ভদ্রমহিলা হাসলেন—বললেন, আপনার সন্দেহ যেন এখনও নিরসন হয়নি!

গৌতম বললো, হলো আর কই। সেই তখন থেকে তো কেবলই একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে—যার সঙ্গে আপনার বেশ একটা সামঞ্জস্য রয়েছে। অথচ—

—অথচ সেই মেয়েটি আমি হতে পারলাম না দুর্ভাগ্য আমার। ভদ্রমহিলা হাসলেন।

গৌতম বললো, দুর্ভাগ্য আপনার নয় দুর্ভাগ্য আমার। আমিই সেই মেয়েটিকে হারালাম।

—তাই নাকি!

গৌতম বললো, হ্যাঁ তাই।

ভদ্রমহিলা এবারও হাসলেন। চোখের কোণে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললেন, তাহলে তো শুনতে হয় সে কাহিনী। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

গৌতম বললো, না বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে কতকগুলো সর্তে আপনাকে রাজী হতে হবে। রাজী আছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, শুনি সে নমুনা।

গৌতম বললো, প্রথমতঃ আপনার নাম ধাম পরিচয় দিতে হবে।

—বারে, তা তো দিলাম। ভদ্রমহিলা এবার বাধা দিয়ে উঠলেন।

গৌতম বললো, তাতে যে স্পষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়তঃ আপনি কোন মিথ্যের আশ্রয় নিতে পারবেন না। আর তৃতীয়তঃ তেমন যদি কোন ঘটনা আপনার জীবনে ঘটে তবে তা অকপটে বলতে হবে।

—ওরে বাবা, এ যে আসামীর মতো হলফ করিয়ে নিচ্ছেন। শেষে অতবড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি তা পালন করতে না পারি?

গৌতম বললো, তাহলে আমাকেও মুখ বন্ধ করতে হবে।

ভদ্রমহিলা হাসলেন, বললেন, না অতবড় স্বার্থত্যাগ করতে পারবো না, তার চেয়ে আপনার সর্ত মানতে রাজী আছি।

একটি জংশন স্টেসানে গাড়ি থামতেই গৌতম উঠে দাঁড়ালো। বললো, চায়ে আপত্তি আছে আপনার?

—না।

—তবে আসুন না গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক্। অনেকক্ষণ ও বস্তু পেটে পড়েনি কিনা।

ভদ্রমহিলা বললেন, কিন্তু আমিই বা আপনার কাছে অনর্থক ঋণী হবো কেন ?

—বেশ তো হবেন না। গৌতম হাসলো, সে ঋণ না হয় আপনিও এক সময় শোধ করে দেবেন।

ভদ্রমহিলা আর কোন কথা বললেন না। চুপ করে থাকলেন। গৌতম এবার জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকলো, এই চা—চা ইধার আও।

চা-ওয়ালা এগিয়ে আসতেই গৌতম দু ভাঁড় চায়ের অর্ডার দিল। তারপর এক ভাঁড় ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, কি হলো—কথা বলছেন না যে ?

—কি বলবো বলুন ? ভদ্রমহিলা মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, কথা তো এবার আপনারই শুরু করবার পালা।

কিন্তু গৌতম সে কথার উত্তর করলো না। ভাঁড়ে একটা দীর্ঘ চুমুক দিল। তারপর সেটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বললো, হ্যাঁ, তাহলে শুরুই করা যাক্। কিন্তু তার আগে নিজের নাম ধাম পরিচয়টা দিই—পাছে আবার সন্দেহের উদ্রেক হয়।

—আপনি তো আচ্ছা সিরিয়স লোক ! ভদ্রমহিলার চোখ দুটো ছোট হয়ে এলো।

গৌতম বললো, সিরিয়াস আর হতে পারলাম কই। তাহলে তো জীবনটা এমন বরবাদ হয়ে যেত না। তা যাক্, আমার নাম গৌতম রায়, জীবিকা প্রফেসারী, আপাততঃ গন্তব্য গিরিডি। আর আপনার ?

—আমার ! আমার আবার কি বলবো। ভদ্রমহিলা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—আমার পরিচয় তো আগেই দিয়েছি। নাম মিস্ মায়া সেন, পেশা মাষ্টারী, গন্তব্য মধুপুর।

গৌতম এবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল. চমকে ফিরে তাকালো। আশ্চর্য ! তাই তো এতক্ষণ নজরেই পড়েনি —ভদ্রমহিলা তাহলে অবিবাহিত। অথচ বাঙালী মেয়েরা এত বয়স অবধি অবিবাহিত থাকে না। তবে কি ভদ্র-মহিলার স্বামী জোটেনি ? নাকি তারই মতো কোন সুপ্ত বেদনা মনের অন্তঃস্থলে ঘুমিয়ে রয়েছে ! যা তাঁর সমস্ত জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে, বিবাহিত জীবনের উপর বিদ্বেষ —একটা ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। ইচ্ছা হলো গৌতম জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু এই মুহূর্তে গৌতম তা কিছুতেই পারলো না। বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো।

ট্রেণ ছাড়তেই ভদ্রমহিলা বললেন, কি হলো, চুপ করলেন যে ? এবার আরম্ভ করুন।

গৌতম নিজেকে সজাগ করে তুললো। বললো, হ্যাঁ এবার আরম্ভই করা যাক্। তখন কতই বা বয়েস, পঁচিশ ছাব্বিশ। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে পুজোর ছুটীতে বেড়াতে গিয়েছি গিরিডি। মামার বাড়ি। অদ্ভুত দেশ। চারি-দিকে ছোট ছোট পাহাড় আর তারই মাঝে একটা ছোট্ট শহর। জনহীন নিরিবিলি। কিন্তু বছরের একটি সময়ে এই শহরটাও সরগরম হয়ে উঠে। বিশেষত ভাদ্রের শেষ থেকে কার্তিকের শুরু অবধি। এই কটি মাস লোকের আনাগোনা শুরু হয়। ফাঁকা বাড়িগুলো আবার মুখর হয়ে উঠে, শহরের চঞ্চলতা বাড়ে—যেন বিশীর্ণা নদী বন্যার জল পেয়ে আবার উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

সেবারও একটি পরিবার এলো বাড়ির পাশে দিল্লী থেকে। পরিবারটি খুব একটা বড় নয়। স্বামী স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটির বয়স বছর বারো, আর মেয়েটির বয়স সতের আঠার।

কিন্তু হলে হবে কি। ঐটুকু সংসার অথচ এত হৈচৈ যে মনে হতো কিছু একটা যেন লেগেই আছে। চাকর বাকররাও এক মিনিট ফুরসৎ পেতো না। সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হতো।

ক্রমে ক্রমে আলাপ পরিচয় হলো। ভদ্রলোক একদিন বললেন, চলে এসো না হে, বাড়িতে তো বসেই—থাকো তাস-টাস খেলা যাবে।

বললাম, যাবো একদিন।

—না না যাবো নয়, আজই চলে এসো। ভদ্রলোক হাঁ হাঁ করে উঠলেন, সন্ধ্যে বেলায় কোন কাজ-টাজ আছে তোমার ?

বললাম, না কাজ আর কি।

ভদ্রলোক বললেন, অলরাইট চলে এসো তবে।

সন্ধ্যেবেলায় সত্যি সত্যিই ভদ্রলোক লোক পাঠিয়ে তলব করলেন। যেতে হলো। একটা লজ্জা আর সংকোচ নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক সে সংকোচ

আর লজ্জাকে রাখতে দিলেন না। বললেন, এই যে এসো এসো, কি নাম হে তোমার ?

বললাম, গৌতম রায়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ গৌতম, বাড়িতে বসে থাকবে না—তাতে মন মেজাজ ভালো থাকে না। অবাধে চলে আসবে নিজের ছেলের মতো। গল্প গুজব তাস টাস খেলা যাবে। ইয়ং ম্যান বাড়িতে বসে থেকে থেকে সময়ের অপব্যয় করবে কেন ?

পরে শুনেছিলাম ভদ্রলোকের নাম সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলের একজন টুরিং অফিসার। আপাততঃ এখন দিল্লীতে আছেন, পরে কোথায় যাবেন কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু সে রাত্রিতে তাসের আসর আমাদের জমেনি। মঞ্জু বারবারই ভুল করছিল। আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একটা লজ্জা আর সংকোচ নিয়ে সমস্তক্ষণ মুখ নীচু করে বসেছিল।

পরদিন আবার গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক তখনও সান্ধ্য ভ্রমণ করে ফেরেননি। মঞ্জুর মা এগিয়ে এলেন, এই যে এসো ভাই এসো। তোমার মেশোমশাই বেড়াতে বেরিয়েছেন এক্ষুণি ফিরবেন তুমি ততক্ষণ বসো।

বসলাম। কিছুক্ষণ পরে মঞ্জু এসে দাঁড়ালো। বললো, মা জিজ্ঞাসা করছেন—আপনি চা খান ?

বললাম, পেলে খাই, না পেলেও আপত্তি নেই।

মঞ্জু হাসলো। বললো, আপনি বসুন আমি আপনার চা নিয়ে আসি।

মঞ্জু চলে যেতে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম—আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছু নেই। খান দুই টেবিল আর খানচারেক চেয়ার। কিছু বই—আর একটা ফুলদানিতে দুদিনের বাসীফুল শুকিয়ে রয়েছে। তবু তারই মধ্যে একটা ছন্দ আছে, একটা অদ্ভুত সুষমা ছড়িয়ে রয়েছে। একটা যত্নপ্রসূত লালিত্যও।

কিছুক্ষণ পরেই মঞ্জু ফিরে এলো চা নিয়ে। কাপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বললাম, বসুন না দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

মঞ্জু বসলো না। পা দিয়ে মেঝে খুঁড়তে খুঁড়তে বললো, আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন, আমি আপনার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। আমার নাম মঞ্জু—আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন।

বললাম, বেশ আপনার যখন আপত্তি তখন নাম ধরেই ডাকবো।

মঞ্জু আর কোন কথা বললো না। সময় নিঃশব্দে গড়িয়ে চললো। একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি—কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। মঞ্জু তেমনিই আঙুল দিয়ে মেঝে খুঁড়তে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে বললাম, আমি তাহলে আজ উঠি।

মঞ্জু বললো, এখনি উঠবেন ?

—হ্যাঁ উঠি।

—কিন্তু বাবা এক্ষুণি ফিরবেন।

বললাম, তা হোক, আজ আর মেশোমশাইকে বিরক্ত করবো না। বরং আর একদিন না হয় আসবো।

এরপর দিন সাতেক যেতে পারিনি। বিশেষ কাজে আটকে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক একদিন দেখি—নিজেই এসে হাজির—গৌতম আছো নাকি হে, গৌতম ?

আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম—কে ? মেশোমশাই, আসুন আসুন।

ভদ্রলোক বললেন, না হে না বসবো না। ভাবলাম তুমি আর যাচ্ছো না—তা দেখেই আসি। শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো হে ?

বললাম, না না শরীর তো আমার বেশ ভালোই আছে। মানে বিশেষ কতকগুলো কাজে আটকে গিয়েছিলাম কিনা তাই—

ভদ্রলোক বললেন, তা ভালো। শোন আজ ও বেলার দিকে একটু আসতে পারবে ?

—আজ!

—হ্যাঁ আজ। মানে বিশেষ একটা জরুরী কথা আছে—তা এসো না হে ওবেলায় একটু সময় করে।

বললাম, আচ্ছা যাব।

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে ঐ কথাই রইলো, আমি আজ চলি বুঝলে।

সন্ধ্যে বেলায় গেলাম। ভদ্রলোক বাইরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে সন্ধ্যার হাওয়াটুকু উপভোগ করছিলেন।

আমাকে দেখে উঠে বসলেন, এই যে এসো হে। এইমাত্র তোমার কথাই ভাবছিলাম। বসো বসো—

বসলাম। ভদ্রলোক বললেন, একটা উপকার করতে পারবে?

বললাম, বেশ তো বলুন কি করতে হবে। আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি অবশ্যই করবো বৈকি।

ভদ্রলোক বললেন, মানে আমরা উশ্রী ফল্‌সে একটা চড়ুই ভাতি করতে চাই। তুমি যদি আমাদের সাথে থাকো তো বিশেষ উপকার হয়। কিছুই তো চিনিনে, সবই অপরিচিত—তবু সঙ্গে থাকলে একটা ভরসা।

গৌতম চুপ করলো। একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো।

ভদ্রমহিলা বললেন, তারপর?

গৌতম বললো, তারপর সেই চিরাচরিত কাহিনী। একটা অদ্ভুত আনন্দ তার উল্লাসের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়েছে। মঞ্জু পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটাছুটি করে বেড়িয়েছে ছোট শিশুর মতো। খাঁচায় বন্দী বনের পাখী হঠাৎ মুক্তি পেলে যেমন উল্লসিত হয়ে উঠে—ঠিক তেমনি। উশ্রী ফল্‌সের ধারে চুপচাপ বসে থেকেছি। লক্ষ লক্ষ জলের ধারা হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে পাহাড়ের সানুদেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে খলবল করে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে—সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মঞ্জু বলেছে—কি সুন্দর না?

বলেছি, ঠিক তোমারই মতো।

মঞ্জু হেসেছে বলেছে, আমি বুঝি খুব সুন্দর?

বলেছি, অন্ততঃ আমার চোখে তাই।

মঞ্জু আর কোন কথা বলেনি। চুপচাপ বসে থেকেছে স্থিরচক্ষু হয়ে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি মঞ্জুর মুখে পড়ন্ত রোদের লুকোচুরি—সমস্ত মুখমণ্ডলে লজ্জাবশতঃ একটা রক্তিমাভা। ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে দু' একটি চুল, ভেসে আসছে মাংস পোলাওয়ের উৎকট গন্ধ। আর সব কিছু ছাপিয়ে অবিশ্রান্ত একটা ঝরঝর শব্দ।

অনেকক্ষণ পরে মঞ্জু বলেছে, চলো উঠি।

—চলো।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মঞ্জু বলেছে, এটা কি ভালো হলো?

—কোনটা?

—এই এমন করে আমাদের মেশামেশা?

বলেছি, ভালো মন্দ বিচার করে তো প্রেম আসেনা মঞ্জু। অনর্থক শুধু শুধু কেন ভয় পাচ্ছো। অন্ততঃ তুমি আমাকে ভরসা দাও, বিশ্বাস করো মঞ্জু—তুমি যে আমার সারাজীবনের ভরসা।

মঞ্জু ম্লান হেসেছে বলেছে, ভরসা!

—হ্যাঁ ভরসা।

—কিন্তু সে ভরসা যদি সারা জীবন না দিতে পারি?

বলেছি, তাহলেও দুঃখ করবো না। ভাববো ভরসা নাই বা পেলাম—তবু তো একদিন তোমার সান্নিধ্যে এসেছি এটাই কি কম। সেই স্মৃতিটুকু আজন্ম বুকে ধরে দুঃখকে ভুলবার চেষ্টা করবো।

মঞ্জু হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছে, না না তুমি অমন করোনা অমন করোনা গৌতম। অমন করে আমাকে বেঁধো না। আমাকে মুক্তি দাও। কি হবে অমন করে জীবনটাকে তছনছ করে?

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। জীবনটা যদি এত ছোট হতো, এত ছোট করে ভাবতে পারতাম, তাহলে তো কোন সমস্যাই থাকতো না।

পরের রবিবারে গিয়েছিলাম পরেশনাথে। তার পরের রবিবারে বরাকরে। মঞ্জু তেমনি অবাধে মেলামেশা করেছে—এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি। তেমনি ছুটাছুটি করেছে পাহাড়ে পাহাড়ে। সমানে হেঁটেছে, বরাকর নদীতে সাঁতার কেটেছে সমানে পাল্লা দিয়ে।

কিন্তু তবু বুঝি একদিন সময় ঘনিয়েই আসে। কলেজের ছুটী ফুরিয়ে এলো, বিদায় নিতে গেলাম মঞ্জুর কাছে। মঞ্জু বললো, চিঠি দিও।

বললাম, দেব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ অন্ততঃ রোজ একখানা করে চিঠি দিও।

বললাম, তাই দেব।

কিন্তু কে জানতো যে মঞ্জুই একদিন আমাকে ভুলে যাবে। সমস্ত দিন কাজকর্মের পর রোজ একখানা করে চিঠি দিতাম। যথা সময়ে সে চিঠির উত্তরও আসতো। আর সেকি আনন্দ! মনে হতো পৃথিবীতে এত সুখী বোধ

হয় আর কেউ নয়। কিন্তু সে চিঠিও একদিন কমে আসতে লাগলো। লক্ষ্য করলাম- রোজ থাক সপ্তাহে একখানা করে চিঠিও মঞ্জু দেয় না। ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে সে চিঠি মাসে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর আপনা আপনিই একদিন বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমি তবু কোন অনুযোগ কোন অভিযোগ করিনি। কি হবে অভিযোগ করে! পরে শুনেছিলাম, মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গিয়েছে বিলাত ফেরৎ বড় একজন ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। তবু আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি: হে ভগবান, ওরা যেন সুখী হয়, ওরা যেন শান্তিতে থাকে। ওরা আমাকে ভুলে যাক্।

কাহিনী শেষ করে গৌতম চুপ করলো।

আর ভদ্রমহিলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, কিন্তু তাবলে আপনি জীবনটা এমন করে নষ্ট করে দেবেন?

গৌতম বললো, কই না—জীবনটা তো নষ্ট করিনি। সে যে আজও আমার অন্তরে জাগরুক হয়ে বেঁচে আছে।

—হুঁ।

ভদ্রমহিলা একটা অস্ফুট আতনাদ করলেন।

গাড়ি তখন ছুটে চলেছে বাইরের গাঢ় অন্ধকারের বুক ভেদ করে। যেন অনন্ত মহাশূন্যে সবেগে ছুটে চলেছে অনন্ত—অনন্তকাল ধরে।

ভদ্রমহিলা বললেন, কিন্তু এও তো হতে পারে যে সে সমস্তই ভুল।

—কি ভুল?

—এই আপনারই মতো সে আর কোন দ্বিতীয় সঙ্গী খুঁজে নেয়নি। আজও প্রতীক্ষায় রয়েছে আপনারই পথ চেয়ে।

গৌতম বললো, না না তা হতে পারে না। আর তাই যদি হয় তবু আমি সাহস করে যাচাই করতে পারবো না। পাছে এই সত্যটাই রূঢ় হয়ে দেখা দেয়।

ভদ্রমহিলা আর কোন কথা বলতে পারলেন না। গৌতমও চুপ করে রইলো। একটা অনন্ত নিস্তব্ধতা, একটা দুর্বার সময় গড়িয়ে চললো।

অনেকক্ষণ পরে গৌতম বললো, কিন্তু আপনি? আপনি কেন বিয়ে করলেন না মিস্ সেন?

ভদ্রমহিলা হাসলেন। বললেন, সময় হলো না বলে।

—না না এ আপনি মিছে কথা বলছেন। গৌতম বাধা দিলো, অন্তরের বেদনাকে জোর করে লুকোতে চাইলেই কি লুকোনো যায়?

ভদ্রমহিলা এবার চোখ তুলে তাকালেন—বললেন তাহলে শুনবেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ শুনবো বৈকি।

—কিন্তু সে যে নিতান্তই মামুলি।

—তাহোক। গৌতম বললো, তবু আপনি বলুন।

ভদ্রমহিলা বললেন. একটা বয়স আছে মানুষের—যে বয়সটা সব কিছু সুন্দর করে দেখতে শেখায়। মোহাঞ্জন লাগে চোখে। আর তাইতেই ছেলে মেয়েরা এত বেপরোয়া হয়ে উঠে। গুরুজনেরা ভয় পান ঐ বয়সটাকে। তখন কতই বা বয়স—বাইস তেইস। সিক্সথ ইয়ারে পড়ি। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম ক্লাশের সেরা ছাত্র কল্যাণ সোম কখন আমার মনটা চুরি করে নিয়েছে আমারই অজ্ঞাতে। হয়তো ওর শান্ত গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্বই আমাকে এত গভীর ভাবে আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

যাই হোক ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। তারপর অন্তরঙ্গতা। সব শেষে মন দেওয়া নেওয়ার খেলা শুরু হলো। কিন্তু কে জানতো যে ওর সবটাই ছিলো মুখোশ, কেবল কথার ফুলঝুরি দিয়ে আমার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিতে চেয়েছিলো। হলও তাই। একটা বিদেশী কোম্পানীর সাহায্য নিয়ে বিলেত গেল—আর ফিরলো না। সবশেষ খবর হলো—ওখানে নাকি মেম বিয়ে করে এখন সুখেই ঘরকন্না করছে।

ভদ্রমহিলা চুপ করলেন।

গৌতম বললো, কিন্তু এ আপনার মিছে অভিমান।

—কিসের কথা বলছেন?

গৌতম বললো, একটা ছেলে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলেই যে আপনি তার উপর অভিমান করে সমস্ত শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে জীবনটা এমন ভাবে ধ্বংস করবেন এ আপনার ভারি অন্যায়।

ভদ্রমহিলা হাসলেন। বললেন, ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি দিয়ে সব সময় বিচার করা যায় না গৌতমবাবু! এই আপনার জীবনটা দিয়েই দেখুন না!

গৌতম আর কোন কথা বলতে পারলো না। চুপ-চাপ বসে রইলো মুখোমুখী, যেন কেউ কাউকে দেখছে না, কেউ কাউকে চেনে না, জানে না, বোঝে না। কেবল ভাসা ভাসা দৃষ্টি দিয়ে তারা পরস্পর পরস্পরের বিস্মৃত স্মৃতি-গুলোকে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

রাত্রি দশটায় গাড়ি মধুপুরে এসে পৌছুতেই ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন। গৌতমও।

ভদ্রমহিলা বললেন, একি আপনি এখানে নামবেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আপনি যে বললেন গিরিডি যাবেন?

—না। আপাততঃ এখানেই নামবো স্থির করলাম।

—সেকি!

—হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে গৌতমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, কিন্তু কোথায় উঠবেন আপনি?

—কেন আপনি যেখানে উঠবেন।

—সে তো একটা মেয়েদের হোস্টেল।

গৌতম আর সহ্য করতে পারলো না। মুহূর্তে তার সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বললো, কেন মঞ্জু, তোমার ঘর কি আমার ঘর হতে পারে না?

ভদ্রমহিলা তবু একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চাইলেন, এ আপনি কি বলছেন!

গৌতম বললো, ঠিকই বলছি মঞ্জু ঠিকই বলছি—তুমি আর আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। একবার হেরেছি কিন্তু তা বলে আর বারবার হারতে চাইনে। এই দেখ। বলে পকেট থেকে একটা নাম ধাম লেখা কার্ড বের করে দিতেই ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন, একি এটা কোথায় পেলেন আপনি?

গৌতম বললো, তোমার এটাচি কেসে।

—উঃ।

—কি হলো?

মঞ্জু এবার ভেঙ্গে পড়লো। বললো, না আর পারলাম না গো পারলাম না—আমারই হার হলো।

গৌতম হাসতে লাগলো মৃদুমৃদু। বললো, কিন্তু যাই বলো, চোর আমি ঠিকই ধরেছি।

—তা আবার ধরবে না। মঞ্জু এবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, এক চোর যে আরেক চোরকেই খুঁজে ফেরে। ওটাই যে তার স্বভাব।

—না ঠিক তাও নয়। গৌতম বাধা দিলো, এক চোর আরেক চোরকে কি আর সাধে খুঁজে ফেরে—সে যে সহাবস্থান করতে চায়।

—হয়েছে হয়েছে আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। মঞ্জু ফিক করে হেসে ফেললো। বললো, লজ্জা সরমের মাথা তো একেবারে চিবিয়ে খেয়েছো দেখছি। ছিঃ, পারলে তুমি এই এক গাড়ি লোকের মধ্যে এমন ভাবে অপদস্থ করতে?

—তুমিই বা অমন ভাবে পালিয়ে যাচ্ছিলে কেন?

মঞ্জু বললো, সাধ করে কি আর পালিয়ে যাচ্ছিলাম, তোমার মতো ডাকাতের হাতে সারা জীবনটা জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে পালিয়ে যাওয়া ঢের ভালো।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ তাই। কি লাভ হতো পরিচয় দিয়ে বেশতো ছিলাম। দেখলাম তুমি তেমনিই ভালোবাস, তেমনিই স্নেহ আর শ্রদ্ধা কর। অন্ততঃ আমি যে সেইটুকুই চেয়েছিলাম। বাঁচতে চেয়েছিলাম তোমার মধ্যে—তাইতো পালিয়ে যেতে চেয়েছি।

কিন্তু তুমি—তুমি আমাকে বাঁচতে দিলে কই?

গৌতম এবার কি একটা বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু মঞ্জু সে কথায় কর্ণপাত করলো না। দরজার কাছে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো। ডাকলো, এই কুলি—কুলি ইধার আও।

পল্লী-শিক্ষা প্রসংগ

অধ্যক্ষ শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

স্বাধীন ভারতে, ভারত সুন্দরতর হোক, ভারতবাসী মাত্রই এই কামনা করেন। প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী-ই চাহেন যে তাহার দেশ শ্রীসম্পদে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক, জ্ঞান গরিমায় উন্নত হোক, চরিত্রবলে বলীয়ান হোক এবং সর্বোপরি—আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করুক। এ বাসনা আমাদের আজিকার নহে,—বহু দিনের। স্বাধীন ভারতের প্রথম ঊষার আগমনের সংগে সংগেই আমাদের অন্তরে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দিন হইতেই এই জ্ঞান গৌরবোজ্জ্বল ভারত দর্শন ইচ্ছায় আমরা অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি অধীর আগ্রহে চাহিয়া আছি।

কিন্তু ভারত স্বাধীন হইয়াছে আজ দীর্ঘ দিন। এই দীর্ঘ দিনে ভারত কি আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্তির পথে বিশেষ কিছু অগ্রসর হইয়াছে? বর্তমান ভারতের শ্রীসম্পদ, ভারতের চরিত্র, ভারতের নৈতিক ও মানসিক আদর্শ কি সেই পরাধীন ভারত অপেক্ষা বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে? সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে—আমাদের সে স্বপ্ন বাস্তবতার পথে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। রাষ্ট্র তাহার কর্তব্য অবহেলা করিয়াছে, দেশ-নেতাগণ উদাসীন কিংবা জনগণের প্রচেষ্টার ও সহযোগিতার অভাব এ বিষয়ে রহিয়াছে—এরূপও বলা চলে না। কারণ দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পরিযোজনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। তথাপি কেন আমাদের এই অবস্থা, ইহা একটী গভীর চিন্তনীয় বিষয় ও সমস্যা সন্দেহ নাই।

আমাদের মনে হয় ভারতের পল্লীশিক্ষা সমস্যা এবং উপরোক্ত সমস্যা একই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পল্লীই ভারতের প্রাণ—ভারত পল্লীপ্রধান দেশ। ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০জনই পল্লীবাসী। সুতরাং তাহাদের উন্নতি কিংবা অবনতি, ভারতেরই উন্নতি তথা অবনতির কারণ। দেশের জনসংখ্যার তিনচতুর্থাংশই যদি অশিক্ষিত থাকিয়া যায় তবে অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ যতই উন্নত ও শিক্ষিত হোক না কেন তদ্দ্বারা একটা দেশ উন্নত হইতে পারে না। ব্যষ্টির উন্নতিই যে সমষ্টির উন্নতি নহে, এ সত্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও শিক্ষামূলক যাবতীয় পরিকল্পনা ও শিক্ষা প্রচার প্রচেষ্টা পল্লীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কেন? পূর্বেই বলিয়াছি, ভারত পল্লীপ্রধান দেশ। ভারতের পল্লীর প্রধান জীবিকা কৃষি ও শিল্পকলা। ভারতের ধন-সম্পদই বলি, আর জনসম্পদই বলি, সবই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ঐ দুই উদ্যোগের উন্নতির উপর। সুতরাং দেশকে উন্নত করিতে হইলে উহার উন্নতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু দেশের শিক্ষা পরিচালনা পদ্ধতির দ্বারা ইহা স্বীকৃত হয় বলিয়া মনে হয় না।

'পল্লী উন্নয়ন' কথাটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি, সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্দেহ হয় শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও উহার প্রকৃত অর্থ অল্পসংখ্যক লোকই হৃদয়ঙ্গম করেন। যদি ইহা সত্য না হইত, তবে ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি বহু পূর্বেই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইত।

শিক্ষা ত সর্বপ্রকার উন্নতির কেন্দ্রস্থল। কিন্তু 'শিক্ষা' শব্দের অর্থ আমাদের মধ্যে কয়জন প্রকৃতরূপে জানেন, তাহাই সর্বপ্রথম বিচার্য। পরাধীন ভারতে আমরা দেখিয়াছি শিক্ষা অর্থে, কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করা ও সেই কণ্ঠস্থীকৃত বিষয়গুলি কাগজের উপর উদ্গীরণ করা এবং তাহা হইতে যে কোন জিজ্ঞাসার উত্তর অনতিবিলম্বে প্রদান করা। প্রারম্ভিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি শিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্রই ঐ একই অর্থে শিক্ষা-শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি—নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষায় পার্থক্য থাকিত শুধু পুস্তক সংখ্যার উপর। আজ ভারত স্বাধীন। আজও কিন্তু স্বল্পাধিক পরিবর্তিত আকারে শিক্ষা অর্থে তাহাই বুঝিতেছি। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কি ইহাই? যে শিক্ষা জীবনের সংগে যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিল না,

দেশের প্রাণ-ধারণে সাহায্য করিল না, দেশকে নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতির পথে লইয়া গেল না ; কেবল দুর্বোধ্য ও আড়ম্বরপূর্ণ কতকগুলি বুলি আওড়াইতে শিখাইল, তাহাই কি শিক্ষা ? আমাদের মনে হয় 'শিক্ষা' শব্দের ইহা অপেক্ষা ভ্রমপূর্ণ পরিভাষা আর কিছু হইতেই পারে না। অথচ পরাধীন ভারতে তথা বর্তমানেও আমাদের শিক্ষা এই-রূপই।

ইহা ভিন্ন অন্যদেশের অনুকরণে আজো আমাদের শিক্ষা একান্ত সহরকেন্দ্রিক। যাহারা আধুনিক শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত হন, তাহারাই প্রায় গ্রামের প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হ'ন। দেশের প্রাণস্বরূপ—পল্লীর প্রতি তাহাদের ঘৃণার অন্ত থাকে না এবং শুধু এই কারণেই পল্লীর প্রাণ আজ শুষ্ক ও নির্জীব। পল্লী কতকগুলি অজ্ঞ মূর্খ ও অন্ধ লোকের বাসভূমি ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং 'পল্লী উন্নয়ন কল্পে আমরা যাহাই করি না কেন তাহাই নিরর্থক হইয়া পড়ে অজ্ঞানতার প্রভাবে।

কোন গ্রামে মনে পড়ে না, একটা ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি। বর্তমান শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত মাত্রের-ই পল্লীর প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জাগে, যদিও তাহা অকারণ নহে। সুতরাং তথায় ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিবে কি করিয়া ? গ্রামগুলির প্রতি জনগণের যেরূপ ঔদাসিন্য, রাষ্ট্রেরও প্রায় তদ্রূপই। তথাকার পথঘাট জলাশয়, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রা প্রভৃতির যাবতীয় পরিবেষ্টনই জঘন্য ও পংগু।

সুতরাং ভারতকে উন্নত শ্রীসম্পন্ন দেখিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকে পল্লী অভিমুখী করিতে হইবে। আমাদিগকে ফিরিতে হইবে ত্যক্ত পল্লীর বুকে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ ও অনুসরণ আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, শিক্ষা দেশের ভৌগোলিক স্থিতির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে এবং যেহেতু পাশ্চাত্য পরিস্থিতি আমাদের সর্বপ্রকার পরিস্থিতি হইতে ভিন্ন, সেকারণে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিও ভিন্ন হইবে। একের পক্ষে যাহা অমৃত, অপরের পক্ষে তাহাই গরল।

সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যাপারের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন :—

প্রথম। পল্লী শিক্ষা প্রসারের প্রস্তাবনা। পল্লীর প্রতি আমাদের সহানুভূতির একান্ত অভাব। পল্লী-শিক্ষা প্রসারে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক প্রয়োজন এই সহানুভূতির। গ্রামে গ্রামে জনগণকে বুঝাইতে হইবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা যে মানুষকে অমৃতত্বে লইয়া যায়, শিক্ষা যে প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার, শিক্ষা যে জীবন-যাত্রার পথকে সুগম্য ও ও সুখপ্রদ করিয়া তোলে এই সত্য গ্রামে গ্রামে প্রচারিত করিতে হইবে। এই প্রচার কার্যে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের সাহায্য লইতে হইবে অধিক মাত্রায়। মনে রাখিতে হইবে—অজ্ঞ চিত্তে উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ সর্বদাই অধিক কার্যকারী।

দ্বিতীয়। গ্রামে উন্নত ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। আমরা দেখিয়াছি পল্লীতে উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে গ্রামস্থ শিক্ষালাভেচ্ছু সকলকেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহরস্থ বিদ্যায়তনের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহারই ফলে গ্রাম একমাত্র অশিক্ষিতের বাসস্থান হইয়া পড়ে। সুতরাং রাষ্ট্র যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া প্রয়োজন বোধে প্রারম্ভিক বেতন বর্ধিত করিয়া দিয়াও সুশিক্ষক নিয়োজিত করিয়া গ্রামে গ্রামে উচ্চ বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুশিক্ষা লাভের সুযোগ করিয়া দেং, তবে অত্যল্প সময়ে-ই পল্লীগুলি শিক্ষিতের আবাসভূমি হইয়া পড়িবে নিঃসন্দেহ। সহরবাসের ফলে যে ঘৃণা গ্রামের প্রতি হইত তাহারও নিরসন ঘটিবে।

তৃতীয়। গ্রাম্য জীবনযাত্রার সহায়। সহরে যে সকল সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া যায় যথা :—বিশুদ্ধ পানীয়, প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র ও সুচিকিৎসক, বিনা শুল্কে সার্বজনীন পাঠাগারের প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষা, গমনাগমনের সুনির্মিত পথঘাট, ডাকঘর প্রভৃতির ব্যবস্থা পল্লী অঞ্চলেও হওয়া উচিত। এইরূপ হইলে গ্রামস্থ জনগণ সুখলাভের লালসায় আর সহরের প্রতি ধাবিত হইবে না। ফলে বর্তমান পরিত্যক্ত গ্রামগুলি আবার জনসম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

চতুর্থ। গ্রামে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন। স্বল্প শুল্কে কিংবা বিনাশুল্কে রাষ্ট্রকে ইহা করিতে হইবে।

পঞ্চম। পাঠক্রম। বর্তমানে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের কোন সম্বন্ধই নাই। শিক্ষা ও জীবনযাত্রা বর্তমানে ভিন্নপথগামী। পর-অনুকরণই যে ইহার

জন্য দায়ী এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া ভারতের জীবন যাত্রার সহায়ক শিক্ষার প্রচলন অনতিবিলম্বে একান্ত প্রয়োজন। ভারতের ন্যায় পল্লী ও কৃষি প্রধান দেশে শিক্ষাকে যদি জীবন যাত্রার সহায়ক করিতে হয়, তবে-শিক্ষা কৃষি ও উদ্যোগ-কেন্দ্রিক হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষার পাঠক্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন। (ক) ফলিত বিভাগ ও (খ) পাঠ্য বিভাগ।

(ক) বিভাগে থাকিবে কৃষি, উদ্যানবিদ্যা, এবং গ্রাম্য শিল্প—(যেমন লৌহ শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, চর্ম শিল্প, বেত্র শিল্প, প্রভৃতি উটজ শিল্পকলা। শিক্ষার্থীর রুচি ও জীবিকার্জনের রুচি অনুযায়ী—যে কোন বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) বিভাগে থাকিবে সামাজিক ইতিকথা, ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক শাসন সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান। ইহা ভিন্ন থাকিবে মাতৃভাষা, ব্যবহারিক গণিত, নাগরিকতা। অনিবার্য রূপে শিক্ষা দিতে হইবে এই সব।

ষষ্ঠ। বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যচর্চার প্রবর্তন। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় গুরু ব্যায়াম ভারতে অসাধ্যের-ই কারণ হইয়া থাকে। অথচ পল্লী-বাসীকে এ বিষয়ে আলোক দিবার জন্য ব্যবস্থাই নাই। সুতরাং অভিজ্ঞ ও অনুভূতি সম্পন্ন কতিপয় শিক্ষকের উপর এ ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। তাহারা জনগণকে বুঝাইয়া এ শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করিবে। দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সুতরাং কাহার ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহাকে বাধ্যতামূলক না করিয়া, ইহার উপকার প্রদর্শন করিয়া, গ্রামবাসীগণকে এ কার্যে নিয়োজিত করিতে হইবে।

সপ্তম। যাবতীয় শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা করা। একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা সহজবোধ্য ও আনন্দ দায়ক হইয়া থাকে।

পরিশেষে শিক্ষার সহিত ধর্মের—সংযোগ যেন বিচ্যুত হইয়া না যায়—সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্র হইতে ধর্মকে নির্বাসিত করাই মনে হয় যুগধর্ম। আধুনিক শিক্ষা যে মানুষকে বহির্মুখী ও শান্তিহারা করিয়া তোলে, শিক্ষা ক্ষেত্র হইতে ধর্মের পরিত্যাগ-ই তাহার কারণ কিনা কে বলিবে। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আমরা অনুকরণ করি; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের শিক্ষার ধর্ম নীতিকে আমরা অস্বীকার করি। সে দেশের শিক্ষার নীতি বলে—

"The study of bible, already justifiable on literary grounds, has after claims for recognition in the Carriculum, Since no boy or girl can be counted as properly educated unless he or she has been made aware of the existance of a religious interpretation of life," এ প্রসংগে শিক্ষাবীর স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ করি—"Religion is the innermost Cause of Education—ধর্ম শিক্ষার আভ্যন্তরিক সত্বা। আমাদের মনে হয় সর্বধর্ম সার গীতা অধিকতর উপযুক্ত ভাবে এ স্থান অধিকার করিতে পারে।

ধর্মের সহিত শিক্ষার নিত্য যোগ কল্পে বিদ্যালয়ের নিত্য কার্যারম্ভের পূর্বে শিক্ষক ও ছাত্রগণকে একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিবার রীতি প্রবর্তিত থাকা প্রয়োজন। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ধর্ম বিষয়ে ধর্মের সহিত জীবনের সম্বন্ধ বিষয়ে, সহজ বোধ্য ভাষায়, গল্পের আকারে বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলে এ বিষয়ে সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় সার্বজনীন ভাষা

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ একটি বিচিত্রদেশ, আর বিচিত্র রকমের তার ভাষা। সুদূর প্রাচীন কালথেকেই এর এ রকম অবস্থা। প্রাচীনকালে সংস্কৃতভাষার প্রভাবে অন্য ভাষাগুলো মাথা তুলতে পারেনি। কিন্তু তথাপি কালক্রমে অশোকানুশাসনের ভাষা,পালি,প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ট ভাষাও আত্মপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলো। প্রাকৃত আরও বহুরকমের ছিল (যথা মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা-পৈশাচী, আবন্তী, প্রাচ্যা, বাহ্লীকী, দাক্ষিণাত্যা, শবরী, রন্তিকা, পাঞ্চালা) তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোনটিই কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলো না। মগধরাজ শিশুনাগ, শূরসেনরাজ কুবিন্দ, কুন্তলরাজ সাতবাহন এবং উজ্জয়িনীরাজ সাহসাঙ্ক তাঁদের অন্তঃপুরে এক রকম ভাষা প্রয়োগ করবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এ কথা রাজ-শেখর (৯ম শতাব্দী) তাঁর কাব্যমীমাংসায় উল্লেখ করে গেছেন :—

"শ্রূয়তে হি মগধেষু শিশুনাগো নাম রাজা। তেন দুরুচ্চারান্ অষ্টৌ বর্ণান্ অপাস্য স্বান্তঃপুর এব প্রবর্তিতো নিয়মঃ। টকারাদয় শ্চত্বারো মূর্দ্ধন্যাস্তৃতীয়বর্জম্ উষ্মাণস্ত্রয় ক্ষকারশ্চেতি॥"

"শ্রূয়তে হি সুরসেনেষু কুবিন্দো নাম রাজা। তেন পরুষসংযোগাক্ষরবর্জম্ অন্তঃপুর এবেতি সমানং পূর্বেন॥"

"শ্রূয়তে চ কুন্তলেষু সাতবাহনো নাম রাজা। তেন প্রাকৃতভাষাত্মকম্ অন্তঃপুর এবেতি সমানং পূর্বেণ॥"

"শ্রূয়তে চোজ্জয়িন্যাং সাহসাঙ্কো নাম রাজা। তেন চ সংস্কৃতভাষাত্মকম্ অন্তঃপুর এবেতি সমানং পূর্বেণ॥"

সুতরাং ভাষাগত অসুবিধা প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে ছিলো। কিন্তু তখন সংস্কৃতের প্রভাব বেশী থাকায়, সংস্কৃতের মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকের সঙ্গে সকলে কথাবার্তা বলত। এমনকি তাতেও অসুবিধা বোধ করায়, কোন কোন রাজা তাঁদের রাজ্যে একটা সার্বজনীন (কৃত্রিম) ভাষা করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্ততঃ রাজশেখরের কাহিনীটুকু সেকথারই ইঙ্গিত দেয়।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, জাতীয় জীবনে ভাষার একটা বিশেষ স্থান আছে। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটা সার্বজনীন বা আন্তর্জাতিক ভাষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

'আন্তর্জাতিক ভাষা' বলতে আমরা সাধারণতঃ সে ভাষাই বুঝে থাকি, যা পৃথিবীর সব মানুষ সমভাবে বুঝতে ও বলতে পারে। এই এক 'বিশ্বজনীন ভাষা'র অবস্থান দু' প্রকারে হতে পারে—স্বাভাবিক নিয়মে, অথবা কৃত্রিম উপায়ে। ভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও স্বাভাবিক গতির দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় যে, সুদূর অনাদি অনন্ত কাল হতেই পৃথিবীতে বহুভাষা বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন ভাষা বা ভাষা-গোষ্ঠী হতেই আজ পৃথিবীতে উপভাষা সহ প্রায় তিন হাজার সংখ্যক ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মে যখন একটি ভাষা 'আন্তর্জাতিক ভাষা' হিসেবে খ্যাতিলাভ করতে পারেনি, তখন অন্য উপায়ে কোনও এক ভাষাকে আন্তর্জাতিকরণের চেষ্টা চলেছিল পাশ্চাত্যভূখণ্ডে। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুদূর অতীতে Francis Bacon, Descartes. Francis Lodurch (লোদুর্খ), Thomas Urquhart (উরকুহার্ট), Cave Beck, Dalgarnos (দলগারনোস্), Bishop Wilkins, Sudre প্রভৃতি মনীষিগণ লাতিন, কোইনে গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, classical arabic, negro affrica, hausa মধ্যযুগের ফ্রাঙ্কো-ফেনেটিয়ান্, রোমান্স, ইংরেজী ইত্যাদিকে আন্ত-র্জাতিক ভাষা হিসেবে গণ্য করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে ইংরেজীর, শব্দাবলীকে সরলকরে সি, কে, অগডেন মহাশয় 'basic English' প্রচার করেছিলেন। কিন্তু কোনও একটা দেশ বা জাতির ভাষাকে সমস্ত

পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে গণ্য করান সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কাজেই তাঁদের প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি।

বিশ্বমানব যাতে সহজ শিক্ষায়, স্বল্প আয়াসে, ব্যাকরণের জটিলতা দূর করে,অল্পসংখ্যক শব্দাবলীর মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের সহিত কথাবার্তা বলতে পারে—এক সূত্রে গ্রথিত হতে পারে—সে উদ্দেশ্যে গত শতাব্দী হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা কৃত্রিম নবীন আন্তর্জাতিক ভাষার সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে। ভাব ও কল্পনা এবং কার্যকারিতার দিকে লক্ষ্য রেখে জার্মাণ ক্যাথলিক ধর্মযাজক যোহান্ মার্টিন শ্লেয়ের ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কৃত্রিম ভোলাপুক (volapuk) ভাষার প্রচার করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—Menade bal puki bal, অর্থাৎ এক বিশ্বমানবের জন্য এক ভাষা। এই ভোলাপুক বা 'পৃথিবীর ভাষা'র অবস্থান কালেই সেন্টমাস্কের বোপাল, বয়ের এর স্পেলিন, ফীওয়েগের এর দিল, দোরময় এর বালটা, আরনিমের ভেন্টপাল এবং বোল্লাকের লাং ব্লু প্রভৃতি বহু কৃত্রিম ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু কোন ভাষাই বেশীদিন থাকতে পারেনি। লড উইগ লাজারুস জামেনহোফ এর 'এস্পেরান্তো' পূর্বোক্ত সব আন্তর্জাতিক কৃত্রিমভাষাকে পরাভূত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো। ঠিক এমনি ভাবেই পিয়ানোর 'লাতিনে সিনে ফ্লেক্সিওনে', হগরেনের 'ইণ্টারগ্লোসা' এবং ইয়েস্পেরসনের 'নোভিয়াল' একে একে মাথা তুলে দাঁড়ালো। তা' ছাড়া ইদো ইডিওম নিউট্রাল গ্লোরো, রো, মোং লিন—আরও কতকি একে একে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলো। তা' ছাড়া, গত শতাব্দীতে বিভিন্ন উপায়ে অনেক কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি করে একটা সার্বজনীন ভাষা করবার চেষ্টা চলছিলো। সে উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ জারগণ, ফ্রেঞ্চ জারগণ, স্প্যানীস জারগণ, ইতালীয়ান্ জারগণ, চিনুক্ জারগণ, এমনকি ইংলিস্ জারগণেরও সৃষ্টি হয়েছিল। পরে তা' থেকে আবার পিজন ইংলিস ও বীচলামার এর উৎপত্তি হয়েছিলো। শুধুকি তাই পিজন ইংরেজীর অনুকরণে পিজন মালয় (যাকে pasar বা bazaar মালয়ও বলে), ফ্রেঞ্চ ও পর্তুগীস পিজন, তাগালোগ স্প্যানীস-পিজন এবং নিগ্রো ইংলিসও হলো। ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেল। এ ভাবে পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে আরও কত ভাষাকে সাধারণীকরণের জন্য চেষ্টা চলেছিলো তার আর ইয়ত্তা নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ্ বাসিগণ আফ্রিকাআন্‌স্‌কে যেরূপ মূল্য দিয়েছিলো, ঠিক সেরূপ মূল্য দিল পশ্চিম আফ্রিকায় পর্তুগীস্‌কে এবং ডাচ্ গিনিতে টাকী-টাকী বা নিগ্রো তোঙ্গোকে। এরূপে জির্ত তোঙ্গো, গুল্লানিগ্রো, আরাওয়াক, কবীর, গুম্বো বা ক্রিওলে ফ্রেঞ্চ এবং আরও কত কি ভাষা সার্বজনীনতার দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কালের কপোলতলে এদের অস্তিত্ব আর রইলনা। কারণ এগুলো সবই পণ্ডিতের খেয়াল খুশী মত বা বিচারমত গড়া কৃত্রিমভাষা। স্বভাবজাত বা সিদ্ধভাষা নয় বলে এগুলোর প্রাণ বা জীবনী শক্তি ছিলনা। মানুষের মনো মরুভূমিতে প্রবেশ করতে না করতেই শুকিয়ে বিলীন হয়ে গেল। তাদের জন্ম জানল বটে, কিন্তু অবস্থানের অনুভূতি হলনা! তা ছাড়া, এ সমস্ত ভাষার একটা মস্ত রকমের ত্রুটী ছিল। এগুলো সবই ইউরোপীয় আবহাওয়ায় তৈরী হয়েছিল। ভারতীয় পরিবেশে এরা কোন দিনই মানুষ হয়নি। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে এগুলোর একটিও প্রযোজ্য নয়।

বর্তমান ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে একথা অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে জনগণের হিতার্থে ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক ও প্রকাশক এরূপ একটি ভাষার দরকার, যা ভারতবাসী সহজেই বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারবে। এই "নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা" জনগণের যত বেশী উপযোগী ও কার্যকরী হবে, ভারতের তাবৎ রাজকার্য পরিচালনার পক্ষে তত বেশী সুবিধে হবে কিন্তু ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কোনও একটি প্রচলিত ভাষার সহ-অবস্থান, কতটা কার্যকরী তা একবার ভেবে দেখা দরকার।

এখানকার ভাষাসমূহ আলোচনা করে দেখা গেছে যে, ভারতবর্ষে মূলতঃ চারটি ভাষাবর্গের অবস্থান আছে—(১) ইন্দো-ইউরোপীয়, (২) দ্রাবিড় (৩) অষ্ট্রো এশিয়াটিক, এবং (৪) ভোটীয়-চীনীয়। এ সকল ভাষাবর্গের অন্তর্গত যে সমস্ত ভাষা ও উপভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে,তাদের সংখ্যা হলো ৮৫৪। এর মধ্যে ৩৪৫টি

ইরানীয় ৩৬টি দার্ডিক এবং ৪৬টি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। ভারতের রাষ্ট্রভাষা বিচারে এদের ধরবার কোন সার্থকতা নেই। ভারতের ভাষাজীবনে এদের প্রভাব থাকলেও প্রসার অত্যন্ত অল্প। এ ছাড়া, আরও প্রায় ২৪টি ভাষা অন্যভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো আধুনিক কালে আগত অল্প সল্প লোকের মধ্যে সীমিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু যে ভাষা সভ্যতার অগ্রগতিতে, সংহতি শক্তিতে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সুনিয়ন্ত্রিত, 'নিখিল ভারত রাষ্ট্র ভাষা' বিচারে তাদেরি মর্যাদা বা স্থান আছে। সে দিক দিয়ে দেখলে মাত্র ২১টি প্রধান সাহিত্যিক ভাষাকেই স্বীকার করে নিতে হয়। এগুলো সাহিত্যে ও শিক্ষায় এবং পরিবার ও বিশিষ্ট সমাজের বাহিরে অবস্থিত বৃহত্তর জীবনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ভাষা গুলির মধ্যে—(১) বাঙ্গালা, (২) আসামী, (৩) উড়িয়া (৪) মৈথিলী (৫) ভোজপুরী (৬) আবধি (৭) বুন্দেলী, (৮) হিন্দী, (৯) উর্দু (১০) হিন্দোস্তানী (১১) মারাঠী, (১২) রাজস্থানী, (১৩) গুজরাটী (১৪) সিন্ধী, (১৫) পাঞ্জাবী, (১৬) কাশ্মীরী, এবং (১৭) নেপালী আর্য গোষ্ঠীর অন্তর্গত। আর, (১৮) তেলুগু (১৯) কানাড়ী, (২০) তামিল, ও (২১) মালয়ালম্ দ্রাবিড় গোষ্ঠি ভুক্ত। ধ্বনিতত্ত্বে ও রূপতত্ত্বে এবং বাক্যরীতি ও শব্দশক্তিতে একে অন্য হতে পৃথক্। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কোনও একটি প্রচলিত ভাষা ভারতের জাতীয় জীবনের ঐক্যের বিধায়ক হবে কিনা, তার বিচারের ভার ভবিষ্যতের ওপর।

আমাদের মনে হয়, ভারতের মত বিশাল বহু ভাষাময় ও জনবহুল দেশে অন্ততঃ পক্ষে দুই বা দুই এর অধিক ভাষা রাষ্ট্রকার্যে ব্যবহৃত হলে ভাল হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কথা বিচার করলে এর নজির কিছুটা মিলবে। এমন অনেক রাষ্ট্র আছে, যেখানে দু-দুটি করে ভাষা রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—আফ্‌গানিস্থানে ফারসী ও পোষ্‌তো ; সুইজারল্যাণ্ডে জরমান, ফরাসী, ইতালীয়ান ও রেতো রোমান ; কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী, বেলজিয়ামে ফরাসী ও ফ্লেমিশ ; এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজী ও আফ্রিকান্‌স্ সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রেও এটা প্রচলিত হতে পারে। ভারতের জনগণের 'মাতৃভাষা' যার যেমনটি আছে, ঠিক তেমনটিই থাকবে, উপরন্তু একটা কৃত্রিম সহজ ও সরল ভাষার তৈরী করতে হবে, যা হবে ভারতের 'এস্পেরান্তে'। ভারতের প্রধান ভাষার শব্দাবলীতে অনেক সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার আছে। এ সকল ভাষা থেকে, আবশ্যকমত বিদেশীয় ভাষা থেকেও, শব্দ সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে যুগোপযোগী সহজ ও সরল সংস্কৃত প্রভাববহুল কোনও এক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা যেতে পারে কিনা, তাও একবার ভেবে দেখা দরকার। জনগণের মাতৃভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হলে, এ ভাষা গ্রহণে কারও কোন আপত্তি হবেনা। আপাততঃ এটা ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহক এবং ধর্ম ও কর্মের সহায়ক হবেনা। এ ভাষা হবে কেবল ভারতের রাষ্ট্রের রাজকার্যের ভাষা। কর্ম ক্ষেত্রে, ব্যবসারক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে এ ভাষা হবে বলবতী। প্রদেশ হতে প্রদেশান্তরে এর সাহায্যেই ভারতীয় জনগণ নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করবে ; এর মাধ্যমেই তাদের জাতীয় জীবনের ঐক্য ঘটবে। এ ভাষাটি এমন হবে যে এর কর্মশক্তি, প্রসার-শক্তি ও অধিকারশক্তির ওপরেই এর প্রতিষ্ঠা ও সর্বজনীনত্ব নির্ভর করবে। এভাবে যদি নিখিল ভারত এস্পেরান্তো ভাষার সৃষ্টি হয়, তা হলে ভারতবর্ষ একটা ভাষা-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও হবে। ভারতের জাতীয় জীবনে এরূপ একটি সর্বজনীন ভাষার প্রয়োজন আছে।

তা ছাড়া, শিক্ষাও সংস্কৃতিমূলক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য সংস্কৃতকেও রাখতে হবে তার যথোপযোগী মর্যাদা দিয়ে। প্রয়োজন বোধ হলে যাতে এ ভাষায়ও মানুষ কথা বলতে পারে তারও ব্যবস্থা রাখতে হবে। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবশ্য সংস্কৃতকে একটু সরল ও সহজ করতে হবে। প্রয়োজন বোধে বিদেশীয় শব্দকে সংস্কৃত করে নিতে হবে। ভারতবাসীর সংস্কারে ও কথাবার্তায় সংস্কৃতের ছাপ বিদ্যমান। ইংরাজী জনগণের ভাষা না হলেও শিক্ষার ভাষা হতে কোন আপত্তি নেই। ভারতের ভাষা সমস্যা ব্যাপারে সংস্কৃতবহুল কৃত্রিম ভাষার কোন স্থান আছে কিনা—তাহা জনমতের অপেক্ষাধীন।

আনাতোল ফ্রাঁস

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

যে একটিমাত্র প্রতিভাকে সমগ্র ফরাসী গদ্য-সাহিত্যের মুকুটমণি এবং 'ফরাসী' শব্দেরই প্রায় সমার্থক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে তিনি আনাতোল ফ্রাঁস। ক্লাসিকাল কাব্যে অনুরূপ মর্যাদা দাবি করতে পারেন আর একজন —অতুলনীয় রাসীন। রাসীন দিয়েছেন ফরাসী মনের দার্ঢ্য, সামর্থ্য,সমুচ্চতা, স্বচ্ছতা—ভাষা তাঁর হাতে পেয়েছে সংযমের পরাকাষ্ঠা, অব্যর্থ গতি। আনাতোল দেখিয়েছেন ফরাসীর বহুধারা—তাঁর রহস্য-প্রিয়তা, তাঁর শ্লেষোক্তি, তাঁর সরল ও সুঠাম ভাষায় এনেছে এক বহুবর্ণিল প্রাণবন্যা; চিন্তায় সমৃদ্ধি এবং ভাবে অতলস্পর্শী গভীরতা সত্ত্বেও তাঁর হাতে বাণীশিল্প হয়েছে লঘুপক্ষ; তাঁর পরিচ্ছন্ন মন কোথাও অস্পষ্টতা কিছু রাখেনি, কোথাও অসংলগ্নতা ও অবহেলার স্থান হতে দেয়নি।

যুক্তিবাদিতা আর স্বচ্ছচিন্তা ফরাসী মনের বিশেষত্ব, ফরাসী-গদ্যের বিশেষ গুণ বললেও চলে। আনাতোল ফ্রাঁস ফরাসীর হয়ে পেয়েছেন উভয় গুণই—একটু আধটু নয়, পরিপূর্ণ মাত্রায়। তিনি আবার স্বদেশ অতিক্রম করে হয়েছেন বিশ্বের প্রতিনিধি, আধুনিক বিশ্বমানবের প্রতিনিধি। কি রকমে? আধুনিক মনের প্রকৃতি কি সেটি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নে আর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে আধুনিক মন হল উগ্র 'বৈজ্ঞানিক'—অর্থাৎ মস্তিষ্কচারী যুক্তিবাদী, সে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যুক্তির পরম্পরা বেয়ে—এক বা একাধিক জানা থেকে নূতনতর সত্যে। এই বিচারসিদ্ধ জ্ঞান হল নিষ্কাশিত সত্য—ইন্‌ফারেন্সিয়াল্ নলেজ। কিন্তু খণ্ডসত্যের উপর, জড়ের উপর বনিয়াদ করে অসীম ও অখণ্ড সত্যের দিকে মানুষী অনুসন্ধিৎসার অভিযান বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান এক ক্রমবৃদ্ধির এবং ক্রমপরিবর্তনের ধারা বেয়ে তাকে সংশয়াকুল করে তোলে। যা ছিল চিরসত্য, অব্যয়, অক্ষয়, তা হয়ে দাঁড়ায় দেশকালপাত্রনির্ভর সত্য, আংশিক সত্য। আর যা মাত্র এখানে সত্য, একক্ষেত্রে সত্য, অন্যখানে বা অন্যক্ষেত্রে সত্য নয়, তাকে পূর্ণ সত্যই বা বলি কি করে? তা মিথ্যারই নামান্তর। শেষ কথা তাহলে জানা যায় না, শাশ্বত সত্য বলেও কিছু পাই না। যা আছে বা যা পাই, তা সাময়িক সত্য—আগামী কালের নূতনতর জ্ঞান ও বৃহত্তর সত্য তাকে যে নাকচ করে দেবে না তাও বলা যায় না। সন্দেহবাদের স্কেপ্‌টিসিজমের এই হল রহস্য। অগম্য অলব্ধ দূরের কাছে ব্যর্থ হয়ে মানুষ শেষে হয়ত একেবারে হতাশ হয়, নয়ত একটা দুরন্ত ক্ষোভের বশে একান্ত নিকটের কাছেই অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করে—জড়ের পূজারী হয়।

বুদ্ধির চর্চা করে বিচারের সূক্ষ্মতম ধারা বেয়ে বিজ্ঞানী মনের চূড়ায় পৌঁছিলেন আনাতোল। তারপর জড়বাদীর সন্দেহফল ভক্ষণও করলেন। এক ইহসর্বস্ব জীবন-দর্শন তাঁকে তখন গ্রাস করল। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে রিক্ততার মধ্যে তাঁর হল নবজন্ম। যে সৌন্দর্য-বোধ, যে শুচিশুভ্র আনন্দ হৃদয়ে চাপা পড়েছিল তর্কের ধুলাবালিতে তা সামান্য অনুকূল মৌসুমী বায়ু পেয়ে শতদল মেলে ধরল। একদা তিনি বলছিলেন, মানুষের সার্থকতা আত্মক্লেশের কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিয়ে নয়, উদাসীন শুষ্কতার মধ্যে দিয়ে নয়; তিনি বলছিলেন তা সুন্দরের মধ্যে দিয়ে আনন্দের উপাসনায়। প্রচলিত ধর্মাচারের বিরুদ্ধে 'তাইস'-এর বাণী এই বিপ্লবের বাণী। তাইস মূঢ় পাফনুসিয়াসদের জন্যে সে বাণী রেখে গিয়েছে—তার যৌবন রসোচ্ছিন্ন অনুপম তনু মৃত্যুর কোলে উৎসর্গ করে।

তারপর আনাতোল যেন ছাড়িয়ে গিয়েছেন ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ, জড়ের সীমানাও। তাই বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় এসে তিনি বললেন—

"দিনের প্রকাশ হতে আমার মনও একখানি শ্বেত পদ্মফুলের মতো নিজেকে খুলে ধরল, আমি জানলাম

আমাদের দুঃখ-দুর্দশার মূল বাসনা—সেই বাসনাই আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে জিনিসের সত্যরূপ দেখতে দেয় না ; বিশ্ব-বিষয়ে এই সত্যদৃষ্টি যদি পেতাম আমরা—তবে দেখতাম যে আকাঙ্ক্ষা করবার নেই কিছুই, আর তাহলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশারও হত অবসান…নিরহঙ্কার হও, হও বিনম্র, মধুরস্বভাব। প্রবৃত্তি হল যেন মৃত্যু অক্ষৌহিণী সেনা—যেমনভাবে মত্তহস্তী খড়ের ঘর নিস্পিষ্ট নিশ্চিহ্ন করে তেমনি তাদের ধ্বংস কর। বাসনার সহস্র ভোগ্যবস্তু পেয়েও তোমার তৃপ্তি হবে না, সমুদ্রের সমস্ত জল দিয়েও যেমন নিবৃত্তি হয় না তৃষ্ণার।"

জড়বাদীর রাজ্য থেকে এখানে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি অন্তর্লোকে। যুক্তিবুদ্ধির চেয়ে অন্য এক জিনিস প্রধান হয়ে উঠেছে এখানে—তা উপলব্ধিগম্য, তা চলে হৃদয়ের অন্তস্তল বেয়ে, বুদ্ধির ওপারে।

কিন্তু এ কী হল? আধুনিকের সত্য দর্শনের সঙ্গে অহঙ্কারের, ঔদ্ধত্যের, ক্রূরতার, বাসনার কী সম্পর্ক? শিল্পী তাহলে প্রবেশ করেছেন সত্যোপলব্ধির জগতে—তারই জন্য প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি। সমষ্টিগত জীবনে যে আদর্শের অনুসরণ তারও মূলসূত্র এইখানে—বিপ্লব বাহিরের নয়, আকারের প্রকারের নয়, অন্তত ততখানি নয়, যতখানি ভিতরের, ব্যক্তির মধ্যে, তার প্রকৃতিতে ও গঠনে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর শেষ উপন্যাসের (La Revolte des Anges বা 'দেবদ্রোহ') উপসংহার করছেন আনাতোল এই অর্থপূর্ণ কথাগুলি দিয়ে :

"আমাদের কৃতিত্বে সেই বুড়ো অথর্ব ভগবান এখন পৃথিবীরাজ্য থেকে গদীচ্যুত, আর এই বিশ্বে সকল চিন্তাশীল জীবই তাকে অবজ্ঞা কিম্বা ডোণ্টকেয়ার করে। কিন্তু মানুষ ইয়ালদাবাওথকে না মানলেও বড়ো একটা কাজ করে না যদি সেই ইয়ালদাবাওথের প্রেতমূর্তিকেই ভিতরে আসন দেয়, যদি তারই মতো স্বভাব পায় সে—পরশ্রীকাতর, নিষ্ঠুর, কলহপ্রিয়, দেহলোভী, শিল্প সৌন্দর্যের শত্রু ; কী লাভ সেই হিংস্র বিশ্বস্রষ্টাকে তাড়িয়ে যদি মানুষ কর্ণপাতই না করে মিত্র দেবশক্তিদের—ডায়োনিসস্, আপোলো এবং 'মিউজ' দেবীদের—অমৃত ভাষণে ? আমাদের ক্ষেত্রে—আমরা, যারা স্বর্গের প্রাণী, অপার্থিব দেবশক্তি—আমরা আমাদের অত্যাচারী ইয়ালদাবাওথকে কেবল তখনই বিনাশ করতে পারব যখন আমাদের ভিতরে অজ্ঞানতা এবং ভয়কে বিনাশ করতে পেরেছি।"

ভারতীয় উপনিষদ এবং প্রাক্-উপনিষদদ্রষ্টারাও বলতে পারতেন এই কথা—অজ্ঞানই মানুষের শত্রু, মানুষের ঊর্ধ্বগতির অন্তরায়, আত্মবোধের পথে প্রধান বাধা। আধুনিকের হয়ে আনাতোল শেষে আকর্ষণ করছেন সমস্যার এই একেবারে মূল ধরে। উত্তরণের বা উদ্ধারের পথ তিনি অবশ্য সাধক দার্শনিকের ভঙ্গি ও ভাষায় প্রকট করে দেন নি, তবে প্রবুদ্ধ শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তার আভাস ও ইঙ্গিত দিয়েছেন, আর আরম্ভ করবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট—অহংকারনাশ, সাত্ত্বিকগুণের চর্চা, বাসনা-কামনা বর্জন, জ্ঞানের উদ্রেক এবং ভয় পরিহার। এই রকমে শান্ত স্থির হৃদপদ্ম উপরের আলোর অজস্র ধারা বর্ষণে পুষ্ট হয়ে আপন সহস্র দল মেলে—উপমাটিও ইন্দ্রিয়বিলাসী যুরোপের মনীষী নিয়েছেন মনে হয় যেন ভারতীয় সাধনার প্রাচীন ঐতিহ্য-ভাণ্ডার থেকে।

নিঃসঙ্গ সুর

জীবেশ মৈত্র
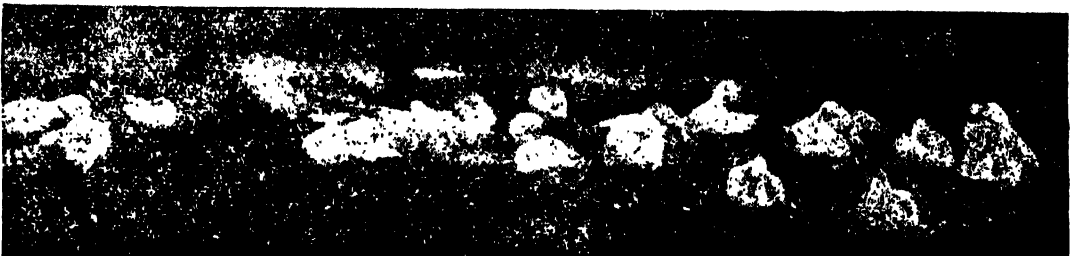
গাঁশুদ্ধ লোক জানে ভুপেটা চিরকেলে গোঁয়ার। যেমন গোঁয়ার তেমনি বেকুব। না হলে ১৯৪৭ সালের পর এত জল ইচ্ছামতী দিয়ে গড়িয়ে গেলেও কিনা হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানের ফারাকটি বোঝেনা?

বল্লেই বলবে—চ্যাংখালি আর দৌলতগঞ্জ এর মধ্যে ফারাকটা হয় কি হিসাবে শুনি? চেরডা কাল একসঙ্গে উঠাবসা, চাষ আবাদ.আর আজ হল দৌলতগঞ্জ পাকিস্থান, আর চ্যাংখালি হিন্দুস্থান?···ওসব বাপু আমার মাথায় ঢোকে না।

শোন একবার কথা! সাধে কি আর···আচ্ছা সেদিনের কথাটাই বলি তাহলে। বৃষ্টি হয়েছে কদিন আগে। জমিতে 'জো' বসেছে। বোশেখ মাসের 'জো' বলে কথা। এবেলা 'জো', তো ওবেলা মাটি টান। চাষার মনটাও অমনি। বলে, যম যদি আসে তাকেও বসে থাকতে হবে। চাষা বলবে—ডে'ড়াও, আগে 'জো' রাখি তারপর অন্য কথা।

ভুপে উঠেছে সেই রাত থাকতে। সুয্যি ঠাকুরের তখন বাড়ী কোথায়? এমন কি পূবে ফর্সাও দেয়নি, কাক কোকিল ডাকেনি। কেবল মুশলমান পাড়ায় এখনও যে দু এক ঘর মানুষ আছে, তাঁদেরই কারুর মটকায় মোরগ দু' একবার বাক্ দিয়েছে।

সেই তখন ভুপে ঘুম থেকে উঠেছে। বলদ দু'টোকে ঘানি পানি খাইয়ে বেরুবে—তার আগেই লক্ষীমণি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। খুঁটে বাঁধা এক পালি মুড়ি আর একটু গুড় শুদ্ধ গামছাখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে জলের ঘটিটা এগিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়। হুঁকো, কলকে আর বিচুলির লুটি গুছিয়ে না দিলে আবার কার কাছে যাবে তামাক খেতে?

এ সব ব্যাপারে লক্ষ্মমণির এতটুকু এদিক ওদিক হয় না। তার পর ভুপের একখানা হাত চেপে ধরে মিনতি করে, এট্টু সকাল সকাল ফিরো আজ। শরীরডাও তো দেখতে হয়?

এ কথা শুনলে রাগ হয় না কোন সুমুন্দির? ভুপে বলে—জমি কি তোর বাপের যে. যা বলবি তাই? বলেই এক ঝটকায় লাঙ্গল কাঁধে ফেলে সে রাস্তায় পা বাড়ায়। গাঁ ছাড়িয়ে যখন সে মাঠের কিনারে, তখন একরকম তাকে চমকে দিয়েই যেন বাঁ দিকের আম গাছে একটি কোকিল ডেকে ওঠে, দেখা দেখি কাক, কোকিল, ঘুঘু, শালিক, বটের আরো যে কত পাখী! যেন পাখীর রাজ্যি। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দরজা খুলে এক চিল্‌তে ঝিরঝিরে হাওয়া ভেসে আসে। আঃ! প্রাণ মন যেন জুড়িয়ে যায়।

যাবেনা? দেবতারা যে অন্তরীক্ষে হাওয়া খেতে বেরোন এই সময়। বাপ পিতামহ আমল থেকে এর কোন ব্যাত্যয় নেই। লাঙ্গল নামিয়ে ভুপে এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবে। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত সময়ও কি আর নষ্ট করবার উপায় আছে?

উঠে লাঙ্গলে গরু জুতে সে মনে মনে মা ধরণীকে প্রণাম করে। সেই সঙ্গে তার মাঠের কাজ শুরু। গরুর ল্যাজে একটা মোচড় দিতেই লাঙ্গলের ফলাটা বসে যায় মাটির মধ্যে।

ইতিমধ্যে পুবদিক আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে-কাঁচের মত স্বচ্ছ। অন্য সব পাখীর স্বর ছাপিয়ে একটি কোকিলের গলা কেবলি পরদায় পরদায় চড়ছে। আর তার সঙ্গে পাল্লাদিয়ে রোদের তেজ।

ভুপে যখন জোয়াল থেকে গরু দুটোকে ছেড়েদিল তখন সূর্য্যিদেব ঠিক মাথার ওপর। সেই কোন ভোরে

উঠে এই তিনপোর বেলা পর্য্যন্ত নাগাড়ে লাঙ্গল চষা বড় চাট্টিখানি কথা নয়। তবু যে ধান জমিটার তেয়ার শেষ করতে পেরেছে এতেই সে খুসী।

গরু দুটোকে ছেড়ে দিয়ে এসে ভুপে একটু বসলো উত্তরের বাবলা গাছের ছায়ায়। সবে দু' একটা ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে গাছে। দু' চারটে হলুদ ফুল তার আশে পাশেও ছড়িয়ে আছে।

একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল সে। আর যায় কোথায়? যা হবার তাই হল। কুলেটা যে এখনও সাঁয়া, সে কথাটাও কি একবার মনে হল না তোর? যখন খেয়াল হ'ল তখন কুলে পগার পার বর্ডারের পিল্লে পেরিয়ে একেবারে দৌলতগঞ্জের সীমানায়। সঙ্গে সঙ্গে ভুপেও উঠে দে ছুট। কিন্তু তার একবারও মনে হল না যে ওটি হিন্দুস্থান নয়—পাকিস্থান।

কিন্তু সে কুলের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন? সারাদিন লাঙ্গলটেনে এমনিতেই পা দুটো ন্যাতা। আর কুলেও হয়েছে তেমনি। যেন তাকে ব্যঙ্গ করেই দ্বিগুণ জোরে ল্যাজ তুলে ছুটতে সুরু করল।

এমন সময় সামনে ছাদেরকে দেখে ভুপে যেন হালে পানি পেল। চেঁচিয়ে বল্ল—ছাদের ভাই, গরুডা ফিরাও।

শুনে ছাদের লাঙ্গল ছেড়ে এলো। কুলেকে বাগার দিয়ে বলল—তা হ্যারে ভুপে, তুই যে বড় এপার এয়েচিস? আন্‌ছাররা দেখলে সে এখুনি ধরবে।—

আরে ফেলে থোও তোমার আনছার। আমার নাম ভুপে বিশ্বাস। আমারে ধরবে আনছার?

কিন্তু গ্রহের ফের দেখো। তার মুখের কথা শেষ না হতেই তিন্ তিনটে জলজ্যান্ত আনছার। ছাদের বল্‌ল—ভুপে এই বেলা পালা শিগগিরি।

—ওরা কারা ছাদের ভাই।

—আনছার! বাঁচতে চাসতো পালা এই বেলা। ভুপে আর কথা বাড়াল না। কুলের ল্যাজে কসে একটা মোচড় দিয়ে দিল এক ছুট। এপার চলেও এসেছিল ঠিক। কিন্তু ঝোপের মধ্যে যে একটা খানা আছে সেটা আর তার নজরে পড়েনি। পড়বি তো পড় একেবারে সেই খানার মধ্যে।

ছাদের ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখেছিল। অনেকক্ষণ তাকে উঠতে না দেখে সে মহা ফাঁপরে পড়ল। ভুপে যেখানে পড়েছে, সেটা হিন্দুস্থানের মধ্যে। নজরের মধ্যে ব্যাপারটা, কিন্তু হলে হবে কি? এযেন পাহাড় পর্ব্বতের ব্যবধান।

তবু মানুষের মন বলে কথা। আজই না হয় ওটা হিন্দুস্থান; তা হলেও তো এতদিনকার একটা চেনাশোনা দহরমমহরম। এখন সে করে কি?

আর একটু চেঁচিয়ে ডাকল—ভুপে! তোর হ'লটা কি? পড়ে যে আর উঠছিসনে? বেশী জখম হয়নি তো?

—মন লাগছে পা-টা বোধ হয় একেবারেই গিয়েছে ছাদেরভাই। আমাকে এটুসখানি ধর।

…এমন বিপদে কি মানুষে পড়ে?

ছাদের বল্‌ল—শেষে যদি কেউ দেখেটেখে ফেলে?

…কেউ দেখবে না। তুমি এট্টুসখানি ধরে দাঁড় করিয়ে দাও। দেখি যদি কোন রকমে যেতে পারি।

আর্তনাদের মত শোনায় ভুপের কথাগুলো। ছাদের অস্থির হয়ে উঠল। সতর্ক চোখে একবার সে চারদিকটা তাকিয়ে দেখল।…পুলিশ-টুলিশ তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ছাদের ভাবল, বেরিয়ে তো পড়ি, তারপর যা করে আল্লা।

অতি সতর্ক উত্তেজনায় এক পা, দু'পা করে এগিয়ে গেল ছাদের। নিশ্বাসের সঙ্গে যে বুকের উঠাপড়া তারই টিপটিপানি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে নিজের কানে। ভারী পা ফেলে ফেলে সে যেন এক অজানা অরণ্যে ঢুকতে যাচ্ছে।

অরণ্য যে, তাতে তার ভুল নেই। ছাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অনুমান করতে পারলো না যে, তিনজোড়া শ্বাপদ চক্ষু তাকে অনুসরণ করছে। কর্কশ জিভে থাবা চেটে প্রস্তুত তারা।

শেষ পর্য্যন্ত ভুপের কাছে পৌছতে পারল না ছাদের। মাঝ পথে এসে হঠাৎ তার চলা থেমে গেল। মনে হল আকাশখানা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।··গুড়ুম গুম্। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া অন্ধকার।

আওয়াজ শুনে ভুপে চমকে উঠে মাথা উঁচু করে একবার দেখতে চাইল ব্যাপার। উঃ! ধরণী একেবারে রক্তে লাল।

একে সারাদিন অসহ্য খাটুনি। এখন পর্য্যন্ত পেটে কিছু পড়েনি বল্লেই হয়। তার উপর দুরন্ত আঘাত। ভুপে আর সহ্য করতে পারল না। মাথার মধ্যে তার ঝিমঝিম করে উঠল, তারপর সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

বোশেখ মাসের সূর্য্য মাঝ আকাশ পেরিয়ে গিয়েছে। তামাটে আকাশখানাকে যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

একটা ঘুঘু ডাকছিল দূরের বাবলা গাছে।…ঘুঙুর-ঘুঙ্, ঘুঙুর-ঘুঙ্। কোন বিদেহী আত্মা যেন একান্তে অশ্রু ঝরিয়ে চলেছে এই রুক্ষ প্রান্তরে।

সে সুর কারও কানে পৌছুল না।

সাহিত্যের সন্ধান

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরবো না গো আর
তোমারে করি নমস্কার

নমস্কার করি আপনাদের, মায়েদের, ভায়েদের, গুণীজ্ঞানীদের, সাধু-সজ্জনদের, আমার কবি বন্ধুদের, আর রেখে যাই আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি এই শ্যামলা দেশের মাটিতে, বিশ্বময়ীর আঁচল যেখানে পাতা, সব পরিচয়গ্রাসী নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে—যার সঙ্গে আমার নাড়ীর ঘনিষ্ঠতা, রক্তের যোগ, স্নেহের টান, ভালবাসার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মনে পড়ছে আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে কবিগুরু এক অপূর্ব উন্মাদনার দিনে ভায়ের হাতে রাখী পরিয়ে বলেছিলেন—একবার তোমার চিত্তকে প্রসারিত করে দাও, হিমাচলের পাদমূল হতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত থেকে শৈল-মালা বন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত - আজ বাংলা দেশের সমস্ত ছায়াতরু নিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারায় অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দেমাতরম গীতিধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্, একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান

সেদিন ছিল শুধু মনমাতানো প্রাণভোলানো দিন নয়, উন্মোচনের উন্মীলনের দিন, উদ্বোধনের লগ্ন, ভারত পথ-পথিক হোতাদের, উদ্গাতাদের উদ্গীতের দিন যাঁরা বলেছিলেন—

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কবিগুরু আয়ুর শেষ সীমায় পৌঁছে তার শেষকৃত্য সম্পাদন করেছিলেন এই পুণ্যক্ষেত্রে। মেদিনীপুর তীর্থরূপ নিয়ে তাঁকে আহ্বান করেছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের উদয় শিখরে যে দীপ্তিমানের আবির্ভাব হয়েছিল অস্তদিগন্তের প্রান্ত থেকে—তাঁকে প্রণাম জানিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। আমরাও জানাই সেই আদি কবিকে যিনি লিখে গেছেন—জল পড়ে, পাতা নড়ে।

সেদিন যে দেশজননীকে আমরা বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে চোখের জলে অভিষিঞ্চিত করেছি, যার জন্য বুকের রক্ত দিয়ে তর্পণ করতে চেয়েছি—তার একদিকে ছিল 'জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্র, পরিকীর্ণ পশু কঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেত নৃত্য, আর একদিকে ছিল আপক্ব ধান্যভারনম্র সুজলা সুফলা শস্যক্ষেত্র, যেখানে প্রসন্ন প্রভাত-সূর্য প্রতিদিন মুছিয়ে নেয় শিশিরবিন্দু।' শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্ধলুপ্ত অবশেষের মর্য্যাদাহীনতা থেকে সেই আহিতাগ্নিকে পরম যত্নে লালন করেছিলেন যাঁরা তাঁরাই বাংলার বৈষ্ণব বাউল শাক্তশৈববৌদ্ধ মহাজনতার কবি, তার চারণ, তার চাষী, তার কথক, তার পাঠক, তার সীতা, তার সাবিত্রী, তার দময়ন্তী শৈব্যা হরিশ্চন্দ্র প্রহ্লাদ, রাম লক্ষ্মণ অর্জুন যুধিষ্ঠির। এই ত আমার শাশ্বত উত্তরাধিকার, তারই উত্তরসাধক রামমোহন থেকে রবীন্দ্র-নাথ, মাইকেল, বঙ্কিম শরৎ তারাশংকর জগদীশচন্দ্র প্রফুল্ল-

মানালি

(...লু ভ্যালি—কাশ্মীর)

...া: রবীন চক্রবর্ত্তী
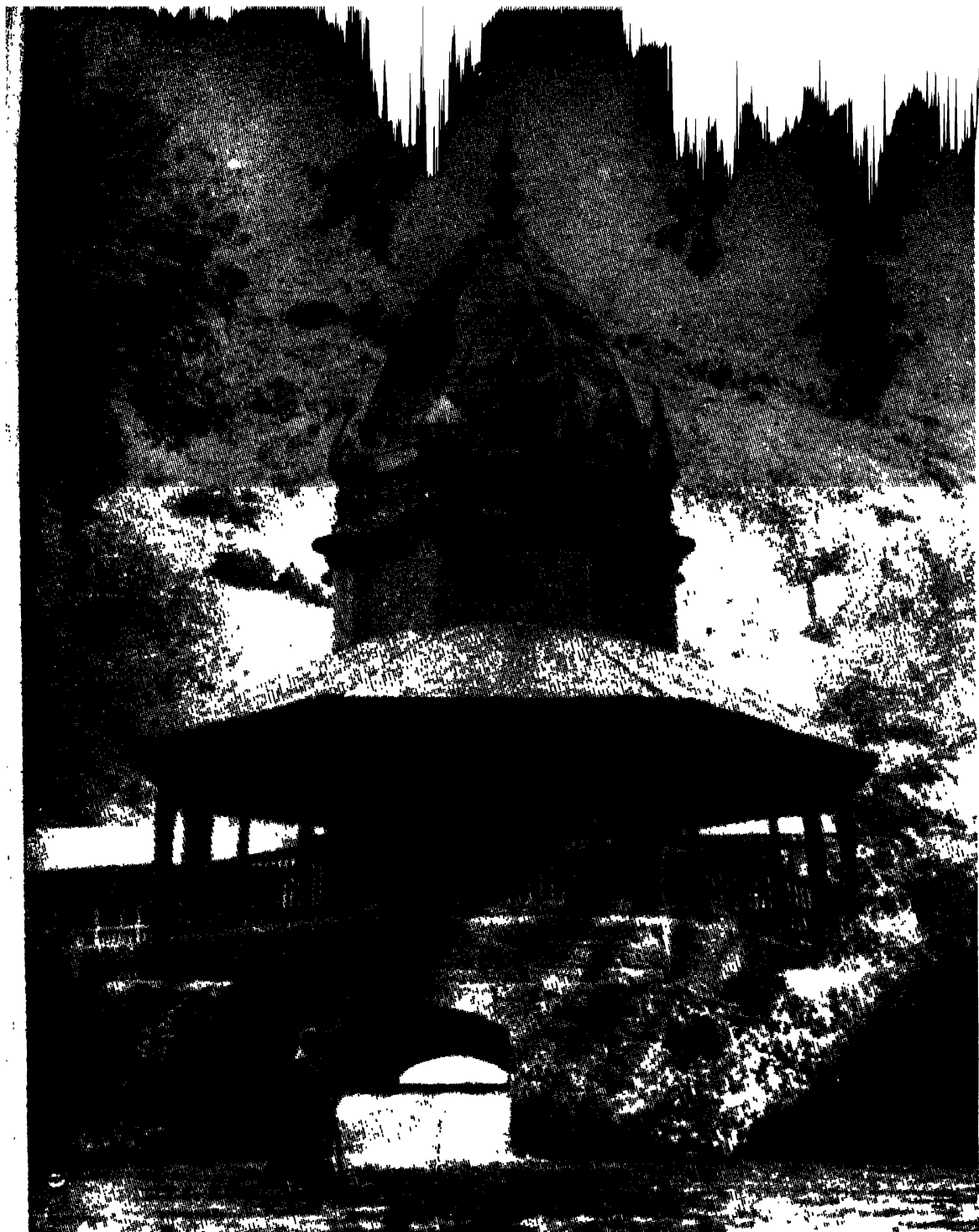
প্রাচীনতম শিবমন্দির (কাশ্মীর)　　　　ফটো : সন্তোষকুমার দাস

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

চন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন বসু, তারই উত্তরযোগী পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অরবিন্দ, মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল—তাঁদেরই হাত থেকে আমরা সে দান গ্রহণ করেছি যত ঋণী হয়েছি, কিন্তু সেই পিতৃঋণকে স্মরণ করছি কই—জানি এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে, আমার দৃষ্টি শুধু পিছনে পড়ে থাকবে না, বলবে—চরৈবেতি, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, কিন্তু সে সার্থকতার তীর্থ কোথায়, কোথায় সেই স্বপ্ন যা বাঁধবে পূবকে পশ্চিমকে, জ্ঞানকে বিজ্ঞানের সঙ্গে, অন্ন হবে বহু, টেকনোলজি শুধু যন্ত্র-দানবকেই সম্মান দেবেনা, শেখাবে 'যে মানব আমি, সে মানব তুমি কন্যা'।

আজকের এই পল্লীবাসরে সমাগত কবি সমাজকে শুধু সশ্রদ্ধভাবে নিবেদন করবো সেই কথাটি—যা সত্য যা সনাতন, যা, দেশকালপাত্র রুচি নিরপেক্ষ—

কাঙ্গাল আর করবে কত
যদি নয়নে নজর না থাকে
প্রেম যদি না মিললো খ্যাপা
তবে সাধন ভজন কদিন রাখে

বাংলা দেশের হৃদয় হতে জননী এইরূপেই বেরিয়েছিলেন, কাব্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ছিল এই বাদশাহী মোহর, তাকে ভাঙিয়ে কানাকড়ার কড়ি করে ফেলেছি আমরা। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীরা এই সত্য দর্শন করেছিলেন এবং এক রসায়নের স্বপ্নও দেখেছিলেন, শুধু প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের নয়, শুধু জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের নয়, শুধু অভাবের সঙ্গে প্রাচুর্যের নয়, পল্লী বাংলার সঙ্গে সহর বাংলার। শত শত স্কিম, উন্নয়ন নীতি, সেচ বিদ্যুৎ স্কুল কলেজ হেলথ্ সেণ্টার সত্ত্বেও এই বিভেদ শুধু স্পষ্ট নয়, অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। কেন, তার শুধু বহিরঙ্গে বিচার, materialistic interpretation দরকার নয়, অন্তরঙ্গে বিশ্লেষণও প্রয়োজন। জানি আমার ক্রুদ্ধ নবীন বন্ধুর দল (angry young men) এখনি বলবেন—মশাই, romantic extravagance ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের বুলি, ঝুলি থেকে বারে বারে বের না করে সোজা তেলনুন লকড়ির একটু সমাধানের ইঙ্গিত দিন দিকিন্, বেঁচে থাকার সমস্যাটাই হচ্ছে আসল, সত্যি, চতুর্দ্দিকে রোদনভরা বেদন, কান্নার রোল, হা-হুতাশের গঞ্জনা—গেলো, গেলো, সব গেলো, দেশ ভাঙলো, সমাজ ভাঙ্‌লো, মন ভাঙলো, দেবতার দেউল শূন্য, ঋত্বিক অনাগত, দীপ জ্বলে না, অন্ধকার কাটে না, তমসা দূর হয়না। দীর্ঘ যাত্রা পথের প্রতিটি উপলখণ্ডে মিশে আছে নিঃসহায়ের বেদনা, মাটির প্রতিটি ধূলিকণায় স্তব্ধ হয়ে আছে ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস, দিকে দিকে শুধু অভিসম্পাত, অক্ষম আস্ফালন, মনুষ্যত্বহীন পরাজিত মনোভাবের বিকার, বিদ্বেষ কলুষ ক্লেশ গ্লানি পরশ্রীকাতরতা। সুস্থ সমাজ নয়, আনন্দিত চেতনা নয়, বিকৃতভঙ্গুর উপবাসী দেহ ও মন। সবার উপরে আছে অন্নচিন্তা চমৎকারা। উদয়াস্ত তারই চেষ্টায় আমাদের ছেলেরা ছোটে, মেয়েরা জোটে, অনেকেই আজ কল্যাণী গৃহিণী সীমন্তিনী নয়। যুগদেবতার রথ পিশে চলেছে, জীবনের মুক্তধারা ঘুলিয়ে যাচ্ছে, দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে ফেলে আসা মন গজরাচ্চে। সেই সনাতন অভাব, সেই গতানুগতিক অভিযোগ সংসার সমুদ্র মন্থনে যে হলাহল ওঠে তাকে কণ্ঠে ধরবার শক্তি কোন্ নীলকণ্ঠের তা জানিনা। এইত তথাকথিত মধ্যবিত্ত বাঙালার গৃহের ছবি—শ্রীহীন হ্রীহীন—তার সাহিত্য কোথায়, কাব্য লিখবে কে, সংস্কৃতির উচ্চাসনের কল্পনা করবে কে·· প্রাণ নেই; চিন্তার উদার আতিথ্য নেই, ধৈর্যশীল ক্ষমা নেই, আনন্দউজ্জল পরমায়ু নেই। মেয়েরা পায়না পতি, ছেলেরা পায়না শিক্ষা, ঘরণীরা পায়না ঘর,—সমাজ ভাঙে মন ভাঙে, ঘর ভাঙে, জীবন হয় দ্রুত, মরণ দ্রুততর

অর্ধাশনে অনশনে দাহ করে নিত্যক্ষুধানলে
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল, দেহের নাই শীতের সম্বল
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার।

এর উপরতলায় মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবতীদের কথা ছেড়েই দিলাম, তাঁদের দৃষ্টি দিল্লীর তখত্ তাউসে, বালীগঞ্জের তালীকুঞ্জে, লণ্ডনে, নিউইয়র্কে, মস্কোয়। তাঁরা জীজিবেষ শতংসমাঃ। জানি এবং সসম্ভ্রমে স্বীকার করি যে আমাদের লোকায়ত্ত সরকারের বহু পরিকল্পনা, বহু অর্থব্যয়, বহু মনন ও চিন্তনের ফলে দেশের নানা কর্মের সূচনা হয়েছে, নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, নদীর উপর বাঁধ পড়ছে, আকাশে চিমনী উঠছে, বিদ্যুৎশক্তি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জীবনযাত্রার রথকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে—প্ল্যান স্কীম পরিকল্পনা, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালেজন

দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা, শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য নীতির প্রসার সবই চলেছে আইন মাফিক, নিয়ম মত, সরকারী খাতায় মোটা মোটা অঙ্কের খরচের হিসাবও লিপিবদ্ধ হচ্চে। কিন্তু কর্তার ভূত নড়েও না, ছাড়ে না, তোতা-পাখীর পেটে সংস্কৃতির উন্নয়নের দেশহিতকর বহু প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার কাঠখড় মালমশলাগুলো গজগজ করুক, আমরা জয়ধ্বনি করি—জয় হোক্ মানুষের, ঐ নব জাতকের, ঐ চিরজীবিতের। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান সে যে ধুঁকছে,—কাকে ডেকে বলবো উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, এই নাও তোমার প্ল্যান, এই তোমার ধ্যান, স্বপ্ন সফল করো এই নাও তোমার মানুষ হবার সাধনার উপকরণ। তখনি আসবে ছুটে দল মাদলের উতলধারা বাদল ঝরে অর্থাৎ দল ও উপদলীয় দলাদলি, সামান্য বিরোধকে অসামান্য করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা, প্রতিষ্ঠান যাক্ ডুবে, প্রতিষ্ঠা হোক অহমিকার, কর্তৃত্বের···আমরা ভুলে যাই দেশ মানে মাটি নয়, দেশ মানে মানুষ, তাই বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবো যে আমরা শুধু আত্মবিস্মৃত জাতি নই, আত্মঘাতী জাতি—এই মনোভাব আমাদের প্রত্যেক শুভচেষ্টাকে শুভবুদ্ধিকে বিষজর্জর করে তোলে, আত্মবিনাশ মত্ততা জাগায়।

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারিদিকে
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুরগ্রহদেয় মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়
লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই
আজকে দিনের চিত্তদাহের তুল্য নেই
যেন এ দুখ অন্তহীন
ঘর ছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থহীন

কিন্তু শুধু কান্নায় মানুষ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না, আজ জানতে হবে কোন্ আলোকের অববাহিকায় এই নিরন্ধ্র অন্ধকারের হবে সমাধি, কোন্ নবনচিকেতার নব অভীপ্সায় রাত্রির তপস্যা দিনের সন্ধান দিবে। আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনাকে পৌরুষের আকর্ষণ করে নিতে হবে, অকরুণ অদৃষ্টকে আশীর্বাদে পরিণত করতে হবে, সেখানে নৈয়ায়িকের সূক্ষ্মযুক্তি, বিতর্ক, বন্ধ্যাবুদ্ধিগর্ব, রন্ধ্রসন্ধানের ভালোবেসে কর্ম উদ্যোগ, প্রাদেশিকতার অভিমানে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে এই শস্যশ্যামল বাংলাদেশ যেন সম্পূর্ণ হয় তার জন্য, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের কবি মনীষীরা ভারতপথপথিকরা এই নতুন ইঙ্গিতই দিয়ে গেছেন, আমাদের শিল্পী, আমাদের কবি, আমাদের কর্মী, আমাদের দেশনায়ক, আমাদের সাহিত্যিক—যজ্ঞসম্ভব তপোজ্জ্বল মূর্তি গড়ে উঠেছে, পূর্ণাহুতির সমিধ, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে, কাজ দিয়ে, গান দিয়ে। বাইরের দিকে চাইলে হয়তো দেখা যাবে তার দৃষ্টি ফেরানো পশ্চিমের দিকে—জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস রাষ্ট্রবোধের চেতনা—আমরা শুনেছি নূতন করে অনুশীলনের ছন্দ, নূতন করে কর্ম-যোগের ব্যাখ্যা, নূতন বন্দেমাতরম, নূতন গীতাঞ্জলি, নূতন জনগণমন-অধিনায়ক পথ পরিচায়কের পরিচয়, নূতন ভাগবতজীবনের কথা, নূতন জীব শিব মন্ত্র, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্তভাবনাহীন, শুধু ভাবের গদগদ মোহে; ভাষার চাকচিক্যে চিন্তার আবিলতায় নয়, একটা অপূর্ব দার্ঢ্য, বলিষ্ঠতায়, ঋজুতায়, কর্মকুশলতায়, নিষ্ঠায়, সেবায়। এই তো আমাদের উত্তরাধিকার, এই তো আমাদের সাধনার শেষ কথা, জীবনের বড় সম্পদ, পূর্বসূরীদের কাছে যা পেয়েছি তা কী আমরা তুলে দিয়ে যেতে পারবো আমাদের উত্তর-পুরুষদের কাছে—আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, তপতপস্যা, প্রেম ভালবাসা। জানি তার্কিক তর্ক তুলবেন, ওহে বাপু, কল্পনার আকাশ থেকে নেমে এসে শক্ত মাটিতে পা দাও ত বাপু, অন্নবস্ত্রের ছোট্ট সন্ধানটি দাও, তারপর যতো পারো ঐতিহ্য সংস্কৃতি কাব্যকথার তালিকা পেশ করো—এখানে যে জ্বলবে রাবণের চিতা, বুভুক্ষুর হাহাকার, প্রবঞ্চিতের দাহ, অক্ষমের আস্ফালন পীড়িতের দীর্ঘশ্বাস। আমি জানি এ কথার মূল্য আছে, কিন্তু তারও পিছনে আছে ততঃ কিম্—আমার মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা, অনন্ত আস্পৃহা—একটি অমৃতভাণ্ডের জন্য। সেইখানেই বসে আছেন কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক—জানি সে গ্রাম, সে অরণ্য, সে মন, সে মানুষ, সে প্রেম, সেই বহতা নদী, সেই শস্যশ্যামল প্রান্তর, উত্তুঙ্গ গিরিশিখর নিয়ে

গলির ভিতরে যে দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য বিরহ কামনা বেদনা-লোভ লাস্য মূক হয়ে রয়েছে তাকে প্রকাশ করতে, তার ব্যাখ্যান বিচার বিশ্লেষণ করাই আজ কবির কাজ—সে সাহিত্য হবে কঠিন, নিষ্ঠুর, জীবনরসে জারিত, সেখানে থাকবে না শিবসুন্দরের কল্পনা, আবেগময় বাগবিস্তার। এ কথা শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর। ইংলণ্ডে একযুগে ইয়েটস্. এলিয়ট, অয়ডেন, স্পেণ্ডার, ডেলুইস একটা Cause খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, সাহিত্যে তার স্পর্শ দিয়েগেছেন—আজকের তরুণরা কি এদেশে কি ও দেশে "are far more interested. in producing some thing hard hitting, some thing that will make an immediate impact।

চিরকালের মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন হচ্চে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কে সে সমবর্ততাগ্রে—অমৃত কাহার ছায়া, কার ছায়া মহান মরণ—সেই কোন দেবতারে হবি মোরা করি সমর্পণ, হিরণ্যগর্ভের দ্যুতি কি তাঁরই প্রকাশ, সবিতার কবিতা কি তাঁরই আবেশ। দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষের মনে জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায় এই প্রশ্নই নানা রকমে উঠেছে—চরম আকুতি নিয়ে, পরম প্রার্থনা রূপে—কে সে দেবতা, কোন সে শক্তি, কি সে ছন্দ ভোরের ভোরাইয়ের গানে সে জিজ্ঞাসা করেছে, দিনের তপ্ত আলোয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে প্রশ্ন করেছে, পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সে জানতে চেয়েছে কে তুমি, কী তুমি, কোন পথ গ্রাহ্য; কোন পথ বাহ্য—উত্তর মেলেনি। রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারে মহাতামসীর কোলে বসেও মা মা বলে ডেকে তার সেই এক প্রশ্ন মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরাকে—দেখা দাও, দেখা দাও, বলে দাও, জানিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও, আমি দেখবো—নয়ন ন তিরপিত ভেল—আমায় চোখ দাও—

জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতু মে

অসুনীতে পুনরাস্মাসু চক্ষু, পুনঃ প্রাণমিহ

ন ধেহি ভোগম্

জ্যাম্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম, অনুমতে মৃড়য়

নঃ স্বস্তি—

প্রাণের নেতা আমাকে চোখ দাও, আমি উচ্চরান্ত সূর্যকে দেখবো, সাবিত্রীমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সেই জ্যোতিকে আমায় ভোগ দাও, আমায় প্রাণ দাও। সত্যকাম জাবাল আচার্য ছাড়াই ব্রহ্মবিৎ হয়েছিলেন, উপদেশ পেয়েছিলেন 'অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ'। মানুষ শুধু বাঁচতে চায়না, সে জানতে চায়, সে প্রকাশ করতে চায় I Exist, I Know, I Express, তার সীমার বাইরে যা,. আর সীমার মধ্যে যা। এই দুইএর মধ্যেই তার কল্পনা রঙীণ হয়েছে, তার ব্যঞ্জনা রসান্বিত হয়েছে, তার প্রকাশ রূপে রসে ছন্দে গানে রচনা শৈলীতে সমৃদ্ধ হয়েছে—সব মানুষের মনেই এই দ্বৈতের লীলা, তার দোলা অন্তরে আর বাহিরে, চিদাকাশে নীলাকাশে, কারুর কাছে সেটা স্পষ্ট, কারুর কাছে সেটা অস্পষ্ট—যে মেতেছে এই উন্মোচনের খেলায়—যে বলেছে—হে প্রকাশবান্, অন্তবান্, জ্যোতিষ্মান্ ঘোমটা খোলো, সমস্ত আয়তে অর্থাৎ প্রাণে চক্ষুতে শ্রোত্রে মনে সব কলায় তোমায় দেখবো, খোলো খোলো দ্বার, অপাবৃণু, মহাপ্রকৃতি হাত ধরে তাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন এই স্বরূপের সম্ভোগলীলা। তার একদিকে আছে কাম কামনা, আশা আকাঙ্ক্ষা ভয় লোভ মোহ আর একদিকে প্রেম ভালবাসা, তাস্যা জ্ঞান, আনন্দে বিধৃত চেতনা অপরিমেয় মন। তাই সে সাড়া দেয় শুধু রূপে, ভোগে, বাক্যে নয়,—অরূপ প্রতীকে, ত্যাগেও। এই চিরন্তন প্রকাশকে মূর্তি দেবার যিনি চেষ্টা করেন তিনিই কবি—প্রাচীন গুহামানব থেকে আজকের রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সেই একই মন্ত্রের সাধক, একই পথের যাত্রী—এই প্রকাশময় জগতের আনন্দ যজ্ঞে তাঁদের নিমন্ত্রণ, সন্দেশ রসগোল্লা থেকে চিড়েদই এঁটো কাঁটা যে যা পারো লুটে পুটে নাও নিজের গ্রহিষ্ণু মন দিয়ে। গুহার মধ্যে যখন দেখি রেখার আঁচড়ে হাতিকে বোঝাবার জন্য একটা অতিকায় জন্তুর আভাস, সিংহকে বোঝাবার জন্য একটা কিম্ভূতকিমাকার কেশর ফোলানো জন্তুর প্রতিকৃতি, দেখি মহেঞ্জদড়ের চিত্রে এক নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি পশু দেবতার কল্পনা, দেখি, বহু Heirgly phics. Cunei form wntng আকা জোকা Clay tablet এ গিল গামেশের কাহিনী, বা পুরোণো প্যাপিরাসে লেখা ইখনা টোনের সৌরগাথা, বা হামিরাবুর আইন বা ভূর্জ্জপত্রে উপর স্তর, রসেটা ষ্টোন বা বুক অফ্ দি ডেড"

তখন ভাবি, এ সবই হচ্ছে কবিমনের প্রকাশের ভঙ্গীর বিভিন্ন ধারা। জন্ম নিচ্চেন শিল্পী স্রষ্টা দ্রষ্টা এক কথায় কবি—যিনি মনীষী, যিনি দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের জনক আলঙ্কারিক আনন্দ,বর্ধনাচার্য্য কবিতাকে বলেছেন রসাত্মক বাক্য, দণ্ডী বলেছেন শ্লেষ—শ্লিষ্টমস্পৃষ্ট শৈথিল্যং গাঢ়বন্ধ—ওজঃ যেখানে আছে, সেদিনের রসিক সমালোচক অভিজ্ঞান শকুন্তলার নান্দীবাক্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য ষ্টাইলের চমৎকারিত্ব শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যের একটি অব্যভিচারী লক্ষণ—তয়া কবিতয়া কিং বা তয়া বণিতয়া চ কিম্, পদবিন্যাস মাত্রেণ যয়া নাপহৃতং মনঃ—মন হরণ করা চাই। নগ্ননির্জনাহতে বনলতা সেনকেই টানুক আর আকাশলীনা সুরঞ্জনাকে বজ্রগর্ভ মেঘ দেখা দিক ক্লান্ত শহর পরে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—Poetry is a rhythmic Speech which arises at once from the heart of the seer and the distant house of truth···The greatest poets are those who had a large and powerful interpretative and intuitive vision and where poetry arises out of the revealatory utterance of it.

রবীন্দ্রনাথও এই সত্যটিকে আর এক ভাবে প্রকাশ করলেন

> আমি ত সাধক নই,
> আমি কবি, আছি
> ধরণীর অতি কাছাকাছি
> এপারের খেয়ার ঘাটায়
> সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়
> নিত্য কহে নিয়ে ছায়া আলো
> মন্দ ভালো
> সে তরঙ্গ নৃত্যোছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
> চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
> এ বিশ্ব প্রবাহে
> যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের
> অশ্রুতে হাসিতে
> তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে

আমরা বলবো—এ জানাও 'বেদাহমেতং'এর সামিল। এ প্রণাম রূপের কাছে, রসের কাছে, জীবের কাছে, বিশ্বের কাছে, বিশ্বাতীত যিনি, তিনি যে ভোক্তা মহেশ্বর, তিনি ও যে ঐ অণুতে রেণুতেই প্রবিষ্ট—তিনি যে বিষ্ণু। সত্য ধরা দেয় খণ্ডভাবে প্রাণরূপে, প্রাণ আবার শক্তি তরঙ্গের বিচ্ছুরণ—সে শক্তির দ্যোতনা মহাপ্রকৃতির প্রকাশে, শুধু সীমার রেখায় নাম ও রূপে মিলিত হয়েছে বলেই সেই অখণ্ডতার পরিচয় আমরা পাই না—কবির কাছে তার আভাস আসে প্রাণের কলকল্লোলে জীবনের স্রোতে—এই হলো তার পশ্যন্তী বাণী—কবি সেই অর্থে সাধক—প্রাণ সাধক, রূপ সাধক, রস সাধক—তিনি রোমাণ্টিকই হোন্, বাস্তবতন্ত্রীই হোন্। সেকালের বৈদিক কবি যে প্রাণকে দেখেছিলেন আকাশে, বলেছিলেন—যদি আনন্দ না থাকতো বিস্ময়ে যদি মন না জেগে উঠতো—একালের অতি আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্য সমালোচকও সেই কথাই বললেন, কবিতার মূল কথা হচ্ছে—Some thing vital is released, some thing organically rhythmical (Edwin Markham)। সাহিত্য 'value empty art' নয় বা মিউজিয়ামও নয়। জীবনের ক্লেদ, দ্বিধা, অনাচার, অত্যাচার, অবিচার, অসুস্থ মানসিকতার প্রতিফলনই সাহিত্যের শেষ—আসলে মৃন্ময়ী মনের এই চিন্ময়ী বৃত্তি—তাই তো আমরা ছুটি গুরুর কাছে, ছুটি জ্ঞানীর কাছে, যাই বিদ্বজ্জন সভায়, শিক্ষার মন্দিরে, বিজ্ঞানীর বীক্ষণশালায়, মাথা খুঁড়ি পাথরের দেবতার কাছে,—

> গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
> তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন।
> গুরু যে তোর বরণ ডালা, গুরু যে তোর
> মরণ জ্বালা
> গুরু যে তোর হৃদয় ব্যথা, (যে) ঝরায় দুনয়ন
> কারে প্রণাম করবি মন

কথা নয়। অবক্ষয়ের কালিমা—শ, ওয়েলস্, গল্সওর্যাদি, ফষ্টারেও দেখেছি কিন্তু প্রীতি, ত্যাগ, শুচিতা মানবিকতাও আছে। ফষ্টারের Howard's End পড়ুন, Panic ও Emptinessএর সঙ্গে আছে একটা সুনিষ্ঠ সন্ধান। শ্রীঅরবিন্দের কথায় বলি—

> We have seen the sign of Thor and the
> hammer of new creation

A seed of blood in the soil and a flower of
blood in the skies
We march to make of earth a hell and
call it heaven
We mock at God we have silenced the mutter
of priests at his altar
... ...
We have made the mind a cypher
We have strangled thought with a cord
... ...
We are born in humanity's sun set to the
Night is our pilgrimmage

কিন্তু মানুষের উপরে বিশ্বাস হারানো পাপ—

এ কুৎসিৎ তাণ্ডব যবে হবে শেষ,
মানব তপস্বী বেশে চিতাভস্ম শয্যা বলে এসে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে ধ্যানের আসনে

কারণ

আমরা পাখীর জাত—
আমরা হেঁটে চলার কথা জানিনা, আমাদের
উড়ে চলার ধাত

মুখে আমরা বলি বটে,—বুদ্ধ শংকর চৈতন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গান্ধীজী বিনোভার কথা, বারে বারে আওড়াই —শরণং গচ্ছামি বা সোঽহম বা চিদানন্দময় শিবোঽহং শিবোঽহং বা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বা জীবে দয়া নামে রুচি বা জীবই শিব বা আমার জীবনই আমার বাণী বা সমাজায় ইদম্, তবু 'করা' আর 'হওয়া' যতক্ষণ বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রের মত দুই ঋষির মন্ত্রে প্রেমে মিলিত না হয় ততক্ষণ মানুষের কল্যাণ যজ্ঞ বারে বারে ব্যাহত হবেই। সামাজিক জীবনে কর্ম যজ্ঞের নির্দেশ হচ্চে যে, ব্যক্তিকে আহুতি দিতে হয় সমষ্টির কাছে, কল্যাণবোধের কাছে, শ্রেয়োবোধের কাছে। বৈশ্বানর অগ্নি তৃপ্ত হন শুধু সেই অন্নে যে অন্ন বহু হয়, যা প্রাণকে উল্লসিত করে, মনকে সংহত করে, বিশেষ বিরাট জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করে তবেই আনন্দং পরমানন্দং।

উপনিষদে আর একটি প্রশ্নোত্তর আছে। ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন—সামগানের মধ্যে (অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে) যে রহস্য আছে তার প্রতিষ্ঠা কোথায়। দালভ্য বলেছিলেন—এই পৃথিবীতে স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয়। প্রবাহণ জবাব দিয়েছিলেন—তাহলে তোমার সত্য অন্তবান হলো, সীমায় এসে ঠেকলো। সত্য যেমন অনন্ত, কাব্যও তেমনি অগাধে দীক্ষা—কবি হচ্চেন প্রবাহন্ তাকে বহন করে নিয়ে চলেছেন শুধু রূপ থেকে অরূপে নয়, সীমা থেকে অসীমে নয়, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে নয়, জীবনের স্বাদ বর্ণ গন্ধময় সমগ্রতাটাকে নূতন রসালোকের বর্ণচ্ছটায়—

গৈব মাহি গুরু দেও মিলা পায়া হাম পরসাদ
মস্তক মেরা কর ধরা দক্ষ্যা হম্ অগাধ

রন্ধ্রহীন অন্ধকার ভেদ করে আমার গুরু আলো হয়ে প্রকাশিত হলেন—আমি কিছু পেলাম তাঁর প্রসাদ, তিনি আমার শির ধরে আশীর্বাদ করলেন, আমার হলো অগাধে দীক্ষা।

প্রেম পিয়ালা নূরকা আসিক ভর দীয়া,
মৈঁ মতওয়ালা কীয়া

জ্যোতির পিয়ালায় প্রেমময় তার প্রেম ভরপুর করে দিলেন, আমি হয়ে গেলাম মাতাল। এই রসায়ন পান করেই আলোক মাতাল মানুষ।

হরে পটংবর পহিরি করি, ধরতী কঠৈ সিংগারে
তাই তো সবুজ পটাম্বরে ধরিত্রী এমন শৃঙ্গারময়।

মানুষ জন্মায়, তার দিন এগোয়, চলে জীবনযাত্রার রথ এ পথে ও পথে, আসে ক্ষুব্ধ অন্তরের তপ্ত নিঃশ্বাস, ক্ষুধাতুর কামনা, বৃদ্ধ সংসারের কর্কশ কোলাহল, তবু তারই মাঝে সে কাজ করে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের নগর প্রান্তরে—সে চোখ মেলে সে চেয়ে থাকে, বুঝতে চেষ্টা করে বুদ্ধি দিয়ে, বোধি দিয়ে—কেন জল পড়ে, কেন পাতা নড়ে, কেমন করে নারকেল গাছের আড়ালে সূর্যোদয় হয়। তারপর একদিন হয়তো সব কিছু ভাবনা বেদনা নিবিড় চেতনার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিবদ্ধ হয়ে জেগে ওঠে—ভালো লাগে, ভালোবাসি। এই তো প্রথমজা অমৃত, দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি—কবি হচ্চেন সেই সৃষ্টি যজ্ঞের প্রথম লগ্নের বিচিত্র দূত।

সেকালের সমালোচকের মত একালের ক্রিটিকও বলবেন—"এতো হলো কাব্যি"। আজকের যুগে এই

রোমান্টিক গদগদ ভাব নিয়ে কী চলে, মানুষের কথা বলুন, তার অভাব অনশন অনটনের কথা, তার কামকামনা আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, তার জীবন যৌবন ধন মান তনু মনের কথা, তার ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির কথা সোজা খাড়া ঋজু ভাষায়।

ভারতবর্ষ অবশ্য আমাদের ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতির মত কবিকে দিয়েছে, শূদ্রকের মত নাট্যকারকে, বিষ্ণুশর্মার মত গল্পলেখককে, যাজ্ঞবল্ক্য গৌতম শংকরের মত দার্শনিককে, পাণিনি কাত্যায়নের মত বৈয়াকরণিককে, পিঙ্গলের মত ছন্দশাস্ত্রজ্ঞকে আর্যভট্ট বরাহমিহির ব্রহ্মগুপ্ত ভাস্করাচার্যের মত জ্যোতির্বিদ গণিতজ্ঞকে, চরক সুশ্রুতের মত চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎকে, কৌটিল্যের মত অর্থশাস্ত্রকারকে, নাগার্জ্জুনের মত রাসায়নিককেও দিয়েছে। আজকের যুগেও এই বাংলাদেশে পেয়েছি ত্রয়ীকে—বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎকে —যাদের কথায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন "achievment enough in a Country. বঙ্কিম তার সাহিত্যে প্রথম আসন দিয়েছিলেন নৈতিক মানুষকে (Ethical man) রবীন্দ্রনাথ জোর দিলেন Aesthetic Sense এর উপর, সত্যশিবসুন্দরের উপর, শরৎচন্দ্র ছিলেন ভাবময় পুরুষ Emotional man হোক তার প্রধান উপজীব্য। শরৎ পরবর্তী শিল্পী মানসে নৈতিকবোধ সুন্দরের চেতনা, ভাবের অবগাহন নেই তা নয়, কিন্তু আরো সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলো সাহিত্যে সেই মানুষ যে জৈবিক তাড়নায় ঘোরে যে স্থূল কামনাকে শুধু অবচেতনে রাখেনা, যে মানুষ অর্থ নৈতিক, সামাজিক, দাবীকে অস্বীকার করেনা, যে মানুষ প্রোলেটারিয়াট, যে মানুষ অন্নহীন, যে মানুষ দুঃখী। অথচ এই সবগুলির সংমিশ্রণেই মানুষের শুধু সামাজিক সত্তার বিকাশ হয়না, তার আধ্যাত্মিক চেতনাও প্রবুদ্ধ হয়। সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য গল্প নাটক এরই সুষ্ঠু প্রকাশ। কে কতটুকু বাস্তবপন্থী, কে কতটা আদর্শবাদী, কার লেখায় qualitative গুণ বিকশিত বা quantitative মূল্য বেশী, এর নির্ধারণের মাপ্‌কাঠি শুধু যুগোচিত জীবনবোধ নয় একটা শাশ্বত জীবন বেদও। আসল সাহিত্যের রূপ সেইখানে। যুগে যুগে রুচিনীতি নিরীখ রচনাশৈলী বদলায়, কিন্তু চিরকালের একটা ছাপ হয়তো লেগে থাকে যুগাতীত সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ হয়ে। সেক্সপীয়রের হাতে ম্যাকবেথ পুলিস কোর্টের বিবরণী হয়নি, কালিদাসের হাতে কুমারসম্ভবের হরগৌরী সম্বাদের সম্ভোগকাহিনী বর্ণনাতিশয্যে রংএর প্রলেপে রুচিদোষদুষ্ট হলেও বিদ্যুৎবস্ত্র ললিত বণিতাদে মদন প্রলাপ বা শৃঙ্গার কাহিনী হয়নি। রোঁলা বলতেন—সূর্য যেমন কিরণ বিকীরণ করেন নিষ্কিপ্ত হয়ে, তেমনি সাহিত্যও জীবনকে রূপরেখা দেন কৈবল্যহীন হয়ে—It is neither moral nor immoral, ।

তনু প্রকাশেন বিষেয় তারকা প্রভাত কল্পা শশিনেব শর্বরী বাংলার ঘাটে মাঠে পল্লী বাটে আমরা এই ধরণের এক অদ্ভুত 'কাব্যি' পেয়েছি, তার কথা বলেই শেষ করি। এ যেন প্রথমজ অমৃত—তার পদাবলীতে, তার গাথায়, গানে সুরে, ছড়ায় বাউলের কণ্ঠে বৈরাগীর একতারায়, শাক্তের মা মা ধ্বনিতে। আসলে সবই হচ্চে মধুরের না হোক্ বিধুরের সাধনা—আমাদের সবারই নিমন্ত্রণ সেই আনন্দ যজ্ঞে—ধন্য হলো, ধন্য হলো আমার জীবন। তিনিত শুধু দ্যুলোকে ভূলোকে আলোকে পুলকে নন, সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসে, সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতে দূরে অস্তিকে তিনি যে সকাম, অকাম, আপ্তকাম, সর্বকাম। একেই জানতে চেয়েছে মানুষ—যা তাকে আকর্ষণ করে সেইতো কৃষ্ণ, যিনি হরণ করেন তার দুঃখতাপ তিনিইত হরি, যিনি প্রাণারাম, রমণ করেন আমার হৃদয় পুরে তাঁকেই নাম দিই না কেন রাম, নামে কি যায় আসে,—প্রাণ স্রোতের পেছনে আছে, শক্তি বীর্য তেজ ওজঃ ঐশ্বর্য। সব মিলিয়ে এক কথায় বললাম, কবির ভাষায় তিনি হচ্ছেন রস—ঋষির সব ধ্যান, বৈজ্ঞানিকের সব মনন, দার্শনিকের সব চেতনা কবির সব কাব্য সেই চিরসারথির রথচক্রমুখরিত পায়ে চলার ইতিহাসের দ্বার উন্মীলনেরই পালা, অপাবৃণুর সাধনা, রসো বৈ স এর প্রকাশ—সেই রস "সর্বগঃ" সর্বগামী।

বাংলাদেশে একদিন মেঘমেদুর তামসী রাত্রিতে সেই চিরন্তনীর অভিসার যাত্রার সুরুহোল—রাধে গৃহং প্রাপয়

সঞ্চরধর সুধা মধুরধ্বনি মুখরিত মোহন বংশম

বলিতদৃগঞ্চল চঞ্চল মৌলিক কপোল বিলোলাবতংসম

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তীর পর এলেন বিদ্যাপতি—পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেল। লাখলাখ যুগ চলে যায়,

হিয়ার জুড়ন না হয়, জাগলো আর এক কবির অন্তরে রাধিকার অন্তরের উল্লাস।

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন

তারপর

প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়
অবতীর্ণ হইল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়

চৌদ্দশত সাত শক মাস সে ফাল্গুন
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ

শ্রীবাসের অঙ্গনে অদ্বৈতাচার্য তখন কীর্তন করছেন, তার মনে লাগলো সাড়া—মিশ্র হইল আনন্দে বিহ্বল।

শচী মা নাম রাখলেন নিমাই—লোকে বললে—চাঁদের মত ছেলে, নাম দাও,

গোরাচাঁদ গৌর, গৌরাঙ্গ
পূর্ণিমার চান্দ সনে চন্দন বাটিয়া গো
কে গড়িল গৌরতনু খান্

... ...

অরুণ কিরণখানি তরুণ অমৃত ছানি
কোন বিধি নিরমিলা দেহা

পথ হলো ঘর, ছুটে আসে চাষী, গৃহী, রাজা-প্রজা ধনী-নির্ধন, তিনি বলেন—ওগো ধন নয়, মান নয়, যশ নয়, ঐশ্বর্য নয়—আমার ঠাকুর শুধু একটু ভালবাসার কাঙাল—শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়। মহাপ্রভু চলেছেন নীলাচলে, জগতের নাথ তাকে ডাকছেন—মন্দিরে ঢুকতে যান, বিগ্রহকে জড়িয়ে ধরেন—আর কি পাণ্ডারা মারতে আসে—ধরে ফেলেন সার্ব্বভৌম—বেদান্তের মহাচার্য্য—ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যা করেন—শুনে যান তিনি কিন্তু কোন প্রশ্ন নেই—কেন, কে এই শ্রুতিধর স্মৃতিধর—তারপর বোঝেন—গাঢ়ং গাঢ়ং নীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ—নীলাচল থেকে দাক্ষিণাত্য, গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ এলেন, আমি যে শূদ্র—তাতে কী, তবে তারে কৈলা প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ

একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্নান সেরে মহাপ্রভু বসে আছেন, রায় রামানন্দ এসে হাজির—সাধ্যনির্ণয় কী—রায় কহে—স্বধর্মাচরণ, বিষ্ণুভক্তি ইত্যাদি—

প্রভু বলেন—এহ বাহ্য, আগে কহ আর

রায় বলে—গীতার নবম অধ্যায়ে আছে কৃষ্ণে কর্ম সমর্পণ, যৎ করোষি যদশ্নাসি···

প্রভুর মনঃপূত হয় না—আগে কহ আর

আচ্ছা ভক্তি প্রধর্মহারিণী, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, ব্রহ্মভূতো প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি

তাও নয়

আচ্ছা জ্ঞানবর্জিতা ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি, অর্থাৎ ভগবানের ঐশ্বর্য জ্ঞান আর নেই

প্রভুর টনক নড়ে—এহো হয়, আগে কহ আর

আচ্ছা প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, হ্যাঁ, এ উত্তম, কিন্তু

শেষ পর্য্যন্ত পৌছলো কান্তাপ্রেমে রাগানুরাগে, প্রেমাবিদ্দীপদীপনম্ মহাভাবে—মোদন মাদন পেরিয়ে, হ্লাদিনী সঙ্গিনী সংবিৎ মিলিয়ে অধিরূঢ় মহাভাবের স্বরূপ। কিন্তু এই লীলার পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে কোথায়—সর্বোত্তম যে নরলীলা, নরবপু তাহার সহায়। তাই মানুষকে নিয়ে খেলার সুরু, মানুষকে নিয়েই লীলার শেষ Divinity of humanity, humanity of divinity! শিবই জীব, জীবই শিব—মানুষের সামগ্রিক জীবনের এই হচ্চে কাহিনী, এই হচ্চে প্রতীক (legend and Symbol)—সর্বভূতে প্রেম সাধনাই তার সর্বোত্তম চেতনা—শুধু নিজের ব্যষ্টির ব্যক্তির আত্মিক জীবনে নয়, সর্ব স্তরে, সব ভাবে, সত্তায়, চিন্তায়, নীতিতে রীতিতে কর্মে ধর্মে। প্রেমের অবিনাশী রূপই একমাত্র সত্য, তাই হিংসা কণ্টকিত পৃথিবীতে এই লোভ লাভ কামনার যুগে নীচতা ক্ষুদ্রতার পারিপার্শ্বিকে এর চেয়ে বড় কথা মানুষের আর নেই—

রক্ত দিয়ে কি লিখিব, প্রাণ দিয়ে কি শিখিব
কী করিব কাজ
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব, বাণী
হে মহিমময়ী

কাঁপিবে না ক্লান্ত কর ভাঙিবেনা কণ্ঠস্বর
ছুটিবেনা বীণা
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি
দীপ নিভিবেনা,

এই আহ্বান এলেই দিনপূর্ণহবে, পৃথিবীর ধূলি মধুময় রসময় হবে—তখনি বলতে পারবো আমার সমস্ত নাও, সমস্ত ঘুচিয়ে দাও, তবেই তোমার সমস্ত পাব—মহাসম্পদ তোমারে লভিব, সব সম্পদ খোয়ায়ে, মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে। এই সাধনার মূল পদ্ধতি যোগযাগ, মন্ত্রতন্ত্র, আচার ব্যাহ্যানুষ্ঠানের উর্দ্ধে একটি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন—আত্মসম্প্রসারণ,—

একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
ঘনশ্রাবণ মেঘের মত রসের ভারে নম্র নত
সমস্ত মন পড়ে থাক্ তব ভবনদ্বারে
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
নানাযুগের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।

* বঙ্গীয় কবিপরিষদের রামগড় (মেদিনীপুর) কবি মহা সম্মেলনের প্রধান অতিথির ভাষণ রূপে লিখিত।

তুমি হেথা নাই

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

তোমারে খুঁজেছি আমি হায়—
স্নিগ্ধ বন-ছায়,
আকাশে বাতাসে
পৃথিবীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে
কোথাও তুমি নাই,
মনে হয় বারে বারে তাই
ভুলে যাওয়া সে অতীত স্মৃতি
জনম লভিল কেন হয়ে নব গীতি
ভগ্ন বক্ষের অন্তস্থলে—
আশা ভরা নয়ন জলে।
হয়তো এ আমার ভুল ;
তবু মোর বাগিচার ফুল
আজ ফোটে আগেকার মত
অবহেলা করি তারে যত।

তুমি নাই আমি আছি—থাকিব আমি
কালের স্রোতেতে ভেসে কোথা যাব নামি'
সে কথা ভাবিবার নাই অবকাশ
তুমি সে রেখেছ ঢেকে
মনের আকাশ।
আলোকে আঁধারে
বারে বারে
তোমারে ভুলিতে চেষ্টা করি যত
আমার নিকটতম হও তুমি তত—
ছায়া হতে রূপ নিয়ে
দু'হাত বাড়ায়ে দিয়ে
সম্মুখে দাঁড়াও—তাই
ভুলে যাই—
তুমি হেথা নাই।

ইতিহাসের কথা

উপানন্দ

তোমরা যারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী, এযাবৎ পড়ে আসছ আর্যরা ভারতবর্ষে অভিবাসন করেন। তাঁরা বহিরাগত। এখানে কৃষ্ণকায় অসভ্য বর্বর মানুষ বাস করতো, ভারতবর্ষ আক্রমণ করে আর্য্যরা কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতিকে পরাজিত করেন আর বসবাস সুরু করেন। কত বছর আগে তাঁরা ভারত আক্রমণ করে প্রবিষ্ট হন, তাও পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ বৎসরে আর্য্যদের ভারতে আগমন, এই কথাই ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়েছে। একশো বছর ধরে এই লেখাই আমরা পড়ে আসছি। আর্য্যদের বাস যে কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি—এ সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী কল্পনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। খুসি-মাফিক কথার মূল্য কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়। কাণে একবার যা ঢুকে যায়, তাকে বের করা বড় কঠিন। ফলে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হ'য়েছে যে আর্য্যজাতি নামে এক জাতি ছিল, আর এই জাতি খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ বছরে ভারত আক্রমণ করে। আর্য্যরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল, এরূপ কথা ভারতের বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায়না, অতিকথা বা জনশ্রুতি হিসাবেও কোন নিদর্শন নেই। আর্য্যদের ভারতবর্ষ আক্রমণ, আগমন আর বসতি স্থাপন প্রভৃতি কথা শুনিয়েছেন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ, যার মূলে রয়ে গেছে সত্যের অপলাপ।

ভারতবর্ষ ইংরাজের অধিকারে এলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতের বহু অমূল্য পুঁথি লণ্ডনের কুক্ষিগত হয়। এই সব লুণ্ঠিত পুঁথির মধ্যে কি লেখা আছে তা জানবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে শ্বেতাঙ্গজাতি। ফলে সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে সারা ইউরোপে চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আমলে যে সব ইংরেজ ভারতে সংস্কৃত শিক্ষা করলেন, তাঁদের অনুবর্ত্তন ও উপদেশ অনুযায়ী একদল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ভাষাগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে এলেন যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাষাগুলির সাদৃশ্য আছে। বোপ সাহেব ভাষাপুঞ্জের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বাচক শব্দগুলি নিয়ে গবেষণা পূর্ব্বক একখানি তুলনামূলক ব্যাকরণ তৈরী করলেন, তাতে তিনি দেখালেন যে ইন্দো-ইয়োরপীয় ভাষাগুলির জননীই সংস্কৃত ভাষা। এর ভাবস্তন্য পান করে আর এর ভাষা শুনে অন্যান্য ভাষা রূপায়িত ও সজীব হয়ে উঠেছে।

ইনি সংস্কৃত ভাষাকে বিশেষ বিশেষ মর্য্যাদা দেওয়াতে এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গাত্রদাহ হোলো। ফলে বোপ সাহেবের মত খণ্ডন করলেন জার্ম্মানীর ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ব্রুগম্যান সাহেব। তিনি বললেন সংস্কৃত হচ্ছে ইন্দো-ইয়োরপীয় ভাষাপুঞ্জের সমগোত্রীয়। তিনি মৃত সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন কল্পে কতকগুলি এমন সব শব্দ

সংগ্রহ করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেন, যাতে জীবনের স্পন্দন হওয়া তো দূরের কথা, সংস্কৃতকে হেয় প্রতিপন্ন করার পথই রচিত হোলো। এঁর ইঙ্গিত আর ইংরাজের উস্কানি থেকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হোলো, তা অত্যন্ত হাস্যকর, লজ্জাকরও বটে। জার্মাণ ভাষাতত্ত্ববিদ ম্যাক্সমূলারের ভ্রান্তিবিলাস প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্য্যাদাহানিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে গেছে। তাঁর অনূদিত বেদ ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলির ভেতর বহু জল ঢুকে গেছে, ভুলের তো কথাই নেই, অথচ ম্যাক্সমূলার বলতে মহাসিন্ধুর এপার ও ওপারের লোক একেবারে অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর আনুকূল্যেই ব্রিটিশ শাসক গণের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছিল, এজন্যে তাঁরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এজন্যেই তোমরা ইতিহাসে দুবেলা পড়ছ—মিশরই পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলোক সম্পাত করে, আর মিশরীয় সভ্যতাই সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পকলার পথ দেখিয়েছে। প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতাকে কোণঠেসা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের এই চক্রান্ত এখন ক্রমে ক্রমে ধরা পড়ছে। বৌদ্ধরা যেমন হিন্দুর সমস্ত দেব দেবীকে বুদ্ধের পদ প্রান্তে রেখে চেষ্টা করেছিল বুদ্ধের মহিমা কীর্তন করতে, তেমনিভাবেই শিকাগোতে বিশ্বধর্ম্মমহাসম্মেলন ঘটিয়ে খৃষ্টান জগত চেষ্টা করেছিল খৃষ্টান ধর্মকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে প্রতিপন্ন করতে। কিন্তু যা সত্য, তাকে বিলুপ্ত করা কঠিন। তাই বত্রিশ বছরের তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে খ্রীষ্টান জগত ভীষণ ধাক্কা খেয়ে আজ পর্য্যন্ত বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলন ডাকতেই সাহস করলো না। কেননা ঐ মহাসম্মেলনে হিন্দুর ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে। যাহোক ম্যাক্সমূলার বললেন ইন্দো-ভারতীয় ভাষাভাষীরা এক সঙ্গে বাস করতো অন্ততঃ দশ হাজার বছর আগে, তারপর তাদের পৈতৃক বাসভূমিতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে তারা পৃথিবীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একদল আর্য্যরা ঐ বাসভূমি ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষে ভারতে আসে। ভারতবর্ষে তখন অসভ্য জাতিরা ছিল, ভারতের সভ্যতার কোন অবদান ছিলনা। ম্যাক্সমূলারের ধারণাটাই অকাট্য বলে মেনে নেওয়া হোলো, ফলে দেখা গেল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ কোন এক অজানা প্রান্ত থেকে। এই অজানা প্রান্তে আর্য্যদের প্রাচীন বাসভূমির কথা ম্যাক্সমূলারের মুখ থেকে বেরোতেই চতুর্দ্দিকে সেই কথা প্রতিধ্বনিত হোলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সমর্থন করলেন ম্যাক্সমূলারের কথা। ফলে সমস্যার সমাধান ও যেন হয়ে গেল। ব্রিটিশ পদানত ভারতীয় জাতির পশ্চাতে যে বিরাট ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আছে তাকে অপহরণ করে; আর তার অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করে, ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোলো। কেননা কোন সুপ্রাচীন গৌরবসমৃদ্ধ মহান জাতিকে বহু কাল ধরে শাসন করা সম্ভব নয়, একদিন না একদিন সে জাতি তার স্বরূপ উপলব্ধি করে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে—এই সব আলোচনা হয়েছিল লণ্ডনের গুপ্ত বৈঠকে, তাই আমরা দেখ গজনীর মামুদ, নাদির শাহ প্রভৃতি ভারতের যতখানি সর্বনাশ সাধন করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি করেছে ইংরাজ ভারতবর্ষের মসনদে বসে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রকার নিদর্শন ও অমূল্য পুঁথিগুলি আত্মসাৎ করে।

বাঙ্গালীর গৌরব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় মহেঞ্জোদারো থেকে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন তুলে না ধরলে, গর্ব্ব করবার মত কিছুই থাকতো না তোমাদের কাছে দিয়ে যাবার মত। ম্যাক্সমূলারের সময় থেকে বহুল পরিমাণে ভারত, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিসর, ক্রীট ও গ্রীস দেশ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রহ হয়েছে; এখনও উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের মন্দির থেকে মূল্যবান শিল্প নিদর্শন ভারতের বাইরে গোপনে চলে যাচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার হননের উদ্দেশ্যে। যেসব দ্রব্য থেকে সে সব তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, আর গবেষণা হয়েছে, সে গুলি ম্যাক্সমূলারের অনুমানসিদ্ধতত্ত্বগুলিকে খণ্ডিত করেছে। হেমিটিক জাত অধ্যুষিত ক্রীটও মিসর থেকে গ্রীকরা তাদের সভ্যতাও সংস্কৃতি পেয়েছে'। তারা আর্য্যসংস্কৃতি বা ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণীভুক্ত নয়। তারা হেমাইট জাতির অন্তর্ভুক্ত। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় ছিলনা মহাপ্রাণ বর্ণ। প্রথম

অষ্টম শতাব্দীর আগে গ্রীকরা লিখতে পড়তে জানতো না। ফিনিসীয় ব্যবসায়ীদের লিখন পদ্ধতি, ভাব ও ভাষা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলে মনে করতো। কিন্তু ভারতবর্ষ যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পাঁচহাজার বছর আগে থেকেই লিখনপদ্ধতি কৌশল আয়ত্ত করে সভ্যতার অনেকখানি পথে এগিয়ে গিয়েছিল,সিন্ধু উপত্যকা থেকে তা খননের মাধ্যমে যে সব শীলমোহরাঙ্কিত ব্রাহ্মী লিপি পাওয়া যায় সেগুলি প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নিদর্শন। গ্রীকদের নিরক্ষরতাই সুস্পষ্ট প্রমাণ করছে যে তারা হিন্দুর সঙ্গে একত্র বসবাস করেনি। আর্য্যগোষ্ঠীর বংশ পরম্পরায় হিন্দুরা পেয়েছে ঋক্‌বেদ, কিন্তু গ্রীক কিম্বা ইউরোপীয়দের কিছুই নেই। অতএব ইউরোপীয়েরা আর্য্যশাখা সম্ভূত বলে দাবী করতে পারেনা। ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও ইউরোপীয়দের সঙ্গে হিন্দুদের আকাশ পাতাল তফাৎ। বৈদিক দেবতাদের নাম গ্রীক্‌ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরা জানতো না। সুতরাং তারা হিন্দুদের সঙ্গে ম্যাক্‌সমূলার কথিত প্রাচীন পৈতৃক ভূমিতে বাস করেনি, এটি প্রমাণিত হচ্ছে। ভারতের বাইরে ইন্দো-আর্য্য পৈতৃকভূমির সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং আর্য্যদের প্রাচীন পৈতৃক ভূমি ভারতবর্ষ। আর্য্য শব্দ ঋগ্বেদে ভদ্র সম্মানিত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রয়োগ করা হোতো। পরে আর্য্যাবর্ত্ত গঠনের পর জাতীয় নাম আর্য্য হয়। ইউরোপীয় কোন ভাষা উপভাষায় আর্য্য শব্দ নেই। সুতরাং ইউরোপীয় জাতিরা আর্য্য ভাষার অনার্য কথোপকথনে অভ্যস্ত। বৈদিক যুগে আর্য্যরা ভারতবর্ষ থেকে সমুদ্রযাত্রা করে নানা দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে যেতেন, জাহাজ ধ্বংসের কথা, ও সমুদ্র থেকে ঐশ্বর্য্য সম্পদ প্রাপ্তির কথা, আর বৈদিক ভারতের মানুষের সমুদ্র উপকূলে বাসের কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে পানি, যদু, আরামি প্রভৃতি নৌবিদ্যাবিশারদ জাতির উল্লেখ আছে। মিসরে যদু বংশ রাজত্ব স্থাপন করেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিসরকে সভ্য করেছে ভারতবর্ষ। বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিলনা। পুরোহিত সম্প্রদায়ও ভারতের বাইরে বৈশ্যবৃত্তি নিয়ে ব্যবসা করতে যেতো, সে সত্য ও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ঋগ্বেদের এই সব তথ্য সম্পদ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, আর্য্য জাতিত্ববাদের ধারণা যা পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আর্য্যরা ছিলনা গ্রাম্য মেষপালক জাতি, তারা ম্যাক্‌সমূলারকথিত অদ্ভুত মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বাস করতোনা। মহেঞ্জোদাড়ো, হারাপ্পা প্রভৃতি স্থান খনন করে আমরা যে সব অমূল্য সম্পদ পেয়েছি, তা দেখিয়ে গর্ব্বভরে আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষ থেকে সভ্য মানুষেরা পৃথিবীর নানাদেশে গিয়ে রাজ্য বিস্তার করেছে, জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলার শিক্ষা দিয়েছে, ধর্ম্মের কথা শুনিয়েছে আর ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করেছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে উদ্দেশ্য করে ঠিকই বলেছেন—

'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে—'

বিজ্ঞান বিচিত্রা

মুর্গীদের নির্বোধ বলে যতোটা কুখ্যাতি আছে আসলে তারা ততটা নির্ব্বোধ নয়'—পশ্চিম জার্মানীর একজন মুর্গী বিশেষজ্ঞ মুর্গীদের ভাষা এমন ভাবে আয়ত্ত করেছেন যে, তাদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্যে দেশবিদেশের মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হয়। তাঁর নাম এরিখ বেউমের। মুর্গীদের কথা বোঝার বেলায় একমাত্র তিনিই দাবী করতে পারেন। তাঁর মতে শুধু ডাকার জন্যেই তারা ডাকেনা। এক একটি বিশেষ শব্দে তারা সঠিক কিছু বোঝাতে চায়।

বহু কষ্টস্বীকার করে ইনি মুর্গীদের কক্‌ কক্‌ কথার অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর সেই গবেষণার ফলাফল মুর্গীদের চালচলনের সূত্র নামে পরিচয় লাভ করেছে। ডাঃ বেউমার শিশুকাল থেকেই মুর্গীদের চালচলন খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে থাকেন। ডাক্তারী পড়ার সময় অধ্যাপকদের যখন তিনি মুর্গী সম্পর্কে নিজের কথা বলেন, তখন তাঁরা হেসে উড়িয়ে দেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে বেউমারের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

ডাঃ বেউমারের মতে পোষ মানাবার ফলে মুর্গীদের বোধশক্তি বা বুদ্ধি লোপ পায় না। অধিকন্তু এর ফলে শব্দে হাবভাবে চালচলনে তাদের অনেক রকম ফের হয়েছে। তিনি বলেন, মুর্গীদের সমাজ জীবনের প্রধান হচ্ছে মোরগ। তার কথা অনুযায়ী সকলকে চলতে হয়। সে সব সময় সতর্ক থাকে, বিপদ বুঝলেই যথাসময়ে মুর্গীদের সাবধান

করে দেয়। তার জোর আওয়াজের হ্রস্ব হুকুমের মানে হচ্ছে মহাবিপদ। রাত্রে মুর্গীরা ঘুমোবার সময় মোরগ মাঝে মাঝে কুকু শব্দ করে। একে বলা হয়েছে সতর্কতা-মূলক ধ্বনি অর্থাৎ আস্তানার কাছে অপরিচিত কোন কিছুর আবির্ভাব হয়েছে। বাচ্চার মা না হলে মুর্গীরা অবশ্য সাধারণতঃ কম সন্দেহ বাতিক হয়, কিন্তু তাদেরও নিজস্ব ভাব প্রকাশের ভঙ্গী আছে। ডাঃ বেউমার মুর্গীদের ভাষা সম্পর্কে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন যা মানুষের বেলায় খাটেনা। যতো জাতেরই মুর্গী হোক, তাদের বুলি এক।

আলেকজান্দার হ্যুমা
রচিত
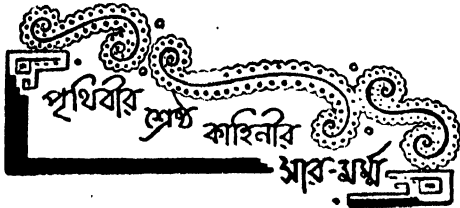
দী কাউণ্ট অফ্ মণ্টি ক্রিষ্টো

সৌম্য গুপ্ত

১৮১৫ সালের কথা। দিগ্বিজয়ী-বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তখন পরাজিত-বিপর্য্যস্ত হয়ে ক্ষুদ্র এল্বা দ্বীপে নির্ব্বাসিত ·· ফ্রান্সের সিংহাসনে অষ্টাদশ লুই তখন রাজা হয়ে বসেছেন ···ফরাসী দেশে তখন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম দল—'রয়ালিষ্ট' (Royalists) অর্থাৎ রাজা লুইয়ের পক্ষে—দেশের শাসনভার এখন একরকম এই 'রয়ালিষ্ট' দলের হাতে। দ্বিতীয় দল হলো—'বোনা-পার্টিষ্ট' অর্থাৎ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অনুরক্ত-দল··· এ দল চক্রান্ত করছেন, উদ্যোগ-আয়োজন করছেন কোনো-রকমে নির্ব্বাসিত নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে উদ্ধার করে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসাবেন।

ফ্রান্সের এমনি দুর্দ্দিনে, ১৮১৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ফ্যারাও' নামে একখানি মালবাহী পাল-তোলা জাহাজ এসে পৌছুলো মার্সেল্‌স্‌-বন্দরে! জাহাজখানির পৌছুনোর কথা ২৭শে তারিখে—কিন্তু এলো একদিন পরে! জাহাজের ক্যাপ্টেনের সহকারী (Mate) এডমণ্ড দান্তে·· বয়স মাত্র উনিশ বছর···এ বিলম্বের জন্য তার কৈফিয়ৎ তলব হলো!

জাহাজের মালিক মোরেল নিজে জাহাজে উঠে এসে এ কৈফিয়ৎ তলব করলেন—সেই সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন, এডমণ্ডের মুখ মলিন—সে যেন দারুণ বেদনাহত! মোরেল শুধোলেন,—ব্যাপার কি, এডমণ্ড···তোমাকে এমন বিমর্ষ, অবসন্ন দেখছি কেন?

নিশ্বাস ফেলে কম্পিত-কণ্ঠে এডমণ্ড বললে,—ফিরতি-পথে জাহাজে দারুণ বিপদ ঘটে গিয়েছে, হুজুর!···ফেরবার পথে ক্যাপ্টেন লেক্লেয়ারের হয় সাংঘাতিক অসুখ—এবং সেই অসুখেই তিনি জাহাজেই মারা গিয়েছেন!···

খবর শুনে মোরেল চমকে উঠলেন! এডমণ্ড জানালে, —অন্তিমকালে ক্যাপ্টেন আমার হাতে একটি প্যাকেট দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, সে প্যাকেটটি আমি যেন এল্বায় পেঁ।ছে দিয়ে আসি। তাঁর সেই অন্তিম-ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আমি জাহাজ চালিয়ে এল্বা হয়ে তবে এখানে আসছি—তাই দেরী হলো!

নিশ্বাস ফেলে মোরেল বললেন,—তুমি উচিত কাজ করেছো। কিন্তু জানো, তোমার এল্বায় যাবার জন্য পাচজনে তোমাকে রাজ-বিদ্রোহী 'বোনাপার্টিষ্ট'-দলের বলে সন্দেহ করতে পারে! জানো, সে সন্দেহের পরিণাম?···

এডমণ্ড বললে,—কিন্তু সে-প্যাকেটে কি ছিল, তা আমি জানি না···ক্যাপ্টেন আমাকে ইঙ্গিতেও তার কোনো আভাস দেননি! সেখানে জাহাজ থামতে একজন লোক প্যাকেটের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে তাঁর হাতে আমি প্যাকেটটি দিই···তিনি তখন আমার হাতে এই চিঠিখানি দিয়েছেন—প্যারিসে এক ভদ্রলোকের হাতে এ চিঠিখানি পৌছে দিতে বলেছেন।

দুজনে এ সব আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় জাহাজের

'মালখানার' অধ্যক্ষ ড্যাঙ্গ্লার্স সেখানে এসে হাজির হলো। তাকে দেখে এডমণ্ড মোরেলকে বললে,—পথের বিপদের কথা এঁর কাছে আপনি সব শুনুন···আমি এখন যাই জাহাজ-নোঙর করবার কাজে!

এডমণ্ড চলে গেল তার কাজে···ড্যাঙ্গ্লার্স সবিস্তারে বর্ণনা সুরু করলো—ফেরবার পথে জাহাজে ক্যাপ্টেনের সঙ্কট-পীড়া হলো···মাথার ব্যামো···মৃত্যুর আগে এডমণ্ডের হাতে প্যাকেট দিয়ে অনুরোধ—ফিরতি পথে সেটি এল্‌বায় কোন-একজন লোকের হাতে দিয়ে যেতে হবে···আর সে যদি কোনো চিঠিপত্র দেয় তাহলে সে চিঠিও যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে! ক্যাপ্টেন মারা গেলে তাঁকে সলিল-সমাধি দেওয়া হয়···তারপর এল্‌বায় যেতে মানা করেছিলুম ···বলেছিলুম—এল্‌বায় বোনাপার্টির আস্তানা···ওদিকে গেলে বিপদ···তা শুনলো না! ক্যাপ্টেন মারা যাবামাত্র ওর উপরেই যেন জাহাজের ভার—ও যেন ক্যাপ্টেন! মানা শুনলো না তার জন্য একদিন দেরী হলো আমাদের মার্সেল্‌সে পৌঁছুতে! এল্‌বায় যাওয়া উচিত হয়নি এডমণ্ডের!

মালিক মোরেল বললেন,—এডমণ্ড বুদ্ধিমান ছেলে··· ও কখনো অন্যায় কিছু করতে পারে না! ভালো বুঝেই ও এ কাজ করেছে!

ড্যাঙ্গ্লার্সের ললাট হলো কুঞ্চিত। সে বললে,—হ্যাঁ, ছোকরা-বয়স···এ-বয়সে মানুষ মনে করে—সে যেমন ভালো সব বোঝে, এমন আর কেউ বোঝে না! নিজের উপর বিশ্বাস হয় এত বেশী যে কারো বা কিছুর পরোয়া করে না। ক্যাপ্টেন মারা যাবার পর থেকে এডমণ্ডের হাবভাব যা হয়েছে, যেন ঐ এ জাহাজের ক্যাপ্টেন!

মোরেল বললে,—হ্যাঁ, তাই হবে···শীঘ্রই সেই ব্যবস্থা করছি!

ড্যাঙ্গ্লার্সের বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বললো!···ঐ ছোকরা এডমণ্ড হবে জাহাজের ক্যাপ্টেন!···আর ড্যাঙ্গ্লার্স!—চিরদিন 'মালখানার' চাবি নিয়ে চৌকিদারী করবে···মালপত্রের হেফাজতী করে দিন কাটাবে!···

দুদিন পরে জাহাজের কাজকর্ম শেষ করে এডমণ্ড ছুটি পেয়ে বাড়ীতে চললো···বাড়ীতে বুড়ো বাপ—বাপের সঙ্গে দেখা করতে—ড্যাঙ্গ্লার্সের বুকে হিংসার আগুন প্রধূমিত হতে লাগলো। সে স্থির করলো,—এডমণ্ড হবে ক্যাপ্টেন! কখনো না!··আমার হাতে কলকাঠি আছে, যে চাকা ঘুরিয়ে দেবো—এডমণ্ডের ক্যাপ্টেন হওয়া কি, মেটগিরিও থাকবে কিনা সন্দেহ! এ জাহাজের ক্যাপ্টেন হবো আমি —মঁশিয়ে ড্যাঙ্গ্লার্স!···

বাড়ী এসে এডমণ্ড বুড়ো বাপকে খবর দিলে, মালিক মোরেল সাহেব আমাকে জাহাজের ক্যাপ্টেন করবেন—এমনি আশা দিয়েছেন।

ছেলের এ বয়সে এমন পদোন্নতি···বাপ শুনে খুশী হলেন। তিনি বললেন,—তোমার এ উন্নতি—ভগবানের আশীর্ব্বাদে! ছেলের উন্নতি, ছেলের মর্য্যাদা, বাপকে কতখানি সুখ, কতখানি গৌরব দেয়—আমি তা জানছি, এডমণ্ড!

বাপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে এডমণ্ড চললো মার্সে-ডিজের সঙ্গে দেখা করতে! মার্সেডিজ্ রূপসী কিশোরী —পিতৃমাতৃহীনা···সে থাকে এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়ের বাড়ী—আশ্রিতা। আত্মীয়ের তরুণ পুত্র ফার্নান্দ্ তাকে নিত্য উত্যক্ত করে—তাকে বিবাহ করতে হবে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে এডমণ্ডের সঙ্গে মার্সেডিজের খুব ভাব··· দুজনে দুজনকে প্রাণের সমান ভালবাসে—এখন দুজনে বিবাহ হবে—কথা পাকা। এডমণ্ড জাহাজে কাজ করে —জলে-জলে ঘোরে···ফার্নান্দ্ থাকে ঘরে—সে খালি মার্সেডিজ্‌কে বিরক্ত করে—ফার্নান্দ্‌কে বিবাহ করতে হবে! মার্সেডিজ্ বার বার আপত্তি জানায়···বলে,—না, না, না···হাজার বার তোমাকে বলেছি, না! তোমাকে আমি বিবাহ করবো না! আমি ভালবাসি এডমণ্ডকে··· এডমণ্ডও আমায় ভালবাসে···আমি এডমণ্ডকে বিবাহ করবো! ফার্নান্দ্ শাসায়,—তাকে আমি মেরে ফেলবো! মার্সেডিজ্ জবাব দেয়,—এডমণ্ড যদি মারা যায়, আমিও মরবো···আত্মহত্যা করবো!···

সেদিনও ফার্নান্দ্ ঐ এক কথা বলে জ্বালাতন করছে মার্সেডিজ্‌কে···মার্সেডিজ্‌ও বিরক্ত হয়ে তাকে বলছে, —না, না, না···এমন সময় দরজায় ডাক,—মার্সেডিজ্···

···এ যে এডমণ্ডের কণ্ঠ! মার্সেডিজ্ ছুটে বেরিয়ে এলো···তারপর···দুজনে কত কথা···কত হাসি!···

ফার্নান্দ্‌কে দেখে এডমণ্ড জিজ্ঞাসা করলো,—এ লোকটি কে ?

মার্সেডিজ্‌ বললো,—এর নাম ফার্নান্দ্‌···সম্পর্কে আমার ভাই হয়! দুজনে আলাপ করো!

এডমণ্ড করমর্দ্দনের জন্য সাদরে হাত বাড়াতেই, ফার্নান্দ দু' চোখে অগ্নিদৃষ্টি হেনে সটান্ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল—ক্ষিপ্ত-পশুর মতো আক্রোশে! সহরের পথে ঘুরতে-ঘুরতে একটা সরাইখানার সামনে গাছতলায় ফার্নান্দের দেখা ডাঙ্গ্‌লার্সের সঙ্গে···ডাঙ্গ্‌লার্স ছায়ার মতো এডমণ্ডের পিছনে ঘুরছে! ফার্নান্দ্‌কে দেখে ডাঙ্গ্‌লার্স বললে,—কি হে ফার্নান্দ্‌···চিনতেই পারছো না যে··· আমি তোমার পুরোনো বন্ধু ডাঙ্গ্‌লার্স!···এসো···এসো ···একসঙ্গে বসে খানা-পিনা গল্পসল্প করা যাক্ দুজনে মিলে!

কোনো জবাব না দিয়ে ফার্নান্দ্‌ গম্ভীরভাবে ডাঙ্গ্‌লার্সের খানা-টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো। তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাঙ্গ্‌লার্স আগ্রহভরে পাশের খালি চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে বললে,—বসো!···কিন্তু চেহারা যা করেছো—দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো কিশোরীর কাছে বিবাহের কথা বলেছিলে···সে প্রত্যাখ্যান করেছে!

ডাঙ্গ্‌লার্সের কথা শুনে ফার্নান্দ্‌ একটি নিশ্বাস ফেলে বললে,—তাই বন্ধু, তাই!···সেই ব্যাপারটি ঘটেছে!··· আমি মার্সেডিজ্‌কে বিবাহ করতে চাই···কিন্তু মার্সেডিজ্‌ কিছুতেই রাজী নয়। সে বিবাহ করতে চায় ঐ এডমণ্ড দান্তেকে!···তিনদিন পরেই নাকি বিবাহ হবে···আমি নিজের কানে শুনেছি—ওদের দুজনের বিবাহের তারিখের কথা! দেরী চলবে না···দান্তে নাকি তার জাহাজের ক্যাপ্টেন হবে এবার!

ডাঙ্গ্‌লার্স বললে,—বটে!···

নিশ্বাস ফেলে ফার্নান্দ্‌ বললে,—হ্যাঁ।···কিন্তু এ বিবাহ আমি হতে দেবো না!···ভেবেছিলুম—দান্তের বুকে ছুরি বসাবো ওকে মেরে ফেলবো···কিন্তু মার্সেডিজ্‌ বলে,—দান্তে যদি মারা যায় তো সেও সেইদণ্ডে আত্মহত্যা করবে! তাই তো আমার সমস্যা!···

ফার্নান্দের কথা শুনে ডাঙ্গ্‌লার্সের মুখে বক্র-হাসির রেখা ফুটে উঠলো···সে বললে,—চিন্তা করো না বন্ধু!·· দান্তেকে খুন করার প্রয়োজন নেই। আমি এমন মন্ত্র জানি যে মন্ত্রের জোরে দান্তে বাছাধনকে আজীবন কারাগারে বন্দী থাকতে হবে···তুমি মজাসে পারবে তোমার মার্সেডিজ্‌কে বিবাহ করতে।

ফার্নান্দ্‌ বললে,—কিন্তু কি করে তা হবে? দান্তে কারো কিছু ক্ষতি করেনি কখনো··কাকেও খুন করেনি··· কোনো অপরাধ করেনি কোনোদিন!

হেসে ডাঙ্গ্‌লার্স বললে,—না, তা করেনি! তবে, জানো না তো রাজ্যের বিধি···কেউ যদি 'বোনাপার্টিষ্ট' হয়—মানে, এল্‌বা-দ্বীপে নির্ব্বাসিত নেপোলিয়ন বোনাপার্টির গুপ্তচরের কাজ করে, আর সে কাজের জন্য এল্‌বার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তাহলে তার কি নির্ম্মম শাস্তির ব্যবস্থা আছে! এ ধরণের লোকের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা— 'গিলোটিন', না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড!

ফার্নান্দ্‌ বললে,—কিন্তু এডমণ্ড দান্তে···

বাধা দিয়ে ডাঙ্গ্‌লার্স বললে,—আমি জানি, দান্তে এবারে দেশে ফিরতি-পথে জাহাজ নিয়ে এল্‌বায় গিয়েছিল···সেখানে কি যেন একটা পুলিন্দা দিয়ে, এল্‌বা থেকে একখানি গোপন-চিঠি নিয়ে এসেছে। তার প্রমাণ আছে!

ফার্নান্দ্‌ বললে,—তুমি সে প্রমাণ দেবে? ··

মাথা নেড়ে ডাঙ্গ্‌লার্স জবাব দিলে,—উঁহু! আমি এর মধ্যে থাকবো না···নিজে যদি ফ্যাসাদে পড়ি শেষে! ···বরং আমি একখানি উড়োচিঠি ছাড়বো আদালতের নামে··তাতে শুধু এ খবরটুকু জানাবো···ব্যস্—তাহলেই আর দেখতে হবে না···দান্তে বাছাধন বেমালুম সাফ্‌ হয়ে যাবে!

মতলব জাগার সঙ্গে সঙ্গেই সরাইখানার টেবিলে বসে ডাঙ্গলার্স তখনি একখানি চিঠি লিখলো আদালতের বড়কর্ত্তার নামে—তবে চিঠিতে নাম সই করলো না··· কোনো ঠিকানাও দিলে না···শুধু লিখলো—এডমণ্ড দান্তে এল্‌বায় গিয়েছিল···সেখানে পুলিন্দা পৌঁছে দিয়ে একখানি গোপন-চিঠি নিয়ে এসেছে···প্যারিসে ওর সঙ্গী একজন 'বোনাপার্টিষ্টের' হাতে!

আদালতের বড়কর্ত্তার নামে উড়োচিঠি লিখে ডাঙ্গলার্স দিলে ফার্নান্দের হাতে···এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে ফার্নান্দ নিজের হাতে ফেলে দিয়ে এলো পোষ্ট-অফিসের ডাক-বাক্সে!

ক্রমশঃ
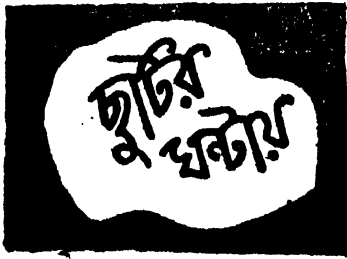
চিত্রগুপ্ত
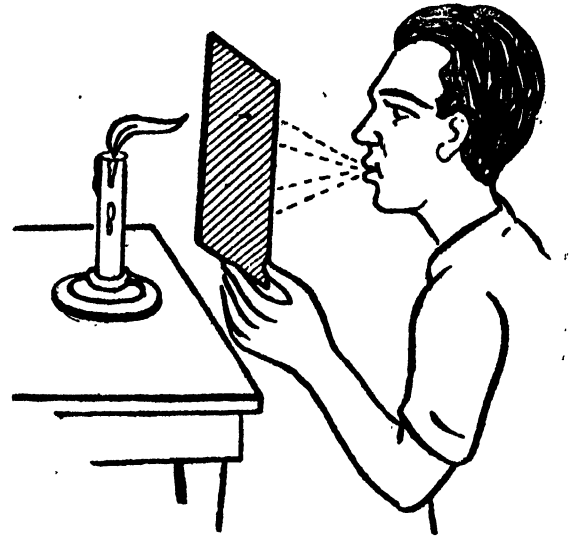
এবারে বিজ্ঞানের যে নতুন খেলাটির কথা তোমাদের বলছি সেটি ভারী আজব মজার। এ খেলার কলা-কৌশল খুবই সহজ-সরল···তাছাড়া খেলাটি দেখানোর জন্য নিতান্ত টুকিটাকি যে কয়েকটি উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলি জোগাড় করা এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়···তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই এগুলি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবে। তবে উপকরণ সামান্য হলেও, খেলাটির কলা-কৌশল ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়ে, তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে এটি ঠিকমতো দেখাতে পারলে, তাঁদের সবাইকে তোমরা যে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দেবে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গ ক্রমে, আরো বলা যেতে পারে যে, এ খেলাটি থেকে শুধু যে নিছক আনন্দ-উপভোগ করবে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের অভিনব-বিচিত্র বিশেষ একটি রহস্যময়-তথ্যেরও সুস্পষ্ট-পরিচয় পাবে।

এই মজার খেলাটি দেখাতে হলে, যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, আপাততঃ তারই একটা মোটামুটি ফর্দ জানিয়ে রাখি তোমাদের। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—একটি মোমবাতি, একবাক্স দেশলাই, অন্ততপক্ষে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া মাপের চৌকোণা-ছাঁদের এক টুকরো কার্ডবোর্ড বা কোনো বাঁধানো বই-খাতার শক্ত মলাট। এই কয়েকটি সামান্য ঘরোয়া-সামগ্রী জোগাড় করতে তোমাদের কারো কোনো অসুবিধা হবে না বলেই ধারণা হয়।

যাই হোক, এবারে বলি শোনো—এ খেলার মজার কলা-কৌশলের কথা।

খেলাটি দেখানোর সময়, গোড়াতেই খুব সাবধানে দেশলাই-কাঠির সাহায্যে মোমবাতির পল্‌তেটিকে জ্বালিয়ে নাও। পল্‌তেটি জ্বালিয়ে নেবার পর, মোমবাতিটিকে পাশের ছবির ভঙ্গীতে খাড়া-সিধাভাবে সমতল টেবিল বা ঘরের মেঝের উপরে বসিয়ে রাখো। এ কাজ সারা হলে দর্শকদের মধ্যে কাকেও ডেকে এনে জ্বলন্ত-মোমবাতির সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বলো—মোমবাতির জ্বলন্ত শিখার দিকে সজোরে ফুঁ দিতে। তোমার কথামতো জ্বলন্ত-মোমবাতির শিখার দিকে তিনি সজোরে ফুঁ দিলেই দেখবে যে সনাতন রীতি-অনুসারে বাতাসের ধাক্কায় বাতির শিখাটি তাঁর মুখের বিপরীত-দিকে হেলে পড়েছে। এটুকু হলো—খেলার অবতারণা মাত্র· আসল-মজা সুরু হবে এ ঘটনার পর থেকে। অর্থাৎ, সেই দর্শকটি মোম-বাতির জ্বলন্ত-শিখার দিকে ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বলবে যে, এবারে এমন বিচিত্র-কায়দায় আবার ফুঁ দিন যে মোমবাতির শিখাটি যেন তাঁর মুখের বিপরীত-দিকে হেলে না পড়ে, বরং তাঁর মুখের পানেই এগিয়ে যায়! আসরে সকলের সামনে নিজের সম্মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি হয় তো বার-বার নানান্ কায়দায় মুখের সামনে খাড়াভাবে সাজিয়ে রাখা মোমবাতির জ্বলন্ত-শিখার পানে জোরে ও আস্তে ফুঁ দিতে থাকবেন···কিন্তু তাঁর সেই ফুঁয়ের বাতাসের ধাক্কায় প্রতিবারই মোমবাতির জ্বলন্ত-শিখা আগের মতোই তাঁর মুখের বিপরীত-দিকে হেলে পড়বে···কোনোমতেই উল্টোদিকে, অর্থাৎ, তাঁর নিজের মুখের পানে এগিয়ে আসবে না! এমনিভাবে বার-বার চেষ্টার পর তিনি যখন শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে হার মানবেন, তখন ঐ তিন-চার ইঞ্চি লম্বা চওড়া মাপের চৌকোণা-কার্ডবোর্ড বা বই-খাতার মলাটের টুকরোখানি হাতে তুলে নিয়ে উপরের ছবির ভঙ্গীতে খাড়া-সিধাভাবে সাজিয়ে-রাখা জ্বলন্ত-মোমবাতির শিখার সামান্য দূরে রেখে কার্ডবোর্ডখানির অন্যদিক থেকে তুমি সজোরে ফুঁ দাও। তাহলেই দেখবে—মোমবাতির জ্বলন্ত-শিখা আর আগের মতো তোমার মুখের বিপরীত-দিকে হেলে পড়ছে না··
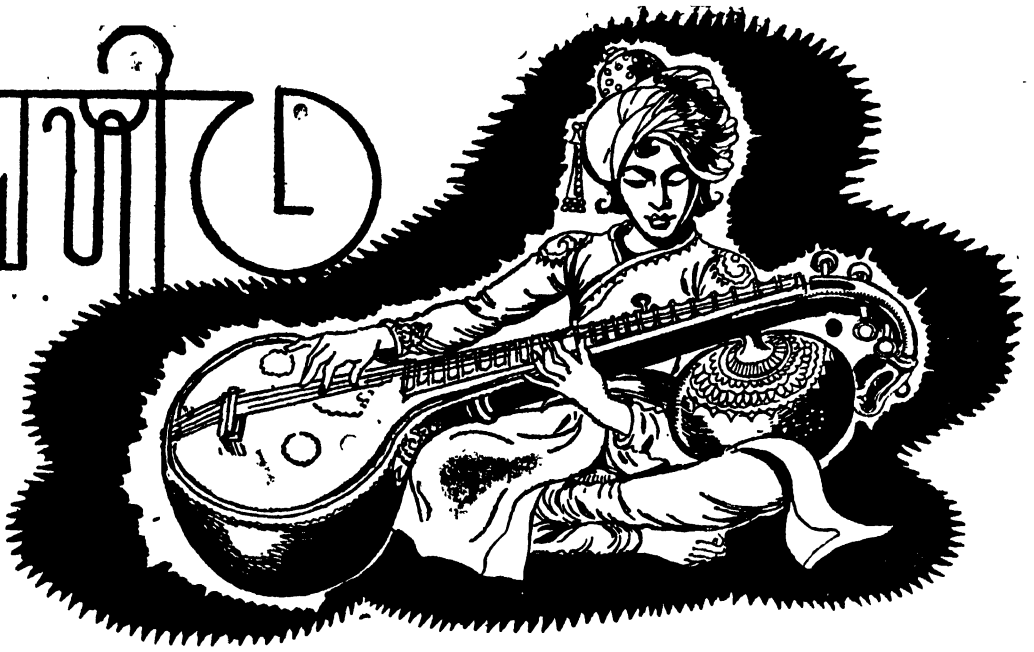
রাসে গোপী প্রার্থনম্

মূল সংস্কৃতঃ

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ

চন্দ্রচারুকর চুম্বিত গগনে ফুল্লকুসুমচয়সুরভিতপবনে
চঞ্চল চরণে ধাবতি হরিণে
মিলিতুমিহ ত্বং কিং ন ত্বরসে ?
গায়তি কুঞ্জে কোকিল পুঞ্জে
মধুকরনিকরে গুঞ্জন মুখরে
তরুগণবিটপে সশিখিকলাপে
কুহু বত রমণীবল্লভ ! রমসে।
রাসমণ্ডলমত্র সুশোভং কুসুমগুচ্ছকৃতলোচনলোভম্ !

জলধররম্যং নীলকদম্বং
ত্যজসি কথং নো বিরহং সহসে ?
তব শুভবিগ্রহদর্শনকামা বয়মিহ মিলিতা ললিতা বামাঃ।
স্বজনবিযুক্তা বিজনমুপেতা
জানন্নপি নচ্ছলতো দয়সে।
এহি বিরহদহনাকুল হৃদয়াং শীতলয় ত্বং প্রিয়তম ! দয়য়া
রোদিতি রজনী হিমকরজননী
নম্ন কথমকরুণভাবং বহসে ?

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থের অপরূপ পদলালিত্যে ও ভক্তিভাবে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর "রাসে গোপীপ্রার্থনম্" গানটির আমি অনুবাদ করেছি যাতে একই সুরে দুটি গানই গাওয়া যায়। বাংলা অনুবাদটি ত্রিমাত্রিক তালে গাইতে শিখলেই যে-কোনো সঙ্গীতজ্ঞ মূল গানটি সেই সুরের ছকে সহজেই ফেলতে পারবেন কেবল তাল বদলে—অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ছন্দে গেয়ে।

ইতি।—সুরকার

চারুচন্দ্রিকা মঞ্জু গগনে কুসুম গন্ধ বিধুর পবনে
চপল চরণে খেলিছে হরিণ, তবু তো তুমি আসিলে না ?
গাহিছে কোকিল উছলি' কানন, ফুলে ফুলে
অলি করে গুঞ্জন,
ময়ূর কলাপ মেলি' নাচে দেখ, তুমি শুধু দেখা দিলে না !
দেখ, সখি, রাসমঞ্চ কেমন কুসুমগুচ্ছে শোভে বিমোহন !

অম্বুদসম ঘেরে কদম্ব, তুমি তো সম্ভাষিলে না !
দরশন পেতে বন্ধু, তোমার ছেড়ে প্রিয়পরিজন সংসার
এসেছি অবলা বাহিয়ে বিজনে, তুমি তো আলো
হাসিলে না।
বিরহের তাপে আকুল-হৃদয় করো গো শীতল বরায়ে প্রণয়,
অশ্রুশিশিরা রজনী কাঁদিছে, তুমি যে ভালোবাসিলে না।

সুর ও অনুবাদ— —শ্রীদিলীপকুমার রায়

না না র্সনা ধনা ধপা ধা I গা পা পধা নর্রা র্সা না I র্সা র্রা র্রা র্রা র্রা র্সনা I
চা রু চন্ দ্রি কা ম - ধু গ গ নে কু সু ম গ ন্ ধ
র্সা র্গা র্রা নর্রা র্সা না I র্সা র্সা র্সনা পনা না না I পধা ধা ধা ক্ষপা পা পা I
বি ধু র প ব নে চ প ল চ র ণে খে লি ছে হ রি ণ
সা রা গা পা ধা না I গা র্গা র্রা র্সা -া -া I
ত বু তো তু মি আ সি লে না - - -
তু মি শু ধু দে খা দি লে না - - -
তু মি তো স ব্ ভা ষি লে না - - -
তু মি তো আ লো হা সি লে না - - -
তু মি যে ভা লো বা সি লে না - - -
সা সা সা পা পা -া I রা রা রা ধা ধা -া I ক্ষা ক্ষা ক্ষা না না না I
গা হি ছে কো কি ল উ ছ লি কা ন ন্ ফু লে ফু লে অ লি
পা পা পা র্সা র্সা -া I র্সা র্গা র্রা নর্রা র্সা না I ধা র্সা ণা পনা ধা ধা I
ক রে গু - ঞ্জ ন্ ম য়ূ র ক লা প মে লি' না চে দে খ
র্সা র্সা র্সা পা পা পা I না -া না মা মা -া I ধা ধা ধা গা -া গা I
দে খ ম রি রা স ম - ঞ্চ কে ম ন কু সু ম গু চ্ ছে
পা পা পা সা সা -া I সা র্সা র্সা রা র্র র্রা I গা র্গ র্রা না রা র্সা I
শো ভে বি মো হ ন্ অ ম্ বু দ স ম ঘে রে ক দ ম্ ব
গা মা মা পা পা ধা I মা ধা পা মপা গা মা I গা মা পা ক্ষা পা ধা I
দ র শ ন পে তে ব ন্ ধু তো মা র্ ছে ড়ে প্রি য় প রি
দা ধা না র্রা র্সা -া I মা র্রা র্রা না র্গা র্গা I পা না না পা র্রা র্সা I
জ ন স ং সা র্ এ সে ছি অ ব লা বা হি রে বি জ নে
র্সা র্সা ণা ধা ধা ণা I পা পা ধা ণা ধণধা পা I পা ধা পধপা মা গা মা I
বি র হে র তা পে আ কু ল হৃ দ য় ক রো গো শী ত ল্
মা পা ধা ক্ষপা পা -া I ধা -া ণা পধা পা পা I পা ধা র্সা র্রা র্গা র্রা I
ঝ রা য়ে প্র ণ য় অ - শ্রু শি শি রা র জ নী কাঁ দি ছে

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)
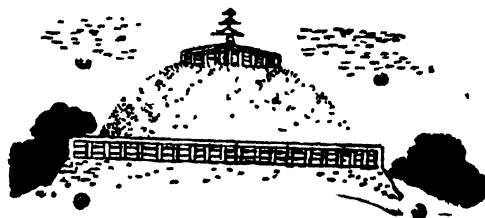
ইহার পর বটতলায় ৺জয়চাঁদ মিত্রের পুত্র শ্রীপাঁচকড়ি মিত্রের উদ্যোগে ৩১৯ নম্বর চিৎপুর রোডের বাড়ীতে "পদ্মাবতী" অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। ১২৭৪ সালের ৩০ ভাদ্র (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর) শনিবার ঐ বাড়ীতে উহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতাদের নাম,—

ইন্দ্রনীল	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
মন্ত্রী সারথি কঞ্চুকী অঙ্গিরা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
কলি	জীবনকৃষ্ণ সেন।
বিদূষক	মণিমোহন সরকার।
নাগরিক ১ম	চণ্ডীচরণ ঘোষ
ঐ ২য়	পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
দ্বারবান ১ম	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শচী	হেমচন্দ্র ঘোষ
গৌতমী	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
মুরজা	শীতলচন্দ্র বসু।
পদ্মাবতী	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বসুমতী	হরিদাস দাস (বৈষ্ণব)
পরিচারিকা	অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বিহারীবাবু অভিনয় শিক্ষা দিতেন। গায়ক জোয়ালা-প্রসাদ ও বাদক নিতাই চক্রবর্ত্তী (রামাৎ বৈষ্ণব) সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। দুই একটি অভিনয়ে মাইকেল উপস্থিত ছিলেন। বাগবাজারনিবাসী ৺শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যিনি ন্যাশনাল থিয়েটারে "নীলদর্পণে" দেওয়ান সাজিতেন, তিনি) এই দলে ছিলেন, কিন্তু কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। পদ্মাবতীর অভিনেতা শিববাবু স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

এই সময় চোরবাগানে "চোরবাগান অবৈতনিক থিয়েটার" স্থাপিত হইয়াছিল। কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি এই থিয়েটারের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। "ঊষা-অনিরুদ্ধ নাটক" অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের এক শাখা (শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র) হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় জামাতা) ও "আপনার মুখ আপনি দেখ" প্রণেতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। চোরবাগানের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে (কানাইবাবুদের বাড়ীতে) এই সমিতির অভিনয় হইত। এই অভিনয় দেখিয়া ভোলানাথবাবু হেমেন্দ্রবাবুর নিকট প্রস্তাব করেন, যদি অভিনয় করিতে হয়, তবে এ সকল যাত্রার উপযোগী বিষয় অভিনয় করিয়া ফল কি? যাহাতে দেশাচার সংশোধিত হয়, এরূপ সামাজিক বিষয়ের অভিনয় করাই উচিত। তাহার পর

পরামর্শ স্থির হইল, হেমেন্দ্রবাবু অভিনয়ের উদ্যোগ করিবেন, ভোলানাথবাবু একখানি উপযুক্ত পুস্তক লিখিয়া দিবেন। এই সূত্রে ভোলানাথবাবু "বুঝলে কি না" প্রহসন লেখেন। এই সময়ে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বংশের এক শাখা উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুর স্বীয় বাটীতে (১০ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে) একটী একতান-বাদনের দল গঠন করেন। একদিন অতীন্দ্রবাবুর বৈঠকে ভোলানাথবাবু "কিছু কিছু বুঝি" নামে নূতন প্রহসন লইয়া উপস্থিত হইলেন। উহা অভিনয় করাই স্থির হইল। কয়লাহাটায় (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো) বৈষ্ণনাথ মল্লিকের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে (যে বাড়ীতে হেমেন্দ্রবাবুরা থাকিতেন সেই বাড়ীতে) অভিনয় করিবার ব্যবস্থা হয়। হেমেন্দ্রবাবু ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর উপর দল গঠনের ভার পড়িল। নাট্যাভিনয় কার্য্যে অর্দ্ধেন্দুবাবুর এই হাতেখড়ি। চোরবাগানের কানাই বাবু সেক্রেটারী হইলেন। ইঁহাদের বন্ধু ব্যাঁটরানিবাসী মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নামক এক জন অয়েল-পেণ্টার, ইঁহাদের নাট্যশালা-চিত্রণের ভার পাইলেন। অতীন্দ্রবাবু, হেমেন্দ্রবাবু ব্যতীত ৺রমানাথ ঠাকুরের পৌত্র শশীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহাদের একজন পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই দলের আয়োজন হইল। মুস্তফী মহাশয়ের স্বরভঙ্গী ও অনুকরণ-পটুতাই তাঁহার শিক্ষকতার অনুকূল হইল। ১২৭৪ সালের ১৭ কার্ত্তিক (১৮৬৭।২রা নভেম্বর) শনিবারে ইহার প্রথমাভিনয় হয়। মুস্তফী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাল্যবন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর এই দলে যোগদান করেন। তিনি রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের ভার প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহারও এই হাতেখড়ি, তিনি ইহাতে স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনেতাদের নাম,—

নট	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
খদ্যোতেশ্বর	বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
দন্তবক্র	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
মুরাদআলী	" "
চন্দনবিলাস	" "
গুরুজী	শশিভূষণ দাঁ
কলু	বেণীমাধব মিত্র
বিনোদ	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
চন্দনবিলাসী	ধর্ম্মদাস সুর
বরদা	পূর্ণ মুখোপাধ্যায়
বৈষ্ণবী	কার্ত্তিকলাল মিত্র

এতদিন যেখানে যত প্রহসনের অভিনয় হইয়াছিল, এই প্রহসনের অভিনয় সে সমস্ত অপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল। এই অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু তিনটি বিভিন্ন অংশের অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে সুসঙ্গত প্রকারের অভিনয়ে তাঁহার নিপুণতা এই সময়েই পূর্ণ বিকশিত ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার এক অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "মৃত্তিকেরে বাবা মৃত্তিকে" অর্থাৎ অন্য সকলকে মাটী করিল। মুস্তফী মহাশয় ও ধর্ম্মদাস সুরের এই প্রথম অভিনয়, এই অভিনয়েই তাঁহাদের জীবনের গতি ফিরিয়া গেল।

এই স্থানে বাঙ্গলার সাধারণ নাট্য সমাজের প্রধান অভিনেতৃগণের ও স্থাপয়িতৃগণের কে কবে প্রথম কোথায় কি অভিনয় করেন, তাহার একটা তালিকা দিতেছি,—

নাম	সময়	পুস্তক	ভূমিকা	স্থান
৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	১২৬৩ ফাল্গুন	কুলীনকুলসর্ব্বস্ব	স্ত্রীচরিত	চড়কডাঙ্গা জয়রাম বসাকের গলি
৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ	ঐ	শকুন্তলা	"	ছাতুবাবুর বাড়ী
গিরীশচন্দ্র ঘোষ (স্থূলকায়)	১২৭১	নলদময়ন্তী	ঋষি	বাগবাজার মদনমোহনের বাড়ী
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৭৩	পদ্মাবতী	কঞ্চুকী	শুঁড়িপাড়া
জীবনকৃষ্ণ সেন	১২৭৪ ভাদ্র	"	কলি	বটতলা
অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী	১৭ কার্ত্তিক ১২৭৪	কিছু কিছু বুঝি	দন্তবক্র	কয়লাহাটা
			মুরাদআলী	"
ঐ		ঐ	চন্দনবিলাস	"
ধর্ম্মদাস সুর	ঐ	ঐ	চন্দনবিলাসী	"

গিরীশচন্দ্র ঘোষ (প্রসিদ্ধ নাটককার), অমৃতলাল বসু, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি স্বনামখ্যাত অভিনেতারা কেহই এত অধিক পূর্ব্বে নাট্যে মিলিত হন নাই।

শিবের ঘরে কেষ্টার মেয়ে,
পেঁচার মত রৈল চেয়ে,
শকুনি ঢাকা গঙ্গায় নেয়ে করলে পলায়ন।
খেয়েছি অসহ্য মদ
দিয়েছি কার কেশে পদ,

"কিছু কিছু বুঝি" অভিনয়ে মাইকেল ব্যতীত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, গৌরদাস বসাক, কালীপ্রসাদ ঘোষের পুত্রগণ, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভগিনীপতি) উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ে নিম্নলিখিত গানটি গীত হয়—

"ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু করে দুনয়ন।
রাবণ মারিল রামে কাঁদে দুর্য্যোধন॥
না বুঝে করেছি নেশা
কোথায় আমার রৈল পেশা
এলকেশে এলকেশা, করিবারে রণ।
দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো,
পদীরে পেয়েছে পেঁচো
বিদ্যে হল গর্ব্ববতী, ঠাকুরের লিখন॥

এতো নহে কম বিপদ, কামড়ো না এখন॥
একি হল দাঁতের জ্বালা,
লোকালয়ে বিষম জ্বালা,
কানেতে করিল কালা, বিকট বদন॥

এই গানটি সুপ্রসিদ্ধ "ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু করে দুনয়ন, কোথায় রহিল আমার সে বিধুবদন॥" (ইত্যাদি) গানের সুরে ও তাহারই শ্লেষ (Parody) রূপে রচিত। ভোলানাথবাবুই গানটির রচয়িতা। তখন কবি, পাঁচালী, খেউড়ের আমোদে দেশ পরিপূর্ণ। কবিতায় শ্লেষ বিদ্রূপ পাইলে লোক আমোদে নাচিয়া উঠিত। এতদ্ব্যতীত তখন যুবক এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপান, বিলাস এবং আমোদের স্রোতে এমন অভীভূত হইয়া

পড়িয়াছিল যে মদ্যপান করি না বলিতে লোকে লজ্জাবোধ করিত। এ সময়ে যে সকল নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হইত, প্রত্যেক সম্প্রদায়েই মদের স্রোত বহিয়া যাইত। মদের অকাতর ব্যয় করিতে না পারিলে তখন দল জমান দুরূহ হইত। অনেক দলে এই মদের জন্য অভিনয়ের সময়েও অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত। যখন দেশের রুচির এই অবস্থা, তখন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (ইনি তখনকার যাত্রা, পাঁচালী তরজার ছড়া ও পালা বাঁধিতেন) গ্রন্থকার হওয়াতে অতর্কিত ভাবে গানটি "কিছু কিছু বুঝি'র দলে গীত হইয়াছিল। গানটিতে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ ছিল, গালি ছিল না।

"এলকেশে এলকেশা"—শ্রীযুক্ত (মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর নাট্যশিক্ষক কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

"দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো"—বাগবাজারের নলদময়ন্তীর অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য।

"পদ্মীরে পেয়েছে পেঁচো"—বটতলার পাঁচকড়ি বা পঞ্চানন মিত্রের উদ্যোগে পদ্মাবতীর যে অভিনয় হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য।

"বিদ্যে হল গর্ভবতী, ঠাকুরের লিখন"—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য।

"শিবের ঘরে কেষ্টার মেয়ে"—শোভাবাজারের রাজা শিবকৃষ্ণের বাড়ীতে কৃষ্ণকুমারী অভিনয়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

"শকুনি ঢাকা গঙ্গায় নেয়ে"—ঐ সময়ে গঙ্গার অপর পারে শকুন্তলার অভিনয় হইবার উদ্যোগ হইতেছিল। সেই দলের প্রতি শ্লেষোক্তি।

"খেয়েছি অসহ্য মদ"—সাধারণতঃ মদ্যপ অভিনেতার প্রতিলক্ষ্য।

"একি হল দাঁতের জ্বালা"—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতি লক্ষ্য।

[ক্রমশঃ

হ্রদ-নগরী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

হে হ্রদ-নগরি, নয়নাভিরাম
প্রীতি-পুলকিত আলোকের ধাম,
খুঁজিতে খুঁজিতে হেথায় এলাম
শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে।
তোমার আলোক তব সমীরণ,
আলাপ-আকুল গৃহ-বাতায়ন,
অলিন্দে বোনা আল্‌তো স্বপন
কী যেন কি যায় ক'য়ে!

(২)

গৃহবলিভুক পাখী-পাখালীরা
প্রাঙ্গণ-পাশে সুখে করে ক্রীড়া;
পালিত প্রাণীরা করে ঘুরা-ফিরা,
ডাকে কভু খুসীভয়ে।
রাজপথ-পাশে শাখী সারি সারি
কত কথা কয় শাখা-বাহু নাড়ি';
পুষ্প-পাতারা করে ঠারাঠারি,
আলো লোফালুফি করে।

(৩)

উজল আলোকে করে ঝিলমিল্
মেঘ-ফুল-বোনা অতি অনাবিল
আকাশ-চাঁদোয়া নির্ম্মল নীল;
শোভা তব তা'রই তলে
পরাণে পরাণে পিয়াসার আশা,
চারু চমকিত ভীরু ভালোবাসা,
চকিত থকিত ফেনায়িত ভাষা
বুনিয়া বুনিয়া চলে।

(৪)

হে হ্রদ-নগরি, সরণী বাহিয়া
আবেগ-উৎস-ধারায় নাহিয়া,
গুন্-গুন-গান নীরবে গাহিয়া
এসেছি তোমারই গেহে।
আহ্বান-লিপি পাঠালে গোপনে,
প্রতীক্ষা তা'রই ছিল নাকি মনে।
কত কাল ধ'রে তা'রই আয়োজনে
নিয়োজিত ছিলে স্নেহে।

(৫)

শ্রান্ত চরণ—ক্লান্ত এ কায়া ;
সমাদর-ভরা তবু তব মায়া
নিভৃত এ চিতে ফেলে চলে ছায়া।
উতলা পরাণে তাই।
তোমার মাধুরী চুরি করে নিয়ে,
তা'রই নিষেবিত রস-ধারা দিয়ে,
নিজেই নিজেরে রসেতে রসিয়ে
গত ব্যথা ভুলে যাই।

(৬)

আমি যাযাবর—ঠাই হারা নর
পথে গ'ড়ে চলি চলন্ত ঘর
কত অনাদর—কত সমাদর
স্মৃতির ঝুলিতে ভরি।
কত ভুলে যাই, কত ফেলে যাই,
কত কী আবার হারায়ে কুড়াই,
পথেই পথের পাথেয় ফুরাই
স্বপনও ভাঙিয়া গড়ি।

(৭)

এই ভাঙা-গড়া চিরদিন কার ;
কালের বেলায় হয় তো বা তা'র
স্মৃতি-রেখা থাকে লহরী-লীলায় ;—
ইতিহাস তা'রই নাম।

হে হ্রদ-নগরি, তুমি তব বুকে
তা-ই বুঝি ধ'রে রাখো স্মৃতি-সুখে !
তা'রই উদ্ভাস হেরি ওই মুখে,
বুঝি মানুষেরও দাম।

(৮)

তুমি দাম দিলে, তব আহ্বানে
যেতে যেতে পথে বুঝি তব টানে
পান্থ-পরাণ লভিল পরাণে
ক্ষণ-বিরতির সুধা।
হঠাৎ হঠাৎ হয়তো এ ভাবে
কেহ তো জানে না কখন্ কে পাবে
হ্রদ-নগরীতে যাহে মিটে যাবে
ঐহিকতারও ক্ষুধা

(৯)

হে হ্রদ-নগরি—মহাফেজখানা
ভাণ্ডারে তব জানা—নাহি-জানা
পুঞ্জিত সুধা ; তা'রই যে নিশানা
মেলে যে নিমন্ত্রণে।
এরই লাগি' বুঝি পরাণ ধারণ !
এরই লাগি' বুঝি চলা অ-বারণ !
অমরত্বেরও স্বাদ আহরণ
চকিতে শুভ ক্ষণে।

(১০)

হে হ্রদ-নগরি, কিরণ তোমার
ঝল্মল্ করে ; দীধিতিতে তা'র
শ্রান্ত পান্থ পায় আপনার
পন্থে চলার ভাতি !
ভয় নাই আর, সঙ্গ পেয়েছি ;
বুঝি প্রাণে মনে ইহাই চেয়েছি ;
এরই পিপাসায় এ পথও বেয়েছি ;
আসুক্ এবার রাতি।
ভয় নাই আর নিভুক এবার
নিশারও দিশারীবাতি।
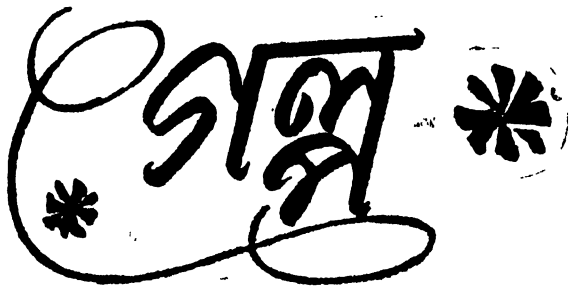
একটি মুকুলের বৃন্তচ্যুতি

কল্যাণী রায় চৌধুরী

গাঢ় নীল রংএর ল্যাণ্ডমাষ্টার গাড়ীখানা যখন দমদমের দুকামরা বিশিষ্ট কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো, সারা তল্লাটের দৈনন্দিন জীবনে একটি ঢিল পড়লো যেন—শান্ত পুকুরের জলে যেমন ঢিল পড়ে। এক সাথে এ বাড়ী ও বাড়ী থেকে কয়েক জোড়া উৎসুক চোখ ইসারায় ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসায় কথা কয়ে গেল। গাড়ী থেকে নেমে এলেন মিসেস্ ব'ব্যাল—ডিসেম্বরের কন্‌কনে ঠাণ্ডাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যেন একখানা জর্জ্জেট শাড়ী সারা অঙ্গে জড়ানে' ' ান ব্লাউজের হাতা দুই ইঞ্চি, কোমরের উপরে চা' ইঞ্চি, আর কাঁধের নীচে চার ইঞ্চি নিষিদ্ধ এলাকা বাঁচিয়ে ব্লাউজের ছাটকাট। চোখে গগল্‌স এবং হাতে মর্য্যাদার থলি।

মিসেস বটব্যাল বাড়ীর ভেতরে এলেন—খোকার মা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বল্‌লেন—"এস ভাই এস, কি যে ভাগ্য আমার, তুমি খোকাকে নিতে এসেছ। ও খোকা এসো প্রণাম করো।" ন্যাড়া মাথা নিয়ে এক পা দুপা করে খোকা এগিয়ে এলো, আস্তে আস্তে মিসেস্ বটব্যালের পায়ের ধুলো নিয়ে হাসি হাসি মুখ করে পাশে দাঁড়ালো,—মিষ্টি মিষ্টি চোখে পিট্ পিট্ করে হেসে হেসে বল্‌লো—"আজই যাব মা?" "হ্যা বাবা, তোমার কাকীমা যে তোমাকে নিতে এসেছেন।" কাকীমা! খোলা খোলা চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে কাকীমাকে একবার ভাল করে দেখে নেয় খোকা, তার মা, দিদি, দিদিমা এ পাড়া ও পাড়ার মাসীমা কারো সাথেই মিল নেই কাকীমার। তবু মা বলছেন কাকীমা, হ্যাঁ কাকীমাই তো, ও শুনেছে বাবার আপন মামাতো ভাই হয় কাকাবাবু। কাকীমার চেহারা কি সুন্দর। কোথায় যেন কোন্ চিত্রতারকার সাথে মিল ও আছে,—আর এই কাকীমার বাড়ী থাকা, সে তো মহা ফুর্ত্তির ব্যাপার। কাকাবাবুর গাঢ় নীল রংএর মস্ত বড় গাড়ী। গল্পের স্বপনপুরীর মত নাকি কাকাদের বাড়ীটা! একটা অশান্ত সন্ত ডানা উঠা পাখী কল্পনার পাখায় ভর করে কাকীমার বাড়ীর দিকে ছুটে যেতে চায়, মুক্তি চায় উদার আকাশের মাঝে। দমদমের কোয়ার্টারের ছোট্ট উঠানে আকাশভরা সূর্য্যের আলো উছলে পড়ে কিন্তু, ঘরের মধ্যে নিরুত্তাপ ভাই বোনগুলোর সাথে রোজ সোনার সকালে মুড়ি আর নুন নিয়ে মারামারি করতে হবে না। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় একটা সুতীর সোয়েটার পরে দুপুরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা ভাত ঠাণ্ডা তরকারী দিয়ে পরম তৃপ্তিতে যারা খায় সেই পিণ্টু, নন্ত, ভণ্টু, সন্তটা আর ভোলাটা থাকগে পড়ে এখানে··· সে মস্ত বড় হবে জীবনে। লেখাপড়া শিখবে, বাবার আপিসে ঐ যে নতুন নতুন সব ইঞ্জিনীয়ার—ও তাদের মত বড় হবে—অনেক টাকা আনবে। মাকে আর সকাল বেলা উঠে বাসন মাজতে হবেনা-দিদিটাকেও একটা শাড়ী কিনে দেবে—কাকীমার মত শাড়ী। দিদি ওকে কত ভাল-বাসবে তাহলে। মার আমসত্বের হাঁড়ি থেকে লুকিয়ে বেশী করে আমসত্ব এনে দেবে খোকাকে। আর ঐ ভোলাটা—ওটাকে কিছু দেবেনা খোকা—যেমন হাড় জিল্‌জিলে তেমনি পাজী। রোজই তো একলা দু'খানা রুটী খায়—তাইতেই তো মায়ের রুটী থাকে না। বাবার দুধের বাটীটা আবার জল দিয়ে ধুয়ে খায়, এমন হাড়-হাবাতে! দেখতে দেখতে পিণ্টু, নন্ত, ভণ্টু, সন্ত আর ভোলা আস্তে আস্তে গুটী গুটী করে মায়ের চারধারে ঘিরে আসে—একটা শোলমাছ যেমন একদল ছানা নিয়ে

মাঝ পুকুরে থম্‌কেদাঁড়ায়—আর খাবি খায়, তেমনি ঢোক গিলে গিলে মা বলেন তোরা সব প্রণাম কর কাকীমাকে। পিল-পিল করে এক পাল হাড় জিল্‌জিলে ন্যাড়া নিরুত্তাপ ছেলে প্রণাম করে কাকীমাকে। দেখতে দেখতে কয়েকটি উৎসুক মুখ দেখা দেয় খোকনদের কোয়ার্টারে, ইতিমধ্যে যে যার বৈকালিক প্রসাধন সেরে আগন্তুককে দেখতে এসেছে। খোকার মা চা করে আনেন—চা আর দোকানের কেনা নিম্‌কি। মিসেস বটব্যাল মৃদু আপত্তি করে চা এর পেয়ালায় চুমুক দেন, নিম্‌কিগুলো ভাগ করে দেন সারিবদ্ধ ক্ষুধার্ত্তদের মধ্যে, সমস্ত ঘরে একটি হুড়োলুটি শুরু হয়ে যায়—আবার থেমেও যায় নিমেষে। ইতিমধ্যে খোকন তার টিনের রঙ্গীণ স্যুটকেসটা গুছিয়ে একেবারে তৈরী হয়ে দোর গোড়ায় দেখা দেয় বলে—"আমার হয়ে গেছে কাকীমা।" ঠাকুরমা বলেন—তোমার মাকে প্রণাম করো খোকন। মাকে প্রণাম করে ঠাকুরমার পায়ের ধুলো নিতে নিতে—আবার ঠাকুরমার কাছ থেকে আদেশ আসে—তোমার বাবার ফটোতে প্রণাম করো খোকন—এবারে ঠাকুরমার গলা একেবারে কান্নায় আচ্ছন্ন। বাবার ফটোটাকে প্রণাম করে, ঐ ফটোর তলায় রাখা ফুল থেকে একটি তুলে মাথায় ছোঁয়ায় খোকা, তারপর ফুলটি রেখে দেয় পকেটে। তারপর উঠে আসে কাকীমার সাথে কাকীমার গাড়ীতে—শীতের স্বল্পায়ু প্রহর ইতিমধ্যে শেষ হয়ে আসে, পশ্চিম আকাশের আবির গোলা আলোতে খোকার চোখে সবই ঝাপসা হয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর ঠাকুরমা, দিদি, পিণ্টু, নন্তু, ভণ্টু সন্তু, ভোলা সকলকেই ঝাপসা দেখে খোকন—দুহাত দিয়ে একবার বুঝি মুখও ঢাকে। মার ক্ষীণ দেহখানাকে বেষ্টন করে আছে নতুন-কেনা থানখানা—সব রিক্ততা সব দুঃখের নিশানা হয়ে। গাড়ী ততক্ষণে কোয়ার্টারের গেট পেরিয়েছে—বিশাল আকাশ একটুকরো ছেঁড়া মেঘের মত মনে হয়—মার ক্ষীণ সাদা থান জড়ানো দেহটাকে। ঝড়ে বিধ্বস্ত একটি নৌকার ছেঁড়া পালের মত মায়ের সাদা আঁচলটা দূরে মিলিয়ে যায়।

চৌরঙ্গীর আলোর রোসনাই-ধাঁধানো চোখে খোকা দেখে। সে আলো চোখ ধাঁধায়, কিন্তু মায়ের চোখের মত উজ্জ্বল নয়। পিণ্টু, সন্তু, ভোলাকে পড়ার সময় ে আলোর ভাগ দিতে হয় না। তাই সেই আলো পর প চোখ ধাঁধানো তবুও কেমন যেন ফিকে-ফিকে।

কাকীমা জিজ্ঞেস করেন—এ রাস্তায় আগে এসে খোকন?—হ্যাঁ এসেছি।

—কার সাথে এলে।

—একলাই এসেছি—বাবার জন্য ওষুধ কিনে নিতে।

—ও তাই নাকি? তুমি তাহলে এ রাস্তা জান।

—বাবার অসুখের সময় আমরা এই রাস্তা দিে রোজই হাসপাতালে যেতাম। জানেন কাকীমা, বাবা সব দামী দামী ওষুধের দামই আমরা কোম্পানী থেকে পাব?

—করুণা মেশানো সুরে কাকীমা বলেন—ও আচ্ছা।

—জানেন কাকীমা, বাবাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোম্পানী থেকে ট্রাকও পেয়েছিলাম আমরা। একটি কুকুর তো একেবারে চেপটেই গেল গাড়ীর তলায় ট্রাক পাওয়া, গাড়ীর তলায় কুকুর চেপটে যাওয়া, আ বাবার অকালে মৃত্যু—এর মধ্যে কোন যোগসূত্রই তা শিশু মনে আর খুঁজে পায় না তাই কথাটা বলে—নিজের মনেই কেমন বেওকুভ বনে যায়। সব কিছু কেমন ওলট পালট, কেমন তালগোল পাকানো মনে হয়—খোকার কাছে। কাকীমার সুন্দর শাড়ী, মায়ের স কেনা মোটা থান, চৌরঙ্গীর আলোর রোশনাই কোম্পানীর ট্রাকে বাবার মৃতদেহ—চন্দনে চর্চ্চিত আর নীল সুন্দর গাড়ীখানাতে বসে আছে খোকা—সব বাস্তব, কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া—পৃথিবীতে যা সত তাই কি এমনি একান্তই খাপছাড়া।

সাদার্ণ এভিনিউর মস্ত বাড়ীর ফটকে এসে থামে গাড়ীখানা। দারোয়ান এসে গেট খুলে দেয়। দুধারে মৌসুমী ফুলের কেয়ারী-করা লাল কাঁকর আর সাদা নুড়ির রাস্তা ধরে এগিয়ে আসেন কাকীমা, তাঁর পেছনে পেছনে আসে খোকা। মিসেস্ বটব্যাল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলেন—চা নিয়ে এসো বেয়ারা, আর খোকার জন্য দুধ এনো। চা আসে সুন্দর টি-পটে করে সাথে রকমারি বিস্কুট, খোকার জন্য দুধও আসে। খোকা কেন দুধ খাবে—এ প্রশ্নের মোকাবিলা নিজের মনে

করার চেষ্টা করে খোকা—দুধ খেতেন তার বাবা, দু-দুবার কার্শিয়াং টি, বি, সেনেটরিয়াম থেকে ফেরৎ বাবা। অসুখ না হলে যে কেউ দুধ খায়—এ ত জানা ছিল না তার! ভোলাটা মাঝে মাঝে খেতে চাইতো বটে, আর মা মারতেন; এতদিন যাবৎ খোকা ভেবেছিল দুধ খেতে চাওয়ার অবশ্য পাওয়াটা হলো, মার খাওয়া, এবং এটাই বুঝি নিয়ম। কিন্তু এখানে বুঝি অসুখ না হলেও দুধ খাওয়ার নিয়ম। বিস্ময়ে ধাক্কা লাগে খোকার। মিসেস্ বটব্যাল চলে যান—খোকা তেমনি বসে থাকে।

বেয়ারা এসে খোকাকে তার ঘরে নিয়ে যায়। বা! এই মস্ত ঘরখানাই তার। ঘরের এক কোণে শুভ্র নরম বিছানা। বইএর শেলফ, পড়ার টেবিল, টেবিলে টাইম-পিস্, উজ্জ্বল আলো। ঠিক সাড়ে আটটায় খাবার টেবিলে ডাক পড়ে। খাবারের সুগন্ধ এসে নাকে ঢোকে—সন্তু, পন্তু, ভোলা আর দিদিটাতো সেই দুপুরের ঠাণ্ডা ভাতের সাথে ঠাণ্ডা তরকারি···একি খোকন খাচ্ছনা কেন? খাও, সুপটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে—কাকাবাবুর গম্ভীর উদাত্ত গলায় আহ্বান! সুপ খাওয়া বুঝি এখানকার রেওয়াজ! কিন্তু সুপটা নোনা—নোনা লাগে কেন? তাড়াতাড়ি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে সুপের প্লেটখানাই ধরে চুমুক দেয় খোকা—আর এ যাত্রা চোখের জলটা অন্ততঃ সকলের কাছ থেকে আড়াল করতে পারে। রাত্রে নরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে খোকা। বাবা হাসপাতালে যাওয়ার আগে প্রায়ই শক্ত বিছানা নিয়ে খিটিমিটি করতেন মায়ের সাথে। মা তো নিজের গায়ের লেপখানাই পেতে দিয়েছিলেন···সেটা ছেঁড়া ছিল, কিন্তু ওটাই মায়ের একমাত্র সম্বল—বাবা তবু খুশী হননি। আর লেপটা ছেড়ে দিয়ে বেচারা মা কি গায়ে দিয়ে শুতেন কে জানে! কাঁচের শার্সীর ভেতর দিয়ে এক ঝাঁক তারা দেখা যাচ্ছে আকাশে—মিটি মিটি করে কাঁপছে যেন—ঠাণ্ডায় কাঁপছে নাকি? নন্তু, সন্তু, ভোলা যেমন রোদ ওঠার আগে কাঁপে রোজ সকালে!

কবি

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যা কিছু কহিতে চাই, রঙ ধরে তায়
আপনার হাসি গান অশ্রুর ব্যথায়।
সামালিতে নারি। গুঞ্জরি গুঞ্জরি বাজে
মোর যত কাব্যগান কাকলীর মাঝে
বুকের কাহিনী মম।
উদাসীন হয়ে
সুখে দুঃখে অনুদ্বেগে শিল্পী মন লয়ে
সুন্দরের উপাসনা—নাহি আসে মম।

ধরণীর দুঃখ সুখ হোক তুচ্ছতম
তাহে চিত্তে অনুখন দোলা
মোর লাগে।
তারি দোল শিহরণে দুঃখে অনুরাগে
হাসি ও অশ্রুর আমি শুধু জাল বুনি;
তাত্ত্বিকের উপদেশ কিছু নাহি শুনি।
কাব্য তাহা হল কিনা চাহিনা জানিতে
হাসি কাঁদি ভালবাসি লেখনীর গীতে॥

পশুপতিনাথের দেশে

শ্রীসুধীর ব্রহ্ম

দুর্ভেদ্য নৈসর্গিক পরিখা ও প্রাকারে বেষ্টিত হিমালয়ের ক্রোড়ে বিস্তীর্ণ এক স্বাধীনরাজ্য পার্ব্বত্য-দৃশ্য গরিমায় অধিষ্ঠিত। দেবের আবাসভূমি একদা এই প্রদেশ ছিল নরের অগম্য। নেপালের অনেক স্থানে হিন্দু জাতির প্রাচীন ইতিহাস গুপ্ত হয়ে লুকিয়ে আছে। সেই আদিম সুসভ্য পরাক্রান্ত হিন্দুস্থানবাসীর সঙ্গে পৃথিবীর আর কোন জাতির সাদৃশ্য বা জ্ঞাতিবন্ধন না থাকাই ছিল তখন স্বাভাবিক। এখন এই বিচিত্র রাজ্যে প্রবেশ করতে কোন বাধা নেই। বুদ্ধদেবের জন্মস্থল কপিলাবস্তু নগর আমাদের সকলের কাছে আজ এক তীর্থস্থান। সাধারণতঃ শিব-

চতুর্দ্দশীর দিন মাত্র নেপালে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলতো। উপস্থিত সেই নিয়মও শিথিল করা হয়েছে; যে কোন ভারতীয় নাগরিক এখন যে কোন সময়ে নেপাল ঘুরে আসতে পারে। নেপালের দক্ষিণে ঘন জঙ্গলে শিকারীরা আসে হাতী, বাঘ ও গণ্ডারের সন্ধানে; আর উত্তর দিকে রয়েছে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট, মাকালু. অন্নপূর্ণা ইত্যাদি। প্রতি বৎসর এখানে সমবেত হয় বিশ্বের সকল পর্ব্বত অভিযানকারী দলগুলি, কারণ নেপালের উত্তর থেকেই পর্ব্বত আরোহণ অপেক্ষাকৃত সহজ।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে নেপাল ভ্রমণের ইচ্ছা জাগল। পাটনা থেকে নেপাল যেতে প্লেনে সময় নেয় এক ঘণ্টারও কম। পথের দৃশ্য উপভোগ করা চাই; তাই হাওড়া থেকে ট্রেণে চেপে প্রভাতে মোকামা স্টেশনে নেমে পড়লাম। ষ্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে সামরিয়া ঘাটে এলাম; সেখান থেকে উত্তর বিহারের ট্রেন মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, বরৌনী প্রভৃতি শহর অতিক্রম করে আমাকে বৈকালে সগৌলীতে পৌছে দিল। সগৌলীতে একদা যুদ্ধ ঘটেছিল ইংরাজদের সঙ্গে নেপালীদের এবং নেপালীরাই হয়েছিল পরাজিত। সন্ধির সর্ত্তানুসারে ঠিক হয়েছিল নেপালের ডাক ও পররাষ্ট্র বিভাগে বৃটিশের থাকবে আংশিক কর্ত্তৃত্ব। সগৌলী থেকে সোজা এক ট্রেণ রাতে রক্সৌলে পৌছে দিল। এই রক্সৌল ষ্টেশনটি সম্প্রতি ১৬২ লক্ষ টাকা খরচে পুনর্নির্ম্মাণ করা হয়েছে। ২৯শে জানুয়ারী ১৯৬১ সালে রেলওয়ে মন্ত্রী জগজীবনরাম বলেছেন:—

"Raxaul was the gateway to Nepal and the remodelled station building constructed on the model of Pasupatinath temple was a symbol of friendship and goodwill between India and Nepal"

ও, টি রেলের রক্সৌল স্টেশনের পাশেই নেপাল রাজ্যের রেল স্টেশন। আগে দলে দলে যাত্রী পদব্রজে বীরগঞ্জ যাবার জন্য কাতারে কাতারে অপেক্ষা করত,নাড়ী টেপানো ডাক্তার ও সীমান্তের কাষ্টমস কর্ম্মচারীদের প্রতীক্ষায়। ছাড়পত্র, Identity card ইত্যাদি পরীক্ষা না হলে নেপাল সীমান্তে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। এখন আর সে সবের হাঙ্গামা নেই।

এইখানেই ভারতীয় এলাকা শেষ হল; সুরু হল নেপাল রাজ্য। ভারত ও নেপালের সীমারেখার উপর এই সুগম সমতল স্থানটিতে প্রহরীরা সব সময় পাহারা দিচ্ছে। সমস্ত রাতটা রক্সৌলে কাটিয়ে ভোর ৫টায় আমলেখগঞ্জএর এক টিকিট কিনলাম। ভারতীয় মুদ্রা নেপালে অচল। কাজেই মুদ্রা বিনিময় করতে হল। আমলেখগঞ্জের ভাড়া নিল নেপালী মুদ্রায় ২ টাকা ৪০ পয়সা অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রা এক টাকা নয় আনা। নেপাল

রেলওয়ে বীরগঞ্জ বাজারের সঙ্কীর্ণ পথকে আরও সঙ্কীর্ণ করে চলেছে। ট্রেণটিতে যাত্রীর অভাবে মালগাড়ী জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন ভারত সীমানার ছোট নদীতে জল নেবার জন্য ট্রেণটি দাঁড়িয়ে গেল, তখন দেখি নিকটেই এক ধর্ম্মশালা। ভারত সীমানা থেকে বীরগঞ্জের দূরত্ব মাত্র তিন চার মাইল, কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও শিবরাত্রি ভিন্ন অন্য সময়ে এখানে পৌছান দুরূহ ব্যাপার ছিল। বীরগঞ্জের এই ধর্ম্মশালা এখন প্রায় পরিত্যক্ত। সেই পাকা ঘর-বাড়ী, রন্ধনশালা, কূপকে এখন আমি ট্রেণে বসে বিদায় জানালাম। ট্রেণ মন্থর গতিতে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে এল; ছোট বড় গাছের ডালপালা জানালার মধ্যে এসে অঙ্গ স্পর্শ করে, প্রভাত সূর্য্যের লাল আভা সর্ব্বাঙ্গে তখন ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেণের গতি ঠিক যেন কলকাতায় রিক্সা চলার মত। কল্পনা রাজ্যের দ্রুত গতির সঙ্গে মোটেই যেন খাপ খায় না। নেপাল রেলওয়ে শেষ হল আমলেখগঞ্জে। এই চব্বিশ মাইল পথটি অতিক্রম করতে ছোট লাইনের ট্রেণটি সময় নিল পুরো পাঁচ ঘণ্টা।

রেলওয়ে প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে আমলেখগঞ্জ এখন একটি নূতন শহরে পরিণত। এখান থেকে কাঠমাণ্ডু যেতে হলে ১০৭ মাইল পথ মোটর বাসে যেতে হবে। পথ ভাল নয়; সংস্কার কাজও তখন চলছিল। কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাস চলার অনুমতি আছে। সমগ্র পথের মধ্যে ১১টি ঘাঁটিতে বাস থামবে। মাঝখানে আবার আবগারী বিভাগের লোকেরা যাত্রীদের বাক্স, পেটরা খুলে পরীক্ষা করে দেখবে। কড়া হুকুম, নেপালের মধ্যে কোন নিষিদ্ধ মাল যেন প্রবেশ না করে। যা' হউক আমলেখগঞ্জের একটি হোটেলে বাঙ্গালী-খাদ্য দই-ভাতও জুটল। সকাল ১০॥ টার মধ্যে আহার শেষ করে দেখি, অতিরিক্ত যাত্রী সংখ্যায় সব কটি মোটর বাস ভর্ত্তি। বেশী টাকার লোভে যাত্রী ও মাল বোঝাই কাজ তখনও চলছিল। ডিসেল ইঞ্জিনযুক্ত একটি লরী চালকের সঙ্গে অগত্যা চুক্তি করতে হল। দশ টাকা ভাড়ায় সে আমাকে কাটমাণ্ডু নিয়ে যাবে। সব যাত্রীবাহী বাস ও লরী একই সঙ্গে প্রথম check postএ দুপুর দুইটা নাগাৎ এসে থেমে গেল। সকলের সঙ্গে আমাকেও সুটকেস ও বিছানা খুলে নেপালের সরকারী কর্ম্মচারীদের দেখাতে হল। চুরিয়ামাটির চড়াই

বহুযুগের ওপারে নির্ম্মিত এই ধরণের কাঠের মন্দির নেপালের পথে প্রান্তরে দেখা যায়।

ভেঙ্গে আমার লরীটি এক সুদীর্ঘ অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করল। চালক খুবই সতর্কতার সঙ্গে ঐ অপ্রশস্ত গহ্বরটির মধ্যে ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে যাচ্ছিল। তবু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল—গাড়ীর সঙ্গে যেন সুড়ঙ্গের দেওয়াল প্রায় লেগে যাচ্ছে। খোলা লরীর মধ্যে বসে চারদিকের দৃশ্য বেশ উপভোগ্য হচ্ছিল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে মাথা বাঁচাবার জন্য আমাকে নীচু হয়ে বসতে হচ্ছে। সামনে ও পিছনের বাস থেকে যাত্রীরা বলে উঠল "বলো পসুপথিনাথ বাবা কি জয়"। সুড়ঙ্গের মধ্যে একজায়গায় খানিকটা আলো এসে পড়ল; দেখি যে মুক্ত আকাশে রোদের মধ্যে চাঁদের ফালি, মনে এনেছিল নিশ্চিন্ততার আনন্দ। সুড়ঙ্গের বাইরে সুরু হল তরাইয়ের জঙ্গল-ঢাকা পাহাড়ের সারি। কোথাও বন কেটে নূতন বসতি তৈরী হয়েছে, আর নূতন স্থাপিত গ্রামের পাশে চরে বেড়াচ্ছে আকারে ছোট পাহাড়ী গাভীর দল। এই ভাবে তিন ঘণ্টা নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে ভীমপেদীতে পৌছালাম। আমালেখগঞ্জ থেকে ভীমপেদীর দূরত্ব ২৪ মাইল। ভীমপেদী বাজারের পাশ দিয়ে রেল লাইনের তার কাঠমাণ্ডু পর্য্যন্ত চলে গেছে। বিদ্যুতের সাহায্যে পাথর চালান করা হচ্ছিল এক মুল্লুক থেকে আর এক মুল্লুকে। কিন্তু বিকেল হওয়ার সঙ্গে নেমে এল শীতের হাওয়া। কাজেই গরমজামা পরে এবার আশ্রয় নিলাম লরীচালকের পাশে। অস্তগামী সূর্য্যের লাল আভা পর্ব্বতশৃঙ্গের স্থানে স্থানে যেন আগুন ধরিয়ে দিল; সাদা মেঘের টুকরো গুলি লাল হয়ে উঠল কখন।

ভীমপেদী থেকে থানকোট যাওয়ার একটি ১৮ মাইল

কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন কাষ্ঠমণ্ডা

পায়ে হাঁটা পথ আছে। থানকোট থেকে অবশ্য বাসে করে কাঠমাণ্ডু পৌছান যায়। আমি হাঁটতে প্রস্তুত নই, তাই নবনির্ম্মিত ত্রিভুবন রাজপথের উপর দিয়ে ৭৫ মাইল লরীতে কাঠমাণ্ডুর দিকে চলেছি। চীসাপানীর ভীষণ চড়াই ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমেছে। নেপাল পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত কর্ম্মীরা সেই ঢালুর উপর চওড়া রাস্তা তৈরী করছে। বড় বড় পাথরের টুকরো পথে জমাট বেঁধে রয়েছে। এই বন্ধুর-পথ ধরে শেষ পর্য্যন্ত 'মহিষদহে' এলাম। কোথাও কোথাও কুলীরা কাজ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াল, লরী তবে পথ চলতে পারল। এই ভাবে রাতের ঘন অন্ধকারে আট হাজার ফুট উপরে 'সিঙ্গভঙ্গ'এ এলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শরীর অবসন্ন, ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়েছি চালকের পাশে। ডিজেল ইঞ্জিনের উত্তাপ গায়ে এসে লাগছে। উঁচু নীচু এক পথের মধ্যে গাড়ীটা থেমে গেল। সামনে সব যাত্রীবাহী বাস ও লরীগুলি দাঁড়িয়ে পড়ল। রাত আটটার পর কোন যান বাহন ঐ check post অতিক্রম করতে পারে না। এখন রাত কাটাই কোথায়? এক German tourist তাঁবু খাটাতে লেগে গেল খোলা মাঠের মাঝে। আমার বিছানা পত্র সে বহন করে নিয়ে এল এক মেটো দোকান ঘরে। গরম চা পান করে কয়েকজন যাত্রীকে নিয়ে P. W.D Bunglowতে গেলাম। Over-seer Mr. Mittra তখন কয়েকজন বাঙ্গালী বন্ধুর সঙ্গে তাস খেলছিলেন। অনুমতি প্রার্থনা করলাম আমাদের গাড়ীগুলিকে ছেড়ে দিতে; অন্যথায় এই রাতে অসুবিধার একশেষ হবে আমাদের। তিনি একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে জানালেন যে তিনি নিরুপায়। নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে এলাম দোকান ঘরে।

German touristএর তাঁবুতে আশ্রয় নেবার প্রস্তাব পেলেও চাঁদনি রাতে জঙ্গলের খোলা জায়গায় থাকলাম না। বাঙ্গালীর চামড়ায় খোলা তাঁবুতে অত হিম ঠাণ্ডা সইবে না। দোকানের লাগোয়া বস্তি বাড়ী দুতলা ঘরেরই অনুরূপ। বস্তির দ্বিতীয় তলায় রাত কাটান স্থির করলাম, আর খাদ্যের ব্যবস্থা হল লুচি ও আলুসেদ্ধ। অপর এক ঘরে নেপালীরা কাজ সেরে প্রায় দুইহাত লম্বা-চওড়া অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে হাত পা সেঁকছে। জঙ্গল থেকে আনা কাঁচা কাঠ শুকনা কাঠের মত জ্বালিয়ে রেখেছে। প্রচুর ধোঁয়ার মধ্যে চারপাশে বিছানা করে পিতা-মাতা পুত্র ও পুত্রবধূ একত্রে রাত কাটায়। শয়ন-কক্ষ স্বল্প পরিসর, তাই তাদের সঙ্কোচশূন্য না হয়ে উপায় নেই। বস্তির মধ্যে ঝগড়া নেই। এখনও চকমকি পাথরে দিয়াশলাই ও চেলাকাঠের আগুন দিয়ে প্রদীপের কাজ চালায়। গাছের গুঁড়ি কেটে নানা ধরণের পাত্র তৈরী করেছে—এগুলি তাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। যোগ্য মাটির অভাবে মেটো বাসন পাওয়া যায় না। রাতের মত শুয়ে পড়লাম। লামা গুরুঙ্গ, তমঙ্গ জাতীয় নেপালীদের কথাবার্ত্তা পূর্ব্বে শুনার সুযোগ ঘটেনি। নেপালীদের ভাষা তিব্বতীয়, কিন্তু গোর্খা রাজভাষা হওয়ায় তারই ব্যবহার বেশী। কৌতুহল বশতঃ একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সে জাতিতে লামা। আমাদের দেশে যেমন বৈরাগী বা সন্ন্যাসী কোন কারণে গৃহী হ'লে, তার সন্তানেরাও নিজেদের বৈরাগী নামে পরিচিত করে—সেই রকম বৌদ্ধ ভিক্ষু গৃহস্থ হলে তার সন্তানসন্ততি লামা পদবী গ্রহণ করে। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, এদিকে ভোর না হতেই German সাহেব এসে জানাল যে সে নাকি সারা রাত তাঁবুতে বসে কাটিয়েছে। রাতের আঁধার তখন কাটেনি। যাত্রীবাহী সব বাসগুলির সাথে আমার লরী চলল কাঠমাণ্ডুর পথে। কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু সহরে অবশেষে পৌছান গেল। সহরের মধ্যস্থলে মানস সরোবর হোটেলে উঠলাম।

কাঠের মন্দির অর্থাৎ সংস্কৃতে কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে কাঠমাণ্ডু কথাটি এসেছে। নেপালের এই বৃহৎ নগরী

খৃঃ পূর্ব্ব ৭২৩ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন কাষ্ঠমণ্ডপ কান্তিপুর নামে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান নগরটি সমুদ্রতল থেকে ৪৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। সহরের সর্ব্ব-বৃহৎ বাজার 'ইন্দ্রচক।' বিলাতি পণ্যদ্রব্যে সুশোভিত সেই বাজার অনেকটা কলকাতার বড়বাজারের মত। রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত ও প্রস্তরনির্ম্মিত। রাস্তার দুপাশে দুতলা বাড়ী। কাঠের তৈরী বারান্দায় কত কারুকার্য্যই না রয়েছে। ছোট ছোট জানালা থাকায় অধিকাংশ ঘর দিনের বেলায় অন্ধকারময়। রুচির পরিবর্ত্তন হওয়ায় এখন দেখি কলকাতার মত কয়েকটি নবনির্ম্মিত অট্টালিকা। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বাড়ীগুলি 'টুনিখিল' নামে এক বিরাট ময়দানের চারদিকে শোভা পাচ্ছে। ময়দানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল। সাধারণতঃ এইখানে কুচকাওয়াজ হয়। মধ্যে রয়েছে তিনটি ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি (১) বীর শামসের (২) জঙ্গবাহাদুর (৩) ভীমসেন থাপা। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে চন্দ্রশামসের নির্ম্মিত শ্বেত সৌধ সিংহদরবার ও জঙ্গবাহাদুর নির্ম্মিত থাপাথলির দরবার। থাস সেক্রেটেরিয়েট, বিধান সভা, আকাশবাণী ও নেপাল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ আফিসগুলি সিংহদরবারে রয়েছে। ছাড়পত্র নিয়ে সিংহদরবারে প্রবেশ করলাম। উদ্যানের মধ্যে এক জলাশয়ে ভবনের অপরূপ প্রতিবিম্ব পড়েছে। বিরাট এক হলঘরে বৈদ্যুতিক আলোর হরেক রকমের ঝাড়, রাণাদের ব্যবহৃত কত আসবাবপত্র। কাঁচের তৈরী প্রকাণ্ড এক ঘড়ী—কিনতে খরচ হয়েছিল প্রায় লক্ষ টাকা। বিধান ভবনের চারদিকের প্রাচীরগাত্রে রাণাদের শিকার চিত্রগুলি Oil Painting এর মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সিংহ দরবারের বিরাট এলাকার একাংশে প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল। টুনিখিলের পশ্চিম দিকে বীর হাসপাতাল ও দরবার স্কুল। উত্তরে রাণী পুকুর ও বীরশামসেরের অতি সুশোভন প্রাসাদ 'লাল দরবার'। চারশত বৎসর পূর্ব্বে পুত্রশোকাতুরা পত্নীর সান্ত্বনার্থে রাজা প্রতাপমল্ল রাণী পুকুরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতের সব তীর্থ থেকে পবিত্র বারি সংগ্রহ করে এই সরোবরটিতে রাখা হয়েছিল। পুকুরের মধ্যে একটি মন্দির, কিন্তু কেবলমাত্র বৎসরের নির্দ্দিষ্ট দিনে নাকি বিগ্রহ দর্শন করা চলে। দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড

নেপালের মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক স্কুলে পারিতোষিক বিতরণ

পাথরের হাতির উপর প্রতাপমল্ল ও রাণীর প্রতিমূর্ত্তি। পূর্ব্ব দিকে বীরশামসেরের কীর্ত্তি বীরলাইব্রেরী, নেপালের গ্রন্থাগার থেকেই বাঙ্গলা ভাষায় সবচেয়ে প্রাচীন লিপি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' পাওয়া গেছল। শ্রদ্ধেয় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের গ্রন্থাগার থেকে বাঙ্গলা ভাষার এই অমূল্য রত্ন উদ্ধার করেছিলেন। তাছাড়া প্রসিদ্ধ 'ভৃগু-সংহিতার' মূল পাণ্ডুলিপি নেপালেই পাওয়া গেছে। নেপালীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করে তারা ঔষধ সেবন করে। বীরশামসের কাঠমাণ্ডু সহরে ড্রেণ ও কল বসানর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, আর চন্দ্রশামসের আনিয়েছিলেন বৈদ্যুতিক আলো। লাল দরবারের উত্তরে রয়েছে রাণা পরিবারের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য সুদৃশ্য প্রাসাদগুলি, আর পর্ব্বতের পাদদেশে রয়েছে বৃটিশ রেসিডেন্সি। কাঠমাণ্ডু সহরের মধ্যস্থলে মচ্ছিভবন ও গোরক্ষনাথ মন্দির উল্লেখযোগ্য। একটি গাছের কাঠ থেকে শেষোক্ত মন্দিরটি নির্ম্মিত।

বীর লাইব্রেরীর নিকটেই ঘণ্টাঘর; পাশ দিয়ে এক রাস্তা বাগমতীর পশ্চিম তীর দিয়ে চলে গেছে। পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি; সেই তিন মাইল রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার বাহুল্য নেই। দূর থেকে শ্রীশ্রীপশুপতিনাথের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া দেখা গেল, ঘণ্টার শব্দ জানিয়ে দিল মন্দির এসে গেছে। বাগমতীর তীরে অসংখ্য ধর্ম্মশালা ও লম্বা বারান্দা—নীচে নদীতীরে স্নানঘাট। বহুদূরবিস্তৃত সেই পাকা ঘাট পশুপতিনাথ মন্দির পর্য্যন্ত চলে গেছে। সাধু সন্ন্যাসী, নরনারী সিক্ত বস্ত্রে স্নানাহ্নিকে ব্যস্ত। পশুপতি

নাথের বৃহৎ ভবনের প্রবেশ মুখে নীচের চত্বরে অসংখ্য মন্দির। একদিকের চত্বরে পাষাণময় শত শত শিবলিঙ্গ; উপরে কিন্তু কোন আচ্ছাদন নেই। দ্বিতীয় মহলের মধ্যস্থলে পশুপতিনাথের মূল মন্দির। চার ধারে প্রশস্ত ও উচ্চ রোয়াক। সামনের রোয়াকে দুটি প্রশস্ত ও উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভে লম্বমান প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলছে। পশ্চিম ধারে চৌতারার উপর গণ্ডশৈলাকার পিত্তলময় প্রকাণ্ড বৃষ। মন্দিরের সম্মুখভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট ৬৭টি পাষাণময় সুগঠিত মূর্ত্তি। সেই পুরুষ প্রতিমূর্ত্তিগুলি নাকি পূর্ব্বতন মহারাজাদের। মন্দিরে চারটি সোপান-শ্রেণী চারদিকের চার দরওয়াজার মুখে রয়েছে। এক রকম ধাক্কা খেতে খেতে ভিতরের দ্বারে উপস্থিত হলাম। যাত্রীরা দুধ, পঞ্চামৃত পশুপতিনাথের মস্তকে চড়াতে ব্যস্ত। যথেষ্ট ভীড়ের মধ্যে মন্দিরের ভিতরকার বৃষ ও পঞ্চমুখ-বিশিষ্ট পশুপতিনাথের সারে তিন ফিট উচ্চ বিগ্রহ নজরে এল। অষ্টভুজের দক্ষিণ চার হস্তে রুদ্রাক্ষমালা ও প্রত্যেক বাম হস্তে কমণ্ডলু। মস্তকে স্বর্ণমুকুট ও স্বর্ণছত্র। মস্তকের ঠিক উপরে কয়েকটি সর্প। বিগ্রহ স্পর্শ করার নিয়ম নেই।

পশুপতিনাথ ভবনের উত্তরে কৈলাশনাথ নামে এক উচ্চ ভূমিখণ্ড। বাগমতী নদী সুন্দরভাবে স্থানটিকে বেষ্টন করে রয়েছে। তীরে গৌরীমাতার শিলাময়ী মূর্ত্তি; উপরে প্রকাণ্ড এক উচ্চভূমিতে কিরাতেশ্বর মহাদেব। গাছ পালা ঘেরা এক ঢালু পথ নীচের দিকে চলে গেছে। যাত্রীরা সব চলল সেই দিকে। ঐ স্থান যেমন প্রাচীন তেমন রমণীয় এবং মৃগস্থলী নামে কথিত। বেশ খানিকটা নীচে গুহ্যেশ্বরী মাতার মন্দির—এখানেও পূজা-পাঠের একদণ্ড নিবৃত্তি নেই। একটী সেতু অতিক্রম করেই বোধাস্থানে পৌছালাম। বোধাস্থান নেপালের অন্তর্গত হলেও তিব্বতের টুকরো বললেই চলে। বোধাস্তূপের তিব্বতী নাম 'চৈত্যরত্ন', আর নেপালি নাম নেপাল চৈত্য। শোনা যায় সম্রাট অশোক ইহা সর্ব্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন। স্তূপকেন্দ্রে রয়েছে স্বর্ণমণ্ডিত শিখর। স্তূপ পরিধির চারধারে লোকের বসতি। বাসিন্দা প্রায় সবই ভোটীয়; তবু এদের মধ্যে নানা জাতি বিভাগ আছে। এই স্থান নাকি শীতকালে তিব্বতের মত তুষারাবৃত হয়। ফেরার পথে এক সুযোগ মিলল।

কলকাতার নেপালী ভাইস্‌কন্‌স্যালের ছোট ভাই 'শ্রীবাসওয়াস্ত'এর সঙ্গে পথে আলাপ হল। সে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে এল। নেপালীদের ঘরোয়া আবহাওয়া বোধ হয় কোন পর্য্যটকই ভুলতে পারে না। সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত নেপাল অধিবাসীর সেদিনের সেই সব ব্যবহার, আচরণ, হাসিমুখে অভিবাদন আজও ভুলতে পারি না। শ্রীবাসওয়াস্তের পিতা ও পরিবারবর্গ কলকাতার এই নাগরিককে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে নিল। স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখানর জন্য এক ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভোটগাঁওতে। নেপালের উত্তর সীমার শেষ বস্তি ভোটগাঁও। সহরের আকার ঠিক শঙ্খের মত! কাঁকর বিছানো চড়াই ও উৎরাই পথের মাঝে মাঝে ঝরণা, মেটো পাথরের পাহাড়, সহরের পূর্ব্ব পাশ দিয়ে কাবেলী গঙ্গা, এক রাস্তা চলে গেছে কুম্ভকর্ণ পর্ব্বতের দিকে। স্থানীয় লোকপ্রবাদ যে রামরাবণের যুদ্ধে রামের বাণে কুম্ভকর্ণের মস্তক ছেদন করে এই পর্ব্বতে আনা হয়েছিল। কাবেলী গঙ্গার একটি শাখা পর্ব্বতের গা ঘেষে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে চলে গেছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কুম্ভকর্ণ পর্ব্বতে নেপালীরা মেষ চরাতে আসে। পর্ব্বতের ওপর একটি ধর্ম্মশালা আছে, আর সেখান থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে যোগীদের আবাসভূমি ধবলগিরি, দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে আমি গেলাম গুরুদত্তাত্রেয়ের পীঠস্থানে। চার-পাঁচতলা অট্টালিকার মধ্যে দত্তাত্রেয় শিবের মূর্ত্তি—তিনটি মস্তক, তিন হাত ও তিনপদ বিশিষ্ট বিগ্রহ।

নেপালে প্রায় আড়াই হাজার মন্দির। শতাব্দী ত্রিশ থেকে নেপালের স্থানে স্থানে ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল, যেমন কাটমাণ্ডু, ভোটগাঁও ও পাটন। কিম্বদন্তী আছে যে পাটন অর্থাৎ প্রাচীন ললিতপট্টন বা অশোকপট্টন মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক স্থাপিত ও সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। নেপালের অর্দ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'স্বয়ম্ভূপুরাণে সম্রাট অশোকের নেপাল-যাত্রা বিবরণ লিখিত আছে। ভারত হ'তে ভিখনা-টোরী-পোখরা হয়ে তখন লোকে নেপাল আসত। পাটন নেপালের বৃহৎ নগর ও কাঠমাণ্ডু থেকে ১২ মাইল দূরে এক উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। পাটনের প্রাচীন বিহার এখনও পুরাণো নামেই প্রসিদ্ধ।

উপস্থিত সেখানে ভিক্ষু নামে পরিচিত বহু লোকের বাস; অধিবাসী প্রায় সবই বৌদ্ধ এবং নেয়ার। এই স্থানে অশোক একদা সপরিবারে এসেছিলেন। তাঁহার কন্যা চারুমতির সঙ্গে নেপালরাজ দেবপালের বিবাহ হয়েছিল। রমণী জীবনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি স্বনামে ও স্বীয় ব্যয়ে 'চারুবিহার' স্থাপন করেছিলেন। সহরের চারধারে মন্দির-চৈত্যের ছড়াছড়ি। প্রাচীন কৃষ্ণমন্দিরের কাজ সত্যই উল্লেখযোগ্য। গলির পথে বিছানো ইঁট, প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচায়ক। পুরানো রাজপ্রাসাদগুলি সত্যই দর্শনীয়। রাস্তা ও গলির অবস্থা জঘন্য, চারধারে আবর্জ্জনার মধ্যে শূকরের পাল চরে বেড়াতে দেখলাম। অবশ্য নূতন জলের কল সহরের মধ্যে বসান হচ্ছে। সেই প্রাচীন সহর একদা কতটা উন্নত হয়ে উঠেছিল সেগুলি এখানকার প্রাসাদ স্তম্ভ ও পাথরে খোদাই অক্ষরমালা স্তূপ ও প্যাগোডা দেখলে বোঝা যায়। পাটনের বৌদ্ধমন্দির 'মৎস্যেন্দ্রনাথ' নামে প্রসিদ্ধ। দেবতাকে পূজা করার সেই প্রাচীন ঐতিহ্য আজো বেঁচে আছে প্রত্যহের নানা উৎসবের মধ্যে। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের অপূর্ব্ব এক সংমিশ্রণ রয়েছে তাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে।

পাটন থেকে ফেরার পথে কাঠমাণ্ডুর বাইরে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধতীর্থ স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির দর্শন করলাম। সুদূর চীন থেকে কোন যুগে কোন বোধিসত্ত্ব মহাত্মা এখানে এসে বিপুল হ্রদকে রমণীয় উপত্যকায় পরিণত করেছিলেন; হ্রদে ফুটল শতদল, উৎসারিত হল পবিত্র বারি, প্রকাশিত হলেন স্বয়ম্ভু ভগবান। বর্ত্তমান মন্দিরটি এক টিলার উপর অবস্থিত। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠার সময় দেখা যায় কয়েকটি কাল পাথরের বিরাট মূর্ত্তি প্রশস্ত সোপানগুলির ধারে শোভিত। কিছুকাল পূর্ব্বে এই জায়গা সম্পূর্ণ মেরামত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। মন্দির প্রাঙ্গণে যে ছোট মন্দির বা অট্টালিকা রয়েছে সেগুলি কোনটাই স্বয়ম্ভুপুরাণে বর্ণনার ন্যায় প্রাচীন নয়। রমণীয় স্থানে মন্দিরযুগল স্থাপিত। মন্দিরের সুড়ঙ্গ চূড়াটি নাকি সুদূর চন্দ্রাগড়ী থেকে দেখা যায়। নিকটেই রয়েছে মঞ্জুশ্রী নামে এক সুন্দর মন্দির। আর কাঠমাণ্ডুর পশ্চিমে প্রায় সাত মাইল দূরে নেপালের স্বনামখ্যাত 'মুক্তিনাথ'।

পাহাড়ী পথ দিয়ে ফিরে চলেছি। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পিঠে বোঝা নিয়ে নিচের দিকে কত সহজেই না নেমে চলেছে। নেপালীরা বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ; মুখ চেপ্টা হলেও রং পরিষ্কার। মেয়েরা যেমন পরিশ্রমী, তেমন নৃত্যগীতপ্রিয়। মেয়েরা ঘোমটা দেয় না। রং বেরঙের পোষাক পরে এই সব শ্রমজীবীরা যখন ঢোল বাজিয়ে নাচ করে, তখন গানের ভাষা না বুঝলেও তাদের প্রাণপ্রাচুর্য্যের প্রতিচ্ছবি ভোলা যায় না। উৎসবে যোগ দেবার সময় দীর্ঘ-বসন অর্থাৎ পঁচিশ ত্রিশ গজের কাপড় কুঁচিয়ে পরে তারা সভ্যভব্যতার পরিচয় দেয়। গত আদমসুমারীতে নেপালের জনসংখ্যা ছিল ৮,৪১৩,৪১৮; তন্মধ্যে ২৯৩,৮৫৩ জন লোক বৎসরে ছয়মাস স্বদেশে অনুপস্থিত থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপস্থিত বহু স্কুল কলেজ স্থাপিত রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে পড়তে পারে; রাতেও কলেজে পড়ার সুযোগ আছে। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজএর এক বাঙ্গালী ছাত্র আমাকে নিমন্ত্রণ করল তাদের পিক্‌নিক্‌এ যোগ দিতে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশার এ এক অপূর্ব্ব সুযোগ। প্রভাতে মিলিত হলাম কলেজ প্রাঙ্গণে।

প্রায় শতখানেক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তিনখানি মোটর বাস কাবেরীর পথে যাত্রা করল। কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে এই স্থানটির দৃশ্য পরম রমণীয়। রাণারা এখানকার ঘন জঙ্গলে শিকার করতে আসেন! উঁচু নীচু পথের মাঝে কখনও কখনও বাসটি চলতে চলতে থেমে যায়। ছেলেমেয়েরা অনুরোধ করে—আমিও যেন বাস থেকে নেমে তাদের সঙ্গে হৈ হল্লা করি। বাঙ্গালী ছাত্রটি আমার ইণ্টারপ্রেটর হয়ে পাশে বসে আছে। আমার বাসটিতে পিক্‌নিক্‌এর রসদ ছাড়া একটি জীবন্ত ছাগলও ক্রমাগত ভ্যা ভ্যা করে সকলকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল। গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি ছোটখাটো পাকা ঘর রয়েছে—শিকারীরা নাকি রাতে এখানে আশ্রয় নেয়। খোলা এক সমতল ভূমি, পাশ দিয়ে কাবেরী নদী প্রবাহিত। চারদিকে জঙ্গল ও পাহাড়ের শোভা দেখতে দেখতে প্রাতঃরাশ সুরু করলাম। চিড়ে ভাজা, কপির তরকারী, চাটনী—সুস্বাদ না হলেও ক্ষুধা মেটান চলে। অবশেষে একপ্রকার মিষ্টি বরফি

পেস্তা ও বাদামের সঙ্গে তৈরি উপরে রয়েছে, কুচান পাতা ছড়ান। আমি মাত্র দুটি বরফি খেয়ে চা পান করলাম। কিন্তু আর সকলে ঐ বরফির অনেকগুলি করে টুকরো খুবই আনন্দের সঙ্গে খেয়ে নিল। অতিথিপ্রিয়তা নেপালী স্ত্রী-পুরুষের একটা স্বভাবজাত সংস্কার। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মাস্টার অতিথিকে নিয়েই ব্যস্ত। একদল ডাকে তাদের সঙ্গে নাচ গানের আসরে যোগ দিতে, অপরদল বলে মধ্যাহ্নের আহার প্রস্তুতের কাজে আমাকে জোগান দিতে। প্রত্যেক নেপালীদের কাছে কুকরী নামে ছোট ও ভারী এক ভুজালি থাকে। কাটারির মত দুদিক বাঁকা না হলেও কুকরীর পৃষ্ঠদেশ পুরু আর ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ। ডগা সূচের মত সূক্ষ্ম। ছোট হাতল দেওয়া সেই অস্ত্রটিতে পঁচিশ ত্রিশ বৎসরেও মরচে পড়ে না। শুধু কুকরী হাতে গুর্খা সৈন্য প্রথম ইউরোপীয় সমরে নেমে যোদ্ধা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই অস্ত্র হাতে পেলে নেপালীরা বাঘ শিকারেও ভয় পায় না। এক নেপালী ছাত্র দেখি ছাগলটিকে খুব আদরের সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা খাওয়াচ্ছে, আর অপর এক ছাত্র ঐ কুকরীর এক কোপে ছাগলের গলাটি কেটে ফেলেছে। রক্তক্ষরণ এক হাতে বন্ধ করে ছাগ দেহটিকে গরম জলে ফেলা হল। লোমগুলি অতি সহজেই ছেড়ে গেল। ঐ কুকরির সাহায্যে ছাগদেহ খণ্ডাকারে বিভক্ত করা দেখে, আমি পাহাড়ে উঠে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা ঘুরে নীচে এসে দেখি মধ্যাহ্ন আহার প্রস্তুত। হাত মুখ ধুতে বসেছি, হঠাৎ মনে হল অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে; কাবেরীর স্রোত যেন আমাকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে চায়। হাতড়ে হাতড়ে পশ্চাদপসরণ করেছি, কিন্তু চলার ক্ষমতা ক্রমশঃ যেন লোপ পেতে বসেছে। দলের কয়েকটি ছাত্র আমাকে ধরাধরি করে মাঠে শুইয়ে দিল। আমি শুয়ে শুয়ে দেখছি যে আমার মত শায়িত রয়েছে আরও কয়েকটি ছাত্র। দুটি ছাত্রী গাছের তলায় বসে তখনও বমন করছিল। বরফির উপর যে পাতা ছড়ান ছিল সেগুলি হচ্ছে সিদ্ধি গাছের পাতা। ভাঙের নেশা যে কি, সেই অভিজ্ঞতা আমার প্রথম। চোখের সামনে গোলাকার বিন্দুর ছড়াছড়ি, আমি যেন শূন্যে উঠছি। কত কল্পনা যে এক সঙ্গে মাথায় এসে গেল, সেগুলি পৃথক করে এখানে লেখা সম্ভব নয়। কলকাতা থেকে কতদূর নেপালের কোন এক প্রান্তে আমি নিরুপায় হয়ে শুয়ে আছি। অসহায় ভাবে জানালাম যে জ্ঞান হারালে তারা যেন আমাকে বাসের মধ্যে তুলে নেয় —আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যে তাদের! বাঙ্গালী ইণ্টারপ্রেটর বন্ধুবর আমার কথাটি বুঝল বটে, কিন্তু আর সকলেই এক সঙ্গে পরমানন্দে আহারে মশগুল। আমাকে তাদের সঙ্গে আহার করার জন্য কতই না অনুরোধ। অভুক্ত এই বাঙ্গালীটিকে তারা বাসে তুলে দিয়েছিল, দু-পাশে দুটি ছাত্রীর কড়া প্রহরাধীনে। শেষ পর্যন্ত আমি আমার হোটেলে ফিরে আসি। পরদিনই কাঠমাণ্ডুকে বিদায় জানিয়ে কলকাতা রওনা হলাম।

শেষের অভিজ্ঞতাটি তেমন তৃপ্তিদায়ক না হলেও, নেপালের বহু সুরম্য স্মৃতি আমার মনকে ভারাতুর করে তুলল যাত্রাকালে। এই কদিনের প্রত্যহ পরিচয়ে কত মানুষ কত মুখ, আকাশ নদী অরণ্য স্মৃতিমুখর হয়ে থাকল হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে। বহু অমিলের মধ্যে আমাদের সঙ্গে নেপালী সমাজের কোথায় যেন একটি সুগভীর জীবন-বোধ অনুভব করলাম। মনে পড়ল কবিবর প্রমথনাথের কাব্যাংশটি :—

"ও নেপালী, বাঙ্গালী তোর ভাই
তোদের না হয় হিমালয়ে বাস,
আমরা না হয় সমতলে পড়ে'
দারুণ গ্রীষ্মে করি হাঁস-ফাঁস।
তোরা না হয় আব্‌হাওয়ার গুণে
বীরের জাতি বলে' পা'স্ মান,
আমরা না হয় জল-বায়ুর দোষে
কলম পিষে হচ্ছি হয়রাণ!
আমাদের এই সমতলে মিশল
তোদের গিরিমালা,
আমরা যেমন কালো রে ভাই, তোরাও
তেমনি কালো
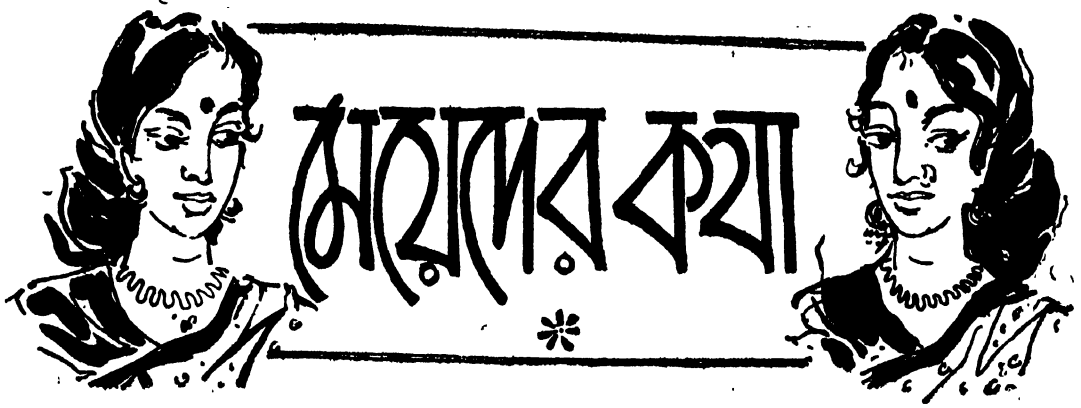
নারীর ধর্ম

কল্যাণী গুহ

নারীর ধর্ম কি এ নিয়ে যে তর্কের ঝড় একটা বইছে তা লক্ষ্য করে বড় ঔৎসুক্য অনুভব করেছি। তাই দু একটা কথা না বলে স্থির থাকতে পারছি না। একদিকে নির্বাণপ্রিয়া দেবীর বর্ণিত ধর্ম যেমন সুপ্রাচীন ভারতের নারীর সতীধর্মের মহিমাকে প্রকাশ করেছে, অপর দিকে বাসবী দেবীর প্রবন্ধে তেমনি বর্তমান যুগের নারীজাতির জীবন সমস্যা প্রতিভাত হয়েছে। বর্তমান যুগের নারী রামায়ণ যুগের নারীর মত পুরুষের উপর নির্ভর করে বেঁচে নেই, দস্তুরমত পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলছে। মেয়েরা স্কুলে কলেজে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে, চাকুরী ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করছে, নির্বাচনে প্রতি-যোগিতা করছে, রাজ্য চালনায় অংশ গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় নারী আর রামায়ণের যুগের নারীর মত, বা তুলসীদাসের যুগের মত পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। তখন পূর্ণ নির্ভরের মূল্য হিসাবে পুরুষকে যা দিতে হ'ত তা হচ্ছে একনিষ্ঠ পতিভক্তি। তাই পতিভক্তির মর্যাদা ঐ যুগে এত বেশী ছিল।

বাসবী দেবীর মতে ঐ রকম পতিভক্তি ভোগ করতে হলে পতিদেবতাদের রামের মত হতে হবে। কিন্তু রামের মত হওয়া যদি এ যুগের পুরুষদের পক্ষে সম্ভব হত তবে নারীর ধর্ম নিয়ে এই বিতর্কই উত্থাপিত হ'ত না। দেশ ও সমাজের চেহারাই অন্য রকম হত। মানুষের নীতিবোধ লোপ না পেলেও ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। রাম ও তুলসীদাসের যুগের নৈতিক মানদণ্ড নিয়ে সমাজ আজ আর পরিচালিত নয়। এ দেশের সমাজের শিক্ষিতা নারীরা পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে মেতে উঠেছে।

কিন্তু এই মেতে ওঠ, এই অনুকরণপ্রিয়তা আমাদের এ দেশের নারীদের পক্ষে কতটা মঙ্গলজনক হবে বা দুঃখজনক হবে—তা কি আমরা ভাল করে চিন্তা করে দেখেছি? আমার তো মনে হয় তা আমরা দেখছি না। আমরা কেউ ভেবে দেখছি না, বিদেশীদের অনুকরণ আমাদের কোন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। যাদের অনুকরণ আমরা করছি তাদের কথা একবার ভেবে দেখা দরকার। আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের প্রবন্ধ 'বিলাত দেশটা' থেকে জানা যায়, "মাঝ বয়সী পুরুষেরা এখন আইবুড়ো থাকতেই পছন্দ করে। তার মানে এই নয় তারা সাধু পুরুষ বনে গিয়েছে। আসল কথা ৩৫ বছরের উপরে বয়স পেরিয়ে যাওয়া পুরুষেরা বান্ধবী চায়, বউ চায় না।" তার কারণ, "একদল সাফ বলেছে, তারা মেয়ে মানুষের নাম-গন্ধও সইতে পারে না। তাদের আজকাল আর মেয়ে বলা ঠিক নয়। আচারে, ব্যবহারে, পোষাকে-আশাকে ওরা এখনকার পুরুষের বাবা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় দল এতটা কঠোর নয়। তারা মেয়েদের সঙ্গ ভালবাসে

আকাঙ্ক্ষা করে। তবে চায় তারা প্রেমিকা হয়েই থাক, বিয়েতেই এই দলের আপত্তি। তৃতীয় দল বলেছে তারা বিয়ে করতে চায় না এই কারণে যে বউরা অযথা তর্ক আর কথা কাটাকাটি করে তাদের মন মেজাজ নষ্ট করে দেয়। যে মেয়ে প্রেমিকা অবস্থায় কোমল বাহুবল্লরী আন্দোলোভরে গলায় দিয়ে কপোত কূজনে কানে সুধা ঢেলে দেয়, সেই মেয়েই বিয়ের আঙটি আঙুলে পরার পর থেকে কর্তৃত্বের রাশ টেনে স্বামী বেচারার গলায় ফাঁস পরাতে চায়।

এদেশের শিক্ষিত সমাজে এই জাতীয় নর-নারীর আবির্ভাব ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। ফল হয়েছে বিলেতের মেয়েদের মধ্যে যে কর্মনিপুণতা, শৃঙ্খলাজ্ঞান, সময়নিষ্ঠা রয়েছে সে সকল সদ্‌গুণ আমাদের মেয়েদের মধ্যে প্রকাশ না পেয়ে, প্রকাশ পাচ্ছে সে-সব অসদ্‌গুণ যাতে পুরুষেরা নারী-বিদ্বেষী হয়, অথবা নারীকে নিয়ে শুধু প্রেমবিলাসের স্বপ্ন দেখে,—বিয়ে করতে রাজী হয় না, অথবা শান্তি-নিকেতনী ঢঙে দু-একটি মধুর বাণী শুনে বিয়ে করে শেষে মোড়লীর চোটে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে।

যে শিক্ষায় নারীজাতির অন্তরের সদ্‌গুণরাজি বিকশিত না হয়ে তাদের মধ্যে শুধু কুরুচি আর কদাচার বৃদ্ধি পায়, সে শিক্ষা ভয়ংকর বিপজ্জনক। ইহাতে নারীর জীবনই যে শুধু অশান্তির হবে তা নয়, পুরুষের জীবনেও অশেষ দুর্গতি নেবে আসবে, তারা উচ্ছৃঙ্খল হবে। আর সে উচ্ছৃঙ্খলতার ফলস্বরূপ সমাজের শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকল নারীর জীবন বিষময় হবে। তাই আজকের যুগের শিক্ষিতা নারীদের বিদেশী উচ্ছৃঙ্খলতাকে অনুকরণ করতে যাওয়ার আগে একটু থেমে ভাববার সময় এসেছে।

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় রঙ-করা কাপড়ের জমীর উপর থেকে মোমের প্রলেপ মুছে ফেলার যে পদ্ধতির কথা বলেছি, তেমনিভাবে 'বাটিক্'-কারুশিল্প সামগ্রীটিকে সম্পূর্ণরূপে মোমের আস্তরণহীন করে সযত্নে গরম-জল আর সাবান দিয়ে কেচে ছায়া-শীতল স্থানে খোলা-বাতাসে মেলে রেখে আগাগোড়া শুকিয়ে নেবার পর, সেটিকে পরিপাটিভাবে ইস্ত্রি করে ফেললেই শিল্প-সামগ্রী রচনার কাজ শেষ হবে।

ইতিপূর্ব্বে যে পদ্ধতিতে সূতী বা পশমী কাপড়ের জমীতে 'বাটিক'-কারুশিল্পের নক্সাদার সৌখিন-সামগ্রী রচনার কথা বলেছি, সেটি হলো 'এক-রঙা' (Mono-colour Batik Designing Procedure) 'বাটিক' কলাকারুর প্রথা। একাধিক রঙের সাহায্যে 'বাটিক্'-শিল্পের কাজ করতে হলে, কাপড়ের টুকরোটিকে সর্বপ্রথম

সব চেয়ে 'হাল্কা-রঙে' রঞ্জিত করে নিতে হবে। তবে এই হাল্কা-রঙে রঞ্জিত করে নেবার আগে, কাপড়ের
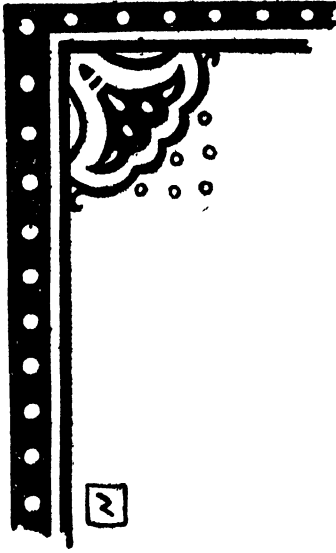
টুকরোটির যে সব অংশ শাদা বা রঙের স্পর্শহীন রাখা প্রয়োজন, সেই অংশগুলিকে পূর্বপ্রথানুসারে তরল-মোমের প্রলেপন দিয়ে ঢেকে নেওয়াই হলো একাধিক-রঙে 'বাটিক্' শিল্পের কাজ করার রীতি। এমনিভাবে বিভিন্ন অংশে তরল মোমের প্রলেপন দেবার পর, কাপড়ের টুকরোটিকে হাল্কা-রঙে রঞ্জিত করতে হবে। এ কাজ সারা হলে, কাপড়ের টুকরোটির যে সব অংশে ঐ হাল্কা রঙের নক্সাদার ছোপ বজায় রাখা দরকার, সেই অংশগুলিকে পুনরায় তরল মোমের আস্তরণে ঢেকে রাখবেন এবং কাপড়ের টুকরোটিকে দ্বিতীয় রঙে রঞ্জিত করে নেবেন। প্রথম বা হাল্কা রঙের চেয়ে দ্বিতীয় রঙটি যে গাঢ় হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঠিক এমনি প্রথাতেই কাপড়ের টুকরোটির যে সব অংশে দ্বিতীয় রঙটিকে বজায় রাখতে হবে, সেই অংশগুলিকে তরল মোমের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে, তৃতীয় রঙে রঞ্জিত করে নেবেন। মোটকথা, 'বাটিক্'-শিল্পের কাজের জন্য যত বেশী ও বিভিন্ন ধরণের রঙ ব্যবহার করা হবে, ততবারই উপরোক্ত প্রথানুসারে কাপড়ের জমীর বিভিন্ন অংশগুলিকে তরল-মোমের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে আলাদা-আলাদা রঙে সুরঞ্জিত করে নিতে হবে। বাটিক্-পদ্ধতিতে একাধিক রঙে সূতী বা রেশমী কাপড় রঞ্জিত করার এটিই হলো চিরাচরিত রীতি। তবে এই রীতি অনুসারে সূতী বা রেশমী কাপড় রঙ করার সময়, আরো কয়েকটি জরুরী বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। অর্থাৎ, একাধিক রঙের সাহায্যে 'বাটিক্'শিল্পের কাজ করতে হলে, সর্ব্বদা মনে রাখবেন—প্রথম রঙটি যেন হাল্কা-ধরণের হয়, দ্বিতীয় রঙটি হবে তার চেয়ে গাঢ়, তৃতীয় রঙটি আরো গাঢ়-ধরণের, চতুর্থটি তৃতীয়ের চেয়েও অপেক্ষাকৃত গাঢ়তর …এমনি নিয়ম মেনেই ক্রমশঃ হাল্কা থেকে গাঢ় রঙ ব্যবহার করে চলবেন এবং কাজ শেষ করবেন সব চেয়ে গাঢ় অর্থাৎ ঘন-কালো রঙে কাপড়ের টুকরোর বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে পরিপাটিভাবে সুরঞ্জিত করে তুলে। প্রসঙ্গক্রমে সরল একটি দৃষ্টান্ত দিলেই, ব্যাপারটি আরো সহজ-বোধগম্য হবে। ধরুন, হলদে, বাদামী আর কালো—এই তিনটি বিভিন্ন রঙের সাহায্যে 'বাটিক্'-শিল্পের কাজ করছেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই হলদে, তারপর বাদামী এবং সব শেষে কালো রঙে 'বাটিক্'-শিল্পের উপযোগী সূতী বা রেশমী কাপড়টিকে সুরঞ্জিত করে নিলেই সুচারু-ছাঁদে কারু সামগ্রীটি রচিত হয়ে যাবে। তবে হুঁশিয়ার—'বাটিক্'-শিল্পের কাজ করবার সময় কদাচ গরম-জলে রঙ গুলবেন না…সর্ব্বদা শীতল জলে রঙ গোলাই হলো এ কাজের চিরন্তন রীতি। শীতল জলের বদলে গরম জল মেশানো রঙ ব্যবহার করলে সুষ্ঠুভাবে 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে শিল্প-কাজ করার যে সব অসুবিধা ঘটে…সেগুলির হদিশ আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি—তাই আর তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। মোটামুটি ভাবে উপরোক্ত নিয়মাবলী মেনে কাজ করলে যে কোনো শিক্ষার্থীই অচিরে 'বাটিক্'-শিল্পকলায় সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারবেন বলেই ধারণা হয়।

সৌখিন ব্লাউশের প্যাটার্ন

মৃন্ময়ী দেবী

গত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিশ্রুতিমতো এবারেও শীতান্তকালে পরিধান-উপযোগী আরো ছুটি অভিনব-সৌখিন ছাঁদের ব্লাউশের নমুনা উপহার দেওয়া হলো। এ ছুটি ব্লাউশই 'পোষাকী' এবং 'আটপৌরে' হিসাবে অনায়াসেই ব্যবহার করা চলবে।

উপরের ১নং চিত্রে যে বিচিত্র ব্লাউশের নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি সুদৃশ্য-সৌখিন হলেও, অপেক্ষাকৃত সাধাসিধা ধরণের। সাধারণভাবে অফিস, স্কুল, কলেজ, বাজার প্রভৃতি স্থানে কাজে বেরুনোর সময় মহিলাদের পরিধানোপযোগী পরিচ্ছদ হিসাবে বিশেষ মানানসই হবে বলেই ধারণা হয়। এ ধরণের ব্লাউশের প্যাটার্ণটি সুতী এবং রেশমী—উভয়বিধ কাপড়েই বানানো চলবে। তবে আমাদের মতে, এই প্যাটার্ণের ব্লাউশটি সুতীর চেয়ে রেশমী কাপড়েই আরো বেশী মনোরম দেখাবে—বিশেষভাবে সেটি যদি জরীর বা রেশমী সুতোর বুটিদার দক্ষিণ-ভারতীয় রেশমের কাপড়ের সাহায্যে রচিত করা হয়। এই ধরণের নাতি-দীর্ঘ হাতাওয়ালা ও চওড়া গলার অংশ বিশিষ্ট ব্লাউশটি মহিলাদের গ্রীষ্মকালে পরিধানোপযোগী আরামপ্রদ পরিচ্ছদ হবে বলেই আমাদের ধারণা।

উপরের ২নং চিত্রে সুদৃশ্য কুঁচিদার ও সরু 'পাইপিং' বা 'পাড়' বসানো সুপ্রশস্ত গোল-গলাওয়ালা বিচিত্র-সৌখিন ছাঁদের যে ব্লাউশের নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি 'আটপৌরে' পরিচ্ছদ-হিসাবে ব্যবহারের চেয়ে 'পোষাকী' হিসাবেই বিশেষ উপযোগী ও মানানসই হবে। এ ব্লাউশটি যে কোনো হাল্কা-ধরণের নক্সাদার রঙীন-ছিটের সুতী বা রেশমী কাপড়ে বানানো যেতে পারে। গরমের দিনে এই ধরণের উন্মুক্ত-গলা ও হাত-বিহীন সৌখিন সুন্দর ব্লাউশ মহিলাদের পক্ষে সবিশেষ আরামপ্রদ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অযথা-আড়ম্বরহীন এই ব্লাউশের ছাঁট-কাট সেলাই নিতান্তই সহজ-সরল এবং সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে যে সব সুগৃহিণী অল্প বিস্তর সীবন-শিল্পচর্চ্চা করেন, তাঁদের পক্ষে ঘরে বসেই নিজের হাতে ছাঁট-কাট সেলাই করে এমনি প্যাটার্ণের ব্লাউশ বানানো খুব একটা দুঃসাধ্য-কঠিন ব্যাপার নয়। রচনা-পদ্ধতি নিতান্তই সহজ-সরল হলেও, এ ধরণের ব্লাউশ কিন্তু মহিলাদের চারু-অঙ্গে অপরূপ সৌখিন-সুন্দর ও খুবই মানানসই দেখায়। মোটকথা, এ ধরণের বিচিত্র ব্লাউশটির পরম বৈশিষ্ট্যই হলো—এর একান্ত সহজ-সরল-সুন্দর ছাঁদ বা 'প্যাটার্ণ'। ছাঁদ বা 'প্যাটার্ণ'টি সহজ-সরল হলেও, ব্লাউশটি আগাগোড়াই অপরূপ আভিজাত্য-মণ্ডিত। এই কারণেই এমনি ছাঁদের ব্লাউশ 'আটপৌরে' হিসাবে সচরাচর গৃহে ব্যবহারের চেয়ে বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে 'পোষাকী' হিসাবে সৌখিন-মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী হবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বারান্তরে, এই ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব-বিচিত্র নতুন-নতুন প্যাটার্ণের ব্লাউশ রচনার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

—

সুধীরা হালদার

রন্ধন-কলায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙলাদেশের বিশিষ্ট একটি স্থান আছে—বিশেষভাবে মিষ্টান্ন, মৎস্যাদি আমিষ-খাদ্য এবং বিবিধ নিরামিষ-ভোজ্য রান্নার ব্যাপারে। বাংলাদেশের অভিনব ছানার সন্দেশ, রসগোল্লা, মালপোয়া প্রভৃতি মিষ্টান্নের অপরূপ স্বাদে ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীরাই পরম পরিতৃপ্ত… প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাই আজ বাঙলাদেশেরই বিচিত্র-মুখরোচক বিশেষ এক-ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার কথা বলছি। এ খাবারটির নাম—'কুমড়োর মালপোয়া'। মিষ্টান্ন-জাতীয় উপকরণ-হিসাবে হলেও, এ খাবারটি রান্নার জন্য অবশ্য ছানা ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই…আধসের কুমড়ো, একপোয়া চিনি, একমুঠো ময়দা বা আটা, আন্দাজ মতো পরিমাণে খানিকটা ঘি এবং গোটা পাঁচ-ছয় ছোট এলাচ জোগাড় করতে পারলেই অভিনব-সুস্বাদু এই বিচিত্র মিষ্টান্ন বানানো চলবে।

উপরের ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, প্রথমেই কুমড়োর ফালিটিকে দু'টুকরো করে পরিপাটিভাবে খোসা ছাড়িয়ে নিন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে. সেই পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে জল ভরে খোসা-ছাড়ানো কুমড়োর টুকরোগুলিকে আগাগোড়া সু-সিদ্ধ করে ফেলুন। কুমড়োর টুকরোগুলি ভালভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবার পর, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে নেবেন এবং কুমড়োর টুকরোগুলিকে আগাগোড়া জল ঝরিয়ে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন।

এবারে পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে চিনির রস পাক করুন। চিনির রস পাক হয়ে যাবার পর, ভিন্ন-পাত্রে তুলে-রাখা সু-সিদ্ধ কুমড়োর টুকরোগুলিকে বেশ মিহি-ভাবে চটকে মেখে 'মণ্ড' বানিয়ে ফেলুন এবং সেই 'মণ্ডের' সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণ ময়দা বা আটা এবং ছোট এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন।

এ কাজ সারা হলে, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি দিয়ে, সেটিকে পুনরায় উনানের আঁচে বসিয়ে গরম ও গলিত করে নিন। ঘিটুকু গলে গরম এবং ফুটন্ত হলেই, ময়দা ও ছোট এলাচের গুঁড়ো-মেশানো কুমড়োর মণ্ডটি থেকে মালপোয়ার আকারে বিভিন্ন টুকরো বানিয়ে, হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে গরম-গলিত ঘিয়ে সেগুলিকে ভালো-ভাবে ভেজে নিন। ফুটন্ত-ঘিয়ে ভাজার ফলে, মালপোয়ার আকারের টুকরোগুলির আগাগোড়া বেশ বাদামী-রঙের হলেই, হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে সেগুলিকে সযত্নে রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে সদ্য-পাক-করে-রাখা চিনির রসের পাত্রে ডুবিয়ে রাখুন। অন্ততঃপক্ষে, আধঘণ্টাকাল চিনির রসে ডুবিয়ে রাখার ফলে, কুমড়োর মালপোয়ার টুকরোগুলি আগাগোড়া বেশ টুপ্‌টুপে হয়ে উঠলে, সাদরে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশন করুন। আপনার হাতে-রান্না করা অভিনব মুখরোচক 'কুমড়োর মালপোয়া' মিষ্টান্নটির সুস্বাদে তাঁরা যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য!

বাঙলাদেশের বিচিত্র-উপাদেয় 'কুমড়োর মালপোয়া' রান্নার এই হলো মোটামুটি প্রণালী।

পরের সংখ্যায় এমনি ধরণের আরো একটি অভিনব-মুখরোচক ভারতীয় খাদ্য-রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

—

বর্ত্তমান পরিস্থিতি—

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করিলে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। গত তিন মাস কাল পূর্ব পাকিস্তান বাসী সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুগণ সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমানগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া হাজারে হাজারে নয়, লক্ষে লক্ষে ভারতরাষ্ট্রের আসাম, বিহার, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের উপর কিরূপ অকথ্য অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—কত হিন্দু রমণী যে ধর্ষিতা হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব-পাকিস্তানবাসী প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা কলিকাতাস্থ পিতাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছে—মুসলমানরা আমাকে ও আমার মাতাকে নিকা করিয়াছে। কি অবস্থায় একজন রমণী এই কথা জানাইতে বাধ্য হয়, তাহা অবর্ণনীয়। সীমান্ত পথ দিয়া পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসার সময় শুধু হিন্দুদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা হয় নাই, তাহাদের সকলকে—স্ত্রী-পুরুষ যুবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে—অর্থহীন ও উলঙ্গ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠানো হইতেছে। ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলের একই অবস্থা! রংপুর হইতে খবর আসিয়াছে, তথায় প্রকাশ্যভাবে হাট বসাইয়া হিন্দু রমণী-দিগকে বিক্রয় করা হইতেছে—অবস্থানুসারে এক হাজার টাকায় একজন হিন্দু যুবতী বিক্রীত হইয়াছে। কত বাড়ী যে পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কত ধন সম্পত্তি যে নষ্ট করা হইয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

এইরূপ অবস্থায় গত তিন মাস কাল প্রত্যহ প্রায় কয়েক সহস্র করিয়া বিপন্ন, ভীতিগ্রস্ত, লুণ্ঠিত ও ধর্মান্তরিত নরনারী পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পশ্চিম বাংলায় আগমন করায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৭ বৎসর পূর্বে বঙ্গবিভাগ হইয়াছে—পূর্বপাকিস্তান মুসলমানশাসিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এই ১৭ বৎসর ধরিয়া কয়েক কোটি হিন্দু অধিবাসী পূর্ব বাংলায় তাহাদের পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এত অধিক লোকের—প্রায় কয়েক কোটি অধিবাসীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সহজ কথা নহে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচুর অর্থসাহায্য সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও হাজার হাজার উদ্বাস্তু—১৫।১৬ বৎসর পূর্বে পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা সত্বেও—যে ভাবে দুর্দ্দশার মধ্যে বসবাস ও দিনযাপন করে, তাহা দেখিলে হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রই বিচলিত হইয়া থাকেন। এই পুনর্বাসন ব্যবস্থার ত্রুটি অনেক, সে ত্রুটির কারণ অনুসন্ধান করিয়া লাভ নাই। যে সকল ব্যক্তি, সংঘ বা প্রতিষ্ঠান এই সকল অব্যবস্থার জন্য দায়ী, তাহারা আমাদেরই দেশবাসী—ভাগ্য দোষে বা কর্মফলে তাহাদের দ্বারা কার্য্য সুসম্পাদিত না হইয়া বিপরীত ফল দান করিয়াছে। সেই পুরাতন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হওয়ার পূর্বেই—আমাদের এই নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। গত ৩ মাস কাল প্রতি দিন কিছু-সংখ্যক করিয়া উদ্বাস্তু আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের শরণাপন্ন হয় ও উভয়ে মিলিত ভাবে বহু সহস্র উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়—সে সকল উদ্বাস্তুকে একটি কেন্দ্রে কয়েকদিনের জন্য রাখিয়া ক্রমে ক্রমে দণ্ডকারণ্য প্রদেশে ধীরে ধীরে পাঠাইয়া পুনর্বাসন দান করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় দণ্ডকারণ্যে স্থান খুবই কম—সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উড়িষ্যা, বিহার, মধ্য ভারত, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন—যেন প্রতি রাজ্যতেই এই সকল উদ্বাস্তুর কয়েক হাজার করিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়। এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ভারতবর্ষকে বহু কোটি টাকা ব্যয় করিতে

হইবে। একদল চিন্তাশীল দেশনেতা পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে লোক বিনিময়ের প্রস্তাব করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার লোকবিনিময় ব্যবস্থা সম্ভব ও সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। গত ৩ মাস ধরিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলার ফলে ভারতের নানাস্থানে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও দেখা দিয়াছে। তবে অত্যাচারের তুলনায় সে হাঙ্গামা উল্লেখযোগ্য নহে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও তৎকালীন দেশবিভাগের সময় ভারতরাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করার ফলে কয়েক কোটি মুসলমান অধিবাসী ভারতে বাস করাই স্থির করিয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে এক দলের মন হইতে পাকিস্তানপ্রীতি চলিয়া যায় নাই। তাহারা ভারতে বাস করিয়াও পাকিস্তানের গুপ্তচরের কাজ করে এবং ভারতের মুসলমান-প্রধান স্থানগুলিকে ভবিষ্যতে পাকিস্তান বলিয়া ঘোষণা করার ইচ্ছায় সে বিষয়ে কার্য্য করিয়া থাকে। বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূলে ঐ সকল মুসলমান অধিবাসীর কার্য্যকলাপ কতকটা কাজ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইতি-মধ্যে পুর্ব পাকিস্তানের বহু মুসলমান অধিবাসী গোপনে—বিনা পাসপোর্ট ও ভিসায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ত্রিপুরা ও আসামে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। আসাম রাজ্যে হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে, তথায় কয়েক লক্ষ পাকিস্তানী মুসলমান প্রবেশ করিয়াছে ও তাহারা আসামকে পাকিস্তান করিয়া ঘোষণা করার চেষ্টা করিতেছে - সে জন্য আসাম সরকার ঐরূপ অন্যায়ভাবে প্রবেশকারী মুসলমানদিগকে আসাম হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভারতের অভ্যন্তরের অবস্থাও ভাল নহে। এক দল চীন-প্রেমিক কম্যুনিষ্ট ভারতরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা করিয়া ভারতের একদল বিপথগামী অধিবাসীকে বিভ্রান্ত করিতেছে। তাহার ফলে বহু কল-কারখানার শ্রমিক অযথা অন্যায় দাবী করিয়া কল-কারখানায় গণ্ডগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। সে হাঙ্গামা থামাইবার জন্য ভারত রাষ্ট্রকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট পেশ করিতে লোকসভায় যাইতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুকেও দেখা যাইতেছে।

ভারতরাষ্ট্র সকল রাজনৈতিক দলকে সমান অধিকারদানের চেষ্টার ফলে ঐ সকল দেশদ্রোহী নেতারা ভারতের মধ্যে থাকিয়া নানাভাবে ভারতের ক্ষতি করিয়া থাকে। তাহাদের অবিলম্বে কঠোর হস্তে দমন করা প্রয়োজন।

কাশ্মীর সমস্যা আজও সুমীমাংসিত হয় নাই। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান রাজ্য হইলেও তাহার অধিকাংশ অধিবাসী ভারতের মধ্যে থাকিবার ইচ্ছা বহুবার বহু প্রকারে প্রকাশ করায় কাশ্মীর এখন ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু কাশ্মীরের পার্শ্ববর্তী পশ্চিম পাকিস্তানবাসী একদল গুপ্তচর প্রায়ই কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীরে গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতবিরোধী বৃটিশ ও মার্কিণ রাজনীতিকেরা

কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করিয়া কাশ্মীরের লোককে বিক্ষুব্ধ করিবার চেষ্টা করে। সে জন্য বিদেশীদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া আজও পাকিস্তান সরকার ভারত অধিকৃত কাশ্মীর পাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানেও ভারত-রাষ্ট্রকে কঠোরতার সহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাধীন হইবার পর ভারত তাহার জনগণের অর্থনীতিক উন্নতির জন্য অধিক মনোযোগ দেওয়ায় সে তাহার সামরিক শক্তি-বৃদ্ধির জন্য অধিক চেষ্টা করে নাই—সে জন্য দেড় বৎসর পূর্বে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর হইতে ভারতকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে অধিক যত্নবান হইতে হইয়াছে। বর্তমানে বিদেশ হইতে সমর-উপকরণ আমদানী করিয়া, সমর সরঞ্জাম নির্মাণের কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ও কারখানাগুলিতে অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া, সৈন্য-বাহিনীতে বহু সংখ্যায় নূতন লোক গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ আয়োজনও আরম্ভ হইয়াছে। সব দিক দিয়া ভারত এখন তাহাকে বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ঘোষণা করিয়াছেন যে পাকিস্তান বারবার সকল চুক্তির মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া ভারতরাজ্যে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করিয়া থাকে—এখন ভারতীয় সৈন্যরা প্রয়োজন বোধ করিলেই পাকিস্তানের সীমা পার হইয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করিবে ও প্রয়োজন মত পাকিস্তান সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিবে। শ্রীনেহরুর এই উক্তি প্রকাশিত হওয়ার পর শুধু পাকিস্তান সরকার ভীত হয় নাই, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যে সকল রাজনীতিক এতদিন পাকিস্তানকে অন্যায়ভাবে সমর্থন করিতেছিল, তাহাদের মুখেও ভীতির কথা উচ্চারিত হইয়াছে। বর্তমান ভারতের নেতা শ্রীনেহরু যুদ্ধপ্রিয় ব্যক্তি নহেন—তিনি এতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ না করিয়া শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে আর তাঁহার পক্ষে শান্তি রক্ষা করিয়া থাকা সম্ভব হইতেছে না। আজ যুদ্ধ বাধিলে ভারত গত ১৭ বৎসর ধরিয়া যে সকল উন্নতিমূলক কার্য্য করিয়াছে, সেগুলির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে। ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার কথা চিন্তা করাও [illegible] কঠিন হইয়া পড়িবে। এই কারণেই শ্রীনেহরু যুদ্ধ চাহেন না। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য। অন্ততঃ পাকিস্তান আক্রমণের পথে বাধা দিয়া পাকিস্তানকে পুনরাক্রমণ না করিলে ভারতবাসী শান্তিতে ভারতে বসবাস করিতে পারিবে না। এখন দেশবাসী সকলকে সকল প্রকার দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আজ সকল ভারতবাসীর শ্রীনেহরুর কথা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ণয়ের দিন সম্মুখীন হইয়াছে।

সম্প্রতি নাগাল্যাণ্ডে সফরকালে ভারতীয় স্থল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জে, এন, চৌধুরীকে সকলে বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়।

ছাত্র বিক্ষোভ—

কয়মাস পূর্বে একটি ছাত্র দক্ষিণ কলিকাতা গড়িয়ায় তাহার কলেজের প্রাঙ্গণে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়—সে সময়ে সহরের নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছিল এবং কর্তৃপক্ষ হাঙ্গামা দমনের জন্য পুলিশকে কঠোরভাবে কর্তব্য সম্পাদনের আদেশ দিয়াছিলেন। দুঃখের কথা, স্বাধীনতা লাভের ১৭ বৎসর পরে আমাদের দেশের একদল পুলিশ ইংরাজ শাসনের সময়ের মনো[illegible]

...োগ করিতে পারে নাই। তাহারা নিজদিগকে দেশের জনগণের সেবক মনে না করিয়া দণ্ডমুণ্ডের কর্ত বলিয়া ...ন করে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আজও পুলিস সাধারণ মানুষের বিপদের সময় তাহাদের সাহায্য করিতে প্রায়ই অগ্রসর ত হয় না, বরং অযথা মানুষকে হয়রাণ করিয়া থাকে। সেজন্য সাধারণ লোক খুব বেশী বিপদে না পড়িলে পুলিসের সাহায্যপ্রার্থী হয় না। গত ৩ মাস ব্যাপী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় দেখা গিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিস শান্তিরক্ষার অজুহাতে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া অযথা তাহাদের কষ্ট দিয়াছে। ইহা লইয়া নানাস্থানে একদল নেতা যে গণ্ডগোল করিয়াছেন, সে কথা সর্বজনবিদিত। ঐ সকল নেতার অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক সত্য। এত অধিকসংখ্যক পুলিস কর্মচারী থাক সত্বেও পুলিস বিভাগ অভিযোগ করেন, তাহাদের কর্মীর সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে। অথচ এ বিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, কর্মীর দলের সকলে ভাল করিয়া কর্তব্য পালন করেন না। সে যাহা হউক, ছাত্র ভূদেব সেনের মৃত্যু লইয়া গত কয় মাস ধরিয়া কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সম্প্রদায় যেভাবে সর্বত্র গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও সমর্থন করা যায় না। প্রথম হইতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভূদেব সেনের হত্যাকারীর সম্বন্ধে সরাসরি পুলিসী তদন্ত করার কথা বলেন এবং ছাত্র সম্প্রদায় ও অধ্যাপকবৃন্দ এ বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করেন। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বিধান সভায় এক সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করিয়া এ বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের অসুবিধার কথা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ...রাধীর শাস্তি হউক, এ বিষয়ে সকলে একমত হইলেও ছাত্রগণের দাবী প্রথমাবধি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকচ করায় গণ্ডগোল দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং জনমত মুখ্যমন্ত্রীর কার্য্য সমর্থন করে নাই। অপরপক্ষে ছাত্রগণ হরতাল ও ধর্মঘট করায় ...র সুযোগ লইয়া কলিকাতার একদল দুর্বৃত্ত ...ল কলেজের আসবাবপত্র ধ্বংস করিয়া যে তাণ্ডব-...র সুযোগ লইয়াছে, তাহাও দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমর্থন করিতে পারেন নাই। একদিকে পাকিস্তান ও চীন ভারতের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেছে, পাকিস্তানী গুপ্তচরের দল সে জন্য ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের সর্বত্র গোলমাল পাকাইয়া তাহা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলিয়া ঘোষণার চেষ্টা করিতেছে ও সেই সঙ্গে চীন-পন্থী কমিউনিষ্টরা ঐ দলে যোগদান করিয়া দুষ্কৃতকারীদের কার্য্যে সাহায্য দান করিতেছে, অন্যদিকে যদি এ সময়ে ছাত্রগণের আন্দোলনের ফলে দেশের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এ দুর্দিনে দেশকে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। ভারত আজ সত্যই বিপন্ন—কারণ ভারতকে হয়ত শীঘ্রই চীন ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইবে, এ সময় যদি ছাত্রগণ আবার নূতন করিয়া হাঙ্গামা সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিয়া বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করা কি করিয়া সম্ভব হইবে—সে বিষয়ে সকলের ধীরভাবে চিন্তা করা কর্তব্য। দেশের এই দুর্দিনে আমরা সকলকে শান্তিরক্ষা করিবার আহ্বান জানাই এবং ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইলে আমাদের সে বিষয়ে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে নিবেদন জানাই।

বাঙ্গালীর গৌরব—

দুইজন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও খ্যাতিমান ভারত-সেবক শ্রীআর-আর-দিবাকর ও শ্রীকে-এম-মুন্সী বোম্বায়ে ভারতীয় বিদ্যাভবন নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দেশের সর্বত্র ভবন গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় খুলিতেছেন। সেই প্রতিষ্ঠান হইতে বঙ্গ-গৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী প্রকাশিত হইল—রচনা করিয়াছেন ভারতবর্ষের লেখক, বাঙ্গলার খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। ইংরাজিতে লেখা গ্রন্থের দাম আড়াই টাকা। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থকার উভয়কে অভিনন্দিত করি। বিদ্যাভবন কর্তৃপক্ষ আচার্য্য বসু মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ করিয়া বড় কাজ করেন নাই, তাহা একজন বাঙ্গালী লেখকের লেখনী প্রসূত হওয়ায় বাংলা ও বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ভারতের অতিথি
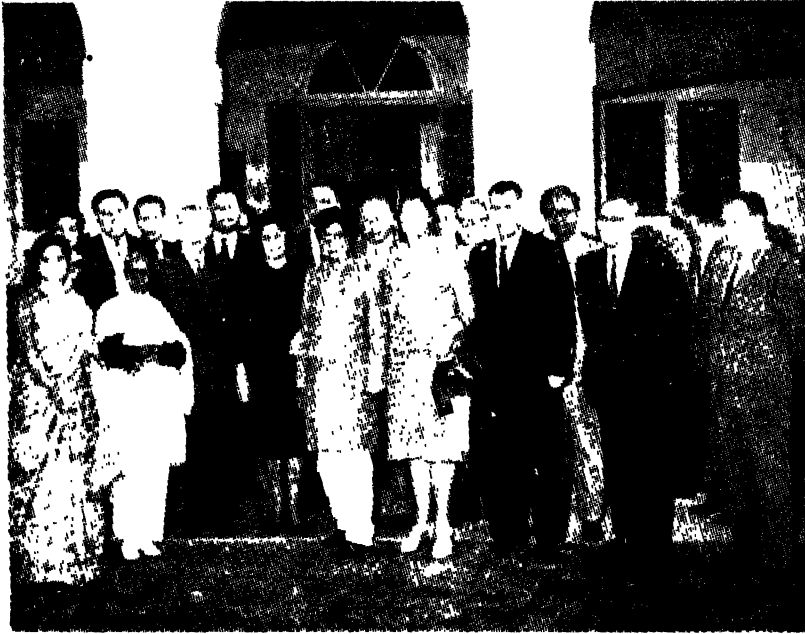
সোভিয়েট পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন্ দল গত মাসে ভারত সফরে আসিয়াছিলেন। লোক সভায় স্পীকার সর্দ্দার হুকুম সিং-এর সহিত তাঁহাদের দেখা যাইতেছে।

জার্ম্মান ডেমোক্রেটিক্ রিপাবলিক্ এর উপ-প্রধান মন্ত্রী হের ব্রুনো লিউস্নার ভারত সফরে আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাকে (সর্ব্ব বামে) এবং তাঁহার দলকে সর্দ্দার হুকুম সিং-এর সহিত দেখা যাইতেছে।

ফিলিপাইনস্ এর পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট ম্যাগ্‌-সেইসে-র পত্নী তাঁহার ভারত সফরকালে বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য নির্মিত আগ্রায় ম্যাগ্‌সেইসে হাসপাতাল করেন। চিত্রে শ্রীমতী ম্যাগ্‌সেইসেকে একটি শিশু রোগীকে আদর করেতে দেখা যাইতেছে।

মেদিনীপুর রামগড়ে মহাসম্মিলন—

গত ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী শনি ও রবিবার মেদিনী-পুর জেলার চন্দ্রকোণা রোড রেল ষ্টেশন হইতে অদূরে রামগড় নামক স্থানে স্থানীয় জমিদার রাজা শ্রীরণজিৎকিশোর সিংহ সাহসরায়ের আহ্বানে তাঁহার বিরাট রাজভবনে বঙ্গীয় কবি পরিষদের প্রথম বার্ষিক মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্মিলনের মূল সভাপতি ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার অভিভাষণে তাঁহার দেখা কয়েকজন সাহিত্যসেবীর আদর্শ ও জীবন কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার সাহিত্য সেবার বিবরণ দান করেন। জালালাবাদ মহাকাব্যের লেখক কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্যকে কবি পরিষদের পক্ষে এক অভিনন্দন দান করিয়া সম্মানিত করা হয়। প্রথম দিনে এই দুই অনুষ্ঠানের পর বৈষ্ণব পণ্ডিত মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এক ভাষণে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিলে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিন রবিবার সকালে নাট্য সাহিত্য শাখায় শ্রীমন্মথ রায় সভাপতিত্ব করেন এবং অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্য্য নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। রবিবার সন্ধ্যায় কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে কাব্য শাখার অধি-বেশনে বহু কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তথায় শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার, শ্রীসুধীর বাগচী, শ্রীমতী যূথিকা দাস, শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়, শ্রীশিব নারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রধান অতিথি সুপণ্ডিত শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ সভায় পঠিত হইয়াছিল। সম্মিলনে মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলার বহু কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। রাণী শ্রীমতীপুষ্পলতা সাহসরায় সাহিত্য সরস্বতী তাঁহার গৃহে সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ও ঐ অঞ্চলের প্রায় ২ হাজার লোক ২দিন সম্মিলনে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

বিশিষ্ট পণ্ডিতের তিরোধান—

একে একে নিভিছে দেউটি, সমগ্র ভারতের পণ্ডিত সমাজে ন্যায়শাস্ত্রের জন্য বাংলা দেশের বিশিষ্ট খ্যাতি ছিল। আজ তাহা নির্বাপিত প্রায় হইতে চলিল। বাংলার তথা ভারতের নৈয়ায়িককুলচুড়ামণি অসংখ্য
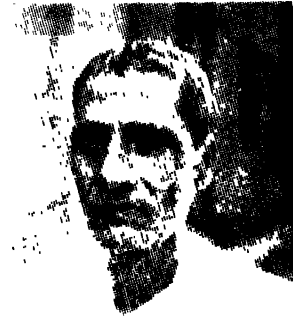
পণ্ডিত যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ

তর্কতীর্থ দর্শনাদিতীর্থের গুরু যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয় ২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রে পুত্র কন্যা স্বজনের

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীএম, সি, চাগ্‌লা নয়া দিল্লীতে জাতীয় কলা প্রদর্শনী উদ্বোধন কালে একটি চিত্রের অঙ্কনরীতি দেখিতেছেন।

সামনে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে পরলোক গমন করেন। ফরিদপুর জিলার দুলারডাঙ্গীগ্রামের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় উমাকান্ত ন্যায়রত্নের ঔরসে ও গঙ্গামণি দেবীর গর্ভে ১২৮৮ সালে ভাদ্রমাসে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। কোটালীপাড়ার বিশিষ্ট নৈয়ায়িক আশুতোষ তর্করত্নের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়া মুলাজোড় কলেজে পণ্ডিত-কুলপতি শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তাঁহার নিকট হইতেই নব্য-ন্যায়ের সরকারী উপাধি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া স্বর্ণপদকাদি লাভ করেন। ইহার প্রতিভা, বিনয় ও নিষ্ঠার জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। মূলাজোড়ের অধ্যয়ন সমাপ্তির পর অধ্যাপনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়। তাঁহার বহু ছাত্র বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে যশস্বী অধ্যাপক রূপে খ্যাত হইয়াছেন। ব্রজশাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীতে আচার্য্য রূপে দীর্ঘদিন কাজ করিয়া পরে নবদ্বীপ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ও সর্ব্বশেষে হালিসহরে নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমেও ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে সংস্কৃত কলেজে যে পণ্ডিত সম্মেলন হয় তাহাতে তাঁহাকে তর্ক-চূড়ামণি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সরকার তাঁহার আজীবন বার্দ্ধক্য ভাতা ১০০৲ করিয়া দিয়া আসিতে-ছিলেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আগ্রহে সংস্কৃত কলেজের গবেষণা গ্রন্থমালার একটী কঠিন ন্যায়গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষার পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্ত্তা ছিলেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ও সংস্কৃত কলেজ গভর্ণিং বডীর সদস্য শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার তথা ভারতের নব্যন্যায়জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। পণ্ডিতসমাজ এই সদালাপী নিরভিমান নৈয়ায়িকের কথা কোন দিনই ভুলিবেন না।

ফণীন্দ্রনাথ জন্মোৎসব—

গত ৮ই মার্চ রবিবার সকালে ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটি-সোদপুরে বি-টি রোডস্থ মীনা সিনেমা হলে পানিহাটি পৌরাঞ্চলের অধিবাসীদের উদ্যোগে এক সভায় স্থানীয় সমাজসেবী কর্মী শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৭ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। সভায় প্রায় ২ শত লোক উপস্থিত হন। পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভার উদ্বোধন করেন, প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভা-

[ব্য]ক্তির আসন গ্রহণ করেন ও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হন। বিশিষ্ট কোবিদ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোদপুরের অধ্যক্ষ শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য, পানিহাটির শিক্ষাব্রতী শ্রীইন্দুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুখচরের সমাজসেবী শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতি ভাষণ দেন ও পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী উৎসবের মঙ্গলাচরণ করেন। উৎসব সমিতির সম্পাদক শ্রীঅমিয়কুমার সেন ফণীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন পত্র দান করেন ও উৎসব কমিটির কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন এবং কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান শ্রীশিশিরকুমার মিত্র সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ফণীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন পত্র ও নানাবিধ উপহার প্রদান করা হয়। নিকটস্থ সকল গ্রামের অধিবাসীরা দলে দলে উৎসবে যোগদান করিয়া ফণীন্দ্রনাথের আজীবন সমাজসেবা ও জনকল্যাণকর কার্য্যের স্বীকৃতি দান ও প্রশংসা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীকুমারবাবু এক সুদীর্ঘ ভাবব্যঞ্জক ভাষণে ফণীন্দ্রনাথের সাহিত্য সেবা, রাজনীতি আলোচনা ও মানব সেবার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে লিখিত ফণীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত এক পুস্তিকা সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস শতবার্ষিক—

গত ১লা মার্চ রবিবার নদীয়া জেলার মাজদিয়া রেল ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল দূরে কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাথপুর গ্রামে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের পৈতৃক বাটিতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস মহাশয়ের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব পালন করা হইয়াছে। সকালে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা স্কুল পরিদর্শক শ্রীঅমর চক্রবর্ত্তী নাথপুরে যাইয়া স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন—স্তম্ভগাত্রে মর্মর প্রস্তরে লেখা হইয়াছে যে ঐ স্থানে কর্ণেল বিশ্বাসের পিতৃগৃহ ছিল। সুরেশচন্দ্র যৌবনে ব্রেজিলে যাইয়া সেখানকার সৈন্য দলে যোগদান করেন ও সেখানেই দেহত্যাগ করেন তাঁহার জন্মের শতাধিক বর্ষ পরে তাঁহার দেশবাসী স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের উদ্যোগে তাঁহার জীবন কথা প্রচারিত হওয়া সত্যই দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয়। ১লা মার্চ বিকালে নাথপুরে ঐ সম্পর্কে এক জন সভা হয়। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতি হন ও কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছাড়াও স্থানীয় চন্দননগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীজ্যোৎস্নাময় মজুমদার, বাণপুরের কবি শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়, মাটিয়ারী বানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুলেখক শ্রীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীঅজিত কুমার বসু, স্থানীয় উন্নয়ন অফিসার শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বণিক, ভাজন ঘাটের শিক্ষক শ্রীঅমল চট্টোপাধ্যায় নাভপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবলাই কৃষ্ণ বিশ্বাস প্রভৃতি সুরেশচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে সুরেশচন্দ্রের জীবন ও কার্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা লইয়া স্মরণিকা নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। সুরেশচন্দ্রের কোন জীবন কথা পাওয়া যায় না—উৎসবের উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করিতে আমরা অনুরোধ জানাই।

পথ চলতে

বেলা দে

যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত গিন্নি তো বাড়ী ফিরলেন কোন রকমে হাত-পা কেটে ছিড়ে একাকার করে। অথচ হাজারবার বলেছিলাম ট্যাক্সিতে করে চলো, তা হলোনা। সখ কত! দোতলা বাসে করে হাওয়া খেতে খেতে যাব! নাও, এখন হাওয়া খাও! অবশ্য আর একটু বেকায়দায় পড়লে হাওয়ার বদলে উনি খাবি খেতেন। সে কত কথা —আজকাল সবাই তো ট্রামে বাসে যাওয়া আসা করছে, আমি কি হাত গুণতে জানি যে আগে থেকে বুঝতে পারব আমের খোসায় পড়ে পা পিছলে যাবে? বলবো কি, মাসে বাতেরই ওষুধ কিনছি প্রায় কুড়ি টাকার, কাজেই এখন আমের খোসার দোষ দিলে কি হবে? এদিকে বয়েসটা যে দিন দিন বাড়ছে এটা কোনো সময় বুঝতে চাইলেন না। আর আমিই বা কি করে বুঝবো বলুন? এখনো লাল ডুরে শাড়ী পরছেন, মাসে স্নো পাউডার, সাবান কিনছেন তিরিশ চল্লিশ টাকার, লাল, নীল রডিস্ ছাড়া পরেন না। আমি তো মাঝে মাঝে পদ্মর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি।

যাক্ গে এসব কথা—এখন শুনুন আমার বিপদটা। গিন্নির বেলফুলের মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে নিজে তো চোখে ধুতুরো ফুল দেখলেন আর আমাকেও রাস্তার মাঝখানে মাথা হেঁট করালেন। উনি তো পা পিছলে পড়ে খালাস। সে কি কাণ্ড! রাস্তার একদল লোক হো হো করে হেসে উঠলো! একদল লোক আহা উহু করে ছুটে এসে আমাকে ডিঙ্গিয়ে হাত-পা ধরে তুলতেই ব্যস্ত! কেউ বলে হাঁসপাতালে চালান কর, কেউ বলে সামনের ডাক্তারখানায় নিয়ে চলুন। আর একদল চললো বাসের ড্রাইভারকে মারপিট করতে, আর আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলুম আর পুলিশের জেরার জবাবদিহি করতে লাগলুম। প্রায় আধঘণ্টা পরে হুকুম পেলাম আপনার স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। নিজের পা দু'টো তো খোঁতো করলেনই, মাঝখান থেকে পূজোর কেনা চল্লিশ টাকা দামের শাড়ীটা দু'টুকরো করলেন। বাস থেকে নামবার সময় বললুম হাতটা ধরে নামো—ওঁর লজ্জা করলো—এদিকে রাস্তায় যখন উবুর হয়ে পড়লেন তখন রাস্তার লোকেরা শেষে হাত পা টানাটানি করলো তাও আমায় দাঁড়িয়ে দেখতে হল! আর তা ছাড়া আমি যে গিন্নির হাত ধরে তুলবো সে সুযোগই বা পেলুম কোথায়? রাস্তার ছোকরার দল ছোঁ মেরে ওঁকে তুলে নিলে যেন ভাগাড়ে মরা পড়েছে।

বলব কি গিন্নিকে নিয়ে পথে বেরুলেই একটা-না-একটা বিপদ লেগেই আছে। এই সেদিন ছোট ভাইকে গেলেন হঠাৎ আদিখ্যেতা করে দেখতে! সেও কি কম দুর্ভোগ হল? শিয়ালদা ষ্টেশনে গেছি, উনি ছোট ভাইয়ের সংসার দেখতে যাবেন বায়না ধরেছেন—প্ল্যাটফর্মে গাড়ী দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জানলার ধারে ওঁর ভাইয়ের পুরনো ঝি মোক্ষদাকে দেখতে পেয়ে একেবারে হাম্‌লে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে উঠে গিয়ে বসলেন—ওদিকে গার্ডসাহেবের বাঁশীও বেজে উঠলো, গাড়ীও ছুটলো। চলন্ত ট্রেনে আমিও উঠতে বাধ্য হোলাম। কি গাড়ী, কোথায় যাবে, কিছুই আমায় জিজ্ঞেস করতে দিলেন না। আমিও গুড়ের নাগরীর মত একজনের একটা ভুষির বস্তার ওপর কোন রকমে জায়গা করে বসে পড়লাম। চলেছি তো চলেছি হঠাৎ খেয়াল হলো গাড়ী অন্য লাইনে দৌড়াচ্ছে—ততক্ষণে প্রায় পনেরো মাইল চলে এসেছি। একটা ষ্টেশনে শুনলাম তিন মিনিট দাঁড়াবে—হন্তদন্ত হয়ে নেমে পড়ে মেয়েদের গাড়ীতে খোঁজ করলাম—দেখি, নিশ্চিন্তে দুজনে বসে খোস-গল্প করছে! তাও শুনলাম সে ঝি নাকি ওঁর ভাইয়ের বাড়ীতে এখন আর কাজ করেন না—দেশে

যাচ্ছেন। উপরন্তু আমি কেন গিন্নির সঙ্গে মাঝখানে দেখা করিনি তার কৈফিয়ৎ চাইতে এলেন গিন্নি। ব্যাপার দেখুন, আমি ট্রেণে জায়গা পেয়েছি ভুষির বস্তার ওপর—দরজায় লোক বাদুড়-ঝোলা হয়ে ঝুলছে—তার উপর কানের গোড়ায় তারস্বরে ফেরিওয়ালাদের চিৎকার! তার মধ্যে রাজনীতির তর্ক নিয়ে ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের মধ্যে হাতাহাতি হবার জোগাড়—এই ফাঁকে গাড়ী কখন লাইন বদলে ডানদিকে চলতে সুরু করেছে সেটা আমি কি করে লক্ষ্য করি বলুন তো?

তারপর ষ্টেশনে তো নেমে পড়লাম দুজনে—সেখানে এসে শুনলুম কলকাতার গাড়ী আসতে এখনো দুটী ঘণ্টা দেরী আছে। সেই রোদ্দূরে বসে চার আনার স্যাঁতানো চানাচুর চিবুলুম। সেই গাড়ী লেট্ করে এলো, কাজেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে দেখে সোজা কলকাতার টিকিট কিনে বাড়ী ফিরে এলুম। এরপরও সেদিন আমায় নিয়ে বেরুলেন—হাটবাজার করতে। বললেন—বিশেষ কিছু কিনবো না, পদ্মর একজোড়া আটপৌরে শাড়ী আর হেবোর দুটো হাফপ্যান্ট্। বলবো কি, সেই শাড়ী আর প্যান্ট্ পছন্দ করতে দেড় মাইল ফুটপাত ধরে হাঁটতে হোল, আর মাঝে মাঝে ফুটপাত বদল করতে ওঁকে প্রায় তিনবার বাস আর মটরের চাকার তলা থেকে টেনে বার করতে হয়েছে। এইখানেই শেষ নয়—এক ফাঁকে নিজের রং বেরংয়ের ব্লাউস কিনলেন প্রায় দেড় ডজন, হেবোর সার্ট দুটো, গামছা এক জোড়া, ফুটপাতের বোতাম, টিপ্ ক্লপ, এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, কাঁচের গেলাস, বাটী, রেকাবী, এ ছাড়া বোদা ল্যাংড়া আম কুড়িটা, কুরুনী, কাটারি দু' চোখে যা দেখছেন তাই কিনছেন। দুটো র‍্যাশান ব্যাগ ভর্ত্তি হয়ে গেল। তখনো ফুটপাতে ওঠাবসার শেষ নেই।

ওদিকে বাজার করার মধ্যেই তেড়ে বৃষ্টি নামলো! ধারে কাছে কোনো গাড়ী বারান্দা নেই। কাক ভেজা ভিজে ঐ লটবহর নিয়ে উঠলুম এক তেলেভাজার দোকানের মধ্যে—সেখানে গিন্নিকে খুসী করতে আট আনার তেলে-ভাজা কিনতে হলো। হাঁটুর ওপর রাস্তার জল ভেঙ্গে দু'টাকার রিক্সা ভাড়া দিয়ে বাড়ী এসে পৌছালাম প্রায় রাত দশটায়। বাড়ী এসে দেখি, অৰ্দ্ধেক জিনিস দোকানে দোকানে ফেলে এসেছেন। হাফ্প্যান্ট হেবোর ফুলপ্যান্টে দাঁড়িয়েছে। রেডিমেড্ সার্ট প্রায় কনুইতে এসেছে। গামছা দুটোর মাঝখানটা কাটা। কাঁচের জিনিসপত্র সব ফাটা আর দাগী। সেই রাত্রিতে বৃষ্টিতে ভেজার জন্যে তেড়ে জ্বর—চারদিন বিছানায় শয্যাশায়ী—ওষুধ কিনতে বেশ কিছু টাকা গেল।

তবুও বাইরে বেরুবার সখ্ মেটেনি। ফাঁক পেলেই সামান্য কাজের দোহাই দিয়ে পথে বেরুতে ভোলেন নি।

প্রান্তি

মনোজকুমার ঘোষ

এমনি আজন্ম এই বাড়ীটির পরিখা পেরিয়ে
(নিচ্ছিদ্র সুখের মাঝে যেহেতু আমার ধ্রুবতারা
ভাবেনি অন্যের চেয়ে ঐশ্বর্য তার কতোটুকু বেশী ;)
যখন-ই আমায় পেলো আমার অচেনা পরদেশী
রিক্ত মনের সুরে তার অনুপম সাড়া দিয়ে
আমার সুখের মাঝে আমি যেন হই দিশাহারা।

সেইটুকু পাই যদি শেষ বিদায়ের ক্ষণে ক্ষণে
নিঃশেষে বিমুগ্ধ প্রাণ হোক পরাজিত লাঞ্ছিত—
এই তো হৃদয় মাঝে বেদনার মধুরিমা সুর হয়ে বাজে
যদিও একান্তভাবে অবহেলা পেয়ে আমি
সিঁদুরের সাঁঝে
ধূসর রাতের বুকে মিশে যাবো অবাধ্য চরণে :
সুখ যদি পুড়ে যায় বেদনার অংশভোগে কেন কুণ্ঠিত ?

ভেবোনা আমার চাওয়া আমার পাওয়ার চেয়ে বেশী ;
অনিঃসীম শূন্যতাঘেরা এ দিনের সবটুকু দিয়ে
প্রাবৃষায় মাথা পেতে চাইনি প্রেমের বারিধারা :
সুনিপুণ যোদ্ধবেশে করেছি নিজেরে বাণীহারা ;
অথচ সুখের রণে হেরে গিয়ে আমি হই খুশী
দিনের আ[illegible]ার শেষে অন্ধ দিনের স্মৃতি ব'য়ে।

সেই স্মৃতি সুপ্ত থাক এই দুনিয়ার কোনো মনে
বেঁচে থাক কাঁটা হয়ে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে যদি
সুখের সোনার তরী ভেসে যায়
অনন্ত ইচ্ছার অস্তিত্বে :
হৃদয়-দীধিতি-দীপ্র মধুর সাগর-সঙ্গমে—
আমার এ ভালোবাসা শেষ হয় যদি কোনো ক্ষণে
নিঃসীম সাগরে শুয়ে ভেবো তুমি ছিল সেই নদী।

সন ১৩৭১ সালের বর্ষফল

উপাধ্যায়

সন ১৩৭১ সাল বিশ্বের নানা দিকে অশুভ বার্ত্তাবহ রূপে সক্রিয় হয়ে উঠবে। বিদায়ী বর্ষের চৈত্রমাসে পড়েছে পাঁচটি রবিবার। এরূপ যোগ অশুভব্যঞ্জক। ফলে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, রোগ, বিপ্লব, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সংঘর্ষ, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হবে। দাঙ্গা হাঙ্গামা, রক্তপাত ইত্যাদি বহু দেশকে বিপন্ন করে তুলবে। ভারতের নানা দিকে বহু মানীয় ব্যক্তি হবে—ওলাউঠা, বসন্ত, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও গলপ্রদেশের রোগে অনেক লোক ক্ষয় হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ধ্বংসাত্মক কার্য্য কলাপের জন্য ভারত বিব্রত হয়ে উঠ্‌বে, বাধ্য হয়ে তাকে প্রতিরোধ কল্পে নাম্‌তে হবে রুদ্ররূপ নিয়ে সংঘর্ষের ভিতর,—শান্তিপূর্ণ অহিংসাত্মক নীতি ও পদ্ধতি রক্ষা করে চলা অসম্ভব হয়ে উঠবে। ভারতের শাসনতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা ও মন্ত্রীদলের মধ্যে পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আশঙ্কা করা যায় কয়েক জন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন হানি, রাজদণ্ড বা গুপ্তভাবে প্রাণ সংহার! যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আকস্মিক ভাবে হবার আশা করা যায়, তার ফল খুব শুভই হবে। এবারও বিস্মৃত গণনায়ক মহামানবের আর্বি-র্ভাব ভারতবর্ষে সম্ভাবনা আছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবেনা, গুরুতর পরিস্থিতির আশঙ্কা করা যায়! কাশ্মীরে দেশব্যাপী ব্যাপক নরহত্যার সম্ভাবনা আছে। আষাঢ় মাসের পরই ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের গুরুতর বিপদ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা। আকস্মিকভাবে বিপন্ন হবে পূর্ব্ব পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, সিকিম ও কাশ্মীর। এই বিপন্নতার মূলে থাকবে ভারতে অবস্থিত সংখ্যাগুরু পঞ্চমবাহিনীর সক্রিয় নেপথ্য ভূমিকা। দুর্ব্বল বাদীর প্রাত্যহিক তোষণ নীতি যে বর্ব্বরতার গতিকে নিষ্ক্রিয় করতে পারেনা, বরং সর্বনাশের দাবানল সৃষ্টি করতে পারে, সেই সত্যই ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিবাসীরা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করবে। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' চাণক্যের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বাণীকে অবহেলা করে, আর শক্তিবাদকে শবে পরিণত করে, তারা নিজেদের ভুল বুঝে অনুতপ্ত হবে, এ বৎসরই তারা বুঝবে ক্লৈব্যগত প্রেমবাদ এ যুগে অচল—শক্তি সঞ্চয় ও শক্তি প্রকাশ করাই যুগ ধর্ম্ম। এবৎসর তাদের বিভ্রান্ত নীতির উপযুক্ত শিক্ষালাভ হবে। আশার বিষয়, এ বৎসর থেকে ভারতীয় রাষ্ট্র ধাক্কা খেয়ে মহাশক্তির উপাসক হয়ে সর্ব্ব-কার্য্যে উন্নতির পথে দ্রুত ভাবে অগ্রসর হবে। দেশকে অধঃ-পতনের মুখে যারা টেনে নিয়ে চলেছে, তাদের অনেকেই জনগণের কাছে নির্য্যাতিত হোতেপারে। এই বৎসর শোনা যাবে জনশক্তির রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি। ব্যবসায়ীদের অবস্থা মন্দ হবে। সুবিধাবাদী দুর্নীতিপরায়ণ ও চোরাকারবারী-দের অনেকেই শাস্তি ভোগ করবে—বহুলাংশে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। বহির্বাণিজ্যে এবৎসর ভারত বিশেষ লাভ-বান হবে। ভারত সীমান্তে শত্রু পক্ষের রুদ্ররূপ প্রকাশ পাবে, এজন্য ভারতের কুম্ভকর্ণ নিদ্রা না ভাঙলে বিপদ ঘনীভূত হবে। ভারতের ভিতরে শত্রুরা এর মধ্যেই বহু-সংখ্যক গুপ্তচর ছেড়ে দিয়েছে, তারা রাষ্ট্রঘাতী কার্য্য

কলাপে, জয় চাঁদ, মীর জাফর প্রভৃতির ভূমিকা অবলম্বন করে বাহিরে শান্ত শিষ্ট ভদ্র লোকের মুখোস পরে আছে, আর সর্ব্ব ঘটে হয়ে রয়েছে জনার্দ্দন। এদের সম্বন্ধে রাষ্ট্র পরিচালকগণের বিশেষ দৃষ্ট ও সমুচিত দণ্ড দেওয়া এই চৈত্র মাস থেকেই সুরু করা উচিত। আলোচ্যবর্ষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিব্রত হবে। মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের ভাগ্যে বিশেষ দুর্দ্দশা ভোগ। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জনশক্তির বিক্ষোভ, প্রবল আন্দোলন, অসন্তোষ ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ প্রকাশ পাবে। এবৎসর ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নৈরাশ্যজনক। ভারতীয় রাষ্ট্রের কতিপয় বিখ্যাত রাজনীতি-বিশারদ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও সাহিত্যিক মহাপ্রস্থান করবেন। জনৈক বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিরও তিরোভাব। শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের অসন্তোষ ও ধর্মঘট। কলিকাতার ট্রাম কোম্পানির কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট ও গোলমালের অবতারণা করবে, ফলে জনসাধারণের অসুবিধা ভোগ করতে হবে। রাজনৈতিক দলাদলির ক্ষেত্রে মারপিঠ পর্য্যন্ত হোতে পারে। দেশের ভেতর বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আশঙ্কা থাকায় পূর্ব্ব থেকে সকলেরই সতর্ক হওয়া' বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্য পরিচালনা সময়ে সময়ে ব্যাহত হোতে পারে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদলের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হওয়ার দরুণ প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটু অসুবিধায় ফেলে দেওয়া হবে। বিমান ও নৌবহরে পঞ্চম বাহিনীর কার্য্য কলাপ প্রকাশ পেতে পারে। উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলগুলি সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে কালাতিপাত করবে। এই সব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, চুরি ডাকাতি, উপদ্রব, লুণ্ঠন, হত্যা, ঝটিকা বন্যা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যাবে। শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগ থেকে দুর্ঘটনাগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে ভারতের উত্তর ও পূর্ব্বাংশ। এখানে ভূমিকম্প, প্রবল ঝটিকা, বন্যা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি প্রকট হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবৎসর জনপ্রিয় হোতে পারবেন না। রাজনৈতিক আন্দোলন গুরুতর ভাবে হোতে পারে। কোন বিশিষ্ট মন্ত্রীর পদত্যাগের সম্ভাবনা। অন্নসমস্যা জটিল হবে। বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার স্বাস্থ্যহানি, পীড়া কিম্বা প্রাণ-হানির যোগ আছে। কোন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকের তিরোধান। বাংলার স্থানে স্থানে ঝড় বৃষ্টি, বন্যায় শস্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা। পশ্চিম বাংলার ব্যবসায়ীদের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধায় সম্মুখীন হোতে হবে। তা ছাড়া দেশের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা রক্তপাত, দুর্ঘটনা, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি চলবে। এ বৎসর পশ্চিমবাংলায় দুঃসময়। বাঙালীর কোণঠেসা হবার আশঙ্কা। পাকিস্তানের অবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমস্যা সঙ্কুল। পাকিস্তানে বিদ্রোহ ও অন্তর্বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। বিদায়ী বৎসরের মতই পাকিস্তানে লীলা চলবে আলোচ্য বর্ষে। বহু লোকক্ষয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্ত পাত, খাদ্যাভাব, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ প্রভৃতি পূর্বপাকিস্তানে ঘটবে। রাশিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক নিহত হোতে পারেন, সরকার জনসাধারণের অপ্রিয়ভাজন হবে। ভারতের মত সেখানে ও পঞ্চম বাহিনী ও গুপ্তচর বৃদ্ধি পাবে। বিরুদ্ধ দলের পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। কতিপয় বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়কের জীবন বিপন্ন হবে। পর রাষ্ট্রের সহিত বিবাদ ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হবে। চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ আবশ্যম্ভাবী। সামরিক কারণে ব্যয়বাহুল্য ও তজ্জনিত রাশিয়ায় অর্থনৈতিক সঙ্কট। বৎসরের শেষে রাশিয়ায় বহু অমঙ্গলজনক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। চীনে গৃহ বিবাদ প্রবল আকার ধারণ করবে। শাসনতন্ত্রের বিপর্য্যয় ঘটবে। দুর্ভিক্ষ ও অর্থাভাব প্রবল হবে। দেশে দেখা দেবে বিদ্রোহ ও বিপ্লব। পৌষ মাসের পর মাও সেতুং ও অপর কয়েকজন প্রধান রাষ্ট্র কর্ণধারের বিপদ ও প্রাণহানি। চীন এবৎসরে ভারত আক্রমণ করতে পারবে না। বিশ্ববাসীর কাছে চীন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, শেষে ভারতের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হবে। ইংলণ্ডের দুর্বৎসর। আর্থিক সঙ্কট, শ্রমিক ধর্মঘট ও নানা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। মন্ত্রীসভার মধ্যে মতানৈক্য হেতু বিবাদ উপস্থিত হবে। কোন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদের প্রাণহানি যোগ। লণ্ডনে আকস্মিক দুর্ঘটনা, আফগানিস্তানে কমিউনিষ্ট প্রভাব। ব্রহ্মদেশে রাজনৈতিক গোলযোগ, বিদ্রোহ, রক্তপাত ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ। সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রনায়কের জীবন বিপন্ন। আমেরিকার মন্ত্রীসভাও শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হবে। ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটবে। ফলে জন সাধারণের দুর্দ্দশা চরমে উঠবে। বহু লোক

ক্ষয় ঘটবে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে। সরকারের বিপক্ষে বিদ্রোহ, আন্দোলন, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সম্ভাবনা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়কের জীবন বিপন্ন হোতে পারে। বাণিজ্য ব্যবসায় সুবিধাজনক নয়। রাশিয়ার সাম্যনীতি জার্ম্মানীতে বিস্তৃতি লাভ করবে। ফ্রান্সে রক্ত পাত, আর্থিক বিপর্য্যয়, অসন্তোষ, খাদ্যাভাব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হবে। ফ্রান্সের সহিত চীনের আঁতাত প্রহসনে দাঁড়াবে। আরবের সময় ভালো যাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ। আয়ার ল্যাণ্ডে এবার বহু লোকক্ষয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এবৎসর অশুভ ঘটনার বাহুল্য আছে। ভারতে ঘোরতর ঝড় বৃষ্টি, বহু লোকের প্রাণ হানি ও অর্থ সঙ্কট। কোথাও শুভ ফলের সম্ভাবনা নেই। এ বৎসর ছিন্নমস্তা সভ্যতার নিজ মুণ্ডকেটে রুধির পানই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, আর সভ্যতার রাজপথে প্রবহমান হবে রক্তস্রোত, রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের অক্ষ ক্রীড়ায় ভ্রমাত্মক চালে।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, কৃত্তিকার পক্ষে মধ্যম আর অশ্বিনীজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যভাব শুভ, মাসের শেষার্দ্ধে পিত্ত প্রকোপ, গৃহে নবজাতকের আর্বিভাব, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা অতীব উত্তম, বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ। প্রথমার্দ্ধ চাকুরিজীবির পক্ষে অনুকূল, পদোন্নতি ও অনুরূপ মর্য্যাদা বৃদ্ধি। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ, সামরিক বা পুলিশ কর্ম্মচারীর সম্মান, পদক প্রভৃতি লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে সন্তোষজনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, অনেকের সন্তান সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, রোহিণী ও মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম ও একই প্রকার। ভ্রমণে অবসাদ, পারিবারিক সুখশান্তি লাভ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়ার্দ্ধে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হেতু সন্তোষ ও সুখ লাভ। আর্থিক অবস্থা উত্তম, আয়বৃদ্ধি ও লাভ। ব্যয়বাহুল্য, বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ। চাষের নব প্রবর্ত্তনের দিকে গেলে ক্ষতি হবে। চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতি ও অনুকূল আবহাওয়া, বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির আয় অতীব উত্তম, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ। বাপের বাড়ী থেকে দুঃসংবাদ পেয়ে মর্ম্মাহত হবে, প্রণয়ের ক্ষেত্র শুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

মিথুন রাশি

পুনর্ব্বসুজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম, আর্দ্রার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্যহানি, শারীরিক অসুস্থতা, সাধারণ দৌর্ব্বল্য, ভ্রমণান্তে অবসাদ, ধারালো অস্ত্রে আঘাতপ্রাপ্তি, পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা কিন্তু পরিবার বহির্ভূত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য। নবজাতকের আর্বিভাব, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আর্থিকক্ষেত্র সন্তোষজনক নয়। শেষার্দ্ধ শুভ ও আয়বৃদ্ধি যোগ, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মধ্যম। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ শুভ নয়, শেষার্দ্ধ মন্দ যাবে না। পদোন্নতি হবার সম্ভাবনা, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। সিনেমা ও মঞ্চ-শিল্পীর অতীব উত্তম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষার পক্ষে উত্তম, পুষ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট। জ্বর ও অনুরূপ পীড়া। রক্তের চাপবৃদ্ধির সম্ভাবনা। শেষার্দ্ধে পারিবারিক শান্তির ও ঐক্যের অভাব। স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। ব্যয়বৃদ্ধি, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র মোটামুটি ভালো যাবে, যারা বৈদেশিক দূতাবাসে বা সমুদ্র পারের বৈদেশিক সংক্রান্ত বিভাগে যারা কর্ম্মলিপ্ত, তাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে অতীব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, উত্তর ফল্গুনীর পক্ষে মধ্যম। মঘার পক্ষে নিকৃষ্ট, উদর ও গুহ্য পীড়া, মূত্রাশয় পীড়া, জ্বর, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, চক্ষুরোগ প্রভৃতি। পারিবারিক ক্ষেত্রে ও বাইরে অশান্তি, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি, উপরিওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। শেষার্দ্ধ শুভ, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, শিল্পী, গায়িকা, অভিনেত্রীর পক্ষে বিশেষ শুভ ও সাফল্যলাভ। বিদ্যার্থী নারীর পক্ষেও উত্তম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

কন্যারাশি

উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির উত্তম, হস্তা ও চিত্রার পক্ষে সমান ও মধ্যম ফল। স্বাস্থ্য ভালো যাবে, উদরের কিছু গোলযোগ, গুহ্যস্থানে প্রদাহ প্রভৃতি শেষার্দ্ধে সম্ভব। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা। আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে অনুকূল। চাকুরীজীবির পক্ষে বিশেষ শুভ, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন, পসার প্রতিপত্তি, উপরওয়ালার সুনজর, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে প্রথমার্দ্ধ বিশেষ শুভ, শেষের দিকে আয় হ্রাস। স্ত্রীলোকের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, চাকুরিজীবি মহিলার পক্ষে কিঞ্চিৎ শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

তুলা রাশি

বিশাখার পক্ষে উত্তম, চিত্রার পক্ষে মধ্যম, স্বাতীর পক্ষে নিকৃষ্ট। মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা, স্বাস্থ্যের অবনতি। সন্তানাদির পীড়া, পারিবারিক কলহ ও অশান্তি। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক ক্ষতি, প্রচেষ্টায় নৈরাশ্য, ব্যয় বৃদ্ধি, শেষার্দ্ধ আশা-ব্যঞ্জক ও অর্থাগম। ঋণ পরিশোধ, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ। চাকুরিজীবি মাসের প্রথমার্দ্ধে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবে, শেষার্দ্ধ শুভ হবে। অধীনস্থ কর্ম্মচারী বা ভৃত্যের জন্য অশান্তির সৃষ্টি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে কিছু শুভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। ভ্রমণযোগ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ভালো বলা যায় না।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠার পক্ষে উত্তম, অনুরাধার পক্ষে মধ্যম। শারীরিক অসুস্থতা, রক্তপাত, অজীর্ণ, জ্বর, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি, শেষার্দ্ধে দুর্ব্বলতা এমনকি দুর্ঘটনা ও আঘাত প্রাপ্তি হোতে পারে। সন্তানাদির পীড়া। পারিবারিক অশান্তি কলহ স্বজনবিরোধ। আর্থিক ক্ষেত্র অশুভ, ক্ষতির সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে গতানুগতিকভাবে মাসটি চলে যাবে। চাকুরিজীবির পক্ষে ভালো বলা যায়না, নানাপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সমাবেশ কর্ম্মক্ষেত্রে হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে সময়টি মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ নয়, কেবল ছায়াছবি ও মঞ্চশিল্পীর পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, উত্তরাষাঢ়া জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম, মূলার পক্ষে নিকৃষ্ট। পারিবারিক শান্তি। শেষার্দ্ধে সামান্য পারিবারিক কলহ। স্বজন-বিরোধ। উদরঘটিত পীড়া ও হজমের গোলমাল। আর্থিক অবস্থা বিশেষ সন্তোষ জনক। নানাভাবে অর্থা-গম। লাভ ও সাফল্য। শেষদিকে নগদ টাকার টান ধরবার সঙ্গে সঙ্গে তা হাতে এসে যাবে! আর্থিক ব্যাপারে অদূরে ভ্রমণ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে সুবিধাজনক নয়। চাকুরি জীবির পক্ষে প্রথম দিকটা মন্দ নয়, শেষের দিকে একটু অসুবিধাজনক পরি স্থিতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে এক ভাবেই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। বিশেষতঃ ছায়াছবি ও মঞ্চাভিনেত্রী, সঙ্গীতশিল্পীর পক্ষে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা। অনেকের কন্যা সন্তান হবে।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ায় পক্ষে উত্তম। শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। সামান্যই বায়ু পিত্ত প্রকোপ। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা। সন্তান জন্মগ্রহণ-জনিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা। প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ ভালো যাবেনা, শেষার্দ্ধ অনেকটা ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি

জীবির পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। পিত্রালয় থেকে শুভ সংবাদ লাভ। ছায়াছবি ও মঞ্চাভিনেত্রী, গায়িকা প্রভৃতির পক্ষে সর্ব্বোত্তম সুযোগ। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম, শতভিষার পক্ষে নিকৃষ্ট। শরীর ভেঙে পড়বে, উদরে ও বুকে ব্যথা ও যন্ত্রণা, শ্বাসপ্রশ্বাসের পীড়া, চক্ষুকষ্ট প্রভৃতি। সাধারণ দুর্ব্বলতা। পারিবারিক শান্তি থাকলে ও মানসিক অশান্তি। বাইরে থেকে দুঃসংবাদপ্রাপ্তি, স্বজন বিরোধ, কলহ বিবাদ প্রভৃতি সম্ভাবনা। সন্তানদের স্বাস্থ্যহানি। এমাসে আর্থিক দুর্গতি। ব্যয়বৃদ্ধি চুরি ও প্রতারণার দরুণ অর্থহানি। ভ্রমণের সময় সতর্কতা আবশ্যক। কেননা পয়সা কড়ি জিনিষ পত্র চুরি হবার যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে সতর্কতা দরকার। চাকুরিজীবির পক্ষে মাসটা একভাবে যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি আশানুরূপ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রোহিণী জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তর ভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। দৈহিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। জ্বর পিত্ত কোপ প্রভৃতি। শেষার্দ্ধে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, রক্তের চাপ বৃদ্ধি ও চক্ষু পীড়া। পারিবারিক কলহ ও অশান্তি। আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব। ব্যয় বৃদ্ধি ও ক্ষতি। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধ অনেকটা ভালো। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়, চাকুরি জীবির পক্ষে বিশেষ দুঃসময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। চিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রী গায়িকা প্রভৃতির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

ব্যবসায়ে লাভ। অর্থোপার্জ্জনে আংশিক বাধা। শেষার্দ্ধে অর্থাগম। ভ্রাতাভগ্নীর জন্য মনোকষ্ট। পিতৃপীড়া, এমন কি পিতৃবিয়োগ। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। চাকুরিজীবির পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষলগ্ন—

ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষায় অপটুতা। চোর জুয়াচোরের ভয়। ভ্রাতার রোগভোগ। মানসিক উদ্বেগ, আর্থিক উন্নতি। কর্ম্মসাফল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন লগ্ন—

বন্ধুবিয়োগ, আর্থিক উন্নতি, স্বাস্থ্যহানি, কর্ম্মস্থল শুভ। বুদ্ধির ভুলে কাজকর্ম্মে অশান্তি। বন্ধু দ্বারা অর্থলাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কর্কট লগ্ন—

স্ত্রীলোক থেকে ক্ষতি, গুরুজনের জন্য অশান্তিভোগ, অর্থাগম, সাফল্যলাভ, ভাগ্যোন্নতি ও খ্যাতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহ লগ্ন—

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক। ব্যবসায়ে ধনাগম। মানসিক উদ্বেগ। সন্তানের পীড়া। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

কন্যা লগ্ন—

ভালো সময়। কর্ম্মেসাফল্যলাভ। অগ্রজ থেকে অশান্তি। অযথা অর্থব্যয়। ভ্রমণ। সন্তানের পীড়া। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা লগ্ন—

মানসিক বল ও উদ্যমের অভাব। শত্রুবৃদ্ধি। গৃহনির্ম্মাণে বাধা। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার মৃত্যুতুল্য পীড়া। পারিবারিক অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মোটামুটি ভালো বলা যায়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

বৃশ্চিক লগ্ন—

স্বাস্থ্য ভালো বলা চলে না, অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু মস্তিষ্ক পীড়া, পারিবারিক অবস্থা উত্তম, কর্ম্মস্থলে উন্নতি, যশও প্রতিষ্ঠালাভ, সন্তানের উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু লগ্ন—

কর্ম্মোন্নতি, নূতন জমি সংগ্রহের চেষ্টা, পত্নীর অসুস্থতা, গৃহ নির্ম্মাণ যোগ। আর্থিক উন্নতি ও কর্মসাফল্য লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মকর লগ্ন—

ভাগ্যোদয়, দাম্পত্যকলহ, প্রীতিভঙ্গ, সহকর্ম্মীদের সঙ্গে মতানৈক্য হেতু অশান্তি, ব্যবসা বাণিজ্যে আশানুরূপ ফলের অভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভ লগ্ন—

পত্নীর স্বাস্থ্য হানি। মানসিক উদ্বেগ, গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি যোগ, বাত বেদনা। স্নায়বিক দুর্বলতা। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশানুরূপ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মীন লগ্ন—

বেদনা সংযুক্ত পীড়া। ধন লাভ। সন্তান সন্ততির লেখা পড়ায় বিশেষ উন্নতি। ব্যয় বৃদ্ধি। ভাগ্যোন্নতি। কর্মস্থলে অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

ছাঁটাই
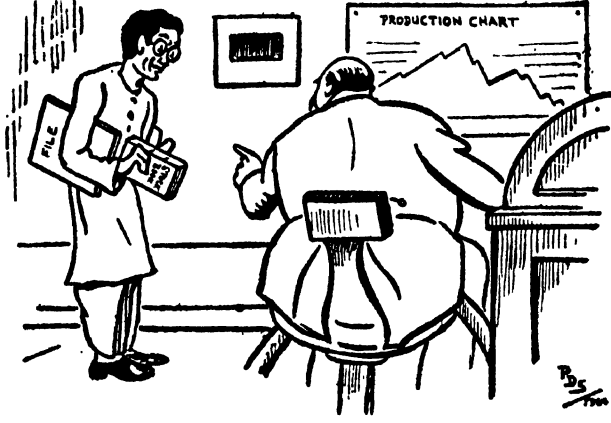
কেরাণী—(সবিনীতভাবে)আজ্ঞে···একটা কথা জিগগেস করবো স্যার ?···

মালিক—কি ?

কেরানী—আজ্ঞে, কর্ম্মচারী-ছাঁটাইয়ের যে ফর্দ্দটা কাল আপনি টাইপ করতে পাঠালেন, তাতে কি আমারও নাম আছে স্যার ?···

মালিক—না ! সে ফর্দ্দ ছেপে আসার আগেই তুমি তো বিদায় হচ্ছো !

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
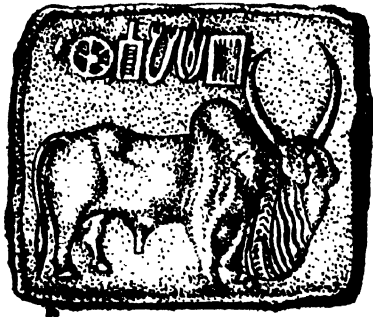
অলংকার শাস্ত্রে রসতত্ত্বের আলোচনা আছে। নাট্যাচার্য ভরতমুনি 'নাট্যসূত্রের' ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞকৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটি রস বলিয়া গণ্য। উদ্ভট প্রণীত 'কাব্যালঙ্কার-সারসংগ্রহে' অতিরিক্ত শান্তরস যোগ দিয়া নবরসের কথাও আছে।

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণ রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"

এবং সাহিত্যদর্পণকার বাৎসল্যরসকে অতিরিক্ত ধরিয়া দশম রসের কথাও বলিয়াছেন।

"অথ মুনীন্দ্রসম্মতো বৎসলঃ।
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ॥"

নিম্নে উক্ত রসগুলির 'স্থায়ীভাব' কি কি তাহা পর্যায়ক্রমে লিখিত হইল।—

রস॥ (১) শৃঙ্গার, (২) হাস্য, (৩) করুণ, (৪) রৌদ্র, (৫) বীর, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস, (৮) অদ্ভুত, (৯) শান্ত, (১০) বাৎসল্য।

স্থায়ীভাব॥ (১) রতি, (২) হাস্য, (৩) শোক, (৪) ক্রোধ, (৫) উৎসাহ, (৬) ভয়, (৭) জুগুপ্সা, (৮) বিস্ময়, (৯) শম [নির্বেদ], (১০) বাৎসল্য-স্নেহ।

স্থায়ীভাব কি?—ইহা অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ, উহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; কিন্তু, স্বরূপতঃ বিনাশশীল হইলেও উহা সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে চিরস্থায়ী হয়। স্থায়ীভাব সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকার বলিতেছেন—

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥"

অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ কোন প্রকার 'সঞ্চারী' ভাবই যে ভাবের তিরোধান ঘটাইতে পারে না, যাহা আস্বাদাঙ্কুর-কন্দ-স্বরূপ, তাহাই 'স্থায়ী' ভাব।

রূপগোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে কিছু বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন।—

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে॥"

অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে বশীভূত করিয়া যে ভাব উত্তম রাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। অবিরুদ্ধভাব হইতেছে মিত্রভাব ও উদাসীনভাব; লজ্জা, বোধ, উৎসাহ, প্রভৃতি মিত্রভাব, এবং গর্ব, হর্ষ, সুপ্তি, প্রভৃতি উদাসীনভাব; আর বিরুদ্ধভাব হইতেছে—বিষাদ, দৈন্য, মোহ, শোক, ক্রোধ, ত্রাস, প্রভৃতি। মনে রাখিতে হইবে এগুলি সবই ব্যভিচারী ভাবের অন্তর্গত। ভাবার্থ এই,—যিনি উত্তম রাজা তিনি তাঁহার মিত্রপক্ষ, উদাসীন পক্ষ ও শত্রুপক্ষকে স্বীয় প্রভাবে যেরূপ বশে আনিতে পারেন, সেইরূপ স্থায়ীভাব অবিরুদ্ধ-বিরুদ্ধ উভয় ভাবকেই বশে আনিয়া নিজের পুষ্টিসাধনে নিয়োজিত করিতে পারেন।

রস শব্দের দুইটি অর্থ,—আস্বাদ্যবস্তু এবং রস-আস্বাদক যিনি [রসিক]। কবিকর্ণপুর বলেন, যে আস্বাদ্যবস্তুর আস্বাদন লাভে চিত্তের দ্রবতা জন্মে সেই চমৎকৃতিই হইতেছে রসের প্রাণবস্তু।—

"রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসোরসঃ।
"তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ॥"

অলঙ্কারকৌস্তুভ

চমৎকারের কারণ হইল অনির্বচনীয় সুখাতিশয্যের অনুভূতি, এজন্য বলা যাইতে পারে যে, সেই চমৎকারিত্বময় সুখই হইল 'রস'। সাহিত্যদর্পণকারের 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—যদি মানা যায় তবে বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে রস নাই তাহা কাব্য হইতে পারে না, এবং কোন কাব্যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য থাকিলেও উহা যদি রসহীন হয় তবে উহা কাব্য নয়। অগ্নিপুরাণ বলিতেছেন,—

"বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবনম্।"

কবিকর্ণপুরের মতে কবির অসাধারণ চমৎকারিণী রচনাই

কাব্য—কবিবাঙ্‌নির্মিতং কাব্যম্। 'কাব্যপ্রকাশরচয়িতা মম্মথভট্ট প্রাকৃত কাব্যের ফলের কথা বলিয়াছেন, যথা, যশঃ, অর্থপ্রাপ্তি, ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতালাভ, পরম সুখপ্রাপ্তি ইত্যাদি; কিন্তু কবিকর্ণপুর 'অলঙ্কারকৌস্তুভে' ভগবদ্‌বিষয়ক অপ্রাকৃতকাব্যের কথা বলিয়াছেন।—যে কবি শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ চিন্ময়রসাত্মক (divine rasa) কাব্যরচনাকালে পরমানন্দ অনুভব করেন তিনি যে পরম-ফললাভ করেন, তাহা পূর্বোক্ত যশাদিপ্রাপ্তির আনন্দের তুলনায় অনির্বচনীয়। প্রাকৃত কাব্যরসিকগণ প্রাকৃত কাব্যের রসাস্বাদনজনিত আনন্দকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" বলিয়াছেন।

আবার, প্রাকৃতকাব্য রসাত্মক হইলেও যে কোনও ব্যক্তি সেই কাব্যরসের আস্বাদনে যোগ্যতা অর্জন করে না, কারণ, রত্যাদি বাসনা না জন্মাইলে রসের অনুভূতি হয় না। রংগালয়ে যাইয়া অভিনয় দর্শনে যে অনির্বাচ্য আনন্দ [সুখ] উপভোগ করিবার অভিলাষ দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে উদয় হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন; এই আকাঙ্ক্ষাই হইল 'রতি'; এই আকাঙ্ক্ষা যাহার থাকে না সে রংগালয়ে যায় তামাসা দেখিবার জন্য, রসাস্বাদনের উদ্দেশ্যে নহে। তাই সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলিতেছেন,—

"ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদি বাসনাম্।
নির্বাসনাস্ত রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥"

এই প্রকার বাসনারহিত দর্শকগণ রংগশালার কাষ্ঠ, দেয়াল ও প্রস্তরের ন্যায়।

সাহিত্যদর্পণকার বলিতেছেন যে, উহা দ্বারা মানুষ চিত্তের অনুকূল কোন বস্তুর প্রতি তন্ময়ীভাব বা আসক্তি লাভ করিয়া নিজেকে সুখী বোধ করে।—

"রতির্মনোঽনুকূলার্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্।"

যাহাকে দেখিলে, যাহার কথা শুনিলে, যাহাকে স্পর্শ করিলে, যাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিলে আমরা আপনাকে সুখী অনুভব করি তাহাকেই আমরা সুন্দর বলি। প্রতি নরনারীর নিকট এই সৌন্দর্য রুচিও সংস্কারভেদে স্বানুভব-সংবেদ্য। এই 'রতি'কে আলংকারিকগণ 'ভাব'ও বলিয়া থাকেন।

কাব্যরসের আস্বাদন করিতে হইলে কাব্যে বর্ণিত বিষয়বস্তুর জ্ঞানের প্রয়োজন, এ জন্য তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা ও তন্ময়তালাভ আবশ্যক; অর্থাৎ, এ সম্বন্ধে প্রয়োজন হইতেছে চিত্তের নির্মলতা, চিত্তের কোন আবিলতা থাকিলে তন্ময়তা আসিবে না, রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। চিত্তে যদি রজোগুণের প্রাধান্য থাকে তবে চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটিবে, তমোগুণের প্রাধান্য থাকিলে বিষয় বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না! এজন্য রজঃ ও তমোহীন সত্ত্বগুণ থাকিলে চিত্ত নির্মল হইবে। সত্ত্বগুণান্বিত সামাজিকগণই রসগ্রহণে অধিকারী এবং তাঁরাই সহৃদয় সামাজিক বলিয়া কথিত হন। কিন্তু মায়িক রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের অতীত না হইলে চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তদাত্ম্য লাভ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক হয় না—হ্লাদিনীশক্তি চিত্তে আবির্ভূতা হয় না!

নব্য অলংকার শাস্ত্রের জনক আনন্দবর্ধনাচার্য তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' নামক গ্রন্থে বলিতেছেন যে, ভাবহীন জ্ঞান ও জ্ঞানহীন ভাব ইহার কোনটিই মানুষের হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ রসাস্বাদনাভিলাষকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ নয়।

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং ন বা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমখিলং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন! ত্বদ্‌ভক্তিতুল্যাসুখম্॥"

তাৎপর্য এই,—"নানা প্রকার রসকে আস্বাদন করাইবার জন্য সদা সমুদ্যত কবিগণের নিত্য নবীন প্রতিভাময়ী দৃষ্টি [জ্ঞানহীন ভাব] ও অব্যভিচারী প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ পারমার্থিক বস্তুতত্ত্বের প্রকাশে সমর্থ যে প্রমাণ পরতন্ত্র জ্ঞানীপুরুষগণের দৃষ্টি [ভাবহীন জ্ঞান]—আমরা এই উভয় প্রকার দৃষ্টির সাহায্যে এই অনন্তবৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বরহস্যের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়া আজীবন পরিশ্রম করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। হে ক্ষীরোদশায়িন্ রসঘন চিদানন্দময় পুরুষ! তোমাকে ভালবাসারূপ যে ভক্তিরস, সে রসাস্বাদনরূপ সুখ কিন্তু এই উভয়প্রকার দৃষ্টির সাহায্যে আমরা লাভ করিতে পারিলাম না।"

রসাস্বাদই মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু এ কীরূপ রস? প্রাকৃত কাব্যে কল্পিত স্ত্রী-পুরুষরূপ নায়িকা-নায়ককে আলম্বন করিয়া যে রস সহৃদয় সামাজিকগণের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়? অথবা, প্রাপঞ্চিক আলম্বনাদির ভাবনাবহির্ভূত বৈষয়িক সুখ হইতে বিভিন্ন কোন শাশ্বত আলম্বন রসিত অনির্বাচ্য রস? উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি—
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ
আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ॥"

সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই রস। সেই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারী মানব আনন্দের সহিত নিত্যযুক্ত হয়। রসরূপ আনন্দ যদি না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসারে কে স্পন্দিত হইত? কেই বা জীবিত থাকিত? সেই আনন্দ-স্বরূপ রসই আকাশের ন্যায় অনাবৃত, সর্বব্যাপী ও অখণ্ড।

এই রসই যদি পরমপুরুষার্থ হয়, তবে কাব্যে বা নাটকে বা কোন বর্ণনায় সে রস নাই। আবহমান কাল যে কাব্য সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে তাহা রসের উৎস নহে, তাহাতে রস নাই, কারণ তাহা প্রাপঞ্চিক অশাশ্বত বস্তুর বর্ণনায় সমুজ্জ্বল, তাহা রসাভাস, তাহাতে রসের গন্ধ আছে মাত্র, —যেখানে "সঃ" সেইখানেই "রস"। তাই রূপগোস্বামী বলিতেছেন,—

"সর্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

এই যে ভগবৎস্বরূপভূত রস তাহা ভক্তিহীন নরনারী কর্তৃক লাভ করা দুরূহ, যে ভক্তগণের ভগবৎপাদপদ্মই সর্বস্ব কেবল তাঁহারাই সেই ভগবৎস্বরূপ রসের আস্বাদন লাভে সমর্থ।

সেই ভক্তির অধিকারী সম্বন্ধে রূপগোস্বামী বলিতেছেন,—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখাস্যত্র কথমভ্যুদয়ে ভবেৎ ॥"

ভোগলিপ্সা ও মুমুক্ষা এই দুই পিশাচী হৃদয়ে যে পর্যন্ত বর্তমান থাকে সে পর্যন্ত হৃদয়ে ভক্তি-সুখের (রসের) উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

এখন ভক্তিরস সম্বন্ধে বলিব। যে সমস্ত বস্তুর মিলনে কোন আস্বাদ্য বস্তুর চমৎকারিত্ব আনিয়া উহাকে রসে পরিণত করে সেই সমস্ত বস্তু হইল উক্ত রসের সামগ্রী। সিতা, ঘৃত, মরীচ ও কর্পূরের মিলনে 'দধি' 'রসালা' নামক রসে পরিণত হয়, এজন্য উক্ত সিতাদি হইল রসালার 'সামগ্রী'। কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয় কতকগুলি সামগ্রীর মিলনে। কৃষ্ণরতি একটি স্থায়ীভাব। এই স্থায়ীভাবের সহিত কি কি সামগ্রী মিলিত হইয়া রস [কৃষ্ণভক্তি] তাহা চৈতন্যচরিতামৃতকার বর্ণনা করিয়াছেন।

"স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥
সাত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি "রস" হয় অমৃত-আস্বাদনে ॥"

চৈ, চ, ২।১৯।১৫৪-১৫৪

ভক্তিরসের সামগ্রী চারিটি,—বিভাব, অনুভাব, সাত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভাব।

মুখ্য কৃষ্ণরতি পাঁচ প্রকার,—শান্তি, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। একই কৃষ্ণরতি বিভিন্ন আশ্রয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন একই দীপের আলোকরশ্মি বিভিন্ন বর্ণের কাচের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইলে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া নির্গত হয় তদ্রূপ। শান্তভক্তের কৃষ্ণ-রতিকে বলে শান্তরতি; দাস্যভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে দাস্যরতি, ইত্যাদি। সেইরূপ, শান্তরসে শান্তরতি স্থায়িভাব, দাস্যরসে দাস্যরতি স্থায়িভাব, ইত্যাদি। এই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস যথাক্রমে উক্ত পাঁচটি মুখ্যাতির সহিত বিভাবাদি চারিটি সামগ্রীর মিলনে উৎপন্ন। পূর্বে যে হাস্যাদি অষ্ট [শ্রীরূপের মতে সাতটি] রসের অবতারণা করিয়াছি তাহাদের বলে 'গৌণ' রস,— 'মুখ্য'রস ঐ শান্তাদি পাঁচটি। শান্তদাস্যাদি পঞ্চরতি যেমন সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে এক একভাবে ভাবিত ভক্ত চিত্তে প্রবাহিত, হাস্যাদি রতি সেরূপ থাকে না; কোনও আগন্তুক কারণ বশতঃ হাস্যাদির উদয় হয় ও পরক্ষণে বিলয় হয়, এজন্য উহারা সাময়িকী। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যে গৌণীরতির কথা বলিয়াছেন তাহার সংখ্যা সাত; যথা— হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা।

"হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধোভয়ং তথা।
জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ ॥"

সর্বসমেত এই দ্বাদশটি রস লইয়া শ্রীরূপাদি বৈষ্ণবাচার্যগণ রসতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

বিভাব কাহাকে বলে? সাহিত্যদর্পণকার বলেন, বিভাব রত্যাদির উদ্বোধক,—

"রত্যাদ্যুদবোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ"।

উদ্বোধক অর্থে হেতুস্বরূপ। বিভাব দ্বিবিধ,—আলম্বন ও উদ্দীপন।

যাহাকে অবলম্বন করিয়া জননীর বাৎসল্যরতির অস্তিত্ব সেই সন্তান হইল বাৎসল্যরতির আলম্বন। এখানে সন্তান 'বিষয়রূপ' আলম্বন, এবং জননীও 'আশ্রয়রূপ' আলম্বন। সেইরূপ, নায়কনায়িকাদিকে অবলম্বন করিয়া যে মধুররসোদ্গম হয়, এজন্য একজন অপরজনের আলম্বন, অনন্তভাবে বিষয়ালম্বন . ও আশ্রয়ালম্বন। যে সব বস্তু চিত্তস্থিত ভাবকে উদ্দীপিত করে তাহাদের উদ্দীপন-বিভাব বলে। যথা, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, চেষ্টা, সাজসজ্জাদি [প্রসাধন], স্মিত [মন্দহাসি], বংশী, শৃংগ, নূপুর, কম্বু [দক্ষিণাবর্ত পাঞ্চজন্য শংখ], পদচিহ্ন, তুলসী : অথবা সাধারণ নায়ক সম্পর্কে চন্দ্র-চন্দন-কোকিলকূজন-ভ্রমর-গুঞ্জন, প্রভৃতি।

অনুভাব কাহাকে বলে? অনু অর্থাৎ পরে যাহা জন্মে তাহা অনুভাব। কোনও বস্তুর অনুভাব হইতেছে সেই বস্তুর পরিচায়ক বহির্বিকার বা লক্ষণ। যেমন, জ্বরের প্রভাব [লক্ষণ] শরীরের উত্তাপ [temperature], ক্রোধের প্রভাব চক্ষুর বা মুখমণ্ডলের রক্তিমা। ভক্তের চিত্তস্থিত যে কৃষ্ণরতি তাহা বাহিরে অনেক প্রকার বিক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে—যথা, নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গীত, চীৎকার, হুঙ্কার, দীর্ঘশ্বাস, অট্টহাস্য প্রভৃতি ; আবার রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, স্তম্ভ, পুলক, বৈবর্ণ্যও অনুভাব হইতে পারে। এজন্য, অনুভাব দুই শ্রেণীর,—(১) উদ্ভাস্বর [নৃত্যগীতাদি] ও (২) সাত্ত্বিক [অশ্রুপুলকাদি] সাত্ত্বিকভাব আটটি।

ব্যভিচারীভাব কাহাকে বলে? "ব্যভিচারী" শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে [কদাচারী বা ভ্রষ্টাচারী অর্থে] ব্যবহৃত হয় নাই। বি+অভি+চারী=ব্যভিচারী। বি [বিশেষরূপে] +অভি [স্থায়ীভাবের অভিমুখে]+চারী [গমনকারী]—অর্থাৎ বিশেষ অভিমুখ্যের সহিত স্থায়িভাবের দিকে গমন করে যাহা তাহা ব্যভিচারীভাব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাই বলিতেছেন,—

"বিশেষেনাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি"।

এজন্য স্থায়ীভাব ব্যতীত অন্যকিছুর সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। ইহার অপর নাম "সঞ্চারী" ; এই ব্যভিচারীভাব [কৃষ্ণরতির] গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ইহাকে সঞ্চারীভাবও বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা তেত্রিশ। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শংকা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি (মৃত্যু), আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ। ইহারা অস্থায়ী। সাগরে তরঙ্গের মত উহারা রত্যাদির উপর কখনও আবির্ভূত হয় কখনও তিরোহিত হয়।

বুঝাগেল যে, বিভাব রত্যাদি স্থায়ীভাবের উদ্বোধক বা 'কারণ' ; অনুভাব, উক্ত রত্যাদি স্থায়ীভাবের বহিঃপ্রকাশ বা 'কার্য', ব্যভিচারীভাব স্থায়ীভাবের উপর সঞ্চরণ করে, আবির্ভাব-তিরোভাবের দ্বারা স্থায়ীভাবের অনুকূলতাচরণ ও পুষ্টিসাধন করে। সাত্ত্বিকভাব, অনুভাবের অন্তর্গত হইলেও ইহা সত্ত্বসম্ভূত চিত্তের বিকার ও বাহ্যলক্ষণ। এজন্য, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের পরস্পর সংযোগে যাহার নিষ্পত্তি হয় তাহাই 'রস'।—

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ।"

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন (১৩৭০)

শ্রীসন্তোষ রায়

একশো আটাশ বছর আগে ফাল্গুনের এক শুক্লা রজনীর শেষে, আসন্ন প্রত্যূষে এক নতুন আলোকের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল এক শিশু—বাবলা আর বাঁশঝাড়ে ঘেরা পল্লী বাংলার এক অখ্যাত গ্রামের এক অতি দীন কুটিরে। সেই শিশুর বিভূতি, তার দীপ্তির ছটা উত্তরকালে সেই গণ্ডগ্রাম থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে শুধু সমগ্র বাংলা তথা ভারতকেই উদ্ভাসিত করেনি, তার আভা ভারত অতিক্রম করেও ছড়িয়ে পড়েছিল জগতের বিভিন্ন প্রান্তে। সেই দীপ্তি আজও অম্লান।—সেই শিশুই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তার আবির্ভাবপূত পল্লীগ্রাম—হুগলী জেলার কামারপুকুর।

সেই কামারপুকুর আজও পল্লীগ্রাম হলেও, আজ আর অখ্যাত নয়। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সুন্দর মন্দির, অতিথিশালা এবং শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাস। তাছাড়া, সরকারী সহায়তায় ও সাধারণের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা বিদ্যামহাপীঠের বিরাট সৌধ। যে গ্রাম এককালে দুরধিগম্য ছিল, তাও আজ নতুন-নতুন রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণের ফলে সহজগম্য হয়ে উঠেছে।

সেই পুণ্যক্ষেত্র কামারপুকুরে এবারে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিন ব্যাপী, গত ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে ফাল্গুন ১৩৭০ (ইং ৭, ৮ ও ৯ই মার্চ, ৬৪) শনি, রবি ও সোমবার। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় একশত সভ্য-সভ্যা প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন, তাছাড়া স্থানীয় নিকটবর্তী অঞ্চলের সহস্রাধিক সাহিত্যানুরাগী প্রতিদিন বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করে সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে একটি বলিষ্ঠ অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় এবং সমিতির সম্পাদক হন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা বিদ্যামহাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সম্মিলনের সমগ্র উদ্যোগ আয়োজনের প্রায় একক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন মহাবিদ্যাপীঠের সম্পাদক, সমাজসেবী ও দেশকর্মী অধ্যাপক শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য পিতা-পুত্র শ্রীবিমলাকান্ত ও অধ্যক্ষ শ্রীবিনয়কৃষ্ণ তাঁদের সহকর্মী ও ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে অক্লান্ত নিষ্ঠায় পরিশ্রম করেছেন।

৭ই বেলা ১১টার ট্রেনে সম্মেলনের মূল সভাপতি, শাখা-সভাপতি ও বিশিষ্ট বক্তাদের নিয়ে সম্মিলনের কর্মকর্তারা ও প্রতিনিধিগণ একত্রে প্রায় ৭৫ জন তারকেশ্বরের ট্রেনে কামারপুকুর যাত্রা করেন। তারকেশ্বরে পূর্বাহ্ণেই তিনটি বাস নির্দিষ্ট করা ছিল, তাতে করেই সকলে হরিণখোলা পর্যন্ত গমন করেন। হরিণখোলায় মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর কাঠের সেতু ভগ্ন হওয়ায় যাত্রীদের কিছু দুর্ভোগ ঘটে,—বাস থেকে নদীর ধার পর্যন্ত হেটে এবং খেয়ায় নদী পার হয়ে অপর পারে পুনরায় নির্দিষ্ট বাসে সকলে চড়েন। কামারপুকুরে পৌছাতে প্রায় ৪টা বাজে। সম্মিলনের দুইজন সদস্য ডাঃ শম্ভুচরণ পাল ও শ্রীজয়দেব দত্ত ব্যবস্থাপনার জন্য পূর্বদিনই কামারপুকুর পৌচেছিলেন।

বিদ্যামহাপীঠের সুপ্রশস্ত কক্ষে প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সভাপতি ও বক্তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। মূল সভাপতি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী এবং বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সুব্যবস্থাযুক্ত অতিথিশালায় ব্যবস্থা হয়েছিল। মহিলাদের জন্য কিছু

দূরে একটি স্বতন্ত্র গৃহে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং মহিলাদের সেইস্থান থেকে সভামণ্ডপে যাওয়া-আসার জন্য দুটি জীপও রাখা হয়েছিল। দূর পল্লীগ্রামে যেখানে যাওয়া আসা খুব সুগম নয় সেই স্থানে সাময়িক ব্যবস্থা যা' করা হয়েছিল তা' মোটামুটি ভালোই।

বিশ্রাম ও জলযোগের পর সন্ধ্যা ৬টায় পুণ্যক্ষেত্রের শান্ত-সমাহিত পরিবেশে বিরাট চন্দ্রাতপের নীচে সম্মেলনের জন্য নির্দিষ্ট সভামণ্ডপে সাহিত্যানুরাগী প্রতিনিধি ও দর্শকদের এক আশাতীত জনসমাবেশে সম্মিলনের মূল অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত উদাত্ত কণ্ঠে পরিবেশন করেন সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হতে পারেননি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ ও বিদ্যামহাপীঠের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, এবং অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের বিবৃতি পাঠ করেন সম্পাদক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এরপর সম্মিলনের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে সম্মিলনের সহসভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সম্মিলনের ইতিবৃত্ত, আদর্শ ও বক্তব্য নিবেদন করেন। তিনি বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন—"সাহিত্যই জাতীয় চরিত্রের দর্পণ স্বরূপ। সাহিত্যই জাতির মন এবং চরিত্র গঠনের সর্বাপেক্ষা সার্থক উপায়। পূর্বপাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গ একই ভাষাভাষী। যদি এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কখনও কোনও বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি স্থাপনের সম্ভাবনা থাকে তো, তা সাহিত্যের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব।......"

তারপর সম্মিলনের সাধারণ সচিব শ্রীসুরেন নিয়োগীর পক্ষে সম্মিলনের অন্যতম সচিব শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় বিবৃতি ও কার্যসূচী নিবেদন করেন।

বিবৃতির পর নিম্নলিখিত পরলোকগত ব্যক্তিদের আত্মার কল্যাণ কামনাকরে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। ডঃ শিশিরকুমার মিত্র ২। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। সুকুমার সেন আই, সি, এস, ৪। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৫। ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ৬। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৭। তিনকড়ি দত্ত ৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

এরপর সম্মিলনের উদ্যোগে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের অবদান বিষয়ে যে ভাষণ প্রতিযোগিতা ২৩, ২, ৬৪ তারিখে মহাজাতি সদন সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রথম স্থান অধিকারী বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্র শ্রীতপন দেবকে সম্মিলনের পক্ষে 'শর্বাণী স্মৃতি বিবেকানন্দ পদক' পুরস্কার অর্পণ করেন মূল সভাপতি শ্রীনরেন্দ্র দেব।

এরপর মূল সভাপতির অভিভাষণে শ্রীনরেন্দ্র দেব সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করে বর্তমান সাহিত্য প্রসঙ্গে বলেন—"দিন বদলের পালার সঙ্গে আমাদের জীবন ধারারও পরিবর্তন ঘটছে, সমাজ এগিয়ে চলেছে। মানুষের সংস্কার, অভ্যাস ও আদর্শও বদলে যাচ্ছে।......

...সাহিত্যের আদর্শও বদলে যাচ্ছে। অতি আধুনিক সাহিত্যের গতি চলেছে নব রোমান্সের বাস্তবতার সন্ধানে যার ভিত্তি কঠিন কঠোর এই মাটির পৃথিবীতে, কল্পলোকে স্বপ্নরাজ্যে নয়। জীবনের নিষ্ঠুর নগ্নসমস্যা যা আজকের মানুষকে দিশেহারা করে তুলেছে, সেই সমস্যা-পীড়িত নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক দুর্গতজীবনের কাহিনীই অতি আধুনিক কথা সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। মানুষ হতভাগ্য হলেও তার জীবন একেবারে শুষ্ক রসহীন পাষাণে পরিণত হয় না। উপলখণ্ডেও যেমন রংএর জলুস দেখা যায়, রেখার বৈচিত্র্য দেখা যায়, অধঃপতিত মানুষের সমাজেও রোমান্সের নিঃশেষ মৃত্যু হয় না। আধুনিক সাহিত্য আমাদের কাছে এতকালের অবজ্ঞাত সেই মানুষগুলির জীবনরহস্য প্রকাশ করে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করেছে এবং আমাদের এত দিনের এক-পেশো সাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক উপন্যাসগুলি নিছক কাহিনী-সর্বস্ব নয়; রোমান্সই তাদের একমাত্র মূলধন নয়। এর মধ্যে আছে ইতিহাসের তথ্য, সমাজের এতাবৎ অপ্রকাশিত তত্ত্ব।......

...বর্তমান কথাসাহিত্য মানব জীবনের ও সমাজের বাস্তব চিত্র এঁকে আমাদের চোখের সামনে আয়নার মতো ধরেছে। সে সত্যের স্বরূপ দেখে শিউরে উঠলে সত্য কখনও মিথ্যা হয়ে যাবে না।"

রাত্রে বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ রাগসঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং পরে চন্দননগরের 'নট ও নাট্য' সম্প্রদায় চন্দ্রগুপ্ত নাটক অভিনয় করেন।

পরদিন সকালে কথা সাহিত্যের অধিবেশন বসে। সভাপতি শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হতে না পারায় অধ্যক্ষ শ্রীশুদ্ধসত্ত বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন,—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরকুমার মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, নক্ষত্র রায়, মুরারি মহিন্তামণি, মনোরঞ্জন গুপ্ত, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্তা দীপ্তি দাশগুপ্ত।

শ্রীশাস্ত্রী বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোট গল্প বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা করেন। তিনি বর্তমানের উপন্যাস সম্বন্ধে বলেন,—বৃহৎ উপন্যাস লেখার একটা ঝোঁক এসেছে এবং তার জন্য একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা চলেছে। এ কারণে উপন্যাসের মানেরও অবনতি ঘটছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের আয়তন আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার কথা সাহিত্য ও উপন্যাস সম্বন্ধে বলেন,—বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের যে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তা খুবই স্বাভাবিক। ···কল্লোল যুগের প্রচেষ্টাকাল পার হয়ে গেছে। আজ বিস্তৃতির এবং বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি অধিক।···বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলেন, মনস্তত্ত্বকে বঙ্কিম গভীর ভাবে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সমাজের গণ্ডি ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেননি।···শরৎচন্দ্র চরিত্রকে কাহিনীর আগে রেখে এবং সামাজিক সমস্যার প্রশ্ন উত্থাপন করে উপন্যাস সৃষ্টির যে পথ খুলে দিয়ে গেছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।···প্রেমের সংগ্রামী ও কঠোর রূপ শরৎচন্দ্রের রচনায় রয়েছে, কিন্তু সাহসের অভাবে তিনি তাঁর নায়ক-নায়িকাকে পূর্ণ রূপ দিতে পারেননি।"

শ্রীসুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে, বর্তমান সাহিত্যিকরা যে তাঁদেরসৃষ্টির সাহায্যে পাঠকের মনের রস-পিপাসা মেটাতে পারছেন না এবং কোনও পথের সন্ধান দিতে পারছেন না—সে সম্বন্ধে একটি বেদনাজনক জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেন।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন যে,—"যে কোনও সৃষ্টি আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখি, তার অলক্ষ্যে একটা বুনিয়াদ থাকে। শাশ্বত বস্তু সেই বুনিয়াদের মধ্যে থাকে—সাহিত্যের প্রাসাদও সেইরূপ বুনিয়াদের ওপরই নির্মিত হয়ে থাকে।···শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। যে সৃষ্টি অসৎ প্রবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট করে তাই অশ্লীল। সাহিত্যে যেমন রস সৃষ্টি করতে হবে, তেমনি তাকে সংযতভাবে পরিবেশন করারও দায়িত্ব থাকা দরকার।···রসে এবং বশে থাকাই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি।"

সভাপতি শ্রীশুদ্ধসত্ত বসু সমগ্র আলোচনার উপর একটি সংক্ষিপ্ত এবং মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বৃহৎ উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এটা কোনও একটা সমস্যা নয়—লেখকের মনে যে ঔপন্যাসিক চেতনা আসে তা' সব সময়ে অল্পকথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বর্তমানের ঔপন্যাসিকরা লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে এক সূতায় বাঁধবার চেষ্টা করেছেন।

বিকাল সাড়ে তিনটায় শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবন্ধ শাখার অধিবেশন বসে। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত, ও ডাঃ বঙ্কিম শেঠ এবং চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী চিত্রকলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। 'শিল্প সংস্কৃতি—রাজা-রাণী মন্দির, ভুবনেশ্বর' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীবীরেন রায়।

সভাপতি অধ্যাপক সেনশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভি-ভাষণে বলেন···"আমাদের মধ্যে যে কবি-পুরুষ আছেন, তিনি নব-নব সৃষ্টির মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন, আর যিনি মননশীল পুরুষ তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেন, তর্ক-যুক্তির আশ্রয় লন, স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করেন। এই মনস্বী পুরুষের আত্মপ্রকাশের বাহন গদ্য,—সাহিত্য, শিল্প সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল জাগ্রত। এই ধীমান পুরুষই নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন, আর এই প্রবন্ধ যখন সাহিত্য গুণে মণ্ডিত হয়, তখন আমরা তাহাকে বলি প্রবন্ধ সাহিত্য।

···আমরা জানি, কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে

দ্ব'টি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন,—সংহত ও পরম্পরা-যুক্ত চিন্তা ও ঋজু প্রকাশ ভঙ্গি।"

ইহার পর প্রবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি 'কয়েকজন বিস্মৃতপ্রায় বা বিস্মৃত প্রবন্ধ-লেখকের সম্বন্ধে উদ্ধৃতি সহযোগে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন; এবং উপসংহারে বলেন,—"একালের প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য না করিয়াও এ-কথা বলা যায় যে বাঙ্গালীর জীবনে আজ ব্যাপকভাবে চিন্তার দুর্ভিক্ষ বা দৈন্য প্রকট হইয়াছে এবং প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষীর অভাব ঘটিয়াছে।···আজ জাতির পরম দুর্দিনে, জাতি যখন প্রায় জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময়ে, সেই ঋজু মেরুদণ্ডসম্পন্ন মনস্বী লেখক কোথায়, যিনি বহুশ্রুত অথচ দেশপ্রেমিক, যিনি সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে পারেন? কে এই দুরূহ ব্রত সাধনে প্রস্তুত হইবেন?···

···আজ প্রবন্ধকারদের নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। তাঁহারা একদিকে হইবেন রসস্রষ্টা, অপর দিকে আচার্য বা লোকশিক্ষক। বাঙ্গালী পাঠক গুরু-গম্ভীর বিষয় পড়িতে চাহে না বলিয়া অভিযোগ করিলে চলিবে না, পাঠকদের জঠরে যাহাতে জারকরসের আধিক্য ঘটে, সমাজচিকিৎসক রূপ প্রবন্ধকারদের সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে।"

শিশু সাহিত্যের জন্য স্বতন্ত্র কোনও অধিবেশন না-হওয়ায় প্রবন্ধসাহিত্য অধিবেশনেই শিশু সাহিত্যের আলোচনা হয়। শিশু সাহিত্য বিষয়ে শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর প্রবন্ধ তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঠ করেন শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত। শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা তাঁর প্রবন্ধে বলেন—"···এখন সাহিত্যে তথা শিশুসাহিত্যিকের নীতি কথাটা হাস্যকর হয়ে গেছে। আবার শিশু সাহিত্যের কাছে নেই সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া—যাতে চড়িয়ে শিশুকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক অনাস্বাদিত অলৌকিক জগতে পৌঁছে দিতে পারা যাবে। অথচ, না-পারার বেদনাবোধ আছে। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তার চেতনা আছে।

কাজে কাজেই তর্ক উদ্দাম হয়ে উঠছে। শিশু-সাহিত্যিক কোন পথ ধরে চলবেন, তার মীমাংসা হচ্ছে না। অবশ্য কোনও ব্যাপক চিন্তাই কখনো আলোচনার মাধ্যমে একটা নিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছতে পারে না, তবু আলোচনাই জীবনের লক্ষণ।······"

উপসংহারে তিনি বলেন—"শিশু-সাহিত্যিকদের কাছে একটি মাত্রই অনুরোধ তাঁরা যেন শিশুসাহিত্যের জন্য কলমধরার সময় নিজের বাড়ির ছেলেমেয়েগুলির কথা একবার হৃদয়ে আনেন। যে কথা সেই ছেলেমেয়েদের মুখে শুনলে তাঁর নিজের পিত্ত জলে ওঠে, সে ধরণের কথা যেন তাঁর গল্পের ছেলেমেয়েরা না বলে, আর যে কুশ্রীতা বা যে বিটকেলমি নিজের ছেলেমেয়েদের চোখে পড়লে তিনি বিচলিত হন, সেই ধরণের দৃশ্যের অবতারণা তাঁর শিশুসাহিত্যের মধ্যে না করেন।"

এরপর শ্রীউৎপল হোম রায় শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় কাব্যশাখার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুপস্থিতিতে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী।

স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন,—কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল বটব্যাল, মুরারি মহিন্তামণি, সুধাংশু চৌধুরী, সলিল মিত্র, বীরেন রায়, আবদুর রহমান কবিরত্ন, অনিল চন্দ্র, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নিত্যগোপাল পাল, বিনয়কৃষ্ণ তরফদার, অজিতকুমার ভট্টাচার্য এবং সৌরীন্দ্রকুমার দে।

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী তাঁর ভাষণে বলেন,—"পঠিত কবিতাগুলির মধ্যে আজকের দিনের বেদনার আভাস পেলাম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে গ্রহণ করেই কবিতা জন্ম লাভ করে। কাব্য এমন একটি শিল্প যাকে সুস্পষ্ট কতকগুলি সংজ্ঞা দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না।—

···কবিতা জীবনের মহৎ আশ্রয়—এর কোনও তুলনা নেই।···মানুষের সীমিত জীবনের সুখস্রোতে পাওয়া না-পাওয়ার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে আনন্দের মাধ্যমে সঙ্গীত।

··মহৎ শিল্প বুদ্ধি করে, পরামর্শ করে, ফরমাস দিয়ে হয় না। আপনা হতে হয়ে ওঠাই শিল্পের বৈশিষ্ট্য।"

রাত্রি আটটায় ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত শ্রীশ্রীজননী সারদামণির পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত

সঙ্গীত বহুল সংস্কৃত নাটক—"শক্তি-সারদম" পরিবেশন করেন 'প্রাচ্যবাণী'র শিল্পীবৃন্দ। ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও রমা চৌধুরী উভয়েই উপস্থিত থেকে অভিনয় পরিচালনা করেন। বহু বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিসহ সহস্রাধিক দর্শক এই অভিনয় উপভোগ করেন।

পরদিন ৯ই মার্চ, ৬৪, সকালে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের জন্য কোনও অধিবেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ইতিপূর্বেই বহু প্রতিনিধি জয়রামবাটি ও নিকটস্থ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। এই দিন সকালে একটি বিশেষ বাস-এর ব্যবস্থা করে চল্লিশজন প্রতিনিধি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্য জন্মস্থান বীরসিংহ দর্শন করিতে যান। গড় মন্দারণের প্রাকারের ধ্বংসস্তূপও দেখা যায়।—এগারটায় ফিরে স্নানাহার ও দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের পর বিকাল ৪টায় নাট্য-সাহিত্যের অধিবেশন বসে। নাট্য-সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং উদ্বোধক শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী উভয়েই অনুপস্থিত থাকায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় ও শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করেন সম্মিলনের অন্যতম সচিব শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে; আলোচনায় যোগদান করেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ নির্মল সরকার।

সভাপতি ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় তাঁর ভাষণে নাটক ও নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচনা করেন। যুগের পরিবর্তন নাট্যসাহিত্যের ও অভিনয় পদ্ধতির পরিবর্তন হবেই এবং হওয়া প্রয়োজন—একথা স্বীকার করে, তিনি বর্তমানে নাটক ও অভিনয়ের উৎকর্ষতার অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। নাটকের ভাষা ও সংলাপ যে অভিনয়কে কত উন্নত এবং দর্শককে কত প্রভাবিত করে তা তিনি কয়েকটি আবৃত্তির সাহায্যে বুঝিয়ে দেন। বর্তমানে আঙ্গিক, আলোকসম্পাত ও আনুষঙ্গিকের প্রাধান্যের জন্য অভিনয় ব্যাপারটি পরোক্ষ হয়ে গেছে, সে কারণেই প্রকৃত নিষ্ঠাবান অভিনেতার সাক্ষাৎ মেলে না।

মূল সভাপতি শ্রীনরেন্দ্র দেবও আলোচনায় যোগদান করেন।

সন্ধ্যায় বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন বসে—সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী শ্রীসহায়রাম বসু। স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানাচার্যকে মাল্যদান করা হয়। 'অক্সিজেন' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত।

সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। এই বিষয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বের সকল উন্নত দেশেই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতাই বর্তমান সভ্যতার মাপকাঠি, আমাদেরও মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য অতুল এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দানের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী, পরিভাষার জন্য অপেক্ষা না করে অবিলম্বে ব্যবস্থা শুরু করে দেওয়া দরকার—পরিভাষা আপনা থেকেই গড়ে উঠবে। বহু দিনের পরাধীনতার ফলে আমাদের নিজের ভাষার ওপর আমরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছি; আমরা মনে করি, ইংরাজী ছাড়া গতি নেই। এই ভুল ভাঙ্গতে বাংলা ভাষার চর্চা অধিকতর নিষ্ঠায় করতে হবে এবং দেশবাসীর কাছে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

এর পরই সমাপ্তি অধিবেশনে মূল সভাপতি শ্রীনরেন্দ্র দেব তিন দিন ব্যাপী অধিবেশনের আলোচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে সম্মেলনের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রফুল্ল দাশ গুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব সহ ছ'টি প্রস্তাব উত্থাপন করলে শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় সমর্থন করেন এবং সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনকে এবং যাঁরা এই সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা 'অলীক-বাবু' নাটক অভিনয় করে সকলকে পরম পরিতৃপ্তি দেন।

অধিবেশনের তিন দিন ব্যাপী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,

বিষ্ণুপুর শাখা প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষ্যে বাংলা পত্র-পত্রিকারও একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল।

সম্মিলনের সুযোগ্য সাধারণ সচিব শ্রীসুরেন নিয়োগী বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার কঠিন-সাধ্য দায়িত্ব যোগ্যতার সহিতই পালন করেছেন। তাঁকে যথোচিত সহায়তা করেছেন সচিবদ্বয় শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে এবং সম্মেলনের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত ও সংগঠন সম্পাদক শ্রীঅনিল চক্রবর্তী। অধিবেশনগুলি সাধারণ সচিবের পক্ষে পরিচালনা করেন উপরোক্ত দুই সচিব।

১০ই মার্চ ৬৪, মঙ্গলবার প্রত্যুষে প্রতিনিধিগণ পুণ্য ভূমির ধূলিকণা মাথায় ও সর্বাঙ্গে গ্রহণ করে স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন

জলে-ডাঙ্গায়
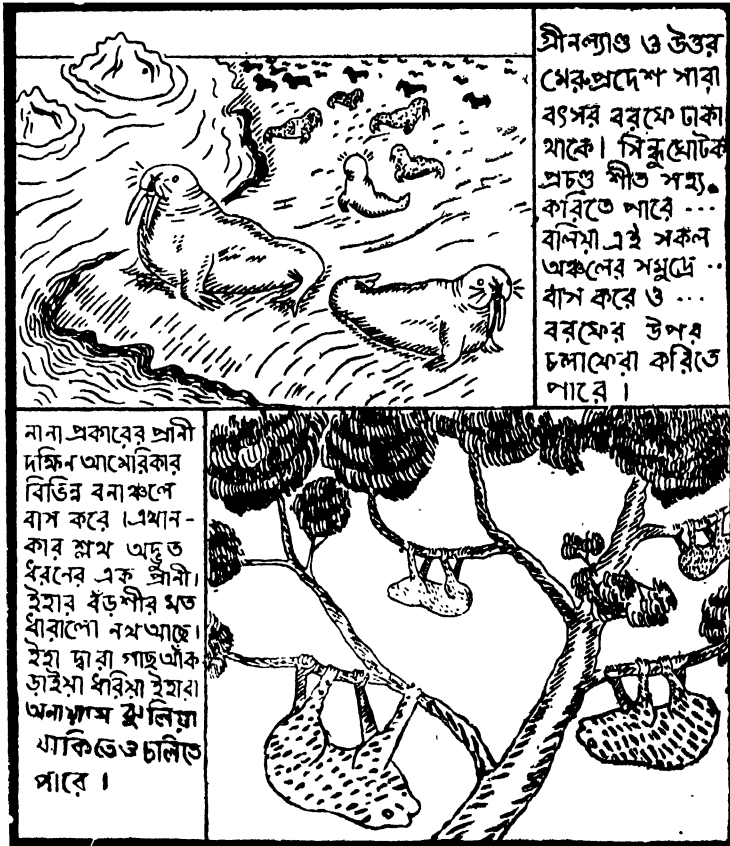
—আব্রাহাম রচিত

শ্রী'শ'—

॥ পুরস্কার ॥

১৯৬৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের সম্মান বাংলা ছবির ভাগ্যে এবার মিলল না। অনেকেই হয়ত আশা করেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের "মহানগর" চিত্রটিই এবার শ্রেষ্ঠ চিত্র রূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল হিন্দী চিত্রই এবার শ্রেষ্ঠ বলে মনোনীত হল। খাজা আহম্মদ আব্বাসের "শেহর অওর সপ্‌না" ১৯৬৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র রূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। আর "মহানগর" পেয়েছে তৃতীয় পুরস্কার। বাংলার বিমল রায়ের হিন্দী চিত্র "বন্দিনী" এবং উত্তমকুমার প্রযোজীত ও অসীত সেন পরিচালিত বাংলা চিত্র "উত্তর ফাল্গুনী" শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক চিত্ররূপে রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদক লাভ করেছে। 'উত্তমকুমার ফিল্মস'-এর সদ্যমুক্ত "জতুগৃহ" চিত্রটিও 'সার্টিফিকেট অফ মেরিট' পেয়েছে।

বাংলা চিত্র এ বৎসর শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান না পেলেও, বাংলা ছবি যে পিছিয়ে পড়ে নি এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। বাঙ্গালী অভিনেত্রী, বাঙ্গালী পরিচালক এবং বাংলা চিত্রের সুনাম আজ বিদেশেও পরিব্যাপ্ত, পুরস্কারে সম্মানিত। কিন্তু তবু বলব বাংলা চিত্রের অগ্রগমন ঠিক আশানুরূপ হচ্ছে না। প্রগতির ছাপ, নতুনত্বের স্বাদ, অভিনয়ের কুশলতা, পরিচালনার দক্ষতা—সবই আছে, কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়, ছাড়া ছাড়া ভাবে। যখন একটি চিত্রে এর সবকটির সমাবেশ ঘটে তখন তা স্ফুলিঙ্গের আকারে উদ্ভাসিত হয়ে চিত্র জগৎকে আলোকিত করে তোলে। কিন্তু এ রকম ছবি সবসময় তৈরী হয় না। অনেক সময় রাষ্ট্রিয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্রও সর্ব্বগুণান্বিত হয় না। সাধারণ ভাল ছবিকেই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে সত্যকার উৎকৃষ্ট চিত্রের অভাবে। কিন্তু ব্যাপকভাবে উৎকৃষ্ট চিত্র নির্ম্মাণ করতে না পারলে সামগ্রীক ভাবে চিত্রের উন্নতি হয়েছে বলা চলে না। পুরস্কার পাওয়া সত্বেও বাংলা ও সর্ব্বভারতীয় সবরকম চিত্রের পক্ষেই এই কথা বলা চলে। তাই বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র নির্ম্মাতাদের অনুরোধ তাঁরা যেন পুরস্কার লাভ করে বা দু'একটি বিদেশী সম্মানে সন্তুষ্ট হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ না করে সামগ্রীক ভাবে কি করে চিত্রের —সর্ব্বস্তরের চিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করা যায় সেই চেষ্টাই যেন করেন।

*　　*　　*　　*

খবরাখবর ঃ

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের বহু পঠিত উপন্যাস "পদ্মানদীর মাঝি"-কে চিত্রে রূপায়িত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদারের পরিচালনায় ও 'এস, আর, ফিল্মস'-এর প্রযোজনায় শীঘ্রই চিত্রটির সুটিং আরম্ভ হবে।

*　　*　　*　　*

প্রযোজক আর, ডি, বন্‌শল একটি ব্যয়বহুল ভোজপুরী চিত্র নির্ম্মাণে উদ্দ্যোগী হয়েছেন। চিত্রটির নাম "মেরে মন মিতবা" এবং এর সুটিং শীঘ্রই কলিকাতায় আরম্ভ হবে। ছবিটির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবেন নাজ, হেলেন, সুজিতকুমার, বেলা বসু, বিপিন গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী ও 'শেহর অওর সপ্‌না'-খ্যাত নবাগত দিলীপরাজ।

*　　*　　*　　*

"অন্তরাল" নামের একটি নতুন চিত্র নির্ম্মিত হবে অগ্রদূত গোষ্ঠীর পরিচালনায়। অভিনয়াংশে থাকবেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি। ছবিটির সুটিং আগামী মাসে আরম্ভ হবে।

*　　*　　*　　*

"আলোর পিপাসা" নামের একটি নতুন ছবির বহির্দৃশ্য পাটনা, বারাণসী, লক্ষ্মৌ প্রভৃতি স্থানে গৃহীত হবে।

ছবিটির পরিচালক তরুণ মজুমদার তাই তাঁর কলাকুশলীদের নিয়ে যাত্রা করে গেছেন ঐ সব স্থানের উদ্দেশে।

*   *   *   *

"মহুয়া বনের ছায়া" নামে একটি নূতন ধরনের চিত্র নির্মিত হচ্ছে। পরিচালনা করছেন সুধীর মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবেন পাহাড়ী সান্যাল, অসিত বরণ, পদ্মা দেবী, লিলি চক্রবর্ত্তী, আশীষকুমার ও সুমিতা সান্যাল।

*   *   *   *

'ঈগল ফিল্মস' ইষ্টম্যান্‌কলারে "আম্রপালী" নামের একটি ব্যয়বহুল চিত্র নির্ম্মাণ করছেন। চিত্রটির মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে অজন্তা গুহায় এবং এর অধিকাংশ দৃশ্যের সুটিং হবে অজন্তার বাস্তব পটভূমিকায়। প্রধান ভূমিকায় আছেন সুনীল দত্ত ও বৈজয়ন্তীমালা। চিত্রটি পরিচালনা করছেন 'প্রফেসর'-খ্যাত ট্যাণ্ডন এবং প্রযোজনা করছেন এস, সি, মেহরা।

*   *   *   *

'গুপ্তশী প্রডাকসন্স'-এর "নিশাচর" চিত্রটির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে নির্ম্মিত এই অপরাধ চিত্রটির পরিচালনা করেছেন ভূপেন রায়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সুমিতা সান্যাল, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

*   *   *   *

দেশে বিদেশে ঃ

"এপ্রিল ফুল" নামের একটি ব্যয়বহুল চিত্র ইষ্টম্যান্‌কলারে তুলছেন প্রযোজক-পরিচালক সুবোধ মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দশ মিনিট ব্যাপি একটি জল-নৃত্যের (water ballet) দৃশ্য। এই নৃত্যের জন্যে ফরাসী রাজধানী প্যারিস থেকে পনেরটি নর্ত্তকীকে আনা হবে এবং নৃত্য-পরিকল্পনাও করা হবে একটি ফরাসী শিল্পীর দ্বারা। ছবির নায়িকা সায়রা বানু এই জল-নৃত্যে প্রধান ভূমিকায় থাকবেন এবং বোম্বের কোনও হোটেলের সুইমিং পুল-এ এই নৃত্য দৃশ্যটি গৃহীত হবে। নায়কের ভূমিকায় আছেন বিশ্বজিৎ এবং অন্যান্য ভূমিকায় দেখা যাবে সজ্জন, আই-এস-জহর, নাজিমা, চাঁদ উসমানী প্রভৃতিকে। চিত্রটির গল্পাংশ লিখেছেন সুবোধ মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত রচনা করেছেন শঙ্কর জয়কিষণ।

*   *   *   *

মার্ক রবসন-এর "Nine Hours to Rama" চিত্রে গান্ধীজীর চরিত্রাভিনেতা জে, এস, কাশ্যপ্‌ এবার নিজে গান্ধীজীর একটি কাহিনী চিত্র নির্ম্মাণ করবার মনস্থ করেছেন। কয়েকজন নাম করা লেখকের সাহায্যে তিনি ইতিমধ্যে ছবিটির গল্পাংশ লিখে ফেলেছেন এবং ভারত সকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁদের অনুমোদনের জন্য। প্রাক্তন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও তেহরী গারওয়াল্‌ ষ্টেটের চীফ্‌ সেক্রেটারী এবং বর্ত্তমানে অভিনেতা কাশ্যপ নিজেই এই চিত্রে গান্ধীজীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। "নাইন্‌ আওয়ারস্‌ টু রাম"-এ গান্ধীজীর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি ইতিমধ্যেই ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রশংসা লাভ করেছেন। শ্রীকাশ্যপ জানিয়েছেন যে প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক বিমল রায়ের উপরই তিনি এই চিত্রটির পরিচালনা ভার দিতে চান। চিত্রটি হিন্দী ভাষীই হবে। তবে একটি ইংরাজী সংস্করণও তৈরী হতে পারে।

*   *   *   *

ব্রিটিশ চিত্র প্রযোজক Richard Attenboroughও গান্ধীজীর জীবনী নিয়ে একটি চিত্র নির্ম্মাণ করতে ইচ্ছুক। তিনিও তাঁর এই গান্ধী-চিত্রের একটি স্ক্রপ্ট ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন অনুমোদনের জন্য।

*   *   *

মালয় ও সীঙ্গাপুরে টেলিভিসন্‌ চালু হওয়ায় ভারতীয় চিত্রের রপ্তানি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে আরম্ভ হয়েছে। ঐ দু'টি দেশে বেশ কিছু ভারতীয় চিত্র রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু টেলিভিসন্‌ চালু হওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই ভারতীয় চিত্রের চাহিদা হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে। প্রায় ১০০০০০ টেলিভিসন্‌ সেট ইতিমধ্যেই ওদেশে বিক্রি হয়ে গেছে। শীঘ্রই Kuala Lumpur-এও টেলিভিসন্‌ চালু করা হবে বলে জানা গেছে।

*   *   *

আমেরিকাতেও টেলিভিসন্‌ চালু হবার পর চিত্র ব্যবসায় বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। টেলিভিসনের আকর্ষণে অনেকেই চলচ্চিত্র দেখা কমিয়ে ফেলেন। কিন্তু অধুনা চলচ্চিত্র দর্শকের সংখ্যা বাড়তির পথে বলে ওখানকার বাণিজ্য বিভাগ জানিয়েছেন। তাঁদের প্রদত্ত সাপ্তাহিক গড় পড়তা সংখ্যা থেকে জানা যায় যে ১৯৬১ সালে ৪১,৬০০,০০০ ; ১৯৬২ সালে ৪২,৫০০,০০০ এবং ১৯৬৩ সালে ৪৩,০০০,০০০ দর্শক চলচ্চিত্র দর্শন করেছেন।

তারকা সমাবেশ

(বামদিক থেকে) কানন দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, সত্যজিৎ রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জু দেকে মন্ত্রী জগন্নাথ কোলের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

খুব সম্ভব টেলিভিসন্ দেখতে দেখতে একঘেয়ে লাগায় মার্কিণ দর্শকদের মনের এই পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

* * *

হলিউডের Academy of Motion Picture Arts and Sciences-এর যে বার্ষিক 'Academy Award' অনুষ্ঠান এই এপ্রিল মাসে হবে, তাতে পাঠাবার জন্য "Call of the Flute" নামে ইষ্টম্যানকলারে তোলা ভারত সরকারের ফিল্ম-ডিভিসনের ডকুমেণ্টারী চিত্রটিকে মনোনীত করা হয়েছে। এই প্রামাণ্য চিত্রটি মণিপুরে গৃহীত হয়েছে এবং এতে রাধাকৃষ্ণ নৃত্য, লাস্য নৃত্য, প্রভৃতি কয়েকটি নৃত্য দৃশ্য আছে। ছবিটি শীঘ্রই সর্বভারতে মুক্তি লাভ করবে।

* * *

২৯শে মে, অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ শহরে যে চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হবে তাতে পাঠানর জন্য ভারত সরকার কর্তৃক তপন সিংহ পরিচালিত 'উত্তমকুমার ফিল্মস'-এর "জতুগৃহ" চিত্রটি মনোনীত হয়েছে।

* * *

হলিউডের বিখ্যাত 'ভিলেন্' (দুর্বৃত্ত) চরিত্রাভিনেতা পিটার লোর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নিজের বাড়ীতে বিছানার নিকট তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খুব সম্ভব হৃদরোগের আক্রমণেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। কিছুদিন আগে হলিউডের আর একজন খ্যাতনামা অভিনেতা অ্যালান্ ল্যাড্-এরও অনুরূপভাবে মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুকালে লোর বয়স ৫৯ বৎসর হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যা আছেন। পিটার লোর জন্ম হাঙ্গেরীতে। ছেলেবেলায় তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে নাটক দলে যোগ দেন, কিন্তু সুনাম অর্জ্জন করেন চলচ্চিত্রে নেমে। বহু ভয়াবহ দুর্বৃত্ত চরিত্রকে পিটার লোর চলচ্চিত্রে অবিস্মরণীয় করে রেখে গেলেন।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টি যুদ্ধ :

বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান সনি লিস্টন বনাম ক্যাসিয়াস ক্লে'র বিশ্ব-খেতাবের লড়াইয়ে ক্লে শেষ পর্য্যন্ত সপ্তম রাউণ্ডে টেকনিক্যাল নক্-আউটে জয়ী হয়েছেন। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্লয়েড প্যাটারসনকে প্রথম রাউণ্ডেই নক্-আউট ক'রে লিস্টন প্রথম বিশ্ব হেভী-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। লিস্টন পুনরায় ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে প্যাটারসনকে প্রথম রাউণ্ডেই নক-আউট করে তাঁর বিশ্ব-খেতাব সম্মান অক্ষুন্ন রাখেন। ক্যাসিয়াস ক্লের বিপক্ষে লিস্টনের এই লড়াইটি ছিল খেতাব-অক্ষুণ্ন রাখার দ্বিতীয় লড়াই। ক্লের হাতে লিস্টনের এই পরাজয় তাঁর পেশাদারী খেলোয়াড়-জীবনের দ্বিতীয় পরাজয়। ক্লে গত ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের লাইট-হেভীওয়েট বিভাগে স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলেন। লিস্টনের বিপক্ষে ক্লের এই লড়াইটি ছিল তাঁর পেশাদারী খেলোয়াড়-জীবনের ২০তম লড়াই।

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান :

ক'লকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ২১তম জাতীয় এবং দ্বিতীয় আন্তঃরাজ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের এ্যাথলেটিক্স বিভাগে পাঞ্জাব সর্ব্বাধিক পদক অর্জন ক'রে শীর্ষস্থান লাভ করে। দ্বিতীয় স্থান পায় মহারাষ্ট্র। প্রথম স্থান অধিকারী পাঞ্জাব পায় ৪২টি পদক (স্বর্ণ ২৩, রৌপ্য ১৩ এবং ব্রোঞ্জ ৬)। বাংলা দেশের পদক সংখ্যা ছিল ২৭ (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৮ এবং ব্রোঞ্জ ১৫)। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে বাংলা দেশ কোন স্বর্ণ পদক অর্জ্জন করতে পারেনি। বাংলা মোট ৪টি স্বর্ণ পদক পায়—বালিকা বিভাগে ৩টি এবং বালক বিভাগে ১টি। পুরুষ বিভাগে বাংলার পদক ছিল মোট ৬টি (রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৪), মহিলা বিভাগে মোট ৫টি (ব্রোঞ্জ ৫), বালক বিভাগে মোট ৮টি (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ৪) এবং বালিকা বিভাগে মোট ৮টি (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ২)।

এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে সর্ব্বাধিক ৩টি ক'রে স্বর্ণপদক লাভের গৌরব লাভ করেন মাত্র দু'জন—বালক বিভাগে পাঞ্জাবের পার্ভিনকুমার এবং বালিকা বিভাগে দিল্লীর জর্জিনা ওয়েকফিল্ড। এই সর্ব্বাধিক স্বর্ণপদক লাভ ছাড়াও পার্ভিনকুমার হ্যামার থোতে নতুন ভারতীয় রেকর্ড (দূরত্ব ৫৩.৭৬ মিটার) এবং জর্জিনা ওয়েকফিল্ড ২০০ মিটার দৌড়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড (সময় ২০.৪ সেঃ হিটে) স্থাপন করেন।

যাঁরা তিনটি এবং দু'টি ক'রে স্বর্ণপদক অর্জ্জন করেছিলেন তাঁদের তালিকা :

পুরুষ বিভাগ

২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড় : মাখন সিং (পাঞ্জাব)।

মহিলা বিভাগ

২০০ ও ৮০০ মিটার দৌড় : ষ্টিফি ডিসুজা (মহারাষ্ট্র)।

সটপুট ও জাভেলিন : এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট (পাঞ্জাব)।

বালক বিভাগ

২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড় : নোয়েল তির্কি (বিহার)।

লং-জাম্প এবং ট্রিপল-জাম্প : কে পি চন্দ্রশেখর নায়ার (কেরালা)।

সটপুট, ডিসকাস এবং হ্যামার : পার্ভিন কুমার (পাঞ্জাব)।

বালিকা বিভাগ

৫০, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় : জর্জিনা ওয়েকফিল্ড (দিল্লী)।

নতুন রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

গুরবচন সিং (দিল্লী)

১১০ মিটার হার্ডলস :

সময় : ১৪.৪ সেকেণ্ড (হিট)

দয়াল সিং (পাঞ্জাব)

৮০০ মিটার দৌড় :

সময় : ১ মিঃ ৫০.২ সেঃ

মহিলা বিভাগ

৮০০ মিটার দৌড় : ষ্টিফি ডিসুজা (মহারাষ্ট্র)
সময় : ২ মিঃ ২২.৬ সেঃ (ফাইনাল)

সটপুট : এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট (পাঞ্জাব)
দূরত্ব : ১১.১৪ মিটার

বালিকা বিভাগ

২০০ মিটার দৌড় : জর্জিনা ওয়েকফিল্ড (দিল্লী)
সময় : ২৭.৪ সেঃ (হিট)

৪ × ১০০ মিটার রীলে : বাংলা। সময় : ৫৩ সেঃ

বালক বিভাগ

৪০০ মিটার দৌড় : নোয়েল তির্কি (বিহার)
সময় : ৫১.১ সেঃ

হ্যামার থ্রো : পরভীন কুমার (পাঞ্জাব)
দূরত্ব : ৫৩.৭৬ মিটার

জাতীয় জিমন্যাস্টিক

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম দেবাশীষ মণ্ডল (সার্ভিসেস)—১০৬.৯৫ পয়েণ্ট, ২য় ভিকাজী ভোঁসলে (সার্ভিসেস)—১০০.৬০ পয়েণ্ট, ৩য় ত্রিলোক সিং (সার্ভিসেস ৯৮.২০)—পয়েণ্ট।

জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতা

চূড়ান্ত ফলাফল : পাঞ্জাব ৩৬ পয়েণ্ট, রেলওয়ে ১৭, মহারাষ্ট্র ১২, সার্ভিসেস ৯, বিহার ৬, মহীশূর ৫, উড়িষ্যা ২, বাংলা ২ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ১।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

চূড়ান্ত ফলাফল : দলগত চ্যাম্পিয়ান—সার্ভিসেস (৪৮ পয়েণ্ট), রানার্স-আপ—রেলওয়ে (২০ পয়েণ্ট)।

জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম সার্ভিসেস (৪৬ পয়েণ্ট), ২য় মাদ্রাজ (২০ পয়েণ্ট), ৩য় মহারাষ্ট্র (১৩ পয়েণ্ট), ৪র্থ বাংলা এবং দিল্লী (১১ পয়েণ্ট)।

বাংলার পক্ষে প্রথম স্থান

বালিকা বিভাগ

হাই জাম্প : শিখাশ্যাম রায়
উচ্চতা : ১.৩৫ মিটার

লং জাম্প : রুবি নন্দী
দূরত্ব : ৪.৮৪ মিটার

৪ × ১০০ মিটার রীলে : বাংলা
সময় : ৫৩ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

বালক বিভাগ

পোল ভল্ট : মধুসূদন গাঙ্গুলী
উচ্চতা : ৩ ১৭ মিটার

এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে দুটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—৪০০ মিটার দৌড়ে প্রখ্যাত দৌড়বীর মিলখা সিংয়ের দ্বিতীয় স্থান লাভ এবং মহিলা বিভাগের ১০০ মিটার দৌড়ে গত সাত বছরের চ্যাম্পিয়ান ষ্টিফি ডি' সুজার (মহারাষ্ট্র) দ্বিতীয় স্থান লাভ।

জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস ঃ

নিউদিল্লীর রেলওয়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২৫তম জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের অনুষ্ঠানে বোম্বাই, মহিলাদের অনুষ্ঠানে রেলওয়ে এবং বালকদের অনুষ্ঠানে হায়দরাবাদ দলগত চ্যাম্পিয়ান খেতাব লাভ করেছে। পুরুষদের দলগত অনুষ্ঠানে বোম্বাই এইবার নিয়ে উপর্যুপরি ১০ বার 'বার্ণা-বেলাক' কাপ জয় ক'রে সর্বাধিক বার জয় লাভের রেকর্ড করলো।

পুরুষদের দলগত বিভাগ : ফাইনালে বোম্বাই দল ৫—০ খেলায় মাদ্রাজকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ১০ বার 'বার্ণা-বেলাক' কাপ জয় করে।

মহিলাদের দলগত বিভাগ : ফাইনালে গত ৩ বছরের বিজয়ী রেলওয়ে ৩—০ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে 'জয়লক্ষ্মী' কাপ জয় করে।

জুনিয়র দলগত বিভাগ : ফাইনালে হায়দরাবাদ ৩—০ খেলায় উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত ক'রে 'রামানুজন কাপ' জয় করে।

ব্যক্তিগত বিভাগ—ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস :

জয়ন্ত ভোরা (বোম্বাই) ২৩-২১, ১২-২১, ২১-১৮, ১১-২১ ও ২১-১৭ পয়েন্টে রতীশ চাচাদকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মহারাষ্ট্রের নীলা কুলকার্ণি ২২-২০, ২১-১৭, ১৫-২১ ও ২১-১৭ পয়েন্টে উর্মিলা তেহ্রানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জয়ন্ত ভোরা এবং রতীশ চাচাদ ২১-১৫, ২১-১৮ ও ২১-১১ পয়েন্টে পি পি হালদাঙ্কার এবং জে এম ব্যানার্জিকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : পি পি হালদাঙ্কার এবং কুমারী মীনা পারাণ্ডে (রেলওয়ে) ২৩-২১, ২২-২৪, ২১-১৪ ও ২১-৬ পয়েন্টে ভি রামচন্দ্রন এবং কুমারী এ ব্ল্যাকলেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস : মীর কাসিম আলী (হায়দরাবাদ) ২১-১১, ২১-৭ ও ২১-১১ পয়েন্টে পি এন সাহকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

জাতীয় লন টেনিস ঃ

দিল্লীর জিমখানা কোর্টে জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় বৃটেনের শ্রীমতী এ্যালেন মিলসের ব্যক্তিগত সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রতিযোগিতার তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে জয়লাভ করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস : গত বছরের বিজয়ী রমানাথন কৃষ্ণন (ভারতবর্ষ) ৬-১, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে এ আর মিলসকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লাল ২—৬, ৬—৩, ৬—৩, ৩—৬ ও ৮—৬ গেমে রমানাথন কৃষ্ণন এবং নরেশকুমারকে পরাজিত করেন।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

মাদ্রাজে ২০তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহারাষ্ট্র ১-০ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত ক'রে 'সন্তোষ ট্রফি' জয় করেছে। ১৯৫৪ সালে তারা তৎকালীন বোম্বাই নামে ২-১ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে প্রথম সন্তোষ ট্রফিজয়ী হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মধ্যে এই নিয়ে তিনবার ফাইনাল খেলা হ'ল। ১৯৫৬ সালের ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশ (তৎকালীন নাম হায়দরাবাদ) ৪-১ গোলে মহারাষ্ট্রকে (তৎকালীন নাম বোম্বাই) পরাজিত করেছিল। পরবর্তী বৎসরেও (১৯৫৭) এই দুই দল ফাইনালে খেলেছিল এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ৩-০ গোলে জয়ী হয়েছিল। সুতরাং মহারাষ্ট্র দু'বার পরাজয় স্বীকার ক'রে তৃতীয়বারের চেষ্টায় অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করলো।

সেমি-ফাইনাল খেলার একদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ ১-০ গোলে রেলওয়েকে এবং অপরদিকে মহারাষ্ট্র ৪-০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। এই মাদ্রাজ দলের কাছেই কোয়ার্টার-ফাইনালের পুনরনুষ্ঠিত খেলায় বাংলা পেনালটি গোলে (০-১) পরাজিত হয়েছিল। প্রথমদিন ১-১ গোলে খেলাটি অমীমাংসিত ছিল।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ঃ

দিল্লীর লেডী হার্ডিঞ্জ মাঠে অনুষ্ঠিত ২৯তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী রেলওয়ে দল ২-১ গোলে গত বছরেরই রানার্স-আপ সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে 'রঙ্গস্বামী কাপ' জয় করেছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি ১-১ গোলে ড্র ছিল। রেলওয়ে দল এই নিয়ে ৬বার ফাইনালে খেলে ৬বারই জয়লাভ করলো। ১৯৩০ সালের প্রতিযোগিতাটি লীগ প্রথায় খেলানো হয়েছিল এবং রেলওয়ে দল লীগের চূড়ান্ত তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। সুতরাং জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দলের জয়লাভের সংখ্যা বর্তমানে সাত—প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অভিনব রেকর্ড। প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ৮বার জয়ী হয়েছে পাঞ্জাব—১২বার ফাইনালে খেলে। ১৯৩০ সালের লীগের খেলায় পাঞ্জাব রানার্স আপ হয়েছিল।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ৪।৪।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনেক কালি-ই আসবে
যাবেও অনেক কালি।
কালির সেরা সুলেখা
থাকবে চিরকাল-ই॥
ROYAL BLUE
Sulekha
FOUNTAIN PEN
INK

বৈশাখ—১৩৭১

[দ্বি]তীয় খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ভগবদ্দর্শন

জিতেন্দ্রনাথ সেন

[দ]র্শন, ব্রহ্মদর্শন ও পরমাত্মদর্শন একই সচ্চিদানন্দ বস্তুর [এক] ভাবে দর্শন মাত্র। চক্ষু দিয়া তাহাকে দেখা যায় [না, কর্ণ] দিয়া তাহাকে শুনা যায় না, নাসিকা দিয়া তাহাকে [আঘ্রাণ] করা যায় না, জিহ্বা দিয়া তাহাকে আস্বাদন করা [যায়] না, ত্বক দিয়া তাহাকে স্পর্শ করা যায় না। শাস্ত্র[মতে] তিনি বাক্য মন প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর—তিনি চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ (শ্রবণ শক্তি), নাসিকার [ঘ্রাণ]শক্তি ইত্যাদি অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রাণ। তিনি [আছে]ন বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, জিঘ্রণ [আস্বাদ]ন, মনন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তিনিই দ্রষ্টা এবং তিনিই দৃশ্য হইয়া এই বিশ্ব মাঝে নানারূপে নিজকে দর্শন, স্পর্শনাদি করেন। তিনিই স্রষ্টা এবং তিনিই সৃষ্ট অর্থাৎ ব্যক্ত-রূপ এই বিশ্ব। বিশ্বের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তিনি থাকিলেও তাহাকে দেখিতে পাই না। তিনি অতি সন্নিকটে, সকলের অন্তরে থাকিলেও তাহাকে দেখিতে পাই না, উপলব্ধি করিতে পারি না। মানুষ জীবন ভরিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, পূজা করিতেছে এবং স্তব স্তুতির দ্বারা, যাগযজ্ঞ নামজপ প্রভৃতির দ্বারা তাহার প্রীতি সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিয়াও তাহার দর্শন পাইতেছে না। তবে কি তাঁহাকে

পাওয়া যায় না? নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। যে ভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহার বহু পন্থা আছে। সর্ব্ব পন্থার মূলই হচ্ছে তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা যাহার যত বেশী সে তত শীঘ্রই তাঁহাকে পাইবে। সে যে পন্থাই অবলম্বন করুক সকল পন্থারই মূলে থাকা চাই ব্যাকুলতা—তাহাকে পাইবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা। তাহাকে পাইবার জন্য যে ঐকান্তিক ইচ্ছা, অনুরাগ বা রতি উহার নামই ভক্তি। তাহাকে পাইবার জন্য অনুরাগ যতই প্রবল হইতে থাকে ততই চিত্ত-বৃত্তি নির্ম্মল হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ভক্তি বা পরাভক্তি রূপেপ্রকাশপায় এবং তখন ইন্দ্রিয়গণ বিষয় ছাড়িয়া ভগবৎ-মুখী হইতে থাকে। সুতরাং একদিকে যত বিষয় বৈরাগ্য বাড়িতে থাকে অপর দিকে মন ততই ভগবন্ময় হইয়া যায়। ইহাকেই বলে চিত্ত শুদ্ধি। সুতরাং তুমি নাম জপই কর, ধ্যান ধারণাদি অষ্টাঙ্গ যোগই কর, যাগ যজ্ঞ পুজাদিই কর, তুমি তাঁহাকে পাইবার জন্য যে কোন পন্থাই অবলম্বন করনা কেন, তুমি ব্যাকুল না হইলে, তোমার চিত্ত শুদ্ধি হইবে না এবং তাঁহাকে পাইবার যোগ্যতাও লাভ করিবে না। সুতরাং যদি বিষয়ের বাহ্যরূপে আকৃষ্ট না হইয়া আকুল প্রাণে চোখের জলে চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পার, যদি প্রতি পদার্থের নাম রূপের দিকে লক্ষ্য না করিয়া উহাদের অন্তরে 'অস্তি, ভাতি, প্রিয় রূপে' অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দ-রূপে যিনি রহিয়াছেন উহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতে পার তবে সেই নির্ম্মল মন ও বুদ্ধি বিষয়ের বাহ্যরূপ প্রকাশ না করিয়া সমস্ত বিষয়ের বা পদার্থের অন্তরে যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বস্তু রহিয়াছেন তাহাকেই প্রকাশ করিবে অর্থাৎ জীবের অজ্ঞানতাবশতঃ বা চিত্তের মলিনতাবশতঃ যে ভ্রান্তি দর্শন হইতেছিল—একই বস্তুকে পৃথক পৃথক নাম ও রূপের আবরণে বহু স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া দর্শন হইতেছিল—উহা বিদূরিত হওয়ায় সর্ব্বত্র এক অখণ্ড আনন্দময় সত্তা সূর্য্যের মত প্রকাশিত হইবে। এই যে প্রকাশ বা দর্শনের কথা বলিলাম ইহা পঞ্চ জ্ঞানে-ন্দ্রিয় দ্বার দিয়া প্রকাশ হয় না। ইহা প্রকাশ পায় সাধকের জ্ঞানচক্ষুতে। সাধকের মনযখন বহির্ম্মুখে ক্রিয়াশীল না হইয়া অন্তরে স্থির হয় তখনই তিনি তাহারজ্ঞানচক্ষুতে দেখেন—

"সর্ব্বভূতস্থম আত্মানম সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র
সম দর্শনঃ॥"

সেই যোগযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া দেখিতে পান এক অখণ্ড আত্মার এই পৃথক পৃথক খণ্ড খণ্ডভূত সকলের অন্তরে মাঝে অখণ্ড রূপে রহিয়াছেন এবং সেই অখণ্ড আত্মার মধ্যে খণ্ড খণ্ড ভাবে ভূত সকল রহিয়াছে। সমুদ্রের মাঝে বহু কুম্ভ ডুবাইয়া রাখিলে কুম্ভ সকলের অন্তরে বাহিরে যেমন সমুদ্র জল ব্যতীত কিছুই থাকে না—বাহিরে কেবল কুম্ভের মৃত্তিকাবরণ মাত্র দেখা যায়, ঠিক তদ্রূপ সাধক বোধ করিতে থাকেন যে তাহার অন্তরে বাহিরে এক অখণ্ড আনন্দবোধ রহিয়াছে এবং ঐ আনন্দ-বোধকে তাহার দেহরূপ বোধটি গণ্ডি করিয়া তাহাকে খণ্ড-রূপ পৃথক সত্তা বোধ করাইতেছেন। তখন সাধক তাহার ঐ দেহরূপ খণ্ড আবৃত বোধকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ঐ খণ্ড বোধকে ধ্যানবলে অখণ্ড বোধে মিলাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। একাগ্র মনে তৈল ধারাবৎ চিন্তা করিতে করিতে সাধক দেখিতে পান (উপলব্ধি করেন) যেন সেই অখণ্ড আনন্দবো[ধ] তাহার দেহরূপ গণ্ডিকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরস্থ বোধের সহিত মিলিত হইতেছেন। এইরূপ ব্যাকুল-চিত্তে মিলিত হইবার জন্য ধ্যান করিতে করিতে এবং খ[ণ্ড] বোধকে অখণ্ড বোধে মিলাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অভ্যা[স] করিতে করিতে সাধকের দেহাত্মবোধের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া গিয়া এক অখণ্ড বোধে মিলিত হয়। ইহাকেই ব[লে] হৃদয় গ্রন্থির ভেদ। ইহারই ফলে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন হয়। ইহা যোগের এক অপূর্ব্ব কৌশল। ইহাই অনাত্মরূ[প] দেহ বোধকে ও দৃশ্যরূপে স্থূল জগৎ বোধকে আত্মরূ[প] চিন্ময় বোধে মিলন করাইবার অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক কৌশল। ইহাই পরমাত্ম দর্শন। এই অবস্থায় সাধক যদি তাহা[র] ইষ্ট মূর্ত্তিকে কোন বিশিষ্ট আকারে দেখিতে চান তবে আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ—বস্তু সাধকের নিক[ট] তদাকারে উপস্থিত হইয়া তাহার সকল মনোবাঞ্ছা প[ূর্ণ] করেন। ইহাই ভগবদ্দর্শন।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা গদ্যকবিতা

অধ্যাপক শ্রীদুলালচন্দ্র দাস, এম-এ

"একদিন আমি যখন কবির পালা সুরু করেছিলুম পদ্যে, তখন গদ্যের ডাক পড়েনি। আজ যখন পালা সাঙ্গ করবার দিন এলো, তখন দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যে পদ্যে মিল হবার জন্যে রফারফি চলবে। যাবার আগে তাদের কবুলপত্রে আমাকেও একটা সাক্ষীর সই দিয়ে যেতে হোলো। আমার এই স্বভাব—আমি এক কালের খাতিরে অন্য কালকে অস্বীকার করতে পারিনে।"১

উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের। কাব্যে গদ্যছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে এই ধরণের আরো অনেক উক্তি আছে তাঁর। বাংলা কাব্যে যে ছন্দোমুক্তি-সাধনা মধুসূদনের হাতে দেখা গেল তারই অমিত্রাক্ষরে, সেই ছন্দোমুক্তি-সাধনা তীব্র ও প্রখর হোলো রবীন্দ্রনাথের বলাকায় মুক্তকছন্দে এবং পরিশেষে পরিণতি লাভ করলো 'পরিশেষে'র গদ্য কবিতায়। 'পরিশেষ' থেকে 'পুনশ্চ' তারপর আরো কয়টি গদ্যকাব্যের গ্রন্থ—'শেষ সপ্তক' 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' ইত্যাদি। গদ্য-কাব্যের পরিণতির নিদর্শন এ-সব কাব্যের কবিতাগুলিতে।

গদ্যছন্দে কবিতা রচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ কোথায় ও কীভাবে পেলেন সে-সম্বন্ধে অনেক অনুমান ও বিচার লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের অভিমতগুলিই যথেষ্ট;—যে সকল অভিমত অজস্রধারে প্রকীর্ণ তাঁর প্রবন্ধে ও চিঠিতে, ভাষণে ও ব্যাখ্যামূলক নিবন্ধে কিংবা কোনো কবিতাতেই। তেমন একটি কবিতা হোলো 'শেষ সপ্তকে'র পঁচিশ সংখ্যক কবিতা। কবি এতে গদ্যকবিতা-প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার যে বিবরণটি দিয়েছেন :

পাঁচিলের এ ধারে ফুলকাটাচিনের টবে একটি সাজানো গাছ, সুসংযত; পাঁচিলের গায়ে-গায়ে একটি বন্দী করা লতা। এরা আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা—শান্ত, ভদ্র ও সুমধুর। বাগানটাকে দেখে মনে হয় মোগল বাদশার জেনেনা—রাজ-আদরে অলঙ্কৃত জীবন অথচ চারদিকে কড়া নজরের পাহারা। এ হোলো দৃশ্যপটের একদিক; অন্য দিকে পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে একটা সুদীর্ঘ য়ুকলিপটাস্; আর পাশে দুটি তিনটি সোনাঝুরি,—প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ। ওদের মাথার ওপর অবারিত নীল আকাশ। কত দিন এই দৃশ্য কবি দেখেছেন! হঠাৎ একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন 'ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা'। দেখলেন, "ওরা ব্রাত্য, আচারমুক্ত, ওরা সহজ; সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে, বাইরে নেই শৃঙ্খলের বাঁধাবাঁধি। কবি এখান থেকেই পেলেন গদ্যকবিতার ইশারা। কবি বললেন :

> আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত;
> বললেম, 'টবের কবিতাকে
> রোপণ করব মাটিতে
> ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
> বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে।'

গদ্যছন্দ রচনার প্রেরণা হিসেবে কবির এই অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। গদ্যছন্দ প্রবর্তনে কবির এই অভিজ্ঞতা একমাত্র নয়, তবে অন্যতম নিশ্চয়ই। তাঁর ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অভিমতগুলি পরপর সাজালে অন্তত আরো কয়েকটি প্রেরণার হদিশ পাওয়া যায়। দেখা যায়, এই প্রেরণাগুলি কবির মনে দীর্ঘকাল ধরে ক্রিয়াশীল ছিল।

গদ্যছন্দের সহকারিতায় কাব্যজীবনের নূতন পালা সুরু করবার প্রসঙ্গে 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।'

কবির এই উক্তি থেকেই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে,

ইংরেজি গদ্যে গীতাঞ্জলি অনুবাদ ও তার কাব্যরূপে স্বীকৃতি ও সাফল্যলাভ কবিকে বাংলায় গদ্যরীতিতে কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়েছিল। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে, গদ্যকাব্যের প্রস্তুতি পর্বের নিদর্শন তাঁর 'পুনশ্চ'তে নেই, আছে 'লিপিকা'য়। সে এক ইতিহাস। কবি সে-ইতিহাস নিজেই বিবৃত করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথকে এক সময়ে বলেছিলেন, 'ছন্দের রাজা তুমি, অ ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।'২ সত্যেন্দ্রনাথ সে প্রস্তাব স্বীকার করেননি, হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল।'৩ তারপর তাঁর 'অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।'৪ তবে কবি যা চেয়েছিলেন, অবনীন্দ্রের রচনায় ঠিক তা পাওয়া গেল না, সে জন্যে নিজেই সুরু করলেন 'লিপিকা'য়। 'লিপিকা'র রচনাগুলি পদ্যের মতো খণ্ডিত করে ছাপা হোলো না, রবীন্দ্রনাথের মতে, 'বোধকরি ভীরুতাই তার কারণ।'৫

আরো দেখা যায়, কবির মনে এই সময়ে একটি বিশ্বাস ক্রমশ দানা বাঁধছিল, তা হোলো,—অনলঙ্কৃত গদ্য-রীতিতেও উচ্চতম কাব্যোৎকর্ষে পৌঁছনো সম্ভব। গদ্য-ছন্দের প্রবর্তনে কবির এই বিশ্বাস একটি উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াশীল ছিল। আর এই বিশ্বাসের সমর্থন তিনি পেলেন নানা সূত্র থেকে। কবি বললেন, "ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি [সত্যকামের কাহিনী] সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য বলে মেনে নিতে একটুও বাধেনি।......এতো অনুষ্টুভ বা ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয়নি। আমি বলি—হয় নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত তবে হালকা হয়ে যেত।" রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বাইবেলের 'সলোমনের গান' ও 'ডেভিডের গাথা'র কথা উল্লেখ করে বললেন, এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্তপদক্ষেপ আছে তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হত তবে সর্বনাশই হত।'৭

কিন্তু গদ্যছন্দ-প্রবর্তন-ব্যাপারে সবচেয়ে স্মরণীয় উক্তিটি শোনা গেল শান্তিনিকেতনে তাঁর একটি অভি-ভাষণে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না।'৮ কাব্যরসিক মাত্রই জানেন প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির অন্যোন্যনির্ভরতা। কারণ প্রসঙ্গই স্থির করে দেয় প্রযুক্তি কী রকম হবে; প্রসঙ্গের উপযোগী প্রযুক্তির এই অনিবার্যতা সাহিত্যে বিশেষত কাব্যব্যাপারে একটি স্বীকৃত সত্য। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটিতে এই সত্যেরই সমর্থন পাওয়া গেল। অনেক গদ্যকাব্যে কবি এমন অভিনব ও বিচিত্র প্রসঙ্গ গ্রহণ করলেন, যার জন্যে গদ্য কবিতার প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তাই দেখা গেল; পদ্য-কবিতা বা অন্যবিধ প্রকাশকৌশল নয়।

অবশ্য গদ্যকবিতা রচনায় এই প্রেরণাগুলিই সব নয়, আরো কিছু ঘটনা, আরো অনেক অভিজ্ঞতা, বিদেশের কাব্য আন্দোলনের নানা তরঙ্গ, সর্বোপরি কবিমনের গণতান্ত্রিক বিবেক ও ভাবীকালের ইচ্ছা ও রুচির প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাপার সংক্রম থেকে কবিমনে যে ঋতু-পরিবর্তন ঘটালো তারই অনিবার্য ফল হোলো তৎকালীন কাব্যের রীতি-পরিবর্তন।

২

গদ্যছন্দ বা গদ্যকবিতা কথাটা কেমন যেন পরস্পর-বিরোধী। রচনাবিশেষে শ্রুতিমধুর ও পরিমিত পদবিন্যাস কৌশলকে ছন্দ বলে বলা হয়। এই ছন্দ 'রচনা বিশেষ' বলতে পদ্যে বা কাব্যেই থাকে, গদ্যে নয়। আমাদেরও চিরকালীন সংস্কার—কাব্য যদি লিখতেই হয় তবে তা লেখা হবে ছন্দে। সুতরাং গদ্যকবিতা বা গদ্য-ছন্দ কথাটা যেন 'সোনার পাথরবাটি'। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যগুণনির্ণয়ে গদ্য-পদ্যের ভেদ রাখা হয়নি; রসাত্মক বাক্যমাত্রই—গদ্যে বা পদ্যে যা-ই হোক না কেন—কাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যপদ্যের এই নির্বিরোধ সহ-অবস্থান কাব্যশ্রেণীয় বলে গণ্য হলেও বাংলা সাহিত্যে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। বাংলায় গদ্য ও পদ্যের মধ্যে সাধারণ ও আপাত পার্থক্যটুকু এতকাল নির্দেশ করেছি এ ছন্দেরই উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে। আধুনিক কালে—প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে, রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কোনো কোনো কাব্য দেখে আমাদের এ সনাতন সাধারণ ধারণা বিপর্যস্ত হোলো। রবীন্দ্র-

'পরিশেষ',. 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' 'শ্যামলী' ইত্যাদিতে 'গদ্যছন্দ' বা 'ভাবের ছন্দ' প্রবর্তন করলেন; আর আমরা জানলাম, এরই নাম 'গদ্য কবিতা'।

রবীন্দ্রনাথ একদা এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে সাহিত্য-সংসারের আলঙ্কারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়।" ৯ ছন্দ কবিতায় পদবিন্যাস-কৌশল হোলো তার আলঙ্কারিক সমারোহ, কাব্যোচিত শব্দচয়ন ও যোজনা হোলো তার রাজসিক ঐশ্বর্য। ছন্দকবিতায় ছান্দসিকের দণ্ডচিহ্নের বিধান যেমন অভ্রান্ত নির্দেশক, তেমনি দীর্ঘকালীন একটা সংস্কার হোলো তার সহচারী। গদ্যকবিতায় আমরা পরম উৎসাহের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম, ছান্দসিকের দণ্ডচিহ্নের বিধি আর বহুমান্য নয়, বরং উপেক্ষিত।

তা ছাড়া, গদ্য কবিতায় এমন সব শব্দ বা ধ্বনিকে আদর করে বসানো হোলো যারা একান্তরূপেই গদ্য-জমিদারির প্রজা। যেমন গদ্যেই আমরা ব্যবহার করি—'এবং', 'কিন্তু', 'সঙ্গে' ইত্যাদি শব্দ; কিংবা সেই সব বাক্য বা বাক্যাংশ যা একান্তই গদ্যজাতীয়—

'জনশূন্য তরুহীন পর্ব্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে
রুষ্ট রুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো'
(খেয়াই, পুনশ্চ)

'কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য' (ঐ)

অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট
(শিশুতীর্থ. পুনশ্চ)

'লুপ্তনদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু 'শিশুতীর্থ, পুনশ্চ

'অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা' (ঐ)

রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার চরিত্র ও বৈচিত্র্যবিধানের জন্যে শুধু শব্দ ব্যবহারে গদ্যসুলভ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হলেন না, যাতে এই বৈচিত্র্য স্পষ্ট হয়ে কানে বাজে তার জন্যে গদ্যকবিতা থেকে 'পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি'কেও ত্যাগ করলেন এবং তরে, সনে, মোর, প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না' তাদেরও নির্মমভাবে বর্জন করলেন।১০ এই ভাবে গদ্যকাব্যে 'আলঙ্কারিক অংশটা' হালকা হোলো। গদ্যকাব্যে অতি-লালিত্য অতি-মাধুর্যের মোলায়েম নূপুরনিক্কণ যেমন থাকলো না, তেমনি তাতে ফুটলো গদ্যের স্পষ্টবাদিতা ও পরুষ কঠোরতা। এ জন্যে গদ্যকবিতার ত্রি-সীমানায় যে-সব বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রবেশাধিকার ছিল না সেই সব প্রসঙ্গ বা বিষয়—তুচ্ছ ও অতুচ্ছ সব রকমই, সমাদরে স্বীকৃত হোলো গদ্যকবিতায়।

৩

রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতাকে বলেছেন 'ভাবের ছন্দ' বা 'ভাবছন্দ'। কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনালেও গদ্য-কবিতায় ছন্দ আছে এবং সে ছন্দ ভাবের। অর্থাৎ ভাবের বিন্যাস এমনভাবে ঘটে যে পদ্যকবিতার ছন্দের মতো গদ্যকবিতায়ও এক ধরণের সুষমাবোধ আমরা অনুভব করি; কান ও মনের মনোযোগিতা থাকলে অনায়াসে এই ভাবছন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। কেননা, রবীন্দ্রনাথের মতে গদ্যকাব্যে 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার' না থাকলেও তার যে অস্পষ্ট ঝঙ্কার বা তার আভাস আছে এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। এইরূপ একটা অস্পষ্ট ঝঙ্কার না থাকলে গদ্যকবিতা মাত্রই আর গদ্যকবিতা হয়ে ওঠেনা, —হয় বিশৃঙ্খল' রচনা, যা অসংলগ্ন চিন্তা ও অতি-পল্লবিত মুখরতার বাহন। 'আসল কথা, ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও 'আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম' এমনি প্রকাশ্য যে, যার জন্যে গদ্যকাব্যের অঙ্গে অঙ্গে বিকীর্ণ হয় সেই চকিতদ্যুতি, কাব্যের সেই অমোঘ গুণ যার নাম 'ছন্দস্পন্দ' বা 'রিদম্'। একটি দৃষ্টান্ত:

তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে—
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরাণির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া-ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে। [বাঁশি, পুনশ্চ]

গদ্যকবিতার পংক্তিতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ বাক্-পর্ব'; পদ্যকাব্যে সুনির্দিষ্ট যতি স্থাপনের ফলে যে ধ্বনিপর্ব অনুভূত হয়, এগুলি সেরূপ কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি মাত্র

করেননা। তাই বাক্-পর্বগুলি পরস্পর সমান দৈর্ঘ্যের তো হয়না, কোনো পূর্ব-পরিকল্পিত আয়তনেরও নয়। গদ্যকাব্যে বাক্পর্বগুলি অর্থানুসারী—অর্থাৎ গদ্যে যেরূপ ভাবের বা অর্থের প্রয়োজনে বিরতি-বিধি অনুসৃত হয়, গদ্যকাব্যেও তেমনি অর্থবোধক বিরতি-বিধি অনুসৃত হয়ে 'বাক্পর্ব' রচনা করে। ছন্দকবিতায় পর্বগুলি সুনিয়মিত, পর্বে পর্বাঙ্গবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৃত যতির উপস্থিতি পরিকল্পিত। গদ্যকাব্যে কোনো দিক থেকেই সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই, বাক্-পর্বগুলি নানা মাপের, পর্বাঙ্গবিন্যাসের সমস্যা নেই এবং বিরতি-বিধি পরিকল্পিত না হয়ে ভাব-নিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া গদ্যকাব্যে পংক্তি দৈর্ঘ্যও সুনির্দিষ্ট নয়। তবে ছন্দকাব্য ও গদ্যকাব্য এক জায়গায় এসে হাত মেলায় ;—তা হোলো ছন্দস্পন্দের অনুভূতিতে।

ওগো শ্যামলী
আজ শ্রাবণে। তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ করে থাকা। বাঙালি মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায়। মনের কথাটির মতো।
তোমার মাটি। আজ সবুজ ভাষায় ছড়া কাটে।
ঘাসে ঘাসে
আকাশের বাদল-ভাষার। জবাবে।
ঘন হয়ে উঠল। তোমার জামের বন।
পাতার মেঘে,
বলছে তারা। উড়ে চলা মেঘগুলোকে।
হাত তুলে,
"থামো, থামো,
থামো তোমরা। পুব বাতাসের সওয়ারি।"
[শ্যামলী]

[দণ্ডচিহ্নের সংকেতে বাকপর্ব দেখানো হোলো। তবে এই বিধান অপরিবর্তনীয় বলা চলেনা। এক আধটু পরিবর্তন হলে মোটের 'পর কোনো ক্ষতি হয় না।

৪

অনেকের ধারণা, 'গদ্যকবিতা' ও 'কাব্যধর্মীগদ্য' [যদি এই নামে বলা যায়]—দুটি একই পদার্থের রকমফের মাত্র। শ্রীবিষ্ণু দে 'বাংলা গদ্যকবিতা প্রবন্ধে বলেছিলেন যে সেকালে বড়ো-বড়ো গদ্যরচনায় যা ছিল রঙীণ অংশমাত্র একালে তাদের 'সর্ব্বস্ব করে লিখলে ও লাইন' ভাগ করে ছাপলে তাদের নাম দেওয়া হয় গদ্যকবিতা।'১১ আমাদের মনে হয়, 'গদ্যকবিতা' আর 'কাব্যধর্মীগদ্য' এক বস্তু নয়। গদ্যকবিতা জন্মসূত্রে ছন্দোমুক্তি-সাধনার যে-ইতিহাস ধারণ করে, 'কাব্যধর্মীগদ্যে তেমন কোনো ইতিহাস বা বিবর্তন ধারা অনুপস্থিত। গদ্যকবিতা একালেরই নিজস্ব, তার বিকাশ ও পরিণতির পর্যায়গুলিও সুস্পষ্ট, পক্ষান্তরে কাব্যধর্মীগদ্যে কোনো বিবর্তন বা পরিবর্তন তো নেইই, তা চিরকালীন। গদ্যকবিতায় এক-একটি ভাবময় পংক্তি এক একটি আবর্ত রচনা করে, একাধিক পংক্তিতে গড়ে ওঠে স্তবক বা স্ট্রফিক ইউনিট'; গদ্যকবিতার পংক্তিগুলিতে দুটি, তিনটি কি বড়োজোর চারটি বাক্পর্ব্ব থাকে। আর কাব্যধর্মী গদ্যে যুক্তিনির্ভর বাক্যপরম্পরায় গঠিত হয় এক-একটি অনুচ্ছেদ ; এক-একটি পংক্তিতে চারের বেশি বিভাগ থাকতে বাধা নেই। কাব্যধর্মী গদ্যের উদাহরণ—বঙ্কিমচন্দ্রের 'আমার দুর্গোৎসব' বা 'বসন্তের কোকিল', রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' কিংবা 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি।

৫

যেহেতু গদ্য কবিতায় প্রচলিত ছন্দোরীতির নিয়মাবলী অনুসৃত হয়না, সে কারণে অনেকেই মনে করেন, গদ্য-কবিতা রচনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। আসলে তা নয়। পদ্য কবিতায় নিয়মগুলি মেনে চললেই কবিতা হোক বা না হোক ছন্দ রক্ষা করা যায়, আর গদ্য কবিতায় কবিতা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে দুকূল যায়। গদ্যকবিতা-রচনা তাই পরিণত কবিশক্তির পক্ষেই সম্ভব, অন্যে নয়! বোধহয়, এ-জন্যেই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, "অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা।...অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্য-কাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে।"১২

৬

রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক কবিদের অনেকেই গদ্য-কবিতার অনুশীলন করেছেন; তবে পরিমাণের ও

পরিণতির বিচারে তাঁদের পদ্য কবিতায় যে কৃতিত্ব, গদ্য কবিতায় তা নেই বলা চলে। (অবশ্য ব্যতিক্রম হিসেবে শ্রীসমর সেন উল্লেখ্য।) তাঁদের রচনায় গদ্যকাব্যবিরলতাই প্রমাণ করে গদ্যকাব্য রচনা সত্যই দুরূহ ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথের হাতে এবং তাঁর শেষ বয়সের কয়েকটি কাব্যে গদ্যরীতির প্রবর্তন ও অনুশীলন ঘটলেও এবং পরবর্তী-কালে আধুনিক কবিদের কাব্যে কিছু কিছু গদ্যিকা-রীতির পরিচয় পাওয়া গেলেও, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে গদ্যরীতিতে কাব্যরচনার বাসনা প্রথম দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'গদ্য-পদ্য বা কবিতা-পুস্তকে'র বিজ্ঞাপনে বলেছেন, "এক্ষণে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নহিলে কেবল কবি-নাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা, একপ্রকার সং সাজিতে বসা।"[১৩] বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যে কাব্যরচনার বাসনা ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হলেন না, ওই গ্রন্থে তিনটি গদ্য রচনা 'মেঘ', 'বৃষ্টি', 'খদ্যোত' (এবং আর একটি রচনা 'পুষ্প নাটক') সংযোজিত করলেন। এ-সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তা স্মরণীয়: "উচ্ছ্বাসপূর্ণ কয়েকটি ছোট ছোট প্রবন্ধ—যেগুলিতে গদ্যকবিতার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যাইতে পারে—'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর' ও 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি অধিকাংশ 'কবিতা পুস্তক'এ (১৮৭৮) ও ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ 'গদ্য-পদ্য বা কবিতাপুস্তক'এ (১৮৯১) সঙ্কলিত হইয়াছিল।"[১৪] তাহলে, প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে বাংলা কাব্যসাহিত্যে গদ্যরীতিতে কাব্য রচনার বাসনা ও সচেতন প্রয়াস যদি কারো থাকে তবে সে-গৌরব বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য। এই প্রসঙ্গে এ-কথা বলা আদৌ অসমীচীন হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের বা তাঁর পরবর্তীদের কাছ থেকে আমরা যে গদ্যকবিতা নামক বস্তুটি পেলাম তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির কাব্যের সম্পর্ক কিছুটা দূরতর, বরং কাব্যধর্মী গদ্যের সঙ্গেই তার আত্মীয়তা সুপ্রকট। তথাপি আমরা ভেবে আনন্দিত হই যে, কাব্যে গদ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্র-চিন্তার কী আশ্চর্য সঙ্গতি ও সাদৃশ্য!

উদ্ধৃতি পরিচয়

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ, আশ্বিন, ১৩৭০, 'গদ্যছন্দ'। রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ উক্তি আছে তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থের 'গদ্যছন্দে'।

২, ৩, ৬, ৭ ও ৮ সাহিত্যের স্বরূপ, 'গদ্যকাব্য'।

৪, ৫ ও ১০ 'পুনশ্চ'র ভূমিকা।

৯, সাহিত্যের স্বরূপ, 'কাব্যে গদ্যরীতি'।

১১, শ্রীবিষ্ণু দে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, বাংলা গদ্য-কবিতা।

১২, সাহিত্যের স্বরূপ, 'কাব্য ও ছন্দ'।

১৩, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ (বসুমতী সংস্করণ)।

১৪, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ)

তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা সম্পর্কিত যাবতীয় অভিমতের প্রভাব এই রচনায় সুস্পষ্ট—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সেদিন রাতে পূজার ঘরে সাবিত্রী ও প্রহ্লাদ অনেকক্ষণ ধ'রে গুরুবন্দনা গাইল। গাইতে গাইতে প্রহ্লাদের ভাবসমাধি। সাবিত্রী হাতজোড় ক'রে চেয়ে থাকে।

প্রায় পনের মিনিট পরে প্রহ্লাদ চোখ মেলে। চোখের জলে ফুটে ওঠে দিব্য হাসি, বলে গাঢ় কণ্ঠে :

"কে বলো তো ?"

সাবিত্রী (উদ্দেশে প্রণাম ক'রে) : গুরুদেব তো ?

প্রহ্লাদ (হেসে) : তুমিও দেখেছ ?

সাবিত্রী : না অত ভাগ্য ক'রে আসি নি, তবে ঘরের হাওয়া বদ্‌লে গিয়েছিল, আর মাথার উপরে যেন তাঁর হাতের চেনা স্পর্শ পেলাম। দেহ মন জুড়িয়ে গেল। তবে হয়ত মনের ভুল···

প্রহ্লাদ (চোখ মুছে) : না, ভুল হয় নি তোমার। তিনি তোমার মাথায় অনেকক্ষণ ধ'রে দুটি হাত রেখে জপ করলেন : "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় !"

সাবিত্রী (অশ্রুগাঢ়কণ্ঠে) : জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় !

প্রহ্লাদ (দোয়ার দিয়ে) : জয় গুরু, জয় গুরু, দিলে বরাভয় ! তুমি বড় ভাগ্যবতী···গুরুদেব বললেন।

সাবিত্রী (স্বামীর পায়ে গড় হ'য়ে) : যার স্বামী সাক্ষাৎ শিব, সে ভাগ্যবতী হবে না তো হবে কে শুনি ?

প্রহ্লাদ : না বৌ, শিব হবার এখনো দেরি আছে, তাই তো গুরুদেবকে আসতে হ'ল এ জীবের কাছে।

সাবিত্রী (থম্‌কে) : আসতে হ'ল ? ও !—মন্মু-ভাইয়ের সঙ্গে তর্কাতর্কি বুঝি ?

প্রহ্লাদ : ধরেছ। কেবল গুরুদেব এও বললেন যে এ বাগ্বিতণ্ডায় যে কোনো সুফলই ফলে নি তা নয়—তবে বাক্‌সংযম করলে আরো বেশি সুফল ফলত।

সাবিত্রী : বুঝতে পারছি না। একটু খুলেই বলো না।

প্রহ্লাদ : গুরুদেব বললেন মৃদুহেসে : "আমাদের মুনিঋষিরা বারবারই বলেছেন যে চোরার কাছে ধর্মের কাহিনী বলতে নেই। ঠাকুর গীতার শেষ অধ্যায়ে বলেন নি কি যে যারা ভক্তিহীন, ভগবৎ-দ্রোহী, তপস্যাহীন বা আদৌ সৎকথা শুনতে চায় না, তাদের কাছে কদাচ বলবে না ধর্ম সম্বন্ধে কোনো গুহ্য কথা ?"

সাবিত্রী : কিন্তু তুমি তো কই কোনো গুহ্য কথাই বলো নি ?

প্রহ্লাদ : না, তাইতো বেঁচে গেছি রগ ঘেঁষে। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় গুরুদীক্ষার বা সাধুসন্তের গুণকীর্তন ক'রে ফেলেছি এই যা দুঃখ, কেন না—গুরুদেব বললেন—শেষ-মেষ এ-ভুলের ফলভোগ করতে হবে ঐ একরত্তি মেয়েকেই।

সাবিত্রী : একথা আমারো মনে হয়েছিল কিন্তু।

প্রহ্লাদ (হেসে) : তোমাদের মতন সদাসজাগ নয় তো আমাদের প্রকৃতি। তাই উচিত কথা না ব'লে ঢোঁক গিলে ব'সে থাকতে পারি নে সোনা হেন মুখ ক'রে।

সাবিত্রী (হেসে) : মানে মেয়েরা ভণ্ড এই তো ?

প্রহ্লাদ : তা নয়, তবে সাবধানী। হয় কি জানো ? আমরা খানিকটা মাটিছাড়া মনিষ্যি চলি, ঝোঁকের মাথায়

অনেক সময়েই। তোমরা—মানে, মেয়েরা—চলো পা টিপে টিপে মাটির ভিৎ না পেলে সহজে এক পাও এগোতে চাও না। তাই থানায় বেশি পড়ি আমরাই।

সাবিত্রী: থানায় পড়তে যাব কী দুঃখে বলো—যখন থাকি 'শিবতুল্য স্বামীর নজরবন্দী হ'য়ে? কিন্তু ঠাট্টা থাক, বলো গুরুদেব আর কী বললেন?

প্রহ্লাদ: বললেন আরো অনেক কথা—কেন আমাদের তত্ত্বদর্শীরা অধিকারী-ভেদ মানতেন—যে যতটুকু হজম করতে পারে তাকে তার চেয়ে বেশি পথ্য জোগাতে নেই—এই সব। শেষে বললেন: মন্নুদার ধর্মের পরে এত রাগ হয়েছে কেন—আমার একটু বুঝতেও অন্ততঃ চেষ্টা করা উচিত ছিল। অর্থাৎ, যে স্ত্রীকে পেয়েও পায় নি, আর খুইয়ে বসল—গুরু মাঝে এসে তাকে ভগবৎমুখী করলেন ব'লে—তার গুরুর পরে রাগ হবে না?

সাবিত্রী: তা বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এ-যাত্রা দাদার রাগের আরো একটা কারণ ছিল। উনি কৃতী পুরুষ তো, উপায়ও করেন বিস্তর,কাজেই বুদ্ধির অভিমানও একটু বেশি। এই অভিমানে বড় ঘা খেয়েছেন—আজ তর্কে তোমার কাছে হেরে অপদস্থ হ'য়ে। নৈলে এতটা রেগে উঠে শেষে গুরুদেবকে গালিগালাজ সুরু করতেন না।

প্রহ্লাদ: একথা সত্যি। কিন্তু গুরুদেব বললেন—ও সবচেয়ে বেশি তেতে উঠেছিল আর একটি কারণে। সেটি এই যে, পিণ্টো প্রফেসার হিসেবে খ্যাতিমান্, বুদ্ধিমান্—বিশেষ ক'রে চরিত্রবান বলেও নাম কিনেছে। যারা চরিত্রহীন, তারা টলমল করে ব'লেই আরো বেশি আঁকড়ে ধ'রে এই ধরণের অটল মানুষকে। এই জন্যেই মনুদা ওর বৈজ্ঞানিক গুরুর যুক্তিবাদকে বেদবাক্য মনে ক'রে শুধু যে শান্তি পায় তাই নয়—খানিকটা আত্মসম্মানও ফিরে পেয়েছে—পিণ্টো গুরু-ফুরুকে চোখা চোখা ব্যঙ্গের যুক্তি-বাণে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়েছে ভেবে। গুরুদেব বললেন: "আজ হঠাৎ তোমার পাল্টা ব্যঙ্গের তীরন্দাজিতে এ-হেন অজেয় বিজ্ঞান পূজারীর যুক্তিবিগ্রহ ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার দরুণই মনুভাই আর টাল সামলাতে পারে নি।" তবে—গুরুদেব বললেন—এ নিয়ে আমার বেশি মন খারাপ করার দরকার নেই—কারণ ঠাকুর ভাবগ্রাহী তো—তাই আমার ভাব যখন ঠিক ছিল তখন আমি একটু আধটু ভুলভ্রান্তি করলেও তিনি শেষরক্ষা করবেনই করবেন—বলে উদ্ধৃত করলেন ভাগবতের আশ্বাস:

স্বপাদ মূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্বং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ॥

সাবিত্রী: এ শ্লোকটা আমি গুরুদেবের মুখে দুতিনবার শুনেছি, কিন্তু মানেটা ভুলে ব'সে আছি।

প্রহ্লাদ: এর মানে ভারি চমৎকার: যে মনে রাখে যে, ঠাকুর তার হৃদয়ে আছেন সে ভুলভ্রান্তি ক'রে তাঁর চরণেই শরণ নিলে তাকে সে-ভুলের কর্মফল থেকে ঠাকুর রক্ষা করেন। অর্থাৎ অন্য লোকে যে-আগুনে হাত দিলে তাদের হাত পুড়ত ভক্ত সে-আগুনে ভুল ক'রে ঝাঁপ দিলেও ভয় নেই, ঠাকুর বাঁচাবেনই বাঁচাবেন।

সাবিত্রী: চমৎকার বটে, কিন্তু তোমার ভয়টা কি?

প্রহ্লাদ: ভয়টা ঠিক আমার না—রমার।

সাবিত্রী: রমার?

প্রহ্লাদ: হ্যাঁ, গুরুদেব সেই কথা বলতেই আজ এসেছিলেন সূক্ষ্মদেহে। বললেন আমার ভুলের জন্যে রমা দুঃখ পাবে এ ঠিক—কিন্তু এক্ষেত্রে গুরুশিষ্যা উভয়েই ঠাকুরের প্রিয় বলে স্নেহের শাপও শেষে রমার কাছে হয়ে উঠবে বর।

সাবিত্রী: কী ভাবে?

প্রহ্লাদ: তোমার কী যে কৌতূহল! সাধ হয় তো টেলিফোনে জেরা করো গিয়ে—আমি জানি না যাও।

সাবিত্রী: আহা! যেন তর্ক করতে আমরাই উধাও হই তাল ঠুকে। আমার শুধু প্রাণ কাঁদে ঐ লক্ষ্মীপ্রতিমা মেয়েটার জন্যে—তাই না এত খুঁটিয়ে জানতে চাই-যদিপারি কোনোমতে মা-হারার দুঃখ একটুও কমাতে।

প্রহ্লাদ (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে): দুঃখ কমাতে না চায় কে বৌ? আমরা প্রত্যেকেই তো ঘড়ি ঘড়িই ঘোষণা করি—এ চাই ও চাই তা চাই—বা চাই না। গুরুদেব বলেন—মনে নেই: আমরা কী চাই না চাই সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল খবর পাওয়া ঠাকুর কী চান?

সাবিত্রী: বুঝলাম, কিন্তু সে-খবর দিতে আসবেন কে শুনি?

প্রহ্লাদ: যিনি আজ এসেছিলেন। সদ্গুরু।

সাবিত্রী : আর একটু খুলে বলো—তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।

প্রহ্লাদ : কী বলব বৌ ? এসব কুডাক ডাকতে কি ভালো লাগে ছাই ? গুরুদেব বললেন : "মনুভাই এবার রুখে উঠে রমার বিয়ে দেবে জোর ক'রেই। ফলে হবে প্রায় ভরাডুবি—কিন্তু আমরা যেন তাতে উদ্বিগ্ন না হই—মনে রাখি—(সুর ক'রে) 'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।"

* * *

সাবিত্রীর অশান্ত মন শান্তি পায় একটু। রাত্রে ভক্তি ভরে গুরুমন্ত্র জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে সে স্বপ্ন দেখে এত বিচিত্র!

কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে ছুটি চিতা জ্বলছে…হঠাৎ যেন জ্বলন্ত শবদেহ ছুটি উঠে বসল। আগুন ঘুরতে ঘুরতে ছুটি মূর্তির রূপ নেয়।

সাবিত্রী ব'লে উঠল : বাবা! দিদি!

মূর্তি ছুটি প্রসন্ন হেসে মিলিয়ে যায়।…আগুন নিভে যায়। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। সাবিত্রীর নিজেকে হঠাৎ বড় একলা মনে হয় —একলা অথচ নিঃসঙ্গও নয়—একটি পরিচিত প্রিয় মুখের কায়া নেই, শুধু ছায়া আছে থমকে। একটু পরে ফুটে ওঠে ওর মার মুখ · কিন্তু কমলা তো কয়েকমাস আগে অমরনাথে গিয়ে আর ফেরে নি…অনেক খোঁজ করেও কোনো ফল হয় নি। সাবিত্রী চোখের জলে প্রার্থনা করেছিল : "ঠাকুর, মা তীর্থ করতে গিয়ে যদি কোথাও দেহরক্ষা ক'রে থাকেন তবে তাঁকে তুমি পায়ে ঠাই দিও।" হঠাৎ স্পষ্ট শোনে—এক ছায়া মূর্তির আশ্বাস।

"তোমার প্রার্থনা গুরুদেব শুনেছেন মা!"

সাবিত্রী (ছায়ামূর্তিকে) মা—মা—মা। সত্যিই তুমি ?

কমলার ছায়ামূর্তি : হ্যাঁ মা, গুরুদেব আমাকে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছেন অমরনাথে আমার দেহরক্ষার একটু আগে। পরম শান্তিতে আছি আমি, ভেবো না।

সাবিত্রী আনন্দে এগিয়ে যায় মা-কে প্রণাম করতে, কিন্তু মূর্তি মিলিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে…কে ? গুরুদেব না ?

জ্যোতির্ময় স্বপ্নমূর্তি : এসো মা, এসো।

সাবিত্রী (প্রণাম ক'রে) : মা কি শান্তি পেয়েছেন গুরুদেব ?

স্বপ্নমূর্তি : শুনলে না কি এইমাত্র মা ?

সে মূর্তি মিলিয়ে যায়··

কে ? গুরুমা ?

শান্তিময়ীর স্বপ্নমূর্তি : এসো মা এসো।

সাবিত্রী : রমার কী হবে মা এখন ? ধ্রুবর সঙ্গে…

স্বপ্নমূর্তি : না মা। সে হবার নয়। ধ্রুব বলে—রমাকে ও চিরদিন বোন মনে করে এসেছে, একসঙ্গে খেলা করে এসেছে…এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ শুভ নয়।

সাবিত্রী : কিন্তু দিদির বড় ইচ্ছে ছিল।

গুরুমা : জানি। কিন্তু সে জানত না ধ্রুবর মনের কথা। তাছাড়া মালতীই যে ধ্রুবর যথার্থ তীর্থসঙ্গিনী ঠাকুর আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন।

সে মূর্তিও মিলিয়ে যায়…

হঠাৎ এ কি ? শ্মশান ? ইন্দ্রায়ণীর তীরে ? চিতায় কে ? এ কি ? ওর নিজের দেহ ?

অথচ আশ্চর্য…ভয় তো হয় না। তবে কি মরণের মধ্যে ভয়ের কিছু নেই ? প্রশ্ন জেগে ওঠে ওর মনে।

সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর মুখ ভেসে ওঠে চিতার উপরে "না বৌ। ঠাকুর বলেন নি কি গীতায় যে—তাঁকে যে চাইবে সে-কল্যাণীর দুর্গতি হবে না।

সাবিত্রী : ঠাকুর ? তাঁকে তো দেখিনি দিদি। জানি এক গুরুদেবকে—

গৌরী (হেসে) : গুরু আর ইষ্ট কি ভিন্ন বৌ ?

সাবিত্রী : শুনেছি নয়, কিন্তু জানব কবে ?

গৌরী : অন্তর জানেই জানে বৌ।

সাবিত্রী : জানে ? কই, আমি তো জানি না।

গৌরী : একটা পাৎলা পর্দার আবরণ আছে… ঘুচলেই জানবি…দেখতে পাবি।

সাবিত্রী (সাগ্রহে) : পাব ? কোথায় দিদি ?

গৌরী (চিতার দিকে দেখিয়ে) : ঐখানে।

সাবিত্রী জেগে ওঠে চমকে।…কিন্তু কই বুকের মধ্যে বেদনা তো নেই…শুধু অন্তরের শান্তি…

তেইশ

মনুভাই ছুটে দেহুতে গিয়েছিল কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে নয়—প্রহ্লাদকে ও সত্যিই ভালোবাসত তাই গিয়েছিল বোঝাতে—যাতে আকাশবৃত্তি নিয়ে সে অনর্থক কষ্ট না পায়। তাছাড়া গৌরীর অকালমৃত্যুর পরে ও রমাকে টেলিগ্রাম ক'রে ও তারপরে চিঠি লিখেও উত্তর পায় নি। তাই দেহুতে গিয়েছিল খুঁটিয়ে জানতেও বটে—কী ভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। মহাদেবকেও ও শ্রদ্ধা করত—তাই তাঁর কথা ভেবেও ওর মন একটু নরম হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু প্রকৃতিতে অসংযমী ও দাম্ভিক ব'লে প্রহ্লাদের কাছে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় তর্ক ফেঁদে বসল। তার পরে যা হবার তাই হ'ল—তীক্ষ্ণধী বিদ্বান্ প্রতিপক্ষের কাছে বিতণ্ডায় কোণঠেশা হয়ে ও গালি-গালাজ শুরু করে দিলি—খানিকটা গায়ের ঝাল মেটাতেই। কিন্তু প্রহ্লাদ উত্তরে পাল্টা কটূক্তি না ক'রে স্থানত্যাগ করল—ওকে ঘরে বসিয়ে রেখে। বলল কি না—সস্ত্রীক ইন্দ্রায়ণী নদীতে স্নান ও পরে সারাদিন উপবাস ক'রে তবে ওর দুর্বচন শোনার পাপ থেকে মুক্ত হ'তে হবে! সবার উপর, যে-পিণ্টোর কাছে সবাই হাতজোড় করে থাকে ভয়ে ভয়ে, সেই বিজ্ঞানী-ধুরন্ধরকে নিয়ে হাসাহাসি ক'রে ও তাকে এমন রঙে রাঙিয়ে তুলল যে—মনে হ'ল যেন পিণ্টো একটা সং। অপমানের জ্বালায় ফুঁশতে ফুঁশতে ও সোজা পিণ্টোর কাছে গিয়ে বলল কী ভাবে ও লাঞ্ছিত হয়েছে। কেবল রিপোর্ট দেবার সময়ে গোপন ক'রে গেল ও নিজে কী ভাবে ধর্ম, শাস্ত্র ও গুরুবাদকে গালিগালাজ করেছিল। ঠিক যে ইচ্ছে ক'রে অর্ধসত্য বলতে চেয়েছিল তাও নয়—সত্যের অপলাপ করেছিল—যেমন আর পাঁচজন ক'রে থাকে—বিশেষ ক'রে কৃতী পুরুষেরা যাদের কাছে সত্যনিষ্ঠার চেয়ে দম্ভপ্রতিষ্ঠার দাম বেশি।

পিণ্টো শুনে আগুন হ'য়ে গর্জে উঠল—রেগে উঠলেই তার মুখে ইংরাজি গালিগালাজের খই ফুটত:

"যত সব ইনসোলেণ্ট হাম্বাগ ফিলিস্টাইন, মিডীভাল, ইগনোর‍্যামাস, প্যারাসাইটের দল! বলি কি তোকে? তবু তুই রমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলি! আমি তখনই বলেছিলাম তোকে—গৌরীকে ডাইভোর্স ক'রে আর একটা বিয়ে ক'রে রমাকে এনে নিজের কাছেই রাখতে। তুই বললি—না, গৌরী হয়ত দুচার বৎসর পরে গুরুফুরুর বুজরুকিতে অতিষ্ঠ হ'য়ে ফিরতেও পারে। সাইকলজি পড়লে জানতিস যে, স্পাইনলেস ধামাধরাদের কখনো সুবুদ্ধি হয় না—হ'তে পারে না। তাই না আমার কথায় কান না দিয়ে তুই সেণ্টিমেণ্টাল হ'য়ে রমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলি স্ত্রীকে appease করতে। তোর এই দুর্বলতাই তোকে মেরেছে। you own instability and varillation have been your undoing! কিন্তু মরুক গে, যা হবার তা হয়েছে—no use crying over split milk, তুই আজই কাশী রওনা হ। রমাকে এনে রাখ—কোনো মেম গভর্নেসের নজরবন্দী ক'রে। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারিস একটা ভালো ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দে। হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম কদিন থেকে: আমার একটি ছাত্র আছে—গৌতম। সেইই হবে ঠিক জামাই একেবারে মডার্ণ বুদ্ধিমান্ মেটারিয়ালিস্ট—অবস্থাপন্ন কিন্তু তুই আগে রমাকে তো নিয়ে আয়। but no more shilly shally, if you please!...এই ভাবে পিণ্টো মনুভাইকে ধমকে বলল ঝাড়া চল্লিশ মিনিট।

সুতরাং মনুভাই যে চোখে সর্ষের ফুল দেখবে, এ আর বিচিত্র কি? ও গুটি গুটি গিয়ে করুণ হেসে বলল পিণ্টোকে যে, রমা তার মার মেয়ে বটে—ভাঙবে তবু মচকাবে না—শেষে বলল: "সাহেব-পুরাণেও নেই কি—you can take a horse to the water but you cannot make him drink?" পিণ্টো এই প্রথম বিপন্ন বোধ করল, কারণ মনুভাই এযাত্রা তো ভুল বলে নি: এ-বিংশ শতাব্দীতেও হবু বরের সঙ্গে আলাপ করতে না চাইলে তো আর জোর ক'রে হবু-কনের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি ঘটানো যায় না।

অগত্যা পিণ্টো বলল—দেহুতে ওকে যেতে দেওয়া হোক মাঝে মাঝে—কেবল সপ্তাহে একদিনের বেশি নয়, এবং এই সর্তে যে, গৌতমকে ও বিবাহ করবে। রমা বলল বিবাহ করা মুখের কথা নয়—গৌতমকে না দেখে কিছু বলতে পারে না। তবে একপক্ষ যখন একটু ছাড়ছে তখন ওকেও একটু ছাড়তে হ'ল: সপ্তাহে একদিন গুরুদেবের সংস্পর্শ পাবে এই ভরসা পেয়ে রমা রাজি হ'ল গৌতমের

সঙ্গে আলাপ করতে। মনে মনে জপ্‌ল—বিবাহ যখন করব না তখন দেখা করতে বাধা কি ?

গৌতম ওকে দেখে বিহ্বল হ'য়ে গেল। পিণ্টোকে গিয়ে বলল : এযে এ যে—ই-য়ে ! মনুভাই শুনে বলল হেসে : My boy ! "তাই তো দিতে চাই বিয়ে !"

তারপর দু-তিন মাস ধ'রে অশ্রান্ত টানা-ছেঁড়া—মনুভাই পিণ্টো গৌতম একদিকে—আর রমা একদিকে। একদিন পিণ্টো যে পিণ্টো—সেও আশ্চর্য হ'য়ে বলল মনুভাইকে : "ওরে ! সত্যি একটু অবাক লাগে ভাবতে—একটা teen-age মেয়ে এত শক্ত হ'তে পারে—বিশেষ ক'রে যে-মেয়ে বরাবর মিডীভাল কুসংস্কারের আওতায় বেড়ে উঠেছে ?"

শক্ত ব'লে শক্ত ! দেখেশুনে মনুভাই সত্যিই থ হ'য়ে গেল, কারণ গৌতমকে সবাই বলত সাক্ষাৎ কন্দর্প। মনুভাই নিজে লম্পট তো, তাই ভাবত এমন সুশীল সুরূপ যুবক দিনের পর দিন রমার কামনা বাসনার কাছে দরবার করলে আগুন জ্ব'লে উঠতে বিলম্ব হবে না। কিন্তু এ কী ব্যাপার ? রমা র'য়ে গেল বরফের ম'তই ঠাণ্ডা, কঠিন, নির্বিকার ! গৌতমের সঙ্গে সে যেত বটে এখানে ওখানে, কিন্তু, একদিন গৌতম মোটরে একটু বেশি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতেই রমা ব'লে দিল শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে যে, সে ধর্ম মানে—গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে। ও কথা দিয়েছে যে, বিবাহের পূর্বে কোনো পাণিপ্রার্থীর এতটুকু স্পর্শও সইবে না।

আসলে রমা গৌতমের সঙ্গে মিশতে ভয় পেত না, কেন না জানত ওর মনের চার দিকে রক্ষাকবচ হ'য়ে আছে ধ্রুব—যাকে ও বহুদিন থেকেই মনে মনে বরণ করেছিল। মনুভাই কিছুতেই তার সঙ্গে ওর বিবাহে মত দেবেন না ভাবতে দুঃখ পেত বৈ কি, কিন্তু স্থির করেছিল ধ্রুবর জন্যেই ও অপেক্ষা করবে—বছর খানেক বাদে সাবালিকা হ'লেই পিতার অমতেও তাকে বিবাহ করবে এইই ছিল ওর পণ। কিন্তু ধ্রুব জার্নালিস্‌মে আরো পটু হ'তে আমেরিকা হ'য়ে জাপানে গেছে—সেখান থেকে আবার আমেরিকা হ'য়ে ফিরতে ফিরতে অন্তত আরো ছ-সাত মাস। রমা পিতৃগৃহে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেও স্থির করল ধ্রুবর ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে—যত কষ্টই হোক না কেন।

এই সময়ে হঠাৎ ওকে বন্দনা একটি চিঠিতে লিখল যে প্রহ্লাদ মালতীকে দীক্ষা দিয়ে গেছে—ঠিক হয়েছে ধ্রুব ফিরে এলেই কাশীতে ওদের বিবাহ হবে এবং প্রহ্লাদই হবে পুরোহিত।

রমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ও সোজা দেহুতে গিয়ে "মা জননী !" ব'লেই সাবিত্রীর কোলে ভেঙে পড়ল। কেবল কান্না আর কান্না ! তখন সাবিত্রী বলল, ওর স্বপ্নে-পাওয়া বাণীর কথা। রমা চোখে অন্ধকার দেখল। আশার শেষ রশ্মিও লুপ্ত হ'ল। কিন্তু তবু—গৌতমকে বিবাহ ? সে যে ভাবাই যায় না। স্বভাবে ও খানিকটা রোমান্টিক হ'য়েই গ'ড়ে উঠেছিল : মনে মনে একজনকে বরণ ক'রে আর এক জনের পাণিগ্রহণ করলে কি ও দ্বিচারিণী হবে না ?

ফিরে এসে জপ ও ধ্যানে মন বসালো। কারুর সঙ্গে মেশে না, শুধু মাঝে মাঝে দেহুতে যায় এই মাত্র। মনুভাই ভয় পেয়ে গেল। কী হ'ল আবার ? কী করবে সে এমন রোখালো অবুঝ মেয়েকে নিয়ে—যাকে কোনোমতেই এতটুকু টলানো যায় না ? সব শুনে অনেক ভেবেচিন্তে শেষে পিণ্টো পরামর্শ দিল যে মেয়ে যখন কোনোমতেই বাগ মানছে না তখন ফের চাপ দেওয়াই বিধি—ওর দেহু যাওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়া যাক, কিছুদিন নজরবন্দী ক'রে দেখাই যাক—অবাধ্য মেয়ে শায়েস্তা হয় কিনা।

দুদিন বাদে পিণ্টো এক ইহুদী মেম গভর্নেস পাঠিয়ে দিল—রমার দেহু যাওয়া বন্ধ হ'ল।

কিন্তু তারপরে ঘটল আর এক অভাবনীয় কাণ্ড—রীতিম'ত ড্রামা। কিন্তু তার নাটকীয় পঞ্চমাঙ্ক ফুটিয়ে তুলতে হ'লে আগে প্রথম চারটি অঙ্কের কথা না বললেই নয়।

চব্বিশ

চঞ্চলমতি মানুষের যা হয়—মনুভাইয়ের মন প্রহ্লাদের বাড়িতে জীর্ণ বেলুনের মতন চুপসে গিয়ে তার পরেই পিণ্টোর নাস্তিক ফুশলানির ফুঁ-এ ফের ফুলে উঠল রোখালো পৌরুষের আত্মপ্রত্যয়ে। ছুটল সাণ্টা ক্রুজে, উড়ল আকাশে, জপল সদাপটে—পিণ্টোর গুরুমন্ত্র : No more shilly-shally—আর দুর্বল হওয়া নয় !"

রমাকে ও স্নেহ করত সত্যিই, তাই ভেবেছিল দুদিন বাদে আনতে যাবে। কিন্তু আর গড়িমসি করা নয়—পিণ্টো ঠিকই বলেছে। ও এবার দেখিয়ে দেবে মহাপুরুষকে—কী দেখিয়ে দেবে? ভেবে পেল না। নাই পাক। না না…হয়েছে দেখিয়ে দেবে যে, ও কাপুরুষ নয়—মিডীভালিস্ট নয়—সুপারস্টিশাস নয়—আরো কত কী নয় নয় নয়। ভাবতে ভাবতে ও মনে মনে রিহার্সাল দিল নাটকীয় ঢঙে বিষ্ণুঠাকুরকে কী ভাবে তীব্র ব্যঙ্গ ক'রে বসিয়ে দেবে। আত্মপ্রসাদে মন ওর পেখম মেলল যেন!

*　　*　　*

কিন্তু মানুষ ভাবে এক—হয় আর। কী গেরো! বিষ্ণুঠাকুরের শুভ্রকান্তি জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে অনিচ্ছায়ও সভয় সম্ভ্রমে ওর মাথা মন্ত্রৌষধি হতবীর্য সাপের ফণার মতনই নত হ'য়ে এল শুধু তাঁর নয়—গুরুমার চরণেও। হায়রে অব্যবস্থিত চিত্তের ফ্যাসাদ!

বিষ্ণু ঠাকুর ওকে শান্ত কণ্ঠে বললেন—রমাকে আরো কিছুদিন পরে নিয়ে গেলে ভালো হ'ত। ও মাথা নিচু ক'রে একটু ভেবে বেরিয়ে গিয়ে বন্দনার বাড়ি থেকে টেলিফোন করল ওর প্রবল বৈজ্ঞানিক গুরুকে। সে শুনতে না শুনতে তেতে উঠে ওকে ধমকাল: "তোর লজ্জা ক'রে না? এত ক'রে বোঝালাম—সব বুদ্বুদের হাওয়া! ধিক্! কিন্তু শোন্, তুই সইলেও আমি আর সইব না, ব'লে রাখছি। এবারও যদি তুই ফের ঐ গুরু-ফুরুর কথা শুনিস তবে বেশ—ফেয়ারওয়েল্। আর আমার এখানে আসিস নে। I cant stand spineless, sentimental, laclirymose vacillating molly-coddles—যাদের কথার ঠিক নেই, মাথার ঠিক নেই, এক পা এগোয় তো দুপা পেছোয়…ইত্যাদি ইত্যাদি ঝাড়া পাঁচ মিনিট লেকচার।

মনুভাই ওকে কথা দিল যে, আর নরম হবে না। বন্দনা ওকে জিজ্ঞাসা করল: কী ব্যাপার দাদা?" ও বলল: "কিছু না, শুধু রমাকে নিয়ে যেতেই হবে। তুমি গুরুমাকে এই চিঠিটি দেবে? আমি বি—গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই না, তোমার এখানে একটু জিরিয়ে নিই। বড় মাথা ধরেছে।"

*　　*　　*

খানিক পরে বন্দনা মোটরে ফিরে এল রমাকে নিয়ে। রমার চোখের পাতা ফোলা। কিন্তু সে একটি কথাও বলল না। মনুভাই বন্দনাকে জিজ্ঞাসা করল: কী ব্যাপার?

বন্দনা (অনুযোগের সুরে): কেন ওকে নিয়ে যাচ্ছেন দাদা? এত তাড়া কি?

রমা (বাধা দিয়ে): না দিদি, আমি যাব। গুরুমা বলেছেন—ঠাকুর যে-ব্যবস্থাই করুন না কেন, বরণ ক'রে নিতে হবে।—শুধু "তোমার ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময় স্বামী" গান গাইলেই আত্মসমর্পণ-সাধনায় সিদ্ধি হয় না।

মনুভাই থ হ'য়ে গেল। ভাবল—একটু যেন বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে, রমাকে তো নিয়ে যেতে পারত আর কিছু দিন পরে…কিন্তু পিণ্টো যে অলটিমেটাম দিয়েছে—না না—জপ করে গুরুমন্ত্র, No more shilly-shally!" পিণ্টোকে হারালে ও দাঁড়াবে কোথায়?

পঁচিশ

রমাকে সাত তাড়াতাড়ি পুণায় নিয়ে এসে কিন্তু মনুভাই মহা মুস্কিলে পড়ল। রমা দেখতে যেমন নরম, ভিতরে কি তেমনি অনমনীয়! তার উপর এত অল্পভাষিণী! এক আধবার আপত্তি করে বাপের এ-ও-তা প্রস্তাবে, কিন্তু তার পরেই নিশ্চুপ। ওর তল পাওয়া ভার।

পুণায় ফেরার তিন দিন বাদে রমা দেহুতে যেতে চাইতেই মনুভাই বলল যে, ও যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে যার সঙ্গে ইচ্ছে দেখা করতে পারে, কেবল প্রহ্লাদের সঙ্গে ছাড়া। শুনেই রমা বলল: বেশ, কিন্তু তাহ'লে আর কারুর সঙ্গেও দেখা করব না আমি।"

কী বিপদ! এদিকে ও যে পিণ্টোকে কথা দিয়েছে যে গৌতমকেই জামাই করবে। এখন উপায়? এ-ঘোর কলিযুগের বণিক্‌বালাও যে স্বয়ম্বরাই র'য়ে গেল—পিতার জামাতৃ-বরণে সায় দিয়ে বরমাল্য গাঁথতে চায় না! তার উপর, রমা দেখতে তন্বী হ'লেও তার ইচ্ছাশক্তি মোটেই তন্বী ছিল না। গৌরীর মেয়ে তো! সাফ ব'লে দিল—যতদিন ও নাবালিকা আছে পিতার হেফাজতে থাকতে

বাধ্য বটে, কিন্তু তাই ব'লে বিবাহ করতে বাধ্য নয়। আর এ-যুগে সপ্তদশী কুমারীকে কিছু গায়ের জোরে বিবাহ দেওয়া সম্ভব নয়।

ছাব্বিশ

ইহুদী মেয়েটির নাম অলিভিয়া। পর্তুগীজ গোয়ার রাজধানী পঞ্জিমে তার বাবা ছিলেন ডাক্তার। মেয়েকে তিনি ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন, কিন্তু মেয়ে দুবৎসর প'ড়েই এক লম্পটের সঙ্গে পালিয়ে যায় বিলেতে। সে অলি-ভিয়াকে যথাকালে পরিত্যাগ করে। অলিভিয়া আবিষ্কার করে প্রণয়ীর স্ত্রী পুত্র আছে। সে সোজা পুনায় আসে পিণ্টোর খবর পেয়ে।

পঞ্জিমে পিণ্টো তাকে জানত ও একসময়ে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। কিন্তু তখন পিণ্টো ছিল দরিদ্র ছাত্র। অলিভিয়া চাইত অর্থ ও বিলাস। কাজেই পিণ্টোর বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে তার বাধে নি। পিণ্টো গভীর বেদনা পেয়েছিল। কিন্তু সময়ে সব তাপই জুড়িয়ে যায়, পিণ্টোরও গেল।

অলিভিয়া যখন বিলেত থেকে ফিরে আসে তখন বম্বে ও পুনায় পিণ্টোর খুব নামডাক। সে পিণ্টোর কাছে গিয়ে জানালো নিজের অভাব। পিণ্টো দাম্ভিক হ'লেও ছিল চরিত্রবান্ তথা স্পষ্টবাদী, বলল: "আর হয় না অলিভিয়া, যা যায় তা আর ফেরে না। তুমিও যে সে-তুমি নেই—যাকে আমি ভালোবেসেছিলাম, আমিও সে-আমি নই যাকে তুমি হাতে পেয়েও পায়ে ঠেলেছিলে। তবে তোমার কাছে আঘাত পেয়ে আমার মন একমুখী হয়েছে, আমি ভালোবেসেছি বিজ্ঞানকেই একান্তভাবে, তাই তোমাকে বিবাহ করতে না পারলেও আমি সাহায্য করব—আরো স্মৃতির মান রাখতে।"

পিণ্টো স্বভাবে কৃপণ ছিল না। অলিভিয়া এখানে ওখানে নানা পরিবারে পড়াত ইংরাজি ও শেখাতো পিয়ানো। কিন্তু তবু সে অকুণ্ঠে পিণ্টোর কাছে এসে বলত যা পায় তাতে অভাব মেটে না। পিণ্টো তার মোহ কাটিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু অতীতের স্মৃতি তাকে সময়ে সময়ে সেণ্টিমেণ্টাল ক'রে তুলত। তাই সে অলি-ভিয়াকে সাহায্য করত শুধু টাকা দিয়েই নয়, নানা পরিবারে পেশ ক'রে শিক্ষয়িত্রী বা গভর্নেস রূপে।

রমাকে নজরবন্দী রাখার ব্যবস্থার মাসখানেক আগে অলিভিয়াকে পিণ্টো পুণায় একটি ধনী পার্সী পরিবারে ভালো গভর্নেস ব'লে সুপারিশ দেওয়ায় অলিভিয়া সেখানে মোটের উপর আরামেই ছিল, কিন্তু সেই সময়ে একবারও পিণ্টোর ওখানে চায়ের পার্টিতে গৌতমও রমাকে দেখে উৎসুক হ'য়ে ওঠে—আরো পিণ্টোর কাছে শুনে যে, রমা গৌতমকে বিবাহ করতে চায় না। ও পিণ্টোকে বলে: "আমি রমাকে রাজী করাতে পারি যদি মোটা মাইনেয় আমাকে গভর্নেস রাখা হয়।" ও শুনেছিল যে গৌতমের অনেক টাকা।

যোগাযোগ হ'য়ে গেল নিয়তির দুর্বোধ্য বিধানে। ফলে পিণ্টো অলিভিয়াকে পেশ করল মনুভাইয়ের কাছে জানিয়ে যে, এ-ব্যাপারে অলিভিয়ার ঘটকালিতে হয়ত কার্যসিদ্ধি হ'তেও পারে। কারণ অলিভিয়ার শুধু যে বাইরের চটক ছিল তাই নয়, কথাবার্তা কইতে, হাসতে, হাসাতে বিশেষ ক'রে নাচতে পারত ও চমৎকার।

অলিভিয়া বেশ ভেবেচিন্তেই ফন্দি এঁটে এসেছিল। প্রথমেই রমাকে নাচ শেখাতে চাইল। রমা বলল: না। অলিভিয়া তখন গৌতমকে ধরল। গৌতম নাচতে জানত ওয়াল্‌টজ ও ট্যাঙ্গো। অলিভিয়া বলল: আমার সঙ্গে নানা পার্টিতে তুমি যদি নাচো রমার সামনে তো দেখবে ওর মন উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে। রমাকে ও চিনত না।

অলিভিয়ার হাবভাব দেখে রমার মন ছি ছি ক'রে উঠল—ও শুধু ইংরাজি পড়ার সময় ছাড়া তার সঙ্গে দেখা করা পর্যন্ত ছেড়ে দিল। কিন্তু নানা জায়গায় অলিভিয়ার নাচ দেখে ঘটল এক অভাবনীয় কাণ্ড: মনুভাইয়ের লম্পট মন উঠল চঞ্চল হ'য়ে। অলিভিয়া মনুভাইকে চায় নি, চেয়েছিল গৌতমকে রমার কাছছাড়া করে পাকে ফেলে বিবাহ করতে। গৌতম দুদিন বাদে ওর সঙ্গে দেখাশুনো করাও ছেড়ে দিল। কিন্তু মনুভাইয়ের হ'ল মতিভ্রম। চাইল নাচ শিখতে।

অলিভিয়ার তখন মাথায় এল "ব্রেণ-ওয়েভ": মনু-ভাইয়ের অগাধ টাকা—এই তো টোপ খেয়েছে অপ্রত্যাশিত মহামীন! ও মনুভাইকে সাগ্রহেই ট্যাঙ্গোর নাচ শেখানো সুরু করল।

তারপর অনেক কাণ্ড ঘটল। সংক্ষেপে রমাকে ইংরাজি পড়ানো ছেড়ে অলিভিয়া মনুভাইকে পেয়ে বসল। মনুভাইও পড়ল ওর ফাঁদে।

রমা অষ্টাদশী—তার উপরে বুদ্ধিমতী—বুঝতে ওর বাকি রইল না—কী দারুণ চালু পথে গড়িয়ে চলেছে ওর পঞ্চাশোত্তীর্ণ পিতা। একদিন এক ককটেল পার্টিতে অতিথিরা প্রস্থান করার পর অলিভিয়া মনুভাইকে আরো দুপেগ খাইয়ে বলল: "এসো আর একটু নাচা যাক। মনুভাই মাতাল হ'য়ে নাচ স্বরু ক'রে দিল ভুলে গিয়ে যে, রমা পাশের ঘরে পূজায় বসেছে। রমার ধ্যান ভঙ্গ হ'ল পিতার প্রমত্ত হওয়ায়। সে উঠে তাকাতেই দেখল—অলিভিয়া পিতার বাহুবন্ধনে। আর টাল সামলাতে না পেরে ছুটে এসে তীব্র কণ্ঠে বলল অলিভিয়াকে: এক্ষণি বেরিয়ে যাও, ব'লেই পিতাকে: "নৈলে আমি এক্ষণি চ'লে যাব কাশীতে—আর ফিরব না।"

রুষ্ট মেয়ের রুক্ষ কণ্ঠে মনুভাইয়ের নেশা ছুটে গেল। অলিভিয়াকে ছেড়ে দিয়ে জর্জর হ'য়ে ছুটল ধন্বন্তরি পিণ্টোর কাছে। পিণ্টো শুনে আগুন হ'য়ে উঠল। বলল: কতবার বলেছি দুপেগ-এর বেশি খাসনে। ছি ছি! পাশের ঘরে grown-up মেয়ে—বাপ হ'য়ে ভুললি কী ব'লে?" ব'লেই অলিভিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে তিরস্কার ক'রে বলল—কোনো হোটেলে চ'লে যেতে। অলিভিয়া স্রেফ মুখের উপর জবাব দিল যে, মনুভাই ওকে একাধিক প্রেমপত্র লিখেছে। কথাটা সত্যি। মনুভাইয়ের মত্ত অবস্থায় ও তাকে দিয়ে কয়েকটি উচ্ছ্বসিত পত্র লিখিয়ে নিয়েছিল। অলিভিয়া আরো বলল—মনুভাই এইমাত্র নাচতে নাচতে কী বেলেল্লামি করেছিল কোর্টে বলবে এবং রমাকেই সাক্ষী মানবে—সে ধার্মিক মেয়ে, সত্য কথা বলতে বাধ্য হবে।

মনুভাই বিষম ভয় পেয়ে গেল—কেঁচো খুঁড়তে এ কী সাপ বেরুল! ও যতই কেন না অসংযমী হোক, অলিভিয়ার মতন স্বৈরিণীকে গৃহলক্ষ্মী করবার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি তো—বিশেষ যখন রমার বিবাহ দেবার চেষ্টা করছে। অগত্যা পিণ্টোর মাধ্যমে অলিভিয়াকে কুড়ি হাজার টাকা দণ্ড দিয়ে চারটি প্রেমপত্র ফেরৎ নিয়ে বহু কষ্টে অব্যাহতি পেল।

অলিভিয়া চ'লে গেল কলম্বোয় এক কাজ পেয়ে। কিন্তু রমা আর পারল না পিতৃগৃহে টিকতে। গৌতমকে বলল—সে তাকে বিবাহ করতে রাজি আছে, কেবল অবিলম্বেই বিবাহ করতে হবে।

গৌতম তো হাতে চাঁদ পেল। যাকে দেহের প্রতি-অণু দিয়ে চেয়েও পায় নি সে হঠাৎ না চাইতে ধরা দিলে "কেন ধরা দিল" সে নিয়ে মাথা বকায় কে? সে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে রমাকে বরণ করল গদগদ উচ্ছ্বাসে। হেসে বলল: জানো রমা, আমার বাড়িতে সবাই বলছে অপূর্ব জুড়ি মিলেছে—অ্যাপলোর সঙ্গে ভিনাসের মিলন! "গৌতম জানত সে রূপে রমণীমোহন। রমা ম্লান হাসল, মনে মনে: "কী যায় আসে, জুড়ি কেমন—যখন একলা চলার পথ পৌঁচেছে চোরাগলিতে?"

সাতাশ

মনুভাই রমার বিয়ে দিল ঘটা ক'রেই। যৌতুকও দিল প্রচুর। একদিন ককটেল পার্টিও দিল পুনা ক্লাবে শহরের সাহেবসুবো ও নামজাদা বণিকদের নিমন্ত্রণ ক'রে। সবাই একবাক্যে বলল: "হ্যাঁ, একটা বিয়ের মতন বিয়ে দিল বটে মনুভাই কাপাডিয়া।" কেবল কয়েকজন চাপা হেসে বলল: "না দিয়ে করে কি বলো? মেয়েকে ঘরে রাখলে কি আর রঙ্গিণীদের সঙ্গে ঢলাঢলি নাচানাচি করা চলে?'

* * * *

শ্বশুরবাড়িতে এসে রমার দিন কাটে বিষাদে আত্ম-গ্লানিতে। সবাই ওকে মাথায় ক'রে রাখে বটে—তিলোত্তমা তার উপরে ধনীকন্যা—গৌতম তো উচ্ছ্বসিত। এ পার্টি ও-পার্টিতে সুন্দরী বৌকে নিয়ে যায় দর্প- ভরে, বলে বন্ধুদের: "কেমন? বলি নি?"

রমার কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না। বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝেছিল ভুল করেছে। কিন্তু না ক'রেও যে উপায় ছিল না। মনে পড়ে ওর মহাভারতের একটি বিখ্যাত উক্তি—বন্দনা উদ্ধৃত করেছিল গৌরীর অকাল-মৃত্যুর পরে: "দৈবং পুরুষকারেণ কো নিবর্তিতুম্ অর্হতি?" —হাজার চেষ্টা করলেও পুরুষকার দিয়ে ভবিতব্যকে কে খণ্ডাতে পারে! কিন্তু তবু ওর মন যে মানে না,

ধিক্কার দিয়ে বলে: "যাকে ভালোবাসে নি তার শয্যা-সঙ্গিনী হওয়া কি মহাপাপ নয়?"

শেষে ও একদিন প্রহ্লাদকে লিখল মাত্র একটি ছত্র: "আত্মহত্যা করা পাপ কেন?" প্রহ্লাদ শঙ্কিত হ'য়ে বিষ্ণুঠাকুরকে টেলিফোন করল। তিনি বললেন: "রমাকে বলবে—ঠাকুরের বিধান আমাদের মেনে নিতেই হবে—যদি সত্যি যোগ করতে চাই। আত্মহত্যার কথা যেন ভুলেও মনে স্থান না দেয়। যেন আমার কথায় বিশ্বাস রাখে যে ওর দুর্গতি হতে পারে না, পারে না। মহাপুণ্যবতীর মেয়ে ও, তার উপর নিজেও ফুলের মতন নির্মল, নৈবেদ্যের মতন পবিত্র। পাপ ওকে স্পর্শও করতে পারবে না, যদি শুধু ভগবানের কৃপায় বিশ্বাস রেখে তাঁকে ডেকে চলে। ওকে ফের মনে করিয়ে দেবে—যে কথা আমি ওকে বলেছি একাধিকবার—যে বড় আধার ব'লেই তার পরীক্ষাও বড়। আর যত বাধা ততই বিকাশ।

আটাশ

কয়েকমাস বাদে ধ্রুব ফিরে এল জাপান থেকে আমেরিকা ঘুরে। বম্বেতে নেমে প্রথমেই গেল গুরুদেব প্রহ্লাদের কাছে। প্রহ্লাদ খুব খুসি হ'ল তার উৎসাহ দেখে। ধ্রুব বলল—বিলেত থেকে শিখে এসেছে অনেক কিছু—বিশেষ ক'রে প্রকাশের নানা খুঁটিনাটি। কেবল একটা প্রেস কিনতে হবে। তার কাকা তাকে যে-পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ত্রিশ হাজার বিলেতে খরচ হয়েছে—এ দুবৎসর বাকি বিশ হাজার টাকা দিয়ে যদি একটা প্রেস পাওয়া যায় তাহ'লে বইয়ের ব্যবসা ফাঁদতে পারে। কিন্তু এত কম টাকায় কি এযুগে ভালো প্রেস পাওয়া যায়? ধ্রুব শুধালো চিন্তিতস্বরে। প্রহ্লাদ বলল: "ঠাকুরের কৃপায় কী না হয় বাবা?"

সত্যিই যোগাযোগ হ'য়ে গেল অভাবনীয় পথে। নারায়ণ পেঠে যশোবন্ত কোশলকর নামে এক বিপত্নীক নিঃসন্তান প্রকাশকের একটি প্রেস ছিল। তিনি বিষ্ণুঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন দশ বারো বৎসর আগে। প্রতিবৎসরই দুবার ক'রে কাশী যেতেন, ধ্রুবকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ধ্রুব ফিরে এসেছে শুনেই তিনি বিষ্ণুঠাকুরকে লিখলেন যে তিনি বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হ'তে চান—ধ্রুব যদি প্রেস চালায় তবে তার হাতে প্রেসটি দিয়ে বাণপ্রস্থী হবেন কাশীতে গুরুপদাশ্রয়ে। এ দান নয়, গুরুসেবা। তিনি কখনো গুরুর জন্যে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি টাকাকে বেশি ভালোবাসতেন ব'লে। এখন চান সঞ্চিত সব কিছু গুরুচরণে সঁপে দিয়ে কৃপণতার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

বিষ্ণুঠাকুর আশীর্বাদ ক'রে মত দিলেন। মালতীকে বিবাহ ক'রে ধ্রুব মারাঠী প্রকাশকের বাড়িতে এসে বসল। বন্দনা এসে একমাস থেকে মহাউৎসাহে সব গোছগাছ ক'রে দিল ওদের নতুন সংসারের।

তিনতলা পাথরের বাড়ি। নিচের তলায় গুদামঘর ও প্রেস, দোতলায় ধ্রুব মালতীকে নিয়ে থাকত। তিনতলায় একটি বড় হল ঘর, একটি ছোট ঘর—পাশে একটি ছাদ ও ছাদের পাশে একটি কুঠুরি। প্রহ্লাদ এই ঘরটিতে এসে ভজন করেছিল গৃহপ্রবেশের দিন। তার পর বন্দনা এই দুটি ঘরকে চমৎকার ক'রে সাজিয়ে দিল। বড় ঘরটিতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হ'ল—ক্রমশঃ দুশো আড়াইশো ধর্মার্থী আসত প্রহ্লাদের ভজন শুনতে। দীক্ষা নিলও এক এক ক'রে শতাধিক শিষ্য-শিষ্যা। ওর নাম রটল সাধুজি। প্রহ্লাদ দীক্ষা দিলেও 'গুরু' নামে পরিচিত হ'তে কুণ্ঠিত হ'ত, বলত: "আমার গুরু রয়েছেন—আমার এখন সাধু নামই থাক। পরে দেখা যাবে।" পুনায় ওকে মারাঠী গুজরাতী সৌন্ধি কচ্ছী পার্সী সবাই ডাকত "সাধুজি" বলে। কেবল অন্তরঙ্গ কয়েকটি শিষ্য-শিষ্যা ডাকত "গুরুদেব" ব'লে। আমরা এখন থেকে ওকে "সাধুজি" নামেই ডাকব।

(তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত)

বিস্মৃতপ্রায় মহিলা-ঔপন্যাসিক জেন অষ্টিন

সুভাষ সিংহ

১

সাম্প্রতিক কালে অষ্টাদশ শতাব্দীর মহিলা ঔপন্যাসিক জেন অষ্টিন সম্বন্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য আলোচনা চোখে পড়েনি। মিস্ অষ্টিনকে হয়ত আমরা ভুলে গেছি। হয়ত ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র এবং অধ্যাপকেরা সাহিত্যের বিবর্ত্তনবাদ আলোচনা করতে গিয়ে অষ্টিনকে পড়ে, অথবা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করে—তবে সেটা নেহাৎই অ্যাকাডেমিক আলোচনা হয় কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অথচ মিস্ অষ্টিনের উপন্যাসের মধ্যে আমরা শুধু তদানীন্তনকালের লণ্ডনের শহরাঞ্চলের নর-নারীর আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, নাচ-গান এবং প্রেম-অভিমান-সংস্কার ইত্যাদির পরিচয়ই পাই না—পরন্তু জানতে পারি তাদের জীবনের পরম গূঢ় রহস্যের কথা, জানতে পারি তাদের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা, জানতে পারি তাদের চরম হৃদয়াবেগের ব্যাখ্যান, সর্ব্বোপরি জেনেছি তাদের বিত্ত ও অবিত্তের মধ্যে ক্ষমাহীন সংঘাত, আর, আজ যদিও পৃথিবী অনেকটা বদলে গেছে, যদিও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক মূল্যায়ন নূতন সমাজের উপর ভিত্তি করে নূতন করে হচ্ছে, তবুও মিস্ অষ্টিন আমাদের কাছে পুরনো, এক ঘেয়ে হয়নি। কেননা তাঁর লেখার মধ্যে মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় আছে—সে-কারণেই মিস্ অষ্টিন পুরনো হবে না।

কোন লেখক বা লেখিকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা চাই। কেননা একজন লেখকের সমগ্র জীবন তার সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে—একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই মিস্ অষ্টিনকে বুঝতে গেলে তাঁর জীবনের একটা সামগ্রিক রূপ আমাদের মনের পর্দায় স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়া চাই, কেননা এর ফলে তার সাহিত্যকর্ম আলোচনা অনেকটা সহজবোধ্য হবে সাধারণ পাঠকদের কাছে। আমার এই নিবন্ধ পণ্ডিতদের জন্য নয়। পাণ্ডিত্য প্রকাশ করবার মত ধৃষ্টতা আমি করতে চাইনে, তাই সাধারণ পাঠকদের কাছে এই নিবন্ধ উপস্থিত করছি। ইউরোপীয় সমালোচকদের মতে মিস্ অষ্টিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে "প্রাইড্ এণ্ড প্রেজুডিস্" এবং আমার আলোচনা প্রধানতঃ উল্লিখিত রচনাটিকে কেন্দ্র করেই হবে।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জেন অষ্টিন জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের দেশে যেমন অনেকে যুদ্ধের সময়ে হঠাৎ ধনী হয়ে পড়েছিলেন, যদিও আভিজাত্য বলতে যা বোঝা যায় প্রায়শঃই সেটা তাদের মধ্যে ছিল না—মিস্ অষ্টিনের পূর্ব্বপুরুষেরাও অনেকটা সেই ধরণের ধনী ছিলেন। আমরা যে-কালের কথা বলছি, সে কালটা হ'ল ইংরেজ এবং ফরাসীর মধ্যে দারুণ বিদ্বেষের যুগ। আর ঝগড়াটা চলছিল কানাডার পশমকে কেন্দ্র করে; পশমের ব্যবসাটা ছিল তখন বেশ লাভজনক। কিন্তু কয়েক পুরুষ পরে এসে অষ্টিন পরিবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ল। মিস্ অষ্টিনের পিতা জর্জ্জ অষ্টিন সার্জ্জন ছিলেন—যদিও সে-কালে এ' পেশাটা সম্মানিত ছিল না। চ্যাপম্যান ক্লার্কের বক্তৃতা থেকে জানা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে এটর্নী, সার্জ্জন ইত্যাদি পেশাগুলি সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য স্থান পায়নি। পার্সুয়েশাদের মধ্যেও দেখা যায় এটর্নীর প্রতি উঁচুতলার লোকদের বীতশ্রদ্ধভাব।

মিস্ অষ্টিন ছিলেন সবচেয়ে কনিষ্ঠ সন্তান। বড় বোনের নাম ছিল কাসাণ্ড্রা। দুটি বোনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ছিল খুব বেশী। ভাই ছিল ছ'জন। ভাইয়ের মধ্যে

এডওয়ার্ড ছিল ভাগ্যবান। পরবর্ত্তী জীবনে সে স্যার টমাস নাইটের বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছিল দত্তক-পুত্র হিসেবে। আর মিসেস্ অষ্টিনের সাংসারিক অবস্থা যখন অনেক নীচে নেমে এল। এডওয়ার্ড উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া চাউটন অঞ্চলে একটি বাড়ী মাকে উপহার দিল।

সেখানে মিস অষ্টিনের অধিকাংশ জীবন কাটে। তবে শেষের দিকে অসুখের বাড়াবাড়ি হওয়ায় নামকরা ডাক্তারের আশায় উইন্‌চেস্‌টারে যান, সেখানে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

এর আগেই বলা হয়েছে যে, দুটি বোনের মধ্যে মিল ছিল বেশী। কাসাণ্ড্রা যখন স্কুলে ভর্ত্তি হলেন, তখন দিদির সাথে জেনেরও স্কুলে যাওয়া চাই, যদিও তখন তার বয়স খুব কম। অনেকের মত আমারও কৌতূহল ছিল মিস্ অষ্টিন রূপসী হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করেননি কেন? ঐ সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু জানা যায় না। মিস্ অষ্টিনের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একজন বলেছেন—"Her figure was rather tall and slender, her step light and firm, and her whole appearance expressive of health and animation. In complexion she was a clear brunette with a rich colour; she had full round cheeks with mouth and nose small and well-formed, bright hazel eyes, and brown hair forming natural curls round her face."

বড় বোন কাসাণ্ড্রা আরও সুন্দরী ছিলেন। দু' বোনের মধ্যে পত্রের আদানপ্রদান হ'ত এবং মিস্ অষ্টিনের পত্রের মধ্যে সাহিত্যের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। যদিও তাঁর অনেক অনুরাগী পত্রগুলিকে একঘেয়ে, অপাঠ্য বলে বর্ণনা করেছেন—আমার মনে হয়, পত্রগুলো শুধু সুন্দর করে লেখা হয়নি, স্বাভাবিকও বটে। মিস্ অষ্টিন ধারণা করতে পারেননি যে, তার পত্রগুলি পরবর্ত্তী জীবনে সমালোচকদের কাছে প্রভূত প্রশংসা পাবে। কেননা কাসাণ্ড্রা ছাড়া অন্য কেউ যে তাঁর পত্র পড়তে পারে এমন ধারণা তাঁর ছিল না। তা'ছাড়া তাঁর নিজের যা ভাল লাগত তাই লিখতেন কাসাণ্ড্রাকে। নুতন কার সাথে পরিচয় হ'ল, লোকদের আচার-ব্যবহার কেমন, ক'টা পার্টিতে যোগদান করলেন—ইত্যাদি লিখতেন বড়-বোনকে। আর এসব জানবার জন্য কাসাণ্ড্রার ছিল ভারী উৎসাহ।

পত্রসাহিত্য অবজ্ঞার জিনিষ নয়। অনেক লেখকের প্রথম সাহিত্যজীবনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্তিগত পত্রে বা ডায়রীতে পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ যখন শুনলেন যে, স্ত্রীকে লেখা প্রেমপত্রগুলি আগুনে পুড়ে গেছে, তখন তিনি পাগলের মত চিৎকার করে উঠেছেন। তাঁর ধারণা ছিল—পত্রগুলির মধ্যেই সাহিত্য-কর্মের চরম কৃতিত্বের পরিচয় আছে।

মিস্ অষ্টিন পত্রসাহিত্য সম্বন্ধে মতামত দিয়েছেন কাসাণ্ড্রাকে এক পত্রে—"I have now attained the true art of letter writing, which we are always told is to express on paper exactly what one would say to the same person by word of mouth. I have been talking to you almost as fast as I could write the whole of this letter." তাঁর পত্রগুলি ছিল রঙ্গে ভরা। পড়লে হাসি চেপে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তাঁর বিদ্রূপ এবং সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করেনি। পাঠকদের কাছে নমুনা স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করছি :—

"single woman have a dreadful propensity for being poor, which is one very strong argument in form of matrimony."

"I respect Mrs. chamberlayne for being her hair well, but cannot feel a more tender sentiment. His Longbey is like any other short girl with a broad nose and wide mouth, fashionable dress and exposed bosom: Admiral Stanhope is a gentlemanlike man, but then his legs are too short and his tail too long."

মিস্ অষ্টিন নাচ ভালবাসতেন। কাসাণ্ড্রাকে লিখছেন—"There was only twelve dances, of which

danced nine, and was merely prevented from dancing the rest by want of a partner.

"There was one gentleman, an officer of the cheshire, a very good-looking young man, who, I was told, wanted very much to be introduced to me, but as he did not want it white enough to take much trouble in effecting it, we never could bring it about."

মিস্ অষ্টিনের সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল। বিস্ময়কর হিউমারবোধ থাকায় অপরকে সহজেই হাসাতে পারতেন। যদিও সব সময় তাঁর ব্যঙ্গ নির্দ্দোষ ছিল না। মাঝে মাঝে কষাঘাত যে করতেন না এমন নয়। মানুষের অস্বাভাবিকতাকে, তাদের ভাণকে, তাদের কপটতাকে ও তাদের স্নেহকে তিনি পর্য্যবেক্ষণ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে ব্যঙ্গ করেছেন। আর আশ্চর্য্য বলতে হবে—লোকে তাঁর কষাঘাতে যতটা না বিরক্তিবোধ করেছেন, তার চেয়ে উপভোগ করেছেন বেশী। এখানেই অষ্টিনের বৈশিষ্ট্য! এ' প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই ডিকেন্সের নাম মনে পড়ে। ডিকেন্সের ব্যঙ্গ বাস্তববোধকে অতিক্রম করে যেত। তাই তার সৃষ্ট চরিত্র শেষ পর্য্যন্ত ক্যারিকেচার হয়ে দাঁড়াত। মূলতঃ এখানেই মিস্ অষ্টিনের সাথে ডিকেন্সের রচনা-বৈশিষ্ট্যের তফাৎ।

মিস্ অষ্টিনের মধ্যে নির্ম্মমতা ছিল কম। সেখানে অনাবিল আনন্দের খোরাক ছিল বেশী। মানুষের চরিত্রকে তিনি আঘাত করেছেন কিন্তু তাকে সস্তা ভাঁড় করে তোলেননি।

আগেই বলা হয়েছে যে, মিস্ অষ্টিনের পর্য্যবেক্ষণবোধ ছিল অনন্য। তুচ্ছতম ঘটনাও তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। পরবর্ত্তী জীবনে যখন তিনি ও কাসাণ্ড্রা বড়লোক ভাই এডওয়ার্ডের কাছে মাঝে মাঝে থাকতেন তখন সেই পরিবেশের কপটতা, ছলনা তাকে ব্যথিত করত। এ' পরিচয় তার অনেক উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। তথাকথিত সোসাইটি-মহিলারা যদিও মিস্ অষ্টিনকে ভালবাসতেন, তবু তাঁর আচার-ব্যবহারকে অথবা ডিনার টেবিলের আলাপকে যথোচিত মার্জ্জিত বলে মনে করতেন না। এখানে সেই বিত্ত ও অবিত্তের মধ্যে চিরাচরিত ব্যবধানের প্রশ্ন। সোসাইটি মহিলারা মনে করতেন দুটি বোন সুন্দর, ভাল, বাধ্য—কিন্তু যুগোপযোগী নন! দু'টি বোনকে গেঁয়ো ব'লে মনে করতেন। এর কারণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা গ্রামে বাস করতেন, শহরের সাথে অর্থাৎ লণ্ডনের উদ্দাম জীবনের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, এরা ছিলেন শহরের লোকদের ভাষায় অমার্জ্জিত; আর এক শ্রেণীর লোক—যারা বছরের কিছুটা সময় লণ্ডন শহরে কাটাতেন, শহর সভ্যতার সাথে ছিল যাঁদের ঘনিষ্ট পরিচয়, তাঁরা বাকী সময়টা গ্রামে থাকতেন। চেষ্টা করতেন গ্রাম্য জীবনের মধ্যে নাগরিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে। এরা ছিলেন তথাকথিত সুমার্জ্জিত, ধনবান শ্রেণীর লোক। এদের যোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন "প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিসের" বিংলে পরিবার। আর প্রথম দলের মুখপাত্র হলেন বেনেট পরিবার। যদিও বেনেট পরিবার সামাজিক মর্য্যাদায় অষ্টিন পরিবার থেকে একধাপ উচুতে ছিলেন; যেহেতু মিঃ বেনেট ছিলেন ছোটখাট একজন জমিদার, আর মিঃ অষ্টিন ছিলেন নেহাৎই গ্রাম্য বিত্তহীন শ্রেণীর লোক।

অষ্টিন পরিবার ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে তারা পুরো সচেতন ছিলেন। তাই বিংলে পরিবারের মত কোন ধনবান শ্রেণীর সংস্পর্শে এলে নিজেদের মনকে গুটিয়ে রাখতেন, তখন তাদের মনোভঙ্গীটা হয়ে উঠত বিদ্রূপাত্মক। তখন তারা তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতেন।

মিস্ অষ্টিনের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, সাংসারিক কাজকর্ম্ম নিজেরাই করতেন, চাকর রাখার মত অবস্থা তাদের ছিল না। আর চাকর থাকলেও রান্নার কাজ তাদের দিয়ে করাতেন না। এর পরিচয় পাই মিস্ অষ্টনের প্রথম জীবনীকার লীর রচনা থেকে—"...that less was left to the charge and discretion of servants, and more was done, or superintended by the master and mistresses, with regard to the mistresses they took a personal part in the higher branches of cookery." এর থেকে বোঝা যায় অষ্টিন ভগ্নীদ্বয়ের গৃহকর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল। কোন ভাণ তাদের মধ্যে ছিল না। তাই ভাণকে

মিস্ অষ্টিন ব্যঙ্গ করতে ছাড়তেন না। তাদের জীবন ছিল স্বাভাবিক। তদানীন্তন কালে লণ্ডনের শহরাঞ্চলে এমনি বহু পরিবার শান্ত, সুন্দর, স্বাভাবিক জীবন কাটিয়েছেন। তাদের আনন্দের একমাত্র উপকরণ ছিল নাচ। ধনী প্রতিবেশীর বাড়ীতে নাচের আয়োজন প্রায়ই হত—সেখানে অষ্টিন পরিবারের মত অনেকেই নাচের আসরে যোগদান করতেন। অতএব এমনি সুস্থ অনুকূল পরিবেশের মধ্যে যে, উত্তরকালে ঔপন্যাসিক হিসেবে মিস্ অষ্টিন খ্যাতিলাভ করবেন এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই।

মিস্ অষ্টিন অপেক্ষাকৃত কম বয়সে নাচগান, সুদর্শন-যুবকদের সাথে প্রেমের অভিনয় করতে ভালবাসতেন। স্বাভাবিকতা বলতে যা কিছু সবই তার মধ্যে ছিল। তাঁর জীবন ছিল সরল। তাঁর জগৎ ছিল সীমিত। নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই যে-জীবন সম্বন্ধে কিছু জানতেন না, সেই জীবন নিয়ে কিছু লেখেননি। ফ্যাণ্টাসীর প্রতি তার কোন মোহ ছিল না, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাননি। তার সমগ্র সাহিত্যকর্ম নিখুঁত বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মিস্ অষ্টিনের পড়াশুনা অগভীর নয়। ডাঃ চ্যাপমানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, থ্যানি বার্ণে, মিস্ এজওয়ার্থ এবং মিসেস র‍্যাডক্লিপের উপন্যাস তাঁর প্রিয় ছিল। গ্যেটেও পড়েছেন অনুবাদের মাধ্যমে। কিন্তু শুধু উপন্যাস পাঠ নয়, কাব্য ও নাটকের প্রতি তার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, সেক্সপীয়র ছিল তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে। আধুনিক কবিদের মধ্যে স্কট, বায়রণকে পড়েছেন, যদিও সবচেয়ে বেশী মনকে দোলা দিয়েছে কাউপারের কবিতা। মোটকথা তাঁর ছোট্ট আবেষ্টনীর মধ্যে যে-বই পেয়েছেন, তাই পড়েছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তার সমান অনুরাগ ছিল।

ধর্ম্মের প্রতি মিস্ অষ্টিনের যেমন উৎকট মোহও ছিল না, তেমনি গভীর অনাগ্রহও ছিল না। তবে কী মনোভাব পোষণ করতেন ধর্ম্মের প্রতি—তার একটা মনোজ্ঞ বিবরণ ডাঃ চ্যাপমান দিয়েছেন,—"Just as we take a bath every day and wash our teeth every morning and only feel at ease if we have done so, so I should think, Miss Austin like most others of her generation, having with proper inaction preferred her religious duties, put away the matter with which religion is concerned as one puts away an article of clothing one does not for the moment want, and, for the rest of the day and week, gave her whole mind with an untroubled conscience to secular affairs."

২

মিস্ অষ্টিনের ব্যক্তিগত জীবনের কিছুটা পরিচয় দেওয়া গেল। তাঁর যুগ, তাঁর পরিবেশ, তাঁর ধর্ম্মবোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা এতক্ষণ পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছি। অনেকেই হয়ত মনে করতে পারেন যে, তার সাহিত্যকর্ম আলোচনাতে ব্যক্তিগত জীবনের আলোকপাত কী বেশী হয়ে গেল না? সবিনয়ে বলব, তা হয়নি। কেননা উত্তরকালে মিস্ অষ্টিনের সাহিত্যকর্ম্মের পিছনে যে তাঁর সমাজ, তাঁর পরিবেশ, তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপক প্রভাব ছিল একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এবার আমরা তাঁর রচনাশৈলীর আলোচনা করব। যদিও পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, মুখ্যতঃ "প্রাইড্ এণ্ড প্রেজুডিসই" আমাদের আলোচ্য বিষয়, তবু সেইসঙ্গে অন্যান্য উপন্যাস সম্বন্ধে দু'একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়বে একথা বলাই বাহুল্য। তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনা করতে গেলে একই লেখকের বিভিন্ন বই সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

শিল্প সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কী—এ-নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। সমালোচকরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। অস্কার ওয়াইল্ড বলেন যে, শিল্পসৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের মনে সৌন্দর্য্যের বিকাশ সাধন করা। আবার অনেকে বলেন যে, সাহিত্যে সুন্দর-অসুন্দর দুই থাকবে—নির্ব্বিশেষে কোন একটা বিশেষ মতকে গ্রহণ করলে চলবে না। নিছক আনন্দদানই ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য কি না, এবিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যদি ধরে নেওয়া যায়, আনন্দদান পাঠকের মনে সংক্রামিত করাই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য, তা হলে মিস্ অষ্টিন পাঠকদের সে চাহিদা ভালভাবে পূরণ করেছেন। বস্তুতঃ তার উপন্যাস পাঠে

আমাদের হৃদয়মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। একথা সত্যি যে, 'ওয়র এণ্ড পীস্' বা ব্রাদার কারামাজোভ-এর মত কোন উপন্যাস তিনি লিখতে পারেননি। তবু সীমিত দৃষ্টি ভঙ্গীর সাহায্যে যা লিখেছেন, তা ইংরেজী সাহিত্যের এক চরম সম্পদ হয়ে রয়েছে।

মিস্ অষ্টিনের যুগে মেয়েদের সাহিত্য টাহিত্য করাটা যেন বিশেষ নিন্দনীয় ছিল। মঙ্ক লিউস্ এ-সম্বন্ধে বলেছেন—"I have an aversion, a pity and contempt for all female scribblers the needle, not the pen, is the instrument they should handle and the only one they ever use dexterously. তাই মিস্ অষ্টিন লিখতেন অতি সন্তর্পণে—যেন কেউ দেখতে না পায়। নিজের সাহিত্য সাধনা চলত অতি নিভৃতে। স্যার ওয়াল্টার স্কট কী বলেন শোনা যাক্,—"She was careful that her occupation should not be suspected by servants or visitors or any person beyond her family party" লেখার সময় দরজায় সামান্যতম আওয়াজ পেলেও তিনি তাড়াতাড়ি পাণ্ডুলিপি লুকোতেন, পাছে তাঁর এই গোপন সযত্নলালিত সাহিত্য সাধনা অন্য কারুর চোখে পড়ে। নিজের সৃষ্টির পিছনে এই সঙ্কোচ থাকার জন্য মিস্ অষ্টিনের প্রথম উপন্যাস "সেন্স এণ্ড সেন্সিবিলিটি" স্বনামে প্রকাশ হয়নি। টাইটেল পেজে লেখা থাকে—কোন এক মহিলার দ্বারা। যদিও এটা তাঁর প্রথম উপন্যাস নয়। প্রথম একটা বই লিখেছেন—নাম 'ফার্ষ্ট ইম্প্রেসান'। দুভার্গ্যক্রমে বইটি অপ্রকাশিত, প্রকাশকেরা ছাপাতে রাজী হননি। বইটা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে লেখা সুরু হয়। শেষ হয়েছিল এক বছর পরে অর্থাৎ আগষ্টের ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। অনেকের ধারণা এই বইটির পরিবর্ধিত রূপ নেয়, প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস্ নামে ষোল বছর পরে। এ' সময়টা মিস্ অষ্টিন পর পর দুটো উপন্যাস লেখেন: সেন্স এণ্ড সেনসিবিলিটি নরদানগ্যার-এ্যাবী। যদিও এর একটিও সাহিত্যক্ষেত্রে সাফল্য আনতে পারেনি। অবশ্য পাঁচ বছর পরে কোন এক রিচার্ডক্রস্বী শেষের উপন্যাসটি অর্থাৎ নরদানগ্যার এ্যাবী দশ পাউণ্ড দিয়ে কেনেন। তিনিও বইটি ছাপেননি, অন্য কোন প্রকাশককে বিক্রী করেছেন।

তিনি কী করে বুঝবেন যে, আজ যে উপন্যাস-লেখিকার প্রতি অবিচার করছেন, ভবিষ্যতে তাঁর নাম পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে। তাঁর এ দূরদৃষ্টি ছিল না। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ অষ্টিন 'নরদানগ্যার এ্যাবী' লেখেন। এর পর এগার বছর অর্থাৎ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তার লেখনী স্তব্ধ থাকে। এই স্তব্ধতার যুগ সম্বন্ধে সমালোচকবৃন্দ বহু বিচিত্র ব্যাখ্যা পাঠকের কাছে পেশ করেছেন। এই যুগে মিস্ অষ্টিন ভালবাসা নামক রোগে জড়িয়ে পড়েছেন, এমনি ধারণা যে অনেকে করেছেন তা বলাই বাহুল্য। মানুষের জীবনে প্রেম যখন আসে, তখন সে আর অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করতে পারে না। প্রেম আসে বন্যার মত, জীবনের দু'কূলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কোন বন্দরে থমকে দাঁড়াবার উপায় নেই। অষ্টিনের জীবনে হয়ত সে প্রেম এসেছিল—তাই তাঁর সাহিত্য সাধনা তখন স্তব্ধ।

মিস্ অষ্টিনের জীবনে প্রেম হয়ত এসেছিল। সে প্রেম হয়ত বা একতরফা অর্থাৎ অনেকে প্রেম নিবেদন করেছেন, আর মিস্ অষ্টীন গভীর অনিচ্ছায় মুখ ফিরিয়েছেন। নিজের জীবনে প্রেমের গভীর চাঞ্চল্য অনুভব করতে পারেননি। সে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসের নায়িকার চরিত্রে। তাঁর উপন্যাসের নায়িকারা গভীরভাবে কাউকে ভালবাসতে পারেনি। তাঁদের ভালমন্দ বোধ যেন ছকবাঁধা অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। প্রেম বলতে যা বোঝা যায় তার সাথে কোন আপোষের সম্বন্ধ নেই। হিসেব নিকেশ করে ভালবাসা যায় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ "পরসুয়েসান" এর কথাই ধরা যাক নায়িকা অ্যান ইলিয়ট একজন নৌ বিভাগের কর্ম্মচারী ওয়েণ্টওয়ার্থকে ভালবাসে। দু'জনের মধ্যে বিয়ে হবে ঠিক হ'ল। কিন্তু তা' হ'ল না। কেননা উপন্যাসের আর এক চরিত্র, লেডী রাসেল, যার কাছে প্রেম ছেলেখেলা যার দৃষ্টিবোধ স্থুল, সে বাধা দিল অ্যান ইলিয়টকে। (বোকাল ওয়েণ্টওয়ার্থকে বিয়ে করে লাভ নেই। কার একজন বিত্তহীন লোককে বিয়ে করার চেয়ে অপেক্ষা ক ভাল। ভাল শাঁসালো পাত্র জুটতে কতক্ষণ! অ্যা ইলিয়ট প্রত্যাখ্যান করল ওয়েণ্টওয়ার্থকে—এই হ নায়িকার ভালবাসা! নায়িকার মধ্যে যদি প্রেমের জী

আবেগ থাকত, যে আবেগকে স্তাঁদাল আখ্যা দিয়েছেন অদম্য প্রেম নামে, তবে নায়িকা শত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করেও ব্যবসায়ীসুলভ দেনাপাওনার হিসেব না কষে, প্রিয়তমের গলায় জয় মাল্য পরাত।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ এগার বছর ছিল মিস্ অষ্টিনের শুষ্কতার যুগ এবং এই যুগে তার সৃষ্টিশীল বন্ধ্যাত্বের কারণ সম্বন্ধে সমালোচকদের মতবাদও শুনলাম। তবে যতদূর জানা যায়,এ যুগটায় তার লেখনী বন্ধ থাকার অন্যতম কারণ হ'ল নিজের ক্ষমতার প্রতি সন্দিহান হওয়া, পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য প্রকাশক না পাওয়া—যদি ও তাঁর লেখার ভক্তের অভাব ছিল না। এদের স্তাবকতায় মিস্ অষ্টিনের মন ভরত না। শিল্পীমনের অতৃপ্তিবোধ তাঁকে যেন পীড়ন করত। খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকেরা—যেমন স্তাঁদাল, বালজাক, ডিকেন্স, টুর্গেনিভ, টলষ্টয় এবং থ্যাকারে—এরা প্রত্যেকেই তাদের আপন সমাজের মধ্যে বিভিন্ন টাইপ চরিত্রের প্রতিরূপ খুজে পেয়েছেন, যার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁদের বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে। মিস্ অষ্টিন সম্বন্ধেও একথা খাটে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে চাউটন অঞ্চলে থাকাকালীন মিস্ অষ্টিন তাঁর পুরনো পাণ্ডুলিপির প্রতি নজর দেন। তখন তার কাছে থাকত মা ও বড় বোন। চাউটনের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য তাকে যেন অনুপ্রেরণা দিত। ২ বছর কাটল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে "সেন্স এণ্ড সেন্সিবিলিটি" প্রকাশ হ'ল, সাহিত্যিক উৎকর্ষতার পরিচয় পেলেন অনেকেই উপন্যাসটির মধ্যে। মহিলা লেখিকা হিসেবে তখন আর কেউ মিস্ অষ্টিনকে অবজ্ঞার চোখে দেখল না। ততদিনে নারী জাগরণ সুরু হয়েছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল। লিজা ফে নাম্নী এক মহিলা ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মিস্ অ নের চিঠিপত্রের সম্পাদনা করে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু নারী-বিদ্বেষী প্রকাশকদের কাছ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় তার ইচ্ছা আর পূর্ণ হয়নি। এই মহিলাই আবার ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মহিলা লেখিকাদের প্রতি জনসাধারণের ধারণা কেমন ছিল তার সুন্দর পরিচয়ে বললেন, "Since then a considerable change has gradully taken place in public sentiment and its development, we have now not only as in former days a number of women who do honour to their sexes literary characters, .."

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মিস্ অষ্টিনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে "প্রাইড্ এণ্ড প্রেজুডিস" প্রকাশ হয়। মাত্র একশ দশ পাউণ্ডের বিনিময়ে বইটির কপিরাইট বিক্রী করেন। এরপর তিনখানা উপন্যাস লেখেন: ম্যান্সফিল্ড পার্ক, এমা এবং পারসুয়েশান। সাহিত্য ক্ষেত্রে তার খ্যাতি স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত লেখক সমালোচকের দল মিস্ অষ্টিনের সাহিত্যকে অভিনন্দন জানান। স্যার ওয়াল্টার স্কটের মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,—"That young lady had a talent for describing the involvements, feelings and charaters of ordinary life which is to me the most wonderful I have ever met with,... .."

মিস্ অষ্টিনের বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণবোধ ছিল অনন্য। তাঁর হিউমার-বোধের তুলনা নেই। এই হিউমার-বোধ তাকে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছিল জগৎ এবং জীবনকে দেখবার, অনুভব করবার। যদিও তাঁর জগৎটা ছিল সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ উপন্যাসের চরিত্রগুলো যেন একে অন্যের ছায়া। একই চরিত্র যেন অন্য চরিত্রের প্রতিবিম্ব। তাঁর চেনাশুনার পরিধি সীমিত হ'লেও তিনি এর যথাযথ পরিচয় দিয়েছেন। তার নিজের জীবন আবর্তিত হয়েছে লণ্ডনের শহরাঞ্চলের নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর। এর মধ্য থেকেই তিনি নায়কনায়িকা সংগ্রহ করেছেন। এদের জীবনযাত্রা ছিল তার নখদর্পণে, এদের ধ্যান ধারণা তার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি যা উপলব্ধি করেছেন, যাদের গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন, তাহাই স্থান পেয়েছে তার সাহিত্যে! সাহিত্যের দরবারে সৌখিন মজদুরি করেননি যাদের জানতেন না তাদের নিয়ে মাথা ঘামাননি এবং আমাদের মনে হয় এমনি সংযমের অধিকারী হওয়া যে-কোন লেখকের পক্ষে চরম কৃতিত্বের বিষয়।

মিস্ অষ্টন এমন একটা যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন যে, যার ভূমিকা ইতিহাসে বিশ্ববিশ্রুত! পৃথিবীর

যুগান্তরকারী চমকপ্রদ ঘটনা তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছে। ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ানের উত্থানপতন, ফরাসী বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম—মিস্ অষ্টিনের সাহিত্যে এসব ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনাবলীর ছাপ দেখতে না পেয়ে আজকের যুগের পাঠকেরা স্বভাবতই হতাশ হবেন। কিন্তু আমরা যদি লেখিকার যুগে ফিরে যাই তবে দেখতে পাব যে, সে-যুগে মহিলারা রাজনীতি করতেন না। কেন না রাজনীতিটা সেকালে পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে তার জন্য এমন ধারণা যেন না করি, যেহেতু মিস্ অষ্টিন তার সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কোন পরিচয় উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেননি, সেই হেতু উল্লিখিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন।

আসল কথা হ'ল তিনি ইচ্ছে করেই এসব এড়িয়ে গেছেন। সমসাময়িক ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করে রচিত সাহিত্য বেশীদিন বেঁচে থাকে না। এটা তিনি জানতেন। তাই যা ক্ষণস্থায়ী তার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। সেই জন্যই তাঁর উপন্যাস আজও আমরা পড়ি।

অধিকাংশ ঔপন্যাসিক জনচিত্তে বেশীদিন বেঁচে থাকেন না। জনসাধারণের ভালমন্দ বোধটা একটু অদ্ভুত ধরণের। আজ যাকে মাথায় নিয়ে নাচে, কাল তাকেই পথের ধুলোয় ফেলতে দ্বিধাবোধ করে না। আসল বিচারক হচ্ছে মহাকাল। তাঁর দরবারে টিকতে পারলেই হ'ল। মিস্ অষ্টিন বিস্মৃতপ্রায় লেখিকা হলেও এখনও তাকে আমরা পড়ি। আর তাঁর উপন্যাস আমাদের প্রভূত আনন্দ দেয়। যে আনন্দটাকে আমরা সহজেই হৃদয়ে অনুভব করতে পারি! তাঁর লেখায় একাধারে মননশীলতা, অন্যদিকে হৃদয়বেত্তার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ রয়েছে।

প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক গারোড বলেন যে, মিস্ অষ্টিন গল্প লিখতে জানতেন না। তার মানে তিনি বলতে চান একটি নিটোল রোমান্টিক অথবা অসাধারণ গল্প বলতে যা বোঝায়, যেখানে ঘটনার পরস্পর সংলগ্নতা থাকবে, এমনি ধরণের গল্প মিস্ অষ্টিন লিখতে পারেননি। তিনি তা চাননি। তাঁর হিউমারবোধ ছিল অসাধারণ, তেমনি প্রশংসনীয় ছিল তার ইন্দ্রিয়বোধ। তিনি রোমান্টিক মনের অধিকারী ছিলেন, অসাধারণের চেয়ে সাধারণের প্রতি তাঁর নজর ছিল বেশী। বরং সাধারণকে অসাধারণ করে তুলতেন তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের সাহায্যে। গল্প বলতে আমরা বুঝি একত্র ও পরস্পরসংযোজিত ঘটনাবলী; সেখানে ঘটনার আরম্ভ, ঘটনার মধ্যভাগে আসা এবং পরিশেষে ঘটনার সুষ্ঠু যবনিকা। "প্রাইড্ এণ্ড প্রেজুডিস" সঙ্গতভাবেই সুরু হয়েছে। প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায় এলিজাবেথ ভগ্নীদ্বয়ের প্রতি দু'জন তরুণ বিত্তবান যুবকের প্রমত্ত ভালবাসা, আর এটাই উপন্যাসের আরম্ভ। শেষ হ'ল তাদের পরস্পরের বিবাহকে কেন্দ্র করে এবং এটাই হচ্ছে উপন্যাসের পরম্পরাগত মধুর যবনিকা। এই ধরণের যবনিকার প্রতি তার্কিকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব এসেছে। যদিও এটা ঠিক—অধিকাংশ বিবাহের পরিণতি সুখময় হয় না এবং বিবাহেই কোন কিছুর চরম পরিণতি হয় না, বরং বিবাহটা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সিঁড়িতে ওঠবার একটা সিঁড়িমাত্র! অনেক লেখক তাদের উপন্যাসে বিবাহের পরবর্ত্তী সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করেন। তাঁদের উপন্যাস বিবাহোত্তর জীবনের নানা সমস্যায় আলোকপাত করে। এক শ্রেণীর পাঠক আছে যারা নায়ক নায়িকার বিয়ে হ'লে আর কিছু চায় না। বিশেষ করে "প্রাইড্ এণ্ড প্রেজুডিসের" নায়ক-নায়িকার মিলন পাঠকদের কাছে আরও কাম্য একারণে যে, নায়িকা বিবাহের পর স্বামীগৃহে বেশ সুখেই থাকতে পারবে, যেহেতু নায়কের সামাজিক মর্য্যাদা আছে, নায়কের নিজস্ব বাড়ী গাড়ী সবই আছে। আমরা বাস্তব জীবনে অনেক কিছু করতে চাই, অনেক কিছু হ'তে চাই, কিন্তু তা' আর হয়ে ওঠে না, আমাদের বাসনা অচরিতার্থ থাকে। তাই কল্পিত কাহিনীর মাধ্যমে আমরা নায়ক-নায়িকার সম্ভাবনাময় জীবন দেখে আনন্দিত হই। পাঠকের মনে এমনি ধরণের আনন্দ সৃষ্টি করাই সৎ-সাহিত্যের লক্ষণ।

গঠনরীতির দিক থেকে "প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস" অতুলনীয়। একটার পর একটা ঘটনা সম্ভাব্য পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। পাঠকের মনে কখনও ঘটনার সম্ভাব্যতা নিয়ে সংশয় জাগেনি।

চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়েও মিস্ অষ্টিনের নৈপুণ্য আছে। অনেকের ধারণা এলিজাবেথ চরিত্রটি লেখিকার নিজের। এলিজাবেথের মধ্যে যে-ধরণের সজীবতা, উৎফুল্লতা, সাহস, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতির অপূর্ব সমাবেশ আমরা দেখেছি, তাতে চরিত্রটি যে লেখিকার অত্যন্ত প্রিয় এবং সেই কারণেই নিজের, এমনি ধারণা করা বোধহয় একেবারে অন্যায় হবে না। তা'ছাড়া স্বাভাবিকও বটে। স্বাভাবিক এ কারণে যে, তার নিজের জীবনের বহুবিধ ঘটনা ও আচরণের সাথে এলিজাবেথ-চরিত্রের নিবিড় মিল আছে। তেমনি জেন বেনেট চরিত্রের সাথে কাসাণ্ড্রার মিল যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তাতেও আশ্চর্য্যের কিছু নেই। আসল কথা হ'ল, যেহেতু সাহিত্য জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে, কখন কখনও লেখকের আত্মজীবনও বটে, সেই হেতু লেখকমানসের বিভিন্ন প্রবণতা চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। "প্রাইড্ এণ্ড প্রেজুডিসের" ক্ষেত্রেও সেই লেখকমানসের বিভিন্ন প্রবণতা আমরা দেখতে পাই। নায়ক ডার্সি চরিত্রের সবচেয়ে বিশেষত্ব হ'ল এই যে, তার সমগ্র চরিত্রটা অহঙ্কারবোধের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। আর এই অহমিকাবোধ এসেছে সামন্তসুলভ মনোভাব থেকে। এই অহমিকাবোধ তার চরিত্রের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে বলেই মিস্ অষ্টিন সেখানে নাটকীয়ভাব সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছেন। ডার্সি চরিত্রের কতগুলো বিশেষ প্রবণতা আছে। প্রথমতঃ তিনি আভিজাত্যবোধের জন্য হোক বা অহমিকা বোধের জন্য অথবা অর্থকৌশলী থাকার জন্যই হোক—কোন অপরিচিতার সাথে অন্তরঙ্গ হ'তে অনিচ্ছুক; যদিও তাঁর ও এলিজাবেথের সাথে নিছক ভদ্রতার খাতিরেও পরিচয় হয়েছে। এলিজাবেথ সেই ক্ষীণ পরিচয়ের সূত্র ধরে নাচের পার্টনার হিসেবে ডার্সিকে আমন্ত্রণ জানায়। ডার্সি তার অহমিকাবোধ নিয়ে পিছিয়ে যায়। তারপর অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ বিংলের কাছে এলিজাবেথ সম্বন্ধে একটু অপমানজনক কথাই বলে—আর দুর্ভাগ্যক্রমে এলিজাবেথের কানে সে রূঢ় ভৎসনাগুলো যেন তপ্ত-সীসার মত এসে আঘাত করে। তারপর সুরু হয় দুজনের মধ্যে প্রেমের সূত্রপাত—যদিও তাঁর বহিরঙ্গটা কখনও কখনও একটু বা ঝাঁজালো, কটুরসে আপ্লুত। ডার্সি যেদিন তার অর্থ কৌলীন্য ও অহমিকাবোধ ত্যাগ ক'রে প্রকৃত প্রেমিকের মত এসে দাঁড়িয়েছে, সেদিন এলিজাবেথ তাকে অস্বীকার করতে পারেনি। ডার্সি চরিত্রের ক্রম-বিবর্তন অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন মিস্ অষ্টিন। অনেকের কাছে লেডী ক্যাথারিণ ও মিঃ কলিন্সের চরিত্র অস্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে হ'তে পারে। কিন্তু তা' হয়নি। কমেডি জীবনকে একটু তরলচোখে দেখে; সেখানে কল্পনার ঠাস বুনোনি থাকলেও থাকতে পারে, তাই প্রয়োজনবোধে চরিত্রের উপর রংয়ের প্রলেপ একটু বেশী পড়লেও ক্ষতি নেই। চরিত্র তাতে অনেক সময় জীবন্ত হয়ে ওঠে। লেডী ক্যাথারিণ সম্বন্ধে বলতে গেলে মনে রাখতে হবে যে, মিস্ অষ্টিনের যুগে পদমর্য্যাদা মানুষের মনে আত্মগরিমা এনে দিত, আর সেই অহমিকার রঙ্গীণ চোখে তাঁরা তাঁদের চেয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নীচু লোকদের অনুকম্পার চোখে দেখতেন, কখনও কখনও অবজ্ঞা, ঘৃণা যে না করতেন এমন নয়। আজকের যুগেও আমাদের সমাজে লেডী ক্যাথারিণের মত নারীচরিত্র খুজে পাওয়া যায়।

মিস্ অষ্টিনের লেখায় আমরা ভঙ্গী-সর্ব্বস্বতার পরিচয় পাই না। তাঁর লেখনী আন্তরিকতাকে ছাপিয়ে ভঙ্গী-প্রধান হয়ে উঠেনি। তিনি তাঁর রচনায় ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করেছেন। তৎকালীন লণ্ডনের শহরাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে-ধরণের ঘরোয়া ইংরেজী ভাষা চালু ছিল—মিস্ অষ্টিন সেই ভাষাকে তার সাহিত্যে স্থান দেননি।

তাঁর সংলাপ রচনার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। যদিও আজকের যুগের পাঠকের কাছে তেমনি সংলাপ কিছুটা জোলো মনে হতে পারে। কেননা নায়ক-নায়িকারা যে ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেছে, সেটা যেন অত্যন্ত ভদ্রগোছের, যেন তাদের সব সময় সজাগ দৃষ্টি কথাবার্তার মধ্যে ব্যাকরণগত কোন ভুল না হয়। যেহেতু এই ধরণের নর-নারীরা শিক্ষিত ছিলেন, সুতরাং তাদের আচার ব্যবহার, কথাবার্তা, আচরণ প্রভৃতি তথাকথিত আভিজাত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, এমনি মনোভাব আজকের যুগের পাঠকদের কাছে খুব বেশী প্রীতিপ্রদ হবে না।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, মিস্ অষ্টিন যদিও তার সৃষ্ট নায়কনায়িকার মুখ দিয়ে কিছুটা বা কৃত্রিম কথাবার্তা প্রকাশ করেছেন, তবুও অ্যানের মুখ দিয়ে একসময় অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ কথা বলিয়েছেন। উপন্যাসের এক চরিত্র অ্যান এক সময় হেসে বলেছে,—"My idea of good company, Mr, Elliot, is the company of clever well-informed people who have a great deal of conversation that is what I called good company." মিঃ এলিয়টের উত্তরও সমান উপভোগ্য—"You are mistaken. That is not good company, that is best,"

মিঃ এলিয়টের চরিত্রের অনেক দোষ আছে—অন্ততঃ মিস্ অষ্টিন তাই দেখিয়েছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি এত সুন্দর ও বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দিতে পারে, তাঁর চরিত্রের অসঙ্গতি দেখিয়ে লেখিকা আমাদের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। আমরা আরও খুশী হতাম যদি অ্যান স্কুল ক্যাপ্টেন ওয়েন্টওয়ার্থকে বিয়ে না করে মধুরভাষী মিঃ এলিয়টকে বিয়ে করত।

মিস্ অষ্টেনের সাহিত্যকর্মের আরও একটা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করছি। সে দিকটা হল তার পড়াশুনার গভীরতার দিক। অনেক প্রখ্যাত লেখকের চেয়েও তাঁর পড়াশুনা গভীর ছিল। যদিও এটা ঠিক—পাণ্ডিত্য আর প্রতিভা এক জিনিষ নয়। একটা জন্মগত, অন্যটা চর্চা সাপেক্ষ। মিস্ অষ্টিন জীবনের সরল সোজা দিকটা দেখেছেন। গার্হস্থ্য জীবনের প্রেম, দুঃখ, অভিমান নরনারীর মনের মধ্যে কী গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে—সে পরিচয় পাই "প্রাইড্ এণ্ড প্রেজুডিস্" প্রভৃতি উপন্যাসে। আজও তার কোন উপন্যাস পড়তে বসলে, রচনার স্বাভাবিক গতি আমাদের শেষ পাতা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। আর বই পড়বার পর এক অনাস্বাদিত পুলকে আমাদের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। যিনি পাঠককে তার রচনার দ্বারা এমনি করে মুগ্ধ করতে পারেন, তাঁর সাহিত্য যে জনচিত্তে চিরকালীন সৌন্দর্যের অক্ষয় ভাণ্ডার হিসেবে বেঁচে থাকবে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

উপসংহারে একটা কথা বলি—যদিও তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা যত বেশী আধুনিক হচ্ছি, ততবেশী প্রাচীন শিল্প সাহিত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হচ্ছি। প্রগতির মানে যদি অতীতকে ভুলে যাওয়া হয়। অতীতের সংস্কৃতিকে আজ দূরে অবজ্ঞায় ঠেলে দেওয়া হয়, তবে এমনি প্রগতি আমাদের জাতীয় জীবনের শিল্প,সাহিত্য, সংস্কৃতিকে কতদূর উন্নত করবে সে বিষয়ে আজ আমাদের চিন্তা করবার সময় এসেছে। অতীতকে বাদ দিলে বর্ত্তমানের কোন অস্তিত্বই থাকে না। কেননা বর্ত্তমানের যা কিছু উৎকর্ষ আমরা দেখতে পাই—তার পটভূমি অতীতের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পরিশেষে বক্তব্য আধুনিক সাহিত্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ থাকবে এটা সত্যি। তেমনি সেই সঙ্গে প্রাচীন ক্লাসিকাল বা চিরায়ত সাহিত্যের প্রতিও আমাদের পক্ষপাতহীন অনুরাগ থাকা একান্ত দরকার। *

* আলোচ্য প্রবন্ধটি সমরসেট মমের প্রবন্ধের অনুসরণে লিখিত।
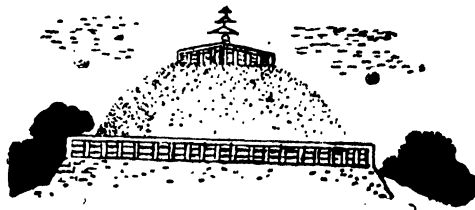
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মানুষ ও শিল্পী

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁদ্রে. জিদ্ সম্পর্কে আর্ণল্ড বেনেট্ একবার বলেছিলে,—

"He writes in the very midst of morals. They are not only his background but very frequently his foreground."

—উক্তিটি আঁদ্রে জিদ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সার্থক কিনা এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। তারা মনে করেন কথাটা আবেগজনিত অতিশয়োক্তি মাত্র। কিন্তু এই মন্তব্যই যদি কথাসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে করা যায়, সকলেই তা সশ্রদ্ধভাবে মেনে নেবেন।

বাস্তবিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন আশ্চর্য একটা সুস্থ আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। 'বাঁচিয়ে রেখেছিলেন' বলছি বিশেষ ভাবে তাঁর কৃতিত্বেরই স্মারক হিসাবে। অভাব, অসুবিধা, রোগ, শোক, দিনগত পাপক্ষয়ের গ্লানি,—বেঁচে থাকবার দুঃখ তাঁর কম ছিল না, কিন্তু সহজাত একটা উদার প্রসন্নতায় অপ্রাপ্তির সব বেদনা ঢেকে হাসি মুখে তিনি সত্যসুন্দরের আরতি করে গেছেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তার জন্ম, মৃত্যু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর। বাঙ্গালীর পক্ষে দীর্ঘ ৮৬ বৎসরের জীবন, সিপাহী বিদ্রোহের আপাত-ব্যর্থতার হতাশা এবং প্রেরণা, জাতির সর্বস্ব পণ করা মুক্তিসংগ্রামের ইতিবৃত্ত, দু দুটো বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ, আবর্ত-সঙ্কুল ঘটনাপ্রবাহে সমাজজীবনে নানা ওলটপালট, পুত্রহীন পরিণত বয়সে জীবনসঙ্গিনী বিয়োগের মত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বহু ক্ষয়ক্ষতির সমস্যা, কলকাতা, জব্বলপুর, কাশী, পূর্নিয়া—দেশের অভ্যন্তরভাগে ব্যাপক পরিক্রমা এবং ঘরকুনো বাঙালীর একজন হয়েও বক্সার-বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সুদূর চীনদেশে পাড়ি,—বৈচিত্র্যের তরঙ্গাঘাত কেদারনাথের সুদীর্ঘ জীবনে অনেক হয়েছে। কিন্তু আনন্দের কথা—এইসব নাড়াচাড়ায় কলা-সৃষ্টিরক্ষেত্রে বর্ণসমারোহেরই সুযোগ মিলেছে, মনে তার কোন ক্ষতের সৃষ্টি হয়নি। কলকাতার উত্তর-সহরতলিতে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর বাড়ি, ঘর থেকে দু'পা এগুলেই সাধক-প্রবর ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যলাভের দুর্লভ সুযোগ, প্রথম জীবনের কোমল হৃদয়সত্তার নিয়ে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পেয়েছিলেন ব'লেই বোধহয় চিরকালের জন্য তাঁর মনটি খাঁটি সোনায় মুড়ে গিয়েছিল, বাস্তবের দুঃখদৈন্য সে মনে কখনও কলঙ্কের দাগ কাটতে পারেনি। হাস্যরসাত্মক রচনায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শক্তি সর্বজন-স্বীকৃত, কিন্তু তাঁর লেখায় ব্যঙ্গ থাকলেও বিদ্বেষ নেই। সত্যাশ্রয়ী লেখনী তাঁর, অন্যায়, অসত্য, দুর্নীতি ও মিথ্যাচারের মুখোস খুলে দেবার জন্য ব্যঙ্গের আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে, তবু এসব রচনার পিছনে সহানুভূতিশীল মানবতা-বাদী ন্যায়নিষ্ঠ গঠনমূলক লেখক-মানস থেকে গিয়েছে বলে সে লেখা কঠোরতায় রূঢ় হয়নি! নির্মল শুভ্র হাস্যরসের প্রবর্তক হিসাবে আধুনিক সাহিত্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেছেন, এ হিসাবে কেদারনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী, এই মহৎগুণের জন্যই সাহিত্যরথী বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) 'আমরা কি ও কে' গল্পসঞ্চয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে কেদারনাথকে বলেছেন:

'আমরা কি ও কে' অতি চমৎকার লেখা। ও লেখার প্রতি ছত্রে রস আছে। আর আপনি বৈঁচি ষ্টেসন মাষ্টারের যে ছবি একেছেন, বাঙলা সাহিত্যে তার জুড়ি নেই। ভদ্রলোকের অবস্থা শুনে ও তাঁর কথা শুনে,—আমার দুচোখ জলে ভরে এসেছিল—অবশ্য হাসতে হাসতে। আমার বিশ্বাস বাংলায় আর একজন লোক নেই যিনি ও ছবি আঁকতে পারেন।"

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বা গল্প অনেকের কাছে আভিধানিক অর্থে উচ্চশ্রেণীর বলে গণ্য হবেনা, কারণ এগুলিতে নরনারীর জৈবিক প্রেমের টানাপোড়েন

নেই এবং গভীর মনস্তত্ত্বের সংঘাত খুবই কম। বিশেষ ক'রে শরৎচন্দ্রের যুগের পাঠকরুচিতে এ ধরণের লেখা সমাদৃত হওয়া কঠিন। তাছাড়া কেদারনাথের রচনায় অতিকথনের দোষ আছে, উচ্চাঙ্গ আর্টের পক্ষে অপরিহার্য মাত্রাবোধ তাঁর ছিলনা। কিন্তু অন্যহিসাবে কেদারনাথের কথাসাহিত্যের মূল্য অনেক। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত চিত্রধর্মী মনোজ্ঞ রচনা এবং সেই রচনার অনেক-গুলিতে নিজের গ্রামকে পটভূমি ও নিজেকে প্রধান চরিত্র রূপে উপস্থাপন বিচিত্র রূপ ও রসের সঞ্চার করেছে। এ দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার আশ্চর্য মিল দেখা যায়। তাছাড়া জগৎজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ, সুনীতির প্রতি অটুট আস্থা, কল্যাণ ধর্মের অবিরাম অনুশীলন এবং পরিবেশ বা ঘটনাসংস্থানের বিরূপতা সত্বেও শেষ পর্যন্ত আশ্বাসের দক্ষিণা বাতাস—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের সম্পদ। আগেই বলা হয়েছে তাঁর লেখার মধ্যে হাল্কা হাসির ছড়াছড়ি, কারও ক্ষতি না করে, কারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করে মহৎ ও সুন্দর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার সাধনা তিনি করেছেন। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি 'কালাচাঁদ খুড়ো' অমর কমলাকান্তের সরল সংস্করণ এবং মূলত কালাচাঁদ খুড়ো তিনি নিজেই। যা কিছু সামাজিক বা জাতিগত অন্যায় ও দুর্নীতি, কালাচাঁদ খুড়ো ব্যঙ্গের আশ্রয়ে তারই জীবন্ত প্রতিবাদ। সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র কেদারনাথকে লেখা একখানি চিঠিতে তাঁর চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন। "কোষ্ঠীর ফলাফল" উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে ১লা কার্তিক, ১৩৩৬ তারিখে লেখা পত্রে তিনি বলেছেন : "চমৎকার লাগলো। বইখানিতে একটিমাত্র ত্রুটির বিষয় উল্লেখ কোরব,—কিন্তু রাগ করতে পারবেন না এই অনুরোধ। ভগবান লেখার শক্তি আপনাকে অপর্যাপ্ত দিয়েছেন, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে ঐশ্বর্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন, কাঙালের সে কাজ আবশ্যক হয় না। শুধু লিখে চলাই ত নয়, থামতে পারার কথাটাও মনে থাকা চাই যে।"*

প্রাচীন কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ সন্তান, হিন্দুধর্মের মহৎ মর্যাদা সম্পর্কে কেদারনাথ সব সময়েই সচেতন ছিলেন। ভণ্ডামির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হ'লেও এবং আধুনিকতার মহত্বটুকু সহজভাবে হাসিমুখে মেনে নিলেও যা প্রাচীন অথচ সুন্দর, তিনি ছিলেন তার একান্ত সমর্থক। হিন্দুদের আচার বিচার, এমন কি যা কুসংস্কার বলে অবহেলিত হয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সেগুলির মূল্যায়নের চেষ্টা তিনি সর্বদা করতেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। দেওঘরে বৈদ্যনাথ মন্দিরে ভারতের বিভিন্ন পবিত্র বলে পরিচিত নদীর জল ক্ষুদ্রাকার শিশিতে চড়াদামে বিক্রী হয়, ভক্তরা বাবার মাথায় ঢালবার জন্য তা কেনে। 'কোষ্ঠীর ফলাফলে' দৃশ্যটির বর্ণনা হাস্যরসাত্মক, কিন্তু এই বর্ণনার শেষদিকে কেদারনাথ আবেগের সঙ্গে বলেছেন : —"এই জলদেবতা এমন সব দুর্লভ জিনিষ রাখেন, যাহাদের ড্রামের মূল্য কিং কোম্পানীর এক ড্রামের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু তাহা অন্যায়ও নহে, অন্যায্যও নহে—কারণ এই সব জল জাহাজেও থাকে না, ল্যাবরেটারিতেও বানায় না। গরীবেরা অধিকাংশ পথই পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সেতুবন্ধ, দ্বারকা, মানস সরোবর প্রভৃতি সুদূর দুর্গম তীর্থ হইতে অসীম শ্রমে বিপদসঙ্কুল পথে তাহা বহন করিয়া আনে। এই শ্রদ্ধার সামগ্রীর যথার্থ মূল্য আমরা দিতে পারি কি ? পারি কেবল উপ-হাসের এক ফুৎকারে তাহাদের সৎকার করিতে। শার-দীয়া অষ্টমীতে দেবীকে কাপড় দেওয়ার রীতি সাধারণ্যে প্রচলিত, পূজায় সার্বজনীন নববস্ত্রসংগ্রহের চাপে এ কাপড়ের গুণাগুণের জন্য কারও বড় একটা মাথাব্যথা নেই, নিয়মরক্ষা হ'লেই হয়। ভক্ত কেদারনাথ কিন্তু এতে সুখী নন। স্বাভাবিক ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়ে 'ভোলানাথের উইল' গল্পে তিনি পূজার বাজার সম্পর্কে লিখলেন :— "বেপরোয়া বাঙ্গালীরা বাড়ির তাগাদা মত আপিস যেতে আসতে দু বেলা পূজার মালের খবর নিচ্ছিলেন। মহা-লয়ার (শ্রাদ্ধের) দিনে 'শো কেসে' শাণিত 'মদনবাণ'— শাড়ী ঝুলতে দেখে তাঁরাও গলা বাড়িয়ে ঝুলে পড়লেন—

---

* শরৎচন্দ্র কেদারনাথকে পানিত্রাস থেকে ১০।৬।১৯২৮ তারিখে লেখা এক পত্রে বলেছিলেন : "প্রার্থনা করি আপনি আর ও কিছুদিন বেঁচে থেকে গল্প লিখুন। আমি প্রত্যেক ছত্রটি তার পড়ি। বন্ধুর লেখা বলে নয়, সত্যকার সাহিত্যিক মানুষের লেখা বলে পড়ি।"

ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে শুরু করলেন।···সপ্তমীর মধ্যে বাঙালীদের খরিদ একপ্রকার শেষ—কেবল মহাষ্টমীতে দেবীকে দেবার মত সস্তা কস্তাপেড়ের জন্যে তেমন তাগাদা ছিল না। একজোড়া নিয়ে ঝিয়েরও একখানা হবে, দুর্গারও একখানা হবে।"

সৎ ও সাত্বিক জীবনযাপনের অনুরাগ ছিল কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি', 'বাণীসুধার পবিত্র গান ও কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর সেই মনের স্পষ্ট পরিচয় মেলে। বলতে গেলে তাঁর প্রায় সব রচনাতেই এই মহৎ ধর্মটি ছড়িয়ে আছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এই ধর্মের বাস্তব মর্যাদা দিয়েছেন। পুঁথিগত বিদ্যার পুঁজি তাঁর বেশি ছিল না, কিন্তু চাকরীটি তিনি পেয়েছিলেন ভাল। সেই চাকরীর বন্ধন কিন্তু তাঁকে বাঁধতে পারেনি—বিষণ্ণ করেই রাখতো। একমাত্র সন্তান কন্যার বিবাহের পর দায় একটু কমার সঙ্গে সঙ্গেই কেদারনাথ তাঁর অফিসার মেজর স্মিথ, ডি, এস, ও—কে জানালেন চাকরী করতে তাঁর আর মন নেই। খোলাখুলি বললেন:—"ছেলে নেই, কন্যাদায় মুক্ত হয়েছি, জীবন কিন্তু নিষ্ফল। জীবিকার্জন করেছি মাত্র, নিজের কাজ কিছুই করা হয়নি। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, পরমার্থচিন্তা আমার অবশ্য করণীয় কাজ। সেটা রয়ে গিয়েছে।' সব সত্য কথা বললুম ও আমাকে কর্ম-হতে অবসর নিতে সাহায্য করতে অনুরোধ করলুম। তিনি শুনে অবাক। পরে আমার প্রস্তাবের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা বুঝতে পেরে বললেন—"পাঁচটা বছর থাকলে এখন যা পাচ্ছ তার তিনগুণ পাবে, নির্বোধের মত এরূপ ত্যাগস্বীকার কেন? বললুম, 'সারাজীবন Comfort seening-এ (আরাম খুঁজে) কেটেছে, একাজে ত্যাগই প্রথম সোপান, আমি যদি অল্পে চালাতে না পারি, ত্যাগের আনন্দ আমাকে সাহায্য না করে, তবে বুঝবো আমার এ সঙ্কল্পের মধ্যে সত্য নেই।' (সজনীকান্ত দাসের ভূমিকা,—দাদামশায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প)

আগেই বলেছি, সনাতন ভাবধারা ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া সত্বেও আধুনিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কেদারনাথ অচেতন ছিলেন না। বস্তুবাদী ঐতিহাসিক পরিবর্তন তিনি সহজভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যই সম্ভাবনাময় নূতনকে বরণ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। অবসর গ্রহণের পর তিনি কাশীবাসী হয়েছিলেন পুণ্যার্থী হয়েই, কিন্তু সেখানে শুধু ধর্মচর্চা বা পূজানুষ্ঠানই তাঁর অবলম্বন ছিল না। তিনি কাশীতেও বয়স্কদের চেয়ে দেশের যারা ভবিষ্যৎ সেই তরুণদের সঙ্গে বেশি মিশতেন এবং তাদের বোঝবার বা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। 'আই হ্যাজ'—এ এটার কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি বলেছেন:—"তরুণদের মন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তারা ভুল করতে পারে, কিন্তু জ্ঞানতঃ অনিষ্ট করবে না। পারলে সাহায্য করাই তাদের ধর্ম,—না পারলেও চেষ্টা পায়। তাই না ভালবাসি।" আবার 'চাটুয্যে সংবাদ' গল্পে বলেছেন:—"অবসর গ্রহণান্তে কাশী এসে রইলুম। একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই। অনভ্যস্ত পূজা, জপ, গঙ্গাস্নান নিয়ে অনির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করাও বড় বোরিং।

···'জয়নারায়ণ স্কুলের সামনে বেউড়িতলায় বাসা—দ্বিতলেই থাকি। প্রীতিভাজন তরুণেরা আসেন—কেহ লেখক, কেহ সাহিত্যপ্রেমিক—বেশ একটি আনন্দ বৈঠক নিত্যই বসে—সাময়িক সাহিত্যকথা চলে। তারা যেন নবযুগের বার্তাবাহক—চোখে মুখে আনন্দ উত্তেজনা ও প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য। কিছু সৃষ্টির জন্য উৎসুক। ভাবতুম এইতো যৌবন, একেই বলে যৌবন। এরাই তো জগৎকে নূতন রূপ দিতে আসে—"

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবতাবোধ যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। এই মানবতাবোধের আতিশয্যে তাঁর অনেক লেখা সম্ভাবনা সত্বেও আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে সমাজে যারা ছোট হয়ে থাকে, তাদের জন্য সুগভীর মমতায় তিনি সর্বদাই উচ্ছল। বৃদ্ধবয়সে প্রাতিঃধন্য সকলে তাঁকে দাদামশাই বলে ডাকতেন, সে উপাধি সার্থক। তাঁর জীবনচর্চা এবং সাহিত্যকৃতি এই দাদামশায়সুলভ স্নিগ্ধ ভালবাসায় সমুজ্জল। সমাজে অন্যায় করে যারা অতিরিক্ত সুবিধাভোগ করে, সামাজিক দায়িত্বের ভার নিয়ে যারা অধিকার ভোগ করলেও দায় বহন করে না, তাদের কেদারনাথ আঘাত করেছেন। কিন্তু যারা সুযোগ পায়না বলেই ছোট হয়ে যাবে, অকৃত্রিম প্রীতিস্পর্শে তাদের তিনি উজ্জ্বল করে এঁকেছেন। এইজন্য তাঁর 'কোষ্ঠির ফলাফলে'

সমাজপ্রধান সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যকে অতি সাধারণ মুসলমান কাবুলীওয়ালা আজিজ অনায়াসে অতিক্রম করে গেছেন। এই গ্রন্থের শেষদিকে প্রচণ্ড শীতের রাতে ট্রেণের যে পাহাড়ী দরিদ্র যুবক নিজের শেষ সম্বল কম্বলখানা শীতার্ত সহযাত্রীকে দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়ে হাসিমুখে নেমে গেল, তার কথা ভোলা যায় না। 'থাকো' গল্পে পল্লীগ্রামের পরিচারিকাশ্রেণীর গয়লা-বৌ থাকো চরিত্র-তার নীতিশাস্ত্রের বিধানে হয়তো দাঁড়ায় না, কিন্তু হৃদয়ের ঐশ্বর্যে সে শুধু গ্রামের ইতরভদ্র সকলকে জয় করেনি, সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ও জয় করেছে। 'কালী ঘরামী' গল্পে সামান্য চাকর কালী পরের গ্রামের মানুষের কষ্ট-লাঘবের জন্য নিজের বহুশ্রমে অর্জিত ৫২২ টাকা স্বেচ্ছায় সাঁকো তৈরীতে দিয়ে দিল। দক্ষিণেশ্বর গ্রামের সে সাঁকোর কথা লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। 'আনন্দময়ী দর্শন' গল্পে ব্যাণ্ডেলের ষ্টেশন মাস্টার অতি-কায় ও ভীষণ দর্শন কাক্রী ক্রিশ্চান মিঃ শেফার্ড, মুসলমান যুবক সুলতান, ইউরোপীয় ট্রেণের টিকিটপরীক্ষক মিঃ হার্ডি, সাধারণ বাঙ্গালী যুবক সতীশ—সকলেই হৃদয়-মাধুর্যের অনুপম প্রকাশে পাঠকের মন লুটে নিয়েছে। মিঃ হার্ডির প্রথম দর্শন প্রীতিকর নয়, রূঢ়ভাষী কর্তব্যবিলাসী শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব, কিন্তু এই কঠিন বহিরঙ্গরূপের অন্তরালে তাঁর স্নিগ্ধ কোমল মনটিকে খুঁজে বার করে অনুপম-ভঙ্গিতে পাঠককে উপহার দিয়েছেন কেদারনাথ। উৎসব-প্রাক্কালে ওড়নাখানি উপহার দিয়ে আদরের বোন সেলিনার মুখে হাসি ফোটার মধুর কল্পনা করতে করতে বৈঁচি ষ্টেশন থেকে নিজের গ্রামের পথে রাত্রির অন্ধকারে পা বাড়াল সুলতান, আর তার সেই দুরূহ যাত্রাকে সম্ভব করার পর ফেরবার ট্রেণের জন্য বৈঁচি ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলেন মিঃ হার্ডি। কেদারনাথ লিখছেন:—"মিঃ হার্ডি এবার জ্যোৎস্নাখচিত চন্দ্রাতপ তলে একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া উদাসভাবে বসিলেন। তাঁহার একমাত্র ভগ্নি সোফিয়ার কথা মনে পড়িল। দেড় বৎসর হইল সোফিয়া তাঁহাকে পরপর তিনখানি পত্র লেখে ও প্রত্যেকখানিতেই ভারতের রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির আর নূরজাহান ও তাজমহলের ফটো পাঠাইয়া দিবার জন্য আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ জানায়। তিনি—"মিছে কাজ" বলিয়া তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। আজ সেই বিস্মৃত কথা বার বার তাঁহাকে আঘাত করিয়া পীড়া দিতে লাগিল। সোফি-য়ার অভিমান ভারাবনত চক্ষুর মধ্যে ভগ্নিত্বের অবমাননার নালিশ তিনি আজ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।"

কেদারনাথ প্রথম জীবনে বাংলার যে সমাজজীবন দেখেছিলেন তাতে ভাঙনের ইঙ্গিত ছিল সুস্পষ্ট। নীতি-বোধ, শৃঙ্খলা এবং মানবিকতার অবক্ষয় যত্রতত্র পরি-লক্ষিত হ'ত। বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত 'বাবু'র দল তখন পারি-বারিক জীবনে স-দাপটে বিরাজমান, ফলে কুলমহিলাদের দুর্দশার অনেকক্ষেত্রেই অন্ত ছিল না। এর বিপরীতে পতিতারা বরং সুখে থাকতো। সমাজজীবনে সর্বব্যাপী পুরুষ-প্রাধান্যের ফলে স্বভাবতঃই মেয়েদের মনে একটা অন্তর্নিহিত হীনতাবোধ ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, যার ফলে অবস্থাকে মানিয়ে নেবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃজাতির এই দুর্দশায় ব্যথিত হয়েছিলেন। অসহায়া কুললক্ষ্মীদের প্রকৃত মূল্যায়নের এবং তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। তার স্বাভাবিক ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লেখা "দেবী মাহাত্ম্য" এ হিসাবে এক অবিস্মরণীয় গল্প। প্রফুল্ল স্বচ্ছল গৃহস্বামী, কালাচাঁদ খুড়ো তাঁর দরিদ্র প্রতিবেশী। বলা বাহুল্য, কালাচাঁদ খুড়ো বা খুড়োর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন স্বয়ং কেদার-নাথ। গল্পে বন্ধু-পরিবৃত প্রফুল্ল ও খুড়োর কথোপকথনের একাংশ উদ্ধৃত হল:—

প্রফুল্ল—একদিন রাত্রে বেড়িয়ে এসে ডাকলুম,—দু মিনিট হয়ে গেল, উত্তর নেই—দোর খোলাও নেই। রাত তখনো সাড়ে বারোটা হয়নি হে! রাগে ব্রহ্মাণ্ড জলে গেল। সজোরে একটা লাথি মারতে খিলটা কোথায় ছিটকে গেল।

খুড়ো—এক লাথিতে, অ্যা,—মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে! তারপর?

প্রফুল্ল—দেখি, লাঠান নিয়ে ছুটে আসছেন! খুকিটে চিল চেঁচাচ্ছে,—বরদাস্ত করতে পারলুম না,—লাঠানটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলুম।

খুড়ো—আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলুম,—ও সময়ে ও

ছাড়া আর কিছু আসতেই পারে না,—fitও করে না। আমি নিজে না পারলেও তোমাকে দুষতে পারি না। জোর থাকা চাই বই কি! আর নয়তো স্ত্রীপুরুষে প্রভেদ থাকে কোথায়?

প্রফুল্ল—শুনুন,—তারপর সাড়ে তিনমাস হয়ে গেল, আজও দোরের খিলটে হল না! সেটাও কি আমার কাজ?

খুড়ো—তুমি যে অবাক করলে বাবাজি! তুমিই ভাঙবে, আবার সারাতে হবে তোমাকেই? তাহলে ত যার অসুখ তাকেই ডাক্তার ডাকতে ওষুধ আনতে যেতে হয়।"

এই 'দেবী মাহাত্ম্য' গল্পের মতই আর একটি সার্থক গল্প 'নামঞ্জুর'। অবশ্য 'নামঞ্জুর'-এ কেদারনাথ ব্যঙ্গের সাহায্য নেননি। এতে স্বার্থপর-দুর্নীতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের রূপ তিনি দেখিয়েছেন 'মাস্টার বৌ' চরিত্রে। সতীলক্ষ্মী প্রথমা স্ত্রী 'ক্ষ্যান্ত' থাকা সত্বেও মাধব মোহবশে যাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। 'ক্ষ্যান্ত'র বিপরীতে এ গল্পে 'মাস্টার বৌ' একেবারে ম্লান। গল্পটিকে জটিল সমস্যার সুলভ সমাধান হয়েছে সন্দেহ নেই এবং সে হিসাবে আর্টের বিচারে গল্পটির দাম কমে গেছে, কিন্তু তাহলেও নিগৃহীতা, অবহেলিতা বাংলার পুরস্ত্রীদের জন্য কেদারনাথের বেদনাবোধ এতে চমৎকার ফুটেছে।

বাংলার শ্যামল প্রকৃতিকে কেদারনাথ যেমন ভালবাসতেন, তেমনি ভালবাসতেন, তার মানুষগুলোকে। বাঙ্গালীর দোষ, হীনতা বা অধঃপতন তাঁকে মর্মাহত করত। তাদের সবদিক থেকে মানুষ করে তোলবার জন্য সাহিত্যিক কেদারনাথ সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন এবং এর জন্যই তিনি বিশেষ করে ব্যঙ্গের সাহায্য নিয়েছেন। বাঙালী হৃদয়বান হোক, কর্মী হোক, নিজেদের ঐতিহ্য আর অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সম্ভাবনা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলুক,—এই ছিল কেদারনাথের আকাঙ্ক্ষা। 'আমরা কি ও কে' গ্রন্থের গল্পগুলি প্রধানতঃ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখা। গ্রন্থের নামগল্পে বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতার বিপরীতে তিনি একটি অত্যুজ্জ্বল অথচ অতি-সাধারণ মাতাল ইংরেজ নাবিকের ছবি এঁকেছেন। এই নাবিকটি হাওড়া সেতুর উপর যেতে প্রচণ্ড ঝড়জলের মধ্যে অসুস্থ বাঙ্গালী তরুণ কিশোরীর প্রাণরক্ষা করল নিজের পানে না তাকিয়ে, অথচ কলকাতা থেকে গৃহাভিমুখী বাঙ্গালীর দল কিশোরীকে পড়ে থাকতে দেখেও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আত্মরক্ষার চেষ্টায় দ্রুতপায়ে অন্তর্ধান হ'ল। এখানেও কেদারনাথ কালাচাঁদ খুড়োর বেনামীতে উপস্থিত হয়েছেন এবং ক্ষুরধার ব্যঙ্গের আঘাতে স্বদেশবাসীর চৈতন্য ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। গল্পের শেষে অসুস্থ কিশোরীকে তার স্বস্থান শ্রীরামপুরের গাড়ীতে তুলে দিয়ে শ্বেতাঙ্গ নাবিক ফিরলো। কালাচাঁদ খুড়ো তার ফিরে যাওয়া চিত্র করছেন:—"দূর থেকে দেখা গেল,—যাকে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বেপরোয়া হাওয়ার মত হঠাৎ মোড় ফিরে এসে পড়ায় পেয়েছিলুম, সে নির্বিকার স্বাধীন হাওয়ার মত—সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই চলেছে! তার কোথাও বাধা সঙ্কোচ, ভেদাভেদ নেই। আশ্রয় তাকে বাঁধতে পারেনি। বিলিতী binding এর (মলাটের) জীবন্ত বেদান্ত!"

এইভাবেই বাঙালীর দুর্বলতার উপর কেদারনাথ ব্যঙ্গের কুঠারাঘাত করেছেন 'দাদার দুরভিসন্ধি' গল্পে। বড়ভাই জগৎ প্রবাসে চাকুরী করে, ছোটভাই শশী বাড়ীতে থেকে ক্রমেই সঙ্গদোষে অল্পবয়সেই সাবালকত্ব লাভ করছে। লেখাপড়ায় শশী ইস্তফা দিতে চায়, শিক্ষক বিধুমাষ্টার সমর্থন করলেন তাকে:—"যাদের নষ্ট করবার টাকা আছে তারা চিরদিন পড়ুক না, তা নাতো আমাদের চাকরী থাকবে কেন? তোমার সঙ্গে তো সেকথা নয়, তুমি আমাদের নমস্য ঘোষাল মশায়ের ছেলে। যা শিখেছ, তা গেরস্থ ছেলের জন্য যথেষ্ট। ওর ওপরে গেলেই—কবিতা লেখা আর কাগজে জ্যাঠামি করা বাড়ে বৈত না। তোমাকে সে কুপরামর্শ দিয়ে আমি পাপ বাড়াতে পারব না। লেখাপড়া যদি জ্ঞানবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্যে হয়, আর ঘোষাল মশায়ের বুদ্ধির যদি এক কাঁচ্চাও পেয়ে থাক তো কোনও মাড়োয়ারী বাচ্চাও তোমাকে হঠাতে পারবে না—এ আমি গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলতে পারি। আর যদি রোজগারের কথা তোল, পশুপতিবাবুর কাছে শুনেছি জগৎ বেশ দুপয়সা কামাচ্ছে। তোমার চারদিকে চটকলের কুলি আর কন্যাদায়গ্রস্ত কেরাণী, সেই টাকা আনিয়ে মোটাসুদে ছাড়লে একটা

হৌসের মুচ্ছুদ্দির মোটা রোজগার ঘরে বসেই করতে পারবে। হিসেব যখন হাসিল করেছ, তোমার আবার ভাবনা কি, টাকা লাফিয়ে বাড়বে। বুদ্ধির 'টেস্ট্' টাকা রোজগার।'

ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর দেশে শান্তিশৃঙ্খলা আনবার সংকল্প নিয়েই লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারী প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। সমাজের উচ্চস্তর থেকেই প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর স্থষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই মহান কাজটি নৈরাশ্য-জনক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল। জমিদারসম্প্রদায়ের আত্মকেন্দ্রিকতা, আলস্য, দম্ভ, বিলাসিতা ও অমিতাচারের হীনতা বাঙলার সমাজজীবনের উপর প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করল। সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনার শোচনীয় পরিণতি কেদারনাথ অপেক্ষাকৃত প্রাচীনপন্থী হয়েও সমর্থন করতে পারলেন না। 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি' শীর্ষক হাস্যরসাত্মক গল্পটিকে এই জমিদারের ব্যঙ্গচিত্রই তিনি এঁকেছেন। গল্পটির প্রথম কয়েকটি লাইন পড়লেই কেদারদাথের বক্তব্য এবং আকাঙ্ক্ষা অনবহিত পাঠকের কাছেও ধরা পড়বে :—

"চৌধুরী মশাই ছিলেনগ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত সম্মানিত স্থূলকায় মাতব্বর,—ছ-আনি জমিদার। বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, শিবমন্দির, সট্‌কায় রাখা অনির্বাণ বাড়বানল,—সবই তাঁর ছিল। আর ছিল—তাস, পাশা, অহিফেন আর সান্ধ্য মজলিস্;—এই চতুর্বেদচর্চা। অহিফেনটা তিনি আহার করতেন,—সাতসের দুধে দুভরি আফিং সুপক্ক হলে তার সরখানি তিনি ভোগে লাগাতেন, দুগ্ধটা পার্শ্বদদের মধ্যে অধিকারী মত বণ্টন হত।

'ভৃত্য নন্দার প্রধান কাজ ছিল,—গো-সেবা, দুগ্ধ-প্রস্তুত আর কল্‌কে বদলে দেওয়া। আর যে কাজটি ছিল সেটি সে দুধ জাল দিতে দিতেই সেরে রাখতো। কথা বার্তার জবাব সে চোখ বুজেই দিত।

'চৌধুরী মশাই কখনো কখনো আন্দাজে বলতেন—"নন্দা, ঝিমুচ্ছিস বুঝি! খবরদার বেটা, দোর গোড়ায় বসে ঝিমুলে গেরস্তোর অকল্যাণ হয় জাননা পাজি, দূর করে দেব।

'নন্দা চোখ বুজেই বলতো—"আপনি দেখলেন কখন হুজুর!"

কথাটা ঠিক, শুনে চৌধুরী মশাই খুসীই হতেন। বড়লোকের, বিশেষ জমিদার লোকের, চোখ চেয়ে থাকাটা একেবারেই ভাল নয়, লোকসেনে লক্ষণ। প্রজা বেটারা চোখ দিয়ে ভিতরে ঢুকে বাঁধি ব্যবস্থা বিগড়ে দেয়,—মতলব হাসিল করে নেয়,—দুঃখকষ্ট মাখানো মুখ দেখিয়ে অকস্মাৎ দয়া টেনে বার করে বসে। এটা ছিল তাঁর পিতৃবাক্য। চোখ চাওয়ার তরে পড়ে রয়েছে ভস্মলোচনেরা—নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা।"

বাঙালীর মত বাংলাসাহিত্যকে কেদারনাথ প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং বাংলাসাহিত্যের অনুশীলন যাতে বাড়ে তারজন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতেন। অবসর-গ্রহণের পর কাশীতে গিয়ে ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগের চেয়ে সাহিত্যচর্চায় তিনি নিজেকে অধিকতর ব্যাপৃত রাখতেন। তাঁর উপন্যাস "আই হ্যাজ"—এ আছে, কাশীতে কালীকুমারকে তিনি বলছেন,—"তুমি ভাই বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু আর শরৎবাবুর যা লেখা বেরিয়েছে, তাই ভাল করে দেখ,—বারবার—আর কিছু দেখ আর না দেখ। রসে, সৌন্দর্যে, শিল্পে আমাদের অমন সম্পদ রামায়ণ মহাভারত ছাড়া আর কোথাও আছে কি না আমার জানা নেই।" মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কেও তাঁর শ্রদ্ধা কিরকম গাঢ় ছিল কোর ফলাফলের মূল চরিত্রেরষ্ঠী দেওঘরে নাতজামাইয়ের সঙ্গে কথোপকথনের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যাবে—"আবার আমাদের মধুকবি ব্যারিষ্টার মাইকেল ক'দিন ধরে এক নাপিতের মামলা—কয়েকটা কবির গান শুনে করে দিয়েছিলেন; তাইতেই হাজার টাকার খোলের ফাঁকটা উপচে উঠেছিল!

শ্রীমান—আর তাই শেষ অবস্থাটাও খুব শোচনীয়,—মলেনও দাতব্য চিকিৎসালয়ে।

'বলিলাম—"মলেন! না—.রাকে বাঁচালেন? কোন খবরই রাখনা বন্ধু। ত্রেতাযুগের মরা মেঘনাদকে সব-যুগে অমর করে গেলেন, আর নিজেও অমর হয়ে রইলেন। তোমার মেটিরিয়েল 'মেশিনগানের' এত শক্তি নেই যে আর তাঁদের মারেন।"

কাশীতে একবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের

সাক্ষাতের সম্ভাবনা হয়। 'কবুলতি' গল্পগ্রন্থের "স্মরণে" গল্পে আছে সেই প্রসঙ্গে তিনি বললেন,—"শরৎবাবুকে দেখবার ইচ্ছাটা সত্যই প্রবল। যিনি বইছাড়াদের কেঁচে বই ধরিয়েছেন, তাঁকে দেখতে হবে বৈ কি। খৃষ্টানই হয়েছি—তা বলে সরস্বতী পুজো করব না কেনো।"

এরপর যখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল, শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি যা বললেন তা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির এক নবমূল্যায়ন :—"চরিত্রহীনে গৃহদেবতা নারায়ণকে অন্ন দেওয়ার ঘটনাটা নিয়ে কলেজ থেকে ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে বসে যে অনুতপ্ত অপরাধীটি শান্তিলাভার্থ ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিল, সে দিবাকর নয়, বোধ করি শরৎচন্দ্র। অন্তত; দিবাকরের প্রাণে যিনি অনুতাপ এনেছিলেন তিনি-আপনি। আবার অতবড় বিচারগর্বিতা বিদুষী কিরণময়ীর হাতে যিনি কালীঘাটের ফুলবিল্বপত্র দিয়ে তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তি করেছেন, তিনিও আপনি বই আর কেউ নন।" তারপর শরৎচন্দ্র বিদায় নিলে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনার জের টেনে কেদারনাথ বললেন যে—লোকটির লেখা পড়তুম আর অবাক হয়ে ভাবতুম—বাঃ কোথাও ফিকে মারছে না! ভাষার শক্তি আর সৌন্দর্যে—ঘরের পরিচিত আটপৌরে জিনিষটিকে কি উপভোগ্য করেই উপস্থিত করেন। কোথাও রঙের সাজগোজ নেই—উচ্ছ্বাসের উৎপত্তি নেই—সবই সহজ! আজ সেই মানুষটির চেহারায় আর পরিচ্ছদে সেই পরিচয়ই পেলুম।

বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা সেবা ক'রে সমৃদ্ধ করেছেন সেইসব সাহিত্যরথীকে কেদারনাথ প্রাণাপ্রিয় মনে করতেন। তিনি নিজে সাহিত্যিক, কিন্তু যশোলাভের প্রশ্নে প্রতিযোগিমূলভ মনোভাব তাঁর ছিল না। মাতৃভাষার অন্য যশস্বী সাহিত্যিকদের অকুণ্ঠ প্রশস্তি করতে তাঁর মনে কখনো দ্বিধা জাগতো না। নিজের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ তিনি বঙ্গসাহিত্যরথীদের করকমলে উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। নিম্নোদ্ধৃত উৎসর্গপত্রগুলিতে তাঁর উদার গুণগ্রাহিতা প্রকাশমান :—

১। আমরা কি ও কে—গল্পগ্রন্থ—"আমার জীবনসন্ধ্যায় ভাগ্যলব্ধ সুহৃদ্বর বিশ্ববরেণ্য কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে পরম শ্রদ্ধায় নিবেদিত" ;

২। আই হাজ—উপন্যাস—"প্রথম জীবনে যাঁহার রচনা আমাকে রসসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে ও প্রেরণা দেয়,—সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে" ;

৩। কবুলতি—গল্পগ্রন্থ—"পরম শ্রদ্ধেয় রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের করকমলে" ;

৪। কোষ্ঠীর ফলাফল—উপন্যাস—"শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে" ;

৫। ভাদুড়ী মশাই—উপন্যাস—"যার অসীম প্রভাব কথিত চলতি ভাষাকে পুস্তকে পাংক্তেয় করে প্রকাশ চেষ্টাকে সহজ শক্তি দিয়েছে, সেই অশেষ শ্রদ্ধাভাজন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের করে—চলতিভাষায় লেখা আমার এই সামান্য অর্ঘ্য অর্পণ করলুম" ;

৬। সন্ধ্যাশঙ্খ—গল্পগ্রন্থ—"শুভাশীষসহ প্রিয় বনফুলকে।"

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সূক্ষ্ম শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু মহৎ শিল্পীর সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণসাধনব্রতী হওয়ার জন্য তাঁকে সাধারণের বোধগম্য হ'তে অতিরিক্ত স্পষ্ট হতে হয়েছে এবং সেই-সূত্রে ব্যঙ্গপ্রবণ হওয়ার জন্য তাঁর এই মহৎ শিল্পপ্রতিভা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হয়েছে। কেদারনাথের রচনায় রূপসজ্জার শৃঙ্খলাভাব কিছুটা দেখা গেলেও তা নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কেদারনাথের সঙ্গে ডিকেন্সের তুলনা করেছেন। ডিকেন্সের অভিজ্ঞতা, ডিকেন্সের সংবেদনশীলতা, ডিকেন্সের মানবতাবাদ এবং ডিকেন্সের সাধারণের মর্মভেদী পরিহাসপ্রিয়তার সমান্তরাল মানসরূপ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। কেদারনাথের প্রতিভা সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত প্রশংসাবাণীই শেষ কথা :—

"তোমার এই রচনার কুঞ্জে মরা ডাল শুকনো পাতা নেই বললেই হয়। তোমার চিত্রপট থেকে ছবিগুলো বেরিয়ে এসে কথা কইতে থাকে।" (রবীন্দ্রনাথের পত্র, আপল্যাণ্ডস্ শিলং, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

বিজ্ঞান ভবন

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রুক্ষস্বরে কোটপ্যাণ্টধারী লোকটি বলল,—জানেন আমি কে ?

পক্ককেশ বৃদ্ধ লোকটি হেসে বললেন,—আজ্ঞে না।

—আপনি বিছানা তুলে দিলেন কেন ?

—একটু বসব বলে।

—তার মানে ? দেখছেন আমি ওয়াইফ ও চিলড্রেণ নিয়ে যাচ্ছি। বিছানাটা কেন তুললেন ?

বৃদ্ধলোকটি জুতো খুলে জোড়াসন করে বেঞ্চিতে বসলেন—বেশ আরাম করে এবং নিশ্চিন্ত ভাবে।

সাহেব লোকটি এই আরাম ও নিশ্চিন্ততা দেখে যেন ক্ষেপে গেলেন। বললেন,—উঠুন, উঠুন,—বুড়ো হয়েছেন, একটু আক্কেল নেই ?

—ব্যস্ত হবেন না। সবে এখন ৭টা, নটার আগে ত আপনারা শোবেন না। আমি তার আগেই নেমে যাবো। আপনার জায়গা আপনারই থাকবে—

সে কথা বলে যদি বিছানাটা তুলতেন তবে ত ভদ্রতা হত—

—তার মানে আপনার পারমিশন নিয়ে বসতে হবে ?

হাঁ—আপনি জানেন আমি কে ?

ট্রেণের কামরায় জায়গা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল, যেমন হামেশাই হয়। সাহেবের প্রতি একটু কটাক্ষ করে বৃদ্ধলোকটি বললেন,—পরিচয় দিলে জানতে পারি—

—জানেন আমি একজন, এস, ডি, ও, আমার এলেকা দিয়ে এই ট্রেণ যাবে।

—তা ভালই, যাবে ত যাবে—রোজই যায়—

অন্য এক ভদ্রলোক পাশের থেকে বক্রোক্তি করলেন, —এস, ডি, ও—আপনার একটু সমীহ করা উচিত ছিল, —একটু ভীত না হোন চকিত হওয়া উচিত ছিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা সস্তা সিগারেট ধরিয়ে বললেন— আমাদের কানমলা না খেলে কেউ হাকিম হুজুর হয় না। তিনি সিগারেটের ধোঁয়াটা অত্যন্ত অলস ভাবে ছাড়লেন।

সাহেব ভদ্রলোক 'কানমলা' কথাটা শুনে আরও ক্ষেপে গেলেন। বললেন, তার মানে আপনি যত আই, এ, এস, —বি, সি, এস সকলের কান মলেন ?

– হাঁ, আজ তিরিশ বছর মলেছি, এখনও মলছি— আরও বছর দুই মলবো—

—আপনার আস্পর্দা ত কম নয়। সাহেব রাগে প্রায় আস্তিন গুটিয়ে ফেলেছেন। গাড়ীর মধ্যে ঝড়ের সংকেতে সব স্তব্ধ।

বৃদ্ধ লোকটি অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে আর একবার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—উত্তেজিত হবেন না। সেটা আপনাকে শোভা পায় না। তবে আমি মিথ্যা কথা বলিনি –

—তার মানে ?

—বলছি, আমি মাষ্টার,—বলতে পারেন আমাদের হাতের কানমলা না খেয়ে এ পর্যন্ত কেউ হাকিম হয়েছে ?

গাড়ীর স্তব্ধতা ভেঙ্গে সকল যাত্রীই হো হো করে হেসে উঠলেন। সাহেবও যেন হঠাৎ একটু বেকুব হ'য়ে বসে পড়লেন। বললেন,—এমনভাবে বললেন, যে— যে—তা—

গল্পটা শুনেছিলাম অনাদিবাবুর মুখে। অনাদিবাবু ফিলসফির প্রফেসর, বহু দিনের। প্রায় অবসরেয় সময় হয়ে এসেছে তার। নতুন কলেজে এসেছেন কয়েক বছর, —সদা প্রফুল্ল এবং আত্মভোলা এই লোকটি এমন কাণ্ড করতে পারেন একথা হঠাৎ বিশ্বাস হত না—কিন্তু ঐ ট্রেণেই সাক্ষী ছিল তাই বিশ্বাস করতে হয়েছে।

অনাদিবাবুর দার্শনিকসুলভ ভুল ভ্রান্তি ছিল, অবশ্য

ঘড়ি সিদ্ধ করতে দিয়ে ডিম হাতে করে উনি বসে থাকেন নি কখনও, তবে কাপড়ের উপর ইংরিজি প্রফেসারের সার্ট ও কোট চাপিয়ে পড়াতে এসেছেন একথা সত্যি। ওঁরা হোষ্টেলে একই রুমে থাকতেন। অনাদিবাবুর কাণ্ড-কারখানা নিয়ে ছাত্র মহলে আমরা হাসাহাসি করতাম, যদিও দার্শনিকদের ভুলোমনের অনেক গল্প আমরা পড়েছি। কিন্তু একটা ব্যবহার আমরা অনুমোদন করিনি,—সেটা বলতে হলে এই কলেজের একটু ইতিহাস বলা দরকার।

এই কলেজের বাড়ী যেখানে উঠেছে সেটা এক জমিদারের বাগানবাড়ী। নাম ছিল গোলাপ বাগ। সেখানে বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান, পুকুর আর একটা ছোট বাড়ী ছিল। সেই ছোট বাড়ীটা আজ হোষ্টেল, প্রফেসর কয়েকজন থাকেন। যখন জমিদারী সত্ব বিলোপ হতে চলেছে তখন জমিদারের কাছে সাধারণ লোকে এই জায়গাটা চেয়েছিল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে। জমিদার ঠিক দান করেন নি, তবে যখন বুঝলেন এসব সরকার নিয়েই নেবে—তখন সাপে খেলেও খাবে বাঘে খেলেও খাবে—এই ভেবে দানই করে দেন। তারপর একটা একটা করে বাড়ী উঠেছে—এখন আর গোলাপও নেই বাগও নেই। এক কোণে দারোয়ানের ঘরের কাছে একফালি জমিতে নিতাই, মানে কলেজের একজন বৃদ্ধ বেয়ারা একটু বাগান করে রেখেছে। এই মাত্র—

জমিদারের পুকুরে আমরা এখন স্নান করি, কাপড়ে সাবান দি। একপাশে কয়েকটা কলমের আম গাছ ছিল তাও আজ গতায়ু। ডাল কেটে কেটে ন্যাড়া করে রেখেছি, ফল আসলে আমরা কচি আমের টক খাই,—গরমের বন্ধের আগে, আমে আঁটি হবার আগেই তা শেষ করে দিয়ে বাড়ী যাই।

অনাদিবাবু বিকেলে একটু বেড়িয়ে এসে এই নিতাই এর সঙ্গে—কোনদিন একঘণ্টা কোনদিন দু'ঘণ্টা গল্প করে তবে হোষ্টেল আসেন। তাঁর মত একজন প্রফেসর, ঐ বুড়ো মালীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেন এবং আস্কারা দেন এটা আমরা ভাল চোক্ষে দেখিনি—সমালোচনা করেছি। একদিন স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলাম স্যার, আপনি ঐ নিতাই বুড়োর সঙ্গে কি গল্প করেন—

অনাদিবাবু জিবে কামড় দিয়ে বললেন,—ও রকম বলো না। ও লোকটা অশিক্ষিত তাই, নইলে ও বড় কবি—দার্শনিক হতে পারতো—

আমরা হাসি। উনি বললেন,—হাসির কথা নয়, যে অন্তর থাকলে লোকে কবি হয়, যে ভাবুকতা ও চিন্তা-শক্তি থাকলে দার্শনিক হয়, তা ওর মধ্যে আছে। ওর কাছে অনেক শিখবার আছে। এ্যারিষ্টটল থেকে কিয়ের কোগাড পর্য্যন্ত দর্শনশাস্ত্রে যে মানবিকতার কথা বলা হয়েছে, ওর জীবনে সেটা প্রতিফলিত, তাদের কথা বইতে আছে, ওর আছে জীবনে—রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন কাব্যে, ওর জীবনদর্শন জীবনে—ওকে চিনতে চেষ্টা কর—

এই আবার তার পাগলামী—সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করলাম নিতাই এর মধ্যেও নিশ্চয়ই পাগলামী কিছু আছে। নইলে এমন হবে কেন? রতনে রতন চেনে—

আমরা কয়েকজন ঠিক করলাম, বিকেলে আমরাও বুড়ো নিতাইএর কাছে যাবো। সেটা অনাদিবাবুর মত জীবন-দর্শন বুঝবার জন্যেও নয়, নিতাইএর মাঝে দার্শনিককে আবিষ্কার করতেও নয়। আমাদের ফন্দীটা অন্যরকম—আমরা বিরক্ত করলে অনাদিবাবু নিশ্চয়ই ওখানে বসা ছেড়ে দেবেন। তাঁর সম্মানটা ছাত্রসমাজে রক্ষা হবে—

সেদিন অনাদিবাবুর পিছন পিছন গিয়ে আমরাও উপস্থিত হলাম। অনাদিবাবু নিতাইএর ফুলবাগানের মাঝে ঘাসের উপর বসে, নিতাই নিড়ানি হাতে করে এসে বসল।

অনাদিবাবু বললেন,—আচ্ছা নিতাই, তোমার দেশ কোথায়?

—সে অনেক দূর, গাড়ীতে উঠে তিনঘণ্টা যেতে হবে, সেখানে আমাদের ইষ্টিসন পাঁচলা, সেখান থেকে হেঁটে ক্রোশ পাঁচেক হবে!

—তোমার বয়স কত হল?

—আজ্ঞে তিনকুড়ির উপর ত বটেই।

বুঝলাম প্রশ্ন করে করে নিতাইএর জীবন-কথাকে স্যর আমাদের সামনে উপস্থাপিত করছেন। আমরা একটু হেসে জীবনী শুনতে লাগলাম। সামান্য জীবন—

পনর ষোল বছর বয়সে চাকুরীর চেষ্টায় সে

ছেড়ে এসে এই জমিদার বাড়ীতে মালীর সহকারী হিসাবে পাঁচ টাকা মাইনের কাজ পায়, অবশ্য খোরাকীটা সে রাজবাড়ীতেই পেত। প্রথম প্রথম এই কোদাল কোপানো, ঘাস নিড়ানো, সার তৈরী করা—এসব তার ভাল লাগত না, কিন্তু করতে হত। এমনি করে যখন বয়স তার প্রায় পঁচিশ হল তখন বুড়ো মালী মারা গেলে সেই মালী হল। তারপরে বিয়ে করল, ছেলেপুলেও হল। কিন্তু বাড়ীতে যেয়ে কিছুতেই থাকতে পারতো না, মনে হত কে যেন গাছের ডাল ভাঙ্গছে, ফুল ছিড়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাজবধূ, রাজকন্যা, রাজপুত্র ফুল পাচ্ছেন না—ছুটি ফুরানোর আগেই চলে আসতো। বাড়ী, স্ত্রীপুত্রের আকর্ষণের চেয়েও এই বাগানের মায়া তার বেশী হয়ে উঠেছিল জীবনে। গোলাপবাগ দান হল, দালান উঠতে সুরু করলো। রাজার কাছে বলল,—এই বাগানের একটু চাকরী তার থাকবে না? রাজার অনুরোধে কলেজ কর্তৃপক্ষ তার চাকুরী একটা দিলেন—চাকুরীও করে কলেজে—কিন্তু সে পড়ে আছে এই বাগানটুকুর জন্যে—

এই সামান্য জীবনকথা শুনে আমরা একটু ব্যঙ্গের হাসি হাস্‌লাম। কিন্তু এই সামান্য কি করে অসামান্য হ'য়ে উঠল এই কথাটা পরিষ্কার করবার জন্যেই অনাদিবাবু প্রশ্ন করলেন—স্ত্রীপুত্রই সবচেয়ে আপনার, তার জন্যেই লোকে চাকুরি করে, কিন্তু তা ছেড়ে বাগানের মায়া তোমার বেশী হল কি ক'রে?

নিতাই বলল,—সে এক তাজ্জব ব্যাপার। যখন প্রথম কাজ করতে এলাম, কেবল ফাঁকি দিতাম, বুড়ো মালী দু'চার দিন মেরেছেও। গাছ আর মাটি ওই বয়সে ভাল লাগবে কেন? একদিন বিকেলে কতকগুলি বিলিতি ফুলের বীজ বোনা হল, বেশ সার জল দিয়ে। দু'তিন দিন পরে মালি বলল,—যা দেখে আয় বীজ উঠেছে কিনা? তখন ত এই সবটাই ফুলের বাগান ছিল। পুকুরের পাড়ে এই তিনবিঘেয় ছিল গোলাপ। ও ধারে মরশুমী ফুল। যা হোক্ মালীর কথামত যেয়ে একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখলাম। একখানা ভাঙ্গা খাপরা শূন্যে ঝুলছে, অথচ কিছু নেই। নীচেও কিছু নেই, আমি অবাক। এটা কেমন করে হয়? উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলাম, ঠিক মাটি থেকে প্রায় এতটা, মানে এক ইঞ্চি উপরে খাপারাটা রয়েছে। ভূতের কাণ্ড! তার চারিপাশে বীজ উঠেছে, মাথাগুলো বাঁকা করে মাটি ভেদ করে উঠেছে সব চারা। আমি আস্তে খাপরাটা তুলে দেখি তিনটা চারা ওটাকে ঘাড়ে করে তুলে ফেলেছে অতটা। কি আশ্চর্য্য। এতটুকু চারাগাছের এত শক্তি! অবাক হয়ে গেলাম। ঐ বীজগুলো ঘরের মধ্যে বোতল ভর্ত্তি হ'য়ে ছিল। নেহাতই জড় পদার্থ। জীবনের কোন চিহ্ন ছিল না, হঠাৎ জীবনই বা পেলে কোথায়? আর এত শক্তিই বা পেল কোথায়? মাষ্টারবাবু, এ একেবারে যাদুখেলা, সেইদিন থেকে এই যাদুখেলা নিয়েই আছি। কি যে আছে এর পিছনে, কি শক্তি—না ভগবান—কিছু বুঝি না। ওরা ঠিক মানুষের মত—কথাও হয়ত বলে!

আমাদের একজন, বোটানির ছাত্র বলল,—আলো, জল, বাতাস পেলে বীজ ত অঙ্কুরিত হয়।

—হ্যাঁ, হয় কেন? গোলাপের ত বীজ নেই, বীজে গাছ হয় না, সব বীজই ত ওঠে না। ওইটেই ত যাদুর খেলা—

অনাদিবাবু ভাবালুভাবে প্রশ্ন করলেন,—এটা কি, এই শক্তিটা কি বলে তোমার মনে হয় নিতাই।

—আমি মুখ্‌খু মালী, কি বলব বাবু, তবে আলো জল বাতাসের ভিতর দিয়ে এই প্রাণ দিলে কে—এইটেই ত ভাবি। মনে হয় ওই ভগবান—

অনাদিবাবু বললেন,—ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ নিতাই, মানুষও তাই। মায়ের পেটে থাকতে শিশুর আহার মল-মূত্র কিছুই থাকে না, ভূমিষ্ঠ হয়েই তার সব আরম্ভ হয়। মাতৃজঠরে অথচ সে বাড়ে—আবার মানুষ বাড়তে বাড়তে বুড়ো হয়, আলো জল বাতাসের শক্তি একই থাকে অথচ মানুষ মরে যায়—

নিতাই চীৎকার করে বললে,—ওই এই ভগবান। ওই জল বাতাসের পিছনে যে আছে সেই—

অনাদিবাবু হঠাৎ উঠে পড়লেন, আমরাও উঠে পড়লাম। পথে আসতে স্যর বললেন—তোমাদের মনে হল ওটা পাগলামি, না? নিতাই একটি পাগল। এই পাগলামীই জগতের বড় বড় মানুষকে পাগল করেছে।

আমরা নিস্পন্দে তাঁর অনুসরণ করছিলাম। অনাদি-

বাবু হঠাৎ বললেন,—পাশ্চাত্য দর্শন ব্যর্থ হয়েছে, জগৎকে তারা কোন এথিক্যাল সমাধান দিতে পারেনি, কারণ তারা যুক্তি দিয়ে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যুক্তি দিয়ে জগতকে বুঝতে চেয়েছে। এই যে যুক্তি—একে উপনিষদ বলছে অবিদ্যা—প্রকৃত বিদ্যা পাওয়া যায় উপলব্ধির মধ্যে। নিতাই সৃষ্টির এই বিস্ময়কে উপলব্ধি করেছে তার ফুলগাছের জীবনের সাথে,—তাই ও সাধক।

আমরা অন্ধকারে গা টেপাটিপি করে হাসলুম। অনাদিবাবু কি ভাবতে ভাবতে বিমর্ষ ভাবে চলতে লাগলেন।

হোষ্টেলে ফিরে সেদিন খুব হাসাহাসি। বন্ধু বললে, গাছ দেখলে প্রণাম করবি। ওই ত ভগবান, বিশেষতঃ তোর সেকেণ্ড পেপার খারাপ হ'য়েছে। পাথর ছাড়বিনে—সেটাও বাড়ে, ক্ষয় হয়—

আর একবন্ধু বললেন,—সোপেনহাওয়ারের একটা গল্প শুনেছি—শোন। একদিন তার এক মিটিংএ সভাপতি হওয়ার কথা। তার মেয়ে সেদিন তার সঙ্গে যেতে পারেনি। ষ্টেশনে গিয়ে একটা নোট ফেলে দিয়ে বললে, টিকিট দাও। বুকিং ক্লার্ক বলে—কোন ষ্টেশন? বুড়ো বলে,—টাকা দিয়েছি টিকেট দাও। মহা বচসা সুরু হল। স্টেশন মাষ্টার এসে বললে,—আপনি—জায়গায় সভায় যাবেন ত? হ্যাঁ—তা হ'লে অমুক স্টেশনের টিকিট দাও। স্টেশন মাষ্টার তাঁকে চিনতো। বুকিং ক্লার্ক টিকিট দিলে, দার্শনিক চোখ রাঙিয়ে বললে, সি দি ডিফারেনস্ বিটুইন এ বুকিং ক্লার্ক এ্যাণ্ড এ স্টেশন মাষ্টার। (স্টেশন মাষ্টার আর বুকিং ক্লার্কএর তফাৎ কোথায়, দেখলে।)

সকলে হেসে উঠল—বন্ধু বলল,—সেই গোত্রের লোক ত?

পরদিন আবার বিকেলে তাঁর সঙ্গ নিলাম। আমরা সবিনয়ে বললাম,—স্যার, আমরা ত ফিলজফির ছাত্র নয়, আমরা আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারিনে—

অনাদিবাবু বললেন,—অত্যন্ত সোজা কথা। এত জ্ঞানবিজ্ঞান মানুষ আহরণ করেছে, আজ চন্দ্রলোক বিজয় করছে, এ সব আবিষ্কার মানুষের সুখের জন্যে, অথচ মানুষ সুখী হয়নি, তার দুঃখ বেড়ে গেছে। কেন? তার হেতু—মানুষের বুদ্ধি বেড়েছে হৃদয় বাড়েনি। হৃদয় বাড়েনি তার কারণ এই জগতের বিশ্বজাগতিক শক্তিকে সে চিনতে পারেনি—আধ্যাত্মিক শিক্ষা ব্যতীত তার বুদ্ধি ব্যর্থ হয়েছে—কোন দর্শনেই এর সমাধান দিতে পারেনি, তবে হিন্দুদর্শন ইঙ্গিত দিয়েছিল—

বললাম,—যা সোজা ছিল তা ত আরোও দুরূহ হয়ে গেল আপনার কথায়।

—তা হয়। উপনিষদে হাতি দেখার গল্প জানো তো—ছয় অন্ধ হাতি দেখতে গিয়েছিল। হাতড়ে দেখে কেউ বলে হাতি কুলোর মত, কেউ বলে থামের মত, কেউ বলে সাপের মত—মহা তর্ক। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দিয়ে দেখেছে বলে তারা সকলেই আংশিক সত্য, উপলব্ধি দিয়ে দেখেনি বলে মোটের উপর ভুল—

অনাদিবাবুর দার্শনিক তথ্য হজম হচ্ছিল না তবুও তার সাথে সাথে আবার নিতাইএর ওখানে উপস্থিত হলাম। প্রশ্নের উত্তরে নিতাই বললে,—এই বাগানের সঙ্গে কত আনন্দ, কত দুঃখ, কত কি মনে পড়ে। কত মজার ঘটনা ঘটেছে—

—কি রকম?

—বড় রাজপুত্রের বিয়ে হওয়ার পর বৌরাণী একদিন আমার বাগানে এলেন। কত কি প্রশ্ন, এটা কি ওটা কি? কি ফুল, এই সব। তখন শীতকাল গোলাপের মরশুম। বাগান দেখে খুব খুশী হলেন। বললাম—বৌরাণী, আপনাদের বাড়ীতে বাগান নেই। তিনি বললেন,—আছে, তবে এত বড় নয়। এত রকম ফুলও নেই। আমি বললাম,—আপনি বলুন, কোন্ কোন্ ফুল দিয়ে তোড়া তৈরী করে দেব। যখন দয়া করে বাগানে এসেছেন—

বৌরাণী বললেন,—গোলাপ দিয়ে—

—কোন্ গোলাপ—

—তিনি আঙুল দিয়ে কতকগুলি বড় বড় গোলাপ দেখিয়ে দিলেন। আমি হেসে উঠলাম—

নিতাই সত্যি সত্যিই হেসে উঠল। বৌরাণী বললেন—হাসছ কেন?

বললুম,—ও ত বাজে গোলাপ, পলনিয়ন দেখতেই বড়, আর কোন গুণ নেই—আর রঙট একটু চটকদার—

—তা হোক, ঐ দাও।

—কিন্তু কাঁটা খুব গাছে, আপনার হাতে লাগবে। বরং ওর সঙ্গে কিছু মরশুমী দিয়ে তোড়া করে দি। তাই দিলাম তৈরী করে—যেমন বৌরাণীর চেহারা, যাওয়ার সময় মনে হল একরাশ ফুল আর একরাশ ফুল কোলে করে যাচ্ছে—

নিতাই একটু থেমে বোধহয় অতীতস্মৃতি রোমন্থন করে নিল। তারপরে বলল,—বৌরাণী প্রায়ই আসতেন, ফুল নিয়ে যেতেন। তাছাড়া সকালে ত আমি ঘরে ঘরে ফুল দিয়েই আসতাম। একদিন মাত্র একটি গোলাপ দিয়ে তাকে তোড়া করে দিতেই তিনি রেগে গেলেন। বললেন,—একটা গোলাপ! এত গোলাপ থাকতে একটা কেন?

—আজ্ঞে বৌরাণী, ঐ গোলাপটাকে দেখাব বলেই। ঐটি-রেখে দেবেন ঘরে—এতদিনত শত গোলাপ রেখেছেন। কাল আমাকে বলবেন,—ঐ এক গোলাপে আপনার ঘর বারান্দা গন্ধে মাত করে দেবে—তেমনি রংএর জৌলুস চোখ ঠিকরে দেবে—

ফুলটা তখনও ভাল ফোটেনি, গন্ধও তেমন নেই। পরদিন ফুটবে—ঠিক তাই হল। পরদিন বৌরাণী অবাক, একটা গোলাপে এত গন্ধ, এমন তার বর্ণ। তিনি গাছ দেখলেন, চিনলেন—বললুম ওরনাম ব্লাক প্রিন্স। বছরে তিনচারটে ফুলফোটে, কিন্তু সেরা ফুল—ঐ ফুল এক সপ্তাহ ঘর আলো করবে। কাঁচ আর হীরে—

নিতাই আপন মনে হেসে বলল, ভগবান কত গন্ধ কত রূপ দিয়েছেন তাকে। ঐ যে দেখছেন বাবু, ঐটে সেই গাছের কলম। সব গাছ চলে গেছে কিন্তু ওকে বুক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি। সে বৌরাণীরা কোথায় জানিনা, কিন্তু তার সেই আদর লেগে রয়েছে ওর গায়—

নিতাই থেমে থেমে বলল,—আর একবার এক কাণ্ড হল। বৌরাণী বাগানে এসে বললেন, এ সব কড়াইশুটি লাগিয়েছ কেন ফুলবাগানে? আমি কিছু বললুম না, চুপকরে গেলাম। তার পরে ফুল ফুটলে একটা তোড়া তৈরী করে, সিল্কের রুমালে ঢেকে নিয়ে যেয়ে বললাম,—বৌরাণী,ফুল না দেখে গন্ধ শুঁকে বলুনত কি ফুল? বৌরাণী একবারটি শুঁকেই বললেন,—গোলাপ। আমি ঢাকনা খুলে দিতেই তিনি অবাক—একি ফুল? বললুম—সেই কড়াইশুটি দেখেছিলেন তারই ফুল—সুইট-পি। এরপর থেকে সুইট-পি তার চাই-ই-চাই—ফুলের এমন টান যে তাকে রোজ আসতেই হবে বাগানে।

অনাদিবাবু বললেন,—এ সব গল্পত তোমার জিতের, হারের গল্প নেই—

—একটা আছে, তবে সেটায়ও শেষ পর্য্যন্ত জিত হল আমারই—

মনে হল অনাদিবাবুর এ গল্প জানা, আমাদের শোনাবার জন্যেই তার প্রশ্ন।

নিতাই বলল,—ছোট রাজকন্যাও খুব ফুল ভালবাসেন। তার বিয়ের পরে যেখানে তিনি গেলেন সেবাড়ীতেও খুব ফুলের চাষ। দুজনে মহাতর্ক, বাজি—কাদের বাগানে সব চেয়ে ভাল গোলাপ। তার পরে ঠিক হল তিনি ফুল নিয়ে আসবেন - তার মত ফুল দেখাতে হবে তেমনি বড়, তেমনি গন্ধ, তেমনি রং। শেষে একদিন বড় বড় কয়েকটি ফুল নিয়ে জামাইবাবু এলেন, ছোট রাজকন্যা তাকে নিয়ে এলেন আমার বাগানে। বললেন—নিতাই, এমনি ফুল আমাদের বাগানে নেই? আমি ফুল শুঁকে দেখে বললাম,—নেই। রাজকন্যা রেগে বললেন—কেন নেই? বললাম—আমি ভগবানের বাগানে কাজ করি, এফুল কোথায় পাব? ভগবানের দেওয়া হলে নিশ্চয়ই থাকতো!

জামাইবাবুর ত খুব অহঙ্কার—বললেন,—দ্যাখো হেরে গেলে—

জামাইবাবুকে একটি গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম—এই ফুল আপনার আছে, এমনি রং এমনি গন্ধ, এই রকম বড়—

জামাইবাবু একটু থতমত খেয়ে বললেন,—তা জানি না, যেয়ে দেখতে হবে? বুঝলাম সবই, জামাইবাবু ফুল চিনেছেন। বললাম,—এতবড় ইটয়েল ডি লিয়ন দেখেছেন কখনও?

হয়ত আছে। আমার কি সব মনে আছে? তবে তুমি ত আমায় ফুলের জুটি দিতে পারনি—

—অপরাধ না নেন ত বলি? ও ফুল ত বাগানে হয় না—

—তার মানে?

—বলব—

—বলনা—

—পলনিরণে আতরের গন্ধ। আমি আতর পাব কোথায় দিদিমণি? আমার বাগানে ভগবানের দেওয়া ফুল, এতে আতর নেই—

জামাইবাবু জব্দ!…

নিতাই বলল,—গরুতে যেমন নিরামিশ ঘাস পাতা খায়, বাঘে মাংস খায়, তেমনি গাছেরও খাদ্যাখাদ্য বিচার আছে—ঠিক খাবারটি না পেলে ওদের জাত যায়, দেহ ভাল থাকে না। ওদের সঙ্গে পরিচয় না হ'লে তা জানা যায় না—নইলে কি গর্ব করে বলতে পারি এমনি ইটয়েল ডি লিয়ন দেখেছেন?

নিতাই জয়ের গর্বে হেসে উঠে বলল,—তাই ত ঐ ফুল, ঐ সুইট-পি এখনও রেখেছি বাগানে। রাজা চলে গেছে, রাজকন্যে, বৌরাণী কেউ নেই, কিন্তু ওদের আমি রেখেছি বাঁচিয়ে—পাছে মরে যায় তাই বাড়ী যেতে পারিনে। নিতাইএর কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে এল, কেন ঠিক বুঝলাম না —তখন চারিপাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। অনাদিবাবু উঠলেন—

আমরাও নিঃশব্দে পিছন পিছন চললাম। সুর বললেন, ওটা নিতাইএর আপনার। যেমন আমরা গর্ব করি,— আমার ছাত্র অমুক আই, সি, এস হয়েছে, অমুক মন্ত্রী হ'য়েছে এমনি। সৃষ্টির আনন্দ,—ভগবানের এই সৃষ্টির মাঝে ও ওর জগৎ সৃষ্টি করে আনন্দে অধীর, গর্ব্বে অন্ধ। বুঝলে, রাজবধূ, রাজকন্যা, অবান্তর—ওর কাছে ফুলই ওর রাজবধূ, রাজকন্যা, রাজ্য—

আমাদের বাতিকটা মন্দীভূত হ'য়ে এলে অনাদিবাবুর সঙ্গ ছেড়ে দিলাম, কিন্তু লক্ষ্য করতাম নিরলস নিতাই কলেজের কাজের ফাঁকে যতটুকু সময় পায় ঐ বাগান নিয়েই থাকে—পরম স্নেহে তার ক্ষুদ্র বাগানটায় লালন পালন করে—সেই বাগানের গাছ মাটি আর ফুলের মধ্যে কি যেন একটা অতীন্দ্রিয় আনন্দ পায় নিতাই।

অনাদিবাবুর অবসর নেওয়ার সময় হ'য়ে এসেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে নোটিশ দিয়েছেন। সংবাদটা শুনে মনটা দুঃখে ভরে গেল আমাদের। এই আত্মভোলা সজ্জন ব্যক্তি আর এখানে থাকবেন না, একথা মনে করতেই যেন হৃদয় ফেটে পড়ে। তারপর তিনি একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন—আমরা দেখতে গেলাম।

অনাদিবাবু সহাস্য মুখে বললেন,—কি হে, তোমরা কেন? অসুখ কিছু নয়, ওটা বার্দ্ধক্য, অসুখ নয়। ওষধি যেমন বড় হয়, ফল দেয়, আবার শুকিয়ে যায়—এও ঠিক তাই। পৃথিবীর হাওয়া, জল, প্রকৃতির শক্তি একই আছে, কিন্তু পিছনের সেই শক্তি জবাব দিয়েছে—

আজ আমরা হাসতে পাচ্ছি না,—তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে একটা ভয়াবহ বেদনার সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে। আমরা চুপ করে শুনছি—

হঠাৎ নিতাই ব্যথিত উত্তেজিতভাবে ঘরে প্রবেশ করে বললে,—বাবু, বাবু—

—কি হল নিতাই—

—আমার বাগানে ফিতে ফেলে সব মাপামাপি ক'রছে কেন?

—মাপ্‌ছে কেন?

—হ্যাঁ—বলছে বিজ্ঞান ভবন না কি হবে। এই গোলাপবাগের সবই ত গেছে, কিছু নেই—এক পাশে আমার যথের ধন আছে, তাও থাকবে না—মাটি থাকবে না? গাছ থাকবে না—সব দালান আর বিজ্ঞান ভবন হবে?

অনাদিবাবু বললেন,—কেন বিজ্ঞান ভবনের সীমানা কি তোমার বাগানের মধ্যে গিয়ে পড়েছে?

—হ্যাঁ ঠিক বাগানের মাঝে ফিতে ফেলেছে। ব্লাক-প্রিন্স আর ইটয়েল ডি-লিয়নের মাঝখান দিয়ে—সেখান দিয়ে পত্তন হবে দালানের—

—তাই হবে হয়ত—

—তবে কি নিয়ে থাকবো, কি আর চাকুরী করব? বাড়ী চলে যাই—নিতাই রাগে অভিমানে যেন কেঁদে ফেলল মনে হয়।

অনাদিবাবু রোগক্লান্ত কণ্ঠে বললেন,—সব গোলাপ-বাগই বিজ্ঞান ভবন হতে চলেছে নিতাই, তোমার বাগান আর এরমাঝে কি করে থাকবে? তবে হ্যাঁ থাকবে, দালানের ছাতে টবে তোমার বাগান থাকবে—কেন জানো?

আমরা নীরব। কেবল নিতাই দুঃখে ক্ষোভে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে—

অনাদিবাবু বললেন, মানুষকে যন্ত্র-দানবে ধরেছে নিতাই, তার আত্মা নিরন্তর কাঁদছে তাই তোমার চোখে জল, আর গোলাপবাগের গোলাপ ছাতের টবে বসে চোখের জল ফেলছে—

নিতাই উত্তেজিতভাবে বলল,—আমার বাগানে ফিতে ফেলেছে বাবু, আমি আর থাকবো না, কিছুতেই থাকবো না এখানে,—আজ পঞ্চাশ বছর রয়েছি—

নিতাই হয়ত চোখে গামছা চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল। অনাদিবাবু হেঁকে বললেন,—যেতেই হবে নিতাই। আমরা এক গাড়ীতেই যাবো, আমার বাড়ীও ঐ দিকে—

অনাদিবাবুর যাবার দিন এগিয়ে এল। পাশ্চাত্য মতে আমরা ফেয়ার ওয়েলের ব্যবস্থা করে কিছু দামী জিনিষপত্র দিলাম, তার সঙ্গে শ্রদ্ধা দিয়েছিলাম কিনা জানিনা, তবে ধুম ধামের অভাব হয়নি এটুকু জানি।

অনাদিবাবু যাবার দিনে হাস্‌তে চেষ্টা করে বার বার চোখের জল ফেললেন। বললেন—আমার জায়গায় আর লোক লাগবেনা—ফিলজফি পড়ে ত কোন কাজে লাগে না, অর্থও অর্জন করা যায় না,—ও শাস্ত্রটাই এখন অকেজো হ'য়ে গেল। মানুষের বুদ্ধি এত বেড়েছে যে হৃদয় আজ বেঁচে নেই। এখন ইকনমিক্‌সের যুগ—

আমরা তাঁর খেদোক্তিতে কোনরকম বিচলিত না হ'য়ে ষ্টেশনে তুলতে গেলাম। গাড়ী ছাড়বার কিছু আগে নিতাই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রশ্ন করলো,—বাবু, বাবু কোথায়?

—কেন নিতাই, দেখা করবে?

—না দেখা কিসের? এই যে, এই যে বাবু, আমিও যাবো, এই যে টিকিট কেটেছি। অনাদিবাবু বললেন,—তুমিও যাবে? কেন কি হল? চল এক সঙ্গেই যাই—

—ওরা সব আমার বাগানে ফিতে ফেলে খুঁটো পুঁতে দিয়েছে। বিজ্ঞান ভবনের পুস্তন কাটবে। আমার ডাচার, পল নিয়ন, ব্লাক প্রিন্সের গাছ কেটে গর্ত্ত করবে বাবু, তাই দেখবো দাঁড়িয়ে? গোলাপ বাগে গোলাপ নেই ত নিতাইও নেই।

অনাদিবাবুর পিছন পিছন নিতাই তার ব্যাগ আর টিনের সুটকেশ নিয়ে গাড়ীতে উঠলো। আমরা জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম,। অনাদিবাবু বললেন,—তোমরা আর কেন দেরী করছ, বেলা হল। গাড়ীত ছাড়বেই—এ নতুন পৃথিবী তোমাদেরই রইল।

নিতাই কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলল—বাবু এতক্ষণে ওরা আমার সব কেটে ফেলেছে—বৌরাণীর ব্লাক প্রিন্স, গাছে কুঁড়ি এসেছিল বাবু—

একটা চরম হতাশা ও ব্যর্থতায় নিতাই চোখ মুদল—ধরা গলায় বললে—এই গোলাপবাগে ভগবানের লীলা চলত—কি ছিল, কি হল—

আমরা ফিরে এলাম, গোলাপবাগের রিক্ততা যেন নতুন করে আমার চোখে লাগল। নিতাইএর ফুল-বাগানের মধ্যদিয়ে আমাদের সায়ান্স ব্লকের পুস্তন কাটা আরম্ভ হ'য়ে গেছে,—শিকড় সমেত গোলাপের গাছটা গর্ত্তের পাশে খর রৌদ্রতাপে পড়ে আছে। তাদের দেখলে নিতাই হয়ত বুক চাপড়ে কাঁদতো—

শেষ রবিরশ্মি

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

"যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে ততক্ষণ তাকে নূতন করেই দেখি, তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়" জন্মোৎসব। রবীন্দ্রনাথ॥

কবীন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর মধ্যে মানুষ কয়েক দিনের আনন্দোজ্জ্বলতার সম্ভাবনাকে আশার আলোকে উদ্ভাসিত করে দেখতে চায়। জাতককে আপনকরে পাওয়ার যে নিষ্ঠা ঔদার্য্য তা নবাদর্শের দীক্ষা গ্রহণের মধ্যদিয়ে সত্য হয়ে উঠে; তখন তা দায়ে পড়ে করার মত বা বহির্বিশ্বের সঙ্গে পাল্লাদিতে সুরু করেনা।

আবার বলেছেন—"আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ, তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে দেখতে পাই···যেখানে এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব।"

"সত্য যেখানে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানেই উৎসব" রবীন্দ্রনাথ। আপনকরে পেতে হবে, আপনকরে নিতে হবে কবিকে। তা কেমন করে? কবি বলেছেন—

"নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে অহংকারকে খর্ব করা মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে, ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়।"

নিজের গর্বকে খর্ব করে, অহংকারকে খাটো করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বিশ্ব কবির আদর্শনীতি ও বাণীকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর আদর্শে স্থিত হয়ে তাঁর জ্ঞান দিয়ে তাঁকে জেনে—তাঁকে আপন করে নিলে সার্থক হবে জন্মোৎসব। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে জানতে হবে। কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে ব্রহ্ম হ'তে হবে।

সামাজিক রাষ্ট্রিক আধ্যাত্মিক বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত মানুষকে নৈরাশ্য নিয়ে ঢেকে রেখেছে—অনন্ত অন্ধকার যেমন আলোককে ছেয়ে থাকে, বর্ষার অজস্র মেঘ যেমন করে সূর্য্যকে রাখে ঢেকে, গুহান্তরালে রয়েছে যারা এবং যারা দৃষ্টি শক্তি হারা সূর্য্যকে দেখতে পায়না, তারা সূর্য্যকে দেখবার সর্ব সৌভাগ্য ও সম্ভাবনা হ'তে বঞ্চিত। যদিও অজস্র সূর্য্যরশ্মি তাদের চারিপাশে রয়েছে ভীড় করে, আঘাত হানে দুয়ারে দুয়ারে, তেমনি কবিগুরুকে আপন করে পাওয়ার জানার সকল সম্ভাবনা ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েও মানুষ বঞ্চিত। হেতু শুধু বহির্মুখীনতা অজ্ঞানতা। সত্যকে উপলব্ধি করার, সত্যকে জানার জন্য যে অন্তর্মুখীনতার প্রয়োজন তার থেকে দূরে সরে রয়েছে, 'বাহির দেখা দেখলি শুধু হৃদয় মাঝে দেখলি না' নিজেকে না দেখে নিজেকে না খাটো করে অন্তর্বিষয়ে মন প্রবিষ্ট হতে পারে না। বিষয় বাসনা লোকৈষণা হ'ল অন্তর্মুখীনতার বিশেষ প্রতিবন্ধক।

যে সুযোগ আসে একবার তাকে কেমন করে অভিনন্দিত করা যেতে পারে—তা গভীর ভাবনা দিয়ে ভেবে বেছে নিতে হবে। যেমন করে দেবার্চ্চনায় বাহ্য ঢাক-ঢোল বা জয়ে নৈবেদ্যের ঘটা করে বৃথার্চ্চনা না করে আত্মসমাহিত হয়ে পরমভক্তি শ্রদ্ধাসহযোগে দেবারাধনা সার্থক হয়ে উঠে—তেমনি করে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রেমদিয়ে আমাদের বিশ্বকবিকে বরণ করে নিতে হবে, পেতে হবে আত্ম মাঝে আমাদের হৃদয়ে শিল্পে, সাহিত্যে, কলায়, কবিত্বে ও গানে।

প্রদীপ নিভবার আগে তার সমস্ত শক্তি উৎসারিত করে প্রয়োগকরে নিজেকে উজার করে শেষ শিখাটি মেলে ধরে দিতে আকাশের কোলে। সূর্য্য ডোববার প্রাক্কালে সূর্য্য তার শেষ রশ্মি ধরার ধূলায় অন্তরীক্ষে, আকাশের আনাচে-কানাচে রক্তিমাভা ছড়িয়ে যায়। এই যে প্রথম জলা প্রদীপ ও শেষনির্বাণ প্রদীপ-শিখা, উষার উদিত সূর্য্য আর সন্ধ্যার অস্তগামী সূর্য্য, এতে রয়ে গেছে অনেক অনেক ব্যবধান; অনেক কর্ম নৈপুণ্য অশেষ সৃষ্টির বৈচিত্র্য তা তো সবার বোধগম্য নয়। তেমনি রবীন্দ্রের প্রথম প্রকাশ

আর শেষ প্রকাশের মধ্যে অবিমিশ্র মাধুর্য্য ও ভাবনা, অশেষ নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য ছেয়ে আছে। "জল পড়ে পাতানড়ে" আর "শাস্তির অক্ষম অধিকার" প্রথম শিখা আর শেষ শিখা—এর মধ্যে রয়ে গেছে অনন্ত প্রেম, রয়ে গেছে শাশ্বত জিজ্ঞাসা। যেমন আকাশ আর অবনী বহুবহুদূর হলেও প্রাণের সুষমা বলয়ে একত্রে বাঁধা পড়েছে, রবীন্দ্র-ভাবসিন্ধু তেমনি অবিমিশ্রভাবে পরিপূর্ণ থেকেও এক বিশিষ্ট অদ্বৈতকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাঁর এই শেষ লিখা তথা শেষ শিখা "তোমার সৃষ্টির পথ"—যা মানবের শাশ্বত জিজ্ঞাসা এবং লোভনীয় সামগ্রী—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি।
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী।"

কবিবর অন্তিমকালে মৃত্যুর শীতল বক্ষে শায়িত হ'য়ে জীবনের অমূল্য অমৃত নির্য্যাস নিখিল বিশ্ববাসীর জন্যে রেখে গেছেন। যেমন করে মহাদেব হলাহল পান করে অমৃত সিন্ধু দিয়ে গেছেন বিশ্বপ্রাণীকে—তেমনি রবীন্দ্রনাথ জগতের ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে থেকে সমস্ত জীবন ধরে যা পেয়েছেন তাই তিনি সর্বশেষ বাণীতে ব্যক্ত করেছেন যা মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা শাশ্বত গ্রাহ্য।

ষোড়শবর্ষীয় শঙ্করাচার্য্য যা বলে গেছেন "মায়াময়-মিদং অখিলং হিত্বা" মায়াময় এ জগত মায়িক অপূর্ব। এ জগত মায়াময়। প্রকৃতির সৃষ্টি। অসংখ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে, অনন্য বৈচিত্র্যে ভরা রয়েছে এর প্রতি অণু পরমাণু। আজ যা এখানে সত্য বলে মনে করে জড়িয়ে ধরে, কাল তা দূরে সরে যায়। পদ্মপাতার জল যেমন টলমল করে এখানের ব্যাপারটা তাই। মুহূর্তে এই আসে এই আসে এই যায় চলে ফের এই নাই। এমনিই এর লীলা বৈশিষ্ট্য। "সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নেই, সংসারের তত্ত্বই হ'চ্ছে সরে যাওয়া, সুতরাং তাকে চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাওয়া হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলেছেন—
"বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্"
বিকার ও গুণগুলি প্রকৃতি হ'তে উদ্ভূত।

"এই শক্তির ক্ষেত্র মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়। এর কোনখানে এসে মানুষ চিরদিনের মতো বলে না যে এই-খানে পৌঁছান গেল।" প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ

"মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে"

মানুষ দেখতে পেয়েছে যে সংসারের সঞ্চয়ন প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে যায়। যতই ভয় ভাবনা করি, ততই আগলে আগলে রাখি, কাল সমস্তই নষ্ট করবে, নবীন সৌন্দর্য্য কোথাও রাখবে না" রবীন্দ্রনাথ। তারপরে "তোমরা সংসারবাসী মৃত্যুর পুত্র নও, তোমরা যে ধামে রয়েছ যে লোকে বাস করছো, সে কোন্ লোক ?......তোমরা দিব্যলোকে বাস করছো"— রবীন্দ্রনাথ।

'অমৃতস্য পুত্রাঃ' শ্রুতি। অমৃতের পুত্র, অমৃতের শিশু, অমৃত শিশু, অমৃত লোক —স্বর্গ লোক। এই যে সহজ বোধ, এই সহজ সরল জীবনে এসে দেখা দেয় মমত্ববোধ, কুটিলতা বিদ্বেষ যা নির্বেদ। সহরের মাঝে দেখা দিয়েছে কুটিলতা যা মৃত্যুলোকে নিয়ে যায়, যা অন্ধকার পথ—কিন্তু আমরা অমৃতের সন্তান। তাঁর থেকেই এই মন, দিব্য মন, এই তনু দিব্যতনু, এই মর্তভূমি দিব্যভূমি ঈশ্বরের আবাসভূমি "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বম্"।

ধূলি আমি ধূলো তুমি ধূলি খেলা এ বিশ্বভুবন
তিনি ধূলো, ধূলি তিনি-এও তাঁরি পরম সৃজন।
তারা জলে বহ্নিজলে শক্তিমান বিশ্বে বৈশ্বানর,
বহ্নি কণা আঁখি মেলে দীপ্ত জলে সেও শক্তিধর॥

এই পরম সত্যকে, দিব্য বোধকে, আবৃত করে রেখেছে, এই মায়া মিথ্যার জাল ফেলে মায়া বেড়ে বাঁধা পড়েছে যেমন করে গুঁটি পোকা নিজের তন্তুতে নিজেই বাঁধা পড়ে।

অগ্নি জলে উর্দ্ধে শিখা মেলে নিজে জলে অন্যকে পোড়ায়
চিত্ত জলে বিরহ অনলে অপরেও দগ্ধে সে ব্যথায়।
এ হৃদয় নিশিদিনজলে জলেনিজে জ্বালায় অন্যেরে
বক্ষ ভাসে নয়নের জলে অপরেও ভাসে সেই নীরে।
সে দহন বুঝেনাক কেউ, হে হৃদয়, হও নির্বিকার
যমুনার রাঙ্গা প্রেম ঢেউ এ ভুবন আলোক আঁধার॥

এমনি সহজ হতে সহজ সরল জীবন পেয়েও সত্যকে দেখতে পায় না। আলেয়ার পিছু পিছু ছুটে ছুটে জীবন যায় বৃথা কেটে, সত্যকে আর চেনা হয় না।

"এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছে চিহ্নিত
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।"

প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র। প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে প্রচার করছেন, আর জীবাত্মার প্রেমের দ্বারা নিজেকে দান করছেন" রবীন্দ্রনাথ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দেখা তাঁর অমর বাণী—

"কাল ও জীবের সহিত বিশ্বের সৃষ্টির যত কারণাদি
সে সব ব্রহ্মের আপন সৃজিত শক্তিতে হয়ে আশ্রিত।"

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ১৩।২১ "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।"

পুরুষই প্রকৃতিতে হয়ে অবস্থিত প্রকৃতির গুণ সব করে উপভোগ।

এই মায়াময়, প্রবঞ্চনাময়, প্রপঞ্চে সেই মায়াধীশের ভোগের জন্যই, তাঁরই জয়গাথা, গুণগান প্রচারের জন্যই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দ লীলা বিকশিত করে তুলছেন" "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ব্রহ্ম সূত্র। এখানের মতই সেখানের লীলা খেলা কিম্বা সেখানের মতই এখানের লীলা খেলা। সেই ব্রহ্মই অভীপ্সানলে নিজেকে আহুতি দিয়েছেন, তাই তো আশ্রয় নিয়েছেন মায়ার কোলে শিশু হয়ে। অমৃত শিশু।

হে ব্রাহ্মণ! কুণ্ডলিত অভীপ্সা অনলে
করিয়াছ আপনারে আহুতি প্রদান
উদ্বেলিত চেতনার ক্ষুব্ধ অন্তঃস্তলে
বিশ্বঘিরে সে অনল জ্বলে অনির্বাণ।
অনন্তের বক্ষমাঝে অবিদ্যা তিমিরে
স্বর্ণাক্ষরে লিখে যাও অগ্নিময় বাণী
জাগাইলে এ সৃষ্টির বিস্মৃত স্মৃতিরে
জ্বালাইলে অব্যাকৃতে জ্বলে বিশ্ব প্রাণী।

যেমনি করে অসংখ্য প্রবঞ্চনা দিয়ে ঘেরা রয়েছে এই বিশ্ব প্রপঞ্চ তেমনি করে এর থেকে মুক্তি পাবারও পথ তিনি রেখেছেন উন্মুক্ত করে—

"তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চির স্বচ্ছ
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।"

"সত্য হচ্ছেন নিয়ম স্বরূপ, তাঁকে জানতে হলে তাঁর বাঁধন মানতেই হবে……যিনি পূর্ণসত্যস্বরূপ তিনি অন্যের নিয়মে বদ্ধ হন না। তাঁর নিজের নিয়মই নিজেরই মধ্যে।" রবীন্দ্রনাথ। এ বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রবঞ্চনা দিয়ে পূর্ণ থাকলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ ও পূর্ণ ভাবেই খোলা রয়েছে, তা তাঁর সত্য পথ, দেবযান পথ, সে পথ সহজ বিশ্বাসের পথ। পূর্ণতম বিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত। তা আত্মনিবেদন তথা আত্মাহুতির বহ্নিতে চিরজ্যোতিষ্মান। দিব্য চেতনানলে চিরভাস্বর।

প্রজ্বলিত হোমাগ্নির জ্যোতির শিখায়
ভ্রূ মধ্যের দিব্য দৃষ্টি করে উন্মোচিত।
প্রজ্ঞাঘন অমৃতের অখণ্ড সত্তায়
অবর্ণ সোঽমধ্বনি হয় যে ধ্বনিত॥

"প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একটি স্বাতন্ত্র্য আছে নইলে প্রকৃতির উপরে তাঁর তো কোন ক্রিয়া চলতো না· ঈশ্বর এই প্রকৃতিকে কী দিয়ে পৃথক করে দিয়েছেন? নিয়ম দিয়ে।" রবীন্দ্রনাথ। এই জগত আলোছায়া ঘেরা, সত্য মিথ্যা ভরা, ক্ষর অক্ষর দিয়ে পূর্ণ, এপার ওপার নিয়ে পরিপূর্ণ, বক্র, ঋজু, অন্তর আর বাহির এই দ্বন্দ্বময়ই সংসার। এই দ্বন্দ্বময় জগতে অন্তরের পথই প্রেমপথ। অন্তরের প্রোজ্জ্বল দ্যুতিতে সত্যের পরম পথ মিলে। এ পথ দ্যুলোকের পথ। তাই বলা হচ্ছে—

কামনার প্রদীপ্ত অনল, অসীমের বক্ষ ঘিরে জ্বলে
অহুক্ষণ
অগ্নিময় সে কুণ্ডের মাঝে নির্বিচারে আপনাকে
করেছে অর্পণ।

নিত্যেরি এ পরম বিহার
লীলা নৃত্য চির অধিকার
অনিত্যেরি নাভি পদ্ম হ'তে, অপ্রাকৃত প্রপঞ্চের
মহৎ সৃজন।
লুব্ধ চিত্ত ব্যূহের মাঝার, সমাবিষ্ট সর্ব-আত্ম কেন্দ্রিক স্পন্দন
নিত্যেরি তালে অনিত্য ছন্দ
অনিত্যেতে নিত্য সত্য বন্ধ

বীর্য্য শূন্য বিকৃত কলঙ্ক বিচিত্র ধূসর বর্ণে আঁকা আলিম্পন।
পরম বিলাস তার এ যে, নিখিল প্রপঞ্চ ঘিরে বঞ্চনা স্ফুরণ
বিষময় কামনার শরে
নিজেকে সে বিষ দিয়ে ভরে
সত্য হীন নিত্য প্রবঞ্চনা, অন্তরের কুণ্ডে জ্বলে দীপ্ত
হুতাশন।
এও সেই সত্যের নিয়ম, প্রপঞ্চের প্রবঞ্চনা নিত্যেরি ভূষণ
শাশ্বত সত্যের এই রথ
সত্য তার চির গতি পথ
সত্য পথ সত্যের সাধন, নিত্য সঙ্গী সত্য পথে যে করে
গমন,
নিত্য যবে করে আলিঙ্গন অনিত্য নিত্যকে তবে করে
সে বরণ॥

সেই পরম সত্যকে নিজের মাঝখানে জেনে অবশেষে তা বহুরূপে দেখতে হবে "যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে", বাহিরে অনেক সময় ভুল দেখা হতে পারে কিন্তু অন্তরে তা সহজ ও নির্ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই কবি বলেছেন—

"বাহিরে কুটিল হ'ক অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত
সত্যের সে পায়
আপনার আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।"

"নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে সেই সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলে অন্যের মধ্যেও সেই সত্যকে দেখতে পাব না, যখন জানবো যে পরমাত্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমাত্মা আছেন।" ·····রবীন্দ্রনাথ। তখনই তা যথার্থ দর্শন হবে—গীতায় বলছেন—

সর্ব্বভূতামাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥" গীঃ ৬।২৯

অর্থাৎ যোগ যুক্ত আত্মা যাহার সর্বত্র তাঁহার সমদর্শন।

সর্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত এমনি
করেন ঈক্ষণ॥

আত্মস্বরূপানুভব (Self Realisation) দিয়ে জান্তে হবে। এই বিশ্বের বহিরাবরণ যদিও কুটিল মায়াময় তত্রাচ এই মায়াকে বশ করেই মায়াধীশকে জানতে হবে। যেমন নারকেল উপরে ছোবড়া তাপের শক্ত খোসা, তার পর শাঁস, এও তেমনি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরো বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতান তরন্তিতে॥
গীঃ ৭।১৪

এই গুণময়ী দৈবী মায়া মম কাটাইয়া উঠা শক্ত অতিশয়।
কিন্তু যারা লয় আমার আশ্রয় তারাই এ মায়াকে করে
অতিক্রম

সত্যকে আশ্রয় করে কুটিলতাকে ত্যাগ করে আত্মস্বরূপে যে স্থিত হতে পারে সেই তাকে পেতে পারে, সত্যকে লাভ করে, মাতৃসাধকের ভাষায় 'মাকে ভজ বাপকে পাবে' "সত্যে শেষ নয় মঙ্গলে শেষ নয় অদ্বৈতেই শেষ" রবীন্দ্রনাথ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—ক্ষরও আমি, অক্ষরও আমি এবং এই উভয় হয়েও এদেরও অতীত পুরুষোত্তম আমি। গীতা ১৫।১৮

আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে আত্মালোকে উদ্ভাসিত হলে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছলনা সরে যায়। সত্যের আলোকে মায়াও ঝলমলিয়ে উঠে, অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্তায় হৃদয় ভরে যায়—

"কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে"

পরমাত্মস্বরূপে আবৃত হ'য়ে, অমৃতসিন্ধুতে অবগাহন স্নান করে পরম পাওয়াকে একান্ত করে লাভ করে। "সেই অন্তরাত্মার নিত্যধামে পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্তি হয়েই আছে—রবীন্দ্রনাথ—

কঠোপনিষদ তাই বলছেন—

চেতন বস্তর মাঝে তিনিই চেতন, অনিত্য বস্তর মাঝারে
তিনি নিত্য হন।
অদ্বিতীয় হইয়াও জীব সকলের সর্ব কর্ম ফল
তিনি বিধান করেন।
সেই সে আত্মাকে দেখে অন্তরে নিজের
নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হন সেই জ্ঞানিগণ॥

বিশ্বকবি তাই বলেছেন—সর্বশেষে—

"অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার ॥"

"যাঁকে পাওয়া হ'য়ে গেছে তাঁকে নানা রকম করে পাচ্ছি। সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে, লোকে লোকান্তরে...তখন সে জানে "সত্যংজ্ঞানময়ম্" অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মতো গ্রহণ করে আছেন সংসারে তাঁরই "আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি" "সংসারে তাঁর প্রেমের লীলা। এইখানে নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের চিরযোগ আনন্দের অমৃতের যোগ।" রবীন্দ্রনাথ এপার ওপারকে এক করে দেখতে পেরেছে যে মন সে মন চিরস্থায়ী শান্তির অধিকারী। যেমন নদী উভয় কূলকে সমান ভাবে লালন পালন করে সমুদ্রে মিশে যায়, তেমনি জীবন নদীর একুল ওকুল অর্থাৎ প্রবঞ্চনাময় ছলনাময় এই মর্তের ছল-চাতুরী সহ্য করে অমর্ত জীবনের দিব্যলোকে স্থির বস্তুকে গ্রহণ করে অর্থাৎ মর্তের মাটিতে দৃষ্টি রেখেও ঊর্দ্ধের পানে—দ্যুলোকের দিকে লক্ষ্য রেখে মমত্বযোগে স্থিত হতে পেরেছে, যে ক্ষরকে অক্ষরকে আয়ত্ব করতে পেরেছে, সত্যকে জানে মঙ্গলকে দেখেছে এই সত্য ও মঙ্গলকে জেনে পরম শান্তিরূপে ব্রহ্মে ঈশ্বরে স্থিত হয়ে শাশ্বত অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়। জীবের এই শাশ্বত প্রশ্ন পরম-পাওয়া অনন্তকাল ধরে চলে এসেছে "শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ" নারদ সূত্রে।

"পাওয়ার তত্ত্ব কেবলমাত্র ব্রহ্মেই আছে, কেননা তিনিই হচ্ছেন সত্য" রবীন্দ্রনাথ। আর এই শাশ্বত সত্যকে যিনি জানেন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন—তাই বলা যেতে পারে—

সুনিশ্চয় পথ চলা পথিকের সে চির আশ্রয়
শ্রান্ত নীল শঙ্কাতুর এ চিত্তের প্রসন্ন অভয়।
মৃত্যুর শীতল শৈলে অমৃতের সাগর অতলে
নিদ্রার সোনার স্বপ্নে জাগরণে শিশিরের জলে
সেই শুধু শঙ্কাহরা মনোহরা আশ্রিত আলয়
যতটুকু ভেবে পাই সে হৃদয় অনন্ত অক্ষয়।
সুখের সংসারে কিম্বা তপ্তশোক দুঃখের গরলে
বনানীর বন্যতায় হরিণীর অশ্রুসিক্ত জলে।
হিংস্রতায় ঘৃণ্যতায় রক্তমাখা সিংহের গুহায়
করুণায় দৈন্যতায় ভীরু লাজ কুমারী হিয়ায়।
আকাশের নীল জলে ভুলতুলে তারার নয়নে
ছোট ছোট ঘাস ফুল বুল বুল আলোর কিরণে।
সেইখানে থাক না সে জানি জানি সে যে প্রেমময়
সে যে এই জীবনের মরণের পরম আশ্রয় ॥

আর যিনি এই পরমতত্ত্ব বিশ্ববাসীকে সন্ধান দিতে পারেন তিনিই কবি—মনীষী, ঋষি।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যাদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ঈশোপনিষদ

তুমি কবি মনীষী দুষ্ট নিসূদন হে অনাদিরাদি ভগবান
অবিনশ্বর প্রজাদের তুমি যথাযথ ফলের করেছ বিধান ॥
হে কবি তব শুভ সৃষ্টির স্মরণে,
কিম্বা তব মর্ত হতে বিদায়ের ক্ষণে।
হৃদয়ের অর্ঘ্যরাজী রাখি সযতনে ॥
ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

এস

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মহাভারতের মহারণ কই
হয় নাই আজো শেষ
কোথায় পার্থ ধূলা হতে তব
তুলে লও রাঙা বেশ।
কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে হোথা
হাঁকে অরি ভীম রবে।

এস হে পার্থ, এস ভীমসেন
রক্ষা কর'গো সবে।
পার্থ-সারথি এস এস আজ
অত্যাচারীর খুলে নাও সাজ
দুষমণ যত যাক হটে যাক
নাহি যেন রয় লেশ

অকালে আকাশে মেঘ ঘনালো।

এতক্ষণে ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছিল। সামনের শিরীষ গাছটার পাতায় পাতায় পড়ন্ত বেলার রোদ ঝিলমিল করছিল।

আকাশের এ-প্রান্তে সে-প্রান্তে হেমন্তের কয়েক টুকরো নিরীহ মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। আঁচমকা প্রায় বিনা ভূমিকাতেই সেগুলো মিলে মিশে একাকার হয়ে আকাশ-টাকে ছেয়ে ফেলল। বেলাশেষের আলোটুকু নির্জীব হয়ে এল। এখন ছায়া-ছায়া অন্ধকার।

ঝিরঝিরে বাতাস মেতে উঠে সামনের সেই শিরীষ গাছের মাথাটাকে এলোপাথাড়ি ঝাঁকাতে শুরু করেছে। এক ঝাঁক তিতির বাতাসের ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে কোন দিকে যে অদৃশ্য হ'ল!

প্রথমে ততটা খেয়াল করে নি শোভনা। কিংবা করলেও বিশেষ গ্রাহ্য করে নি। স্কুলবাড়ি থেকে হস্টেল মাত্র মিনিট দশেকের পথ। ভেবেছিল এ পথটুকু পাড়ি দিতে আর বৃষ্টি নামবে না। কিন্তু নামল। শিরীষ গাছটার কাছা-কাছি আসতেই বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করে দিল।

একবার পেছন ফিরে তাকাল শোভনা। মিশন স্কুলের লাল রঙের বিশাল বাড়িটা এখন ঝাপসা দেখাচ্ছে। স্কুল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রেভারেণ্ড মণ্ডলের কুঠিটাও নিবু-নিবু আলোর পটে প্রায় নিরাকার একটা ছবির মতই মনে হচ্ছে।

অনেকটা পথ এসে পড়েছে শোভনা। এখান থেকে স্কুলবাড়িতে কি রেভারেণ্ড মণ্ডলের কুঠিতে ফিরে গিয়েও বৃষ্টি নামলে কতক্ষণ আটকে থাকতে হবে, কিছু ঠিক নেই। তার চাইতে হস্টেলে ফিরে শাড়িটা বদলে ফেললেই চলবে।

অতএব জোরে জোরে পা চালিয়ে দিল শোভনা। মফঃস্বল শহরের রাস্তা। কুমীরের পিঠের কাঁটার মত খোয়া মাথা তুলে তুলে রয়েছে। প্রতি পদক্ষেপেই এখানে মাধ্যাকর্ষণ।

শিরীষ গাছটার পর খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তারপর সারি সারি শিশু আর কড়ি গাছ। ফাঁকে ফাঁকে ইতস্তত দু-চারটে কৃষ্ণচূড়া। সামনের বাঁক পর্যন্ত খোয়ার পথটা একেবারে নির্জন, নিঝুম। বাঁক থেকে বাঁ দিকে একটা

লাল সুরকির রাস্তা সোজা নদীর দিকে চলে গেছে। এর কোন সুরাহা নেই। কেননা আকাশের যা অবস্থা, জোরে হাঁটা দরকার। এই রাস্তাটাই শহরের হৃদ্‌পিণ্ড। তারদু-পাশে দোকানপাট, জমজমাট বাজার। দেওয়ানী এবং ফৌজদারি—দুটো আদালতই এ-অঞ্চলে। প্রায় পাশাপাশিই। কাছারি-পাড়া পেরিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে মিশন গার্লস্ স্কুলের হস্টেল। স্কুলবাড়ি থেকে হস্টেল পর্যন্ত পথটুকু শোভনার মুখস্থ।

এতক্ষণ বড় বড় ফোঁটা পড়ছিল। এবার তীরের ফলার মত ঝরছে। বাতাস আরো মেতে উঠেছে।

নাঃ, আকাশের বর্ষা সহজে রেহাই দেবে না। বৃষ্টির ছাটে শাড়ি-ব্লাউজ ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। শাড়ির প্রান্তটা পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রথমে জোরে জোরে হাঁটছিল শোভনা। যদি না-ভিজে পারা যায়! এখন আর উপায় নেই। চলার বেগ সুতরাং কমিয়ে দিল সে। তা ছাড়া অকালের বৃষ্টিতে ভিজতে মোটামুটি মন্দ লাগছে না। বহুকাল পর কেমন এক অকারণ ছেলেমানুষিতে পেয়ে-বসল শোভনাকে। ভিজতে ভিজতে বয়স যেন অনেক কমে গেছে। হাতের আঁচলে জল ধরে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল শোভনা। এখন আর মিশনারী স্কুলের কড়া মিস্ট্রেস বলেই মনে হচ্ছে না নিজেকে।

মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে তেলের বাতিগুলো আজ আর জ্বলে নি। বাতিগুলো জ্বললে অকারণ সুখের এই ভেজাটুকু আর হত না শোভনার। শাড়ি-ব্লাউজ গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। রাস্তায় আলো থাকলে কারু না কারুর চোখে ফস করে পড়ে যেত। ভাবতেও অস্বস্তি লাগে। শরীরটা বিচিত্র লজ্জার এক অনুভূতিতে শিরশির করতে থাকে শোভনার।

দশ মিনিটের পথে মিনিট কুড়ি কাটিয়ে হস্টেলে পৌছুল শোভনা। বাতাস আরো প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ধারাল ফলার মত গায়ে বিঁধছে। শিশু এবং কড়িগাছগুলো সমানে মাথা কুটোকুটি করছে।

লাল সুরকির পথটা নদীর পাড়ে অর্ধবৃত্তাকারে বাঁক নিয়ে একতলা হস্টেল বাড়িটায় ঢুকেছে। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে পড়ল শোভনা।

ইলেক্‌ট্রিসিটির দাক্ষিণ্য এখনও এ অঞ্চলে পৌছয় নি। কাজেই ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বলছে। চারদিক একবার দেখে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত শাড়িটা গুটিয়ে নিঙড়ে নিল। শোভনা শাড়ি-ব্লাউজ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে। প্রকাণ্ড আঁটো খোঁপাটা ভেঙে গেছে। একরাশ ভেজা চুল কপালে গালে গলায় লেপ্টে রয়েছে।

বারান্দা দিয়ে ডানদিকের শেষ ঘরখানার কাছে এল শোভনা। ঘরখানার মালিকানা এজমালি। ইংরেজির টীচার মল্লিকা সেন আর সে এই ঘরে থাকে।

তক্তাপোষের ধবধবে বিছানায় হারিকেন জ্বলছে। বুকের নীচে বালিশ গুঁজে আধ শোয়া ভঙ্গিতে ঝুঁকে রয়েছে মল্লিকা। বিছানায় অনেকগুলো খাতা ছড়ানো।

মল্লিকার মুখটা জানালার দিকে ফেরানো ছিল। তাই শোভনাকে দেখতে পায় নি।

যাই হোক, ঘরে দুটো তক্তাপোষ। একটা মল্লিকার, অন্যটা শোভনার।

ঘরে ঢুকে নিজের তক্তাপোষের তলা থেকে হারিকেন বার করে জ্বালিয়ে নিল শোভনা। তারপর হাল্কা গলায় মল্লিকার উদ্দেশে বলল; এই মল্লি, কি করছিস?'

একটু চমকে উঠে বসল মল্লিকা। ভুরু দুটো কুঁচকে রয়েছে। কপালে একটা খাঁজ পড়েছে। গজগজ করতে লাগল সে, 'মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করছি। বুঝলে শোভনাদি, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, গত জন্মে মহাপাপ না করলে এ জন্মে কেউ মেয়ে-স্কুলের টীচার হয় না।'

মৃদু হেসে শোভনা বলল, 'কেন রে, কি হ'ল?'

'কি আবার হবে! এই যে সব পরীক্ষার খাতা! জান শোভনাদি, একেকটা বানান আর গ্রামার ভুলের চিড়িয়াখানা। দেখতে দেখতে নিজেরই ইংরেজিজ্ঞান লোপ পাবার জোগাড় হয়েছে। উঃ—' সরু সরু আঙুল দিয়ে কপালের দু-পাশ টিপে ধরল মল্লিকা। আর ধরেই হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল, 'এ কি শোভনাদি, তুমি যে একেবারে ভিজে নেয়ে এসেছ। শিগগির কাপড় টাপড় বদলে এস।'

'স্কুল থেকে রেভারেণ্ড মণ্ডলের কুঠিতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফেরার পথে বৃষ্টি নামল। ভেবেছিলাম,

আকাশের মেঘে দু-এক ফোঁটা পড়েই থেমে যাবে। থামল না তো আমি কি করব! ভিজতে ভিজতে তাই চলে এলাম। তা ছাড়া ভিজতেও ভারি ভাল লাগছিল।'

'ভিজতে ভাল ল্যাগছিল। ইস্‌, অসময়ের বৃষ্টিতে নেয়ে এসে একটা কাণ্ডই বাধাবে তুমি! নিশ্চয়ই বাধাবে। আর তখন মজাটা টের পাবে। যাও, আর কথা নয়। বাথরুমে চলে যাও।' মল্লিকা অস্থির হয়ে উঠল।

'যাচ্ছি বাপু, যাচ্ছি।' আমার ওপরেও যে দিদিমণি-গিরি ফলাতে শুরু করলি মল্লি! একটু-আধটু ভিজলে এমন কিছু হয় না।' আলনা থেকে শুকনো জামা-কাপড় আর হারিকেনটা নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল শোভনা।

এখনও সমানে জল ঝরছে। এলোপাথাড়ি সাঁই-সাঁই বাতাস ছুটছে। আকাশের সুদূর বায়ুকোণে বিদ্যুৎ ঝলকে যায়। আর পৃথিবীজোড়া বিরাট একটা মৃদঙ্গে গুরু গুরু ঘা পড়ে অর্থাৎ মেঘ গর্জায়।'

খানিকটা পর বাথরুম থেকে ঘরে ফিরে এসে অবাক হয়ে গেল শোভনা।

বিছানা থেকে নীচে নেমে বাঁ হাত নেড়ে নেড়ে ধমকাচ্ছে মল্লিকা। ডান হাতে চায়ের কাপ। আর মুখ কাঁচুমাচু করে একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মালা। টুঁ শব্দটি করছে না।

শোভনা ঘরে ঢুকতেই মল্লিকার গলা আরেক পর্দা চড়ল, এই যে শোভনাদি, তুমি এসে গেছ। আজ এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।'

এই তো একটু আগে বাথরুমে গেলাম। এর মধ্যে কি এমন হ'ল যাতে রণরঙ্গিণী হয়ে উঠেছিস্‌!' ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে একবার মালা আরেকবার মল্লিকার মুখের দিকে তাকাতে লাগল শোভনা।

'কি আবার হবে! চা-চা, কি একখানা চা-ই বানিয়েছে মালা। তুমিই বল শোভনাদি, একে তো ইংরেজির খাতা, তার ওপরে এই চা। মেজাজ কারো ঠিক থাকে! হোপলেশ!' মুখখানা গম্ভীর করে মল্লিকা বলল, 'মালাকে দিয়ে আর চা করানো চলবে না।'

মালার দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না। মল্লিকার পছন্দমত চা তৈরি করতে পারে নি। সেই অক্ষমতায় অপরাধীর মত নত চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কালো মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

মালা মেয়েটিকে বেশ লাগে শোভনার। বড় শান্ত আর বড় রোগা মেয়েটি। বছর কুড়ি বয়েস, অথচ পনের বছরের কিশোরীটির মত দেখায়। ঢলঢলে মুখখানায় আর বড় বড় দু'টি সরস গ্রামীণ চোখের মণিতে অনেকখানি করুণ ব্যথা যেন টলমল করছে।

আদালত পাড়ার ওপাশে নদীর পাড় ঘেঁষে সে গ্রামের শুরু সেখানে ছোট ছোট দু'টি ভাই, মা আর বাপকে নিয়ে মালাদের সংসার। বাপ কলকাতার কাছাকাছি কিসের একটা কারখানায় কাজ করত। বছর খানেক হল কারখানার মেশিনে একটি পা খুইয়ে পঙ্গু হয়ে ঘরে এসে বসেছে। সংসারের অবস্থা প্রায় অচল!

অতএব স্কুল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রেভারেণ্ড মণ্ডল এই হস্টেলে নিয়ে এসেছিলেন মালাকে। ফরমাস খাটা, চা-টা তৈরী করা, রান্নাবান্নায় রাঁধুনিকে জোগাড় দেওয়া, ঘরদোর পরিষ্কার করা—টুকিটাকি কাজের জন্য একজন লোকের দরকার হয়েছিল। মিস্ট্রেসদের হস্টেল, নিখাদ প্রমীলারাজ্য। পুরুষ মানুষ এখানে অচল। তাই-খাওয়া-পরা থাকা আর মাসান্তে পনের টাকা মাইনেতে মালাকেই রাখা হল।

বেশি কথা বলে না মালা। মুখ বুজে দিনরাত ফরমাস খাটে। খুটখাট শব্দ করে টুকিটাকি কাজ করে। দিদিমণিদের কেউ বকলে দুটি সরল গ্রাম্য চোখ একবার তুলেই নীচু করে। সর্বক্ষণই সে প্রায় নির্বাক।

যাই হোক, চড়া গলায় মল্লিকা বলল, 'চায়ের জন্য অন্য ব্যবস্থা করতেই হবে শোভনাদি।'

ভেজা শাড়ি-সায়া একপাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে শোভনা বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা সে হবে'খন। তুই এবার থাম। ঢের হয়েছে।' মালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস! বকুনি খেতে খুব মিষ্টি লাগছে, না!'

নিঃশব্দে মালা বেরিয়ে গেল।

আর হারিকেনটা সামনের টেবিলের ওপর রেখে শোভনা বলল, 'কি রে, মল্লি, মেজাজ এমন খিটখিটে হয়ে

রয়েছে কেন? সমরবাবুর চিঠি বুঝি আজও আসে নি? তা রাগটা তাঁকে না পেয়ে মালা বেচারির ওপর দিয়ে যাচ্ছে! বেশ, বিয়ে না হতেই এই, বিয়ে হলে মানুষটির বরাতে অনেক দুর্ভোগ আছে দেখছি, পরিহাসে শোভনার গলা তরল শোনাতে লাগল।

মল্লিকা চুপ! বিস্ময়ে প্রায় বিমূঢ়ই হয়ে গেছে সে। রাশভারী গম্ভীর মিষ্ট্রেস হিসেবে সুনাম-দুর্নাম—দুই-ই আছে শোভনার। ছাত্রীরা তাকে ভয় করে। ক্লাসে টুঁ শব্দটি করে না। মিষ্ট্রেসরা তাঁকে এড়িয়ে চলে। হাসাহাসি মাতামাতির ধারেকাছে পারতপক্ষে ঘেঁসে না শোভনা। লঘু পরিহাসে চপল হতে তাকে কেউ কোনদিন দেখে নি।

তা ছাড়া সর্বক্ষণই সে প্রায় নির্বাক। কোন ব্যাপারেই যেচে গিয়ে সে কথা বলে না। কেউ কোন প্রশ্ন করলে যত খানি সম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দেয়। কিন্তু অসময়ের বর্ষায় ভিজে বসে আজ যেন কি হয়েছে শোভনার। নিজে উপযাচক হয়ে কথা বলছে। পরিহাস করছে।

ভূগোলের টিচার লতিকা বোস মল্লিকাকে মাঝে মাঝে বলে, 'তুই কেমন করে ওই শুষ্কং কাষ্ঠংটার সঙ্গে ঘর করিস বল তো মল্লিকা? হাসতে জানে না, ঠাট্টা-তামাসা-রস-কস কিচ্ছু নেই। মুখখানা সবসময় হাঁড়ি করে আছে। দেখলেই গা ছমছম করে। সত্যি বলছি ভাই, সোভনাদির গুহায় এক রাত্রি কাটালে আমার দু পাউণ্ড ওজন কমে যেত।'

শোভনার ঘরখানাকে ঘর বলে না লতিকা; বলে গুহা।

মল্লিকা হাসতে হাসতে উত্তর দেয়, শোভনাদির সঙ্গে ঘর করি, তার ঘরণী হয়ে বহাল তবিয়তেই আছি। আমার কৃতিত্ব আছে বল।'

'একশ' বার আছে। শোভনাদিটা একটা আস্ত রামগরুড়। তার কাছে হাসিখুসি নেই। তোর বদলে আমার থাকতে হলে নির্ঘাত দম আটকে মরে যেতাম।' লতিকা বলে।

ইতিহাসের টিচার মাধবী সোম বলে, 'মাইরি ভাই, মিশনারী 'নান' হতে ভুল করে মিশন স্কুলের মিস্ট্রেস হয়ে গেছে শোভনাদি।'

আশ্চর্য! সেই শোভনা আজ এত কথা বলছে, এমন পরিহাস করছে—সব শুনেও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। বিস্মিত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মল্লিকা। আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিদ্যুৎচমকের মত কথাটা মনে পড়ে গেল। আজ বিকেলের ডাকে শোভনার একখানা চিঠি এসেছে। পীওন মল্লিকার কাছেই চিঠিটা দিয়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা বিচিত্রই বটে! বছর চারেক এই মিশনারী স্কুলে চাকরি নিয়ে এসেছে মল্লিকা। এর মধ্যে কোনদিন পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে শোভনার কোন চিঠি এসেছে বলে মনে করতে পারে না সে। শোভনা অবশ্য তার বছর তিনেক আগে এখানে চাকরি নিয়ে এসেছে। সে আসবার আগে শোভনার কোন চিঠিপত্র আসত কি-না, তা অবশ্য জানা নেই মল্লিকার।

যাই হোক মল্লিকা বলল, 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম শোভনাদি—'

'কী?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শোভনা তাকাল।

'তুমি রেভারেণ্ড মণ্ডলের কুঠিতে যাবার পথ পীওন তোমার একখানা চিঠি স্কুলে দিয়ে গেছে।'

'কোথায়?'

বিছানায় ছড়ানো খাতাগুলোর মধ্যে থেকে একখানা খাম বার করে মল্লিকা বলল, 'এই যে'—

নিরাসক্ত ভাবে হাত বাড়াল শোভনা। প্রথমটা তার মনে হয়েছিল দাদার চিঠি। এই সুদূর মফঃস্বল শহরে বছর পাঁচেক চাকরি নিয়ে এসেছে সে। এখানে আসার পর প্রথম প্রথম বছর খানেক প্রায়ই চিঠি আসত দাদার। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রথমে শোভনা মনে করেছিল, দাদার চিঠি। কিন্তু হাতের খামখানা আগ্রহশূন্য ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ নজরে পড়ল। খামের ওপর টানা টানা হরফে তার যে নাম-ঠিকানা রয়েছে সেটা দাদার হাতের লেখা নয়।

অথচ হস্তাক্ষরটা অত্যন্ত পরিচিত। কতদিন? প্রায় বছর ছয়েক অর্থাৎ একটা যুগের অর্ধাংশ এই দীর্ঘ সময়ের পর দেখামাত্রই নির্ভুল চিনতে পেরেছে শোভনা। ঐ যে ঈষৎ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে প্রতিটি অক্ষরের শেষে সুন্দর টান দেওয়া—এ নিশ্চয়ই ভবতোষের লেখা।

ভবতোষ! নামটা বিড় বিড় করে একবার মাত্র উচ্চারণ করল শোভনা। আর করতে করতেই মনে হল হৃদ্‌পিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেছে। মনে হল, হস্টেল বাড়ির এই ঘরখানা একেবারেই বায়ুশূন্য। একটা অনুভূতিহীন নিশ্চেতনার মধ্যে নিজের তক্তাপোষে উঠে এল শোভনা।

বাইরে অসময়ের বর্ষা এখনও প্রমত্ত হয়ে রয়েছে। মেঘের গুরু গুরু, বিদ্যুতের হানাহানি, বাজের গর্জন—সবাই মিলে একটা চুক্তি করে ফেলেছে যেন। এই ছোট্ট মফঃস্বল শহরটাকে রসাতলের অতলে পাঠিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের ক্ষান্তি নেই।

বাইরের পৃথিবী যে এমন আদিম দুর্যোগের মধ্যে মেতে আছে, সে দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নেই শোভনার। তার স্মৃতি কিসের একটা তরঙ্গকে আশ্রয় করল যেন। তারপরে দোল খেতে খেতে বহুদূরের একটা মহকুমা শহরে ফিরে গেল।

এই মফঃস্বল শহরের মতই সেই সুদূর মহকুমা শহরটারও শিয়রে একটি গেরুয়া জলের নদী। প্রান্তবাহিনী সেই নদীটার পার ঘেঁষে রিভারসাইড রোড। আর তারই পাশে জাফরান রঙের একখানা দোতলা বাড়িতে সব সময় একটা আনন্দের প্রাণ খেলা করে বেড়াত। এতকাল পর সে-সব কথা নির্ভুল মনে করতে পারে শোভনা। স্মৃতির মধ্যে নীল নীল জোনাকির মত সে-সব কথা জ্বলে নেভে, নেভে জ্বলে।

রিভারসাইড রোডের সেই দোতলা বাড়িটার ঘরে ঘরে, অলিন্দে-খিলানে-সিঁড়িতে-ছাদকোঠায় শোভনা নামে একটা খুশির মূর্তি ঘুরে ঘুরে বেড়াত। তার সিঁথিতে সরু সিঁদুর কপালে মস্ত টিপ। দু-হাতের নিটোল মণিবন্ধে কঙ্কণ আর সোনা-বাঁধানো শাঁখা। শোভনার পিছু-পিছু আনন্দের সেই প্রাণটাও ছুটতে থাকত।

রিভারসাইড রোডের সেই বাড়িটার ওপর তলায় থাকত তিনটি মাত্র প্রাণী। শোভনা প্রিয়তোষ এবং ভবতোষ।

শ্বশুর প্রিয়তোষবাবু ছিলেন দেওয়ানী কোর্টের নামজাদা উকিল। মহকুমার সকলেই তাঁকে খাতির করত, সম্মান দিত। বার এসোসিয়েশনের সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটির সম্মানিত সদস্য, পাবলিক লাইব্রেরির সভাপতি, মহকুমা শহরের জীবনে তাঁর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। উনিশ শ তিরিশে শহরে যে আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছিল, তিনি তার নায়ক। এস, ডি, ও-র বাঙলার সামনে বিলিতি কাপড়ে আগুন জ্বালিয়ে স্বাধীনতার যজ্ঞ করেছিলেন প্রিয়তোষবাবু। সেই থেকে সাদা খদ্দর পরেন। মনে-প্রাণে-ধ্যানে-স্বপ্নে খাঁটি স্বদেশী মানুষ।

নামকরা উকিল প্রিয়তোষ। ফাঁপানো পশার। রিভারসাইড রোডের দোতলা বাড়িটায় অনটনের ছায়া পড়ে না। দিন দিন সেই আনন্দের প্রাণটা আরও খুশী হয়ে ছুটে বেড়ায়।

প্রিয়তোষবাবুর একমাত্র ছেলে ভবতোষ। শোভনার স্বামী।

স্বামী! হ্যাঁ, স্বামীই তো। শোভনা ভেবেছিল এতকাল পর ভবতোষ সম্বন্ধে তার সমস্ত বোধই অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু তা তো নয়। বিচিত্র অসহনীয় এক যন্ত্রণায় শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। এই বোধহয় জীবনের রীতি।

যাই হোক, সেই মহকুমা সহরের কলেজে প্রফেসারি করত ভবতোষ। শান্ত, বিচক্ষণ আর সুন্দর মনের মানুষ সে।

শাশুড়ী নেই। ভবতোষের শৈশবেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

দোতলায় থাকত তারা তিনজন। কিন্তু নীচের তলার বড় বড় এজমালি কুঠুরিগুলোতে দূর সম্পর্কের পরিজন এবং সম্পর্কহীন প্রিয়জনেরা ভিড় জমিয়েছিল। এরা সবাই প্রিয়তোষবাবুর প্রতিপাল্য। প্রিয়তোষ শুধু সম্মানিত স্বদেশী মানুষই ছিলেন না, হৃদয়বান উদারও ছিলেন।

যাই হোক, নীচের তলার সেই মানুষগুলির কেউ কলেজে পড়ত, কেউ সকাল-সন্ধ্যে টিউশানি, কেউ বা দুপুরবেলা টরেটক্কা প্র্যাকটিশ করত। কেউ চাকরির উমেদার। কেউ আবার কিছুই করত না। খেয়ে ঘুমিয়ে তাস খেলে আড্ডা দিয়ে দিন কাটিয়ে দিত।

এদের মধ্যে থলথলে-গা গ্রাম-সুবাদে পিসী ছিল। খসখসে-গলা মাসী ছিল। গলায় ত্রিকণ্ঠি মালা, কপালে

গায়ে রসকলি—প্রিয়তোষবাবুর শ্বশুরবাড়ির গ্রামের এক বোষ্টমীও এসে ছুটেছিল।

এদের নিয়েই প্রিয়তোষবাবুর সংসার। এদের সবার জন্যই তাঁর অফুরন্ত মমতা।

এমন সব মানুষদের মধ্যে যা হয়ে থাকে, শুধু পান থেকে চুণটি খসার ফিকির। সঙ্গে সঙ্গে থলথলে-গা পিসী আর খসখসে-গলা মাসীদের রাজ্যে প্রলয় বেধে যেত। মাথার কাপড় কোমরে জড়িয়ে গলায় গিটকিরি এবং গমক খেলিয়ে খেলিয়ে তারস্বরে চেঁচাত। সে চেঁচানিতে রিভারসাইড রোডের জাফরান রঙের দোতলা বাড়িটাই শুধু নয়, সমস্ত মহকুমা শহরটা থেকে তাবৎ কাক চিল উধাও হয়ে যেত।

আর সেই চিৎকারে তরতর করে দোতলা থেকে নেমে আসত শোভনা। চিবুকে-ঠোঁটে-চোখে একটি সুন্দর শাসনের হাসি ফুটিয়ে বলত, 'আবার শুরু করলেন তো আপনারা! বলুন কার কি অসুবিধে?'

থলথলে-গা পিসী বলল, 'এই যে নাতবউ, প্রিয়তোষ আমাকে দাঁতে দেবার জন্যে মিশি দেয়। কি বলব, মাড়ি যা শুলোয়, রাতে দু-চোখের পাতা এক করতে পারি না। তাই দেখে শতেকখেয়োরির চোখ টাটায়।'

খসখসে গলায় মাসী বলত, 'টাটাবে না! তোর মিশি না হলে ঘুম হয় না। আমারও পানদোক্তা না হলে বায়ু চড়ে যায়। কিন্তু হজম হতে চায় না।'

শোভনা হাসত। বলত, 'বেশ তো, পানদোক্তা আমি দেব আপনাকে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে এত কাণ্ড। আমাকে বললেই পারতেন। এবার সব থামুন। আপনাদের বায়ুদোষ, দাঁত জ্বলুনির মোক্ষম ওষুধ আমার হাতে আছে। ওসব পান-দোক্তা-মিশিতে কিছু হবে না।' শোভনার দুচোখে কৌতুক ঝিকমিক করত।

মাসী-পিসিরা ভুরু কুঁচকে বলত, 'কেমন?'

শোভনা ঠোঁট টিপে হাসত, 'আপনাদের দু-জনকে সতীন করে নেব।'

'পারবি! পারবি! নাকি শুধু মুখে মুখেই নাতবউ!'

পরিহাসে নীচের তলাটা নিমেষে সরস হয়ে উঠত। চেঁচামেচি থেমে যেত। হাল্কা পায়ে ওপরে উঠে যেত শোভনা।

এই তো গেল নীচের তলার জগৎ। ভবতোষকে ঘিরে শোভনার নিজস্ব যে জগৎ, এবার তার কথা।

দুপুরের দিকে প্রায়ই কলেজ পালিয়ে চলে আসত ভবতোষ। এ-সময় প্রিয়তোষ কোর্টে থাকতেন। নীচের তলার ছেলেরা কেউ কলেজে, কেউ টাইপ শিখতে, কেউ চাকরির খোঁজে আর জনকয়েক আছে যারা মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের ওদিকে কোথায় আড্ডা দিতে গেছে। নীচের তলায় এখন নিখাদ প্রমীলা রাজ্য। অপূর্ব দৃশ্য সেখানে। গতর এলো করে মাসীপিসীর দল ঘুমুচ্ছে। তাদের নাকের আওয়াজে প্রলয় বয়ে যাচ্ছে।

লম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোতলায় উঠে আসত ভবতোষ।

ওপর তলায় জানালার পাশে কার্নিসতোলা নতুন খাট। সেই খাটে দুধসাদা বিছানা। বিছানায় রিভারসাইড রোডের এক জাফরান-রঙ দোতলা বাড়ির আনন্দের প্রাণটি ঘুমিয়ে রয়েছে। চোখ দুটি বোজা। ঠোঁটের ফাঁকে দুটি ঝকঝকে দাঁত। সিঁথিতে সরু সিঁদুর। নিঃশ্বাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে বুকটা ওঠানামা করছে।

জানালার বাইরে একটা জামরুল গাছ। জামরুলপাতার ফাঁক দিয়ে চিকরি-কাটা রোদ এসে পড়েছে শোভার মুখে। মুগ্ধ বিবশ দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকত ভবতোষ। তারপর শোভনার চুলের সমুদ্রে আঙুল ডুবিয়ে দিত।

ধড়মড় করে উঠে বসত শোভনা। তার ঘুমন্ত চোখে কেমন যেন এক ভয়ের ছায়া।

ভবতোষ বলত 'কি হল?'

নিমেষে ভয়ের ছায়াটা সরে যেত। চিবুকে-গালে-ঠোঁটে খুশি-খুশি সুন্দর হাসিটা আবার ছড়িয়ে পড়ত। অপ্রস্তুত গলায় শোভনা বলত, 'বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তুমি এমন অসময়ে? আবার কলেজ পালিয়েছ বুঝি?'

'মাঝখানে দুটো অফ পিরিয়ড। ভাবলাম একবার বাড়ি যাই।'

মুখ টিপে টিপে হাসত শোভনা। বলত, 'এই রোদে বাড়ি আসার কি দরকার ছিল? প্রফেসার বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করেই তো সময়টা কাটিয়ে দিতে পারতে।'

'সেই ইচ্ছেই ছিল। হঠাৎ মনে হল বাবা কোর্টে, নীচের তলার ছেলেরা যার যার কাজে বেরিয়েছে। ঠাকুমা-দিদিমার দল ঘুমুচ্ছে। সে ঘুম কাড়া-নাকাড়া বাজালেও ভাঙা দূরে থাক, একটুও টোল খাবে কি-না সন্দেহ।'

'সে-জন্যে বাড়ি আসতে হবে!' নিতান্ত ভাল মানুষটির মত বড় বড় চোখে তাকাত শোভনা।

এ-সব স্মৃতি, এ-সব স্বপ্ন। একদা-বাস্তব এই স্বপ্নময় ভাবে কেমন যেন অবিশ্বাসও মনে হয়।

আশ্চর্য! ভবতোষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রেই তো জীবনটা জড়িয়ে ছিল। মাকড়সা যেমন সরু সরু জালগ্রন্থি দিয়ে জাল বোনে তেমনি ভবতোষের চারপাশে ছোট ছোট মধুস্বাদ সুখ, আনন্দ, আর সাধের সূতাতন্তু দিয়ে সেও তো জাল বুনেছিল। ভবতোষ প্রিয়তোষ আর নীচের তলার প্রিয়জন-পরিজনদের নিয়েই পরিতৃপ্ত হতে চেয়েছিল শোভনা। ভেবেছিল এঁদের নিয়েই নাকি জীবনটা কেটে যাবে। কিন্তু কাটল না।

কেন কাটল না সে-কথা বলতে গেলে সেই মহকুমা শহরটা সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়।

ছোট্ট শহর। ভবতোষের উপমায় শান্ত এক মিঠে জলের হ্রদ। তার শান্তি নির্বিঘ্ন। তার স্বস্তিতে কোন-দিন ছেদ পড়ে নি। উনিশ শ তিরিশে আইন অমান্য আন্দোলন আর বিয়াল্লিশের আগষ্ট শুঁড়িখানা, কাছারিপাড়া, স্কুল-কলেজের সামনে পিকেটিঙ, ধর-পাকড় এবং জেল-জরিমানা—এই দুটো হ'ল সেই মহকুমা শহরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐতিহাসিক ঘটনাই বলা চলে।

এ দু'টি ছাড়া মহকুমা শহরের জীবন গতানুগতিক। দু-একটা আত্মহত্যা, দু-এক বছর অন্তর অন্তর এস-ডি-ও-র ফেয়ারওয়েল আর রিসেপশন, বড় শহর থেকে ভাড়া-করে-আনা ড্রামাপার্টি কি ফুটবল দল এলে খানিকটা মাতামাতি। তবে আগষ্ট আন্দোলনের পরের বছর ডায়নেমো চালিয়ে যখন বায়োস্কোপ এল তখন শহরে রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছিল। চায়ের দোকানে, আদালত পাড়ায়, বার লাইব্রেরিতে, মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে এক প্রসঙ্গ, এক আলোচনা।

আরেকবার শহরটা সরগরম হয়েছিল যেবার সার্কেল-অফিসারের কলেজে-পড়া মেয়েটা উকিল সারদাবাবুর বয়াটে ছেলেটার সঙ্গে কালীপুজার রাত্রে উধাও হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম সারদাবাবু এবং সার্কেল অফিসার পুলিনবাবু—দু' তরফ থেকেই ব্যাপারটা ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সাতদিনের মধ্যেই সারা মহকুমা শহরটাকে চমকে দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির সদর রাস্তায় একটা সাইকেল রিক্সা তুমুল ফুর্তিতে বেশ বাজাতে বাজাতে ছুটে গিয়েছিল। রিক্সায় পাশাপাশি বসে আছে সারদা উকিলের ছেলে নীলমণি আর সার্কেল অফিসারের মেয়ে মাধবী।

প্রসঙ্গটা খুবই মুখরোচক। সমস্ত শহর দিনকয়েক মেতে রইল: ভোজের পাতে চাটনির মত উকিলপাড়ায়, ব্যবসাদারপাড়ায়, খেয়াঘাটে, বাজারে, দূরের রেল স্টেশনে সর্বত্র সব আলোচনায় নীলমণি—মাধবী প্রসঙ্গ অপরিহার্য হয়ে উঠল।

এইভাবেই চলছিল। মহকুমা শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনে মাঝে মাঝে ছোট-খাটো দু-একটা ঢেউ উঠেই নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেত। কিন্তু একদিন তা আর হ'ল না। শান্ত মিঠে জলের হ্রদে হঠাৎ প্রলয় ভেঙে পড়ল।

অনেক—অনেক দূরে পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে নাকি দাঙ্গা লেগেছে। একটা সন্ত্রাসের ছায়া সেখান থেকে লম্বা পায়ে এখানেও ছুটে এল। শুধু ছুটেই এল না, মহকুমা শহরের শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনকে একেবারে ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। এই প্রথম মানুষের রক্ত ঝরল এখান-কার রাস্তায়, আগুন লাগল বাড়িতে বাড়িতে, শিশু আর নারীদের চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হতে লাগল।

শোভনার মনে পড়ে, দেখতে দেখতে মহকুমা শহরটা একেবারে শূন্য হয়ে গেল। দলে দলে ভীত শঙ্কিত সন্ত্রস্ত মানুষ দিগ্বিদিকে পালাতে লাগল। আর সেই পালানোর ঢেউ এসে লাগল রিভারসাইড রোডের সেই বাড়িটাতেও। নীচের তলাটা দু'দিনেই ফাঁকা হয়ে গেল। থলথলে-গা পিসী আর খসখসে-গলা মাসি কেউ আর নেই। রাতের অন্ধকারে আশ্রিতরা সবাই পালিয়ে গেছে। আর এত বড় প্রায় নির্জন বাড়িতে ভয়ে উদ্বেগে বুকের মধ্যে শ্বাস যেন আটকে আসত শোভনার।

রক্ত—আগুন—হত্যা!

উনিশ শ তিরিশে সরকারী চাকুরি ছেড়ে ওকালতি শুরু করেছিলেন প্রিয়তোষ। উনিশ শ ছেচল্লিশে আদালত ছাড়লেন। মনে প্রাণে খাঁটি স্বদেশী মানুষ। সাদা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। একেবারে সর্বশুক্ল।

আদালত ছেড়ে তিনি পীস্ কমিটি গড়লেন। সকাল-বেলা শান্তিবাহিনীর ছেলেদের নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বাড়ি ফিরতে বেলা কাবার হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই, স্নানের সময়ের ঠিক নেই। বাড়িতে ঢুকে ঝপ্ ঝপ্ দু-বালতি জল মাথায় ঢেলে নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজেই আবার ছোটেন। যে সন্ত্রাসের ছায়াটা এই ছোট্ট মহকুমা শহরের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তাকে না সরানো পর্যন্ত প্রিয়তোষের ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, স্বস্তি নেই।

এদিকে ভবতোষের কলেজ বন্ধ। সারাদিন সে বাড়িতেই থাকে আর নিদারুণ এক অস্থিরতার মধ্যে পায়চারি করে। রাতেও সে ঘুমোয় না।

ইতিহাসের অধ্যাপক ভবতোষ। ব্যথিত বিষণ্ণ গলায় সে বলে, 'ইতিহাসে এরই নাম অরাজকতা, এরই নাম মাৎস্যন্যায়। শিশুর চিৎকারে, নারীধর্ষণে, নিরীহের রক্তে সভ্যতা শৃঙ্খলা ন্যায়বিচার কোথায় ভেসে যায়। অস্ত্রের ঝনঝনা, লুঠতরাজ, নির্বিচার হত্যার মধ্যে ইতিহাস শিক্ষা দেয়, মানুষের আদিম আরণ্যক সত্তা কোনদিনই মরে না। একটু সুযোগ পেলেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটে।'

যাই হোক, একদিন সকালে যথারীতি শান্তিবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রিয়তোষ। দুপুরবেলা খবর এল বাজারপাড়ার কাছে দাঙ্গা থামাতে গিয়ে তিনি নাকি মাথায় সাঙ্ঘাতিক আঘাত পেয়েছেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে।

খবর পাওয়ামাত্র এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা করেনি ভবতোষ। উন্মাদের মত হাসপাতালের দিকে ছুটেছিল। রিভারসাইড রোডের সেই জাফরান রঙের বাড়িতে শোভনা তখন একা, একেবারে নিঃসঙ্গ।

ভবতোষ বেরিয়ে যাবার খানিকটা পরই নরকের দু'টি পোকা গুটি গুটি আবার এসে দাঁড়াল। এরাই একটু আগে প্রিয়তোষের আঘাতের খবর নিয়ে এসেছিল। এবার তারা জানাল প্রিয়তোষের অবস্থা খুবই সাঙ্ঘাতিক। আঘাত পাবার পর থেকে জ্ঞান আর ফেরেনি। ভবতোষ তাকে নাকি এখনই যেতে বলেছে!

হিত-অহিত বিচারের সময় তখন নয়। অন্ধের মত তাদের পিছু-পিছু বেরিয়ে গিয়েছিল শোভনা। তখন কি সে বুঝতে পেরেছিল, জাফরান রঙের সেই বাড়িটা থেকেই না, জীবনের আনন্দময় আলোকিত দিকটা থেকে চির-দিনের জন্য নির্বাসিত হতে চলেছে!

বুঝতে অবশ্য পারল খানিকটা পরেই। তখন আর কোন উপায় নেই। হাসপাতালে নয়, মহকুমা শহর থেকে অনেক দূরে মাঠের মাঝখানের এক বাড়িতে এনে তখন তাকে তোলা হয়েছে।

তারপর? মিশনারি স্কুলের এই টীচার্স হস্টেলে প্রিয়তোষের চিঠি হাতে নিয়ে সে-কথা ভাবতেও বুকের ভেতর শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। তবু না ভেবে উপায়ই বা কী?

মাঠের সেই বাড়িটায় দু'টি মাস তাকে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। আর এই দু-মাসের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নরকের অন্ধকার যে কী, তিলে তিলে তার আস্বাদ পেয়েছে শোভনা।

দু-মাস পর তাকে পুলিশ উদ্ধার করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। ভবতোষ এবং প্রিয়তোষের সেই রকমই নির্দেশ ছিল।

কলকাতায় প্রিয়তোষ তাঁর দাদার বাড়িতে উঠে-ছিলেন। ভবতোষ প্রাইভেট একটা কলেজে লেকচারার-শিপ জোগাড় করে নিয়েছিল।

জীবনের অনন্ত আগ্রহ আর ভয় বুকে পুরে স্বামী এবং শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল শোভনা। মনে পড়ে সজ্ঞানে নয়, অর্ধচেতন একটা ঘোরের মধ্যে সে কলকাতায় এসেছিল। হাত-পা-বুক—সর্বশরীর অসহ্য দুরন্ত এক অস্থিরতায় যেন শিথিল হয়ে যাচ্ছিল তার। কাঁপা স্খলিত স্বরে প্রিয়তোষের উদ্দেশে সে বলেছিল, 'বাবা', আমি এসেছি।'

প্রিয়তোষ উত্তর দেন নি। ব্যথিত করুণ মুখ দু-হাতে ঢেকে ঘাড় ভেঙে স্তব্ধ একটা মূর্তির মত চুপচাপ বসে-ছিলেন। তাঁর এই স্তব্ধতার মধ্যেই উত্তরটা ছিল।

এবার স্বামীর দিকে ছুটে গিয়েছিল শোভনা। উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠেছিল, 'বাবা তো কিছু বললেন না। তুমিও কি মুখ বন্ধ করে থাকবে?'

ভবতোষও নিশ্চুপ। বাবার মতই তার চোখ নিদারুণ বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর সেই মুহূর্তে সব বোঝা হয়ে গিয়েছিল শোভনার। এখানে আর তার জায়গা নেই। প্রিয়তোষ বা ভবতোষের উদারতা, স্নেহ, প্রীতি বা গ্রহণক্ষমতা বিশেষ একটা সীমা পর্যন্ত। তার বাইরে যাবার সামর্থ্য তাদের নেই। আর ঘরের যে বউ দু-মাস অজ্ঞাতবাস ক'রে (তা যে কারণেই হোক) এল তার হাতে অনন্ত শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই দেবার নেই তাদের।

সেই শূন্যতার মধ্যে ভাসতে ভাসতে অবশেষে কলকাতা থেকে শ-দেড়েক মাইল দূরে এই মিশন স্কুলে চাকরি পেয়েছে শোভনা। তারপর পাঁচ বছরে একটু একটু করে জীবনের সকল দিকের কোমলতা স্নিগ্ধতা পুড়ে গিয়ে সে যেন মরুভূমি হয়ে গেছে।

এই পাঁচ বছরে প্রিয়তোষ বা ভবতোষের কোন খবর রাখে নি শোভনা। ভবতোষদের দিক থেকেও তার খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন মনে হয় নি।

পাঁচটা বছর, অর্থাৎ একটা যুগের প্রায় অর্ধাংশ। এতকাল পর হঠাৎ ভবতোষের চিঠি এসেছে। কী আছে তাতে?

আত্মবিস্মৃতের মত খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বার করল শোভনা। চিঠিটা সম্বোধনহীন। শোভনা পড়তে লাগল:

তোমাকে চিঠি লেখার কোন অধিকারই আমার নেই। তবু লিখতে হচ্ছে। এই বোধ হয় নিয়তি।

তুমি আমার স্ত্রী। দৃশ্য-অদৃশ্য, জীবনের সকল স্থলে তুমি আর আমি বাঁধা। এই সত্যকে একদিন আমি অসম্মান করেছিলাম। তোমার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করেছিলাম। সেদিন চিরাচরিত সংস্কারটা ছিল আমার মধ্যে প্রবল। হৃতা স্ত্রীর দেহকলঙ্কই আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তার অন্য সব দিকে দৃষ্টি ফেরাবার মত বিচার আমার ছিল না।

কিন্তু তখন কি জানতাম, ভবিষ্যৎ আমার জন্য মুঠোয় কি পুরে রেখেছে? আজ ছ'মাস ধরে আমি যক্ষ্মায় ভুগছি। আছি কাঁচড়াপাড়ার টি, বি, হাসপাতালে। তুমি বোধহয় খবর পাও নি, দু বছর আগে বাবা মারা গেছেন। যাই হোক, হাসপাতালে কেউ আমাকে দেখতে আসছে না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন—কেউ না। আমার দেহের মধ্যে ধ্বংসের যে সংক্রামক বীজ, তাকে সবাই ভয় পায়। জীবন থেকে তাই বুঝি তারা আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

শোভনা, একদিন দেহকলঙ্কের জন্য তোমাকে গ্রহণ করতে আমার বেধেছিল। আজ আমার দেহও কলঙ্কিত। সেই কারণে পৃথিবীর সকলের দ্বারা আমি পরিত্যক্ত।

জানো শোভনা, এ একরকম ভালই হয়েছে। একএক সময় আমার মনে হয়, এই রোগটা জীবনের সবচেয়ে মহৎ আশীর্বাদ। এটা না হলে একটা নিদারুণ সত্য আমার জানা হত না। জানা হ'ত না, কতখানি মর্মান্তিক আঘাত নিয়ে তুমি আমার কাছ থেকে গেছ।

কলঙ্কিত দেহে আমরা বুঝি একই বেদনার সমতলে এসে দাঁড়িয়েছি।

যাই হোক, কোনদিক থেকেই তোমার কাছে আমার কোন প্রত্যাশা থাকা উচিত নয়। তবু তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়। তুমি আসবে কি?

চিঠিখানা পড়া হয়ে গেলে নিশ্চেতনের মত অনেকক্ষণ বসে রইল শোভনা। বাইরে প্রবল ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। বাইরেই শুধু না, শোভনার মনে হল, তার মরুভূমি জুড়ে বহু যুগ পরে এই প্রথম বর্ষা নামল।

ইংরেজ জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি ও বর্ত্তমান বৃটেন

ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম, এ (লণ্ডন) পি এইচ্ ডি (লণ্ডন)

যে কোন জাতির সংস্কৃতিই হ'ল তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আর সংস্কৃতি বলতে বোঝা যায় জীবনের সামগ্রিক রূপকে—তার চিন্তাধারা ধ্যান ধারণা শিক্ষা দীক্ষাকে। ইংরেজ জাতি হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু কি নিয়ে তারা সভ্যতার পথে এগিয়ে গেছে—আজও বা তাদের কি অবস্থা তা লক্ষ্য করবার মত।

একথা মানতেই হবে যে রাজনৈতিক পরিচয় ছাড়াও ইংরেজের অন্য পরিচয় আছে। যেমন তার সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি। আজও সে দাঁড়িয়ে আছে কিসের বলে? চারিত্রিক সম্পদ ছাড়াও এ জাতির নিষ্ঠা ও সাধনা একে সাহায্য করেছে সভ্যতার সৌধ রচনা করতে। তাই ইংরেজী সাহিত্য আজ জগতের সেরা সাহিত্য তার শিল্প কলা এখনও অনুকরণীয়।

অবশ্য ইতিহাসের পাতা উল্টোলে দেখা যায় যে শিল্প সাহিত্যের প্রসারের জন্যে যে অনুকূল পরিবেশ দরকার তা সবসময় পায়নি। বরঞ্চ অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে এ জাতির কলা ও সাহিত্যকে এগুতে হয়েছে।

একদিন ছিল যখন ধর্ম্মগত সংকীর্ণতা মানুষের মধ্যে একটা গোঁড়ামি জন্মে দিতে চেয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আত্মপ্রকাশের বিরোধী।—নিজের সত্ত্বাকে সব দিক থেকে বঞ্চিত করে রাখাই—যেন কৃতিত্বের পরিচয় বলে গণ্য করা হত। কিন্তু এই অস্বাস্থ্যকর মনোভাব কয়েক জন গোঁড়া অন্ধ বিশ্বাসী মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের যে বৃত্তি চিরন্তন. যা সকলের মাঝেই প্রকাশের পথ খুঁজছে, তাকে রোধ করবে কে? রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকাল ইংরাজী সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। নৃত্যকলা, অভিনয়, সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল এ যুগে। কিন্তু এর পরবর্ত্তীকাল ছিল নিষ্ঠুর—যে কোন আমোদ-প্রমোদ শিল্প কলা এ যুগের গোঁড়া কয়েকজন ধর্ম্মনেতার কাছে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও এমন কি রাষ্ট্রবিরোধী বলে বিবেচিত হত। তাঁরা মনে করতেন যে কলাসাহিত্য, নৃত্যগীতি, ও আমোদ প্রমোদের দিকে গা ভাসিয়ে দিলে আত্মিক অবনতি ত হবেই। রাষ্ট্রেরও অবনতি ঘটবে তাতে। একমাত্র আত্মপ্রকাশের জন্যে ভাষাই ছিল একমাত্র খোলা পথ। এই জন্যেই বোধহয় এদেশে সাহিত্যের তুলনায় অন্যান্য ললিত কলার প্রসার কমেই এসেছে তাই এদেশে থিয়েটার অপেরার উন্নতি আশানুরূপ হয়নি। শিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। কাঠের কাজকে ঘিরে যে কুঠীর শিল্প গড়ে উঠেছিল প্রেরণার অভাবে তাও পল্লীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকল। কারণ আসবাব পত্র ও এমনি আরও সাজ-সজ্জার জিনিষ অন্যদেশ থেকে আমদানি করাতে স্থানীয় শিল্পীদের উৎসাহ ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল। তারা অন্যান্য দেশের শিল্পীদের তুলনায় নিজেদের হীন বলে ভাবতে লাগল। তেমনি যারা চিত্র শিল্পী বা সঙ্গীত শিল্পী তাদেরও একই অবস্থা হল হলাণ্ড থেকে আনা হ'ল চিত্র-শিল্পীদের শিল্পসম্ভার, ইটালি থেকে সঙ্গীত শিল্পীদের। দেশের শিল্পীদের এই অনাদরের ফলে এসব ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েই গেল। কারণ ইংরেজের দৃষ্টি তখন রাজনৈতিক দিকে যাওয়ার ফলে এদিকটা উপেক্ষিতই রয়ে গেল। বহুদিন ধরে তার শক্তি ও প্রতিভা ব্যয়িত হয়েছে উপনিবেশস্থাপনের চেষ্টায়। তারপর ঘটেছে যন্ত্রশিল্পের অভ্যুত্থান। ফলে ললিত কলা ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে ইংরেজের আজ যে স্থান হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। আজকের দিনে ইংরেজের গৃহপরিবেশকে ঘিরেও এদেশের ললিত কলা গড়ে উঠেছে। তার গৃহসজ্জার বেশ-বিন্যাসে ও এমনকি উদ্যান রচনায় একটা রসিকমন ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য বোধের ছাপ দেখা যায়। অনেকের মতে ইংরেজের শিল্পকলার ওপর আমেরিকার সংস্কৃতিগত প্রভাব

এসে পড়েছে। আর সে সম্পর্কে তাঁদের শঙ্কারও অন্ত নেই। স্থপতি শিল্পেও আজ যে প্রগতি দেখা দিয়েছে তার মূলেও বোধহয় যুদ্ধোত্তর প্রভাব রয়েছে। ফলে সৌন্দর্য্য কল্পনা ও সূক্ষ্ম রুচির সঙ্গে দেখা দিয়েছে বাস্তব উপযোগিতার প্রশ্ন। কিন্তু বাস্তব উপযোগিতা এক জিনিষ, আর Art আর এক জিনিষ। বর্তমান বৃটেন এই পার্থক্যকে যেন আমল দিচ্ছে না। আর তার পরিণতি হ'ল art এর দুর্গতি। তাই আজ ইংরেজি ললিত কলায় পিকাসোর অবদান সম্পর্কে শ্রদ্ধা কমে আসছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ও যন্ত্র শিল্পের যুগে আর্টের এই দুর্গতি কতখানি ক্ষতিকর তা ভাববার মত। শিল্পকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি চলতে পারেনা। তাই যে জাতির শিল্পকলা যত সমৃদ্ধ, তার সংস্কৃতি তত বৈচিত্র্যময় ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। এর কারণও সুস্পষ্ট, কলা ভাস্কর্য্য অভিনয় সবকিছুর পেছনে যে অনুভূতি ও কল্পনা লুকিয়ে থাকে, যে ভাবুক মনের ছোঁয়া থাকে, তার মূল্য সংস্কৃতিলোকে কম নয়। আর সেই চিন্তার গভীরতা না থাকলে মানুষের সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়? কলা ছাড়াও সংস্কৃতির আরও কয়েকটি পাথেয় আছে। তার মধ্যে শিক্ষার কথা প্রথমেই বলা চলে। যে কোন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় তার সংস্কৃতি ধারাকে। বৃটেনের শিক্ষা বরাবরই মানবিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। Humanities সেখানে বেশী মর্য্যাদা পেয়েছে বিশেষতঃ গ্রামার স্কুলে। তাই ত চিরদিনই Public school এ ছেলে মেয়েদের দেবার জন্যে এ দেশের লোক পাগল। তাই এখনও মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রিবেণী সংগমে মানবিক শিক্ষা ধারায় ধন্য হবার আকাঙ্ক্ষা এত বেশী। বৃত্তিশিক্ষার উপযোগিতা আজকের দিনে যতখানিই থাকনা কেন—তা হৃদয় বৃত্তিকে উপেক্ষা করলে তার মূল্য কতখানি এই সমস্যা আজ কেবল বৃটেনেই দেখা দেয়নি, সবখানেই যান্ত্রিকতা ও মানবতার মধ্যে সংঘাত। এ দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা স্তর থাকলেও এদের মধ্যে এখনও অসন্তোষ রয়ে গেছে।

সাধারণের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে বৃটেনের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এখনও শ্রেণীবৈষম্য রয়ে গেছে, কারণ যে মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রী গ্রামের স্কুলে বা পাব্লিক স্কুল যাবার সুযোগ পায় তাদের অধিকাংশই অভিজাত শ্রেণীর। এর কারণ অবশ্য একটা নয়, গৃহপরিবেশও এই সাফল্য ও অসাফল্যের জন্যে দায়ী। অনেক সময় দেখা গেছে যে গৃহপরিবেশ এদেশের শিক্ষাসমস্যার জন্যেই দায়ী নয়, আরও অনেক জটিল সমাজসমস্যার জন্যেও দায়ী। আজ বৃটেনে অপরাধের সংখ্যা যে বেড়ে চলেছে, এর কারণ মানুষের মানসিক স্থৈর্য্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার বদলে দেখা দিচ্ছে মনের বিকার। বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংঘাত অশান্তি, মনের স্বাভাবিক সুস্থতাকে নষ্ট করে দেয়। আর তার জন্যে দেশের সংস্কৃতিও হয় বিপন্ন। বৃটেনে এই সমস্যার দিকে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নজর পড়েছে—তাঁরা মনে করেন এর সমাধান সময়সাপেক্ষ, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অনেক সমস্যা। এ সব সমাজ সমস্যা ত আছেই। গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে বৃটেন তার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করলেও সাধারণের ধারণা যে দেশে এখনও যথেষ্ট শ্রেণী-চেতনা রয়ে গেছে। তবে অর্থের বণ্টননীতি খানিকটা উদার হয়েছে ঠিকই, তাই আজ একজন শ্রমিকের আয় আর ব্যাঙ্কের কেরাণীর আয়ের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। আজ বৃটেনে সাধারণের আয় বেড়েছে। স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, কিন্তু মনে শান্তি নেই। এর কারণ কি? প্রথমেই দেখা যায় যে মানুষের চাহিদা আজ বেড়ে চলেছে, প্রতি সংসারে প্রসাধন, যান্ত্রিক সরঞ্জামের মাত্রা ছাপিয়ে যাচ্ছে যে বৃটেনের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। আর প্রয়োজনের তাগিদ যতই বেড়ে চলেছে ততই সংঘাত, ততই অশান্তি। এই বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি একদিকে যন্ত্রশিল্পের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করছে, আবার অন্যদিকে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ হতে দিচ্ছেনা। সুখ শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য পেতে গেলে যে সুস্থ সবল মনের দরকার, তা হারিয়ে ফেললে অন্যকোন উন্নতি দেশের বা জাতির প্রকৃত কল্যাণ আনতে পারবে কি?

সেখানে বৃটেনের জনসাধারণের ইচ্ছার মূল্য কতখানি। আজ তাই সমাজের সব স্তরেই একটা বিক্ষিপ্ত ভাব—শিশু থেকে সুরু করে প্রৌঢ় পর্য্যন্ত সবাই আজ কেন্দ্রচ্যুত। লক্ষ্যহারা জীবনের পথে চলতে চলতে কোথায় যে পরিণতি কে জানে? আর এই অবস্থার মধ্যে সংস্কৃতি কখনও সমৃদ্ধ হতে পারে না। কারণ সুস্থ

কখনও ঝড়ের দিনে বিকশিত হয় না—তার জন্যে চাই শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ পরিবেশ।

সংস্কৃতি মানব সভ্যতার পরিণতি—তাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে চাই কোন আন্তরিক সহযোগিতা। আজকের বৃটেন জানে যে আণবিক অস্ত্রই মানুষের সভ্যতার ক্ষেত্রে একটা মস্ত অভিশাপ। আজ যে শঙ্কার ছায়া তার কারণ হল—এই দানবীয় শক্তির রুদ্ররূপ। চারিদিকে তার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি আর অনর্থক অর্থক্ষয়। বিশ্বমানবের কল্যাণে আজ প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। কত দুঃস্থ দরিদ্র অতিমানুষ হাহাকার করছে। নিরাশ্রয় আশ্রয়ের জন্যে তাকিয়ে আছে কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমরা কিসের নেশায় ছুটে চলেছি? এই হল বৃটেনের শান্তিবাদী জনসাধারণের প্রশ্ন।

তারা চায় সত্যিকারের সুস্থ সুন্দর জীবন—চায় শান্তি ও সাংস্কৃতির অগ্রগতি। এই প্রসঙ্গে একটা ইংরেজি উক্তি উদ্ধৃত করা চলে—"What we English people are really ofter is not a good time but a good life" কিন্তু কোনটাই আজ এদের ভাগ্যে নেই এইখানেই বিড়ম্বনা। এ থেকে বোঝা যায় যে ইংরেজ সাহসী আত্ম-সচেতন হলেও শান্তিপ্রিয়। সাংস্কৃতির প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে। হাইড্রোজেন বম্বের বিরুদ্ধে এদেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হয়েছে তাতেও বৃটেনের এই যুদ্ধভীতি প্রকাশ পায়।

সভ্যতার এতবড় সংকট আগে বোধহয় কখনও আসেনি। শুধু বৃটেনে কেন সারা দুনিয়ায় মানব সংস্কৃতির এই বিপর্যয়ে রাসেলের মত চিন্তানায়ক মানুষের শোচনীয় পরিণতির কথা বারংবার উল্লেখ করে তাঁর সতর্কবাণী পেশ করেছেন। চিন্তানায়ক ও দার্শনিকদের মধ্যে আজ কেউ কেউ মনে করেন যে মানুষ যতই ধর্মে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে, ততই তার দুর্গতি ঘটছে—কারণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্ম ও দর্শনের অবদান অনেকখানি। বৃটেনেও আজ যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস কমে আসছে। রবিবারে গির্জ্জায় যে প্রার্থনা হয় সেখানেও উপস্থিতি কমে আসছে। তাছাড়া অনেক গির্জ্জার ভগ্নদশা থেকে সংস্কার আর হচ্ছে না। ধর্মনীতির চরিত্রের ওপর যে প্রভাব আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজ ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্যে বৃটেনে জাতীয় চরিত্রেরও নাকি অবনতি হচ্ছে। তাই আজ অনেকেই বলেন শিক্ষাকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার ফলেই আজ এই অবস্থা। কেবল তাই নয় শিক্ষার মধ্যে বৃত্তি শিক্ষা প্রধান হওয়ার ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ হতে চলেছে। তাই বৃটেনের শিক্ষার সংস্কারের দিকে আজ আবার দৃষ্টি ফিরেছে। যাতে মস্তিষ্কের বিকাশের সঙ্গে হৃদয়ের বিকাশ হয়। কমনীয় বৃত্তির উন্মেষ ঘটে, এমন Comprehensive Education এর জন্যে আজ সুপারিশ চলেছে। জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি যাতে অল্পবয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে জন্মায় এ জন্যে school studies এর প্রবর্তন। বৃটেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেটুকু দিয়েছে তা অন্যান্য জাতির তুলনায় কম নয়—বরঞ্চ নানাভাবে সে বিশ্বসভ্যতার ধারাকে প্রভাবিত করেছে। বিজ্ঞানকে সে নিয়োজিত করেছে জনকল্যাণের জন্যে—কিন্তু আজ যান্ত্রিক যুগের ধর্মপালন করতে গিয়ে যদি সে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই। তবে এতদিনের চেষ্টায় যে সংস্কৃতির তাজমহল গড়ে উঠেছে তা আবার ভূমিসাৎ হবে তাই আজ সবচেয়ে বড় সংকট হল সাংস্কৃতিক বিপর্যয়—বস্তুসর্ব্বস্ব মন নিয়ে মানুষ যতই পক্ষবিস্তার করুক না কেন, তাতে সভ্যতার কোন অগ্রগতি হবেনা। গত শতাব্দীর অক্লান্ত সাধনার ফল এই সংস্কৃতি—আর তারই সৌরভ এনেছে মানবত্ব, এনেছে চিত্তের উৎকর্ষ। আজ আমরা আকাশে উড়তে শিখেছি, গহন জলে পাড়ি জমাতে শিখেছি, কিন্তু মাটিতে মিলেমিশে একসঙ্গে বাস করতে শিখিনি। এইখানেই আমাদের সবচেয়ে বড় পরাজয়। মনের ওপর বস্তুর প্রাধান্য এর জন্যে দায়ী। তাই আজ আবার নতুন করে ভাববার দিন আসছে।

'চির নূতনেরে দিল ডাক……
পঁচিশে বৈশাখ"

সেক্সপীয়রের টুয়েলভথ নাইট

নাট্য সম্পাদনা ও অনুবাদ

শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্ত

পাত্র-পাত্রী

অরসিনো	...	ইলিরিয়ার ডিউক।
অলিভিয়া	..	ইলিরিয়ার কাউন্টেস্
ভায়োলা	...	মেসালিনের রাজকন্যা
এ্যান্টনিয়ো	...	
সেবাষ্টিয়ান	...	মেসালিনের সেবাষ্টিয়ান।
নাবিক	...	
স্যার টবি	...	অলিভিয়ার কাকা।
স্যার এ্যানড্	...	জমিদারের ছেলে।
মেরিয়া	...	অলিভিয়ার সহচরী।
ভাঁড়	...	
ডিউকের বন্ধু	...	
মেলভলিয়ো	...	অলিভিয়ার সরকার।
ক্যাবিয়ান	...	অলিভিয়ার কর্ম্মচারী
পুলিশ	...	
পুলিশ	...	

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ডিউকের প্রাসাদ

গান—১ (দূর দিগন্ত হ'তে...)

ডিউক। ঐ লাইনটা আবার গাও। ওর সুরটা আমার কানে এসে বাজল ঠিক যেন গোলাপ খেতের উপর দিয়ে বয়ে আসে যে হাওয়া তারই সুরভি নিঃশ্বাসের মত।

(গান)

কিন্তু না: আর অত ভালো লাগছে না। প্রেম জিনিষটা এমনি খামখেয়ালি যে ওর যেন খেয়ালের আর অন্ত নেই।

বন্ধু। শিকার করতে যাবে বন্ধু ?

ডিউক। কী শিকার করব ?

বন্ধু। কেন, হরিণ ?

ডিউক। তাই ত' দিনরাত করছি, সেই হরিণটাকে যে আমার সব হরিণের সেরা, সে আমার প্রাণ। ওঃ, যেদিন প্রথম অলিভিয়াকে দেখলাম, সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমার প্রাণ যেন একটা হরিণের মতই চকিত হ'য়ে উঠল। আর আমার অতৃপ্ত কামনা যেন হিংস্র, নিষ্ঠুর কুকুরগুলোর মতই আমার প্রাণটার পিছু তাড়া করে চলেছে।

বল, কী খবর এনেছ তার কাছ থেকে ?

বন্ধু। আর বন্ধু, সে ত' আমাকে তার কাছে যাবার হুকুমই দিলে না। তার ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠাল যে সাত বছরের মধ্যে আলো বাতাস পর্য্যন্ত তার মুখ ভালো ক'রে দেখ্‌তে পাবে না, সে ব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনীর মত ঘোমটায় মুখ ঢেকে থাকবে। এমনি করে যে ভাইটি তার মরে গেছে তার স্মৃতিকে আপনার বেদনার মধ্যে জাগিয়ে রাখবে, এই তার পণ।

ডিউক। আহা, যার প্রাণটা এমনি সুন্দর, যে শুধু মাত্র ভ্রাতৃস্নেহের ঋণ এমন করে শোধ করছে—যখন প্রেমের সোনার তীর তার মন থেকে অন্য সব ভালবাসার দলগুলোকে তাড়িয়ে দেবে, যখন তার মন প্রাণ কোন একজন একছত্র রাজার প্রেমে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে, তখন না জানি সে তাকে কেমন ক'রেই না ভালবাসবে।

চলো বন্ধু, আমায় ফুল-বাগানে নিয়ে চলো। কুঞ্জবনের ছায়াতলই প্রেমের স্বপ্ন দেখবার উপযুক্ত জায়গা।

দ্বিতীয় দৃশ্য—সমুদ্র-তীর

ভায়োলা এবং নাবিক

ঝড়

ভায়োলা। বন্ধু, এ আমরা কোন দেশে এসেছি ?

নাবিক। এ দেশের নাম ইলিরিয়া।

ভায়োলা। ওগো, এ দেশে আমি কী করব। আমার ভাই......

নাবিক। না, না, আপনি অমন করবেন না। হয়ত আপনারই মত আপনার ভাই দৈবযোগে বেঁচে আছে। যখন আমাদের জাহাজ ডুবি হ'ল তখন আমি তাকে দেখেছিলাম। সে নিজেকে একটা শক্ত মাস্তলের সঙ্গে বেঁধে দুরন্ত ঢেউগুলির সঙ্গে লড়াই করছিল।

ভায়োলা। আমি নিজে যে বেঁচে আছি তার থেকে এই আশা মনে জাগছে যে হয়ত' আমার ভাইও বেঁচে আছে। আচ্ছা, এ দেশটা কি তোমার জানা?

নাবিক। হ্যাঁ, খুব ভালো করেই জানা। এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যেই আমাদের নিজেদের গাঁ।

ভায়োলা। এ দেশের শাসনকর্ত্তা কে? তাঁর নাম কি?

নাবিক। তাঁর নাম ডিউক অরসিনো।

ভায়োলা। আমি আমার বাবার মুখে এ নাম শুনেছি। তখনো তিনি বিয়ে করেন নি।

নাবিক। শুনেছি যে তিনি এখানকার জমিদারের মেয়ে অলিভিয়াকে বিয়ে করতে চান।

ভায়োলা। সে মেয়েটি কেমন?

নাবিক। খুব ভাল মেয়ে। এই ত' বছর খানেক হ'ল তাঁকে তাঁর ভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে তাঁর বাপ মারা-যান। তার পরে সেই ভাইটিও মারা যান। লোকে বলে সেই শোকে তিনি আর কারো সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করেন না।

ভায়োলা। আমি যদি এই মেয়েটির কাছে কাজ পেতাম…।

নাবিক। সে ত' হয়ে ওঠা মুস্কিল, তিনি যে কারো সঙ্গে দেখাই করেন না।

ভায়োলা। বন্ধু, আমি যে কে—একথা তুমি কাউকে ব'ল না। আমি ছদ্মবেশে ছেলে সেজে এই ডিউকের কাছেই কাজ নেব। তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। প্রস্থান

(ভায়োলার বেশ পরিবর্ত্তন। ঐক্যতান বাদন।)

তৃতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার বাড়ী

টবি ও মেরিয়া

টবি। আমার ভাইঝির এ কী কাণ্ড! ভাইয়ের শোকে এমন ক'রে পাগল হ'তে ত' কাউকে দেখিনি।

মেরিয়া। দেখুন, স্যার টবি, রাত্রি বেলায় আপনি আর একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরবেন। আপনি যে রোজ রাত দুপুরে বাড়ী আসেন এতে আপনার ভাই-ঝি খুবই রাগ করছেন।

টবি। এতদিন যখন রাগ ক'রে এসেছেন তখন আরও দুদিন করুন না।

মেরিয়া। এত মদ খেলে আপনার শরীর ক'দিন টিকবে? এই কথাই আপনার ভাইঝি সেদিন বলছিলেন। তিনি আরও বলছিলেন, আপনি নাকি কোন এক জমিদারের বোবা ছেলেকে এনেছেন, আপনার ভাইঝির সঙ্গে সম্বন্ধ করবেন ব'লে।

টবি। কে, স্যার এ্যাণ্ড্রু?

মেরিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ তিনিই।

টবি। কেন তিনি ইলিয়ার যে কোন সুপাত্রের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারেন। আর তার আয় বছরে দু'লক্ষ টাকা।

মেরিয়া। ও টাকায় তাঁর বছরখানেকের বেশী চলবেনা, কারণ তিনি যত বড় বোকা ততবড় বেহিসাবী। যাক্, যে কথাটা বলছিলাম সেটা একটু খেয়াল রাখবেন—নইলে…।

চতুর্থ দৃশ্য

ডিউকের প্রাসাদ

বন্ধু, সিসারিয়ো, ডিউক

বন্ধু। দেখ ভাই সিসারিয়ো, ডিউক যদি তোমার প্রতি তাঁর এই অনুগ্রহ বজায় রাখেন তাহ'লে তোমার ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা আছে। তোমার সঙ্গে তাঁর মাত্র এই তিন দিনের পরিচয়। আর এরই মধ্যে তুমি যে তাঁর অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছ!

ভা। আমার উপর তাঁর দয়া বজায় থাকবেনা কেন? তিনি বুঝি খুব খামখেয়ালী লোক?

বন্ধু। না, না, তা নয়।

ভা। ঐ যে তিনি এখানেই আসছেন।

ডিউকের প্রবেশ

ডিউক। এই যে সিসারিয়ো, এখানে, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। বন্ধুর প্রস্থান

দেখ সিসারিয়ো—তোমাকে ত' আমি সব কথা বলেছি, তাই তোমাকেই বলছি তুমিই তার কাছে যাও।

ভা। কিন্তু মহারাজ, যেমন শুনি, তিনি যদি তেমনি শোকে আকুল হ'য়ে থাকেন তা হ'লে ত' বোধ-হয় তিনি আমার সঙ্গে দেখাই করবেন না।

ডি। তা হ'লে তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি ক'রো, গোলমাল ক'রো, সভ্যতার সীমা পেরিয়ে যেতে হয় তাও যেও, কিন্তু কাজ না সেরে কিছুতেই ফিরো না।

ভা। আচ্ছা, ধরুন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তার পরে?

ডি। তখন তুমি তাকে আমার গভীর ভালবাসার কথা জানিয়ো। কোন গম্ভীর বুড়ো মানুষের চেয়ে সে তোমার মত সুন্দর, সুকুমার যুবকের কথায় নিশ্চয় বেশী মন দেবে।

ভা। আমার ত' তা মনে হয় না।

ডি। বিশ্বাস কর ভাই, এ কাজের জন্য তুমিই সব চেয়ে যোগ্য লোক। মেয়েদের সঙ্গে তোমার খুব মিল আছে। তোমার লাল পাতলা ঠোট দুখানি, তোমার গলার মিষ্টি স্বর, ঠিক যেন মেয়েদের মত।

ভা। আচ্ছা, আমার যতদূর সাধ্য—তাতে আমি ত্রুটি করব না।

ডি। আচ্ছা, তা হ'লে যাও, আর দেরী নয়।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

অলিভিয়ার বাড়ী

অলিভিয়া, ভাঁড়, মেলভলিয়ো, মেরিয়া, টবি, সিসারিয়ো

ভাঁড়। প্রণাম হই রাণীদিদি।

অলি। এই বোকাটাকে এখান থেকে কেউ নিয়ে যাও ত'।

ভাঁড়। আরে এই কে আছিস্? রাণীদিদিকে এখানে থেকে নিয়ে যা ত।

অলি। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছি।

ভাঁড়। ভয়ানক ভুল কথা বলেছেন, কারণ আমি আপনাকে এখনি বোকা বানাতে পারি।

অলি। আচ্ছা তাই সই, হাতে আর কোন কাজ নেই। তোমাকে নিয়েই একটু সময় কাটানো যাক্। বানাও আমাকে বোকা, দেখি কী ক'রে বানাবে।

ভাঁড়। দিদিভাই, তুমি শোক করছ কার জন্য?

অলি। আমার ভাইয়ের জন্য।

ভাঁড়। আমার মনে হয় তার আত্মা নিশ্চয় জাহান্নামে গেছে।

অলি। আমি জানি তার আত্মা স্বর্গে গেছে।

ভাঁড়। তবে ত' তোমার মত বোকা আর নেই যে, তোমার ভাই স্বর্গবাস করছে ব'লে তুমি শোকে আকুল হয়েছ। আচ্ছা, কে আছিস্, এই বোকাটাকে এখান থেকে নিয়ে যা।

মেলভলিয়োর প্রবেশ।

অলি। সরকার মশাই, আপনি এই ভাঁড়কে কেমন দেখ্ছেন? এর ভাঁড়ামোর উন্নতি হচ্ছে কি না?

মেল। হ্যাঁ, ওর বোকামো দিন দিন উন্নতি করতেই থাক্‌বে, একেবারে মরার দিন পর্য্যন্ত। বয়স হ'লে বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ত' কমে যায়, কিন্তু বোকার বোকামো দিনে দিনে বাড়তেই থাকে।

ভাঁড়। ভগবান করুন তুমি তাড়াতাড়ি বুড়ো হও, যাতে তোমার বোকামোটা তাড়াতাড়ি বাড়ে।

অলি। সরকার মশাই, এবার কী জবাব দেবেন, দিন।

মেল। আমি অবাক্ হ'য়ে দেখ্ছি, আপনি কেমন ক'রে এই হতভাগা বোকাটার বোকামো উপভোগ করছেন। যে সব বড়লোকে এই সব বোকাদের প্রশ্রয় দেয় তাদের আমি বলি গণ্ডমূর্খ।

অলি। আঃ, সরকার মশাই, আপনি দেখছি একটা রসিকতা পর্য্যন্ত উপভোগ করতে পারেন না। যাদের মেজাজ খোলামেলা হাসি-খুসি—তারা এসব হাসি ঠাট্টায় রাগ করে না। ভাঁড় যদি ভাঁড়ামো করে, তাতে চট্‌বার কী আছে।

মেরিয়ার প্রবেশ

মেরি। রাণীদিদি, গেটের কাছে এক অল্পবয়সী ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে চান।

অলি। নিশ্চয় ডিউকের কাছ থেকে এসেছে?

মেরি। তাত' জানি না, কিন্তু ভদ্রলোকটি দেখ্‌তে ভারী সুন্দর, আর খুব অল্প বয়স।

অলি। সরকার মশাই, আপনি যান, ভদ্রলোক যদি ডিউকের কাছ থেকে এসে থাকেন তা হ'লে তাকে ব'লে দেবেন, আমি অসুস্থ, কিম্বা বাড়ী নেই। আপনার যা খুশী একটা কিছু বানিয়ে ব'লে দেবেন।

স্যার টবির প্রবেশ

অলি। হায় ভগবান, আধমাতাল হ'য়ে আছেন। কাকা, ফাটকের কাছে কে এসেছে ?

টবি। এক ভদ্রলোক।

অলি। কী রকম ভদ্রলোক ?

টবি। হ'তে পারে শয়তান এসেছে, যে খুশি হ'ক্ না, আমার তাতে কি ? আমি সৎপথে থাকলেই হ'ল, আমার কাছে শয়তানও যা, সাধু মহাত্মাও তাই···বেশ, বেশ···

প্রস্থান

মেলভলিয়োর প্রবেশ

মেল। রাণীদিদি, সেই ছোঁড়াটি দিব্যি-কেটে বল্‌ছে কি—যে আপনার সঙ্গে কথা বল্‌বেই। ওকে কী বলি বলুন ত' ? ও যে কোন ওজরই শুনতে চায় না।

অলি। তাকে আস্‌তে দিন, আর মেরিয়াকে ডেকে দিন।

মেলভলিয়োর প্রস্থান। বিপরীত দিক দিয়ে মেরিয়া ও সিসারিয়োর প্রবেশ

সিসারিও। এ বাড়ীর কর্ত্রী কে ?

অলি। আমার সঙ্গেই কথা বলুন, তার হ'য়ে আমিই জবাব দেব।

সিসা। দেখুন, আমায় বলে দিন আপনি এ বাড়ীর কর্ত্রী কি না। আমি অপাত্রে আমার কথা নষ্ট করতে চাই না। একথাগুলো যাঁর, তিনি ভারি সুন্দর করে এই কথাগুলো গুছিয়ে লিখেছেন আর আমিও অনেক কষ্ট ক'রে তা মুখস্থ ক'রেছি।

অলি। মানুষ হাসানোই আপনার ব্যবসা না কি ?

সিসা। মোটেই নয়, কিন্তু এমনি আমার দুর্দৈব যে আমি যে পার্ট প্লে করছি, আসলে আমি তা নই। আপনিই কী এ বাড়ীর কর্ত্রী ?

অলি। আমি যদি নিজের সম্পত্তি নিজে চুরি না ক'রে থাকি, তা হ'লে আমিই এ বাড়ীর কর্ত্রী।

সিসা। তা হ'লে নিশ্চয়ই আপনি নিজেকে নিজে চুরি ক'রেছেন। কারণ যা আপনার পরকে দেওয়া উচিত তা আপনি নিজের জন্য রেখে দিতে পারেন না। যাক্ এসব কথা আমার বক্তব্যের মধ্যে নয়। আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথমে আছে আপনার প্রশংসা আর তার পরে···।

অলি। আপনার বক্তব্যের মধ্যে যেটা বেশী দরকারী কথা সেটাই বলুন—প্রশংসাটা আমি আপনাকে মাপ ক'রে দিলাম।

সিসা। হায়রে, আমি যে অনেক কষ্ট ক'রে ওটা মুখস্থ ক'রেছি, আর দেখুন ওটা খুব পোয়েটিক্যাল।

অলি। সেই জন্যেই ওটা মিথ্যে। ওটা আপনি মনে মনেই রাখুন। তবে যা ব'ল্‌বেন সংক্ষেপে বলুন। আমার এই সময়টা ঠিক এই রকম হাল্কা হাসি-ঠাট্টা করবার উপযুক্ত নয়।

মেরিয়া। মশাই, আপনি যদি এবার পাল তুল্‌তে চান ত' আপনার রাস্তা পরিষ্কার।

সিসা। না গো, আমি আর একটুখানি এখানেই ভেসে বেড়াব। রাণী আপনার এই সখীটিকে একটু শান্ত করুন।

অলি। আপনার মনের কথাটি আমায় বলুন।

সিসা। আমার মনের কথা, আমি ত' কেবল অন্যের দূত। আমার বক্তব্য শুধু আপনার একার শুনবার জন্যে।

মেরিয়ার প্রস্থান।

অলি। নিন্ মশাই, এবারে আপনার কথাটা বলুন।

সিসা। ওগো মধুময়ী !

অলি। বেশ, বেশ, আপনার এই বক্তৃতা কোথায় লেখা আছে ?

সিসা। ডিউক অরসিনোর বুকে।

অলি। ওঃ, তার বুকের কোন চাপটারে ?

সিসা। আপনার বলার কায়দা হিসাবে তার বুকের প্রথম চাপটারে।

অলি। ওঃ, সে আমি প'ড়ে নিয়েছি, ও সমস্ত মিথ্যে কথা। আপনার আর কিছু বল্‌বার—নেই কি ?

সিসা। আমার মালিক আপনাকে ভালবাসেন।

অলি। আপনার মালিক আমার মন জানেন। আমি তাঁকে ভালবাস্‌তে পারব না।

সিসা। আমি যদি আমার মালিকের মত আপনাকে এমন মর্মান্তিক ভালবাসতুম, তা হ'লে আপনার এই প্রত্যাখ্যানের কোন অর্থ আমি বুঝ্‌তে পারতাম না।

অলি। আপনি কী করতেন ?

সিসা। আমি খড়কুটো দিয়ে আপনার দুয়ারে কুঁড়ে ঘর তৈরী ক'রে বাস করতাম আর বাড়ীর মধ্যে যে আমার প্রাণ, তার কাছে আমার আকুল মিনতি পাঠাতাম। পাহাড়ে পর্ব্বতে আমি তার নামের প্রতিধ্বনি তুলতাম, আর হাওয়ায় যে কানাকানি চলছে তার মধ্য থেকে বাজিয়ে তুলতাম আমার আহ্বান—ওগো মধুময়ী !

অলি। হয়ত' আপনি নিজের কাজ উদ্ধার ক'রেও নিতে পারছেন। আপনার পরিচয়টা কী ?

সিসা। আমি ডিউকের আশ্রিত।

অলি। আপনি গিয়ে আপনার বন্ধুকে বলুন, আমি তাঁকে ভালবাসি না, তিনি যেন আর কখনো কোন লোক না পাঠান। হ্যাঁ, অবশ্য আপনি এসে আমায় ব'লে যেতে পারেন যে এই খবরটা তিনি কী ভাবে নিলেন।

সিসা। আচ্ছা সুন্দরী নিষ্ঠুরতা, তা হ'লে বিদায়।

সিসারিয়োর প্রস্থান

অলি। আহা, এ যদি অনুচর না হ'য়ে ডিউক নিজে হ'ত ? এমনও হয় না কি ? এখানে কে আছেন ? সরকার মশাই ?

মেলভলিয়োর প্রবেশ

মেল। এই যে আমি।

অলি। দেখুন, ঐ অভদ্র লোকটা ঐ ডিউকের কাছ থেকে এখনই যে এসেছিল, তার পিছনে দৌড়ে যান্। ও একটা আংটি জবরদস্তি রেখে গেছে। ওকে বলুন, এ আংটি আমি নেব না। যান্ ছুটে চলে যান্।

মেল। আমি এখনই যাচ্ছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—সমুদ্র-তীর

এ্যান্টনিয়ো। বন্ধু, তা হ'লে তুমি আর এখানে থাকতে চাও না। আর এও চাও না যে আমি তোমার সঙ্গে যাই।

সেবাষ্টিয়ান। না, এই জন্যে চাই না যে আমার সময়টা খুব খারাপ প'ড়েছে। তুমি আমার সঙ্গে এলে হয় ত' আমার দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ তোমাকেও লাগবে।

এ্যান্টনিয়ো। অন্তত তুমি কোথায় যাবে তা ত' আমাকে বলে যাও।

সেবাষ্টিয়ান। আমি যাচ্ছি ডিউক আরসিনোর কোর্টে। আচ্ছা, তবে আসি। প্রস্থান

এ্যান্টনিয়ো। সমস্ত দেবতাদের আশীর্ব্বাদ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—পথ

মেলভলিয়ো, সিসারিয়ো

মেলভলিয়ো। আরে এ মশাই, আপনি না এখনি রাণী অলিভিয়ার ওখানে গিয়েছিলেন। তিনি আপনাকে আংটি ফিরে দিয়েছেন। মশাই, এটা আপনি নিজেই নিয়ে এলে পারতেন, আমাকে কষ্টটা না দিলে বুঝি আপনার চলছিল না।

সিসারিয়ো। তিনি আংটি আমার কাছ থেকে নিয়েছেন। ও আর আমি ফিরিয়ে নেব না।

মেলভলিয়ো। দেখুন মশাই, আপনি জবরদস্তি ক'রে রেখে এসেছেন এবং তাঁর ইচ্ছে তেমনি জবরদস্তি ক'রেই এটা আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে! এই আপনার চোখের সামনে পড়ে রইল। মেলভলিয়োর প্রস্থান

সিসারিয়ো। আমি ত' কোন আংটি দিয়ে আসিনি। মেয়েটার মতলবখানা কি? ভগবান না করুন, আমার এই বেশ দেখে সে ত' ভোলে নি ? ওঃ, এই জন্যই এত ক'রে আমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। হ্যাঁ, ও এমন ক'রে আমায় দেখছিল যেন মনে হচ্ছিল ওর চোখের দৃষ্টির মাঝে ওর কথা হারিয়ে যাচ্ছিল। এই ছলে ও আমায় ডেকেছে। ও ভেবেছে আমি পুরুষ মানুষ। এর যে কি পরিণাম হবে! আমার প্রভু ওকে খুব ভালবাসেন আর আমি হতভাগী আমার প্রভুকে ততখানিই ভালবাসি। আর ঐ মেয়েটি ভুল ক'রে আমাকে ভালবেসেছে।

তৃতীয় দৃশ্য—অলিভিয়ার বাড়ী

টবি, এ্যানড্রু, ভাঁড়, মেরিয়া, মেলভলিয়ো

টবি। আসুন, আসুন, স্যার এ্যানড্রু। দেখুন মাঝ রাতের পরে না ঘুমানো মানে ঠিক সময় ওঠা।

এ্যানড্রু। তা জানি না, তবে এটুকু জানি যে দেরীতে শোওয়া মানে দেরীতে শোওয়া।

টবি। এ আপনার ভুল কথা, মাঝরাতের পরে জেগে থাকা আর তারপরে শোওয়া মানে সকাল বেলাতে শোওয়া, অর্থাৎ ঠিক সময় মত শোওয়া।

এ্যানড্রু। আরে এই যে গোপাল ভাঁড় আস্ছে।

ভাঁড়ের প্রবেশ

ভাঁড়। কেমন আছেন প্রাণের বন্ধুরা আমার।

টবি। এস, এস গর্দ্দভ, এস, একটু গান বাজনা হোক্।

ভাঁড়। কি গান শুনবেন? ধর্ম্মসঙ্গীত না প্রণয় সঙ্গীত?

টবি। আরে প্রণয় গীত, প্রণয় গীত।

এ্যানড্রু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওসব ধর্ম্ম সঙ্গীতের আমিও ধার ধারি না।

ভাঁড়ের গান :—প্রিয়া গো কোথায় চলেছ…

…কে না জানে।

বাঃ, বাঃ, চমৎকার।

বাঃ, বাঃ……

ভাঁড়ের গান : প্রেম কী? সে ত' নয় পর জীবনে…

…ছায়ার প্রায়।

মেরিয়ার প্রবেশ

মেরিয়া। আপনারা এ কী হৈ হুল্লোর লাগিয়েছেন বলুন ত'। এখনি রাণীদিদি তার চাকরকে ডেকে যদি আপনাদের বাড়ীর বার ক'রে দিতে না বলেন তো কী বলেছি।

টবি। আমি না তার আত্মীয়, আমি না তার কাকা। তুই কোথাকার কে, যাঃ, যাঃ।

গান

ঐ যে শহর বেবিলন, সেথা থাকত একজন

শোন শোন সুন্দরী গো।

মেলভলিয়োর প্রবেশ

মেলভ। আরে মশাই আপনারা কি সব পাগল হয়েছেন? একি করছেন আপনারা? আপনাদের কি কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, একটা ভদ্রতা ব'লে কি কিছু নেই? রাত দুপুরে রাস্তার মাতালের মত হৈ-হুল্লোর জুড়ে দিয়েছেন। রাণীদিদির বাড়ীটাকে যেন তাড়িখানা বানিয়ে তুলেছেন!

টবি। আমরা সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা করছিলাম, ও ত' একটা জ্ঞান। যান্ যান্ এখান থেকে সরে পড়ুন।

মেলভ। দেখুন, স্যার টবি, আমি আপনাকে স্পষ্ট বলবো। রানী দিদি আপনাকে বল্তে বলেছেন যে যদিও আপনি তাঁর আত্মীয় ব'লে তিনি আপনাকে পুষেছেন কিন্তু আপনার এই সব বেয়াড়াপনা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। আপনি যদি ভদ্রলোকের মত থাক্তে পারেন তো স্বচ্ছন্দে থাকুন, আর তা যদি না পারেন ত' আপনি ইচ্ছে করলে এখান থেকে বিদায় হ'তে পারেন।

টবি। গান :—বিদায় দাও প্রেয়সী…

…যেতেই হবে আমাকে।

মেরিয়া। আসুন স্যার টবি।

ভাঁড়ের গান :—ওর চোখ দেখে মনে হয়

ওর প্রাণ থাকে কি না থাকে।

মেলভ। আচ্ছা বটে এতদূর সাহস বেড়ে গেছে।

টবি। (গান) কিন্তু আমি কোনদিন মরবো না।

ভাঁড়। (গান) দাদা এ তোমার মিছে কল্পনা।

মেলভ। বাঃ বাঃ চমৎকার।

টবি। (গান) ওকে চলে যেতে বল্ব কি?

ভাঁড়। (গান) বলেই দেখনা হয় কি?

টবি। (গান) কান ধ'রে ওকে ক'রে দেব দূর?

ভাঁড়। (গান) বটে, বটে, বটে সাহস এত দূর!

টবি। আরে আরে পদ মিলল না, তাছাড়া তুই মিছে কথা বল্ছিস, এ হতভাগা বাড়ীর সরকার বইত' নয়। মেরিয়া, বোতল লে আও।

মেলভ। মেরিয়া ঠাকরুণ, তুমি যদি রানী দিদির জন্যে এতটুকুও কেয়ার করতে তা হ'লে এই সব বেয়াড়াপনার প্রশ্রয় দিতে না। ভেবনা, তোমার সব খবর তিনি আমার মুখেই শুনতে পাবেন।

মেরিয়া। যান্, যান যা পারেন করুন গিয়ে।

মেলভলিয়োর প্রস্থান

এ্যানড্রু। দেখ, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। ও বেটাকে জব্দ করতে হবে।

টবি। ঠিক কথা, ওকে জব্দ করতে হবে।

মেরিয়া। আজ রাতে আর কিছু করবেন না। ডিউকের সেই লোক, আজ যে রানী দিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তারপর থেকে তিনি যেন কেমন উতলা হ'য়ে আছেন। ঐ সরকারটাকে জব্দ করবার জন্যে, সে ভার আমায় দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

টবি। তোমার মতলবটা কি আমাদেরও একটু বল, বল।

মেরিয়া। তবে শুনুন, যদিও কখনও কখনও লোক-টাকে একটু সাধু সাধু ব'লে মনে হয় কিন্তু আসলে ও সাধুও নয়, কিছুই নয়। ও শুধু লোক দেখানি। আসলে লোকটা আত্মভিমান সর্ব্বস্ব গাধা। ওর জ্ঞান গম্য কিছু নেই। ও নিজেকে বড় বেশী গুণী বলে মনে করে। তাই ওর মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে লোকে ওকে দেখামাত্রই ওর প্রেমে পড়ে। ওর স্বভাবের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েই আমি ওর উপর শোধ তুলবো।

টবি। তুমি কি করবে?

মেরিয়া। আমি ওর পথের ধারে একটা অস্পষ্ট ভাষায় লেখা প্রণয় পত্র ফেলে রাখব।

টবি। বা-রে, চৎমকার, আমি এর মধ্যে খুব চমৎকার একটা ফন্দির গন্ধ পাচ্ছি।

এ্যানড্রু। সে গন্ধ আমার নাকেও আসছে।

টবি। ঐ চিঠি দেখে ও ভাববে যে আমার ভাই-ঝি ওকে প্রণয় পত্র লিখেছে। সে ওকে ভালবাসে।

মেরিয়া। আমার মতলবটা ঠিক তাই। আজ রাতের মতন শুতে যান, আর এই মজার কথাটা নিয়ে স্বপ্ন দেখুন। প্রস্থান

টবি। নমস্কার চতুরিকা!

এ্যানড্রু। মাইরি বলছি, মেয়েটি বেশ।

টবি। আর জানেন, আমাকে ভালোবাসে।

এ্যানড্রু। একবার আমাকেও একজন ভালোবেসেছিল। প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য—ডিউকের বাড়ী

ডিউক, ভায়োলা

ডিউক। তুমি যদি কখনও ভালবাস, তা হ'লে প্রেমের সেই মিষ্টি ব্যথার মধ্যে আমাকে মনে ক'রো। এখনি যে গানটা শুনলে তার সুরটা তোমার কেমন লাগল?

ভায়োলা। মনে হ'ল যেখানে ভালবাসা তার মানস-সিংহাসনে ব'সে আছে, এ গান গিয়ে একেবারে সেইখানে প্রতিধ্বনি তুলছে।

ডিউক। তুমি কি চমৎকার করেই না কথাটা বললে। আমার মনে হয়, যদিও তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ তবুও তুমি কাউকে দেখেছ যাকে তুমি ভালোবাস।

ভায়োলা। হ্যাঁ একটুখানি দেখেছি আপনারই মুখে।

ডিউক। সে মেয়েটি কেমন দেখতে?

ভায়োলা। তার চেহারাটি অনেকটা আপনারই মতন।

ডিউক। তা হ'লে সে তোমার যোগ্য নয়। দেখ ভাই সিসারিয়ো, কাল রাতে যে একটা পুরোণো দিনের গান শুনেছিলাম, তাতে আমার মনটা অনেকটা হাল্কা হ'য়েছিল। সেই গানটি আর একবার আমায় শোনাও তো ভাই।

ডিউক। আর একবার তুমি সেই রাণী নিদয়ার কাছে যাও।

ভায়োলা। আর সে যদি আপনাকে ভালোবাসতে না পারে, তা হ'লে?

ডিউক। এ জবাব মেনে নিতে পারি না।

ভায়োলা। কিন্তু আপনাকে মেনে নিতেই হবে এই ধরুন হয়ত' কোন মেয়ে,—এমন কোন মেয়ে থাকতেও পারে, যে আপনাকে ভালোবাসে। আপনি তাকে ভালো-বাসতে পারেন না। আপনি তাকে সে কথা ব'লে দিলেন। তখন কি তাকে সে জবাব মেনে নিতেই হবে না।

ডিউক। অলিভিয়ার প্রতি আমার ভালোবাসাকে তুমি আমার প্রতি কোন মেয়ের ভালোবাসার সঙ্গে তুলনা ক'র না।

ভায়োলা। কিন্তু আমি যে জানি—

ডিউক। তুমি কী জান?

ভায়োলা। মেয়েরা কতখানি ভালোবাসতে পারে। আমি তবে তার কাছে যাই।

ডিউক। হ্যাঁ সেই কথাই তো তোমায় বলছি। তাড়াতাড়ি তার কাছে যাও। প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য—অলিভিয়ার বাগান

মেরিয়া, মেলভলিয়ো, এ্যানড্রু, টবি, ফ্যাবিয়ান

মেরিয়া। দেখুন মেলভলিয়ো এই পথেই আসছে। আপনারা তিনজনে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখুন এ চিঠি পেয়ে ও কী করে।

মেরিয়া চিঠি ফেলে যাবে

মেলভলিয়োর প্রবেশ

মেলভ। ভাগ্যে থাকলে কী না হ'তে পারে? সবই ভাগ্যের খেলা। মেরিয়া একবার ব'লেও ছিল যে রাণী আমায় ভালোবাসেন। আর তিনি নিজেও প্রায় এ ধরণের কথা ব'লেছেন। আর তিনি আমায় যতটা খাতির করেন, তাঁর লোকজনদের মধ্যে আর কাউকে তেমনটি করেন না। এর থেকে কী প্রমাণ হয়?

এ্যানড্রু। ও হো হো, আমি যদি এই সময়ে বদমাইসটাকে ধ'রে ক'সে মার দিতে পারতাম।

টবি। আরে চুপ্ চুপ্।

মেলভ। তখন আমি হব কাউণ্ট মেলভলিয়ো।

টবি। ওরে শয়তান!

এ্যানড্রু। ওরে গুলী কর, গুলী কর।

মেলভ। কেন, এরকম কত উদাহরণ আছে যে রাজার মেয়ে তার কোন কর্মচারীকে বিয়ে করেছে।

ফ্যাবিয়ান। দেখুন, দেখুন বেটা একেবারে দিবাস্বপ্নে মশগুল হ'য়ে উঠেছে।

মেলভ। এই মাস তিনেক হ'ল আমাদের বিয়ে হ'য়েছে। একদিন আমি নিজের দরবারে ব'সে আছি। আমার সব অফিসারেরা আমায় ঘিরে ব'সেছে। আমার গায়ে একটা সুন্দর কাজকরা মখমলের জামিয়ার। সবে দিবানিদ্রা সেরে উঠে এসেছি—অলিভিয়া তখনো বিছানায় ঘুমিয়ে…

টবি। ওরে ওর মাথায় কেন বজ্রাঘাত হয় না!

ফ্যাবিয়ান। আহা হা, করেন কি, করেন কি? থামুন থামুন, আপনারা যদি এমন করেন তো সব ভেস্তে যাবে।

মেলভ। তখন আমি দরবারের উপযুক্ত বেশে, ভারিক্কি চালে, গম্ভীর মুখে ব'সে থাক্‌ব, আর আশেপাশের লোকজনদের দিকে এমন গম্ভীরভাবে তাকাব, যেন তারা বুঝ্‌তে পারে যে আমিই বা কে আর ওরাই বা কে। (চিঠি তুলে নিয়ে) এঁ্যা, এ যে রাণীর হাতের লেখা, এ চিঠিখানা খুলে পড়্‌তে হ'চ্ছে।

(পড়ছে) "দেবতা জানেন—
ভালবাসি আমি কিন্তু কাকে।
মুখ, ব'লো না সে কথা
বুক, চেপে রাখ ব্যথা—
জানুন তা একা অন্তর্য্যামী।"

কিন্তু কাকে? মেলভলিয়ো, সে যদি এ চিঠি তোমাকেই লিখে থাকে?

(পড়ছে) "যাকে ভালবাসি
সে আমারি অধীন
তবু নীরব ভালবাসা
ছুরির মতন
বিঁধে আছে মোর বুকে।
ম, হ, ভ এ আখর কটি
বুকে মোর রক্তরেখায়
লিখে রয়েছে কে?"

সে আমারি অধীন। বাঃ আমি তো তাঁর অধীন, আমি তাঁর সরকার, তিনি আমার কর্ত্রী। বা-রে, এর মানে তো যে কোন লোক বুঝতে পারবে। এতে না বুঝবার মতন কোন্ কথাটা আছে? এঁ্যা এ যে পুনশ্চ দিয়ে আবার কিছু লেখা আছে!

(পড়ছে) "এতক্ষণে তুমি নিশ্চয় বুঝেছ আমি কে? যদি তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ কর তা হ'লে আমার কাছে হাস্‌তে হাস্‌তে এসো। সেই হবে তোমার সংকেত। হাস্‌লে তোমাকে যে কী সুন্দর লাগে সে আর কি বল্‌ব। তাই যতক্ষণ তুমি আমার সাম্‌নে থাক্‌বে সারাক্ষণ হাস্‌তে থাকবে, এই আমার প্রার্থনা।"

আমি হাস্‌ব, তুমি আমাকে যা বল্‌বে আমি তাই করব। প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলিভিয়ার বাগান

টবি, ভায়োলা এবং এ্যানড্রুর প্রবেশ পরে অলিভিয়ার প্রবেশ

টবি। নমস্কার মশাই।

ভায়ো। নমস্কার।

টবি। আপনি কি আমার ভাই-ঝির সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন?

ভায়ো। হ্যাঁ, মশাই।

টবি। তা হ'লে চলুন, ভেতরে চলুন।

ভায়ো। আমাকে আর যেতে হবে না, ঐ যে তিনি নিজেই আসছেন।

টবির প্রস্থান

অলিভিয়ার প্রবেশ

ভায়ো। রাণী, আকাশের সুগন্ধি আশীর্ব্বাদ আপনার উপর ঝ'রে পড়ুক।

এ্যানড্রু। এই লোকটি বেশ সাজিয়ে কথা ব'ল্‌তে পারে ত'—আকাশের সুগন্ধি আশীর্ব্বাদ—আচ্ছা।

ভায়ো। রাণী, আমার বক্তব্য শুধু আপনারই কাছে।

এ্যানড্রর প্রস্থান

অর্থাৎ অন্তরালে অবস্থান।

অলি। আপনার নামটি কি?

ভায়ো। রাণী, আপনার এ দাসের নাম সিসারিয়ো।

অলি। দোহাই আপনার, আপনার মালিকের কথা আর আমার কাছে বল্‌বেন না। তবে যদি আমায় আপনার কোন কথা বল্‌বার থাকে তাহ'লে বলুন, সে আমি…।

ভায়ো। রাণী!

অলি। আমাকে বল্‌তে দিন। আপনি সেদিন এখানে এসে যে যাদু ক'রে গেছেন, তার পরে আমি আপনাকে ধ'রে আনবার জন্য একটা আংটি পাঠিয়েছিলাম।

ভায়ো। আপনাকে দেখে আমার দয়া হচ্ছে।

অলি। দয়া থেকেই ত' ভালবাসা জন্মায়।

ভায়ো। দেখুন আমি দিব্যি ক'রে ব'ল্‌তে পারি আমি শুধু একজনকেই ভালবাসি আর সে একজন কোন মেয়ে মানুষ নয়। আচ্ছা তা হ'লে আজ আসি।

অলি। আপনি আবার আস্‌বেন। হয়ত আপনার কথায় একদিন আমি তাকে ভালবাসতেও পারি।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার বাড়ী

টবি, এ্যানড্রু, মেরিয়া

এ্যানড্রু। নাঃ, আর এক মুহূর্ত্ত আমি এখানে থাক্‌ব না।

টবি। কেন, দুর্ব্বাসা মুনি, কি হ'ল বলুন ত'?

এ্যানড্রু। হ্যাঁ, আমি দেখেছি আপনার ভাইঝি ঐ ডিউকের লোকটাকে যে খাতির কর্‌ল আমাকে তা একদিনও করেনি।

টবি। আপনার সামনে যে লোকটাকে খাতির করেছে সে শুধু আপনার মনটাকে চেতিয়ে তোল্‌বার জন্যে। ঐ ডিউকের লোকটাকে আপনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করুন। মাইরি বল্‌ছি পুরুষের প্রতি মেয়ের মন আকর্ষণ করতে তার বীরত্ব গাথার মতন এমন জিনিষ আর নেই।

মেরিয়ার প্রবেশ

মেরি। দেখুন, আপনারা যদি হাসির চোটে পেট ফেটে মারা যেতে রাজী থাকেন ত' আমার সঙ্গে আসুন।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

সেবাষ্টিয়ান, এ্যাণ্টনিয়ো

সেবাষ্টি। আমি নিজে থেকে তোমাকে কষ্ট দিতে চাইতাম না, কিন্তু তুমি যখন এই কষ্টতেই আনন্দ পাও, তখন আর আমি তোমায় কিছু বল্‌ব না।

এ্যাণ্ট। আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারলাম না।

সেবাষ্টি। ভাই এ্যাণ্টনিয়ো, আমি আর কোন জবাব দিতে পার্‌ছি না। শুধু বল্‌ছি ধন্যবাদ। কিন্তু অনেক সময়ই উপকারের প্রতিদান এমনি মুখের মিথ্যে ধন্যবাদ দিয়েই সারা হয়। কিন্তু আমার মনে যা আছে কাজে তা দেখাবার মত অবস্থা যদি আমার থাক্‌ত তা হ'লে আমি তোমার সঙ্গে এর চেয়ে ভাল ব্যবহার কর্‌তাম। আচ্ছা, এখন কি করা যায় বল ত'? এ দেশের সব ঐতিহাসিক জিনিষগুলো দেখে আসা যাক্ কি বল?

এ্যাণ্ট। সে কাল দেখো ভাই, আজ আগে থাক্‌বার জায়গাটা ত' দেখে নাও।

সেবাষ্টি। আমি একটুও ক্লান্ত হইনি। আর রাত হ'তে এখনও ঢের দেরী। আমি বলি কি, আগে এ দেশের সব বিখ্যাত দর্শনীয় জিনিষগুলোকে দেখে নিয়ে চোখের ক্ষুধা মিটিয়ে আসা যাক্।

এ্যাণ্ট। আমাকে ক্ষমা কর্‌তে হবে, ভাই কারণ একবার এখানে দুই দলের ঝগড়া নিয়ে আমি এইখান-

কার ডিউকের বিরুদ্ধে খুব লড়াই করেছিলাম। ওর লোকেদের ধরে আমি এমন মার দিয়েছিলাম যে এবার আমি যদি এখানে ধরা পড়ি তা হ'লে সহজে নিষ্কৃতি পাব না।

সেবাষ্টি। তা হ'লে ভাই তুমি বেশী বাইরে বেরিয়ো না।

এ্যাণ্ট। এই নাও আমার পার্স। শহরের দক্ষিণ দিকে যে আশোকা হোটেল আছে থাকবার জন্য সেটাই সব চেয়ে ভালো। ঐ খানেই আমাকে পাবে।

সেবাষ্টি। আমি তোমার পার্স নেব কেন?

এ্যাণ্ট। হয়ত কোন সুন্দর জিনিষ তোমার চোখে পড়তে পারে। হয়ত' সেটা তোমার কিনতে ইচ্ছে হবে। জানি ত' এ সময় তোমার হাতে বাজে খরচ করবার মত টাকাকড়ি নেই।

সেবাষ্টি। আচ্ছা ভাই ঘণ্টাখানেক আমি তোমার পার্স ব'য়ে বেড়াব। ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই আমি ফিরে আস্‌ব।

এ্যাণ্ট। আশোকা হোটেলে আসবে।

সেবাষ্টি। মনে আছে। প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য—অলিভিয়ার বাড়ী

অলিভিয়া, মেরিয়া, মেলভলিয়ো, টবি,
ফ্যাবিয়ান, এ্যানড্রু

অলি। মেলভলিয়ো কোথায়? উনি বেশ গম্ভীর প্রকৃতি আর বেশ সভ্যভব্য। আমার যে রকম অবস্থা তাতে ঐ রকম লোকই আমার পক্ষে ভাল।

মেরি। রাণীদিদি, উনি আস্‌ছেন, কিন্তু আজকে ওর রকম-সকম ভারি অদ্ভুত। আমার মনে হয় ওকে ভূতে পেয়েছে।

অলি। কেন কি হয়েছে? উনি কি আবোল তাবোল বল্‌ছেন নাকি?

মেরি। না দিদি আর কিছু করছেন না, খালি হাস্‌ছেন। ও যদি আসে ত' আপনার বডি গার্ড সঙ্গে রাখা উচিত কারণ মনে হয় ওর মাথাটা যেন ঠিক নেই।

অলি। যা তাকে এখানে ডেকে আন।

মেরিয়ার প্রস্থান

মেলভলিয়োর প্রবেশ

অলি। কেমন আছেন, সরকার মশাই?

মেল। রাণী আমার, হাঃ হাঃ……

অলি। আপনি হাস্‌ছেন কেন?

মেল। আমি হাস্‌লে যদি কেউ খুশী হয়—

অলি। এঁ্যা, এ সব আপনি কী বল্‌ছেন? আপনার হ'য়েছে কী?

মেল। আমার মাথার একটুও বেঠিক হয়নি। সে জিনিষ যার জন্যে ছিল তারই হাতে পড়েছে।

অলি। সরকার মশাই, আপনি শুতে চলুন।

মেল। শুতে? যখন তুমি বল্‌বে আমি তখনি যাব।

অলি। হায় হায়, ভদ্রলোক একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে।

মেরিয়ার প্রবেশ

মেরি। দিদি, ডিউকের কাছে থেকে সেই ভদ্রলোকটি আবার এসেছেন।

অলি। আমিই তার কাছে যাচ্ছি। এই এঁকে একটু দেখা শোনা কর। টবিকাকা কোথায়? তাকে বলে দাও আমার লোকজনরা যেন এঁর বিশেষ যত্ন নেয়।

অলিভিয়ার প্রস্থান

মেল। আহা দেখ্‌ছি ধীরে ধীরে তুমি আমার দিকে এগিয়েই আস্‌ছ। আমার দেখাশোনার ভার এখন থেকে আর চাকরবাকরের উপর নয়, টবিকাকা আমার দেখাশোনা করবেন। সন্দেহের এতটুকু লেশ, এতটুকু কণার কণা, এতটুকু বাধা, এতটুকু দ্বিধা—কিছু নেই। সন্দেহ করবার কী আছে? আমি আর আমার আশার স্বর্গ—এ দুয়ের মাঝখানে কোথাও কোন বাধা দেখতে পাচ্ছি না। এ সব দেবতা ক'রেছে, আমি নয়, আমি নয়। হে ভগবান্‌, তোমাকে প্রণাম।

ফ্যাবিয়ান টবির প্রবেশ

টবি। কোথায় আছে মেলভলিয়ো?

মেল। চলে যান, এখান থেকে চলে যান। আমি এখন একটু একলা থাক্‌তে চাই।

মেরি। আমি বলিনি আপনাকে, যে ওকে ভূতে পেয়েছে। রাণীদিদি বলেছেন আপনি ওর দেখাশোনা করুন।

মেল। আহা, তাই বলেছেন বুঝি।

টবি। সরকার মশাই আপনার একি হ'ল? দেখুন ভূতের বশ মানবেন না, ভূত যে মানুষের শত্রু।

মেল। কী বল্‌ছেন, তার মানে জানেন?

মেরি। এঁ্যা দেখ ভূতের নামে কিছু বল্‌লে, কী রকম ক্ষেপে উঠ্‌ছে, ভগবান না করুন, ওকে মামদো ভূতে পায়নি ত'?

ফ্যাবি। ওর ভূত শান্তির জন্যে পুরুত ডেকে আন।

মেরি। ঠিক ব'লেছ, রাণী দিদি বলেছেন, যত টাকা লাগে লাগুক্, ওকে সারিয়ে তোলা চাই-ই।

মেল। তবে, এখনো বুঝলি না, মাগী?

মেরি। ওমা, কি হবে গো? ওকে রামনাম করতে বলুন।

মেল। রামনাম করতে বলুন, পাজি মেয়ে কোথাকারের।

মেরি। ঐ দেখুন ঠাকুর দেবতার নাম শুনলেই চটে যাচ্ছে।

মেল। যান, যান্—সব দূর হ'য়ে যান্; যত সব ছ্যাবলা বাজে লোক।

মেলভলিয়োর প্রস্থান

টবি। লোকটা এতবড় গাধা?

মেরি। এবার ওর পেছনে পেছনে চলুন, তা নইলে হয়ত' সব ফাঁস হ'য়ে যাবে।

টবি। এসো আমরা ওকে হাত-পা বেঁধে অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখ্‌ব! আমার ভাইঝির ত' এই বিশ্বাসই হ'য়েছে যে ও পাগল হ'য়ে গেছে। প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

টবি, এ্যানড্রু, ভায়োলা, ফ্যাবিয়ান, এ্যাণ্টনিয়ো, পুলিশ

টবি। ঐ ছোঁড়াটা একেবারে বাচ্চা শয়তান। এতটুকু বয়সে এমন ওস্তাদ আমি আর দেখিনি।

এ্যানড্রু। গোল্লায় যাক্, আমি আর ওকে ঘাঁটাব না।

টবি। কিন্তু এখন আর ও শুনবে না।

ভায়োলাকে ধ'রে ফ্যাবিয়ানের প্রবেশ

ঐ দেখনা ফ্যাবিয়ান ওকে আর ধ'রে রাখ্‌তে পারছে না।

এ্যানড্রু। এই মরেছে, আমি যদি আগে জান্‌তাম যে ছোঁড়া এমনি ওস্তাদ তা হ'লে কি আমি ওকে চ্যালেঞ্জ দিতাম। তার চেয়ে ও গোল্লায় যেত, যেত। ওকে বল গিয়ে ও আমায় ছেড়ে দিক, আমি ওকে আমার আরবী ঘোড়াটা দিয়ে দেব।

টবি। আচ্ছা চেষ্টা ক'রে দেখি। বাঃ বাঃ যেমন আমি তোমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, তেমনি তোমার—ঘোড়ায় চ'ড়ে ও বেড়াবে।

ফ্যাবিয়ানের প্রবেশ

টবি। স্যার এ্যানড্রু এই ঝগড়া মেটাবার জন্যে তার আরবী ঘোড়া দিয়ে দিতে চেয়েছেন। আমি ওর মনে এই বিশ্বাস ঢুকিয়েছি যে ছোঁড়াটা মূর্ত্তিমান শয়তান।

ফ্যাবিয়ান। আর ঐ ছোঁড়াটাও ওর সম্বন্ধে তাই ভাব্‌ছে। ওর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, মুখ থেকে সব রক্ত নেমে গেছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন ওকে ভালুকে তাড়া করেছে।

(ফ্যাবিয়ান ভায়োলাকে ধ'রে নিয়ে আসবে)

টবি। (ভায়োলার প্রতি) কিছু হ'ল না মশাই, উনি আপনার সঙ্গে লড়্‌বেনই।

ফ্যাবিয়ান। (ভায়োলার প্রতি) যদি দেখেন যে উনি খুব রেগে গেছেন তা হ'লে আপনি হার মেনে নেবেন।

টবি। আসুন, স্যার এ্যানড্রু, কিচ্ছু হ'ল না। ভদ্রলোক ব'লছে যে আত্মসম্মানের খাতিরেও আপনার সঙ্গে একহাত লড়বেই। তবে ও বলেছে যে ও আপনার কোন ক্ষতি করবে না।

এ্যানড্রু। হে ভগবান, ও যেন ওর কথা রাখে—

(তলোয়ার বের করবে)

এ্যাণ্টনিয়োর প্রবেশ

এ্যাণ্ট। থামো থামো, এই ভদ্রলোক যদি কোন দোষ ক'রে থাকে ত' তার জন্য আমি দায়ী। আর ওর প্রতি যদি কেউ দুর্ব্ব্যবহার ক'রে থাকে ত' ওর হ'য়ে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি।

লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হবে

টবি। আপনি, আপনি কে মশাই? আপনি যদি ওর হ'য়ে লড়তে চান ত' আপনার জন্যে আমি তৈরী আছি।

ফ্যাবিয়ান। করেন কি করেন কি? থামুন, ঐ দেখুন পুলিশের লোক আসছে।

পুলিশের প্রবেশ

টবি, এ্যানড্রু ও ফ্যাবিয়ান পালাবে

১ম পুলিশ। এই সেই লোকটা, একে এ্যারেষ্ট কর।

২য় পুলিশ। আমি ডিউকের নামে তোমাকে এ্যারেষ্ট কর্‌ছি।

এ্যাণ্ট। আপনি ভুল কর্‌ছেন।

১ম পু। না হে না, এতটুকুও ভুল করিনি। তোমার চেহারাখানা আমি বেশ চিনি।

এ্যাণ্ট। তোমাকে খুঁজতে বেরিয়ে আমার এই হ'ল। এখন বিপদে প'ড়ে আমাকে তোমার কাছে আমার সেই টাকার থলিটা চাইতে হ'চ্ছে। তুমি যে একেবারে হত-বুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে। অত ব্যাকুল হয়ো না ভাই, শান্ত হও।

২য় পুলিশ। চলো, চলো।

এ্যাণ্ট। আমাকে আমার ঐ থলি থেকে কিছু টাকা দাও ভাই।

ভায়োলা। কোন টাকা মশাই?

এ্যাণ্ট। তুমি কি এমন সময় ঠকাবে? আমি তোমার জন্যে যা করেছি…

ভায়োলা। আমি ত' কিছু জানি না, আর আপনাকেও ত' আমি চিনি না।

এ্যাণ্ট। হে ভগবান্!

১ম পুলিশ। চলো হে চলো।

এ্যাণ্ট। আমাকে দুটো কথা ব'লে যেতে দিন। এই যে ছেলেটাকে আপনারা দেখ্‌ছেন, মরণ যখন ওকে আধখানা গ্রাস ক'রেছে, তখন আমি তার মুখ থেকে ওকে ছিনিয়ে এনেছি।

১ম পু। এ সব কথায় আমাদের কী দরকার? চলো, চলো।

এ্যাণ্ট। কিন্তু হায় হায় এমন দেবমূর্ত্তির মধ্যে এ কোন জঘন্য আত্মা বাস করছে! সেবাষ্টিয়ান, তুমি জগতের সমস্ত রূপবান মানুষকে লজ্জা দিচ্ছ। তোমার রূপে কোন খুঁত নেই, কিন্তু তোমার মন? যার দয়া নেই সেই ত' বিকলাঙ্গ। ধর্ম্মই ত' সৌন্দর্য্য। কিন্তু সৌন্দর্য্য যেখানে ধর্ম্মহীন সে যেন শূন্য পেটরার ডালায় শয়তানের হাতের

১ম পুলিশ। এ লোকটা পাগল হ'য়ে গেল নাকি। আরে চলো চলো।

পুলিশ ও এ্যাণ্টনিয়োর প্রস্থান

ভায়োলা। ওর এই রাগ দেখে, ওর কথা শুনে আমি ভাবছি ও যা ব'ল্‌ছে ও নিজে তা বিশ্বাস করে। অথচ আমি জানি যে ও ভুল কর্‌ছে। ওরে আমার মনরে তুমি যা ভাব্‌ছ তাই যেন সত্যি হয়, ও আমাকে আমার ভাই ব'লে ভুল ক'রেছে।

ভায়োলার প্রস্থান

টবি, এ্যানড্রু ও ফ্যাবিয়ানের প্রবেশ

টবি। এ ছোঁড়াটা দেখ্‌ছি ভয়ানক বদ। আবার এদিকে একটা খরগোসের চেয়েও ভীতু। ও যে কতবড় বদ তা এই থেকেই বোঝা গেল যে একজন বন্ধুকে তার বিপদের সময় এমন ক'রে ঠকাল। আর ও যে কী রকম ভীতু তা ফ্যাবিয়ানকে জিজ্ঞাসা করুন।

ফ্যাবিয়ান। কাপুরুষ, কাপুরুষ, একেবারে কাপুরুষতার গোঁড়া ভক্ত।

এ্যানড্রু। এ্যাঁ, তা হ'লে আমি আবার ওর পিছু তাড়া ক'রে ওকে গিয়ে মার দেব।

টবি। তাই যান, ওকে গিয়ে আচ্ছা ক'রে মার দিন।

এ্যানড্রু। যদি তা না করি?

প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—পথ

ভাঁড়, সেবাষ্টিয়ান, এ্যানড্রু, টবি, অলিভিয়া

ভাঁড় ও সেবাষ্টিয়ানের প্রবেশ

ভাঁড়। আপনি বুঝি আমায় বিশ্বাস করতে বলেন যে রাণী আপনাকে ডেকে পাঠান নি।

সেবাষ্টিয়ান। আরে যান যান। যত সব বাজে ফাজলামো।

ভাঁড়। বাঃ, আপনি ত' দেখ্‌ছি দিব্যি ভান কর্‌তে পারেন। আপনার নাম যেন সিসারিয়ো নয়, এটা যেন আমার নাক নয়। আর যা কিছু যা হচ্ছে তা যেন তা নয়।

সেবাষ্টিয়ান। এই নাও তোমার বক্‌শিস্—নিয়ে এখান

থেকে সরে পড়। আর যদি বেশী দেরী কর তা হ'লে যা দেব সেটা তোমার তত পছন্দ না হ'তেও পারে।

এ্যানড্রুর প্রবেশ

এ্যানড্রু। কী হে মশাই, এই যে আপনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হ'য়ে গেল। এই নিন……।

সেবাষ্টিয়ান। বটে, তবে তুইও এই নে। এই—এই নে।

ধ'রে মার দেবে

টবির প্রবেশ

টবি। এই মশাই থামুন থামুন—নইলে এখনি আপনাকে মজা দেখিয়ে দেব।

ভাঁড়। আমি বাবা এর মধ্যে নেই, রাণীদিদিকে সব কথা এখনি গিয়ে বলি।

টবি। (সেবাষ্টিয়ানকে ধ'রে) এগিয়ে আসুন না, স্যার এ্যানড্রু, একে আচ্ছা করে শিক্ষা দেওয়া যাক্।

এ্যানড্রু। না, ওকে যেতে দিন। আমি অন্য রাস্তায় ওর সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নেব। ও আমাকে আক্রমণ করেছে ব'লে আমি কোর্টে গিয়ে নালিশ করব, দেখ্‌ব এদেশে আইন ব'লে কিছু আছে কিনা? যদিও আমিই ওকে আগে মেরেছি, কিন্তু তাতে কি?

সেবাষ্টিয়ান। এই মশাই ছেড়ে দিন বল্‌ছি।

টবি। আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি না।

হাতাহাতি হবে

অলিভিয়ার প্রবেশ

অলিভিয়া। কাকা একি, হচ্ছে কি? থামো, থামো, থামো বল্‌ছি। হতভাগা কোথাকার, তুমি কি চিরটা কাল এইভাবেই চল্‌বে? সিসারিয়ো, আপনি রাগ করবেন না। যাও, দূর হ'য়ে যাও, অভদ্র কোথাকার।

টবির প্রস্থান

সেবাষ্টি। এ্যাঁ, এ আবার কি? নদীর জল কোন দিকে বইছে। হয় আমি পাগল হ'য়ে গেছি নয়-ত' এ একটা স্বপ্ন। তা যদি স্বপ্নই দেখ্‌তে হয় ত' ঘুমিয়ে থাকাই ভাল।

অলি। চলুন না সিসারিয়ো। আপনি বুঝি আমার কথা রাখ্‌বেন না।

সেবাষ্টি। চলুন, আপনার কথা আমি রাখ্‌ব।

দ্বিতীয় দৃশ্য—অলিভিয়ার বাড়ী

টবি, মেরিয়া, ভাঁড়, মেলভলিয়ো

টবি। মেরিয়া, পুরুতের পোষাক নিয়ে এস, যেন ও ভাবে পুরুত ঠাকুর এসেছেন।

ভাঁড়। আচ্ছা, এমনি ক'রে আমি পূজারীর বেশে ধর্ম্মের ভান করব। হায়রে, আমি যদি প্রথম মানুষ হ'তাম যে পূজারীর বেশে ধর্ম্মের ভান করছে!

মেরিয়া। পোষাকের কী দরকার? অন্ধকারে ও তো আপনাকে দেখ্‌তে পাবে না। চলুন, এবার ওর কাছে চলুন, ওর ভূত শাস্তি করবেন চলুন।

অন্ধকার ঘর

ভাঁড়। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

টবি। বাঃ বাঃ শয়তানটা কেমন সুন্দর পুরুতের নকল করছে দেখ।

মেলভ। কে ওখানে?

ভাঁড়। আমি পুরুত, আপনার পাগলামোর ভূত শান্তি করতে এসেছি।

মেলভ। পুরুত ঠাকুর, ও পুরুত ঠাকুর, আপনি একবার রাণীর কাছে যান্।

পুরুত। ওঃ হো ওকে মাম্‌দো ভূতে পেয়েছে। খালি মেয়ে মানুষের কথা বল্‌ছ।

মেলভ। পুরুত ঠাকুর, মানুষের উপরে এমন অত্যাচার আর কোনদিন হয়নি। মনে করবেন না আমি পাগল হয়েছি। ওরা আমায় এই অন্ধকারে বন্ধ ক'রে রেখেছে।

পুরুত। কী বল্‌লেন? ঘরটা অন্ধকার?

মেলভ। একেবারে নরকের মত অন্ধকার।

পুরুত। না, এ ঘরে ত' উত্তরে, দক্ষিণে, নীচে এবং উপরে সবদিকেই জানালা দিয়ে পরিষ্কার আলো আস্‌ছে।

মেলভ। আমি ত পাগল হইনি পুরুত ঠাকুর, আমি বল্‌ছি ঘর অন্ধকার।

পুরুত। ওহে পাগল, তুমি ভুল করছ। আমি বল্‌ছি অজ্ঞানের বাড়ী আর অন্ধকার নেই। তুমি সেই অন্ধকারেই দিশেহারা হ'য়েছ। তোমার আর কোন আশা নেই। আমি তবে চলি।

মেলভ। পুরুত ঠাকুর ও পুরুত ঠাকুর!

আলো জলে উঠবে

টবি। তুমি পুরুতের পার্টে চমৎকার এ্যাক্‌টিং করেছ। এবার তুমি নিজের আসল গলায় ওর সঙ্গে কথা বলগে।

প্রস্থান

অন্ধকার ঘর। ভাঁড়ের প্রবেশ।

ভাঁড়ের গান "কাকাতুয়া কাকাতুয়া।"

মেলভ। ও ভাঁড়—

গান—বল্লো দেখি ভাই—

মেলভ। ও ভাঁড়—

গান—প্রিয়া তোমার কেমন আছে জান্‌তে আমি চাই।

মেলভ। ও ভাঁড়—

গান—প্রিয়া আমার নিদয়া যে
কেন হ'ল নিদয়া সে

ভাঁড়। এ্যাঁ, কে ডাকে?

মলভ। ভাই ভাঁড় যদি আমার কাছে—বক্‌শিস্ পেতে চাও, ত' আমায় একটা মোমবাতি এনে দাও। আর একটা কলম, কালি আর কাগজ।

ভাঁড়। আরে এ যে সরকার মশাই।

মেলভ। হ্যাঁ ভাই, আমি।

ভাঁড়। হায়, হায়, আপনি এমন পাগল হ'লেন কি ক'রে?

মেলভ। ভাইরে, কোন মানুষের প্রতি এমন অন্যায় আর কোন দিন করা হয়নি। ওরা আমাকে এখানে বন্ধ ক'রে রেখেছে। আমার ভূত শান্তির জন্য পুরুত ডেকে আনছে। যত সব গাধা।

ভাঁড়। কী বল্‌ছেন? পুরুতঠাকুর যে এখানেই আছেন।

মেলভ। ও পুরুত ঠাকুর!

পুরুত। ওর সংগে কথা ব'লো না।

ভাঁড়। কে কথা ব'লবে, আমি? আমি নয়। পুরুত ঠাকুর প্রণাম হই।

পুরুত। সুখে থাক, সুখে থাক। ভাঁড়, পুরুত ঠাকুর, আমি বেশ সুখেই আছি।

মেলভ। ও ভাঁড়, ও ভাঁড়, ও ভাঁড়, আমায় একটা আলো, আর একটা কলম ও কাগজ এনে দাও। আমার

ভাঁড়। তা এনে দেব। কিন্তু আগে সত্যি ক'রে বলুন ত' আপনি পাগল হন নি?

মেলভ। সত্যিই বল্‌ছি আমি পাগল হইনি।

ভাঁড়। না, না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি লোকের মাথার খুলি খুলে দেখছি, ততক্ষণ কে যে পাগল আর কে যে নয়, সে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না। আচ্ছা কলম, কাগজ ও কালি এনে দিচ্ছি। প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য—অলিভিয়ার বাগান

সেবাষ্টিয়ান, অলিভিয়া

সেবাষ্টিয়ান। এই ত হাওয়া দিচ্ছে, এই ত সূর্য্য উঠেছে, এইত সেই আংটি যা আমাকে ঐ মেয়েটি দিয়েছে। যদিও সমস্ত ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত হেঁয়ালি, তবু আমি ত পাগল হ'য়ে যায়নি। এ্যাণ্টনিয়োই বা গেল কোথায়? ঐ যে সেই মেয়েটি আস্‌ছে।

অলি। দেখ, এত তাড়াতাড়ি করছি বলে আমায় দোষ দিওনা, লক্ষ্মীটি। এসো পরশুই আমাদের বিয়ের দিন স্থির করি।

সেবাষ্টিয়ান। আমি রাজী, পরশুই হোক্। প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য—পথ

ডিউক, ভাঁড়, ভায়োলা, ১ম পুলিশ, ২য় পুলিশ, এ্যাণ্টনিয়ো, অলিভিয়া, এ্যানড্রু, টবি, সেবাষ্টিয়ান ফ্যাবিয়ান

ডিউক। এই যে মশাই, আপনাকে আমি চিনি। আপনি ত' রাণী অলিভিয়ার বাড়ীতে থাকেন। আপনি কেমন আছেন?

ভাঁড়। সত্যি কথা যদি বলি তবে শত্রুর কল্যাণে আমি ভালই আছি আর বন্ধুর কল্যাণে আমার সর্ব্বনাশ হচ্ছে।

ডিউক। বাঃ এযে একেবারে উল্টো বললেন। বলুন বন্ধুর জন্যই আপনি ভাল আছেন।

ভাঁড়। না মশাই, তারাই আমার সর্ব্বনাশ করছে।

ডিউক। সে কি করে হয়?

ভাঁড়। তা হ'লে শুনুন মশাই, বন্ধুরা আমার প্রশংসা ক'রে আমায় গাধা বানায়। আর আমার শত্রুরা মুখের উপর বলে দেয়, আমি একটি গাধা। এমনি করে শত্রুরা আমাকে আমার স্বরূপ জানিয়ে দেয়। আর আমার বন্ধুরা আমায় নিজের সম্বন্ধে একেবারে অন্ধকারে রাখে।

ডি। বাঃ মশাই বেড়ে বল্‌ছেন ত। এবারে আমার একটি কাজ আপনাকে করে দিতে হবে। আপনি গিয়ে রাণী অলিভিয়াকে খবর দিন যে আমি দেখা করতে এসেছি।

ভাঁড়। আচ্ছা এখনি যাচ্ছি।

ভায়োলা। ঐ দেখুন, সেই লোকটি যে আমাকে আজ বাঁচিয়েছে।

পুলিশ ও এ্যান্টনিয়োর প্রবেশ

ডি। একে ত আমি চিনি। একবার দাঙ্গায় এ আমার লোকদের খুব মার দিয়েছিল।

১ম পুলিশ। মহানুভব ডিউক এই যে একে ধ'রে এনেছি। সেই সেবারে দাঙ্গায় এ আমাদের অনেক লোক কে মার দিয়েছিল।

ভায়োলা। এ আমাকে বাঁচিয়েছিল ;

ডি। তুমি আমার রাজ্যে কোন্ সাহসে এসেছ বল ত'?

এ্যাণ্ট। একটা শয়তান যাদু করে আমায় এখানে টেনে এনেছে। সেই অকৃতজ্ঞ শয়তান এ যে আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে।

ভায়োলা। এ তুমি কি বল্‌ছ?

ডি। আচ্ছা বল, এই ছেলেটি এখানে কবে এসেছে।

এ্যাণ্ট। আজই এসেছে।

ডি। এ যে রাণী আস্‌ছেন। আমার মনে হ'চ্ছে আজ স্বর্গ মাটিতে নেমে এসেছে। আর ওহে, তুমি ত' নেহাৎ পাগলের মত বল্‌ছ, এ ছেলেটি যে তিন মাস থেকে আমার কাছে রয়েছে। আচ্ছা পরে সব শুন্‌ব, এখন একটু ওদিকে যাও।

এ্যাণ্টনিয়ো ও পুলিশ দূরে সরে দাঁড়াবে

অলিভিয়ার প্রবেশ

অলি। আমার প্রতি আপনার কী হুকুম বলুন? সিসারিয়ো, আপনি ত' আপনার কথা রাখলেন না।

ডি। রাণী!

অলি। কি সিসারিয়ো, আমার কথার জবাব দিন, (ডিউকের প্রতি) কি বল্‌ছেন?

সিসা। আমার হ'য়ে উনিই জবাব দেবেন। আমি ওঁর চাকর।

অলি। আপনি যদি সেই পুরোনো কথা বল্‌তেই এসে থাকেন তা হ'লে তাতে কোন লাভ নেই।

ডি। এখনো তেমনি নিষ্ঠুর।

অলি। এখনো তেমনি একনিষ্ঠ।

ডি। তোমার নিষ্ঠা আমার প্রতি বিমুখতায়। কী নিষ্ঠুর, কী অকৃতজ্ঞ! এখন আমি কী করব?

অলি। তাই করুন যাতে সিসারিয়োর মতন লোকের উপযুক্ত সমাদর হয়।

ডি। হাঁ যদি পার্‌তাম ত' ওর উপযুক্ত পাওনা ওকে মিটিয়ে দিতাম। আমি জানি তুমি ওকে ভালবাস। আর সেই জন্যই তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌ছ। আর ভগবান জানেন ওকে আমি কতখানি স্নেহ করি কিন্তু ওই সুন্দর পায়রার বুকে যে শকুনি বাস কর্‌ছে তাকে কষ্ট দেবার জন্য আমি যাকে স্নেহ করি তাকেও বলি দিতে পারি।

সিসা। আর আপনাকে এতটুকু আনন্দ দেবার জন্য আমি হাজার বার হাসি মুখে মর্‌তে পারি।

অলি। সিসারিয়ো, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

সিসা। আমি যাচ্ছি তারই পিছে পিছে যাকে আমি ভালবাসি।

অলি। হায়রে, আমায় ও ঠকিয়েছে।

সিসা। কে তোমায় ঠকিয়েছে?

অলি। এই ত' দুদিন আগে কথা হ'ল, এর মধ্যে তুমি কি সব ভুলে গেলে?

মাথায় রক্ত, মাথায় হাত দিয়ে এ্যানড্রুর প্রবেশ

এ্যানড্রু। ওরে ডাক্তার ডাক্, ডাক্তার ডাক্, স্যার টবির জন্য একটা ডাক্তার এখনই ডাক্।

অলি। কী, হয়েছে কী?

এ্যানড্রু। এই যে ডিউকের সেই ছোঁড়াটা, আমার মাথা ভেঙ্গে দিয়েছে আর স্যার টবির মাথাও আস্ত রাখে নি। আমরা ভেবেছিলাম ও একটা ভীতু, কাপুরুষ। কিন্তু আসলে ও শয়তানের প্রতিনিধি।

ডি। সিসারিয়ো মেরেছে?

এ্যানড্রু। ঐ মরেছে, ছোঁড়া যে এখানেই দাঁড়িয়ে। তুই মিছি মিছি আমার মাথা ভেঙ্গে দিয়েছিস্। আর আমি যে তোকে মেরেছি সে ত স্যার টবি আমায় শিখিয়ে দিয়েছে।

সিসা। আপনি আমায় এ সব কি বল্‌ছেন? আমি আপনাকে মারিনি। আপনি অবশ্য আমাকে মারতে এসেছিলেন কিন্তু আমি ত' মিষ্টি কথায় আপনাকে শান্ত ক'রে চ'লে এলাম।

এ্যানড্রু। মাথা ভাঙ্গাকে যদি মারা বলে তবে তুই নিশ্চয়ই আমায় মেরেছিস্। তোমার মতে মাথা ভেঙ্গে দেওয়াটা বুঝি কিছু নয়? ঐ যে স্যার টবিও খোঁড়াতে খোঁড়াতে এদিকে আস্‌ছেন।

টবির প্রবেশ—মাথায় রক্ত, ব্যাণ্ডেজ

ডি। একি মশাই, ব্যাপার কি?

টবি। বিশেষ কিছু নয়, এই ইনি আমায় মেরেছেন, ব্যস্ চুকে গেল।

অলি। এটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ওকে এমন ক'রে কে মেরেছে?

এ্যানড্রু। চলুন, স্যার টবি, আমি আপনাকে সাহায্য করব।

টবি। তুই সাহায্য কর্‌বি? গাধা. উড়নচণ্ডে, বদমাইস. কাপুরুষ, বোকা।

অলি। ওকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও আর ডাক্তারের ব্যবস্থা কর।

টবি ও এ্যানড্রুর প্রস্থান

সেবাষ্টিয়ান ও এ্যাণ্টনিয়োর প্রবেশ

সেবাষ্টি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি আপনার আত্মীয়কে মেরেছি। কিন্তু ও যদি আমার আপন ভাইও হ'ত তবুও আত্মরক্ষার জন্যও আমাকে এতটুকু কর্‌তেই হ'ত। আপনি কেমন ক'রে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, ও বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার উপর রাগ ক'রছেন। লক্ষ্মীটি, আমায় ক্ষমা কর। এই ত' দুদিন আগে আমরা পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। তার খাতিরেই না হয় তুমি আমায় ক্ষমা কর।

ডি। এক মুখ, এক স্বর, এক পোষাক; অথচ দুটো মানুষ। একি চোখের ভুল, যা দেখছি আসলে তা নেই।

এ্যাণ্টনিয়ো সাম্‌নে আসবে

সেবাষ্টি। ভাই এ্যাণ্টনিয়ো, তোমাকে যেদিন থেকে হারিয়েছি সেদিন থেকে আমার সময় যে কী ভাবে কেটেছে।

এ্যাণ্ট। তুমি কি সেবাষ্টিয়ান?

সেবাষ্টি। কেন, তাতে তোমার সন্দেহ আছে নাকি?

এ্যাণ্ট। তুমি কি নিজেকে দুভাগে ভাগ করেছ? একটা আপেলকে ঠিক মাঝখান থেকে কাটলে যেমন এক রকম দুখানা টুক্‌রো বেরোয়—এ দুটো প্রাণী তার চেয়ে কম এক রকম নয়! তোমাদের মধ্যে সেবাষ্টিয়ান কে?

অলি। কী অদ্ভুত!

সেবাষ্টি। ঐ ঐখানে কি আমি দাঁড়িয়ে আছি না কি? আমার ত' ভাই ছিল না, আর আমি ত' দেবতা নই যে একই সময় দু জায়গায় বিরাজ করব। আমার একটি বোন ছিল। দয়া ক'রে বল' তুমি আমার কে হও? তোমার বাড়ী কোন দেশে, তোমার নাম কি? তোমার মা-বাপ কারা?

ভায়োলা। আমার দেশ মেসালিন। আমার বাবা ছিলেন মেসালিনের সেবাষ্টিয়ান। আমার ভাইয়ের নামও সেবাষ্টিয়ান আর সেও ঠিক আপনারই মত দেখতে।

সেবাষ্টি। আর ত' সবই ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। শুধু তুমি যদি মেয়ে হ'তে তা হ'লে আমি তোমার গলা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতাম।

ভায়োলা। তা হ'লে আমরা দুজনই খুসি হতে পারি। শুধু একমাত্র বাধা এই আমার পুরুষের ছদ্মবেশ। আমি তোমায় এই শহরের এক মাঝির বাড়ীতে নিয়ে যাব। তার কাছেই আমার মেয়ের পোষাক সব রাখা আছে।

সেবাষ্টি। ও এবার বুঝেছি, আপনি আমাকে ভুল করেছেন। কিন্তু আপনাদের দুজনার মধ্যে নিশ্চয় স্বভাবের মিল আছে, তাই আপনি ওকে ভালবেসে ছিলেন।

ডিউক। আপনি অমন হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? এ খুব বড় ঘরের ছেলে। যদি এর কথা সত্যি হয়—ওর কথা সত্য ব'লেই ত' মনে হচ্ছে—তা হ'লে এই সুখের নৌকাডুবির সুখের ভাগ আমিও নেব। সিসারিয়ো, তুমি আমাকে হাজারো বার ব'লেছ, তুমি আমায় যেমন ভালবাস কোনদিন কোন মেয়েকে তেমন ভালবাসবে না।

ভায়োলা। সেই কথাই আজ আমি আবার বল্‌ছি। আর সেই প্রতিজ্ঞা আমি তেমনি ক'রেই রক্ষা করব যেমন

ক'রে দিনরাতের যিনি ভাগ করেন সেই সবিতা তার বুকের আগুন চিরদিন ধ'রে পুষে রেখেছেন।

চিঠি নিয়ে ফ্যাবিয়ানের প্রবেশ

ফ্যাবিয়ান। রাণী এই চিঠি ভাঁড়ের হাতে মেলভলিয়ো আপনাকে পাঠিয়েছেন।

অলি। চিঠি খুলে প'ড়ে শোনাও।

ফ্যাবিয়ান। (প'ড়ছে) রাণী, আপনি আমার প্রতি অন্যায় ক'রেছেন, একথা আমি সারাদুনিয়ার লোকের সামনে ব'লব। আমি যা করেছি তার জন্যে আপনার নিজ হাতে লেখা চিঠি আমার হাতে আছে। সেই চিঠি লোককে দেখিয়ে হয় আমি নিজের অধিকার জারী করব, নয় ত' আপনাকে লোকের সামনে লজ্জা দেব।

অলি। এ চিঠি সে নিজে লিখেছে?

ফ্যাবিয়ান। হ্যাঁ, রাণী দিদি।

অলি। ওকে এখানে নিয়ে এসো ত'।

ফ্যাবিয়ানের প্রস্থান

অলি। আমার ওপরে আপনার আগে যেমন প্রীতি ছিল আশা করি এখন বোন ব'লে আমায় ততখানিই প্রীতির চোখে দেখ্‌বেন। আপনার যদি মত হয় তবে চাই যে আমাদের এই দুই আত্মীয়তা বন্ধনের উৎসব এক-দিনে আমারই বাড়ীতে আর আমারই খরচে হ'ক্।

ডিউক। বোনটি আমার, তোমার এই প্রস্তাবে আমি খুবই রাজী। এবারে তোমার মনিব তোমায় তার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিল। আর তুমি তার যে সেবা ক'রেছ, সেই সেবারই বিনিময়ে এই নাও আমার হাত। এতদিন যাকে তুমি মনিব ব'লেছ আজ থেকে তুমিই তার মনিব হ'লে।

অলি। এবারে দুদিক থেকেই তুমি আমার হ'লে।

ডিউক ও ভায়োলার প্রস্থান

ফ্যাবিয়ান, ভাঁড় ও মেলভলিয়োর প্রবেশ

মেলভ। রাণী, আপনি আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, অত্যন্ত দুর্ব্যবহার ক'রেছেন।

অলি। আমি? না সরকার মশাই।

মেলভ। হ্যাঁ, আপনি ক'রেছেন। এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখুন। আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে এ লেখা আপনার নয়, এ ভাষা আপনার নয়? তবে কেন আপনি আমায় এমন ক'রে বোকা বানালেন—কেন? কেন?

অলি। (চিঠি দেখে) হায়, হায়, এত' আমার হাতের লেখা নয়। যদিও আমার অনুকরণ ক'রে লেখা, তবু এত' বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এ মেরিয়ার হাতের লেখা। ও, এইবার আমার মনে পড়েছে ওই এসে প্রথম আমায় বলেছিল যে আপনি পাগল হ'য়েছেন, আর তার পরেই আপনি হাঁসতে হাঁসতে এলেন।

মেলভ। আমি তোদের সব কটাকে দেখে নেব।

সমাপ্তি দৃশ্য

নাচ—সমস্ত পাত্র পাত্রী মিলে

গান—গান জাগে প্রাণ জাগে

আজি লেগেছে মিলনের মেলা।

সমাপ্ত

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ ও মানব প্রেম

অধ্যাপক গৌরীদাস মল্লিক এম-এস-সি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সর্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।' কত মহামানবের চরণধুলায় পবিত্র করা এই ভারত, যার অন্তরাত্মায় এখনও জেগে আছে ভারতের মহাপুরুষদের অধ্যাত্মবাদ, অহিংসাবাদ, যার বুকের মধ্যে এখনও জমে আছে মানবধর্মমূলক সংহতির ঐশ্বর্য ও গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রাচুর্য। এই ঐতিহ্যময় গৌরবময় ভারতের কোলে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, আর এই ভারতের ভাবরসধারা প্রবাহিত হয়েছে রবীন্দ্রমানসে, তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আলোকসম্পাত হয়েছে তাঁর চিন্তা-জগতে। যে দেশের এক যুগাবতার একদিন প্রচার করেছিলেন 'অহিংসা পরমধর্ম', যে দেশের এক ভক্ত কবি সকল মানুষকে শুনিয়ে গেছেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই,' যে দেশের এক প্রেমের ঠাকুর এক দুর্দান্ত পাপাত্মাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—'মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না, যে দেশের এক মহাপুরুষ তাঁর বাণী প্রচার ক'রে বলেছিলেন—'নরনারায়ণ' আর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর', রবীন্দ্রনাথ সেই দেশেরই মহাকবি, সেই দেশেরই একজন প্রতিভাশালী দার্শনিক, তিনি ঐ সকল ভারতের মহাপুরুষদের ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারী। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতের চিন্তাজগৎকে প্রভাবিত করে আসছে মানবপ্রেম মানবকল্যাণ মানবধর্ম সংবলিত মানবতাবাদ। ভারতেরসেই মানববতাবাদ ও মহাপুরুষদের প্রেমধর্মবাণী রবীন্দ্রমানসে প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে করেছে মানবতাবাদী মানবপ্রেমিক।

মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ কবি, মনীষী ও দার্শনিক। তাঁর কাব্যে প্রবন্ধে ও ভাষণে তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে মানবতাবাদের, গভীর পরিচয় আছে মানবপ্রেমের ও আন্তরিক আকূতি আছে মানবকল্যাণ সাধনার দ্বারা বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টায়। তাঁর মানবপ্রেমের গভীরতা যে কতখানি, তা সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে তাঁর মানব প্রেমের এক কবিতার মধ্যে এই লেখায়—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।"

মানবের প্রতি তাঁর প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম, তাই জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের সকল মানুষকে তিনি আপনজন ভাবে গ্রহণ করতে উৎসুক ছিলেন। তাই বুঝি, তাঁর (কবির ভাষায়)

"————————ইচ্ছা করে মনে মনে,
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে,————————"

কবির এই ইচ্ছার আন্তরিকতায় বোঝা যায় তাঁর মানবপ্রীতি তথা মানবতাবোধের গভীরতা কতখানি। তাঁর এই মানবপ্রেম তিনি শুধু তাঁর নিজ অন্তরের মধ্যেই পোষণ করেন নাই, অপরের হৃদয়েও যাতে তা পল্লবিত হয়ে উঠে, সেই ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করে তাঁর এক স্নেহাস্পদকে সম্বোধন করে বলেছেন—

"যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ-শোক।"

সেই একই প্রসঙ্গে কবি আবার বলেছেন—

"তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমায় হেরিয়া যেন মুগ্ধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।"

উপরোক্ত কবিতাংশে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে কবির মানবপ্রেমের প্রগাঢ়তা ও আন্তরিকতা। তাঁর কামনা, প্রেমের আলো নিয়ে সকল মানুষের অন্তরে মানবপ্রেমের আলো জেলে সুন্দর করে তুলতে হবে মানব জগতকে।

কবি মানবপ্রেমিক, আবার ভগবৎ-প্রেমিকও বটে। তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল ভগবৎ-প্রেম ও মানবপ্রেমের দ্বিধারা, যার কলধ্বনি কবির অন্তরবীণার তারে তুলেছিল এক ঝংকার, আর সেই ঝংকারকে এক মধুর সংগীতে রূপায়িত ক'রে কবি ভাবের আবেগে গাইলেন সেই সংগীত—

"গাও বীণা—বীণা গাওরে !
অমৃত মধুর তাঁর প্রেমগান মানব সবে শুনাওরে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাও রে॥
ব্যথা দিও না কাহারে ব্যথিতের তরে
পাষাণ প্রাণ কাঁদাওরে।
নিরাশারে কহো আশার কাহিনী,
প্রাণে নব বল দাওরে।"

এই ভাবময় সংগীতের ধ্বনিতে ধ্বনিতে ঝরে পড়ে প্রেমের রসধারা।

কবির অধ্যাত্মচেতনা ছিল প্রগাঢ়, সেই জন্যে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভগবৎ-মহিমা, আর সেই জন্যই তাঁর অন্তর লোকে প্রবাহিত হয়েছিল ভগবৎ-প্রেমের উৎস। অপরদিকে তাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল যে, মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা ভগবানের আছে সংযোগ। তাই, তিনি ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মানুষের মধ্যে। তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ করে একদিন তিনি ভগবানের কাছে নিবেদন করেছিলেন এই বলে—

"নিকটে দেখিব তোমারে বাসনা করেছি মনে,
চাহিব না হে, চাহিব না হে, দূর দুরান্তর গগনে
দেখিব তোমারে গৃহমাঝারে, জননী স্নেহে, ভ্রাতৃপ্রেমে
শতসহস্র মঙ্গল বন্ধনে।

মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ মমতা প্রেম মৈত্রী প্রভৃতির মঙ্গল বন্ধনে কবি দর্শন করেছিলেন ভগবানের মহিমা। তাই তাঁর বিশ্বাস, মানুষকে ভালবাসলে ভগবানকেই ভালবাসা হয়, মানবপ্রেম দিয়েই ভগবানের পূজা হয়। এই প্রসঙ্গে উপদেশচ্ছলে একজায়গায় তিনি বলেছিলেন—

"ভজন মন্দিরে তব
পূজা যেন নাহি রয় থেমে,
মানুষে কোরো না অপমান।
যে ঈশ্বরে ভক্তি করো,
হে সাধক, মানুষের প্রেমে
তাঁরি প্রেম করো সপ্রমাণ।"

কবি ভগবৎ-প্রেম ও মানবপ্রেমের মধ্যে সমন্বয় করে দেখতেন, তাই ভগবানের প্রতি যেমন ছিল তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি, মানুষের প্রতিও তাঁর ছিল তেমনি গভীর অনুরাগ। মানুষের প্রতি তাঁর এই মনোভাবের কথা প্রকাশ ক'রে একদিন তিনি বলেছিলেন—

"চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।"

মানুষের মনুষ্যত্বকে উপহাস করা উচিত নয়। ইহার কারণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন—"মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ।"

কবির অধ্যাত্মচেতনাই তাঁর হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিল মানবপ্রেমের উৎস, যে উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল মানবতাবোধ, যার ফলে তিনি হয়েছিলেন মানবতাবাদী। তিনি মানবতাবাদ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর হৃদয়ের প্রেরণায়।

কিন্তু মানবতাবাদের উদ্দেশ্য মানবসমাজে বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কবি বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করতেন,—মানুষের মনের মধ্যে জাগ্রত করা ঐক্যবোধ এবং মানবসমাজে বিস্তার করা ঐক্যের অনুশীলনা, যার ফলে সকল মানুষ মানব সমাজে সুখে শান্তিতে সহঅবস্থান করতে পারে। এই সম্পর্কে কবি একস্থানে বলেছেন—"মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানে দুর্বল, সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধারণ করে দেশকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করবে।"

কবি এই প্রসঙ্গে ঐক্যের অভাবে মানবসমাজে কেন

যে ব্যাধির সৃষ্টি হবে, সে সম্বন্ধে বলেছেন—"ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মানুষের সত্যধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।"

কবি উপলব্ধি করেছিলেন, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে, যদি মানুষের মধ্যে সমবায়ধর্ম জাগ্রত হয়, অর্থাৎ যখন সকল মানুষ ঐক্যতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করে তা কার্যে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়। ঐক্য অর্থাৎ সকল মানুষের মধ্যে মৈত্রীভাব বিশ্বশান্তির মূল। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ ক'রে কবি বলেছেন,—"শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এই জন্যে পিতামহরা বলেছেন—

'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।' অদ্বৈতই শান্ত, কেন না অদ্বৈতই শিব।"

কবির এই উক্তির দ্বারা বোঝা যায় যে, সকল মানুষের মধ্যে অদ্বৈতভাব অর্থাৎ একীভাব জাগলে মানুষের সকল বিষয়ে মঙ্গল সাধিত হয়, আর মানবসমাজ মঙ্গলময় হলেই বিশ্বশান্তি সম্ভব হয়।

কবির উল্লেখিত ঐক্যতত্ত্ব প্রাচীন ভারতের নিজস্ব তত্ত্বকথা। কারণ, এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—"এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ।" ভারতের এই পথ অনুসরণ ক'রে অনেক ভারতপথিক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই ভারততীর্থে। কবি এই ভারত পথ অনুসরণ ক'রে চলেছিলেন মানবতার আদর্শ গ্রহণ ক'রে। প্রাচীন কালের ভারতপথিকের মতই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানবসমাজের শান্তির জন্য প্রয়োজন সকল মানুষের মধ্যে মিলনসাধন, আর এই মিলনসাধনই হবে মনুষ্যত্বের সাধনা, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তি লাভের সাধনা। তিনি কায়মনোবাক্যে এই সাধনাই করে গেছেন একজন ভারতপথিকরূপে। তাই, তাঁর কণ্ঠ দিয়ে একদিন বার হয়ে এসেছিল ভারতপথের গান—

"এসো হে আর্য এসো অনার্য হিন্দুমুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ ; শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমান ভার।
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

এইভাবে কবি প্রচার করলেন ঐক্যবাণী।

কিন্তু বৃথায় গেল কবির ঐক্যবাণী প্রচার করা, বৃথায় গেল তাঁর বিশ্বপ্রেমের গান গাওয়া। বাস্তবক্ষেত্রে জগৎ চলেছে রহস্যে ভরা জটিল পথে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। তার আকাশে বাতাসে ভেসে চলেছে জাতিবিদ্বেষের বিষাক্ত ধূম, তার বুকে নিয়ত চলেছে কুটিলতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার অভিযান। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবি স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন দেশে দেশে মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ। তাই দেখে মানবদরদী কবির মন ভরে গেল দুঃখে ও ক্ষোভে। সেই ক্ষুব্ধ মন নিয়ে একদিন তিনি বলেছিলেন—

"——————স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি, করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ;——————"

মানবদরদী কবি দেখতে পেলেন, অন্যায় অবিচারে ও শত অপমানে চির নির্যাতিত নিরীহ মানুষদের মর্মান্তিক বেদনা। তাঁর অন্তরে জেগে উঠলো মানবতা বোধ, তাই তাদের প্রতি তাঁর কোমল হৃদয় সহানুভূতিতে ভরে গেল। কিন্তু যারা অন্যায় অবিচার ক'রে মনুষ্যত্বহীন হয়ে ঐ নির্যাতিত মানুষদের, তাদের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে মানবাত্মার অপমান করেছে, তাদের উপর তাঁর প্রবল ঘৃণা বর্ষিত হলো। তাই তাদের তিনি তীব্র ভৎসনা ক'রে বললেন—

"মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

কবি আরও ভবিষ্যবাণী ক'রে সেই সকল মানবধর্মদ্রোহীদের স্মরণ করিয়েছিলেন—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে

বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥"

কবির বিশ্বাস, মানুষের ঠাকুর মানুষের মধ্যেই বিরাজ করেন। তাই, মানুষকে ঘৃণা অপমান করলে, সেই ঠাকুরকেই ঘৃণা অপমান করা হয়। সেই জন্য তিনি মানবাত্মার অপমানকারীদের সতর্ক করে বলেছেন—তাদের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী; কারণ মানুষের ঠাকুর ভগবান তাদের মানবতাবিরোধী আচরণ সহ্য করবেন না, তাঁর রোষানলে তাদেরও একদিন ঐ নির্যাতিত মানুষদের সঙ্গে একাসনে বসতে হবে। কবির মতে, ধূলি-মলিন হীন পতিত মানুষদের সহায়রূপে তাদের মধ্যে বিরাজ করেন ভগবান্। এই কথা তিনি এক প্রসঙ্গে প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন—"নেমেছে ধূলারতলে হীন পতিতের ভগবান্।"

কবির উপরোক্ত মনোভাব আরও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে মানবদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর এই সংগীতে—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে তোমার চরণ রাজে,
সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।"

কবির যখন বিশ্বাস, স্বয়ং ভগবান্ মানবদরদী, তখন ভগবৎ-প্রেমিক হয়ে তিনিও যে মানবদরদী হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। কিন্তু তাঁর এই দরদ শুধু সহানুভূতি দেখানোর মধ্যেই পর্যবসিত নয়। 'ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির মূক সবে', যাদের 'ম্লানমুখে লেখা শুধু শতশতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী', তাদের প্রতি দরদী হয়ে তিনি তাদের মনে জাগাতে চান আত্মচেতনা ও আত্মবিশ্বাস, তাদের বিশ্বাস করাতে চান যে, তারাও 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। তাই, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন—

"————————এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা————————"

কারণ কবি বুঝেছিলেন, ভাষার অজ্ঞতা ও আশার শূন্যতা মানুষকে বিড়ম্বিত ক'রে তোলে ও নির্যাতনকারীদের প্রশ্রয়দানে সাহায্য করে। তাই, এই বিড়ম্বনা ও নির্যাতন নিবারণের জন্য তাদের দিতে হবে উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের দিতে হবে অনুপ্রেরণা, যাতে তাদের মনে জাগে আত্মচেতনা ও আত্মশক্তি। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন,—ঐ সব শ্রান্ত শুষ্ক মূঢ় মূক নির্যাতিতদের

"——ডাকিয়া বলিতে হবে
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাবে ধেয়ে।
....
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে......................................"

কবির অন্তর মানবতাবোধে অনুপ্রাণিত, তাই নির্যাতিত মানুষের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে মানবতা-বিরোধী পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধভাবে নির্ভয়ে দাঁড়াইবার সাহস ও মনোবল জাগ্রত করার জন্যই কবির এই নির্দেশ। তাঁর এই নির্দেশ মানবধর্মসম্মত। কারণ, এই সাহস ও মনোবল জাগ্রত করার উদ্দেশ্য, মানবধর্মদ্রোহীদের দমন এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু কবির মনে মানবতার আদর্শ যতই থাকুক না কেন, বাস্তবক্ষেত্রে সেই আদর্শ কার্যে রূপায়িত করবার পথে নানাবিধ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগলো পরাক্রমশালী দানব-তুল্য ধর্মদ্রোহীরা! কবি তাই আশঙ্কিত হয়ে বললেন—

"বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,
যুগযুগের তাপসদের সাধন ধন যত
দানবপদদলনে হলো গুঁড়া।"

কবি দেখতে লাগলেন, দিন দিন মানুষের কোমলবৃত্তি কঠিন হ'তে কঠিনতর পশুবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, মানবধর্মকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে মানবধ্বংসের উৎসবে যেন পৃথিবী উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এইরূপ মানবধর্মবিরোধী পরিবেশের কথা উল্লেখ ক'রে কবি বললেন—

"——হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরা।——"

এই হিংসার ভয়ংকর রূপ আরও বিভীষিকাময় হয়ে উঠতে লাগলো। তাই, হিংস্রতার বিভীষিকায় আতঙ্কিত হয়ে মানবকবি রবীন্দ্রনাথ বেদনার্ত্ত হয়ে বসে উঠলেন—

"রক্তমাখা দন্তপঙ্‌ক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগর গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন করে;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্য সম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে।"

এইরূপে কবির জ্ঞাতসারে দিনে দিনে বাড়তে থাকে আধুনিক সভ্যতার হিংসা-উৎসবের সমারোহ, যে সমারোহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে মানবপীড়নের ও মানবধ্বংসের নিত্য নূতন কৌশল। কবি তাঁর জীবন অবসানের প্রাক্কালে বিশেষ এক প্রসঙ্গে এইরূপ মানব-পীড়নের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন—"এই মানব-পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"

কবির উপরোক্ত উক্তিতে বোঝা যায় যে, হিংস্র সংগ্রাম সৃষ্টি করে মানবপীড়নের জন্য তিনি দায়ী করেছেন পাশ্চাত্যদেশের জাতিবিশেষকে। কারণ, তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছিল বুয়োর যুদ্ধ ও দুইটি পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ যা পাশ্চাত্য জাতির দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল এবং পরে তা' সংক্রামিত হয়ে কলুষিত করেছে প্রাচ্যসভ্যতার অন্তস্থলকে।

যাহা হউক, তিনি স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন, বলদর্পিতের হিংস্রতা কিরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে প্রচণ্ড মূর্তিতে নির্মমভাবে মানবদলনে ব্যাপৃত হয়েছে, যেখানে ধর্মের কোন মর্যাদা নাই, ধর্মের কোন মূল্যও নাই। তাই মানবদরদী কবি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—"বলদর্পিতের পেষণ যন্ত্রে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচারসভায় ধর্মের দোহাই দেবে এমন ভরসা আজ কোথাও রইল না।"

কবি স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারলেন, মানবপীড়নের কোন প্রতিকার নাই, হিংস্রকাজের কোন ন্যায় বিচারও নাই। এইরূপ অন্যায় প্রতিকারহীন হিংসার পৈশাচিক লীলা কত যে মর্মভেদী হতে পারে, তার সত্যকার রূপের এক উত্তেজনাময় বিবরণ দিয়ে কবি একদিন বলেছিলেন—

"আমি যে দেখেছি, গোপনহিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে;
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে,
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।"

এই মর্মান্তিক ঘটনায় মানবদরদী কবি বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারপর গভীর আবেগে তিনি জানালেন তাঁর ব্যাকুল অন্তরের কথা—

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে।"

মানবকবির চোখে একদিন এই ভুবন সৌন্দর্যে সংগীতে ও আনন্দে মহিমান্বিত ব'লে মনে হয়েছিল, তাই সে' দিন তিনি বলেছিলেন—"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।" কিন্তু পরে সেই কবির সব সুখস্বপ্ন হিংসামত্ত পৃথিবীর নৃশংসতার ঘনমেঘজালে আচ্ছন্ন হয়ে দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

আদর্শবাদী কবি ছিলেন 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' এর উপাসক। কিন্তু বুদ্ধিমান ক্ষমতাশালী স্বার্থান্ধ লোভী মানুষেরা হিংসা, অসত্য ও অমঙ্গলের পূজারী। তাই, এই পরিস্থিতিতে মানবতাবাদের প্রচারক কবির মানবধর্ম আদর্শ রূপায়ণের সকল প্রচেষ্টা যে ব্যাহত হবে, তা' সুনিশ্চিত। তাই ব'লে তিনি নিরাশ হয়ে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নাই, বা মানবধর্ম-দ্রোহীদের প্রবল প্রতাপে বিভ্রান্ত হয়ে তেজস্বিতাও হারান নাই। তাই যখনই তিনি শুনেছেন (কবির ভাষায়),—"মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি,—" তখনই তিনি সেই মানুষ-জন্তুদের ধিক্কার দিয়ে বলে গেছেন—

"———মানবের দেবতারে

ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে,
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব'এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের',
বলে যাব, দ্যুতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যেন দেখতে পেয়েছিলেন, মানবদেবতাকে হেয়জ্ঞানে মানবরূপী অপদেবতা তাদের পীড়ন করে, সেই অপদেবতাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, ভবিষ্যতে থাকবে না কিছু তাদের স্মৃতি, মানব-ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে থাকবে না তাদের প্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শন, সেখানে তারা চিহ্নিত হয়ে থাকবে শুধু বিভীষিকারূপে।

মানবতাবাদী কবি আশাবাদীও বটে! তাঁর চিন্তা-ধারা সর্বদাই প্রভাবিত হয়ে থাকতো মানবধর্মচেতনার দ্বারা। তাই, তাঁর ছিল স্থির বিশ্বাস,—মনুষ্যত্বের হবে জয় ও দানবশক্তির হবে বিনাশ। তিনি তাঁর জীবনা-বসানের প্রাক্কালে যে শেষ বাণী দিয়ে গেছেন, সেই বাণীর মধ্যে তাঁর ঐ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন —"মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি। এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা, মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে: নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু-বিনশ্যতি।"

কবির ছিল স্থির বিশ্বাস, প্রথম অবস্থায় অধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ও জয়লাভ হতে থাকলেও, পরিণামে তার সমূলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী তাঁর এই বিশ্বাসের মূলে ছিল ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রভাব।

অধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবাদের জন্মস্থান প্রাচীন ভারত —যার ঐতিহ্য, যার সংস্কৃতি রবীন্দ্রমানসে করেছিল প্রভাব বিস্তার। তাই, সেই ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবরসে স্নাত কবিমনে হয়েছিল গীতা-উপনিষদের আলোকসম্পাত, তাঁর হৃদয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বুঝি ভগবদ্‌গীতার বাণী—

"পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

গীতার এই বাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেই যেন মানবদরদী কবি নির্যাতিত জনগণকে আশ্বাস দিয়ে একদিন তাদের বলেছিলেন—

"তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু,'জেগে আছেন জগৎপ্রভু,
ওরা ধর্ম যতই দলবে, ত'তই ধুলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে॥"

এখানে কবির বক্তব্য,—জগৎপ্রভু ভগবান নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নাই, তিনি যথাকালে অধর্মীদের অহংকার চুর্ণ ক'রে তাদের ধুলায় লুটাইয়ে দেবেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি স্বার্থপর অর্থলোভী পররাজ্যলোভী স্পর্ধান্বিত ধর্মদলনকারীদের প্রসঙ্গে বলেছেন —

"একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকালে নিখিলের বিরাট বিধান।
স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভ ক্ষুধানল
ততো তা'র বেড়ে ওঠে,—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি' না করি' বিচার
জঠরে পুরিতে চায়!—বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ,
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।"

মানবধর্মদ্রোহীদের সীমাহীন অত্যাচার ও নৃশংসতা ভগবান্ কোন কালেই সহ্য করেন নাই, তাদের বিনাশ সাধনের যথোচিত ব্যবস্থা তিনি যুগে যুগে করে এসেছেন, কারণ মানবধর্ম সংরক্ষণের জন্য ইহার প্রয়োজন। এই বিশ্বাস ছিল বলেই কবি বিশেষ প্রসঙ্গে উল্লিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।

কবি আবারমহামানবতাবাদীও বটে,তাই তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল যে, মানবসমাজে মৈত্রী স্থাপন ও মানবধর্ম প্রচারের জন্য ভগবান যুগে মহামানবদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন শান্তিদূতরূপে। তাঁর এই মনোভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এক কবিতায়—যেখানে তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে বলছেন—

"ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে,' বলে গেল

'ভালবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'

কবি বুঝেছিলেন, মানবধর্ম রক্ষার জন্য দুর্দান্ত দুরাত্মাদের বিনাশ সাধনের যেমন প্রয়োজনে আছে, তেমন প্রয়োজন আছে পাপাত্মাদের চিত্তশুদ্ধি দ্বারা পুণ্যময় পরিবেশ সৃষ্টির। মহামানবেরা আবির্ভূত হয়ে শেষোক্ত কাজই করে গেছেন। এই সকল মহামানবগণ ঐশীশক্তির প্রভাবে, জ্ঞানের আলো জ্বেলে, মানবপ্রেম প্রচার ক'রে নির্দয় মানুষদের অন্তঃকরণে আনতে পেরেছিলেন মঙ্গলজনক পরিবর্তন, যার ফলে অশান্ত হৃদয় হয়েছে শান্ত, দানব-প্রবৃত্তি হয়েছে সংযত ও অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মানসক্ষেত্র হয়েছে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। তাঁরা এইরূপে পশুধর্মের অবসান ঘটিয়ে মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইরূপ অঘটনঘটননিপুণ মহামানবের উপর ছিল কবির গভীর বিশ্বাস। তাই, মহামানবতাবাদী মানব-প্রেমিক কবি মানবাত্মার নিয়ত অপমান ও মানবধর্মের দুরবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে স্মরণ করেছিলেন মহামানবকে। কেন যে তাঁকে স্মরণ করেছিলেন, তা' তিনি প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন,—"আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠছে; কেন না, মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই, আজ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। তাই আজ মহা-মানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে: তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো!"

এই প্রসঙ্গে কবি যে বিশেষ মহামানবের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি 'অহিংসা পরমোধর্মে'র মন্ত্রপ্রচারক বুদ্ধদেব, যাঁর মহিমায় কবি মুগ্ধ, যাঁর ধর্মতত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী, যাঁর শরণ নিতে তিনি বিশেষরূপে আকুতি দেখিয়েছেন মনুষ্যত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। এই মহামানবের উপর তার শ্রদ্ধাভাব যে কত গভীর ছিল, তা' বেশ বোঝা যায় তাঁর এই কথায়—"পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্রোধেন জিনে ক্রোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনাপীড়িত এই অপমানের যুগে বলবার দিন এলো: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।' তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন।"

মানবপ্রেমিক কবি আশাবাদী। তিনি স্বপ্ন দেখতেন পাশবতার যুগ কেটে যাবে, পুনর্বার হবে মানব-অভ্যুদয় ও মানবতার প্রতিষ্ঠা। কারন তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, মানব-অভ্যুদয়ের জন্য ও মনুষ্যত্বের প্রকাশের জন্য এক মহাপুরুষ জন্ম লগ্নে শুভংকর মূর্তি ধারণ করে মর্ত্য-লোকে আবির্ভূত হবেন বুদ্ধদেব প্রতিম মহামানব। এই পরম আশায় বিভোর থেকে তিনি তাঁর বিক্ষুব্ধ অন্তরে একদিন অনুভব করলেন আনন্দ জাগানো স্পন্দন। সেই স্পন্দনে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি ভাবাবেশে গাইলেন মহা-মানবের আগমনী সংগীত, যে সংগীত নিরাশার মনে জ্বেলে দেয় আশার আলো, নির্যাতিত মানুষকে শুনিয়ে দেয় আশ্বাসের বাণী। অমানুষের অমানুষিকতায় জর্জরিত মানব প্রাণমন দিয়ে শুনলো কবির সেই সংগীত—

"ঐ মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ'
নব জীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল আকাশে।"

মহামানবের প্রভাবে মানুষের নবজীবন লাভ যে অবশ্যম্ভাবী তা' মানবতাবাদী কবি মনপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। আর, তাঁর এই বিশ্বাস অতি প্রবল ছিল বলেই, তাঁর মানস চক্ষে ভেসে উঠেছিল মানবের নব-জীবন প্রভাতের আশা ও আশ্বাসে ভরা এক আনন্দমুখর দৃশ্যপট, যা' তিনি রূপায়িত করেছেন পূর্বোক্ত মহামানবের আগমনী সংগীতে। তারপর, ছন্দে সুরে ভাবে সমৃদ্ধ সংগীতের মাধ্যমে তিনি সেই দেবতাত্মাকে জানালেন, হিংসামত্ত পৃথিবীর অন্তহীন দুঃখ দুর্দশার কথা, তাঁকে

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'বার আহ্বানও জানালেন পৃথিবীর সকল কলঙ্ক মোচনের জন্যে। মানব দরদী কবি ভাবাবেশে গাইলেন সেই সংগীত—

"হিংসায় উন্মুক্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ ॥
নূতন তব জন্ম লাগি জগতের যত প্রাণী
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধু নিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্ক শূন্য ॥"

এই সংগীতের ছন্দে-সুরে-ভাবে ঝ'রে পড়ে কবির মানব-প্রেমের অমৃতধারা। কবি জানতেন, এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী থেকে সকল অমানুষিকতার কলঙ্ক দূর করা সম্ভব হয়, যদি মানবসমাজে সৃষ্ট হয় মানবতাপূর্ণ এক শান্তিময় পরিবেশ। কিন্তু এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সকল মানুষের মনে প্রেমের সঞ্চার করা, ত্যাগের ব্রতসাধনে তাদের ব্রতী করা, তাদের অন্তর হ'তে সকল অহংকার দূর করা, জ্ঞানের আলোয় তাদের মন উদ্ভাসিত করা ও তাদের সকল দুঃখ শোক মন থেকে অপসারিত করা। কবির বিশ্বাস, ঐ সব প্রয়োজনের সমাধান করতে পারেন সেই মহামানব—তাই তাঁকে আবার আহ্বান জানিয়ে কবি গাইলেন—

"এস' দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা।
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক খণ্ডন কর' মোহ,
উজ্জ্বল হোক জ্ঞানসূর্য-উদয় সমারোহ।
প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥"

মানবতাবাদী মানবদরদী কবির মর্মবাণী মূর্ত হয়েছে এই ভাবময় মহাসংগীতের শব্দে, ছন্দে, সুরে ও মূর্ছনায়। তাঁর এই ভাবময় সংগীত আকাশে বাতাসে দিগদিগন্তে ভেসে গিয়ে কোন দেবলোকে বিরাজিত ঐ মহামানবের মর্মলোক স্পর্শ করবে কিনা জানি না, তবে বিশ্বলোক জানে, মানবতার পরিপন্থী প্রবল প্রতাপশালীর ক্ষমতা, মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা'র পরিসমাপ্তি এবং মানবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বশান্তির সংস্থাপনের জন্য কবিমানসে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর আকুতি, আকুলতাও আন্তরিকতা, যা' চিরাঙ্কিত হয়ে আছে তাঁর স্বরচিত গানে, কবিতায় প্রবন্ধে নিবন্ধে ও ভাষণে। তাঁর কাব্যে প্রবন্ধে, ভাষণে কোথাও বর্ষণ হয়েছে তাঁর মানব প্রেমের সহস্রধারা, কোথাও বা ঝ'রে পড়েছে নির্যাতিত মানুষের জন্য তাঁর করুণাশ্রু, কোথাও জ্বলে উঠেছে মানবতাবিরোধী দানবের প্রতি তাঁর রোষাগ্নি, কোথাও ভাবের আবেগে মুখর হয়ে উঠেছে মানবধর্ম সংস্থাপনের জন্যে ভগবানের কাছে তাঁর আকুল প্রার্থনা, কোথাও বা আশার আলো জ্বেলে দিয়েছে তাঁর মানব-অভ্যুদয়ের আশ্বাসবাণী। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কবির চিন্তাজগতে মানবতার আদর্শ সর্বদাই নানা-ভাবে সক্রিয় হয়ে থাকতো, কারণ তাঁর অন্তরে সর্বদাই জাগ্রতছিল মানবপ্রেম।

কবি মানবতাবাদের আদর্শও বিশ্বমৈত্রী-আন্দোলন শুধু সীমাবদ্ধ করে রাখেন নাই ছন্দোবদ্ধ ভাবময় কাব্যের শব্দবিন্যাসের মধ্যে, সুর তাল লয়সমন্বিত সংগীতের শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে, কিংবা ভাবগর্ভ প্রবন্ধ ও যুক্তিতথ্যপূর্ণ স্পষ্ট ভাষণের বাক্যসমারোহের মধ্যে ; তিনি কর্মক্ষেত্রেও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ঐ মতবাদকে কার্যকরী করবার জন্য। পৃথিবীর সকল দেশই জানে, বিশ্বজনীন কল্যাণ-কাজে তাঁর একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার কথা। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এসে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের বহু মনীষীও তাঁর এই আদর্শকে সমর্থন করে তা' কাজে পরিণত করার জন্য তাঁর সহযোগিতাও করেছিলেন।

আশাবাদী কবি কায়মনোবাক্যে আশা করেছিলেন, হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীর অশান্ত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির অবসান হয়ে যেন বিশ্বশান্তির উদ্ভব হয়। তিনি তাঁর এই আশাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য মানবসমাজে উপস্থাপন করেছিলেন তাঁর ঐক্যতত্ত্ব। তিনি আরও আশা করেছিলেন যে, বিশ্বমানব এই ঐক্যতত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করে প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে মৈত্রীবন্ধনে এক-প্রাণ একমন হয়ে বিশ্বকল্যাণ কাজে ব্রতী হবে। কবে পূর্ণ হবে কবির সেই আশা যে আশানিয়ে একদিন তিনি গেয়েছিলেন—

"কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ, হউক নির্মল, হউক নিঃশেষ—
চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণ কাজে।
স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম, পূর্ব-পশ্চিম বন্ধু সংগম—
মৈত্রীবন্ধন পুণ্যমন্ত্র-পবিত্র বিশ্বসমাজে।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বমানবতা

সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতি-পূজার সঙ্গে—তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা বিশ্ব জুড়ে হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করলে সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে অতীতে আর কোন মনীষী এরূপ উচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা বিশ্বের শিক্ষিত জনগণের কাছে পাননি। তিনি বহু গুণের অধিকারী বটে, কিন্তু মূলতঃ তিনি কবি। এই কবি প্রতিভার মাধ্যমে তাঁর স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বমানবতা আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণভাবে স্বদেশিকতা বিশ্ব-প্রেমের প্রতিকূল হয়ে থাকে কিন্তু তাঁর স্বাদেশিকতা ছিল বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের যুগকে বলা হয় ভারতের নব-জাগরণের যুগ। এই যুগকে তিনি বলেছেন বৈপ্লবিক যুগ। ইংলণ্ডে তখন ভিক্টোরিয়া যুগের মধ্যরবি। ভারতে ইংরাজরাজত্বের প্রসার ও প্রতিপত্তির চরমোৎকর্ষের যুগ।

এক বিরাট ব্যক্তির আবির্ভাব ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণেই ঘটে থাকে, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জন্মযুগে আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তার আলোচনা করে দেখা যাক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হ'ল ইউরোপের ফ্রেঞ্চ রেভোলুশান, রিফরমেশন ও শিল্পবিপ্লবের যুগ। ইউরোপের বৈপ্লবিক বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ও জনসাধারণ স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র-মূলক রাজশক্তির ধ্বংস করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সেই যুগ মতস্বাতন্ত্র্যের ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য লড়াইয়ের যুগ। তখন ইউরোপের যে জাতির সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ হয়েছিল সেই ইংরাজ তখন বিশ্বের দিকে দিকে বাণিজ্যের পাড়ি দিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার দেশগুলিতে বসতি সুরু করেছে এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে যত্নবান হয়েছে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলা বৃটিশের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ইংরাজ সওদাগর-গণ বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যা জয় করে কলিকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারত অধিকারে অগ্রসর হয়। ১৮৫৭-৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহে ভারতে হিন্দু ও মুসলিম ফিউডাল বা সামন্তরাজশক্তির আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা (যাকে আমরা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে থাকি) ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৭৫৭ হতে ১৮৫৭, এই এই একশত বৎসরে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই একশত বৎসরে বাংলায় বৃটিশ শাসন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থায় বাংলা দেশের জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। যে গ্রাম আমাদের জাতির মেরুদণ্ড, আর্থিক, সামাজিক-দেহের আত্মা ছিল, সেই গ্রামের অধিপতি জমিদার হওয়ায় জমিদার শ্রেণী ধনেরও অধিপতি হলেন। সেই ধন ইংরাজের শিল্প ব্যবসায়ে লগ্নি করলেন। ছেলেদের উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠালেন। সেখানকার মানুষের চরিত্র ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতি তাদের মুগ্ধ করল। পাশ্চাত্যশিক্ষা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রভূত ধনসঞ্চয় ও জমিদারী ক্রয় করেন। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণের কেন্দ্রটি ছিল কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে এবং এই শিক্ষিত শ্রেণীর অগ্রগণ্য ছিল ঠাকুর পরিবার। এক-দিকে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণ, এবং অন্যদিকে কলিকাতার বিশিষ্ট ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এই ঠাকুর পরিবারে মিলিত হতেন সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানে। নারীশিক্ষার প্রবর্ত্তনেও এই ঠাকুর পরিবার অগ্রগণ্য ছিল।

কবিগুরুর জন্মপূর্ব্ব একশত বৎসরের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালীর মধ্যে রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সমাজ তত্ত্বে নূতন মতবাদ দেখা দেয়—যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও আত্মবিকাশের স্বাধীনতার বাণী। যাঁরা এই নূতন মতবাদের প্রবর্ত্তক তাঁরা হলেন—রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, সমাজ সংস্কারে এবং সাহিত্যে এই নূতন মতবাদ বাংলার যৌবনচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে। দীর্ঘ শতবৎসর ধরে বাইরের জবরদস্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার বেড়াজাল, সামাজিক বাধানিষেধ—এ কালের মানুষের আত্মাব বিকাশের পথে কঠিন বাধাস্বরূপ হওয়ায় সংস্কার ও পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে জন্ম নিলেন সেই ঠাকুর পরিবার ছিল নব্য বাংলার বৈপ্লবিক মতবাদের ধারক ও বাহক। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বকে পৌছে দিলেন নবীনচিত্তের অন্তঃস্থলে। সে যুগে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজগণ সঙ্গীতে, চিত্রাঙ্কনে, স্থাপত্যশিল্পে এবং সাহিত্যে নবভাবের বাহক ছিলেন। এরূপ পারিবারিক আবেষ্টন ও সামাজিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ বর্দ্ধিত হয়েছেন তাই তাঁর চিত্তের বিকাশ বাল্যকালেই অতি দ্রুত ঘটেছে। পিতার কাছে উপনিষদের বাণীগুলির তত্ত্ব শিক্ষালাভ করে পরিণত বয়সে তাঁর জ্ঞান প্রকৃতির সীমা ছাড়িয়ে অসীমে পৌছায়, তাঁর জীবনদর্শন মানব প্রেমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনি পিতৃপ্রদত্ত ব্রহ্মবাদের মুক্তি মার্গ ছেড়ে তাঁর সুদূর প্রসারী মানসিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সত্তার উপলব্ধি করলেন সর্ব্বজীবে এবং বিশ্ব প্রকৃতির পর্ব্বত, নদী, প্রস্রাণ, লতাগুল্ম ও পুষ্পপল্লবে। বিশ্বকে দেখলেন চিরন্তন সত্যরূপে—অনুভব করলেন ঈশ্বর, মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একটা ঐক্যবোধ, একটা সামঞ্জস্য।

তিনি গাইলেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ
মহানন্দময়।"

আবার অন্যত্র গাইলেন—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেই খানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে
সব হারাদের মাঝে।"

বাল্যকালে তাঁর প্রথম কবিতায় দেখি, জন্মভূমি ভারতের পরাধীনতায় গভীর বেদনাবোধ। প্রৌঢ়ত্বে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে লিখলেন—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।"

রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪-৬ সালের বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন। সাহিত্যের আসর থেকে এই প্রথম তিনি রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান করতে লাগলেন। তখন দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে মারাঠা দেশ বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে বৃটিশরাজ-বিরোধী আন্দোলন চলছিল। ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তের দুই জাতীয় আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। মারাঠা-বীর ছত্রপতি শিবাজী মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করে ভারতের জাতীয় ইতিহাসে যে ত্যাগের ঐতিহ্য ও জাতীয় প্রেরণা রেখে গেছেন—তাকে অবলম্বন করে সেদিন মারাঠা ও বাংলার ভৌগোলিক ব্যবধানের মাঝে সেতু নির্মাণ করা হল। ১৯০৪ সালে বাংলায় শিবাজী-উৎসব পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উৎসব স্মরণে লিখলেন—

"কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে
হে রাজা শিবাজী
তব ভাল উদ্‌ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন যুগে নেতৃত্ব গ্রহণও করেছিলেন। ১৯০৬ বঙ্গীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে পাবনা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে জাতীয় আন্দোলন শুধু ভদ্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, জনগণের মধ্যে কোন সাড়া জাগায়নি। মুসলমান

সম্প্রদায় এতে অংশ গ্রহণ করছে না ; তাছাড়া সাংগঠনিক এমন কোন কর্ম্মতালিকা নেই যাতে জনগণের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। তাই তিনি তাঁর সভাপতিত্বের অভিভাষণে সংগঠন ও গণসংযোগের বিষয় উল্লেখ করেন। কিন্তু সেদিন তাঁর কথায় কেহ কান দেয়নি। তিনি বুঝতে পারলেন—শুধু উত্তেজনা ও প্রচার দ্বারা কার্যোদ্ধার হবে না। তাই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে কলিকাতা ও বাংলার জেলাগুলিতে বিপ্লবীদের গুপ্তসমিতিগুলো গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দাবিভাগের গোচরীভূত হলে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী হয়। বিপ্লবীদের নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হন। বিচারে নিরপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় একবৎসর কারাভোগের পর মুক্তিলাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধায় কবিগুরু লিখলেন—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণী মূর্ত্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ, কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা, ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।"

১৯১৪ সালে ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরাধীন ভারত বৃটিশ গভর্মেণ্টের ইচ্ছায় সেই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়। দেশের নেতৃবৃন্দ জাতীয় কংগ্রেসে দাবী উত্থাপন করেন—হোমরুল বা স্বরাজ। ইংরাজ মহিলা এনিবেশান্ত হোমরুল আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় গভর্মেণ্ট তাঁকে বিনা বিচারে আটক বা অন্তরীণ করেন। দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার এক মহতী জনসভায় এনিবেশান্তের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে স্বাধীনতার দাবীতে গণ-বিক্ষোভ প্রবলতর হতে থাকে। গভর্মেণ্ট রাউলাট আইন পাশ করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সভা-সমিতি শোভাযাত্রা ও সংবাদপত্রপ্রচার বন্ধ করেন। এই আইনের প্রতিবাদে অমৃতশহরের জালিয়ানওয়ালা বাগে এক শান্তিপূর্ণ জনসভায় ইংরাজ শাসকগণ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ দ্বারা বহু নরনারী ও শিশু হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড ভারতবাসিগণ নীরবে সহ্য করেনি। মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ভারতসম্রাট প্রদত্ত "নাইট" উপাধি ত্যাগ করেন। উত্তরোত্তর ভারতে বৃটিশ শাসন অত্যাচার ও দমনমূলক হয়ে উঠলে তিনি দুঃখ করে লিখলেন—"য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল। দেখেছিলাম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে। অনেকদিন আশা করেছিলাম—বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে এবং এও মনে ছিল যে এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে দেখে অবশেষে দেখলুম, চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব্ব 'ল এবং অর্ডার' বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে।"

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতায় রাজনীতির দলাদেলির স্থান ছিল না। তিনি যেমন স্বদেশে ছোট বড় সব মানুষ-গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন তেমনই হিন্দুমুসলিম ঐক্য স্বাধীনতা-অর্জ্জনের জন্য যে একান্ত প্রয়োজন তা বারবার তাঁর লেখনীতে প্রকাশ করেছেন—"আসল কথা আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। ভেদটা দুঃখ, ঐটেই পাপ, সে ভেদ বিদেশীর সঙ্গে হোক আর স্বদেশীর সঙ্গেই হোক। সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মত ব্যবহার করতে পারি কখন? যখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তির ও কর্ম্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে..."

"সুইজরল্যাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েছে—তবুও ত তারা এক নেশন। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্ত বিমিশ্রণে কোন বাধা নাই—ধর্ম্মে বা আচারে বা সংস্কারে। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্ম্মের শাসনে চিরদিনের জন্য যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হতে পারে না। জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্ছে জন্মগত ঐক্য। যারা ভেদকে নিজেদের

মধ্যে ইচ্ছে করে পোষণ করে তারা স্বাধীনতা চায়—একথার কোন অর্থ হয় না।"

স্বাধীনতার জন্য মুষ্টিমেয় যুবকের আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণকে তিনি পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করেও এর ত্রুটি সম্বন্ধে বলেছেন—"সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন। কিন্তু তাঁরা আজ বুঝেছেন, সমগ্র দেশ বলে একটা জিনিস সমস্ত লোকের সৃষ্টি। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোন একটা অংশ থেকে নয়।"

তারপর যখন বৃটিশ রাজশক্তির বর্বর অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে দেশের মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করল—তখন মহাত্মা গান্ধীজী আহ্বান করলেন ভারতের আপামর জনসাধারণকে পরাধীনতার বন্ধন মুক্তির সংগ্রামে—স্বরাজ লাভে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই আহ্বানকে বললেন—সত্যের আহ্বান। তিনি লিখলেন—"বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরও অনেক বড়, সমস্ত ভারতবর্ষজুড়েতারপ্রভাব। বহুদিনধরে আমাদের পলিটিকেল নেতারা ইংরেজিপড়া দলের বাইরে তাকাননি—কেন না, তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি ইতিহাসপড়া একটা পুঁথিগত দেশ। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায়নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরীবের দ্বারে—তাদেরই সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ও মানবতার মধ্যে আদর্শের ঐক্যবোধ ছিল বলে গরীব নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি তাঁর দরদ ছিল অসীম। কি দেশের কাজে, কি সামাজিকতায়, কি ব্যক্তিগত ব্যবহারে, যেখানেই তিনি তাদের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা লক্ষ্য করেছেন—সেইখানেই তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়েছে, তিনি লিখেছেন—

হে মোর দুর্ভাগাদেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান,
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাওনাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

আমরা মানুষকে নীচ, পতিত, অবহেলিত করে রেখে খুঁজেছি ঈশ্বরকে চিরন্তন সুখ ও স্বর্গ লাভের আশায়। কবিগুরু ভগবানকে খুঁজতে বলেছেন নীচ পতিতের ঘরে—তাদের সঙ্গে কর্মযোগে এক হয়ে। তাই তিনি লিখলেন—

"অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই খুজিস সঙ্গোপনে
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথা পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধুলার পরে।"

মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলন সারা ভারতে বিস্তার লাভ করলে কবিগুরু উত্তরভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক রামানন্দ ও কবীরের কাহিনী অবলম্বনে লিখলেন—

"কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন গুন করে,
রামানন্দ বসলেন পাশে
কণ্ঠ তার ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন
প্রভু জাতিতে আমি মুসলমান
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।
রামানন্দ বললেন—এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি বন্ধু
তাই অন্তরে আমি নগ্ন
চিত্ত আমার ধুলায় মলিন,
আজ আমি পরবো শুচিবস্ত্র তোমার হাতে
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।"

আর একস্থানে তিনি লিখলেন—

"গুরু রামানন্দ প্রাতঃস্নান সেরে

চলেছেন দেবালয়ের পথে
দূর থেকে রবিদাস প্রণাম করল তাঁকে
ধুলায় ঠেকাল মাথা।
রামানন্দ স্বধালেন – বন্ধু কে তুমি?
উত্তর পেলেন, আমি শুক্‌নো ধুলো,
প্রভু, তুমি আকাশের মেঘ,
ঝরে যদি তোমার প্রেমের ধারা
গান গেয়ে উঠবে বোবা ধুলো
রঙ বেরঙের ফুলে।
রামানন্দ নিলেন তাকে বুকে,
দিলেন তাকে প্রেম।

তাঁর এই মানব প্রেম স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর পলিটিক্‌স্‌ ও রাজনৈতিক মতবাদ বা 'ইজম্‌' ছিল না। যে দেশই হোক—মানুষের দুর্দ্দিনে তাঁর প্রাণ কেঁদেছে। নীচ পতিত মানুষ যেখানে জেগে উঠে নিপীড়নের জগদ্দল পাথর সরিয়ে দিয়েছে সেখানে তাঁর আশীর্ব্বাদ পৌছেচে। একদা রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে ও রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই ১৯২০ সালে আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ সংগ্রামে চলার সময় রাশিয়ার এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। রবীন্দ্রনাথ সেখানকার ধ্বংসোন্মুখ মানুষদের বাঁচাবার জন্য দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে রেডক্রশ মারফৎ পাঠিয়ে ছিলেন। এ জন্য সেদিন তাঁকে দেশের এক শ্রেণীর ভদ্রলোকদের কাছ থেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ শুনতে হয়েছিল। তারপর ১৯৩০ সালে তাঁর নিমন্ত্রণ এসে পৌছাল সোভিয়েট রাশিয়া থেকে। অ্যাটলান্টিক শক্তিজোটরা যাকে লৌহমানব আখ্যা দিয়েছিল, সেই ষ্টালিনের শাসন কালে পরাধীন ভারতের মানবতার মূর্ত্ত প্রতীক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে রাশিয়ায় আহ্বান বস্তুতঃ বিস্ময়কর ঘটনা। সেদিন লৌহজালে ঢাকা নিষিদ্ধ দেশে তাঁর আমন্ত্রণ ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। রাশিয়ায় পদার্পণ করে সেখানকার সমবায় প্রথায় ক্ষেত খামার এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে করতে একটি চিঠিতে লিখলেন—"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভাল লেগেছে সে হচ্ছে ধন-গরিমার ইতরতার তিরোভাব। কেবল এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্য্যাদা একমুহূর্ত্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভূষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিতও হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য্য সহজ হয়েছে।"

আর একটি চিঠিতে লিখলেন—

"একদিন ফরাসী বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য, সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্বে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিক্‌ল না। এদের এখানকার বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্ততঃ এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করচে।"

আর একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন—

"উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি—'মা গৃধঃ' লোভ ক'রো না। কেন লোভ করবে না? যেহেতু সমস্তকিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিগত লোভেতে ক'রেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—সেই একের থেকে যা আসছে তা কই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলচে। সমস্ত মানব সাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানব সত্যকেই বড় বলে মানে সেই একের যোগে উৎপন্ন যা কিছু, এরা বলে তাকেই সকলে মিলে ভোগ ক'রো।"

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ জন্মভূমি ভারতবর্ষের আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলছেন—

"অহং সীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়। ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের সাধনায় এ যেমন একটা বড় কথা, নেশনের ঐতিহাসিক সাধনাতেও সেই রকম। কোন মহাজাতি কী ক'রে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে এই তপস্যাই তার তপস্যা। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তর বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা। আত্মার আলোকদীপ্তি। ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে

পারেনি। এই আলোকের আঘাতেই ভারত ভূখণ্ড সীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল, স্থতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষ।" তাই তিনি গেয়েছেন—

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে
জাগোরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।"

তিনি এই মহামানবের সাগর তীরে ডাক দিয়েছেন বিশ্বের মনীষীদের তাঁর বিশ্বভারতীতে।

* এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর,' 'গীতাঞ্জলি,' 'সঞ্চয়িতা, 'পুনশ্চ' ও 'রাশিয়ার চিঠি' পুস্তকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছি।

বেলা শেষে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এত পরিপাটি সেজে কিবা ফল,
এত ফুল কেন খোঁপাতে ?
এখনো কি হায়, মন তোর চায়
তেমনি আমায় লোভাতে !
এখনো কি কয় এত কথা তোর
কাঁকনের সাথে কলসী ?
আজো কিরে জল হয় উচ্ছল
হিল্লোলে তোর উলসি' ?
আল্তায় রাঙা ও তোর চরণ,—
বল্তেই হবে শতদল !
নিয়ে তোর ঐ কাঁচপোকা টীপ্
করি কবিত্ব কত বল্ !
ভুলেও যযাতি দেয়নি আমায়
চিরযৌবন উপহার !
শরতের মেঘ যদিও গরজে,—
বরষে কি কভু তত আর ?
কাজরীর স্থর লাগিবে কি ভালো
আজি হেমন্ত-সাঁঝে রে ?
বাটের বাঁশির মিঠে তান আর
বাজে কি হাটের মাঝে রে !

মাঘের শিশিরে ফাগুনের ফাগ
আজিও চাহিস্ গুলিতে ?
ভাঙা পিচ্‌কারী দেয় টিট্‌কারি,—
রঙ খেলা হবে ভুলিতে !
বেলা অবসান !—সন্ধ্যার কালি
মাখানো এখন গগনে !
ঐ শোন্ বাজে বিদায়ের গীতি
মৃদু মন্থর পবনে।
এত ছলাকলা সারাটি জীবন
রেখেছিলি কোথা লুকায়ে ?
রিক্ত কুঞ্জ, ক্লান্ত মধুপ,
কুসুম গিয়েছে শুকায়ে !
সকালের খেলা খেলে কিবা স্থখ
ক্লান্ত করুণ বিকালে !
মরা নদীটিরে বৈশাখে কেগো
কল্লোলকেলি শিখালে !
ভাঙা নহবতে সানাইয়ের স্থর
উঠিবে কি আর বাজিরে ?
ফুল ফোটা নয়—ফুল ঝরিবার
লগন আসিছে আজি রে !

বোবা কান্না

প্রভঞ্জন কুমার রায় চৌধুরী

ছাদে বসে দুদিন ধরে পরামর্শ চলছিলো কি করা যায়, কাকে কাকে বলা যায় এই নিয়ে। বিপুল ঘটা করে নিমন্ত্রিতদের বেশী ভিড় জমিয়ে একটা হুলস্থূল করা হয় এটা প্রদীপের ঠিক অভিপ্রেত নয়। তার মনের অবস্থা বুঝে রত্না বললে,—শরীর খারাপতো রয়েছেই, কিন্তু এমন দিনতো আর সব সময় আসবে না! তাছাড়া এটা প্রথম মিলন বার্ষিকী। রত্নার মুখ চেয়ে রাজী হলো প্রদীপ।

পরদিন রাত্রিতে সবাই চলে যাবার পর উপহারগুলো দেখতে বসলো দুজনে। সব চেয়ে পছন্দনই হলো হর-পার্ব্বতীর যুগল মূর্ত্তিখানি। কৃষ্ণনগরের অজ্ঞাত শিল্পীর তৈরী।

—দেখেছ? পার্ব্বতী যেন সমস্ত মনপ্রাণ উজাড় করে দেখছে তাঁর দয়িতকে, কী তাঁর চোখের ভাষা!—বললে রত্না। কালিদাসের কবিকল্পনা রূপলাভ করেছে নগণ্য অচেনা মৃৎশিল্পীর হাতের নিপুণতায়।

এ যেন প্রদীপের শিখার দিকে রত্নার অপলক দৃষ্টিরই প্রতিচ্ছায়া এবং সেই হিসাবে কল্পনা করেই বোধহয় মূর্ত্তিখানির প্রতি রত্নার আকর্ষণ এত বেশী। ঠিকই। ঠিকই চিনেছ পার্ব্বতীকে। হাসতে হাসতে বললো প্রদীপ। এবার ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত ভদ্রলোককে কেমন দেখাচ্ছে বলতো?

—মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ভুলে গিয়ে পার্ব্বতীকে জড়িয়ে ধরে হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। চোখে তাঁর প্রেমের প্রদীপ্ত জ্যোতি। তন্ময় হয়ে প্রদীপ শুনছিলো ব্যাখ্যা। অস্ফুট কণ্ঠে বেরিয়ে এলো—বাঃ।

—তুমি তোমার পার্ব্বতীকে এমনি করে প্রাণের পরশ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তো? রুগ্না বলে সব সময়ই রত্নার বড় শঙ্কা, বড় দুশ্চিন্তা।

মাসের মধ্যে কমপক্ষে দশদিন ভোগে রত্না। হার্টের রোগ। রোগশয্যায় থেকে থেকে তার দুর্ব্বল মন শুধু ভাবে—যদি রুগ্না বউকে প্রদীপ আর তেমনি ভাল না বাসে, তেমনি আদর না করে। দুর্ব্বল অবসন্ন মন মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ কিন্তু রত্নার মনের দিকে তাকিয়ে জরুরী কাজকর্ম্ম ফেলেও তার পাশে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কত গল্প করে, উপন্যাস পড়ে শোনায়। রত্না যেন অসুস্থ বলে কোন অভাব বোধ না করে। তাই কাজকর্ম্মের বহু ক্ষতি স্বীকার করতে হয় মাঝে মাঝে প্রদীপকে। তবু প্রদীপ জানে এ সমস্ত ক্ষতি নিতান্তই তুচ্ছ, সাময়িক।

হার্টের রোগে ভুগে ভুগে ক্রমে টি. বি. হয়ে পড়লো রত্নার। এ শঙ্কা বিয়ের পর থেকে সর্ব্বক্ষণই ছিল প্রদীপের। এবার প্রদীপের মন ভেঙ্গে পড়লো। স্নায়ু অবসন্ন। আর বুঝি বাঁচানো যাবে না!

সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসা সব কিছু বাড়ীতেই চলছিলে পুরোদমে। কিন্তু যেদিন হঠাৎ গলগল করে গলা থেকে প্রচণ্ড রক্ত বেরোল, হাসপাতালে পাঠা না ছাড়া গত্যন্তর রইলো না সেদিন। তিনটি বছর টি, বি হাসপাতালে কেবিন ভাড়া করে রেখে চিকিৎসা চালাতে হয়েছিলো। এ, পি, স্টেপটোমাইসিন পর্ব্ব শেষ হয়ে এবার অপারেশনই একমাত্র ভরসা। তবু ডাক্তাররা কদিন বাদ দিতে চান মাঝে। রোগী যে বড় দুর্ব্বল। আস্তে আস্তে কথা বলতে পর্য্যন্ত সে হাঁপিয়ে পড়ে।

ভিজিটিং আওয়ারের অপেক্ষায় থাকে রত্না। পথ চেয়ে শুয়ে থাকে। কতক্ষণে সে আসবে। আবার প্রদীপ দেখা করতে এলেও রত্না অসহায়ের মতো কাঁদে। বলে, অপারেশান যত পরে হয় ততই ভালো। ক'টা দিন তোমাকে বেশী দেখতে পাব। প্রদীপ দোদুল্যমান মনে ভরসা দেয় রত্নাকে। এ যেন কিছুই না। জানায়, যে করে হোক্ যতটাকা লাগে লাগুক, তাকে ভালো করে তোলা চাই। সুইজারল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত ডাক্তার দুমাসের মধ্যে কোলকাতা আসছেন এক মেডিক্যাল কনফারেন্সে। তাঁকে দিয়ে অপারেশন করাতে হবে। হাতে যেন আকাশ পায় প্রদীপ। ম্লান হাসি হেসে বলে রত্না—স্বপ্ন দেখছো না?

—না, না। এইতো সেদিন কাগজে দেখেছি। একটা মেডিক্যাল জার্ণালেও দেখেছি তাঁর নাম। বিশ্ববিশ্রুত ডাক্তার। অব্যর্থ তাঁর ছুরিধারা। ডক্টর এডমণ্ট থবসন নাম।

রত্না বাধা দিয়ে বললে,—অত রাশি রাশি টাকা কোথায় পাবে বলতে পারো?

—পাব।

—অত কষ্ট না করে আমাকে মরতে দাও। তুমি বেঁচে থেকে আবার বিয়ে কর, সংসার কর। সব সাধ আহ্লাদ মেটাও।

কথাটা শুনে প্রদীপের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কোন কথা না বলে শুধু করুণ চোখ দুটি তুলে ধরে রত্নার ফ্যাকাশে মুখের দিকে।

—ভাড়া বাসা তুলে দিয়ে বন্ধুর মেসে গিয়ে ক'টা টাকা আর বাঁচবে? এতেই ডাঃ থবসনের স্বপ্ন!

—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। নির্ভয়ে নির্ভাবনায় থেকে দেখো—কি করে তোমায় সুস্থ সবল করে তুলি।

হাসির মৃদু ছটা ছড়িয়ে পড়লো রত্নার চোখে মুখে। সুন্দর রক্তিম ওষ্ঠাধরের ভেতর থেকে আস্তে বেরিয়ে এলো —সাবাস্ বীরপুরুষ! কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর বললো সে,—জান, মাঝে মাঝে বাঁচবার একটু ক্ষীণ আশা মনে জাগে। মনে হয় যদি বাঁচি তো তোমার এই ভালবাসার টানেই বেঁচে উঠবো। বাঁচতে ইচ্ছে করে ঠিকই; কিন্তু কোনদিই তো কর্ম্মক্ষম হতে পারবো না। তাহ'লে তোমার কি লাভ? কদিনই বা ধৈর্য্য রেখে এভাবে চলতে পারবে? ভাবি তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার আগে মরা অনেক ভালো আমার পক্ষে।

—তুমি বেঁচে থাকলেই আমার লাভ। বুঝবো, আমার তুমি আছ—আমার রত্না আছে। বলতে বলতে ঘণ্টা বেজে উঠলো। ভিজিটিং আওয়ার শনিবারের মতো শেষ।

ভোর হতেই কাল সন্ধ্যার কথাগুলো মনে হতে লাগলো বারবার। প্রদীপের শেষ কথাকটি তৃপ্তিতে ভরে দিয়েছে রত্নার মনপ্রাণ। ভাঙ্গা বুক যেন আবার জোড়া লেগেছে,—তুমি বেঁচে থাকলেই আমার লাভ। বুঝবো আমার তুমি আছ। মনে মনে অনেকদিন পর প্রদীপের পাশে লজ্জানম্র নিজেকে কল্পনা করে পুলকিত হ'লো রত্নার সর্ব্বাঙ্গ।

এদিকে সকালে খবরের কাগজে পাত্রপাত্রী কোলামের একটি বিশেষ অংশ হঠাৎ প্রদীপের চোখে পড়লো। বাঁচবার একটা পথ চোখের সামনে যেন সহসা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। লেখা রয়েছে—

"কলকাতার নিকটস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র বোবা কন্যা। মূক ও বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা। বিবাহেচ্ছুক কোন পাত্রের সন্ধান পাইলে আশাতিরিক্ত যৌতুকাদি দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হইবার নিশ্চয়তা আছে।"

রোববার দুপুরের গাড়ীতেই প্রদীপ তার বন্ধু মলয়কে কন্যার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলো। মেসে বসে দুঘণ্টা পরামর্শ ও মহড়া দেবার ফল ভালই ফলেছিলো। শাশ্বতীর পিতার শেষ পর্য্যন্ত আপত্তির কোন কারণই রইলো না। বিদ্বান চাকুরে পাত্র। এর চেয়ে বেশী তিনি কি আর আশা করতে পারেন? তবে বাপ মা নেই এই যা একটু···। তা একপক্ষে ভালও। ভাবলেন, মেয়েটার এতদিনে তা হলে একটা গতি হলো। রাহুগ্রাসে পড়া মেয়ে এতদিনে রাহুমুক্ত হলো বুঝি বা।

শাশ্বতীর বাবার হয়তো সন্দেহের বীজ একটু ছিলো— ছেলেই বা রাজী হলো কেমন করে? মলয় কন্যার পিতার হাবভাব বুঝতে পেরে তাকে বুঝিয়েছিলো যে তার বন্ধু বড় উদার ও দয়ালু, তা ছাড়া সে রাজনীতি করে। ঠি

যাকে বলে ঘোর সংসারী সে তা নয়। কোনদিন হবেও না। তবে এ বিয়ে করলে একটা কাজের মতো কাজ হয় তাই অভিশপ্ত খুঁৎ উপেক্ষা করেও প্রদীপ মেয়েটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে এ বিয়েতে রাজী হয়েছে।

বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পর থেকেই অহরহ বিরাট দ্বন্দ্ব চলছে প্রদীপের মনে। নিজের স্ত্রীকে নিরোগ করবার জন্যে টাকার প্রয়োজনে একটা মূক মেয়ের সর্বনাশ করলাম? অতি ঘৃণ্য স্বার্থপর ভেবে নিজেকে ধিক্কার দিলো বহুবার। ভাবলে, স্বপ্নাবিষ্টের মতো এ কি করে ফেললাম? মেয়েটির বিয়ে যদি না-ও হতো—তাতে আমাকে তো অপরাধের বোঝা ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াতে হতো না।

আবার দ্বন্দ্বের ঘোর কাটিয়ে উঠে নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে,—স্ত্রীকে ভাল করতে গিয়ে অন্যায় কিছুতো করিনি। মূক মেয়ে। কোনদিন তার বিয়েও হতো না। পঙ্গু জীবনের এ বিরাট অভাব থেকে তো তাকে মুক্তি দিয়েছি! সে কি কম হলো? এখন শাশ্বতী জানে—তার স্বামী আছে, তার সব আছে। অনাস্বাদিত অনুভূতির এই শিহরণ তার ব্যথিত প্রাণে জাগাতে পেরেছি সে কি কম হলো? মেয়েটি বিয়ের পর আভাসে ইঙ্গিতে এটা প্রকাশও করেছে। আবার বোবা ভাষা নিয়ে যখনই প্রকাশ করেছে তখনই প্রদীপের মন কেমন একটা বেদনা মিশ্রিত আনন্দে ভরে গিয়েছে।

মাঝে মাঝে আপিসের কাজে বাইরে দুদিনের জন্যে যেতে হচ্ছে বলে রত্নার কাছ থেকে চলে যেতো। গিয়ে শিবনগর নতুন শ্বশুরালয়ে কাটিয়ে আসত দু' একদিন। বোবা বৌয়ের হাসি হাসি চোখদুটি দেখে তার একটা মায়া পড়তো। কিন্তু ঠিক বউয়ের মতো দেখতে পারত না কখনও শাশুড়ীকে। প্রদীপের সংসারের সে যেন একটা পোষা পাখী।

শিবনগর দুদিন থেকে আবার রাজনীতির কাজকর্মের দোহাই দিয়ে চলে আসে। আপিসের নাম সে কমই করে সেখানে। যদি কেউ হঠাৎ কোন সন্দেহের বশে সেখানে গিয়ে হানা দেয়!

যথাসময়ে ছোটে রত্নার কাছে হাসপাতালে। রত্নাকে আগেই বলে রেখেছে যে সম্প্রতি প্রমোসনটার পর থেকেই তাকে মাঝে মাঝে দু' একদিনের জন্যে বাইরে যেতে হচ্ছে আপিসের কাজে। রত্না বলে,—কি রোগ থেকেই ভালো করে তুলছ। বাঁচবো বলে আপিসেও সময় মতো প্রমোশনটা পেয়েছ। প্রদীপ এর কোন জবাব না দিয়ে শুধু হাসে।

—শোন, বাইরে গিয়ে কিন্তু একদিনও বিনা কাজে সেখানে থাকবে না, কেমন?

—না গো না। কর্তব্য রয়েছে বলেইতো বাইরে যাই। দু'একদিন থাকিও। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটবার পর প্রদীপ বললো, এখনতো অনেক ভালো হয়েছ অপারেশনের পর থেকে। এবার হাসপাতালের অনুমতি পেলে কার্শিয়াঙ্ এর সেনাটোরিয়ামে এক বছর ঘুরিয়ে আনলে বাস্ জীবনভর নিশ্চিন্ত।

—এক ব-ছ-র? আচ্ছা সেনাটোরিয়ামে না গেলে চলে না?

—না। এসব রোগের পর সম্পূর্ণ সুস্থ হতে গেলে একবার ঘুরে আসা ভালো।

—ভাবছি এক বছর কি করে থাকবো তোমাকে ছাড়া। কতদিন দেখব না তোমায়।

—তাতে কি? দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে কাজের ফাঁকে ছুটি নিয়ে আমিও যাব কার্শিয়াঙ্।

সেতো বিরাট অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, বড় বড় চোখ করে বললে রত্না।

—তাতে তোমার চিন্তা কেন? টাকা আছে পাচ্ছি, দুহাতে খরচা করে যাচ্ছি।

—একি শ্বশুরের সম্পত্তি যে অনায়াসে দুহাতে খরচা করে যাবে?

রসিকতা করে বললো রত্না। এই রসিকতায় প্রদীপের বুকে কাঁটা বিঁধলো। সহজ স্বাভাবিক সুরে জবাব দিলো প্রদীপ,—ধরো তাই।

দুমাস বাদে কার্শিয়াঙ্ রেখে এলো রত্নাকে। ইতিমধ্যে কিভাবে কিভাবে হাওয়ায় ভেসে কথাটা শাশ্বতীর বাবার কানে গেলো। একদিন মলয়ের বোর্ডিংএ গিয়ে সরাসরি হাজির হলেন তিনি। মলয় এমন ভাব দেখালো এবং কথাটা শোনামাত্র এমন হাসিতে ফেটে পড়লো যে

তিনি শেষ পর্য্যন্ত সন্দেহের নিরসন না ঘটিয়ে পারলেন না।

প্রদীপ ফিরে এসে সব শুনে দিশাহারা হয়ে পড়লো। মলয় তৎক্ষণাৎ ওকে শিবনগর পাঠিয়ে দিলো। পাছে না গেলে তাদের আবার সন্দেহ জাগে। কার্শিয়াঙ্ যাওয়াটাকে সেখানে একটা রাজনীতির কারণের মধ্যে ফেলে দিলো।

প্রদীপ যথাসময়ে শাশ্বতীকে জানিয়ে দিলো যে কার্য্যবশতঃ একটু দূরে মাঝে মাঝে যেতে হবে তাকে, শাশ্বতী যেন কোন চিন্তা না করে। এখন হয়তো সপ্তাহের পরিবর্ত্তে মাসে দু'একদিনের জন্যে শিবনগর আসা সম্ভব হবে, এর বেশী নয়। শাশ্বতী ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। জীবনে যেদিন সে স্বামী পেয়েছে সেদিনই সে জানে তার সব পাওয়া হয়ে গেছে। এর অতিরিক্ত আর কিছু কাম্য নেই বোবা মেয়ের জীবনে।

ক্রমে রত্নাদের দাম্পত্যজীবনে মেঘ ঘনিয়ে এলো। সেনাটোরিয়ামে শিবনগরের একটি মেয়েও রয়েছে নার্স। এই নার্সটির সঙ্গে দিনকয়েকের মধ্যেই রত্নার বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠলো। রত্না শুধু স্বামীর গল্প করতো। আস্তে আস্তে অনেককিছু জানাশোনার মধ্যে পড়ে গেল মেয়েটির। একদিন নাম জিজ্ঞেস করলো। শুনেই সে চমকে উঠলো। কোলকাতা ক্যানেল বোর্ডিংএ থাকতো এই নামে একজন! সে ভদ্রলোক নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে তাদের পাশের বাড়ীর মূক ও বধির শাশ্বতী নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। রত্নার মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো। চিন্তাশক্তি নিমেষের মধ্যে হারিয়ে ফেললো সে। জোরে বলে উঠলো,—আমি রুগ্ন বলে এতবড় সর্ব্বনাশ করলো? না না, কাউকে আর বিশ্বাস নেই। নিজের কেবিনে গিয়ে বালিশে মুখ ঢেকে কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়লো। দুপুরেও কিছু খায়নি সে। বিকেলে টেম্পারেচার উঠলো। নার্স বন্ধুটি বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলো। আমি কি কচি খুকি যে আমাকে বোঝাবে—বললে রত্না। আমার বেঁচে কি লাভ? আমাকে বোকা পেয়ে মিথ্যে বলে ভুলিয়েছে। আপিসের কাজটাজ সব মিথ্যে, সব ফাঁকি।

তিনদিনের মধ্যে রত্নার শারীরিক অবনতি চোখে পড়ার মতো। সেনাটোরিয়াম থেকে তার পেয়ে প্রদীপ পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এলো কার্শিয়াঙ্। রত্নার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো। কেবল একটি মাস আগে যে রত্নাকে এখানে রেখে গেছে সে রত্নায় এ রত্নায় যেন কোন মিল নেই। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না প্রদীপ।

পিঠের একপাশে অসহ্য ব্যথা। টেমপারেচার দুই। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে অসহায়ের মতো। রত্না জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেও টের পাচ্ছিল কে এসেছে ঘরে। লজ্জায় অভিমানে ঘৃণায় প্রদীপের দিকে ফিরে তাকাতেও ইচ্ছে হলো না আজ। যে প্রদীপকে একদিনের জন্যও চোখের আড়াল করতে এতদিন মন চাইতো না, আজ সে প্রদীপকে বিদেশে রোগশয্যার পাশে পেয়েও চোখ মেলে দেখতে প্রবৃত্তি হলো না। ঠিক এমনি সময় কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে প্রদীপকে চলে আসতে হলো।

সন্ধ্যার পর জ্বর এক ডিগ্রি নেমেছে। প্রদীপ দ্বিধা-জড়িত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলো। এরকম রোগীকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পেলো না সে। রত্না কখন একটা কথা বলবে সে—আশায় অধীরভাবে শিয়রের কাছে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। রত্না পাশ ফিরতেই প্রদীপ জিজ্ঞাসা করলো—কেমন আছ? রত্না আনমনাভাবে কোনদিকে চেয়ে আছে সে নিজেও জানে না। প্রদীপ প্রশ্নের কোন জবাব পেলো না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললো,—এই যে রত্না, আমি এসেছি।

রত্না হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। নিজেকে খানিকটা সংবরণ করে বললো,—কে বলেছে তোমায় আসতে? আমি তো বলিনি!

—আহা হা কাঁদছ কেন? শোন।—স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললো প্রদীপ।

—নতুন করে কি শুনবো; সব শুনেছি। আমার এত বড় সর্ব্বনাশ কেন করলে বলো।

—সব বলবো। কেঁদোনা, সুস্থ হয়ে ওঠো, তারপর সব বলবো।

রত্না কান্না কোনক্রমে রোধ করে বললো—সুস্থ হয়ে লাভ কি আমার। আমাকে কেন বাঁচিয়ে তুললে তুমি? মরে গেলেই তো তোমার পথ নিষ্কণ্টক হতো।

—তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যেই তো—

কথাটা শেষ করবার আগেই রত্না বাধা দিয়ে বললো, থাক থাক, আর বলতে হবে না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলো, তোমাকে বলেছিলাম আবার বিয়ে করতে সংসার করতে; তুমি আমার কথা রেখেছ। বুঝলে না—এ কথা কোন মেয়েই প্রাণ থেকে বলে না! এটা একটা কথার কথা। বলতে বলতে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। তখন অস্থিচর্ম্মসার দেহের চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।

আমি সব বুঝেছি। তুমিই ভুল বুঝে—

রত্না রূঢ়স্বরে বলে উঠলো, যাও—কোন কথা শুনতে চাই না। তোমার মুখ দেখতে আর ইচ্ছে হয় না। যে মুখ দিয়ে এতদিন কত প্রেমের কথা শুনিয়েছ, আমাকে আদর করে ডেকেছ—সে মুখ দিয়ে তোমার বিয়ের কথা বলবে—হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ বোবা মেয়ের সাথে বিয়ের কথা বলবে, আমাকে তাই শুনতে হবে?

থামাতে চেষ্টা করেও পারলো না প্রদীপ। প্রবল উত্তেজনায় মাথাটা একটু তুলেই অস্ফুটভাবে কি বলতে গিয়ে হঠাৎ বিছানায় পড়ে গেল রত্না। এক নিমেষে স্বামীকে প্রাণ ভরে দেখে নিলো। প্রদীপ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। চীৎকারে কান্নায় সবাই ছুটে এলো। সব শেষ!

চাপা কান্না বুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো প্রদীপ। পার্ব্বত্য অঞ্চলে উন্মাদের মতো ঘুরতে লাগলো দিনের পর দিন। দেশে ফিরবার কোন তাগিদ নেই। ফেলে আসা জীবনের কোন আকর্ষণই নেই প্রদীপের কাছে আজ। শাশ্বতী?—দূর! যতক্ষণ রত্না ছিলো, ততক্ষণই শাশ্বতী; এখন রত্না নেই শাশ্বতীও মিথ্যা।

কার্শিয়াঙ্ সেনাটোরিয়াম থেকে নার্সটি শিবনগর চিঠি দিয়ে জানালো সব ঘটনা। শাশ্বতীর বাবার কানে গেল সব। কোন কথা শাশ্বতীকে বলেননি। শাশ্বতী আভাষে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে স্বামীর কথা। জিজ্ঞেস করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লো, অথচ কোন উত্তর পেলো না—তখন আকুল দৃষ্টিতে একদিন সজল চোখ তুলে বাবার মুখের দিকে অসহায়ের মতো তাকালো। বোবা মেয়েকে আর বৃথা ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন না তিনি। বললেন, সুখ তোর সইবে কেন মা, বোবা হয়ে জন্মেছিস বোবা কান্নাই তোকে কাঁদতে হবে জীবনভর।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ণ হ'ল আজি;
নির্বাণের সিংহাসন হতে এস নেমে,
সময় আগত এবে, পুণ্য তথাগত!
তব নির্বাণের ভাষ্য নতুন করিয়া
মোদের বুঝায়ে দাও।
নির্বাণে নহে তো
জড়পিণ্ডের শাসন, নহে তো অলস
ঘুমঘোর, নহে তো সে-অহিংসার বাণী
যা মোদের কর্ণে কর্ণে দিয়েছে ঢালিয়া
সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ লক্ষ ভাষ্যকার!
দুর্বলতা আসে যবে জাতির কল্যাণ
পথে; ঘোর ক্লৈব্য উঞ্ছসম ঘুরে যবে
ভিক্ষাপাত্র হাতে পৃথিবীর দ্বারে
দ্বারে নিবারের-কণাতুষ্ট কিংবা
রিক্ত হাতে; শারীর সাধনা, মনোবল
হারায়ে বসে সে যবে; লুব্ধ পঙ্গুদল
স্বর্ণলোভে সকল নৈতিক মানে দিয়া
জলাঞ্জলি, পতঙ্গের প্রায় বিধ্বংসের
জ্বলন্ত শিখায় যবে পতন-উন্মুখ—
তোমার কল্যাণ-ব্রত কর উদ্‌যাপন,
হে বীর পরম শান্ত, পুনঃ জন্ম লভি
মুমূর্ষু এ ধরার প্রাঙ্গণতলে আজি।

বুদ্ধচরিত

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্হৎকে আমার প্রণতি জানাই। স্বয়ং বিধাতা পরাজয় স্বীকার করেছেন এঁর কাছে। বিধাতা শ্রী বা লক্ষ্মীর স্রষ্টা। শ্রী রূপিণী নির্ব্বাণ লক্ষ্মীকে সৃষ্টি করেছেন অর্হৎ। প্রণম্য অর্হৎ ভানুমান জয়ী। কারণ সূর্য্য দূর করে যে অন্ধকার তাহা ক্ষণস্থায়ী, অন্ধকারকে সম্পূর্ণ জয় সে করতে পারেনা। কিন্তু অজ্ঞানরূপী যে অন্ধকার দূর করেন অর্হৎ তাহা চিরস্থায়ী। চন্দ্রদেব পরাজয়-বরণ করেছেন অর্হতের কাছে। কারণ যে নিদাঘের ক্লান্তি অপনোদনে সে প্রয়াসী, তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হতে পারেনা।(১)

আজ হতে বহুদিন পূর্ব্বে মহর্ষি কপিলের এক প্রিয় নগরী ছিল। ইহার সৌন্দর্য্য ছিল তুলনারহিত। নগরীর সীমান্তে ছিল মেঘমালার মত বিশাল বনরাজির বিস্তার। গগনস্পর্শী ছিল এই নগরীর প্রাসাদ শ্রেণী।(২)

কৈলাসশৈলশিখরের সহিত কপিলবস্তু নগরীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যেত। কৈলাসের মতই উক্ত নগরী ছিল শুভ্র সৌন্দর্য্যে পরিপ্লুতা, পর্ব্বতের উচ্চ সীমায় ছিল সমাসীনা। এতে মেঘের দল যে কৈলাস ভেবে ভুল করে এসে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! কপিলবস্তু নগরী মেঘের দলকে মাথায় ধারণ করে কৈলাসশিখরের সঙ্গে আরও সাদৃশ্য বহন করেছিল।৩

দারিদ্র্যের স্থান ছিলনা কপিলবস্তুতে। কারণ উজ্জ্বল রত্নপ্রভায় দারিদ্র্যের অন্ধকার কোথায় মুখ লুকিয়েছিল। মনে হত যেন বিত্তশালী নাগরিকদের সংস্পর্শে এসে ভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর মুখের মৃদু হাসিটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে।৪

সেখানে আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যেত তার তুলনা জগতে কোথাও মেলে না। কপিলবস্তু নগরীর প্রতিটি গৃহ যেন পরস্পরের সঙ্গে সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রতিগৃহের দ্বারে ছিল রত্নখচিত তোরণ-বেদিকা, তার চারিকোণে সিংহমূর্তি গ্রথিত ছিল। এগুলি সীমাহীন সৌন্দর্য্য বিস্তার করেছিল।৫

এত আমরা সকলেই জানি যে পদ্মিনীর দল সূর্য্যের প্রিয়বান্ধবী, আর চন্দ্রের সঙ্গে আছে তাদের চিরশত্রুতা। চন্দ্রের সমস্ত মাধুর্য্যটুকু হরণ করে নিয়েছিল কপিলবস্তু নগরীর রমণীকুলের মুখমণ্ডলগুলি। এই চন্দ্রের সৌন্দর্য্য পদ্মের শোভাকে হার মানিয়ে দিয়েছিল। সূর্য্য কমলকলির প্রিয়তম,*যেন এ অপমান সইতে না পেরে সমুদ্রবুকে জ্বালা জুড়াতে অবগাহন করে—শেষে পশ্চিম গগন পারে অস্ত গেল রজনীনাথ।৬

সেই নগরীতে শাক্যবংশোদ্ভব (বা ইক্ষ্বাকুবংশীয়) রাজারা রাজত্ব করতেন। ইন্দ্রের অমরাপুরী ত অনেক দূর সেই কপিলবস্তু নগর হতে। তাই এখানকার প্রজারা মনে করত, "শাক্যবংশীয় রাজাদের যশ অপহরণ করে ইন্দ্র আজ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।" তারা তাই শুভ্র পতাকা উড়িয়ে যেন স্বর্গপুরীতে ইন্দ্রের চুরী করা যশের কলঙ্ক মুছিয়ে নিতে চেয়েছিল।৭

দিনে এবং রাতে—সকল সময় কপিলবস্তু গৃহগুলি দিব্যশোভাময় হয়ে থাকত। কোনখানে তার ছিল রজতময় গৃহ, কোনখানে সোনার হর্ম্য। দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণ অঙ্গে মেখে নিয়ে তারা ধারণ করেছিল সোনার কান্তি, সূর্য্যপ্রিয়া পদ্মিনী—সূর্য্যকিরণই যার প্রাণ, তাকে যেন তারা পরিহাস করত। রাত্রিতে রৌপ্যময় গৃহগুলি চন্দ্রকিরণের শুভ্রতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। চন্দ্রৈকজীবিতা কুমুদিনীকে পরিহাস করত তারা।৮

সেই নগরীতে শুদ্ধোদন নামে এক সূর্য্যবংশীয় রাজা রাজত্ব করতেন, নৃপকুলে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। যেমন পদ্মবীজকে ধারণ করে পদ্মেরা, সেইরকম কপিলবস্তু নগরীও রাজকুলোত্তম শুদ্ধোধনকে বক্ষে ধারণ করেছিল।৯

শুদ্ধোদনের মাঝে বিরোধী গুণসমূহের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ভূভৃৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েও সপক্ষ

ছিলেন। (ভূভৃৎ অর্থে পর্ব্বত এবং রাজা, সপক্ষের এক অর্থ পক্ষ সহিত, অন্য অর্থ মিত্রশক্তি সমেত)। তিনি অনেক দান করেছিলেন, কিন্তু কোন গর্ব্ব বা অহঙ্কার তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। এর অন্য অর্থ গ্রহণ করে বলা যায় কপোলনিঃসৃত বারিধারা মদ সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি ঈশ বা শঙ্কর হয়েও সমদৃষ্টি বা সমনেত্র ছিলেন (অত্রিনেত্র)। অপর অর্থে বলি, তিনি অপার ঐশ্বর্য্যশালী হয়েও ধনী দরিদ্র কাহারও প্রতি পক্ষপাতযুক্ত ব্যবহার করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৌম্য প্রকৃতি বিশিষ্ট, অপ্রতিহত ছিল তাঁর প্রভাব।১০

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন শত্রুদের সহিত তাঁর সংগ্রাম শুরু হত, তখন মত্তহস্তীসদৃশ সেই বীর রাজারা সমরাঙ্গনে লুটিয়ে পড়তেন। কণ্ঠে তাঁদের যে মুক্তার মালা শোভা পাচ্ছিল, ছিন্ন হয়ে সেগুলি ছড়িয়ে পড়ত রণভূমিতে। মনে হোত যেন তাঁরা শ্বেতপুষ্প দ্বারা শুদ্ধোদনকে পূজা করছেন। গজমুক্তা বিরাজ করে হস্তী শিরে, শির বিদীর্ণ হলে সে মুক্তা মাটিতে লুটায়।১১

শত্রুরা যে সমস্ত চলার পথ নষ্ট করে দিয়েছিল, রাজা শত্রুদের বধ করে আবার নতুন করে প্রজাদের জন্য মার্গ নির্মাণ করে দিতেন। যেমন সূর্য্যগ্রহ উপগ্রহদের সরিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল ভাস্বর স্বরূপে প্রকট হয়ে থাকে, তেমনি ছিল রাজা শুদ্ধোদনের তেজস্বিতা। তার প্রভাবে প্রজাদের পথ তিনি উজ্জ্বল করে দিতেন।১২

ধর্ম, অর্থ ও কাম—মানব জীবনের থাকে তিনটি প্রধান অবলম্বন। রাজা শুদ্ধোদনের ক্ষেত্রে এই ত্রিবর্গের কোনটি অন্য রূপ লাভ করেনি, যথা ধর্ম অন্ধ গোঁড়ামীতে, অর্থ অহেতুক সঞ্চয় লোভে, কাম লালসাময় উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়নি। পরন্তু তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে উচ্চ সিদ্ধি-লাভের জন্য দীপ্ততর হয়ে উঠেছিল।১৩

যেমন চন্দ্রদেব বহু নক্ষত্রবেষ্টিত হয়ে নভোমণ্ডলে বিরাজ করেন রাজা শুদ্ধোদন বহুসংখ্যক জ্ঞানীগুণী (উদার সংখ্যা) অমাত্য সমেত হয়ে বিদ্যমান থাকতেন। উদার ছিল রাজার প্রকৃতি। মন্ত্রীমণ্ডলীর সংখ্যা যেমন ছিল পর্য্যাপ্ত, তেমনি বিদ্যাবত্তাও ছিল অগাধ। সুতরাং তারকা বেষ্টিত সুধাকরের সঙ্গে রাজার যে সাদৃশ্য থাকবে তাতে আশ্চর্য্য কিছু নেই।১৪

রাজা শুদ্ধোদনের যিনি সহধর্মিণী পট্টমহিষী ছিলেন—তিনি আপন মহত্ত্বে পতিরই সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন। রূপে ইনি অতুলনীয়া। স্বামীর অপূর্ব্ব দিব্য-কান্তি মহারাণীর রূপলাবণ্য বৃদ্ধি করতে সহায় হয়ে উঠেছিল। দেবীর নাম ছিল মায়া—সমগ্র রমণীকুলে তিনি ছিলেন সর্ব্বোত্তমা। নামে 'মায়া' হলেও মায়া বা মোহ-জাল হতে আপনি ছিলেন মুক্ত।

রবিপ্রভা যেমন অন্ধকার দূরীকরণে সমর্থ হয়, রাণীর সৌন্দর্য্যকান্তি তেমনি তমোরূপী পাপ দূরীকরণে সমর্থ ছিল। সর্ব্বপাপ হতে তিনি ছিলেন স্পর্শরহিত।১৫

বর্ষ হোতে বর্ষান্তরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধ তুমি ছিলে একদিন জননী আমার।
মৃত সন্তানের দল অঙ্কে নিয়ে কর আজ হাহাকার
বুকফাটা বেদনায়। রাত্রির প্রপাতে নামে বিষণ্ণতা,
সভ্যতার রাজপথে নিত্য নিপীড়নে কাঁদে স্বর্ণলতা।
সন্দেহ বিমূঢ় চিত্তে হোলো আসা
বর্ষ হোতে বর্ষান্তরে,
পাখীর কাকলী-হারা নব দিনে হের পল্লব নিকরে,
বাস্তহারা মানুষের প্রাণের কম্পন ছিন্ন ঝুলি লয়ে ;
বিষাদের পথ হেঁটে তারা এলো বাতাসের মত হয়ে
দুপুর নিশীথে।
বিবর্ণ পাণ্ডুর নভে ডুবে গেছে চাঁদ,
কে জানে ফুরাবে কিনা তোমার আমার
এই কালো রাত।
পিশাচের হাত হোতে দুর্বিপাকে পেলেনাকো
মুক্তি যারা,
তারা দূরে করে আর্ত্তনাদ ওই শোনো—
দেবেনাকি সাড়া ?

শোণিত সাগরে চলে কাল যাত্রা বুঝি। ব্যর্থ আবেদন,
নিরুপায় প্রাণীদের ভয়ার্ত্ত পরাণে নিয়ত চিন্তন।
এ দুর্দ্দিনে অবতার পুরুষের নাহি আর আবির্ভাব,
তোমারে ঘিরিয়া রহে শত শত্রুদল—জান্তব উত্তাপ।
রুদ্ধ কণ্ঠে গুমরিছে মহাজীবনের আদর্শের বাণী,
ভাগ্যের দেবতা তব পলায়েছে দূরে যবনিকা টানি।

মালভূমি উপত্যকা রক্তস্নাত হয়ে নিঃশব্দ বধির,
বাসন্তী লক্ষ্মীর দীপে জ্বলেনাক তব জীবন মন্দির।
তুষার ধবল শীর্ষে সুযোগ সন্ধানী পঙ্কবাহিনী,
পরিণামহীন নগ্ন প্রেমে সমাচ্ছন্ন বীভৎস কাহিনী।
শোনো মাগো চতুর্দ্দিকে অবরোধ তরে গুপ্ত অভিযান,
ভয়াবহ ক্ষণে শত নিদ্রালু প্রহরী—মোরা ম্রিয়মান।
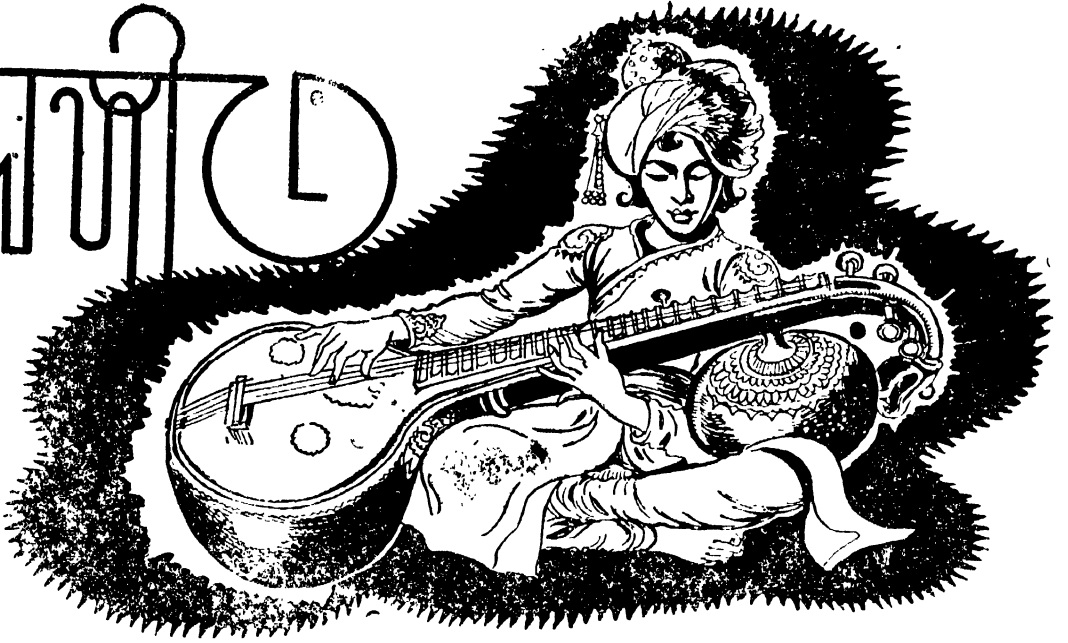
গান

তোমার সমাধি পরে যে নাম লিখেছি আমি
জানি সে তো চিরদিন থাকিবে ;
স্মৃতির ফলকে শুধু সেদিনের পরিচয়
হৃদয়েতে নিয়তই জাগিবে।
সে জাগার কবে শেষ হবে বলো ?
অসহন হিয়া কাঁদে ছলো ছলো
বনানীর তরুতলে অঝোরে ঝরিয়া মরে
কামিনী যামিনী প্রিয়া কাঁদিবে ॥

কথা ঃ শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায় সুর ও স্বরলিপি ঃ ভূপেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ১ ২´ ৩
II প্সা সা সা পা | মা প্া সা সা | ন্া প্া রা রা | মজ্ঞা মা রা সা I
তো মা র স মা ৽ প রে যে না ম্ লি খে ছি আ মি

০ ১ ২´ ৩
রণা রা মা পা | মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা | া বা ন্া রা | সা া া া I
জা নি সে তো চি র দি ন্ ৽ থা ৽ কি বে

৩
পা জ্ঞমা সা মা | রা সা দ্না প্া | নম্া প্সা দ্ন্া প্া | সা ন্া র্সা সা I
স্মৃ তি র্ ফ ল কে শু ধু সে দি নে র প ৽ রি চ য়

০ ১ ২´ ৩
সা রা রা রা | মজ্ঞা মা পা না | । রা না রা | সা । । । II
হৃ দ য়ে তে নি য় ত ই ০ জা ০ মি বে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
II মা পা পা নদা | না দা না পা | না র্সা র্সা র্সা | র্ণা র্সা র্সা র্সা I
সে ০ জা গা ০ র্ ক বে শে ০ ষ হ্ বে ০ ব লো

০ ১ ২´ ৩
ণা ণা র্সা র্সা | র্রা র্রা র্রসা র্রা | র্মজ্ঞা র্মজ্ঞা মা র্মণা | র্রা নর্সা মর্সা র্সা I
অ স ০ হ ০ ন হি য়া কাঁ দে ছ লো ছ ০ ০ লো

০ ১ ২´ ৩
ণদা না পা পা | মা মপা পা পা | পা র্রা র্রা র্রা | র্সা র্সা র্রা র্রা I
ব না নী র ত রু ত লে অ ঝো রে ঝ রি য়া ম রে

০ ১ ২´ ৩
র্মজ্ঞা র্মা র্রা র্সা | দণা পা পা জ্ঞমা | । রা ণ্া রা | সা । । । II
কা মি নী যা মি নী প্রি য়া ০ কাঁ ০ দে বে ০ ০ ০

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(সংস্কৃত রথোদ্ধতা ছন্দানুকরণে)

দেশটা খণ্ড করি' ভাঙ্‌লো শক্তি জোর,
মারতে পৃষ্ঠে ছুরি করলো ঘৃণ্য কাজ !
লণ্ড ভণ্ড হেরি' তীব্র দুঃখে ঘোর
পূর্ণ মুক্তিকামী চিত্ত
কাঁদছে আজ !

হোম্‌রা-চোম্‌রা নহে, মধ্যবিত্ত দীন ;
বিদ্যা অর্জ্জনেতে চাক্‌রি-বাক্‌রি মূল ;
পুত্র কন্যা নারী জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ,
নিত্য খাচ্ছে 'খাবি',
দেখ্‌ছে সর্ষেফুল !

মস্ত মস্ত মাথা মজ্‌লো ধাপ্পাতেই,
তাই তো দেখছে সবে তীব্র অন্ধকার !
পূর্ব্ববঙ্গে বড় হিন্দু আর তো নেই,
ভাগ্যবন্ত যারা লয় কে খোঁজ কাহার !

ওড্র মদ্রদেশে, কেউ বা কোচবিহার,
দিল্লী মধ্যদেশে, কেউ বা বর্দ্ধমান,
হুগ্‌লী হাওড়া যেয়ে বাঁধ্‌লো ঘর এবার,
কেউ বা কাঁচড়াপাড়া করলো দর্‌দালান !

হায় রে সব তো ছিল, কই সে ক্ষেত্‌ খামার !
আম্রকুঞ্জে ঘেরা সুশ্রী দেশটি কই !
কই সে দুগ্ধ খাঁটি, মৎস্য দীর্ঘিকার !
অদ্য বক্ষ ফাটে, আর তো সেই সে নই !

চল্‌তে ফির্‌তে পথে, রইতে নিজ নিবাস
শান্তি পাইনে কভু, আর তো পাইনে সুখ !
ভগ্ন বঙ্গে এলো একটা সর্ব্বনাশ,
জম্‌লো চিত্তাকাশে বজ্রযুক্ত দুখ !
সূর্য্য তেম্‌নি আজো উঠ্‌ছে ডুব্‌ছে বেশ,
রাত্রে চন্দ্র হাসে, পুষ্প কুঞ্জময়,
বৃক্ষে গাইছে পাখী, আর তো নাই সে দেশ !
ভাব্‌লে আর্ত্তনাদে চিত্ত চূর্ণ হয় !

বর্ষবাণী

উপানন্দ

তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হোক। জ্ঞানার্জ্জন ভিন্ন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। সৎকার্য্য করলে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যায়। যারা সত্যাশ্রয়ী, তারা অবিশ্রান্তভাবে ঈশ্বরের করুণাধারায় স্নাত হয়। ভগবৎপ্রেম যে সব গ্রন্থ পাঠে লাভ করা যায়, সেই সব গ্রন্থই তোমরা পড়বে। বিদ্যাই অমূল্যধন। ধনৈশ্বর্য্যও সম্পত্তি অমূল্য বস্তু নয়। পণ্ডিতব্যক্তি জ্ঞানের আকর। সর্ব্বকালে জ্ঞানীগুণীব্যক্তির আসন সবার উপরে। যাঁরা প্রকৃতজ্ঞানী তাঁরা সহজ সরল ভাষায় তাঁদের বাণী দিয়ে থাকেন—যাতে সবাই বুঝতে পারে। চরিত্রের নির্ম্মলতা ভিন্ন সত্যদর্শন হয় না। আত্ম-সংযমের চেয়ে শ্রেষ্ঠসম্পদ পৃথিবীতে নেই। ভীরুতা মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস। ভয় ত্যাগ করে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা কর। ক্রোধী হওয়া ভালো নয়, তাতে শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়। ক্রোধীব্যক্তিদের শরীরই ব্যাধিমন্দির। সুখেদুঃখে সর্ব্বদাই প্রসন্নতা অবলম্বন করবে। নম্রতা, শিষ্টাচার, মধুর ভাষণ ও সৎপ্রসঙ্গ ভিন্ন জীবনের উন্নতি হয়না। ঔদ্ধত্য ত্যাগ করবে। উদ্ধত-ব্যক্তিদেরই শত্রু বেশী। অলসব্যক্তি শুধু নিজের ক্ষতি করেনা, সমাজেরও ক্ষতি করে। অলসব্যক্তি ধনী হোলেও শেষে সহস্র দুর্গতি পেয়ে মৃত্যুকে বরণ করে। নৈরাশ্য মানুষের সর্ব্বনাশের মূল। জ্ঞানগুণী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত তা'তে ফল ভালো হয়, মানুষের মত মানুষ হওয়া যায়। সৎসংসর্গ ভিন্ন আত্মিক শক্তিলাভ হয় না। স্বাস্থ্যই সর্ব্বোত্তম উন্নতির পক্ষে একমাত্র সহায়ক। অসৎ-সংসর্গে মিশলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। যারা বাক্‌সর্ব্বস্ব, তারা লোকের উপকার করে না। মনই সব। যার মন ভালো, তার অবনতি হয় না। যে ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ সেই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ করে। প্রত্যহ ঈশ্বর উপাসনা, ভজন ও ও প্রার্থনা দ্বারা দৈবশক্তি লাভ হয়। এই শক্তিবলে মানুষ জগতে অসাধ্য সাধন করতে পারে। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের নামই শিক্ষা। সেই শিক্ষা তোমাদের অর্জ্জন করতে হবে।

পবিত্রতাই সত্য। কায়মনোবাক্যে পবিত্র হবার চেষ্টা করলে তোমাদের মধ্যে ভগবৎশক্তি সক্রিয় হয়ে উঠবে। দুর্ব্বলতাই মানুষকে কুপ্রবৃত্তি দেয়, আর কুপ্রবৃত্তি-বশে মানুষ অপরের ক্ষতিকর। সহস্রদুঃখ দুর্ভোগের স্রষ্টা শারীরিক দুর্ব্বলতা। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করলে অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তির স্ফুরণ হয়, অসাধারণ প্রতি-ভাবান হওয়া যায়। তোমরা যদি বাল্যকাল থেকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে উন্নতচরিত্র গঠন করতে পারো, তা হোলে তোমাদের বিশাল শক্তির সম্মুখে পৃথিবীর সর্ব্ব-প্রকার দানবীয় শক্তি খর্ব্ব হয়ে যাবে। আজ ভারতবর্ষের ক্লীবতা, নৈতিক অধঃপতন ও ভীরুতার একমাত্র কারণ তার সন্তানেরা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে• আদর্শচরিত্র গঠনে

পরাঙ্মুখ। ভারতবর্ষের সাধনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে যে সব মহান্ আদর্শ ও অধ্যাত্ম শক্তি রয়েছে সে গুলিকে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত শুধু স্বাধীনতা ও যন্ত্রবিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের দ্বারা জড়বাদের উপাসনা আমাদের কোন দুঃখ দূর করতে পারবে না। যত দিন দেশের যুবশক্তির চরিত্র উন্নত আদর্শে না গঠিত হবে, যতদিন স্বার্থগৃধ্নু পিশাচের দল জনসমাজকে মরণের মুখে তুলে দিয়ে নিজেরা সুখৈশ্বর্য্যের ভেতর তাণ্ডবনৃত্য করবে, যতদিন তোমরা না মানুষের মত মানুষ হয়ে স্বদেশ ও সমাজের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের ভার গ্রহণ করবে, ততদিন ভারত মাতাকে অরণ্যে রোদন করে দিন কাটাতে হবে। তোমাদের জীবন প্রভাতের সূর্য্যোদয় হয়েছে কিছুকাল আগে,—সেই সূর্য্য ক্রমে মধ্যাহ্নের দিকে যাত্রা সুরু করেছে। এই সময়টিকে বৃথা নষ্ট করোনা, তোমাদের ভেতর যে হৃদয়ের শতদল রয়েছে, সেটিকে পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করো আদর্শ চরিত্র সাধনার মাধ্যমে। আজ উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল, আজ রাজসিক ভোজের উপরে অগণিত ক্ষুধিত মানুষের অশ্রু জল, আজ মুদ্রাস্ফীত মানুষের আনন্দভবনের উপরে মহাকালের বাহন কালো পেচার ডাক। জাতির এই বিয়োগান্তক দৃশ্য বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের ওপর প্রত্যক্ষ হচ্ছে। তাই তোমরা শপথ করো এই নববর্ষে—'আমরা ঘুচাব মা তোর দুঃখ, মানুষ আমরা নহি ত মেষ। দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ—'

ভারতের ক্লৈব্য দূর হোক তোমাদের অমোঘ বীর্য্যে। দেশপ্রেমই মহৎ ধর্ম্ম। যে কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ করতে হোলে গভীর মনসংযোগ আবশ্যক। ঈশ্বর ধ্যানের অভ্যাস করলে চিত্তসংযম হয়। চিত্তসংযম ভিন্ন আত্মোন্নতি করা যায় না। চিন্তা শক্তির যথেষ্ট মূল্য আছে। সৎ ও উচ্চ চিন্তা করলে জীবন ও উচ্চস্তরে গিয়ে পৌছুবে। ছেলে বেলা থেকেই সর্বপ্রকার কুঅভ্যাস, কুসংসর্গ ও কুচিন্তা ত্যাগ করলে জগতে বড় হওয়ার পথ মুক্ত হয়। কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি একত্র হয়ে চরিত্র গঠন করে, সুতরাং অভ্যাসগুলির দিকে বিশেষ নজর দেবে। যা অভ্যাসে পরিণত হয়, তা ত্যাগ করা কঠিন। বাক্ চাতুর্য্যের দ্বারা ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় না। যাঁরা সদ্গুণের আধার, বাক্‌সংযমী, সত্যপরায়ণ ও আদর্শবান, তাঁদেরই মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। মানুষ হবার জন্যেই শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষিত হয়ে যে মানুষের মধ্যে মমত্ববোধ নেই, পরার্থপরতা বোধ নেই, মানবিকতার প্রকাশনেই, কেবল আছে অহংমন্য ভাব ও দম্ভ, সে মানুষের শিক্ষালাভ ব্যর্থ। সহিষ্ণুতা পরম ধর্ম্ম। যদি কেউ বিনা দোষে আক্রমণ করে, তোমরা পিছু হটে আসবে না, আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবার জন্যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। সহস্র বাধাবিঘ্ন বিপত্তি ঠেলে দিয়ে উচ্চ লক্ষ্য পথে অগ্রসর হোতে হবে। যাঁরা কর্ম্মবীর তাঁরা বিঘ্ন বিপদ তুচ্ছ করেছেন, তাঁরা সাধনার দ্বারা শক্তিলাভ করে পৃথিবীতে অমর কীর্ত্তি রেখে গেছেন। আত্মাধারী মানুষ জীবনে কোন দিন উন্নত হোতে পারে না, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কোন রকমে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এসব মানুষকে কেউ অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করেনা। প্রাণের সঙ্গে উচ্চ ভাবের আনন্দ সম্মিলন না ঘটলে জীবনে কোন মহত্তর আদর্শের আলোক সম্পাত হয়না। পরানুকরণে মত্ত হয়ে আত্মবিস্মৃত হোলে, নিজের অস্তিত্ব ও মর্য্যাদা বিলুপ্ত হয়। জনগণের দারিদ্র্য মোচনে প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, গ্রাম সংগঠন ও জাতীয়তা বোধ প্রভৃতির দিকে তোমাদের লক্ষ্য হোক্। বাঙলা ও বাঙালীর ভাগ্য আজ রাহুগ্রস্ত। তোমরা আমাদের সৌভাগ্য সূর্য্যকে রাহুমুক্ত করো। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তোমাদের তারুণ্যশক্তি মহাশক্তিতে পরিণত হোক। তোমরা অনন্ত শক্তির আধার। সমস্ত বাধাবিঘ্ন পদদলিত করে তোমরা নবীন ভারত গড়ে তোলো সিংহ-সাহসিকতা নিয়ে। আজ শুভ নববর্ষে তোমরা আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো।

আলেকজান্দার ডুমা
রচিত
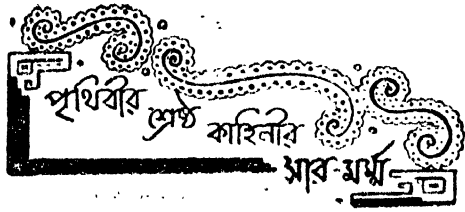
দী কাউণ্ট অফ্ মণ্টি ক্রিস্টো

সৌম্য গুপ্ত

(২)

যেদিন এডমণ্ড দান্তের সঙ্গে মার্সেডিজের বিবাহ হবে, তার আগের দিন ডাঙ্গ্লার্সে'র লেখা চিঠিখানি পৌঁছুলো সরকারী আদালতের বিচারকের হাতে। সে চিঠি পাবার ফলে, তার পরের দিন বিবাহের আবঘণ্টা পূর্ব্বে দান্তের বাড়ীর সদর-দরজায় সহসা করাঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র শান্ত্রী-প্রহরীর আবির্ভাব!

সদর-দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দান্তেকে দেখামাত্র সরকারী শান্ত্রী-প্রহরীরা তাকে প্রশ্ন করলে,—এ বাড়ীতে দান্তে, কার নাম?

দান্তে বললে,—আমার নাম।

শান্ত্রীরা বলে,—তোমাকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

দান্তে বললে,—মিথ্যা অভিযোগ!···আমি রাজদ্রোহী নই!

শান্ত্রীরা বললে,—সে সব কথার আলোচনা আমাদের সঙ্গে করে লাভ নেই। গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা আছে তোমার নামে···তোমাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দেবো··আদালতে বলো তুমি—তোমার যা বলবার আছে!

সরকারী-আদালতে ছঁদে-হাকিম জেরার্ড দ্য ভিলে-ফোর কাছে বিচার। জেরার্ড ছিলেন পরম রাজানুরক্ত··· কিন্তু তাঁর পিতা মঁশিয়ে নোর্ত্তিয়ার্ ছিলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ত্তের গোঁড়া ভক্ত।

দান্তের বাড়ীতে খানা-তল্লাসী চালিয়ে সরকারী-শান্ত্রীরা ইতিমধ্যেই এল্‌বা-দ্বীপ থেকে সঙ্গে আনা সেই চিঠিখানি নিয়ে এসে আদালতে দাখিল করেছে··সেই চিঠি দেখিয়ে হাকিম জেরার্ড দান্তেকে প্রশ্ন করলেন,—এ চিঠি তুমি এনেছো এল্‌বা-দ্বীপ থেকে···কাজেই স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে তুমি রাজদ্রোহী বোনাপার্ত্তের দলের লোক!···এ চিঠির সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?

দান্তে দেখলো চিঠিখানি তখনো খামে-আঁটা···সে বললে,—আমি 'ফারাও' জাহাজের 'মেট' (সহকারী-কাপ্তেন) সমুদ্র-পথে দেশে ফেরার সময় জাহাজের কাপ্তেন জাহাজেই মারা যান। অন্তিমকালে তিনি একটি পুলিন্দা (প্যাকেট) আমার হাতে দিয়েছিলেন—এল্‌বা-দ্বীপে সেটি পৌঁছে দিতে! তাঁর অন্তিম-অনুরোধ শিরোধার্য্য করে আমি দেশে ফেরার পথে এল্‌বা-দ্বীপে জাহাজ থামিয়ে পুলিন্দাটি সেখানকার এক লোকের হাতে দিই···তিনি আমাকে খামে-আঁটা এই চিঠিখানি দিয়ে বলেন—প্যারিসে এক ভদ্রলোকর হাতে এটি পৌঁছে দিতে। জাহাজের কাপ্তেনের দেওয়া পুলিন্দার ভিতরে কি ছিল আমি জানি না···এবং এই খামে-আঁটা চিঠিতে কি লেখা আছে, কে লিখেছে—তাও আমার জানা নেই···আমি সেই পুলিন্দা আর এই চিঠির নিরীহ বাহক মাত্র!

দান্তের জবাব শুনে হাকিম জেরার্ড বললেন,—এ চিঠি তুমি যদি দাবী না করো···আমাকে দাও, তাহলে তোমাকে বেকসুর খালাশ দেবো।

চিঠির খামের উপরে মঁশিয়ে নোর্ত্তিয়ারের নাম লেখা···দান্তে বা সরকারী শান্ত্রী-প্রহরীরা বা অপর কেউ জানে না যে নোর্ত্তিয়ার হলেন ছঁদে হাকিম জেরার্ডের পিতা!

চিঠির খামের উপর সুস্পষ্ট-অক্ষরে পিতার নাম লেখা রয়েছে দেখে হাকিম জেরার্ড সশঙ্কিত হয়ে উঠলেন···মনে-মনে চিন্তা করলেন—যে কোনো উপায়েই হোক্, এ

ব্যাপার চাপা দিতে হবে !···দান্তের মুখ থেকে কোনো-মতেই যেন ন্যোর্ত্তিয়ারের নাম না প্রকাশ পায় !

মনের দুশ্চিন্তা গোপন রেখে জেরার্ড আবার দান্তেকে প্রশ্ন করলেন,—এ চিঠির কথা কাকেও তুমি বলেছো ইতিমধ্যে ?···কার নামে এ চিঠি—সে কথা কাকেও জানিয়েছো ?

দান্তে বললে,—না···কার নামে এ চিঠি···সে কথা কাকেও বলিনি।

দান্তের কথা শেষ হতেই, জেরার্ড খাম ছিঁড়ে চিঠি-খানি বার করে নিয়ে আগাগোড়া সেখানি পড়লেন। চিঠি পড়ে জানতে পারলেন যে প্যারিসে বসেই তাঁর পিতা চক্রান্ত করছেন—এল্‌বা-দ্বীপে নির্বাসিত নেপোলিয়ান বোনাপার্তেকে আবার ফ্রান্সে ফিরিয়ে এনে রাজ-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য···তাই এল্‌বা-দ্বীপ থেকে এসেছে তাঁর নামে এ পত্র মারফৎ পরামর্শ।

ব্যাপার জেনে জেরার্ড রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠলেন ···মনে-মনে ভাবলেন—সর্বনাশ ! দান্তের সম্বন্ধে তাহলে তো খুব হুঁশিয়ার হতে হবে ! দান্তে যদি ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে ন্যোর্ত্তিয়ারের নামে এই চিঠির কথা প্রকাশ করে বসে, তাহলে তদন্ত হলেই প্রকাশ পাবে আসল কাহিনী এবং সে কথা প্রকাশ হলে, শুধু ন্যোর্ত্তিয়ারকেই 'গিলোটিনের' নির্মম আঘাতে প্রাণ হারাতে হবে তাই নয়, উপরন্তু জেরার্ডেরও চাকরী যাবে,আর সঙ্গে সঙ্গে 'গিলোটিন' বা সারা জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মনে-মনে এ সব কথা চিন্তা করে জেরার্ড দান্তেকে বললেন,—তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ শুধু এই চিঠি···এ চিঠি আমি ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলছি ! তুমি এ চিঠির কথা কারো কাছে প্রকাশ করো না ঘুণাক্ষরেও···প্রকাশ করলে তোমার মহাবিপদ হবে !···তার চেয়ে বরং···তোমার সম্বন্ধে আমি ভালো ব্যবস্থাই করছি !

এই বলেই জেরার্ড শান্ত্রীদের সর্দারকে ডাকলেন··· ডেকে তার কানে-কানে কি যেন বললেন···তারপর দান্তের পানে তাকিয়ে তিনি বললেন,—এই শান্ত্রীর সঙ্গে তুমি যাও ! এমন গুরুতর অপরাধ তোমাকে এখনি খালাশ দিতে পারি না···সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাজতে থাকবে··· তারপর খালাশ পাবে তুমি !

দান্তের মনে অবিশ্বাসের বাষ্পমাত্র নেই···জেরার্ডের হুকুমমতোই সে চললো সেই শান্ত্রীর সঙ্গে···শান্ত্রী তাকে নিয়ে গিয়ে কারাগারে এক নির্জ্জন কুঠুরীতে বন্ধ করলো।

গভীর রাত্রে সারা দুনিয়া যখন ঘুমন্ত-নিস্তব্ধ, সেই সময় সন্তর্পণে একদল সশস্ত্র প্রহরী এলো দান্তের কারাকক্ষে··· এসে জানালো—হাকিম জেরার্ডের আদেশে তারা এসেছে।

দান্তে বললে,—বলুন, কি করতে হবে ? মনে-মনে তার ধারণা—এবার বোধহয় তাকে খালাশ দেওয়া হবে !

কিন্তু শান্ত্রীরা নিঃশব্দে দান্তেকে কারাগার থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে নদীতে একটা নৌকায় উঠলো !

দান্তে শুধোলে,—কোথায় নিয়ে চলেছো আমাকে ?

শান্ত্রীরা জবাব দিলে,—'শ্যাটো দ্য ইফে-তে' নিয়ে চলেছি তোমাকে !

দান্তে বললে,—কিন্তু হাকিম আমাকে আদালতে বললেন যে···

শান্ত্রীরা শাসালো,—তিনি আদালতে কি বলেছেন তোমাকে, আমরা জানি না···তবে আমাদের উপর হুকুম —'শ্যাটো দ্য ইফে-তে' তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য।

শিউরে উঠে দান্তে বললে,—কিন্তু 'শ্যাটো দ্য ইফে' তো রাজদ্রোহী-বন্দীদের কয়েদখানা ! আমি বিদ্রোহ-আচরণ করিনি···তবে কেন আমাকে সেখানে নিয়ে চলেছো ?··· তাছাড়া হাকিম নিজে আমাকে বললেন যে—সন্ধ্যার পর খালাশ পাবো !

শান্ত্রীরা বললে,—আমরা সে সব কথা জানি না··· আমাদের উপর যে হুকুম, সে হুকুম তামিল করবো !

তারপর···

শ্যাটো দ্য ইফ—চরম অপরাধে অপরাধীদের জন্য এ কারাগার ! সেখানে দান্তেকে একটা নির্জ্জন-অন্ধকার কুঠুরীতে একা রেখে, লোহার কপাটে তালা এঁটে শান্ত্রীরা সবাই চলে গেল।

অজানা-কারাগারের নিরালা-অন্ধকার কুঠুরীতে একা বসে সারা রাত দান্তের চোখে একফোঁটা নিদ্রা নেই··· দেহে-মনে বৃশ্চিকের দংশন-যন্ত্রণা ! দান্তের কি করে যে রাত্রি কাটলো—বলবার নয় ! সে শুধু একা বসে-বসে ভাবছে—কি তার অপরাধ, যার জন্য এমন নির্মম নিদারুণ শাস্তিভোগের ব্যবস্থা !

[ক্রমশঃ
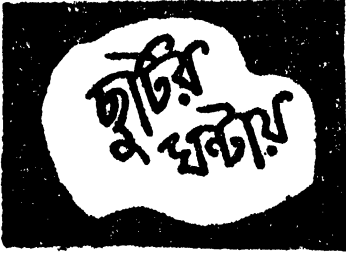
চিত্রগুপ্ত

সিনেমা-হলে বসে ছায়াছবির কত কি বিচিত্র আজব কারসাজি তোমরা আজকাল হামেশাই দেখতে পাও। সে সব ছায়াছবি তোলার এবং দেখানোর জন্য ক্যামেরা, ফিল্ম, প্রোজেক্টার প্রভৃতি বিশেষ-ধরণের এমন অনেক কিছু দামী আর দুর্লভ যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন, যেগুলি সচরাচর জোগাড় করা খুবই অসুবিধার ব্যাপার। অথচ এ সব সাজসরঞ্জাম-যন্ত্রপাতির অভাবে, ছুটির দিনে সিনেমা-হলে না গিয়েও তোমাদের কারো যদি নিজের বাড়ীতে বসে ছায়াছবির কারসাজি দেখার সখ হয়, তাহলে সে বাসনা মেটানোর জন্য নিছক মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে তোমরা এমন কি উপায় ঠাওরাতে পারো, যার ফলে—দিব্যি মজার এবং সম্পূর্ণ নিখরচায় অনায়াসেই সে আনন্দ উপভোগের সুযোগ মেলে?···কথাটা শুনে হয় তো তোমরা অনেকেই ভাববে—এ আবার সম্ভবপর নাকি! যন্ত্রপাতি নেই, সাজ-সরঞ্জাম নেই···ছায়াছবির কারসাজি দেখানো যাবে কি করে!

শোনো, তাহলে সেই মজার উপায়টির কথা। অর্থাৎ, ছায়াছবি তোলার ও দেখানোর বিশেষ ধরণের ফিল্ম, ক্যামেরা, প্রোজেক্টার প্রভৃতি সাজসরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতি না পেলেও, বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের হাতে-কলমে কাজ করে খুব সহজেই কি উপায়ে তোমরা ছুটির দিনে ঘরে বসেই ছায়াছবির আজব কারসাজি দেখার মজা উপভোগ করতে পারো—তারই বিচিত্র রহস্যের কথা বলি। শুনতে অদ্ভুত হলেও, এ কাজ হাসিল করা কিন্তু আসলে এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়···সামান্য চেষ্টা করলেই নিতান্ত-ঘরোয়া টুকিটাকি অল্প কয়েকটি সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটির অভিনব কারসাজি দেখিয়ে তোমরা অনায়াসেই তোমাদের আত্মীয় বন্ধুদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

বিচিত্র-মজার এই ছায়াছবির কারসাজি দেখানোর জন্য সাজ সরঞ্জাম চাই—একটা বড় সাইজের আলপিন বা ছুঁচ, একটা শিশি-বোতলের মুখে-আঁটার ছিপি, একখানা ড্রইং-কাগজ (Drawing paper), এক টুকরো পাতলা-কার্ডবোর্ড, একটি কাঁচি, একশিশি আঠা এবং কয়েকটি রঙীন পেন্সিল।
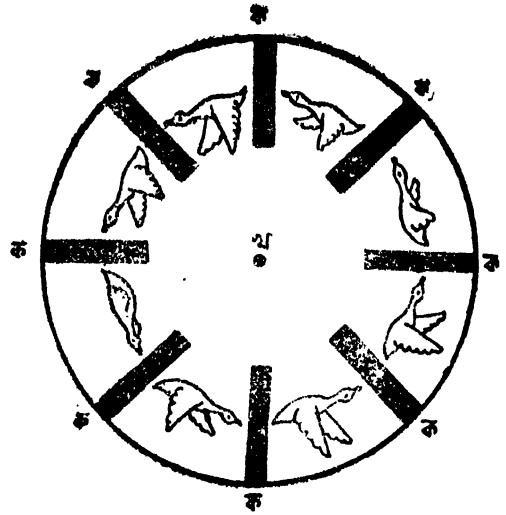
ফর্দমতো সাজসরঞ্জামগুলি জোগাড় হবার পর, উপরের ছবির নমুনা অনুসারে রঙীন পেন্সিলের সাহায্যে ড্রইং-কাগজ-খানির এক দিকে ধারাবাহিকভাবে উড়ন্ত-পাখীর বিভিন্ন ভঙ্গীর নক্সাগুলি পরিপাটি-ছাঁদে 'ট্রেসিং' (Tracing) করে এঁকে নাও। এবারে উপরের ছবির নমুনা-মতো-ছাঁদে উড়ন্ত পাখীর বিভিন্ন ভঙ্গীর চিত্রগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে, একের পর এক প্রত্যেকটি টুকরোকে আঠা লাগিয়ে সেঁটে দাও চক্রাকারে ছাঁটাই-করে-রাখা ঐ পাতলা-কার্ডবোর্ড-খানির গায়ে। পাতলা-কার্ডবোর্ডের বিভিন্ন অংশে উড়ন্ত-পাখীর প্রত্যেকটি ভঙ্গীর প্রতিলিপি আলাদা-আলাদা ভাবে আঠা দিয়ে সেঁটে-বসানোর পর, বিভিন্ন প্রতিলিপির মাঝে উপরের ছবিতে দেখানো 'ক'-চিহ্নিত অংশগুলিকে কাঁচির সাহায্যে আগাগোড়া নিখুঁত-

পরিপাটি ছাঁদে ছাঁটাই করে ফেলা : তাহলেই উড়ন্ত-পাখীর বিভিন্ন ভঙ্গীর 'প্রতিলিপি-চক্র' রচনার কাজ শেষ হবে।

এ কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে সারা হলে, পাত্‌লা-কার্ড-বোর্ডের মাঝখানে অর্থাৎ, উপরের ছবিতে দেখানো 'খ'-চিহ্নিত অংশে লম্বা আলপিন বা ছুঁচটিকে বিঁধে বসিয়ে সেই আলপিন বা ছুঁচের শেষপ্রান্তে শিশি-বোতলের ছিপিটিকে মজবুতভাবে গেঁথে দাও। তাহলেই ঐ চক্রাকারে-রচিত উড়ন্ত-পাখীর বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবিগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখার জন্য দিব্যি চমৎকার একটি 'হাতল' (Handle বা 'দণ্ড' (Revolving Stick) তৈরী হয়ে যাবে।

এবারে উড়ন্ত-পাখীর বিভিন্ন ভঙ্গীর নক্সা-আঁটা কার্ড-বোর্ডের মাঝখানে গাঁথা ছুঁচ বা আলপিনের ছিপি-বসানো দিকটি তোমার বাঁ-দিকের চিবুকের উপর রেখে বড় একখানা দেয়াল-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ডান-চোখটি বন্ধ করে প্রতিলিপি-আঁটা ঐ চক্রাকৃতি কার্ডবোর্ডখানিকে ধীরে ধীরে ঘোরাও। তাহলেই দেখবে—ছবির উড়ন্ত-পাখীটি যেন বিজ্ঞানের আজব-মন্ত্রে দিব্যি সজীব হয়ে উঠে পাখা দুটি নাড়তে নাড়তে সাবলীল-গতিতে শূন্যে উড়ে চলেছে—ঠিক যেমন সিনেমার পর্দায় দেখতে পাও।

এমন আজব-কাণ্ড কেন ঘটে জানো?···এটি আসলে হলো—এক-ধরণের চোখে ধাঁধা লাগানোর কৌশল··· ছায়াছবি বা কার্টুন-ফিল্মের উদ্ভবও হয়েছে বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের চোখে এই বিচিত্র ধাঁধা সৃষ্টির ফলে। অর্থাৎ, মানুষের নজর বা চোখের পলক পড়তে যে সময়টুকু লাগে, তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে একের পর এক উড়ন্ত-পাখীর বিভিন্ন ভঙ্গীর চিত্রগুলি ক্রমান্বয়ে ঘুরে চলে যায় বলেই এমন দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে এবং তাই ধারণা জন্মায় যে ছবিতে-আঁকা পাখীটি যেন বিজ্ঞানের যাদু-মন্ত্রে সহসা জীবন্ত হয়ে উঠে সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে পাখা দুটি নেড়ে শূন্যে বাতাসের বুকে ভেসে চলেছে।

এবারের আজব-মজার খেলাটির এই হলো আসল রহস্য। রহস্যের সন্ধান তো পেলে···এখন নিজের হাতে পরখ করে ছাখো এ খেলার কলা-কৌশল।

—

চতুষ্কোণের হেঁয়ালি :
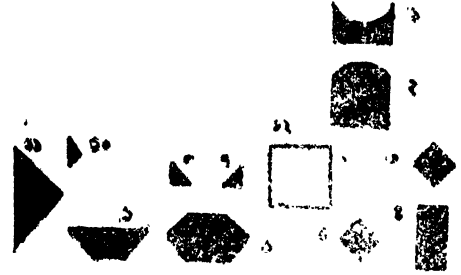
উপরের ছবিতে ছোট-বড় নানান্ ছাঁদের এগারোটি কাগজের টুকরো এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে—দেখতে পাচ্ছো তো। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে ছোট-বড় নানান্ ছাঁদের ঐ এগারোটি কাগজের টুকরোকে এমনভাবে কায়দা করে সাজিয়ে বসাও যে, সেগুলিকে জোড়া দিলে যেন উপরের ছবিতে দেখানো ১২ চিহ্নিত চতুষ্কোণের মতো চারটি আলাদা-আলাদা চতুষ্কোণ রচনা করা যায়। এই আজব হেঁয়ালির সুষ্ঠু সমাধান যদি যথাযথভাবে করতে পারো তো বুঝবো যে তোমরা সত্যিই বুদ্ধিতে পাকা হয়ে উঠেছো। তোমাদের মধ্যে যারা এই হেঁয়ালির সঠিক-সমাধান করে আমাদের দপ্তরে ছবি এঁকে পাঠাবে—পরের সংখ্যায় তাদের নাম-ধাম আমরা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে সবাইকে জানিয়ে দেবো।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত প্রাঁধা :

১। চার অক্ষরে হই—
স্বর্গে আমি রই ;
প্রথম শেষে পাত,
শেষ দুয়েতে জাত ;

দ্বিতীয় খুঁজে ফেলো—
নামটি মোর বলো !

রচনা : রেখা, জ্যোতিপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ (যশপুরনগর)

২। চারি বর্ণে গড়া নাম, দ্বীপ সে সুন্দর ;
শেষ বর্ণ দিলে বাদ—পশু-রাজেশ্বর।
দুই বর্ণ শেষদিকে করো যদি বার—
কত পশু শিরে জাগে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার।
মধ্য দুই বর্ণ ছেড়ে—মৎস্য-বিশেষ,
বলো দেখি, কি বা নাম···ভেবে-চিন্তে বেশ !

রচনা : রীতা ও সীমা বাগচী (কালাহাণ্ডি)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র

১। চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা আজব-জন্তুটির মাথা —হাতীর মতো, গলা—জিরাফের মতো, দেহ—বাঘের মতো, সামনের পা দুটি -হাতীর মতো, পিছনের পা দুটি—ক্যাঙ্গারুর পিছনের পায়ের মতো এবং ল্যাজটি—কাঠ-বেড়ালীর ল্যাজের মতো। এই সব টুকরো জোড়াতালি দিয়ে আমাদের চিত্রকর মশাই বিচিত্র-ছাঁদের আজব-জন্তুটির চেহারা এঁকেছেন।

২। প্রথম—২৭০, দ্বিতীয়—৯০, তৃতীয়—৩০ এবং চতুর্থ—১০ ; মোট ৪০০।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), প্রমীতা ও যশোজিৎ মুখোপাধ্যায় (কাইরো), কুলু মিত্র (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারি ও সুনীল (ভিলাই), সুপ্রিয়া, অলকনন্দা নির্ম্মলেন্দু দাস (কৃষ্ণনগর), নাম হীন (?) কলিকাতা ,

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), মিঠু ও বুবু গুপ্তা (কলিকাতা), শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), বুলা ও সুজিত (কলিকাতা) শাশ্বত-কুমার গোস্বামী (যাদবপুর), বাণী, শুভ্র ও পার্থ হাজরা (আড়ুই শাকনাড়া) কৃষ্ণা, গীতা ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর), সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর),

রবীন্দ্র প্রণাম

শ্রীঅনিন্দ্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভোর না হতেই ভোরের পাখি করল আহ্বান,
করল উষা প্রণাম তোমায়, বর্ষ পেল প্রাণ।
শিশুর মনের খোঁজ পেয়েছ "শিশুই" তাদের কথা,
"ডাক-ঘরেতে" অমল তরে—"ঠাকুরদাদার" ব্যথা।
ছড়ায় ছড়ায় ভরিয়ে দিলে, ভুলিয়ে দিলে মন,
"শিশু ভোলানাথ" তাই তো দেখি কত কাহিনীর বন।
শিশু কিশোরের সাথী ওগো তোমার করি নাম,
বর্ষ-পথে সবুজ দলের লওগো শত প্রণাম।

—

শুধু সখের খাতিরেই নয়, ঝড়-বৃষ্টি বিদ্যুত-বজ্রপাতের দারুণ দুর্য্যোগের মাঝে এমনিভাবে ঘুড়ি উড়িয়েই সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুত-পাতের রহস্যময়-লীলার প্রকৃত-পরিচয় আবিষ্কার করেছিলেন অষ্টাদশ-শতকের এক স্মরণীয় মুহূর্ত্তে। তাঁর এই বিচিত্র আবিষ্কারের ফলেই আজ সুসভ্য-দেশের গৃহ-চূড়ায় 'বিদ্যুত-বজ্রপাত-নিবারক লৌহ-শলাকা' স্থাপনের বৈজ্ঞানিক-রীতির প্রচলন হয়েছে ব্যাপকভাবে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের এই অভিনব-আবিষ্কারের ফলে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বহু চিন্তাশীল-উদ্যোগীপুরুষ সৌখিনভাবে ঘুড়ি-ওড়ানোর বদলে উন্নত বৈজ্ঞানিক-উপায়ে মানুষের হাতের কসরতে আকাশের বুকে ঘুড়ি না উড়িয়ে, বরং ঘুড়ির সাহায্যে শূন্যপথে মানুষকে কিভাবে ওড়ানো যেতে পারে, তারই পরীক্ষা-গবেষণা সুরু করলেন একাগ্র-নিষ্ঠায়। উনবিংশ-শতকের প্রথমভাগে জর্জ্জ পোকক নামে এক পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জমান-তরণী থেকে যাত্রীদের উদ্ধার-কল্পে এবং নভোরাজ্যের বিচিত্র-রহস্যময় তথ্যানুসন্ধানে অনুসন্ধিৎসু-অন্বেষককে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিরাট-ছাঁদের এই ঘুড়িটি উদ্ভাবন করেছিলেন। উড়ো-জাহাজের ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক পোককের উদ্ভাবিত এই অভিনব ঘুড়ির অবদান বিশেষ স্মরণীয়।

দেরাদুনের সবুজ হ্রদে

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গোলোকধাম খেলতে গিয়ে ঘুঁটিটা যখন হরিদ্বারে এসে পৌঁছত তখন স্বর্গের কাছাকাছি আসবার আনন্দে নেচে উঠতাম। সেছিল পূর্ববঙ্গনিবাসী এক বালকের স্বপ্নালোকের রোমাঞ্চ। তারপর দুদশকের তফাতে যেদিন ৪৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের এক প্রভাতে হরিদ্বারকেও চল্লিশ মাইল পেছনে ফেলে দেরাদুন ষ্টেশনে নামলাম সেদিন ছিল পরিণত যৌবনের রূঢ় বাস্তবলোক সামনে।

একে কনকনে শীত, তায় দুদিন থেকে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। যদিও প্রায় কাঁপতে কাঁপতেই ট্রেণ থেকে নামলাম কিন্তু উত্তর দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। ঐত আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হিমাদ্রী শুভ্র মুসৌরী পাহাড়। এর পেছনেই যে মহাকল্যাণময় হিমালয় ভারতবর্ষকে শ্রীমণ্ডিত করে দাঁড়িয়ে আছেন তা অনুভব করে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম, সেদিন অবশ্য আর কোন দিকে তাকাবার সুযোগ হয়নি। আস্তে আস্তে চারিদিক তাকিয়ে দেখেছি। আজও দেখছি। প্রথম দর্শনে যে ভাললাগাটুকু মনে দোলা দিয়েছিল তা আজ ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে।

দেরাদুনের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সিবালিক, চাক্রাতা, মুসৌরী প্রভৃতি ছোট মাঝারি হিমালয়ের গিরি শ্রেণী। সারা দেহেত বটেই, পাহাড়ের গায়ে গায়ে শাল পাইনের সবুজ সমারোহ দেখে প্রকৃতিকে বিলাসী বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। মুসৌরী পাহাড়ে উঠে সামনের দিকে তাকালেই হৃদয়ঙ্গম হয় কেন দেরাদুনকে লোকে সবুজ হ্রদ বলে, আর কেনই বা উত্তরপ্রদেশবাসীরা এ জেলাকে এ প্রদেশের স্বর্গবলে গৌরববোধ করে। কাশ্মীর দেখিনি বটে তবে বিবরণ অনেক পড়েছি। কাজেই মনে হয় এ দাবী খুব অন্যায় নয়।

হৃষিকেশের গঙ্গার ঘাট

জাতীয় মিলিটারী একাডেমির চেটউড্ হল

এসে গুটি গুটি লুকোতে চায় তখনও সে শীত উপভোগ্য না হলেও খুব একটা অসহ্য হয় না। বরং লোক তখন মুসৌরী চাক্রাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। আস্তে আস্তে একদিন ঘনঘটা করে কয়েক পশলা বৃষ্টির সাথে থোকা থোকা তুষার মুসৌরীর রং পালটে দেয়, তখন দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা হেঁটে মোটর-বাসে ছোটে বরফের খেলায় মেতে উঠতে। মুসৌরীতে এ ব্যাপার বাৎসরিক হলেও খাস দেরাদুনের সমতলে কদাচিত তুষারপাত হয়। ১৯৪৫ এর জানুয়ারীর পর আর এখানে বরফ পড়েনি।

শীত শেষ হতে হতেই কিন্তু গ্রীষ্ম একেবারে জাকিয়ে বসে। কালবৈশাখীর রুদ্রলীলায় শুধু অম্বর কাঁপে না, শাল-পাইনের আন্দোলনের সাথে মানুষের মনও ভয়ে বিস্ময়ে নিথর হয়ে যায়। জুন শেষ হতে না হতেই নামে বর্ষা। তখন বলতে ইচ্ছে হয়—'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' মাটির বুকে সবুজ ঘাসের দাম, গাছে গাছে গাঢ় সবুজের কটাক্ষ সব মিলিয়ে মনের মধ্যে যেন নেশার মাতন জাগায়। দেখে দেখে নদীগুলির যৌবন বুঝি চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন দিশেহারা হয়ে উদ্দাম বেগে ছুটতে থাকে দুকূল ভাসিয়ে। এমন অনেক নদী আছে যেগুলি সারা বছর ধরে থাকে একেবারে শুকনো খটখটে। ছোটবড় পাথরগুলির তখন রোদ জল আর হিমে জমে যাওয়া ছাড়া আর কোনই কাজ থাকে না। কিন্তু বর্ষার বিগলিত ধারা ওদের বুকেও বান ডেকে আনে। দুর্বার বেগে জল ছুটে চলে নাচতে নাচতে সমুদ্র যাত্রায়। আর সারা বছর ধরে যে পাথরগুলি চুপ করেছিল তারাও রোমাঞ্চিত দেহে গড়িয়ে গড়িয়ে বিলিয়ে দেয় নিজেকে ফসল ফলানো পলিমাটির রূপে। তখন মানুষ ত দূরের কথা, ট্রাক লরীর

হিমালয়ের বিগলিত করুণায় দেরাদুন আপ্লুত, তাই তার অঙ্গে এত রূপ। ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারে প্রকাশিত আবহাওয়াতত্ত্বের হিসেবে দেখা যায় যে বর্তমানে দেরাদুনে গড়পড়তা বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাপ ৭০ ইঞ্চি। অবশ্য জেলার সর্বত্রই যে সমানভাবে বারিপাত হয় তা' নয়। রাজপুর, মুসৌরী প্রভৃতি স্থানে বাৎসরিক গড়পড়তা ১০৮ থেকে ৮৭ ইঞ্চি পর্যন্ত। এই গেজেটিয়ারের হিসেব মতই দেখা যায় যে ষাট বছর আগেও সারা জেলার গড়পড়তা ছিল ৯৪ ইঞ্চির মত। ক্ষয়িষ্ণু বারিপাতের জন্য ক্রমবর্ধমান বনোচ্ছেদই যে প্রধান কারণ তাতে কারুর সন্দেহ নেই।

বৃষ্টি তুলনায় কমলেও বাতাসে আর্দ্রতার আমেজ তেমনই আছে। তার ফলে গ্রীষ্ম, বর্ষা, আর শীত—এই তিনের প্রাধান্যই এখানে সবাই অনুভব করে। আর বাকি তিনের আগমন-নির্গমণ জনতা শ্রেণীর মত উল্লেখের অযোগ্য। তবে ভেজা হাওয়ার গুণে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে যখন মাঝে মাঝে তরল পারা ১০৯।১০ ডিগ্রির কোঠায় ঠেকে তখনও মানুষ শুকনো হাওয়ার জ্বালা থেকে রেহাই পায়। আবার ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে শীত ঋতুর দাপটে পারা যখন শূন্যের ঘরের দোরে

বন গবেষণা মন্দিরের একাংশ

দৈত্যগুলিও থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়।

নদী-নালার কথায় এসে বলতে হয় দুনের পূর্ব মেখলা পুণ্যসলিলা গঙ্গার কথা, বলতে হয় উত্তর দিকের পাহাড়-কোল-ঘেঁষা যমুনার নীল স্বপ্নাবেশের কবিতা। এই দুই প্রধানা সারা দুনে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে নানা শাখা প্রশাখায়। এ ছাড়াও আছে অনেক কাটা খাল। স্থানীয় ভাষায় এদের নাম নাহার, এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে পূর্ববঙ্গকে লোকে নদীমাতৃক বলে, দুন-উপত্যকা হয়ত সে অর্থে এবং নামে বিভূষিত নাও হতে পারে। কিন্তু নদী-নালা এবং কাটা খাল ছাড়াও অনেক ঝরণা পাহাড়ের গায়ে বসতি স্থাপনের সুবিধে করে দিচ্ছে। হিমালয়ের বরফ গলা জল—যা মাটির নীচ দিয়ে বয়ে আসছে তাই হল এ সমস্ত ঝরণার উৎস। মোট কথা এখানকার জমি সরস কিন্তু জলে ডুবে থাকে না। তাই বোধহয় দুনিয়াজোড়া নাম-ডাকওলা বাসমতী চালের জন্মভূমি হওয়ার গৌরবে ভূষিত হতে পেরেছে। কেবল কি চাল—গম, চা, আখও হয় প্রচুর। আখকে স্থানীয় ভাষায় বলে গেন্না। এর অধিকাংশই লেগে যায় এই জেলারই দইওলার চিনি কলে। বাকী মানুষের রসনালিপ্ত করে।

ভেজামাটি আর আবহাওয়ার গুণেই দুনের বনসম্পদ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শাল, পাইন, শিশু (স্থানীয় ভাষায় শিশম), দেওদার, বাঁশ দুন উপত্যকার শতকরা প্রায় উনপঞ্চাশ ভাগ দখল করে আছে। ইংরেজ আমলে স্থাপিত 'বন গবেষণা মন্দির' (Forest Research Institute)ই এখানকার বনজ সম্পদের গুরুত্ব বুঝতে সহায়ক হবে। এ স্থান নির্বাচনে হয়ত ইংরেজরা এখানকার মনোরম আব-হাওয়া আর মুসৌরী চাক্রাতার সান্নিধ্যও বিবেচনা করে থাকবে। তবে মূল কারণ বোধহয় বনজ সম্পদই। তবে আজকালকার দিন হলে এশিয়ার এই বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক কারণ দিয়ে বিবেচনা করে তবে এর স্থান নির্ণয় করা হত।

প্রকৃতিরই বোধহয় নিয়ম যে কোন একটা স্থানে সব কিছুর সমৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায় না। তাই খনিজ সম্পদে দুন উপত্যকা দরিদ্রই বলতে হয়। তবে একেবারে নিঃস্বও ন। মুসৌরী ও নিকটবর্তী অঞ্চলে যে সীমা হীরা পাথর পড়ে আছে তাতে চুণের ভাগ খুব বেশী। তার ফলে দেরাদুন সহর ও কাছাকাছি অঞ্চলে অনেক পাথুরে চুণের ভাটি থেকে অনবরত ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। এ শিল্পে

বেশ কিছু লোক নিযুক্ত আছে। জলেও চুণের ভাগ খুব বেশী। কিছুদিন জলসেদ্ধ করার পরই কেটলীর মধ্যে বেশ পুরু হয়ে একট চুণের দেয়াল গড়ে ওঠে। ঝরণার জলে অবশ্য তত নেই। অবশ্য পাথরগুলি থেকে যে কেবল চুণই হয় তা' নয়, ঘর-বাড়ি তৈরির জন্য অনেক ক্ষেত্রে ইটের বদলে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া পাথর থেকে সিমেণ্ট তৈরীর মালও হয় বেশ কিছু পরিমাণে।

দেরাদুনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বন থাকলেও হিংস্র জন্তু তেমন নেই। গভীর জঙ্গলে বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। সিংহ সংরক্ষিত অঞ্চলে আছে—তবে তা এত বিরল যে সহসা চোখে পড়ে না। তাছাড়া শিকারীর আকর্ষণ বাড়াতে ঘুরে বেড়ায় কত রকম হরিণ আর বন মুরগী। নদীতে মাছের পরিমাণ মন্দ নয়।

বন্য জন্তুর সঙ্গে প্রায় সমান, গড়পড়তাতেই আছে গৃহ-পালিত তৃণভোজীর সংখ্যা। ৫৬ সালের এক সরকারি হিসেবে দেখা যায় যে প্রতি হাজার মানুষের তুলনায় ২৯১টী গরু মেষ আছে। এর মধ্যে ১৭৭ দুগ্ধবতী, ৫১ টী মাংসের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগে, আর বাদবাকী একজনের সহায়তায় ব্যবহৃত হয়। ছাগল ভেড়া ৭৯, কিন্তু ঘোড়া খচ্চর আর গাধা মিলে সংখ্যাটা ফাপিয়ে তুলে ২১২৩টীতে দাঁড় করিয়েছে। হাঁস-মুরগী মাত্র ২৯টী অর্থাৎ নগণ্য বলা চলে।

বাজারে মোষের দুধই চলতি। সব গোয়ালা গরুর দুধ চাইলেও দিতে অপারগ। আবার যারা হলফকরে গরুর দুধ দেয় তাদের বেলাতেও বিশ্বাস অটুট রাখাই যুক্তিযুক্ত। তা' নইলে বাড়ি বয়ে দুধ নিয়ে আসার হাঙ্গামা অনিবার্যভাবে পোহাতে হবে! সারা বছর দুধ বেশ দামেই বিক্রী হয়। আর পরিমাণও অপ্রচুর। তবে শীতের সময় যখন পাহাড়ীওয়ালা তাদের গরু ভেড়ার দল নিয়ে সমতলে নেমে আসে তখন দুধের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে দামটাও বেশ কমে যায়।

এবার দুনের খাস মানুষের কথাই বলি। ৫১ সনের আদমশুমারির হিসেব মত লোকসংখ্যা দাঁড়ায় গিয়ে ৩,৬২,০০৫ জন। এর মধ্যে ১, ৯০,৪০৬ জন থাকে পাহাড় ও গ্রামাঞ্চলে। বাদবাকী ১,৭১,৫৯৯ জন থাকে সহরে। এই লোকসংখ্যার ২,১১,০৪১ জন পুরুষ এবং ১,৫০,৯৬৪ জন নারী। এর ফলে পুরুষের মধ্যে অবিবাহিতার সংখ্যাও নারীর তুলনায় বেশী। প্রতি দশ হাজার পুরুষের মধ্যে ২,৬৪৭ জন 'অবিবাহিত', কিন্তু সেই তুলনায় নারীর সংখ্যা মাত্র ১,৬৯১। নারীর সংখ্যা অল্প হওয়ার ফলে এদের নৈতিক মূল্য বোধও একটু ঢিলেঢালা। তথাকথিত নিম্ন দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে নারীরা অনেক সময় পণ্য হিসেবে বন্ধকী থাকে অর্থের বিনিময়ে। টাকা শোধ করলেই আপন গৃহে ফিরে যায়। এর সমাজস্বীকৃতি আছে বলে কেউ নিন্দে করে না। মুশকিল বাধে—সেই সময়ে যে সন্তানাদি জন্ম-গ্রহণ করে তাদের নিয়ে। ব্যক্তিগত অনেক অসন্তোষই এর ফলে দানা বাঁধবার সুযোগ পায়। দেরাদুনের সমুদয় লোকের মধ্যে শতকরা ৩৬ জনই নিভর করে কৃষি কার্যের উপর, আর বাদবাকী ৬৪ জন অন্যান্য নানা ভাবে।

কাজের কথায় এসে স্বভাবতই শিল্প সম্ভারের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দুন উপত্যকায় বৃহদাকার শিল্প বলতে বিশেষ কিছু নেই। কুটীরশিল্পই নানা ভাবে—জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। শাক-সব্জী, ফলের বাগান, চা, মালবেরা উৎপাদন করে প্রচুর লোক ভাত কাপড়ের সংস্থান করে। ইদানিং কালে রেশম শিল্প বেশ জাকিয়ে উঠেছে। যেলো হলেও সিল্কের জামা কাপড়ই এদিককার লোকের বেশী পছন্দ। হাতে তৈরী পশমী বস্ত্রেরও খুব অভাব নেই। কাঠের প্রাচুর্য থাকায় আসবাবপত্র একটু সস্তা। এই ব্যবসায়েও প্রচুর লোক নিযুক্ত আছে। পাথুরে চুন আর গমের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। গমজাত দ্রব্যের ব্যবহার এখানে বেশী বলে গম ভাঙ্গানো কল চলে অনেক। অবশ্য চালের কলও একেবারে বিরল নয়।

জন সংখ্যার অনুপাতে এখানে অনেক জিনিষই বেশী জন্মায়। এই সমস্ত বাড়তি মাল রেল, মোটর গরু-মোষের গাড়ী আর মানুষের পিঠে চড়েই জেলার প্রান্ত সীমা অতিক্রম করে যায়। কেননা পাহাড়ী নদী নৌকো চলাচলের অযোগ্য। এই সমস্ত রপ্তানি মালের মধ্যে বাসমতি চাল আর চায়ের অঙ্কটা মোটা, দেরাদুনের লিচুর খুব নাম ডাক। 'সিজন টাইমে' ওয়াগন ওয়াগন বাক্সবন্দী লিচু দূর দূর জেলায় চলে যায়। বেত, বাঁশ এবং কাঠের

জিনিষও কম যায় না! প্রদান যতই হোক না কেন, আদানও সামান্য নয়। কলজাত বৃহৎ-শিল্পের অভাব থাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক ভোগ্যবস্তু এবং বিলাস সামগ্রী দুনবাসীরা অপরের কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে নিতে বাধ্য হয়।

আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেরাদুনের খাস বাসিন্দাদের মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। মঙ্গোলীয় এবং আর্য। প্রথমোক্তদের নাক চেপ্টা, গোল গোল ছোট চোখ এবং উচ্চতায় বেঁটে। আর্য বলে যারা দাবী জানায় তারা অপেক্ষাকৃত লম্বা, নাকও চেপ্‌টা। এদের মধ্যে মৃগনয়নার অভাব নেই। মঙ্গোলীয়দের বেশীর ভাগ থাকে পাহাড়ের ওপরে কিংবা গায়ে। কিন্তু আর্যবংশোদ্ভবদের সহরাঞ্চলই পছন্দ।

দেরাদুন যদিও বহুভাষী জেলা বলে পরিচিত, কিন্তু শতকরা ৫৯.৪ জনই হিন্দী উর্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলে। বাকী লোক পাঞ্জাবী (৯.২%) পাহাড়ী আর গাড়োয়ালী (৬.৯%), নেপালী (৬.২%), এবং দ্বিভাষী প্রায় ১৮.৩%। নগণ্য হলেও বেশ কিছু বাঙ্গালী দেরাদুনে বসবাস করে। অবশ্য সবই প্রায় চাকুরী কিংবা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত আছে। স্থায়ী বাসিন্দা অবশ্য বিরল নয়। বাংলা ভাষার প্রভাব উল্লেখযোগ্য না হলেও স্থানীয় লোকেরা অনুকরণ করতে চেষ্টা করে।

মুশৌরীতে যখন বরফ পড়ে

ভাষার কথা আলোচনা করতে গিয়ে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বিচার করবার ইচ্ছা স্বভাবতই মনে জাগে। শতকরা ৩৯'২ জন লোক কলম চালাতে পারে, আবার বইয়ের ভাষাও অবোধ্য নয়। এটা অবশ্য '৫১ সালের হিসেব'—যদিও জেলার সর্বত্রই ছোটবড় অনেক স্কুল বর্তমান, কিন্তু উচুদরের বিদ্যালয় বলতে দেরাদুন সহরেই বেশী। তার মধ্যে মিশনারী স্কুলগুলি খুব উচুস্তরের। এ ছাড়া আছে দুনস্কুল, আর সৈনিক বিদ্যালয়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও নানা ধর্মাবলম্বী লোক বসবাস করে। তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশী। খ্রীষ্টান এবং শিখেদের বেশীরভাগ লোক সহরবাসী। আবার তপসিলীদের বেশীর ভাগ লোক থাকে গ্রামাঞ্চলে।
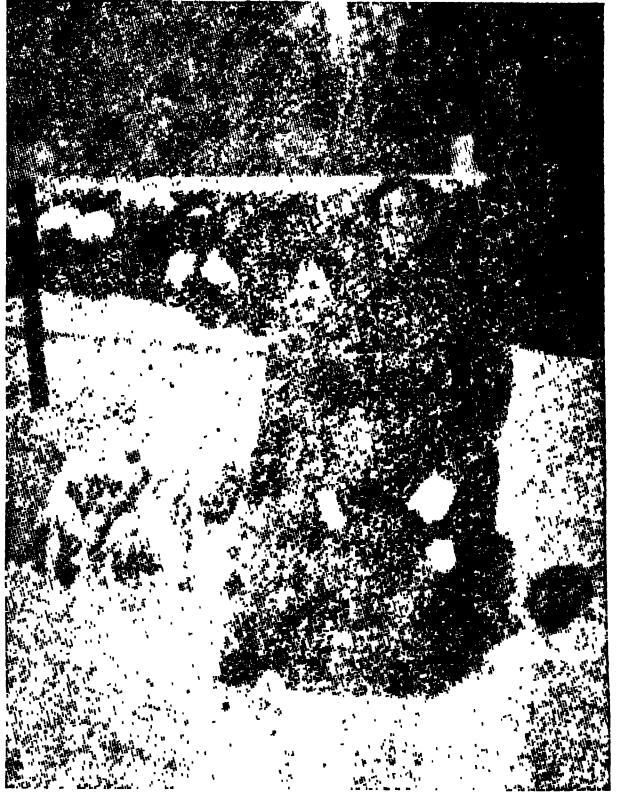
পাহাড়ী নদীর কল্যাণে ওখানে জলপথে যাতায়াত একেবারে অচল। রেল, মোটর, গরুঘোড়ার গাড়ী, সাইকেল আর টাঙ্গা এই হলো যাতায়াতের প্রধান সহায়। একই সাইকেলে তিন-চারজনের গোটা পরিবার দেখাটা বিরল নয়। পল্লী অঞ্চলের লোক গরুর গাড়ীর ওপরই বেশী ভরসা করে। গোটা পরিবারের কথা না হয় বাদ দে'য়া গেল, কিন্তু বিয়ের বর-কনে, বরযাত্রী, আর ব্যাণ্ড-পার্টি সবই এই গরুর গাড়ীতেই চলে। চাক্রতা, মুসৌরী, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা যাতায়াতের রাস্তা পাকা ও সুন্দর। এছাড়া আরো অনেক কাঁচা-পাকা রাস্তা আছে। সারা জেলায় উত্তম রেলের একই পথ দেরাদুন পর্যন্ত। কেবল হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ পর্যন্ত একটী শাখা রেল আছে। সমতলে মোটরযান জনপ্রিয় হলেও পাহাড়ীও'লাদের জন্য টাটুঘোড়া একেবারে অপরিহার্য।

দেরাদুনের প্রকৃতিই যে মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে তা' নয়। হৃষিকেশ, লছমনঝোলা মানুষের আধ্যাত্মিক মনকে আকৃষ্ট করে। এ পথেই যেতে হয় মহাভারতের শেষ প্রান্তে যেখানে যুধিষ্ঠিরের যাত্রা শেষ হয়েছিল। প্রতিবেশী হরিদ্বার ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম। এসবের গান আমি গাইব না। তার কারণ তাদের সঙ্গীতে সারা ভারতবাসীর মন ঝংকৃত হচ্ছে। মুসৌরীর শৈলনিবাস লক্ষ লক্ষ লোকের গ্রীষ্মের জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। চাক্রাতা অপেক্ষাকৃত অপরিচিত হয়েও সৌন্দর্যে অনেক সুন্দরীর ঈর্ষার কারণ হতে পারে। সারা দুনের বুকে কত যে পিক্‌নিকের জায়গা তার অন্ত নেই। এর মধ্যে সহস্রধারা গুহ্যপানীর বিশেষ নাম আছে। দর্শনীয় হিসেবে আছে বন-গবেষণা মন্দির, সৈনিক বিদ্যালয়। চাক্রাতার পথে কালসীতে আছে সম্রাট অশোকের সংস্কৃতিবাহী বিজয় নিশানের শিলালিপি।

মনে করেছিলাম দেরাদুন প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করব। কিন্তু মনে পড়ল এর নামকরণ নিয়ে দুচার কথা না বললে লোকের মনে নানা সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। গোড়াতেই অবশ্য এ সব কথা বলা উচিত ছিল। ভূস্বর্গ ইত্যাদি বড় বড় কথার অবতারণা করে আর মাটির নামটার উল্লেখ করতে সাহসী হইনি। যাই হোক, অনেক নামের মত দেরাদুন নামকরণ নিয়েও নানা মত-ভেদের অবকাশ আছে। কারুর কারুর মতে দুন কথা মহাভারতের দ্রোণাচার্যের অপভ্রংশ। তিনি নাকি এখানে ডেরা (কুটির) বেঁধে কুরুপাণ্ডবের গুরুর আসন অলংকৃত করেছিলেন। সেই থেকেই এ উপত্যকার নাম দেরাদুন। 'ডেরা' শব্দই দেরাতে পরিণত হয়েছে কালক্রমে। আবার ভূগোল-বিজ্ঞানীদের মতে যে উপত্যকার চার-দিকই পাহাড় ঘেরা তাকে দুন বলা হয়। আর এ উপত্যকা এমনি যে, এখানে ডেরা বেঁধে সুখে ঘর করবার সব আকর্ষণ আর উপকরণই বর্তমান। তাই এর নাম দেরা (ডেরা) দুন। আমি না বললেও এটা নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন যে দেরাদুনে যে থাকে বা যে এখানে বেড়াতে আসে তারা অপরের একান্ত ঈর্ষার পাত্র।

দেরাদুনের দক্ষিণাঞ্চল যেদিকটা সিকলিক পর্বত দ্বারা সীমীত, তা কোন কোন পণ্ডিতের মতে সমুদ্রতল থেকে উঠেছে। ও অঞ্চলে নাকি বৃহদাকার মৎস্য ও অন্যান্য সমুদ্রগামী জলজন্তুর ফসিল দেখা যায়। এ অঞ্চল সমুদ্রের তুলনায় প্রায় এক হাজার ফুট উঁচু। এই উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে মধ্য অঞ্চল তিন হাজার হয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে মুসৌরী চাক্রাতার পর্বত শীর্ষে যথাক্রমে ৭৫০০ থেকে ৭৯০০ ফুট উচু হয়ে গিয়েছে। মাপজোপে এ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লেও পাখীর চোখে সারা দেরাদুন একটানা সমতল বলেই দেখা যায়।

অভিমান

সদানন্দ কুণ্ডু

তৃষিত তৃণের মাঝে তৃষ্ণা নিয়ে চেয়ে আছে
ছোট এক ঘাস ফুল।
ছোট সে যতোই হোক মন তার
মাঘের মুকুল।
সোনালী রোদের সাথে শীতের সকালে
দেখা হলে—
মুখ তুলে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে—
বনানীর মতো।
ইথারের থরে থরে আলো এসে—
সারাদিন তাকে ঘিরে রাখে
তবু—সে নীরব থাকে!
দিনান্তে, বিদায়ের কাল এলে
উঁকি মেরে যায় আলো—
শেষ চাওয়া—চেয়ে—
নিদাঘ করুণ মুখে—মুখ তুলে বলে সে
পাতার আড়ালে থেকে
কেয়া বা চাঁপার মত—করিনাকো মন বেআকুল
আমি অতি ক্ষুদ্র এক ঘাস ফুল।

বিপন্ন মোটর

বিপন্ন-মোটর চালক (পথচারীকে): ও দাদা…শুনছেন!…একবার আসুন না…হাত লাগিয়ে গাড়ীটাকে এই খানা থেকে…

পথচারী: এখন আমি দাদা!…বটে!…আর যখন পথের মানুষকে মানুষ ভাবেন না…এই মানুষের গায়ে কাদা ছিট্‌কে হুহু-বেগে গাড়ী ছুটিয়ে যান্…তখন এই দাদা হয় না…!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা
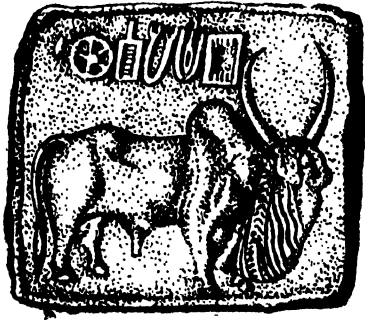
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের গত ১৫ই এপ্রিল ৬৮ বৎসর বয়স আরম্ভ হইয়াছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর গত ২ বৎসর তাঁহার জন্মদিনে কলিকাতায় থাকেন না, গত বৎসর ঐ দিনে তিনি বিহারে ছিলেন—এ বৎসর দিল্লীতে ছিলেন। অবশ্য কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ও ঐদিন দিল্লীতে ছিলেন—দিল্লীতে শ্রীঘোষের চেষ্টায় প্রফুল্লবাবুর জন্মদিনে তাঁহাকে উপযুক্তভাবে সম্বর্ধনা করা হইয়াছিল। ঐদিন কলিকাতা-বাসীরাও সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে সমবেত হইয়া প্রফুল্ল-চন্দ্রের জন্মদিনে তাঁহার দেশসেবা ও ত্যাগব্রতের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানেও মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিবস উৎসব হইয়াছিল। ২৪পরগণা সোদপুরের নিকটস্থ নাটাগড় গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠিত বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক জনসভায় প্রফুল্লচন্দ্রের দেশসেবার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করা হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের এই ৬৮তম জন্মদিনে আমরাও তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি, তাঁহার জীবন নব নব কর্ম সাফল্যে গৌরবান্বিত হউক।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত—

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রবীণ সমাজসেবক নেতা, প্রথম জীবনে কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত বেঙ্গল কেমিকেল কারখানার পরিচালনার পর তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সমাজসেবার কার্যে ব্রতী হন এবং সুদীর্ঘকাল তিনি নিজেকে খাদি-প্রতিষ্ঠান নামক কর্মকেন্দ্রের সহিত যুক্ত করিয়া জনসেবা করিয়া যাইতেন। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরিত হইতে দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছেন এবং ২৫ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে পুনর্বাসন দানের জন্য এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতাস্থ ৭ এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত জনবাণী নামক একখানি সংবাদপত্রে কয় সপ্তাহ ধরিয়া সতীশবাবুর পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুন্দরবনে এক এক ভাগে ৪০ হাজার একর করিয়া ফাঁকা জমী লইয়া ঐরূপ দুটি ভাগে ২৫ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের প্রত্যেককে ৯ বিঘা করিয়া জমী দেওয়া যাইবে। প্রতি পরিবার পিছু সাড়ে ৬ হাজার টাকা ব্যয় করিলে প্রতি পরিবার গড়ে মাসিক ১৫০ টাকার মত আয় করিতে পারিবে। কৃষি, গোপালন, হাঁস ও মুরগী পালন, তরকারী চাষ, কুটির শিল্প (দেশলাই, কাগজ, ঢেঁকী, মধু উৎপাদন, খাদি উৎপাদন প্রভৃতি) ইত্যাদির দ্বারা সুন্দরবনে ঐ সকল উদ্বাস্তুর জীবিকার্জন করা কঠিন হইবে না। সুন্দরবনের নূতন উচ্চ জমীগুলিতে এখনও লোকের বসবাস হয় নাই—সে সকল স্থান এই কার্যে ব্যবহার সহজেই হইতে পারে। সতীশবাবু বাংলার মায়েদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক আবেদনে জানাইয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন ২৫০০ নবজাতক জন্মগ্রহণ করে। মায়েরা যদি তিন মাস কাল ব্রহ্মচর্য ব্রতে ব্রতী থাকেন, তাহা হইলে নবজাতকের সংখ্যা কমিয়া গিয়া পশ্চিমবঙ্গে বহু উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হইতে পারিবে। সতীশবাবুর সারা জীবন কর্মসাফল্যে পূর্ণ—তিনি সর্বদা দেশবাসীর কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। কাজেই তাঁহার প্রস্তাব দেশবাসীর আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে কলিকাতা ১৫ কলেজ স্কোয়ারে খাদি প্রতিষ্ঠানে সতীশবাবুর সহিত আলোচনা করিয়া কর্তব্য সম্পাদনে অবহিত হইতে আহ্বান জানাই।

রাজ্যসভায় সদস্য নির্বাচন—

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কেন্দ্র হইতে গত ২৬শে মার্চ নিম্নলিখিত ৫জন রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—

(১) ডাঃ শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ (কংগ্রেস) (২) শ্রীমহম্মদ ইসাক্ (কং) (৩) শ্রীধরমচাঁদ সারোগী (কং) (৪) শ্রীভূপেশ গুপ্ত (কম্যুনিষ্ট) ও (৫) শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত (নির্দলীয়)।

বিধান পরিষদে নির্বাচন—

বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক গত ২৬শে মার্চ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন (১) শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মন (কংগ্রেস) (২) শ্রীসুকুমার দত্ত (কংগ্রেস) (৩) শ্রীইব্রাহিম ইসমাইল (কং) (৪) শ্রীনরবাহাদুর গুরুং (কং) (৫) শ্রীধ্বজাধারী মণ্ডল (কং) (৬) শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (কং) (৭) শ্রীআবদুল হালিম (কম্যুনিষ্ট) (৮) শ্রীস্নেহাংশু আচার্য (কম্যুনিষ্ট) (৯) শ্রীনির্মল বসু (ফরোয়ার্ড ব্লক)।

পুরস্কার লাভ—

প্রতি বৎসর অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তরের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিকে একটি করিয়া এক হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়। এবার শিল্পকলার গবেষণা মূলক কার্যের জন্য বিখ্যাত শিল্প সমালোচক শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও উপন্যাস রচনায় জন্য খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক শ্রীমনোজ বসু ঐ পুরস্কার পাইয়াছেন। মৌচাক মাসিক পত্রের পক্ষ হইতে বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র দেবকে এবার ৫ শত টাকা মূল্যের মৌচাক পুরস্কার দান করা হইয়াছে।

অপহৃতা হিন্দু নারী বিক্রয়—

পূর্ব পাকিস্তানে দুর্বৃত্তেরা যে সব হিন্দু নারী অপহরণ করিতেছে, তাহাদের চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া জাহাজে আরব দেশসমূহে পাঠাইয়া দিয়া তথায় তাহাদের বিক্রয় করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে রঙ্গপুর হইতে খবর আসিয়াছিল যে তথায় হিন্দু নারীদের প্রকাশ্য হাটে এক একজনকে হাজার টাকা মূল্যে ধনী মুসলমানদের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানে দস্যুর দল শুধু নরহত্যা, সম্পত্তি লুণ্ঠন, হিন্দুর গৃহ-দাহ প্রভৃতি করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই, বহু হিন্দু যুবতী ও বালিকাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া ধর্মান্তরিত করিয়াছে, তাহার পর ধর্ষণ করিয়া শেষ পর্যন্ত বাজারে বিক্রয় করিতেছে। এ সংবাদ সত্যই হৃদয় বিদারক—ইহার পরও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা শুধু প্রতিবাদ সভা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে? তাহার পর কি আর কিছু করার নাই!

রবীন্দ্র পুরস্কার—

পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য ৫ হাজার টাকা মূল্যের তিনটি রবীন্দ্রপুরস্কার নিম্নলিখিত ৩ জনকে দান করিয়াছেন—(১) শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য ইনি শ্রীশঙ্কর নাথ রায় ছদ্মনামে ৬ খণ্ড 'ভারতের সাধক' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (২) প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবিমল মিত্র- 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাস রচনার জন্য পুরস্কার পাইলেন (৩) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ 'আকাশ ও পৃথিবী' নামক সুবিখ্যাত বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমরা তিনজন গ্রন্থকারকেই তাঁহাদের স্বীকৃতিকে অভিনন্দিত করি।

দীঘার নিকট মৎস্য চাষ—

দীঘা স্বাস্থ্য নিবাস হইতে ৭ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে আলমপুর—বালিসাই নামক স্থানে অনুর্বর ২ হাজার বিঘা নীচু জমীতে পশ্চিম বঙ্গ সরকার মৎস্যচাষের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঐ স্থানে সমুদ্রের জলের সঙ্গে মাছ আসিবে ও তাহা সংগ্রহ করা হইবে। তথায় ১৪টি ভাসা বাঁধ নির্মিত হইবে—৫টির নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে। মাটি কাটিয়া ছোট ছোট হ্রদ করা হইবে ও তথায় পোনা, ইলিশ প্রভৃতি মাছেরও চাষ হইবে। ঐ স্থানে সমুদ্রের মাছ সংগ্রহ করা সহজ—কাজেই সুলভে সে মাছ বিক্রয় করা চলিবে। পশ্চিমবঙ্গের ধারে বঙ্গোপসাগর—সেখান হইতে অল্প ব্যয়ে মাছ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইলে বাঙ্গালী মাছ খাইয়া বাঁচিবে।

দিল্লীতে নেতাজীর মূর্তি—

দিল্লীতে লালকিল্লার সম্মুখের মাঠ ও রাস্তা নেতাজীর নামে নামকরণ করা হইয়াছে। ঐ স্থানে নেতাজীর একটি মূর্তি স্থাপনের কথা গত ২০শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীর রাজ্যসভায় আলোচিত হইয়াছিল। ভারত সরকার নিজ হইতে ঐ স্থানে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনা করেন নাই—তবে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যদি এ স্থানে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন, তবে সরকার সে প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দানে কার্পণ্য করিবেন না। দুঃখের কথা, কলিকাতায় এখনও নেতাজীর ভাল

মূর্তি স্থাপিত হয় নাই। বাংলার গ্রামে গ্রামে নেতাজীর মূর্তি স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভারতবর্ষের লেখক, খ্যাতিমান্ সাহিত্যিক শ্রীনিত্য-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। গত ২৩শে এপ্রিল তিনি আগামী বৎসরের জন্য নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। আগামী ১৫ই মে হইতে ১৭ই মে শোলাপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার যে বার্ষিক সম্মিলন হইবে, তিনি তাহাতে সভাপতিত্ব করিবেন। তিনি বীরভূমের খ্যাতিমান্ নাট্যকার স্বর্গত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ও সিউড়ীর জন-নেতা শ্রীসত্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

দীঘার উন্নয়ন ব্যবস্থা—

গত ২৩শে এপ্রিল দীঘায় দীঘা উন্নয়ন বোর্ডের এক সভা হইয়াছিল। বোর্ডের সভাপতি কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, ত্রাণমন্ত্রী শ্রীআভা মাইতি, অর্থ-মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঠিক হইয়াছে দীঘার বিস্তারের জন্য তথায় আরও ১৫০ একর জমী দখল করা হইবে। দীঘা সমবায় যে সকল জমী আইন সঙ্গতভাবে বিক্রয় করিয়াছেন, সেগুলি অনুমোদন করা হইবে। যাহারা জমীর জন্য টাকা দিয়াছেন তাহারা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, তাহা দেখা হইবে। দীঘায় খাদ্যাভাব দূর করার ব্যবস্থার জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত হইবেন—তিনি ডিম, মাছ, দুধ, মাংস প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। দীঘা সত্যই সমুদ্র উপকূলে স্বাস্থ্য নিবাসে পরিণত হইলে বাঙ্গালী বহু প্রকারে লাভবান হইবে।

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ—

গত ৪ঠা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ধান, চাউল, ডিম, দুধ, ঘি, তেল, ডাল, মসলা, চিনি, ফল, তরিতরকারী, কাপড়-চোপড় সকল নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের ব্যবসা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কমিটীর প্রধান সুপারিশ (১) চাউল-কল রাষ্ট্রায়ত্ত করা (২) পশ্চিমবঙ্গ হইতে ধান চাউল রপ্তানী নিষেধ (৩) উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মূল্য উপদেষ্টা বোর্ড গঠন। এই নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করা হইলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হইবে। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীরা বিনা কারণে বহু নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের দাম বাড়াইয়া সাধারণ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। তাহা বন্ধ করার জন্য এই তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সরকারী নির্দেশে বেসরকারী পরিচালনায় যে সমবায়-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে এ বিষয়ে কাজ করা অনেকটা সহজ হইবে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব—

অন্যান্য বৎসরের মত এ বৎসরও দোল উৎসবের দিন দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে কয়েক লক্ষ লোক সমবেত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব উৎসব সম্পাদন করেন। সুবিখ্যাত সাধক শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ উৎসবে প্রধান অতিথি রূপে ভাষণ দান করেন। খ্যাতিমান্ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন। ডাক্তার মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, প্রভুপাদ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ সভাপতিত্ব করেন ও শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে আশীর্বাদ করেন। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ সকলকে আদর অভ্যর্থনা করেন, শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী অনুষ্ঠান সূচি ঘোষণা করেন ও প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন। ঐদিন দেশপ্রিয় পার্কে বাংলার বহু মনীষী ও সাধকের সমাবেশ হইয়াছিল।

কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্বর্দ্ধনা—

কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের গত কামারপুকুরস্থ বার্ষিক সম্মিলনে মূল সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় গত ৫ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা ১৬ আমির আলি এভেনিউস্থ কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যের বাসভবনে এক প্রীতি-সম্মিলনে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিরূপে এবং শ্রীকৃষ্ণধন দে

প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী সুরুচি বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী বেলা দেবী, শ্রীবিশ্বেশ্বর কাব্যতীর্থ, শ্রীমতী শরৎশশী কর প্রভৃতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং নরেন্দ্রবাবু ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবী সম্বর্দ্ধনার উত্তর দান করেন।

বিশ্ব জনমত গঠন প্রস্তাব—

পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার ও তাহাদের মানবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গঠনের ব্যবস্থা করার জন্য গত ৩রা এপ্রিল দিল্লীর লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ যেভাবে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার কার্য্য চালাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে ভারত কর্তৃপক্ষ তেমনভাবে প্রচার কার্য্য করে নাই—যাহা করিয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সে জন্য নূতন করিয়া পাকিস্তানের অনুষ্ঠিত অনাচারের কথা পৃথিবীর সকল দেশে প্রচার করা দরকার। চীন ও পাকিস্তান একযোগে ভারত আক্রমণ করিবার জন্য একদিকে যেমন নিজেদের প্রস্তুত করিতেছে, অন্যদিকে তেমনই ভারতের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া বিশ্বজনমতকে ভারত-বিরোধী করার ব্যবস্থা করিতেছে। ভারত এ বিষয়ে সত্বর অবহিত না হইলে ভারতকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

কেন্দ্রে নূতন মন্ত্রী গ্রহণ—

দিল্লীর সংসদের প্রবীণ সদস্য শ্রীমহাবীর ত্যাগীকে কেন্দ্রে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীরূপে গত ১৪ই এপ্রিল গ্রহণ করা হইয়াছে এবং পুনর্বাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে পরিণত করিয়া শ্রীত্যাগীর উপর সে বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না এতদিন পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ বিভাগের কাজ ছাড়াও পুনর্বাসন বিভাগের কাজ করিতেন—এখন তিনি শুধু পূর্ত ও গৃহনির্মাণের কাজ দেখিবেন। শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর নস্কর শ্রীত্যাগীর দপ্তরে উপমন্ত্রী রূপে কাজ করিবেন। শ্রীত্যাগীকে লইয়া কেন্দ্রে মন্ত্রীর সংখ্যা হইল ১৪। ১৯:২ সাল হইতে শ্রীত্যাগী লোকসভার সদস্য আছেন। ১৯৫২ সালের ১৬ই এপ্রিল শ্রীত্যাগী কেন্দ্রে মন্ত্রী হন—১৯৫৭ সালের ১৬ই এপ্রিল তাঁহাকে মন্ত্রিসভা হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং ১৯৬৩ সালের ১০ই এপ্রিল আবার তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেন।

৭২ ইঞ্চি পাইপ উদ্বোধন—

গত ১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার বিকালে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ বারাকপুরের নিকট পলতায় নূতন ৭২ ইঞ্চি জলের পাইপের কার্য্যের উদ্বোধন করেন। এই পাইপ প্রতিষ্ঠার ফলে কলিকাতা সহরে জলাভাব দূর হইবে। শ্রীঘোষ বলিয়াছেন—আগামী ৭।৮ বৎসরের মধ্যেই ফরাক্কার বাঁধ নির্মাণ কাজ শেষ হইবে—তখন কলিকাতার গঙ্গায় এত জল আসিবে যে একটি নয়, পাঁচটি ৭২ ইঞ্চি পাইপ চালাইলেও গঙ্গায় জলের অভাব হইবে না। কলিকাতা হইতে ১০।১৫ মাইলের মধ্যে ৪টি নূতন সহর নির্মাণ করিয়া কলিকাতা সহরের অধিবাসীর চাপ কমাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সকল সহরেও এই পাইপ দ্বারা জল সরবরাহ করা হইবে।

চাঞ্চল্যকর ঘোষণা—

গত ২১শে এপ্রিল নয়া দিল্লীতে লোকসভায় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ সিং এক চাঞ্চল্যকর ঘোষণা করিয়াছেন—তিনি বলেন—অসুখের পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যদি আর সুস্থ না হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে সেই সুযোগে চীন ও পাকিস্তান যুগপৎ ভারত আক্রমণ করিত। কিছুদিন আগে শ্রীচু এন লাই ও প্রেসিডেণ্ট আয়ুব এই চক্রান্ত করিয়াছিলেন। আসামে চোরাগোপ্তা পাকিস্তানী আগমণের সমস্যা এবং ব্যাপকভাবে ভারতে উদ্বাস্তু আগমণের সমস্যা এই চক্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ঐ দিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন জানান—সমগ্র ভারত সীমান্ত বরাবর চীনারা বেশ বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। জনস্বার্থের খাতিরে কোথায় কত সৈন্য আছে তাহা তিনি জানাইতে পারিবেন না। সিকিম ভুটান সীমান্তেও কয়েক ডিভিসন চীনা সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। সংবাদগুলি সত্যই আশঙ্কাজনক।

নারী লাঞ্ছনার মর্মন্তুদ চিত্র—

এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ২৪পরগণার সীমান্ত হাসনাবাদে যাইয়া ২ দিন স্থানীয় শিবিরগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি শিবিরের ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা ১৫জন নারীর মুখে তাহাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন ও সেই বিবরণ কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার নিকট পেশ করিয়াছেন। পূর্বপাকিস্তানের পুলিশ ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌সের সৈন্যগণ শুধু টাকাকড়ি প্রভৃতি কাড়িয়াই লয় নাই—উদ্বাস্তু নারীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচারও করিয়াছে। উদ্বাস্তু নারীরা রাজ্যপালের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া তাহাদের সম্ভ্রম হানির বিবরণ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা কে করিবে?
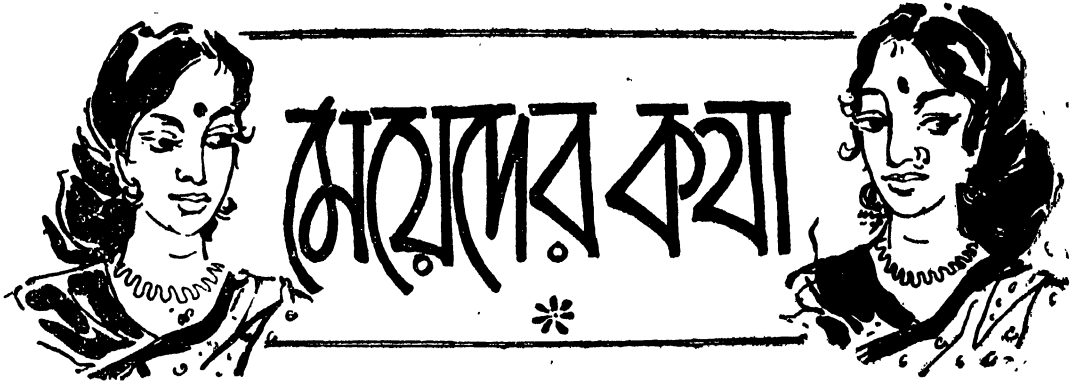
বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ও বাঙলার নারী

কুমারী গীতা মুখোপাধ্যায়

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান্।

প্রার্থনার মন্ত্র, বিশ্বকবির কণ্ঠে সেই দিন বাজিয়া উঠিয়াছিল বাঙলার জন্যে—বাঙালীর জন্যে এই বাঙলা তো এক কালে এমন ছিল না। বাঙলার ঐশ্বর্য ছিল। বিচিত্র বর্ণ ও বহু সংস্কৃতির মিলনকুঞ্জ এই বাঙলা দেশ, বিচিত্র বর্ণ ও বহুসংস্কৃতির মিলনকুঞ্জ হইলেও বাংলাদেশে বাঙালী কেবল আর্য্যেতর প্রেরনাতেই স্বতন্ত্র জীবন রচনা করিয়াছে।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি নহে। বাঙালীর বহুমুখী খ্যাতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। অতীতে বহু প্রতিভাবান মনীষীর বীরের আর বীর নারীর জন্ম হইয়াছিল এই বাংলার মাটিতে বাঙালার নারীর কোলে। বৎসরের পুঞ্জীভূত সাধনার ফলে এই প্রতিভার জন্ম হইয়াছিল। বাঙালী ছিল ভারতের ভাগ্যবিধাতা।

বাঙালীর অতীত ছিল গৌরবময়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অঙ্কে অতীতে শায়িত ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র। খৃষ্টীয় তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতক হইতে প্রাক্ ইংরেজ যুগ পর্য্যন্ত বাংলাদেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামন্ত, মহাসামন্ত তাহার উপর রাজা, রাজার উপর রাজাধিরাজ থাকিত। রাজতন্ত্র থাকিলেও গণজীবন কার্য্যকরী ছিল। ইহার পরিচয় পালরাজাদের আসার আগে কিছুটা দৃষ্টি গোচর হয়। তখন অরাজক মাৎস্যন্যায়ের প্রাবল্য দেশের জনগণকে জাগিয়ে সারা বাঙালী জাতির মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। মুসলমান যুগে রাজতন্ত্র দৃঢ় থাকিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরেকবার অরাজকতা দেখা যায়। দিল্লীর সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসকরা ও উচ্চরাজ কর্ম-চারীরা তাহাদের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত ছিল। বৃটিশ যুগের পূর্বে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার মধ্যে রজনৈতিক ঐক্যের বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম ও জ্ঞানের দিক দিয়া আদিবিধান সাংখ্য শাস্ত্রকার কপিল এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞানের ছটায় দিক্‌বিদিক আলোকিত করিয়াছিলেন। ইহার পর জৈন ধর্মের তীর্থংকর বুদ্ধদেব অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র ইত্যাদি মহামানবগণ প্রায় ১ হাজার বছর পূর্বে তিব্বতে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রসার করেন। অতীতে বাঙালী যে কেবল নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা নহে বাঙালী স্বকীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্যও প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি মনীষী ছিলেন জগৎবন্দিত। নবদ্বীপের বাঙালীদের নব্য ন্যায়চর্চ্চায় সারা ভারত মস্তক অবনত করিয়া

থাকিত। বাংলার মধুসূদন সরস্বতী আরেকজন জ্ঞানের অগ্রদূত ছিলেন। এই বাঙালীদের মধ্যে হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় সিদ্ধাচার্যগণ, যাঁহারা তাঁহাদের প্রগাঢ় জ্ঞানমহিমা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত করিয়া মানবচিত্তের মোহান্ধকার দূর করিয়া জগতে জ্ঞানবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন।

ধর্মসাধনার লীলাক্ষেত্র এই বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তি ও শৈব সাধনার লীলাভূমি এই বাংলা। তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্র এই বাংলাদেশ যেখানে বাঙালীই প্রথম ভগবানকে একমাত্র আপন করিয়া নিজ অন্তরে মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। কালী কেবল মা নহেন, তিনি কন্যারূপেও বাঙালীর মনে স্থান পাইয়াছেন। তিনি একাধারে উমা—গিরিরাজের কন্যা আবার অন্যদিক দিয়া শিবের পত্নীরূপে জগজ্জননী এবং ইহাই বাংলার গৃহস্থ জীবনের প্রতিচ্ছবি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং রামপ্রসাদের কালীসাধনা জগৎবন্দিত। তার পর শ্রীশ্রীমা সারদেশ্বরীর ভক্তি রসামৃতময় উপদেশ অধ্যাত্ম জীবন আজও ভক্তি রসের দিশারী। এইদেশের ধূলিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক ও প্রেমের মূর্ত্ত বিগ্রহ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি প্রেমবন্যায় সারা ভুবন প্লাবিত করিয়া যান। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় কবির উক্তি মনে পড়ে।

—'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া। তেমনি ধর্মপ্রাণা ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া ও নিত্যানন্দ গৃহিণী জাহ্নবী দেবী। বাঙালীর প্রতিভা, বাঙালীর গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত কোন কিছুর তুলনা করা চলেনা। অতীতের সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে শক্তি ও বৈষ্ণব সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। সেই সময় মঙ্গলকাব্যের বন্যায় সারা দেশ প্লাবিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ সেদিন শিল্পে সাহিত্যে দর্শনে, ললিত কলায়, চিত্র শিল্পে, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে, কাব্যে, গানে, শৌর্য্যে, শিক্ষা-দীক্ষায় সদ্‌গুণে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বাঙালীর দান মানুষ আজও শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করে। কাব্য সাহিত্যে বাঙালীর প্রতিভা অতুলনীয় ছিল, চর্যাপদ, জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী কালিদাসের কাব্য, চণ্ডীদাসের পদাবলী, কাশীরামদাসের মহাকাব্য সাহিত্য ও কাব্যে আলোড়ন জাগাইয়াছিল। ইহাছাড়া পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, বাউলগান, সারিগান, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী, পাঁচালী কবিগান বাঙালীর নিজস্ব অবদান ও পরম আদরের ধন। বিশেষ করে কবি চন্দ্রাবতীর রচনার তুলনা ভারতের সাহিত্যে বড় অল্প। বীরত্ব, সাহসিকতা, দেশপ্রেমে ও শৌর্য্যে বিজয়সিংহ, চাঁদরায়, প্রতাপাদিত্য, ধর্মপাল, শশাঙ্ক, গণেশ, ঈশা খাঁ প্রভৃতির প্রতাপ ও বীরত্ব যে কোন জাতীয় বীরের সঙ্গে তুলনীয়। ত্রয়োদশ শতকে বাংলার বীর নারী রাণী ত্রিপুরা সুন্দরী মোগল আক্রমণকারিদের পরাভূত করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। একসময়ে বার ভূঁঞা শক্তির সাড়ায় দিল্লীর স্বাধীনতা রক্ষা করেন। সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। একসময় বিজয়সিংহ সিংহল দ্বীপ জয় করেন। তাদের প্রেরণা যোগাইয়া ছিল বাঙলারই নারী—তাঁহাদের জায়া জননী ভগিনীগণ। সুদূর অতীতে বাঙালী ব্যবসাক্ষেত্রেও পিছাইয়া পড়ে নাই। অকূল সমুদ্রে সপ্তডিঙ্গা ভাসাইয়া বাঙালী চাঁদসর্দার একদিন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন. বাংলার মসলীন, বোগদাদ, রোম, চীন, কাঞ্চন তৌলই কিনতেন একদিন, এবং এই সমস্ত ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বাঙালীকে সুদূর জাভা, সিংহল, বালিদ্বীপে পাড়ি জমাইতে হইত।

শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলার তাঁত, শঙ্খ, হাতীর দাঁতের কাজ, সূচী এবং নৌশিল্প বাংলায় প্রসিদ্ধ শিল্পরূপে একচেটিয়া ছিল। নৌ শিল্প তখনকার দুর্লভ সম্পদ ছিল। ঘর ও নৌকানির্ম্মাণে বাঙ্গালী অতীতে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রেশমশিল্প অতীতে বাংলার একটি প্রসিদ্ধ শিল্প ছিল। ইহার মূলেও বাঙালীর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত শিল্পগুলি ছিল মনোহারী এবং নয়নরঞ্জক। ভাস্কর্য্যে ধীমান ও বীটপালের 'ছত্রমুখ' সৃষ্টিতে কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। অজন্তার গিরিগুহার চিত্রগুলিতে বাঙালীর শিল্প সাধনার নিখুঁত পরিচয় চক্ষুকে চমকিত করে। এই সমস্ত শিল্প শত বৎসরের সাধনার সাক্ষ্য দেয়।

অতীতের বাংলাকে দূরে ফেলিয়া আসার পর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশকে দেখা যায়। এই সময় বাংলাদেশ ভারতবর্ষের সমগ্র ধ্যানধারণাকে ভাবিত করিয়া তুলিয়া

ছিল। ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষা, পাশ্চাত্ত্য ভাব বাঙালীর জীবনে বহন করিয়া আনিয়াছে বিপ্লবের বার্ত্তা। এই নব্য শতাব্দীর চেতনা পুরাতনের অন্ধকারকে দূর করিয়া নূতন আলোক আনিতে চাহিয়াছে। জীবন বলিয়া যে স্বতন্ত্র বস্তু আছে এই কথা সকলকে জানাইতে চাহিয়াছে। এই সময় চারিদিকে মূল্যের তারতম্যের মাপকাঠি খাড়া হইয়াছিল। এই সময় কংগ্রেস প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ভায়তে যে নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল তাহার অগ্রে ছিল বাঙ্গালীর প্রেরণা। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী ধনে, মানে, চিন্তায় ভারতকে নেতৃত্ব দান করিয়াছে। সেই নেতৃত্ব দানের কাজে বাঙলার নারীও কম নয়। অরু দত্ত, তরু দত্ত, ও সরোজিনী নাইডুর কথা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগেও বাঙ্গালী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চাদগামী হইয়া পড়ে নাই। সাহিত্য ক্ষেত্রে, আচার ব্যবহার, চিন্তাধারা, শিক্ষা ধর্ম, শিল্পে যুগধর্মের তাগিদে কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যন্ত্র সভ্যতার প্রভাবে বাঙ্গালীর দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচির কিছুটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাঙ্গালীর শান্তমনে বিজ্ঞানের অবদান চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। পুরাতনকে দূরে রাখিয়া নূতনের আকাঙ্ক্ষায় কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিভার দীপবর্ত্তিকা সারা বাংলায় জ্বালাইয়া গিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, গিরীশ, সত্যেন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যসেবীর দান অতুলনীয়। কবি কামিনী রায়, গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, নিরুপমা দেবী মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি বিশ্বের বৈভব। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। চিত্রশিল্পে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় প্রভৃতি চিত্রশিল্পীরা চিত্রশিল্পে নব নব রূপ দিয়াছেন। গিরীশচন্দ্র সুকুমারী, তিনকড়ি, ইন্দুবালা, হরিমতী শিশির অহীন্দ্রের অভিনয় প্রতিভা নাট্যজগতে নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। নৃত্যে বাঙ্গালী উদয়শঙ্কর অমলা শংকরের দান অনবদ্য। ইন্দ্রজাল বিদ্যায় বাঙালীমায়ের যোগ্য সন্তান শ্রীপি, সি সরকার বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছেন। সঙ্গীতে আলাউদ্দিন, তাঁর কন্যা অন্নপূর্ণা, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রাধিকামোহন ও তিমির বরণ, এক একটি প্রাণবন্ত সুর ও মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করিতেছেন।

চিরবিপ্লবী বাঙ্গালী নব যুগের স্রষ্টা। বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র এই বাংলায় ঋষিকণ্ঠে ভারত মাতার বীজ-মন্ত্র রূপে গৃহীত হইয়াছিল। নেতাজীর স্বরাজ সাধনা সমগ্র ভারতে জাগিয়াছিল অনুপ্রেরণা। তাহা ছাড়া সেই সকল বিপ্লবীদের নাম স্মরণ করিতে পারি "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান" তাঁরাও বাঙ্গালী। ক্ষুদিরাম বাঘাযতীন, কানাই দেশমাতার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মাতঙ্গিনী হাজরার কথাও কেউ এখনও ভুলেন নাই। দেশহিতকর কার্য, সমাজ উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লেডী অবলা বসু, চিত্তরঞ্জন দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

রামমোহন রায় দেশের নিষ্ঠুর প্রথা যেমন সতীদাহ প্রথা তুলিয়া দেন, এবং তিনি ও বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন এবং নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। চিত্তরঞ্জন দাস নানান রকম দেশহিতকর কার্য্যের দ্বারা 'দেশবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সকল মনীষীরা তাহাদের হিত কার্য্যের দ্বারা আজিও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে আর একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন অরবিন্দ। দর্শকের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। মানুষের দেওয়া নিন্দা বা প্রশংসাকে তিনি কোন দিনই দৃষ্টি দেন নাই। আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহ কোন দিনই তাহাকে আচ্ছন্ন করে নাই। মানুষের সমাজে পরস্পরের মধ্যে বৈরীভাব, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি বর্ত্তমান। ইহা ছাড়া একে অপরের সর্বনাশ সাধনে ব্যস্ত। সকলে অহংভাবে আচ্ছন্ন। এই অহংভাব ও অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিলে সকলে মুক্তি পাইবে। এই চিরন্তন সত্যের দিকে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ জগৎ বন্দিত। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীকে মাতারূপে তাঁহার অন্তরে স্থান দিয়া জগৎকে শিখাইয়া গিয়াছেন ঈশ্বর দূরে নহেন অন্তরের অন্তঃস্থলেই তিনি বর্ত্তমান। অতএব প্রত্যেকেই যাহাকে সেই পরমতমকে

আহ্বান জানায় এই কথা শিখাইয়া গিয়াছেন। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের নাম চিরদিন জগতে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বঙ্গদেশ হইতে ভারতের বাহিরে যে সকল ধর্মপ্রচারক গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দের নাম প্রখ্যাত। বিদেশে তাঁহার ধর্ম প্রচারের ফলে, এদেশ সম্বন্ধে বিদেশীদের ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে এবং ইহা হইতেই ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণা উচ্চ হইয়াছে। মানুষের মধ্যেই যে নারায়ণ আসন পাতিয়াছেন মানুষের সেবাই যে নারায়ণের সেবা এই কথা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সংসারের মধ্যেই সেবা ও কর্মের মাধ্যমে তাঁহাকে লাভ করা যায় এই জ্ঞান তাঁহার হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। অন্যান্য মনীষীর সহিত তাঁহার গভীর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার সন্ন্যাস 'আত্মহিতায় নয়, উহা ছিল জগদ্ধিতায়, তিনি সকল সময় গীতার বাণীকে মন্ত্র রূপে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার প্রচারের শ্রেষ্ঠ বাণী 'সকল ধর্মই এক ; নরই নারায়ণ।'

তাঁহার বাণী এখনও প্রতিক্ষণে মনে পড়ে যায়—

বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ;
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

এই সমস্ত মনীষীদের জীবন আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করিতে শিক্ষা দেয়। ইহা হইতেই বাঙালীর জীবন যে যুগ যুগ ধরিয়া প্রতিভার দীপ্ত শিখাকে প্রজ্বলিত রাখিয়াছে তাহা সবার মানসপটে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিলে মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। বাঙ্গালীর গৌরব আজ কোথায়? রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ে বাঙালী আজ পরাজয়ের বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে।

বাঙ্গালী আজ সবকিছু নিজস্ব সম্পদ বিসর্জন দিয়া কোনরকমে কালাতিপাত করিতেছে। বঙ্গবিভাগের ফলে সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও নানান দুর্নীতি দেখা যায়। বিশেষ করিয়া পণপ্রথা বিরাট আকারের দুর্নীতি। অভাবগ্রস্থ অরক্ষণীয়া কন্যাকে অবশেষে নিজের বসবাসের ভিটাটুকুও খোয়াইয়া পাত্রের পিতার উদর পূরণ করিতে হয়। ইহাও দেখা যায় যে যদি বিবাহ আসরে একটি ত্রুটি দেখা দেয় তাহা হইলে বরকর্তার সহানুভূতি ত দূরের কথা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে অপমান করিয়া বিবাহবাসর হইতে পাত্রকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ইহা যে কতবড় দুর্নীতি তাহা কল্পনা করা যায় না। ফুলের মালার মত পণ্য সামগ্রীর পর্য্যায়ে পাত্রীদের ফেলা হইয়া থাকে পরখ করা সত্বেও মূল্যের মাপকাঠিতে তাহাকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইহা পাত্রপক্ষেরা যাচাই করেন না যে পাত্রীটিকেও হয়তো বহু অর্থব্যয়ে তাহাকে শিক্ষায় পারদর্শিনী করিতে হইয়াছে। অতএব পণপ্রথা নিরর্থক। এই যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি এই অবিচার অমার্জনীয়। এই অনার্য প্রথার জন্যে বাঙ্গালী মায়েরাই বিশেষ করে দায়ী।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তদের আর্ত চীৎকারে বাঙ্গালীর জীবন ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালীর জীবন মণিকোঠায় সমস্ত কিছুর প্রবাহ সঞ্চিত রহিয়াছে। তবে মানুষের মধ্যে যে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি সবই অজ্ঞানতা এই সমস্ত তত্ব কিছুটা অবগত হইয়াছে এবং সেইজন্য এই এই হিংসাভরা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। বাঙলার রাষ্ট্রনায়কগণ যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিরাছেন তাহা কার্যকরী হইলে আবার সোনার বাংলা ফিরিয়া আসিবে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনার সমস্যা সমাধান করিতে হইবে। অযথা অপচয়, পণপ্রথা নিরোধ করিতে হইবে। ধর্ম প্রসারের জন্য নানান উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মসংশোধনের জন্য বাঙ্গালী পুরুষকেই উদ্যোগী হইতে হইবে তা নয়, বাঙ্গালী মেয়েদেরও উদ্যোগী হইতে হইবে। অহংভাব বাঙালীকে ত্যাগ করিতে হইবে। নৈরাশ্যে ও হতাশায় বাঙালীকে ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না। মাথা তুলিয়া বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ মাথায় লইয়া ভবিষ্যত পথে প্রত্যেক বাঙালীর অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বাঙালীর ভবিষ্যত যাহাতে সুদৃঢ় হয় এই কথা চিন্তা করিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সত্যেন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে হইবে।

"মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারি নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টীকা পরি,

অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে বরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।

বাঙালী জাতিকে মানুষের মত করিয়া গড়িয়া তোলার দায়িত্ব আজ বাঙালী মায়েদেরই।

সুপর্ণা দেবী

প্রকৃতির মতোই নিজেকে রূপে-বর্ণে-গন্ধে সুন্দর-সুসজ্জিত করে তোলার বিচিত্র রীতি-অনুশীলন ও বাসনা-অনুরাগ পৃথিবীর সকল দেশের সুসভ্য এবং অসভ্য সকল সমাজের সকল শ্রেণীর নর-নারীর মধ্যেই সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে অধুনাবধি সুপ্রচলিত আছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের লোক-সমাজে বিবিধ অভিনব-উপায়ে রূপচর্চ্চা ও প্রসাধন-কলার যে রীতিমত রেওয়াজ ছিল, পুরোনো ঐতিহাসিক পুঁথি-পত্রে এবং বিভিন্ন মন্দির-গাত্রে-খচিত স্থাপত্য-শিল্পেও তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। সেই সব তথ্য-নিদর্শন থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে অঙ্গরাগ-প্রসাধনের সাহায্যে রূপচর্চ্চা আজকের সৌখিন-রীতি নয়, বহু যুগ-যুগান্তকাল ধরেই দুনিয়ার সকল শ্রেণীর মানব-সমাজে পরম সমাদরে চৌষট্টি-কলার অন্যতম বিশিষ্ট-কলা হিসাবেই চিরন্তন এই প্রথাটি সাগ্রহে অনুসৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজের নর-নারী বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন প্রসাধনী-উপকরণাদির সাহায্যে নিয়ত রূপচর্চ্চার উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করে আসছেন।

প্রাচীন যুগে যে সব প্রসাধনী-প্রকরণের সন্ধান মেলে, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—সুগন্ধি তেল, অগুরু-চন্দন, কর্পূর, কাজল, সিন্দুর, অলক্তক, গন্ধ-পুষ্পের পরাগ-কেশর প্রভৃতি; পরবর্ত্তী মোগল-আমলে রূপচর্চ্চার উপকরণ ছিল—সুর্মা, সুগন্ধি আতর ও তেল, মেহেদী-পাতার রস প্রভৃতি। এ সব প্রসাধন-সামগ্রী পুরুষ ও নারী নির্ব্বিশেষে সেকালের সৌখিন-সমাজের সকলেই পরমাগ্রহে ব্যবহার করতেন। এদেশে বিভিন্ন ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বাণিজ্য ঔপনিবেশিক কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাউডার, রুজ, এসেন্স, ল্যাভেণ্ডার-ওয়াটার, ইউডিকোলোন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বিবিধ প্রসাধনী—সামগ্রীর প্রচলন সুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশের গ্রামে-শহরে সর্ব্বত্রই রূপচর্চ্চার এই বিদেশী রীতি এবং বিবিধ উপকরণগুলি বিপুল প্রসারতা ও সমাদর লাভ করেছে। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, সকল শ্রেণীর সৌখিন আধুনিক নর-নারীর কাছে বিদেশী প্রসাধন রীতির এই ব্যাপক সমাদরের ফলে অধুনা ছোট বড় সাধু অসাধু বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী নির্ম্মাতা ও ব্যবসায়ী জন-সাধারণের ব্যবহারার্থে ভালো-মন্দ, সস্তা ও দামী বহুবিধ ধরণের সুন্দর মনোহারী রূপচর্চ্চার উপকরণ পরিবেশন করে শহরের ও গ্রামের বাজারগুলি ভরে তুলেছেন। বাস্তবিকই আজকাল নিত্য-নূতন এত রকমের বহু-বিজ্ঞাপিত ও সৌখিন রূপ-প্রসাধনের সামগ্রীতে বাজার ছেয়ে গেছে যে, এগুলির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট এবং কোনটি অপকৃষ্ট, সে সম্বন্ধে সঠিক যাচাই বা বিচার করাও সহজ-সম্ভব নয়। সেকালের প্রসাধন-সামগ্রী-ব্যবসায়ীদের এমন ব্যাপক প্রাধান্য ছিল না⋯নির্ম্মাতারাও তাই এখনকার মতো ভেজাল-সামগ্রী পরিবেশনের বদলে আসল জিনিষ সরবরাহ করতেন। তাছাড়া সেকালে পুরুষ ও নারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই প্রসাধন বা অঙ্গরাগ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান-রীতি এবং নিয়মিতভাবে এই রীতি-অনুসারে সুষ্ঠু এবং রুচিসম্মত উপায়ে প্রসাধন-চর্চ্চানুশীলনের ফলেই, তখনকার সৌখিন-জনগণের মধ্যে চর্ম্মরোগের ব্যাপকতা আধুনিক-কালের মতো এমন প্রবল ছিল না। পাশ্চাত্য-রীতি অনুসরণে ব্যাপকভাবে নির্ম্মিত, প্রচারিত ও পরিবেশিত মনোহারী চাক-চিক্য-শ্রীমণ্ডিত বিবিধ বিচিত্র আধুনিক প্রসাধনী-সম্ভার আজকাল যতই বেশী আমাদের দেশের সৌখিন-সমাজে আধিপত্য বিস্তার করছে, ততই

জন-সাধারণের মধ্যে একজিমা প্রভৃতি, ব্রণ, মেছেতো, বিভিন্ন প্রকারের চর্ম্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। কাজেই এ সম্বন্ধে সজাগ-দৃষ্টি দেওয়া আজ বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, রূপচর্চ্চার মূখ্য-উদ্দেশ্য হলো—শুধু অঙ্গরাগ-প্রসাধনে, সাজে-সজ্জায় নিজেকে অপরূপ-সুন্দর দেখানোই নয়, বরং দেহের স্বাস্থ্য-লাবণ্য যাতে অটুট থাকে, চর্ম্ম-ত্বকের ঔজ্জ্বল্য যাতে সজীব-অমলিন থাকে, তারই, যথাযথ যত্ন নেওয়া এবং উন্নতিসাধন করা! তাই আপাততঃ সেই বিষয়েই মোটামুটিভাবে কিঞ্চিৎ হদিশ দিচ্ছি।

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান…কাজেই এদেশের নর-নারীর পক্ষে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি প্রত্যেকটি ঋতুতেই দেহ-মুখের পরিচর্য্যা, অঙ্গ-প্রক্ষালন এবং রূপ-প্রসাধনের রীতি-প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরণের ও বিশেষ-বিশেষ ঋতু-উপযোগী হওয়া দরকার। এখন গ্রীষ্মকাল… সুতরাং গোড়াতেই আলোচনা করা যাক—গ্রীষ্মকালোপযোগী রূপ-চর্চ্চার রীতি।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণতঃ সকলেরই দেহে অল্প-বিস্তর ঘর্ম্মোৎসারণ হয়। তাই এ সময়ে রূপ প্রসাধনের ব্যাপারে সর্ব্বদা সজাগ-দৃষ্টি রাখা দরকার যে দেহ যেন শীতল, স্নিগ্ধ ও সুস্থ থাকে। কারণ, গ্রীষ্ম-তাপ শরীরের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষভাবে ক্লান্তি, অবসন্নতা ও ক্ষয়কারক। কাজেই গ্রীষ্মকালে ক্লান্তি, অবসন্নতা ও ক্ষয়-ক্ষতির উপদ্রব বাঁচিয়ে শরীর নীরোগ এবং স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হলে, সময়োপযোগী খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, নিয়মিত স্নান, অঙ্গ-প্রক্ষালন এবং যথোচিত উপায়ে দেহ-প্রসাধনের বিষয়ে সতর্ক আর মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকের ধারণা—এদিকে নজর দিয়ে রূপচর্চ্চা করা—নিছক ব্যয়বহুল সৌখিন বিলাসিতায় প্রশ্রয় দেওয়া। এমন ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, দেহ-প্রসাধনের আসল উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যচর্চ্চা—যার ফলে, নর-নারী প্রত্যেকেরই শরীর-মন সুস্থ-নীরোগ, ফুল্ল কর্ম্মঠ থাকে… দেহ, ত্বক, প্রভৃতি বিভিন্ন শারীরিক-অংশগুলি আগাগোড়া নির্ম্মল পরিচ্ছন্ন ও লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

শরীর সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য গ্রীষ্মকালে প্রাতে ও অপরাহ্নে দু'বেলা স্নান করাই বিধেয়…তার ফলে, শুধু যে দেহ-মনের ক্লান্তি-অবসন্নতার অপনোদন হয় তাই নয়, নবীন উদ্দীপনা জাগে শরীরে, মনও ভরে ওঠে সজীব-প্রফুল্লতায়। গ্রীষ্মকালে নিয়মিতভাবে স্নানের সময়, যে সব নর-নারীর দেহ-চর্ম্ম নরম ও মসৃণ, তাঁদের পক্ষে চন্দন (Sandal-wood) বা নিমের (Margo) সাবান ব্যবহার করাই ভালো। যাঁদের দেহ-চর্ম্ম অপেক্ষাকৃত কর্কশ ও অমসৃণ, তাঁদের পক্ষে যে কোনো রকম ভালো 'গ্লিসারিন' (Glycerine) সাবান ব্যবহার করাই সমীচীন। স্নানের পূর্ব্বে অল্প-পরিমাণে খাঁটি সরিষার তেল অথবা 'অলিভ-অয়েল' (Olive oil) ব্যবহার করে অঙ্গ-মর্দ্দনের রীতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত…দেহ-প্রসাধনের পক্ষে এই সনাতন রীতির নিয়মিত অনুসরণ যে বিশেষ উপযোগী, সে সম্বন্ধে আধুনিক শরীর-তত্ত্ব-বিশারদ চিকিৎসকেরা অনেকেই প্রায় এক-মত। মুখ-চর্ম্মের লাবণ্য-শ্রী, বর্ণ-সুষমা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গক্রমে বিশেষ এক-ধরণের ঘরোয়া-প্রসাধনী সামগ্রী প্রস্তুত করার উপায় এখানে বলে রাখা চলে। সেটি তৈরী করার নিয়ম হলো—

(১) চায়ের চামচের এক-চামচ পরিমাণ চন্দনের গুঁড়ো (Sandalwood Powder),

(২) ১০ গ্রেণ পরিমাণ কর্পূরের গুঁড়ো (camphor Powder) ;

(৩) ৫ গ্রেণ পরিমাণ সোহাগা (Borax) ;

উপরোক্ত উপকরণগুলির সঙ্গে ২ আউন্স পরিমাণ ভালো 'ট্যাল্কম্ পাউডার' (Talcum Powder) মিশিয়ে নিয়ে প্রত্যহ স্নানের পর একবেলা করে মুখে মাখলে শুধু যে মুখচর্ম্ম নির্ম্মল, মসৃণ, স্নিগ্ধ ও বর্ণোজ্জ্বল থাকে তাই নয়, সচরাচর মুখে কোনো রকম ব্রণ, মেছেতা বা চর্ম্মরোগের বেয়াড়া দাগ দেখা দেয় না।

এটি ছাড়াও আরো একটি ঘরোয়া মুখ-প্রসাধনী প্রস্তুত করার পদ্ধতির পরিচয় দিয়ে রাখছি। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে মুখ-প্রসাধনী তৈরী করার নিয়ম হলো—

(১) চায়ের চামচের এক-চামচ পরিমাণ চন্দনের গুঁড়ো (Sandalwood Powder) ;

(২) চায়ের চামচের সিকি-চামচ পরিমাণ 'ক্যালামিন পাউডার' (Calamine Powder) ;

(৩) চায়ের চামচের ১/২ চামচ পরিমাণ তুঁতের গুঁড়ো (Copper-sulphate Powder);

উপরে উল্লিখিত তিনটি উপকরণের সঙ্গে ৪ আউন্স পরিমাণ ভালো 'ট্যাল্‌কম্ পাউডার' (Talcum Powder) মিশিয়ে নিয়ে প্রতিদিন স্নানের পর একবেলা করে মুখে মাখলে মুখচর্ম্ম নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, মসৃণ ও বর্ণ-শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

এ দুটি ঘরোয়া-প্রসাধনী ব্যবহারের মোটামুটি রীতি হলো—

(১) যাঁদের দেহ-চর্ম্ম গৌরবর্ণ, তাঁদের পক্ষে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রসাধনী ব্যবহার করাই বিধেয়। এ প্রসাধনী ব্যবহারের ফলে, তাঁদের দেহ-চর্ম্মের জৌলুষ বৃদ্ধি পাবে এবং কারো মুখে যদি ব্রণ, মেছেতা প্রভৃতির কোনো রকম বিশ্রী দাগ থাকে, তাহলে স্নানের পর প্রথমেই ১/১০০০ পরিমাণ 'হাইড্রোজ-পারক্লোর (Hydraz Perchlore Lotion) লোশ্যন্' দিয়ে আগাগোড়া পরিপাটি ভাবে মুখ ধুয়ে উপরোক্ত প্রসাধনীটি ব্যবহার করলে সবিশেষ উপকার পাবেন।

(২) যাঁদের দেহ-চর্ম্ম শ্যামবর্ণ, তাঁদের পক্ষে প্রথম পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রসাধনী ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। তবে এ প্রসাধনী ব্যবহারের পূর্ব্বে, প্রত্যহ স্নানের পর একবেলা করে তাঁরা যদি এক পেয়ালা ঈষৎ-গরম জলে ১০ ফোঁটা ব্রাণ্ডি মিশিয়ে, সেই 'মিশ্রণ' দিয়ে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে ফেলে প্রথম-পদ্ধতিতে প্রস্তুত ঘরোয়া-প্রসাধনীটি ব্যবহার করেন, তাহলে তাঁদের দেহ-চর্ম্ম অনেকখানি উজ্জ্বল, মসৃণ ও লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

এছাড়া সনাতন-রীতি অনুসারে, মুখচর্ম্ম উজ্জ্বল ও সুন্দর রাখার জন্য আমাদের দেশে দুধের সর মুখে মাখার যে রেওয়াজ আছে, সেটি ব্যবহার করা চলে—বিশেষতঃ যাদের দেহ-চর্ম্ম নরম ও মসৃণ। তবে যাঁদের দেহ-চর্ম্ম অপেক্ষাকৃত কর্কশ ও অমসৃণ, তাঁদের পক্ষে দুধের সরের সঙ্গে অল্প পরিমাণে টোম্যাটোর রস মিশিয়ে নেওয়াই সমীচীন। তাছাড়া যাদের মুখচর্ম্ম রুক্ষ-কর্কশ, তাঁরা যদি নিয়মিতভাবে সপ্তাহে অন্ততঃ দু'দিন মুখে টোম্যাটোর রস মাখেন তো সবিশেষ উপকৃত হবেন। এভাবে টোম্যাটোর রস ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যদি সপ্তাহে অন্ততঃ চারদিন এক পেয়ালা জলে চায়ের চামচের এক-চামচ 'অলিভ-অয়েল' (Olive Oil) এবং বিশ-ফোটা 'রেক্টি-ফায়েড-স্পিরিট' (Rectified Spirit) বা 'এ্যাল্‌কোহল্' (Alchohol) অথবা 'ইউ-ডি-কোলোন্' (Eue-de-Cologne) মিশিয়ে, সেই 'মিশ্রণ' মুখে মাখেন, তাহলে আরো বেশী উপকার পাবেন বলেই বিশ্বাস হয়।

স্থানাভাবের কারণে, রূপ-চর্চ্চা সম্বন্ধে আলোচনা আপাততঃ এখানেই মুলতুবী রাখতে হলো…আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আরো কিছু হদিশ জানানোর বাসনা রইলো।

—

ষ্টেন্‌সিলের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

এবারে বলছি—খুবই সহজসাধ্য অভিনব-ধরণের বিশেষ একটি কারুশিল্প-পদ্ধতির কথা। ইংরাজীতে এই কারুশিল্প পদ্ধতির নাম—'ষ্টেন্‌সিলিং' (Stenciling)…অর্থাৎ, বাঙলা ভাষায় যাকে বলা যায়—'নক্সার ছাঁচ-কাটা ও ছাঁচ-তোলার কলা-কৌশল। গোড়াতেই বলেছি, এ কলা-কৌশল আয়ত্ত করা এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন ব্যাপার নয়। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে যে কোনো সুগৃহিণী সামান্য চেষ্টাতেই বিচিত্র এই 'ষ্টেন্‌সিলিং' পদ্ধতির সাহায্যে ঘর-বাড়ীর দেয়াল ও দরজা জানলার গায়ে, সৌখিন আসবাব পত্রের কিনারায় এবং কাঁচের শার্শীর উপরে, বাগানে বা ছাদে বারান্দায় সাজানো ফুলের টবের ও শিশুদের খেলার ও পড়ার ঘরের (Nursery

corner) বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জামের গায়ে, কাগজের ও চামড়ার তৈরী বিবিধ কারুশিল্প সামগ্রী অলঙ্করণের কাজে, এমন কি—সুতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের তৈরী নানা রকম পোষাক-পরিচ্ছদ, রুমাল, 'স্কার্ফ' (Scarf), 'ষ্টোল্' (Stole), ছোট ছেলেমেয়েদের 'বিব্' (Bib), 'এ্যাপ্রন্' (Apron), ঘরের দরজা-জানলার পর্দা, বিছানা ঢাকা, 'টেবিল ক্লথ,' 'টি-কোজি' (Tea-Cosy), সোফা-কৌচ-ডিভানের' (Sofa, Couch, Divan) আবরণী, বালিশের ওয়াড়, 'ন্যাপকিন', 'টেবিল-ম্যাট' (Table-Mat), কাঁথা প্রভৃতি বিবিধ ঘরোয়া-জিনিষপত্রের উপরে সুন্দর বাহারী ফুল-লতা-পাতা, জীবজন্তু-মানুষের প্রতিলিপি গাছপালা-নদী-পর্ব্বতময় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও নানা-ছাঁদের বিচিত্র 'অলঙ্করণ-শিল্পের' (Decorative-Motifs) রঙচঙে-সুন্দর 'নক্সার ছাঁচ' (Stencil-Designs) তুলে খুব সহজেই এবং স্বল্প-ব্যয়ে সেগুলিকে রীতিমত মনোমুগ্ধকরভাবে বিভূষিত করা যাবে। 'ষ্টেন্‌সিল্'-পদ্ধতিতে কোনো সামগ্রীর উপরে শিল্প-নক্সার ছাঁচ তুলতে হলে, সাধারণতঃ মোটা-কাগজ অথবা পাতলা-কার্ডবোর্ড কিম্বা মিহি ধরণের টিনের পাতের একদিকে প্রয়োজন মতো ছাঁদে 'ছবি' বা 'নক্সার' হুবহু 'প্রতিলিপি' এঁকে বা (drawing) 'ট্রেসিং' (Tracing) প্রথায় 'নকল' (Copying) করে নিয়ে, সেই 'প্রতিলিপির' বাইরের অংশ (Out line) যথাযথ বজায় রেখে, ধারালো ছুরি বা নরুন অথবা ক্ষুরের ব্লেডের সাহায্যে নক্সার ভিতরকার অংশটুকু (Inside portion) সুষ্ঠুভাবে কেটে নিলেই, খুব সহজেই 'মূল-ছবি' বা 'নক্সার' (Original Design) অবিকল 'ছাঁচ' রচিত হয়ে যাবে। এবারে সেই 'নক্সার' ছাঁচটিকে দেয়াল, কাঠ, কাঁচ বা কাপড় যে কোনো স্থানে বসিয়ে, ছাঁচের ভিতরকার ছাটাই-করা অংশের উপরে তুলির সাহায্যে রঙ লেপে দিলেই নীচেকার জিনিষের উপর মূল-ছবি' (Original Design) বা আসল নক্সার' হুবহু 'ছাঁদ' বা 'ছাপ' (Stencilled Copy) ফুটে উঠবে। এই হলো 'ষ্টেন্‌সিল্' পদ্ধতিতে কারুশিল্প-সামগ্রী অলঙ্করণের মোটামুটি রীতি। তবে শুধু এইটুকু তথ্য-পরিচয় জানলেই 'ষ্টেন্‌সিল্'-পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের কারুশিল্প সামগ্রীর উপর 'নক্সার ছাঁচ-তোলা' সম্ভব নয়। তাই এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

কিন্তু সে আলোচনার আগে, 'ষ্টেন্‌সিল্'-পদ্ধতির কারুশিল্প-সামগ্রীর উপর 'নক্সার ছাঁচ তুলতে যে সব সাজ সরঞ্জাম দরকার, আপাততঃ তার একটা ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ এ কাজের জন্য চাই—বেশ মজবুত-ধরণের মোটা-কাগজ অথবা পাতলা পাতলা-কার্ডবোর্ড কিম্বা মিহি-ছাঁদের টিনের পাত (Thin sheet of Galvanized Tin), এক পেয়ালা রেড়ির তেল (Caster Oil), নক্সার ছাঁদ-কাটা কাগজের উপর রেড়ির তেলের প্রলেপ লাগিয়ে কাগজটিকে পাকাপোক্ত করে নেবার জন্য ভালো একটি চওড়া-মুখওয়ালা তুলি (Paint-Brush), কাগজ, কার্ডবোর্ড বা মিহি-ছাঁদের টিনের পাতের উপর 'নক্সার ছাঁচ' আঁকার উপযোগী ড্রইং-পেন্সিল,রবার,(Eraser),'কার্ব্বন-পেপার' (Carbon paper fot Tracing), 'রুলার' (Scale-Ruler), জ্যামিতিক চিত্র-রচনার উপযোগী 'ডিভাইডার্-কম্পাস্' প্রভৃতি সরঞ্জাম, একটি বেশ বড় সাইজের পুরু-সমতল কাঁচ, পাথর কিম্বা কাঠের পাটা, একটি ধারালো নরুণ, ক্ষুরের 'ব্লেড্' (Safety-Razor Blade) ও ছুরি, কয়েকটি ভালো সরু এবং মোটা ছবি-আঁকার তুলি, প্রয়োজনানুসারে লাল, নীল, সবুজ, হলদে, কালো, সাদা, বাদামী, বেগুনী প্রভৃতি কয়েক-ধরণের ভালো 'জল-রঙ' (Water-Colours) কিম্বা 'তেল-রঙ' (Oil-Colours বা Enamel or varhish paints), রঙ, তুলি এবং হাত পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য একটুকরো কাপড় ও অপ্রয়োজনীয় তেল, জল আর রঙের ছোপ মুছে ফেলার জন্য বেশ বড়সাইজের একখানি 'ব্লটিং-পেপার' (Blotting-paper)। প্রসঙ্গক্রমে জেনে রাখা ভালো যে যাঁরা ঘরে বসে নিজের হাতে নক্সা-রচনা 'স্টেনসিলের' ছাঁদ-কাটবার কাগজ (Stencil-paper) তৈরী এবং নিখুঁত-ছাঁদে 'আলঙ্কারিক-নক্সার ছাঁদ (Decorative patterns) কাটবার মেহনৎ বাঁচানোর পক্ষপাতী, তাঁদের সুবিধার্থে বাজারে বড়-বড় রঙের দোকানে নানারকম বিচিত্র সুন্দর নক্সাদার ছাঁচ-কাটা 'ষ্টেন্‌সিল্-পেপার' (Stencil-papcr) কিনতে পাওয়া

যায়···সেগুলির দামও এমন কিছু বেশী নয়। কাজেই এমনি ধরণের দোকান-থেকে-কেনা বিচিত্র নক্সাদার 'ষ্টেন্‌সিল্‌-পেপারের' সাহায্যে তাঁরা অনায়াসেই বিবিধ কারুশিল্প-সামগ্রীর উপর বিভিন্ন-ছাঁদের রঙীন-সুন্দর 'নক্সার ছাঁচ' তুলতে পারবেন। তবে যাঁরা নিজের হাতে 'ষ্টেন্‌সিল্‌'-কারুশিল্পের প্রত্যেকটি কাজ সুচারুভাবে করতে চান, তাঁদের অবশ্য 'নক্সার ছাঁচ-তোলার কাগজ' (Stencll) paper) তৈরী এবং সে কাগজের উপর নিখুঁত-ছাঁদে 'নক্সার ছাঁচ-কাটার' (Stencil-Cutting) পদ্ধতির সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি বিশেষ কলা-কৌশল জেনে রাখা দরকার।

প্রথমেই বলি—ষ্টেন্‌সিল্‌-কারুশিল্পের উপযোগী 'নক্সার ছাঁচ-তোলার কাগজ' (Stencial-paper) তৈরীর কথা। কোনো একটি 'নক্সার' যদি অনেকগুলি 'ছাচ' তুলতে হয়, তাহলে 'নক্সার ছাঁট-কাটা' সেই কাগজখানি যাতে বারবার ব্যবহার এবং রঙের প্রলেপ লাগানোর ফলে অচিরেই নষ্ট হয়ে না যায়, সেজন্য 'ছাঁচের কাগজ খানির' উপরে অন্ততঃপক্ষে বার দুয়েক রেড়ির তেলের প্রলেপ দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া দরকার এবং সেই 'ছাঁচের কাগজখানি' আগাগোড়া বেশ শুকনো খটখটে না হলে, সেটিতে 'নক্সার ছাঁচ' কাটা উচিত নয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে, 'ষ্টেন্‌সিল্‌' কারুশিল্পের কাজে নানান অসুবিধা ও ত্রুটি দেখা দিতে পারে। কাজেই 'ষ্টেন্‌সিল্‌ কারুশিল্পের কাজের সময় এদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

এমনিভাবে 'ষ্টেন্‌সিল্‌'-কারুশিল্পের উপযোগী 'নক্সার ছাঁচ তোলার কাগজ' তৈরীর পর, সে কাগজের উপর 'নক্সার ছাঁচ' এঁকে বা 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নেবার পালা। বিশেষ-পদ্ধতিতে বানানো 'ষ্টেন্‌সিল্‌-পেপারের' (Stencil-paper) উপর কি উপায়ে বিভিন্ন 'নক্সার-ছাঁচ' আঁকা হয়, স্থানাভাববশতঃ সে কথা আলোচনার সুযোগ আপাততঃ মিলছে না। তাই পরের মাসে এ সম্বন্ধে বিশদ-আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো। [ক্রমশঃ
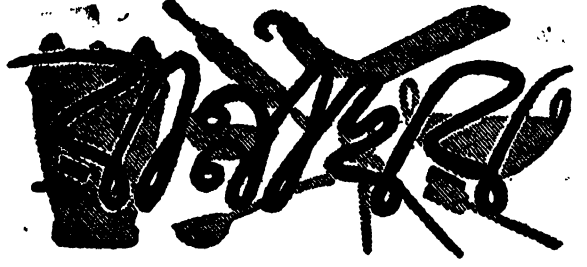
সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—পূর্ব্ব-বঙ্গ অঞ্চলের অপরূপ সুস্বাদু বিশেষ এক-ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার কথা। বিচিত্র উপাদেয় এই মিষ্টান্নটির নাম—'ঢাকাই গজা'।

অভিনব-মুখরোচক 'ঢাকাই গজা' রান্নার জন্য উপকরণ চাই—দেড় পোয়া ময়দা, দেড়পোয়া চিনি, কয়েকটি ছোট এলাচ এবং আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা ঘি।

এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, প্রথমেই ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে একটি ডেক্‌চিতে প্রয়োজনমতো পরিমাণে জল ও চিনি মিশিয়ে, সেই মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণ উনানের আঁচে বসিয়ে ভালোভাবে ফুটিয়ে চিনির-রস' পাক করে ফেলুন। 'চিনির-রস' পাক করার অবসরে পরিষ্কার একটি পাত্রে ছোট এলাচের দানাগুলি ছাড়িয়ে, সেগুলি বেশ মিহি-ছাঁদে গুঁড়িয়ে রাখুন। ইতিমধ্যে চিনির-রস বেশ ফুটন্ত ও সুষ্ঠুভাবে পাক করা হলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটি নামিয়ে রেখে, সদ্য পাক-করা 'চিনির-রসটুকু আগাগোড়া জুড়োতে দিন।

এবারে পরিষ্কার একটি পাত্রে ময়দাটুকু ঢেলে, বেশ বেশী করে 'ময়ান' দিয়ে নিন। অন্য একটি ছোটপাত্রে অল্প একটু ঘি ফেটিয়ে, সেই ঘিয়ে এক-চামচ পরিমাণ ময়দা মিশিয়ে 'লেই' বা 'তরল-মিশ্রণ' বানিয়ে নেবেন। অতঃপর অল্প একটু গরম-জল ও ছোট-এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে 'ময়ান' দেওয়া ময়দাটুকু আগাগোড়া বেশ নরমভাবে ঠেসে মেখে নেবার পর, সেই 'ময়দার তালটি' থেকে ছোট-ছোট আকারের 'লেচি' কেটে নিন। এবারে চাকী-বেলনীর,

সাহায্যে প্রত্যেকটি 'লেচিকে' পরিপাটিভাবে এবং বেশ বড়-বড় সাইজে লুচির মতো গোলাকারে বেলে, সেগুলির গায়ে চামচের পিছন-দিক দিয়ে ইতিপূর্ব্বে বানিয়ে-রাখা ময়দা-গোলা 'লেই' বা 'তরল-মিশ্রণের' পাৎলা-প্রলেপ মাখিয়ে নিয়ে, তার উপর হাতের আঙ্গুলের সহায়তায় অল্প একটু ময়দার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। এ কাজের পর, সদ্য-বেলা 'লেচিটিকে' এবারে হাতের আঙুলের সাহায্যে লম্বালম্বিভাবে গুটিয়ে ফেলুন। এমনিভাবেই প্রত্যেকটি 'লেচিকেই' পরিপাটি-ছাঁদে বেলে এবং গুটিয়ে নিতে হবে এবং গোটা সাত-আট 'লেচি' বেলে ও গুটিয়ে নেওয়া হলে, সেগুলিকে পরিষ্কার একটি থালার উপরে সারি দিয়ে বেশ মোটা-ধরণে সাজিয়ে রেখে ছুরির সাহায্যে এক ইঞ্চি মাপের ছোট-ছোট টুকরো করে কেটে নিন। এবারে ঐ ছোট-ছোট টুকরোগুলিকে চাকী-বেলনীর সাহায্যে মৃদু চাপ দিয়ে পুনরায় লম্বালম্বিভাবে বেলে নিন।

এ পর্ব্ব সারা হলে, রন্ধন-পাত্রে এবারে বেশী পরিমাণে ঘি দিয়ে লম্বালম্বিভাবে-বেলা ঐ ছোট-ছোট টুকরোগুলিকে সেই ফুটন্ত-ঘিয়ে আগাগোড়া বেশ বাদামী-রঙের করে ভেজে ফেলুন। এমনিভাবে ভাজার ফলে, 'লেচির' টুকরোগুলির প্রত্যেকটিতে বেশ থাকে থাকে ভাঁজ পড়ে যাবে। তখন সেগুলিকে রান্নার খুন্তী বা ঝাঁজরায় সযত্নে রন্ধন-পাত্রের ফুটন্ত-ঘি থেকে তুলে এতক্ষণ জুড়িয়ে রাখা 'চিনির-রসের' পাত্রে রাখুন। টুকরোগুলিকে 'চিনির-রসে' তুলে রাখার সময়, নিজের পছন্দ-অভিরুচি অনুসারে, আগাগোড়া রসে ডুবিয়ে বা ঈষৎ-প্রলেপিত করে নিতে পারেন। প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশনের আগে, টুকরো-গুলিকে কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ রস-সিক্ত করে রাখা দরকার। এ কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে সারতে পারলেই, পূর্ব্ব-বঙ্গীয় পাক-প্রণালীতে 'ঢাকাই গজা' মিষ্টান্ন বানানোর পালা চুকবে।

এ খাবারের স্বাদ-গ্রহণ করে ছোট-বড় প্রিয়জনেরা সকলেই যে পরম-পরিতৃপ্তি লাভ করবেন—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বারান্তরে, এমনি ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব ভারতীয় খাবার রান্নার হদিশ জানানোর বাসনা রইলো।

তোমাকে প্রণাম

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আজো তোমাকেই বড় ভালবাসি—
ঈশানের মেঘপুঞ্জ তোমাতে কোথাও
অজস্র বর্ষণ শেষে হয়েছে উধাও।
নিরলম্ব আকাশ পাটে তারা রাশি রাশি।

এ পৃথিবী কংসের কারাগার—
আজো দেবকী-বসুদেব আছে রাত জেগে
বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয় ঘনকালো মেঘে
বুকেতে পাথর-চাপা—সম্মুখে আঁধার।

অনেক দেবকীর শানিত কান্নার শেষে
কংসের কারাগারে একাই তুমি এলে,
এখানেই খুঁজে খুঁজে জীবনের সুর পেলে
পথের আলোয় এলে উষার হাসি হেসে।

মায়ার নির্মোক ভেঙ্গে সহাস পৃথিবীতে
সেদিন বিজয়ীর বলদীপ্তি তোমার চোখে মুখে,
ভোরের কুয়াশা-স্নান-করা আলোর দুর্লভ এক মুখে
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এলো হাতে হাত দিতে।

জানো নি কখনো তুমি মৃত্যু কার নাম—
মানুষের হৃদয়ে আর মাটির আকাশে
ভোরের সূর্যের মতো কেমন সহজে হাসে
তোমার সোনার স্মৃতি। স্বামীজি, তোমাকে প্রণাম

চিত্রশিল্পীর ওপর গ্রহের প্রভাব

উপাধ্যায়

কর্ম জীবনে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব আছে। ভাগ্যের মত কর্মও গ্রহনক্ষত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষ পুত্তলিকা মাত্র। তার পক্ষে যদৃচ্ছারূপ কর্ম করবার শক্তি নেই। এ সব কথাও যেমন সত্য, আবার একথাও সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, গ্রহ নক্ষত্র আমাদের যা কিছু সব করে থাকে, আমাদের নিজের কিছুই করবার নেই। নিজের খেয়ালেই হোক্ বা অভিভাবকের তাগিদেই হোক্ অনেক সময়ে সামনে যে কর্ম পাওয়া যায় তাই নিয়ে কর্মজীবন সুরু করতে হয়, ফলে অনেক সময় যোগ্যতা প্রকাশের অনুকূল না হওয়ায় নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কষ্ট পেতে হয়। যে বিষয়ে যোগ্যতা নেই তাতে আত্মনিয়োগ করে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা নিয়ে শেষে কর্মক্ষেত্র হোতে বিদায় নিতে হয়। এজন্যে জ্যোতিষের নির্দ্দেশ অনুসারে কর্মগ্রহণ আবশ্যক, তাতে সাফল্য, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জ্জন করে কর্মস্থল থেকে বেরিয়ে আসা যায়। কর্মজীবনে বৃত্তি নির্ব্বাচন সম্পর্কে সকলেরই ভেবে চিন্তে কাজ করা উচিত, আর জ্যোতিষীর কাছে কোষ্ঠী নিয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে চলা বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমান যুগে চিত্র জগতে প্রবেশ করে উজ্জ্বল তারকা হবার সাধ অনেকেরই ভেতর দেখা যায়। গ্রহ নক্ষত্রের শুভ যোগাযোগ ভিন্ন চিত্র তারকা হওয়া যায় না। হার্শেলের আবিষ্কারের পর থেকেই শ্রমশিল্পবিপ্লব পৃথিবীতে দেখা দেয়, মানুষের জীবন যাত্রার পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকে। মানুষ ক্রমেই কৃত্রিম জীবন যাপন সুরু করলো, প্রকৃতির কোল থেকে নেমে পড়ে যন্ত্রদানবের বোধন করলো। যন্ত্রদানবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে কলে কাজ সুরু করলো। অত্যন্ত উঁচু ধরণের সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে হার্সেলের আনুকূল্যে। পলায়নী মনোবৃত্তি'কে সংযত করবার জন্যে দেখা দিল নেপচুন, সে হয়ে উঠলো হার্সেলের প্রতিষেধক। সর্ব্বপ্রকার গণ জীবনের আমোদ প্রমোদের উন্নয়ন ঘটেছে নেপচুনের আবিষ্কারের ফলে।

চিত্রজগতের স্রষ্টা হচ্ছে নেপচুন। যে সব জিনিষ আসল রূপ লুকিয়ে রেখে অন্যরূপে নিজেদের প্রকাশ করে তারা নেপচুনের অধীন। সিনেমা বা চলচ্চিত্রের পশ্চাতে অত্যাবশ্যক নেপচুনীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসিক সুগভীর অনুভূতি বা আবেগের ক্রমবিকাশ করে তোলা। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অঙ্গ সৌষ্ঠব, আঙ্গিক সৌন্দর্য্য, মানসিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক, ব্যক্তিক ও ব্যক্তিগত সাজের প্রণালী প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে চলচ্চিত্রে তার চিত্রাভিনয়ের সাফল্য ও চিত্রতারকা হবার যোগ্যতা। শারীরিক ধর্ম বা গুণের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কণ্ঠস্বর,—তাবলে স্বরের উচ্চগ্রাম, পারসর বা বোধশক্তিই অত্যাবশ্যক নয়, অত্যাবশ্যক হচ্ছে কি ভাবে স্বর সংযোজনা করে তাঁর কথার বহিঃপ্রকাশ হোলো সেইটে দেখা। গলা বাজি না করেও স্পষ্টভাবে বলার ভঙ্গীটি চিত্তাকর্ষক চাই।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে শুক্রই প্রাধান্য বিস্তারে প্রথম। বৃষ ও তুলা রাশি শুক্রের স্বক্ষেত্র। শুক্রের সঙ্গে মঙ্গলের যোগাযোগও প্রয়োজন—বৃষের সঙ্গে বৃশ্চিকের সম্বন্ধ লক্ষ্য করা দরকার। কণ্ঠস্বরের ওপর বুধের কারক তা। মিথুন ও ধনু কন্যা ও মীনের ঘর বিচার করে কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে জানা যায়। মনীষা বা নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের কারক বুধ আর মিথুন ও ধনুর ক্ষেত্রে অবস্থিত গ্রহগুলি। বুধের ওপর যে গ্রহের দৃষ্টি পড়ে তার প্রভাব এই গ্রহের ওপর দেখা যায়। লগ্ন থেকে দেহ স্বাস্থ্য সুখ, সরলতা, দুর্বলতা, ব্যক্তিত্ব, মস্তক, মস্তিষ্ক প্রভৃতি বিচার হয়। বৃত্তি নির্ব্বাচন সম্পর্কে এর কোন অধিকার নেই। দশম স্থান থেকে বিচার্য্য।

আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে বৃহস্পতির সঙ্গে রবি, চন্দ্র বা মঙ্গলের কি রকম সম্বন্ধ, তাই বিচার করতে হয়। রাশি থেকে ব্যক্তিত্বকে বিশেষ ভাবেই পাওয়া যায়। চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র অথবা রবি লগ্ন থেকে পঞ্চমে বা দশমে অবস্থিত হোলে ছায়াছবি বা মঞ্চে অভিনয় করার পক্ষে উত্তম যোগ। সিংহ রাশির সঙ্গে ছায়াচিত্র বা মঞ্চের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। সিংহ লগ্ন বা রাশির ব্যক্তি অভিনয় কুশলী হয়। মৌলিকত্বের পরিচয় ও জাতক দিতে পারে। মীনের জাতক ও উত্তম অভিনেতা হোতে পারে। জল রাশিগুলি চিত্রাভিনয়ের পক্ষে অনুকূল। বিশেষতঃ মীন অতীব উত্তম, এখানে শুক্র উচ্চস্থ হয়। ধনু ও মিথুন জ্ঞানী হবার মেরুদণ্ড। ধনু লগ্নের ব্যক্তিরা তড়িৎশক্তিসম্পন্ন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জন্ম হয়েছে ধনু লগ্নে। মেষ লগ্নের ব্যক্তিরা উত্তম অভিনেতা হোতে পারে। অভিনয় মঞ্চকারক রবি এখানে উচ্চস্থ থাকলে অভিনয়-সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। বৃষলগ্নে জাত অভিনেতা বিশেষ জনপ্রিয় হয়। মীন লগ্নের জাত ব্যক্তি সঙ্গীতে নৃত্যেও চিত্রাঙ্কনে অভিনয়ের চেয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে। মিলনাত্মক কাহিনীতে বৃষ জাত ব্যক্তিগণের অভিনয় অপূর্ব্ব হয়। মীনে অথবা কর্কটে শুক্র থাকলে আবেগপ্রধান সংবেদনশীলতা অভিনয়ে প্রকাশ পায়। শুক্র মকরে থাকলে আবেগ সংযত হয়ে থাকে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে, বুধ কেবল কণ্ঠস্বরের কারক নয়, বিশদভাবে অভিব্যক্তি, ভাবপ্রকাশের কুশলতা, স্মৃতি, সৌন্দর্য্য ও কল্পনার কারক ও বটে। আভা গার্ডনার, রাজকাপুর, সূর্য্যকুমারী, কার্ক ডগলাস, ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা প্রভৃতির জন্ম কুণ্ডলীতে মকরে বুধ অবস্থিত। এই সব চিত্রতারকা বিশেষ জনপ্রিয়। মিথুনে বৃহস্পতি অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য এনে দেয়। বৃশ্চিকে এই গ্রহ থাকলে যৌন আবেদন বৃদ্ধি করে এবং মনোরম কণ্ঠস্বর প্রদান করে। কর্কটের ক্ষেত্রে লগ্ন হোলে অভিনয়ে খ্যাতি অর্জ্জন সহজেই হোতে পারে। চন্দ্র ও নেপচুনের যোগে অভিনয়ের বৈশিষ্ঠ্য প্রকাশ পায়। রবি-বৃহস্পতি, রবি-শনি, চন্দ্র-বৃহস্পতি যোগ অভিনয়ে সাফল্য আনে। শুক্র-হার্সেল, এবং রবি নেপচুন যোগ অভিনয় দক্ষতা প্রকাশ করে। হার্সেল ও প্লুটোর যোগাযোগ বা সম্বন্ধ প্রকাশ পেলে মঞ্চে বা চিত্রে ব্যক্তিত্ব আর বলিষ্ঠ স্বাধীন ধরণের মনোবৃত্তি ও চরিত্রের বিকাশ ঘটে। যে সব অভিনেতা বা অভিনেত্রী অভিনয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করে উল্লেখযোগ্য তারকা বলে গণ্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ ব্যক্তিরই একাদশে গ্রহ সংস্থান দেখা যায়, তারপর দেখা যায় লগ্নে, দশমে অথবা সপ্তমে। লগ্ন থেকে পঞ্চম ও একাদশ স্থানই মুখ্যতঃ চিত্র ও মঞ্চ সম্পর্কে বিচার্য্য। চিত্র জগতে বা মঞ্চে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন হ'বে কিনা এ সম্পর্কে বিচার করতে গেলে দেখতে হবে রবি, চন্দ্র অথবা মঙ্গল বৃহস্পতির সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ বা যোগাযোগ করেছে কিনা, নেপচুনের সঙ্গে রবি অথবা শুক্রের কোন সংযোগ হয়েছে কিনা, হার্শেলের সঙ্গে বুধ সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ কিনা মিথুন ও ধনুতে, কর্কট ও মকরে, বৃশ্চিক ও বৃষে, কন্যা ও মীনে গ্রহ সমাবেশ হয়েছে কিনা—রবি মেষ, কুম্ভ অথবা সিংহে আছেন কিনা, বৃহস্পতির সঙ্গে শুক্রের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে কিনা, চন্দ্রের সঙ্গে মঙ্গলের কোন সম্বন্ধ সূত্র দেখা যায় কিনা—এগুলির মধ্যে যে কোন একটি যোগাযোগ ঘটলে চিত্র জগতে বা মঞ্চে প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফল

মেষরাশি

অশ্বিণী ভরনী ও কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির একই রকম ফল। স্বাস্থ্যহানি সামান্য ভাবেই হবে। জ্বরভাব, উদরশূল,

শ্বাস প্রশ্বাসের পীড়া, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, পিত্ত প্রকোপ, চক্ষু পীড়া ইত্যাদি। পারিবারিক শান্তি। কিন্তু পরিবার বহির্ভূত স্বজন বর্গের সহিত কলহ বিবাদ। আর্থিক ক্ষেত্রে একই ভাব। কিছু বাধা ও ক্ষতি যোগ আছে'। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনার অভাব।. এমাসে গৃহসম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় অনুকূল নয়। ঘুষ গ্রহণে সতর্কতা আবশ্যক। চাকুরির ক্ষেত্র মোটামুটি ভালো। বেকার ব্যক্তির কর্ম্ম, অস্থায়ী পদে অভিষিক্ত ব্যক্তির স্থায়ী পদ লাভ। ব্যবসায়ীর পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম মাস। বিশেষতঃ যারা মঞ্চে পর্দ্দায় নৃত্যে গানে নিযুক্ত আছে, তাদের পক্ষে মাসটি বিশেষ অনুকূল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষরাশি

কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। রোহিণী ও মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালো যাবে, শেষার্দ্ধে শারীরিক অসুস্থতা, জর ও পিত্ত প্রকোপ। পারিবারিক সুখ ও শান্তি। পরিবার বহির্ভূত স্বজন বর্গের সহিত মেলামেশায় সতর্কতা আবশ্যক। আর্থিক অবস্থা সুবিধা জনক নয়। ব্যয়াধিক্য প্রবল। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি মোটামুটি মন্দ নয় তবে এমাসে গৃহাদি নির্মাণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। চাকুরির ক্ষেত্র উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে আয়বৃদ্ধি ও সন্তোষজনক পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অনুকূল। কুমারীগণের বিবাহ যোগ। স্ত্রীলোকের সন্তান সম্ভাবনাও আছে। বৃত্তিভোগী নারীর উত্তম সময়। মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রীদের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ফল আশানুরূপ নয়।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পুনর্ব্বসুর পক্ষে নিকৃষ্ট। স্ত্রী পুত্রাদির সামান্য পীড়াদি, স্ত্রীর সম্বন্ধে সতর্কতা আবশ্যক, নিজের স্বাস্থ্য বেশ ভালো যাবে। পারিবারিক শান্তি ও গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিলাস ব্যসনের মাত্রাধিক্য। নিজের অহংমন্য ভাব। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণা ক্ষেত্রে, উচ্চ স্তরের বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য। যাদের পূর্ব্বেই খ্যাতি প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছে এমাসে তারা পুরস্কার পদবী, সম্বর্দ্ধনা, জন্মতিথিতে উপঢৌকন প্রভৃতি আশা করতে পারে। আর্থিক স্বচ্ছলতা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ হবে। নব প্রচেষ্টায় সাফল্য। লভ্যাংশের কিছু ব্যয়ের চাপে বেরিয়ে যাবে। ভূম্যধিকারী বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম। গৃহ নির্মাণাদির পক্ষে অনুকূল। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। পদোন্নতি, নূতন পদ মর্য্যাদা, শুভ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সম্ভব। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি ভোগীর পক্ষে আয়ের প্রাচুর্য্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ। কোন কোন মহিলা বাপের বাড়ীর দুঃসংবাদ পাবেন। দূরে যাবার ডাক আসবে কিন্তু না যাওয়াই ভালো। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পুষ্যার পক্ষে মধ্যম, অশ্লেষার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যহানি। ধারালো অস্ত্র থেকে সতর্কতা আবশ্যক। সন্তান সন্ততির পীড়া। পারিবারিক শান্তি, শৃঙ্খলতা ও ঐক্য। আর্থিকক্ষেত্রে মিশ্র ফল। প্রথমার্দ্ধে শুভ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে ক্ষতি। গ্রন্থপ্রকাশনা বা বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তির বিশেষ অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ার্দ্ধ বিশেষ শুভ। পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য অনুকূল পরিবর্তন। বিভাগীয় পরীক্ষায় সাফল্য। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে অতীব উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্বদিকেই শুভ। দীর্ঘ ভ্রমণ। অবিবাহিতাদের বিবাহ। ব্যবসায়ীও বৃত্তি ভোগীর উত্তম সময়। শিল্পী নারীর অতীব উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ।

সিংহ রাশি

তিনটি নক্ষত্রে জাত ব্যক্তিরই একই প্রকার ফল। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। রক্তশূন্যতা। শারীরিক দুর্ব্বলতা। ধারালো অস্ত্র আঘাত প্রাপ্তির আশঙ্কা। স্ত্রীও সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্যহানি। পারিবারিক শান্তি, পরিবার বহির্ভূত স্বজন বন্ধুবর্গের সঙ্গে কলহ, আর্থিক অবস্থা সাধারণ। অর্থাগম হোলেও ব্যয়াধিক্য সমস্যা। শেষার্দ্ধে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কলহ বিবাদ ও শত্রুবৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম। চাকুরি জীবিদের পক্ষে শুভাশুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে

উত্তম। বৃত্তিজীবী নারীর সর্বোত্তম সময়। অবিবাহিতার বিবাহ সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দনয়।

কন্যা রাশি

তিনটী নক্ষত্রে জাত ব্যক্তিরই একই প্রকার ফল। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। শেষার্দ্ধে রক্তচাপ বৃদ্ধি। স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির সহিত মনোমালিন্য। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, (জন্মতিথি উৎসব, বিবাহ, সাধভক্ষণ প্রভৃতি) বিভিন্নদিক থেকে অর্থাগমের আধিক্য। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরির ক্ষেত্র উত্তম ; ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে আয় বৃদ্ধি ও লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ শুভ সময়। যশ, জনপ্রিয়তা প্রভৃতি। সঙ্গীত, নৃত্য, ছায়াছবি ও মঞ্চে যে সব স্ত্রীলোক লিপ্ত, তাদের উল্লেখযোগ্য সময়। সাধভক্ষণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ !

তুলা রাশি

চিত্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, বিশাখার পক্ষে মধ্যম স্বাতীর পক্ষে নিকৃষ্ট। উত্তম স্বাস্থ্য। স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির সঙ্গে কলহ। আর্থিক ক্ষেত্র বিশেষ শুভ ! বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরির ক্ষেত্রে শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ উত্তম। পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি ও পদমর্য্যাদাবৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মোটামুটি মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষাথীর পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, অনুরাধার পক্ষে মধ্যম, জ্যেষ্ঠার পক্ষে নিকৃষ্ট। শরীর ভালোই যাবে। স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। পারিবারিক অশান্তি। আর্থিকক্ষেত্র সন্তোষ জনক নয়। ব্যয়াধিক্য। নগদ টাকার টান ধরবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী একইভাবে যাবে। মাসের প্রথম দিকে চাকুরির অবস্থা শুভ নয়। উপরওয়ালার সহিত মনোমালিন্য, শেষের দিকে অবস্থার পরিবর্তন ও শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটী সুবিধা জনক নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। গৃহে বিবাহোৎসব, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ নয়॥

ধনু রাশি

তিনটি নক্ষত্রে জাত ব্যক্তির এক রকম ফল। হজমের গোলমাল, রক্তস্রাব, উদরাময়, আমাশয়, জ্বর, প্রভৃতি ; শারীরিক দুর্ব্বলতা। পারিবারিক অশান্তি। স্বজনবর্গের সহিত কলহ আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা। পাওনাদারের তাগাদাজনিত অসুবিধা। জামিন হওয়া অনুচিত। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়। স্ত্রী ব্যাধির প্রকোপ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে উত্তম, শ্রবণার পক্ষে মধ্যম, ধনিষ্ঠার পক্ষে নিকৃষ্ট। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালো যাবে, শেষার্দ্ধে উদর ও গুহ্যপ্রদেশে পীড়া। শারীরিক দুর্ব্বলতা। পারিবারিক অশান্তি ও মতানৈক্য। শেষার্দ্ধে আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা। প্রথমার্দ্ধে লাভ ও অর্থাগাম। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি ভালো যাবে না। মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। উপর ওয়ালার অনুগ্রহ লাভ। প্রথমার্দ্ধে উচ্চতর পদে উন্নীত হবার যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে সন্তোষজনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। অনেকের সন্তান সম্ভাবনা যোগ। চিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রীর উত্তম সময় ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভরাশি

ধনিষ্ঠার পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বভাদ্র পদের পক্ষে মধ্যম, শতভিষার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। পারিবারিক শান্তি। পরিবারবহির্ভূত স্বজনবর্গের সহিত মনোমালিন্য। সন্তানসন্ততির পীড়াদি সম্ভাবনা। কোন আত্মীয় বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি। আর্থিক ক্ষেত্র সুবিধা জনক নয়। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরির ক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়। উপরওয়ালা ও সহকর্ম্মীরা বিব্রত করে তুলবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অশান্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও সম্মানলাভ। বিদ্যার্থীগণের বিশেষ উন্নতি লাভ। পিত্রালয় থেকে শুভসংবাদ প্রাপ্তি। সুখকর ভ্রমণ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি—ভালো বলা যায়।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তর ভাদ্রপদের পক্ষে নিকৃষ্ট। রক্তদুষ্টি হেতু পীড়া। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। পারিবারিক শান্তি। আর্থিক ক্ষেত্র উত্তম—অযত্নধন লাভযোগ।

মাসের শেষে অর্থের প্রাচুর্য্য। গৃহাদি নির্ম্মাণ ব্যাপারে এমাসে কাজ বিশেষ এগোবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ। সম্পত্তি লাভ-যোগ। চাকুরির ক্ষেত্র সুবিধা জনক নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। স্ত্রী ব্যাধি জনিত কষ্ট। যারা শিল্পকলা, সঙ্গীত, মঞ্চ ও ছায়া ছবিতে আত্মনিয়োগ, করেছে তাদের পক্ষে উল্লেখ যোগ্য সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়!

ব্যক্তিগত দ্বাদশলগ্ন ফল

মেষ লগ্ন—শারীরিক সুস্থতা। ধনভাব মন্দ নয়। সহোদরের সহিত মনোমালিন্য। সন্তানাদির স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। পত্নীভাব শুভ। ব্যবসাবাণিজ্যে লাভের আশা কম। ভাগ্যোন্নতিতে বাধা বিঘ্ন। ব্যয়াধিক্য। লাভের ক্ষতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়।

বৃষলগ্ন—দেহ ভাবের ফল মধ্যবিধ। ধনভাব আশানুরূপ নয়। বন্ধুলাভ। বৈষয়িক ব্যাপারে পিতার সহিত মতানৈক্য। সহোদর ভাবের ফল শুভ নয়। কর্ম্মস্থলে বিভ্রাট, উপরওয়ালার সঙ্গে মনোমালিন্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ। মাতৃপীড়া। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ বলা যায় না।

মিথুন লগ্ন—শারীরিক অবস্থা ভালে যাবে না। বেদনা ঘটিত পীড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনা। ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতির যোগ। পত্নীর স্বাস্থ্য হানির জন্য মানসিক চাঞ্চল্য। ভ্রাতার সাহায্যে উপকার প্রাপ্তি। সন্তানাদির পরীক্ষাদিতে মনোনিবেশ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

কর্কট লগ্ন—দেহভাবের ক্ষতি। ধনলাভ যোগ। উত্তম বন্ধুলাভ। নানাপ্রকার বিপদ আপদ ঘটতে পারে। সন্তানের পরীক্ষায় সুফলের আশা। পত্নীর বিশেষ পীড়া বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম।

সিংহলগ্ন—শারীরিক শুভ। চাকুরিজীবির বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি। ভ্রাতৃভাব শুভ। মাতৃপীড়া। ভাগ্যোন্নতি। কন্যার পীড়া। পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা ব্যয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশা প্রদ নয়।

কন্যালগ্ন—শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। সম্মান ও পদ মর্য্যাদাবৃদ্ধি। সন্তান সন্তাতর স্বাস্থ্যভঙ্গ। ভাগ্যোন্নতি। আয়বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর সাফল্য লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

তুলালগ্ন—দৈহিক অবস্থা মন্দ নয়। বিদ্যালাভ বিঘ্ন। ভাগ্যোদয়ে বাধা বিপত্তি। সন্তানাদির দৈহিক অবস্থা ভালো যাবে না, আকস্মিক বিপদ অনিবার্য্য। জয়াধিক্য। গুপ্তশত্রু বৃদ্ধি। বিদেশগমন যোগ। কর্ম্মস্থানের ফল আশা পদ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা! স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ।

বৃশ্চিকলগ্ন—শারীরিক অবস্থা শুভ হোলে ও অজীর্ণতা দোষ, যকৃতের দোষ জন্য কোন পীড়ার সম্ভাবনা। ধন ভাব শুভ নয়! সাংসারিক কলহ। পত্নীভাব শুভ। কপটবন্ধুর সমাগম। শত্রুবৃদ্ধি যোগ। ভৃত্য বা আশ্রিত কিম্বা অধস্তন কর্মচারীগণগোপনে শত্রুতা করবে। সন্তানের পড়া শুনায় উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ।

ধনুলগ্ন—শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না। বায়ুঘটিত পীড়া, বেদনা সংযুক্ত পীড়া, আমাশয়, অজীর্ণ প্রভৃতি। বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে ভ্রাতার সহিত মনোমালিন্য। পত্নীর দৈহিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ। ভৃত্যগণের দ্বারা অনিষ্ট। অকারণ অর্থ অপচয়। ভাগ্যোন্নতি। ব্যবসা বাণিজ্যে আশানুরূপ ফল। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

মকরলগ্ন—শারীরিক অসুস্থতা। আর্থিকোন্নতির অভাব। ব্যয়বৃদ্ধি। পত্নীর স্বাস্থ্য হানি। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, পাকযন্ত্রের পীড়া। কর্ম্মোন্নতি যোগ। বাসগৃহের জন্য নূতন জমিসংগ্রহ। উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের প্রবণতা। সন্তানের পরীক্ষা বিষয়ের ফল সম্পূর্ণ শুভ নয়, রেখাজনিতের কল আশঙ্কা জনক। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ।

কুম্ভলগ্ন—দেহপীড়া। অম্লজনিত কষ্ট, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য। ধনাগম কিন্তু সঞ্চয়ের অভাব। মানসিক কষ্ট। পত্নী পড়া। সন্তানাদির জন্য উদ্বেগ বৃদ্ধি। সহোদর ভাব শুভ। সন্তান লাভ। সন্তানের পরীক্ষা বিষয়ের ফল শুভ হবে না। কর্ম্মোন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ।

মীনলগ্ন—দেহভাব শুভ। ব্যয়বাহুল্য। বন্ধুর সহিত মনোমালিন্য। অর্থাগমে বাধা। সন্তান ভাব শুভ, লেখা পড়ায় উন্নতি। শত্রুবৃদ্ধি। সম্মান ও মর্য্যাদা। অধ্যাপনা কার্য্যে সুনামের আশা। ব্যবসায়ে উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ।

শ্রী'শ'—

॥ চারুলতা ॥

'চারুলতা'—রবীন্দ্রনাথের বহু আলোচিত কাহিনী 'নষ্টনীড়' এর চিত্ররূপ—সত্যজিৎ রায়ের একটি বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা, বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম—একটি অপূর্ব্ব, অনবদ্য অবদান। কাহিনীটি 'লীরিক্'-ধর্ম্মী, তার চিত্ররূপও সত্যজিৎবাবুর যাদু স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে লীরিকের রূপই ধারণ করেছে। ক্লাসিকের পর্যায়ে ঠিক ফেলা না গেলেও "চারুলতা" যে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রজগতের একটি অনবদ্য কালজয়ী সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। আর, ডি. বনশল্ প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত এই "চারুলতা" চিত্রটি বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র জগতের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল। তাই শ্রীরায় ও শ্রীবনশল্‌কে এই অপূর্ব্ব চিত্র নির্ম্মাণের জন্য আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

১৩০৮ গেলে লেখা এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে ১৮৮০ সালের কলিকাতার এক অভিজাত গৃহের কাহিনী। যেখানে দেখা যায় স্বামী ও স্ত্রীর এক শান্তিপূর্ণ সংসার। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত স্বামী নিজের পত্রিকা ও পলিটিক্স নিয়েই মগ্ন, আর অন্তরে উপেক্ষিতা অবকাশ-জর্জরিতা ধনীগৃহের পত্নী, অলস প্রহরগুলি সাহিত্য, সেলাই ও অলস চিন্তার মধ্যে কাটিয়ে কাটিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। অন্তর তার দেবার জন্য অধীর, কিন্তু নেবার লোকের অভাব। অথচ সুশিক্ষিত, সরুচিসম্পন্ন স্বামীর প্রেমে সে বঞ্চিতা নয়, কিন্তু স্বামীর সাহচর্য্য লাভে সে বঞ্চিত। এই সাহচর্য্য, এই সান্নিধ্য, এই দেওয়া-নেওয়ার আকাঙ্খাই একদিন ডেকে আনল এক বিষাদময় পরিণতি তার জীবনে। তার উন্মুখ হৃদয়ের সম্মুখে এসে দাঁড়াল তার স্বামীর জ্ঞাতি ভ্রাতা যুবক অমল—প্রাণরসে চঞ্চল, সাহিত্যানুরাগী আর কাব্যরসিক। তার সান্নিধ্যে অজান্তে, অলক্ষ্যে, আচম্বিতে খুলে গেল চারুলতার হৃদয়ের দ্বার, আর ভেঙ্গে গেল স্বামী-স্ত্রীর আপাত সুখের সংসার—নষ্ট হল নীড়!

লীরিক কবি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিও যে কত বাস্তব ছিল তারও পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর "নষ্টনীড়" গল্পটির থেকে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ও রমনী মনের দ্বন্দ্ব, সমস্যা, অনুভূতি প্রভৃতির যে বিশ্লেষণ তিনি এই গল্পে করেছেন, তা কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়, তা সর্ব্বকালের উপযোগী, সমকালেরও সমস্যা।

স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্ক, নারীর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব—তার দুর্ব্বলতা, তার আসক্তি, তার প্রেম, বৈধ ও অবৈধ—এ সবই সর্ব্বকালের সামগ্রী ও সমস্যা। তাই "নষ্টনীড়"-এর আবেদনও সমকালীন, যদিও সর্ব্বক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কর্ম্মব্যস্ত স্বামী সংসারে বিরল নয়, বরঞ্চ বেশীই। সময়াভাবে সব সময়ে স্ত্রীকে সঙ্গদান করতে পারেন না বলেই যে স্ত্রীকে তাঁরা উপেক্ষা করেন তা নয়। অনেককে তো প্রয়োজনে বিদেশে কর্ম্মস্থলেও থাকতে হয় মাসের পর মাস, কিন্তু তার মানে তাঁরা কি স্ত্রীকে উপেক্ষা করছেন? তা তো নয়। ধনী ভূপতি ঠিক স্ত্রী চারুলতাকে উপেক্ষা করেনি। সে অলস ধনী (idle rich) হয়ে থাকতে চায় নি—দেশের ও দশের কাজ সে কিছু করতে চায়। সে শিক্ষিত ও সম্পদশালী, রাজনীতিতে তার জ্ঞান গভীর, সে জাতীয়তাবাদী, রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণীত সাহসী সৈনিক। বিদেশী সরকারের রোষকে গ্রাহ্য না করে সে সেই সরকারের সমালোচনায় আত্মনিমগ্ন—তার নিজের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী সংবাদপত্র "সেন্টিনাল"-এ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লেখায় সব সময় ব্যস্ত। "সেন্টিনাল" যেন তার প্রাণ, তার ধ্যান, তার জ্ঞান। এই নিয়েই সদাব্যস্ত থাকায় স্ত্রীর প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তাই বলে উপেক্ষাও সে স্ত্রীকে করে নি, স্ত্রীকে সে ভালবাসে। তাই তার কণ্ঠে শুনি—"আমার চারুলতা আছে"। স্ত্রীর নিঃসঙ্গতাও তার দৃষ্টি এড়ায় নি বলেই সে তার শ্যালকের সঙ্গে শ্যালক-পত্নীকেও তার স্ত্রীর সঙ্গিনীরূপে

বাড়ীতে এনে স্থান দিল। কিন্তু স্ত্রী চারুলতার চিত্ত তাতে ভরল না বলেই অমলকে পেয়ে তার ওপরই ঢেলে দিল তার রুদ্ধ আবেগকে। নৈতিক দিক থেকে, সামাজিক দিক থেকে, শালীনতার দিক থেকে এ অন্যায়, এ অসমীচীন; কিন্তু তাই ঘটে গেল নির্মম ভাবে। এর জন্য দায়ী কে? ভূপতি; চারুলতা না অমল? তার নির্দেশ নেই। দাদা ভূপতির প্রতি শ্রদ্ধাবনত অমল চারুলতার প্রেমকে উপেক্ষা করে নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে রাতের আঁধারে গৃহত্যাগ করে চলে যায়। তরুণ অমলের প্রাণচাঞ্চল্য চারুলতাকে আকর্ষণ করলেও এ অঘটনের জন্য অমলকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করাযায় না। আর ভূপতির সম্বন্ধে আগেই বলেছি স্ত্রীর প্রতি উপেক্ষা তার ইচ্ছাকৃত নয় এবং ভালবাসাও তার অকৃত্রিম। তবে চারুলতাই কি এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী? হয়ত তাই, সম্পূর্ণরূপে না হলেও। তবে, "অমলের প্রতি চারুলতার প্রেম একটা দুর্দ্দমনীয়, অপ্রতিরোধনীয় হৃদয়াবেগ মাত্র, ইহা চিন্তার সীমা অতিক্রম করিয়া পাপের পিচ্ছিল পথে পদক্ষেপ করে নাই।"—"নষ্টনীড়"-এর চারুলতা সম্বন্ধে এই বহু স্বীকৃত মন্তব্যটিও কিন্তু মনে রাখা উচিত, না হলে হয়ত চারুলতার প্রতি অবিচার করা হবে। সত্যজিৎবাবুও তাঁর চারুলতার প্রতি সে অবিচার করেন নি। তবে "নষ্টনীড়"-এর চারুলতার মধ্যে যে স্বাভাবিক দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় এই "চারুলতা" চিত্রে তার অভাব দেখা গেছে। তাতে অবশ্য চিত্রটির অঙ্গহানি বিশেষ হয় নি।

অভিনয়ের দিক দিয়ে চিত্রটির সব কয়টি ভূমিকাই সু-অভিনীত হয়েছে বলা চলে। বিশেষ করে চারুলতার ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় অনিন্দ্য সুন্দর হয়েছে বলা চলে। ভূপতির ভূমিকায় শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সংযত অভিনয় যেন নষ্টনীড়ের ভূপতিকে জীবন্ত করে তুলেছে। আর অমলের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অসাধারণকিছু না করলেও চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন বলতে হবে। পরিচালনার ব্যাপারে সত্যজিৎবাবু যে অতুলনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা আগেই বলেছি। চিত্রের গতি প্রথম দিকটায় খুবই মন্থর। গতি মন্থরতা বাংলা চিত্রের একটি বিশেষ ত্রুটি। কিন্তু "চারুলতা" চিত্রে সত্যজিৎবাবু এই মন্থর গতির সাহায্যে চিত্রের মূল ভাবটিকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন অপূর্ব্ব দক্ষতায় সে যুগের সেই শান্ত প্রভাত, অলস মধ্যাহ্ন আর নিরুত্তাপ রাতকে তিনি অসামান্য নৈপুণ্যে কয়েকটি ভাব ও শব্দের মধ্য দিয়ে যেন মূর্ত্ত করে তুলেছেন। নেপথ্য সঙ্গীতও তিনি অসামান্য দক্ষতায় প্রয়োগ করেছেন। শব্দ গ্রহণ, ক্লোস্‌আপ্ বা নিকট চিত্র গ্রহণ প্রভৃতিও খুবই উন্নত পর্য্যায়ের হয়েছে। শুধু এই নয়, কাহিনীর কালের সমসাময়িকতাকে ঠিক ভাবে রূপায়িত করতে তিনি যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন। দৃশ্যসজ্জা ও শিল্পীদের সাজপোষাক নিখুত ভাবে সেই সময়কালীন হওয়ায় তৎকালীন সমাজ ও জীবন বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। আঙ্গিকের প্রতি এই আনুগত্য শ্রীরায়ের পরিচালনায় বৈশিষ্ট্য এবং এর জন্য তিনি অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র।

আজ থেকে ষাট বৎসরেরও আগের লেখা এই গল্পে আশী বছরেরও আগের উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার এক ধনীগৃহের যে গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, তা কালের ব্যবধান অতিক্রম করে এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মানুষকেও যে মুগ্ধ করে তুলতে পারে তার প্রমাণ এই "চারুলতা" চিত্রের মাধ্যমে সত্যজিৎবাবু দেখিয়ে দিলেন। দেখিয়ে দিলেনই শুধু নয়, বিগত কালের এক সৃষ্টিকে উজ্জীবিত করে, সঞ্জীবিত করে এই আধুনিক কালে আবার নতুন করে পরিবেশন করে দর্শক মনে লাগিয়ে দিলেন দোলা, জাগিয়ে দিলেন এক অপূর্ব্ব অনুভূতি।

"নষ্টনীড়" গল্পটির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্যএই "চারুলতা" চিত্রে করা হয়েছে। চলচ্চিত্রে রূপায়িত করতে গেলে মূল গল্পের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জন করা অনেক সময়েই আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রেও সত্যজিৎবাবু নিশ্চয়ই সেই আবশ্যক বোধ করেছিলেন, তাই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। অবশ্য তাতে চিত্র "চারুলতার" মনোহারিত্ব কমে নি, "নষ্টনীড়"-এর কিছুটা অঙ্গহানি হলেও।

ছবির শেষ দৃশ্যটি সম্বন্ধে কিন্তু কিছু বিতর্ক উঠতে পারে। একদিক থেকে এটি খুবই সুন্দর হয়েছে বটে, তবে নীড় সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে গেল কিনা, না আবার জোড়া লাগছে তা স্পষ্ট ভাবে বলা হয় নি। ভূপতি ও চারুলতার উভয়ের দিকে প্রসারিত হাতের মধ্যকার ব্যবধান থেকে

আর, ডি, বনশল্ প্রযোজিত
"চারুলতা" চিত্রের নায়িকা
মাধবী মুখোপাধ্যায়

এবং "নষ্টনীড়" এই নামটির থেকে দর্শক মনে নীড় ভাঙ্গার ভাবটি যেমন প্রবল হয়ে উঠতে পারে, তেমনি চারুলতায় সহাস্যে দরজা খুলে ভূপতির দিকে হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানানর এবং ভূপতিরও দ্বিধা কাটিয়ে চারুলতায় প্রসারিত হাতের দিকে হস্ত প্রসারণ থেকে এ ভাবটিও মনে আসা অসঙ্গত নয় যে ভাঙ্গন ধরা নীড়ে আবার জোড়া লাগবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যাই হোক, মনে হয় সত্যজিৎ বাবু শেষ দৃশ্যের বিচার ভার দর্শকদের নিজ নিজ কল্পনার উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। এই পরিণতিটুকুও এই ছবির একটি বৈশিষ্ট্য।

॥ সেক্সপীয়র স্মরণোৎসব ॥

মহাকবি সেক্সপীয়রের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলিকাতা শহরে। মহাজাতি সদনে চারদিন ব্যাপি এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন "সেক্সপীয়র চতুর্থ জন্ম শতবর্ষ উৎসব সমিতি" এবং মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে "লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ্" আট দিন ব্যাপি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেক্সপীয়রের নাটক, সঙ্গীত ও আলোচনা পরিবেশন করেন। এ ছাড়া আরও বহুস্থানে শেক্সপীয়রের নাটক বাংলায় ও ইংরেজীতে অভিনীত হয়েছে।

মহাজাতী সদনের অনুষ্ঠানে প্রথম দিন "ঐকতান"-এর প্রযোজনায় ইংরাজীতে "দি মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস্" অভিনীত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ দিনে যথাক্রমে "উদয়াচল"-এর প্রযোজনায় বাংলায় "হ্যামলেট্" "প্রাচ্যবাণী"-র প্রযোজনায় সংস্কৃততে "ভেনিস বণিজম্" এবং "থিয়েটার ইউনিট্"-এর প্রযোজনায় বাংলায়" জুলিয়াস সীজার" অভিনীত হয়। তাছাড়া প্রতিদিনই সেক্সপীয়রের সঙ্গীত, আলোচনা, আবৃত্তি প্রভৃতিও সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী, ডঃ অমলেন্দু বসু, ডঃনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীহিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি। সঙ্গীত ও আবৃত্তিতেও অনেকে অংশ গ্রহণ করে উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করে তোলেন। প্রতিদিনই কয়েকঘণ্টা ধরে এই উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দর্শক সাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দদানে পরিতুষ্ট করা হয়।

মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ তাঁদের আট দিন ব্যাপি উৎসব অনুষ্ঠানে 'জুলিয়াস, সীজার (বাংলা), 'ওথেলো' (ইংরাজী) 'রোমিও জুলিয়েট' (বাংলা) এবং 'মিড্‌নামার নাইটস্ ড্রীম্' (বাংলা) অভিনয় করেন। তাছাড়া ময়দানে জনসমাবেশও করেন এবং শেক্সপীয়রের সঙ্গীতও একদিন পরিবেশন করেন। নাটকটির মধ্যে 'ওথেলো' অভিনয় খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। ওথেলো, ইয়াগো ও ডেস্‌ডিমোনার চরিত্রে যথাক্রমে উৎপল দত্ত, ডিন্ গ্যাস্‌পার ও শীলা চৌধুরী সুন্দর অভিনয় করেন। বিশেষ করে ডিন্ গ্যাস্‌পারের 'ইয়াগো' চরিত্রায়ণ সবাইকে ছাপিয়ে যায়। অন্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হয়েছিল। তবে দর্শকদের সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছিল বোধ হয়, 'মিড্‌সামার নাইটস্ ড্রীম্' (চৈতালী রাতের স্বপ্ন')-এর অভিনয়। বিশেষ করে 'বটম্'-এর ভূমিকায় উৎপল দত্ত তাঁর সুললিত অভিনয়ে প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। কিন্তু "জুলিয়াস সীজার" নাটকটির অভিনয় লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ্ ঠিক সাধারণ ভাবে করেন নি। এই নাটকটির আঙ্গিক অভিনয় ও পটভূকিা বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। "জুলিয়াস্ সীজার (সমকালের চোখে)" অর্থাৎ এই আধুনিক কালের পটভূমিকায় এবং আঙ্গিকে সেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস্ সীজার"-এর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত বঙ্গানুবাদ নাটককে উপস্থাপিত করা হয়। নাটকটীর পটভূমিকা করা হয় নাৎসী জার্মানী এবং সীজার, মার্ক এণ্টনী প্রভৃতিকে স্বস্তিক মার্কা পোষাক পরিহীত নাৎসী-নায়ক রূপে দেখান হয়। অস্ত্রশস্ত্র, আদব-কায়দা সবই সেই নাৎসী জার্মানীর। পিস্তলের গুলিতে সীজার হত্যা, মার্ক এণ্টনির প্রেস্ কন্‌ফারেন্স ও বেতার বক্তৃতা যুদ্ধক্ষেত্রে কামান, মেসিনগান ও প্লেনের গর্জ্জন প্রভৃতির থেকে কিন্তু শেক্সপীয়ারের "জুলিয়াস সীজার"-কে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। সীজারকে কার্টুন চরিত্রের মতন কিছুটা হাস্যাস্পদ করার সার্থকতা কি বোঝা গেল না। মার্ক এণ্টনিকেও হিটলার-মার্কা করার অর্থও স্পষ্ট নয়। আর নাৎসী জার্মানীকেই বা টেনে আনা হল কেন ? হয়ত কোনও বিশেষ মতবাদের পরিপেক্ষিতে এরূপ করা হয়েছে, কিন্তু তা করার ঔচিত্য বিবেচনা করা উচিত। লণ্ডনের "ওল্ড ভিক্" থিয়েটার কয়েক বছর আগে এরকম করেছেন। কিন্তু তাঁরা করেছেন বলেই যে এদেশেও করতে হবে তার মানে নেই। তাছাড়া তাঁরা যা করেছেন তাতো ভুলও হতে পারে। নাটক যাঁরা মঞ্চস্থ করেন তাঁদের স্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা উচিত। যে কোনও বিশিষ্ট নাট্যকারের কোন বিশেষ সৃষ্টির ইচ্ছামত ও মতানুযায়ী রদবদল করা শালীনতা বোধের পরিচয় নয়, বিশেষ করে স্মরণ উৎসবের ক্ষণে এইরূপ

বিতর্কিত রূপে· নাট্যরূপায়ণে শ্রষ্টার সৃষ্টিকেই শুধু হেয় করা হয় না—স্রষ্টাকেও অমর্য্যাদার মাঝে নামিয়ে আনা হয়।

যাই হোক, লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের সব কয়টি নাটকই কি অভিনয়ের দিক দিয়ে, কি মঞ্চ সজ্জা, আলোক সম্পাত ও পরিচালনার দিক দিয়ে সুন্দর রূপে উপস্থিত করা হয়েছে এবং এর জন্য তাঁরা সকলের ধন্যবাদার্হ।

শেক্সপীয়র কেন্দ্রের উদ্বোধন

বিশ্ব ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও মার্কিন শেক্সপীয়র কমিটির সভাপতি মিঃ ইউজিন্ ব্ল্যাক গত ২২শে এপ্রিল শেক্সপীয়রের জন্মস্থান ষ্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-এভনে এ নবনির্মিত শেক্সপীয়র কেন্দ্রের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। অমর কবি শেক্সপীয়রের ৪০০ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে এই কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশ্বের বহু দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটেনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার ডাঃ জীবরাজ মেটা।

মিঃ ব্ল্যাক তাঁহার ভাষণে বলেন যে বিশ্বের বহু দেশের সহযোগিতায় এই শেক্সপীয়র কেন্দ্রটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সকল দেশের ছাত্র ও পণ্ডিতদের নিকট ইহা বিশেষ আকর্ষনীয় স্থান পরিগণিতরূপে হবে।

তিনি বলেন, "শেক্সপীয়র তাঁহার পরবর্তী সকল যুগের চিন্তা ও সংস্কৃতির উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমরা আমাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে মহৎ কবি শেক্সপীয়রকেই এই সৌধটি উৎসর্গ করছি।

'ওল্ড ভিক্'-এর রূপান্তর

দক্ষিণ-পূর্ব লণ্ডনে অবস্থিত 'ওল্ড ভিক্' থিয়েটার তাদের শেষ অভিনয় অনুষ্ঠান করার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের একটা যুগের অবসান ঘটল।

গত বৎসরের ১৫ই জুন "মেজার ফর মেজার" নাটকটি শেষ বারের মত অনুষ্ঠিত হয়, এবং নাটকটির যবনিকা পাতের সঙ্গে সঙ্গে "ওল্ড ভিক্"-এর গত ৪৯ বৎসরের শেক্সপীয়র ও ক্লাসিক নাটক পরিবেশনের ইতিহাসের উপর যবনিকাপাত হয়। ওল্ড ভিক্ তার কাজ এইভাবে বন্ধ করলেও আর এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়—প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটেনের জাতীয় থিয়েটাররূপে।

ওল্ড ভিক পুনরায় অভিনয় আরম্ভ করছে বটে কিন্তু তা ন্যাশনাল থিয়েটার হিসাবে।

ওল্ড ভিক্-এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কিন্তু একথা ঠিক যে এর ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন এর নাম ব্রিটিশ রঙ্গ মঞ্চের ইতিহাসে চির উজ্জ্বল থাকবে। চিরকাল লোকে স্মরণ করবে তার বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের। ওল্ড ভিক্ যে ভাবে শিল্পী তৈরি করেছে সে ভাবে আর কোন প্রতিষ্ঠান পেরেছে কিনা সন্দেহ।

ওল্ড ভিক্ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮০ সালে মিস এমা কন্স কর্তৃক—এই ভদ্রমহিলার সহায় সম্পদ ছিল সামান্যই, কিন্তু সমাজকর্মী হিসাবে সুনাম থাকায় স্বভাবতই লোকের সহানুভূতি থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। তিনি এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন স্থানীয় লোকজনের আনন্দ বর্ধনের জন্য। সত্য কথা বলতে কি লণ্ডনের এই অঞ্চলের তখন একটু বদনামই ছিল, সেইজন্য তিনি মনে করলেন এই অঞ্চলে নির্দোষ চিত্তবিনোদনের একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে তিনি কাজে নামলেন, এবং থিয়েটার পরিচালনার জন্য স্থানীয় বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকদের নিয়ে তিনি গঠন করলেন একটি কমিটি—"ব্রিটেনের জনসাধারণের" নামে পরিচালিত হতে থাকল এই থিয়েটার। থিয়েটারের নাম হল 'রয়েল ভিক্টোরিয়ান্ কফি মিউজিক্ হল', এবং শীঘ্রই লোকের মুখে মুখে এর নাম দাঁড়াল "ওল্ড ভিক্"।

মিস কন্স-এর সময়ে বহু বিখ্যাত অভিনেতা এই থিয়েটারে এসে অভিনয় করে যান, এই সব অভিনেতার মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—হেনরি আর্ভিং ও এডমণ্ড কীন। কিন্তু থিয়েটারের স্বর্ণ যুগ আরম্ভ হল যখন মিস কন্স-এর নিকট-আত্মীয়া লিলিয়ান্ বেলিস্ ১৯১২ সালে এই রঙ্গমঞ্চের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি ছিলেন আরও কর্মঠ। তিনি সংকল্প গ্রহণ

করলেন একটি জাতীয় থিয়েটার প্রতিষ্ঠার—আর এই সঙ্কল্পই আজ রূপ নিল তাঁর মৃত্যুর ২৬ বৎসর পরে।

মিস বেলিস্ স্থির করলেন শেক্সপীয়রের এবং ক্লাসিক নাটকগুলি খুব সস্তায় মঞ্চস্থ করার, তাইস্টলের আসন-গুলির মূল্য হল ২ শিলিং ৬ পেনি করে এবং গ্যালারির আসন ৪ পেনি করে। থিয়েটার ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং ক্রমশ মিস বেলিস্ এই থিয়েটারকে গড়ে তুললেন বহু তরুণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর শিক্ষা কেন্দ্র রূপে। আজ যাঁরা বিশ্ব বিখ্যাত হয়েছেন অভিনেতা রূপে তাঁদের অনেকেই প্রথম এইখানেই অভিনয় করেন।

সার লরেন্স অলিভিয়র, রাল্‌ফ রিচার্ডসন্, এডিথ ইভান্স, পেনি অ্যাশক্রফট্, জন গিল্‌গাড, ভিভিয়ান লী, সিবিল থর্নডাইক, মাইকেল রেডগ্রেভ, ভানেসা রেডগ্রেভ, ক্লেয়ার ব্লুম, ফ্লোরা রবসন—এঁরা সবাই এই ওল্ড ভিক্ এরই অভিনেতা অভিনেত্রী। ওল্ড ভিক্-এর বিখ্যাত পরিচালকবর্গের মধ্যে আছেন—টাইরন গাথ্‌রি, গ্লেন বিয়াম শ', মাইকেল সেণ্ট ডেনিস, লরেন্স অলিভিয়র, জর্জ ডিভাইন ও ফ্রাংকো জেফেরিল।

মিস বেলিস্ কেবল ক্লাসিক নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেই সন্তুষ্ট থাকলেন না, তিনি এই সঙ্গে অপেরা ও ব্যালের ব্যবস্থাও করলেন। স্যাডলারস ওয়েলস থিয়েটার যখন ইসলিংটনে খোলা হল তখন মিস বেলিস্ সেখানে নাটকাভিনয়, ব্যালে এবং অপেরা অনুষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নিনেৎ দ্য ভ্যালয়-এর পরিচালনাধীনে ব্যালে কোম্পানী ক্রমশ 'রয়েল ব্যালে' নাম গ্রহণ করল, আর এই রয়েল ব্যালেই এখন কভেণ্ট গার্ডেনে প্রতিষ্ঠিত।

ওল্ড ভিক্ কোম্পানীর সুনাম ক্রমশঃ সুদূর বিস্তৃত হয়। ত্রিশ দশকের শেষ দিকে এবং চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে তার খ্যাতি জাতীয় সীমা অতিক্রম করে। "হ্যামলেট" পরিবেশিত হল এলসিনোরের কাস্‌ল্ প্রাঙ্গণে ১৯৩৭ সালে, এবং এক বৎসর পরেকোম্পানী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সফরে বের হল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোম্পানীটি ব্রিটেনের প্রদেশ-গুলি ব্যাপক ভাবে সফর করে আসে। যুদ্ধ শেষ হলে অন্য সব নাট্য প্রতিষ্ঠান চলে যায় কণ্টিনেণ্টে, অতলান্তিক পার হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এমন কি আরও দূরে অষ্ট্রেলিয়ায় এবং নিউজিল্যাণ্ডে। ওল্ড ভিক্-এর জাতীয় গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল, এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেল তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য।

সেইজন্য সম্প্রতি পরিবেশিত শেষ নাট্যানুষ্ঠান "মেজার ফর মেজার" এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্রভাবে অর্থবহ হয়। ওল্ড ভিক্ বন্ধ হয় বটে, কিন্তু শুরু হয় তার রূপান্তর।

শেষ দিনের অনুষ্ঠানের শেষে ওল্ড ভিক্-এর অল্প কয়েকজন জীবিত অভিনেত্রীদের মধ্যের একজন—ডেম্ সিবিল থর্নডাইক মঞ্চের উপর সকলের সামনে এসে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেছিলেন। কম্পিত কণ্ঠে নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি বলেছিলেন—"কেউ যেন এতে দুঃখিত না হন। অতীত সম্বন্ধে কোন স্মৃতি যদি আজ বেদনা জাগায় তবে তা দূর করুন···লিলিয়ান (বেলিস) চেয়েছিলেন ভিক্ জনকল্যাণেই নিয়োজিত হোক, এক বৃহত্তর নূতন থিয়েটার সেই কল্যাণের কাজ আরও বেশি করে করবার শক্তি লাভ করবে।"

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
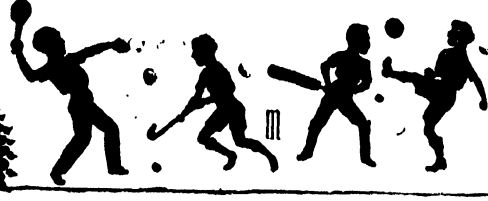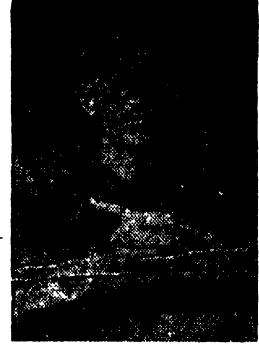
খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

প্রদর্শনী ক্রিকেট—

ভারতীয় একাদশ : ৩৪৮ রান (বাপু নাদকার্নী ৭৮, চান্দু বোরদে ৬৯, এম এল জয়সীমা ৫৪ এবং প্রকাশ পোদ্দার ৫৪ রান। গারফিল্ড সোবার্স ৬৩ রানে ৬ এবং পিচাউড ৫৮ রানে ৩ উইকেট) ও ২১৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। দিলিপ সরদেশাই ৫৯ এবং হনুমন্ত সিং ৫৮ রান। সোবার্স ৫৮ রানে ৩ এবং রিচি বোনো ৩৮ রানে ৩ উইকেট)

কমনওয়েলথ একাদশ : ৩২১ রান (সেমুর নার্স ১০৬ এবং গারফিল্ড সোবার্স ১২৩ রান। চন্দ্রশেখর ১০৩ রানে ৬ এবং নাদকার্নী ৪০ রানে ২ উইকেট) ও ২৪৩ রান (৩ উইকেটে। সেমুর নার্স ১৩৫ নটআউট এবং রিচি বেনো ৬৯ রান। বোরদে ৫১ রানে ২ উইকেট) রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারতীয় বনাম কমনওয়েলথ একাদশ দলের চারদিনের খেলায় কমনওয়েলথ দল ৭ উইকেটে জয়লাভ করে। ভারতীয় জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাহায্য তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রবীণ ক্রীড়াবিদ এবং ক্রিকেট খেলার পুস্তক রচয়িতা ই ডবলিউ সোয়ানটনের ব্যবস্থাপনায় এই কমনওয়েলথ দলে গারফিল্ড সোবার্স, রিচি বেনো এবং সনি রামাধীন—এই তিনজন প্রখ্যাত টেষ্ট খেলোয়াড় এসেছিলেন। কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক ছিলেন কলিন ইঙ্গলবি ম্যাকেঞ্জি (হাম্পশায়ার) এবং ভারতীয় দলের চান্দু বোরদে।

অধিনায়ক বোরদে টসে জয়ী হন। ভারতীয় একাদশ দল প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় একাদশ দলের ২৩২ রান (৫ উইকেটে) ওঠে। দ্বিতীয় দিনের দু' ঘণ্টার খেলায় তাদের বাকি পাঁচটা উইকেট পড়ে ১১৬ রানের বিনিময়ে। মোট ৩৪৮ রানের মাথায় প্রথম ইনিংস শেষ হয়। সোবার্স ৬টা উইকেট পান। খেলার বাকি সময়ে কমনওয়েলথ দল তিনটে উইকেট খুইয়ে ১৭৫ রান করে। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে সোবার্স খেলতে নেমে খেলার গতি ঘুরিয়ে দেন। এইদিন তাঁরা চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ১২০ রান তুলে অপরাজিত থাকেন—নার্সের রান ৭৮ এবং সোবার্সের রান ৭৯। সোবার্স ঝড়ের গতিতে খেলে সহযোগী নার্সের রান অতিক্রম করেছিলেন। যেখানে খেলার এক সময়ে নার্সের রান ছিল ৪৯ এবং সোবার্সের ৩ রান, দ্বিতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার সময় স্কোর বোর্ডে উঠলো সোবার্সের রান ৭৯ এবং নার্সের রান ৭৮।

তৃতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের ৩২১ রানের মাথায়

প্রথম ইনিংস শেষ হ'লে ভারতীয় একাদশ দল মাত্র ২৭ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের দান হাতে পায়। ভারতীয় দলের তরুণ খেলোয়াড় চন্দ্রশেখর ১০৩ রানে ৬টা উইকেট পান। সোবার্স এবং নার্স উভয়েই সেঞ্চুরী করেন। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে নার্স এবং সোবার্স দলের ১৮০ রান যোগ করেন। তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ৩ উইকেট পড়ে ভারতীয় একাদশ দলের ১১০ রান ওঠে।

চতুর্থ দিনে ২১৫ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় ভারতীয় একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দিলীপ সরদেশাই এবং হনুমন্ত সিং ১১৮ রান যোগ করেন।

খেলার ১৭০ মিনিটে ২৪৩ রান তুলে জয়লাভ করতে হবে—কাগজে-কলমের হিসাবে অসম্ভব ব্যাপার। একমাত্র যাঁরা প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলার সমর্থক, তাঁরাই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহসী হ'ন। এই ধরণের খেলায় অনেক ঝুঁকি—পরাজয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তবে এই ধরণের খেলায় দর্শকদের পক্ষে অপরিসীম উত্তেজনা এবং আনন্দ আছে।

খেলায় সে আনন্দ দিয়েছিলেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের গারফিল্ড সোবার্স এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিচি বেনো। একদিকে বৈশাখের খর রৌদ্র এবং অপর দিকে নাদকার্ণির বোলিং। এ সব বাধা তুচ্ছ করে তাঁরা খেলেছিলেন। অবস্থা অনুযায়ী কি ভাবে খেলতে হয় তারই নজির তাঁরা ইডেনের কাঠফোটা রৌদ্রে রেখে গেছেন। ঘড়ির মিনিটের কাঁটাকে পাল্লা দিয়ে কমনওয়েলথ দল খেলেছিলেন। ৪০ মিনিটের খেলায় ৪৭ রান। এই ৪৭ রানের মাথায় প্রথম উইকেট (পতৌদির নবাব) পড়লো। এবং দলের দ্বিতীয় উইকেট (টেলর) ৯৮ রানের মাথায় পড়ে যায়। একদিকের উইকেটে তখন নার্স। সোবার্স শূন্য উইকেটে খেলতে নামলেন। দলের শতরান পূর্ণ হল ৮০ মিনিটের খেলায়—মিনিটের কাঁটাকে অতিক্রম ক'রে রান ছুটেছে। চা পানের বিরতির সময় কমনওয়েলথ দলের রান দাঁড়ালো ১৬০ (২ উইকেটে)। নার্সের শত রান পূর্ণ হয়েছে। হাতে তখন জমা এক ঘণ্টার খেলা এবং জয়লাভের জন্যে আরও ৮৩ রানের প্রয়োজন। চা পান করে বেনো মারমুখী হয়ে খেলতে লাগলেন। নাদকার্ণির এক ওভারের খেলায় ছুটো ওভার-বাউণ্ডারী এবং একটা বাউণ্ডারী করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত ৫০ রান পূর্ণ হল এবং দলের ২০০ রান। দলের ২৩২ রানের মাথায় বেনো তাঁর নিজস্ব ৬৯ রান করে খেলা থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর এই ৬৯ রানের সঞ্চয়ে ছিলো ৮টা বাউণ্ডারী এবং ছুটো ওভার-বাউণ্ডারী। বেনোর পরিত্যক্ত উইকেটে খেলতে নামলেন গারফিল্ড সোবার্স জয়লাভের জন্যে তখন আর মাত্র ১১ রানের প্রয়োজন ছিল। দলের ২৪১ রানের মাথায় নার্সের উপর জয়সূচক ২ রান সংগ্রহের ভার পড়ে। নার্স ২ রান ক'রে দলের জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৩ রান পূর্ণ করলেন। তখন খেলা ভাঙ্গতে ৮ মিনিট বাকি ছিল। ১৬২ মিনিটের খেলায় কমনওয়েলথ দল প্রয়োজনীয় ২৪৩ রান তুলে ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

মোহনবাগান দলের সাফল্য ঃ

মোহনবাগান ক্লাব বোম্বাইয়ের দুই প্রখ্যাত আগা খাঁ এবং গোল্ড কাপ জয় করেছে। একই বছরে এই দুই কাপ জয়ের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দুটি কাপই কলকাতায় এই প্রথম এলো।

গোল্ডকাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ২—০ গোলে কাস্টমস দলকে পরাজিত করে।

আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান দলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পাঞ্জাব পুলিশ। এই খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। ফলে উভয় দলকে যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ইতিপূর্ব্বে ক'লকাতার দুটি দল আগা খাঁ কাপের ফাইনালে খেলেছিল—১৯০৬ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং ১৯৩২ সালে ক্যালকাটা কাষ্টমস।

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস ঃ

১৯৬৪ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে ফিলিপ্পাইন ৩—২ খেলায় গত তিন বছরের পূর্ব্বাঞ্চল বিজয়ী ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে ভারতবর্ষের হাতে পূর্ব্ব পরাজয়ের (১৯৬০ সালে) প্রতিশোধ নিয়েছে। দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ ডাবলসে বিজয়ী হয়ে ২—১ খেলায় অগ্রগামী

ছিল। কিন্তু তৃতীয় দিনের দুটি সিঙ্গলসেই ভারতবর্ষ পরাজয় বরণ ক'রে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়।

রঞ্জিট্রফি ফাইনাল ঃ

বোম্বাই ঃ ৫২৬ রান (এস দিওয়াদকার ১৭৭, অশোক মানকাদ ৮০, সুধাকর অধিকারী ৫৩ এবং তামানে ৫৩ রান। সুন্দরম ১০১ রানে ৪, ঘাটানি ১১৭ রানে ২ এবং রাজসিং ১২২ রানে ২ উইকেট) **ও ২১ রান** (১ উইকেট)

রাজস্থান ঃ ১০৮ রান (সেলিম দুরাণী ৩০ রান। দেশাই ১৮ রানে ৩, নাদকার্নী ২০ রানে ৩ এবং গুপ্তে ৩৮ রানে ২ উইকেট)

ও ৪৩৮ রান (হনুমন্ত সিং ১২৮, সেলিম দুরাণী ১১৮ ও বিজয় মঞ্জরেকার ১০৫ রান। ভার্দে ৬৯ রানে ৩ উইকেট)

১৯৬৩-৬৪ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার (রঞ্জি ট্রফি) ফাইনালে গত পাঁচ বছরের বিজয়ী বোম্বাই রাজ্য দল ৯ উইকেটে গত তিন বছরের রানার্স আপ রাজস্থান দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৬ বার এবং মোট ১৫ বার রঞ্জিট্রফি জয় করেছে। এই নিয়ে বোম্বাই ১৬ বার ফাইনালে খেললো—পরাজয় মাত্র একবার (১৯৪৭-৪৮ সালে, হোলকারের বিপক্ষে ৯ উইকেটে)। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে বোম্বাই সর্ব্বাধিকবার রঞ্জিট্রফি জয়ের রেকর্ডকরেছে।

রাজস্থান টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেয়নি। প্রথম দিনের খেলায় বোম্বাইয়ের ২৮৪ রান (৬ উইকেটে) ওঠে।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের বিরতির সময়-সময়ে ৫২৬ রানের মাথায় বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। বাকি সময়ে রাজস্থান পাঁচটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩২ রান করে।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের আগে ১০৮ রানের মাথায় রাজস্থানের প্রথম ইনিংস শেষ হলে বোম্বাই ৪১৮ রানে অগ্রগামী হয়। 'ফলো-অন' ক'রে রাজস্থান এই দিনে দুটো উইকেট খুইয়ে ১৭৬ রান করে।

চতুর্থ দিনে রাজস্থানের ৪০৫ রান (৭ উইকেটে) দাঁড়ায়। হনুমন্ত (১১৬ রান) এবং ঘাটানি (৭ রান) নট আউট থাকেন। এই দিনে রাজস্থান আরও পাঁচটা উইকেট খুইয়ে তৃতীয় দিনের ১৭৬ রানের সঙ্গে ২২৯ রান যোগ করে। রাজস্থানের তিনজন খেলোয়াড় (দুরানী, মঞ্জরেকার এবং হনুমন্ত সিং) সেঞ্চুরী করেন। সুতরাং চতুর্থ দিনটা রাজস্থানেরই দিন ছিল।

পঞ্চম দিনে ৪৩৮ রানের মাথায় রাজস্থানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে বোম্বাই দলকে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১ রান তুলতে দ্বিতীয়বার ব্যাট ধরতে হয়। এক উইকেটের বিনিময়ে বোম্বাই ২১ রান তুলে নয় উইকেটে জয়ী হয়।

কেম্ব্রিজ—অক্সফোর্ড বোট রেস ঃ

প্রখ্যাত কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১০তম বার্ষিক বোট রেসে কেম্ব্রিজ দল ৬½ লেংথে গত বছরের বিজয়ী অক্সফোর্ডকে পরাজিত ক'রে মোট ৬১বার জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। কেম্ব্রিজ দলের এই সাফল্য খুবই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। পণ্ডিত মহল অক্সফোর্ড দলের সাফল্য সম্পর্কে খুব জোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বিগত ১১০টি বোট রেসের ফলাফল : কেম্ব্রিজের জয় ৬১, অক্সফোর্ডের জয় ৪৮ এবং ১ বার ডেড হিট অর্থাৎ অমীমাংসিত।

টেবল টেনিস টেষ্ট ঃ

যুগোশ্লাভিয়া টেবল টেনিস দল ভারত সফরে মোট পাঁচটি বে-সরকারী টেস্ট খেলায় যোগদান ক'রে অপরাজেয় সম্মান লাভ করে। যুগোশ্লাভিয়া দলে খেলেছিলেন ভি মার্কোভিক, এডো ভেক্কো এবং জেন্টকো হার্বুদ। যুগোশ্লাভিয়া দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন ভি মার্কোভিক। তিনি প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলার পর অসুস্থ হয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

টেষ্ট খেলার খেলার ফলাফল

প্রথম টেস্ট (কলকাতা): যুগোশ্লাভিয়া ৫—১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষের পক্ষে একটা খেলায় জয়ী হ'ন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান জয়ন্ত ভোরা।

দ্বিতীয় টেষ্ট (বোম্বাই): যুগোশ্লাভিয়া ৫—২ খেলায় জয়ী হয়। ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভ করেন গৌতম দেওয়ান এবং খোদাজি। জাতীয় চ্যাম্পিয়ান জয়ন্ত ভোরা তিনটি খেলায় যোগদান ক'রে পরাজয় বরণ করেন।

তৃতীয় টেস্ট (মাদ্রাজ): যুগোশ্লাভিয়া ৩—, খেলায় জয়ী হয়। ভারতবর্ষের পক্ষে জয়ন্ত ভোরা একটা খেলায় জয়ী হন।

চতুর্থ টেষ্ট (হায়দ্রাবাদ): যুগোশ্লাভিয়া ৩-২ খেলায় জয়ী হয়।

পঞ্চম টেষ্ট (জয়পুর): যুগোশ্লাভিয়া ৩-০ খেলায় জয়ী হয়।

হকি টেষ্ট ঃ

মহিলাদের হকি টেষ্ট: জাপানের মহিলা হকি দল ভারত সফরে মোট সাতটি টেস্ট ম্যাচ খেলে 'রাবার' সম্মান লাভ করে। খেলার ফলাফল: জাপানের জয় ৩, ভারতবর্ষের জয় ১ এবং খেলা ড্র ৩। জাপানের জয়: জলন্ধরের প্রথম টেস্টে ২-১ গোলে, বোম্বাইয়ের পঞ্চম টেস্টে ২—১ গোলে এবং ত্রিবান্দ্রামের সপ্তম টেস্টে ২—১ গোলে। ভারতবর্ষের জয়: দিল্লীর তৃতীয় টেস্টে ভারতবর্ষের জয় ৩—২ গোলে। খেলা ড্র: লক্ষ্ণৌর দ্বিতীয় টেস্ট (গোলশূন্য), বাঙ্গালোরের ৬ষ্ঠ টেস্ট (গোলশূন্য) এবং আমেদাবাদের চতুর্থ টেস্ট (১—১ গোলে)।

পুরুষদের হকি টেস্ট: জাপানের পুরুষ হকি দলকে ভারতবর্ষ পাঁচটি টেষ্ট খেলায় পরাজিত ক'রে 'রাবার' লাভ করে।

খেলার ফলাফল: প্রথম টেস্টে (বোম্বাই) ৩—০ গোলে, দ্বিতীয় টেস্টে (দিল্লী) ২—১ গোলে, তৃতীয় টেস্টে (পাতিয়ালা) ২—০ গোলে, চতুর্থ টেস্টে (লুধিয়ানা) ২—০ গোলে এবং পঞ্চম টেস্টে (অমৃত সহর) ২—০ গোলে ভারতবর্ষ জয়ী হয়।

ভারত সফরের ফলাফল: খেলা ১৬, জয় ৪, হার ৯ এবং ড্র ৩। ২০টি গোল খেয়ে জাপান ১৮টি গোল দেয়।

অর্জ্জুন পুরস্কার—

১৯৬৩ সালের ক্রীড়ানৈপুণ্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সাতজন ক্রীড়াবীদকে অর্জ্জুন পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। মহিলা এ্যাথলীট স্টেফি ডি'সুজা (এ্যাথলেটিক্স), চুনী গোস্বামী (ফুটবল), চরঞ্জিৎ সিং (হকি), মেজর ঠাকুর (পোলো), গণপৎ আন্ধালকার (কুস্তি), ঈশ্বর রাও (ভারোত্তোলন) এবং অশোক সিং মালিক (গল্‌ফ)।

জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা ঃ

১৬শ জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল সর্ব্বাধিক পয়েন্ট (২৭) অর্জ্জন ক'রে উপর্যুপরি দশবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব লাভ করেছে।

ফাইনাল: সার্ভিসেস (২৭ পয়েন্ট), পাঞ্জাব (১৭ পয়েন্ট), মহারাষ্ট্র (১১ পয়েন্ট), রেলওয়ে এবং দিল্লী (৭ পয়েন্ট)

সি এ বি নকআউট ক্রিকেট ঃ

বার্ষিক সি এ বি নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ৫ উইকেটে এরিয়ান্স দলকে পরাজিত ক'রে মোট ৮ বার মেহরা ট্রফি জয়ের (রেকর্ড) গৌরব লাভ করেছে।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ৪।৪।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, নবীন ভারতের স্রষ্টা, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননায়ক, গণতন্ত্রের পূজারী, নিরপেক্ষতা নীতির প্রবর্ত্তক, সুর্জাতিকতাবাদী, মানবতাবাদী, কর্ম্মযোগী, শান্তির সাধক, ভারতরত্ন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে আমরা আজ শোকসন্তপ্ত চিত্তে স্মরণ করিতেছি। তাঁর স্বর্গগত মহান আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

এবং তাঁর আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে, তাঁর প্রাণের ভারতের উন্নতি করিতে, তাঁর চিরপ্রিয় দেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ বিধান করিতে সকলকে আহ্বান করিতেছি।

তিনি আজ নেই, কিন্তু তাঁর সাধের সাধারণ-তন্ত্রী ভারত যেন দীর্ঘজীবী হয়।

ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী
শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

(অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

নেতাজী ও নেহেরুজী

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কন্যা ইন্দিরা সহ গাড়ীতে উপবিষ্ট। পার্শ্বে শরৎচন্দ্র বসু দণ্ডায়মান।

নিখিল ভারত কংগ্রেস্ কমিটির কলিকাতার অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সুভাষচন্দ্রের সহিত যোগদান করিতে যাইতেছেন। পশ্চাতে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকেও

সোদপুরে সুভাষচন্দ্রের সহিত জওহরলালজী।

শান্তিঘাটে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের শেষকৃত্য দর্শনরত রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সহিত (বামদিক হইতে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব ষ্টেট মিঃ ডীন রাস্ক, লেডী পামেলা হিক্স, আর্ল মাউণ্টব্যাটেন ও সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি মিঃ হাসান সোফী প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭১

দ্বিতীয় খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শরণাগতি

শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ

ভক্তিবাদের উপর অনেকের আস্থা কমিয়া গিয়াছে। কারণ ভক্তি-বাদই নাকি ক্লৈব্যের পরিচায়ক। যে হেতু শরণাগতি ভক্তিবাদের কথা, অতএব তাহা দুর্ব্বলের আচরণীয়। কিন্তু কোন বিষয় বিচার না করিয়া সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অনুচিত। ভক্তিবাদ কি ক্লীবের বা কাপুরুষের জন্য? উত্তরে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তির কথা মনে পড়ে—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।"

উপনিষদেও দৃষ্ট হয়—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" যদি ভক্তিবাদের সাহায্যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ভক্ত ক্লীব বা তমোগুণাচ্ছন্ন নয়। ভক্ত মহাবীরের চরিত্র জগতে সুবিজ্ঞাত। তাঁহার বীরত্বের কথা কাহারও অজ্ঞাত নাই। অবশ্য যাঁহারা রামায়ণকে কাল্পনিক বলেন—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। ইহা যে কাল্পনিক নয়, তাহার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তুলসীদাস প্রমুখ ভক্তগণ মহাবীরজীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীরজীর যে অলৌকিক কার্য্যাবলী তাহাও অষ্টসিদ্ধির পরিচায়ক। এই সকল বিভূতির কিছু কিছু অংশ সাধকমণ্ডলীর মধ্যে দৃষ্ট হয়।

শরণাগতিকে মাত্র ভক্তিবাদের মূল বা প্রধান উপায় বলিয়া স্বীকার করিলে ইহার স্বরূপসম্বন্ধজ্ঞানের অভাব

পরিলক্ষিত হইবে। শরণাগতি ভিন্ন জীবের মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্য উপায় নাই বলিলে কোন দোষ হয় কি? কর্ম্মী, ভক্ত, জ্ঞানী—সকলকেই শরণাগত হইতে হইবেই। কর্ম্মের এতাদৃশ একটি গতি আছে যে স্থলে কর্ম্মীর কোন স্বাধীনতা থাকে না। অসহায়ভাবে সেই গতিকে অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। সেই অনুসৃতিই কি শরণাগতির নামান্তর নয়?

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

যে কেহ 'আমি তোমার শরণাগত এই কথা একবার বলে সেই সকল প্রাণীকে অভয়দান করাই আমার ব্রত'—ইহা ভক্তিবাদের কথা। গীতায় অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন—"শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" ইহার পরিণামে গীতার উদ্ভব ও বিশ্বরূপদর্শন সম্ভব হইয়াছিল। শরণাগতি শক্তিমানের ধর্ম্ম। আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি দুর্ব্বলের পক্ষে সম্ভবই নয়। তথাকথিত শরণাগতের অভাব নাই। আদেশ বা উপদেশ রুচিকর না হইলে এই জাতীয় শরণাগতের বাহ্যিক বা মানসিক বিকার সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। অন্যের উপদেশ বা আদেশের অপব্যাখ্যা দ্বারা আত্মপ্রীতির ব্যবস্থা করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। ইহা কি প্রকৃত শরণাগতি? শরণাগতের মনোভাব হইবে "আমি তোমার, তুমি মার আর রাখ—তুমি ভিন্ন আমার আর গতি নাই।" এই যে সংযম, এই যে আত্মনিগ্রহ ইহা বলবানের পক্ষেই সম্ভব। ইহাই প্রকৃত শরণাগতি। শরণাগতিকে চাতকী-বৃত্তিও বলা হয়।

জ্ঞানবাদেও শরণাগতির বিশেষ স্থান আছে। জ্ঞানীগণ অনেককে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু গীতার অংশবিশেষ ও উপনিষদ্‌কে জ্ঞানগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার অবশ্যই করিবেন। এই বিষয়ে জ্ঞানগ্রন্থ হইতে প্রমাণ করা যায় যে শরণাগতি জ্ঞানীরও চরম এবং পরম কাম্য। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ গীতা ১১।৫৩॥

তুমি যে রূপ দর্শন করিলে এই রূপ কেহ বেদপাঠ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা দেখিতে সক্ষম হয় না। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছে যে অর্জ্জুন ঈদৃশ কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন যাহার ফলে বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন। শরণাগতি—শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" বেদপাঠ, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা এই রূপ দেখিতে পায় না অর্থাৎ মাত্র গ্রন্থ-অভ্যাসের দ্বারা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানের উদয় হয়, ক্রমে শরণ গ্রহণ করিয়া মানুষ কৃতার্থ হয়। অনেকের মনে হইতে পারে ঐ শ্লোক বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়ের (ভক্তিভাগের) অন্তর্গত। সেই জন্য বিজ্ঞান যোগ অধ্যায়ের আলোচনা করা হইতেছে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪ গীতা

এই চিত্রগুণাত্মিকা অলৌকিকী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী আমার মায়াশক্তি সুদুস্তরা। যাহারা কায়মনোবাক্যে আমার শরণাপন্ন হইয়া ভজনা করেন তাঁহারাই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন। মায়ার পরপারে যাইতেই হইবে নতুবা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভবই নয়। অতএব জ্ঞানেও শরণাগতির প্রয়োজন আছে। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে অনুরূপ কথা পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"মত্তঃ স্মৃতি র্জ্ঞানমপোহনং চ।"

"আমাতেই জ্ঞান ও স্মৃতির উৎপত্তি ও নিবৃত্তি হয়।" অতএব জ্ঞান ভগবানের-ই দান। স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ উপায়।

উপনিষদও বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ ২।৫২।২৩॥

কঠোপনিষদ্ কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। এই আত্মা (ঈশ্বর) যাহাকে উপযুক্ত পাত্র মনে করেন অর্থাৎ বরণ করেন তাঁহারই আত্মসাক্ষাৎকার বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার সম্ভব হইয়া থাকে।"

ইহা দ্বারা শাস্ত্রাভ্যাসাদির উপযোগিতা ক্ষুণ্ণ হয় না। উপযুক্ত হইবার জন্যই স্বাধ্যায়, সাধনা প্রভৃতির প্রয়োজন। ঈশ্বরের আবির্ভাব বা আত্মার প্রকাশ স্ব-ইচ্ছার অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। জ্ঞানী "সোহহং"ভাবের সাধনাদি করিলেও তাঁহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অপেক্ষায়

থাকিতে হইতেছে অর্থাৎ শরণাগত হইতেই হইতেছে। ঈশ্বর বা আত্মা কাহাকে বরণ করিবেন তাহা যদি তাঁহার ইচ্ছার অধীন হয় তাহা হইলে ইচ্ছাকে স্বাভিমুখী করিতে শরণাগতি ভিন্ন অন্য পথ নাই। ঈশ্বরের নির্দ্দেশে বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যখনই জ্ঞানী বেদাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন তখনই কি প্রকারান্তরে শরণাগত হইলেন না?

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের টীকায় বলিয়াছেন—
"তদনুগ্রহ-হেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধি-ভবিতুমহতি।" "জ্ঞানের দ্বারাই একমাত্র মুক্তি সম্ভব। জ্ঞান একমাত্র ভগবৎ কৃপাতেই সম্ভব।" অনুরূপ কথা অবধূত গীতার প্রারম্ভেই পাওয়া যায়।

"ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা।"

"কেবলমাত্র ঈশ্বরানুগ্রহেই মানুষের অদ্বৈত বাসনার উৎপত্তি হইয়া থাকে।" অতএব অদ্বৈত-জ্ঞানবাদীদের ও অদ্বৈত বাসনার জন্য ভগবানের করুণার প্রার্থী হইতে হয়। ভগবৎ কৃপা যদি অপরিহার্য্যই হয় তাহা হইলে শরণাগতিই ইহা লাভের পরম ও চরম উপায়। "শরণাগতি" মাত্র ভক্তের জন্য নয়। ইহা জ্ঞানী ও কর্মী সকলেরই কাম্য বা অবলম্বনীয় বলিলে নিশ্চয়ই অন্যায় হয় না।

প্রাণ প্রবাহ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

প্রাণ সেকি শুধুই জীবন?
বেঁচে থাকা' খাওয়া? নিদ্রা যাওয়া?
হিসাব আর আত্মসুখে
কাল অতিপাত?
হিংস্র ব্যাঘ্রের আর
হিংসায় উন্মত্ত মানুষের
প্রাণ প্রাণ নয়।
প্রাণ সেথা যেথা ভালবাসা,
প্রাণ সেথা সেথা প্রাণ দেওয়া
প্রাণ কেড়ে নেয় সেই প্রাণ,
সে তো প্রাণ নয়।
যদি কোথা বায়ু রাশি
উষ্ণ হয়, সৃষ্টি করে শূন্যতার
চঞ্চল পবন ছুটে আসে
চারিদিক হতে,
অপূর্ণেরে পূর্ণ করে
শূন্যতার নাহি রাখি কেশ।
প্রাণের ও প্রবাহ সেই মত।

প্রাণের বিনাশ যেথা
দম্ভে দর্পে ঘৃণা আর হিংসার জ্বালায়,
প্রাণের ও প্রবাহ সেথা ধায়
বায়ুর প্রবাহ যেমন।
আজি এই শূন্যতায় রুক্ষতায়
প্রাণের অশেষ ক্লেশে
কেন বহে নাকো বেগে প্রাণের প্রবাহ
বায়ুর মতন?
যদি থাকে প্রাণ কেন সে আসে না।
বুকভরা স্নেহ নিয়ে?
সাহস-উদ্দীপ্ত বক্ষে?

সম্মুখে সংকট সবাকার,
ক্লিষ্ট প্রাণ দিকে দিকে
করে হাহাকার।
এ ঘোর সংকটে আজ নেই কারো ত্রাণ
অসংকোচে প্রাণ যদি
না করিবে দান।

রবীন্দ্রকাব্যে সাধারণ মানুষ

শ্রীঅনন্তবিকাশ ভট্টাচার্য্য

সাধারণ মানুষ বলতে প্রথমেই মনে হয় যিনি অসাধারণ নন অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ ও রসকে যিনি অন্তর্দৃষ্টি বা বিশেষ ভাবে দেখেন না। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক—এরাই উপলব্ধি করেন পৃথিবীর রূপ ও রসকে বিশেষ ভাবে। সুতরাং তাঁরাই হচ্ছেন অসাধারণ আর বাকী সাধারণ।

রবীন্দ্রকাব্যে সাধারণ মানুষের স্থান নেই। কারণ রবীন্দ্র প্রতিভা অসাধারণের অসাধারণ। সাধারণ মানুষ তাঁর ধরা ছোঁয়া পেতে পারেনা। রবীন্দ্র প্রতিভার সামনে সমস্ত প্রতিভাই ম্লান, স্তিমিত। যে প্রতিভা এত বড়, এত বিরাট সুদূরপ্রসারিত তার আলোচনা করতে হলে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারের রত্নরাজি সমূহ নানাবিধ ভাবে নানাদিক থেকে সঞ্চিত করে তুলতে হবে। এ যেন বিশাল সমুদ্র, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মালা সাজিয়ে অনন্ত কালের পথে ছুটে চলেছে সৃষ্টি রহস্য ভেদ করতে। রবীন্দ্র প্রতিভাও তেমনি অক্ষরের মালা সাজিয়ে চির-দিনের সর্ব যুগের সকল লোকের হৃদয়ের অব্যক্ত কথা-সমূহ গুণ গুণ করে ফুটিয়ে তুলেছে লেখনীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি-মাধুর্য্যের ভিতর দিয়ে। সুতরাং এ প্রতিভা সম্যক বুঝতে হ'লে আমাদের চাই প্রচুর সময় আর যথেষ্ট সুযোগ ও সাধনা, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কারণ তার মন নানা কাজে ও পেটের চিন্তায় সব সময় ব্যস্ত থাকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আধঘণ্টা কি একঘণ্টা সে মনকে টেনে আনে কাব্যিক জগতে, আবার হয়তো কারও ভাগ্যে তাও ঘটে না। সারা জীবন পড়েও এ প্রতিভা বোঝা শেষ হয় না; এঁকে সম্পূর্ণ জানা যায় না। এঁর দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় দেখা যায় এ আরও কত বিরাট, কত মহান্। কোন বিশেষ প্রতিভাবান্ শক্তিশালী লেখক বলেছিলেন যে এঁদের প্রতিভা সাধারণের জন্য কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভা অতি অসাধারণ। তাঁকে বুঝতে হ'লে সাধারণ জ্ঞান বা সাধারণ চোখ নিয়ে বুঝতে পারা যায় না, চাই অন্তর্দৃষ্টি আর যথেষ্ট সাধনা। আমাদের কিন্তু এ স্থানে দেখতে হবে রবীন্দ্র কাব্যে সাধারণ মানুষ কোন্ দিক থেকে কত পরিমাণে আনন্দ পেয়ে লাভবান্ হয়েছে (ক) প্রথমেই আমাদের মনে হয় তাঁর অমর কীর্ত্তি গীতাঞ্জলির কথা। এখানে যে সুর ভেসে উঠেছে তা দেখি সাধারণ মানুষের একান্ত প্রাণের কথা নিভৃত অন্তরের ব্যথা।

অমৃতের পুত্র আমরা, তাঁর কাছ হ'তে আমরা রয়েছি অনেক অনেক দূরে। তাঁর সহিত মিলন ইচ্ছা রয়েছে প্রতি মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি রচনা করতে যে গান গেয়েছেন তাতে দেখি সাধারণ মানুষ হয়েছে মুগ্ধ; তারা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে তাদের অন্তর দেবতার কথা। সীমাবদ্ধ সাধারণ মানুষ অসীমের সহিত মিলনতৃষ্ণা মেটায় গীতাঞ্জলি পাঠ করে। তাঁরা তাঁর আগমন শোনে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে নিজেদের জীবন ধন্য ও পবিত্র করার জন্য।

> 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
> পরাণ সখা বন্ধু হে আমার—'

> 'তোরা শুনিস্ নি কি, শুনিস্‌নি তাঁর পায়ের ধ্বনি?
> সে যে আসে আসে আসে, পলে পলে দিন রজনী!'

আবার শুনি—

> 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ তলে'

অথবা—

> 'তোমার পতাকা যারে দাও
> তারে বহিবারে দাও শকতি।'

রবীন্দ্রপ্রতিভা শিশুর কোমল শয্যা, যৌবনের উপবন, আর বার্দ্ধক্যের বারাণসী। জীবনের ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে কখন যা প্রয়োজন বোধ করবে সাধারণ মানুষ তখনই এর কাছে তা অম্লান বদনে পেতে পারবে। এ

যেন জীবনপথে কামধেনু দাঁড়িয়ে রয়েছে সকলকে সব কিছু চাওয়া মাত্র দেওয়ার জন্য। শিশুর কোমল, সরল মনে সে পেতে চায় সব কিছু সরল ও স্বাভাবিক ভাবে। সে কোন জটিল ভাবের আদান প্রদান করতে চায় না। তার মাই সব, মাকে নিয়ে তার যত কথা। মা তাকে আদর করে, মাকে সে ভালবাসে। মাকে নিয়েই তার যত কবিতার আদান প্রদান। মার কাছ হ'তে চলে গেলে মার মন কেমন শূন্য লাগবে, আর সেও মাকে ছাড়া কোথাও গেলে শান্তি পাবে না; আবার মার কোলে ফিরে আসতে চাইবে; এই কথাই আমরা শুনি তার কাছে।

'আবার আমি তোমার খোকা হব
"গল্প বল" তোমায় গিয়ে ক'বা।
তুমি বলবে, "দুষ্টু, ছিলি কোথা।"
আমি বলব, "বলব না সে কথা॥ (লুকোচুরি)

'খোকার লাগি তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হয়ে বলব তোমায় "ঘুমো।"
তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো॥"

—(বিদায়)—

সে মাকে সমস্ত ডাকাত ও দস্যুর কবল হতে রক্ষা করবে। মা তাকে বীরপুরুষ বলে কোলে তুলে নেবে, আদর করবে, চুমের সাথে, এই তো সে চায়। এই সব শিশু মনের বাসনা আমরা "শিশু," ও "শিশু ভোলানাথ" হতে অনুভব করতে পারি।

"আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, "লড়াই গেছে থেমে।
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে।
বলছ "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল,
কী দুদশাই হত তা না হ'লে।"

এ সমস্ত কবিতা পাঠে সব শিশুই প্রচুর আনন্দ লাভ করে থাকে।

যৌবন রসে মানুষের দেহ ও মনে এক উন্মত্তের প্রলেপ জাগে, পৃথিবীর রাশি রাশি সৌন্দর্য উপভোগ করতে সাধারণ মানুষের বাসনা জাগে নানা ভাবে নানা কাজে। তখন তার মনে আসে জোয়ার দেহে ডাকে বান, সে বলতে ভালবাসে তখন—

"সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তার উচ্ছল হয়ে ওঠে
মুগ্ধ বানের আবেগ বন্ধ টুটে—
এতাপে শ্বসিয়া ওঠে—বিকশিয়া
বিচ্ছেদ শতদল।" (শেষের কবিতা)

সে খুঁজে বেড়ায় তার চিরকালের সাথীকে। তাকে শেষে পেয়ে বেঁধে রাখতে চায় নিবিড় প্রেমের বন্ধনে। তাকে নিয়ে তার কতই না কল্পনা জল্পনা তৈরী হয় মনের আনাচে কানাচে। সে বলে :—

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।'

(শেষের কবিতা)

আবার কখনও দেখি দুরন্ত যৌবনের আহ্বানে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে চায় আর একজনের বাহুবন্ধনের কাছে, তখন সে বলে,

'হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না—
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক
তোমার চেনার অগ্নি দীপ্ত শিখা উঠুক উজ্জ্বলি
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।'

(শেষের কবিতা)

আবার কখনও বলতে শুনি—

'কে আমারে করেছে পাগল,
শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি
চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

(কড়ি ও কোমল)

মনের তৃপ্তি সাধন করেও সে নিবৃত্ত হয় না। সে চায়

দেহেরও তৃপ্তি। তাই আমরা শুনলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে সাধারণ মানুষের যৌবনের কান্না, যা স্বাভাবিক।

'প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাঝে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
ঘুরেছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।'

(কড়ি ও কোমল)

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণ মানুষের মনের তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে রয়েছে ভানুসিংহের পদাবলী, গীতাঞ্জলি, প্রভৃতি।

যথা :—

(১) 'শ্যামরে, নিপট কঠিন্ মন তোর।' .....
(২) 'শুন সখী বাজত বাঁশি।' .....
(৩) 'বাজা ওরে মোহন বাঁশী।'
(৪) মরণরে তুহু মম শ্যাম···(ভানু সিংহের পদাবলী)
(৫) 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে।···

(গীতাঞ্জলি)

সাধারণ মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে (১) অশিক্ষিত, (২) মধ্য শিক্ষিত, (৩) শিক্ষিত বা উচ্চ-শিক্ষিত।—উপরে-উক্ত ২য় এবং ৩য় শ্রেণীকে, আনন্দ পরিবেশন করতে রয়েছে অজস্র কবিতা, এস্থানে উল্লেখ করা তা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ এ প্রবন্ধ যাঁরা পাঠ করবেন তারা সকলেই (২য়) এবং (৩য়) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আমার কথায় কতটা সত্য নিহিত আছে তা বিচার করবেন আমার সহৃদয় পাঠকবর্গ নিজে।

অশিক্ষিতের জন্য রবীন্দ্রনাথ কি কি দান করেছেন এইবার আমাদের তাই দেখতে হবে, প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে—'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' যে সমস্ত অশিক্ষিত দরিদ্র, নীচবংশজাত সন্তান-দের আমরা এতদিন অবজ্ঞা করে দূরে ফেলে রেখেছি, যাদের মানুষ বলতে আমরা কখনই স্বীকার করিনি তারা যখন শিক্ষার আলোর স্পর্শে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে ধন্য হবে, মানুষ হয়ে উঠবে, তখন তারাও এই কথা চিন্তা করে অপার আনন্দ পেতে পারবে যে বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাদেরও অন্তরের বেদনা একদিন বুঝেছিলেন এবং তাদের উপর অন্যায় ও অবিচারের জন্যে শিক্ষিত মানবসমাজকে শাসিয়েছিলেন —"ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে—"আবার দেখি দরিদ্র হেয়, ঘৃণ্য অশিক্ষিত সন্তানদের মাতৃপূজায় আহ্বান জানালেন। বিভেদ ভুলে সকলের সাথে হাত ধরাধরি ক'রে দেশ-মাতৃকার অভিষেক মানসে প্রত্যেককে সাড়া দিতে বললেন :—

'এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃষ্টান
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার
এসো হে পতিত, করো অপনীত, সব অপমান ভার—'

আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতের ভিতর দিয়েও সাধারণ মানুষ সমাজকে এক অনবদ্য আনন্দ দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে এমন একটা গভীর স্বতন্ত্র ভাব ফুটে আছে যা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রাণ ও মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এর সুরলালিত্য নিজস্ব এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যা সাধারণ এবং অসাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই উপভোগ্য। তারা ভুলে যায় সবই তাদের হিসাব-নিকাশ, দেনা পাওনা, সুখ দুঃখ কিছুক্ষণের জন্যে :—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে'

সুতরাং দেখা যায় রবীন্দ্রকাব্য অনেক অনেক উচুতে ; একেবারে মেঘের কিনারায় তার স্থান, কিন্তু সময় সময় ধরণীর ধূলিতেও নেমে এসে সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে যায়, আনন্দ দিয়ে যায়, সুর দিয়ে যায়। তাই সে মনোহর, অপূর্ব্ব।

শ্রীদিলীপকুমার
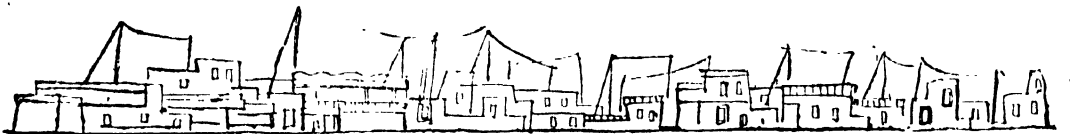
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পর্ব

ফল ও ফুল

এক

আরো তিন বৎসর কেটে গেছে। সাধুজির ইতিমধ্যে অনেকগুলি শিষ্য হয়েছে—শুধু দেহুতে নয়, বম্বে ও পুণায়ও তাঁকে যেতে হয় থেকে থেকে শিষ্যশিষ্যাদের দীক্ষা দিয়ে তাদের গৃহে ভজন করতে তথা হরিকথার পাঠ দিতে। দত্তাত্রেয় প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ ক'রে কাশীতে পড়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। শৈশব থেকেই শিবের কথায় তার মন সাড়া দিত। তাই গৌরীর মৃত্যুর পরেই বিষ্ণুঠাকুরের কথায় সাধুজি তাকে কাশীতে পাঠিয়ে দেন। ছুটিতে সে দেহুতে এলে তাকে গান শেখাতেন! কিন্তু সে আদৌ ওস্তাদি গানের ভক্ত ছিল না, ভালোবাসত বিশেষ ক'রে ধ্রুপদী শিবস্তোত্র, গাইত :

প্রভুমীশমনীশমশেষ গুণম্
গুণহীনমহীশ গরলাভরণম্।
রণনির্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরম্
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।

বন্দনা বৎসরখানেক হ'ল বিধবা হ'ল, বিধবা হওয়ার পর থেকে দত্তাত্রেয় তার কাছেই থাকে বেশি! দত্তাত্রেয় তাকে ডাকে মা মণি ব'লে, বন্দনাও ওকে ডাকে "বাবা" ব'লে। পাড়া-পড়শীরা যারা দেখে অনেকেই ভাবে ও তার আদরের ছেলে। সাধুজি ও সাবিত্রীর কাছে ও ছুটিতে আসে বন্দনার সঙ্গে, আবার ফিরে যায় তার সঙ্গেই কলেজ খুললে। সাধুজির মন এতে খুশি, ভজনে শিষ্যশিষ্যাদের দেখাশুনোয় মন দেওয়া বেশি সহজ হ'য়ে ওঠে, কেবল সাবিত্রীর মাঝে মাঝে ছেলের জন্যে মন কেমন করে, আর স্বামীর কাছে ধমক খায় : "কী ছেলে ছেলে করছ? এতদিন যোগ ক'রেও আমার ভাব গেল না? ভুলে গেলে—ছেলে তোমার নয়, ঠাকুরের—শুধু তোমার কাছে তিনি গচ্ছিত রেখেছেন? গৌরী কেমন এককথায় মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছিল মনে পড়ে না?" সাবিত্রী মোটেই ভোলে নি যে, সে সংসারী গৃহিণী নয়, গুরুমুখী যোগিনী। দত্তাত্রেয়কে গুরুদেব, গুরুমা, বন্দনা সবাই ভালোবাসে এতে আনন্দও পায় বৈ কি। কেবল তবু থেকে থেকে চোখের জল সামলাতে পারে না, মনে হয়—নয়নানন্দ নীলমণিটি বৎসরে আট মাস চোখের আড়াল না হ'লে হয়ত ওর মন আরও একটু বসত জপতপে, নাম কীর্তনে।

দত্তাত্রেয় কিন্তু ঠাট্টা করতে ছাড়ে না, বলে হেসে : "সে কি মা? এখনো তোমার মন কেমন করে এই অপোগণ্ডটার জন্যে? এ বড় লজ্জার কথা, শুধু তোমারই নয়, সেই সঙ্গে আমারো। তাই এসো দুজনে মিলে চোখের জলের নদী বইয়ে দিয়ে গাই সাজসকালে মীরাবাইয়ের সব ছেড়ে একলা ও নিলাজ হওয়ার গান :

'তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোঈ!
সন্তান সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোকলাজ খোঈ।'

কিম্বা শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গার—বাপরে!—"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ···!"

দুই

ধ্রুব ও মালতী পুণায় সংসার পাতার পর রমার

একটা সুবিধা হ'ল। আমেদাবাদ থেকে মাঝে মাঝেই আসত পুণায় যখন সাধুজি ধ্রুবর ওখানে পাঠ দিতেন কি ভজন করতেন। গৌতম নিজে ধার্মিকদের বিশ্বাস করত না ব'লে চাইত না স্ত্রী ধার্মিক গুরুর ধর্মালোচনায় যোগ দেয়। কিন্তু রমার বয়স এখন একুশ—পুরোপুরি সাবালিকা। সে সাফ ব'লে দিল স্বামীকে সেজদি আমেদাবাদে তাকে হরিকথার সভায় যেতে দেওয়া না হয় তবে সে চ'লে যাবে গুরুগৃহে দেহুতে। গৌতম ভয় পেয়ে মনুভাইকে জানায়। মনুভাই বিপদে প'ড়ে এই প্রথম পিন্টোর শরণাপন্ন না হ'য়ে নিজের বুদ্ধিতে চ'লে ভেবেচিন্তে গৌতমকে টেলিফোনে বলে: "রমা তার মার মেয়ে, ভাঙবে তবু মচকাবে না—Chip of the old blade যাকে বলে। তাই ওকে একটু রাশ ছেড়ে না দিলে বিপদ হবে।" অগত্যা গৌতম ওকে মাঝে মাঝে পুণায় যেতে দিত, ভাবত: "কাজ কি? যখন ওর টাকা ঘরে আসবে তখন আমার ব্যাঙ্কে পাঠাবার পরে কড়া হ'লেই চলবে।

রমা পুণায় এলে থাকত ধ্রুবর ওখানেই, মনুভাইয়ের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করত না। মনুভাইও পীড়াপীড়ি করত না, কারণ তার মতিগতি তো বদলায় নি, তাই মেয়ে বাড়িতে না আসাই নিরাপদ। তাছাড়া কেনই বা আর রমাকে নিয়ে মাথা ব্যথা?—ভর্তাই হোক কর্তা, সেই তো ভালো সব দিক দিয়েই।

পুণায় ধ্রুবর হরিকথার আসরে রমার খুব ভালো লেগে গেল নমিতাকে। ওরা সই পাতালো—নয়নতারা। নমিতার পিতা আলোককেও ওর খুব ভালো লাগল আরো তার গান শুনে। এবার ওদের কথা বলার পালা।

আলোকের পিতা ছিলেন পুণার বনেদি বাসিন্দা—নামকরা সার্জন, সবজনপ্রিয়। পুণায় চতুঃশৃঙ্গী মন্দিরের কাছে গণেশখিন্দ রোডে চমৎকার বাড়ি করেছিলেন। আলোকের জন্ম সেইখানেই—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯১৮ সালে। তারপরে সে লণ্ডনে গিয়ে F.R.C.S পাশ করে ফিরে আসে ১৯৪৭ সালে। ভারত স্বাধীন হবার ঠিক পরেই। দেখতে দেখতে সে পিতার নাম রাখল সাসুন হাসপাতালে জনপ্রিয় সার্জন হ'য়ে।

আলোক আবাল্য ওস্তাদি গান শিখেছিল পুণায় বিষ্ণুদিগম্বরের এক সাগরেদের কাছে। স্বভাবেও ছিল আদর্শবাদী, তাই বিলেত থেকে ফিরেই মনে মনে সংকল্প করেছিল যে: এক, বিয়ে করবে না, দুই, ডাক্তারি ক'রে আরো কিছু টাকা ক'রে মহাত্মা ৺বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের মতন অবসর নিয়ে শেষ জীবনটা সঙ্গীত সেবায় নিয়োগ করবে; তিন, যদি যথেষ্ট টাকা জমাতে পারে তবে পুণার একটি সঙ্গীত আকাদেমির পত্তন করবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর: বিলেত থেকে ফিরে এসেই সাসুন হাসপাতালে সহকারিণী এক সুন্দরী নার্সের প্রেমে প'ড়ে আলোক তাকে বিবাহ ক'রে বসল। নমিতাকে জন্ম দিয়েই প্রসূতি বিদায় নিয়েছিলেন ইহলোক থেকে। মাতৃহারা কন্যাকে আলোক প্রায় হাতে ক'রে মানুষ করেছিল বললেই হয়। ফলে ওদের সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল এমন সুন্দর হ'য়ে যে সবাই মুগ্ধ হ'ত। বলতঃ বাপ তো নয়—সে বন্ধু, আর মেয়ে তো নয়—যেন মন্ত্রী।

নমিতাকে ও গান শেখাত পরম আনন্দে, কারণ নমিতার ছিল গানে সহজ প্রতিভা, কণ্ঠও ছিল সাবলীল। আলোক ভালোবাসত বাংলা গানে তানালাপ—নমিতা গাইত বাংলা গানে নানা তান আঁখর দিয়ে। শুধু গান গাওয়াই নয়—নমিতা গান বাঁধতও চমৎকার। আলোক হাতে যেন চাঁদ পেল। এমন না হ'লে আত্মজা!

তিন

আলোক ও নমিতা ধ্রুবর ওখানে প্রথম এসেছিল প্রহ্লাদ পলুস্করের নাম শুনে। গ্রামোফোনে তাঁর গানের নানা তানে ও সার্গামে ওরা মুগ্ধ হয়েছিল দশবৎসর আগে, ধ্রুবর ওখানে তাঁর ভজন ও হরিকথা শুনে আরো আকৃষ্ট হল। আলোক ছেলেবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে পড়েছিল। এ আর এক আশ্চর্য স্বভাবে অবিশ্বাসী তথা বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোভার নিয়ে ও কেমন ক'রে ধর্মের সেকেলিয়ানায় সাড়া দিল! শুধু সাড়া দেওয়া নয়—সাধুজির কাছে দীক্ষা নিল এক হঠাৎ জাগা ভক্তির তাগিদে! নমিতাও দীক্ষা নিল সাগ্রহেই। উভয়ে দীক্ষা নেওয়ার পরে সাধুজি নমিতাকে ঠাট্টা ক'রে বলতেন মাঝে মাঝেই: "এবার আর কি মা? বাপকে বলো—তুম ভি মিলিটারি—হম্ ভি মিলিটারী। যেহেতু আমরা

আর পিতাপুত্রী নই, আমরা গুরুভাই গুরুবোন।" আলোক ও নমিতা হাসতে ভালোবাসত, তাই আরো ভালোবেসেছিল সাধুজিকে। নমিতা আলোককে বলত প্রায়ই: "জানো বাবা? গুরু শুনলে আগে আগে কেমন যেন ভয়ভয় করত, মনে হ'ত —বাপ্ রে! গুরু! কাজ নেই। কিন্তু সাধুজীকে দেখতে না দেখতে ভয় ভেঙে গেল। কী প্রাণ-খোলা সরল হাসি—বলো তো—ঠিক যেন একটি আট বছরের শিশু, না?"

ধ্রুবর ওখানে হরিকথা ও ভজনের আসরে আসত একটি মারাঠি শ্রীমন্তিনী, নাম—ভক্তি ডাণ্ডেকর। ধ্রুবদের তিনতলা বাড়ির ঠিক সামনেই একটি দোতলা অনাথ আশ্রম—রাস্তার ওপারে। তার পরের রাস্তায় মুতা নদীর তীরে একটি ছোট বাংলোয় সে থাকত স্বামীর সঙ্গে।—স্বামী বামন ডাণ্ডেকর ছিল পিন্টোর কলেজে রসায়নের ডিমনস্ট্রেটর। পিন্টোকে সে শুধু যে আদর্শ বৈজ্ঞানিক মনে করত তাই নয়, ভাবত—একজন মহামানব। কাজেই যোগযাগ মন্ত্রতন্ত্র ধ্যানধারণা প্রভৃতির বিরুদ্ধে দিশারি গুরুর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ উপভোগ করত সে মনে প্রাণে। বলত ভক্তিকে যে সাধু সন্তেরা ভগবানকে ভাঙিয়ে খায় শুধু মানুষকে ভয় দেখিয়ে। ভক্তি শুনে দুঃখ পেত, কিন্তু প্রতিবাদ করে ফল নেই বুঝে স্বামীকে ডাকত না ধ্রুবর ওখানে ভজন শুনতে যেতে। তার সঙ্গে আসত শুধু তার বোন শোভনা। অষ্টাদশী রূপসী, কিন্তু ভক্তির মতন শ্রীমন্তিনী নয়। বলতে কি, দুই বোনের মধ্যে কোন মিলই ছিল না—না রূপের, না গড়নের, না স্বভাবের, না মতিগতির।

ভক্তির একটি ঠাকুর ঘর ছিল, শোভনা তার ছায়াও মাড়াত না। সে কলেজে খেলাধুলা নিয়েই মেতে থাকত। পড়াশুনো ও করত—নিতান্ত দায়ে পড়ে। সে অকুতোভয়েই বলত সে চায় চলন বলন প্রসাধনে স্মার্ট হ'তে। কলেজে তাকে অনেক মেয়েই স্মার্ট-এর বদলে ফ্লার্ট উপাধি দিত। কিন্তু শোভনা ভ্রূক্ষেপও করত না, বাঁকা হেসে বলত: "হিংসে। ও মিশত শুধু সেই সব মেয়ের সঙ্গে যারা ওরই মতন স্বভাবে উড়ুক্ষু। তাদের কাছে শিখেছিল শুধু একটি জিনিষ—কী ক'রে সাজগোজ করতে হয়। সাড়ীর কোন রঙের সঙ্গে ব্লাউসের কোন রঙ মানায়, কেমন ক'রে 'ম্যানিকিওর' করতে হয়, গালে "রুজ" দিতে হয়, চুলে ঢেউ খেলাতে হয়—এই সব। ফলে কলেজে ওর চারিদিকে নিরন্তরই গুন গুন করত একদল প্রসাদার্থী মধুলোভী। ভক্তি ভয় পেত—না জানি রূপের ডালি বোনের কখন কী হয়! ঠাকুরের কাছে রোজই প্রার্থনা করত:—ঠাকুর, একটি ভালো পাত্র জুটিয়ে দাও—নৈলে এ মেয়ের কী গতি হবে? শোভনা শুনে হেসে বলত: "বিয়ে টিয়েতে আমি নেই, দিদি, থ্যাংকিউ! আমি হব সিনেমা স্টার মার্লিন দিয়েত্রিচ কিম্বা গ্রেটা—"ভক্তি সভয়ে ওর মুখ চেপে ধরত: "ছি ছি! অমন অলুক্ষুণে কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই।" শোভনা বলত ভুরু তুলে: "বটেই তো! বলতে আছে কোকিয়ে কেঁদে কেবল—'হরেকৃষ্ণ হরে রাম, পায়ের কাদা কোরো শ্যাম।"

ভক্তি কী বলবে? বোনকে সে যে হাতে ক'রে মানুষ করেছিল। ওদের বাপ মা এক রেল-কলিশনে মারা গেলে যখন ওদের এক কাকা অসহায় মেয়ে দুটিকে আশ্রয় দেয় তখন ভক্তির বয়স—বারো, শোভনার—চার। শোভনা ছেলেবেলায় দিদিকেই মা ডাকত—ভক্তিও ওকে আগলে থাকত যেমন মা থাকে দামাল শিশুকে। তারপরে অনেক কিছু ঘটল—তার সঙ্গে এ-কাহিনীর কোন সম্বন্ধ নেই, তাই ডিঙিয়ে আসি এর পরের অধ্যায়ে।

চার

এ অধ্যায়ের সূত্র ভক্তির বিয়েতে। বিয়ে ক'রে ও মামার বাড়ি থেকে চলে আসে বোনকে নিয়ে। ওদের বিপত্নীক পিতা মহাপ্রয়াণ করবার আগে লাইফ ইনশিওর ক'রে দুই মেয়ের জন্য রেখে গিয়েছিলেন ষাট হাজার টাকা। শোভনা তার নিজের তহবিল থেকে ইচ্ছেমত খরচ করত বেশভূষায়। ভক্তি ধ্রুবর হাতে দিল ত্রিশ হাজার টাকা—ধ্রুব প্রেসে খাটিয়ে ওকে মাস মাস দেড়শো টাকা সুদ দিত। পড়া পড়শীরা কেউ শোভনাকে দেখতে পারত না—ভক্তি এজন্য দুঃখ পেত, কিন্তু শোভনা গ্রাহ্যও করত না। স্বভাবে সে ছিল যেমন আত্মকেন্দ্রিক, তেম্নি বেপরোয়া।

সাধুজি থেকে থেকে যখনই ধ্রুবর ওখানে এসে ভজন করতেন কি গীতা ভাগবতের পাঠ দিতেন—শুনতে না

শুনতে ভক্তির চোখে জল আসত। শোভনা আসতে চাইত না, বলত: উঃ! হাউ বোরিং!" তবু ভক্তি ওকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে আসত। সেই সূত্রেই শোভনার পরিচয় হয় সাধুজির ওখানে যারা আসত তাদের সঙ্গে। রমা নমিতা ও বন্দনা প্রায়ই অতিষ্ঠ হয়ে উঠত ওর চলন বলন হাবভাবে। কিন্তু শোভনা ভ্রূক্ষেপ ও করত না কাউকে। বলত মুখ টিপে হেসে "মেয়েরা কবে মেয়েদের ভালোবাসে?" শুনে একদিন বন্দনা বলেছিল: "ভাই শোভনা, রমাকে কি দেখোনি কোনোদিন? না, এমন মেয়ে দেখেছ যে তাকে ভালোবাসে না?" শোভনা বলেছিল পিঠ পিঠ: "আমি সেকেলে মেয়েদের কথা বলিনি—তারা তো তিল তুলসীও ভালোবাসে। আমি বলতে চেয়েছিলাম—যে সব মেয়ে স্মার্ট হ'তে পারে না—তারা দেখতে পারে না তাদের স্মার্ট মেয়েদের।" ভক্তি ওকে ধমক দিত, কিন্তু শোভনা বলত: "মিথ্যে বোকো না দিদি। আমি ঢাকঢাক গুড়গুড়ে বিশ্বাস করিনি কোনোদিন—করবও না।"

আলোক ও নমিতা দীক্ষা নেওয়ার পরে ভক্তি স্থির করল সেও দীক্ষা নেবে - আর বোনকেও যে ক'রে হোক দীক্ষা নেয়াতে হবে। শোভনা শুনে হেসেই খুন। আমার তো মাথা খারাপ হয়নি দিদি, আবদারও হয় নি—দীক্ষা নেব কী দুঃখে?"

ভক্তি আদর ক'রে বোঝাত দিনের পর দিন। কিন্তু শোভনা সাফ জবাব দিত প্রতিবারই: হাঁচি টিকটিকি পাণ্ডাপুরুত তিলতর্পণ—ও সব নিয়ে যারা ঘর করতে পারে তাদের মনের ছাঁচই আলাদা দিদি।"

ব'লেই ভগিনীপতির কাছে গিয়ে ভক্তির চলনবলনের খবর দিয়ে চুকলি কাটত: "জামাইবাবু, যদি ভালো চান তো এখন থেকেই সাবধান হোন।"

পিণ্টোর ওখানে চা পার্টিতে বামনের আলাপ হয়েছিল মনুভাইয়ের সঙ্গে। গৌরীর কথা সে সবই শুনেছিল—পুণায় তার রোখ, শেষে ডুবে মরার খবরও রটে গিয়েছিল। ফলে বামন পিণ্টোকে সব জানালো—ভক্তিকে নিয়ে কী করা যায়? পিণ্টো রুষ্ট হ'য়ে বলল: "শোভনা মডার্ণ মেয়ে, ঠিকই ধরেছে। তোমাকে শক্ত হতেই হবে, নৈলে শেষে ডুববে মনু-ভাই কাপাডিয়ার মতন। আমার কথা শুনলে তার আজ এ হাল হ'ত না। তাকে দেখে শেখো।"

বামন জোর পেয়ে এসে চোখ পাকিয়ে ভক্তিকে বলল: ঢের সয়েছি এতদিন, কিন্তু দীক্ষা আবার কি? ওসব বিশ্বাস করার দিন গত—বলেছেন প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক পিণ্টো। বিজ্ঞান ধ'রে ফেলেছে ধর্মের ধাপ্পাবাজি—numbo-jumbo—সাধু সন্ত গুরু পুরুত ব্রত পার্বণ তিল তর্পণ গঙ্গা যমুনা যোগাযোগের সেকেলে ভেল্কিবাজিতেই আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। সুতরাং আর এক পাও না—সাবধান…!" ইত্যাদি।

ভক্তি স্বামীকে ভালোবেসেছিল বটে, কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও আন্তরিক শ্রদ্ধা করতে পারে নি। তাই পিঠ পিঠ তুড়ে শুনিয়ে দিল: "বাবা আমাকে যে-ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন তার সুদে আমার বেশ চ'লে যাবে। যদি বেশি জোর জুলুম করো তবে আমি থাকব না আর তোমার সঙ্গে। তোমার শনি পিণ্টোর পবিত্র বিজ্ঞান নিয়ে তুমিই থাকো, আমি থাকব তাই নিয়ে যাতে আমার প্রাণ জুড়োয়—ভাগবত ভক্ত ভগবান্। আমিও ঢের সয়েছি মুখ বুঁজে, আর সবই না।"

বামন শুনে হতভম্ব হ'য়ে ফের ধর্ণা দিল গিয়ে দিশারি পিণ্টোর ল্যাবরেটরিতে। মাইক্রোস্কোপ রেখে সব শুনে প্রবল বৈজ্ঞানিক রেগে উঠলেন: "হুম্। দেখছি এই সাধুজিই যত নষ্টের গোড়া—এখানেও জাল ফেলতে এসেছেন মাছ ধরতে।—আচ্ছা, মনুভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করি। তারপর ঠিক করা যাবে। কিং কর্তব্যম্।"

অথ মনুভাইকে পিণ্টো টেলিফোনে বলল: "একবার আয় এক্ষুণি। কথা আছে। সাড়ে চারটেয় চা পার্টি।"

মৎলবী বৈজ্ঞানিক শোভনাকেও ডাক দিলেন গোপনে। শোভনা তো এইই চায়—হট্টগোল, ড্রামা, কাউন্সিল অফ ওয়ার: ছুটে এল বাতাসেরও আগে উড়ে, শুভদৃষ্টি হ'ল মনুভাইয়ের সঙ্গে।

মনুভাই ভক্তির দীক্ষা নেওয়ায় বাধা দেবার চক্রান্ত করতেই এসেছিল, কিন্তু শোভনাকে দেখে সব ভুলে গেল। শুধু রূপই তো নয়, তার উপর এ-নিরুপমার ধারালো ও রোখালো মতামত শুনতে তার মনে হ'ল—এরই তো নাম—আত্মার আত্মীয়া। এমন বোনকে পেলে দিদিকে

নিয়ে কে মাথা ঘামায়? অতঃপর দুয়ে দুয়ে চার: রঙ্গিণী সহধর্মিণীকে জীবনসঙ্গিনী করতে চেয়ে ওকে নানা ছুতোয় লুকিয়ে সিনেমা থিয়েটার রেসে নিয়ে যাওয়া সুরু করল। শোভনা হাবভাবে ওকে মজিয়ে বলল—একটু চেষ্টা করা দরকার দিদিকে তুষ্ট করতে। মনুভাই শোভনার কথায় ওঠে বসে—বলল বামনকে যে, বুদ্ধিমতী ঠিকই বলেছে—বেশি চাপ দিলে ফল হবে না, ভক্তিকে উপস্থিত একটু রাশ ছেড়ে দেওয়াই পন্থা বলা হোক—দীক্ষা নিতে পারে, কিন্তু এখন না একবৎসর পরে। আর ইতিমধ্যে শোভনাকেও একটু স্বাধীনতা দিতে—হবে—নিজের চালে চলবার। রাজি হ'ল—আপোষে সমস্যার নিষ্পত্তি হ'ল তখনকার মতন।

এর পরে ভক্তি একাই যেত কখনো ধ্রুবর ওখানে, কখনো দেহুতে সাধুজির পুণ্যসঙ্গ পেতে। এক বৎসর বাদে সে বামনকে ফের শুধালো: "এবার দীক্ষা নিতে পারি তো?" স্বামী পিন্টোর কাছে যেতেই পিন্টো বলল: আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুক। ভক্ত শুনে রুষ্ট কণ্ঠে বলল: "মরদ কি বাত হাতি কি দাঁত না? লজ্জা করে না? তখন বামন বলল মরীয়া হ'য়ে: না, আমি ভেবে দেখেছি দীক্ষা নিলে তুমি আর বাগ মানবে না। আমার মনুভাই কাপাতিয়ার মতন অবস্থা হবে। ।"

ভক্তি রুখে উঠে বলল—দীক্ষা সে নেবেই নেবে। কিন্তু হবি তো হ—ঠিক সময়েই ও আবিষ্কার করল যে ও অন্তঃসত্ত্বা। ধর্মের পথে বাধা কি একটা? এ অবস্থায় একলা দাঁড়াবে কোথায়—মাত্র দেড়শো টাকা সুদের আয়ের উপর নির্ভর ক'রে?

ও সাধুজির পায়ে গিয়ে বড় কান্নাই কাঁদল। সাধুজি বললেন: "মা, সাধনা নিতে চাইলেই অভাবনীয় বাধা আসে—এদের নাম অনর্থ। কিন্তু ঠাকুরকে ডাকার মতন ডাকতে পারলে অনর্থনিবৃত্তিও হয়ই হয়। তুমি দীক্ষার জন্য ব্যস্ত হোয়ো না। আমি তোমার কল্যাণার্থে প্রার্থনা করব। তুমিও যদি একমনে ডাকো ঠাকুরকে, তো দেখবে একটা আশ্চর্য জিনিষ:• সে পথের বাধা কাটবেই কাটবে। কেবল যে ভাবে কাটবে ভাবছ সে ভাবে না কাটতেও পারে এটুকু মনে রেখো। কারণ ঠাকুরের কৃপা আসে তার নিজের পথে—নিজের ছন্দে।"

ভক্তি বলল: "আমি একলা হ'লে ভাবতাম না গুরুদেব—

সাধুজি হেসে বললেন: "মা, আমিও আরণ্যক তপস্বী নই—সংসারেই মানুষ হয়েছি। তাই জানি বাধা আসে কী ভাবে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা জেনেছি যা তোমার জানতে এখনো বাকি আছে: যে, আশা আসে নিরাশারই অন্ধকারে।"

ভক্তি ডাকল কেঁদে সারারাত: "ঠাকুর! আমার পথের বাধা স'রে যাক্, তোমার কৃপায় আলোয় আঁধার কাটুক, আমি যে পথ দেখতে পাচ্ছি না।"

পরদিনই রসায়ন পরীক্ষাগারে একটা প্রবল ডাইনামো বিকল হ'য়ে যায়। পিন্টো বামনকে পাঠায় দেখতে কী হয়েছে। অসাবধানে হঠাৎ একটা পড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার মাড়িয়ে সে মারা যায় তৎক্ষণাৎ। পিন্টো বলল: "Electrocuted, how sad!"

ভক্তি কাঁদল, কিন্তু বিচিত্র মন মানুষের—সেই সঙ্গে শুনল মুক্তির বাঁশির ডাক: "আমার কৃপা যে সত্যি চায় সে পাবেই পাবে।" সাধুজিকে গিয়ে বলল। তিনি বললেন: "ভুল শোনো নি মা। তবে তোমার বহু পূর্বে একথা শুনেছিলেন দ্রৌপদী ঠাকুরের শ্রীমুখে। তিনি বলেছিলেন তাকে: 'ধর্মনিত্যাশ্চ যে কেচিৎ ন তে সীদন্তি কর্হিচিৎ'—যারা ধর্মকেই নিত্যবস্তু ব'লে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তাদের দুর্গতি হয় না কখনো।"

ভক্তি দীক্ষা নিল চোখের জলে গুরুকে প্রণাম ক'রে, দ্রৌপদীর অঙ্গীকার আবৃত্তি: "যস্য নাথেশ দেবেশ সর্বাপদ্ভ্যো ভয়ং নহি—" তুমি যার নাথ দেবেশ, বিপদে সে ভয় পায় না।

পাঁচ

সঙ্গে সঙ্গে ঘটল আর এক কাণ্ড: শোভনা পালিয়ে এক রেজিস্টারি আপিসে গিয়ে মনুভাইকে বিয়ে ক'রে দিদিকে জানালো এক চিঠিতে: "আজ সন্ধ্যায় এসো দিদি—নিমন্ত্রণ রইল।"

ভক্তি সোজা ধ্রুব ও মালতীর সঙ্গে মোটরে দেহুতে গেল। গিয়ে সাধুজির পায়ে মাথা রেখে ভক্তি অঝোরে কাঁদল।

সাধুজি শুনে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "মা,

এ আমি জানতাম। তবে উপায় কী বলো? যে যার স্বভাবের পথে চলবেই চলবে—প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি—কেন কবে কোথায় কার সুমতি হয় কার দুর্মতি—জানেন এক ঠাকুর। উটের কাঁটা ঘাস খাওয়ার উপমা স্মরণ করো।

মালতী বলল: "গুরুদেব, আমরা শোভনার জন্যে ভাবছি না, ভাবছি—এবার রমার কী গতি হবে? এমন সৎমা—"

সাধুজি হেসে বললেন: "তার জন্যে ভাবতে হবেনা মা। এ শুধু আমার কথা নয় আমার ব্রহ্মবিৎ গুরুদেবের কথা। তিনি বলেছেন আমাকে যে রমাকে ঠাকুর দেখবেনই দেখবেন। তবে এও বলেছেন যে, আধার যার বড় তার পরীক্ষাও বড়। তাই হয়ত ওকে আগুনের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু যে নিখাদ সোনা তার অগ্নিপরীক্ষায় ভয় কী?"

*　　*　　*

শোভনার সাঙ্গে মনুভাইয়ের সিভিল ম্যারেজ হওয়ার ঠিক ছ মাস পরেই প্রবীর জন্মাল। পাড়াপড়শীরা সবাই মুখ টিপে হাসল। ভক্তি লজ্জায় বাড়ি থেকে বেরুতে পারে না, একলা কেবল গৃহ-বিগ্রহ বিঠোভার পায়ে মাথা রেখে কাঁদে: ঠাকুর! ওর মায়াও কাটাতে চাই এবার। ঢের হয়েছে। এবার সময় এসেছে সব ছেড়ে তোমার পায়ে ঠাঁই চাওয়ার।"

কিন্তু বৃথা! ওর মনে কেবলই গুনগুনিয়ে ওঠে নমিতার গাওয়া একটি বাউল গান: "পালাবি কোন্‌খানে তুই বাঁধনের জাল যে পাতা!" ভক্তি যে-ভক্তি সেও বাঁধা পড়ল—এল যথাকালে এক অনিন্দ্যকান্তি আনন্দ-দুলাল স্বামীর মৃত্যুর পরে। সাধুজি তার নাম দিলেন নীলমণি। সবাই তাকে ডাকত মণি ব'লে।

নীলমণি কোলে আসার পরে ভক্তি বাংলোটি ছেড়ে দিয়ে মুতা নদীর তীরে একটি বাড়ির সংলগ্ন আউট হাউস পেল। মাত্র দুটি ঘর: একটিতে স্নানাগার তথা রান্নাঘর, অন্যটিতে ভক্তি মণিকে নিয়ে থাকত। এক কোণে, পর্দা ঝুলিয়ে একটি ছোট্ট পূজার ঘর ক'রে জপ করত রোজ তিনচার ঘণ্টা। ধ্রুব ওকে মাস মাস যে দেড়শো টাকা সুদ দিত, ওর চ'লে যেত টায় টায়। অর্থে ভক্তির লোভ ছিল না কোনো দিনই; আজ দারিদ্র্যকেও সানন্দেই বরণ ক'রে নিল বিধাতার বিধান ব'লে। নিতান্ত অনটন হ'লে পশম বুনে কিছু উপায় করত। পাড়াপড়শীরা সকলেই এ শুদ্ধাচারিণী স্নেহময়ী শ্রীমন্তিনীকে শুধু ভালোবাসা নয়, শ্রদ্ধা করত—আরো এই জন্যে যে সে স্বামীর দেহান্তের পরেই পাশের অনাথাশ্রমে সে শিশুদের পড়াত পারিশ্রমিক না নিয়ে। মাঝে মাঝে আটমাসের নীলমণিকে কোলে করে এলে অনাথিনীদের মধ্যে সাড়া প'ড়ে যেত তাকে কোলে নেওয়ার জন্যে। সবাই আদরে আদরে অতিষ্ঠ ক'রে তুলত তাকে। আট মাসের শিশু যেমন প্রিয়দর্শন তেমনি নধর কান্তি। আ আ ক'রে যখন সে তার দোলনায় শুয়ে হাত পা ছুড়ত চুষিকাঠি মুখে দিয়ে—ভক্তির বুকের মধ্যে যেন আনন্দের জোয়ার ব'য়ে যেত। যার নীলমণি আছে তার কিসের অভাব? শুধু এই কোরো ঠাকুর, যেন ও বাঁচে। ওকে কেড়ে নিও না। আমার যে ও ছাড়া আর কেউ নেই···

কিন্তু এই ধরণের প্রার্থনা করার পরেই ওর মনে আসত গভীর গ্লানি। ও শুনেছিল গৌরীর কথা। রমার মধ্যেও ও দেখে'ছল কী গভীর অনাসক্তি। অথচ ও পারে কই মন থেকে বলতে যে নীলমণি শুধু ঠাকুরের—মায়ের সর্বস্ব নয়? বারবার মনে পড়ে বাউলের গানটি: "পালাবি কোন্‌খানে তুই বাঁধনের জাল যে পাতা!"

পাছে ফের মমতার জালে বাঁধা পড়ে ভেবে ও জপ ধ্যানের সময় আরো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সন্তানের মায়া কাটানো কি চাট্টি খানি কথা—বিশেষ সবে-ধন-নীলমণির প্রতি বিধবা মার মমতা—আর এমন নীলমণি যাকে দেখলেই গোপাল বলে ডাকতে ইচ্ছা হয়—যার প্রতি অঙ্গ বেয়ে রূপ ঝ'রে পড়ে! ভক্তি ইষ্টের বেদীমূলে গড় হ'য়ে প্রণাম করে চোখের জলে কেবল প্রার্থনা করত: "নীলমণি যেন সংসারী না হয়—কে জানে কেমন বৌ আসবে—শোভনার মত—আর সব তছনছ হ'য়ে যাবে। না ঠাকুর, না গুরুদেব—ও যদি সন্ন্যাসী হ'য়ে যায় সেও ভালো, কিন্তু যেন সংসারী না হয়। আর আমার এ-মমতার বাঁধন যেন কাটতে পারি গৌরী দিদির মতন! সংসারে সুখ কতটুকু ঠাকুর? এক কণা আনন্দের ওপিঠে

একরাশ দুঃখ শোক বেদনা—সব চেয়ে বেশি: আশাভঙ্গ, স্বপ্নভঙ্গ!"

শোভনার কাছ থেকে ও কিছু শিখেছিল বৈ কি—আরো শোভনার কাছেই শুনে যে, সে সমস্ত বিষয় মনুভাইয়ের উইলে নিজের নামেই লিখিয়ে নিয়েছে। কথাটা বলেছিল সে জাঁক ক'রেই, কিন্তু ভক্তি শুনে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে গিয়েছিল। শুধু টাকার জন্যে রূপরাগ-প্রসাধন হাবভাবের ফাঁদ পাতাই নয়, স্বামীকে বশ ক'রে তার মেয়ের বিষয় হাত করা—ভেবে চিন্তে, ফন্দি এঁটে! এরই নাম সংসার!

ছয়

শোভনার প্রসবের সময়ে নমিতার ডাক পড়েছিল। ভক্তিও ছিল। প্রসবের পর নমিতা ভক্তিকে মোটরে তার বাড়ি পৌঁছে দেয়। পথে ভক্তি তাকে বলে সব কথা—শোভনার মতিগতি ও বিবাহের ইতিহাস—কিছুই বাদ না দিয়ে। নমিতা বাড়ি ফিরে আলোককে খুলে বলে—শোভনা কী রকম ফন্দি এঁটে মোহমুগ্ধ স্বামীকে দিয়ে বিষয় আশয় সব নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে।

আলোক: বেচারি রমা! এখন কী যে হবে মেয়েটার?

নমিতা (ঝংকার দিয়ে): কী হবে? যা তাদের হয় যাদের ভাগ্যে আসে শোভনার মতন কুচক্রী সৎমা আর মনুভাইয়ের মত স্ত্রৈণ বাপ।

আলোক (একটু পরে): অমন মেয়েটা কেবল দুঃখই পেল সারাজীবন! মা গেল, দাদু গেল, বাপ লম্পট, স্বামী দারুণ কৃপণ—শেষে হ'তে হ'ল কিনা নিঃস্ব! আর এমন দুর্গতি হ'ল কি না লক্ষ্মীপ্রতিমার! ভাবতেও—

নমিতা (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে): না বাবা—না না না—রমার দুর্গতি হতেই পারে না। জানো, গুরুদেব সেদিন আমাকে খুব জোর করেই বলেছেন?

আলোক (ওর মাথায় হাত রেখে): মা, তোমার গুরুবাক্যে বিশ্বাস দেখলে আমিও মনে বল পাই। কারণ গুরুকে একটু আধটু ভালোবাসতে শিখলেও তাঁর বাক্যকে বেদবাক্য মনে করার মতন বিশ্বাসের জোর এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাই নি অন্তরের অন্দর মহলে। কেবল একটি কথা আমার আমেদাবাদের এক বন্ধুর স্ত্রী আমাকে লিখেছেন যে সেখানে রমার শ্বশুর বাড়ির সবাই ওকে উঠতে বসতে গঞ্জনা দেয়, কথাটা কি সত্যি?

নমিতা: ঠিক জানি না বাবা; গুজবটা আমারো কানে এসেছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধে, কারণ রমার স্বামী গৌতম তো মনে হয় ভালো স্বভাবেরই ছেলে। রমাকে তো দুদিন আগেও মাথায় ক'রে রাখত—

আলোক (হেসে): মা কৃপণের মনের খবর তুমি হয়ত রাখো না, কিন্তু আমার তিন তিনটে রুগী ডাক-শাইটে কৃপণ তাই আমি ভুক্তভোগী। না, গৌতম রমাকে ভালোবাসে নি বলতে চাই না, কিন্তু কি জানো? ওরা সবাই বিষম অর্থলোভী। তাই মনে হয়—এ-খবর সত্যি। তা ছাড়া মালতীর কাছেও শুনেছি যে ও রমাকে নিয়ে অত যে উচ্ছ্বাস করত তার মূলে ছিল এই রঙিণ স্বপ্ন যে রমা বাপের সব ধনরত্ন লুটে আনবেই আনবে। এ ধরণের রঙিণ স্বপ্ন ভাঙলে ধূসর জাগরণেরও ছন্দ বদলে যায় যে মা! বাড়া ভাতে ছাই—বলে না?

নমিতা: কিন্তু তাই বলে রমাকে গঞ্জনা দেবে সে—এতবড় অমানুষ? রমার কী দোষ?

আলোক (হেসে): মা, মানুষ যখন কাম ক্রোধ লোভ মোহের ফেরে পড়ে তখন কি সে যুক্তির নির্দেশে চলে? কিন্তু সে যাক, ভক্তি আর কী বলল তোমাকে শুনি?

নমিতা: বলবে আর কী বাবা? বলল মনুভাই নাকি তাকে গোপনে বলেছেন যে তিনি তাঁর উইলে রমাকে বঞ্চিত করেছেন। পাছে রমা টাকা পেলে সাধুজিকে সব দিয়ে দেয়। তিনি না কি উঠতে বসতে গাল দেন সাধুজিকে।

আলোক: বলো কি? গাল দেয় মনুভাই—গুরুদেবের মতন মহাপ্রাণ মানুষকে? আমি তো জানতাম তিনি অজাতশত্রু।

নমিতা (হেসে): বাবা, তুমি বিজ্ঞ হ'য়েও সময় সময় এমন ছেলে মানুষের মতন কথা বলো যে, সত্যি হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনে। মনুভায়ের কথা কি ধ্রুবদা বলে নি তোমাকে সেদিন—কি ভাবে বিষ্ণুঠাকুরকে নিন্দা করার দরুণ গুরুপূর্ণিমার দিন কুরুক্ষেত্র ঘটেছিল? তা ছাড়া গুরুদেবও কতবারই তো বলেছেন আমাদের যে,

আমরা যখন দেখি—কিছুতেই মাথায় মহাপ্রাণ মানুষের সমান হ'তে পারছি না, তখন চাই তাদের মুণ্ডপাত ক'রে তাদের সমান হতে! কাল মালতীও আমাকে বলল এই ধরণেরই একটি কথা: রমার উপরে ওর শ্বশুর শাশুড়ী ননদ জা-দের এত রাগের আর একটা কারণ নাকি এই যে, ধনীর মেয়ে হ'য়েও ওর টাকার লোভ নেই, ওদের বাড়ির পাঁকের মধ্যেও ফুটে উঠল পদ্ম হ'য়ে। মন যাদের নীচ তারা মহৎ মানুষকে দেখলে রটিয়ে বেড়ায় যে, মহত্ত্বটুকু সবই ঢং, অভিনয়। তাই না আজ এ-কমলিনীর অশোক বনে বন্দিনী সীতার অবস্থা। ভক্তিদি বলল—মনুভাই উইলে রমার নাম কেটে দেওয়ার পর থেকে রমাকে ওরা পুনায় আসতে পর্যন্ত দেয় না।

আলোক: চমৎকার উপমা দিয়েছিস সীতার—কেবল আমি জুড়ে দিই—আমেদাবাদের রক্ষপুরে।

নমিতা: যক্ষ বলো।

আলোক: ও একই কথা মা—কারণ রক্ষ স্বর্গের পাসপোর্ট পায় না হিংস্রক হওয়ার জন্যে, যক্ষ পায় না—কৃপণ হওয়ার জন্যে। খৃষ্টদেব কি বলেন নি—বন্দনা কী তর্জমা করেছিল যেন মনে আছে তোর?

নমিতা: আছে, কারণ অনুবাদটি আমি টুকে রেখেছি:

উটের মাথা ছুঁচের ফাঁকে গলানো নয় কঠিন তত,
রামের রাজ্যে ধনীর প্রবেশ করা রে ভাই কঠিন যত—

ঐ দেখ ভুলে গিয়েছিলাম বলতে যে বন্দনাদি আজ সকালেই কাশী থেকে ফের একটি চমৎকার চিঠি লিখেছে—সত্যি, চিঠি লিখতে ওর জুড়ি নেই—শোনো (ব'লে হাতের ব্যাগ থেকে একটি চিঠি বের ক'রে পড়ে):

"স্নেহের নমিতা,

ভক্তির চিঠিতে জানলাম মনুভাই রমাকে কী ভাবে বঞ্চিত করেছেন। মাঝে মাঝে ভাবি: এ-হেন অমানুষকেও গুরুদেব কৃপা ক'রে দীক্ষা দিতে গেলেন কেন? গুরুমাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন—একটি বড় চমৎকার কথা। বললেন কৃষ্ণ দুর্বৃত্ত দুর্যোধনের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন—সে তাঁকে আটকে রাখতে পারে জেনেও। বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে: 'তব ধর্মাশ্রিতা বুদ্ধিস্তেষাং বৈরাশ্রিতা মতিঃ' অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি দেয় ধর্মের সুমতি, কৌরবদের বুদ্ধি দেবে যুদ্ধেরই দুর্মতি—তবু সজ্জন সজ্জনের মতই ব্যবহার করবেন দুর্জনের রীতি ছেড়ে। তাই আমাকে যেতে হচ্ছে—দুর্যোধনকে ব'লে ক'য়ে একবার দেখতে।' ঠিক তেমনি, সাধুরা দুর্জনকেও একঘরে করেন না, জাতে ওঠাতে চান দুরাচার থেকে সদাচারের দীক্ষা দিয়ে। কিন্তু তবু আমার মন কাঁদে ঐ লক্ষ্মীপ্রতিমা মেয়েটার জন্যে। ভাবি, কেমন ক'রে এমন মেয়ের হ'ল এমন 'অখাদ্য' স্বামী—মাথায় করে রাখবার ম'ত স্ত্রীকে পায়ে মাড়িয়ে যেতে যার এতটুকু বাধে না? আর কী অপরাধে ভাব একবার: যে, বাপের কাছ থেকে যে-সম্পত্তি ওর পাবার কথা সেটা ও পেল না ওর কৈকেয়ী সংমার চক্রান্তে। এর পরেও কি গৌতমটাকে মানুষ উপাধি দিবি তুই—যার কাছে রূপ গুণ চরিত্র স্বভাব—এসবের চেয়েও বড় হ'ল টাকা শুধু টাকা? মনুষ্যত্ব কথাটা কি শুধু নীতিপাঠেই পড়েছে ও? তবে সঙ্গে সঙ্গে এও বলব যে বাইরে থেকে দেখলে যদিও মনে হয় রমার সব থেকেও কিছুই নেই, কিন্তু অন্তরের দৃষ্টিতে দেখলে চোখে পড়ে—ওর কিছু না থেকেও সবই আছে, কারণ ওর আছে ভক্তি। ভাগবতে আছে ঠাকুর ভক্তিতে তুষ্ট হন—আর 'তুষ্টে চ তত্র কিম্ অলভ্যম্ অনন্ত আদ্যে'—অর্থাৎ তাঁর মন যে পেয়েছে সে কী না পেয়েছে? যা হোক ওর একটু খবর নিস ও দিস ভাই, লক্ষ্মীটি! ইতি

তোর বন্দনা দি।"

সাত

সেদিন তুকারামের জন্মোৎসব। ধ্রুব ধরল সাধুজিকে পাঠ ও ভজন দিতেই হবে। সাধুজী সাবিত্রীকে নিয়ে এলেন পুণায়। প্রথমে বললেন অনেকক্ষণ তুকারামের কথা—তাঁর ভক্তির নিষ্ঠার প্রতিভার ত্যাগের। "আর সে কি সামান্য ত্যাগ"—বললেন সাধুজি, "যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যে যারা দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মায় তারা অভাবে তেমন কষ্ট পায় না, কষ্ট পায় বেশি তারা যারা সম্পদের কোলে আজন্ম লালিত হ'য়ে হঠাৎ নিঃস্ব হয়—যেমন হয়েছিলেন এই মহাসাধক। দুর্ভিক্ষে অনশনে তাঁর প্রথম

স্ত্রীর অকাল মৃত্যু হয়। তুকারাম সম্পন্ন গৃহস্থের পরিবারে জন্মে নিঃস্ব হন। কিন্তু তখনই দেখা গেল কী ধাতুতে তিনি গড়া। অনশনে অর্ধাশনে দিনরাত তিনি করবেন শুধু বিট্‌ঠলের নাম—মন্দিরে মন্দিরে ইন্দ্রায়ণীর তীরে। দারিদ্র্যে দুর্ভোগে দুঃখ পেয়েছেন অগুন্তি, কিন্তু একটিবারও প্রার্থনা করেন নি গৃহ সুখ, লোকমান, ধনসম্পদ। শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে তাঁর "অভঙ্গ" কীর্তন তেম্‌নি মান-প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল যেমন রাজস্থানে মীরার ভজন, উত্তর প্রদেশে তুলসীদাসের দোঁহা। আর সহজ নাম ডাক নয়, ছত্রপতি শিবাজী স্বয়ং এসেছিলেন তাঁকে ভেট দিতে। কিন্তু তুকার কাছে টাকা মাটি, মাটি টাকা—বললেন তিনি ছত্রপতি শিবাজীকে—বলতে সাধুজির চোখে জল ভ'রে এল, তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধরে দিলেন :

দিরট্যা ছত্রী ঘোড়ে
হেঁ তো বর্যাতে ন পড়ে
আমহী তেণে সুখী
ম্হণা বিঠ্‌ঠল বিঠ্‌ঠল মুখী
তুমচে য়ের বিত্ত ধন
তেঁ মজ মৃত্তীকে সমান
কণ্ঠীঁ মিরবা তুলসী
ব্রত করা য়েকাদশী
ম্হণবা হরিবে দাস
তুকা ম্হণে মজ হে আস।"

মারাঠী অভঙ্গটি গাওয়া হ'লে নমিতা গাইল এর বাংলা অনুবাদ। দেহুতে বন্দনা প্রথম এর তর্জমা ক'রে নমিতাকে শেখায় সাধুজির দেওয়া সুরে। পুণায় ধ্রুবর গৃহপ্রবেশের দিনে গানটি তারা দুজনে মিলে গেয়েছিল।

সেদিন নমিতা গাইল আলোকের সঙ্গে :

ছত্রদীপ বাজী চাহিনা মহারাজ,
　ধন মানের নহি প্রার্থী আমি।
আমার বরণীয় শুধু শ্রীনাথ আজ
　দিয়েছি তাঁর পায়ে প্রাণ প্রণামী।
　মণিকা বৈভব কী দিবে দান?
　মাটিরই মত সে যে শ্রীহীন ম্লান!
তুকার শুধু প্রভু একটি আছে আশ :
　তুলসী মালা পরি' কণ্ঠে তব
হরির হ'য়ে দাস করিয়া উপবাস
　গাহিও নাম তাঁর, মহানুভব!

*　　*　　*

নিস্তব্ধতা ভাঙল মালতী, বলল : "গুরুদেব! অনেকদিন গঙ্গাবন্দনা শুনিনি। কাশীর কথা মনে পড়ে এত!"

সাধুজি হেসে ধরলেন শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত গঙ্গাস্তোত্র :

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে।
ত্রিভুবন তারিণি তরলতরঙ্গে॥
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ।
তেষাং ভবতি সদা সুখ মুক্তিঃ॥"

তারপরে আলোক ও নমিতা গাইল :

"পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।"......

পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

[ক্রমশঃ
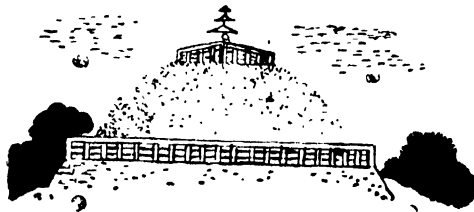
রূপসীর বিদায়

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

কে আমারে দিল আজি আমার এ মন
যাহে এ ভুবন
—নিঃশঙ্কে উঠিল জাগি' ?
কার লাগি'
এ ঐশ্বর্য-ভার নিল তার দেহখানি,
—অন্তরে ভরিল বাণী
প্রেমসুধাময়, এত হাসি
অধরের কোণে,
—নিখিলের বনে বনে
এত আলো-ছায়া খেলা ?
বৈশাখের তাপদগ্ধ দিনে
—শান্তির মঙ্গলময় এই স্নেহরাশি
সায়াহ্নের বেলা ?
কারে চিনে
—বিকশিল চম্পকের কলি,
উঠিল কাকলি
—কোকিলের কুঞ্জ হতে ঘনচ্ছায়াতলে,
কোন্ কুতূহলে
উদার আকাশ হল এমন সুনীল,
গাহিল অনিল
ধরণীর কাণে কোন্ গোপন মন্ত্রণা ?
এ কিসের ব্যঞ্জনা—
বৈশাখের শ্যাম নব মেঘে ?
ঈশানে পবনের বেগে
বিজয় বৈজয়ন্তী কার
করে একাকার,
লণ্ডভণ্ড আকাশে মাটিতে ?
চকিতে—
চপল কটাক্ষ কার লুকাল সকল আলো ?
শান্ত সব হয়েছে এখন।
—ফিরে গেছে যোদ্ধৃবৃন্দ
—নিয়ে তার অশনির ফণী,
—মেঘের দামামা।
আকাশের এক কোণে
ছিন্ন আবরণ ফাঁকে
হতজ্যোতি অপূর্ণ চন্দ্রমা।
চোখে চোখ পড়েছে আমার।

কি করুণ বিষাদের বাণী !
ক্লান্ত কলেবর
শ্রান্ত পদ ছন্দোহীন,
বিবশা রূপসী শশী
চাহিছে বিদায়
কালি যামিনীতে
এই বুঝি ঢেলেছিল
অফুরন্ত মদির চন্দ্রিকা,
ধরণীর সমস্ত হৃদয় জুড়ে
—ব্যেপেছিল মত্ত আলিঙ্গন,
রাখে নাই সে রূপের কোন আবরণ।
—তাইতো ধরণী বুঝি
উঠেছিল এমনে মাতিয়া,
খুলেছিল সব দ্বার হৃদয়ের
ছিল নাকো বাধাবন্ধ কোনো।
উচ্ছ্বাসের উদ্বেল আবেগে
শুনেছিল বৈশাখীর হাঁক।
বড় লজ্জা বয়ানে তাহার—
—আর এ ধরণীর পানে
—মদির নয়ানে
—চাহিবেনা সে কখনো।
—'আবরণ কেন ছিন্ন করো,
এসো এসো আষাঢ়ের মেঘ !
ঢেকে দাও গভীর অঞ্চলে তব
আমার এ লোক।
—নয় নয় ঝঞ্ঝা শুধু চপল চঞ্চল,
ক্ষণিক মাতনে শুধু হৃদয় উচ্ছ্বাস ;
গভীর গম্ভীর তব কম্বুনাদে আনো
মঙ্গলের ঘোষ।
ঝরুক অপ্লুত বারি নয়নে তোমার,
শ্যাম ধরণীর বুকে
সেই আশীর্বাদ।
—আমি শুধু মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যাব,
শান্ত মৌনী ধরণীর
—বিটপীর শাখা—
তোমার দোলায় শুধু দিবে মোরে ডাক।
—এইটুকু থাক।'

পশ্চিমবাংলার হস্তশিল্প

কাশ্যপ শর্ম্মা

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চলেছে। সরকারী সাহায্য এবং বেসরকারী প্রচেষ্টা একদিকে যেমন হস্তশিল্পের কারিগরদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা করছে—তেমনি চলেছে এই সব শিল্পের নানা দিক দিয়ে পরীক্ষা—নিরীক্ষা। এর মধ্যে আবার নতুন নতুন উপকরণ যেমন প্লাষ্টিক আর বেকেলাইটের আবির্ভাব হয়ে শিল্পগুলির রূপ বদলানোতে সাহায্য করছে। তা ছাড়া আজকের যুগ, মেশিনের যুগ। অনেক শিল্প, আগে যাতে শুধু সামান্য হাতে চালানো যন্ত্রের সাহায্যে একটু একটু করে এক একটি জিনিষ তৈরী করা যেত, তা আজ বিদ্যুৎ-চালিত মেশিনে এক সঙ্গে রাশি রাশি জিনিষ উৎপাদন করছে।

আজকে সমাজজীবনে যখন যন্ত্রশক্তি বিপ্লব এনে দিয়েছে, তখন আবার—এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের দিকে মন দেওয়া কেন—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। একাধিক দিক দিয়ে হস্তশিল্প আমাদের গ্রামীন বা এমন কি নাগরিক সমাজে তার উপযোগিতা প্রমাণ করে জনজীবনে সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছে।

হস্তশিল্প বা যে কোন শিল্পই এসেছে মানুষের প্রয়োজনে। পরিধানের বস্ত্র যখন মানুষ তাঁতে বানাতে শিখল, বা কুম্ভকারের চাকা যখন তৈরী করতে লাগল তার পানীয় জলের কলসী, সভ্যতার অগ্রগতিতে তখন মানুষ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষ সভ্য হয়েও বহুদিন পর্য্যন্তই তার সামান্য যন্ত্র-পাতিদিয়েই জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে। অধিক সংখ্যক মানুষের কৃষিই ছিল মুখ্যজীবিকা, আর শিল্প, সংস্কৃতি, সবই ছিল কৃষি-আশ্রিত। জনগণের প্রাণকেন্দ্র ছিল গ্রাম। গ্রামীন মানুষেরই প্রতিচ্ছবি লোকসংস্কৃতির নানা আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের গ্রামও ছিল সেদিন পর্য্যন্ত জীবন্ত। তার চাষী দেশের অন্ন যোগাতো--আর তার কামার, কুমোর, তাঁতী, সূত্রধর, কাঁসারী একদিকে যেমন গড়তো গরুর গাড়ীর চাকা, লাঙ্গলের ফলা, তেমনি আর একদিকে করতো অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি ধাতু দিয়ে, কাঠদিয়ে, মাটি দিয়ে। বিদেশী শাসকের শোষণে গ্রামবাংলার অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এর অনেকগুলিই প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। আজ আবার এ সমস্ত শিল্পের যে সব নিদর্শনকে অতীতের
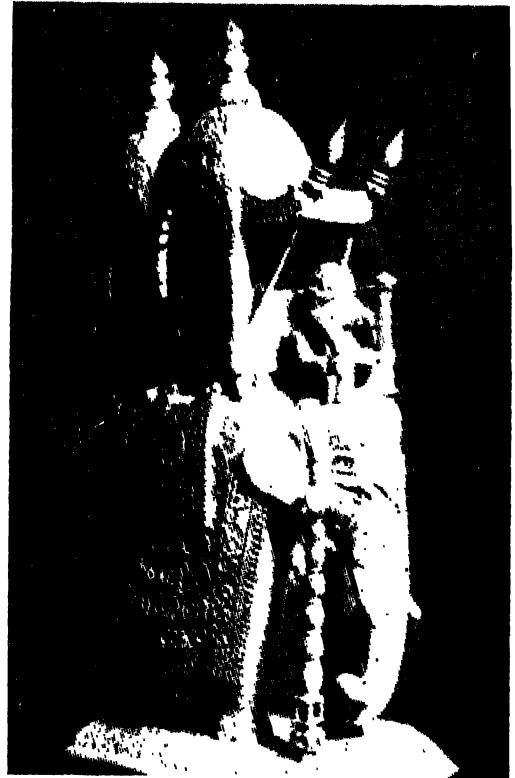
মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কাজ

অন্ধকার হতে বাইরে টেনে আনা হচ্ছে, তার অনেকগুলিই শিল্পোৎকর্ষে অতুলনীয়। সেই শিল্পধারাকে আজকের দিনে বয়ে এনে দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্য সৃষ্টির একটা দিক আমাদের কাছে অবলুপ্ত ছিল আজ নতুন আকর্ষণ নিয়ে আমাদের তা টেনে নিচ্ছে। আজ বাংলা

মোষের সিংএ তৈরী একটি পাখী

সেখানে অপরূপ রূপ সৃষ্টি হয় নারী পরিধেয়ে। মুর্শিদাবাদ মালদহ আর বাঁকুড়া (বিষ্ণুপুরে) রেশম শিল্পীদের কাজ আজ ইয়োরোপ ও আমেরিকার মানুষের আদর লাভ করছে।

বস্ত্রে রূপসৃষ্টির ঐতিহ্য বাংলায় বহুপ্রাচীন। ঢাকাই মস্‌লিন আজ অতীতের সুখস্মৃতি। কিন্তু বালুচরী জামদানী ইত্যাদি সাড়ী আজও সমাদর লাভ করে আসছে। এই রূপসৃষ্টির এক বিশিষ্ট স্থান মুর্শিদাবাদ জেলা। এছাড়া বাঁকুড়া আর চব্বিশ পরগণা জেলায়ও এই রূপসৃষ্টি গ্রামের 'ট্রাডিশনাল' শিল্পীরা চালিয়ে আসছে।

মেশিনের যুগে হস্তশিল্পের বৈশিষ্ট্য তার নিপুণ স্বকীয়তায়। প্লাসটিকের অজস্র নকল হচ্ছে হাতীর দাঁতের কাজের। অথচ এই শিল্পে লিপ্ত আছে মুর্শিদাবাদের শ'খানেক পরিবার। সূক্ষ্মকাজের জন্য এই শিল্পজাত নানাবিধ খেলনা বা সজ্জাদ্রব্য বিদেশে চালান যায় আর কয়েক লক্ষটাকার আমদানী হয় দেশের অর্থকোষে। এই রকমই আর একটি শিল্প কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল। সৃষ্টিনৈপুণ্যে অনন্য এই শিল্পে নিয়োজিত শিল্পীদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কয়েকটি পরিবার এর ঐতিহ্য পুরুষানুক্রমে বহন করে আসছে। এরা অধুনা আরো দুটি একটি যায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ শিল্পসৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের ছাপ এতবেশী আসে এবং শিল্পীর সাধনা এত বেশী প্রয়োজন যে অনেক সময় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শিল্পীর পক্ষে খুব লাভজনক হয় না। কোন বিখ্যাত মূর্তি-নির্মাতাকে বলতে শোনা গেছে—"এর চেয়ে রাসের মেলার জন্য পুতুল তৈরী করলে দুটো পয়সা থাকে—খাটুনীও কম হয়।" বহু শিল্পী বাজারের অবস্থা দেখে নিজেকে অন্য কাজে নিয়োজিত করেছে। তবুও শিল্পীমন শিল্পসৃষ্টিতেই আত্মোপলব্ধি করে। সুযোগ

দেশের শিল্পীদের হাতের কাজ বাংলার বাইরে এমন কি—বিদেশেও আদর পাচ্ছে। আর সরকার হস্তশিল্প সামগ্রীর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরে বিদেশে এগুলির বাজারের প্রসারের দিকে মন দিয়েছেন।

শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টিই নয়, বাংলার হস্তশিল্পের মধ্যদিয়ে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। পলিমাটির দেশ বাংলা। এদেশের মাটির পুতুলের মধ্যে কত বিন্যাস নিয়ে, পটুয়াদের হাতে নানা ছন্দে ধরা দিয়েছে সমসাময়িক সমাজ। চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ রায় বা পূর্ব বাংলা হতে আসা মনসার ঘট বাংলার জন মানসের যে দিক উদ্‌ঘাটিত করে তার ব্যাখ্যা করবেন নৃতত্ত্ববিদ্‌রা আর সমাজ-ঐতিহাসিকরা। এদিক দিয়ে গবেষণা চলতে পারে পুরুলিয়ার মুখোস শিল্পের ওপর বা নতুন গ্রামের কাঠের পুতুলের ওপর।

হস্তশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোক নিযুক্ত আছে তাঁতশিল্পে। পশ্চিমবাংলায় প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশী লোক তাঁত শিল্পের উপরে নিভরশীল। তাঁতের সাড়ীর বাংলাদেশে যেমন বহুল প্রচার, তেমনই উৎকর্ষ। বিষ্ণুপুর, শান্তিপুরের নাম ইতিহাসে লেখা হয়েছে। আজও

পশ্চিম বাংলার তৈরী একটি নক্সা করা মাদুর

সুবিধা পেলেই এদের হাত থেকেই গড়ে ওঠে অপূর্ব-সৌন্দর্যের আধার।

কতকগুলি শিল্প আছে যার প্রয়োজন অন্যান্য শিল্প বা সাংস্কৃতিক মাধ্যমের পরিপূরক হিসাবে। শোলার কাজ প্রতিমা নির্মাণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয়। অলঙ্করণের কাজে শোলার সাজ অনেকদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। আজ অবশ্য অন্যান্য উপকরণ এসেছে—আর নির্মাণ শৈলীও বদলেছে। আর প্লাষ্টিকের প্রতিযোগিতা ঠেলে শোলার কাজের কারিগর এখনও তার নিপুণ হাতে বরের টোপর, কনের মালা আর সিঁথি মৌর আর প্রতিমার অঙ্গসজ্জা গড়ে চলেছে।

হস্তশিল্পের মধ্যে আরো আছে যা বহুযুগ থেকে সৌন্দর্যের ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। বাংলার মাদুর আর পাটি, শাঁখা আর নক্সী-কাঁথা, শিঙের কাজ, কাঠের কাজ, পোড়ামাটির পুতুল এগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে পল্লী-বাংলার হাজার সুখ, দুঃখ, হাসি কান্নার কাহিনী।

যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে রুচি যাচ্ছে বদলে। আজ শিল্পীর সামনে সমস্যা—নতুন যুগে রুচির সঙ্গে তাল দিয়ে রচনা-শৈলীর অদল-বদল করে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কিনা। আর এক সমস্যা—কেবল মাত্র সৌন্দর্য সাধনা করে কোন কিছুই চিরদিন টিকতে পারেনা, মানুষের প্রয়োজন না মেটালে কোন কিছুই বেশী দিন চলতে পারেনা। প্রয়োজন চুকে গেলে জিনিষের জায়গা হয় আবর্জনার ঝুড়িতে কিম্বা চিলে কোঠার কুলুঙ্গীতে। শিল্পীকে এসমস্যারও মোকাবিলা করতে হবে। সরকারী প্রচেষ্টা এদিকে সচেষ্ট। কিন্তু শেষ কথা শিল্পীর কাছে। এক হিসাবে তাদের বাজার তাঁরাই সৃষ্টি করেন।
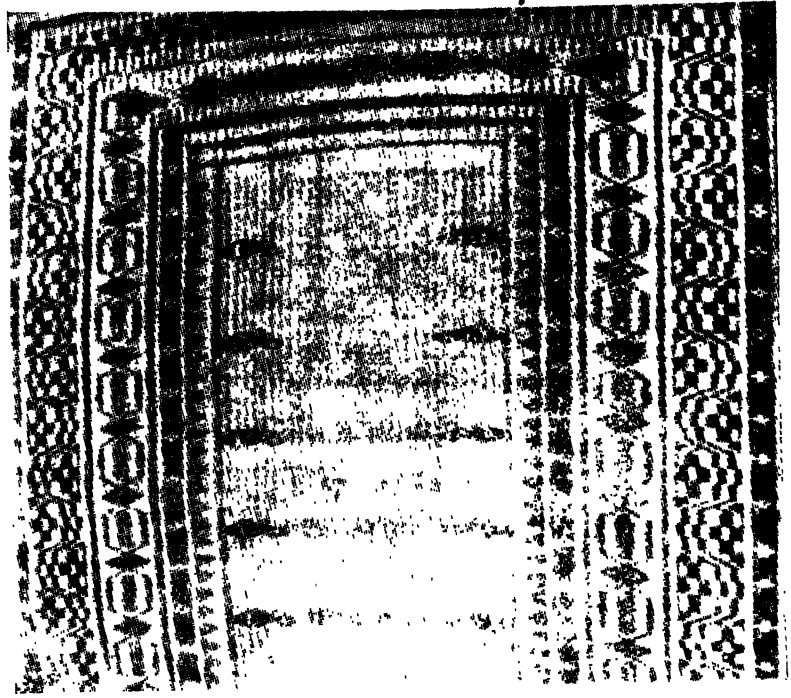
এ সম্পর্কে বারান্তরে আরো কিছু বলবার ইচ্ছা রইল।

বড় ঘরের বউ

শ্রীবিভাসকুমার দত্ত

অমিতার পিতা দিব্যেন্দুবাবু ছোট অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন। আইনজীবি হিসেবে তাঁর যথেষ্ট পসার গড়ে উঠেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতে তিনি আইনের ফাঁক কথার ফাঁকিদিয়ে ভরে দেওয়ার কৌশলটা বেশ আয়ত্ত করেছিলেন।

দিব্যেন্দুবাবু এই সমালোচনা শুনে বিনয়ের কোন ভাণ না করে উত্তর দিতেন, ভাইসব "কনফিউসান অফ্ মেটাফর" বা উপমা বিভ্রাট হয়ে গেল। একটা "ভ্যাকুয়াম" বা শূন্যগভ বস্তুকে আর একটা "ভ্যাকুয়াম" দিয়ে ভরা যায় কি? তা' ছাড়া জজেদের মাথাও যদি অতটা গোময়পূর্ণ হত তাহলে আমার চেয়ে তোমাদেরই সুবিধা হত বেশী।

এহেন সজ্ঞান ব্যক্তি কিন্তু নিতান্তই একটি অবাস্তব প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন। তাঁর তিন পুত্রের পর একটি মাত্র কন্যাকে, বিবাহ না হয় সেও স্বীকার, কিন্তু কখনই পণসহ দান করবেন না। পণপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলনে এগিয়ে এলেও তিনি পেশাদারী নেতা ছিলেন না। তাই চেষ্টা করতেন যেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বা আচরণ তাঁর মতের পরিপন্থী না হয়।

কিন্তু যে অর্থ পণ হিসাবে ব্যয় করবেন না, সেটাকে অমিতার শিক্ষায় নিয়োগে তাঁর একটুও কার্পণ্য ছিলনা। স্কুল কলেজের শিক্ষার উপরেও সে তার মার কাছ থেকে শিখেছিল জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, নামকরা দোকানের ময়রা ডেকে এনে শিখেছিল প্রাচীন অকাব্যিক ও আধুনিক কাব্যসুলভ নামের নানা রকম মিষ্টান্ন প্রকরণ, দর্জির কাছে কাটিং ও শেলাই ও মেম শিক্ষয়িত্রীর কাছে পিয়ানো।

এরপর যেদিন দিব্যেন্দুবাবু বাবুর্চী ডেকে এনে বিলাতী ও মোগলাই খাদ্যের রন্ধন প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করলেন, সেদিন কিন্তু ঘোর আপত্তি উঠ্ল অন্দর মহল থেকে। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবুকে আজ পর্যন্ত কোন মহলই তাঁর মত বা পথ থেকে ফেরাতে পারেনি। তাই সদরেই দিব্যেন্দুবাবুর লাইব্রেরীর পাশেই একটি সাময়িক বাবুর্চীখানা প্রতিষ্ঠা করে এই মহাব্রতটির উদ্‌যাপনেও কোন বাধা টি*কলো না।

সেদিন বিলাতী খাদ্যের সুঘ্রাণে প্রাচীন মাড়োয়ারী মক্কেলদের শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অন্যদিকে আবার আধুনিকের দল এমন গভীর শ্বাস গ্রহণ করছিলেন যেন স্থানটি প্রাণায়াম শিক্ষার একটি কেন্দ্র।

শেষোক্তদের মধ্যে জমিদার হিতেন্দ্রনারায়ণ প্রাচীন বলেই বোধহয় প্রশ্ন সম্বরণ করতে পারেন নি। আর একদিন অন্দর থেকে পিয়ানোর শব্দে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে বাড়ীর মধ্যে বোধহয় সাহেব-মেমদের নাচ চলেছে। সেদিনও জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং উত্তর শুনে ভেবেছিলেন যে অ্যাডভোকেট সাহেব মেয়েকে বোধহয় মেমসাহেবে পরিণত করার চেষ্টায় আছেন। আজকের জবাবেও তাঁর সেই ধারণাই বদ্ধমূল হল। বললেন, যুগের উপযোগী শিক্ষা দিচ্ছেন তা ভালই। কিন্তু দেশী রান্নাও শিখেছে তো। অখাদ্য বা খাদ্যপ্রাণ রহিত বলে তা' সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যায়নি তো।

দিব্যেন্দুবাবু কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, তা' শিখেছে বৈকি। এই কালো চামড়া নিয়ে পুরোপুরি সাহেব হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে লাভ কি? তবে দিশি-খাদ্যেরও প্রাণরক্ষা করা যায় কেমন করে সেটাও তাকে শেখান হয়েছে। যেমন ধরুন আমরা চচ্চড়িকেও ভেজে

কয়লা করিনা আর ভাতের ফেন ফেলে ঝরঝরে করার চেষ্টায় দেহেরও পরকাল ঝরঝরে করার চেষ্টা করিনা।

এরপর দিব্যেন্দুবাবু একটু দ্বিধার সঙ্গে আগামী রবিবার মধ্যাহ্ন ভোজনে হিতেনবাবুকে নিমন্ত্রণ করে বসলেন—তাঁর মেয়ের হাতের দিশিরান্না খাওয়াবেন বলে।

হিতেনবাবু কিন্তু আনন্দের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি প্রাচীন হয়েও ছিলেন কুসংস্কার মুক্ত এবং জমিদার হয়েও ধর্মপ্রাণ। কথাটা সোনার পাথরবাটি বা সুগন্ধ শিমুল ফুলের মত শোনালেও সত্যি। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতে তাঁকে "মহাতেজা জনকরাজার" সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি নাকি একূল, ওকূল দুকূল রাখার দুরূহ সেতু-বন্ধনে সমর্থ হয়েছিলেন।

হিতেনবাবু ছিলেন নিরামিষাশী। তাই সেদিন প্রস্তুত হয়েছিল শুধু বাংলা রান্নাই নয়, মূলতঃ নিরামিষাশী অন্যান্য প্রদেশেরও বাছাই করা অন্নব্যঞ্জন।

হিতেনবাবুরা বংশানুক্রমে লক্ষ্মীমন্ত। তাঁদের ঘরে খাদ্যের অভাব কোনকালে ছিল না। কিন্তু রন্ধন যখন পেশাদারী পাচকদের কবলমুক্ত হয়ে বাড়ীর মেয়েদের হাতে একটি চারুকলায় পরিণত হয় তখন তা রসনাকে যে কি পরিতৃপ্তি দিতে পারে সেটা তাঁর ছিল অনাস্বাদিত। তাই তাঁর স্বভাবত উচ্চকণ্ঠে জাহির করলেন, ও মশাই, এতদিন দেখছি শুধু ঘোল খেয়ে এসেছি। দুধের স্বাদ যে কী তা আজ প্রথম বুঝলাম।

পরিবেশনও করছিল অমিতা। তাকে দেখে ও তার সঙ্গে কথা বলে হিতেনবাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। স্বাভাবিক নম্রতার সঙ্গে শালীনতা, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তাতে জানান দেওয়া লজ্জার বাহুল্য নেই। হিতেনবাবুর মনে হল যে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে যা কিছু সত্য, সুন্দর অমিতা যেন তার এক অপূর্ব সমন্বয়।

তাই তিনি একটা মস্ত ভুল করে বসলেন পাঁচ পাঁচটি মেয়ের মালা গলা থেকে নামাতে তাঁর অর্দ্ধেক জমিদারী এর মধ্যে লাটে উঠবার যোগাড় হয়েছিল। তাঁর গৃহিণী ব্রজরাণীর ধারণা ছিল যে দুই পুত্রের বিবাহে কিছুটা উদ্ধার করে নেবেন। কিন্তু হিতেনবাবু কিছুদিনের মধ্যেই অমিতাকে চেয়ে বসলেন তাঁর বড়ছেলে প্রসাদনারায়ণের জন্যে—ছেলের অযোগ্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিনয় প্রকাশের পর।

দিব্যেন্দুবাবু এরজন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, আপনার ছেলে অনুপযুক্ত হতে পারে না। আপনারা কত বড় ঘর। দশ পুরুষের কুঠিয়াল জমিদার। কিন্তু আমাদের যুগতো চলে গেছে, হিতেনবাবু! ছেলেমেয়ে পরস্পরকে দেখুক।

দিব্যেন্দুবাবুর স্ত্রী কথাটা সম্পূর্ণ করার জন্যে স্বামীর প্রতি একটু কটাক্ষ করে বল্লেন, তারপর আপনিই বলে দেবেন ভগবানের কি ইচ্ছে। "জন্ম, মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে।" ওখানেতো আইনের কচকচি চলবে না, চাই ভগবানের নির্দেশ, যা' আপনার মত ভক্তলোকই দিতে পারেন।

ছেলেমেয়ের দেখা হল। এ বয়সে তারা দেখে থাকে রঙীন চশমা দিয়ে পরস্পরের রূপ, যার অভাব দুজনের কারুর মধ্যেই ছিলনা। তাছাড়া গুরুজনদের সামনে এক-দিনের সলজ্জ সাক্ষাৎকারে আর কি দেখা যেতে পারে!

কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু প্রসাদের মধ্যে দেখ্‌তে পেলেন শান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর তাঁর স্ত্রী দেখতে পেলেন পিতার ধার্মিকতার আভাস। তবুও দিব্যেন্দুবাবু একটা ক্ষীণ আপত্তি তুল্লেন। বল্লেন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বয়স ও শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবধান নেই। কথাটা কিন্তু একটি উকিলী মনের অতি বাস্তব দ্বিধা বলে উড়ে গেল—তাঁর নিজের স্ত্রীর তরফ থেকেই। হিতেনবাবু ভক্ত কি ভণ্ড তা ভগবানই জানেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হল।

বিবাহিত পুরুষদের দুর্বলতাগুলি যতটা তাঁদের সহ-ধর্মিণীরা জানবার সুযোগ পান, তেমন আর অন্য কেউ পায় না। অপরে হিতেনবাবুকে কেবল ধার্মিক বলে মনে করতেন না, অনেকের ধারণায় তাঁর মধ্যে এমন সব বিভূতি জেগে উঠেছিল যা' ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহ ছাড়া লাভ করা যায় না। কিন্তু ব্রজরাণী বল্‌তেন, বিভূতি না ছাই। হিতেনবাবু ছন্দ মিলিয়ে দিতেন, বিভূতি মানেও তাই। "তা না তো কি? অপর গুরুগিরি করে টেঁক ভরে আর তোমার গুরুগিরি করতে গিয়ে টেঁক খসে।" অর্থাৎ হিতেনবাবুর দানধ্যান ও ধর্ম আচরণের মধ্যে

ব্রজরাণী শুধু দেখ্‌তে পেতেন ব্যয়সাপেক্ষ সুনাম-লোলুপতা যা' অ ধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে জাগতিক বুদ্ধিহীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ব্রজরাণীই মেয়েদের বিবাহের সমস্ত যোগাযোগ ঘটাতেন। বরপণের অঙ্ক শুনে প্রত্যেকবারই হিতেনবাবু তাঁকে দিব্যেন্দুবাবুর পণপ্রথা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমতগুলি জানিয়ে দিতেন। তাই সেই পণপ্রথা বিরোধীর কন্যার সঙ্গে নিজের পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব তাঁর কাছে যেন ফুটন্ত তেলে ভিজে আনাজের মত এসে পড়ল।

কিন্তু তিনি জানতেন যে হিতেনবাবুর মাথায় যেসব কীট প্রবেশ করে তাদের জন্যে কোন কার্যকরী ঔষধ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই সেই কীটগুলির প্রসূত বিষক্রিয়া থেকে নিস্তার নেই। শত অবাঞ্ছিত হলেও তা কর্মফলের মতই অনিবার্য।

বিবাহের পর শুভ যা' ঘটেছিল সেটা হচ্ছে অমিতার প্রথম বিভাগে আই, এ পাশের খবর। কিন্তু এই শুভটুকুই অশুভ ফলটাকে আরো বড় ও বিকট করে তুল্‌লো কারণ প্রসাদ বি, এ, ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে দিলে। শুধু তাই নয়, বহুদিনের আন্দোলনের ফলে জমিদারী প্রথা উঠে গেল এবং বহু জমিদারের অবস্থা হয়ে উঠলো সঙ্গীন।

এইসব অঘটনের দায়িত্ব ব্রজরাণী তাঁর বধূরূপী অলক্ষ্মীর উপরই আরোপ করলেন। তাই তিনি অমিতার সকল আচরণেই দেখতে লাগলেন হয় আক্কেলের অভাব না হয় বেআক্কেলের আতিশয্য।

"ওকি বৌমা, মালাইকারীতে গুচ্ছের চিনি ঢেলে দিলে কেন? আমরা ব পু তরকারীকে পিঠে পায়েস করে খেতে পারিনা। মিষ্টি খাওয়ার যম, ও তোমার শ্বশুরমশায়ের মুখেই শুধু ভাল লাগে। সকলেরটা আলাদা করে, তোমার শ্বশুরমশায়ের ভাগে খালি চিনি গুড় কেন, চাওতো খানিকটা মধুও ঢেলে দিতে পারো। প্রশংসাতেও মধু ঝরবে।"

অমিতার আসার পর পাচকের সুনাম থেকে বঞ্চিত, পৈতাধারী উৎকলবাসী সহাস্যে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

অমিতা উত্তর দিলে, ঘিএ চিনি একটু লাল করে নিয়ে, মশলা কষে নিলে মালাইকারীর রঙ হয় দুধে আলতা। এরজন্য যতটুকু চিনি দেওয়া হয় তাতে তরকারী মিষ্টি হয়না। তারপর সে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, তুমি আর মাথা নেড়োনা ঠাকুর। বাংলাদেশের রান্না তোমরা কিছু দেশ থেকে শিখে আসো না, এইখানে এসেই শেখো।

অমিতার এই নতি স্বীকারে অস্বীকৃতি ও ঠাকুরের প্রতি অবজ্ঞাজনক উক্তি ব্রজরাণীর কানে গিয়ে খোঁচার মত বিঁধলো। তিনি নিজে পাচকটিকে "ঠাকুর মশাই" বলে সম্বোধন করতেন আর তার শ্রীহস্তের রন্ধনকে অমৃত জ্ঞান করতেন।

এ বিষয়ে হিতেনবাবুর বিপরীত মত পুত্রবধূর প্রতি ব্রজরাণীর বিরাগ বাড়িয়ে তুলতো। হিতেনবাবু বলতেন, রান্না শিখেছে বটে বৌমা। আমাদের নটের ঠাকুর তো নিরামিশ রাঁধতেই পারে না। শুক্তকে করে তোলে যেন পেহালার পাচন।

দিব্যেন্দুবাবু বরপণ দেননি বটে কিন্তু দানসামগ্রী দিয়েছিলেন প্রচুর। ব্রজরাণী সেগুলিকে "জঞ্জাল" আখ্যা দিয়ে, কতকগুলি মেয়েদের পড়ার ঘরে এমন কি দু'একটি জিনিষ চাকরদের ঘরেও স্থানান্তরিত করলেন। সেগুলি যেন চক্ষুর পীড়াদায়ক! কেবল গৃহসজ্জা হিসাবে পিয়ানোটি বসবার ঘরে স্থান পেয়েছিল। প্রসাদের পীড়াপীড়িতে অমিতা সেটি একদিন বাজাবার সময় ব্রজরাণী হঠাৎ ঘরে ঢুকে দাঁতে দাঁত চেপে এমনভাবে কানে আঙ্গুল দিলেন যেন ঐ বিজাতীয় সঙ্গীত কানে গেলে হিন্দুত্বের মুখগহ্বর দিয়ে পলায়ন অনিবার্য। সেই থেকে অমিতা আর কোনদিন পিয়ানোতে হাত দিত না।

একদিন সহসা শাশুড়ী ঠাকরুণ বলে বসলেন। তোমার গায়ের গয়নাগুলি ছাড়া, বাকীগুলি আমায় দিয়ে দিও, সিন্দুকে তুলে রাখ্‌বো। তোমরা আজকালকার মেয়ে তোমাদের তো আঁচলে চাবী থাকে না।

অমিতা শাশুড়ীর মধ্যে চৌর্যভীতি কোনদিন লক্ষ্য করেনি। তাঁর চাবী আঁচলে থাকলেও, অনেক সময় খুচরা পয়সাকড়ি যেখানে সেখানে ভুলে ফেলে রাখতেন। পরে তার হিসাবও তাঁর মনে থাক্‌তো না, বা ইচ্ছা করেই হিসাব মেলাবার চেষ্টা করতেন না, পাছে তার মধ্যে দিয়ে নিজের অন্যমনস্কতাই পড়ে যায়।

কাজেই অমিতার, এই সতর্কতার অর্থ বুঝতে বিলম্ব হল না। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে শাশুড়ীর আজ্ঞা পালন

করলেও বলে বসলো, এ বাড়ীর চাকরবাকর চাবীতে হাত দেওয়ার বিপদ ডেকে আনবে না। কারণ যথাতথা যা' পড়ে থাকে তাতেই তাদের যথেষ্ট উপরি পুষিয়ে যায়। তাছাড়া আজকালকার মেয়েদের চাবী আঁচলে না থাক্‌লেও, থাকে কোমরে ক্লিপ দিয়ে আটকানো। আঁচল থাকে পিঠে। সেখান থেকে চাবী খুলে নেওয়া হয়ত সম্ভব। কিন্তু কোমর থেকে নেওয়া মোটেই সোজা নয়।

উত্তরে বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই ব্রজরাণী বল্‌লেন, জানি মা জানি, তুমি উকিলের বেটী, তোমার সঙ্গে কথায় পারা যাবে না।

সেদিন সন্ধ্যায় এই বিতর্কের জের গিয়ে পড়ল প্রসাদের ওপর।

"পরের সোনা দিওনা কানে, কান যাবে তোর হ্যাঁচকা টানে।" অমিতা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে প্রসাদকে বল্‌লে, কথাটার সত্য আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম। এখানে যাত্রার দলের রাণী সেজে বসে থাকলেও আমার আসল পার্ট যে ভিখারিণীর তা বুঝতে আর বাকী নেই।

প্রসাদ মনে মনে বুঝলো যে এই অবস্থার জন্য সেই দায়ী। বি-এ ফেল করার পর সে স্টেট থেকে কিছু টাকা নিয়ে লরীর ব্যবসা করে। অল্পদিনে মূলধন অন্তর্হিত হওয়ার পর সে অন্য যা' কিছুই করছে, তা'তে কোন রকমে সময় কাটছে বটে কিন্তু ঘরে বিশেষ কিছু আসছে না। এর মধ্যে সে আরো দু'একটি ব্যবসায়ের পরিকল্পনা তার পিতার কাছে পেশ করেছিল বটে কিন্তু হিতেন-বাবু ও বিশেষ করে তাঁর সহধর্মিণী, প্রথম অসাফল্যেই পুত্রের ব্যবসা বুদ্ধির অভাব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রজরাণী পুত্রকে কিছুদিন থেকে উপদেশ দিচ্ছিলেন একটি চাকরীর সন্ধান করতে। বলছিলেন, "ব্যবসা কি তোমাদের চোদ্দপুরুষে কেউ কোনদিন করেছে?"

প্রসাদ উত্তর দিয়েছিল। মা চাকরীই বা কোন পুরুষে করেছিল বলে তো শুনিনি। প্রথমবার ঠেকে শিখেছি। এবার সাবধানে এগুবো। দরকার হলে কোন অভিজ্ঞ অংশীদারও নিতে পারি। না হয় আমাদের জন্যে বছরখানেকে যা খরচ করতে সেই টাকাই দাও। ব্যবসার আয় থেকে আমিই বরং কলকাতার বাসা খরচ চালিয়ে নেবো।

জ্যেষ্ঠপুত্র বলে প্রসাদের ওপর ব্রজরাণীর যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব ছিল। কিন্তু বিবাহের পর থেকে বধূর নিতান্ত বশংবদ বলে তিনি প্রসাদের ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। তাই শ্লেষের সঙ্গে বল্‌লেন। "থাম বাপু, তোমার ব্যবসা-বুদ্ধি তো তোমার বাপের মতই হবে। যাই হোক্‌ কম্‌পেনসেসনের টাকা বেরুলে আবার একবার নয় অর্থ-দণ্ড দিয়ে দেখা যাবে।

কিন্তু "কমপেনসেসন" বা জমিদারী বিলুপ্তির ক্ষতি-পূরণ তো সরকারের হাতে। এর চেয়ে যক্ষের হাত থেকে গুপ্তধন বার করাও সহজ।

বিবাহের পর থেকে দিব্যেন্দুবাবুকে কোন "ফী" দেওয়া হত না। কোন পক্ষ থেকেই ব্যাপারটাকে অসঙ্গত মনে করেনি। একদিন উভয় পরিবারের অন্তরঙ্গ এক ভদ্রলোক পণপ্রথা দিয়ে তর্কের সময় দিব্যেন্দুবাবুকে বলে বসলেন, তুমিও তো পণ দিচ্ছ হে, না হয় মেয়ের বিয়ের পর। আজকাল কি আর একপয়সাও "ফী" পাও?

কথাটা দিব্যেন্দুবাবু অস্বীকার করতে পারলেন না। তিনি অনেকবার ভেবেছিলেন জামাইকে ব্যবসা করার জন্য কিছু টাকা দেবেন। কিন্তু পাছে সেটাকে প্রচ্ছন্ন পণদান বলে মনে করা হয় তাই এতদিন দিতে পারেননি।

পরদিন তিনি বিয়ের পর বছরখানেকের ওকালতি কাজের একটা বিল করে জমিদারবাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। লিখে দিলেন টাকাটা যেন তাঁর জামাতার কোন ব্যবসাতে তাঁর কন্যার অংশ হিসাবে দেওয়া হয়।

হিতেনবাবু বেশীর ভাগ তাঁর জমিদারীতেই থাক্‌তেন। কাজেই চিঠিটা বিল সমেত ব্রজরাণী দেবারই হাতে পড়ে। তিনি তৎক্ষণাৎ সিন্দুক থেকে নগদ টাকা বার করে প্রসাদকে বিলটা শোধ করতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে লিখে দিলেন যে জমিদারী লোপ পেলেও বনিয়াদী ঘরের আভিজাত্য লোপ পেতে পারে না। তাই তাদের ঘরের বউএর বণিকবৃত্তি গ্রহণ তাঁর কল্পনার অতীত।

তারপর ফেটে পড়লেন অমিতার ওপর। "টাকার

দরকার হয়েছিল, বিলটা পাঠালেই হত। নিজের প্রয়োজনে অপরের সম্মানে আঘাত না করলে কি চল্‌ত না।"

অমিতা সহ্য করতে পারেনি। বলে ফেলেছিল, বাবার তো মেয়ে একটি, ছেলে তিনটি। অত যদি তাঁর টাকার লোভ হ'ত তাহলে তিনি পণপ্রথার বিরোধী না হয়ে সমর্থকই হতেন।

কিন্তু উকিল পিতার হয়ে ওকালতি করতে গিয়ে অমিতা ঘটনাটিকে আরো ঘোরালো করে তুল্‌ল।

জমিদার গৃহিণী জ্ঞানহারা হয়ে উত্তর দিলেন, ওটা হচ্ছে এক ঢিলে দু' পাখি মারার উকিলী কৌশল। খবরের কাগজে নাম জাহির করা হল, আবার ছেলেদের জন্যে বড় বড় ঘরের মেয়েও আনা হল। তোমাদের ঘর ভর্তি জিনিষ ও গহনা কি সব তোমার বাবার রোজগারে কেনা?

এতেই শেষ হল না। পরের দিন গৃহিণী তাঁর জমিদারীতে চলে গেলেন, তাঁর অজ্ঞান স্বামীর জ্ঞান চক্ষু খুলে দিতে। অমিতাকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে প্রতিদিনের খরচের টাকা যেন সে তার ছোট ননদের কাছ থেকে চেয়ে আনবার ব্যবস্থা করে।

প্রসাদও এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। মূক বিস্ময় ও বেদনায় সে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাতৃদেবী আরো জলে উঠে বললেন, গরু চোরের মত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কি লাভ হবে! তোমার কৃতী শ্বশুরমশায়কে ধরে একটা চাকরীও কি জোগাড় করতে পারো না। স্টেট তো লক্ষ্মীর আগমনের পর লাটে উঠেছে। যতটুকু আছে সেটাও তো উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে পারিনা!"

খোঁচা খেয়ে উকিলের মেয়ের ওকালতি স্পৃহা আবার চাগাড় দিয়ে উঠলো।

"আমার পূর্বেই এ সংসারে যে লক্ষ্মী এসেছিলেন তাঁর জীবনকালেই তো জমিদারী গেল। তাহলে অপরাধটা আমার একার হল কি করে? তাছাড়া শুনেছি যে আপনাদের পূর্বপুরুষেরা কোনদিন দাসত্ব করেননি, আর জমিদারী গেলেও এখনও যা' আছে তা'তে দু' পুরুষের হেসে খেলে চলে যাবে। তাই যদি হয় তো আপনার বড় ছেলেই বা তা' থেকে বঞ্চিত হবে কেন? তাকে কেন চাকরী করে খেতে হবে?

আঘাতের পরিবর্তে প্রতিঘাত যে প্রকৃতির নিয়ম ক্রমবর্ধমান আঘাত হান্‌তে হান্‌তে ব্রজরাণী কথাটা প্রায় ভুল্‌তে বসেছিলেন। তাই আজ উত্তর শুনে প্রথমে কিছুক্ষণ হতবাক্‌ হয়ে গেলেন। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এ কথাগুলিও তোমার বাবার বলে মনে হচ্ছে। তা' বেশ তো আইনের সাহায্যে তিনি তাঁর মেয়ের পাওনা গণ্ডা আদায় করে নিন্‌ না। ওটুকুই বা বাকি থাকে কেন?

এই বলে অস্বাভাবিক দ্রুত পদবিক্ষেপে নীচে নেমে গিয়ে গাড়ীতে চেপে বসলেন। মনের আন্দোলনে দেহের যে আলোড়ন ঘটলো তাতে ঘাবড়ে গিয়ে চাকরবাকরের দল সভয়ে দূরে সরে দাঁড়াল।

প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রহণ করতে অমিতা স্বামীকে তার ছোটবোনের কাছে যেতে দিল না। জমিদার বাড়ীর খরচ ঠিকই চলতে লাগলো। প্রসাদ অনুমান করে নিলো যে তার শ্বশুরমশায়ই নিশ্চয় গৌরীসেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

আজকাল প্রত্যহ সন্ধ্যায় অমিতা বেড়াতে বেরোয়। যথেষ্ট কুণ্ঠার সঙ্গে প্রসাদ অনুগমনের প্রস্তাব করায় হঠাৎ অকারণে যেন অমিতার রুদ্ধ অভিমান উথলে উঠলো। তোমাদের সোনার খাঁচায় ভিক্ষের ছোলা খেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমাকে একটু ছেড়ে দাও। আমার দ্বারা তোমাদের কোন সঙ্গত মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হবে না।

প্রসাদ আর কোন কথা বল্‌লে না। সে তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিষয়বুদ্ধি না পেলেও তাঁর ভদ্র সহনশীলতাটুকু পেয়েছিল, যেটা অনেক সময় অমিতা তার ভীরুতা বলে ভুল করত।

* * *

মাসখানেক পড়ে স্বামীসহ ব্রজরাণী সগর্বে কলকাতায় ফিরলেন। হিতেনবাবুকেও কেমন যেন গম্ভীর ও চিন্তিত বলে মনে হল। পূর্বের মত অমিতাকে 'মা' 'মা' করে বাড়ী কাঁপান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

একাকিনী অমিতার প্রতিদিন সান্ধ্যভ্রমণ কেবল অব্যক্ত প্রতিবাদ নয়, কেমন যেন একটা অসোয়াস্তিকর সন্দেহের সৃষ্টি করল।

পরদিন সন্ধ্যায় হিতেনবাবু বোধহয় বেয়াই মশায়ের কাছেই গিয়েছিলেন। নিয়মমত অমিতা বেরিয়ে পড়ল।

সাধারণত মেয়েরা অনুসরণ সম্বন্ধে স্বভাবতই সচেতন, হঠাৎ সে যেন পিছনে এক পরিচিত ছায়া দেখতে পেলো। ফিরে দেখে তাদেরই ঠাকুর। ঠিক সেই মুহূর্তেই কোন স্বদেশবাসিনীর দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, যাকে দেখে তার ভ্রমরপাঁতি সদৃশ দন্তরাজি প্রায় সবকটাই বেরিয়ে পড়েছিল।

অমিতা যেন তাকে দেখেনি এইভাবে দ্রুত এগিয়ে চললো। আর পিছন ফিরে চাইলনা। তার কেমন যেন সন্দেহ হল। এ সময় ঠাকুরতো রান্নায় ব্যস্ত থাকে, বাহিরে বেরোয় না। সে নিকটস্থ একটা পার্কে প্রবেশ করে একটা খালি বেঞ্চে বসে পড়লো।

একটু পরেই পার্কের এককোণে পাচকপুঙ্গবকে দেখা গেল। প্রায় আধঘণ্টা ধরে অমিতাকে লক্ষ্য করার পর তার বোধহয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। কারণ সতর্কদৃষ্টিতে চারিদিক অনুসন্ধান করেও অমিতা আর তাকে দেখতে পেলো না। তখন সেই উদ্যান থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে সে তার গন্তব্য স্থলে চলে গেল।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদনের ফলে সে একটি ধনী ব্যবসায়ীর কন্যাকে পিয়ানো শেখাবার টিউশানী পেয়েছিল। সেখান থেকে অগ্রিম নিয়েই সে এতদিন শ্বশুরবাড়ীর খরচ চালাচ্ছিল।

সেদিন ফিরতে তার বেশ একটু বিলম্ব হল। দেখলো যে হিতেনবাবু তখনও ফেরেননি। এতরাত পর্যন্ত সাধারণত তিনি বাইরে থাকেন না। আরো দেখলো যে শাশুড়ী ও স্বামীর চোখে সশঙ্ক ও সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

অমিতারও মনের উত্তর কোণে জমে উঠেছিল ঝড়ের পূর্বাভাস। কিন্তু প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটলো ব্রজরাণীরই কণ্ঠে।

"তুমি কি মনে করেছ বৌমা…"

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়েই অমিতার স্বর সপ্তমে ঝংকার দিয়ে উঠলো—কি মনে করেছি তাকি গোয়েন্দা লাগিয়েও বুঝতে পারলেন না ?

থমকে গিয়ে ও অমিতার রক্তিমমুখ দেখে কথঞ্চিৎ ভীতা হয়ে, শাশুড়ী একটু স্বর নামিয়ে বল্লেন, তুমি ভুলে যাও কেন বৌমা তুমি কত বড় ঘরের বউ ! আমাদের ঘরের মেয়ে বউ কি কখন পথে-ঘাটে একলা ঘুরে বেড়িয়েছে ?

আবার তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অমিতা বল্লে, হ্যাঁ, বড়ঘরের বউই বটে। তাই চুরি যাওয়ার অজুহাতে তার গায়ের গয়না কেড়ে নেওয়া হয়। বাজার খরচের জন্যে তাকে প্রতিদিন ছোট ননদের কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে বলা হয়। বড় ঘরের বড়ছেলে পথে পথে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়, তার না আছে কোন কাজ, না আছে কোন আনন্দ। এরচেয়ে গরীবের ঘর ঢের ভাল। সেখানে সত্য যতই মর্মান্তিক হোক, তাকে স্বীকার করে নেওয়ার সাহস আছে। সেখানে অন্তত এই ভেঙ্গে-পড়া আভিজাত্যের মিথ্যা অভিমান নেই !

ব্রজরাণী আর সহ্য করতে পারলেন না, যদি আমরা এতটাই ভেঙে পড়ে থাকি, তুমি তাহ'লে ইচ্ছা করলে তোমার নতুন গড়ে-ওঠা বাপের বাড়ীতেই ফিরে যেতে পারো।

"হ্যাঁ, তাই যাবো, তবে বাপের বাড়ীতে নয়।" এই বলে সে বেগে তার অ্যাটাচী কেসে কয়েকটি কাপড় এবং সম্প্রতিপ্রাপ্ত তার পিতৃদত্ত কয়েকটা গহনা ভরে নিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে স্বামীকে ডাক্‌লো—তুমিও চলে এসো, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? এখানে নিজেদের পাওনা গণ্ডাটাও প্রতিদিন ভিক্ষে করার চেয়ে, পথে পথে পরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করাও ভাল।

ব্রজরাণী গর্জে উঠলেন, কি, তোমার এতবড় সাহস ও স্পর্দ্ধা, তুমি আমার পেটের ছেলেকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাও ?

প্রসাদ যেন পাথরের মত প্রাণহীন হয়ে গিয়েছিল। সে এক পাও এগুতে বা পিছুতে পারল না। অমিতা কয়েক মুহূর্ত তার দিকে এক নিমেষে তাকিয়ে থেকে, চোখে জল আসবার পূর্বেই, আর বাক্যব্যয় না করে নিষ্ক্রান্ত হল। দাসদাসী যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে ছুটে এসেছিল। কর্তামার এহেন সিংহনাদ তারা কোন দিন শোনেনি। রীল কেটে গেলে পর্দার উপর ফিল্মের ছবির মত তারা যেন সহসা নির্বাক ও নিশ্চল হয়ে গেল। তবু একটা কথা সকলেই মনে মনে বুঝলে যে ঐ বাড়ীর বড় বউ বদল অনিবার্য। কিন্তু পরদিন থেকে বড়ছেলেও নিরুদ্দেশ হল। ছ মাস ধরে কাগজে বহু বিজ্ঞাপন দিয়েও তার কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা।

খবর পাওয়া গেল প্রায় দু'বছর পরে। দিব্যেন্দুবাবুই সঙ্গে করে ব্রজরাণী ও হিতেনবাবুকে নিয়ে গেলেন। কারখানায় ব্যবহৃত কোন এক বিশেষ প্রকারের চশমার ব্যবসায়ে প্রসাদের নাকি বাণিজ্যদৃষ্টি উন্মীলিত হয়েছিল। বাড়ীর আসবাবপত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। মূলধন ছিল অমিতার দ্বিতীয় প্রস্থের পৈতৃক গহনাগুলি ও ডাক্তার রায়ের ব্যক্তিগত সাহায্য পাওয়া একটি সময়মত সরকারী ঋণ। বলা বাহুল্য যে, অন্যথায় ঋণ হয়তো পাওয়া যেত অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে, কিন্তু তা' পাওয়া যেত ব্যবসাটি উঠে যাওয়ার পর। অমিতাও বসে ছিলনা। সে বাড়ীতেই পিয়ানো শেখাবার একটি সান্ধ্যস্কুল খুলে ছিল। তাছাড়া ইংরাজী ও রাগসঙ্গীতের সমন্বয়ে বাজান তার কয়েকটি রেকর্ড, তাদের বৈচিত্র্যের জোরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই লোকপ্রিয়তার সুযোগ নিয়েই দিব্যেন্দুবাবু, অমিতা ও প্রসাদের শেষপর্যন্ত সন্ধান পেয়েছিলেন।

কিন্তু ব্রজরাণীকে সবচেয়ে বেশী যে আকর্ষণ করেছিল সে হচ্ছে অমিতার কোলের সদ্য গোলাপের মত প্রস্ফুটিত শিশুটি—যে তার অনায়াস হাসিটুকু দিয়েই মা বাপের আয়াসলব্ধ সমস্ত গৌরবকেই যেন ম্লান করে দিয়েছিল।

হিতেনবাবুর একটি সখ ছিল থিয়েটার করা। তাই বোধহয় তিনি থিয়েটারী ঢঙে সগর্বে বলে উঠলেন, দেখলে তো গিন্নী, আমি ভুল করিনি! আমরা ছেলের জন্ম দিয়েছি বটে কিন্তু তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছে আমার মা-জননী। তাই দুঃখ কোরোনা। যা' ঘটেছে তা' হচ্ছে নূতনত্বের সঙ্গে পুরাতনের সংঘর্ষ। সবকালেই এটা ঘটে থাকে এবং জয় হয় নূতনেরই। কিন্তু আমাদের পরাজয় কি শুভমূর্তিই না নিয়ে এসেছে! কি পাওনি—তার দুঃখে নিজেকে হারিয়েছিলে। আজ তো সব কিছুই সুদে আসলে পেয়ে গেলে।

আনন্দাশ্রু সম্বরণ করে ব্রজরাণী দেবী বললেন, জানো বৌমা, আমি স্বপ্ন দেখেছি, যে আর জন্মে তুমি আমারই মেয়ে ছিলে।

দিব্যেন্দুবাবু চুপ করে মজা দেখছিলেন। এবার আর মন্তব্য না করে থাকতে পারলেন না, বললেন, ওটা বোধহয় বেয়াই মশায়ের বিভূতির প্রয়োগ।

সম্মিলিত উচ্চ হাস্য থামার পর অমিতা বললে, কিন্তু মা, আমি কি এ জন্মেও আপনার মেয়ে নই? এ জন্ম কি তার নিজের জোরেই দাঁড়াতে পারে না!

—কোন্ জন্মের পরিচয়ে জানি না, খোকন এর মধ্যেই তার ঠাকুরমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এক হাত দিয়ে তিনি তাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরেছিলেন, আর এক হাতে তিনি পুত্রবধূকেও জড়িয়ে ধরলেন।

লাজুক ও স্বল্পভাষী প্রসাদ এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল, যেমন করে প্রবীণ লোক দূরে দাঁড়িয়ে শিশুদের খেলা দেখে। চট করে টেবিল থেকে ফ্লাস্ লাইট্ ফিট্ করা ক্যামেরা তুলে সে শাশুড়ী-বৌএর এই দুর্লভ মিলন দৃশ্যের ফোটো তুলে নিল।

দিব্যেন্দুবাবু জামাতাগর্বে বলে উঠলেন, একেই বলে উপস্থিত বুদ্ধি, এ দৃশ্য চিরস্থায়ী করে রাখার মতই!

আবার আনন্দের ঢেউ উঠলো। সলজ্জ শাশুড়ী বৌএর মধ্যে খোকনই শিশুসুলভ কলরোলে হেসে উঠলো। পিতার কৃতিত্বে সেই যেন সবচেয়ে বেশী তুষ্ট।

ব্রজরাণী বললেন, আজই তিনি সকলকে নিয়ে যাবেন। এ বাড়ীর চাকরটার সঙ্গে গাড়ীর "শোফার" থাকবে বাড়ীর তত্ত্বাবধানে। পরে আস্তে আস্তে সব জিনিষ-পত্তর নিয়ে যাওয়া হবে। নিজেদের বাড়ীতে অত যায়গা পড়ে থাকতে ভাড়া বাড়ীতে থাকার কি দরকার?

প্রসাদ কিন্তু বলে বসলো, না, মা, তোমরাই বরং এখানে চলে এসো। এই ক'টা লোকের জন্যে অতবড় বাড়ী, এ যুগের চোখে বিলাসিতা। আমাদের বাড়ীটাই বরং ভাড়া দেওয়া হোক। চাকরদের আমি আমার কারখানায় ভর্তি করে নেবো।

হিতেনবাবু বেয়াইএর দিকে চোখ মেরে বললেন, কিন্তু আমাদের নাবালক ঠাকুরটির কি হবে? ওকে তো আমরা প্রাণ থাকতে ছাড়তে পারবো না।

প্রসাদ হেসে বললে, ওকে আমাদের কারখানার "ক্যান্টিনে" নিয়ে নেবো।

আতঙ্কের ভাণ করে হিতেনবাবু বললেন, ওর রান্না খেয়ে কারখানার লোক পালাবে না তো?

আবার হাসির রোল উঠলো। তাই শুনে ব্রজরাণীর কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটা কাটলো। কপট উষ্মা প্রকাশ করে তিনি হিতেনবাবুকে বললেন, তোমার জমিদার না হয়ে, হওয়া উচিত ছিল সার্কাসের "ক্লাউন্"।

হিতেনবাবু দিলদারের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, তোমার সার্কাসে তাই তো হয়ে আছি গিন্নী! কিন্তু বিবেচনা করে দেখো, প্রসাদ অতি উত্তম প্রস্তাব করেছে। কে বলে তোমার ছেলে "বিজনেস্" বোঝে না। কে বলে আমার ছেলে আমারই মত বোকা! তুমি বরং আর "রিং মাষ্টারী" কোরো না, এ যুগকেই মেনে নাও।" আমি অন্ততঃ কলকাতায় আসলে তোমার "ক্যান্টিনে" আর যাচ্ছি না।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম

ধীরেন দেবনাথ

১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা' থেকে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি জানা যায়। তিনি বলেছিলেন ঃ

প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুব সিদ্ধান্ত রূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করে যাবে। য়ুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই

বিচিত্রা ভবন
(রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শনশালা এই বাড়ীতে অবস্থিত)

আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এ রকম সম্মিলন ঘটতে পারেনি। তাছাড়া য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎরূপ আমরা দেখতে পাইনে। যে-সকল

এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদগ্ধ্য বলে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর

প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি জড়পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুকরো-করা মুখস্থ বিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্স্ট-বুক সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েছে।

এ ক্ষুভিত বাণী উচ্চারণের পর অনেক বছর পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দেশে বহু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, শিক্ষাসমস্যা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, নানা দিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার্জনের পথে যে সব মূল বাধা রয়েছে—যার সুগভীর ইঙ্গিত বহন করছে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত ভাষণাংশ—সে-সব বাধা দূরীকরণের দিকে তেমন লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে একথা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যদি একটি পরিপূর্ণ আদর্শের লক্ষ্য না থাকে, ভবে সে তো শুধু পরীক্ষায়-পাশ-করানোর যন্ত্র স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

এই যন্ত্রকেই আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি সর্বত্র। এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়—কিন্তু সবই তো সেই এক ছাঁচে ঢালা। শিক্ষার কাঠামো, পাঠনরীতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার মাধ্যম—সকল প্রশ্নেই সেই অচল অনড় সনাতনত্বের অনুসরণ। অবশ্য প্রচলিত রীতির বর্জনে, কিছু অসুবিধা আছে—বিশেষ করে শিক্ষার সাথে জীবিকার যোগ যেখানে অবিচ্ছেদ্য। তাহলে কি আমরা চিরকাল সেই সহজ প্রাচীনত্বের পথেই চলব? নতুনের প্রয়োজন মনে মনে স্বীকার করে নিলেও জীবনে তাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হব? চলতি ধারার ব্যতিক্রম ঘটাবার প্রাথমিক অধ্যায়ে কিছু অসুবিধা হতে পারে—কিন্তু সেগুলিকে মেনে নিয়ে বৃহত্তর কল্যাণের পথে, মহত্তর সিদ্ধির অভিমুখে কি আমরা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করব না? বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধের এই পৃথিবীতে বহু দেশেই একাধিক সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এঁরা দেশের সংস্কৃতির শিক্ষাধারা পরিচালনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটি উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। সাংস্কৃতিক শিক্ষা যে কেবলমাত্র জন্মগত প্রতিভার সূত্রেই অধিগত হতে পারে না, সাংস্কৃতিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে কোনো বিদ্যাচর্চাই যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনা—এ কথা আমরা তেমন করে ভাবিনি। রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক রূপে সম্মান দেখিয়েছি; কিন্তু যখনই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে তাঁর কোনো সুগভীর চিন্তা ঘোষিত হয়েছে, তখন তাকে দার্শনিক কবির মর্মবেদনার অভিব্যক্তি মাত্র বলে মেনে নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টিতেই নিমগ্ন নন—তিনি যে সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি নিয়ে চিন্তা করেন, এ কথার উল্লেখে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছি। কিন্তু তাঁর সেই বাণীকে, সেই সুগভীর চিন্তাকে বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষতার মধ্যে রেখে পরীক্ষা করতে চাইনি। প্লেটো তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসন চেয়েছিলেন, কিন্তু সংগীতকে তিনি শিক্ষার মধ্যে অনন্য আসন দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তো বলেছেন—শুধু মুখের ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করতে পারেনা বহু মানুষ। এ জন্য চিত্র, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি অন্য মাধ্যমের প্রয়োজন। তিনি বলেছেন:

> In the Centre of Indian culture which I am proposing, music and art must have their prominent seats of honour and not be given merely a tolerant note of recognition.

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনব্যাপী শিক্ষাচিন্তার আদর্শে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছে—বাংলা দেশে, সংস্কৃতি-চর্চার পীঠস্থান কলকাতায়। ১৯৬২ সালের ৮ই মে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্র-ভারতী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে স্থাপিত সংগীত, নৃত্য ও নাটক সম্পর্কিত একাডেমী বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং অবিচল সংকল্পে সেই স্বপ্নকে রূপ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তাঁর মৃত্যুজনিত ক্ষতি

অপূরণীয়। তবু সেই ক্ষতির উর্দ্ধে উঠে তাঁর অভীপ্সিত পথে রবীন্দ্র চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই রবীন্দ্রভারতীর উদ্দেশ্য। এখানে সংগীত, নৃত্য, নাটক প্রভৃতি চারুকলাকে মানবতা বিষয়ক সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—যে কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার নানা সূত্রে বলেছেন। বিদ্যা-চর্চা যেন নীরস পাঠেই পর্যবসিত না হয়—তার মধ্যে আনন্দের অভিষেক চাই: এ আনন্দের উৎস সৃষ্টি হবে ছাত্রমনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ-দানের পথে। ক্রমে ক্রমে সংগীত-নৃত্য ও নাটকে স্নাতকোত্তর (এম·এ) পাঠদানের ব্যবস্থাও হবে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যেতে পারে। এর সম্পর্কে তাই জনমানসে উপযুক্ত-রূপ পরিচিতি প্রয়োজন। আপাততঃ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-যে বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা আছে তা হল—

(১) ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পর্যায়ের পাঠক্রম (সর্বত্র)—[সংগীত, নৃত্য বা নাটক সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক]

সংগীত ভবন

(বিশ্ববিদ্যালয় অফিস এই ভবনে অবস্থিত। সঙ্গীত নৃত্য ও নাটকের ক্লাসও আপাততঃ এখানে নেওয়া হচ্ছে।)

(২) সংগীত (কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত ও আনদ্ধ বাদ্য সম্পর্কে তিন বছরের ডিপ্লোমা পর্যায়ের পাঠক্রম।

(৩) নৃত্য সম্পর্কে তিনবৎসর ব্যাপী ডিপ্লোমা পর্যায়ের পাঠক্রম।

(৪) নাটক সম্পর্কে তিনবৎসর ব্যাপী ডিপ্লোমা পর্যায়ের পাঠক্রম।

(৫) রবীন্দ্র সাহিত্যে ডিপ্লোমা পর্যায়ের বর্ষকালীন পাঠক্রম।

(৬) আগামী জুলাই মাস থেকে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহে স্নাতকোত্তর (এম,এ,) পাঠদানের ব্যবস্থা হচ্ছে :

(ক) সমাজ বিজ্ঞান—Social science—(বাংলা দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই এ বিষয় দুটি পড়ানো হয় না)

(খ) নন্দন তত্ত্ব—Aesthetics—

(গ) (ঘ) (অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা থেকে পৃথক কালোপযোগী পাঠ্যসূচী গৃহীত হয়েছে এ দুটি বিষয়ে)

[ভারতীয় ও বিদেশী ভাষাগুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হবে অদূর ভবিষ্যতে] এ ছাড়া, সংগীত, নৃত্য ও নাটক শিক্ষাদানে নিযুক্ত শিক্ষায়তনগুলিকে অনুমোদন দান করবার ক্ষমতা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। ইতিমধ্যেই একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষায়তন এই অনুমোদন পেয়েছে এবং বহুসংখক আবেদনপত্র বিবেচনাধীন রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাবিভাগটি স্বল্পকাল মধ্যেই গবেষকদের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে 'রেনেস'র প্রভাব, রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন অনালোচিত ও স্বল্পালোচিত দিকে নতুন আলোকপাত, নাটক সম্পর্কে গভীরতর আলোচনা, সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা সুরু হয়ে গেছে। বিচিত্রাভবন স্থাপিত, বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শনশালাটি তার সংগীত উপকরণের সাহায্যে এই সব গবেষকদের যেমন সাহায্য করে চলেছে, তেমনি জনসাধারণের মনেও বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি প্রবল অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলেছে। বিদেশী পর্যটকদের কাছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শনশালা একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু প্রচলিত পাঠক্রমের পরিবর্তনেই নয়, ছাত্রমনের উপযোগী একটি সুষ্ঠু পরিবেশন রচনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত যত্নশীল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পা দিলেই একটি ভিন্নতর হাওয়ার স্পর্শ—সজীব একটি প্রাণ চাঞ্চল্য—সুগভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে হঠাৎ একটি গানের কলি—চকিতে মিলিয়ে যাওয়া অপস্রয়মান একটি নৃত্যের ছন্দ।

সব শেষে উল্লেখ করা দরকার—বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচনে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অনার্স পর্যায়ের পাঠক্রমেও মাধ্যম হল বাংলা। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা গ্রহণ করেছেন :

> ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা এইজন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ: সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ে প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা। অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়। মুষ্টিভিক্ষার যে দান সংগ্রহ করি ফর্দ ধরে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া, সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে শিক্ষা করতে হয় ওজন-দরে।

অত্যন্ত ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিজের বিশিষ্ট আসনটি অর্জন করে নিতে হবে—ক্লান্তিহীন পথপরিক্রমায়, প্রত্যয়নিষ্ঠ সবল সাধনায়। পরিপূর্ণ আদর্শের লক্ষ্যে তার যাত্রা শুরু হয়েছে—এ-যাত্রা শুভ হোক্, জয়ী হোক্।

রবীন্দ্র সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত

গুণেন্দ্র রায় এম-এ

'অতিপ্রাকৃত' কথাটি ইংরেজী Supernatural শব্দের যথাযথ প্রতিশব্দ। অনৈসর্গিক, অলৌকিক, অস্বাভাবিক প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ইহার মানে আর একটু স্পষ্ট করা গেলেও সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা সহজবোধ্য হয়না। দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত পর্য্যন্ত সব কিছুকেই অতিপ্রাকৃত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে অতিপ্রাকৃত বলিতে আমরা ভূতকেই ধরিয়া লইব।

অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক শব্দের ব্যাকরণ সঙ্গত মানে হইল—প্রকৃতি বা নিসর্গের মধ্যে যাহার অস্তিত্ব সম্ভব নয়, বা প্রকৃতির নিয়ম দ্বারা যাহার কোন ব্যাখ্যা করা চলেনা। বিজ্ঞানের মতে প্রকৃতি নিয়মের রাজ্য। সুতরাং, এই নিয়মের রাজ্যে এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যাহার কার্য-কারণ প্রকৃতির নিয়ম বলে নির্ণয় করা যায় না। বৈজ্ঞানিকের মত স্বীকার করিয়া লইলে আমরা বলিতে পারি যে, প্রকৃতির রাজ্যে অতিপ্রাকৃত বলিয়া কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না।

কিন্তু, এতো গেল বাহ্য প্রকৃতির রাজ্যের কথা, অর্থাৎ বস্তুজগতের কথা। এই বস্তুজগতের শাসন-নিরপেক্ষ আরও একটি জগৎ আছে, যাহাকে মনোজগৎ বলা যাইতে পারে। এই মনোজগৎ অত্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় বা Individualistic গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থাও এই জগতে পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী হয়না। এই জগতের অধিবাসী হইল অসংখ্য ভাব বা আবেগ। বাহ্য চেতনা সময় সময় এদের নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হইলেও, অধিকাংশ সময়ই ইহারা স্বাধীন। মনের এই অদমনীয় ভাব বা আবেগেই অতিপ্রাকৃতের জন্ম।

অজ্ঞতাই সকল অনর্থের মূল। এই অজ্ঞতার রসে পুষ্ট হইয়া মনের কোন কোন আবেগ এক একটি কুসংস্কারের রূপ পরিগ্রহ করে। 'সংস্কার' কথাটির মানে হইল—বদ্ধমূল ধারণা। এই ধারণা যখন অজ্ঞতার রসে পুষ্ট হয়, তখন তাহাকে বলা হয়—কুসংস্কার। আকারে প্রকারে ইহারা বিভিন্ন হইলেও, চেতন মনে ইহাদের আবির্ভাবের পদ্ধতি একই প্রকার। এইরূপ আবেগ বা ভাব অবচেতন মনেই অবস্থান করে এবং অনুকূল পরিবেশের আকর্ষণে চেতন মনে আবির্ভূত হইয়া ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে মনের দুইটি ভাগ আছে—একটি চেতন, অপরটি অবচেতন। চেতনমনের চিন্তাধারা চলে। বস্তুজগৎকে অবলম্বন করিয়া, তাই চেতনমনের চিন্তা-ধারাকে বস্তুজগৎ বা প্রকৃতির নিয়ম দিয়া বিচার করা চলে অবচেতন মনের আবেগের সঙ্গে বস্তুজগতের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। তবে সময় সময় অবচেতন মনের কোন ভাব চেতন মনে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। অবচেতন মনের সেই আগন্তুক ভাবটি যদি চেতন মনের তৎকালীন ভাব অপেক্ষা প্রবলতর হয়, তবে সেই ভাবটি সাময়িক ভাবে চেতন মনের ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে। চেতন মনে এইভাবে কোন বীভৎস-রসাত্মক ভাবের আবির্ভাব ঘটিলে, তাহাই আমাদের নিকট ভৌতিক অতিপ্রকৃতি রূপে প্রতিভাত হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক—

মনে করুন, আপনার মনে ভূতের ভয় আছে, অর্থাৎ ভূত নামক কোন কাল্পনিক জীবের অসীম ক্ষমতা, অবস্থা মূর্তি সম্বন্ধে আপনার মনে একটা কুসংস্কার আছে। কিন্তু এই সংস্কারটি অবচেতন মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাই সকল সময় আপনি ভূত দেখিতেছেন না। একদিন কোন শ্মশানের ধার দিয়া অন্ধকার রাত্রে যাইবার সময় অনুকূল পরিবেশের আকর্ষণে আপনার অবচেতন মনের এই ভাবটি অকস্মাৎ প্রবলতর হইয়া উঠিল এবং আপনার চেতন মনের সমস্ত চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি ভৌতিক মূর্তি আপনার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল। আপনি কেবল তখনই ভূত দেখিতে পাইলেন।

সুতরাং বুঝা গেল, 'ভূত' বলিতে এখানে অবচেতন মনের একটি কুসংস্কারের বহির্বিকাশকেই বুঝাইতেছে।

এখন দেখা যাক, কি কি ভাবে বা অবস্থায় অবচেতন মনের এই কুসংস্কার চেতন মনে আবির্ভূত হয়। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে তিনটি উপায়ে অতিপ্রাকৃতের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। ইহাদের প্রথমটি হইল—Illusion এই শব্দটির যথার্থ প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় নাই, তবে, 'মায়া' 'বিভ্রান্তি' 'মরীচিকা' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ইহার অর্থ কতকটা প্রকাশ করা যায়। 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, Illusion শব্দটির যথার্থ মানে হইল তাহাই। একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি আরও একটু স্পষ্ট করা যাইতে পারে—

ধরুন আপনি কোন গ্রামদেশে বেড়াইতে গিয়াছেন। গ্রাম দেশে বলিবার অর্থ এই যে, গ্রামের আকাশে-বাতাসে ভূতের ছড়াছড়ি। তাই গ্রামদেশে ভূত দেখা যত সহজ, দীপালোকিত সহরে ততটা সহজ নয়। আপনি যে বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছেন সেই বাড়ীর উত্তর বা দক্ষিণ দিকে একটি কলার বাগান আছে, সেই বাগানের একটি কলাগাছের চারার নবোদ্‌গত সাদাটে পাতায় চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কোন কারণে অধিক রাত্রে আপনি বাহিরে গেলেন, আর আপনার দৃষ্টি পড়িল সেই কলার চারাটির উপর। মুহূর্তমধ্যে সেই কলার চারাটি একটি বিধবা রমণীর আকার ধারণ করিল; রমণীটি যেন মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া আস্তে আস্তে আপনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এত গভীর রাত্রে এমন স্থানে কোন রমণী থাকা সম্ভব নয়; সুতরাং এযে ভূতের কীর্তি সেই বিষয়ে আপনার আর কোন সন্দেহ রহিল না। এইভাবে ভূতের আকস্মিক আবির্ভাবে ভীত হইয়া আপনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে দেখা গেল—এইটি বিধবা রমণী নয়, নূতন কলাগাছের নূতন পাতার উপর চাঁদের আলো পড়ায় এইরূপ ভৌতিক পরিবেশের উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায়টির নাম হইল Hallucination ইহারও যথার্থ প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় নাই, তবে, 'দিবাস্বপ্ন' কথার দ্বারা ইহার মানে কতকটা প্রকাশ করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'মণিহারা' 'ক্ষুধিত-পাষাণ' গল্পের, বা সেক্সপিয়ারের 'ম্যাক্‌বেথ্' নাটকের ম্যাক্‌বেথের ভোজসভার উল্লেখ করা যাইতে পারে। Illusionএর সঙ্গে Hallucinationএর একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। Illusionএ যেমন কোন একটি বস্তুর মাধ্যমে অতিপ্রাকৃতের বিকাশ ঘটে Hallucinationএ তাহা হয় না। Illusion দেখিয়াছি—কলা গাছ বিধবা রমণীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু 'মণিহারা' গল্পে ফণিভূষণ মৃতা স্ত্রীর যে নূপুর-ঝংকার শুনিয়াছিলেন, 'ক্ষুধিত পাষাণে'এ নায়ক ইরাণীতরুণীর সে সঙ্গীত-সুধা পান করিয়া মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ম্যাক্‌বেথ্ ডান্‌কানের যে প্রেতাত্মা দেখিয়াছিলেন, তাহা বস্তু-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ, অন্য কোন বস্তু বা ধ্বনি তাহাদের নিকট এইরূপ রূপে বা ধ্বনিতে রূপায়িত বা ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। সুতরাং Hallucination হইল এইরূপ বায়বীয় পরিবেশে মানসিক চিন্তারূপের বিকাশ মাত্র।

তৃতীয় উপায়টি হইল—স্বপ্ন। ইহাও একপ্রকার Hallucination পার্থক্য হইল এই যে, স্বপ্ন দেখা হয় ঘুমন্ত অবস্থায়, আর Hallucination দেখা হয় জাগ্রত অবস্থায়। এই বিষয়ে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, স্বপ্ন দেখা হয় তরল নিদ্রা বা তন্দ্রাকালে; গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকা কালে আমরা কোন স্বপ্নই দেখিতে পাই না। তন্দ্রাকালে মনের অবস্থা অনেকটা 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে'র মতই। চেতন মনের তখন মাতাল অবস্থা; আর এই সুযোগে অবচেতন মনের ভাব একটি একটি করিয়া চেতন মনে আসিতে থাকে; এই জন্যই আমরা স্বপ্ন দেখিতে পাই। স্বপ্নের মধ্যেও তাই ভৌতিক মূর্তি দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে অনেককেই দেখা গিয়াছে।

এইবার আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে অতিপ্রাকৃতের স্বরূপ এবং এই অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ কি কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা একে একে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরাট পরিধির মধ্যে অতিপ্রাকৃতকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব না হইলেও, কষ্টকর। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অতিপ্রাকৃতের স্থান বহুবিস্তৃত না হইলেও, তাঁহার সাহিত্য জীবনের 'মাল্য হইতে' যে দু'একটা পাঁপড়ি অতি-

প্রাকৃতের আকারে ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক একটা মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছে। অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিকে রবীন্দ্রনাথের সেরা ছোটগল্প হিসাবে ধরিয়া লইলে বোধহয় ভুল করা হইবে না।

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে কয়েকটি ছোটগল্প ছাড়া আর কোথাও অতিপ্রাকৃত পরিবেশ তেমন দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। জীবন-স্মৃতিতে বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের বর্ণনা থাকিলেও, অতিপ্রাকৃত তথায় প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ অনুভূতি মাত্র। সুতরাং জীবন-স্মৃতির বর্ণনাগুলিকে অতিপ্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'মণিহারা', 'নিশীথে', 'জীবিত ও মৃত' এবং 'কংকাল'—এই কয়েকটি গল্পের মধ্যেই অতিপ্রাকৃত পরিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', ও 'নিশীথে' গল্পকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই তিনটি গল্পে অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। অতিপ্রাকৃত উদ্ভবের যে তিনটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করিয়াছি, সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখক মনস্তত্ত্বের নিয়ম কোথাও লঙ্ঘন করেন নাই।

প্রথমেই ধরা যাক্ ক্ষুধিত পাষাণের বিশ্লেষণ। গল্পের পটভূমিকাটি প্রথমেই বিচার্য। ইহার স্থান আজ হইতে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের মধ্য-ভাগে নির্জন পার্বত্য প্রদেশে নির্মিত একটি পরিত্যক্ত প্রমোদ-ভবন। এইরূপ স্থান নির্বাচনের একটা বিশেষ কারণ আছে। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, অতিপ্রাকৃত মূলতঃ সংস্কারের রসে পুষ্ট মানসিক আবেগের বহির্বিকাশ মাত্র। সেইজন্যই তাহার বিকাশের জন্য অন্ধকার স্থানেরই উপযোগিতা বেশী। সাধারণতঃ, কোন শ্মশান বা গোর-স্থান বা জনমানবহীন পতিত বাসস্থানেই ভূতের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ এইরূপ বহু প্রাচীন, পরিত্যক্ত একটি পরিবেশ বাছিয়া লইয়াছিলেন। ভূতের গল্পে ভয়েরই প্রাধান্য; কিন্তু গল্পটিতে ভয়ের সঙ্গে আছে একটা আকর্ষণ, আছে রোমাঞ্চ; ভূতের গল্পে থাকে বিভীষিকা, ইহাতে আছে অভিসারের আনন্দ—নায়ক মৃত্যুভয়ে ভীত নহেন, বরং অদৃশ্য-সুন্দরীর রূপসুধা পান করিবার জন্য অভিসার-গমনে আগ্রহশীল। তাই আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য একদা শত শত সুন্দরীর নূপুর নিক্কণে ঝংকৃত, মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতে তরঙ্গিত, আতর-গোলাপের গন্ধে আমোদিত একটা স্থান বাছিয়া লওয়ার প্রয়োজন ছিল। গল্পের নায়কটি অবিবাহিত। নায়ক অবিবাহিত না হইলে এইরূপ একটি নির্জন পরিত্যক্ত প্রাসাদে অদৃশ্য-সুন্দরীর রূপ-রস পান করিবার জন্য অভিসার-যাত্রা সম্ভব হইয়া উঠিত না। সর্বশেষে—প্রতিটি ঘটনার সময় হয় সন্ধ্যা, আর না হয় রাত্রি।

এই তো গেল মোটামুটি গল্পটির পটভূমিকা ও রচনা-কৌশল। এখন একটি একটি করিয়া ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া আমরা প্রমাণ করিব যে, রবীন্দ্রনাথ এই গল্প রচনায় অতিপ্রাকৃতের নিয়ম কোথাও লঙ্ঘন করেন নাই।

পরিবেশের সঙ্গে ভূতের একটা নিকট-আত্মীয়তা রহিয়াছে। এই উপযোগী পরিবেশের একটা ধারণা আমরা পূর্বেই দিয়াছি। এইজন্যই কোন শ্মশানের ধার দিয়া যাইবার সময় কোন কারণ না থাকিলেও যেমন ভৌতিক সত্তা উঁকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে, বরীচের এই নির্জন প্রাসাদ ও তাহার অতীত কাহিনী শুনিবার পর হইতে নায়কের মনে তেমনি একটি অশ্রুত নূপুরনিক্কণ বাজিয়া উঠিয়াছিল। মোগল আমলের ভোগবিলাসের ইতিহাস তাঁহার অজানা নয়; তাই এই নির্জন প্রাসাদটির একটি মনোরম চিত্র মনের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে বেশী দেরী হয় নাই। এইভাবে মনকে প্রস্তুত করিয়া যখন তিনি প্রাসাদে গিয়া আস্তানা গাড়িলেন, তখন হইতেই অতিপ্রাকৃত আস্তে আস্তে দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই দানা-বাঁধিয়া-ওঠার কাজে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল। কারণ, তথায় যাইতে না যাইতেই একটি সুন্দরী ভূতের আবির্ভাব অসম্ভব না হইলেও, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া তাহা স্বীকার্য হইতে পারে না। একটু উদ্ধৃতি দিয়া বক্তব্যটি সমর্থন করা যাইতে পারে—"কিন্তু সপ্তাহখানেক যাইতে না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশঃ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল।...বোধহয় এ বাড়িতে পদার্পণ মাত্রেই এ প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু আমি

যেদিন সচেতনভাবে প্রথম উহার সূত্রপাত অনুভব করি, সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

অতিপ্রাকৃতের প্রথম আবির্ভাবের মধ্যেও একটা বিশেষত্ব আছে। প্রাসাদ-সুন্দরীগণ যে তখন নায়কের মনে শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই, তাহা তাহাদের ক্ষীণ পদধ্বনিতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান। নায়ক শুস্তা নদীর বাঁধানো ঘাটে আরাম কেদারায় বসিয়া দেখিল—শুস্তার 'বালুতট 'অপরাহ্নের রঙীণ আভায় রঞ্জিত হইয়া' একটা মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, কোথাও বাতাসের নামগন্ধ নাই, 'নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী, পুঁদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।' নায়ক ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু পিছন ফিরিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পরে এই পদশব্দ এক হইতে বহুতে রূপান্তরিত হইল, মনে হইল—যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া শুস্তার জলে নামিতেছে আর "স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়সিঞ্জিত বাহু-বিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে।"

বলা বাহুল্য, এই অতিপ্রাকৃত পরিবেশটি অত্যন্ত ক্ষীণ, শুধু ধ্বনিতেই ইহার পরিসমাপ্তি, মনের বাহিরে ক্ষীণ ধ্বনিরূপ ছাড়া আর কোন রূপ প্রতিফলিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাকে এক শ্রেণীর Hallucination বা দিবাস্বপ্ন বলা যাইতে পারে। নায়কের অন্তরে এক সপ্তাহ ধরিয়া যে অতীত কাহিনী রূপায়িত হইয়া উঠিতে-ছিল, শুস্তার অনুকূল পরিবেশের সহায়তায় তাহাই চেতন মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বনিরূপে প্রতিফলিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্য করিয়া দেখিবার বিষয় এই যে Hallucinationএ যে রূপের প্রতিফলন ঘটে, এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, হইয়াছে কেবল ধ্বনির প্রতিফলন, তাহাও আবার অতীব ক্ষীণ। ইহার কারণ এই যে, অতিপ্রাকৃত পরিবেশটি তখনও পর্যন্ত নায়কের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

দ্বিতীয় দিবসেও নায়ক আবার এইরূপ আর একটি পরিবেশের সম্মুখীন হইলেন; এ ক্ষেত্রেও কেবল ধ্বনি; তবে এই ধ্বনি পূর্বাপেক্ষা স্পষ্টতর। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই কী যেন একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে নায়ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেই প্রাসাদে। "দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম, অমনি মনে হইল, ঘরের মধ্যে যেন ভারী একটা বিপ্লব বাঁধিয়া গেল—যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকের দরজা-জানালা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পালাইল, তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহু দিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।...শুনিতে পাইলাম—ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও নূপুর-নিক্কণ, কখনও বা বৃহৎ তাম্র ঘণ্টায় প্রহর বাজার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক—আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।"

বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও এই নির্জন প্রাসাদের অতীত কাল্পনিক কাহিনী নায়কের মনে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে এবং চেতন মনকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাকেও দিবাস্বপ্ন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ইহার অন্য প্রকার একটা ব্যাখ্যাও হয়। ঘটনাটির স্থান হইল—সিঁড়ির উপরে বৃহৎ একটি হলঘর। এইরূপ ঘরে সামান্য একটু শব্দ হইলেই শব্দটি চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। এই প্রতিধ্বনিকে কেন্দ্র করিয়াও এইরূপ অতি-প্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্ট হইতে পারে। এই ব্যাখ্যাটি স্বীকার করিয়া লইলে ইহাকে Illusion বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, বাস্তবধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া এই পরিবেশের উদ্ভব ও বিস্তার ঘটিয়াছে।

সেই রাত্রেই নায়ক আবার আর একটি পরিবেশের সম্মুখীন হইলেন। এবার শুধু ধ্বনি নয়, রূপ, অনিশ্চিত হইতে নিশ্চিতের দিকে অগ্রগমন, ইঙ্গিত হইতে আকারে রূপান্তরণ। নায়কের চিন্তাধারা কতকগুলি ইঙ্গিতের উপাদানে একটি নিশ্চিত মূর্তি গড়িয়া তুলিল, আর সেই

মূর্তিরই আবির্ভাব ঘটিতে লাগিল আস্তে আস্তে। নায়কের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই মূর্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে—"আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই, তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিলনা। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তরবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপীর প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।"

নায়ক রাত্রে খাইয়া-দাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। সহসা তিনি শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলেন, কিন্তু ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। "তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। সে কোন কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরি খচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে···তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।··· আমি অত্যন্ত চুপি চুপি উঠিলাম।···নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে সংযত নিশ্বাসে সেই অদৃশ্য আহবা-রূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম তাহা আজ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না।···আমার মনে হইল··· আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগদাদের নির্বাপিত-দীপ সংকীর্ণ পথে কোন-এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি। অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা থমকি য় দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া, বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল। ভিতর হইতে একটি পারস্য গালিচা পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল।··জাফরাণ রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটিপরা দুইখানি সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল আসনের উপর অলস ভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের একপার্শ্বে একটি স্ফটিক পাত্রে কতকগুলি আপেল ন্যাশপাতি নারাঙ্গি এবং প্রচুর আঙ্গুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোট ছোট পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া উঠিল—তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজের উপর শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্পখাটের উপর ঘর্মাক্ত কলেবরে বসিয়া আছি—"

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঘটনাটি সমস্তই স্বপ্নদৃষ্ট। বলা বাহুল্য এক সপ্তাহ ধরিয়া নায়কের মনে যে আরব্য সুন্দরীর চিত্র গড়িয়া উঠিতেছিল, শুস্তার স্থির জলে যাহার বলয়-সিঞ্জিত শ্রবণে তিনি মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন, তাহার গঠন কার্য সমাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ আবেগের অভাবে জাগ্রত অবস্থায় তাহা চেতন মনে আবির্ভূত হইতে না পারিয়া স্বপ্নের মধ্যেই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। পরে এই কামনা রূপিণীই তাঁহার জাগ্রত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিবাস্বপ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গল্পের পরবর্তী অংশে দেখা যাইবে যে নায়ক স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্নের ঘূর্ণ্যাবর্তের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহার মানস সুন্দরী অন্তরের অন্ধকার হইতে বাহিরের আলোকের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে, স্বপ্নে যাহাকে দেখিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, জাগত অবস্থায় এখন তাহাকে দেখিতে পাইয়া উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছেন। নায়কের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে—"অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী-যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত।···এই স্বপ্নখণ্ডের আবর্তের মধ্যে ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভিজল শীকর মিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম।···সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতল রাজ্যে স্বপ্নের···মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।"

ইহার পর আরও কয়েকবার, প্রকৃতপক্ষে প্রতি

রাত্রেই নায়ককে এইরূপ একটি অতিপ্রাকৃত পরিবেশের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে একটা রাত্রির বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—"একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুইদিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরাণির ছায়া আসিয়া পড়িল—পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু তারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ কটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে উর্দ্ধাভিমুখে আবর্তিত করিয়া—মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল।"

ইহা কেবল একদিনেরই ঘটনা নয়, এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। ঘটনাটির স্বরূপ অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, লঘু পদধ্বনি ও ক্ষীণ বলয়-সিঞ্জিতে যাহার সূচনা হইয়াছিল, স্বপ্নের মধ্য দিয়া তাহারই বিকাশ ঘটিতে ঘটিতে শেষ পর্যন্ত Hallucinationএ আসিয়া চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

গল্পটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, গল্পের পটভূমিকা নায়কের অন্তরে ক্রিয়াশীল হইয়া যে কল্পিত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই অতিপ্রাকৃতের রূপে নায়কের চেতন মনে Illusion, Hillucination ও স্বপ্নের আকারে প্রতিফলিত হইয়াছে।

'নিশীথে' ও 'মণিহারা' গল্পে যে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ আছে, তাহা 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অতিপ্রাকৃত পরিবেশের মত এত জটিল ও বহুদূরপ্রসারী নয়।' 'নিশীথে' গল্পে একটি মানসিক ক্ষত বিবেকের তাড়নায় অতিপ্রাকৃতের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু যে তাঁহার প্রথমা পত্নীকে লইয়া সুখী ছিলেন না, গল্পটি পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ হইবার দুইটি যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। প্রথমতঃ, তাঁহার প্রথমা পত্নী দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ সতী-সাধ্বী এবং সুগৃহিণী হইলেও আধুনিক রুচিসম্পন্ন বিত্তশালী যুবক স্বামীর মনের খোরাক যোগাইবার মত শিক্ষা তাঁহার ছিল না। দক্ষিণাবাবুর একটু উক্তি উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টি বুঝিতে পারা যাইবে—"আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মত এমন সুগৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। আমার বয়স তখন বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপণায় আমার মন উঠিত না।"

এই অতৃপ্ত মন ও রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া বায়ুপরিবর্তনের জন্য এলাহাবাদে গেলে বায়ুর পরিবর্তন বিশেষ কিছু না হইলেও, দক্ষিণাবাবুর মনে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। রোগ সারিল না দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—, "যখন ব্যামো সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর একটা বিবাহ করো।" স্ত্রীর এই উক্তিটিকে দক্ষিণাবাবু বাহ্যতঃ না হইলেও, অন্তরে একটা মুক্তিপত্র রূপে গ্রহণ করিলেন। ছাড়পত্র লাভের পর হইতেই সুরু হইল তাঁহার গোপন অভিসার। স্বজাতি হারাণ ডাক্তারের সুরূপা সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত নানা কথার আলোচনা করিয়া বাড়ী ফিরিতে প্রায়ই দেরী হইতে লাগিল। তাঁহার স্ত্রী যে কিছুই বুঝিতে পারিতেন না, তাহা নয়, কিন্তু কোনদিন কোন প্রতিবাদ করেন নাই। এই নীরব উপেক্ষা অজ্ঞাতেই দক্ষিণাবাবুর মনে যে একটা ক্ষত গড়িয়া তুলিতেছিল, তাহার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটিল একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে। সেদিন তাঁহার স্ত্রীর রোগের যন্ত্রণাটা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় হারাণ ডাক্তারের কন্যা মনোরমা দক্ষিণাবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণাবাবু তখন স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, কেরোসিনের আলোটি ঘরের একপার্শ্বে রাখা হইয়াছে, 'এমন সময় মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন।' বাহিরে আলো না থাকায় তাহাকে ভাল করিয়া দেখা গেল না ; দক্ষিণাবাবুর স্ত্রী ভয় পাইয়া স্বামীকে দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে! ও কে! ও কে গো।" এই আকস্মিক আতঙ্কিত ধ্বনিটি দক্ষিণাবাবুর অবচেতন মনে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া একটা

ভীতি বা বিবেক দংশন রূপে জাগরূক হইয়া রহিল, যদিও তাহার প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছিল প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ও দ্বিতীয়বার বিবাহের পর হইতে।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দক্ষিণাবাবু কলিকাতায় ফিরিলে মনোরমার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে গিয়াই সর্বপ্রথম এই অতিপ্রাকৃতের বিকাশ ঘটে। একদিন মনোরমাকে লইয়া তিনি বরাহ-নগরের বাগান-বাড়ীতে বেড়াইতে গেলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ক্রমে ঝাউগাছের মাথার উপরে চাঁদ উঠিল, দক্ষিণাবাবু প্রিয়া-মিলনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, মনোরমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে কোনকালে ভুলিতে পারিব না।"

"কথাটা বলিবামাত্রই চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল কথাটা আর কাহাকেও বলিয়াছি।" অর্থাৎ তাঁহার প্রথমা স্ত্রীকেও তিনি একদিন এই বলিয়াই সম্বোধন করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তিনি যে স্বামীর কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই তাহা দক্ষিণাবাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই আজ যখন পুনরায় আর একজনকে ঠিক এই সম্ভাষণই জানাইলেন, তখন তাঁহার অবচেতন মনের লুক্কায়িত বিদ্রূপ চেতনমনের চিন্তাধারাকে ছাপাইয়া প্রতিফলিত হইয়া পড়িল। এইজন্যই কথাটি বলিবামাত্রই একটি মর্মভেদী বিদ্রূপ 'হা-হা-হা-হা' ধ্বনির রূপে আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল।

এই অতিপ্রাকৃত পরিবেশটিকে আমরা Illusion দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারি। এ ক্ষেত্রে বাহিরে একটা ধ্বনি বর্তমান ছিল; এই ধ্বনি হইল আকাশের উপর দিয়া উড্ডীয়মান একঝাঁক পাখীর পক্ষধ্বনি। পাখীদের এই পক্ষধ্বনিই দক্ষিণাবাবুর নিকট বিদ্রূপের হাসির আকারে প্রতিভাত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর হইতেই দক্ষিণাবাবুর অন্তরে একটা আলোড়ন সুরু হইল; অন্তরের অনুতাপ বহিরাগত অবাঞ্ছিত আগন্তুকের মতই প্রতিরাত্রে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তাঁহার 'মনে হইত, চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষ্যে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।'

উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া পদ্মায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। পদ্মা তখন দিগন্ত-বিস্তৃত ধু-ধু করা বালুচর বিস্তৃত করিয়া নিঃশব্দে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। একদিন এক জনমানবহীন বালুচরে বোট বাঁধা হইল; দক্ষিণাবাবু মনোরমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। ক্রমে সূর্য অস্ত গেল, শুক্ল-পক্ষের শুভ্র চন্দ্রালোক দিগন্ত প্রসারিত বালুচরে প্রতিফলিত হইয়া এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করিল। দক্ষিণাবাবু শিথিল-বসনা মনোরমাকে বাহুপাশে জড়াইয়া লইয়া তাহার চন্দ্রালোকোজ্জ্বল কপোলে একটি প্রণয়চিহ্ন আঁকিয়া দিলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জনমানবহীন বালুচরের মধ্যে 'কে তিনবার বলিয়া উঠিল—ওকে? ওকে? ওকে?' দক্ষিণা বাবু কাঁপিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন—এ ভূত নহে' 'চরবিহারী পাখির ডাক।' ভয় পাইয়া তিনি বোটে ফিরিলেন বটে, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলেন না, 'অন্ধকারে কে একজন আমার মশারীর কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ও কে? ও কে। ওকে গো?' ভয় পাইয়া তিনি আলো জ্বালাইলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ছায়া মূর্তি মিলাইয়া গেল, কিন্তু 'হা-হা—হাহা—হাহা রবের একটি বিদ্রূপের হাসি রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। আবার আলো নিবাইতেই পুনরায় সেই অব্যক্ত কণ্ঠস্বর তাঁহার কানের কাছে ধ্বনিত হইতে লাগিল—ওকে? 'ওকে? ওকে গো?'

পাঠক স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, চরের উপরে শ্রুত ধ্বনিটি Illusion বা misrepresentation, অর্থাৎ, বালুচরে মানুষের আকস্মিক আগমনে আতঙ্কিত জলচর পাখী উড়িয়া যাইবার সময় যে-শব্দ করিয়াছিল, দক্ষিণাবাবুর মনে তাহাই একটি ভৌতিকধ্বনির আকারে প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু বোটে গিয়া শুইবার পর যে ধ্বনি তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহা Hallucination। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহার প্রথমা পত্নী বিছানায়

শায়িত অবস্থায় একটি অঙ্গুলি নির্দেশে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন এখানে তাহারই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার রুগ্‌না স্ত্রীর শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি মনোরমার দিকে তুলিয়া 'ওকে! ওকে! ওকে গো!' বলিবার চিত্রটি তাঁহার অন্তরে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; অনুকূল পরিবেশের সহায়তায় তাহাই এইবার তাঁহার চেতনমনকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। চেতনমনে ভীতি-প্রাবল্য থাকায় অবচেতন মনের এই প্রতিফলন দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিয়াছিল।

'মণিহারা' গল্পের অতিপ্রাকৃত পরিবেশটি আরও একটু সরলতর। বাংলার পল্লীগ্রামে 'নিশির ডাক' নামে একটা কথা আছে; 'মণিহারা' গল্পটি সেই 'নিশির ডাক-এরই চিত্ররূপ। 'নিশির ডাক' কথাটী অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের রসে পুষ্ট হইলেও, বাস্তব ঘটনাতেই তাহার জন্ম। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন লোক স্বপ্নের ঘোরে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় এবং রাস্তায় গিয়া ঘুম ভাঙ্গিলে পর নিজের ভুল বুঝিতে পারে। কোন ভৌতিক সত্তার আকর্ষণে এইরূপ ঘটনা ঘটে বলিয়া গ্রামদেশে একটা বিশ্বাস আছে। 'মণিহারা' গল্পে এইরূপ একটা অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসকেই রূপায়িত করা হইয়াছে।

মনের কোন গভীর বাসনা রূঢ় বাস্তবের প্রত্যক্ষ পরিবেশের মধ্যে সফল হইতে না পারিয়া অনেক সময় অবচেতন মনে প্রবেশ করে এবং তথায় নিজের সংগঠন কার্য শেষ করিয়া ঘুমন্ত থাকাকালে চেতনমনে আবির্ভূত হয়। ফণিভূষণ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে দেখিতে পাইলেন না, বা তাহার কোন সন্ধানও পাইলেন না, তখন হইতে তাহাকে ফিরিয়া পাইবার, তাহার অন্তর্ধানের কাহিনী জানিবার একটা গভীর আকুতি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কোন চিহ্ন না রাখিয়া যে গোপনে সরিয়া গিয়া চিরতরে হারাইয়া গিয়াছে, কোন্ ছিন্নপক্ষ জটায়ু তাহার সন্ধান দিবে? বাস্তব জগৎ হইতে ফণিভূষণ তাই কোন সাড়া পাইলেন না। কিন্তু সন্ধান তো করিতেই হইবে; তাই চেতন মনের ব্যর্থ বাসনা অবচেতন মনে প্রবেশ করিল সেই অজ্ঞাত কাহিনী রচনা করিবার জন্য।

সর্বপ্রকার চেষ্টার পরেও যখন মণিমালিকার কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা, ফণিভূষণ তখন নিরাশ হইয়া তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। শয়ন গৃহটি মণিমালিকা নিজের হাতে যে-ভাবে সাজাইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই আছে, একটি জিনিষও ওলট-পালট হয়নি, সমগ্র শয়ন গৃহটি তাহার 'শেষমুহূর্তের' নির্বাক্ সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। ফণিভূষণ একটু উন্মুক্ত বাতায়নে বসিলেন, তাঁহার চিত্তর জুড়িয়া একটা গভীর আকুতি আলোড়িত হইতে লাগিল, এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো; তোমার জিনিষগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করেনা, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন, তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারিদিকের এই-সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড় সামগ্রীর দিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো—এই-সকল মূক প্রাণহীন জড় পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।"

চিন্তা করিতে করিতে ফণিভূষণ সেইখানেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে হইল—একটা ঠক্‌ঠক্ শব্দের সঙ্গে গহনার ঝম্-ঝম্ শব্দ নদীর ঘাট হইতে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। বাহিরের নিরন্ধ্র অন্ধকারে কাহাকে দেখা না গেলেও 'পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিছুই দেখা গেল না।...শব্দটা ক্রমে ঘাটের সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।' পরে বাড়ীর সম্মুখে থামিল। দেউড়ি বন্ধ থাকায় 'রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ শব্দ করিয়া ঘা পাড়িতে লাগিল।... ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিলেন না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন! দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দেখিতে পাইলেন তিনি নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছেন।'

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—স্বপ্ন দেখা হয় তন্দ্রাকালে। মনের তখন 'না-ঘুম, না জাগরণ' অবস্থা। চেতনমন তখন

একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে না বলিয়াই এই অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় রাত্রে ফণিভূষণ ঘুমাইবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া জানালাটায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সেদিন ইচ্ছা করিয়াই তিনি দেউড়ি খোলা রাখিয়াছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি শুনিতে পাইলেন—গত দিনের সেই শব্দটিই নদীর ঘাট হইতে উঠিয়া ক্রমে ক্রমে দেউড়ি পার হইল, "অন্দরমহলের গোল সিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিতে লাগিল এবং শয়ন ঘরের সামনে আসিয়াই থামিয়া গেল। ফণিভূষণ আর থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—মণি। কিন্তু নিজের চীৎকারে জাগিয়া উঠিয়া ফণিভূষণ কপালে করাঘাত করিলেন।'

তৃতীয় রাত্রেও এই একই ঘটনার পুনরুক্তি হইল। ঘুমের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফণিভূষণ সেদিন উপবাস করিয়া রহিলেন, কিন্তু তবু কখন নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। পূর্বরাত্রির মতই বলয়সিঞ্জিত ঘাটের সোপান হইতে উঠিয়া দেউড়ি পার হইয়া গোল সিঁড়ি বাহিয়া আসিয়া শয়ন গৃহের সম্মুখে কিছুক্ষণ থামিল, পরে শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘরের সমস্ত জিনিষের কাছে একবার করিয়া থামিয়া শব্দটি ফণিভূষণের কাছে আসিল। ফণিভূষণ চোখ খুলিয়া দেখিলেন—'ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কংকাল দাঁড়াইয়া। সেই কংকালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।...তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব,...আঠারো বৎসর পূর্বে ফণিভূষণ শুভদৃষ্টিতে' যে চোখ দেখিয়াছিলেন, এ যেন সেই চোখ। কংকাল নীরব অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিল। 'ফণিভূষণ মূঢ়ের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল,...ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন' এবং ক্রমে ক্রমে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কঙ্কাল এক-পা এক-পা করিয়া নদীর জলে নামিতে লাগিল, ফণিভূষণও তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'জলস্পর্শ করিবামাত্রই ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।'

বলা বাহুল্য, এই কল্পিত কঙ্কাল, ফণিভূষণ ভূষণের প্রিয় মৃতা স্ত্রী মণিমালার। বাস্তবের দিবালোকে এই মূর্তি দেখা অসম্ভব বলিয়াই স্বপ্নের মধ্যে তাহার বিকাশ ঘটিয়াছে।

'জীবিত ও মৃত' গল্পটিকে অতিপ্রাকৃত বলা সঙ্গত নয়। কারণ, যে কাদম্বিনীকে কেন্দ্র করিয়া একটি অতিপ্রাকৃত পরিবেশ গড়িয়া তোলা হইয়াছে, সে অতিপ্রাকৃত নয়, বাস্তব জগতের জীবন্ত মানুষ। মানুষের মনের কু-সংস্কার বা ভৌতিক ভীতি কী অনর্থ ঘটাইতে পারে, এই গল্পের মধ্য দিয়া তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কাদম্বিনী মরিয়া গিয়াছে বলিয়াই সকলের ধারণা; সুতরাং, রক্তমাংসের দেহ লইয়া তাহার পুনরাবির্ভাব অসম্ভব। কিন্তু সত্য সত্যই যখন তাহার পুনরাবির্ভাব ঘটিল, তখন তাহাকে ভূত ছাড়া আর কিছু মনে করা সম্ভব নয়। কাদম্বিনী প্রাণপণ চেষ্টা করিল নিজেকে জীবিত প্রমাণ করিবার। সংস্কার এমনই ভাব যে, প্রাণান্তেও তাহার বিলুপ্তি ঘটিতে চায় না। শেষ পর্যন্ত কাদম্বিনী যখন মরিয়া প্রমাণ করিল যে, সে ইতিপূর্বে মরে নাই, তখনও সংস্কার দূর হইয়াছিল কিনা বলা কঠিন।

'কংকাল' গল্পটি অতিপ্রাকৃতের কাঠামোতে পরিবেশন করা হইলেও, অতিপ্রাকৃতের নিয়ম দিয়া উহার ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। কাহিনীটি অতি সামান্য। বক্তা ছাত্রজীবনে একটি নরকংকালের সাহায্যে অস্থিবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, তবে কালক্রমে কংকালটি সেই ঘর হইতে লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বক্তার মন হইতেও যে তাহার স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বক্তা আমাদিগকে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ বক্তাকে সেই কংকালের ঘরেই এক রাত্রে শয়ন করিতে হইয়াছিল। কংকালটির বাহিরের অস্তিত্ব লোপ পাইলেও বক্তার অবচেতন মনে যে তাহার স্মৃতি তখনও অমর হইয়াছিল, সেই রাত্রেই তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে স্মৃতি ছিল বলিয়াই রাত্রে শয়ন করা মাত্রই তাঁহার সারা অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ভীতি-প্রাবল্য বশত

কিছুতেই ঘুম আসিল না। একটা মনস্তাত্ত্বিক সত্য এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে চেতনমনের বিচার-ক্ষমতা কমিয়া যায়, আর সেই সুযোগে অবচেতন মনের আবেগ চেতন মনে রাজ্য-বিস্তার করিয়া বসে। 'কংকাল' গল্পে বক্তার মানসিক অবস্থাও তাই। বাল্যে কংকালের যে স্মৃতি তাঁহার অবচেতন মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে তাহাই আজ অতিপ্রাকৃতের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু, এ ক্ষেত্রে একটা বক্তব্য আছে; বক্তব্যটা হইল এই যে, অতিপ্রাকৃতের দায়িত্ব এত দীর্ঘ হইতে পারে কিনা। দুপুর রাত্রে তাহার সূচনা এবং ভোরের আলো প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অবসান। এই দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরিয়া একটা ভৌতিক পরিবেশ টিকিয়া থাকা কতকটা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 'নিশীথে' গল্পের শেষভাগেও এইরূপ একটা দীর্ঘস্থায়ী ভৌতিক পরিবেশ আছে। পদ্মার উপরে বোটের মধ্যে শয়নকালে দক্ষিণাচরণবাবু ও ঠিক এইরূপ একটি পরিবেশের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তথায় আলো জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূতের অন্তর্ধান আছে। কিন্তু কংকাল গল্পে যেরূপ একটানা ছয় ঘণ্টা কাহিনী চলিয়াছে, 'নিশীথে' গল্পে ঠিক সেইরূপ নয়।

অধিকন্তু বক্তা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন নাই, তাই স্বপ্ন দিয়া ইহার ব্যাখ্যা করা চলে না। Illusion এর নিয়মও এখানে প্রযোজ্য নয়। বাকী রহিল Hallu-cination এর কথা। Hallucination এরূপ পরিবেশে সম্ভব হইলেও, তাহার স্থায়িত্ব এত দীর্ঘ হইতে পারে না। তবে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইলে যে Delirium, যে প্রলাপ উপস্থিত হয়, তাহাকে এক শ্রেণীর Hallucination বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বক্তার বাহ্য চেতনা একেবারেই থাকে না। আলোচ্য গল্পে বক্তার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইলেও, বাহ্য চেতনা লোপ হয় নাই। সুতরাং, ইহাকে প্রলাপ বলাও সঙ্গত নয়।

সুতরাং, উপসংহারে আমরা গল্পটিকে অতিপ্রাকৃতের পরিবেশে সজ্জিত একটি কল্পিত কাহিনী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কংকালের আবির্ভাবের যে চিত্র এই গল্পে আছে, তাহা বক্তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র।

ছুটির স্তোত্র

দেবপ্রসাদ রায়

কঠিন কাজের দিন গেছে ঢের, আজ হবে খোসগল্প
সময়-কৃপণ আত্মীয়জন বহু আছে, ছুটি অল্প।
আজকে দূর হোক অতি প্রীতশোক শাস্ত্রের মুখবন্ধ
দেখো না হাওয়ায় করে হায় হায় হাসনুহানার গন্ধ?

আজকের মত হৃদয়ের ক্ষত করেছি বাক্সবন্দী
আজ রূপ ধরে কাজের কবরে প্রাণের বয়ঃসন্ধি
হিসাবের দিন জমিয়েছে ঋণ কত তার মানসাঙ্ক
ভুলে যাওয়া ভাল, নাহ'লে যে আলো ছড়াতে
থাকবে সাংখ্য!

দুচোখে অশ্রু দেখেই শ্মশ্রু দুলিয়ে অনেক বিজ্ঞে
দেবে অবিরাম নয়নাভিরাম জ্ঞান এই অনভিজ্ঞে
সেই সব জ্ঞান মৃত্যু সমান তার থেকে এই সন্ধ্যা,
বাগানে ফোটাক আরও একঝাঁক শুভ্র রজনীগন্ধা।

গদাধর

শ্রীকালীপদ পাল

লোকটাকে প্রায়ই দেখি শেয়ালদায়।

ট্রাম থেকে নেমে ট্রেন ধরবার জন্যে যখন ছুটোছুটি সুরু হয়, তখনই মেইন ষ্টেশানের সামনে খোলা চত্বরটায় দাঁড়িয়ে সে হাঁকে—বাবু, নেন না আমার থেইক্যা একটা দাঁতের মাজন; ঘরের তৈরী। নিমের মাজন। দাঁতের পোকা মরবে—মাড়ী শক্ত হবে; মুখের দুর্গন্ধ যাবে। নেন না বাবুরা। আমার মত একজন রিফ্যুজীকে দয়া করেন; মাত্তর দু আনা পয়সা—দশদিন মাজা চলবে।

কত লোকের কাছে আবেদন জানায় লোকটা। হাজার হাজার মানুষের পদধ্বনিতে মুখরিত, অসংখ্য ট্রাম বাস ট্রেনের আর ট্যাক্সি প্রাইভেটের আগমনে নন্দিত শিয়ালদহের বুকে এতটুকু কথা শুনবার সময় বুঝি কারো নেই। কেউ শোনেনা; যে যার পথে চলে। এক মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় যে কারো নেই! সময়ের কাঁটা চলছে নিখুঁত ভাবে। কাউকে সাহায্য করবার জন্যে সে থমকে দাঁড়াচ্ছেনা বা কাউকে অপ্রস্তুত করবার জন্যে তাড়াহুড়ো করেও চলছে না।

চলমান জগৎটা চলছে। তার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলছে কত মানুষ। যারা পারছেনা, তারাই পদে পদে আঘাত খাচ্ছে। খেয়েছিলো এই গদাধর দাসও। সে আঘাত চরম। একটা জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের সময় একটু পদস্খলন হলে যা হয়। গদাধর হয়েছিলো গৃহচ্যুত, বাস্তুচ্যুত। তারপর রেলে, ষ্টীমারে, প্লাটফরমে জীবন কাটছে। ওই যে ফুটপাথের ওপর ছোট্ট কার্ডবোর্ডের টুকরো দিয়ে এস্কিমোদের মত ঘর তৈরী করেছে সে, সেখানে যে তার, জন্যে অপেক্ষা করে আছে তার স্ত্রী আর সংসারের পোষ্য পাচছ'টি প্রাণী। তাইত গধাধরকে বেরোতে হয়েছে ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খড়িমাটি আর দু চারটে জিনিষ মিশিয়ে তৈরী করেছে সে অপূর্ব এই মাজনটি। ব্যবসার জন্যে নয়—বাঁচবার জন্যে। নিতান্ত দাবী মেটাবার জন্যে। সকালথেকে সন্ধ্যে অবধি যতগুলো ট্রেন আসে, তার প্যাসেঞ্জারগুলো এখান দিয়ে আসে যায়। শিয়ালদহের এই আঙিনা দিয়ে। এত দৃশ্যপটে ভূষিত এই শিয়ালদহ; তবু তো একে দেখবার জন্যে কেউ থামেনা। সবাই যাচ্ছে।

গদাধরও থামেনা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সে ছুটোছুটী ক'রে বেড়ায়। লোকের পেছনে পেছনে ছোটে সে। মাথার ওপর তপ্ত আকাশ; নীচে তপ্ত বালুকার মত বাঁধানো তাতানো চত্বরটা। হুঁসকরে মাঝে মাঝে চলন্ত গাড়ির পায়তারা। গদাধর আমারো সামনে পড়েছে অনেকদিন। আমি এড়িয়ে গেছি ওকে। একদিন দুপুরের খর রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে ট্রেনের দিকে ছুটছিলাম। গদাধর আমার সামনে আড় হয়ে দাঁড়ালো।

বুঝলাম ওকি বলবে। ওকে কিছু বলবার সুযোগ দিলাম দাঁড়িয়ে থেকে। বলতে লাগলো গদাধর, বাবু, সারাদিন কিছু খাইনি; ছেলেমেয়েরাও কিছু খায়নি। দুটো মাজন কিনুন তবেই আমার চলবে।

পকেট হাতড়ে কয়েক আনা পয়সা বের করলাম। ওর হাতে দিয়ে বললাম, নাও।

ও গোটা দুই মাজন আমার হাতে তুলে দিতে যায়।

বাধা দিয়ে বলি, গদাধর, মাজন দিয়ে কি হবে? মাজন তো আমার রয়েছে। ওটা বরং তুমি রেখে দাও। আর কারো কাছে বেচো। গম্ভীর হয়ে ওঠে গদাধরের মুখটা। একটা ম্লান ছায়া পড়ে সেখানে। ও মুখে না বললেও আমি তো বুঝতে পারি—ও কি বলতে

বৃদ্ধি পায়। রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা কি অনুপাতে বর্দ্ধিত হয় নিম্ন প্রদত্ত তালিকা হ'তে তা অনেকটা বোঝা যাবে :—

সাল	রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা
১৯৪৭-৪৮	২৭৬৬
১৯৫০-৫১	৩৯৮৭
১৯৫২-৫৩	৪৯০৯
১৯৫৪-৫৫	৬৬৫৯
১৯৫৬-৫৭	৮৫৬৩
১৯৫৭-৫৮	১০০৪৫
১৯৫৮-৫৯	১০২২৮

যদিও রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বিগত দশ বছরে আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি সরকারী ট্রেড ইউনিয়ন করণাধ্যক্ষের (Registrar of tred unions) নিকট বৃহৎ সংখ্যক ইউনিয়ন বাৎসরিক রিটার্ন দাখিলে বিরত থাকে। ১৯৫৮-৫৯ সালে মাত্র ৬০৪০টি ইউনিয়ন রিটার্ন দাখিল করে। এর পূর্ব্ববর্ত্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৫৭-৫ সালে রিটার্ন দাখিলকারী ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৬৫২০ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ছিল ৪৩৯৯। রিটার্ন দাখিলকারী ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা গত কয়েক বছরে কি ভাবে বর্দ্ধিত হয়েছে নিম্নতালিকা হ'তে সে সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যাবে।

সাল	সদস্য সংখ্যা
১৯৪৭—৪৮	১৬.৬৩ লক্ষ
১৯৫০—৫১	১৭.৫৭ "
১৯৫২—৫৩	২০.৯০ "
১৯৫৪—৫৫	২১.৭০ "
১৯৫৬—৫৭	২৩.৭৭ "
১৯৫৭—৫৮	৩০.১৫ "
১৯৫—৫৮৯	৩৬.৪৫ "

স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক হ'লেও আশানুরূপ উন্নত হতে পারে নি। কারণ :

ক) মেহনতী মানুষের মাত্র এক ভগ্নাংশ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির অন্তর্গত। এখনও বহু শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের আওতার বাহিরে।

খ) এদেশের কতকগুলি শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন উন্নত ধরনের, কতকগুলি শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন খুব উন্নত না হ'লেও সন্তোষজনক বলা যেতে পারে। কিন্তু এমন অনেক ইউনিয়ন আছে যেগুলি নামে মাত্রই ট্রেড ইউনিয়ন কিন্তু সংগঠনী শক্তি বলতে কিছুই নেই। এই প্রসঙ্গে কণ্ট্রাক্ট লেবার (Contract labour), কৃষি-কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মচারী (Agricultural workers), গার্হস্থ্য কর্ম্মচারী (Domestic servants প্রভৃতি এলাকার ট্রেড ইউনিয়নের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ) বৃহৎ এবং উন্নতশিল্পে অতি সুসংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিও দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রকাশ করে থাকে। বহু ট্রেড ইউনিয়নই রিটার্ণ দাখিল করে না অথবা যথাসময়ে রিটার্ণ পাঠাতে পারে না।

ঘ) যদিও শহরতলী এবং গ্রামের শিল্পাঞ্চলেও আধুনিক কালের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে তথাপি ট্রেড ইউনিয়নের কার্য্য-কলাপ বড় বড় শহরাঞ্চলেই বিশেষভাবে কেন্দ্রস্থ। এর ফলে শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হচ্ছে না।

ঙ) একই শিল্পে একাধিক ইউনিয়নের অস্তিত্বও দেখা দিচ্ছে। ফলে এক ইউনিয়নের সঙ্গে অন্য ইউ-নিয়নের অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা এবং বৈরীভাব ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে।

চ) শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতার এবং উৎসাহের অভাবে আভ্যন্তরীন নেতৃত্ব গঠনের অনু-কূল অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সেইজন্য ট্রেড ইউ ইউনিয়নগুলি প্রকৃত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের পরিবর্ত্তে বহিরা-গত রাজনৈতিক ব্যক্তিগণের নেতৃত্বেই পরিচালিত হচ্ছে। ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অধিকাংশ সময়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যে এখনও আশানুরূপ উন্নত পর্য্যায়ে এসে পৌছায়নি উপরোক্ত গলদগুলি হতে তা স্পষ্টই অনুমেয়। অর্থের এবং সুদক্ষ কর্ম্মীর অভাব হেতুও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখন শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক দিক অপেক্ষা রাজ-

গদাধর

শ্রীকালীপদ পাল

লোকটাকে প্রায়ই দেখি শেয়ালদায়।

ট্রাম থেকে নেমে ট্রেন ধরবার জন্যে যখন ছুটোছুটি সুরু হয়, তখনই মেইন ষ্টেশানের সামনে খোলা চত্বরটায় দাঁড়িয়ে সে হাঁকে—বাবু, নেন না আমার থেইক্যা একটা দাঁতের মাজন; ঘরের তৈরী। নিমের মাজন। দাঁতের পোকা মরবে—মাড়ী শক্ত হবে; মুখের দুর্গন্ধ যাবে। নেন না বাবুরা। আমার মত একজন রিফুজীকে দয়া করেন; মাত্তর দু আনা পয়সা—দশদিন মাজা চলবে।

কত লোকের কাছে আবেদন জানায় লোকটা। হাজার হাজার মানুষের পদধ্বনিতে মুখরিত, অসংখ্য ট্রাম বাস ট্রেনের আর ট্যাক্সি প্রাইভেটের আগমনে নন্দিত শিয়ালদহের বুকে এতটুকু কথা শুনবার সময় বুঝি কারো নেই। কেউ শোনেনা; যে যার পথে চলে। এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করবার সময় যে কারো নেই! সময়ের কাঁটা চলছে নিখুঁত ভাবে। কাউকে সাহায্য করবার জন্যে সে থমকে দাঁড়াচ্ছেনা বা কাউকে অপ্রস্তুত করবার জন্যে তাড়াহুড়ো করেও চলছে না।

চলমান জগৎটা চলছে। তার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলছে কত মানুষ। যারা পারছেনা, তারাই পদে পদে আঘাত খাচ্ছে। খেয়েছিলো এই গদাধর দাসও। সে আঘাত চরম। একটা জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের সময় একটু পদস্খলন হলে যা হয়। গদাধর হয়েছিলো গৃহচ্যুত, বাস্তু-চ্যুত। তারপর রেলে, ষ্টীমারে, প্লাটফরমে জীবন কাটছে। ওই যে ফুটপাথের ওপর ছোট্ট কার্ডবোর্ডের টুকরো দিয়ে এস্কিমোদের মত ঘর তৈরী করেছে সে, সেখানে যে তার, জন্যে অপেক্ষা করে আছে তার স্ত্রী আর সংসারের পোষ্য পাচছ'টি প্রাণী। তাইত গধাধরকে বেরোতে হয়েছে ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খড়িমাটি আর দু চারটে জিনিষ মিশিয়ে তৈরী করেছে সে অপূব এই মাজনটি। ব্যবসার জন্যে নয়—বাঁচবার জন্যে। নিতান্ত দাবী মেটাবার জন্যে। সকালথেকে সন্ধ্যে অবধি যতগুলো ট্রেন আসে, তার প্যাসেঞ্জারগুলো এখান দিয়ে আসে যায়। শিয়ালদহের এই আঙিনা দিয়ে। এত দৃশ্য পটে ভূষিত এই শিয়ালদহ; তবু তো একে দেখবার জন্যে কেউ থামেনা। সবাই যাচ্ছে।

গদাধরও থামেনা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সে ছুটোছুটী ক'রে বেড়ায়। লোকের পেছনে পেছনে ছোটে সে। মাথার ওপর তপ্ত আকাশ; নীচে তপ্ত বালুকার মত বাঁধানো তাতানো চত্বরটা। হুঁসকরে মাঝে মাঝে চলন্ত গাড়ির পায়তারা। গদাধর আমারো সামনে পড়েছে অনেকদিন। আমি এড়িয়ে গেছি ওকে। একদিন দুপুরের খর রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে ট্রেনের দিকে ছুটছিলাম। গদাধর আমার সামনে আড় হয়ে দাঁড়ালো।

বুঝলাম ওকি বলবে। ওকে কিছু বলবার সুযোগ দিলাম দাঁড়িয়ে থেকে। বলতে লাগলো গদাধর, বাবু, সারাদিন কিছু খাইনি; ছেলেমেয়েরাও কিছু খায়নি। দুটো মাজন কিনুন তবেই আমার চলবে।

পকেট হাতড়ে কয়েক আনা পয়সা বের করলাম। ওর হাতে দিয়ে বললাম, নাও।

ও গোটা দুই মাজন আমার হাতে তুলে দিতে যায়।

বাধা দিয়ে বলি, গদাধর, মাজন দিয়ে কি হবে? মাজন তো আমার রয়েছে। ওটা বরং তুমি রেখে দাও। আর কারো কাছে বেচো। গম্ভীর হয়ে ওঠে গদাধরের মুখটা। একটা ম্লান ছায়া পড়ে সেখানে। ও মুখে না বললেও আমি তো বুঝতে পারি—ও কি বলতে

বৃদ্ধি পায়। রেজিষ্টার্ডড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা কি অনুপাতে বর্দ্ধিত হয় নিম্ন প্রদত্ত তালিকা হ'তে তা অনেকটা বোঝা যাবে :—

সাল	রেজিষ্টার্ডড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা
১৯৪৭-৪৮	২৬৬৬
১৯৫০-৫১	৩৯৮৭
১৯৫২-৫৩	৪৯০৯
১৯৫৪-৫৫	৬৬৩৯
১৯৫৬-৫৭	৮১৬৩
১৯৫৭-৫৮	১০০৪৫
১৯৫৮-৫৯	১০২২৮

যদিও রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বিগত দশ বছরে আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি সরকারী ট্রেড ইউনিয়ন করণাধ্যক্ষের (Registrar of tred unions) নিকট বৃহৎ সংখ্যক ইউনিয়ন বাৎসরিক রিটার্ন দাখিলে বিরত থাকে। ১৯৫৮-৫৯ সালে মাত্র ৬০৪০টি ইউনিয়ন রিটার্ন দাখিল করে। এর পূর্ব্ববর্ত্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৫০-৫ সালে রিটার্ন দাখিলকারী ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৫৫২০ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ছিল ৪৩৯৯। রিটার্ন দাখিলকারী ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা গত কয়েক বছরে কি ভাবে বর্দ্ধিত হয়েছে নিম্নতালিকা হ'তে সে সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যাবে।

সাল	সদস্য সংখ্যা
১৯৪৭—৪৮	১৬ ৬৩ লক্ষ
১৯৫০—৫১	১৮'৫ ”
১৯৫২—৫৩	২০'৯০ ”
১৯৫৪—৫৫	২১'৭০ ”
১৯৫৬—৫৭	২৩'৭৭ ”
১৯৫৭—৫৮	৩০'১৫ ”
১৯৫—৫৮৯	৩৬'৪৫ ”

স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক হ'লেও আশানুরূপ উন্নত হতে পারে নি। কারণ :

ক) মেহনতী মানুষের মত্র এক ভগ্নাংশ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির অন্তর্গত। এখনও বহু শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের আওতার বাহিরে।

খ) এদেশের কতকগুলি শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন উন্নত ধরনের, কতকগুলি শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন খুব উন্নত না হ'লেও সন্তোষজনক বলা যেতে পারে। কিন্তু এমন অনেক ইউনিয়ন আছে যেগুলি নামে মাত্রই ট্রেড ইউনিয়ন কিন্তু সংগঠনী শক্তি বলতে কিছুই নেই। এই প্রসঙ্গে কণ্ট্রাক্ট লেবার (Contract labour), কৃষি-কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মচারী (Agricultural workers), গার্হস্থ্য কর্ম্মচারী (Domestic servants প্রভৃতি এলাকার ট্রেড ইউনিয়নের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ) বৃহৎ এবং উন্নতশিল্পে অতি সুসংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিও দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রকাশ করে থাকে। বহু ট্রেড ইউনিয়নই রিটার্ণ দাখিল করে না অথবা যথাসময়ে রিটার্ণ পাঠাতে পারে না।

ঘ) যদিও শহরতলী এবং গ্রামের শিল্পাঞ্চলেও আধুনিক কালের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে তথাপি ট্রেড ইউনিয়নের কার্য্যকলাপ বড় বড় শহরাঞ্চলেই বিশেষভাবে কেন্দ্রস্থ। এর ফলে শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হচ্ছে না।

ঙ) একই শিল্পে একাধিক ইউনিয়নের অস্তিত্বও দেখা দিয়েছে। ফলে এক ইউনিয়নের সঙ্গে অন্য ইউনিয়নের অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা এবং বৈরীভাব ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে।

চ) শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতার এবং উৎসাহের অভাবে আভ্যন্তরীন নেতৃত্ব গঠনের অনুকূল অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সেইজন্য ট্রেড ইউ ইউনিয়নগুলি প্রকৃত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের পরিবর্ত্তে বহিরাগত রাজনৈতিক ব্যক্তিগণের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অধিকাংশ সময়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যে এখনও আশানুরূপ উন্নত পর্য্যায়ে এসে পৌঁছায়নি উপরোক্ত গলদগুলি হতে তা স্পষ্টই অনুমেয়। অর্থের এবং সুদক্ষ কর্ম্মীর অভাব হেতুও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখন শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক দিক অপেক্ষা রাজ-

নৈতিক দিকেই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সেইজন্য শ্রমিকগণ পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে অতি অল্প সচেতন। প্রায়ই দেখা যায় ষোল আনা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বড় বড় বুলির আর ভাবধারার মুখোস এঁটে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের চোখে নিজেদের শ্রদ্ধাস্পদ করে তুলতে চায়। অথচ শ্রমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং বিভিন্ন প্রকার শ্রমিক কল্যাণকর কর্ম্ম অনুষ্ঠানে তাঁরা আগ্রহী নন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের (যাঁদের মধ্যে অধিকাংশ বহিরাগত) এবং সাধারণ কর্ম্মচারীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ না থাকায় শ্রমিকগণ ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে উদাসীন। নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আহূত সভা এবং শোভাযাত্রায় অতি অল্প সংখ্যক সভ্যই অংশ গ্রহণ করে। ফলে শিল্পে যখন শান্তি থাকে তখন সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসে।

আই, এন, টি, ইউ, সি, (INTUC) এ, আই, টি, ইউ, সি, (AITUC) এইচ, এম, এস (HMS) এবং ইউ, টি, ইউ, সি, (UTUS) নামে ভারতবর্ষে যে চারিটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আছে সেগুলির সঙ্গে বহু ইউনিয়ন তাঁদের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক আদর্শ ও আনুগত্য অনুসারে সংযুক্ত। অবশ্য এমন বহু ইউনিয়নও আছে যেগুলি এই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন চারিটির কোনটির সঙ্গেই যুক্ত নয়। এই ধরণের একক বিচ্ছিন্ন ইউনিয়নগুলির জন্য নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার জন্য এই ধরণের ইউনিয়নগুলি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্তৃক সম্পাদিত কোন চুক্তিই মেনে নিতে চায় না। সেইজন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে এই সমস্ত ইউনিয়নের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এর ফলে সমস্যা সমাধানের কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক অথবা অন্য প্রকারে বিবাদ বিসম্বাদ দূরীভূত হয়ে টেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের যাতে উন্নতি হয় সেই জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা চলে। অবশেষে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি চুক্তির মাধ্যমে কতকগুলি মৌলিক নীতি চারিটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নীতিগুলি এইরূপ :—

ক) প্রত্যেক কর্ম্মচারী তার ইচ্ছামত যে কোন ইউনিয়নের সভ্য হতে পারবে। এ সম্বন্ধে কোন রকম জোর-জুলুম চলবে না।

খ) কোন কর্ম্মচারী একই সময়ে একাধিক ইউনিয়নের সভ্য হতে পারবে না।

গ) শ্রমিকগণের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা ইত্যাদির প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

ঘ) ইউনিয়নের কাজকর্ম্ম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করবার পূর্ণ অধিকার থাকবে।

ঙ) নিয়মিতভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইউনিয়নের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন করতে হবে।

চ) শ্রমিকগণের অজ্ঞতাকে কোনরূপ স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করা চলবে না।

ছ) আন্তঃ ইউনিয়ন সম্বন্ধে হিংসা, পীড়ন, ভীতি অথবা ব্যক্তিগত বিবাদমূলক হওয়া চলবে না।

নিঃসন্দেহে এই উপসংহারে পৌছান যায় যে উল্লিখিত নীতিগুলি সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহযোগিতার অভাব হেতু গৃহীত নীতি গুলির মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। যদিও নীতিগুলি সদুদ্দেশ্যমূলক তথাপি ওগুলি গলদ বিহীন নয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন চতুষ্টয় কর্তৃক গৃহীত আচরণ বিধি (Code of conduct) গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগে যুক্ত অথবা বিযুক্ত বহু ইউনিয়নই নিজেদের সুবিধামত নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই সকল ইউনিয়নের নিকট আচরণ বিধির মূল্য খুবই কম। প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নগুলির মধ্যে বৈরী ভাব কমিয়ে এনে তাদের মধ্যে সখ্য এবং শান্তি স্থাপনেও নীতিগুলি ব্যর্থ হয়েছে। বহিরাগত নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রমিক শোষণও এই নীতিগুলির দ্বারা বন্ধ হয়নি। নীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় গলদ এই যে যারা এই নীতিগুলির রচয়িতা এবং গ্রহীতা তারা যদি এগুলি অমান্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন মত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার কোন বিধান নীতিগুলির মধ্যে নেই। ফলে প্রকৃত উক্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা অসংশ্লিষ্ট ছোট বড় ইউনিয়ন-

এবং গবেষণামূলক কাজের সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। এদেশে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ইউনিয়নগুলি সমষ্টিগত লাভের এবং শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কাজেই প্রধানতঃ লিপ্ত।

উপরোক্ত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুসৃত নীতি পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে বর্ত্তমান যুগে ঐ সকল দেশের শ্রমিকগণ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে দেশের স্বার্থকে পৃথক করে দেখে না। তারা "যুদ্ধং দেহি" মনোভাব ক্রমশঃ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আইনের সাহায্যে অথবা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন আলোচনা পরিচালনা করে। যখন শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অথবা আইনানুগ পন্থায় তারা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে অসমর্থ হয় শুধু তখনই তাদের সংগ্রামের পথে নেমে আসতে বাধ্য হ'তে হয়।

বহু পাশ্চাত্ত্য দেশের মত এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিকে যদি এককেন্দ্রিক করে তুলতে হয় তাহলে সর্ব্বপ্রথম যে জিনিষটির বিশেষ প্রয়োজন সেটি হল একটি আন্তঃ ইউনিয়ন আচরণ বিধিকে (Inter Union Code of Conduct) সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা। এই আন্ত-ইউনিয়ন আচরণ বিধি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'লে ট্রেড ইউনিয়ন এলাকায় বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে বৈরিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রচলিত আচরণ বিধিগুলির সঙ্গে আর একটি ধারা যুক্ত করা উচিত। এই ধারার [ক] ট্রেড ইউনিয়নে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হ'বে। খ) আচরণ বিধি অমান্যকারী ইউনিয়ন এবং ইউনিয়নের কর্ম্ম কর্ত্তাদের বিপক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথার উল্লেখযোগ্য থাকবে। গ) যে কোন একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে প্রতিটি ইউনিয়নকে অবশ্যই সংযুক্ত হতে বলে নির্দ্দেশ দিতে হবে।

কেবলমাত্র আচরণ বিধি গৃহীত হলেই শিল্পের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। এদেশে ট্রেড ইউনিয়নের মান উন্নত করতে হলে এবং দেশের শিল্পায়ণে ট্রেড ইউ-নিয়নের মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে যতদূর সম্ভব কঠোরতার সঙ্গে আচরণ বিধি পালিত হওয়া উচিত।

ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বভার বহিরাগত নেতৃবৃন্দের পরিবর্ত্তে প্রকৃত কর্ম্মরত শ্রমিকগণের উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগিক জ্ঞানের সাহায্যে শ্রমিকগণ নিজেদের সমস্যার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম এবং সমস্যা সমাধানের পথ নির্দ্ধারণে সমর্থ। সেইজন্য বহিরাগত নেতার পরিবর্ত্তে কর্ম্মচারীদের ভেতর থেকেই যদি উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর নেতৃত্বভার অর্পিত হয় তাহলে রাজনৈতিক দলের প্রভুত্ব থেকে ট্রেড ইউনিয়ন মুক্তি পাবে এবং ট্রেড ইউনিয়নের কার্য্যাবলী অধিকতর সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হবে। যতদিন শ্রমিকগণের ভেতর থেকে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া না যায় তত দিন অবশ্য বহিরাগত নেতৃত্বের সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তথাপি ট্রেড ইউনিয়নের এলাকায় বহিরাগত নেতৃত্বের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থাগুলির অবলম্বনে বহিরাগত নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করা যেতে পারে:—

ক) কোন ইউনিয়নের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে ঐ সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার একের চার অংশের অধিক বহিরাগত সদস্য থাকতে পারবে না। এইরূপ বহিরাগত সদস্যের নূন্যতম সংখ্যা দুজনের কম হবে না।

খ) তিনটির অধিক ইউনিয়নে কোন বহিরাগত ব্যক্তি একই সময়ে সদস্য থাকতে পারবে না।

গ) বিশ্বাসভঙ্গ এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগের জন্য বহিরাগত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার ক্ষমতা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিকে গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন নেতা ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইনের বিধান লঙ্ঘন অথবা ষোড়শ ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে গৃহীত আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দোষে দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে অন্ততঃ তিন বছর তিনি কোন ট্রেড ইউনিয়নের কোন পদে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

ঘ) বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য দোষী সাব্যস্ত অথবা ইউ-নিয়নের সদস্যদের স্বার্থ বিরোধী কর্ম্মে লিপ্ত এমন কোন বহিরাগত নেতাকে ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করবার পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা ইউনিয়নের সাধারণ সভ্যদেরও দিতে হবে।

নৈতিক দিকেই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সেইজন্য শ্রমিকগণ পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে অতি অল্প সচেতন। প্রায়ই দেখা যায় ষোল আনা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বড় বড় বুলির আর ভাবধারার মুখোস এঁটে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের চোখে নিজেদের শ্রদ্ধাস্পদ করে তুলতে চায়। অথচ শ্রমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং বিভিন্ন প্রকার শ্রমিক কল্যাণকর কর্ম্ম অনুষ্ঠানে তাঁরা আগ্রহী নন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের (যাঁদের মধ্যে অধিকাংশ বহিরাগত) এবং সাধারণ কর্ম্মচারীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ না থাকায় শ্রমিকগণ ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে উদাসীন। নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আহূত সভা এবং শোভাযাত্রায় অতি অল্প সংখ্যক সভ্যই অংশ গ্রহণ করে। ফলে শিল্পে যখন শান্তি থাকে তখন সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসে।

আই, এন, টি, ইউ, সি, (INTUC) এ, আই, টি, ইউ, সি, (AITUC) এইচ, এম, এস (HMS) এবং ইউ, টি, ইউ, সি, (UTUS) নামে ভারতবর্ষে যে চারিটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আছে সেগুলির সঙ্গে বহু ইউনিয়ন তাঁদের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক আদর্শ ও আনুগত্য অনুসারে সংযুক্ত। অবশ্য এমন বহু ইউনিয়নও আছে যেগুলি এই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন চারিটির কোনটির সঙ্গেই যুক্ত নয়। এই ধরণের একক বিচ্ছিন্ন ইউনিয়নগুলির জন্য নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার জন্য এই ধরণের ইউনিয়নগুলি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্তৃক সম্পাদিত কোন চুক্তিই মেনে নিতে চায় না। সেইজন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে এই সমস্ত ইউনিয়নের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এর ফলে সমস্যা সমাধানের কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক অথবা অন্য প্রকারে বিবাদ বিসম্বাদ দূরীভূত হয়ে টেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের যাতে উন্নতি হয় সেই জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা চলে। অবশেষে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি চুক্তির মাধ্যমে কতকগুলি মৌলিক নীতি চারিটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নীতিগুলি এইরূপ :—

ক) প্রত্যেক কর্ম্মচারী তার ইচ্ছামত যে কোন ইউনিয়নের সভ্য হতে পারবে। এ সম্বন্ধে কোন রকম জোর জুলুম চলবে না।

খ) কোন কর্ম্মচারী একই সময়ে একাধিক ইউনিয়নের সভ্য হতে পারবে না।

গ) শ্রমিকগণের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা ইত্যাদির প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

ঘ) ইউনিয়নের কাজকর্ম্ম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করবার পূর্ণ অধিকার থাকবে।

ঙ) নিয়মিতভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইউনিয়নের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন করতে হবে।

চ) শ্রমিকগণের অজ্ঞতাকে কোনরূপ স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করা চলবে না।

ছ) আন্তঃ ইউনিয়ন সম্বন্ধে হিংসা, পীড়ন, ভীতি অথবা ব্যক্তিগত বিবাদমূলক হওয়া চলবে না।

নিঃসন্দেহে এই উপসংহারে পৌছান যায় যে উল্লিখিত নীতিগুলি সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহযোগিতার অভাব হেতু গৃহীত নীতি গুলির মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। যদিও নীতিগুলি সদুদ্দেশ্যমূলক তথাপি ওগুলি গলদ বিহীন নয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন চতুষ্টয় কর্তৃক গৃহীত আচরণ বিধি (Code of conduct) গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগে যুক্ত অথবা বিযুক্ত বহু ইউনিয়নই নিজেদের সুবিধামত নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই সকল ইউনিয়নের নিকট আচরণ বিধির মূল্য খুবই কম। প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নগুলির মধ্যে বৈরী ভাব কমিয়ে এনে তাদের মধ্যে সখ্য এবং শান্তি স্থাপনেও নীতিগুলি ব্যর্থ হয়েছে। বহিরাগত নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রমিক শোষণও এই নীতিগুলির দ্বারা বন্ধ হয়নি। নীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় গলদ এই যে যারা এই নীতিগুলির রচয়িতা এবং গ্রহীতা তারা যদি এগুলি অমান্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন মত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার কোন বিধান নীতিগুলির মধ্যে নেই। ফলে প্রকৃত উক্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা অসংশ্লিষ্ট ছোট বড় ইউনিয়ন-

এবং গবেষণামূলক কাজের" সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। এদেশে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ইউনিয়নগুলি সমষ্টিগত লাভের এবং শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কাজেই প্রধানতঃ লিপ্ত।

উপরোক্ত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুসৃত নীতি পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে বর্ত্তমান যুগে ঐ সকল দেশের শ্রমিকগণ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে দেশের স্বার্থকে পৃথক করে দেখে না। তারা "যুদ্ধং দেহি" মনোভাব ক্রমশঃ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আইনের সাহায্যে অথবা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন আলোচনা পরিচালনা করে। যখন শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অথবা আইনানুগ পন্থায় তারা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে অসমর্থ হয় শুধু তখনই তাদের সংগ্রামের পথে নেমে আসতে বাধ্য হ'তে হয়।

বহু পাশ্চাত্ত্য দেশের মত এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিকে যদি এককেন্দ্রিক করে তুলতে হয় তাহলে সর্ব্বপ্রথম যে জিনিষটির বিশেষ প্রয়োজন সেটি হল একটি আন্তঃ ইউনিয়ন আচরণ বিধিকে (Inter Union Code of Conduct) সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা। এই আন্ত-ইউনিয়ন আচরণ বিধি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'লে ট্রেড ইউনিয়ন এলাকায় বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে বৈরিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রচলিত আচরণ বিধিগুলির সঙ্গে আর একটি ধারা যুক্ত করা উচিত। এই ধারার [ক] ট্রেড ইউনিয়নে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হ'বে। খ) আচরণ বিধি অমান্যকারী ইউনিয়ন এবং ইউনিয়নের কর্ম্ম কর্ত্তাদের বিপক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথার উল্লেখযোগ্য থাকবে। গ) যে কোন একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে প্রতিটি ইউনিয়নকে অবশ্যই সংযুক্ত হতে বলে নির্দ্দেশ দিতে হবে।

কেবলমাত্র আচরণ বিধি গৃহীত হলেই শিল্পের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। এদেশে ট্রেড ইউনিয়নের মান উন্নত করতে হলে এবং দেশের শিল্পায়ণে ট্রেড ইউ-নিয়নের মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে যতদূর সম্ভব কঠোরতার সঙ্গে আচরণ বিধি পালিত হওয়া উচিত।

ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বভার বহিরাগত নেতৃবৃন্দের পরিবর্ত্তে প্রকৃত কর্ম্মরত শ্রমিকগণের উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগিক জ্ঞানের সাহায্যে শ্রমিকগণ নিজেদের সমস্যার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম এবং সমস্যা সমাধানের পথ নির্দ্ধারণে সমর্থ। সেইজন্য বহিরাগত নেতার পরিবর্ত্তে কর্ম্মচারীদের ভেতর থেকেই যদি উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর নেতৃত্বভার অর্পিত হয় তাহলে রাজনৈতিক দলের প্রভুত্ব থেকে ট্রেড ইউনিয়ন মুক্তি পাবে এবং ট্রেড ইউনিয়নের কার্য্যাবলী অধিকতর সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হবে। যতদিন শ্রমিকগণের ভেতর থেকে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া না যায় তত দিন অবশ্য বহিরাগত নেতৃত্বের সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তথাপি ট্রেড ইউনিয়নের এলাকায় বহিরাগত নেতৃত্বের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থাগুলির অবলম্বনে বহিরাগত নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করা যেতে পারে :—

ক) কোন ইউনিয়নের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে ঐ সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার একের চার অংশের অধিক বহিরাগত সদস্য থাকতে পারবে না। এইরূপ বহিরাগত সদস্যের নূন্যতম সংখ্যা দুজনের কম হবে না।

খ) তিনটির অধিক ইউনিয়নে কোন বহিরাগত ব্যক্তি একই সময়ে সদস্য থাকতে পারবে না।

গ) বিশ্বাসভঙ্গ এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগের জন্য বহিরাগত নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার ক্ষমতা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিকে গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন নেতা ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইনের বিধান লঙ্ঘন অথবা ষোড়শ ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে গৃহীত আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দোষে দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে অন্ততঃ তিন বছর তিনি কোন ট্রেড ইউনিয়নের কোন পদে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

ঘ) বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য দোষী সাব্যস্ত অথবা ইউ-নিয়নের সদস্যদের স্বার্থ বিরোধী কর্ম্মে লিপ্ত এমন কোন বহিরাগত নেতাকে ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করবার পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা ইউনিয়নের সাধারণ সভ্যদেরও দিতে হবে।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এই শ্লেষের পরিণাম বড় বিষম দাঁড়াইল। কিছু দিন পরে বাগবাজারে রাজবল্লভপাড়ায় ৺যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একটী নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হয়। হোগলকুড়িয়ার প্রিয়মাধব বসুমল্লিক (শোভাবাজারের রাজবাড়ীর অভিনেতা) ইহার শিক্ষক। যদুবাবু নিজেও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর এক জন অভিনেতা। এই দলে "রত্নাবলী" ও একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহসন প্রিয়বাবুর লিখিত। প্রিয়বাবু এক জন সুকবি ছিলেন, ভাস্কর ও প্রভাকরের কবিতাযুদ্ধে ইহার অনেক কবিতা থাকিত, এতদ্ভিন্ন যাত্রার পালা বাঁধিয়া দেওয়া, হাফ্‌আখড়াইএর গান বাঁধা প্রভৃতি কার্য্যে তিনি পটু ছিলেন ও সর্ব্বদা তাহাতে লিপ্ত থাকিতেন। ১২৭৪ সালের শেষাংশে এই অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে (রাজা) সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ে প্রহসনের মধ্যে দুইটী গান ছিল,—

"আমি থিয়েটারের হিষ্ট্রী।
গ্রীণ চস্‌মা নাকে-দিয়ে গো,
দেখি গ্রীণরুমের মিষ্ট্রি ॥
রাঙ্গা রাঙ্গা ছেলে গুলি সখি সাজে সব
করে নারীর মতন রব
তাদের আকার দেখ্‌লে আক্কেল গুড়ুম
ইচ্ছে হয় কিস্ করি।

*　　　*　　　*

জয়খুড়োর বাড়ীতে মাঝে হল একটা ধূম,
শুনি হয়নি রেতে ঘুম,
এল রাজার বাড়ীর বুড়ো হনূ
ইন্দ্রনীলের সাজ পরি।
দুকাণ কাটা বিদূষক সে লাড়েলি সরকার,
ডিস্‌ব্যাণ্ডেড্ মদনিকা কলি অবতার,
এই পাঁচ পেচোতে পোঁয়র পেলে
বল একবার হরি হরি ॥
ও তোর কেলো ভুলোর * * মুলো
জয়রামে জ্বলে মরি ॥
পাণের খিলির দোকানেতে হল একটা এক্‌ট
বল্‌ছি তারই ফ্যাক্‌ট
হল যুগীর পোলা দময়ন্তী
এমন থিয়েটারে গড় করি ॥

"কিছু কিছু বুঝি"র গানের উত্তর দিতে গিয়া প্রিয়মাধবমল্লিক এই গানে বিশেষ কিছু বলেন নাই, বরং ভোলানাথ বাবুর গানে যে গালি ছিল না, এখানে সেই গালি—অতি অসভ্য গালি প্রবেশ করিয়াছে।

"গ্রীণরুমের মিষ্ট্রী"—অবশ্য গ্রীণরুমের (সাজঘরের) ভিতর অভিনেতাদিগের মদের জটলার কথা।

"রাঙ্গা রাঙ্গা ছেলেগুলি"—ছেলেগুলির মাথা থাওয়ার কথা বলিলে ক্ষতি হইত না, কিন্তু "তাদের আকার" দেখিয়া "কিস্ করিবার" ইচ্ছা অভদ্রোচিত অসহ্য কুরুচি মাত্র।

"জয় খুড়োর বাড়ীতে"—এই সময় ৺জয়রাম মিত্রের বাটীর পদ্মাবতীর অভিনয়।

"এল রাজার বাড়ীর বুড়ো হনূ" - শোভাবাজার রাজবাড়ীর অভিনেতা জীবনকৃষ্ণ দেবের প্রতি গালি। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এই পদ্মাবতীতে ইন্দ্রনীলের অংশ লইয়া ছিলেন।

"রাজার বাড়ীর বিদূষক"—শোভাবাজার রাজবাড়ীতে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়ে—ধনদাসের অংশ মণিমোহন সরকার অভিনয় করেন। প্রথমতঃ এই অভিনয় প্যারী মোহন দাসের করিবার কথা হইয়াছিল, তিনি কাঁশারীপাড়ার দলে যোগদান করায় মণিবাবু অভিনয় করেন। মণিবাবুর প্রথমে "মদনিকা" অভিনয়ের কথা ছিল। এই ঘটনার উল্লেখে এই গানে ডিস্ব্যাণ্ডেড্ মদনিকা বলা হইয়াছে।

"ও তোর কেলো ভুলোর মূলো"—ইহা অতি অশ্লীল কুৎসিত রসিকতা। ভুলো - ভোলানাথবাবু।

"পানের খিলির দোকানেতে"—বাগবাজারের নলদময়ন্তী অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য। এই দলে শেষে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে কম্বুলিয়াটোলানিবাসী যুগীদের একটী বালক দময়ন্তীর অংশ অভিনয় করিত।

এই প্রহসনে প্রিয়বাবুর আরও দুইটী গান ছিল,—

১। ওরে হায়রে দেশের থিয়েটার।
আগে পদ্মফুলের মতন তোমার শোভা ছিল
চমৎকার।
কয়লাহাটায় নয়লা হাটায় হল তোমার ঠাঁই,
কি ছিলে কি হলে তুমি মনে ভাবি তাই,
পড়ে হাড়হাভাতে ভুলোর হাতে
গেলে তুমি ছারখার॥

২। ভ্যালা ভ্যালা ভ্যালা মোর বাপরে।
তুই গোঁড়ার দলে কপনি পরিস,
আপনি কলির কাপ্‌রে
রাজার বাড়ী বুঝলে কি না,
ও তার বুঝিস্ কাঁচকলা, ও তোর জাঁয় না...
গুণ বলা,
কিছু কিছু বুঝি বলে, লাগ্‌লো তোর হাপরে॥

এ গানটিও কেবল গালাগালি। কেহ কেহ বলেন, এই গালাগালি শুনিয়া শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সত্য নহে। এরূপ গুণপনাহীন গালাগালিপূর্ণ গানে রাজা সার শৌরীন্দ্রের ন্যায় রসজ্ঞ লোকের তৃপ্তি হইতে পারে না। বাগবাজারের এই রত্নাবলীর অভিনয়ে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেন। শ্রীরাধামাধব করের একতান-বাদন-সম্প্রদায় বাজাইয়াছিল।

এই সময়ে জয়রাম বসাকের বাড়ীতে 'ভ্যালারে মোর বাপ্" প্রহসন অভিনীত হয়।

এই সময়ে বহুবাজারে একটী নাট্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুর "সতী" নাটক ও "রামাভিষেক" নাটক অভিনয় করেন।

বাঙ্গালা নাটকের এই আর এক যুগ। ইহার প্রথম যুগে "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" ও "শকুন্তলা"; দ্বিতীয় যুগে "পদ্মাবতী" এবং তৃতীয় যুগে "রামাভিষেক" নাটকের অভিনয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। রামাভিষেক নাটকের অভিনয় কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগে সে সময়ে অনেক স্থলে হইয়াছিল। এমন কি দক্ষিণাংশে এইখানি নাট্যামোদীদের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি এইজন্য ইহাকে "বর্ণপরিচয়নাটক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

যাহাহউক বাগবাজারের রত্নাবলীর দল ভাঙ্গিয়া গেলে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধামাধব কর আবার বাজনার দল লইয়া পড়িলেন, কিন্তু তখন তাঁহাদের আমোদের ক্ষুধা আর বাজনায় মিটিতেছিল না। সহরের সর্ব্বত্র বাগবাজারের বাজনার দলের সুখ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহা পুরাতন বোধ হইতে লাগিল।

আমোদের নূতনত্ব না হইলে আর তৃপ্তি হইতেছিল না ও ভাল লাগিতেছিল না। এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবু নিজে একটা থিয়েটারের দল বসাইবার পরামর্শ করিলেন। বাগবাজার হরলাল মিত্রের গলিতে (মুখুয্যেপাড়ায়) শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র হালদারের বাড়ীতে প্রথমে দল বসিল। নগেন্দ্রনাথের বাজনার দলের কেহ কেহ এই দলে যোগ দিলেন। ইঁহার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে নাট্যাভিনয়ে কৃতকর্ম্মা তখন এক নগেন্দ্রনাথ নিজে, আর তাঁহার বাল্যবন্ধু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এবং ধর্ম্মদাস সুর। নগেন্দ্রনাথ কয়লাহাটার থিয়েটারে এই দুই বন্ধুর কৃতিত্ব ও যশ দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষকতার প্রশংসা তখনই মাইকেলের ন্যায় ব্যক্তিবর্গের মুখে ধরিত না, সুতরাং নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকেই শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কয়লাহাটার দল দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ আরও বুঝিয়া আসিয়াছিলেন যে বিশেষ কোন ধনীর আশ্রয় না পাইলেও, তাঁহারা আপনারা চেষ্টা করিয়া একটা থিয়েটারের দল চালাইতে পারিবেন এই ভরসায় তিনি নিজের বাজনার দল হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া দল বসাইলেন। ধর্ম্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপাল বিশ্বাস, ঈশানচন্দ্র নিয়োগী, অরুণচন্দ্র হালদার, মহেন্দ্রনাথ দাস, নগেন্দ্রনাথ পাল, নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলে যোগ দিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী তখন অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় নগেন্দ্রবাবুর আগ্রহ স্বত্বেও আশাপূর্ণ হইল না, তিনি যোগ দিতে পারিলেন না। শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ নগেন্দ্রনাথের আর একজন বাল্যবন্ধু। গিরীশবাবুই ইঁহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিদ্বান্ বলিয়া নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকেও এই দলে আহ্বান করিলেন। নাট্যশালার সহিত গিরীশবাবুর সম্বন্ধ এইরূপে প্রথম স্থাপিত হয়। নগেন্দ্রবাবুর যতটা আশা ও সাহস ছিল কার্য্যে নামিয়া ততটা ফল পাইলেন না অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবের নিকট তেমন সাহায্য পাইলেন না, কাজেই যে সকল নাটকে রাজা রাণী ইত্যাদি সাজিবার প্রয়োজন, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয় মিলিবেনা বলিয়া সে সকল নাটক পরিত্যক্ত হইল। শেষে গিরীশবাবুর পরামর্শে দীনবন্ধু বাবুর নবপ্রকাশিত **"সধবার একাদশী" অভিনয় করা স্থির হইল।** নগেন্দ্রবাবুও কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি, তিনিই প্রথমে শিক্ষাভার লইলেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা গিরীশবাবুর স্কন্ধেই পড়িল। গিরীশবাবুর নির্ব্বাচনে এইরূপ পাত্র বিভক্ত হইল,—

নিমচাঁদ	গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
অটল	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
নকুড়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কাঞ্চন	শ্রীরাধামাধব কর।
জীবনচন্দ্র	ঈশানচন্দ্র নিয়োগী।
কেনারাম	শ্রীঅরুণচন্দ্র হালদার।
রামমাণিক্য	নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়।
কুমুদিনী	আপালচন্দ্র বিশ্বাস।
সৌদামিনী	মহেন্দ্রনাথ দাস।
নটী	নগেন্দ্রনাথ পাল।

দীনবন্ধু বাবুর লেখায় নট নটী লইয়া একটা প্রস্তাবনা ছিল না। তখনকার প্রথার উপর নির্ভর করিয়া গিরীশবাবু নট নটি দিয়া একটা প্রস্তাবনা লিখিয়া দেন। ক্রমে শিক্ষা চলিতে লাগিল। ১২৭৫ সালের আষাঢ় বা শ্রাবণ (১৮৬৮ জুন বা জুলাই) মাসের একদিন ইঁহারা পুরা নাটক খানির আখড়াই দিবেন স্থির করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর সহিত নগেন্দ্রবাবুর দেখা হয়। তিনি মহা আনন্দে ও আগ্রহে তাঁহাকে আখড়াই দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। যথা সময়ে আখড়াই আরম্ভ হইল। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে বৈঠকখানার হলে একা অর্দ্ধেন্দু বাবু দর্শক বা শ্রোতা, আর তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ছোটঘরের দরজার সম্মুখে অভিনেতারা উপস্থিত হইয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যথাকালে অভিনয় শেষ হইল। গিরীশ বাবু আসিয়া অর্দ্ধেন্দু বাবুকে দোষগুণ বিচার করিতে বলিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু বলেন—অটল, নিমচাঁদ বেশ হয়েছে, আর কিছু ভাল হয় নাই, জীবনচন্দ্র একবারে খারাপ হয়েছে। ইহাতে অনেকেরই মতের মিল হইল। নগেন্দ্র বাবু ও গিরীশ বাবু মহা আগ্রহে অর্দ্ধেন্দু বাবুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেজন্য একরূপ প্রস্তুতই ছিলেন। প্রস্তাব হইবামাত্র তিনি সম্মত হইলেন। নগেন্দ্র বাবু

অর্দ্ধেন্দু বাবুকে শিক্ষাভার লইতে বলিলেন, তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং কয়টির অংশ বদলাইয়া দিলেন। রামমাণিক্যের অভিনেতা নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বিক্রমপুরবাসী হইলেও নাটকের ভাব বিকাশ করিতে পারিতেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবু এই রামমাণিক্যের অংশ রাধামাধব করকে এবং কাঞ্চনের অংশ নন্দলাল ঘোষকে, কুমুদিনীর অংশ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়কে ("কাপ্তেন বেল" নামে ইনি উত্তরকালে পরিচিত হন) এবং নিজে কেনারামের অংশ লইলেন।

এই সময়ে আখড়াইএর আড্ডা অরুণবাবুর বাড়ী হইতে উঠিয়া ২৮নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীটে যায় এবং কিছু দিন পরে সেখান হইতে ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে নগেন্দ্রবাবুর বাটিতে যায়। এই সময়ে শিক্ষাদানকার্য্যটা গিরীশবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবুর মধ্যে ভাগাভাগী হইয়া চলিতে লাগিল। উভয়েই শিক্ষা দেন। গিরীশবাবু তখন এট্‌কিন্সন্ টিল্‌টনের বাড়ীতে নিজ শ্যালক ব্রজনাথ দেবের অধীনে কার্য্য করিতেন। তাঁহার অবসর অল্প ছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবুই প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাদাতা ছিলেন, তিনি আখড়ায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন এবং যখন যাহাকে পাইতেন, তখনই তাহাকে শিক্ষা দিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু ১৩০৭ সালের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"আমি আমার বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে প্রত্যেক অভিনেতাকে অভিনয়ের ধরণধারণ, ভাব ভঙ্গী, চলা ফেরা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সূক্ষ্মভাবে শেখাতে লাগলেম। যা দেখেছিলেম, তাতে এই গুলোরই বেশী অভাব ছিল।"—ক্রমে দল বেশ মার্জ্জিত ও শিক্ষিত হইয়া উঠিল। ১২৭৫ সালের আশ্বিন [১৮৬৮।অক্টোবর] মাসে পূজার সময় সপ্তমী পূজার দিন রাত্রিতে মুখুয্যে পাড়ায় গোপাল নিয়োগীর গলিতে ৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে এই দলের প্রথম অভিনয়ের নিমন্ত্রণ হয়। এই সময় এই দলের নাম The Bagbazar Amateur Theatre রাখা হয়।

[ক্রমশঃ

বক-ধার্ম্মিক

অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য

এখন তোমায়
বিষাক্ত ধুতুরা ফুল অথবা সায়ানাইডের
শাস্তি কামনার মত ধার্মিক বক মনে হয়। মনের রাতের
প্রত্যেক সুড়ঙ্গে কীট, খুঁড়ে খুঁড়ে মানুষ পাড়ায়
আতঙ্ক করেছ সৃষ্টি। তুমি কি কেবলি ছবি,
শুধু পটে লিখা, অথবা তুলির রক্তে জাল করা সভ্যতার
টীকা—
নির্জীব ফানুসে শেষ, আর সব করুণ বাস্তব,
রাস্তায় মিছিল করা জরাজীর্ণ আদর্শের শব ?

তোমার জিহ্বায় স্বর্গ। তা'র নীচে লেলিহান ক্ষুধা
(আহা যদি রুটি হ'ত সমস্ত বসুধা!)
প্রলুব্ধ রাক্ষসের মত পিশাচ স্বরূপে
ব্যক্ত হয়, মাঝে মাঝে। ব্যর্থ হ'লে অজ্ঞতার কূপে

ঝাঁপ দিয়ে হও চোখ, উৎসাহী মানুষের মত
দরদ ফোয়ারার জলে পৃথিবীর ক্ষত
ঢেকে দিতে প্রত্যেক মানুষকে আহ্বান করো।
সে' মিথ্যার ভিত থরো থরো

প্রহরে প্রহরে কাঁপে, যা'র কাঁচে
তোমার চেহারা
স্পষ্টতম হয়। যা'রা
হাজার বছর ধরে নানা রূপে তোমার আসল
মাটির পায়ের গন্ধ, বুকের গরল

সব কিছু হিসাবে রেখেছে, তা'দের চোখে কি
এখনো সুন্দর তুমি ? কাল এই রূপ থাকবে কি,
নকল পাউডারে গড়া ? তিক্ত এক বীর্য্যহীনতার
আস্বাদে কঠিন হবে রাজপথ জীবনযাত্রার।

আমারই মঙ্গল হ'ল। অপাত্রের মুখোশ আকাশ
শুভক্ষণে ছিঁড়ে গেল। নেফায় সমাহিত হ'ল
ভুলে-গড়া মৈত্রীর লাশ।

পদ্মার সংসার

শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল

সেদিন সকালে সিক্ত-বসনে স্নানের ঘর থেকে বাহির হইয়া রাসমণি যখন দেখিলেন যে—উনান হুহুশব্দে—পাচিকারও দেখা নাই—তাহারও সর্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল—চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—ওরে সুমতি! তোদের নিয়ে আর যে পারিনা! চায়ের কেটলীটাও উনানে চাপাতে পারিস নি? দশমবর্ষীয়া কন্যা ভয়ে ভয়ে উপর হইতে নামিয়া আসিল—তার পিছনে আর এক কিশোরীও অতি সঙ্কুচিত ভাবে আসিল! রাসমণি—কে তুমি?—যেন চেনা চেনা মুখ!

কিশোরী নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল,—বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন!

রাসমণি ভাল করিয়া দেখিলেন—একহারা গড়ন—রং ফর্সা বলা চলে—হাতে দুগাছি লাল রবারের চুড়িমাত্র—পরণে স্থানে স্থানে শেলাইকরা লালপাড় শাড়ী—বিবর্ণ হলেও পরিষ্কার কাচা—গায়েও সেই রকম পুরানো—ব্লাউজ—আদিতে কি রং ছিল বোঝা যায় না। বয়স সতেরো হবে—দারিদ্র্যের কশাঘাতে যৌবন জোয়ার বাধা পাইতে থাকিলেও তার বিক্রম প্রকাশের অশেষ চেষ্টা করিতেছে—মুখখানি পরিষ্কার, স্নানের পর এলায়িত কুন্তলরাশি পিঠে স্কন্ধে কপোলের পাশে পাশে নাড়াচাড়া দিতেছে—আয়ত লোচনদু'টি শুধু বিষাদমাখান—দেখিলেই মমতার উদয় হয়!

রাসমণি। তুমি পদ্মা না? পাশের বাড়ীর ভাড়াটে হরিবাবুর মেয়ে। পদ্মা আগাইয়া আসিল—প্রণাম করিয়া পদধূলি নিবার জন্য হাত বাড়াইলে রাসমণি দু'পা পিছু হটিলেন, বলিলেন—থাক্-থাক্—সুরটী আপনিই নরম হইয়া আসিল—বলিলেন,—একটু দাঁড়াও—ভিজে কাপড় ছেড়ে—তাড়াতাড়ি ঠাকুর প্রণামটা সেরে আসি! সুমতি চায়ের জলটা চাপিয়ে দে, কলেজ-বামণী আজ এলনা দেখছি—আর পারিনা! আপন মনে বল্‌তে বল্‌তে তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে নীচে নামিলেন,—রান্নাঘরের সামনে দালানে পা দিয়া অবাক হইয়া গেলেন, দেখিলেন—সুমতি তার ছোট ভাই কাকুর সঙ্গে পরম পরিতৃপ্তির সহিত গরম হালুয়া গলাধঃকরণ করিতেছে, আর পদ্মার সঙ্গে গল্প করিতেছে! রাসমণি।—একি সব কে কর্লে?

অঙ্গুলী নির্দেশে পদ্মাকে দেখাইয়া এক চামচ হালুয়া গিলিয়া সুমতি বলিল,—কাকাবাবুকেও দিয়ে এসেছি! মা কাকাবাবু কি বল্লেন জান?

বিরক্তির সুরে রাসমণি বলিলেন,—আর জেনে কাজ নেই—সব যে একাকার হ'য়ে গেল?

বিবর্ণ মুখে পদ্মা ধীরে ধীরে বলিল,—আমি স্নান করে কাচা কাপড়ে এসেছিলাম।

—তা হোক্—রাস্তাদিয়ে এসেছ তো?

সুমতির কাকাবাবু বই খাতাহাতে কলেজ যাচ্ছিল—দালান পার হয়ে—কথাটা কানে যেতে একটু দাঁড়াইল, বলিল—বামনী কি রোজ গাড়ী পাল্কী চড়ে আসে নাকি?

বৌদি!—কি চমৎকার হালুয়া খাওয়ালে—চাও বেশ হয়েছে! আর আমি কি করে জানবো যে বামনী আসে নি'! আমিই তো তাড়া দিলাম—কলেজের দেরী হয়ে যাবে বলে। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পদ্মার জলভরা ঝাপসা চক্ষের দিকে চাহিয়া একটু থামিয়া বাহির হইয়া গেল। রাসমণিও সেই চক্ষুদুটির দিকে চাহিয়া অপ্রস্তুত হইলেন বলিলেন,—নাগো না—ওভাবে কথা আমি বলিনি'—আর বল্লেই না কি হবে—ঠাকুরপোর জন্য কি আর বিচার আচার মানার জো' আছে! যাক্—সুমতি!

তোর বাবাকে চাটা দিয়ে আয়—আমি রান্না চাপাই! এস পদ্ম! তুমিও একটু জল খাও—তার পর সব শুনবো।

পদ্মা ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলে ভাবিলেন—লজ্জা! বলিলেন, নাগো না—লজ্জা কিসের!

একবাটি চা ও রেকাবিতে হালুয়া পদ্মার সাম্‌নে আগাইয়া দিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন সে আঁচল চাপিয়াও অশ্রুধারা রোধ করিতে পারিতেছে না।

থাকিতে না পারিয়া তখন তিনি পদ্মার অশ্রুমাখা মুখখানি বুকে টানিয়া লইলেন—অশ্রুধারা মুছাইতে মুছাইতে আদরের স্বরে বলিলেন,—এমন বোকা মেয়েতো কখনো দেখিনি। আমার কথায় বড্ড অভিমান হয়েছে বুঝি! কিছু মনে করো না। আমার ছেলেমেয়ে খেলে, আর তুমি খাবে না?

তখন রুদ্ধকণ্ঠে পদ্মা জানাইল—সে ও তার ছোট ভাই সুরেন কাল রাতে কিছু খায় নি'!

—সেকি?—কেন?

—কাল যে শনিবার ছিল—মাসকাবার ছিল। ঘরে কিছু ছিল না—বাবাও রাত করে ফিরলেন শুধু হাতে! নারী হৃদয়ে করুণাধারা বহিল।

—সেকি? সব খুলে বল আমায়! পাশের বাড়ীর কচি ছেলে মেয়ে সব উপোসী—আর আমরা গিলচি! তাও বাড়ীতে আমাদের তো আরও ভাড়াটে আছে, তাদেরও তো ছেলে মেয়ে আছে! তারাও কোন খোঁজ রাখে না?

—তাদের কাছেও তো বাবার দেনা!

তখন পদ্মাকে পাশে বসাইয়া রাসমণি তাহার সদ্যসিক্ত চুলের গোছাভরা মাথাটি কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্নের পর প্রশ্নে যাহা জানিলেন তাহার সারকথা এই—প্রায় পাঁচবৎসর আগে পদ্মা ও পঞ্চমবর্ষীয় ভ্রাতাকে রাখিয়া তাদের মাতা দেহ রাখেন—পিতা সহরের এক দেশী ব্যাঙ্কে আন্দাজ আড়াইশো টাকার কেরাণী! শুধু মাহিনাটা নয়, দেশে কিছু জমাজমী ছিল—সবই ঘোড়-দৌড়ের মাঠে দিয়াছেন। তবু মা থাকিতে কিছুটা সংসারে দিতে হোত—এখন একেবারে বেপরোয়া! অভাবের তাড়নায় পদ্মা দশমশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াও গত দু'বৎসর থেকে পড়াশুনা ছেড়ে সংসার নিয়ে আছে। এমন দিন আসে যে রাত্রে অন্য ভাড়াটেদের দয়ায় শুধু চারটি মুড়ি খেয়েও কাটাতে হয়! সময়ে অসময়ে তারা আর্থিক সাহায্যও করেছে কিন্তু এক পয়সাও ফেরৎ না পাওয়ায় তারাও হাত গুটিয়েছে এবং গতরাত্রে শুধু সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হওয়ায় তাহাদের সঙ্গে বিষম ঝগড় হয়। একে মোটা টাকা ভাড়া বাকি—তারপর অন্য ভাড়াটেদের নালিশ—ফলে বাড়ীওয়ালা যে ডেকে পাঠাবেন তার আর কথা কি! তাই সকালেই বাবা নেয়ে আফিস যাবার নাম করে বেরিয়ে গেছেন—পদ্মাকে বলে গেছেন বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা করে বোল্‌তে যে এইমাসে ব্যাঙ্কের বোনাস পাবার কথা আছে, পেলেই তাঁর খানিকটা দেনা শোধ করে দেবেন!

রাসমণি চুপ করে সব শুনিলেন। এই মা-মরা মেয়েটি দারিদ্র্যের সঙ্গে ঐ একটুখানি শক্তি নিয়ে কি যুদ্ধই করছে—কি সহ্যই করছে!

যখন পদ্মা বলিল,—যাই সুরেন, একেলা আছে। তিনি বাধা দিলেন বলিলেন—সে ব্যবস্থা আমি করছি! ঝি-কে ডাকিয়া বলিলেন—যা তো মা—পাশের বাড়ী থেকে এর ভাই সুরেনকে নিয়ে—বল্‌বি তার দিদি ডাকছে!

জড়িতস্বরে পদ্মা যখন বলিল—না দিদি! আজ থাক্—যদি বাবা এখনি ফেরেন?—তিনিও যে কাল থেকে উপোসী।

পদ্মার হাতদুটি ধরিয়া—রাসমণি তাকে বুকে টানিয়া লইলেন, বলিলেন,—দিদি যখন হলাম-তখন আর কথা কি!

ঝিয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—যা সুরেনকে পৌছে দিয়ে আসি। মাছটা নিয়ে আয়—বাজার সব আছে।

(২)

আহার করিতে করিতে কর্ত্তা গোবিন্দ চৌধুরী পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজ নাকি বামুনি আসে নি?

—না!

—বাঁচা গেছে!—তোমার কি রান্নার হাত খুলে

গেল—এমন মন দিয়ে রান্না অনেকদিন যে খাইনি! কি, অন্য রাঁধুনী পেয়েছ!

—ওবেলা অফিস থেকে এলে সব বোল্‌বো!

—নতুন রাঁধুনী?—কি বামনী কি কাজ ছাড়বে?—যে ঝগড়াটে।

—বলছি তো—ওবেলা সব কথা হবে।

—আচ্ছা এ নচ্ছার ভাড়াটে হরিপদটার কি করি বল দেখি।—শুধু ভাড়া দেবে না নয়, অন্য ভাড়াটেদের পর্যন্ত শান্তিতে থাক্‌তে দেবে না! ডেকে পাঠালাম, কৈ এলো না তো! ও বেলা পাড়ার ছেলেদের দিয়ে টেনে আনবো ভাব্‌ছি—

—থাক আর বীরত্ব দেখাতে হবে না—শোন তবে সব কথা!

ছোট করিয়া রাসমণি পদ্মার কাছে যাহা শুনিয়াছিলেন বলিলেন—শেষে বলিলেন,—চমৎকার গোছালো মেয়ে পদ্মা! সব রান্নাই তো সে করেছে?

সে কি হেঁসেলে—কি জাতের মেয়ে?

—আমি জাতে বামুনতো বটেই—মুখুজ্যে কি ভাল বামুন নয়? আমি আর থাক্‌তে পারলাম না যখন বল্লে—মাছ রান্না যে ভুলে গেছি—কতদিন রাঁধিনি'—

তাঁর গলা ধরিয়া আসিল!

কর্তা কিন্তু গলিলেন না বলিলেন, দেখ, আমারও উৎলে পড়া সংসার নয়। জানতো মাহিনাটি, ঐ পাশের বাড়ীর ভাড়া থেকে চালাতে হয়। তাও জানি সে চলে তোমার গুণে—তোমার হিসাবী চালে!

দু'পাঁচটাকা দিতে হয় দিয়ে দাও-ব্যস্‌—হরিমুখুজের নিত্য অভাব ঘুচানো তোমার সাধ্য নয়—তারপর জুয়াড়ীকে প্রশ্রয় দিতে আমি কোন কালে পার্ব না।—বুঝি গো সব বুঝি—ওঠ এখন অফিস যাও—দেরী হয়ে গেল—ওবেলা পরামর্শটা হবে!

অফিস্‌ থেকে ফিরে জলযোগ করিতে করিতে গোবিন্দবাবু শুনলেন—গৃহিণী পদ্মা ও সুরেনকে বাড়ী যেতে দেন নি'—বাড়ী ভাঁড়ার জন্য এখন তাগাদা হইবে না—কর্তার কাছে এ প্রতিশ্রুতি পেলে তবে যেতে দেবেন!

গোবিন্দ। এ রকম অন্যায় প্রশ্রয় দিলে অন্য ভাড়াটেরা পেয়ে বস্‌বেনা?

ছোট ভায়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—কি বলিস চুনী? চুনী এম, এ পাশ করিয়া শেষে আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তার মতেরও একটা দাম আছে—ও সে বড় ভায়ের মতের বিপক্ষে মত দিবে না, এই আশাই গোবিন্দবাবু করিতেছিলেন।

চুনীলাল কিন্তু সকালের সেই মমতা মাখানো—সজল চক্ষু দুটিকে ভুলিতে পারিতেছিল না! সে কোন উত্তর দিল না!

গোবিন্দ। ও বাড়ীর অন্য ভাড়াটেরা হরির প্রতি মোটে তুষ্ট নয়। যাক, এক কাজ কর—হরিকে বাড়ী ছেড়ে দিতে বল—বাকী ভাড়ার জন্য যা হয় একটা লিখে দিতে বল—কি বল চুনী?

চুনী শুধু বলিল, সে কথা মন্দ নয়।

রাসমণি কিন্তু বাঁকিয়া বসিলেন, বলিলেন, তার মানে চোখের সামনে না দেখে অন্য জায়গায় গিয়ে মরুগ!

—না সে হবে না!

গোবিন্দবাবু বুঝিলেন—বৃথা চেষ্টা! তবু বলিলেন, তুমি দেখছি মেয়েটার দু'ফোটা চক্ষের জলে গলে গেছ। মায়াটা একটু কমাও গো! স্বজাতি বলে হরিকে আমি যথেষ্ট দয়া দেখিয়েছি—তা জান কি! তেরো চৌদ্দ মাসের ভাড়া পাওনা—তারপর যে সস্তা ভাড়ায় আছে দোতলার দুখানা ঘর মায় বারাণ্ডা—দেয় মোটে ২৫৲ মাসে।

রাসমণি। সব জানি—পদ্মা বলেছে—টাকা দিতে না পারায় লজ্জায় হরিবাবু দেখা কর্চ্ছেন না।

গোবিন্দ। লজ্জা তার আছে? বলো না—মাঠে যাওয়া জুয়া খেলাটা সে ছাড়ুক—আবার শুনছি—ইদানীং সে নেশা কর্তে সুরু করেছে! দেড়শো টাকা মাইনে—ওঁর চলে না? আমি কত মাইনে পাই? চুণির কলেজের খরচা ছেলেমেয়ের স্কুলের মাহিনা—সংসার খরচা সবই তো তুমি নিজে হাতে কর্চ্ছ—কি করে চল্‌ছে?

রাসমণি। আমি অত বুঝি না। বুঝি শুধু এ মেয়েটি বড় শান্ত—বড় ভাল—বড় দুঃখী!

গোবিন্দ। দেখ্‌ছি কোন্‌ দিন বলে বস্‌বে হরিকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কর—চুণির বৌ করে নিয়ে এস।

গোবিন্দ ভাবিলেন—খুব রসিকতা করা হোল! খানিকটা হাসিয়াও ফেলিলেন!

এদিকে পুঞ্জীভূত কাল বৈশাখীর মেঘের বুকে সৌদামিনী খেলিয়া গেল। রাসমণি সত্যই খুশী হইয়া বলিলেন,—দেখ দিকিনি—একেই বলে পুরুষের বুদ্ধি! সাধে তোমায় এত ভক্তি করি! আজ সকাল থেকে এই কথাটাই আমার বুকে খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধছে। ওগো! এতে আমি সত্যই খুশী হব! কি ঠাকুরপো! পদ্মা তো দেখ্‌তে মন্দ নয়—লেখাপড়াও তো কিছু জানে! এরকম জা পেলে আমি যে সত্যই খুশী হব!

গোবিন্দলাল বিষম বিপদ গণিলেন, বলিলেন,—রসিকতা বোঝ না? যাও রান্নাঘরে যাও! ঐ হা ঘরের মেয়ে আমায় আন্‌তে হবে চুণির বৌ করে। আইনটার শেষ পাশ করুক না—দেখনা কি ধুমধাম করে চুনির বৌ নিয়ে আসি!

হাঘরের মেয়ে বলাতে রাসমণি বিষম রাগিয়াছিলেন—শুধু বলিলেন—তাই কর—ঠাকুর-পো-কে বিক্রী করে বড়লোক হও!

রাগে গজগজ করিতে করিতে তিনি নীচে নামিবার জন্য সিঁড়ির কাছে আসিলেন—দেখিলেন—বুঝিলেন—পদ্মা বিবর্ণ মুখে সেখানে দাঁড়াইয়া আছে নিশ্চয়—স্বামীর ও তাহার কথাবার্তা সে শুনিয়াছে।

(৪)

আবার মাসকাবার—আবার শনিবার! অফিস যাবার সময় হরিপদবাবু দেখিলেন, পদ্মা ঘরের বাহিরে চৌকাঠের নিচে দাঁড়াইয়া!

—কিরে কিছু বোল্‌বি?

—বাবা! তার কণ্ঠস্বর খুব আর্দ্র! চক্ষে জল! সেদিন পিতার মেজাজটা ভালই ছিল—অফিসের ঝাড়ুদারের ভাই মস্ত বড়লোকের ঘোড়দৌড়ের সহিস! সে আজ 'টিপ' দেবে—খাস আস্তাবলের খপর!

—কি হোল তোর?

রুদ্ধকণ্ঠে পদ্মা বলিল,—প্রায় একমাস ওঁদের দয়ায় দু'মুঠো খেতে পেয়েছি—বাবা! আজ অফিস থেকে বাড়ী চলে এস! আজ মাসকাবার।

—আরে! আজ সব খুচরা দেনা শোধ করে দোব!

পদ্মা বলিয়া যাইতে লাগিল,—এই শীতে সুরেনের গায়ে একটা গরম জামা নাই—তালি দেওয়া পুরাণো একখানা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে স্কুলে গেছলো—মাষ্টার ক্লাশে পড়তে দেয় নি'—আগামী হপ্তায় ওর ক্লাশ পরীক্ষা।

—কি আপদ! আমি কি সব জানি না—যা—অফিসের দেরী হয়ে গেল!

পদ্মা শুষ্ক বিবর্ণ মুখে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল!

পরদিন সকালে সুরেনকে নিয়ে পদ্মা রাসমণির কাছে উপস্থিত! তিনি তখন রান্নার জোগাড় দিতেছিলেন বামুনীকে! দু'জনের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, বুঝেছি! কাল রাত্রের চেঁচামেচি একটু শুনেছি! রাত্রে রান্না হয়নি'—কিছু খাস্‌নি তো?—তা আমার কাছে চলে এলি না' কেন?

ওকি? কাঁদ্‌ছিস কেন—কেঁদে কি হবে?—আয় বোস্‌!

পদ্মা ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলিল,—দিদি! তোমায় আর কত—সে আর বলিতে পারিল না!

রাসমণি পদ্মার নত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—আয় আগে তোরা একটু চা খা—তারপর—

বাধা দিয়া পদ্মা বলিল,—না দিদি।—আপনি সুরেনকে একটা অনাথ আশ্রমে ভর্ত্তি করে দিন—আপনার ঠাকুরপোকে বলে—আর আমি কোথাও চলে যাই!—আর যে পারি না!

—সেকি?—এ বুদ্ধি তোকে কে দিলে?

—না দিদি! পাড়ায় খেটে খেলে বাবার মান বড্ড নেবে যাবে—পাড়ার সবায়ের টিপ্পনী সইতে পার্ব না—ইচ্ছে হচ্ছে গঙ্গায় ডুবে মরি—শুধু সুরেনের জন্য পার্চি না!

—আমি তোদের দিদি না? আমার ভাই থাক্‌বে অনাথ আশ্রমে—ছোট বোন হবে আত্মঘাতী?—না তা হবে না—হতে পারে না—আয় আমার সঙ্গে—

আবেগের ভরে পদ্মাকে টেনে নিয়ে গেলেন স্বামীর কাছে! বলিলেন,—এর বিহিত তোমায় কর্ত্তেই হবে!

গোবিন্দবাবু আতঙ্কে ব'ললেন,—আবার কি হোল? বুঝেছি—কাল মাহিনার সব টাকাটা হতভাগা মাঠে দিয়ে তবে ফিরেছে—তাই রাত্রে গোলমাল হচ্ছিল ও-বাড়ীতে—দাঁড়াও হতভাগাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে তবে জলগ্রহণ কর্ব!

ডাকিলেন,—চুনি।—ও চুনি।

পাশের ঘর থেকে চুণীলাল আসিল,—কাল মাসকাবারে হরিবাবুর আবার সেই পুরাণো কাণ্ড—আবার শুনছি—নেশা করে কাল এসে বাড়ীতে সবার—এমন কি ছেলে-মেয়ের ওপর হামলা করেছেন—যা তো তাকে ঘাড ধরে টেনে নিয়ে আয় তো!

হিতে বিপরীত হয় দেখে রাসমণি হতভম্ব।

পদ্মা তাঁর হাত দুটি ধরে বলে উঠ্‌লো—দিদি। কাল-থেকে বাবা উপোসী যে।

চুণী একবার পদ্মার দিকে একবার বৌদির দিকে ভালকরে দেখিল বলিল,—বৌদি'। কলেজের দেরী হযে যাবে—জলখাবার দেবে এস। দাদা। ওবেলা অফিস থেকে আসুন যা হয় একটা ব্যবস্থা কর্ত্তেই হবে।

গোবিন্দ। বেশ তাই হোক, আমি এর একটা বিহিত কর্বই কর।

কলেজ যাবার সময় হরিবাবুর ঘরের সামনে দাঁড়িযে চুণীলাল বলিল,—এই টাকা কটা রাখুন—যান তাডাতাডি অফিস যান—বাজারে কিছু কিনে খাবেন—ওরা সব আজ আমাদের কাছে খাবে।

চুণী চলে যাবার পর হরিবাবু দেরাজের উপর রক্ষিত টাকা ক'টির দিকে চেযে ভাবিতে লাগিলেন, কেন এমনটা হয। তার সবই যে ছিল—তবু কেন এত কষ্ট। এক ঘোডদৌডের মোহ তার সর্বনাশ করিল। এ মোহ কেন কাটে না। কেন সে অধঃপতনের নিম্নতম ধাপে নেবে যাচ্ছে? আরও ভাবিল আজ কোন মুখে সে অফিস যাবে? সহকর্মী থেকে পিয়ন দ্বারওযান পর্য্যন্ত সবার কাছে যে ঋণী। কাল মাহিনা পাবামাত্র পিছনের দ্বার দিয়ে মাঠে পালিয়েছে সবাইকে ফাঁকি দিযে—কিন্তু আজ। কেন সে মাঠে যায়? কে বুঝিবে দারিদ্র্যের তাডনায আশু মুক্তি পাবার আশায—সে যে কশাহত অশ্বের মত মাঠে ছুটিয়া যায়—যদিও সে জানে এবং পরে বোঝে সে মরীচিকার পিছনে ঘুরিতেছে।

হায়রে নিয়তি।

৫

সেদিনের গোবিন্দবাবুর উগ্রমূর্ত্তি আর চুণীলালের মহানুভবতার পর দিন কয়েক পদ্মা আর ওদিকে যায় নাই। বাবাও একদিন শান্ত ভাবেই দেখাশুনা কর্ছিলেন। শরীর খারাপের অজুহাতে অফিসও যাচ্ছেন না। তারপর একদিন লক্ষ্য করিল বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে নানা রকম দ্রব্যাদি মুটের দল নিয়ে আস্‌ছে। প্রথমে কৌতুহল তারপর কেমন একটা উত্তেজনা। সে আর থাকিতে পারিলনা। সন্ধ্যায় সময় সে রান্নাঘরের সাম্‌নে হাজির হয়ে লক্ষ্য করিল যে বাড়ীতে একটা আনন্দের রোল। পাচিকা ঠাকরুণ নানা রন্ধন সামগ্রী বেষ্টিত হয়ে—ভারী ব্যস্ত। পদ্মাকে দেখিযাই পাচিকা বলিল, ওমা। পাশের বাড়ী থাক—আর কোন খপর রাখ না?

—কি ব্যাপার? আমরা তো কিছু জানি না।

—তা জান্‌বে কেন—দরকারের সময় তো রোজ আস্‌তে। পদ্মা কুঁকড়াইযা গেল।

জাননা ছোটবাবু ভাল পাশ করেছে—তার খুব বড লোকের বাড়ীথেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে আজ মেয়ের পক্ষ থেকে ছোটবাবুকে দেখতে আস্‌ছে, জন কতক লোক আসবে বাইরে থেকে—গিন্নিতো উপরেই তাদের বসাবার জোগাডে ব্যস্ত আমি এসব কি করে সামলাই বলতো।

পদ্মা বিনা বাক্যব্যযে রান্নার জোগাড দিতে লাগিয়া গেল। পাচিকাও আপন মনে বলিতে লাগিল, আজ বডবাবু ছোটবেলার এক বন্ধু আস্‌বেন তিনিই এই বিয়ের ঘটক। মেয়ের বাপ খুব বডলোক, মস্ত কারবার—আমি একখানা ভারী গহনা নিযে তবে ছাডবো। ওমা। মায়ের চা যে জুডিযে গেল। ঠাকুর ঘর থেকে বেরিযেই যে চা চাইলেন।

পদ্মা বলিল, দাও আমায আমি দিযে আসি।

চাযের সরঞ্জাম নিয়ে সে উপরে গেল। তাহাকে দেখিযাই রাসমণি বলিলেন,—পদ্ম। এ ক'দিন কোথা ছিলি রে? চা ওপরে আন্‌লি কেন? চ', নিচে গিয়ে চা খাইগে—বাধুনীকেও যে জোগাড দিতে হবে বেশী নয়, জন চার পাঁচ লোক খাবে আজ এখানে।

পদ্মা। আমি সব জোগাড দিয়ে এসেছি। বলেন তো কালিঘাটা বামুণীর সঙ্গে রেঁধে দি। আসুন এইখানেই চা খান। ঠাণ্ডা হযে যাচ্ছে।

একমুখ হাসিয়া রাসমণি বলিলেন, কাজে তোর জোডা

নেই। আয়, একসঙ্গে চা খাই। এ কদিন দেখিনি কেন? পদ্মা একটু ভাবিয়া বলিল,—বাবার শরীর ভাল নেই—অফিস যান্ না।

—সে কি? কি অসুখ? ডাক্তার দেখান হচ্চে? পদ্মা ঘাড় নীচু করে বল্লে,—বোধ হয় চাকরী নাই।

—জিগ্‌গেস করিস্ নি?

—কিছু তো বলেন না—সেদিন ঘুমের ঘোরে বল্‌ছিলেন চাক্‌রী আর রইলনা। কি খাব?

তার স্বর রুদ্ধ হইল।

উত্তেজিত হইয়া রাসমণি বলিলেন,—চাক্‌রী অম্‌নি গেলেই হোল। চুরিও করে নি'—ডাকাতিও করে নি। ঠাকুরপোর কাছে শুনেছি—আজ কাল চাকরী যাওয়া অত সোজা নয়—এর জন্য আইন হয়েছে আলাদা।

শুনেছিস্ ঠাকুরপো খুব ভালভাবে আইন পাশ করেছে। চ' আজ এখানে খেয়ে যাবি—।

আর কত জ্বালাবো দিদি। নাগাড় তো তোমার খেয়ে যাচ্চি।

—সেই জন্যই বুঝি আস্‌তে লজ্জা করে রোজ?

চ' নীচেয়—চ', সেখানে অনেক কথা আছে।

সিড়ির মুখে বাধা পড়িল। গোবিন্দবাবু অতিথিদের নিয়ে উপরে আস্‌ছেন। রাসমণিকে দেখে সোৎসাহে বলিলেন—এই আমার বাল্যবন্ধু যতীন রায় রাঁচী থেকে আজ এসেছে—সঙ্গে এঁরা ওর জানা লোক। ওঃ, কতদিন পরে দেখা!

পদ্মা ও রাসমণি পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালে সবন্ধু যতীনবাবু উপরে উঠিলেন, বলিতে লাগিলেন—ওঃ। গোবিন্দ! তোমার বিয়েতে শাল্‌তি চড়ে জয়নগরে বরযাত্রী যাওয়া তখনকার দিনে একটা এডভেঞ্চার।—রাত্রে তক্ষক নাগের কট্ কট্ শব্দ—হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় সারারাত তাসখেলা। কি অত্যাচারই আমরা বরযাত্রীর দল না করেছি। তোমার বৌয়ের কি সে সব মনে আছে? সহসা পদ্মাকে দেখিয়া বলিলেন—এ মেয়েটি কে গোবিন্দ? গোবিন্দ। ওর নাম পদ্মা। পাশের বাড়ী থাকে, আমারই ভাড়াটের মেয়ে—স্ত্রীর গলগ্রহ।

পদ্মা নম্র রাসমণিও খুব সঙ্কুচিত ভাবে মাথা নত করিল। ইতিমধ্যে যতীনবাবু পদ্মার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আপাদমস্তক দেখিতেছিলেন।

—বিয়ে হয়নি দেখছি।—এত বড় মেয়ে সহর বলে চলে যাচ্ছে।—বিয়ে হয়নি কেন?

রাসমণির গা জ্বালা করিতেছিল—একেতো গায়ে পড়ে চুণীর বিবাহ সম্বন্ধ আনাতে তারপর স্বামীর বক্র ইঙ্গিতে আর শেষে অভদ্র ব্যবহারে তিনি যতীনবাবুর উপর জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—ওর বাপের তো বড় কারবার নাই, বাড়ীও নাই, মোটর গাড়ীও নাই আর হিতৈষী বন্ধুও নাই—তাই বিয়ের ফুল এখনো ফোটেনি—

এই বলিয়া তিনি পদ্মার হাত ধরিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন।

যতীনবাবু কথাগুলো মোটে গায়ে না মাখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—গোবিন্দ! তোমার বৌকে বল—চুণীলালের মত উচ্চ শিক্ষিত পাত্র না পেলেও শাদামাটা পাত্র কি জোটে না? ব্রাহ্মণ তো? বেশ আমার এক শালা আছে—রাচীর স্কুলের থার্ড মাষ্টার, সম্প্রতি বৌ মরে গেছে—গোটা চারেক ছেলে মেয়ে রেখে। শেষেরটি মোটে আট মাসের—প্রথমে ভেবেছিল আর নয়, এখন বল্‌ছে একটা ডাগর মেয়ে পেলে রাজী, ছেলে মেয়েদের দেখবার জন্য। ওর বাবাকে জিজ্ঞাসা করো যদি রাজী হয় দু'টো বিয়েই এক সঙ্গে লাগিয়ে দি'—

ততক্ষণ রাসমণি ঘর্মাক্ত পদ্মাকে নিয়ে নীচে নেবে গেছেন। সেখানে তাহার অশ্রুসিক্ত ঘর্মাক্ত মুখখানি অঞ্চলাগ্রে মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, মানুষের মনে ঘা' দিয়ে, কষ্ট দিয়ে কথা বলাটা অনেকে বাহাদুরী মনে করে।

(৬)

বৌদিদির আদেশ মত পরদিন সকালে চুণীলাল দ্বিতলে যেখানে হারবাবু থাকেন সেখানে গেল। বারান্দায় পা দিয়াই লক্ষ্য করিল, পদ্মা পিছন ফিরিয়া সিক্তকুন্তলরাশি পিঠে এলাইয়া দিয়া উনানে আগুন দিতেছে—আর পাশে বসিয়া সুরেন দিদিকে শুনাইয়া পড়া তৈয়ারী করিতেছে। জুতার শব্দে মুখ ফিরাইল—ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করিয়া চুণীকে দেখিল। তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিল—জীর্ণ শাড়ীখানি

দিয়া নিজেকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিল তখন তাহার রক্তিম মুখ আরও রক্তিম।

চুণীও অপ্রস্তুত, তাহারও মুখ লাল।

পদ্মা কোন রকমে বলিল,—আসুন।

চুণী। বৌদিদি পাঠিয়ে দিলেন—

পদ্মা। বুঝেছি—বাবা ঘরেই আছেন—যা সুরেন বাবাকে ডেকে দে।

এই দ্বিতীয়বার চুণীলাল ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। প্রথমবার ঘরটি ভাল করিয়া দেখে নাই, এবার দেখিল। সব আসবাবপত্র দারিদ্র্যের চিহ্ন বহন করিলেও নোংরা নয়—মলিন নয়। তালি দেওয়া সেলাইকরা আলমারী, বাক্সের ঢাকা মায় বালিশ ইত্যাদি।

হরিপদবাবুও চুণীকে দেখিয়া একটু 'কিন্তু' হইলেন বলিলেন,—কি খপর? ভাড়া? বড় খারাপ সময় চল্‌ছে!

—বৌদি' পাঠিয়ে দিলেন—

—এবার মেয়েছেলের নাম নিয়ে তাগাদা তা আমি—

পদ্মা পিছু হইতে মৃদুস্বরে বলিল, বাবা! আপনি ক'দিন অফিস যান নি সেই কথা জেনে—

বাধা দিয়া হরিপদবাবু বলিলেন—আমায় এখন বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে?

চুণীলাল। আগে শুনুন না। আপনার চাক্‌রী নিয়ে কি গোলমাল হয়েছে—

হরিপদ। ত'তে তোমাদের কি—

পদ্মা এবার আগাইয়া আসিল, বাবা! সেদিন ঘুমের ঘোরে বোল্‌ছিলেন যে চাক্‌রীটা গেল—সে কথা আমি দিদিকে জানিয়েছিলাম।

হরিপদ। তা ওরা কি আমার চাক্‌রী ফেরৎ পাইয়ে দেবে? বড়বাবুকে বশ করে দেবে?

এবার চুণীলাল বিরক্তি বোধ করিল, বলিল—একটু মন দিয়ে সব কথা শুনলে বোধ হয় ক্ষতি হোত না। এমন জানলে আসতাম না।

হরিপদ। দেখ বাবাজী আমি সব বুঝি। অবশ্য একটু নরম হইল। বলিল—কি কর্তে পার তোমরা। শুন্‌লাম উকীল হয়েছ, ভাল কথা, মামলার বুদ্ধি দেবে তো। দেখ, আইন বড়লোকদের জন্য, আমার মত গরীবের জন্য নয়! আমি অদৃষ্টবাদী। বড়বাবুকেই ধর্ব ফের—যা হবার হবে! অদৃষ্ট মানা ছাড়া আমার আর কি পথ আছে।

চুণী। তাই মানুন—আসাটা তাহ'লে খুব অন্যায় হয়েছে। চল্লাম। সে নামিবার জন্য সিঁড়িতে পা দিবে এমন সময় পিছন হইতে পদ্মা উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিল, শুনুন দয়া করে।

চুণী ফিরিয়া দেখিল, পদ্মা নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আঁচলের খুঁটটি পাকাইতেছে।

চুণী। কি বোল্‌বে এরপর!

পদ্মা। দয়া করে ক্ষমা করুন—

এ করুণ-প্রার্থনায় চুণী ভিজিল না, বলিল, সাহস থাকে বৌদির কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে এস—এ অপমানটা তাঁরই। এই বলিয়া সে সিঁড়িতে পা দিল পিছনে তাকাইল না।

পদ্মা তখনো আর্তকণ্ঠে বলিতেছে—কি করে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। অথচ—

বাকী কথাটা চুণীলালের কানে গেল না। ফিরিল বটে কিন্তু মনটা খচ্‌খচ করিতে লাগিল। মনের কোন্ অজানা কোণে কে যেন ধাক্কা দিতেছিল—অন্ততঃ পদ্মার শেষ করুণস্বরের কথা কয়টি।

রাসমণি সব শুনিয়া খালি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, তোমার দাদাকে যেন এ কথাগুলো বলো না।

(৭)

সেদিন বৈকালে রাসমণি শয়নকক্ষ থেকে দালানে আসিতে দেখিলেন পদ্মা অতি সংকুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া। তাহাকে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল, বলিল, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি দিদি। বাবার চাকুরী রয়ে গেছে—তবে পুরুলিয়ার ব্যাঙ্কে বদলী করে দিয়েছে। পুরুলিয়া তো এখন বাংলা দেশই। তবে আসি দিদি। কম্পিত কণ্ঠে ত্রস্তপদে সে হাঁটু-গাড়িয়া বসিল পাদস্পর্শের জন্য দু'হাত বাড়াইল।

বিস্মিতা রাসমণি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন বলিলেন,—এক মাসের ওপর হোল যে আসিস্ নি। হাত দিয়ে লক্ষ্য করলাম—ঘরের সামনের বারন্দায় ছেঁড়া চট টাঙ্গানো। কেন? যদি মুখোমুখী দেখা হয়, না? তা আবার এ বিদায়ের ঢং কেন?

নত মস্তকে পদ্মা বলিল,—আর কত লজ্জা দেবেন? দেখা কর্বার মত সাহস যে চেষ্টা করেও পাইনি এ-কদিন। কিন্তু আজ আর থাকৃতে পার্লাম না—মাপ করো নিজগুণে, আশীর্বাদ করো দিদি। সে আর বলিতে পারিল না—কণ্ঠ যে রুদ্ধ।

ততক্ষণে রাসমণি নিজেকে সাম্‌লাইয়াছেন—উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, না, না যাওয়া হবে না তোর কোথাও—বুঝলি; থাক্ তুই আমার কাছে। তোকে আমি সত্যই নিজের বোন মনে করেছি যে—

পদ্মা। সে পুণ্য কি আমি করে এসেছি দিদি! তারপর নিজেকে কিছুটা সংযত করিয়া বলিল, শুনুন কেন জোর করে এলাম আজ। মা যাবার আগে আমায় এই সোনার আংটিটি দিয়ে গেছলেন আর বলেছিলেন এই আংটির সঙ্গে তাঁর শেষ আশীর্বাদ গাঁথা রইল—তাই এত কষ্টেও আমি এটা খোয়াইনি। নাও দিদি এটা!

রাসমণি বিস্মিত কণ্ঠে বলিল,—কি কর্ব ওটা—তুই কি সব দেনা ঐ আংটিটা দিয়ে শোধ কর্তে চাস্ নাকি?

আবেগ কম্পিতকণ্ঠে পদ্মা বলিয়া যাইতে লাগিল—

আমি এত ছোট নই দিদি, যে এইসামান্য জিনিষ দিতে এসেছি আপনার অগাধ অযাচিত স্নেহের শোধ দিতে! শুনুন—আপনার ঠাকুরপোর বিয়ে হবে—কত ধুমধাম হবে, কনে নিয়ে সবাই আমোদ আহ্লাদ করবে! তখন আমি তো থাক্‌বো না। তাই দিদি! আমার শেষ আব্দার কনেকে আপনি আমার হয়ে পড়িয়ে দেবেন—এটি তুচ্ছ জিনিষ হ'লেও আমার মায়ের শেষ আশীর্বাদ যে এতে মাখানো আছে—এটাকে আমার তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য বলে নিয়ে আমায় কৃতার্থ কর, দিদি—আপনার ঠাকুরপো'ও যেন নিজগুণে আমার সব দোষ ভুলে যান—যেন হাসিমুখে—

উদ্বেলিত অশ্রুরাজী আর দমন করিতে না পারিয়া সে আংটিটি রাসমণির হাতে গুঁজিয়া দিয়া অঞ্চলাগ্রে মুখ ঢাকিয়া ফোঁফাইতে ফোঁফাইতে ঘুরিল—সিঁড়িতে নামিবার জন্য পা বাড়াইল! সহসা রাসমণির চক্ষের সাম্‌নে এক নূতন ছবি ফুটিয়া উঠিল—পদ্মার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব তাহাতে বড় স্পষ্ট হয়ে—নতুন সুষমামণ্ডিত হয়ে দেখা দিল—তিনিও যে নারী! বিস্ময়ের ধাক্কা কাটাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—ওরে এমন করে আমায় দাগা দিয়ে যাস্‌নি—ফিরে আয়!

তখন যে পদ্মা নীচে নামিয়া গিয়াছে।

রাসমণি বসিয়া পড়িলেন!

চুণীলাল পিছন হইতে আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁকে টানিয়া তুলিল,—বৌদি!

আংটির দিকে চাহিয়া—সেটা তুলিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি বলিতেছেন,—ওরে! এ বুকচেরা রক্তের একটা ডেলা—এতো সোনা নয়! ঠাকুর-পো! কথাগুলো তার সব শুনেছো!

চুণীলাল কি বলিবে! তাহারও বুকের স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছিল। তাহার চক্ষের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল সেই প্রথম দর্শন। সেই মমতা-মাখান অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতাভরা বিস্ফারিত চক্ষুদুটি! তারপর সেদিন তার নিজের বাড়ীতে সিঁড়ির উপর হতাশা মাখানো সুরে মার্জনা ভিক্ষা তারপর আজ সহ্য শক্তির শেষ সীমায় আসিয়া আকুল ক্রন্দন! সে আর থাকিতে না পারিয়া বলিল,—দাও তো বৌদি? আংটিটা!

রাসমণি। সে কি রে? ফেরৎ দিয়ে আসবি নাকি?

না-না—চুণী আকুলকণ্ঠে বলিল,—না না—অত বড় শক্ত বুকের পাটা আমার নেই। বৌদি, আশীর্বাদ কর যে ঐ আংটির যোগ্য সম্মান তাকে দিয়ে আস্‌তে পারি।

অতি ব্যগ্রতার সঙ্গে তার হাত দুটি ধরে রাসমণি বলিলেন,—পার্বে? ঠাকুরপো পার্বে? এই নাও আংটি। চলো আমিও যাব!

আংটিটি শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়ে চুণীলাল বলিল,—দাদার আসবার সময় হোল—তুমি তাকে সামলাও—আসি—এখনি ফিরে আস্‌ছি!

রাসমণি—পার্ব তোর দাদাকে সামলাতে!

চুণীলালের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল,—তোমায় যে পারতেই হবে—দাদাকে শুধু বলো—

রাসমণি।—কি বোল্‌তে হবে সে আমি জানি—যাও—তুমি শীঘ্র যাও।

৮

সিঁড়ি পার হ'য়ে বারান্দায় পা দিয়ে চুণী ডাকিল, পদ্মা!

পদ্মা তখন ঘরের ভিতর মাটিতে লুটাইয়া—মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। বারান্দায় স্থরেন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল!

চুণীলাল ঘরে গিয়া পদ্মার মাথায় হাত দিয়া আবার ডাকিল—পদ্মা!

স্বর চিনিয়া—পদ্মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল,—অঞ্চলাগ্রে অশ্রুর ধারা মুছিবার চেষ্টা করিল! চুণীলালের দিকে একবার দেখিয়া—আবার ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল—তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল!

চুণীলাল ঢোক গিলিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—বৌদি' পাঠিয়ে দিলেন আংটিটা!—

পদ্মার বুকে কে যেন লোহার হাতুড়ী পিটিল।

অতি অপরাধীর মত শুষ্ককণ্ঠে শুধু বলিল,—নেবেন না এটা? ফেরৎ দিলেন?

চুণীলাল নরম স্বরে বলিলেন,—যা বলে এলে সেটা তো মনের কথা না জান্‌লে কি করে নেওয়া যায় বল—তাই বৌদি' জান্‌তে পাঠালেন—

পদ্মা শুধু বলিল,—কি!

চুণীলাল।—কথাগুলো তোমার অন্তর থেকে এসেছে কিনা! ক্ষণিক উত্তেজনার বসে বোলেছ কিনা—নইলে এ আংটির দাম যে কিছু নয়!

পদ্মা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল,—বিশ্বাস করুন—আমি বড় অভাগী!

কোন রকমে নিজেকে সংযত করিয়া মাথা নত করিয়া বলিল—বিশ্বাস করুন—আমি সত্যই অভাগী।—আপনার পা ছোঁবার যে যোগ্য নই—নহিলে সে আর বলিতে পারিল না—ক্রন্দনের আবেগে তার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। মুক্তাধারার মত তার অশ্রুর বন্যা বহিল।

চুণীলাল। সত্যই পুরুলিয়া যাবে—বাবার সঙ্গে। তাহ'লে যা' বলে এলে তাতে তোমার মনের কথা নয়।

এবার পদ্মা মুখ তুলিয়া চাহিল—প্রাণপণে অশ্রুধারা রোধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিল—তারপর শরাহত পক্ষিনীর মত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল—অস্পষ্ট স্বরে শুধু বলিল,—না—না—না। আপনি ত নিষ্ঠুর নন্—আমার সোনার স্বপন ভেঙ্গে দেবেন না। আপনার করুণা মাখান ছবি—আপনার দয়ার মূর্তি—আপনার স্মৃতি। না—না—না। আমায় আত্মঘাতী হ'তে উত্তেজিত—দোহাই আপনার—কর্বেন না।

চুণীলাল আর থাকিতে পারিল না—পদ্মার কম্পিত হাত ধরিয়া আবেগের সঙ্গে বলিল,—ওঠ। পদ্মাকে তুলিল কাপড়ের খুঁটে তার ব্রীড়ানম্র মুখখানি মুছাইয়া বলিল—তোমার মনের কথা জানবার জন্য এসেছি অবশ্য বৌদির মত আছে। তোমার মায়ের আশীর্বাদ মাখানো এ আংটি তুমি মনে মনে যার নামে উৎসর্গ করেছ—তাকেই ভগবানের নাম নিয়ে পরিয়ে দিলাম।

আংটিটি আঙ্গুলে দেবার সময় পদ্মা শুধু কাঁপিতেছিল বাধা দেবার বা কোন কথা বল্‌বার শক্তি তাহার ছিলনা। সে অস্ফুট স্বরে শুধু বলিল, দিদি!

চুণীলাল। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বৌ-দির আশীর্বাদও এর সঙ্গে আছে। নাও! এবার যাও পুরুলিয়া।

স্থরেন বাহির হইতে ডাকিল—বাবা!

হরিপদবাবু তখন দ্বার প্রান্তে!

চুণীলাল পদ্মার হাত ধরিয়া প্রায় জোর করিয়া তাহার সামনে নত হইয়া বলিল—আশীর্বাদ করুন। তখন তিনি পদ্মার সলজ্জ চক্ষু রক্তিম কপোল কম্পিত দেহ ওষ্ঠ প্রান্তে অমাবস্যার তৃতীয়ার চন্দ্রের মত হাসি লক্ষ্য করিলেন দুজনের হাতে হাত মিলাইয়া পদ্মার চিবুক স্পর্শ করিয়া আবেগ কম্পিত স্বরে শুধু বলিলেন—ওরে তোর মায়ের দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবির দিকে চেয়ে তোর মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম কর—এ যে তারই আশীর্বাদ।

শেষে ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন, ওগো, তোমার শেষ প্রার্থনা চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় নি তো!

জাতীয় সংহতি ও শিক্ষা

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

"Disunity within a nation is not only a source of political embarrassment but is also a source of economic disadvantage"—কথাগুলি A Backward Society নামক গ্রন্থে Reymond Frost এর। জাতীয় সংহতি কথাটির উপর আজকাল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই বিষয়ের উপর প্রচুর আলোচনাও দেখতে পাই। কিন্তু বিষয়টি আজও যেন তেমন পরিষ্কার হয় নি।

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা আপাত দৃষ্টিতে সাফল্য এনেছে বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু গভীর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে একদিক থেকে বিজ্ঞান বিরাট ব্যর্থতা ডেকে এনেছে। পৃথিবীব্যাপী ভাবগত অসংহতি যথেষ্ট ক্ষোভের বিষয়। অর্ধোত্তর বিংশ শতাব্দীর গৌরবময় যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের সভ্যতা মহাকাশস্পর্শী। কিন্তু এই সভ্যতার পরিপুষ্টি একদিনে সম্ভব হয়নি। যুগ যুগান্তরের বিবর্তনে পরিপুষ্টি লাভ করেছে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সভ্যতা যতই উন্নততর হোক মানুষের সমাজ থেকে কি দূরীভূত হয়েছে জান্তব জিঘাংসা-প্রবৃত্তি? মানুষ কি আজো পশুত্বের ভারমুক্ত হতে পেরেছে? পারে নি বলেই দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে কোন সংহতি নেই। গত বিশ বছরের ইতিহাস স্নায়ু যুদ্ধের ইতিহাস। এই ইতিহাস প্রমাণ করে মানুষ আজো ভাবগত সংহতি [emotional integration] থেকে অনেক দূরে।

সংহতি বলতে কোন একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—"Emotional consciousness of the total values that we as a nation hold in common. It is the development of loyalties to these values" প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ Dewey বলেন "Belief in the dignity of men"—মানুষের মর্যাদার প্রতি বিশ্বাস থেকেই জাতীয় সংহতির জন্ম। Albert Scheuitier বলেন, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা Reverence for life থেকেই সংহতির উদ্ভব।

কিন্তু সে যাই হোক জাতীয় সংহতি রাষ্ট্রোন্নতির ভিত্তি। মানুষ সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্র। একদিন মানুষ ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন। জীবনের বৃহত্তর তাগিদ তাদের ছিল না। সেদিন জীবনকে তারা বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখতে শেখে নি। তাই মহত্তর জীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা তাদের ছিল না। কিন্তু একদিন সেই আদিম মানুষ অন্তরে এক মহত্তর প্রেরণা অনুভব করলো। তারা বুঝলো অসংহত জীবনযাত্রা মোটেই মঙ্গলকর নয়। যেদিন থেকে তাদের মধ্যে এই চেতনা এলো সেদিন থেকেই পৃথিবীতে সভ্যতার মাঙ্গলিক স্পর্শ দেখা গেলো। এরও অনেক শতাব্দী পরে মানুষের সমাজে সৃষ্টি হোল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। সেই সভ্যতার আদিম প্রভাতেই মানুষ বুঝেছিলো পারস্পরিক সৌহার্দের ভিত্তিতেই জীবনের পূর্ণতম বিকাশ। তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিলো, মিলনের সেতু রচনা করেছিলো এবং সার্থক জীবন রচনা করে তৃপ্ত হয়েছিলো। মানুষের এই মিলন-কেন্দ্রিক সভ্যতা আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষে প্রবহমান। ভারতের বাণী সত্য, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী।

ভারত বহু ভাষাভাষী দেশ। এখানে একাধিক জাতির বাস—একাধিক ধর্মের অস্তিত্ব। এতো বিভিন্নতার মাঝেও এখানে রয়েছে মিলনের যোগসূত্র। ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিরও মূল কথা বিশ্বাত্মবোধ, ভারতের ধর্ম্ম বিশ্বমানব ধর্ম্ম, ভারতের বাণী বিশ্বমৈত্রী ও প্রীতির বাণী। এই বাণী উত্থিত হয়েছিলো সভ্যতার সেই প্রথম যুগে। আধুনিক যুগেও ভারতবর্ষ বহু যুগ বিবর্তিত

আন্তর সভ্যতাকে বহন করে চলেছে এবং বিক্ষুব্ধ বিশ্বে প্রেম, মৈত্রী ও সংহতির বাণী শোনাচ্ছে। ভারতবর্ষ মানুষের হৃদয়ে দেবত্বের মূর্তি রচনা করে তৃপ্ত হয়েছে। এদেশ প্রাণের মধ্যে মহাপ্রাণকে, খণ্ডের মধ্যে চিরকালই অখণ্ডকে আবিষ্কার করেছে। তাই এদেশের প্রাণধর্ম এতো বলিষ্ঠ। ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই বহু পঠিত ও বহু কথিত উক্তি দিয়েই বলা চলে—"এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা বিপত্তি দুর্গতি সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।" অধুনা জগতের চিন্তানায়কগণের মধ্যেও একটি বিশেষ চিন্তা জেগেছে—মানবজাতির ঐক্য সাধন। জগতে একই জাতি—মানবজাতি, একই ধর্ম—মানবধর্ম, একই সমাজ—মানবসমাজ। আধুনিক যুগের মানবধর্মবাদ (Humanitarianism), শান্তিবাদ প্রভৃতি মতবাদে এই চিন্তাধারাই অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

ভারতবর্ষের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জাতীয় সংহতি বিচার করতে হবে। ভারতের মর্যাদা শুধু বিস্তৃতিতে নয়, বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু জাতির মিলিত ঐক্যই ভারতের আসল মর্যাদা চিহ্নিত করে। এ কথা ঠিক অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতে কঠোর জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত। এই জাতিভেদ যে অনেক সময় সংহতির বিনাশ সাধন করেছে তাও অস্বীকার করা চলে না। ব্রাহ্মণ্যযুগে ব্রাহ্মণেতর জাতির শিক্ষার পথ সুগম ছিলো না। বৌদ্ধযুগে এই অবিচার অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়েছিলো, জাতীয় সংহতি উৎসাহিত হয়েছিলো। একদিক থেকে বলতে গেলে ভারতের ইতিহাস আঘাত ব্যাঘাতের ইতিহাস, জয়-পরাজয়ের ইতিহাস। মুসলমান আমলে দেশে সংহতি অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়েছিলো। বহু দুর্ধর্ষ মুসলমান শাসকের রাজত্বকালে হিন্দুদের জীবন বিপন্ন হয়েছিলো এবং কিছুকালের জন্য জাতীয় সংহতি অপসৃত হয়েছিলো। এর ফলেই দেখা দিয়েছিলো শিবাজী প্রমুখ হিন্দুবীরের নেতৃত্বে নতুন শক্তির উত্থান। আবার দেখা দিয়েছিলো দেশব্যাপী জনজাগরণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংহতির পরিপুষ্টি।

এরপর ইংরাজ আমল। ইংরাজ জাতি ছিলো চতুর। ভারতের জাতীয় ঐক্যের প্রতি তারা কোনদিনই আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করে নি। কারণ জাতীয় ঐক্য তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিলো। তাই তারা ভেদ-নীতির সাহায্যে দেশের ঐক্যকে বিনষ্ট করবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলো। তাদের উদ্দেশ্য যে অনেক পরিমাণে চরিতার্থতা লাভ করেছিলো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবুও তারা পরিপূর্ণভাবে এই ঐক্যকে ধ্বংস করতে পারে নি। বিজাতির বিরুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের লোকের মনে তীক্ষ্ণ আক্রোশ দানা বেঁধেছিলো এবং তাই একদিন বারুদের মতো ফেটে পড়েছিলো। তখন সকলের মুখে একই কথা—'স্বাধীনতা চাই'; একই বুলি—'ইংরাজ ভারত ছাড়।' সেদিন না ভাষা, না ধর্ম, না জাতিগত পার্থক্য—সংহতি গঠনে বাধার সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু এই ঐক্যকে বিনাশ করতে ইংরাজদের পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় নি। বিশেষ করে ইংরাজ-কর্তৃক এ দেশে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিলো যে শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয়-শিক্ষার কোন আদর্শই ছিলো না। যতোখানি সম্ভব হয়েছে এ দেশের শিক্ষার বাহনগুলিকে সমূলে উৎপাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এলো লকের দর্শন এবং মিলটনের কাব্য। পুরোপুরিভাবে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হোল। আর সেইদিন থেকেই আমাদের জাতীয় জীবনে অবনতির দিন সুরু হোল। ইংরাজী শিক্ষাকে কঠোর সমালোচনা করে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, "English education in the manner it has been given has emasculated the English educated Indians, it has put severe strain upon the Indian students and has made us imitators." ইংরাজী আমলে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কোনরূপ অনুকূল মনোভাব প্রদর্শন করা হয় নি। অথচ অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে এক স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। তপোবনের শান্ত নিভৃত কোণে, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে এবং আরো অনেক আরণ্যক

মুনিদের আশ্রমে শিক্ষার যে বীজমন্ত্র উচ্চারিত হ'ত, বহু যুগের বিবর্তনে তা একটি স্বতন্ত্র আকার ধারণ করেছিলো। বহু শতাব্দীর সেই স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে একদিনেই অস্বীকার করার মধ্যে আর যাই থাক, গৌরব কিছু ছিলো না। ইংরাজ সরকারের বিকৃত মনোভাবে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে জাতীয় সংহতির অবনতি দেখা দিয়েছিলে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে জাতীয় জীবনের চারিদিকেই এসেছে পরিবর্তন। এই পরিবর্তন কোন বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ নয়। আজ যেন জীবনের কূলে কূলে নতুন আশ্বাস বাণী শুনতে পাচ্ছি। উনবিংশ শতাব্দীর বিক্ষুব্ধ সন্ধিক্ষণে জাতীয় জীবন থেকে যে সুস্থতা হারিয়ে গিয়েছিলো তা যেন আবার ফিরে আসছে। দেশের বুকে বেজে উঠছে নতুন জীবনের স্পন্দন। নতুন দিনের সোনালি সুখ-সম্ভাবনা ফুটে উঠছে পূর্ব আকাশের ললাটে। কিন্তু তবুও কি পরিপূর্ণভাবে জাতীয় সংহতি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তা হয় নি বলেই মনে হয়। কতকগুলি বিশেষ কারণে স্বাধীনতোত্তর ভারতেও জাতীয় সংহতি সুগঠিত হতে পারে নি। প্রথমতঃ ভাষার বিভিন্নতা যথেষ্ট গোলযোগ সৃষ্টি করেছে। ভাষাকে কেন্দ্র করেই অনেক রাজ্যে অশ্রদ্ধেয় মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। বোম্বাই এবং আসামে ভাষা-কেন্দ্রিক যে গোলযোগের উদ্ভব হয়েছে তা সংকীর্ণ প্রদেশিকতার নামান্তর মাত্র। ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্র। এখানে অনেক রাজ্যের অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেক রাজ্যই নিজস্ব সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। কিন্তু এই স্বতন্ত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হীন প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করেছে এবং তার ফলে জাতীয় সংহতির পরিপুষ্টি ব্যাহত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন মানুষের আচার আচরণে, কথাবার্তাতেও অনেক পার্থক্য রয়েছে।

কিন্তু আশার কথা—এতো প্রভেদ সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য আজো বলবৎ আছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যতো পার্থক্যই থাক, সেই পার্থক্যের অন্তরালে আছে সহজ ঐক্যের সুর। ভারতকে 'ভারত ইউনিয়ন' নামকরণের মধ্যেও এই সত্য লুকিয়ে আছে। আসল কথা আচার আচরণের পার্থক্যের চেয়ে ভাবনা চিন্তা ও ধ্যান ধারণার ঐক্য এখানে বড় করে দেখা দিয়েছে। এর পরিচয় পাওয়া গেছে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। সাম্প্রতিক বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জাকর ঘটনা কম্যুনিষ্ট চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ। এই আক্রমণে ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা যখন বিপন্ন হয়েছে, তখন স্বাধীনতা রক্ষা মানসে দেশের অভ্যন্তরে যে গণ জাগরণ দেখা দিয়েছিলো তা ভারতের সেই অটুট জাতীয় সংহতিরই প্রকাশ মাত্র। আসমুদ্র হিমাচল নব প্রাণোন্মাদনায় নেচে উঠেছে, দেশের শত শত তরুণ তরুণী মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। সৈনিকের কামান গর্জন করে উঠেছে নিশ্চল পাহাড়ের পরে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা মানসে। কোন স্বাধীন দেশের ইতিহাসে এমন অত্যাশ্চর্যকর ঘটনা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের চিন্তা নায়কেরা দেশকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন! ৯৬২ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের মহান রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন যে ভারত হয়ে উঠবে "a cohesive, purposeful pattern of society on the principles of unity, freedom, justice and co-operation." দেশ আজ নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে—নতুন মন্ত্রে সে এগিয়ে চলেছে উন্নতির শীর্ষ চূড়ায়।

ভারতের জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আলোচনা করার পরে প্রশ্ন থেকে যায় যে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় সংহতির উন্নয়ন সম্ভব কেমন করে? এ'কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে আজকের শিশুরাই আগামীকালের নাগরিক। আজ যাঁরা নিয়মিতভাবে পাঠরত, আগামীকালে তারাই হবে দেশের কর্ণধার। সেই হিসাবে প্রত্যেক শিশুকে সুনাগরিক করে গড়ে তুলতে গেলে শিক্ষকদের এ বিষয় বিরাট দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব আছে শিক্ষা বিভাগের, দায়িত্ব আছে সরকারের। এই প্রসঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে 'committee on Emotional Integration' এর মত খানিকটা তুলে দেওয়া গেলো—"If universities are to play an effective part in providing leadership and fostering the necessary climate for emotional integration

*

ধ্য দিনে

বিজয় দাশগুপ্ত
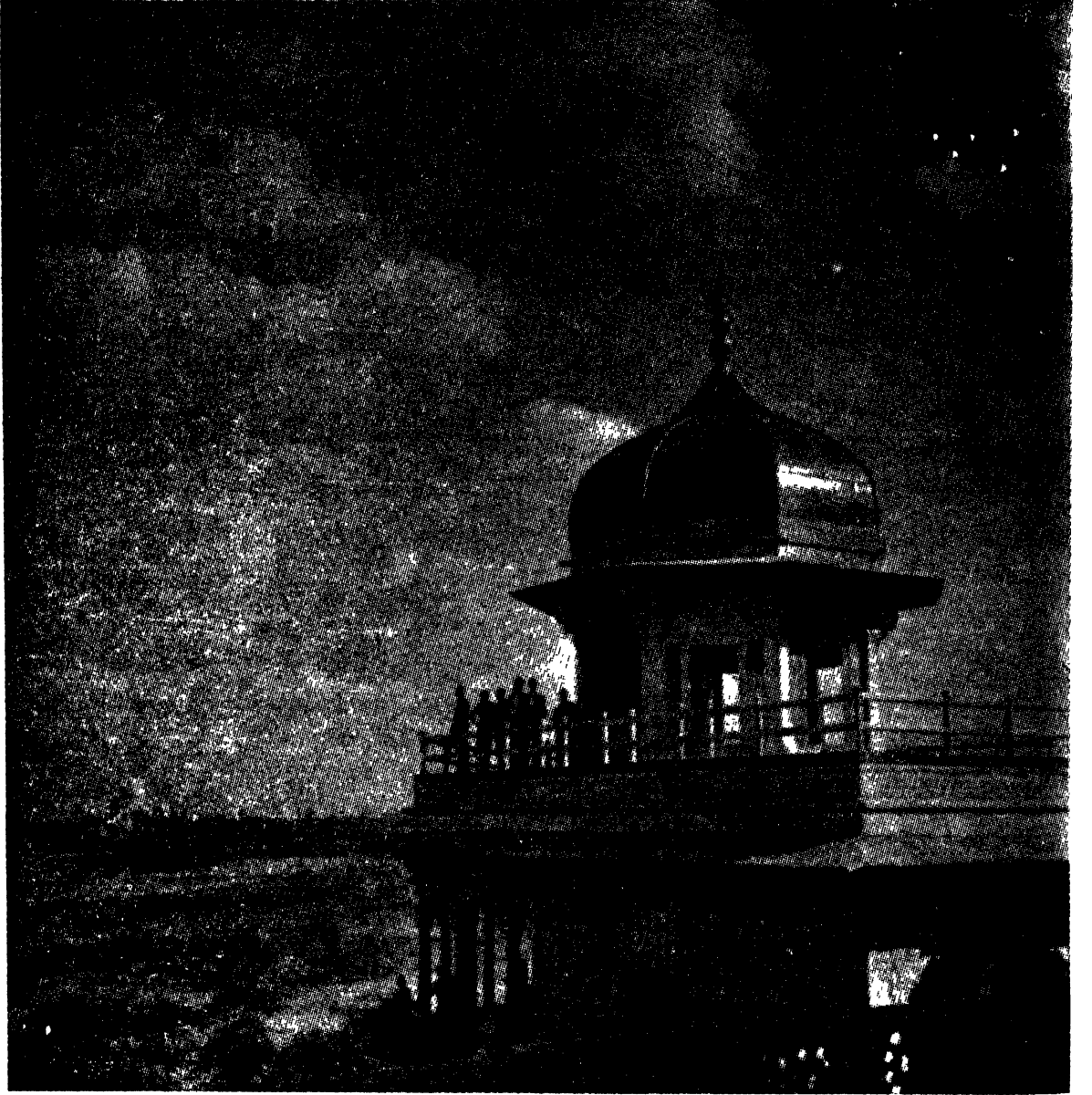
আগ্রা ফোর্টের একাংশ

ফটো : দীপক চন্দ্র

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

they must maintain uniformally high standards through a judicious basis of admission and the recruitment of staff on the basis of academic qualifications, character and personality." এই কমিটি অনেকগুলি পরামর্শ দান করেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের নীতির পরিবর্তন সাধন, ভাষাগত বিরোধের নিষ্পত্তি, বিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন সাধন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবর্তন আনয়ন, বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রমের সংস্কার, টেক্সট বই-এর সঠিক নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিটি সর্বসমেত ২১৩টি পরামর্শ উপস্থাপন করেছেন।

জাতীয় সংহতি সাধনের দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। নিছক ভাবপ্রবণ বক্তৃতা এবং কিছু কিছু পুস্তক প্রকাশেই এই কর্তব্য সম্পাদিত হতে পারে না। যে সমস্ত বিদ্যায়তন-শৈশব থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবী নাগরিক এবং সুস্থ চিন্তার অধিকারী করে গড়ে তোলবার জন্য দায়ী, সেই সমস্ত বিদ্যায়তনই জাতীয় ঐক্য গঠনে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। বিদ্যালয়গুলিই ছেলেমেয়েদের দেশকে সত্য করে চিনিয়ে দিতে পারে। সেইজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে এমন আদর্শের ছায়াতলে পুষ্ট হতে হবে—যাতে সেগুলি জাতির উদ্দেশ্য সাধনের পথে সহায়ক হতে পারে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। শিক্ষার উন্নয়নে সরকার অনেক পরিমাণে যত্নশীল হয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু যতোখানি যত্নশীলতা জাতীয় সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে অনুকূল ততোখানি যত্নশীলতা আজো আসে নি। আজো স্বাধীনতা প্রাপ্তির সতের বছর পরেও সকল রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন সমতা বা সমধর্মিতা আসে নি। সত্যি বলতে কি প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই রাজ্যের স্বতন্ত্র মনোভাব অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মাননীয় জাতীয় সরকারের উচিত হবে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করে সংহতিমূলক শিক্ষাদর্শের প্রতিষ্ঠা করা। কারণ প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি খুব বেশি পার্থক্য থাকে তাহলে সেই পার্থক্য ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এমন ছাপ ফেলবে, যা হবে ভবিষ্যকালে সংহতি গঠনের পথে প্রতিকূল।

ভাষাগত বিরোধ দেশের সংহতি সাধনের পথে একটি অন্যতম অন্তরায়। বহু ভাষা-ভাষী দেশ ভারতবর্ষ। এখানে বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। এই ভাষাগত বিরোধ দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধক। যদিও এই ভাষাগত বিরোধের মীমাংসা সহজ নয়, তবুও এই বিরোধ মীমাংসার জন্য ন্যায়সঙ্গত উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। আসল কথা সকল বিরোধের উৎস মানুষের অজ্ঞতা, হীনমন্যতা ও সার্থক শিক্ষার অভাব। শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েরা যদি একই বৃহত্তর আদর্শের ছায়াতলে লালিত পালিত হয় তাহলে ভাষাগত বিরোধ তাদের ভাবী জীবনে অন্যায় দলাদলি ডেকে আনতে পারে না। এই বৃহত্তর আদর্শের শুভ উদ্বোধন হওয়া উচিত শিক্ষার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দায়িত্ব সর্বাধিক।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। আজো বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা গতানুগতিক পথে প্রবাহিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের পরিপন্থী। সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটাই হয়েছে দায়সারা গোছের। এতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই হয় বেশি। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের দিকে আগে লক্ষ্য দিতে হবে। কারণ নিছক জ্ঞানার্জন শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না। শিক্ষা যদি ছাত্রছাত্রীদের মানসিক প্রসারতা সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষা ব্যর্থ। Raymond তাই বলেন, "The teachers ultimate concern is to cultivate nor wealth of muscles, nor fullness of knowledge, nor refinement of feelings,but strenght and purity of character." চরিত্র গঠন ছাড়া শিক্ষা শিক্ষাই নয়। যে ছেলে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী, তার মানস প্রবৃত্তি অনেক উন্নত। আর উন্নত মানস প্রবৃত্তি জাতীয় ঐক্য গঠনে সহায়ক। Mudaliar commission ও বলেন The supreme end of educative process should be the training of character and personality of students in such a way that will be able to realise their

full potentialities and contribute to the well-being of the community,

জাতীয় সংহতির উন্নতি সাধন করতে হলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদীক্ষাও যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করে চালাতে হবে। অসংখ্য নাগরিক নিয়েই তো জাতি—সুতরাং জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করে নাগরিকের সামগ্রিক মঙ্গল সাধনের উপর। প্রত্যেক মানুষের চিন্তাধারাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমা ভেঙে ফেলে সামগ্রিক কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে। জীবন নিজের জন্য নয়, পরের জন্য। শিক্ষার মাধ্যমে পরার্থপরতা-বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। John Deway ঠিকই বলেছেন—"Education has a responsibility for training individuals to share in this social control instead of merely equipping them with ability to make their private way in isolation and competition."

সার্থক শিক্ষার মাধ্যমে মনের সাবলীলতা বাড়ে। ছেলেমেয়েরা যাতে সব কিছুই খোলা মন নিয়ে বিচার করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিক্ত সংস্কারাচ্ছন্ন মন কোনদিনই সুস্থ চিন্তার উদ্রেক করে না। জাতীয় সংহতি তখনই সুচারুরূপে গঠিত হতে পারে যখন দেশের প্রতিটি মানুষ সংস্কারমুক্ত খোলা মন নিয়ে সব কিছু বিচার করতে শিখবে এবং হৃদয়ের প্রসারতা হেতু সকলকে আপন করে নেবার উৎসাহ বোধ করবে। এ কথাও ঠিক—এই গুণগুলির অনুশীলনের প্রকৃষ্টতম স্থান বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনে যদি শিক্ষার্থীরা একটি সুস্থ সুন্দর স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় পরিবেশে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলবার শিক্ষা পায়, তবে তারা নিজ জীবনেও উন্নততর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত পাঠক্রমের পরিবর্তনের কথা বলতে হয়। বিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের অনুকূল নয়। এই পাঠ্যক্রম ছেলেমেয়েদিগকে গ্রন্থ-পণ্ডিত করে তোলে, কিন্তু সার্থক শিক্ষাদান করতে পারে না। সেইজন্য পাঠ্যক্রমে এমন পরিবর্তন আনতে হবে যা হবে ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনে, মানসিক সাযুজ্য বিধানে, গঠনশীলতা, সংবেদনশীলতা ও সহযোগিতাবোধ সৃষ্টির উপযোগী। 'টেকস্ট বই নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। টেকস্ট বই নির্বাচনের কমিটি আছে ঠিকই, কিন্তু সেই কমিটি পুস্তক নির্বাচনে যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন না। পুস্তক নির্বাচনে বিজ্ঞতার অভাব শিক্ষার বুনিয়াদকে দুর্বল করে তোলে। এই কার্যটি যথেষ্ট তৎপরতা এবং যত্নশীলতার সঙ্গে সমাপ্ত হওয়া উচিত। সেই শিক্ষার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে টেকস্ট বইগুলি যাতে যথেষ্ট সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

জাতীয় সংহতিগঠনে Sampurnananda committee এর কোন কোন পরামর্শও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। এই কমিটির মতে বৎসরে দুইবার শিক্ষার্থীদের দেশসেবার শপথ গ্রহণ করতে হবে। সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের একই uniform বা পোষাকের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কমিটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দান করেছেন। কমিটি বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষক বিনিময়ের উপর জোর দিয়েছেন। এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অন্য বিদ্যালয়ে গিয়ে পঠন পাঠনায় অংশ গ্রহণ করলে ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে অনেকটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাকে এড়ানো সম্ভব হয়, অপরদিক শিক্ষার্থীদিগকে বৃহত্তর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলা হয়। কমিটি বলেন—বিদ্যালয়গুলিতে বর্ণগত বিভেদ স্বীকার করা হবে না। নিখিল ভারত যুবসংস্থা গঠন করে জাতীয় সংহতি গঠনের পথ অনেকটা প্রশস্ত করা যেতে পারে। কমিটি আরো বলেন যে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এমন একটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যে বিষয়টি জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেবে।

জাতির জীবনে জাতীয় সংহতির মূল্য অপরিমেয়। জাতীয় সংহতি গঠন করতে গেলে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় আদর্শকে তুলে ধরতে হবে। শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য দেশের মহান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে দেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত না থাকলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। কোন দেশের ভাবধারা ও সংস্কৃতির মধ্যেই থাকে সেই দেশের জাতীয় আদর্শ। তাই সংস্কৃতির সঙ্গে

পরিচিত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দেশের ধ্যান-ধারণা চিন্তাধারা সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচিতি দান ব্যতিরেকে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

সাম্প্রতিককালে জাতির জীবনে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজন সর্বাধিক। ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা বহু কষ্টার্জিত। স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে আছে অনেক ত্যাগ, অনেক সংগ্রাম। কিন্তু তবুও স্বাধীনতা লাভ করা যতো বড় না হোক, স্বাধীনতা রক্ষা করা তার চেয়ে অনেক বড়। আজ আমরা যদি এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে অক্ষম হই, তাহলে বিশ্বের কাছেই আমরা হব উপহাসাস্পদ! তাই আজ যদি আমাদের স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে বড় পরিচয় হবে আমরা বাঙালী নই, বিহারী নই—আমরা ভারতবাসী—ভারতবর্ষ আমাদের জননী। দেশের জনগণের মধ্যে এই অনুপম ভাবাদর্শ সঞ্চারিত করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রকে আরো প্রসার, আরো সক্রিয় এবং আরো উন্নত করে তুলতে হবে।

চণ্ডাল

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

জনাকীর্ণ সহরের সঙ্কীর্ণ শ্মশান,—
শব দেহ পোড়াবার অভাগা ভাগাড়।
শ্রেণীবদ্ধ শব শুধু আসে অনিবার :—
সৎকার-পিপাসা হেথা চির-বহ্নিমান।
যন্ত্রীভূত চণ্ডালেরা লুব্ধ অন্ন-পান
সাগ্রহে লুফিয়া লয় সম্মুখে চিতার;
নিষ্করুণ নিষ্প্রাণতা সজীব সত্তার,
নিঃসাড় করিয়া তোলে স্পর্শাতুর প্রাণ।
শ্মশান-শিয়রে যা'রা জাগ্রত প্রহরী
মৃত্যুর মহিমা যদি আস্বাদিতে নারে,
শ্মশানেরে তোলে যদি আস্তাকুড় করি',
মৃত্যু পরিণতি পাবে যান্ত্রিক-ভাগাড়ে
জীবনও যে হায় হায়! চিতা-দীপ ধরি'
সেতু কবে গড়া হবে এ-পারে ও-পারে?

২

হেরিবে না মূঢ় নর অন্ধ অংকারে
মহাকালেশ্বর-মূর্ত্তি শ্মশান-শিখায়!
যান্ত্রিকতা পর্যুদস্ত করিবে কি হায়
শ্মশানেরও মহাশান্তি স্থূলতার ভারে?
লোলা-দীর্ণ দৈন্যাতুর দেহ-মৃত্তিকারে
চিতা-বহ্নি করে শুদ্ধ দীপ্ত বর্ত্তিকায়,
শাশ্বত সুন্দর মূর্ত্তি অমিত আভায়
সপ্রকাশ হয় শুধু হেথা যম-দ্বারে।
শ্মশানেও ব্যাপিয়াছে ব্যবসায়িকতা;
হে চণ্ডাল, সুপবিত্র শ্মশান-প্রহরী,
সহস্র চিতায় ভস্ম কর এ লোলতা;
বিভ্রান্ত বিলাপী চিত্তে চিত-দীপ ধরি'
অমরাবতীর স্বাদু অমৃতময়তা
এনে দাও,—ধন্য হবো সুধা-পান করি'।
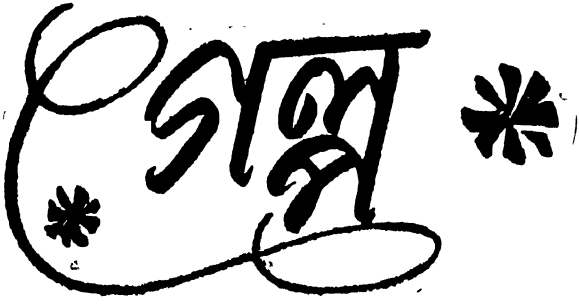
মুকুল

বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মুকুল নামটি শুনতে লাগে বেশ। দেখতেও সে সুন্দরী। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গেই সে রূপে ঘর আলো করেছিল। কিন্তু যতখানি সে রূপ নিয়ে এসেছিল যদি সে তাহার কণামাত্র সৌভাগ্য নিয়ে আসত তবে সে বিশেষ ভাগ্যবতী না হলেও দুর্ভাগ্যবতী হত না। কিন্তু সে তাহা পারেনি। পিতামাতার নয়টি সন্তানের সে একটি। যা অনিবার্য্য তাই ঘটেছে এ ক্ষেত্রে। আদর যত্নে লালিত হওয়ার সুবিধা ও সৌভাগ্য সে হারিয়েছে। তবুও অযত্নে অবহেলায় আজও তাহার সৌন্দর্য্য অনেকখানি অটুট আছে। তার পিতা মহিম চাটুজ্যের কেমন আশ্চর্য্য লাগে যে এতগুলি সন্তানের তিনি জনক। আর ঐ ওধারের বড় রাস্তার প্রকাণ্ড বাড়ীর মালিক নিঃসন্তান। আজকালকার ছেলেরা যাই বলুক ভগবান যদি না ইচ্ছা করতেন তো এতগুলি পুত্র কন্যা কি তাঁর স্ত্রীর গর্ভে জন্ম লাভ ক'রে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতো। তিনি গরীব, তবু নিঃসন্তান হ'লে তাঁর যথেষ্ট সুবিধাই হ'ত। ভগবানের এই কারসাজিতে তাঁর রাগ ধরে।

যাই হোক্ আমাদের মুকুলকেই প্রয়োজন, তার বাবাকে নিয়ে টানাটানির বড় বেশি দরকার নেই।

মুকুল সুন্দরী মেয়ে বটে। তবে বয়স্থা মেয়ে নয় যাকে নিয়ে প্রেমকাহিনী রচনা করা চলে। সে নয় বছরের বালিকা। সকলের মত তারও জীবনে রাত্তির ও দিনটা এসে পড়তো। তা' কি ভাবে সে কাটাতো দেখা দরকার। ভোরে উঠে ও রাত্তিরে শোওয়ার মাঝখানে যে সময় তা তার মার ফাইফরমাস খেটে চলতো।

কুলিমজুরদের জীবন সম্বন্ধে বড় বেশি কিছু ধারণা নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি যে সদাব্যস্ত একটি চায়ের দোকানের 'বয়' বা ছোঁড়াকে যদি মুকুলের মত ফাই ফরমাস খাটতে হতো, তবে সেও বোধকরি সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলতো। ভোর হতেই মা ডাকেন, "মুকু ওঠ মা, বেলা হয়ে এল। এ মার প্রথম সম্বোধন। ঘুমন্ত পুরী হতে ক্লান্তি ভরা মুকুলকে জাগাবার পক্ষে এ যথেষ্ট নয়। তার সাড়া মিলতো না। সঙ্গে সঙ্গে মাও মারমুখী হয়ে উঠতেন। মর চোখখাগী, কত বেলা অবধি ঘুমুবি, ওঠ না।"

এ ডাক যেন রূপকথার জীবনকাঠি। বলা মাত্র মুকুল সকল ক্লান্তি ঠেলে বিছানায় উঠে বসতো ও ক্ষণ পরেই দাঁড়িয়ে উঠতো। তারপর মুখ হাত ধুয়ে চা করতে বসতো। সরঞ্জাম খুব সরল ও সংক্ষিপ্ত। একটা হাতল ভাঙা কাপ ও এনামেলের চটা-ওঠা-গেলাস। এলুমিনিয়ামের একটা গামলায় জল গরম হ'তো ও তার মধ্যেই চায়ের পাতা ভিজতো। পাত্র দু'টি ভরে দিত মুকুল। তার বাবা মা সেই অতি স্বল্প দুধ ও চিনি সংযোগের রক্তবর্ণ চা যত শীঘ্র সম্ভব শুষে নিয়ে ছুটতেন নিজেদের কাজে। এর পর মুকুল একটির পর একটি ভাই বোনদের চা ও ভাঙা বিস্কুট খাওয়াতো। নিজের বেলায় মুকুলের যদি বা চা জুটতো তো কদাচ বিস্কুট মিলতো।

দুগ্ধ পোষ্য গুটি দুই শিশু ছিল মুকুলের মার। তাদের বৎসর খানেকের জীবনে দেহের কোথাও সবলতার চিহ্ন না থাকলেও কণ্ঠের সামর্থ্য ও স্বরের তীব্রতা যথেষ্ট ছিল। প্রভাত বন্দনার দ্বারা তারা সুরু করতো ও সমাপ্ত করতো, সন্ধ্যার স্তবে যদি নিদ্রা শীঘ্র আসতো।

এ হেন দুটি পুষ্টিহীন ও অর্দ্ধাহারী ক্ষীণজীবী প্রাণীর ভার মুকুলের হাতে ফেলে দিয়ে তার মা নিশ্চিন্ত হয়ে এক-মনে গৃহকার্য্য ক'রতেন। মুকুল তাদের প্রাণপণ যত্ন ও অপটু হাতের সেবা দিয়া ভুলাতে চেষ্টা করতো। তাদের কোলে নিয়ে নানা রকম আদর আপ্যায়ন করতো ও

মাঝে মাঝে একটা ফিডিং বোতল মুখে পুরে দিত। সেই দুগ্ধরূপী জলের মেকি স্তন্যে মেয়ে দুটার পেট ভরতো না ও খানিক টেনে তারা ব্যর্থ হয়ে দ্বিগুণ বেগে চীৎকার শুরু করতো। তখন মুকুলকে তাদের কোলে নিয়ে জিনিস ঠাসা স্বল্প পরিসর ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে হ'তো। তারপর তাদের শুইয়ে দিয়ে ছিন্ন বিছানা পত্র ঘরের এক কোণে জড় করে ঝাঁট দিতে হ'তো ঘর দোর। এক দিকে তার সুবিধা ছিল, কারণ ঐ একখানা ঘরেই তাদের সমস্ত সংসারটিকে সঙ্কুলান করা হয়েছিল। এই বার কাপড় চোপড় কাচতে ও বাসন মাজতে তাকে নেমে আসতে হ'তো অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে সাঁজের কলতলায়।

এই অন্ধকার ভরা গহ্বরটি একটি আশঙ্কার বস্তু। এখানে অতি সাবধানে পা চালালেও শেওলা ধরা শানে আছাড় খাবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। বাড়ীর এমন কেউ নেই যে এখানে দু একবার না পিছলে আঘাত পেয়েছে—মুকুলও বাদ যায় নি। এর উপর চারিদিক আঁটা সাঁটা স্থানটি দুর্গন্ধে ভরপূর হয়ে আরও মনোরম হয়ে উঠেছে। এই খানেই ঘণ্টা দু'ই ধরে কাড়াকাড়ি করে জল নিয়ে মুকুল বাসন ধুয়ে, কাপড় কেচে ও স্নান সেরে উপরে আসতো। এসেই সে যে কিছু পান করে পিত্তি পড়া নিবারণ করে বিশ্রাম করবে এমন সম্ভাবনা নেই। তার আসবার বহু পূর্ব্ব থেকে বোন দু'টি তীক্ষ্ণ চীৎকার করে করে ককিয়ে উঠেছে। ভিজে কাপড়েই মুকুল বাসন কুসন ফেলেই এদের শান্ত করতে লেগে যায়।

মেয়ে দুইটি তার মায়ের, কিন্তু কার্য্যগতিকে হয়ে দাঁড়িয়েছে মুকুলের। শুধু তাই নয়, মুকুলের মা এত সহ্য করতে পারেন, কিন্তু ঐ দুটি শিশুর ক্রন্দন তাঁর একদম বরদাস্ত হয় না। তাদের কান্না শুনলেই তিনি মুকুলের উপর মারমুখী হয়ে উঠেন। "আ মর চোখখাগী, একটু ভোলাতে প্যারিস না ওদের, বুড়োমাগী তিন ছেলের মা হতিস বিয়ে হ'লে। মুকুল যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে এমনি ভাবে ভয়ে জড়সড় হয়ে নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

গালাগালটা ভদ্রতা সঙ্গত নয়। ছাপার অক্ষরে পড়বার উপযুক্ত নয়। কিন্তু ভদ্রস্ত্রীলোকও অবস্থার ফেরে অভাবে অনটনে ও রোগে উদ্ভ্রান্ত হয়ে আপন সন্তানকে এমনি অকথ্য সম্ভাষণ করে বসে।

মা চলে গেলে মুকুল রাগে গরগর করে উঠে। যখন নিশ্চিত বোঝে মা এক টেরের রান্না ঘর রূপ খোপে প্রবেশ করেছেন তখন মার উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ গালাগালির স্তোত্র মুখস্ত বলে। তা'তেও তার রাগের উপশম হয় না, বরং বেড়ে উঠে। মুকুলের ইচ্ছা করে মেয়ে দুটোকে ঘা কতক দিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের মুখের দিকে তাকালেই মুকুলের জমাট ক্রোধ তুষারের ডেলার মত দ্রব হয়ে আসে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মুকুলের জীবনযাত্রার বর্ণণা নিষ্প্রয়োজন। তার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জীবনের গতিরূপ অনুমান করা সোজা।

বোধহয় এমনি ক'রেই মুকুলের জীবন কাটতো। আর জীবনের গতিপথটি ক্রমেই অসুবিধা সঙ্কুল ঘনীভূত হয়ে উঠতো। তারপর বিবাহযোগ্যা হলে হয়তো একটা কিছু উপায় হলেও হতে পারতো।

কিন্তু হঠাৎ সব কিছুই ওলট পালট হয়ে গেল। ভগবান্ নির্দ্দয় নন। মুকুলই রোগকে আশ্রয় ক'রল, কি রোগই মুকুলকে আশ্রয় ক'রল বলা কঠিন। মোটের উপর মুকুলের একটা হিল্লে হ'ল। যক্ষ্মা যাকে ধরে তাকে সসম্মানে গ্রহণ না ক'রে ছাড়ে না। তার যদি কিছুমাত্র রস বোধ থাকতো তো বুঝতো যে শুষ্ক মুকুলের দেহ শুষে খেয়ে তার প্রচণ্ড ক্ষুধার উপশম হবে না।

ক'দিন হ'তে মুকুলের জ্বর ছাড়ছিল না। অত্যন্ত অনিচ্ছায়ই মুকুলের বাবাকে একবার মুকুলকে রিক্সা ক'রে ডাক্তারের ডিস্পেন্সারিতে নিয়ে যেতে হ'ল। দিনটা রবিবার। ও ছাড়া মহিমের সুবিধাও হয় না।

বিনা মেঘে বজ্রঘাতের মতই ডাক্তারের কথাগুলো এসে মহিমকে আঘাত করল। ডাক্তারের কাছে মহিম যা শুনলেন তাতে তিনি একেবারে হতবাক্ হয়ে গেলেন।

আকস্মিক বেদনার আঘাতে তিনি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

কর্ত্তব্য নির্ণয়ের শক্তিটুকু অবধি তাঁর কয়েক ঘণ্টা ছিল না। প্রায় মধ্যাহ্ন শেষে মুকুলের মা যখন অবসর পেয়ে তাঁর শিথিল দেহটাকে মেঝের উপর ফেলে দিলেন তখন মহিম কাছে পেয়ে কথাটা তাঁকে বলে ফেল্লেন।

ডাক্তার বলছে মুকুলের যক্ষ্মা হয়েছে—তার আর আশা নেই। পক্ষাঘাত হলে যেমন মানুষ নড়তে পারে না তেমনি ভাবেই হেমাঙ্গিনী কয়েক মিনিট অসাড় হয়ে রইলেন। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, "মাগো! একি করলে ভগবান।…হাঁ গো, মেয়েটার কি হবে।"

শুষ্কস্বরে মহিম উত্তর দিলেন, "যা আর পাঁচ জন গরীবের মেয়ের হয় তাই হবে—মরে যাবে।

"বেঘোরে মেয়েটা মরে যাবে।" আর আমরা তাই বাপ মা হয়ে দেখ্‌বো। "হেমাঙ্গিনী এইখানেই থামতে পারলেন না বললেন, "ঘটি বাটি বেচে আমার যা কিছু আছে সব বেচে কিনে মেয়েটাকে বাঁচাও।"

এত দুঃখেও ক্ষীণ হাসির রেখা ক্ষণিকের জন্য ফুটে উঠল মহিমের মুখে। প্রত্যুত্তর মুখেও আসছিল, ঘটি বাটি যা আছে তা, নগণ্য। এই আক্রার বাজারেও ভাঙা-চোরাগুলো বেচলে হয়তো গোটা দশ টাকা হবে। আর তোমার নিজের যা কিছু তো এক জোড়া রুলি। তা দিয়ে এই ধনী রোগটির ক' দিনের চিকিৎসা হবে।"

কিন্তু তিনি থেমে গেলেন। সত্যই স্ত্রীকে কখনও আরাম বা কোন সুখ দিতে পারেন নি। যদি সে এই বীভৎস দুঃখের মধ্যে একটুখানি তৃপ্তি পায় তো পাক্‌ না। আপনার ভুল সে বুঝতে পারবেই।

বোধহয় পেরেছিলেনও হেমাঙ্গিনী এবং তাই বুঝি নীরবেই চোখ মুছতে লাগলেন।

হাঁক পাঁক করা ছাড়া মুকুলের বাপ মা কিছুই করতে পারছিলেন না তার জন্য। করবেনই বা কি? তাঁদের সমস্ত সময় ব্যয় হয়ে যায় সংসার ও আফিসের কাজে। মাস মাহিনার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হয়েও খাদ্যের ব্যয় সংকুলান হয় না। বাহির হতে দেখলে মনে হয় এদের বুঝি কিছুই স্পর্শ করে না। সহিতে সহিতে এরা এমনই নির্মম হয়ে উঠেছে যে, হৃদয়ের করুণা ও স্নেহ মমতার উৎস বুঝি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু এ দু'টি নরনারীর অন্তর যদি মুক্ত করা সম্ভব হ'ত তো দেখা যেত যে সেখানে রাবণের চিতার মতই দুঃখাগ্নি প্রজ্জ্বলিত দুঃসহ উত্তাপ সব কিছু খাক্‌ ক'রে মনের মধ্যে শুধু দুঃখের মরুভূমি রচনা করেছে। তাই বুঝি বুকের জালায় জলে মরলেও এদের চোখে জল দেখা দেয় না। এর উপর আর এক উৎপাত দেখা দিল। রোগটি ছোঁয়াচে ও মারাত্মক। একে সকলেই ভয় ক'রে থাকে ও পরিত্রাণ পাবার জন্য সব কিছু করে থাকে। নিজেদের কথা ছেড়ে দিলাম। প্রথম প্রথম মহিম ও তাঁর স্ত্রী অন্য ছেলেমেয়েগুলিকে ছোঁয়া-ছুঁইর হাত থেকে উদ্ধার করবার ও নিজেরা একটু সাবধানে চলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেটাও চেষ্টার কামনা মাত্র, তারপর অসম্ভব বুঝে সে বিপর্য্যয় আর ঘটাননি। কিন্তু গোল বাধল অন্য ভাড়াটেদের নিয়ে। জানাজানি হতে দেরী হল না। তারা বাড়ীর মালিককে ধরলে মহিমকে তুলে দিতে হবে। যেকোন কারণেই হোক বাড়ীর মালিক গররাজি হয়ে নূতন আইনের দোহাই পেড়ে রক্ষা পেলেন। এই খানেই যবনিকা পড়ল না। এবার সকলে জেদ ধরলে যে মেয়েটাকে বাড়ীর যেখানে সেখানে যেতে দেওয়া চলবে না। সঙ্কট বড় কঠিন। মেয়েটাকে ঘরে বন্ধ করে রাখলে কাজ চলেনা। অথচ প্রতিবাসীরা প্রতিবাদ শুরু করল। "লাভ্‌ দাই নেবার" বাইবেলের এই নীতি অনুসরণ ক'রতে বড় একটা কাউকে দেখা গেল না। প্রথমে প্রতিবাদ খাদেই ও নেপথ্যেই হয়েছিল। তারা ভেবেছিল এতেই কাজ হবে। তারপর যখন তা হল না তখন সকলে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করলো। তাদের চীৎকার ক্রমে উচ্চসপ্তকে গিয়ে ঠেকল। এতগুলি লোকের সশব্দহুঙ্কার মহিমের অস্থির মাথাটাকে আরও অস্থির করে ফেললে। তিনি ভয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

হেমাঙ্গিনী দুঃখে ব্যথায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। এবার তিনি এগিয়ে এলেন। হেমাঙ্গিনীর একটা সুবিধা ছিল যে এই গাল পাড়াপাড়ির ঝগড়ায় সামনে ছিল মেয়েরা. আর পিছনে ছিল পুরুষরা। হেমাঙ্গিনীর এবার আর একটা কাজ বাড়ল। তাঁকে কাজ ক'রতে ক'রতে সমান তালে বিবাদ ক'রতে হ'ত। তাঁর তপ্ত দেহ মনের শাপ গাল খুব উতপ্তই হ'ত। অনেকেই সে তাপ সহ্য ক'রতে না পেরে পেছিয়ে গেল বা সরে পড়ল। কিন্তু এ যুদ্ধে সবার বড় ঘা খেয়েছিল মুকুল। তাকে হিতৈষী প্রতি-বাসীরা তার যে ভীষণ একটা কিছু হয়েছে ও কারো কাছে আসা বা ছোঁওয়া যে তার পক্ষে অপরাধ এ কথা বোঝাতে ত্রুটি করেন নি। নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই তাকে তাঁরা

রোগের নামটি ও আসন্নমৃত্যু সঙ্কটের খবর জানান নি। তা'ছাড়া মেয়েটা সাবধান হ'লেও তাঁদের অনেক সুবিধা।

মুকুল পারতপক্ষে কারো সুমুখে আসতো না। একে বেচারা ভীতু, রোগগ্রস্তা, তার উপর তাকে নিয়ে যে তার বাপমাকেও ঝঞ্ঝাটে পড়তে হচ্ছে তা' বুঝতে পেরে সে আকুল হয়ে উঠল। কি তার করা উচিত শিশুর কোমল অন্তরে তা' ঠিক ধরতে না পেরে সে দিশাহারা হয়ে পড়ল। এমনি অবস্থায়, নির্জ্জনে হঠাৎ একদিন কেঁদে ফেলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রলে, "হয় আমার রোগ সারিয়ে দাও আর নয় আমায় শীগ্‌গির্ মেরে ফেল ঠাকুর।"

অবশেষে সব কিছু গোলোযোগের নিষ্পত্তি ক'রে মুকুল নিজেই নিস্তেজ হয়ে শয্যা নিল।

আজ আট দিন হল মুকুল বিছানায় পড়েছিল। জরও ছাড়ছিল না অন্য উপসর্গও বাড়ছিল। মহিমই সকালে আফিস যাবার আগে ও সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে তার পাশে এসে বসতেন। বড় একটা কেউ মুকুলের কাছে আসতো না। কারণ ভাই বোনদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার আদেশ ও উপদেশ দেওয়া ছিল। হেমাঙ্গিনীর অবসর হ'তো না সেবা করবার বা কাছে বসবার। মাঝে মাঝে ঔষধ ও পথ্য দিয়ে যেতেন মাত্র ও থার্ম্মোমিটার দিতেন। শুধু মধ্যাহ্নের শেষ দিকে, স্বল্প অবসর পেয়ে হেমাঙ্গিনী মেয়ের পাশে এসে বসতেন। তারপর শিথিল হাতে তার অঙ্গে হাত বুলিয়ে স্নেহ বিলাতে বিলাতে তার পাশেই ঢলে পড়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। মুকুলই এক পাশে সরে এসে তাঁর মাথায় বালিস ঠেলে দিত। বেলা দেখে সচকিত হয়ে তাঁকে জাগিয়ে দিত। এমনিই হ'ত মুকুলের সেবা। আশ্চর্য্য, তবুও এই অভিযোগহীনা মেয়েটি কখনও কিছু চাইতো না। কখনও কাউকে ডাকতো না বা রাগ ক'রতো না। যোগী-ঋষি-দুর্লভ নির্বিকার ভাবেই চুপ ক'রে থাকতো।

প্রতিদিনের মত আজও মহিম সন্ধ্যায় মুকুলের পাশে এসে বসলেন। প্রতিদিনের মতই প্রশ্ন করলেন, কেমন আছ মা?"

মত সে এইখানেই আজ থামল না। ধীরে ধীরে ক্ষীণ স্বরে বললে—"বাবা আমি বাঁচব না।"

কথাগুলি এত অতর্কিতে মহিমের হৃদয়কে বিদ্ধ করে বসল, যে তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। শুষ্ক মুকুলের দেহটা বুকে জড়িয়ে হু হু ক'রে কেঁদে ফেললেন। কতক্ষণ কাঁদলেন জানিনা, কিন্তু বুকের কাছে শুনলেন অস্ফুট স্বরে সে বলছে, "বাবা মাকে বোল না।"

এই অস্ফুট কথা কয়টি মহিমের কান্নার বেগ আরও বাড়িয়ে দিল। মুকুলের ফোঁপানিও তার সহিত মহিম হৃদ্‌পিণ্ডের কাছে অনুভব ক'রলেন। এইবার মহিম বাধ্য হলেন নিজেকে অতি কষ্টে সংযত ক'রতে। সযত্নে মুকুলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আদর ক'রে চোখ মুছিয়ে মহিম বল্লেন, "না মা, তুমি কিছু ভেব না, দু'দিনেই তুমি সেরে যাবে, ডাক্তার ব'লেছে।"

মুকুল কোন জবাব ক'রল না। যেমন নীরবে শুয়ে ছিল তেমনিই পড়ে রইল।

"বেশি দিন তো বহিতে হয় না একটি জীবন ভার।" রবীন্দ্রনাথ অমনি একটা কিছু বোধহয় বলে গেছেন। মুকুলের সেইটেই হয়েছিল বড় সুবিধার। শুধু মুকুলেরই বা কেন তার বাপ মারও।

ডাক্তারের মামুলি আশা ভরসা বাদ দিলে বাকি থাকে মাত্র মুকুল বাঁচতে পারবে না। শুধু ভুগিয়ে এবং ভুগে মরবে। কাজেই সত্যের অপলাপ না ক'রলে বলতে হয়, তার উচিত শীঘ্র শীঘ্র সরে পড়া। অবশ্য বলতে বাধে তো বটেই। স্নেহ আছে করুণা আছে। কিন্তু এই সত্য। দুঃখ যিনি সৃষ্টি করছেন, তিনিই দুঃখীর জন্য এই বিধান দিয়েছেন। সেদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মেঘ করেছিল বলে সময়ের পূর্ব্বেই অন্ধকার হতে শুরু করেছিল। মহিমের ঘরে অনেক আগেই আঁধার জমা হ'য়েছিল। ঘরখানি এমন কসরৎ ক'রে তৈয়ারী যে আলো হাওয়ার ছিল ঘরে প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু অন্ধকারের ছিল অবারিত দ্বার। ঘরে একটি অতি স্বল্প ক্যাণ্ডল পাওয়ারের বিজলী বাতি জলছিল। একটা মস্ত বিলাস মহিমের পক্ষে। সেই স্তিমিত আলোকে ভাল ক'রে নজর করলে তবেই দেখা যেত মুকুলকে। ছায়ান্ধকার কোণে মলিন বিছানায় শীর্ণ

হয়ে শুকিয়ে গেলে যেমন দেখতে হয়, তাকে দেখলে তেমনিই বোধ হয়। বুঝতে দেরি লাগে না যে মুকুল ঝরে যাচ্ছে।

মহিম মুকুলের শিয়রে বসেছিলেন। শুষ্ক মুকুল স্তব্ধ হয়ে চেয়েছিল। উজ্জ্বল চোখ দু'টি দেখলে মনে হ'ত তার দেহের সমস্ত অবশিষ্ট তেজ ও শক্তি ওই চোখ দু'টিই আশ্রয় ক'রেছে। মহিম তার মাথায় আলতো ভাবে হাত রেখে প্রশ্ন ক'রলেন, "কেমন আছ মা ?" প্রতিদিনের মত সে মাথা নাড়বার ভঙ্গি ক'রলে—'তার অর্থ ভাল আছি। মাথাটা যেমন ছিল তেমনি রইল। কারণ নড়াচড়া করবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছিল। মহিমের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সেই একটি দিন ছাড়া এত কষ্টেও মেয়েটা কখনও বল্লে না সে ভাল নেই। অতি কষ্টেই চোখের জল রোধ করলেন। বারবার ওই কথাটাই পাক খেয়ে মনের মধ্যে উঠতে লাগল। মুকুল নিশ্চল হয়ে আছে। মহিম সেই অবসরে আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে অন্যমনস্ক মহিমের মনে হ'ল মুকুল কেমন ক'রছে। সে যেন কিছু ব'লবার চেষ্টা ক'রছে। মহিম বুঝতে না পেরে নত হয়ে প্রশ্ন ক'রলেন, "জল খাবে, মা ?" সেই মুহূর্ত্তেই তার উজ্জ্বল চোখ দু'টি আরও একটু বিস্ফারিত হ'ল ও পরক্ষণেই একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

মহিম চীৎকার করে উঠলেন, "ওগো শিগ্‌গির এস। ওরে তোদের মাকে ডাক।"

হেমাঙ্গিনী বা আর কেউ ছুটে আসবার আগেই মুকুল সকল কষ্ট শেষ করেছে।

মুকুল চলে যাবার পর আজ দু'দিন কেটে গেছে। অন্তরে এত বড় আঘাতের ঘা-ও এত অল্প সময়েই অনেকখানি মিলিয়ে গেছে। সন্ধ্যার মুখে হেমাঙ্গিনী রন্ধনে ব্যস্ত। ছেলেরা খেলায় মত্ত। মহিম আফিস থেকে ফিরে বিশ্রাম ক'রতে বসেছেন। সেখানে মুকুলের বিছানা পাতা থাকতো সেই শূন্য কোনটার দিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হু-হু ক'রে উঠল। সেই পুরাণো স্মৃতি মনের মধ্যে ঠেলে এল। মৃত্যু-শয্যাশায়িনী বালিকা কখনও ভাল নেই বলেনি। শুধু একটি দিন কেবল—কেন জানিনা—"বাবা আমি বাঁচব না···মাকে বোল না।"—এই কথা কয়টি বলেছিল।

মহিম হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলেন।

অনেক কথাই মনের মধ্যে জানা ছিল। ভগবান অনেক দুঃখ জীবনভোর ভোগ ক'রেছি, এই বিচ্ছেদ ব্যথাটুকু নাই বা দিতে। কেঁদে কেঁদেও মহিম ভাবছিলেন বড় লোকের মেয়ে হ'লেও হয়তো মুকুল মরতো। কিন্তু এমন ভাবে বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে, বিনা যত্নে ও সেবায় নয়। ভগবান এমন নিদারুণ দারিদ্র্যের ও অভাবের প্রতিকার নাই! ছোকরারা বলে সোসালিজিমে আছে। জগতে উন্নতি, প্রতিকার, মঙ্গল হ'তে পারে এ বিশ্বাস মহিম অনেকদিন হারিয়ে ফেলেছেন। জন্মেছি মরতে পারলে বাঁচি। উপায় নেই তাই বেঁচে আছি। এই তাঁর মনোভাব। চোখের জল শুকিয়ে এসেছিল। আর ভাবতেও পারছিলেন না। ক্লান্ত হয়ে মহিম শুয়ে পড়লেন।

সেই সময়ে সামনের প্রকাণ্ড বাড়ী থেকে বালিকা-কণ্ঠে গান শুরু হ'ল। প্রতিদিনই হয়, মহিম শুনেও শুনেন না। আর মনটাকে দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি দেবার জন্য মহিম শুনতে চেষ্টা ক'রলেন।

মেয়েটা মুকুলের বয়সী। শুনলেই বুঝা যায় গলায় স্বর বলে কোন জিনিষ তার নেই। শুধু বাপের টাকার জোরেই, মাষ্টারের উৎসাহে ও বাজনার সাহায্যেই সে গাইছিল। বিদ্যুৎ খেলে গেল মহিমের মনের মধ্যে, বুদ্ধিমতী মুকুলকে এমন ক'রে শেখালে সে কতই না শিখতে পারতো। তিনি মগ্ন হলেন গানটা শুনতে।

"যে ফুল না ফুটিতে ঝ'রেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা।"

মুকুলই ব'লেছিল গানটা রবীন্দ্রনাথের। দূর হতে ওরই গান শুনে সে গানের চর্চ্চা ক'রতো। মহিমের সে কথা মনে হ'তেই শুষ্ক চোখ আবার ভিজে উঠল।

সেকেলে মহিম রবীন্দ্রনাথকে কখনও বুঝতেন না বা দেখতেও পারতেন না। আজ তাঁর চমক লেগে গেল। গানের অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল। দু' ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে টস্ টস্ ক'রে ঝরে পড়ল। এ যে তাঁরই বুক ভাঙা দুঃখের কথা।

হেমাঙ্গিনী এসে করুণ স্বরে ডাকলেন, "ওগো, খাবে এস।" আর গান শুনা হ'ল না। মহিম উঠে পড়লেন।

রোগের বীজাণুবাহী

উপানন্দ

সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অণুপরমাণুর দ্বারা পরিচালিত সকলের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে এদের প্রভাব। এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়ে এরা দেহধারীর পরিবর্তন ঘটায়, দেহধারীকে এদের জয় পরাজয়ের ফল ভোগ করতে হয়। সাধুসঙ্গের ফলে এজন্যই অসাধুব্যক্তি সাধু হয়ে ওঠে, আর অসৎ সংসর্গের ফলে সাধু ব্যক্তিও অসাধু হয়ে নানা প্রকার কুক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়, শেষে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করে মৃত্যুকে বরণ করে। অণুও বিভাজ্য, আর অণুর মধ্যেও মহাচৈতন্যশক্তি আছে। এই সব কথা মানব সভ্যতার প্রাতঃসন্ধ্যাকালে হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে শুনিয়ে গেছেন কণাদমুনি, আজ তাঁরই উদ্‌ঘাটিত তত্ত্ব ও তথ্য জড় বিজ্ঞানীদের পরম অবলম্বন হয়েছে—তাঁরা উপলব্ধি করেছেন অণু পরমাণু (এ্যাটম ও মলিকিউল) শুধু সৃষ্টির সহায়ক নয়, সংহারকও বটে—এদের মধ্যে রয়েছে জগৎ-বিধ্বংসী শক্তি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৈজ্ঞানিকরা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন।

কণাদ যে দর্শন প্রণয়ন করেছিলেন তার নাম বৈশেষিক দর্শন। এই দর্শনের মধ্যে অণুপরমাণুতত্ত্ব নিহিত আছে। মাত্র কুড়ি দিনে এটি রচিত হয়েছিল। কণাদের আসল নাম উলুক। কৃষকেরা শস্যক্ষেত্র থেকে শস্য কর্ত্তন করে নিলে, যে ধান্যকণাগুলো পড়ে থাকতো তা একটি একটি করে তুলে নিতেন এই মুনি, সেগুলি আহার করে জীবনধারণ করতেন, এমি ছিল তাঁর জীবিকার কঠোরতা। এর প্রতি লক্ষ্য করে বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা উলুককে কণাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

অণুপরমাণুর প্রভাবে মানুষের বহু দুর্ভোগ ঘটে। রোগের বীজ ছড়িয়ে পড়ে, শুধু যে রুগ্ণ মানুষ কিম্বা রুগ্ণ পশুপক্ষীর দেহ থেকে রোগ অন্য দেহে ছড়িয়ে পড়ে এরূপ ধারণাই চরম নয়, সুস্থ সবল মানুষও রোগভোগের পর কিম্বা রোগে না ভুগেও অন্য মানুষের দেহে রোগের বীজ সংক্রামিত করে দিতে পারে—এই সত্যও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুস্থ সবল মানুষেরাও রোগ বীজাণুবাহী। এদের সংস্পর্শে যারা আসে, তারা রোগে আক্রান্ত হয়। রোগবীজাণুবাহী মানুষের মধ্যে যে সব রোগের বীজাণু থাকে, সে সব রোগে সে আক্রান্ত হয়না। রোগের বীজাণুরা তাদের ধারকের কোন অনিষ্ট করেনা, তার শরীরের মধ্যে পুষ্টিলাভ করে তারা বেঁচে থাকে। তারপর উপযুক্ত সময়ে সুযোগ ও সুবিধা পেলে তারা তার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে অপরের দেহে প্রবেশ করে তাকে সংহার করবার চেষ্টা করে, শেষে একাধিক ব্যক্তি আক্রান্ত হয় আর দেশব্যাপী ভয়াবহ মহামারী সৃষ্ট হয়ে মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রা ব্যাহত হোতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে রোগবীজাণুবাহী

মানুষেরাই কলেরা, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপথিরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতির ব্যাপক আক্রমণের জন্যে দায়ী।

এই রকম রোগবীজাণুবাহী একটি মেয়ে মার্কিণ মুল্লুকে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। তার নাম মেরী। চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল টাইফয়েড্। তাই তার নামকরণ হয়েছিল টাইফয়েড্ মেরী। রাঁধুনির বৃত্তি অবলম্বন করে তাকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হোতো। যেখানেই মেরী রান্না করতো, সেখানেই তার হাতের রান্না খেয়ে বহু লোক টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হোতো। আমাদের শাস্ত্রে এজন্যেই যার তার হাতের রান্না খাওয়ার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। স্বপাকে খাওয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা হয়েছে, অভাবে পরিবারস্থ ব্যক্তিদের হাতের রান্না খেতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখনকার দিনে খাওয়া দাওয়ার বাচবিচার নেই, হোটেলে, রেস্তোরায়, বাড়ীতে যে কোন লোকের হাতের রান্না খাওয়ার প্রচলন হওয়াতে আধুনিক কালের মানুষেরাই বেশীর ভাগ সময় বড় বড় অসুখে ভোগে, বিশেষতঃ বড় লোকের বাড়ীতে যে বারো মাসই মারাত্মক ব্যাধি আসন পেতে বসে আছে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে, মেরীর মত রোগ বীজাণুবাহী রাঁধুনী হয়তো ঢুকে আছে রান্না ঘরে।

মেরী যে টাইফয়েড রোগ বীজাণুবাহী রাঁধুনি, তা ধরা পড়লো অনেকদিন পরে। সে সময়ে তার বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। মেরী অতি সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী মহিলা, অত্যন্ত বুদ্ধিমতীও ছিল। বহু জায়গায় মেরী রান্না করেছে, তার রান্না খেয়ে লোকে টাইফয়েডে আক্রান্ত হোতে লাগলো। শেষে তাকে ধরে আনা হোলো পুলিশের সাহায্যে, তাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হোলো হাসপাতালে। দেখা গেল, তার মলের সঙ্গে অসংখ্য টাইফয়েড রোগের বীজাণু বেরিয়ে আসছে প্রতিদিন।

হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা নানা প্রকার চিকিৎসা করেও মেরীর শরীর থেকে রোগের বীজাণু দূর করতে পারলেন না। টাইফয়েড বীজাণুরা কোনদিন মেরীর কোন অনিষ্ট করেনি, কিন্তু তার মাধ্যমে বহু লোককে আক্রমণ করেছে, বহু লোকের জীবন নষ্ট করেছে। ডাক্তাররা মেরীর চিকিৎসা করে যখন কোন রকমেই বীজাণুগুলোকে ধ্বংস করতে পারলেন না, তখন তার পেট কেটে তার পিত্তের থলিটি বাদ দিয়ে দেবেন এরূপ সিদ্ধান্ত করলেন, কারণ তাঁদের ধারণা মেরীর পিত্তের থলিতেই টাইফয়েড বীজাণু বাসা বেঁধে তাদের বংশবৃদ্ধি করছে! এরাই মলের সঙ্গে বেরিয়ে এসে মহামারীর সৃষ্টি ক'রে। মেরী অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থায় কোন মতেই রাজী হোলেন না। সে জীবনে কখনও রোগ ভোগেনি – তাই অস্ত্রোপচারে তার আপত্তি।

শেষে ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে তিন বছর পরে মেরীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলেন, আর তাকে সাবধান করে দিলেন, সে যেন আর রান্নার কাজ না করে। কিন্তু সে রান্নার কাজ ছাড়লো না, অন্য সহরে গিয়ে নাম বদলে রান্নার কাজে লেগে গেল, সেখানেও নতুন মনিবের বাড়ীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হোলো। এই ভাবে সে কয়েক বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ করে রোগ ছড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার পর আবার ধরা পড়লো। মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো তাকে বিনা দোষে কি ভাবে আটকে রাখা যাবে—এরকম আইন তো কোন দেশে নেই।

মেরীকে শেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মোটা টাকা দিয়ে এক দ্বীপে নিয়ে গিয়ে রাখা হোলো। সেই দ্বীপে তেইশ বছর ধরে নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকার পর অতিবৃদ্ধ বয়সে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মেরী দেহত্যাগ করলো। মেরীর মত বীজাণুবাহী কত নরনারীই না আমাদের মধ্যে থেকে নানা রোগের বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে, এ সম্বন্ধে কজনই বা খবর রাখে।

আলেকজান্দার ডুমা

রচিত
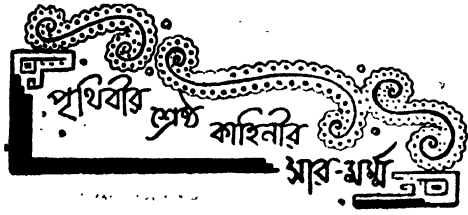
দী কাউণ্ট অফ্ মণ্টি ক্রিস্টো

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই অন্ধকার কারাকক্ষে দিনের পর দিন কাটে··· কোনোমতে দু'টি উদরসাৎ করে—অনিদ্রায় দুঃস্বপ্নদার ·· বুকের ভিতর থেকে প্রাণটা বেরিয়ে আসবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে !

এমনিভাবে সতেরো মাস কাটলো এই অন্ধকূপে ·· তারপর একদিন কয়েদখানার সরকারী সর্ব্বাধ্যক্ষ এলেন কারাগার-পরিদর্শনে। দান্তের সঙ্গে দেখা করে তিনি বললেন,—তোমার কোনো বিশেস বাসনা থাকে তো বলো ?

দান্তে বললে,—আমি শুধু জানতে চাই, কি অপরাধে আমি এ দণ্ড ভোগ করছি ?···আমি নিরীহ নিরপরাধ··· নিশ্চয় কোনো গুপ্তশত্রুর চক্রান্তে মিথ্যা অভিযোগে আমার এ চরম শাস্তি ! সে শত্রু কে, জানতে চাই !

কয়েদখানার সর্ব্বাধ্যক্ষ এ কথা শুনে কারাগারের নথীপত্র দেখলেন···দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে—এড্‌মণ্ট দান্তে সাংঘাতিক দেশদ্রোহী···বোনাপার্টের অনুরক্ত-দলের লোক...তার সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ারী আচরণ করা চাই !

রিপোর্ট পড়ে কয়েদখানার সর্ব্বাধ্যক্ষ নিশ্বাস ফেলে দান্তেকে বললেন,—উপায় নেই ! তোমার জন্য কিছু করবো···নাঃ, কোনো উপায় নেই !

তারপর আরো চার বছর কাটলো এই অন্ধকূপে··· দান্তের মাথায় পাকা-পাকা চুল···মুখে পাকা দাড়ি-গোঁফ ·· ভবিষ্যৎ অন্ধকার—আলোর ক্ষীণ রেখাও নেই ! হতাশায় সে প্রায় পঙ্গু···ভাবলো,—এ জীবনে প্রয়োজন কি ? কিসের আশায় বাঁচবো ?···তবে, কে এমন শত্রু ? বাঁচতে চাই, যদি এর শোধ নিতে পারি !···কিন্তু কি করে···কি করে তা হবে ?···

দান্তে ভাবলো,—সে আত্মহত্যা করবে···অন্নজল স্পর্শ করা নয়···তার চেয়ে অনাহারে সে মরবে !···

অন্নজল ত্যাগ করে সে পড়ে রইলো···কদিন পরে শরীর হলো অত্যন্ত দুর্ব্বল—এমন দুর্ব্বল যে উঠতে পারে না···মনে হলো, যেন মৃত্যু আসছে তাকে গ্রহণ করতে !

এমনি অবস্থায় হঠাৎ একদিন তার চেতনা হলো— ঘরের দেয়ালের ওপাশে ঘড্-ঘড্ আওয়াজ ! যে দেয়াল ঘেঁষে সে পড়ে আছে, সেই দেয়ালেরই ওপিঠে ! দান্তে ভাবলো,—ও ঘরে কোনো আটক-বন্দী নিশ্চয় মুক্তি-প্রয়াসে দেয়ালে রন্ধ্র রচনা করবার চেষ্টা করছে ! সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে সে দেখলো—আলোর রেখা ! ভাবলো, মৃত্যু নয়···বাঁচতে হবে ! ঘরের কোণেই পাত্রে অভুক্ত পড়ে ছিল অন্ন আর জল ··কোনোমতে গড়াতে গড়াতে গিয়ে দান্তে সেই অন্ন-জল গ্রহণ করলো।

দীর্ঘকাল পরে অন্ন-জল গ্রহণ করে দু'দিনের মধ্যেই দান্তে শরীরে বল পেলো···সে ভাবলো,—কারাকক্ষের ওপাশের ঐ আটক-বন্দীর মতো আমিও এদিক থেকে দেয়াল খুঁড়বো ! সঙ্গে সঙ্গেই কাজ সুরু !···জলের 'জ্যাগ্‌টা' (Jug) ঘরের মেঝেয় আছড়ে ফেলে ভাঙলো··· খাবার-রাখার 'সশ্‌প্যানের' (Sauce-pan) হাতলটা সজোরে চাড় দিয়ে খুলে নিয়ে সোৎসাহে দেয়ালের গায়ে রন্ধ্র-রচনার কাজ আরম্ভ করে দিলে !

দু'দিনের অবিরাম পরিশ্রমে দেয়ালে হলো বড় গর্ত ·· কিন্তু শেষে ওদিকার কি যেন লৌহার কড়িতে লাগলো 'সশ্‌প্যানের' হাতলের ঘা···হায় রে, এত চেষ্টা—সব

বুঝি মিথ্যা হলো!···আর্তকণ্ঠে দান্তে বলে উঠলো,—হা ভগবান···এত আশা···সব চূর্ণ করে দিলে!···

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে কণ্ঠ শুনলো,—কে? কে?···

ভগবানের কাছে দান্তে এতক্ষণ যে প্রার্থনা জানাচ্ছিল, বোধহয় সে আশা পূর্ণ হলো!···

একটু পরে ও-ঘরের বন্দী কোনোমতে দেয়ালের রন্ধ্র দিয়ে এ ঘরে এলো। তাকে দেখে দান্তে চমকে উঠলো!

আগন্তুক-বন্দী বললে,···আমি হলুম, এ্যাবে ফারিয়া··· ইতালীর গীর্জ্জার পুরোহিত। আমি ওদিকের দেয়াল ভাঙ্গছিলুম···ভেবেছিলুম, দেয়ালে ফোকর করলে, সে ফোকরের ভিতর দিয়ে কয়েদখানার লোকজনের নজর এড়িয়ে যে করে হোক বাইরে বেরুতে পারবো। কে জানতো যে দেয়ালের এদিকেও রয়েছে আরেকটি অন্ধকূপ!

দান্তেও আগন্তুককে দিলে তার নিজের পরিচয়··· বললে,—কোনো গুপ্ত-শত্রুর চক্রান্তে নিতান্তই অবিচারে তার এই কারাবাস দণ্ডভোগ···কে এই শত্রু, বুঝি না!

ফারিয়া বললে,—তুমি বলছো—তোমার জাহাজের 'কাপ্তেন' হবার কথা, আর মার্সেডিজের সঙ্গে বিবাহ হবে—সব ঠিক!

দান্তে বললে,—হ্যাঁ!

ফারিয়া বললে,—তোমার বাদ সাধতে চায়, এমন কেউ নেই?···

ফারিয়ার কথা শুনেই দান্তের মনের উপর থেকে পর্দা গেল সরে!···বটে···

সে বললে,—আমার 'কাপ্তেন' হওয়া···তাতে ড্যাঙ্গ্লার্সের হিংসা···আর মার্সেডিজ্‌কে বিবাহ করতে চেয়েছিল ফার্নান্দ্‌!···তাহলেও আমার এ কঠিন দণ্ডভোগ কি অপরাধে?

ফারিয়া বললে,—মানে, ঐ নোর্ত্তিয়ার হলেন হাকিম জেরার্ডের বাবা···ও চিঠিখানা জেরার্ড শুধু ছিঁড়ে ফেলেই ঠাণ্ডা হননি, তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে যাবজ্জীবন আটক রেখেছে···অর্থাৎ, তিনি চাইছেন, বাইরে সকলে ও চিঠির কথা যেন বিন্দুবাষ্পও না জানতে পারে কোনোমতে!

ফারিয়ার কথা শুনে দান্তে ভাবলো,—যেমন করেই হোক, এই গারদ থেকে বেরুতে হবে এবং বাইরে বেরিয়ে ঐ তিনজন দুর্বৃত্তের সম্বন্ধে বোঝাপড়া···

এ্যাবে ফারিয়া অসাধারণ পণ্ডিত-মানুষ···দুজনে আলাপ হলো নিবিড় এবং তারপর আট বছর দুজনের এ নরক-বাস। দান্তেকে এ আট বছর এ্যাবে ফারিয়া নানা বিদ্যা শেখালেন। কয়েদখানার শান্ত্রীরা ঘুণাক্ষরেও জানলো না—দেয়ালের রন্ধ্রের ব্যাপার···জানলো না—দুজনে বেশীর ভাগ সময় এক সঙ্গে থাকে। এত দুঃখে পরস্পরকে পেয়ে কোনোমতে সান্ত্বনা রচনা করেছে—এখান থেকে বাইরে বেরুনোর সম্বন্ধে দুজনেই হতাশ হয়েছেন।

এমনিভাবেই দিন কাটে···হঠাৎ একদিন ফারিয়ার হলো অসুখ—খুবই সঙ্গীণ ব্যারাম! তিনি বুঝলেন—এ যাত্রা আর রক্ষা পাবেন না। তাই দান্তেকে ডেকে তিনি বললেন,—শোনো এডমণ্ড···আমার মৃত্যু আসন্ন। আমি অজস্র ধন-রত্নের মালিক···সাতটা রাজার ঐশ্বর্য্য সে! আমার সে সব ধন-রত্ন আছে লুকোনো—মন্টি ক্রিষ্টো দ্বীপে···পাহাড়ের গুহায়!···তোমাকে আমি ছেলের মতো ভালোবাসি—মরবার আগে সে সব ধন-রত্ন আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি!···আমি তোমাকে রেখা এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—কোথায় সে দ্বীপ···কোথায় সে পাহাড়···কোথায় সে পাহাড়ের গুহা এবং কোথায় কি ভাবে আছে সে ধন-রত্ন। এত আছে যে তিনপুরুষ ধরে অজস্র ব্যয় করলেও ফুরোবার নয়! আজ থেকে সে সব তোমার···সে সবে আমার কোনো অধিকার রইলো না!

এই বলে দান্তের হাতে ধন-রত্নের সব ভার সমর্পণ করে সেই রাত্রেই এ্যাবে ফারিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

পরের দিন সকালে কয়েদখানার শান্ত্রীরা যথারীতি খোঁজ-খবর নিতে এসে দেখলো এ্যাবে ফারিয়ার মৃত্যু হয়েছে। পাশের কুঠরীর দেয়ালে কান পেতে দান্তে শুনতে পেলো—ফারিয়ার কুঠরীতে শান্ত্রীরা বলাবলি করছে,—বুড়োটা আচমকা অক্কা পেয়ে হাঙ্গামা বাধালো তো দেখছি!···চলো হে···মোটা চাদর চাপা দিয়ে বুড়োর দেহটাকে ঘরে ফেলে রেখে, আমরা ডুলি আনি···তারপর

ডুলিতে চাপিয়ে দেহটাকে কয়েদখানার বাইরে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলবো !

তাদের কথাবার্তা শুনে দান্তের মাথায় হঠাৎ এক ফন্দী জাগলো। এমনি বলাবলি করে শাস্ত্রীরা বন্দীর কুঠরী ছেড়ে ডুলির ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে যেতেই দান্তে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ফারিয়ার প্রাণহীন দেহ তুলে এনে নিজের কামরায় রাখলো। রেখে নিজে ফারিয়ার শয্যায় শুয়ে রইলো সেই মোটা-চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে। ফারিয়াকে উদ্দেশ করে সে মনে মনে বললে,—তুমি আমার বাবার মতো···ক্ষমা করো, আমার এ পাপ···জানো তো, আমি চাই—সেই শত্রুদের অন্যায়ের কড়ায়-গণ্ডায় শোধ নিতে !···

দান্তে যখন মোটা-চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে ফারিয়ার শয্যায় শুয়ে মনে মনে এ সব কথা চিন্তা করছে, এমন সময় ডুলি নিয়ে শাস্ত্রীরা ঘরে এসে হাজির। দান্তে যে ইতিমধ্যে ফারিয়ার বদলে আপাদমস্তক চাদর-মুড়ি দিয়ে শয্যায় শুয়ে রয়েছে, সে সম্বন্ধে তাদের কারো কোনো ধারণা নেই। কাজেই তারা আর তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে বিনা-দ্বিধায় বৃদ্ধ বন্দীরই মৃতদেহ ঠাউরে চাদরে-মোড়া আপাদমস্তক দান্তেকে তুললো ডুলিতে এবং সবাই মিলে সে ডুলি বয়ে নিয়ে এসে কারাগারের প্রাচীরের বাইরে পাহাড়ী-টিলার উপর থেকে চাদর-মোড়া দান্তের দেহটিকে সোৎসাহে ছুঁড়ে ফেলে দিলে নীচে উত্তাল-সমুদ্রের জলে। তাদের ধারণা—মৃতের অন্ত্যেষ্টি-পর্ব সারা হলো···কিন্তু দান্তে ?···

ক্রমশঃ

—
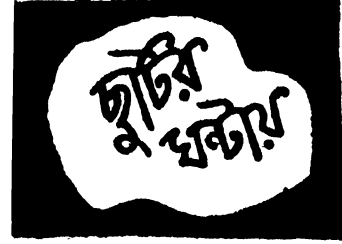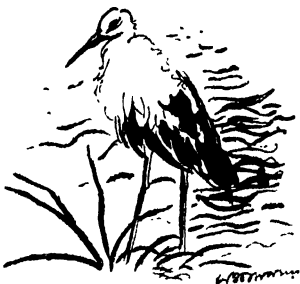
চিত্রগুপ্ত

ছেলেবেলায় তোমরা ফাঁপা-নলের সাহায্যে ফুঁ দিয়ে বাতাসের বুকে সাবান-জলের বুদবুদ (Soap-water Bubbles) উড়িয়ে কত মজাই না করেছো। এখন কিশোর-বয়সে, তেমনি ধরণের সাবান-জলের বুদবুদ বানিয়ে তোমরা আরেক ধরণের মজার খেলা খেলতে পারো কি উপায়ে, এবারে তোমাদের তারই বিচিত্র কলা-কৌশলের হদিশ দিচ্ছি। এ খেলাটি থেকে শুধু যে নিছক আমোদ মিলবে তাই নয়, বরং রহস্যময় বিজ্ঞানের একটি অভিনব-তথ্যেরও পরিচয় পাবে সেই সঙ্গে। বিচিত্র-মজার এই আজব-খেলার নাম—'বুদবুদের নৃত্য-লীলা।'

খেলার কলা-কৌশলের কথা বলবার আগে, তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে খেলাটি দেখানোর জন্য নিতান্ত ঘরোয়া টুকিটাকি যে দু'চারটি সামান্য সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, আপাততঃ তার একটা মোটামুটি ফর্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এজন্য জোগাড় করতে হবে—এক টুকরো পশমী-কম্বল (Woolen Blanket) বা 'ফ্ল্যানেল' কাপড়ের (Flannel Cloth-piece) টুকরো, এক গেলাস সাবান-গোলা জল, কাঁচের বা কাগজের কিম্বা টিনের তৈরী সরু একটি ফাঁপা-নল (Hollow-pipe) কাচকড়ার বা পশুর শিঙের অথবা 'প্লাষ্টিকের' তৈরী (Plastic-Comb) একটি চিরুণী। এ সব সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, খেলার কলা-কৌশল রপ্ত করার পালা।

ছুটির দিনের আসরে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে আজব-মজার এই খেলাটি দেখানোর সময়, প্রথমেই ঘরের

মেঝেতে কিম্বা একটি সমতল-টেবিলের উপরে পশমী-কম্বল অথবা 'ফ্ল্যানেল'-কাপড়ের টুকরোটিকে সমানভাবে (Flat) পেতে রাখো—ছবিতে যেমন দেখছো, অবিকল তেমনি ধরণে। এ কাজ সারা হলে, চিরুণীটি হাতে তুলে নিয়ে বার কয়েক বেশ ভালো করে তোমার মাথার তৈলাক্ত-চুলে ঘষে আঁচড়াও…তাহলেই দেখবে, কিছুক্ষণ বাদেই ঐ চিরুণীর দাঁড়ার ডগায় 'বৈদ্যুতিক-চুম্বক-শক্তি' (Electro-Magnetic Energy) সৃষ্টি হয়েছে। এমনিভাবে চিরুণীতে 'বৈদ্যুতিক-চুম্বক-শক্তি' সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে সাবান-গোলা জলের গেলাসে ফাঁপা-নলের ডগাটি ভালোভাবে দু'তিনবার চুবিয়ে নিয়েই চটপট সেটিকে শূন্যপানে উঁচু করে তুলে রেখে নলের মুখে সুকৌশলে ফুঁ দিয়ে বাতাসের বুকে কয়েকটি বুদ্‌বুদ্ (Soap-water Bubbles) রচনা করো। শূন্যে বাতাসের বুকে ভেসে চলে বুদ্‌বুদ্‌গুলি যখন ধীরে ধীরে ঘরের মেঝে কিম্বা সমতল-টেবিলের পানে নামতে সুরু করবে, তখনই ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে 'বৈদ্যুতিক-চুম্বক-শক্তিতে' ভরপুর ঐ চিরুণীটিকে কায়দা করে ধরো ঐ পড়ন্ত-বুদ্‌বুদের একেকটির মাথার উপর…সঙ্গে সঙ্গে দেখবে—এক আজব-মজার কাণ্ড! অর্থাৎ, 'বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তি' ভরা চিরুণীটিকে বুদ্‌বুদের মাথার কাছাকাছি ধরামাত্রই, শূন্যে বাতাসে-ভাসমান 'পড়ন্ত-বুদ্‌বুদ্' আর নীচে নেমে যাবে না…বিজ্ঞানের বিচিত্র বিধানে সেটি বরং ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে ঐ চিরুণীর পানে এগিয়ে চলবে। শুধু যে শূন্যে-ভাসমান বুদ্‌বুদ্‌গুলিই এমনিভাবে উপরদিকে ভেসে উঠবে তাই নয়, 'বৈদ্যুতিক-চুম্বক-শক্তি' ভরা চিরুণীর আকর্ষণে সমতল-টেবিল বা ঘরের মেঝেতে বিছানো পশমী-কম্বলে যে সব বুদ্‌বুদ্ নেমে আশ্রয় নেবে, সে-গুলিকেও উপরে শূন্যপথে টেনে তুলে এনে অনায়াসেই বাতাসের বুকে ভাসিয়ে রাখা সম্ভব হবে। এবারের আজব-মজার খেলাটির এই হলো আসল রহস্য। 'বুদ্‌বুদের নৃত্য-লীলা' দেখা এবং দেখানো সম্ভব হয়, বিজ্ঞানের বিচিত্র-উপায়ে সৃষ্টি করা এই 'বৈদ্যুতিক-চুম্বক-শক্তির' (Electro-Magnetic Energy) সহায়তায়।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি অভিনব-মজার বিজ্ঞানের খেলার বিচিত্র কলা-কৌশলের পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

১। দেশলাই কাঠির হেঁয়ালি ঃ
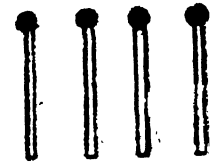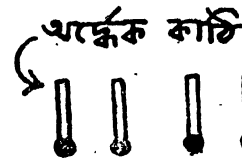
উপরের ছবিতে আটটি দেশলাই-কাঠি সারি দিয়ে সাজানো রয়েছে…এগুলির মধ্যে চারটি 'অর্দ্ধেক' ভাঙা কাঠি এবং চারটি 'পুরো' কাঠি। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে এমন কায়দায় মোট এই আটটি…অর্থাৎ, চারটি 'অর্দ্ধেক'-কাঠি এবং চারটি 'পুরো'-কাঠিকে সাজাও, যার ফলে, সমান-মাপের (equal size) এবং রুইতন-ছাঁদের (diamond-shape) তিনটি 'চতুষ্কোণ'-ঘর রচনা করা যায়। তবে মনে রেখো—এভাবে কাঠি সাজিয়ে 'চতুষ্কোণ' ঘর রচনার সময়, একটিও 'বাড়্‌তি-কাঠি' (Additional matchstick) ব্যবহার করা চলবে না এবং এই

আটটি কাঠির কোনোটি যেন আদৌ অপরটির উপর বসানো থাকে না। এ নিয়মটি মেনে চলে, তোমরা নিজেরা এবার চেষ্টা করে ভাখো—কি উপায়ে দেশলাই-কাঠির এই আজব হেঁয়ালিটির সুষ্ঠু সমাধান করতে পারো।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

তিন অক্ষরে নাম, তাতে নারীগণ সাজে,
আদি আর মধ্য মিলে রয় ক্ষেত্র মাঝে,
মধ্য আর অন্তে মিলে ওঠে গাছ বেয়ে,
আদি-অন্তে তৃপ্তি পায় পায়ে লেপে মেয়ে।

রচনা : ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাঁশবেড়িয়া)

২।

মাত্র দুই অক্ষরের এমন একটি শব্দের নাম করো, যার অর্থ হয়—একপ্রকার মাছ, শীতবস্ত্র বিশেষ এবং বর্ষ।

রচনা : নবকুমার শাসমল (চেতুয়া রাজনগর)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর ঃ

১। উপরের ছবিতে যেমনভাবে সাজানো রয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে বিভিন্ন টুকরোগুলিকে যথাযথ-ভঙ্গীতে সাজিয়ে বসালে, সহজেই হেঁয়ালির সমাধান হয়ে যাবে।

২। পারিজাত

৩। সিংহল
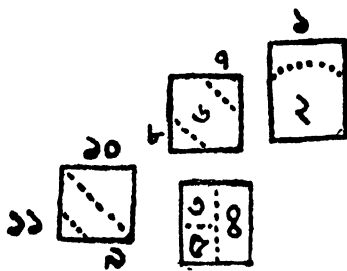
গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারি ও সুনীল (ভিলাই), কুলু মিত্র (কলিকাতা), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), আদু, দুলাল, সঞ্জিত, চায়না, কল্পনা ও রঞ্জিত পৈতণ্ডী (মুক্তিপুর)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুবু ও মিধু গুপ্ত (কলিকাতা), শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), গৌতম ও অশোক ঘোষ (কলিকাতা), মিংকু, রিংকু, পিংকু ও টিংকু (কাটিহার), বাণী, শুভ্র ও পার্থ হাজরা (আড়ুই), সুপ্রিয়া, অলকনন্দা ও নির্ম্মলেন্দু দাস (কৃষ্ণনগর), নন্দকিশোর স্বপন, বাদল ও মাণিক গোস্বামী, মুরলীধর পুরোহিত (ভালাইগোড়া)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

সন্তু, মণ্টি, গাব্বু ও বুটুন সিংহ (মদনপুর), শাশ্বত-কুমার গোস্বামী (যাদবপুর)।

খুকুমণি খুকুমণি

দেখছ তুমি কি ?

এই দেখনা আমি তোমার

ছবি তুলেছি

খেলনা-পুতুলের ইতিকথা

পৃথ্বী দেবশর্ম্মা রচিত ও চিত্রিত

মানুষের ছাঁদের এই যে বিচিত্র পুতুলটি দেখছো, এ ধরণের পুতুল নিয়ে খেলা করতো খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫০০ সালে সাইপ্রাস্ অঞ্চলের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা। এ সব পুতুল গড়া হতো কাদা-মাটি দিয়ে— এমনি নক্সাদার ছাঁদে।

আর উড়ন্ত-পাখীর ছাঁদের এ পুতুলটিও হলো ঐদেশের কারিগরের তৈরী... এই ধরণের খেলনা-পুতুলের প্রচলন ছিল খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৪০০ সালে। নানা রঙে গড়া হতো এ সব বিচিত্র পুতুল।

এবং নীচের ছবিতে যে চাকাওয়ালা ঘোড়া-পুতুল দেখছো, এগুলি ছিল ২০০ খৃষ্টাব্দে রোমান্ শিশুদের খেলার প্রিয় সামগ্রী। এ সব খেলনা তৈরী, কাঠের সাহায্যে নানা বিচিত্র বর্ণে ও ছাঁদে।
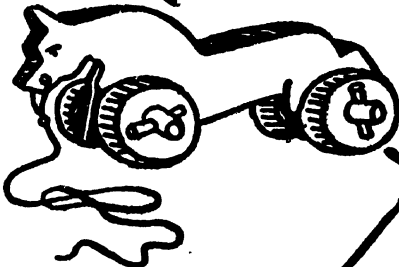
ছবির ডানদিকের কোণে নক্সাদার-ছাঁদের এই যে বিচিত্র কাঠের তৈরী পুতুলটি দেখছো, এ সব নিয়ে খেলা করতো খৃষ্টীয় তেরো-শতকের মিশরীয় ছেলেমেয়েরা।

কৃত্রিম বরফ

অধ্যাপক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সভ্যতার প্রারম্ভের সাথে সাথে মানুষ বরফের ব্যবহার করিতে শিক্ষালাভ করে। ১৭৭৬ সালের বরফের প্রচলন খুব দ্রুত প্রসার লাভ করে। ১৮০০ সালের প্রায় মধ্যভাগ হইতে ইউরোপে ও তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহগুলি বরফের ব্যবহার ও তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। শৈলশিখর কিম্বা নদী হইতে তাহারা বরফ সংগ্রহ করিত এবং এমন কি এক সময় ছিল ইউরোপে তখন নরওয়ের লেক হইতে ইংলণ্ডে প্রাকৃতিক বরফ সরবরাহ করা হইত। ব্যাহত হইতে লাগিল। ইহার প্রতিকারের জন্য তাহারা বিশেষ যত্নবান হইলেন। সভ্যতার সাথে পা মিলাইয়া চলার জন্য বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। বিজ্ঞানীরা দেখিলেন যদি কোন ক্রমে কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী করা যায় তাহা হইলে সাধারণ লোক খুব স্বল্প খরচায় বরফ ব্যবহার করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে। বিজ্ঞানীরা যে কত নিত্য নূতন জিনিষের উদ্ভাবন করিতেছেন তাহা শুনিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কাল যাহা মানুষের বুদ্ধির অগোচর ছিল আজ তাহা খুব সহজ ও সরল।

উপর হইতে (১নং চিত্র)

বিংশ শতাব্দীর ন্যায় তদানীন্তন কালে বিজ্ঞানের এত উন্নতি ছিল না। স্বভাবের উপর নির্ভর করাই মানুষের একমাত্র পন্থা ছিল। যতই দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল মানুষ বুঝিতে পারিল যে বরফ একটি নিত্য অপরিহার্য্য বস্তু! ব্যবসায়ীরা উপলব্ধি করিল যে বরফের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু বরফ সহরে আনা বিশেষ কষ্টকর ও প্রচুর ব্যয়জনক। সুতরাং ব্যবসায়ীদের লাভ সংখ্যা বহুলাংশে যাহা হউক কিরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা কৃত্রিম বরফের আবিষ্কার হইল তাহারই কিছু সংক্ষেপে বলা হইল।
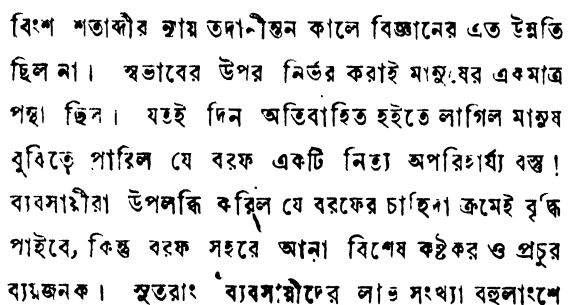
১৭১৫ সালে উইলিয়াম কুলেন প্রথম যন্ত্র ও মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইলেন এবং পরবর্ত্তী কালে এই সব মেসিনের কলকব্জা অনেক রদ বদল করিয়াও বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। ঐ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বৈজ্ঞানিকরা

দুইটি বস্তুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অতি নিম্নমাত্রার টেম্প্‌পারেচার উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয়। ১৭৭২ সালে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ফ্যারেনহাইট (Frahrenheit) জল জমানর সহজ পন্থা আবিষ্কার করেন, এবং যে টেম্প্‌পারেচারে জল জমান সেই টেম্প্‌পারেচারের নাম দিলেন ০ [শূন্য] টেম্প্‌পারেচার। স্যার উইলিয়াম সিমেন্স একটী নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন, যাহার দ্বারা কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী করা হইত। এই মেসিনের সাহায্যে যে বরফ তৈয়ারী হইত তাহা মোটেই অল্পব্যয়ী ছিল না। বিজ্ঞানীরা, ইন্‌জিনীয়াররা সকলে মিলিত হইয়া মেসিনটির কার্য্যকারিতা, কর্ম্মক্ষমতা প্রভৃতির উন্নতি করিতে বিশেষ অনুপ্রাণিত হন কিন্তু অবশেষে তাঁহাদের পরিকল্পনা অকৃতকার্য্য হয়।

এডেনবারার নিকট ব্যাথগেট এবং চীনদেশের, হংকংএ খুব বেশী ব্যবহার হইয়াছিল।

১৮৬৮ সালে প্রসটোলে অন্য প্রকার যন্ত্র তৈয়ারী করিলেন, কিন্তু তাহা এমন কিছু ফলপ্রদ হয় নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দু'টি জার্ম্মান ইন্‌জিনীয়ার এই মেসিনটির উন্নতির জন্য বিশেষ গবেষণায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারা নানাপ্রকার যন্ত্রের অদল বদল করিয়া মেসিনটির কর্ম্মক্ষমতা কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি উন্নত করিবার জন্য রত রহিলেন। তাঁহাদের কার্য্য সফল হইল কিন্তু একটি বড় অসুবিধা রহিল কারণ যে কক্ষটী ঠাণ্ডা করিতে হইবে প্রথমত সেই কক্ষটিকে বাতাসশূন্য [Vacuum] করিতে হইবে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বহু বৈজ্ঞানিক ও ইন্‌জিনীয়ার প্রভৃতি সকলে গভীরভাবে গবেষণা করিতে

সম্মুখ হইতে　(২নং চিত্র)
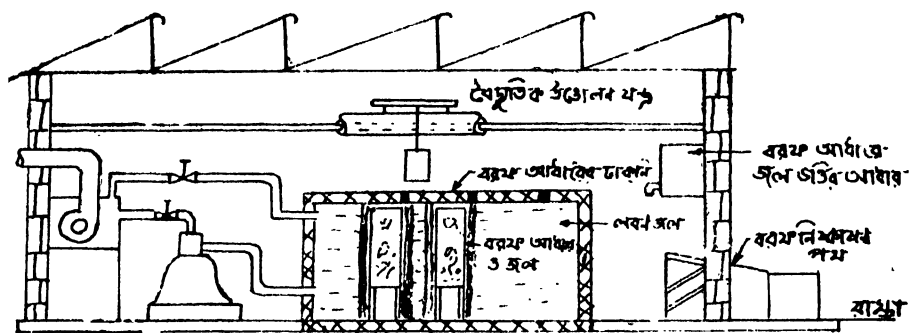
১৮৪৫ সালে আমেরিকার ফ্লোরিডাতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ জন গোরি [Dr. John Gorrie] একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মেসিন আবিষ্কার করিলেন। এই মেসিনটি পুরাপুরি যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। এঁর অবদান কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী করার ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। আমেরিকাবাসীরা এইরূপ বৈজ্ঞানিককে তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সহরের ভিতর একটি স্তম্ভ স্থাপন করিয়া উহাই প্রস্তরগাত্রে একটি স্মারক লিপি তাঁহার নামে লিখিয়া রাখিয়াছেন। ১৮৬১ সালে আর একজন বৈজ্ঞানিক কার্ক অন্যপ্রকার প্রণালীর সাহায্যে একটি মেসিন উদ্ভাবন করিলেন এবং এই মেসিনের দ্বারা তিনি প্রচুর কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী করিবার সুবিধা বাহির করিলেন। এইরূপ ধরণের মেসিন

আরম্ভ করিলেন। ১৮৭৩ সালে পল্ গিফার্ড আর একটি নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করেন এবং এই মেসিনটির খুব সমাদর হয়। ১৮৭৭ সালে জেমস্ কলম্যান, জন ও হেনরী বেল এই তিনজন বৈজ্ঞানিক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্র চালিত মেসিন আবিষ্কার করিলেন। ইঁহাদের আবিষ্কার refrigeration world এ বিরাট সাড়া আনিয়া দেয়। বিশেষতঃ বড় বড় ব্যবসায়ীর দৃষ্টি ইহার দিকে আকৃষ্ট হয়। ব্যবসায়ীরা অনুমান করিল যে কৃত্রিম বরফ এইরূপে তৈয়ারী হইলে মাছ, মাংস, ঘৃত, দুধ, আলু ফল প্রভৃতি অনেক দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য বস্তু শীঘ্র পচিয়া যাইবে না। পরন্তু তাঁহারা দেখিলেন অর্থনীতির দিক হইতে বেশ লাভবান হইতে পারিবেন। কারণ এক ঋতুর বহুপ্রকার ফল-মূল অন্য ঋতুতে ব্যবহার করিতে পারিবেন অথবা একস্থানের

কাঁচামাল অন্যস্থানে বিক্রয় করিবার সুবিধা হইবে। কিন্তু এই মেসিনও খুব স্বল্পব্যয়ী ছিল না।

যাহা হউক এইরূপ নানাপ্রকার মেসিনের উন্নতির চেষ্টা বৈজ্ঞানিকেরা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ১৯১১ সালে আমেরিকায় একটি নূতন প্রণালীতে যন্ত্র চালিত মেসিন ব্যবহার হয়। প্রথম প্রথম কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী করিবার জন্য পরিস্রুত জল ব্যবহার করা হইত। এইরূপ বরফ বিজ্ঞান সম্মত, বীজাণু রহিত। ইহা খুব জনপ্রিয়
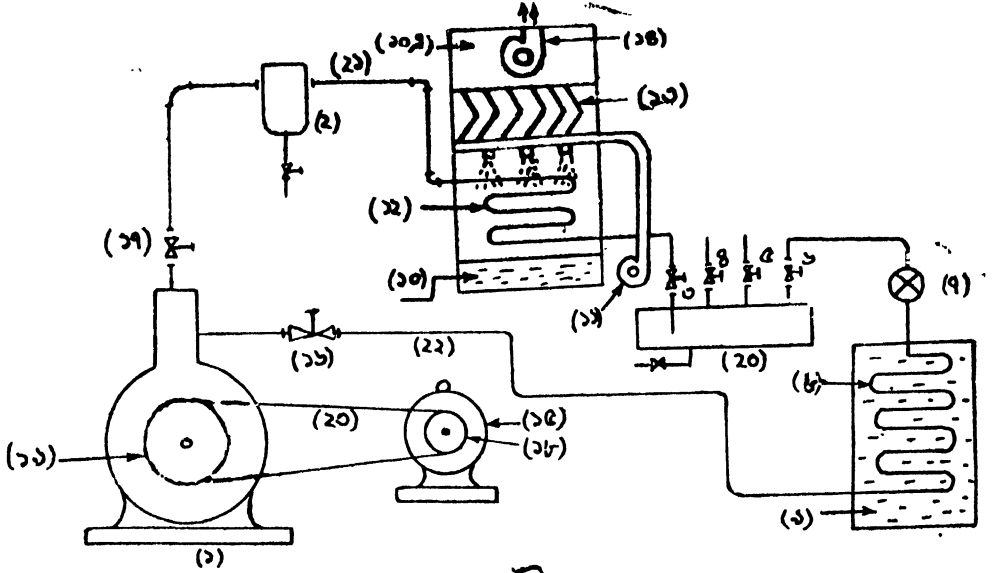
৩নং চিত্র

[১] কম্প্রেসার [Compressor]

[২] অয়েল সেপারেটর [Oil Separator]

[৩] কিং ভাল্ব [King Valve]

[৪] গ্যাস প্রয়োগ পথ [Charging Valve]

[৫] সেফটি ভাল্ব [Safety Valve]

[৬] মেন ভাল্ব [Main Valve]

[৭] নিয়ন্ত্রিত ভাল্ব [Expansion Valve]

[৮] লবণ-সলিউশনকে ঠাণ্ডা করিবার নলসমূহ [Refrigerant Coils]

[৯] লবণ সলিউশন [Brine Solution]

[১০এ] ইভ পোরেটিভ কন্‌ডেন্‌সার [Evaporative Condenser]

[১১] ঐ জলের পাম্প

[১২] ঐ রেফ্রিজারেন্ট বয়েল [Refregerant coil finned type]

[১৩] জলের আধার [Water Tank]

[১৩] এলিমিনেটর [Eliminator]

[১৪] কক্ষ হইতে গরম হাওয়া দূর করিবার পাখা [Blower]

[১৫] ইলেকট্রিক মোটর [Electric Motor]

[১৬], [১৭] মেশিনে রেফরিজারেন্ট প্রবেশ ও নির্গমন ভাল্ব।

[১৮], [১৯] মেসিনকে চালাইবার জন্য বড় ছোট চাকা [Fly wheel]

[২০] বেল্ট [V-Belt]

[২০] রেফরিজারেন্ট তরল পদার্থ রাখিবার আঁধার [Liquid receiver]

[২১], [২১] প্রবেশ ও বাহির পথ [Suction and discharge line]

হয়। সাধারণ পানীয় জলে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বরফ তৈয়ারী হয় না, তার কারণ রাসায়নিক বৈজ্ঞানিকেরা, গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে সাধারণ পানীয় জলে ধাতব বস্তু ও অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত আছে। পূর্ব্বোক্ত কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী করিতে প্রচুর পরিস্রুত জলের প্রয়োজন। ইহা অর্থনীতির দিক হইতে মোটেই সমীচিন নয়। তাই ইন্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিকেরা পুনরায় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি প্রকারে পরিস্রুত জলের পরিবর্ত্তে পানীয় জল ব্যবহার করিলে স্বচ্ছ বরফ তৈয়ারী করা যায়। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিলেন, যে আধারে বরফ তৈয়ারী হইবে তাহার মধ্যে বাতাসের চাপ বৃদ্ধি করিয়া প্রবেশ করান এবং জল যখন জমিয়া আসিবে তখন আধারের মধ্যে যে জল জমে নাই তাহা তুলিয়া ফেলিয়া এবং পরিশেষে পরিষ্কার জল তাহার পরিবর্ত্তে ঢালিয়া দিতে হইবে। তাহাদের এই পরীক্ষা সত্যই খুব আশান্বিত ফল পাওয়া যায়। এইরূপে কৃত্রিম বরফের উৎপত্তি হয়।

১নং এবং ২নং ছবিতে বরফ কারখানায় কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী করিবার মেসিন ও তার আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি দেখা যাইবে। ৩নং ছবিটি অনুধাবন করিলে বেশ বুঝা যাইবে, কি কি উপায়ে ও মেসিনের সাহায্যে কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী করা হয়।

প্রথম কম্প্রেসারটি [১] ইলেকট্রিক মোটর [২] দিয়া চালু করিতে হইবে এবং সাকসান [১৬] ও ডিস্চার্জ্জ [১৭] ভাল্ব দুইটী খুলিতে হইবে। ব্রাইন কুলার [৮] মধ্যে যে নিম্ন চাপ ও তাপ রেফরিজারেন্ট গ্যাস থাকে, কম্প্রেসার তাহা সাকসান লাইনের [২২] মধ্যে দিয়া শোষণ করিয়া লইবে এবং খুব উচ্চ তাপ ও চাপ কমাইয়া রেফরিজারেন্ট গ্যাস হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। এই উচ্চ তাপ ও চাপ গ্যাসটি ডিস্চার্জ্জ লাইনের [২১] মধ্যে দিয়া যাইবার সময় অয়েল-সেপারেটার [২] মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া ইভাপরেটিভ কন্ডেন্সারে যাইবে। এখানে যে কয়েল [coil] এর মধ্যে প্রবেশ করিবে তাহার বিশেষতঃ যে কয়েলগুলি পাতলা অনেকগুলি টুকরা টিনের চাদরের মধ্যে দিয়া যাইবে। এইরূপ কয়েলগুলিকে ফিনড্ কয়েল [finned coil] বলা হয়। যখন উচ্চ তাপ ও চাপ রেফ্রিজারেন্ট গ্যাসটি এই কয়েলের মধ্যে দিয়া যাইবে তখন কয়েলগুলিকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য উপর হইতে জল স্প্রে নজলের [Spray nozzle] সাহায্যে ফোয়ারার মতন কয়েলের উপর বর্ষণ করা হয় তাহাতে গ্যাসটি ঠাণ্ডা হয়, উপরন্তু কক্ষটির [১৩] উপরে একটি পাখা [১৪] এমন ভাবে বসান আছে যাহাতে কক্ষের নীচু জায়গা হইতে বাতাস টানিয়া বাহিরে ফেলিতে পারে। পাখা চলিলে সাধারণতঃ গরম বাতাসও বাহির হইয়া আসিবে। এইরূপ করার জন্য পাইপের মধ্যে গ্যাসটি বেশ শীতল হয় কিন্তু চাপ পুরামাত্রায় থাকে। গ্যাস ঠাণ্ডা হইলে গ্যাসটি তরল পদার্থ আকার ধারণ করিবে, তখন তরল পদার্থটিকে একটি বড় আধারে রাখা হয় যাহার নাম লিকুইড্ রিসিভার [Liquid receiver] [২০]। এই রিসিভার হইতে তরল পদার্থটি উচ্চ চাপে মেন ভাল্ব [৬] দিয়া বাহির হইয়া আসে এবং তখন তরল পদার্থটিকে হঠাৎ একটি সরু ছিদ্র-মধ্য দিয়া যাইতে দেওয়া হয়, এই সরু ছিদ্র-যন্ত্রটির নাম নিয়ন্ত্রণ ভাল্ব [Expansion Valve [৭]। এইরূপ করিলে তরল পদার্থের চাপ কমিয়া যায় এবং গ্যাস হইয়া স্ফীত হয় ও সাথে সাথে চাপ ও তাপ কমিয়া যায়। এখন যে পাইপ অথবা কয়েলের মধ্য দিয়া গ্যাস প্রবাহিত হইল উহার পারিপার্শ্বিক খুব ঠাণ্ডা হইয়া যায় কারণ গ্যাসটি বাতাসে অথবা যে কোন তরল পদার্থের আভ্যন্তরীণ [Latent] ও বাহির [Sensible heat] উত্তাপ টানিয়া লয়। গ্যাসটি এমতাবস্থায় পুনরায় কম্প্রেশার শোষণ [suction] করে। এইরূপ ভাবে পুনঃ পুনঃ রেফরিজারেন্ট একটি বদ্ধ চক্রের মধ্যে ঘূর্ণায়মান হয়।

১নং ছবিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ব্রাইন জলের আধারটির মধ্যে কয়েলগুলি দুইটি পার্শ্বে সুসজ্জিত ভাবে বসান আছে এবং বরফ আধারগুলি [Ice can] তার মধ্যে বসান রহিয়াছে। সাধারণ জল ব্যবহার না করিয়া ব্রাইন জল [Brine water] ব্যবহার করা হয় তাহার কারণ ব্রাইন জল জমিবার টেম্পারেচার সাধারণ জল জমিবার অনেক নীচে। ব্রাইন আধারটি সম্পূর্ণ কর্ক দিয়া ইনসুলেট [insulate] করা হয়। বাহির ও

ভিতরের মধ্যে তাপ অপরিচালিত করিবার জন্য। বরফ আধারগুলির উপরিভাগও কর্ক-বোর্ড দিয়া ঢাকা থাকে। একটি সমতল এজিটেটার [Harizontal agitator] ব্রাইন জলের আধারের ভিতরে প্রবেশ করান থাকে এবং যতক্ষণ বরফ তৈয়ারী হইবে ততক্ষণ এজিটেটারটি চালান থাকে, তাঁহার কারণ ব্রাইন সলুসনকে সদাসর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান রাখা। বৈদ্যুতিক উত্তোলন যন্ত্রের [Electic crane] সাহায্যে বরফ আধার উত্তোলন করিয়া একটি চৌবাচ্চায় রাখা হয়। এই চৌবাচ্চার নাম থইং ট্যাঙ্ক [Thawing Tank], এই চৌবাচ্চার ভিতর একটু উষ্ণ জল রাখা হয় কারণ বরফ আধার [Ice can] থেকে বাহির করা সহজ হইবে। উহার পর টিপিং টেবিল [Tipping table] এর উপর বরফ আধার রাখা হয় এবং পরে উল্টাইয়া দেওয়া হয়। বরফ আধার থেকে নিষ্কাশিত হইয়া বরফ নিক্ষেপনে [Ice chute] পথ দিয়া প্ল্যাটফরমের উপর চলিয়া আসে। তখন কৃত্রিম বরফ চালানির জন্য প্রস্তুত হয় অথবা বরফ রাখার কক্ষে রাখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ ভাবে কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী হয়।
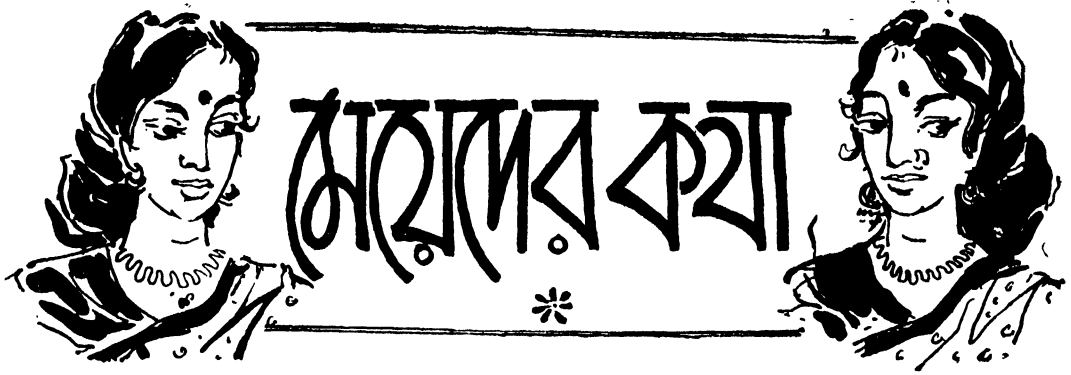
রবীন্দ্রনাথের নারী

চারুলতা দেবী

নারী-ধর্ম নিয়ে আজকাল শিক্ষিত নারীরা খুব আলোচনা করছেন। তাঁরা অতীত ভারতের আদর্শের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। বর্তমানের অবস্থা দেখে নিরাশ হচ্ছেন। কিন্তু নিরাশ হবার মতো কিছু তো আমি দেখতে পাই না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নারী-ধর্ম সম্বন্ধে যে আদর্শ স্থাপনা করে গেছেন সে কথা মনে রাখতে পারলে আমাদের এক নিমেষের জন্যেও নিরাশ হবার কিছু থাকে না। ভারতের প্রতি ঘরের যে নারী মাতারূপে, ভগ্নীরূপে, কন্যারূপে অতি দীনহীনভাবে দিন কাটাচ্ছিল তাকে অমরত্ব দিয়ে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি আহ্বান করেছেন।

"পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী।"

তিনি নারীকে দেখেছেন কর্মকুশলা সেবাপরায়ণা কল্যাণীরূপে :—

"প্রভাত আসে তোমার দ্বারে পূজার সাজি ভরি ;
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণডালা ধরি।"

নারীর সেই কল্যাণীরূপ কী সুন্দর ভাবে স্পষ্ট হয়েছে 'গোরা'-য় :—

."ভারতের গৃহকে পুণ্যে সৌন্দর্যে ও প্রেমে মধুর ও পবিত্র করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। যে লক্ষ্মী ভারতের শিশুকে মানুষ করেন, তাপীকে সান্ত্বনা দেন, তুচ্ছকেও প্রেমের গৌরবে প্রতিষ্ঠা দান করেন, যিনি দুঃখে দুর্গতিতেও আমাদের দীনতমকেও ত্যাগ করেন না, অবজ্ঞা করেন না, যিনি আমাদের পূজার্হা হইয়াও আমাদের অযোগ্যতমকেও এক মনে পূজা করেন, যাঁহার নিপুণ সুন্দর হাত দুখানি আমাদের কাজে উৎসর্গ করা, এবং যাঁহার চির-সহিষ্ণু ক্ষমাপূর্ণ প্রেম আমরা অক্ষয় দানরূপে ঈশ্বরের কাছ হইতে লাভ করিয়াছি।"

গোরার মুখে ভারতের নারীর কল্যাণময়ী মূর্তি আরও সুন্দর ফুটেছে :

"মা, তুমি আমার মা, তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

"চোখের বালি'র অন্নপূর্ণার মাঝে ভারতের নারীর আর যে মূর্তি এঁকেছেন,—সে তাঁর ভক্তি রসাপ্লুত মূর্তি। অন্নপূর্ণা বলেন : "ওরে বাছা, যাঁর সঙ্গে আসল দেনা পাওনার সম্পর্ক যিনি এই সংসারের হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্ত লইতেছিলেন। হৃদয়ে বসিয়া আজ সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম বলিয়া সংসারের কর্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম, তাহা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত?"

অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে আধুনিকাদের প্রতি

বিদ্রূপের কশাঘাত স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে 'শেষের কবিতা'য় মিসি, লিসির চরিত্র বর্ণনায় :—

"উঁচু খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুককাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়ীটা গায়ে তির্য্যগ্ ভঙ্গীতে আঁট করে ল্যাপটান। এরা খুট-খুট করে দ্রুত লয়ে চলে, উচ্চৈঃস্বরে বলে, স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি, মুখ বেঁকিয়ে স্মিত হাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়—জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি, গোলাপী রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে। এবং পুরুষ বন্ধুর চৌকির হাতার উপর বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্দ্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জ্জন প্রকাশ করে থাকে।"

ভারতীয় সমাজের নারী জীবনে যে লাঞ্ছনা যে অপমান-গঞ্জনা রয়েছে তাও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বলেছেন: "নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্যে অপমান করা এতই সহজ, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে বাইরের বাধা এতই কম! স্ত্রীকে নিরুপায় ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজের হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে; অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোন আবশ্যক পন্থা রাখা হয় নি। এই নিদারুণ দুঃখ ও অসম্মান ঘরে ঘরে ও যুগে-যুগে কি রকম ব্যাপ্ত হয়ে আছে···সতীত্ব গরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত সস্তা, এত অকিঞ্চিৎকর!"

আজ পল্লীতে পল্লীতে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব প্রতি-পালিত হচ্ছে। আমাদের এই সব উৎসব ব্যর্থ হবে, যদি রবীন্দ্রনাথের কল্যাণময়ী নারীর মূর্তি আমাদের অন্তরে দাগ না কাটে,—যদি তথাকথিত উগ্র আধুনিকতার প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা না জাগে, যদি নির্যাতিতা ভারতীয় নারীর প্রতি সমবেদনায় আমাদের অন্তর বিগলিত না হয়।
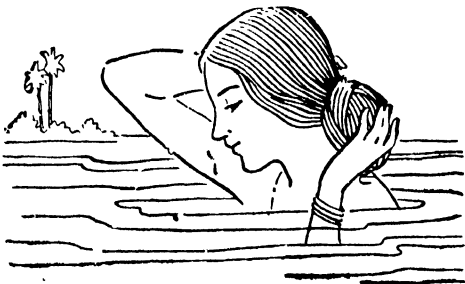
সুপর্ণা দেবী

গত সংখ্যায় গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে রূপ-প্রসাধন-কলার রীতি প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছি, তারই জের টেনে এবারেও আরো কয়েকটি দরকারী কথা বলে রাখি।

আধুনিক যুগে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমাজের সকল স্তরেই নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের মনেই রূপ-প্রসাধন চর্চ্চার রীতিমত আগ্রহ-অনুরাগ নজরে পড়ে এবং তারই ফলে, আজকাল ঘরে-ঘরে ভালো-মন্দ, দামী ও শস্তা নানা রকম সৌখিন-সুন্দর বিচিত্র-রঙীন প্রসাধনী-সম্ভার···অর্থাৎ, সুগন্ধি তেল, সাবান, পাউডার, স্নো, ক্রিম্ লোশন্, রুজ, লিপ্ষ্টিক্, কাজল, সুর্ম্মা, ম্যাস্কারা, নখ-পালিশ, তরল আল্তা প্রভৃতি রূপসজ্জা-সামগ্রীর বহুল-ব্যবহার ও ব্যাপক-প্রচলন হয়েছে। আধুনিক-সমাজে এই সব সৌখিন প্রসাধনা-উপকরণের চাহিদা-বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারেও নিত্য-নূতন রূপচর্চ্চার বিবিধ সম্ভারের প্রাদুর্ভাব ঘটছে এবং সুনিপুণ বিজ্ঞাপন-প্রচারের দৌলতে এ সব প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে কোন্‌টি ভালো আর কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি আসল আর কোন্‌টি নকল, সে সম্বন্ধে যথাযথ বিচার-বিবেচনা করাও রীতিমত দুঃসাধ্য-কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুপরিকল্পিত বিজ্ঞাপনের চটক ও মোহিনী-মায়ায় ভুলে, ভাল-মন্দ আসল নকল নির্ব্বিচারে বাজার থেকে এই সব বিচিত্র জৌলশদার-সৌখিন প্রসাধন-সামগ্রী কিনে এনে আজকাল ঘরে-ঘরে প্রায় সকলেই ব্যবহার করছেন এবং যথোচিত বিচার-বিবেচনা না করে শস্তা-দামের আজেবাজে এ সব রূপসজ্জার উপকরণ ব্যব-

সৌন্দর্য্যকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছেন তাই নয়, উপরন্তু নানা-রকম উৎকট চর্ম্মরোগেও আক্রান্ত হচ্ছেন। কাজেই রূপচর্চ্চাটা এবং প্রসাধনী-উপকরণাদি ব্যবহার-কালে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা যে একান্ত প্রয়োজন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই কারণেই ইতিপূর্ব্বে বলে রেখেছি যে বিভিন্ন নর-নারীর দেহের ত্বক্ ও চর্ম্মের শ্রেণীগত-পার্থক্যের দরুণ বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রসাধনী-উপকরণ ব্যবহার করাই সমীচীন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে শীতপ্রধান পাশ্চাত্যদেশের সৌখিন সমাজে নাতিস্নান-রীতি এবং স্নো, ক্রিম, লোশন ব্যবহারের যে বহুল-প্রচলন দেখা যায়, সে বিধান প্রাচ্যদেশীয়দের পক্ষে সর্ব্বৈবভাবে প্রযোজ্য নয়। কারণ, শীতের প্রকোপে দেহের ও মুখের চর্ম্ম সচরাচর শুষ্ক-খস্‌খসে এবং কর্কশ হয়ে যায়, তাই পাশ্চাত্য-সমাজে নিত্য-স্নানের প্রচলন কম এবং স্নো, ক্রিম প্রভৃতি প্রসাধনী ব্যবহারের রেওয়াজ বেশী। কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্নো, ক্রিম প্রভৃতি মাত্র কয়েক ঘণ্টার বেশী মেখে থাকা উচিত নয় এবং নিত্য-স্নানের রীতি একান্ত পালনীয়। আমাদের দেশে স্নো বা ক্রিম ব্যবহারের আগে,শীতল বা ঈষৎ-উষ্ণ জলে ভালো করে মুখ ও দেহাংশ ধুয়ে এবং শুকনো গামছা বা তোয়ালের সাহায্যে জলটুকু বেশ খটখটেভাবে মুছে ফেলে খুব সামান্য পরিমাণে ও অল্পক্ষণ ঘষে এ সব প্রসাধনী মেখে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দেহের ও মুখের চর্ম্ম সাধারণতঃ তৈলাক্ত-মসৃণ থাকে…সুতরাং বেশীক্ষণ স্নো বা ক্রিম ঘষাঘষির ফলে, সে চর্ম্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্রমশঃ রুক্ষ-কর্কশ হয়ে ওঠে। তাছাড়া রূপ-লাবণ্য অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের সৌখিন সমাজের অনেকেরই রাত্রে শয়নের আগে স্নো বা ক্রিম মুখে মাখার অভ্যাস আছে—এ অভ্যাসটি কিন্তু সৌন্দর্য্য-সাধনার পক্ষে সবিশেষ অপকারী। রাত্রে শয়নের আগে স্নো বা ক্রিম ব্যবহারের পরিবর্ত্তে, বরং যদি এক পেয়ালা শীতল-জলে দশফোঁটা ইউ-ডি-কোলোন (Eue-de-cologne) মিশিয়ে, সেই জলে ভালোভাবে মুখ এবং দেহাংশ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন তোয়ালের সাহায্যে শুকনো করে মুছে, সামান্য পাউডার মেখে নিতে পারেন, তাহলে রূপ-লাবণ্য অটুট থাকবে দীর্ঘকাল। এ ছাড়া ইতিপূর্ব্বেই গত সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যে কয়টি 'ঘরোয়া প্রসাধনী' সামগ্রীর উল্লেখ করেছি, সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করলেও যথেষ্ট উপকার পাবেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের একটি প্রাচীন রূপচর্চ্চা-রীতিরও উল্লেখ করা যায়। পুরাকালের সৌখিন-সমাজে গ্রীষ্মকালে দেহের ও মুখের চর্ম্ম মসৃন-সুন্দর রাখার জন্য চন্দনের প্রলেপ মাখার রীতি প্রচলিত ছিল। সুপ্রাচীন হলেও, রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধিকল্পে চন্দন-প্রলেপনের এই অভিনব রীতিটি একালের সৌখিন নর-নারীর পক্ষেও বিশেষভাবে অনুসরণযোগ্য। গ্রীষ্মকালে স্নানের পর দেহের ও মুখের চর্ম্মের উপর যদি খুব মিহি-ও পাতলা ধরণে চন্দনের প্রলেপ মেখে, তার উপর সামান্য পরিমাণে পাউডার বা চন্দনের গুঁড়ো ঘষে নিলে, মুখচর্ম্ম সুস্থ-সুন্দর, মসৃণ ও লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিত থাকে এবং বর্ণশোভাও সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে সবিশেষ। এমন কি, রাত্রে শয়নের আগে, ভালো করে মুখ ও দেহাংশ ধুয়ে অল্প একটু চন্দনের গুঁড়ো অথবা মিহি-প্রলেপ মেখে নিতে পারেন তো রূপশ্রী অক্ষুণ্ন-অমলিন থাকবে দীর্ঘকাল। এভাবে চন্দন-চর্চ্চিত করার ফলে, শুধু যে চর্ম্ম-ত্বক্ সুস্থ সুন্দর ও লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে তাই নয়, গ্রীষ্মতাপের দুঃসহ-কষ্টেরও লাঘব হবে অনেকখানি এবং দেহ-মন সুশীতল ও সুগন্ধময় থাকবে সারাক্ষণ। বাঙলাদেশের সৌখিন-সমাজে অধুনা চন্দন-চর্চ্চার রেওয়াজ অদৃশ্যপ্রায় হলেও, দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে এ রীতির এখনও বেশ প্রচলন আছে। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কারো সখ হলে, কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ ভারতবাসীদের প্রতিষ্ঠিত বহু মনোহারী দোকানেই অনায়াসে এবং সুলভে অঙ্গরাগ-সামগ্রী হিসাবে বিশেষভাবে প্রস্তুত 'চন্দন-গুঁড়োর বটিকা' (Sandalwood powder tablets) সংগ্রহ করতে পারবেন।

এবারের মতো এখানেই আমাদের রূপচর্চ্চার আলোচনা শেষ করলুম—পরের সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরো কিছু হদিশ জানানোর বাসনা রইলো।

——

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশু-মঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সকল জ্বালা জুড়ায় শেষে,
খোকা আমার মধুর হেসে,
মা না হলে বুঝবে কে সে,
বিধাতার করুণা কি সে।
খোকার হাসি হয় না বাসি,
বুকে আমার বাজায় বাঁশী,
খোকা, খুকুর মধুর হাসি,
বাঁধন আমায় দিলে কসি।

প্রসূতির পরিচর্য্যা শুধু যে মেয়েদের শিক্ষণীয়, আমাদের অনেকেরই এমনি একটা ধারণা আছে। কিন্তু এটা কি ঠিক? অশিক্ষিত দাই যে যুগে আমাদের প্রসূতি পরিচর্য্যার ভার নিত সে যুগ আর নেই। সেকালে অশিক্ষিত পরিবেশ ও 'হেলুনী' বা উপযুক্ত শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন নিম্ন-শ্রেণীর মেয়েদের হাতে প্রসব-কালীন ব্যবস্থাদির ভার ন্যস্ত থাকায় 'পেঁচোয় পেয়ে' অনেক শিশুই তখন অকালে প্রাণ হারাতো...এমন কি, শিশুর মাতাও অকাল-মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেতেন না। এখনকার যুগে অবশ্য শিক্ষিত ধাত্রী ও ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া গেলেও, সংসারে স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন সকলেরই প্রসূতির প্রতি একটা মোটামুটি কর্ত্তব্য জ্ঞান ও সে কর্ত্তব্য পালনের জন্য কি করা উচিত, আর কি করা উচিত নয় তারও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কি উপায়ে প্রসূতির স্বাস্থ্য সবল ও সুস্থ রাখা যেতে পারে, সে বিষয়ে পরিবার-ভুক্ত সকলেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব গ্রহণ ও কষ্ট স্বীকার করতেই হয়। কারণ মাতৃগর্ভে শিশুর উদ্ভব থেকে তার জন্ম পর্য্যন্ত কালে এমন নানা অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটতে পারে যে, সময়মতো সাবধান না হলে সঙ্গীন বিপদ ঘটে যেতে পারে। কাজেই সে বিপদের কবল থেকে শিশু ও মাতার প্রাণরক্ষার যদি কোন উপযুক্ত প্রতিবিধান আমাদের জানা না থাকে, তা হলে আমরা শুধু যে গভীর দুশ্চিন্তা ও অশান্তি ভোগ করি, তাই নয়, নিজেদের অজ্ঞতার ফলে, অনেক সময় অহেতুক প্রাণসংশয়কর শোচনীয় পরিণামের বিপদ ডেকে আনি। কিন্তু যত বড়ই বিপদ আসুক না কেন প্রসূতি-পরিচর্য্যা এবং শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান ও সময়মতো সাবধানতা অবলম্বন এবং যথোচিত চিকিৎসার সুব্যবস্থার ফলে, অনায়াসেই আমরা সে বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাই সে প্রসঙ্গেরই মোটামুটি আলোচনা করছি।

শিশুর জন্ম

প্রসূতি-পরিচর্য্যা এবং শিশু-মঙ্গল সম্পর্কে কি কি বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন গোড়াতেই তার হদিশ রাখা দরকার। প্রসূতির পরিচর্য্যা বলতে সচরাচর আমরা বুঝি যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে ভবিষ্যৎ জননীর দৈহিক ও মানসিক এমন বিশেষ কয়েকটি অবস্থান্তর ঘটতে পারে, যে জন্য ধাত্রীবিদ্যা সম্মত এবং চিকিৎসাশাস্ত্র অনুমোদিত সাবধানতা ও সুব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। যথা, (১) বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার আগে (প্রাক্ প্রসবকালে) কি কি বিপদ ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা বা জ্ঞান (২) কি উপায়ে সুষ্ঠু-ভাবে বিপদ এড়ানো যেতে পারে, (৩) কোন্ সময়ে সেই বিপদ এড়ানর জন্য উপায় বা চিকিৎসা করা প্রয়োজন—সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান। কারণ, এগুলির সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকলে ও সময়ে সাবধান হলে মাতা ও সন্তান উভয়েরই জীবন রক্ষা করা সম্ভব। কথাটা শুনলে হয়তো অনেকেই আশ্চর্য হবেন যে মাত্র ২০।৩০ বৎসর যাবৎ আমরা এই 'প্রসূতি পরিচর্য্যা' সম্বন্ধে কিছু কিছু আগ্রহশীল হয়েছি এবং আমাদের এই আগ্রহ-শীলতার ফলেই আজ সারা দুনিয়াতে নবজাত শিশুর ও প্রসূতির মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে গেছে। প্রগতি-শীল সকল দেশেই স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্ম্মীরা আজ এ বিষয়ে সজাগ-দৃষ্টি দান করেছেন এবং নিত্য-নতুন উন্নত ব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তনেরও পর্য্যাপ্ত আয়োজন সুরু হয়েছে। তবে পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় এ সম্বন্ধে আমাদের দেশ অবশ্য এখনও অনেকখানি পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে।

আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরপ্রতিষ্ঠান সমূহের ও স্বাস্থ্যদপ্তরের এ বিষয়ে আরো অনেক বেশী সজাগ হতে হবে, কারণ সুস্থ ও সবল শিশুরাই গড়ে তুলবে ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজ। Economic Society বা অর্থনৈতিক সুস্থ সমাজ গঠন ব্যবস্থায়—জন্ম নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুপালনের যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে—সে কথা আজ সকলকেই জানতে ও বুঝতে হবে।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশু-মঙ্গল ব্যবস্থার সুপ্রসারতা-কল্পে বিলাতে সুশিক্ষিত চিকিৎসক ও ধাত্রীর দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য Antinalal clinics বা শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান বা সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে আশ-পাশের অঞ্চল থেকে যে কোন 'মাতা' বা প্রসূতি নিয়মিত যাতায়াত ও যে কোনও বিষয়ে উপদেশ এবং সাহায্য লাভ করতে পারেন। তাছাড়া পাশ্চাত্য দেশে যে কোনও সাধারণ হাসপাতালে অথবা প্রসূতিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ধরণের সেবাসদনেও এই শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সুবন্দোবস্ত আছে। উপরন্তু সেখানকার প্রায় প্রত্যেকটি পৌর-প্রতিষ্ঠানেই এ ব্যবস্থা সুপ্রচলিত রয়েছে। যে সব দুঃস্থ-দরিদ্র সন্তান সম্ভবা মহিলাদের পক্ষে বিশিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাঁরা অনায়াসেই তাঁদের এলাকাস্থিত পৌরপ্রতিষ্ঠানের ধাত্রী বা শিশুমঙ্গল সমিতির পরিচারিকার (Health visitor) উপদেশ নিতে ও প্রয়োজন হলে তাঁর সাহায্যে নিকটতম শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানেও সুচিকিৎসার্থে যেতে পারেন। এত সুবন্দোবস্ত থাকা সত্বেও (আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দিলেও) সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য দেশে এখনও এমন বহু মাতা-পিতা আছেন যাঁরা শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও সে-গুলির উপকারিতার সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। এই কারণেই প্রখ্যাত চিকিৎসকবৃন্দ ডাঃ সেলডন্, ডাঃ হল্যাণ্ড ও ডাঃ জইসবেরী দুঃখ প্রকাশ করেছেন—বিলাতী-সমাজের নরনারীর এমন উদাসীনতার কারণ শুধু যে অজ্ঞতা ও কুড়েমী—তা নয়—এটা হলো তাঁদের একটা মজ্জাগত সামাজিক ব্যাধি। সমাজের প্রত্যেক লোকের মধ্যে, ভবিষ্যৎ মাতা ও সন্তানদের মুখ চেয়ে—এই শিশুমঙ্গল ও প্রসূতিপরিচর্য্যার শিক্ষার ব্যাপক প্রসারতা একান্ত দরকার ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠার মতোই মঠে, মন্দিরে ও মসজিদেও যেন এ সম্বন্ধে রীতিমত অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়।

ধাত্রী—সময়ে ঠিক করুণ। সকলেই তো আর ধাত্রী-বিদ্যা বিশেষজ্ঞের বা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে পারেন না এবং বহু ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও অনেকেরই হয় না। তাছাড়া ধাত্রী বা চিকিৎসক নিয়োগ বহুক্ষেত্রেই আর্থিক সঙ্গতি ও প্রসূতি বা শিশুর স্বাস্থ্যের উপরও নির্ভর করে অনেকখানি। তবে একথা মনে রাখা দরকার সন্তান সম্ভাবনার সুরু থেকেই প্রসূতির পক্ষে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক অথবা শিক্ষিতধাত্রীর সহিত যোগাযোগ রাখা অথবা যে কোন প্রসূতি সেবাসদনে নিয়মিত যাতায়াত ও পরীক্ষাধীন থাকা উচিত। কারণ বিশেষজ্ঞের উপদেশ, পরামর্শ বা সক্রিয়-সহায়তা দরকার হলেই যেন সময়মতো সে ব্যবস্থার যথোচিত সুযোগ লাভ করতে পারেন অনায়াসেই। বিলাতে ব্যবস্থা আছে যে কোনও প্রসূতির পক্ষে ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হলে অচিরেই সে সুবিধা-সুযোগ পেতে পারেন। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত সাধারণ চিকিৎসকদের মধ্যেও বহু পারদর্শী ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বান্ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা প্রসূতির মঙ্গলার্থে যে কোনও অবস্থার উপযোগী সহায়তাদান সর্ব্বতোভাবে করতে পারেন। আমেরিকা ও বিলাতের মত সু-উন্নত অতি-আধুনিক দেশে অধিকাংশ প্রসূতিই আজকাল শিক্ষিত-ধাত্রী ও চিকিৎসকদের সাহায্য নিতে সুরু করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে চিকিৎসকদের সম্বন্ধে ব্যবহারিক-জীবনে বিশেষ একটি কর্ত্তব্য থাকা উচিত। সে কথা আজকাল আমরা ভুলতে বসেছি। একজন চিকিৎসক তাঁর কতখানি মূল্যবান সময়, বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম প্রসূতি এবং শিশুর হিতার্থে অতিবাহিত ক'রেন সে বিষয়ে আমাদের একান্তভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। ইংলণ্ডের খতিয়ানে দেখা যায় যে ১৯৩৩ সালে সেখানে মোট ষোল হাজার ধাত্রী ছিলেন এবং শতকরা প্রায় ৫০ জন প্রসূতিই তাঁদের সহায়তায় সন্তান প্রসবের সুষ্ঠু সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছেন। ইদানীংকালে এই সব ধাত্রীদের শিক্ষা ও কর্মকুশলতার মান আগের চেয়ে আরও অনেক

বেশী উন্নত হয়েছে। বিলাতে ধাত্রীবিদ্যা অবশ্য একবৎসর শিক্ষণীয় এবং পরীক্ষায় সাফল্যলাভের পর ব্যক্তিগত দক্ষতা-অনুসারে তাঁদের সকলকে তক্‌মা বা Certificate দেওয়া হয়। চিকিৎসকের সাহায্য কখন নিতে হবে, সে বিষয়ে তাঁদের যথোচিত নির্দ্দেশ দেওয়ার সুব্যবস্থা আছে। এই সব সুনিপুণ-ধাত্রীরা সাধারণতঃ খুবই পরিশ্রমী ও স্বল্প বেতনভুক্ত হয়ে থাকেন। এঁদের সঙ্গে প্রসূতির সম্পর্ক খুবই অন্তরঙ্গ ও সুমধুর। সম্প্রতি আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষাদানের সুবন্দোবস্ত হয়েছে। তবে এখনও পল্লীগ্রামে, বিশেষতঃ পশ্চাৎপদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রদেশে, অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর বিশেষ একধরণের পেশাদার মহিলারাই প্রসূতির পরিচর্য্যা করে থাকে, এদের কোনও উপযুক্ত শিক্ষাও নেই এবং পরম দ্বিধাহীনভাবেই এখনও সেই আদিকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে এরা অসঙ্কোচে এদের অপটু ধাত্রীবিদ্যার কাজ চালিয়ে যায়। তারফলে প্রসূতি ও শিশুর যথোচিত সেবা-যত্নের অভাবে নানা বিপদের উৎপত্তি হয়। এর পরিণামে শুধু যে অকারণে শিশু মৃত্যুর হার বাড়ে তাই নয়, প্রসূতিরাও বহুবিধ প্রাণ সংশয়কর বিপদে পড়ে। এই কারণেই, আমাদের দেশের মহিলাদের উচিত—গর্ভাবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব সুশিক্ষিত ধাত্রী অথবা সুদক্ষ চিকিৎসকের উপদেশ ও সহায়তা গ্রহণ করা। তার ফলে, বিপদের সম্ভাবনা থাকলে যথা সময়ে সাবধানতা অবলম্বন ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থাগুণে প্রসূতি ও শিশুকে রক্ষা করা ও অকালমৃত্যু, বিকলাঙ্গ ও স্বাস্থ্য হানির কবল থেকে বাঁচান যায়। যথাসময়ে সাবধানতা অবলম্বন না করে, পরে সঙ্কট মুহূর্ত্তে ধাত্রী বা চিকিৎসকের পরামর্শ বা সাহায্য নিয়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে আমরা অকারণে শুধু শুধু নিজেদের মন্দ-ভাগ্যের ও ধাত্রী বা চিকিৎসকের দোষ দিই···কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতা বা অবহেলার কথা আদৌ চিন্তা করি না। এটিই হলো সব চেয়ে পরিতাপের বিষয়। তবে অযথা পরিতাপ করে কোন ফল লাভ হবে না···বরং যথার্থ শিক্ষার্জ্জন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সন্তান সম্ভাবনা মেয়েদের জীবনে অসুস্থতার লক্ষণ বিশেষ কোন রোগ নয়, সেই হেতু ঘটা পটা করে দাই বা ডাক্তারের বাড়ী দৌড়াদৌড়ির কোন দরকার নেই। অবশ্য একথাও সত্য যে শতকরা ৯৫% জন প্রসূতিই খুব সহজে সন্তান প্রসব করেন এবং গর্ভাবস্থায় তাঁদের স্বাস্থ্যেরও কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কিন্তু তাহলেও, বাকী ৫% ভাগের জন্যই এই বিশেষ সেবা-যত্ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। প্রসূতি অবস্থায় দেহের যাবতীয় অংশগুলির বিশেষ একটি তারতম্য ও পরিবর্ত্তন ঘটে··তার ফলে রসস্রাবী গ্রন্থিসমূহের উপর চাপ পড়ে এবং সেগুলিরও কাজ বাড়ে। তাই সেই সময়ে প্রসূতির দেহপরীক্ষার ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়ে। কাজেই সেগুলির সম্বন্ধে যথা-সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বনের ফলে, প্রসূতিকে সুষ্ঠুভাবে বিপদ মুক্ত করা যায়। হৃদযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্‌, মূত্রাশয়, ও অন্ত্রতন্ত্রের যেমন পরীক্ষার প্রয়োজন হয়—ঠিক তেমনিভাবেই প্রসব কালীন সাবধানতার অঙ্গ-হিসাবে প্রসূতির কোমরের অস্থির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনারও একান্ত প্রয়োজন আছে। সুদক্ষ ধাত্রী অথবা বিচক্ষণ চিকিৎসক ছাড়া এগুলির যথার্থ বিচার-বিবেচনার উপায় নেই। কাজেই অশিক্ষিত দাই বা 'হাতুড়ে বদ্দির' সাহায্য না নিয়ে, এ বিষয়ে নিজেদের জ্ঞানসঞ্চয় করা একান্ত প্রয়োজন। (ক্রমশঃ

—

হাতের কাজ

ষ্টেন্‌সিলের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি, সেইমতো

বিশেষ পদ্ধতিতে কি উপায়ে বিভিন্ন 'নক্সার ছাপ' (pattern-Design) আঁকা বা 'ট্রেসিং' (Tracing) করা যায়, তারই মোটামুটি হদিশ জানাচ্ছি।

ধরুন, উপরের ৩নং ছবিতে যে বিচিত্র ফুল-পাতার নক্সাটি দেখছেন, সেই নমুনামতো ছাঁদে কাঠের, কাগজের কিম্বা কাপড়ের কোনো সামগ্রীতে 'ষ্টেন্‌সিল্'-কারুশিল্পের ছাঁচ তুলতে হবে। এ কাজ করবার সময়, প্রথমেই 'ষ্টেন্‌সিল্-পেপারের' উপরে আগাগোড়া নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে ফুল-পাতার নক্সাটি এঁকে বা 'ট্রেসিং' করে নিন—উপরের ১নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে। ষ্টেনসিল্-কাগজের উপর নক্সাটি সুষ্ঠুভাবে এঁকে নেবার পর, ধারালো নরুণ বা ক্ষুরের ব্লেড (Safety Razor Blade) কিম্বা ছুরির সাহায্যে সেটিকে নিখুঁত-পরিপাটি ও যথাযথ ধরণে প্রত্যেকটি রেখার দাগ-বরাবর ছাঁদে কেটে নিতে হবে। উপরের ২নং ছবিটি দেখলেই, এ কাজ কি উপায়ে সুসম্পন্ন করতে হবে তার সুস্পষ্ট হদিশ মিলবে। অর্থাৎ, উপরের ২নং ছবিতে দেখানো ফুল-পাতার নক্সার কালো-রঙে চিহ্নিত অংশগুলিই শুধু, নরুণ, ছুরি বা ক্ষুরের ব্লেড দিয়ে নিখুঁত-পরিপাটি ধরণে কেটে ফেলতে হবে—শাদা রঙের কোনো অংশেই যেন বেহিসাব বা অসাবধানতার ফলে, এতটুকু ছাঁট-কাটের ছোঁয়াচ না লাগে—সেদিকে সচেতন-দৃষ্টি রাখবেন। দৈবাৎ ভুলক্রমে, এ কাজে যদি সামান্য কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে 'ষ্টেন্‌সিলের' নক্সা শুধু যে শ্রী-হীন হয়ে উঠবে তাই নয়, কারুশিল্প-রচনার পক্ষেও নানা অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করবে। 'ষ্টেন্‌সিল্-পেপার' কাটবার নিয়ম হলো—নক্সার কাগজটিকে একখানি সমতল কাঠের বা কাঁচের পাটার উপর রেখে, বাঁ-হাতের তালুর চাপ দিয়ে সেটিকে বেশ ভাল করে চেপে ধরে আগাগোড়া খুব সন্তর্পণে ও নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে নক্সার যে সব অংশগুলি কালো-রঙে চিহ্নিত, সেগুলিকে ধারালো ছুরি, নরুণ অথবা ক্ষুরের ব্লেডের সাহায্যে আগাগোড়া সুচারুভাবে ও যথাযথ-আকারে কেটে নিতে হবে। এভাবে 'ষ্টেন্‌সিল্-পেপার' কাটবার সময়, নক্সার কিনারাগুলি যেন পরিষ্কার ও সমান-ছাঁদে কাটা হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ, নক্সার কিনারা অপরিচ্ছন্ন ও অসমানভাবে ছাঁটাই করা হলে, কারুশিল্পের প্রতিলিপি অস্পষ্ট এবং অসুন্দর দেখাবে। কাজেই বিশেষ মনোযোগ-সহকারে এ কাজটুকু আগাগোড়া পরিপাটিভাবে নিষ্পন্ন করা চাই।

'ষ্টেন্‌সিল্-পেপারে' নক্সার ছাঁদ ছাঁটাই করে নেবার পর, কাপড়, কাগজ বা প্রয়োজনানুযায়ী সামগ্রীর উপর বিশেষ কোনো একটি বা একাধিক রঙ ব্যবহার করে 'নক্সা-চিত্রণের' (Stencil-Colouring) পালা। সে কাজ কি পদ্ধতিতে করতে হয় এবং 'ষ্টেন্‌সিল্'-কারুশিল্পের ছাপ তোলার জন্য কোন ধরণের রঙ-তুলি প্রভৃতি সরঞ্জাম প্রয়োজন— আগামী সংখ্যায় তার বিশদ-পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ

সুধীরা হালদার

এবারে বাঙলা দেশের যে অভিনব মুখরোচক মাছ দিয়ে তৈরী আমিষ-খাবার রান্নার কথা বলছি, সেটির নাম—'রুই মাছের সুক্তো।' প্রিয়জনদের পাতে সাদরে পরিবেষণের পক্ষে এ রান্নাটি খুবই বৈচিত্র্যময় হবে বলেই মনে হয়।

বিচিত্র-সুস্বাদু এই আমিষ খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খাবার রান্নার জন্য চাই—রুই মাছ, আলু, কাঁচকলা, বেগুন, পটল, ঝিঙে, সজ্‌নে ডাঁটা, আদা-বাটা, হলুদ-বাটা, নুন, সরষের তেল, সরষের গুঁড়ো, মেথি আর খানিকটা পিটুলী।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে মাছটিকে প্রয়োজনানুযায়ী মাপে টুকরো করে কুটে পরিপাটিভাবে ধুয়ে কিছুক্ষণ নুন ও হলুদ মাখিয়ে পরিষ্কার একটি পাত্রে রেখে দিন। তারপর আলু, পটল, বেগুন, ঝিঙে, সজ্‌নে ডাঁটা প্রভৃতি আনাজ গুলিকে ডুমোডুমো অথবা লম্বা ফালি করে কুটে রাখুন এবং কাঁচকলার টুকরোগুলিতে হলুদ মাখিয়ে উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে সরষের তেলে ভেজে নিন।

এ কাজ সারা হলে পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে ইতিপূর্বে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখা মাছের টুকরোগুলিকে সরষের তেলে ভেজে রাখুন। মাছের টুকরোগুলি আগাগোড়া ভাজা ও বাদামী রঙের হলে, সেগুলিকে সযত্নে পরিষ্কার একটি পাত্রে নামিয়ে রেখে, পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র বসিয়ে গরম সরষের তেল মেথি, লঙ্কা, সরষের গুঁড়ো ফোড়ন দিয়ে ইতিপূর্ব্বে কুটে-রাখা আলু, পটল, বেগুন, ঝিঙে, সজনে ডাঁটা প্রভৃতি আনাজের টুকরোগুলিকে ছেড়ে কিছুক্ষণ খুন্তি দিয়ে নাড়'চাড়া করে সেগুলিকে ভালোভাবে ভেজে নিন। এমনিভাবে ফুটন্ত সরষের তেলে ফোড়ন-সহকারে আনাজের টুকরোগুলিকে আগাগোড়া ভেজে নেবার পর, উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে নুন ও হলুদ মিশিয়ে খানিকটা জল ঢেলে দিন। কিছুক্ষণ বাদে উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রের এই 'মিশ্রণটি' বেশ ফুটন্ত হয়ে উঠলেই, রান্নার 'মিশ্রণটিতে' ইতিপূর্ব্বে ভেজে-রাখা মাছের ও কাঁচাকলার টুকরোগুলি ছেড়ে দিন। খানিকক্ষণ ফোটানোর ফলে, মাছের ও আনাজের টুকরোগুলি আগাগোড়া সু-সিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে রন্ধন-পাত্রের 'মিশ্রণে' অল্প একটু পিটুলী মিশিয়ে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ উনানের আঁচে বসিয়ে রেখে ফুটিয়ে নিন এবং রান্নার মিশ্রণ' বা ঝোল বেশ ঘন ও কাই কাই ধরণের হলেই উনানের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটি নামিয়ে ফেলে খাবারটিতে আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু আদা-বাটা মিশিয়ে দিয়ে সযত্নে অন্য আরেকটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। তাহলেই 'রুই মাছের সুক্তো' রান্নার পালা শেষ হবে।

অতঃপর এ খাবারটি সাদরে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশন করুন—আপনার হাতে তৈরী বিচিত্র মুখরোচক এই অভিনব রান্নার সুস্বাদে তাঁরা যে প্রচুর পরিতৃপ্তি লাভ করবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি রসনাতৃপ্তিকর খাবার রান্নার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

প্লুটো

উপাধ্যায়

ইতিপূর্ব্বে গ্রহজগতে হার্সেল ও নেপচুন নিয়ে কিছু আলোচনা করা গেছে। এবার নবতম আবিষ্কৃত গ্রহ প্লুটো (রুদ্র) সম্বন্ধে কিছু বলবো। ১২ই মার্চ্চ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবী থেকে ৩,০১০, ৭০, ০০০, ০০০ মাইল ধুরে অবস্থিত। এতদূরে থেকেও সে পৃথিবীর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে, মানবজীবনের ওপরও তার আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণ শেষ করতে এর ২৪৮ বর্ষ সময় লাগে। প্রত্যেক বছরে দেড় ডিগ্রীরও কম নড়ে। রোমান গ্রীক দেবতা প্লুটোর নামে এই গ্রহ অভিহিত হয়। প্লুটোর ক্ষেত্র' বৃশ্চিক। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণাত্মক গ্রহটি স্ত্রী সংজ্ঞক হোলেওএর পুংসংজ্ঞক নামকরণ হয়েছে। প্লুটো মৃত্যুর অধিকর্ত্তা। অনেকে বলেন নেপচুনই মৃত্যুর অধিপতি কিন্তু তা নয়, নেপচুন দুঃখের কর্ত্তা। মীনরাশি নেপচুনের ক্ষেত্র। মীন দুঃখদায়ক রাশি। শতকরা আশীজন লোকের মাতৃবিয়োগের কারকই প্লুটো। নেপচুনও প্লুটো যে সব রোগ সৃষ্টি করে, সেগুলি মানসিক ব্যাপার ঘটিত। হর্মোন পুষ্টির সহায়ক প্লুটো। বিস্ফোটক, দুর্ঘটনা, মূত্রাশয়, রক্তদুষ্টি, করোনারি থ্রম্বসিস, ডিপথিরিয়া, যৌন ব্যাধি, মূর্চ্ছা, স্ত্রী ঘটিত ব্যাধি, ম্যালেরিয়া, হাম, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মেদবৃদ্ধি, নিউমোনিয়া, টিউবার কিউলোসিস, টাইফয়েড, হুপিং কাশি, মানসিক ব্যাধি প্রভৃতির কারক প্লুটো। প্লুটোর প্রভাবে যে সব রোগ হয় তাদের পথ্যে প্রোটিন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, এ, সি, ডি ও বি কম্ প্লেক্সের প্রয়োজন। প্লুটোর প্রভাবে রাজনীতিজ্ঞ, পুলিশের লোক, জ্যোতিষী, কৃষক, উপসেবিকা (বা নার্স) প্রসাধনদ্রব্যাদিপ্রস্তুতকারক, ভৃত্য, টেলিফোন অপারেটার, গুদামের কেরাণী, ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী, রেডিও টেক্‌নিসিয়ান, নৃত্যশিল্পী, রসায়নবিদ্ প্রভৃতির বৃত্তি অবলম্বন হয়। যৌন ঘটিত ব্যাপার গুলির উপর প্লুটোর প্রভাব বেশী। সমলৈঙ্গিক যৌনতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, প্লুটোর দ্বারা সংঘটিত হয়। প্লুটোর সঙ্গে চন্দ্র পুরুষের রাশিচক্রে থাকলে তার স্ত্রীর পর পুরুষাসক্তি প্রবল হয়। প্লুটো মাতৃকারক গ্রহ। দশমস্থানে থাকলে জাতকের উপর মায়ের প্রভাব খুব বেশী থাকে। এই গ্রহটি অনুকূল হোলে জাতক প্রচুর অর্থশালী হয়। কোন গ্রহ প্লুটোর সঙ্গে সহাবস্থান করলে সে এই গ্রহের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। ষষ্ঠ স্থানে প্লুটো থাকলে জাতকের স্বাস্থ্য লাভ হয়। যার কোষ্ঠিতে প্লুটো প্রতিকূল তার জীবন দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হবেই, কোন গ্রহই তার মত চরম দুঃখ-দুর্দ্দশা দেয় না। প্লুটোর সঙ্গে রবির সহা স্থান বা দৃষ্টি সম্বন্ধ হোলে জাতকের দুর্দ্দম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাহস, দৃঢ় সংকল্প, সৃষ্টি কুশলতা ও সুন্দর আত্মসংযম প্রত্যক্ষ করা যায়। চন্দ্রের সঙ্গে এরূপ সম্বন্ধ ঘটলে, বড় বড় পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার আগ্রহ দেশ-প্রেম, কল্পনা, গভীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আত্মোপলব্ধির সক্ষমতা প্রকাশ পায়। মঙ্গলের সঙ্গে প্লুটোর অনুরূপ

সম্বন্ধ হোলে অসাধারণ শারীরিক শক্তি, অদম্য ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় সংকল্প, আত্মবিশ্বাস ও সমর প্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। বুধের সহিত প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে বুদ্ধি তৎপরতা, হাতের কাজে দক্ষতা, নানা বিষয়ে জ্ঞান, আকর্ষণী শক্তি আর প্ররোচক মোহিনী শক্তি প্রত্যক্ষ হয়। বৃহস্পতির সহিত প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়, আয়ু দীর্ঘ হয়, দীর্ঘকাল ব্যাপী যৌবন অটুট থাকে, উচ্চ সম্মান ও পদ মর্য্যাদা, ধর্ম্ম ও দর্শনের দিকে ঝোঁক প্রভৃতি ফল লাভ হয়। শুক্রের সঙ্গে প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, শিল্পী সুলভ আত্মপ্রকাশ হয়। প্রবল আবেগ, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য সূচিত হয়। শনির সঙ্গে প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে নাছোড়বান্দাভাব, জেদ, অধ্যবসায়, অসাধারণ আত্মসংযম ও স্বার্থত্যাগ দেখা যায়। হার্সেলের সঙ্গে প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে প্রচণ্ড প্রভুত্ব পরায়ণ চরিত্র ফুটে ওঠে, আর সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও ইচ্ছাশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাচুর্য্য, অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ, স্বাধীনতা ও মুক্তির আগ্রহ প্রভৃতি পরিস্ফুট হয়। নেপচুনের সঙ্গে প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিকতা লাভ, পার্থিব বস্তু সম্পর্কে অসন্তোষ, তুরীয় স্তরে যাবার দিকে আগ্রহ প্রকাশ পায়।

প্লুটো লগ্নে থাকলে অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি ও সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। ডাঃ এ্যানি বেশান্তের এই যোগ ছিল। মন বিস্তৃত হয়, মৌলিক চিন্তাধারা ও সৃষ্টি কুশলতা প্রকাশ পায়, সৃজনী প্রতিভা ও অভিব্যক্ত হয়। প্রতিভার স্ফূরণ হেতু লোক সমাজে সমাদর লাভ ঘটে। জাতকের মনে বিগতদিনের প্রতি আগ্রহ আর অনাগত দিনের বস্তু, প্রাপ্তির জন্য লালসার মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় স্থানে প্লুটো থাকলে বিভিন্ন দিক থেকে অর্থাগম হয়, অস্বাভাবিক উপায়ে বিশেষ বিত্তশালী হয়ে ওঠে। তৈল, খনিজ পদার্থ, আবিষ্কার ও পুরস্কারের মাধ্যমেও অর্থাগম হোতে পারে। প্লুটো তৃতীয় স্থানে থাকলে অসাধারণ মেধাশক্তি প্রকাশ পায়। কল্পনাও প্রখর হয়, বাগ্মিতায় পারদর্শিতা লাভ হয়, রহস্যজনক গল্প রচনায় খ্যাতি অর্জ্জন হয়। 'স্বপ্ন সাধ ও আকাঙ্খা বহুধা বিস্তৃত হয়, কখন কখন সেগুলি জঁাকাল হয়ে ওঠে। চতুর্থ স্থানে প্লুটো থাকলে মানুষের মধ্যে আসে বিশ্বপ্রেম, যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তার মতের বা ভাব অনুভাবের স্থিরতা থাকে না। এ্যাডভেঞ্চারের দিকে জাতকের সহজাত স্পৃহা। আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক, সে ভাবে জগতে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে।

পঞ্চম স্থানে প্লুটো থাকলে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এরূপ আকাঙ্খার আতিশয্য দমন করা দরকার। জাতক অত্যন্ত সামাজিক, দল কেন্দ্রিক ও ব্যঙ্গপ্রিয়, নূতনের সংস্পর্শে এসে উত্তেজনার অন্বেষক হয়। নাট্য রচনা, সিনেমা বা থিয়েটারে অভিনয়াদি প্রভৃতির দ্বারা লাভবান হোতে পারে। প্লুটো বিরুদ্ধ হোলে প্রেম, সন্তান, আনন্দও স্পেকুলেশন ব্যাপারে বাধ্যতা মূলক অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। চিকিৎসক, নার্স ও সমাজকর্ম্মীর পক্ষে ষষ্ঠস্থ প্লুটো অত্যন্ত শুভদায়ক। জাতকের মধ্যে মানুষের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি দূর করবার ক্ষমতা থাকে। মানুষের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি, করুণা, বন্ধুত্ববোধ, পরার্থপরায়ণ প্রকাশ পায়। সাধু সন্ন্যাসী, মানবতার উপাসক, জনকল্যাণের জন্য আন্দোলনকারী ত্যাগী পুরুষদের পক্ষে ষষ্ঠস্থ প্লুটো অত্যন্ত উপযোগী। সপ্তম স্থানে প্লুটো থাকলে স্বামী বা স্ত্রীর অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয়, আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক থাকে, স্বাধীনতা সুদৃঢ় হয়, যশ, প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব বা উচ্চস্তরে অবস্থিত সম্ভব হয়, সৃষ্টিশক্তি থাকে প্রবল, আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি সম্পন্ন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। অষ্টম স্থানে প্লুটো থাকলে অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্য সন্ধানের দিকে আগ্রহ থাকে। নানারকম স্বপ্নদর্শন হয় এবং যে সব স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যায়। জাতক ভবিষ্যদ্রষ্টা হয়। কিন্তু আশঙ্কা থাকে তাহার জীবনে কোন না কোন সময়ে অগোচরে প্রস্থান করতে পারে আর তার সম্বন্ধে কোন দিন কোন কিছু জানা সম্ভব হয় না।

নবম বা ভাগ্যস্থানে প্লুটোর অবস্থিতে অত্যন্ত শুভদায়ক। জাতকের উন্নত মনের পরিচয় পাওয়া যায়, অসাধারণ প্রতিভা, ভ্রমণপ্রিয়তা, ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ,' আদর্শ ও অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝোঁক, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শিতা প্রভৃতি ফলগুলি দেখা যায়। দশমস্থানে প্লুটো থাকলে রাষ্ট্রশাসকগণ, বড় বড় নেতা ও রাষ্ট্রের

সৌন্দর্য্যকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছেন তাই নয়, উপরন্তু নানা রকম উৎকট চর্ম্মরোগেও আক্রান্ত হচ্ছেন। কাজেই রূপচর্চ্চাটা এবং প্রসাধনী-উপকরণাদি ব্যবহার-কালে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা যে একান্ত প্রয়োজন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই কারণেই ইতিপূর্ব্বে বলে রেখেছি যে বিভিন্ন নর-নারীর দেহের ত্বক্ ও চর্ম্মের শ্রেণীগত-পার্থক্যের দরুণ বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রসাধনী-উপকরণ ব্যবহার করাই সমীচীন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে শীতপ্রধান পাশ্চাত্যদেশের সৌখিন সমাজে নাতিস্নান-রীতি এবং স্নো, ক্রিম, লোশন ব্যবহারের যে বহুল-প্রচলন দেখা যায়, সে বিধান প্রাচ্যদেশীয়দের পক্ষে সর্ব্বৈবভাবে প্রযোজ্য নয়। কারণ, শীতের প্রকোপে দেহের ও মুখের চর্ম্ম সচরাচর শুষ্ক-খস্‌খসে এবং কর্কশ হয়ে যায়, তাই পাশ্চাত্য-সমাজে নিত্য-স্নানের প্রচলন কম এবং স্নো, ক্রিম প্রভৃতি প্রসাধনী ব্যবহারের রেওয়াজ বেশী। কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্নো, ক্রিম প্রভৃতি মাত্র কয়েক ঘণ্টার বেশী মেখে থাকা উচিত নয় এবং নিত্য-স্নানের রীতি একান্ত পালনীয়। আমাদের দেশে স্নো বা ক্রিম ব্যবহারের আগে,শীতল বা ঈষৎ-উষ্ণ জলে ভালো করে মুখ ও দেহাংশ ধুয়ে এবং শুকনো গামছা বা তোয়ালের সাহায্যে জলটুকু বেশ খটখটেভাবে মুছে ফেলে খুব সামান্য পরিমাণে ও অল্পক্ষণ ঘষে এ সব প্রসাধনী মেখে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দেহের ও মুখের চর্ম্ম সাধারণতঃ তৈলাক্ত-মসৃণ থাকে···সুতরাং বেশীক্ষণ স্নো বা ক্রিম ঘষাঘষির ফলে, সে চর্ম্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্রমশঃ রুক্ষ-কর্কশ হয়ে ওঠে। তাছাড়া রূপ-লাবণ্য অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের সৌখিন-সমাজের অনেকেরই রাত্রে শয়নের আগে স্নো বা ক্রিম মুখে মাখার অভ্যাস আছে—এ অভ্যাসটি কিন্তু সৌন্দর্য্য-সাধনার পক্ষে সবিশেষ অপকারী। রাত্রে শয়নের আগে স্নো বা ক্রিম ব্যবহারের পরিবর্ত্তে, বরং যদি এক পেয়ালা শীতল-জলে দশফোঁটা ইউ-ডি-কোলোন (Eue-de-cologne) মিশিয়ে, সেই জলে ভালোভাবে মুখ এবং দেহাংশ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন তোয়ালের সাহায্যে শুকনো করে মুছে, সামান্য পাউডার মেখে নিতে পারেন, তাহলে রূপ-লাবণ্য অটুট থাকবে দীর্ঘকাল। এ ছাড়া ইতিপূর্ব্বেই গত সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যে কয়টি 'ঘরোয়া প্রসাধনী' সামগ্রীর উল্লেখ করেছি, সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করলেও যথেষ্ট উপকার পাবেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের একটি প্রাচীন রূপচর্চ্চা-রীতিরও উল্লেখ করা যায়। পুরাকালের সৌখিন-সমাজে গ্রীষ্মকালে দেহের ও মুখের চর্ম্ম মসৃণ-সুন্দর রাখার জন্য চন্দনের প্রলেপ মাখার রীতি প্রচলিত ছিল। সুপ্রাচীন হলেও, রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধিকল্পে চন্দন-প্রলেপনের এই অভিনব রীতিটি একালের সৌখিন নর-নারীর পক্ষেও বিশেষভাবে অনুসরণযোগ্য। গ্রীষ্মকালে স্নানের পর দেহের ও মুখের চর্ম্মের উপর যদি খুব মিহি-ও পাতলা ধরণে চন্দনের প্রলেপ মেখে, তার উপর সামান্য পরিমাণে পাউডার বা চন্দনের গুঁড়ো ঘষে নিলে, মুখচর্ম্ম সুস্থ-সুন্দর, মসৃণ ও লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিত থাকে এবং বর্ণশোভাও সমুজ্জল হয়ে ওঠে সবিশেষ। এমন কি, রাত্রে শয়নের আগে, ভালো করে মুখ ও দেহাংশ ধুয়ে অল্প একটু চন্দনের গুঁড়ো অথবা মিহি-প্রলেপ মেখে নিতে পারেন তো রূপশ্রী অক্ষুণ্ণ-অমলিন থাকবে দীর্ঘকাল। এভাবে চন্দন-চর্চ্চিত করার ফলে, শুধু যে চর্ম্ম-ত্বক্ সুস্থ সুন্দর ও লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে তাই নয়, গ্রীষ্মতাপের দুঃসহ-কষ্টেরও লাঘব হবে অনেকখানি এবং দেহ-মন সুশীতল ও সুগন্ধময় থাকবে সারাক্ষণ। বাঙলাদেশের সৌখিন-সমাজে অধুনা চন্দন-চর্চ্চার রেওয়াজ অদৃশ্যপ্রায় হলেও, দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে এ রীতির এখনও বেশ প্রচলন আছে। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কারো সখ হলে, কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ ভারতবাসীদের প্রতিষ্ঠিত বহু মনোহারী দোকানেই অনায়াসে এবং সুলভে অঙ্গরাগ-সামগ্রী হিসাবে বিশেষভাবে প্রস্তুত 'চন্দন গুঁড়োর বটিকা' (Sandalwood powder tablets) সংগ্রহ করতে পারবেন।

এবারের মতো এখানেই আমাদের রূপচর্চ্চার আলোচনা শেষ করলুম—পরের সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরো কিছু হদিশ জানানোর বাসনা রইলো।

——

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশু-মঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সকল জ্বালা জুড়ায় শেষে,
খোকা আমার মধুর হেসে,
মা না হলে বুঝবে কে সে,
বিধাতার করুণা কি সে।
খোকার হাসি হয় না বাসি,
বুকে আমার বাজায় বাঁশী,
খোকা, খুকুর মধুর হাসি,
বাঁধন আমায় দিলে কসি।

প্রসূতির পরিচর্য্যা শুধু যে মেয়েদের শিক্ষণীয়, আমাদের অনেকেরই এমনি একটা ধারণা আছে। কিন্তু এটা কি ঠিক? অশিক্ষিত দাই যে যুগে আমাদের প্রসূতি পরিচর্য্যার ভার নিত সে যুগ আর নেই। সেকালে অশিক্ষিত পরিবেশ ও 'হেলুনী' বা উপযুক্ত শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন নিম্ন-শ্রেণীর মেয়েদের হাতে প্রসব-কালীন ব্যবস্থাদির ভার ন্যস্ত থাকায় 'পেঁচোয় পেয়ে' অনেক শিশুই তখন অকালে প্রাণ হারাতো…এমন কি, শিশুর মাতাও অকাল-মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেতেন না। এখনকার যুগে অবশ্য শিক্ষিত ধাত্রী ও ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া গেলেও, সংসারে স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন সকলেরই প্রসূতির প্রতি একটা মোটামুটি কর্তব্য জ্ঞান ও সে কর্ত্তব্য পালনের জন্য কি করা উচিত, আর কি করা উচিত নয় তারও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কি উপায়ে প্রসূতির স্বাস্থ্য সবল ও সুস্থ রাখা যেতে পারে, সে বিষয়ে পরিবার-ভুক্ত সকলেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব গ্রহণ ও কষ্ট স্বীকার করতেই হয়। কারণ মাতৃগর্ভে শিশুর উদ্ভব থেকে তার জন্ম পর্য্যন্ত কালে এমন নানা অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটতে পারে যে, সময়মতো সাবধান না হলে সঙ্গীন বিপদ ঘটে যেতে পারে। কাজেই সে বিপদের কবল থেকে শিশু ও মাতার প্রাণরক্ষার যদি কোন উপযুক্ত প্রতিবিধান আমাদের জানা না থাকে, তা হলে আমরা শুধু যে গভীর দুশ্চিন্তা ও অশান্তি ভোগ করি, তাই নয়, নিজেদের অজ্ঞতার ফলে, অনেক সময় অহেতুক প্রাণসংশয়কর শোচনীয় পরিণামের বিপদ ডেকে আনি। কিন্তু যত বড়ই বিপদ আসুক না কেন প্রসূতি-পরিচর্য্যা এবং শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান ও সময়মতো সাবধানতা অবলম্বন এবং যথোচিত চিকিৎসার সুব্যবস্থার ফলে, অনায়াসেই আমরা সে বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাই সে প্রসঙ্গেরই মোটামুটি আলোচনা করছি।

শিশুর জন্ম

প্রসূতি-পরিচর্য্যা এবং শিশু-মঙ্গল সম্পর্কে কি কি বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন গোড়াতেই তার হদিশ রাখা দরকার। প্রসূতির পরিচর্য্যা বলতে সচরাচর আমরা বুঝি যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে ভবিষ্যৎ জননীর দৈহিক ও মানসিক এমন বিশেষ কয়েকটি অবস্থান্তর ঘটতে পারে, যে জন্য ধাত্রীবিদ্যা সম্মত এবং চিকিৎসাশাস্ত্র অনুমোদিত সাবধানতা ও সুব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। যথা, (১) বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার আগে (প্রাক্ প্রসবকালে) কি কি বিপদ ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা বা জ্ঞান (২) কি উপায়ে সুষ্ঠু-ভাবে বিপদ এড়ানো যেতে পারে, (৩) কোন্ সময়ে সেই বিপদ এড়ানর জন্য উপায় বা চিকিৎসা করা প্রয়োজন—সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান। কারণ, এগুলির সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকলে ও সময়ে সাবধান হলে মাতা ও সন্তান উভয়েরই জীবন রক্ষা করা সম্ভব। কথাটা শুনলে হয়তো অনেকেই আশ্চর্য হবেন যে মাত্র ২০।৩০ বৎসর যাবৎ আমরা এই 'প্রসূতি পরিচর্য্যা' সম্বন্ধে কিছু কিছু আগ্রহশীল হয়েছি এবং আমাদের এই আগ্রহ-শীলতার ফলেই আজ সারা দুনিয়াতে নবজাত শিশুর ও প্রসূতির মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে গেছে।.. প্রগতি-শীল সকল দেশেই স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্ম্মীরা আজ এ বিষয়ে সজাগ-দৃষ্টি দান করেছেন এবং নিত্য-নতুন উন্নত ব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তনেরও পর্য্যাপ্ত আয়োজন সুরু হয়েছে। তবে পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় এ সম্বন্ধে আমাদের দেশ অবশ্য এখনও অনেকখানি পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে।

আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরপ্রতিষ্ঠান সমূহের ও স্বাস্থ্যদপ্তরের এ বিষয়ে আরো অনেক বেশী সজাগ হতে হবে, কারণ সুস্থ ও সবল শিশুরাই গড়ে তুলবে ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজ। Economic Society বা অর্থনৈতিক সুস্থ সমাজ গঠন ব্যবস্থায়—জন্ম নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুপালনের যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে—সে কথা আজ সকলকেই জান্‌তে ও বুঝতে হবে।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশু-মঙ্গল ব্যবস্থার সুপ্রসারতাকল্পে বিলাতে সুশিক্ষিত চিকিৎসক ও ধাত্রীর দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য Antinatal clinics বা শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান বা সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে আশপাশের অঞ্চল থেকে যে কোন 'মাতা' বা প্রসূতি নিয়মিত যাতায়াত ও যে কোনও বিষয়ে উপদেশ এবং সাহায্য লাভ করতে পারেন। তাছাড়া পাশ্চাত্য দেশে যে কোনও সাধারণ হাসপাতালে অথবা প্রসূতিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ধরণের সেবাসদনেও এই শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সুবন্দোবস্ত আছে। উপরন্তু সেখানকার প্রায় প্রত্যেকটি পৌরপ্রতিষ্ঠানেই এ ব্যবস্থা সুপ্রচলিত রয়েছে। যে সব দুঃস্থ-দরিদ্র সন্তান-সম্ভবা মহিলাদের পক্ষে বিশিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাঁরা অনায়াসেই তাঁদের এলাকাস্থিত পৌরপ্রতিষ্ঠানের ধাত্রী বা শিশুমঙ্গল সমিতির পরিচারিকার (Health visitor) উপদেশ নিতে ও প্রয়োজন হলে তাঁর সাহায্যে নিকটতম শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানেও সুচিকিৎসার্থে যেতে পারেন। এত সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও (আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দিলেও) সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য দেশে এখনও এমন বহু মাতা-পিতা আছেন যাঁরা শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও সেগুলির উপকারিতার সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিব্‌হাল নন। এই কারণেই প্রখ্যাত চিকিৎসকবৃন্দ ডাঃ সেলডন্, ডাঃ হল্যাণ্ড ও ডাঃ জইস্‌বেরী দুঃখ প্রকাশ করেছেন—বিলাতী-সমাজের নরনারীর এমন উদাসীনতার কারণ শুধু যে অজ্ঞতা ও কুড়েমী—তা নয়—এটা হলো তাঁদের একটা মজ্জাগত সামাজিক ব্যাধি। সমাজের প্রত্যেক লোকের মধ্যে, ভবিষ্যৎ মাতা ও সন্তানদের মুখ চেয়ে—এই শিশুমঙ্গল ও প্রসূতিপরিচর্য্যার শিক্ষার ব্যাপক মন্দিরে ও মসজিদেও যেন এ সম্বন্ধে রীতিমত অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়।

ধাত্রী—সময়ে ঠিক করুন। সকলেই তো আর ধাত্রী-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞের বা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে পারেন না এবং বহু ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও অনেকেরই হয় না। তাছাড়া ধাত্রী বা চিকিৎসক নিয়োগ বহুক্ষেত্রেই আর্থিক সঙ্গতি ও প্রসূতি বা শিশুর স্বাস্থ্যের উপরও নির্ভর করে অনেকখানি। তবে একথা মনে রাখা দরকার সন্তান সম্ভাবনার সুরু থেকেই প্রসূতির পক্ষে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক অথবা শিক্ষিতধাত্রীর সহিত যোগাযোগ রাখা অথবা যে কোন প্রসূতি সেবাসদনে নিয়মিত যাতায়াত ও পরীক্ষাধীন থাকা উচিত। কারণ বিশেষজ্ঞের উপদেশ, পরামর্শ বা সক্রিয়-সহায়তা দরকার হলেই যেন সময়মতো সে ব্যবস্থার যথোচিত সুযোগ লাভ করতে পারেন অনায়াসেই। বিলাতে ব্যবস্থা আছে যে কোনও প্রসূতির পক্ষে ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হলে অচিরেই সে সুবিধা-সুযোগ পেতে পারেন। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত সাধারণ চিকিৎসকদের মধ্যেও বহু পারদর্শী ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বান্ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা প্রসূতির মঙ্গলার্থে যে কোনও অবস্থার উপযোগী সহায়তাদান সর্ব্বতোভাবে করতে পারেন। আমেরিকা ও বিলাতের মত সু-উন্নত অতি-আধুনিক দেশে অধিকাংশ প্রসূতিই আজকাল শিক্ষিত-ধাত্রী ও চিকিৎসকদের সাহায্য নিতে সুরু করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে চিকিৎসকদের সম্বন্ধে ব্যবহারিক-জীবনে বিশেষ একটি কর্ত্তব্য থাকা উচিত। সে কথা আজকাল আমরা ভুলতে বসেছি। একজন চিকিৎসক তাঁর কতখানি মূল্যবান সময়, বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম প্রসূতি এবং শিশুর হিতার্থে অতিবাহিত ক'রেন সে বিষয়ে আমাদের একান্তভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। ইংলণ্ডের খতিয়ানে দেখা যায় যে ১৯৩৩ সালে সেখানে মোট ষোল হাজার ধাত্রী ছিলেন এবং শতকরা প্রায় ৫০ জন প্রসূতিই যাঁদের সহায়তায় সন্তান প্রসবের সুষ্ঠু সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছেন। ইদানীংকালে এই সব ধাত্রীদের

বেশী উন্নত হয়েছে। বিলাতে ধাত্রীবিদ্যা অবশ্য একবৎসর শিক্ষণীয় এবং পরীক্ষায় সাফল্যলাভের পর ব্যক্তিগত দক্ষতা-অনুসারে তাঁদের সকলকে তকমা বা Certificate দেওয়া হয়। চিকিৎসকের সাহায্য কখন নিতে হবে, সে বিষয়ে তাঁদের যথোচিত নির্দ্দেশ দেওয়ার সুব্যবস্থা আছে। এই সব সুনিপুণ-ধাত্রীরা সাধারণতঃ খুবই পরিশ্রমী ও স্বল্প বেতনভুক্ত হয়ে থাকেন। এঁদের সঙ্গে প্রসূতির সম্পর্ক খুবই অন্তরঙ্গ ও সুমধুর। সম্প্রতি আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষাদানের সুবন্দোবস্ত হয়েছে। তবে এখনও পল্লীগ্রামে, বিশেষতঃ পশ্চাৎপদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রদেশে, অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর বিশেষ একধরণের পেশাদার মহিলারাই প্রসূতির পরিচর্য্যা করে থাকে, এদের কোনও উপযুক্ত শিক্ষাও নেই এবং পরম দ্বিধাহীনভাবেই এখনও সেই আদিকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে এরা অসঙ্কোচে এদের অপটু ধাত্রীবিদ্যার কাজ চালিয়ে যায়। তারফলে প্রসূতি ও শিশুর যথোচিত সেবা-যত্নের অভাবে নানা বিপদের উৎপত্তি হয়। এর পরিণামে শুধু যে অকারণে শিশু মৃত্যুর হার বাড়ে তাই নয়, প্রসূতিরাও বহুবিধ প্রাণ সংশয়কর বিপদে পড়ে। এই কারণেই, আমাদের দেশের মহিলাদের উচিত—গর্ভাবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব সুশিক্ষিত ধাত্রী অথবা সুদক্ষ চিকিৎসকের উপদেশ ও সহায়তা গ্রহণ করা। তার ফলে, বিপদের সম্ভাবনা থাকলে যথা সময়ে সাবধানতা অবলম্বন ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থাগুণে প্রসূতি ও শিশুকে রক্ষা করা ও অকালমৃত্যু, বিকলাঙ্গ ও স্বাস্থ্য হানির কবল থেকে বাঁচান যায়। যথাসময়ে সাবধানতা অবলম্বন না করে, পরে সঙ্কট মুহূর্ত্তে ধাত্রী বা চিকিৎসকের পরামর্শ বা সাহায্য নিয়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে আমরা অকারণে শুধু শুধু নিজেদের মন্দ-ভাগ্যের ও ধাত্রী বা চিকিৎসকের দোষ দিই···কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতা বা অবহেলার কথা আদৌ চিন্তা করি না। এটিই হলো সব চেয়ে পরিতাপের বিষয়। তবে অযথা পরিতাপ করে কোন ফল লাভ হবে না···বরং যথার্থ শিক্ষার্জ্জন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সন্তান সম্ভাবনা মেয়েদের জীবনে অসুস্থতার লক্ষণ বিশেষ কোন রোগ নয়, সেই হেতু ঘটা পটা করে দাই বা ডাক্তারের বাড়ী দৌড়াদৌড়ির কোন দরকার নেই। অবশ্য একথাও সত্য যে শতকরা ৯৫% জন প্রসূতিই খুব সহজে সন্তান প্রসব করেন এবং গর্ভাবস্থায় তাঁদের স্বাস্থ্যেরও কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কিন্তু তাহলেও, বাকী ৫% ভাগের জন্যই এই বিশেষ সেবা-যত্ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। প্রসূতি অবস্থায় দেহের যাবতীয় অংশগুলির বিশেষ একটি তারতম্য ও পরিবর্ত্তন ঘটে··তার ফলে রসস্রাবী গ্রন্থিসমূহের উপর চাপ পড়ে এবং সেগুলিরও কাজ বাড়ে। তাই সেই সময়ে প্রসূতির দেহপরীক্ষার ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়ে। কাজেই সেগুলির সম্বন্ধে যথা-সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বনের ফলে, প্রসূতিকে সুষ্ঠুভাবে বিপদ মুক্ত করা যায়। হৃদযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্‌, মূত্রাশয়, ও অন্ত্রতন্ত্রের যেমন পরীক্ষার প্রয়োজন হয়—ঠিক তেমনিভাবেই প্রসব কালীন সাবধানতার অঙ্গ-হিসাবে প্রসূতির কোমরের অস্থির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনারও একান্ত প্রয়োজন আছে। সুদক্ষ ধাত্রী অথবা বিচক্ষণ চিকিৎসক ছাড়া এগুলির যথার্থ বিচার-বিবেচনার উপায় নেই। কাজেই অশিক্ষিত দাই বা 'হাতুড়ে বদ্দির' সাহায্য না নিয়ে, এ বিষয়ে নিজেদের জ্ঞানসঞ্চয় করা একান্ত প্রয়োজন। (ক্রমশঃ

——

হাতের কাজ

ষ্টেন্‌সিলের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি,··সেইমতো

বিশেষ পদ্ধতিতে কি উপায়ে বিভিন্ন 'নক্সার ছাপ' (pattern-Design) আঁকা বা 'ট্রেসিং' (Tracing) করা যায়, তারই মোটামুটি হদিশ জানাচ্ছি।

ধরুন, উপরের ৩নং ছবিতে যে বিচিত্র ফুল-পাতার নক্সাটি দেখছেন, সেই নমুনামতো ছাঁদে কাঠের, কাগজের কিম্বা কাপড়ের কোনো সামগ্রীতে 'ষ্টেন্‌সিল্'-কারু-শিল্পের ছাঁচ তুলতে হবে। এ কাজ করবার সময়, প্রথমেই 'ষ্টেন্‌সিল্-পেপারের' উপরে আগাগোড়া নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে ফুল-পাতার নক্সাটি এঁকে বা 'ট্রেসিং' করে নিন—উপরের ১নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে। ষ্টেনসিল-কাগজের উপর নক্সাটি সুষ্ঠু-ভাবে এঁকে নেবার পর, ধারালো নরুণ বা ক্ষুরের ব্লেড (Safety Razor Blade) কিম্বা ছুরির সাহায্যে সেটিকে নিখুঁত-পরিপাটি ও যথাযথ ধরণে প্রত্যেকটি রেখার দাগ-বরাবর ছাঁদে কেটে নিতে হবে। উপরের ২নং ছবিটি দেখলেই, এ কাজ কি উপায়ে সুসম্পন্ন করতে হবে তার সুস্পষ্ট হদিশ মিলবে। অর্থাৎ, উপরের ২নং ছবিতে দেখানো ফুল-পাতার নক্সার কালো-রঙে চিহ্নিত অংশগুলিই শুধু, নরুণ, ছুরি বা ক্ষুরের ব্লেড দিয়ে নিখুঁত-পরিপাটি ধরণে কেটে ফেলতে হবে—শাদা রঙের কোনো অংশেই যেন বেহিসাব বা অসাবধানতার ফলে, এতটুকু ছাঁট-কাটের ছোঁয়াচ না লাগে—সেদিকে সচেতন-দৃষ্টি রাখবেন। দৈবাৎ ভুলক্রমে, এ কাজে যদি সামান্য কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে 'ষ্টেন্‌সিলের' নক্সা শুধু যে শ্রী-হীন হয়ে উঠবে তাই নয়, কারুশিল্প-রচনার পক্ষেও নানা অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করবে। 'ষ্টেন্‌সিল্-পেপার' কাটবার নিয়ম হলো—নক্সার কাগজটিকে একখানি সমতল কাঠের বা কাঁচের পাটার উপর রেখে, বাঁ-হাতের তালুর চাপ দিয়ে সেটিকে বেশ ভাল করে চেপে ধরে আগাগোড়া খুব সন্তর্পণে ও নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে নক্সার যে সব অংশগুলি কালো-রঙে চিহ্নিত, সে-গুলিকে ধারালো ছুরি, নরুণ অথবা ক্ষুরের ব্লেডের সাহায্যে আগাগোড়া সুচারুভাবে ও যথাযথ-আকারে কেটে নিতে হবে। এভাবে 'ষ্টেন্‌সিল্-পেপার' কাটবার সময়, নক্সার কিনারাগুলি যেন পরিষ্কার ও সমান-ছাঁদে কাটা হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ, নক্সার কিনারা অপরিচ্ছন্ন ও অসমানভাবে ছাঁটাই করা হলে, কারুশিল্পের প্রতিলিপি অস্পষ্ট এবং অসুন্দর দেখাবে। কাজেই বিশেষ মনোযোগ-সহকারে এ কাজটুকু আগাগোড়া পরিপাটিভাবে নিষ্পন্ন করা চাই।

'ষ্টেন্‌সিল্-পেপারে' নক্সার ছাঁদ ছাঁটাই করে নেবার পর, কাপড়, কাগজ বা প্রয়োজনানুযায়ী সামগ্রীর উপর বিশেষ কোনো একটি বা একাধিক রঙ ব্যবহার করে 'নক্সা-চিত্রণের' (Stencil-Colouring) পালা। সে কাজ কি পদ্ধতিতে করতে হয় এবং 'ষ্টেন্‌সিল্'-কারু-শিল্পের ছাপ তোলার জন্য কোন ধরণের রঙ-তুলি প্রভৃতি সরঞ্জাম প্রয়োজন—আগামী সংখ্যায় তার বিশদ-পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ

—

সুধীরা হালদার

এবারে বাঙলা দেশের যে অভিনব মুখরোচক মাছ দিয়ে তৈরী আমিষ-খাবার রান্নার কথা বলছি, সেটির নাম— 'রুই মাছের সুক্তো।' প্রিয়জনদের পাতে সাদরে পরিবেষণের পক্ষে এ রান্নাটি খুবই বৈচিত্র্যময় হবে বলেই মনে হয়।

বিচিত্র-সুস্বাদু এই আমিষ খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খাবার রান্নার জন্য চাই— রুই মাছ, আলু, কাঁচকলা, বেগুন, পটল, ঝিঙে, সজনে ডাঁটা, আদা-বাটা, হলুদ-বাটা, নুন, সরষের তেল, সরষের গুঁড়ো, মেথি আর খানিকটা পিটুলী।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে মাছটিকে প্রয়োজনানুযায়ী মাপে টুকরো করে কুটে পরিপাটিভাবে ধুয়ে কিছুক্ষণ নুন ও হলুদ মাখিয়ে পরিষ্কার একটি পাত্রে রেখে দিন। তারপর আলু, পটল, বেগুন, ঝিঙে, সজনে ডাঁটা প্রভৃতি আনাজ গুলিকে ডুমোডুমো অথবা লম্বা ফালি করে কুটে রাখুন এবং কাঁচকলার টুকরোগুলিতে হলুদ মাখিয়ে উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে সরষের তেলে ভেজে নিন।

এ কাজ সারা হলে পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে ইতিপূর্বে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখা মাছের টুকরোগুলিকে সরষের তেলে ভেজে রাখুন। মাছের টুকরোগুলি আগাগোড়া ভাজা ও বাদামী রঙের হলে, সেগুলিকে সযত্নে পরিষ্কার একটি পাত্রে নামিয়ে রেখে, পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র বসিয়ে গরম সরষের তেল মেথি, লঙ্কা, সরষের গুঁড়ো ফোড়ন দিয়ে ইতিপূর্ব্বে কুটে-রাখা আলু, পটল, বেগুণ, ঝিঙে, সজনে ডাঁটা প্রভৃতি আনাজের টুকরোগুলিকে ছেড়ে কিছুক্ষণ খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করে সেগুলিকে ভালোভাবে ভেজে নিন। এমনিভাবে ফুটন্ত সরষের তেলে ফোড়ন-সহকারে আনাজের টুকরোগুলিকে আগাগোড়া ভেজে নেবার পর, উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে নুন ও হলুদ মিশিয়ে খানিকটা জল ঢেলে দিন। কিছুক্ষণ বাদে উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রের এই 'মিশ্রণটি' বেশ ফুটন্ত হয়ে উঠলেই, রান্নার 'মিশ্রণটিতে' ইতিপূর্ব্বে ভেজে-রাখা মাছের ও কাঁচাকলার টুকরোগুলি ছেড়ে দিন। খানিকক্ষণ ফোটানোর ফলে, মাছের ও আনাজের টুকরোগুলি আগাগোড়া সু-সিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে রন্ধন-পাত্রের 'মিশ্রণে' অল্প একটু পিটুলী মিশিয়ে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ উনানের আঁচে বসিয়ে রেখে ফুটিয়ে নিন এবং রান্নার মিশ্রণ' বা ঝোল বেশ ঘন ও কাই কাই ধরণের হলেই উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটি নামিয়ে ফেলে খাবারটিতে আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু আদা-বাটা মিশিয়ে দিয়ে সযত্নে অন্য আরেকটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। তাহলেই 'রুই মাছের সুক্তো' রান্নার পালা শেষ হবে।

অতঃপর এ খাবারটি সাদরে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশন করুন—আপনার হাতে তৈরী বিচিত্র মুখরোচক এই অভিনব রান্নার সুস্বাদে তাঁরা যে প্রচুর পরিতৃপ্তি লাভ করবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি রসনাতৃপ্তিকর খাবার রান্নার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

প্লুটো

উপাধ্যায়

ইতিপূর্ব্বে গ্রহজগতে হার্সেল ও নেপচুন নিয়ে কিছু আলোচনা করা গেছে। এবার নবতম আবিষ্কৃত গ্রহ প্লুটো (রুদ্র) সম্বন্ধে কিছু বলবো। ১২ই মার্চ্চ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবী থেকে ৩,৬০০,৭১০,০০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এতদূরে থেকেও সে পৃথিবীর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে, মানবজীবনের ওপরও তার আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণ শেষ করতে এর ২৪৮ বর্ষ সময় লাগে। প্রত্যেক বছরে দেড় ডিগ্রীরও কম নড়ে। রোমান গ্রীক দেবতা প্লুটোর নামে এই গ্রহ অভিহিত হয়। প্লুটোর ক্ষেত্র' বৃশ্চিক। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণাত্মক গ্রহটি স্ত্রী সংজ্ঞক হোলেওএর পুংসংজ্ঞক নামকরণ হয়েছে। প্লুটো মৃত্যুর অধিকর্ত্তা। অনেকে বলেন নেপচুনই মৃত্যুর অধিপতি কিন্তু তা নয়, নেপচুন দুঃখের কর্ত্তা। মীনরাশি নেপচুনের ক্ষেত্র। মীন দুঃখদায়ক রাশি। শতকরা আশীজন লোকের মাতৃবিয়োগের কারকই প্লুটো। নেপচুনও প্লুটো যে সব রোগ সৃষ্টি করে, সেগুলি মানসিক ব্যাপার ঘটিত। হর্ম্মোন পুষ্টির সহায়ক প্লুটো। বিস্ফোটক, দুর্ঘটনা, মূত্রাশয়, রক্তদুষ্টি, করোনারি থ্রম্বসিস, ডিপথিরিয়া, যৌন ব্যাধি, মূর্চ্ছা, স্ত্রী ঘটিত ব্যাধি, ম্যালেরিয়া, হাম, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মেদবৃদ্ধি, নিউমোনিয়া, টিউবার কিউলোসিস, টাইফয়েড, হুপিং কাশি, মানসিক ব্যাধি প্রভৃতির কারক প্লুটো। প্লুটোর প্রভাবে যে সব রোগ হয় তাদের পথ্যে প্রোটিন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, এ, সি, ডি ও বি কম্ প্লেক্সের প্রয়োজন। প্লুটোর প্রভাবে রাজনীতিজ্ঞ, পুলিশের লোক, জ্যোতিষী, কৃষক, উপসেবিকা (বা নার্স) প্রসাধনদ্রব্যাদিপ্রস্তুতকারক, ভৃত্য, টেলিফোন অপারেটার, গুদামের কেরাণী, ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রী, রেডিও টেক্নিসিয়ান, নৃত্যশিল্পী, রসায়নবিদ্ প্রভৃতির বৃত্তি অবলম্বন হয়। যৌন ঘটিত ব্যাপার গুলির উপর প্লুটোর প্রভাব বেশী। সমলৈঙ্গিক যৌনতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, প্লুটোর দ্বারা সংঘটিত হয়। প্লুটোর সঙ্গে চন্দ্র পুরুষের রাশিচক্রে থাকলে তার স্ত্রীর পর পুরুষাসক্তি প্রবল হয়। প্লুটো মাতৃকারক গ্রহ। দশমস্থানে থাকলে জাতকের উপর মায়ের প্রভাব খুব বেশী থাকে। এই গ্রহটি অনুকূল হোলে জাতক প্রচুর অর্থশালী হয়। কোন গ্রহ প্লুটোর সঙ্গে সহাবস্থান করলে সে এই গ্রহের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। ষষ্ঠ স্থানে প্লুটো থাকলে জাতকের স্বাস্থ্য লাভ হয়। যার কোষ্ঠিতে প্লুটো প্রতিকূল তার জীবন দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হবেই, কোন গ্রহই তার মত চরম দুঃখ-দুর্দ্দশা দেয় না। প্লুটোর সঙ্গে রবির সহা স্থান বা দৃষ্টি সম্বন্ধ হোলে জাতকের দুর্দ্দম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাহস, দৃঢ় সংকল্প, সৃষ্টি কুশলতা ও সুন্দর আত্মসংযম প্রত্যক্ষ করা যায়। চন্দ্রের সঙ্গে এরূপ সম্বন্ধ ঘটলে, বড় বড় পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার আগ্রহ দেশ-প্রেম, কল্পনা, গভীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আত্মোপলব্ধির সক্ষমতা প্রকাশ পায়। মঙ্গলের সঙ্গে প্লুটোর অনুরূপ

সম্বন্ধ হোলে অসাধারণ শারীরিক শক্তি, অদম্য ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় সংকল্প, আত্মবিশ্বাস ও সমর প্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। বুধের সহিত প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে বুদ্ধি তৎপরতা, হাতের কাজে দক্ষতা, নানা বিষয়ে জ্ঞান, আকর্ষণী শক্তি আর প্ররোচক মোহিনী শক্তি প্রত্যক্ষ হয়। বৃহস্পতির সহিত প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়, আয়ু দীর্ঘ হয়, দীর্ঘকাল ব্যাপী যৌবন অটুট থাকে, উচ্চ সম্মান ও পদ মর্য্যাদা, ধর্ম্ম ও দর্শনের দিকে ঝোঁক প্রভৃতি ফল লাভ হয়। শুক্রের সঙ্গে প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, শিল্পী সুলভ আত্মপ্রকাশ হয়। প্রবল আবেগ, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য সূচিত হয়। শনির সঙ্গে প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে নাছোড়বান্দাভাব, জেদ, অধ্যবসায়, অসাধারণ আত্মসংযম ও স্বার্থত্যাগ দেখা যায়। হার্সেলের সঙ্গে প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে প্রচণ্ড প্রভুত্ব পরায়ণ চরিত্র ফুটে ওঠে, আর সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও ইচ্ছাশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাচুর্য্য, অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ, স্বাধীনতা ও মুক্তির আগ্রহ প্রভৃতি পরিস্ফুট হয়। নেপচুনের সঙ্গে প্লুটোর সম্বন্ধ হোলে সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিকতা লাভ, পার্থিব বস্তু সম্পর্কে অসন্তোষ, তুরীয় স্তরে যাবার দিকে আগ্রহ প্রকাশ পায়।

প্লুটো লগ্নে থাকলে অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি ও সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। ডাঃ এ্যানি বেশান্তের এই যোগ ছিল। মন বিস্তৃত হয়, মৌলিক চিন্তাধারা ও সৃষ্টি কুশলতা প্রকাশ পায়, সৃজনী প্রতিভা ও অভিব্যক্ত হয়। প্রতিভার স্ফূরণ হেতু লোক সমাজে সমাদর লাভ ঘটে। জাতকের মনে বিগতদিনের প্রতি আগ্রহ আর অনাগত দিনের বস্তু, প্রাপ্তির জন্য লালসার মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় স্থানে প্লুটো থাকলে বিভিন্ন দিক থেকে অর্থাগম হয়, অস্বাভাবিক উপায়ে বিশেষ বিত্তশালী হয়ে ওঠে। তৈল, খনিজ পদার্থ, আবিষ্কার ও পুরস্কারের মাধ্যমেও অর্থাগম হোতে পারে। প্লুটো তৃতীয় স্থানে থাকলে অসাধারণ মেধাশক্তি প্রকাশ পায়। কল্পনাও প্রখর হয়, বাগ্মিতায় পারদর্শিতা লাভ হয়, রহস্যজনক গল্প রচনায় খ্যাতি অর্জ্জন হয়। স্বপ্ন সাধ ও আকাঙ্খা বহুধা বিস্তৃত হয়, কখন কখন সেগুলি আঁকাল হয়ে ওঠে। চতুর্থ স্থানে প্লুটো থাকলে মানুষের মধ্যে আসে বিশ্বপ্রেম, যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তার মতের বা ভাব অনুভাবের স্থিরতা থাকে না। এ্যাডভেঞ্চারের দিকে জাতকের সহজাত স্পৃহা। আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক, সে ভাবে জগতে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে।

পঞ্চম স্থানে প্লুটো থাকলে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এরূপ আকাঙ্খার আতিশয্য দমন করা দরকার। জাতক অত্যন্ত সামাজিক, দল কেন্দ্রিক ও ব্যঙ্গপ্রিয়, নূতনের সংস্পর্শে এসে উত্তেজনার অন্বেষক হয়। নাট্য রচনা, সিনেমা বা থিয়েটারে অভিনয়াদি প্রভৃতির দ্বারা লাভবান হোতে পারে। প্লুটো বিরুদ্ধ হোলে প্রেম, সন্তান, আনন্দও স্পেকুলেশন ব্যাপারে বাধ্যতা মূলক অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। চিকিৎসক, নার্স ও সমাজকর্ম্মীর পক্ষে ষষ্ঠস্থ প্লুটো অত্যন্ত শুভদায়ক। জাতকের মধ্যে মানুষের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি দূর করবার ক্ষমতা থাকে। মানুষের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি, করুণা, বন্ধুত্ববোধ, পরার্থপরায়ণ প্রকাশ পায়। সাধু সন্ন্যাসী, মানবতার উপাসক, জনকল্যাণের জন্য আন্দোলনকারী ত্যাগী পুরুষদের পক্ষে ষষ্ঠস্থ প্লুটো অত্যন্ত উপযোগী। সপ্তম স্থানে প্লুটো থাকলে স্বামী বা স্ত্রীর অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয়, আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক থাকে, স্বাধীনতা সুদৃঢ় হয়, যশ, প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব বা উচ্চস্তরে অবস্থিত সম্ভব হয়, সৃষ্টিশক্তি থাকে প্রবল, আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি সম্পন্ন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। অষ্টম স্থানে প্লুটো থাকলে অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্য সন্ধানের দিকে আগ্রহ থাকে। নানারকম স্বপ্নদর্শন হয় এবং যে সব স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যায়। জাতক ভবিষ্যদ্রষ্টা হয়। কিন্তু আশঙ্কা থাকে জাতক জীবনে কোন না কোন সময়ে অগোচরে প্রস্থান করতে পারে আর তার সম্বন্ধে কোন দিন কোন কিছু জানা সম্ভব হয় না।

নবম বা ভাগ্যস্থানে প্লুটোর অবস্থিতে অত্যন্ত শুভদায়ক। জাতকের উন্নত মনের পরিচয় পাওয়া যায়, অসাধারণ প্রতিভা, ভ্রমণপ্রিয়তা, ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, আদর্শ ও অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝোঁক, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শিতা প্রভৃতি ফলগুলি দেখা যায়। দশমস্থানে প্লুটো থাকলে রাষ্ট্রশাসকগণ, বড় বড় নেতা ও রাষ্ট্রের

খাদ্যমূল্য সমস্যা—

বর্তমান সময়ে অন্য সকল সমস্যা অপেক্ষা খাদ্যমূল্য সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নহে, ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। বহুদিন হইতে এই সমস্যা আছে বটে, কিন্তু এখন তাহা যেরূপ কঠোর আকার ধারণ করিয়াছে, তেমন বোধ হয় ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। শতকরা ২।৪ জনের কথা বাদ দিলে বাকী সকলেই সর্বদা এই সমস্যায় কষ্ট পাইতেছে। চালের দামের সহিত এদেশের অন্যান্য সকল জিনিষের দাম বাঁধা হয়—চাল বাজারে পাওয়া যায় না পাওয়া গেলেও ৪০ টাকা মণ—যাহার প্রয়োজন ২০ কিলো অর্থাভাবে সে ১৫ কিলো মাত্র কিনিয়া বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হয় এবং ফলে অধিকাংশ লোক অর্ধাশনে দিনযাপন করে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৭ বৎসর চলিয়া গেল, শাসক-গোষ্ঠী চাল সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না। উৎপাদন থাকিলেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে তাহা পর্যাপ্ত নহে—তাহার পর বাজারে মুনাফাখোরদের জন্য দাম বাঁধার উপায় নাই। সরকার কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না—শাসক-গোষ্ঠীর আর্থিক প্রাচুর্য থাকায় তাহারা দরিদ্র মধ্যবিত্তদের মত কষ্ট অনুভব করেন না—২।৩ জন করিলেও সে কথা জোর করিয়া বলেন না—ফলে বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় না—সাধারণ মানুষ অতিরিক্ত মূল্য না দিয়া চাল পায় না। গত ২ বৎসর আলুর ফলন ভাল হইয়াছিল—এ বৎসর ফলন ভাল হইলেও হিমঘরের দোষে সব আলু নষ্ট হইয়া গিয়াছে কাজে এখনই (জ্যৈষ্ঠের প্রথমে) আলু ৮০ নয়া পয়সা কিলো দামে বিক্রীত হইয়াছে। চালের দাম বেশী বলিয়া ডালের দামও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া গিয়াছে - বাঙ্গালী আটা খাইতে অভ্যস্ত নহে—আটাও ভাল পাওয়া যায় না—এই গরমে আটা খাইলে অধিকাংশ লোক পেটের অসুখে ভোগে—ডালের দাম বেশী বলিয়া লোক বেশী ডাল খাইতে পারে না। আলুর দাম বেশী হওয়ায় পটোল, বেগুন, ঝিঙ্গা, শাক প্রভৃতিরও দাম খুব বেশী—বাঙ্গালী বেশী তরিতরকারী খায়—তাহাও দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। কি খাইয়া মানুষ বাঁচিবে ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অতি পল্লী গ্রামেও তরিতরকারী সস্তা নাই—রেল ও মোটর লরী যোগে সব তরকারী বড় বড় সহর ও শিল্পাঞ্চলে চলিয়া আসে। বহু নূতন ভাল পথ নির্মিত হওয়ায় যাতায়াতের যেমন সুবিধা হইয়াছে—তেমনই দূরে মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কয় দিন পূর্বে এক সুদূর পল্লী গ্রামে গিয়া দেখিলাম, কাঁচা আম সেখানেও টাকায় মাত্র ৮টা। পাকিলে ত তাহার দাম টাকায় ৪।৫ টা হইবে। মাছের কথা না বলাই ভালো। ভাল মাছ ৬ টাকা কিলো, অতি সাধারণ পুঁটি মাছের কিলো ৩ টাকার কম নহে। বাংলা দেশের লোক মাছ খাইতে ভালবাসে, কিন্তু প্রায় প্রত্যহ সুলভ মাছের অভাবে শূন্য হাতে বাজার হইতে ফিরিয়া আসে। ফলে পরিবারে অশান্তি লাগিয়া যায়। দুধ ত ইহার পর হয় ত পাওয়া যাইবে না। সরকার যে দুধ বিক্রয় করেন, তাহা ত সুলভ নহে—অধিকন্তু সে দুধও খাঁটি নয়। শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। চাল, মাছ, দুধের ত এই অবস্থা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুও বাজার হইতে উধাও হইয়াছে। ঘৃত বলিয়া কোন জিনিষ বাজারে পাওয়া যায় না—দালদা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে—তাহার দামও অতিরিক্ত। সরিষার তেল বাঙ্গালীর নিত্য প্রয়োজনীয়—তাহার দামও হঠাৎ বাড়িয়া গিয়া ৩ টাকা কিলো হইল—ইহার কোন কারণ নাই—সরকার তেলের দাম নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা করেন না। লঙ্কা, হলুদ, ধনে, সরষে প্রভৃতির দামও দ্বিগুণ হইয়াছে। এই ত মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবন যাপনের অবস্থা।

পশ্চিম জার্মানী যাইবার :পথে দিল্লীতে
বস্থানক'লে নেপালের রাজা মহেন্দ্র ও রাণী
া রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সহিত রাষ্ট্রপতি
নে মিলিত হন।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-প্রদর্শনীতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতীয় মণ্ডপে প্রদর্শিত একখানি অতি উৎকৃষ্ট শাড়ী আগ্রহের সহিত দেখিতেছে ।

বিশেষ আমন্ত্রণে তিন মাসের জন্য ইউরোপ সফররত ভারতীয় সাংস্কৃতিক ছাত্র প্রতিনিধিদল দি হেগ্ নগরীতে উপস্থিত হইলে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রাজকুমার রঘুনাথ সিনহা কর্তৃক গত ৫ই মে তারিখে বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হন। ছবির মধ্যস্থলে রাষ্ট্রদূতকে, শ্রীমতী রানী সিনহা (ডানদিক হইতে দ্বিতীয়) এবং তিনজন প্রতিনিধির সহিত দেখা যাইতেছে।

ভারতে পরিকল্পিত ও নির্মিত দুইটি H F-24 বিমান বাঙ্গালোরে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতীয় বিমানবহরকে হস্তান্তরিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীওয়াই, বি, চ্যবন। চিত্রে শ্রীচ্যবনকে বিমানটির ককপিট্ পরীক্ষা করিতে এবং চিফ্ টেষ্ট পাইলট্ গ্রুপ্ ক্যাপ্টেন এস, দাসকে বিমানটির ককপিট ও অন্যান্য বিষয় ব্যাখ্যা করিতে দেখা যাইতেছে।
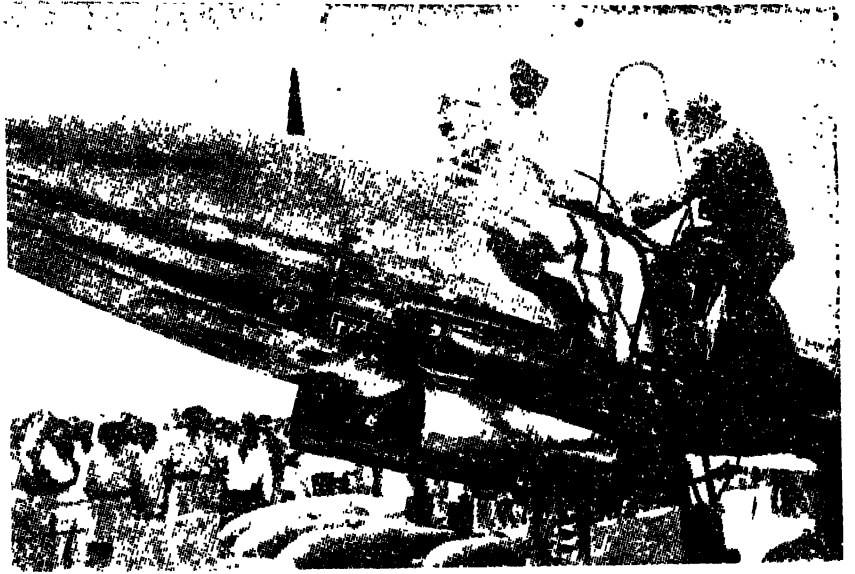
এ্যান্টিওচ ও সমগ্র প্রাচ্যের প্যাট্রিয়ার্ক মহামান্য মার ইগ্নাতিয়াস ইয়াকুবকে (বাঁদিক থেকে তৃতীয়) দিল্লীর রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে মাল্যদান করিতে দেখা যাইতেছে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীএ, এম, টমাসকে তাঁহার বামদিকে দেখা যাইতেছে।

কাজেই মানুষ সর্বদা অভাব-অভিযোগে বিব্রত। বাংলা দেশে ফলের বাগান সব শেষ করা হইয়াছে - তাহার স্থানে নূতন ফলের বাগান করা হয় নাই—কাজেই আম কাঁঠালের সময় মানুষ যে আম কাঁঠাল, লিচু, জাম – জামরুল খাইয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিবে, তাহার উপায় নাই। এই ভাবে মানুষের বাঁচার সমস্যা দিন দিন এমন হইয়া দাঁড়াইতেছে যে পুত্র কন্যাদি লইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাপড়ের দাম দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—আজকাল মানুষ খাদ্য অপেক্ষা পোষাকের প্রতি অধিক মনোযোগী, কাজেই আয়ের একটা অংশ কাপড় কিনিতেই ব্যয় হইয়া যায়। কোন দিক দিয়া সুরাহা নাই। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যয়ও এই অনুপাতে বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?"

উদ্বাস্তু সমস্যা—

গত জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগ হইতে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু অধিবাসীদের উপর সেখানকার মুসলমানগণ কর্তৃক যে অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কথা আমরা পূর্বেও কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। সে সকল অত্যাচারের কাহিনী শুনিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয় এবং অতি নিরীহ মানুষও ক্রোধান্ধ হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, জাতির অধিকাংশ লোক নির্জীব ও মৃতপ্রায়—কাজেই এই অত্যাচারের বিবরণ শুনিয়া ভারতের তরুণগণের যে কর্তব্য পালন করা উচিত ছিল, তাহারা তাহা করে নাই। গত ৪ মাসেরও অধিককাল প্রতিদিন গড়ে ২।৩ হাজার করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু উদ্বাস্তুরূপে ভারতে প্রবেশ করিতেছে—কেহ বা ভিসা লইয়া, কেহ বা বিনা ভিসায়। পশ্চিমবঙ্গসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় তাহাদিগকে ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পুনর্বাসন দানের চেষ্টা করিতেছে। উড়িষ্যা, মধ্যভারত ও মহারাষ্ট্রের একাংশ লইয়া যে দণ্ডকারণ্য অঞ্চল—সে স্থানে লোকের বাস ছিল না, তথায় বহু পতিত জমী, জলা ও জঙ্গল ছিল সেখানে পুনর্বাসনের জন্য কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুকে পাঠানো হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যার অন্যান্য অংশ, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্যভারতের বিভিন্ন অংশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে বহু সহস্র উদ্বাস্তুকে লইয়া গিয়া পুনর্বাসন দানের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এক সঙ্গে এত অধিক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সহজসাধ্য কাজ নহে। সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটিতে উদ্বাস্তুদের দুঃখ কষ্টের শেষ নাই। বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ঐ কার্যে সরকারকে সাহায্য করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল স্থান দিয়া উদ্বাস্তুরা আসে—বানপুর, হলদে, বেনাপোল, বনগাঁ, হাসনাবাদ, বসিরহাট, টাকী প্রভৃতি স্থানে রামকৃষ্ণমিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, প্রভৃতির সহিত বহু ত্যাগব্রতী তরুণের দল উদ্বাস্তুদের সেবা করিতেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ কার্য আদৌ পর্যাপ্ত নহে। বহুস্থানে সরকার ক্যাম্প স্থাপন করিয়া তথায় সদ্য আগত উদ্বাস্তুদের রাখার ব্যবস্থা করে—সে সকল ক্যাম্পের অবস্থাও হৃদয় বিদারক। মানুষকে গরু-ছাগলের মত করিয়া রাখা হয়। স্পেশাল ট্রেণে করিয়া তাহাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাঠাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু সেখানেও মানুষের বাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই—কাজেই বহু লোক সে সকল স্থান হইতে পলাইতে বাধ্য হয়। এই কয়মাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে লইয়া খেলা করা হইতেছে। সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু তাহার কোন ফল হয় না। অধিকাংশ অর্থ অপব্যয়িত হয়। পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, ত্রাণ মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি, কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রভৃতি সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহার কোন ভাল ফল দেখা যায় না—উদ্বাস্তু আগমন বন্ধের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও পর্য্যাপ্ত নহে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বতন্ত্র একটি পুনর্বাসন দপ্তর খুলিয়া খ্যাতিমান কংগ্রেস-নেতা শ্রীমহাবীর ত্যাগীকে সে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি সৎলোক ও কর্মদক্ষ—তিনিও এ বিষয়ে কর্তব্য পালনের চেষ্টার ত্রুটি করেন না। মানুষের এই অসীম দুঃখ-দুর্দশা আরও কতদিন চলিবে কে জানে? পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব লইয়া আছেন। কোন সুব্যবস্থায় তাঁহারা সম্মত হন না। এই অবস্থায় ভারত আর কতকাল পাকিস্তানী অত্যাচার সহ্য করিবে?

চীনের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কা—

সমগ্র জগতের পরিস্থিতি ক্রমে ঘোরালো হইতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রুশিয়া, চীন প্রভৃতি বড়

বড় দেশগুলির মধ্যে কোনরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সম্ভব হইতেছে না। চীন ২ বৎসর পূর্বে একবার অতর্কিত ভাবে ভারত আক্রমণ করিয়াছিল—আবার চীন ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়া ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সে জন্য ভারতকেও আত্মরক্ষায় বিশেষ অবহিত হইতে হইয়াছে। নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি রাজ্যের সহিতও ভারতকে নূতন করিয়া চুক্তি করিতে হইয়াছে। চীন ভারত আক্রমণ করিলে ঐ সকল রাজ্য প্রথমেই আক্রান্ত হইবে। চীনের সহিত যুদ্ধের সম্মুখীন হইবার জন্য সম্প্রতি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন আমেরিকা যাইয়া আমেরিকা হইতে সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। ভারতে এখন প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারী হইতেছে—নৌসেনা, স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে অধিক শক্তিশালী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের জনগণকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষাদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয় নাই। এন-সি-সি, এ সি-সি প্রভৃতির মত দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রই যাহাতে যুদ্ধের সম্মুখীন হইবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে, তাহার ব্যাপক ব্যবস্থার প্রয়োজন। লোকসংখ্যার অনুপাতে যুদ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম! অবশ্য যুদ্ধ সরঞ্জাম নির্মাণের কয়েকটি নূতন কারখানা খোলা হইয়াছে ও পুরাতন গুলিতে অধিক পরিমাণ কাজ হইতেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই কম। ভারত চীন কর্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রত্যেক ভারতবাসী যাহাতে চীনকে বাধা দানের যোগ্যতা ও শক্তিলাভ করে, সে জন্য ব্যাপক ব্যবস্থার কথা আজ সকলেই চিন্তা করিলেও সে চিন্তা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা দেখা যায় না।

শেখ আবদুল্লার মুক্তি—

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করার অপরাধে ১১ বৎসরকাল আটক রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি কাশ্মীরের মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত কেন্দ্রীয় দপ্তরহীন মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কয়েকবার কাশ্মীরে যাতায়াত করিয়া ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন। মুক্তি লাভ করিয়া কয়েকদিন শেখজী বহু এলোমেলো কথা বলিয়াছিলেন—তাহার পর দিল্লী শ্রীনেহরু প্রমুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদিগের সহিত কথা বলিয়া এবং শ্রীরাজা গোপালাচারী ও শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্রের একটি অংশ—কাজেই সে কথা স্বীকার করিয়া কাশ্মীর সমস্যার কথা বিচার করিতে হইবে। সকলেই জানেন কাশ্মীরের একটি বিরাট অংশ ভারতের মধ্যে থাকিয়া সে অঞ্চলের নানাবিধ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাকী সামান্য একটা অংশ নিজকে আজাদ কাশ্মীর বলিয়া ঘোষণা করিয়া—ভারত রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হয় নাই—তাহারা পাকিস্তানেরও আনুগত্য করে না। কাশ্মীর ও জম্মুর অংশ ভারতের মধ্যে, সেখানকার অধিবাসী—সংখ্যায় অধিক মুসলমান হইলেও—তাহারা ভারতরাষ্ট্রের অর্থ সাহায্য ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া সুখে বাস করিতেছে। আজাদ কাশ্মীর হইতে যে খবর পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, সেখানকার অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশার শেষ নাই—তাহারা এখনও বনে জঙ্গলে বাস করিতে বাধ্য হয় ও সভ্যজগত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। সম্প্রতি শেখ আবদুল্লা পাকিস্তানের সহিত ভারতের একটা আপোষ মীমাংসা করার জন্য পাকিস্তানের প্রধান শাসকের সহিত (আউব খাঁ) সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। ভারত ত বহুদিন হইতে বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াও পাকিস্তানের সহিত কোনরূপ আপোষ মীমাংসা করিতে সমর্থ হয় নাই—এখন দেখা যাক—শেখ আবদুল্লার চেষ্টায় যদি কোনরূপ আপোষ সম্ভব হয়!

বোঝাপড়া

স্বামী—টাকা…টাকা…টাকা!…টাকা ছাড়া মুখে আর কথা নেই তোমার! ফের যদি টাকা টাকা করো তো যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাবো!

স্ত্রী—বেশ তো, যাবার আগে সিন্দুকে আমার জন্যে মোটা টাকা রেখে দিয়ে যেও কিন্তু!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

পাষাণ কবর 'পরে
কোন্ দরদী আজো
রেখে যায় ফুলমালা
দিবসের অবসরে

নাই নাই সে তো জানে
তবু কোন্ অভিমানে
ব্যথা যত তার ফুল হ'য়ে ঝরে
ধরণীর বুক ভ'রে

এই জনমের শেষে
চির-ঘুম ঘোরে সে চির-মিলন
ধরা দেয় ভালোবেসে
তাই কিরে পূজারী
ফুরায় না আঁখিবারি
কাঙালের মত ফিরে ফিরে আসো
শেষের খেয়ার তরে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত।

II ·মা ·র্সা -র্সা | ণা -দণা · -দা I মা -া -মা | ·া -া ·-া I
পা ষা ণ ক ব র প -০ রে ০ -০ -০

দপা -ণদা -মা | জ্ঞমা -সজ্ঞা -ণ্সা I মা -া -মা | গমপমা -মা -া I
কো ন্ দ র দী -০ আ -০ জো ০ -০ -০
মা -ধা -ণা | র্সা -ণর্সা -র্সর্রর্সা I ণধা -র্সণা -দা | মপা -া -া I
রে থে যা য়্ ফু্ ল মা -০ -লা ০ -০ -০
সা -গা গা | গা -মা -ণদা I পদপা -মপমা -ঋমা | সা -সা -া II
দি ব সে র্ অ ব স -০ -০ রে -০ -০
I. র্সা র্সা ধা | মা -ধা ণা I ধণর্সর্রা -র্মজ্ঞা -র্রা | র্সা -া -া I
না ই না ই সে তো আ -০ নে ০ -০ -০
ধা র্সা -র্সা | র্সা -র্সা -র্সধা I ধর্সা -ধর্সর্রর্সা -ণা | -া -া -া I
ত বু্ কো ন্ অ ডি মা -০ নে ৯ -০ -০
মা -মর্স র্মর্রা | র্সর্রা র্সণা -ণা I ধণা -ধপা -মা | মপা -মা -গা I
ব্য থা য ত তা র্ ফু ল হ য়ে ঝ রে
সা -গা -গা | গা -মপা -ণদা I পমা -পা -মা | -া -া -া II
ধ র ণী ব্ বু্ ক্ ভ ০ রে -০ -০ -০
II মগা -মা -জ্ঞা | রজ্ঞা -সরা -ণ্সা I গা -মা -মা | পধা -মপা -পা I
এ ই জ ন মে র্ শে ষে -০ -০ -০ -০
মা -ধা -ধা | ধা -দা -ধা I মা -ধা -ণা | র্রজ্ঞর্রা -র্সা র্সা I
চি র ঘু্ মো ঘো রে সে চি র মি ল ন্
র্সনা র্সা পধা | ধা -পমা -সরা I -া গমা -মা | -া -া -া I
ধ রা দে য়্ ভা লো -০ বেসে -০ -০ -০ -০
র্সা -র্সা -ণা | ধমা -ধা -র্সা I ধর্সর্রজ্ঞা -র্সর্রর্মজ্ঞ -র্রা | র্সা -া -া I
তা ই কি রে পূ জা রী . -০ -০ -০ -০ -০.
পা -পর্সণর্রা -র্সজ্ঞা | র্রর্সা -র্সর্রর্সনা I না -র্সা -া | ধণা -পধা ধা I
ফু রা য়্ না আঁ খি বা রি -০ -০ -০ -০
মা -র্সা -র্সর্রা | র্সা -ণা -ণর্সধা I ধা ধা -মা | মপা -মা -গা I
কা ঙা লে র্ ম ত ফি রে ফি রে আ সো
সা -গা -গা | মা -মপা -ণদা I পমা -পা -মা | -া -া -া II II
শে ষে র্ খে য়া র্ ত -০ য়ে -০ -০ -০

প্রাচীন ভারতে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা ঃ বর্ণধ্বনির উৎপত্তি

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মুনি-ঋষি, প্রাতিশাখ্যকার ও বৈয়াকরণগণ বর্ণধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা দেখিয়া মনে হয় যে বর্তমানকালে ভাষাতাত্ত্বিকগণ যে পদ্ধতি অনুসারে ধ্বনি-বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ঠিক সেই-ভাবেই ইহার আলোচনা করিয়াছেন, অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে প্রাচীন ভারতের ধারাই এখন বর্তমান মনীষীদের ব্যাখ্যায় নূতনরূপ লাভ করিয়াছে। আমি এই প্রবন্ধে কেবল বর্ণধ্বনির উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিব।

বর্ণধ্বনির উৎপত্তির মূল উপাদান হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত বায়ু। বায়ুচাপের বিভিন্ন তারতম্য অনুসারে ধ্বনিরও প্রকারভেদ হয়। উচ্চ, নীচ ও মধ্যম চাপ অনুসারে ধ্বনিরও স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। সেই জন্যই ধ্বনির এত ভেদ ও প্রকার। সেই ধ্বনির কিরূপভাবে উৎপত্তি হয়, তাহা পাণিনীয় শিক্ষায় বেশ সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে।

আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্ ॥৬॥
মারুতস্তূরসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্।
প্রাতঃসবনযোগং তং ছন্দো গায়ত্রমাশ্রিতম্ ॥৭॥
কণ্ঠে মাধ্যন্দিনযুগং মধ্যমং ত্রৈষ্টুভানুগম্।
তারং তার্তীয়সবনং শীর্ষণ্যং জাগতানুগম্ ॥৮॥
সোদীর্ণো মূর্ধ্ন্যাভিহতো বক্ত্রমাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণাঞ্জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধাস্মৃতঃ ॥৯॥
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানু-প্রদানতঃ।
ইতি বর্ণবিদঃ প্রাহুর্নিপুণং তং নিবোধত ॥১০॥

অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া বস্তুর দ্যোতনা করে এবং মনকে সেই দ্যোতনা অনুযায়ী (বস্তু বিষয়ে বলিবার জন্য) নিযুক্ত করে; মন হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত অগ্নিকে প্রেরণা দেয় এবং সেই অগ্নি বায়ুকে (বাহিরে বাহির হইবার জন্য) চালিত করে (৬)। বায়ু উরঃদেশে বিচরণ পূর্বক একটি মন্দ্রস্বরের সৃষ্টি করে। (এই স্বর) প্রাতঃ-সবনযোগ্য এবং গায়ত্রীচ্ছন্দকে আশ্রয় করে (৭)। কণ্ঠে আসিয়া সেই বায়ু মধ্যমস্বরের উৎপত্তি করে এবং মাধ্যন্দিনসবনযোগ্য হইয়া ত্রিষ্টুভ্ ছন্দকে অনুসরণ করে। সেই বায়ুই শীর্ষদেশে আসিয়া তারস্বরের সৃষ্টি করে এবং তৃতীয়সবনযোগ্য হইয়া জগতীছন্দকে আশ্রয় করে (৮)। সেই বায়ু এইরূপভাবে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া মূর্ধাদ্বারা প্রতিহত হইয়া, মুখবিবর দ্বারা বাহির হইয়া বর্ণসমষ্টির সৃষ্টি করে। এবং স্বর, কাল, স্থান ও প্রযত্নানুসারে সেই বর্ণরাশিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করে (৯—১০)।

পাণিনীয় শিক্ষায় শব্দের যে স্বরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মনুষ্যগোচরযোগ্য চতুর্থস্তরের বর্ণধ্বনি অর্থাৎ বৈখরী শব্দ। ইহা ছাড়া ধ্বনির আরও তিনটি অবস্থা আছে, যথা—পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা। এই তিনটি অবস্থার পর বৈখরীশব্দের উৎপত্তি হয়। পরাবাক্[১] পরম ব্রহ্ম হইতে বিনির্গত হয়। মূলাধারে অবস্থান করে। শঙ্করাচার্যের মতে পরাবাক্ 'সূক্ষ্ম তারস্বরের' দ্যোতনা করে। উহা শব্দব্রহ্ম, তাই অনপায়িনী। এই পরা বাক্ স্বীয় স্থান মূলাধার ত্যাগ করিয়া "ষট্‌চক্রান্তর্গত মণিপূরে" অর্থাৎ নাভিমূলে আসিলে 'পশ্যন্তী' নামে অভিহিত হয়। যোগিগণ এই পশ্যন্তী বাকের সূক্ষ্ম অবস্থা অনুভব করিতে পারেন। তারপর মণিপূর হইতে দেহের মধ্যভাগ হৃদয়ে

১ শ্রীগুরুপদ হালদার মহাশয়ের ব্যাকরণদর্শনের ইতি-হাসের উপোদ্ঘাত হইতে নিম্নলিখিত অংশের সার সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আসিয়া 'মধ্যমা বাক্' নামে অভিহিত হয়। এই মধ্যমা বাকে যে ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহা সাধারণের শ্রবণযোগ্য নয়। যোগিগণ তপস্যাবলে উহার শব্দ শুনিতে পান। এই মধ্যমা বাক্ই যখন কণ্ঠদেশে আসে এবং মনুষ্য শ্রুতিগোচর হয়, তখন তাহাকে বৈখরী বলে। এই পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শব্দের মূল। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

"পরা বাঙ্ মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা
হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা ॥"

* * *

"বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
আন্তরার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী ॥"

বৈখরী শব্দধ্বনির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—

"মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু তারঃ পরাখ্যঃ,
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্ মধ্যমাখ্যঃ।
বক্ত্রে বৈখর্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্ন-
বদ্ধস্তস্মাদ্ ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ ॥"

অর্থাৎ, "মধ্যমা বাক্ প্রথমতঃ সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া মস্তকে আঘাত করে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বিষয়ীকৃত হয় এবং তারপর উহা নাদরূপে কণ্ঠে বা বক্ত্রে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক বৈখরীদশা লাভ করিয়া থাকে" (গুরুপদ হালদার)। এই বৈখরী অর্থাৎ চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয় বাক্যই যে মনুষ্য বলিয়া থাকে তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদেই আছে—

চত্বারি বাকপরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥" (১।১৬৪।৪৫)

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার শব্দকথায় এইটি বুঝাইবার জন্য একটি সুন্দর উপমার আশ্রয় লইয়াছেন।

"বাঁশীতে ফুঁ দিলে তাহা হইতে ধ্বনি বাহির হয় ও সেই ধ্বনি শুনিয়া আমরা আনন্দ পাই। কিরূপে সেই ধ্বনি জন্মে?"

"বাঁশী বাজাইলে বাঁশীর ভিতরে আবদ্ধ বাতাসটা কাঁপিয়া উঠে এবং ভিতরের কম্প বাহিরে আসিয়া বাহিরের বায়ুরাশিতে ঢেউ জন্মায়। সেই ঢেউগুলি কানে আসিয়া ধাক্কা দেয় ও সেখানকার স্নায়ুযন্ত্রে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্বনি বোধ হয়।"

"বাঁশীর ভিতরে যে ঢেউ জন্মে, উহারা কোথাও কোন বাধা না পাইয়া বাহিরে আসে ও বাহিরের বায়ুরাশিতে সংক্রান্ত হয়। যতক্ষণ ব্যাপিয়া এই ঢেউগুলি আটক না পাইয়া বাহিরে আসিতে থাকে, ততক্ষণ ব্যাপিয়া আমরা বংশীধ্বনি শুনিতে পাই।"

"আমাদের বাগ্যন্ত্র অনেকটা বাঁশীর মত। ফুসফুস হইতে প্রশ্বাসের বায়ু মুখকোটরে আসিবার সময় কণ্ঠনালীর পথে অবস্থিত পেশীনির্মিত দুইটা তারে আঘাত দিয়া ঐ তার দুইটাকে কাঁপাইয়া দেয় এবং সেই তারের কম্পে মুখকোটরের বায়ুমধ্যে ঢেউ জন্মে। সেই ঢেউগুলি মুখকোটর হইতে বাহিরে আসিয়া কর্ণগত হইলে ধ্বনি শোনা যায়।"

Louis H. Gray তাঁহার Foundations of Language নামক গ্রন্থের ৪৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায় ঠিক উপরি উক্ত কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

"Communication by means of speech depends upon the physics of sound, a disturbance of air which starts from some vibrating body, and upon the physics, physiology and psychology of hearing. The vibrations constituting the source of voice or speech are set up by forcing air from the lungs through the trachea into the laryx (with or without vibration of the vocal cords) and then through the pharynx and mouth (frequenty in cooperation with the nasal cavity), over the tongue and past teeth out beyond the lips and nose."

ভবিষ্যতে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।
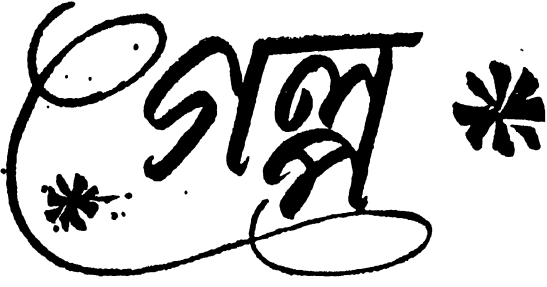
পকেটমার

শ্রীসুকৃতি রায়চৌধুরী

লোকটা ধরা পড়ল। বহুদিন তাকে দেখেছি আমি। ঘিঞ্জি গলিতে ঘিঞ্জি বাড়ী। আমাদের বাড়ীর সামনে একদিন সন্ধ্যায় তাকে আমি প্রথম দেখি। মধুবাবুর একতলা ভাড়াবাড়ীর অনেকগুলো ঘরের একটা ঘরে সে থাকত। বয়স বেশী নয়। এমনিতে দেখলে মনে হ'ত একদিন অবস্থা ভাল ছিল হয়ত—আজ পড়ে গেছে। কিম্বা হয়ত সত্যিসত্যি অবস্থা ভাল, বাড়ীতে ঝগড়াঝাটি করে এখানে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। আমি ঠিক বুঝতাম না। আসলে ও নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে ছিল না।

আমি দেখতাম ও ঠিক নিয়মমত অফিসটাইমে বেরুত আর সন্ধ্যে হলেই ফিরে আসত। একআধদিন ইয়ার দোস্তরা আসত, বেশীর ভাগ দিনই একা থাকত। ছুটির দিনেও বেরুত। তাই এক এক সময় আমার মনে হত ও বোধ হয় অফিসে কাজ করে না। হয়ত কিছুই করে না—শুধুই টোটো করে ঘোরে অথবা মাঠে ময়দানে ঘুমোয়। আমার মনে হত, কেন হ'ত জানিনা।

কিছুদিন পরে একদিন দেখি তার ঘরের সামনে পুলিশ আর লোকে লোকারণ্য। কথায় কথায় ওর আসল পরিচয় ধরা পড়ল। দাগী পকেটমার। আশ্চর্য, আমার অনুমান দেখি মিলে গেল। যারা চাকুরী করে তাদের চেহারা দেখলে আমি বুঝতে পারি। তবে সত্যি বলতে, ও যে পকেটমার হবে তা আমি ভাবিনি। পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেল। অন্যান্য ভাড়াটেরা প্রথমে বিস্মিত ও পরে আনন্দিত হল।

আর মধুবাবু, তিনি তো একরকমের। হাড় কেপ্পন—পাড়ায় কারও সঙ্গে মেলামেশা করেন না। কে জানে, ওই লোককে হয়ত আবার ভাড়াটে রাখবেন। জাতে উনি শুঁড়ি, কিন্তু জাতব্যবসা না করে পুরোনো মুদ্রা কেনাবেচার ব্যবসা করেন। কয়েক শতাব্দীর পুরোনো মুদ্রা, যা যাদুঘরে রাখবার জিনিষ, তা তার হাতে হাতে ঘোরে। আমি জানি কিছু লোকের এসব সংগ্রহের বাতিক আছে। কেউ কেউ বলেন মধুবাবুর সংগ্রহের বেশ কিছু চোরাই মাল।

দিনদুয়েক পরেই সেই লোকটি ফিরে এল তার আস্তানায়। পুলিশ বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে। অন্যান্য ভাড়াটেরা একটু হৈচৈ করবার চেষ্টা করলেন যাতে মধুবাবু তাকে ঘর ভাড়া না দেন—কিন্তু বাড়ীওলার সঙ্গে বিবাদ করার ফল ভাল নাও হতে পারে বিবেচনায় নিজেরাই চেপে গেলেন। মধুবাবু থাকতেন ভেতরের দিকে, ভাড়াটেদের কেউ সেদিকে বড় একটা যেতেন না। লোকটি ফিরে আসার পর কিন্তু লক্ষ্য করেছি মাঝে মাঝে সে মধুবাবুর অন্দরে যেতে শুরু করেছে। আর বিশেষ করে যে সময়ে মধুবাবু থাকতেন না, সেই সময়।

কে জানে কি ব্যাপার—আমি এবিষয়ে মাথা ঘামাইনি। এ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না, অথচ দিতে হল। কেন না কিছুদিন পরেই এক সকালে দেখি মধুবাবু লোকটির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচামিচি করছেন। কান পাততে হল। খানিক পরেই ঘটনাটা বোঝা গেল। লোকটি নাকি তার মেয়েকে নিয়ে পালাবার মতলবে ছিল। অনেক গুণই আছে দেখছি। মেয়েটিকেও বলিহারি, শেষে কিনা পকেটমারকে ভালবাসতে গেলি! বুঝলাম রূপে মজেছে। মধুবাবু পুরোনো মুদ্রার ব্যবসায় করেন, মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে যুবক-যুবতীর চিরন্তন অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিতে চান না। অবিলম্বে তাকে ঘর ছেড়ে দেবার জন্যে শাসিয়ে গেলেন। লোকটির মুখ দেখে মনে হ'ল সে বোধহয় সেটা মেনে নিল।

তার ঠিক পরের দিন। আবার পুলিশ। এবারে ভাড়াটের কাছে নয়, খোদ মধুবাবুর কাছে। কথায়

কথায় জানা গেল, পুলিশ চোরাই মালের সন্ধানে এসেছে। ভাবলাম যা রটে তা কিছুটা বটে। মধুবাবু মুখ কাঁচুমাচু করে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে ঘর সার্চ হচ্ছে। ভীড়ের মধ্যে সেই পকেটমার লোকটিকেও দেখলাম। হাবে ভাবে মনে হয় সাহায্য করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। আর মধুবাবুর চোখও ঘুরে ঘুরে যেন সাহায্যই চাইছে। কে না জানে, বিপদগ্রস্ত মানুষ শত্রুর কাছ থেকেও উপকার প্রত্যাশা করে।

মধুবাবুর ঘরে কিছু না পেয়ে পুলিশ চলেই যাচ্ছিল। সেই সময় ঘটনাটা ঘটলো। যেখানটায় পকেটমারটি ও আরও কিছু লোক জটলা করছিল, সেখান থেকে একটি পুরোণো মুদ্রা পাওয়া গেল। আর যায় কোথায়। পুলিশ সেখানেই সার্চ সুরু করে দিল। পকেটমারের পকেট থেকে আরও কয়েকটি মুদ্রা বেরুল। পুলিশের মতে সব কটিই চোরাই মাল। মধুবাবু এতে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন, এবং ভেবে কিছু ঠিক করবার আগেই লোকটি ধরা পড়ল।

মধুবাবুর মেয়েকে ভালবাসে তাই মধুবাবুর পকেটে যে মুদ্রাগুলি ছিল, কৌশলে সেগুলি হাতসাফাই করে নিজের কাছে রেখেছিল। মধুবাবুকে সে বাঁচাতেই চেয়েছিল, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলো না। অসাবধানতায় একটি মুদ্রা পকেট থেকে পড়ে গিয়ে এই কেলেঙ্কারী। পুলিশ তাকেই চোর বলে ধরল। মধুবাবুর মেয়ের প্রেমকাতর দৃষ্টি কিম্বা মধুবাবুর হতবিহ্বল চাউনী কিছুই তাকে আটকাতে পারল না। তাদের চোখের সামনেই ওকে ভ্যানে তুলল।

রবীন্দ্রনাথ ও মহাবস্তু অবদানের 'কুশ জাতক'

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বহুমুখী বৈচিত্র্য ও নব নব উন্মেষশীল সৃজনসম্পদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রাখিয়াও ইহা বলা যায় যে প্রাচীন সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের মণিমঞ্জুষা হইতে দুর্লভ রত্ন সমূহ আহরণ করিয়া তিনি তাঁহার কাব্যকে অপূর্বরূপে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কারণ, হোমার, ভার্জিল, সেক্‌স্‌পীয়ার প্রমুখ মহাকবিগণও প্রাচীন কবিগণের রচনা হইতে বহু পরিমাণে বিষয়বস্তু আহরণ করিয়াছেন। কবি রাজশেখর এজন্য মহাকবিগণের এই পরস্পর নির্ভরতার ও ঋণগ্রহণের সমর্থনে বলিয়াছেন—

নাস্ত্যচোরঃ কবিজনো নাস্ত্যচোরো বণিগ্‌জনঃ।
স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি নিগূহিতুম্‌।
উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রাচ্যং মন্যতাং স মহাকবিঃ।

(কাব্য মীমাংসা পৃঃ ৬১)

অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোন কবি নাই যিনি পূর্বের কবিগণের সম্পদ চুরি করেন নাই, অথবা এমন কোন বণিক্‌ নাই যিনি চৌর্যমুক্ত। যিনি গোপন করিবার কৌশল জানেন তিনিই নিন্দার হাত এড়াইতে পারেন। একমাত্র তাঁহাকেই মহাকবি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যিনি প্রাচীন বিষয় ও নূতন শব্দ সম্ভারের উপযুক্ত রকমের সমন্বয় সাধন করাইতে পারেন। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' কবিতা ও 'রাজা' নাটককে বিশ্লেষণ করিলে প্রতিভার এই দুর্লভ সমন্বয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯১০ সালে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের ইংরাজী সংস্করণ "দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার" প্রকাশিত হয়। ইহার নাট্যোপযোগী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। 'শাপমোচন'

১৯৩১ সালে রচিত হয়। এই উভয় রচনাই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মহাবস্তু হইতে সংগৃহীত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Calcutta 1882)" নামক গ্রন্থ হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাবস্তু অবদানের যে সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ প্রস্তুত করেন তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার রচনা-দুইটির উৎস খুঁজিয়া পান। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত এবং ক্ষীণকায় আখ্যানাংশ দুইটিকে রবীন্দ্রনাথ যে অভিনব ও সুন্দর নাট্যরূপ দিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের পূর্ণ পরিচায়ক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই সংক্ষিপ্তসার রচিত হইবার সময়ে প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ই, সেনহার্ট তিনখণ্ডে মহাবস্তু অবদানের মূল অংশ প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯৩১ সালে "শাপমোচন" রচিত হইবার সময়েও ভারতের বিদ্বদ্‌মহলে মহাবস্তু অবদানের নাম অজ্ঞাতই ছিল। বৌদ্ধ অবদানের আখ্যানভাগ ছাড়াও পালিজাতকের সংগ্রহ (৫৩১নং) হইতেও রবীন্দ্রনাথ প্রভূত সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। 'রাজা' নাটক পরে 'অরূপ-রতন' নামক গীতি আলেখ্যে রূপান্তরিত হয় (১৩২৬, মাঘ)।

মহাবস্তু অবদানের 'কুশজাতকে'র ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে ভগবান্ বুদ্ধ মারকে পরাজিত করিয়া সম্বোধি-তরুতলে নির্বাণ লাভ করিবার পর রাজগৃহে গমন করেন। তথায় অর্হৎগণ কিরূপে ভগবান বুদ্ধদেব মারকে জয় করিয়াছেন ইহা প্রশ্ন করিলে বুদ্ধ কুশজাতকের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং তিনিই যে পূর্বের একজন্মে বারাণসীর রাজা কুশরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও বিবৃত করিলেন। কুশজাতকের আখ্যানভাগ নিম্নোক্তরূপ।

বারাণসীরাজ ইক্ষ্বাকুর অগণিত মহিষীর মধ্যে প্রধানা মহিষী ছিলেন রাজ্ঞী অলিন্দা। অপত্যলাভ না হওয়ায় রাজার মানসিক শান্তি ব্যাহত হইতেছিল। এজন্য রাজ-পুরোহিত নির্দেশ করিলেন যে রাজার মহিষীবৃন্দ এক-পক্ষকালের মধ্যে তিনবার অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন। রাজা সকলকে অনুমতি প্রদান করিলেও প্রিয়তমা পত্নী অলিন্দাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত রাখিলেন। রাজাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণের বেশধারণ করিয়া আসিয়া রাজ্ঞী অলিন্দার সঙ্গ কামনা করেন। রাজা সত্যরক্ষার নিমিত্ত রাজ্ঞীকে ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পন করিলেও রাজ্ঞী ভয় ও সঙ্কোচে ব্রাহ্মণের সেবায় অসমর্থ হন। রাত্রিশেষে ইন্দ্র স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া অলিন্দাকে একটি ঔষধ বটিকা দান করেন। এই ঔষধময় বটিকা পান করিলে অলিন্দার একটি অসাধারণ শক্তিমান্ পুত্র লাভ হইবে কিন্তু যেহেতু অলিন্দা ইন্দ্রের অভিলাষ পূর্ণ করেন নাই এজন্য সেই পুত্র বিকৃত দেহ ও বিরূপ হইবে। অন্যান্য পত্নীরা সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিলেও অলিন্দা রাজার নিষেধ থাকায় তাহা ভক্ষণ করিতে পারিলেন না। পরে রাজার অগোচরে একটি কুশের অগ্রভাগের সাহায্যে অলিন্দা সেই ঔষধ চূর্ণ আস্বাদ করিলেন। এজন্য অন্যান্য পত্নীরা প্রিয়দর্শন পুত্র প্রসব করিলেও অলিন্দা একটি বিরূপদর্শন পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা এই পুত্রকে অবহেলা করিলেও কালক্রমে সে নিজবুদ্ধি ও প্রতিভায় সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিল এবং ইক্ষ্বাকুর দেহাবসানের পর মন্ত্রিগণের পরামর্শে সে সিংহাসনে আরোহণ করিল। কুশ বিরূপ বলিয়া তাহার বিবাহের জন্য রাজ্ঞী মদ্রক দেশের রাজকন্যা সুদর্শনাকে তাহার রূপলাবণ্যের নিমিত্ত পাত্রী মনোনীত করিলেন। কিন্তু এই সর্ত আরোপ করিলেন যে রাজদম্পতী কেবলমাত্র একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মিলিত হইতে পারিবেন, দিবালোকে তাঁহাদের মিলন হইবে না। সুদর্শনা বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজ্ঞী কহিলেন যে স্বামী স্ত্রী উভয়েই অসাধারণ রূপসম্পন্ন হওয়ায় পুত্রের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখা কোশলরাজবংশের কৌলিক প্রথা। সুদর্শনা স্বামীকে দেখিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলে অলিন্দা কুশের রূপবান্ ভ্রাতা কুশদ্রুমকে সিংহাসনে বসাইয়া কুশকে ছত্রবাহকরূপে দণ্ডায়মান রাখিয়া সুদর্শনাকে দেখাইলেন। সুদর্শনা নিভৃতে স্বামীর নিকটে ঐ কুৎসিতদর্শন ছত্রবাহককে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কুশ বলিলেন যে "কোনও মানুষের যথার্থ নৈতিক মূল্যই তাহার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, বাহ্য সৌন্দর্য তাহার পরিচায়ক নহে।" ইতিমধ্যে সুদর্শনার অগোচরে কুশ তাঁহাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে পদ্মবনে লুকাইয়া থাকিলেন এবং সুদর্শনা পদ্ম আহরণ করিতে গেলে তাহাকে সবলে আলিঙ্গন

করিলেন। আম্রবনে ভ্রমণ করিতে গেলে সুদর্শনার সমক্ষে এক কুৎসিৎদর্শন রাক্ষস উপস্থিত হইল। রাত্রিকালে সুদর্শনা এই সকল বিষয় কুশের নিকট জানাইলে কুশ বলিলেন যে ছত্রবাহক অসৎ প্রকৃতির লোক নহে। অতএব তাহা হইতে সুদর্শনার ভয়ের কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সুদর্শনা স্বামীর পরিচয় জানিতে পারিলেন। রাজার হস্তিশালায় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইলে রাজা কুশ অসীম সাহসের সহিত হস্তিশালার আচ্ছাদন অপসারিত করিয়া হস্তিগুলিকে রক্ষা করিলেন। ইহাতে রাজ্যের সকলেই কুশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। কুৎসিৎ দর্শন ছত্রবাহকই মহারাজ কুশ ইহা বুঝিতে পারিয়া হতাশ ও ভগ্নহৃদয় সুদর্শনা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া কান্যকুব্জে পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন। কুশ সুদর্শনার গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া ভ্রাতা কুশক্রমকে সিংহাসনে বসাইয়া রাণী সুদর্শনার অনুসরণে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া কুশ অতি উৎকৃষ্ট পুষ্পমাল্য প্রস্তুত করিয়া সুদর্শনার নিকটে পাঠাইতে লাগিলেন। সুদর্শনা প্রথমে চমৎকৃত হইলেও মাল্যে কুশের নাম দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কুশ ক্রমে ক্রমে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির বিবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া তাহা সুদর্শনার নিকটে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কুশ রাজ-পরিবারে পাচকের কর্ম গ্রহণ করিয়া সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া ক্রমে সুদর্শনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুদর্শনার মনোভাব কিরূপ জানিতে চাহিলে সুদর্শনা কুশকে একাকী রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। ইতিমধ্যে কুশের দেশত্যাগের সংবাদ শুনিয়া সুদর্শনাকে লাভ করিবার আশায় প্রতিবেশী সাতটি রাজ্যের রাজা একত্র হইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিল। কন্যার আচরণের বিষয় জানিতে পারিয়া রাজা মহেন্দ্রক কন্যাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। সুদর্শনা অনন্যোপায় হইয়া যখন কুশের নিকট সকল বৃত্তান্ত জানাইতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার মাতা অলক্ষিতভাবে তাহা শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্রককে নিবেদন করেন। মহেন্দ্রক কুশকে রাজোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলে কুশ একটি অতিকায় হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মহাযুদ্ধে সাতজন নৃপতিকেই পরাভূত করিলেন। পিতামাতার অনুরোধে সুদর্শনা কুশের সহগামী হইলেন। পথের মধ্যে এক জলাশয়ে কুশ আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া তিনি যে কিরূপ কুৎসিৎ তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং দুঃখে ও মনোবেদনায় আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র সহসা আবির্ভূত হইয়া কুশকে আত্মহত্যা হইতে নিরস্ত করিলেন এবং তাঁহাকে একটি বহুমূল্য রত্ন দান করিলেন। এই রত্ন পরিধান করিয়া কুশ এক অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার স্বামী কোন ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রথমে এইরূপ মনে করিলেও সুদর্শনা পরে সর্বসময়ে কুশের নয়নাভিরাম রূপ দেখিতে চাহিলেন। রাজধানী কাশীতে উপস্থিত হইলে রাজমাতা অলিন্দা ও তাঁহার অমাত্যগণ প্রথমে কুশকে চিনিতে পারেন নাই পরে ইন্দ্রের আশীর্বাদে এইরূপ হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইল।

সেনহার্ট রচিত মহাবস্তু অবদানের কুশজাতকের দ্বিতীয় আখ্যানে কুশের বিরূপতার কারণ অন্যরূপ দেখান হইয়াছে। পূর্বজন্মে কুশ তাঁহার পত্নীর প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন, কারণ তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার স্ত্রী একজন রমণীয় দর্শন প্রত্যেকবুদ্ধকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। কুশ স্ত্রীকে এজন্য ভর্ৎসনা করেন ও সেই প্রত্যেকবুদ্ধের সহিত রূঢ় ব্যবহার করেন। এই কর্মের ফলস্বরূপে তিনি বিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

মহাবস্তুর তৃতীয় খণ্ডের কুশজাতক প্রধানতঃ গদ্যে লিখিত এবং ইহার ছন্দোময় আখ্যান ঐ সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। ঐ জাতকের পালি ভাষায় লিখিতরূপ জাতকের ইংরাজী অনুবাদের পঞ্চমভাগে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক ও কাব্যাংশের পাত্র-পাত্রীর নামগুলি পর্যালোচনা করিলে এবং কুশ-জাতকের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে বিরূপ রাজার নাম সেখানেও কুশ, তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম সুদর্শনা এবং শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রক। তিনি মদ্রদেশের অধিপতি ও কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেন। কুশের পিতা রাজা ইক্ষ্বাকু এবং তাঁহার মাতা অলিন্দা। তাঁহার রাজ্য কাশী ও রাজধানী বারাণসী। পালিভাষায় লিখিত কুশ-জাতকের আখ্যানে ও বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সেখানে বলা হইয়াছে যে কুশ কুশাবতী নগরীর

রাজা এবং মল্লদেশের অধিপতি। তাঁহার মাতার নাম শীলাবতী এবং প্রধানা রাণীর নাম পভাবতী। পভাবতী মল্লদেশের রাজার দুহিতা, তাহার রাজধানী সাগল। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটকে কুশের কোন নামকরণ করেন নাই, কিন্তু রাজ্ঞীর নাম সেখানেও দেওয়া হইয়াছে সুদর্শনা। 'শাপমোচন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অন্ধরাজাকে অরুণেশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম দিয়েছেন কমলিকা। (১)

মূল মহাবস্তু অবদানের 'কুশজাতক' হইতে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক ও 'শাপমোচনে'র প্রধান চরিত্রগুলির পার্থক্য দেখান হইল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও নাটকীয় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এই কাহিনী দুইটির যে অপূর্ব রূপায়ণ করিয়াছেন তাহা অসামান্য সাহিত্য গুণসমৃদ্ধ। 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ রাণী সুদর্শনাকে রাজার বাল্য বিবাহিতা পত্নীরূপে দেখাইয়াছেন। অন্ধকার গৃহে রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সুদর্শনা রাজার রূপ দেখিতে চাহিলে রাজা তাহাকে বলিলেন—"বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপর দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো।" রাজবেশী সুবর্ণকে দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে রাজা বলিয়া ভুল করিলেও রাজপ্রাসাদে অগ্নিকাণ্ডের সময়ে সুবর্ণের ছদ্মবেশ ও রাজার যথার্থ পরিচয় বাহির হইতে বিলম্ব হইল না। রাজা অগ্নি হইতে রাণীকে উদ্ধার করিতে আসিলে অগ্নির আকস্মিক ঝলকে রাণী দেখিলেন রাজার মুখ—"ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো, ঝড়ের মেঘের মত কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো।" রূপের নেশায় নেশাগ্রস্ত সুদর্শনা রাজাকে পরিত্যাগ করিল। পিত্রালয়ে যাইবার অল্পকালের মধ্যে সুদর্শনাকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কাঞ্চীকোশলের নৃপতিকুল একযোগে সুদর্শনার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করিল। সুদর্শনা প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হইয়া মনে মনে বলিল—"দেহে আমার কলুষ লেগেছে, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি—বুক চিরে কি আজ সেটা তোমাকে জানিয়ে যেতে পারব না?"

যুদ্ধে রাজারই জয় হইল কিন্তু ঠাকুরদা আসিয়া খবর দিলেন যে রাজা চলিয়া গিয়াছেন। দুঃখে ও অভিমানে রাণী সখী সুরঙ্গমাকে সঙ্গে লইয়া পথে অভিসারে বাহির হইলেন। বহুকাল পরে পুনরায় সেই অন্ধকার গর্ভ গৃহে রাজা ও রাণীর মিলন হইল। রাণীর হৃদয় এখন অন্তরের আলোকে উদ্ভাসিত। এজন্য পরিপূর্ণ লজ্জার সহিত রাজাকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"এসো এবার আমার সঙ্গে এসো—বাইরে চলে এসো আলোয়।

রাজানাটক মূলতঃ বৌদ্ধ অবদানের অন্তর্নিহিত বাণীর নাট্যরূপ। এই জাতকে মানুষের বাহ্যরূপের প্রতি আসক্তিকে নিন্দা করিয়া শীল-সম্পদকে অবলম্বন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাহিরের উৎসব লইয়া নাটকের বিষয় রচিত হইলেও বাহির হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশের অভিযানকে এ স্থলে রূপকের সাহায্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বিষয়ের প্রলোভন হইতে অন্তরের শুচিতা রক্ষার নিমিত্ত যে নিরন্তর সংগ্রাম তাহার প্রকাশ রাণী সুদর্শনা ও কুশের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় এই নাটকের যে তাৎপর্য নির্দেশ করিয়াছিলেন 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে তাহা উল্লেখযোগ্য—রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা—তারপরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি ত্যাগের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাতে পদে পদে বাধা, কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।" রাণীকে মোহমদির দৃষ্টিতে অন্ধকারের রাজার মধ্যে সৌন্দর্যকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল কবি তাহাকে অনবদ্য সঙ্গীতের মাধ্যমে রূপায়িত করিয়াছেন—

১ "রাজা" নাটক রচিত হয় ১১ সালের আশ্বিন মাসে। ৫ই চৈত্র শান্তিনিকেতনে রাজা নাটকের অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঠাকুরদার ভূমিকায় অভিনয় করেন। "রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা" শীর্ষক গ্রন্থে শান্তা দেবী এই অভিনয়ের বর্ণনা দিয়াছেন।

"আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো,
নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুল বিছানো পথে।
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়াল ফুলের রেণু।
এই দৃষ্টি ভোগীর। (২)

ইহাতে সৌন্দর্য্যের বাহ্য বিলাসকেই সাদরে আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু এই রূপাভিমানী নারী যখন অসুন্দর রাজার মধ্যেই রূপের সন্ধান পাইয়াছেন তখন অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই আপনার সকল মলিনতাকে ত্যাগ করিয়া দীনহীনভাবে অন্তরের প্রবল আকাঙ্ক্ষার সহিত রাজার সহিত মিলনের নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন, অরূপ রাজাকে শুচি সুন্দর দৃষ্টিতে রূপবান্ বলিয়া বোধ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"এবার উজাড় করে লও হে আমার যা কিছু সম্বল।
ফিরে চাও, ফিরে চাও ওগো চঞ্চল।"

রাজা নাটকের(৩) এই ভাবটিকে বিশ্লেষণ করিয়া ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলিয়াছেন—এই রাজা বিশ্বরাজের সুন্দর প্রতীক, মঞ্চে তিনি দেখা দেন না, বাহ্যরূপের অন্তরালে যে চৈতন্যের প্রবাহ নিত্য উৎসারিত তাহাকে জানিতে হইলে প্রয়োজন অতন্দ্র সাধনার। বুদ্ধের শীল-সম্পদ এই অন্তরতত্ত্বের সন্ধানে নিয়োজিত। অপ্রমাদ, ক্ষমা ও অহিংসার দ্বারাই শীলকে অর্জন করা যায়। রাজা নাটকে রবীন্দ্রনাথ এই 'শীল' লাভের সাধনাকে নাট্যরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'শাপ মোচনের কাব্যরূপ ভাষার লালিত্য ও ভাবের ঔদার্যে অধিকতর সমৃদ্ধ। রাজা ও রাণীর প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে উৎকণ্ঠা ও তীব্র বিস্ময়ের সংঘাতে অতুলনীয়—

"ঐ শোনো, ঊষার প্রথম কোকিলের ডাক,
অন্ধকারের মধ্যে আর আলোকের অনুভূতি।
আজ সূর্যোদয় মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হবে
আমার দিনের মধ্যে·········দেখা হক,

টলে উঠল যুগলের সংসার।" হতাশায় অধীর রাণী রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া বিরহের নিঃসঙ্গ বেদনার মধ্যে ক্রমে আপনার চিত্তের দৈন্য উপলব্ধি করেন। কৃষ্ণ পক্ষের অন্ধকার রাত্রে রাণীর বাতায়নতলে বেদনাহত অরূপ রাজার মৌন নৃত্যের ছন্দে বিরহের ব্যাকুল বেদনা অব্যক্ত ভাষায় ফুটিয়া উঠে। এইভাবে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অনুশোচনার তীব্র দহনে দগ্ধ হয়ে রাণী শেষে তাঁর প্রথম পরিচিত রূপহীন রাজার সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছুক হন। গভীর রাত্রে রাজার বীণা যখন করুণ ঝঙ্কারে দিগ্‌দিক ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে তখন রানী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে রাজার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলেন—

"প্রভু আমার প্রিয় আমার,
একী সুন্দর রূপ তোমার।"

মহাবস্তু অবদানের মূল আখ্যানে প্রকৃতি নির্বাসিত হইলেও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য ও অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তাকে তাঁহার কাব্যের পটভূমিরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া অভিনব মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃতির দৃশ্য পরিবর্তনের সহিত মানব মনের পরিবর্তনের সহিত মানবমনের পরিবর্তনের গভীর রহস্যটিকে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব সঙ্কেতময় ব্যঞ্জনার সাহায্যে পরিস্ফুট করিয়াছেন। অভিমানিনী রাণীর অন্তর্বেদনায় সাক্ষীরূপে রাত্রির নিগূঢ় নিস্তব্ধতাকে চিত্রিত করিয়া তিনি সংবেদনশীল শিল্পীমনের পরিচয় দিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় রসবোধ, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি ও রোমান্টিক রসচেতনা একত্রে মিলিত হইয়া শাপমোচন কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। মহাবস্তু অবদানের যে মূল কাহিনী আমরা বর্ণনা করিয়াছি তাহার মধ্যেগুণ নাটকীয় সংঘাত, ও চরিত্র চিত্রণের যে অবকাশ রহিয়াছে তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকিলে 'রাজা' ও 'শাপমোচন' যে অন্যরূপ ধারণ করিত ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্য হইতে কল্পনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাকে যেভাবে রূপায়িত করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি ইলিয়টের একটি সুপ্রসিদ্ধ উক্তির সাহায্যে আমাদের মন্তব্যকে সুদৃঢ় করিয়া আলোচ্য প্রবন্ধ সমাপন করিতে পারি—"No poet no artist of any art has his complete meaning alone. His significance, his appreciation, is the appreciation of his relation to the dead poets and artists.

---

২ 'রাজা' নাটকের সঙ্গীতগুলি গীতাঞ্জলির সঙ্গীতের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ, ইহার মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নূতন অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলিয়াছেন—"অভিনয় শেষে তাহার অন্তর্নিহিত মধুর আধ্যাত্মিক রসটি সমগ্র হৃদয়মন ভাবাবিষ্ট করে।"

গণপতিত্ব

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীময় গণতন্ত্রের বাতাস বহিতেছে। অনেকে মনে করেন যে এই গণতন্ত্রবাদ আধুনিক যুগের রাজনীতি। কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, গণতন্ত্রবাদ ভারতে আদিযুগ হইতেই প্রচলিত আছে। কোনদিনই ভারতবর্ষ এই গণতন্ত্রবাদের বাহিরে ছিল না। তবে তাহার রূপ ছিল বিভিন্ন পন্থানুবর্ত্তী। এবং দেশ-কাল পাত্রভেদে পাশ্চাত্য দেশের গণতান্ত্রিকের সহিত প্রাচ্য দেশের গণতান্ত্রিকের কোনরূপ সামঞ্জস্য ছিল না। বর্ত্তমান যুগে ঐ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে যাইয়া শাসকগণ যেন পদে পদে বাধা পাইতেছেন বলিয়া মনে হয়। গণতন্ত্র লেই হিন্দুজাতি সারাভারতে এবং ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যথেষ্ট সমর্থন মিলে, যেমন—"এই হিন্দু সভ্যতা এক সময় সমস্ত সভ্য জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি ৩।৪ হাজারবর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুগণ এসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানেও বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল অল্প দিন হইল তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে (বিশ্বকোষ, হিন্দু শব্দ)

আর্য্য সন্তানগণ এক একজন নরপতির অধীনে দেশ জয়ে বহির্গত হইতেন, আর তাঁহাদের পুরোভাগে এক একজন ঋষিকে রক্ষা করিতেন। তিনি নূতন দেশে যাইয়া যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা ঐ দেশের জনসাধারণকে হস্তগত করিয়া নরপতিকে সিংহাসন দান করিতেন। এই কারণেই ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণ হিন্দু নামে অভিহিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অনেকে মনে করেন যে, সিন্ধুদেশে বা সিন্ধুনদের তীরে প্রথম বসবাস করার জন্য তাঁহারা হিন্দু আখ্যালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার অনুমান স্বতন্ত্র। হি অর্থে বৃদ্ধি, ন্ অর্থে সুগত, দ অর্থে রক্ষণ এবং উ অর্থে ত্রাস। যাঁহারা বৃদ্ধির গতি রক্ষা করিয়া ত্রাস আনয়ন করিয়াছিলেন অর্থাৎ যাঁহারা ক্রমশঃ উন্নতির পথে যাইতেছিলেন, তাঁহারাই হিন্দু।

ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, তুরস্ক, রুশ ও চীন যেমন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেশ তেমনি এই সকল দেশের শাসনতন্ত্রও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অনুমান, এই সকল দেশে আদিযুগে ব্রাহ্মণকে (ব্রাহ্মণ্য মতবাদকে) কেন্দ্র করিয়া শাসনতন্ত্র রচিত হইত। এবং শাসক এবং প্রজাবৃন্দ ব্রাহ্মণের অধীনে থাকিতেন। তজ্জন্য যখন যে ব্রাহ্মণের আধিপত্য আসিত তখন তিনিই গণপতি বা গণেশ আখ্যা লাভ করিতেন। যেমন, —"স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে বক্রতুণ্ড, কপিল, চিন্তামণি ও বিনায়ক প্রভৃতিরূপে গণেশের অবতারের কথা লিখিত আছে।" (বিশ্বকোষ, গণেশ শব্দ)

এই গণপতি বা গণেশকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্ব্বজ্ঞ ও সুলেখক হইতে হইত। পয়সা খরচ, তদ্বির, কূটনীতির মাধ্যমে বা নিরীহ ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করিয়া ভোট সংগ্রহের সাহায্যে তাঁহাকে গণপতিত্ব লাভ করিতে হইত না। ভোটের সাহায্যে গণপতিত্বলাভই হইতেছে প্রাচ্য দেশের উপর পাশ্চাত্য দেশের প্রভাব-বিস্তার। এই পাশ্চাত্য প্রভাব ভারতবাসী এখনও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। যাহার ফলে, সর্ব্ববিষয়ে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য প্রভাবদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইতেছে এবং সম্মুখে একটা বিপ্লবের সূচনা পরিলক্ষিত হইতেছে প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণে।

আদি যুগে ব্রাহ্মণত্ব লাভ পয়সা খরচের মাধ্যমে হইত না। সে যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈধ জননই হউক আর অবৈধ জননই হউক, জাতক নিজ নিজ মস্তিষ্ক অনুশীলন দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব এবং দৈহিক অনুশীলন দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিত। এবং ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ অপেক্ষা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অতি কষ্ট সাধ্য ছিল। তজ্জন্যই ব্রাহ্মণের সম্মান শাসকের উর্দ্ধে ছিল। ঐ কারণে শাসকগণ ব্রাহ্মণকে কন্যাদান জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহশীল

ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণত্ব লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিতেন। তাহার কারণ পিতৃ-সন্নিধানে জাতক মস্তিষ্ক অনুশীলন (যোগশাস্ত্র) লাভের সুযোগ পাইতেন। তবে কখন কখন দৈহিক অনুশীলনের দ্বারা ব্রাহ্মণ পদ হইতে স্খলিত হইয়া সাধারণের নিকট অবহেলিত হইয়া রাক্ষস পদবাচ্য হইতেন। এবং ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ সন্তানজ্ঞানে ঐ সব ব্রাহ্মণ তনয়কে বধ করিতে বিমুখ থাকিতেন। তাহারই ফলে ঐ সব ব্রাহ্মণ তনয় অপরাজেয় শক্তি সঞ্চয় করিয়া পৃথিবীর বুকে যদৃচ্ছাচার চালাইয়া যাইতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তে পরশুরাম (ইনি ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষাত্র-সমধর্ম্মাচারী ছিলেন বলিয়া রাক্ষসনামে পরিচিত না হইয়া কশ্যপ মুনির প্রযত্নে অবতাররূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন), দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সমুদ্রবক্ষে রাবণ, পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্তে মহী রাবণ, আর হিমালয় প্রদেশে কুবের উপাধিধারী রাবণের অপর ভ্রাতা। কুবেরও সমধর্ম্মাচারী ছিলেন বলিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন, যে মহীরাবণের রাজ্য পাতালে বা বর্ত্তমান আমেরিকায় ছিল, কিন্তু তাহা ভুল ধারণা। পূর্ব্ব-আর্য্যাধিপতি দৈত্যরাজ বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সহিত মহীরাবণের বিবাহ হইয়াছিল। অনুমান, ঐ সূত্রে মহীরাবণ পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্তাধীন তৎকালীন গৌড়দ্বীপ যৌতুক স্বরূপ লাভ করিয়া ঐ দ্বীপের মুনিঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাতালচণ্ডীর (দেবী পাটলা) পাটাল প্রদেশে (একটি জলাভূমির পাহাড়ীর উপরিভাগে, ঐ জলাটি এখনও পাতালচণ্ডীর বিল নামে পরিচিত এবং ঐ বিলের ঠিক পাহাড়ীর উপরে এখনও ঐ বেদী প্রতিষ্ঠিত আছে) রাজধানী স্থাপন করিয়া দেবী পাটলার শান্তির ক্রোড়ে রাজত্ব করিতেন। মহীরাবণের পূর্ব্বে ঐ গৌড়দ্বীপ যতদূর সম্ভব অযোধ্যার সগর বংশীয় ভগীরথের অধীন হইয়াছিল এবং ভাগীরথীপুর নামক স্থানে তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজ বলি হয়ত উহা অধিকার করিয়া মহীরাবণকে দান করেন।

মহারাজ বলির পিতার নাম ছিল বিরোচন, বিরোচনের পিতার নাম ভক্ত প্রহ্লাদ, আর প্রহ্লাদের পিতার নাম দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। ইহা সর্ব্বজন সুবিদিত। এই চারিজন রাজার রাজত্বকালে পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্তে গণপতি ছিলেন ঋষি শুক্রাচার্য্য আর ঐ সময়ে পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের গণেশ ছিলেন ঋষি বৃহস্পতি। উভয়েই উভয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মহারাজ বলি যদি শুক্রাচার্য্যের আদেশ অমান্য না করিতেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়ের পূর্ব্বোক্ত পাতালচণ্ডীর পাটাল প্রদেশের মুনিঋষিগণের আশ্রয় লাভ করিতে হইত না। বামনরূপী মহাযোগী (বামন অবতার) ঋষি বৃহস্পতির প্রেরিত এবং শুক্রাচার্য্যের সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। যাহার জন্য ঋষি শুক্রাচার্য্য মহারাজ বলিকে বাধাদান করিতে যাইয়া তাঁহাকে গণপতিত্ব হইতে পদচ্যুত হইয়া গৌড় দ্বীপের দক্ষিণস্থ অপর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপকে আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আশ্রয় লাভ জন্যই ঐ দ্বীপটির নাম হইয়াছিল "শুক্রবাড়ী চৌডলা" (চৌ=চারি; ডলা=বেলা)।

মহারাজ বলি যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া পাতালচণ্ডীর আশ্রয় বরণ করেন, সেই সময়ে তাঁহার পাঁচজন ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম প্রত্যেকে পূর্ব্ব-সমুদ্রোদ্ভব পাঁচটি দ্বীপকে অধিকার করিয়া নিজ নিজ নামানুসারে দ্বীপগুলির নামকরণ করেন। কিন্তু সুহ্ম যে দ্বীপটি অধিকার করেন, তাহা বহু পূর্ব্বেই "সুহ্ম" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

যযাতিরাজার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল যদু। ইনি পিতার অবাধ্য হওয়ায় পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল তুর্ব্বসু। ইনি পিতৃশাপে যবনত্ব বা সুহ্মত্ব লাভ করেন। আদিতে গৌড় ও সুহ্ম একটি পয়ঃ প্রণালীর ব্যবধানে পাশাপাশি দুইটি দ্বীপ ছিল। গোপালক এবং মহিষীপালকগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ দ্বীপটি সর্ব্বপ্রথমে অধিকৃত হওয়ায় উহার নাম হইয়াছিল "গৌড়"। আর পশ্চিম পার্শ্বস্থ দ্বীপটি তুর্ব্বসুর বংশধরগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় উহার নাম হয় "সুহ্ম"। বলি-রাজ পুত্র সুহ্ম কর্ত্তৃক ঐ দ্বীপ অধিকৃত হইলে পরে সুহ্ম বংশীয় (যবন বংশীয়) চারিটি শাখা পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল দাক্ষিণাত্যে যাইয়া নিজ নিজ নামে চারিটি রাজ্য স্থাপন করেন। এইসময় হইতে যবন বংশীয় সুহ্মগণ প্রসুহ্ম এবং বলিরাজ পুত্র সুহ্মের বংশধরগণ "সুহ্ম" আখ্যা লাভ করেন।

বলিরাজা ছিলেন যযাতিরাজার অপর পুত্র পুরুর বংশধর। যযাতি রাজা পুরুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই নিজ রাজ্য দান করেন। পরে যদু তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তে দেববংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ঋষি বৃহস্পতি ছিলেন এই দেব বংশেরই রাজগুরু। রাজা পুরু রাজ্যচ্যুত হইয়া পুত্র জন্মেজয়সহ পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্তে আসিয়া তথাকার নাগবংশীয়দিগকে আসাম (অসম) প্রদেশে বিতাড়িত করেন এবং পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্তে দৈত্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই জন্মেজয় রাজার নাগযজ্ঞ নামে খ্যাত। পুরুরাজার পুত্র জন্মেজয় এবং রাজা পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের মধ্যে কোন কোন স্থলে সামঞ্জস্য থাকায় মহাভারতকার পাণ্ডব বংশের গৌরব রক্ষার্থে দুই জন্মেজয়ের মধ্যে একটা বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুরাজার পুত্র জন্মেজয় নাগবংশীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, আর রাজা পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় নাগবংশীয়গণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে পরবর্ত্তীকালে শৈশুনাগ বংশের উত্থানলাভ ঘটে।

বলিরাজার স্ত্রীর নাম ছিল রাণী সুদেষ্ণা। ইহার গর্ভে এক মাত্র কন্যা (মহীরাবণের শাশুড়ী) জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু একটিও পুত্র না জন্মায়, রাজা জন্মান্ধ দীর্ঘতমা ঋষিকে আনয়ন করিয়া রাণীর গর্ভে পুত্রদান করিতে অনুরোধ করেন। এই দীর্ঘতমা ঋষি ছিলেন ভরদ্বাজ ঋষির বৈপিত্রেয় ভ্রাতা; অর্থাৎ মমতাদেবীর গর্ভে দেবর বৃহস্পতি ঋষির ঔরসে ভরদ্বাজ ঋষির জন্ম হয়, আর স্বামী উতথ্য ঋষির ঔরসে দীর্ঘতমা ঋষির জন্ম লাভ ঘটে। দীর্ঘতমা ঋষির স্ত্রীর নাম ছিল প্রদ্বেষী। প্রদ্বেষীর গর্ভে গৌতমাদি ঔতথ্যগণের জন্মলাভ ঘটে।

বলিরাজা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ঋষি তাঁহার মহিষীর গর্ভে পুত্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। তৎপরে রাজা রাণীকে ঋষির সেবা করিতে আদেশ দেন। রাণী স্বয়ং ঋষির নিকট গমন না করিয়া তাঁহার পরিচারিকাকে ঋষির নিকট প্রেরণ করেন। পরে রাজা ঐ বিষয় অবগত হইয়া রাণীকে তিরস্কার পূর্ব্বক ঋষির সেবায় নিয়োজিত করেন। ফলে রাণীর গর্ভে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপুত্রের জন্মলাভ ঘটে, আর পরিচারিকার গর্ভে কাক্ষীবান প্রভৃতি একাদশ পুত্রের জন্ম হয়। এই একাদশ পুত্র আশ্রমে প্রেরিত হইয়া তথায় তপঃপ্রভাবে (বিদ্যা-অনুশীলন দ্বারা) ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চজন রাজার রাজ্যে গণ-পতিত্ব লাভ করেন এবং ইহারা গৌতম ঋষির সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া ঔতথ্য আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এই ত গেল চতুর্দ্দশ মনু হইতে পরশুরামের আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত গণতন্ত্রের এবং রাজতন্ত্রের কথা।

আদি মনু বা বৈবস্বত মনু হইতে চতুর্দ্দশ মনু পর্য্যন্ত রাজদণ্ড বা শাসনতন্ত্র ছিল রাজার হাতে। রাজা গণ-পরিষদের মনোনীত সাতজন ঋষির উপদেশানুসারে রাজ্য পরিচালনা করিতেন। ঐ সাতজন ঋষি "সপ্তর্ষি" নামে পরিচিত হইতেন। বিভিন্ন মনুর সময়ে বিভিন্ন ঋষি সপ্তর্ষি মধ্যে গৃহীত হইতেন।

এইবার রামায়ণের যুগে আসা যাক। রামায়ণের যুগে পরশুরামের প্রভাবে শূদ্রজাতির সৃষ্টি হয়। এবং শূদ্রগণও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার প্রয়াস পান। তাহার পূর্ব্বে ঋষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভের প্রয়াসী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণের মনে হিংসার উদ্রেক হয়, এবং দলে দলে রাজসমীপে বিচারের প্রয়াসী হইতে থাকে। এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ নিজ পদস্খলিত হইতে আরম্ভ করে আর ঐ সঙ্গে ক্ষত্রিয় প্রভাব ও প্রজাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। পরে মহাভারতের যুগে ব্রাহ্মণশক্তি রাজশক্তির ছায়া আশ্রয় করিয়া চাকুরীজীবীতে পরিণত হয়। আর যবন বা অনার্য্যশক্তি ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের প্রয়াসী হন। কাজেই এই সময় হইতে ব্রাহ্মণ গণনায়কের পরিবর্ত্তে মন্ত্রীত্ব পদ লাভ করেন। আর শূদ্রগণ দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া "দাস" উপাধিতে ভূষিত হন। তাহার ফলে দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কাজেই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহাজ্ঞানী ও মহাযোগী বিদুর দাসী গর্ভস্থ সন্তান বলিয়া এই যুগে ব্রাহ্মণত্ব ত দূরের কথা ক্ষত্রিয়ত্বও লাভ করিতে পারেন নাই।

এই বার একবার দাক্ষিণাত্যে যাওয়া প্রয়োজন। দাক্ষিণাত্যে প্রথমে যবন-সংস্কৃতি (বৃষলত্ব প্রাপ্ত আর্য্য

সংস্কৃতি) গমন করিয়া পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল এই চারিটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই সময় হইতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যবন সংস্কৃতিই প্রচলিত ছিল। কাজেই সেখানে ব্রাহ্মণত্বের কোন বালাই ছিলনা। পরে পরশুরামের প্রভাবে এই যবনগণ দাসত্ববৃত্তি লাভ করিয়া "বানর" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন (বা দাসত্ব বরণ কারী মানব ; নর শব্দের অর্থ সর্ব্বজন সুবিদিত)। ঐ প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে হনুমান (হূণমান) শব্দে পারশ্য দেশীয় বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় এবং জম্ববান শব্দে জম্বুদ্বীপের অধিবাসী। কর্ণাট প্রদেশে এখনও বহু জম্বুজাতির বসবাস আছে। ঐতিহাসিক গণের মতানুসারে জানা যায় যে, ভারতে আর্য্য প্রভাব আবির্ভাবের পূর্বেই ঐ সকল জাতি ভারতে আসিয়া নানা স্থানে বসবাস করিয়াছিলেন। নাগবংশীয় ক্ষত্রিয় গণও আর্য্য-আবিভাবের পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্য গমন করেন এবং তথায় যাইয়া কেরল রাজ্য জয় করেন। তৎপরে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া তথায় বসবাস করান। এবং তাঁহাদিগকেই গণপতির আসন দান করেন। এই সময় হইতেই দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আর্য্য সংস্কৃতির আবিভাব ঘটে। ঐ ব্রাহ্মণ্য প্রভাব এখনও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যথেষ্টই রহিয়াছে। যেমন জন্ গান্থার বলেন— "Madras is the home of two things, First of most of the intelectuals of India, second of Hinduism in its most intensive form...... Ninety per cent ot the news-paper men in India Brahmans even of English paper like the statesman and Times of India (Inside Asia, p, No 419)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তে পারস্য দেশীয় গৌরমতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের প্রভাব কিছুটা বর্দ্ধিত হয়। অপর দিকে আবার এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ নিজ অস্তিত্ব ভূলিয়া গিয়া ক্ষত্রিয় প্রভাব অধিকার করিতে সচেষ্ট হন। তাহারই ফলে শুণক বংশীয় ব্রাহ্মণ আধিপত্য বিস্তৃত হয়। আর অপর দিকে বৈশ্যগণ গৌর মতাবলম্বী পারস্যদেশীয় ব্রাহ্মণগণের শিষ্যত্বলাভ করিয়া ক্রমশঃ ক্ষত্রিয় প্রভাব হস্তগত করিতে আরম্ভ করেন। ফলে কালক্রমে গুপ্ত বংশের অভ্যুত্থান ঘটে।

পারস্যদেশীয় ব্রাহ্মণ এবং এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে ক্ষত্রিয় তনয় মহাবীর পার্শ্বনাথ গণপতিত্ব লাভ করিতে যত্নবান হন, আর ঐ সঙ্গে ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্পূর্ণরূপে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। তাহার ফলে এদেশে পুনরায় অরাজকতার সৃষ্টি হয়। তাহা দেখিয়া অপর ক্ষত্রিয়তনয় বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ মতের সহিত নিজ মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিবার প্রয়াস পান। এই সময় হইতে প্রজাশক্তি ক্রমশঃ বল সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহারই ফলে হর্ষবর্দ্ধন ও পাল বংশের উত্থান লাভ ঘটে। ভূতপূর্ব্ব অনুপযুক্ত রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বর্দ্ধন সাম্রাজ্য এবং পাল সাম্রাজ্য প্রজাগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে প্রজাশক্তি এতই বলবান হইয়াছিল যে, দিব্বক ও তৎ-ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের নায়কত্বাধীনে প্রজাগণ পালবংশীয় রাজা রামচন্দ্র পালদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় রাঢ়ে (বর্ত্তমান রাঢ় প্রদেশে) খেদাইয়া দিয়াছিলেন। পরে রামচন্দ্রদেব সামন্ত গণের সাহায্যে পুনরায় সিংহাসন লাভ করিয়া বর্ত্তমান সাহুল্লাপুর ঘাট ও মধুঘাটের মধ্যে আদি ভাগীরথী তীরে (আদি রাঢ়ে) রামাবতী নামে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন।

তৎকালীন প্রজাগণ হর্ষবর্দ্ধন বা গোপাল দেবকে সভাপতিত্ব দান করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদিগকে রাজসিংহাসনই দান করিয়াছিলেন। কৈবর্ত্তরাজ ভীমও সিংহাসনই লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সহিত প্রাচ্য গণতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে। ভারতবাসী কোনদিনই রাজদণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চাহে নাই। ইহার পরেও অনুরূপ উদাহরণ যথেষ্ট মিলে।

গৌড়ের বাদশাহ মুজঃফর শাহ হাবসীর (১৪৯২—১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ) অত্যাচারে বঙ্গদেশের জনসাধারণ যখন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা আলা উদ্দীন সৈয়দ হুসেন শাহকে গণপতিত্ব দান পূর্ব্বক মুজঃফর শাহের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এবং তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ

মধ্যে অবরুদ্ধ রাখিয়া হত্যা করেন। পরে গণতন্ত্র প্রভাবে হুসেন শাহ সিংহাসন লাভ করেন। তাহার যথেষ্ট সমর্থনও মিলে। যেমন—"সৌভাগ্যবংশ পরিচালিত হইয়া অতঃপর তিনি বাঙ্গলার রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সকল শ্রেণীর মুসলমান সামন্ত এবং হিন্দুরাজগণ তাঁহাকেই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করেন।" (বিশ্বকোষ বঙ্গদেশ, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

হুসেন শাহ সিংহাসন লাভ করিয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্রীত্ব দান করেন। শ্রীশ্রীরূপ ও সনাতনভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারই দরবার গৃহ আলোকিত করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য মতানুসারে রাজ্য পরিচলনা করার ফলে ১৪৯৮ হইতে ১৫২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসে এরূপ রাজত্বকাল অতি বিরল। ব্রাহ্মণ্য মতবাদকে বাদ দিয়া বৈদেশিক মতবাদ অনুসারে ভারতে সুশৃঙ্খলাভাবে রাজ্যশাসন অসম্ভব। এমন কি ব্রিটিশ শাসকগণও ব্রাহ্মণ্য শাসনতন্ত্রকে বাদ দিতে সাহস করেন নাই।

আমাকে পুনরায় রামায়ণের যুগে যাইতে হইল। রাজা হরিশ্চন্দ্র যখন ঋষি বিশ্বামিত্রকে নিজরাজ্য দান করিয়া কাশীধামে গমন করেন, সেই সময়ে অযোধ্যা-রাজ্যের প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে অনুগমন করিয়া অযোধ্যাকে শ্মশানে পরিণত করেন। ইহা কি গণতন্ত্রের প্রভাব নহে? আবার শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিলে, অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ তাঁহাকেও অনুগমন করিতে থাকেন, ফলে ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়া পাদুকার প্রতিনিধিত্ব করিতে বাধ্য হন। ইহাও কি গণতন্ত্রের প্রভাব নহে? প্রজার কথায় শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা কি গণতন্ত্রের মধ্যে গৃহীত হইতে পারে না? এ স্থানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালের গণতন্ত্রবাদ মহাত্মাজীর রামরাজত্বের গণতন্ত্রবাদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানে ভারতে যে আকারে গণতন্ত্রবাদ চলিতেছে, সে আকারে যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতে ক্রমশঃ দুর্নীতি-রাক্ষস বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এবং শেষে দুর্নীতি-দৈত্য মহাত্মাজীর রামরাজত্বকে গ্রাস করিয়া রাবণ রাজত্বে (যথেচ্ছাচারে) পরিণত করিবে। বৈদেশিক লেখকও বলিয়াছেন,—"The Brahmans in their more intellectual professions are extraordinarily dominant in India considering their number. There are only about 9,000,000 or 10,000,000 Brahmans in all, but they control the politics of the conntry." (Insiha Asia page No. 437).

উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতের শাসনতন্ত্র কিছুটা পরিমাণে ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই পরিচালিত হইতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে বৈদেশিক নীতিতে পরিচালিত হইতেছে বলিয়াই বোধ হয় আজও স্বাধীন ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচিতেছে না। যেমন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

বাঙ্গালা দেশের অবস্থা আরও জটিল। আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ রাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্ত-বাসীগণ (বাঙ্গালী সমাজ) নিজেদের সুখশান্তি বিলোপের ভয়ে কোন দিনই পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে নাই। এই কারণেই পূর্ব্ব-আর্য্যাধিপতি (বর্ত্তমান মূল গঙ্গা ও বড় গঙ্গা অর্থাৎ মিথিলার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত নিমতিতা বা ছাপঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গার স্রোতধারাই তৎকালীন পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্ত ও পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের সীমা রেখা) মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব এবং তাঁহার অনুগত অনুচর গৌড়াধিপ শশাঙ্ক গুপ্ত (নরেন্দ্র গুপ্ত) হর্ষবর্দ্ধনকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। এবং এই কারণেই বাদশাহ হুমায়ুন ও শের শাহকে দিল্লীর রাজপাট সাময়িক ভাবে গৌড়ে আনিতে হইয়াছিল। এমন কি প্রত্যেক বাদশাহ বা নবাবকে বাঙ্গালার শাসনতন্ত্র বাঙ্গালীর হাতেই দিতে হইয়াছিল। যাহার ফলে পরবর্ত্তীকালে পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজ রাজা মহারাজাতে পরিণত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশ (উভয় বঙ্গই) পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ায় দিন দিন যেন তাহার আত্ম-সংস্কৃতির ও আত্ম-মর্য্যাদার বিলোপ ঘটিতেছে। ইহার সমর্থনও মিলে। যেমন, দিল্লী পত্রিকা "ইন্দ্রপ্রস্থের" শ্রদ্ধেয়

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার 'সম্পাদকীয় উক্তির মাধ্যমে বলিয়াছেন—"ভারতীয় জীবন প্রবাহ থেকে বঙ্গদেশ আজ বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন। জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে নেতৃত্ব করার দিন আমাদের দীর্ঘকালের জন্য গত হয়েছে। এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ অর্থাৎ সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর, কোনও বাঙ্গালী কংগ্রেসের সভাপতি হন নি। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দী ভাষাভাষী উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্য। এ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীর মুখ্য ভূমিকা নেই। ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান নগণ্য। বাংলার সম্পদের অধিকারী বাঙ্গালী নয়। হবার কোনও সম্ভাবনাও নেই। (ইন্দ্রপ্রস্থ শীতসংকলন,১৩৭০, ২য় পৃষ্ঠা)।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের অবস্থা আরও ভয়াবহ। সে দেশে হিন্দু-মুসলমান একযোগে মিলিতভাবে সর্ব্ববিষয়ে মুসলমান রাজত্বের প্রথম হইতেই রাজ্য শাসন করিয়া আসিয়াছেন। তাহারই ফলে "বারভূঁইয়া" নামে হিন্দুমুসলমানের মিলিত শক্তি ঐ প্রদেশকেই কেন্দ্র করিয়াছিল। সে প্রদেশে হিন্দু মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ একই ধারায় প্রবাহিত হইত। এহেন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত পবিত্র ক্ষেত্রকে পশ্চিমা রাহু গ্রাস করিয়াছে। তাহারই ফলে ঐ প্রদেশে আজ রাজত্বের নামে অরাজকতা চলিতেছে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালে রাজা সীতারাম তাঁহার শিক্ষাগুরু ফকির মহম্মদ আলির নামে নিজ রাজধানী (বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুর) স্থাপন করিয়াছিলেন, ঐ ফকিরই তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার প্রধান সেনাপতিও ছিলেন মুসলমান। তাঁহার নামছিল মেনাহাতী ঐ ফকিরের সুমন্ত্রণা গুণে এবং মেনাহাতীর পরাক্রমে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সামন্তগণের মধ্যে দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিলেন। আবার অপর পক্ষে মুর্শিদকুলী খাঁ ঐ প্রদেশের হিন্দু সামন্ত গণের সহযোগীতায় সীতারামকে শূলে বিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এস্থানেও দেখা যাইতেছে যে উভয় পক্ষই হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তি দ্বারা জয়ী হইয়াছিলেন। রাজা সীতারাম মুসলমান শক্তির বলে সর্বশ্রেষ্ঠ সামন্তপদ লাভ করিয়াছিলেন আর নবাব মুর্শিদকুলী সীতারামের সৌভাগ্য বিদ্বেষী অপরপর হিন্দু সামন্তগণের প্রযত্নে সীতারামকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন মুসলমান বাদশাহ বা নবাব মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, তাই বলিয়া একেবারে হিন্দুর বিনাশ করিতে চাহেন নাই। এমন কি এমনও প্রমাণ মিলে যে, যেসকল বাদশাহ বা নবাব হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহাদের সভার গৌরব বৃদ্ধি করিত হিন্দু পরিষদ। যেমন—"পূর্ব্বে মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল, মুর্শিদকুলী এক্ষণে উহাকে বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত করিলেন এবং স্বীয় জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁকে উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। এখন তিনি বিশ্বাসী হিন্দু আমিনগণের দ্বারা প্রত্যেক চাকলা ও মৌজায় রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।...তিনি ভূপতি রায় ও কিশোর রায় নামক দুইজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে কোষাধ্যক্ষ এবং মুন্সীর (Private secretary) পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাব বদ্ধমূল করেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার বঙ্গশাসন কালে এদেশে জমিদারগণের পনর আনা হিন্দু ছিলেন।" (বিশ্বকোষ মুর্শিদকুলী খাঁ)

এই মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ভারতেশ্বর ছিলেন ঔরঙ্গজেব। নিজ ধর্ম্মের গোড়ামীর দিক দিয়া উভয়েই সমান ছিলেন। তথাপি মুর্শিদকুলী খাঁ নিজ রাজ্য পরিচালনার জন্য উল্লিখিত বিধিব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী নবাব সুজা খাঁ যশোবন্ত রায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থায়ী রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে দেখা যায়, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নবদ্বীপাধিপতি (অনুমান, তৎকালে মাটীয়ারী হইতে মায়াপুর পর্য্যন্ত নবদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। এবং অবসর সময়ে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আনিয়া বন্দী করিয়া রাখিতেন, আর সন্ধ্যাকালে তাঁহার নিকট মহাভারত শ্রবণ করিতেন।· শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে বা বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে বকেয়া রাজস্ব সহ তাঁহাকে মুক্তিদান করিতেন। সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার আমিনগণের মধ্যে মোহনলাল এবং মহারাজ নন্দকুমারকে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু পরে রাজা হুজুরীমলের এবং অমীচাঁদের চক্রান্তে নন্দকুমারের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া

ছিলেন। পলাশীর ক্ষেত্রে পরাজিত হওয়ার ইহাও একটি কারণ। কারণ ঐ সময়ে নন্দকুমার পদচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। পরে মীরজাফর খাঁ পুনরায় তাঁহাকে নিজ দরবারে গ্রহণ করেন। নবাব মীরজাফর নন্দকুমারের সুযুক্তির বাহিরে কোন কার্য্যই করিতেন না। ঐ কারণেই মহারাজ নন্দকুমারকে হেষ্টিংসচক্রে পড়িয়া ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এদেশ "আমরা সবাই রাজা" হইবার দেশ নহে। কেননা এদেশ বহুভাষা, বহু সংস্কৃতি, বহু ধর্ম্ম, বহু রুচি ও বহু জাতিতে পূর্ণ।

ভারতের রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের যুগে প্রজার ভোটাধিকারের মাধ্যমে দলগত গণপতিত্ব লাভ হইত না। সে যুগে রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিয়া নিজ রাজ্যের সুপণ্ডিত জ্ঞানী, গুণী, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি বর্গকে লইয়া গণপরিষদ গঠন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইতেন, তিনিই ঐ গণপরিষদের গণপতিত্ব লাভ করিতেন। রাজা যন্ত্র চালিতের ন্যায় তাঁহার পরামর্শমত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এমন কি নিজ রাজ্যের বাহিরেও যদি সেরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সসম্মানে নিজ রাজ্যে আনয়ন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেন। পরবর্ত্তী কালে মুসলমান বাদশাহগণও ঐরূপ করিয়াছেন।

অনুমান, মহাত্মাজী পৌরাণিক পদ্ধতিতে গণপতি প্রস্তুতের উদ্দেশ্যেই বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা দান করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা সেভাবে গৃহীত হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা খানিকটা বৈদেশিক পরিকল্পনার অনুকরণে। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক মণ্ডলীকে চাকুরীজীবী না হইয়া বৃত্তিভোগী হইতে হইবে এবং শিক্ষায়তনগুলিকে আশ্রমে পরিণত করিতে হইবে। অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও আশ্রমকে সর্ব্বদার জন্য ভোগবিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে দূরে থাকিতে হইবে। তবেই ভারতোপযোগী গণপতির বিকাশ লাভ ঘটিবে। আর ঐ সঙ্গে আশ্রমে প্রতিপালিত শিষ্যবর্গ ব্রাহ্মণত্ব লাভপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেশে পুনরায় সুখশান্তি আনয়ন করিতে পারিবে। অনুমান যতদিন পর্য্যন্ত ঐ পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সংগঠিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতে সুখ-শান্তি আসিবে না।
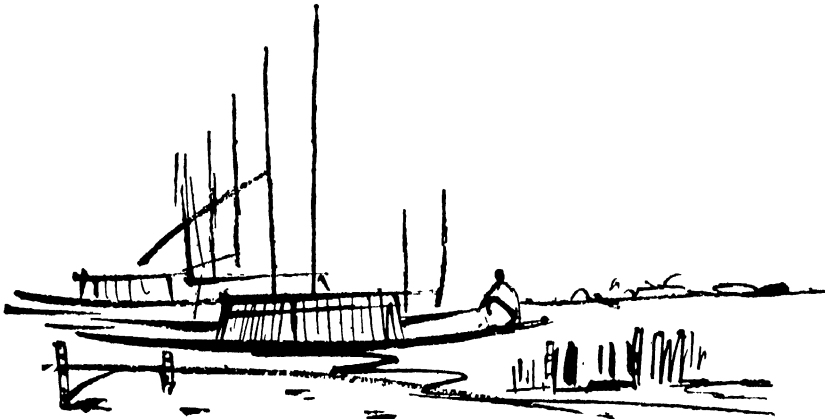
জহরলাল নেহরু

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রভাতের মত তুমি একদিন ছিলে অন্তরালে,
দুর্য্যোগ-ভয়াল রাত্রে অপেক্ষায় অশান্ত নির্ভীক।
এনে দিলে সূর্য্যোদয় শতাব্দীর দিক্‌চক্রবালে
আলোকের গতিপথ বেঁধে দিয়ে, জীবন পথিক!
গ্রহণের কালোছায়া কতবার মৃত্তিকার ভালে
পড়েছে করুণ হয়ে, হৃত করি' সোনালি প্রহর;
অভিনব সাধনায় সেই ছায়া তুমি যে মুছালে,
ভাঙা হালে তরী বেয়ে পাড়ি দিলে সমুদ্র দুস্তর!

'আনন্দ ভবন' হোতে একদিন পদযাত্রা তব,
লক্ষ লক্ষ মানুষের সহজাত অধিকার তরে।
সিংহের গর্জ্জন শুনি হওনিক ভয়ার্ত্ত নীরব,
সেদিন তোমাকে হেরি শিবাজীর কথা মনে পড়ে।
পলাশী প্রাঙ্গণ হোতে বেদনায় দিয়েছি বিদায়
যারে, অন্তরাগে করিয়া রঞ্জিত, তুমি তার লাগি
করেছ সংগ্রাম নিত্য,—জন্মভূমি হেরি মৃতপ্রায়,
তৃণপর্ণে পেতেছ আসন তব জনারণ্যে থাকি।

স্বপ্নের তরঙ্গে যারা আসিয়াছে সম্মুখে তোমার,
তুমি কি দেখেছ তারা দীর্ঘশ্বাসে ঢাকা! মৌন দিন
ক্ষুধায় তৃষায়? সমবেদনায় করি হাহাকার
ধ্যানের ভিতরে বসি করেছ কি মুক্তির সন্ধান?
কতদিন কত রাত্রি গেছে তব লৌহের প্রাচীরে—
সহস্র লাঞ্ছনা সহি! দেশ জননীর কথা ভেবে,
নিঃসঙ্গ একক স্তব্ধ রুদ্ধকক্ষে মনোবীণাটিরে
বাজায়েছ অবিরল অন্তরের দারুণ আক্ষেপে।

স্বাধীন ভারত তুমি রচিয়াছ গণতন্ত্র করি,
সংগ্রাম-মুখরতর সমগ্রজীবন। মোরা জানি
বিশ্বশান্তি মৈত্রী তরে দিনে দিনে সর্ব্বদুঃখ বরি
ভ্রমিয়াছ দেশে দেশে প্রচারিয়া অহিংসার বাণী।
আজ তুমি বহু ঊর্দ্ধে ধরণীর শ্রদ্ধা অর্ঘ্য লভি,
শতাব্দীর হে জ্যোতিষ্ক! এ ভারত তব তিরোধানে
মূর্চ্ছাহত। প্রাণের গোলাপে আর নাহিক সুরভি!
নেতৃত্ববিহীন জাতি, বিভীষিকা শঙ্কাতুর প্রাণে।

মৃত্যুরে করিনা ভয়

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

মৃত্যুরে করিনা ভয় শুনি তার সঙ্গীত মূর্চ্ছনা:
এ বুকে তা'রই তো গান—এ জীবনে তারই তো সাধনা।
মুছে দিয়ে ভুল ভ্রান্তি—দূর করি' মোহ আবেশতা
আনে সে সার্থক স্বপ্ন—জীবনের আনন্দ পূর্ণতা।
সে চির-প্রশান্ত ধীর – সুন্দরের মূর্ত্তি অপরূপ:
মৃত্যু কভু মৃত্যু নয়? জীবনের সে যে পূর্ণরূপ।
ফুল ফোটে ঝরে যায় এতেই সার্থক জন্ম তার,
প্রভাতের শেষে জানি সূচনা-সে আসন্ন সন্ধ্যার।

যে গান আরম্ভ হলো শেষ যদি নাহি তার হয়
কোথায় পূর্ণতা তবে? সার্থক সুন্দর সে তো নয়!
জন্মের নাহিকো শেষ—নেই শেষ কখনো মৃত্যুর:
মৃত্যুই সৃষ্টির ছন্দ,—জীবনের চিরন্তনী সুর।
হে মৃত্যু! হে জীবনের নব সংস্করণ!
নূতন আলোর স্পর্শে ঝেড়ে দাও যত পুরাতন।
রূপে, রসে, সুরে, গানে এ জীবন পূর্ণ হয়ে গেলে
ঝরিয়ে ফোটাও পুনঃ দাও তার রূপ শিখা জ্বেলে।

সার্থক সৃষ্টির স্বপ্ন—মৃত্যু তুমি অমৃত বারতা:
সৃজনী শক্তির ছন্দে—সঞ্জীবনী সুরে কও কথা।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ পথ নির্দ্দেশ ॥

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর অকস্মাৎ তিরোধানে আজ সারা পৃথিবী শোকমগ্ন। আর ভারতের ঘরে ঘরে, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে কর্ম্মের সর্ব্ববিভাগে এই মহাশোকের ছায়া পড়েছে। চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চও তাই আজ এই মহানায়কের জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে চির-বিদায়ের ক্ষণে শোকে অভিভূত। আজ দীর্ঘ সতের বৎসরের সুপরিচালনায় তিনি ভারতবর্ষকে এশিয়া তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। একদিকে জন-জীবনের মানকে উন্নত করবার চেষ্টা যেমন তিনি করে গেছেন, জনচিত্তের বা জনগনের মানসিক উন্নতির চেষ্টাও তিনি তেমনি করে গেছেন। আর প্রমোদশিল্পের বিশেষ করে জনচিত্তে চলচ্চিত্রের অসামান্য প্রভাব তিনি জানতেন বলেই এই প্রমোদশিল্পটির উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন, আর তারই প্রমান পাওয়া যায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রও। বিশেষ করে বাংলা চিত্র, প্রধান মন্ত্রীর এই অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মান ও পুরস্কার জয় করে এনে।

আজ তিনি নেই, কিন্তু যে আলো তিনি জেলে গেছেন, যে পথ তিনি দেখিয়েছেন, যে প্রেরণা তিনি দিয়েছেন তাই সম্বল করে ভারতীয় চলচিত্র এগিয়ে চলবে আরও উন্নতির পথে—আর জনতাকে শোনাবে শান্তির বাণী, দেবে কর্ম্মের প্রেরণা, সাধনায় একাগ্রতা। তাঁর আরব্ধ কার্য্য শেষ করতে, তাঁর মহান ব্রত উদ্‌যাপন করতে, জনতাকে প্রেরণা দিতে চলচিত্রও এগিয়ে আসবে সর্ব্বশক্তি নিয়ে এই আশাই আমরা করি।

তাঁর নিরপেক্ষতা নীতি, তাঁর ধর্ম্মসমন্বয়তা, তাঁর আন্তর্জাতিকতা, আর সর্ব্বোপরি তাঁর মহান উদারতার মধ্য দিয়ে যে পথের নির্দ্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রও সেই নির্দ্দেশ মেনে চলে অচিরেই বিশ্ববন্দিত হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

খবরাখবর :

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্ত্তী নতুন চিত্রটি হবে "ভারতনাট্যম্" নৃত্যের একটি প্রামাণ্য (documentary) চিত্র। প্রখ্যাতা ভারতনাট্যম্ নৃত্যশিল্পী বালাসরস্বতীকে এই অর্দ্ধ-ঘণ্টা ব্যাপি চিত্রে কয়েকটি অপূর্ব্ব নৃত্য প্রদর্শন করতে দেখা যাবে। সঙ্গীত-নাটক আকাদেমীর পক্ষে এই চিত্রটি মাদ্রাজে গৃহীত হবে।

এ ছাড়াও শ্রীরায় 'এসো' (Esso) তৈল কোম্পানীর জন্যে একটি পনের মিনিট ব্যাপী প্রামাণ্য চিত্র নির্ম্মাণ করবেন বলে জানা গেছে। আর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অশনি সংকেত" গল্পটিকেও চিত্রে রূপায়িত করবার ইচ্ছা তাঁর আছে।

* * *

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন্-এর জীবনীচিত্র "রাজা রামমোহন"-এর শুভ-সূচনা উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। বালক অভিনেতা তিলক, নীতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই চিত্রে অভিনয় করবেন।

* * *

আশাপূর্ণা দেবী রচিত কাহিনী অবলম্বনে পম্পি ফিল্মসের "দোলনা"-র শুভ-সূচনা অনুষ্ঠান হয়ে গেছে: পরিচালনা করবেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবং চিত্রনাট্যও রচনা করবেন তিনি। আর সঙ্গীত পরিচালনা করবেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

* * *

'অগ্নিবন্যা' চিত্রে মঞ্জু দে ও সন্ধ্যা রায়

চিত্রমন্দির-এর "সন্ধ্যাদীপের শিখা"-র চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়ে গেছে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে। নায়িকার ভূমিকায় আছেন সুচিত্রা সেন এবং নায়ক ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজরের ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিকাশ রায়।

*   *   *

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কাহিনী অবলম্বনে কে, এম, বি, পিক্‌চার্স "নিশিযাপন" নামে একটি চিত্র নির্মাণ করছেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন অসিতবরণ, সন্ধ্যারাণী, তরুণকুমার, সুমিতা সান্যাল, কমল মিত্র, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি।

*   *   *

ফাল্গুনী চিত্রের "অশ্রু দিয়ে লেখা" চিত্রের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। পরিচালনা করছেন অমল দত্ত এবং নায়ক নায়িকার ভূমিকায় আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস। অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে রূপদান করবেন অনুভা গুপ্ত, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল প্রভৃতি।

*   *   *

অগ্রদূতগোষ্ঠী পরিচালিত "অন্তরাল" চিত্রের চিত্রগ্রহণ এগিয়ে চলেছে। অভিনয়াংশে আছেন যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অনুপকুমার, তরুণকুমার, বিকাশ রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী প্রভৃতি। প্রযোজনা করছেন পরশমল দীপচাঁদ।

*   *   *

রাজীব পিক্‌চার্স-এর "দিনান্তের আলো"-র স্যুটিং চলছে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর রায় প্রভৃতি অভিনয়াংশে আছেন। নেপথ্য সঙ্গীত গাইছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে। ছবিটি পরিচালনা করছেন মঙ্গল চক্রবর্তী।

*   *   *

আর, ডি, বনশল্-এর প্রথম ভোজপুরী চিত্র "Morey Man Mitwa-"র কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। চিত্রটি বাংলা ও বোম্বাই-এর শিল্পীদের সমন্বয়ে কলিকাতাতেই নির্মিত হবে। কুমারী নাজ, সুধীর ও সুজিতকুমার, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, অনুভা গুপ্ত এবং হেলেনকে এই চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করতে দেখা যাবে।

*   *   *

ডঃ বিশ্বনাথ রায়ের একটি উপন্যাস অবলম্বনে "প্রভাতের রঙ" নামে একটি চিত্র নির্মাণ করেছেন এস, এম, পিক্‌চার্স। নায়ক-চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ

রঙমহল থিয়েটারে চলতি নাটক "স্বীকৃতি"র একটি ভূমিকায় সরযূবালা দেবী

এবং অন্যান্য ভূমিকায় আছেন শর্মিলা ঠাকুর, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি। আর সঙ্গীতে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

* * *

কালিকা ফিল্মস-এর "মরুতৃষা" চিত্রটি এখন মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। প্রধান চরিত্র দু'টিতে রূপদান করেছেন অসিংবরণ ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য চরিত্র-গুলিতে আছেন রবীন মজুমদার, তপতী ঘোষ, বিপিন গুপ্ত, নীতিশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

ভারত সরকারের ফিল্ম-ডিভিসন্ ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ১৭০টি চিত্র নির্মাণ করার আশা রাখেন। এই চিত্রগুলি প্রামাণ্য, নির্দেশমূলক, শিক্ষামূলক, সাপ্তাহিক সংবাদমূলক, কার্টুন প্রভৃতি নানা ধরনের হবে। এমন কি টেলিভিসন্ চিত্রও খুব সম্ভব নির্মাণ করার চেষ্টা করা হবে।

* * *

দেশে বিদেশে ঃ

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ এবং সেলুকাস-কন্যা হেলেনের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ প্রভৃতি বিষয়বস্তু নিয়ে "আলেকজাণ্ডার এণ্ড চাণক্য" নামে একটি ভারতীয় চিত্র নির্মিত হবে বলে জানা গেছে। হেলেনের ভূমিকার জন্য কোনও ভারতীয় অভিনেত্রীকে না নিয়ে পোলিশ অভিনেত্রী শ্রীমতী বীটাকে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং তাঁর বিপরীতে চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় অভিনয় করবেন প্রদীপকুমার।

* * *

"Love in Tokyo" নামে সর্বপ্রথম একটি বায়বহুল হিন্দী চিত্র ইষ্টম্যান কলারে জাপানে তোলা হবে: প্রধান চরিত্র দু'টিতে থাকবেন জয় মুখার্জী ও আশা পারেখ। তাছাড়া খ্যাতনামা অভিনেতা প্রাণ-এর বিপরীতে একজন জাপানী অভিনেত্রীও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবেন। জাপানে জন্মগ্রহণ করে বেড়ে উঠেছে এরকম একটি ভারতীয় তরুণীর ভূমিকায় আশা পারেখ

অভিনয় করবেন, যে পরে জাপানে আগত একজন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ যুবকের (জয় মুখার্জী) প্রেমে পড়বে।

* * *

Columbia-র "Major Dundee" চিত্রে অভিনয়রত বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা Charlton Heston জানিয়েছেন যে ঐ ছবিতে অভিনয়ের জন্য তাঁর প্রাপ্য অর্থ তিনি ষ্টুডিওকে ফেরং দেবেন। কারণ তাঁর কল্পনা অনুযায়ী কয়েকটি দৃশ্যের জন্য এগারদিন ও বাজেটের বাইরে ৩০০,০০০ ডলার খরচ হয়ে গেছে। হেসটন্ বলেছেন যে অভিনেতাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক হিসাবে অপবাদ আছে। খুব সম্ভব সেই অপবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তিনি এই প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রাপ্য অর্থ কত তা জানা যায় নি, তবে অনেকে মনে করেন ঐ ৩০০,০০০ ডলারের কাছাকাছিই হবে।

—

ছায়া-ছবি নির্দেশনায় নব-নায়ক সত্যজিৎ

প্রমোদরঞ্জন পাল

"Veni Vidi Vici—এলাম, দেখলাম, জয় করলাম! চলচ্চিত্র রঙ্গ মঞ্চে পরিচালকের ভূমিকায় সত্যজিতের আবির্ভাবও তেমনি আকস্মিক। বিজেতার মুকুট পরেই তাঁর আবির্ভাব।

সত্যজিতের নির্দেশনার মুন্সীয়ানা নিয়ে আলোচনা সমালোচনার অনেক জল গড়িয়ে গেছে হাওড়াব্রীজের নীচ দিয়ে। কিন্তু তাঁর ছায়াকৃতির বিবর্তন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

রূপালীপর্দায় 'পথের পাঁচালী' যখন ছায়া ফেলল, তার স্নিগ্ধ রূপালীরশ্মি মনের অন্তরতম প্রদেশে সাড়া জাগাল। চোখ ধাঁধাঁনো নয়, তবু বিদগ্ধ-সমাজ ঝলকে উঠলেন উচ্ছ্বাসে। (কিন্তু সাধারণের মন মজাতে পারল না সংযতশ্রী গ্রেমারহীন ঘরোয়া নবাগতা মেয়েটি) সত্যজিতের চিত্রনির্দেশনাকে যারা আড়চোখে দেখেন,—তাদের প্রধান নালিশ হল—"অত্যন্ত নীরস সৃষ্টি।" নাটকীয় উত্তেজনা নেই, 'গানা' নেই, বাজনাভি নেই—এ আবার কি ধরণের খেল্? এটা অবশ্য অনভ্যুচর্চিত অপটু-মন দর্শকদের কথা। তবে সাধারণ দর্শকদের কথা ছেড়ে দিলেও একথা সত্যি যে রোমান্টিক ভাববিলাসের মোহ আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। অবাস্তব মানন-কামের মূঢ়তায় এখনও আমরা মজে থাকতে চাই। আমরা যেন এখনও শিশু! চিনি ও সন্দেশের স্বাদগত পার্থক্য এখনও আমাদের কাছে অভিন্ন। আমাদের রুচি-মানস এখনও অপরিশিলীত। রসগোল্লায় চিনির তীব্রস্বাদ নেই বলে চিনির লাড্ডু আমাদের কাছে অধিকতর প্রিয়!

এই বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠ যুগে ভাবালুতার মূল্য কমে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ মানসিক অসম কৌণিকতাকে মসৃণতর করে বলিষ্ঠতর সত্যের মধ্যে গতি-দান করছে এ কথা আমরা জানি। ষ্ট্রীমলাইনের রূপ হল গতির রূপ—গতির সহজীকরণের রূপ (সিম্‌প্লি-ফিকেশন্)।

এই সিম্‌প্লিফিকেশন্ বর্তমান জীবনায়নে অতি প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন অনুসরণ করেই শিল্প-কলা, সাহিত্য, জীবন-নির্বাহ সব কিছু রূপ নেবে।

তাই চোগা-চাপকানের বাবুয়ানা, বাজুবন্ধ—কঙ্কণের বিবিয়ানার রাজত্বের অবসান হল। এই সহজীকরণের যুগে সে যুগের অতিকরণের মুরুব্বিয়ানাকে এখনও তক্তে বসিয়ে রাখতে এত আগ্রহ কেন? সংস্কার? কিন্তু এই স্থিতিশীলতার জন্যে নিরুদ্ধ জীবন ত ধ্বংস হয়ে যাবে। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই গতি—চলমানতা। গতির রূপ হল চির নূতনের,—বিজ্ঞানের, সৃজনের, অনাগতের জন্মদাতা সে। প্রাচীন সংস্কার তার নড়বড়ে সিংহাসন আঁকড়ে, ন্যাকামীর সহায়ে কতদিন বাঁচতে পারে? বর্তমানের লীলাকাণ্ডে ওর ভূমিকা হয়েছে ভাঁড়ের। এখনও রাজবেশ পরে প্রচণ্ড বিক্রমে ওর ভোঁতা তরোয়াল ঘুরিয়ে বীরত্ব ফলাচ্ছে। আর আমরা উল্লসিত হয়ে 'বহুত খুব' বলে হাততালি দিচ্ছি। ওটা যে আনন্দ দেওয়ার জন্য কাতুকুতু দিচ্ছে তা আমরা বুঝতেই পারি না।

তারপর একটি সাধারণ মানুষ যখন আটপৌরে সাজে

আসরে এসে দাঁড়াল—তার পোষাকে আড়ম্বর নেই, ব্যবহারে আতিশয্য নেই, আস্ফালন নেই। এই সহজ মানুষটিকে দেখে জরাগ্রস্ত সংস্কারাশ্রয়ী মন বলে উঠল আরে রাম কহো, একেবারে ফিঁকে—'তার' নেই।

না,—চৌচির চীৎকারের 'তার' নেই এতে। তাই বলি সত্যিকারের তার নেই কি কিছু এর?

সত্যজিৎ রায়ের সবাক চিত্রকলাকে আতিশয্য বর্জ্জিত গতিধর্মী (Streamlined) শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আজকের দিনে আমাদের রুচি বৈজ্ঞানিক কারণে বাহুল্য বর্জ্জিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি ছবি বিচার করা যায়, তবে যে একটি সত্যে পৌছা যায়, তা হচ্ছে—জোর জবরদস্তি বরবাদ কর। স্বাভাবিক যা তা-ই আজকের আর্টের পর্যায়ভুক্ত। ফলায়িত রং বাতিল কর। আড়ম্বরের রাংতা পরা রূপ বিবর্তিত সমাজ পরিবেশে হাস্যকর একথা আমাদের বোঝা দরকার।

জীবন-প্রবাহের সাদা মাঠা রূপকে ছায়াশিল্পের অঙ্গনে সত্যজিতই প্রথম অভ্যর্থনা জানান। এই নবধারার নবনায়ক তিনি।

তাঁর "পথের পাঁচালী"তে নাটকের আড়ম্বরপূর্ণ চমকানি নেই। তবে মর্মস্পর্শী সংবেদনা অথবা সূক্ষ্ম আবেদনের অন্ত নেই। তীব্রতার রৌদ্রদগ্ধ চীৎকার নেই—আছে ছায়া-নিবিড় মূক মর্মশিহরণ। বেতস-পত্রের মত সে-কাঁপছে—হেলছে-দুলছে।

ডোবার জলে অপু ঢিল ছুড়েছে · উঠেছে মৃদু তরঙ্গ। টলমলে জলে একটি পোকা নেচে উঠেছে ঢেউয়ের তালে তালে—দর্শকের মনে লেগেছে ঢেউয়ের দোলা। প্রশান্তিময় নির্বাক নির্মল সহজ চিত্র।

ছোট্ট অথচ গভীর। ছোট্ট অপু, ছোট্ট ঢেউ, ছোট্ট আনন্দ—অনির্বচনীয়, অভাবনীয়, অভূতপূর্ব।

যাত্রা দেখে আসা ছোট্ট অপু। মণিমাণিক্য (রাংতার বাক্স) অপহারক অপু। বাঁশের তরবারি আস্ফালনকারী গর্বিত অপু। রাংতার মুকুট-পরা সম্রাট অপু। দুর্গার আক্রোশ লাঞ্ছিত অসি হস্তে পলায়নপর ভীত অপু। যেন বেদনাময় , স্নিগ্ধ একটি হাসি—একটি চন্দন প্রলেপ।

হাসি-কান্নার চুমকি ছড়ানো সত্যজিতের অপূর্ব এই রাজমুকুট। কত সজীব—কত অন্তরঙ্গ—তরঙ্গভঙ্গ।

খাবার কাঁধে ফেরিওয়ালার পিছে পিছে গরীব দুর্গা—অপুর ঘুরে বেড়ানো, শিশুমনের গ্লানিহীন লোভের আলেখ্য, ধনী সখীর বিবাহ অঙ্গনে দুর্গার মুখে চোখে আনন্দ-নিরাশার দোলায়িত আলোছায়া, এমন সাবলীল গতিশীল বলিষ্ঠরেখ শিল্প সৌন্দর্য কম ছায়াচিত্রেই দেখা যায়। আলেখ্যটি এতখানি সজীব যে মনে হয় শ্রীযুত রায় সবাক চিত্র রচনায় উপন্যাসিক বিভূতিভূষণকেও যেন ছাড়িয়ে গেছেন।

টেলিগ্রাফের তারে অপুর গান শোনার আনন্দ—যারা ছোটবেলায় গ্রামে কাটিয়েছেন তাদের বাল্য-জীবনের ভুলে-যাওয়া দিনের পাতাগুলি দুরন্ত অপু দমকা হাওয়ার মত চোখের ওপর আচমকা মেলে ধরে। কি স্নিগ্ধ স্মৃতিসিঞ্চন! অবগাহন! নিঃশব্দ ঝোরার সুস্বাদ অনুভূতি। এতই গভীর যে একেবারে অবিশ্লেষ্য।

সূক্ষ্ম কারুতে, রূপকের অন্তর্লীন রেখায় 'অপরাজিত' অবশ্য "পথের পাঁচালী" থেকে পেছিয়ে নেই। কিন্তু সমগ্র সত্তার ঘনীভূত অন্তরঙ্গতায় 'পথের পাঁচালী', শ্রীরায় সৃষ্ট ছায়াশিল্পের অনন্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পথের পাচালীতে হরিহরের বাস্তু ত্যাগের পর তার পরিত্যক্ত ঘরের বিষাদখিন্নতা, পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ কুকুরের করুণ ক্রন্দনে মর্মস্পর্শী,এ শুধু যেন একটি বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস, মূক আবেদনের এমন অনুকল্প রচনা একমাত্র সত্যজিতের চিন্তারই অধিগত।

"অপরাজিত"র আর একটি রূপকাশ্রিত দৃশ্যের কথা বলছি। এটিও একটি দ্যুতিময় হীরকখণ্ড!

হরিহরের মৃত্যুশয্যা। মৃত্যু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

মরণোন্মুখকে রেখে সত্যজিৎ চলে গেলেন বাড়ীর ছাদে। একটি লোক পায়রা ওড়ানোর খেলা খেলছে সেখানে! পায়রাগুলো বসে আছে ছাদ-ছড়িয়ে!

হঠাৎ শব্দ হল ঝম্—সঙ্গে সঙ্গে পায়রাগুলো ঝাপট্ দিল পাখার, উড়ল আকাশে।

ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের ঝম্ শব্দ, আর সেই সঙ্গে পায়রার পাখা-ঝাপটানোর শব্দ—ধাক্কা দিল দর্শকদের বুকে—ধ্বক্ করে

উঠল বুক। বুঝতে বাকী রইল না যে হরিহরের আত্মা অনন্তের উদ্দেশে পাখা মেলেছে। রূপকের ভেতর দিয়ে অনুভূতির এই যে মর্ম উদ্‌ঘাটন তা ভারতীয় ছায়াচিত্রে অনন্যপূর্ব।

এ ধরণের অনেক রূপক তাঁর অন্যান্য চিত্রেও ছড়িয়ে রয়েছে।

"জলসা ঘরের" একটি দৃশ্যের কথা বলছি।···জমিদার। ছেলের বাড়ী ফেরার কথা নৌকোয়। জমিদার অপেক্ষা করে আছেন বাড়ীতে। ঝড় উঠল। জমিদার ঘরে বসে আছেন একা। সামনের গ্লাসে শিরাজী আদ্ধেক পড়ে আছে। হঠাৎ একটা ফড়িং গ্লাসের ভেতর লাফিয়ে পড়ল। ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল গ্লাসের ভেতর থেকে। কিন্তু পারল না। হাবুডুবু খেতে লাগল মদের পাত্রে।

চমৎকার রূপক।

পিতার শঙ্কিত মনে সন্তানের বিপদের ছায়াপাতের এই যে প্রজেকশন তা কতই অর্থপূর্ণ। একটুখানি ইঙ্গিতে কত বেদনা দায়ক একটি ঘটনার বিস্তৃত আবর্ত রেখাকে একটি পিন-পয়েণ্টে নিয়ে আসা হয়েছে। পরিকল্পনা, রচনার মৌলিকতা, অনুভূতি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার এমন পরিচয় অন্য কোনও চিত্র-পরিচালকের ভেতর তেমন দেখা যায়।

এখন আসা যাক্ "অপরাজিত"র কথায়। ছবিটি দুটি ভাগে দ্বিখণ্ডিত। প্রথমভাগে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট ও তার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে অপুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন। দ্বিতীয় ভাগে আবার তার গ্রাম্য পরিবেশে ফিরে যাওয়া ও কলিকাতার পাঠ্য জীবন। গ্রামে দাদামশাইয়ের পুরুতগিরির গণ্ডী ছাড়িয়ে অপুর আপন সত্বায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টায়, জীবনের একটা ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পূর্ণ আঙ্গিকের মধ্যে খণ্ড-যোজনা যেন দুর্বল মনে হয়।

সত্যজিতের "পরশ পাথর" সম্বন্ধেও অনেকের অভিমত অনুকূল নয়। এই বিপরীত অভিমতের কারণ দর্শকের দিক থেকে গল্পের মর্মার্থের অনুধাবন। গল্পলেখক পরশুরাম এই বই-খানিতে যে ব্যঙ্গ পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন, "পরশ পাথর" এর মত অবাস্তব একটি গল্প সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা পাঠকদের বা চিত্র দর্শকদের উপলব্ধি করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি। গল্পের বর্ম ভেদ করে মর্মে না পৌঁছতে পারার জন্যই এই বিপত্তি। ব্যঙ্গ যে শুধু ব্যঙ্গই নয় একথা প্রথমে জানা দরকার। আমার একথার প্রমাণ করবে চার্লি চ্যাপলিনের Modern times, line light ইত্যাদি। অবশ্য চার্লির এসব ছবি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, হাসি সবকিছু মিলে ভেতরের গভীরতর বেদনাকে চারপাশে ঘিরে রেখে চোখের আড়াল করার চেষ্টা করেছে—সেজন্য হাস্যকৌতুকগুলি আরও নিগূঢ় ভাবে মর্মান্তিক। কিন্তু পরশ পাথরের বেদনাপর্ব প্রান্তিক—অতটা কেন্দ্রগত নয়। তা হলেও তার ভেতরের তত্ত্বের উপর খানিকটা নজর নিবদ্ধ করতে না পারলে—লেখক ও চিত্রনির্দেশকের প্রতি পাঠক ও দর্শকরা যে অবিচার করে বসবেন তাতে সন্দেহ কি ?—তাই ব্যঙ্গের নিশানাটা কোথায় তা প্রথমে বোঝা দরকার।

পরশ পাথর বলে কিছু যে নেই সে কথা সকলেই জানে। তবে কেন এই অবাস্তব জিনিষের আমদানী করা হল। কথাটা হল এই—আমরা আলনাস্কার না হয়েও হঠাৎ ধনী বনে যাওয়ার—দিবাস্বপ্ন হামেশাই দেখে থাকি। এই লাখোটাকার স্বপ্নটা লাখোক্ষেত্রে মিথ্যা প্রমাণিত হয় একথাও আমাদের অজানা নেই।

স্বল্প-আয় কেরাণী—পরেশবাবুও এই স্বপ্ন দেখেন। ধনী হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণতম—এই অলীক আশা সম্ভব হল একটি অলীক আবিষ্কারে। "পরশ পাথর" কুড়িয়ে পেলেন পরেশবাবু।

মানুষের এই হঠাৎ ধনী হওয়ার মিথ্যা আশাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য এই মিথ্যা পরশ পাথরের আমদানী।

গল্পকারের দার্শনিক ভঙ্গীটি হল এই হঠাৎ ধনী হওয়া একটা দুরাশা—লাখোক্ষেত্রে নিরাশাকেই বরণ করতে হয় কিন্তু কেউ এই আলেয়ার পিছনে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ যদি সত্যি রাজা বনে যায়, তবে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যা কৌতুকের সৃষ্টি করতে পারে তার স্ফীতায়মান অবাস্তবতার বাষ্পরূপ সৃষ্টি করেছেন পরশুরাম।

হঠাৎ ধনী হওয়া যেমন অসাধারণ—পরশ পাথর

পাওয়াও তেমনি অসম্ভব—কাজেই পরশ পাথরকে পরেশবাবুর পেটের ভেতর মিথ্যা স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যেতে হল। এইখানেই অসম্ভবের সঙ্গে বাস্তবের রফা—অবাস্তব মানসকামকে বাস্তব জিজ্ঞাসার কাছে পরাজিত হতে হল এবং এভাবেই হল গল্পের সমাধান।

এটুকু বুঝিতে পারলে হাসির বিষয় বস্তু উপভোগ করার কোনও অসুবিধার কারণ থাকে না। গল্পকার ও চিত্রনির্দেশককেও তাঁহলে অবাস্তবতার অপবাদের আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না।

এবার ছবির কথা বলা যাক্। ছবিটির প্রধান গুণ যা স্বভাবতঃই মনকে আকর্ষণ করে তা হল স্পীড্—বিশেষ করে কতকগুলি দৃশ্যে, যেমন অফিস টাইমে কেরাণীকুলের ত্রস্ত কুইক্‌মার্চ্চের দ্রুত লয়। অচলায়তনের সঙ্গে দ্রুত লয়ের এই ব্যঙ্গ যোজনা হাস্যকর অথচ বেদনাদায়ক। পরেশবাবুর ভৃত্যের প্রবর্ধিত ব্যক্তিত্বে উর্দ্দি পরার গমক তান লয়, আধুনিক যান্ত্রিকতার বিড়ম্বনাময় কেতাদুরস্ত স্মার্টনেসের অতিকরণতা মর্মান্তিকভাবে হাস্যকর। এসব দৃশ্য হাস্যরসিক চার্লি চ্যাপ্‌লিনের মেসিন-সুলভ দ্রুততার হাস্যকর দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

"পথের পাঁচালী" বিশ্ব-বন্দিত হলেও স্বদেশের দর্শকদের তেমন আনন্দ দিতে পারেনি—এটা অনেকের মত। সেই জন্যেই বোধহয় পরশপাথরের মত নিছক হাসির ছবিতে সত্যজিৎ হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের অপরিমার্জিত মোটা বুদ্ধির খবর রাখেননি—তাই তাকে আবার আমাদের বুদ্ধির মাপে মার খেতে হল পরশপাথরের জন্য।

এরপর থেকে এক্সপেরিমেন্ট সুলভ মনোভাব তাঁর প্রতিটি চিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। তারপর আবার পরীক্ষামূলকভাবে তিনি যে ছবিতে হাত দিলেন, তার কাহিনী একটি তরুণীর বিড়ম্বনাময় জীবনের বেদনাদায়ক কাহিনী।—অন্ধ ধর্মোন্মাদের অদ্ভুত বিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে সংস্কারজড়িত তরুণীর আত্মবলিদানের এ কাহিনী। রূপালী পর্দায় দেবীর জ্যোতির্ময়ী রূপ নয়—এটা কুসংস্কারের একটা কালো আলো। আমি "দেবী" বইখানির কথাই বল্‌ছি।

বর্ত্তমানে এ ধরণের চিত্র নির্মাণের কোনও সার্থকতা ছিল বলে মনে করি না। বিদগ্ধজনও এ কাহিনী নির্বাচনে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

পুস্তক নির্বাচনে যদি প্রযোজক দায়ী হয়ে থাকেন, তবে সত্যজিৎ এ ধরণের চিত্রের নির্দেশনার দায়িত্ব নিতে গেলেন কেন বলা শক্ত। দুটি কারণ আমার অনুমান হচ্ছে। প্রথমটি নতুন গল্প নিয়ে experiment দ্বিতীয় কারণ সাগরপারে আমাদের কুসংস্কারের একটি অভিনব-রূপ দেখিয়ে অবাক করে দেওয়ার অভিসন্ধি। এই চিত্র-যোজনায় সত্যজিৎ গল্প নির্বাচনের বিচার ভ্রান্তিতে পড়েছিলেন বলেই মনে হয়।

তারপর এটা ওটার পর, দেখা গেল 'কাঞ্চনজঙ্ঘার' স্পর্ধিত শির তার শিল্প উপচারের ভেতর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মনস্তত্ত্ব, আধুনিক প্রেমের মূল্যায়ন—রীতি-নীতি, প্রগতি প্রভৃতি অনেক কিছুর আপেক্ষিক সূক্ষ্ম টানাপোড়েন বেশ জমজমাটভাবে এর ভেতর ঠাসাঠাসি রয়েছে। গম্ভীর অথচ আনন্দ নিষেকের তরলতা ও বৈচিত্র্যে বইখানি ভরপুর।

একটা বিরাট পটভূমিকার পারিপার্শ্বিকে চিত্রটি মঞ্জরিত হয়েছে।

কিন্তু জনসাধারণ এ ছবিটিও ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি।

কাঞ্চনজঙ্ঘার নামকরণ নিয়ে প্রথম প্রশ্ন ওঠে। এর উত্তরে সাধারণভাবে বলা চলে গগনস্পর্শী "কাঞ্চনজঙ্ঘার" মনোরম দৃশ্যতলে ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে বইখানার এই নাম দেওয়া হয়েছিল। এবং মনস্তত্ত্ব মূলক ব্যাখ্যা করলে বলা যায়—"কাঞ্চনজঙ্ঘা"র বিশালতার কাছে মানুষ যত বড়ই হোক্ তার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ছোট দেখায়। মিঃ ব্যানার্জির ব্যক্তিত্বের অহংকার কাঞ্চন জঙ্ঘারই মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল স্পর্দ্ধার সঙ্গে, কিন্তু সে অহংকার প্রতিহত হয়েছে, অবনমিত হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘার বিরাটত্বের কাছে—নবযুগের অভিযাত্রীদের অভীপ্সার কাছে সে অহঙ্কার পরাজিত হয়েছে, উন্মুক্ত অবাধ প্রকৃতির কাছে মন অবারিত হয়েছে, প্রেম স্বাধীন বিমুক্তিতে প্রসারিত হয়েছে। বন্ধন এবং মুক্তি এই দুই বিপরীত

ধর্মী মানস-কামের অপূর্ব সমন্বয় জটিলতর সমস্যার গ্রন্থি মোচন করেছে। মিঃ ব্যানার্জির যে স্পর্ধিত অহংকার কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল তার ব্যাকুল কণ্ঠের আহ্বানে সেদিন কেউ সাড়া দেয়নি, তাঁর কণ্ঠস্বর কাঞ্চনজঙ্ঘার কঠোর গাত্রে প্রতিহত হয়ে উপহসিত হয়ে ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত এই খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব নিয়েই মিঃ ব্যানার্জিকে ফিরে আসতে হয়েছিল দার্জিলিঙ ছেড়ে।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা"র জটিল রূপায়ণ ছেড়ে এবার আসা যাক্ "অভিযানে"।

"অভিযান" ভারতীয় চলচিত্র জগতে একটি নূতন অধ্যায়। আবার একটা নূতন Experiment, প্রেম বা যৌন আবেদন যা মানুষের মনকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে তারই চিত্ররূপনিয়ে নূতন এই পরীক্ষা—গতানুগতিকতার বাঁধা প্রণালী দিয়ে এর জল প্রবাহিত হয়নি। তাই এটা আচম্বিত প্রেমের চেয়ে স্বতন্ত্র। মানুষের মনের কাছে এর আকুলি-বিকুলি, আবেদন-নিবেদন এবং উচ্ছ্বাস মুক্তধারার মত লঘুছন্দময় এবং নৃত্যতৎপর। তাই ছবিটি সাধারণকে আনন্দ জোগাতে পেরেছে অবিসংবাদিতভাবে।

সাধারণের ভাললাগা-না লাগার দিকে নজর রেখে ছবিটি তৈরী করা হলেও সূক্ষ্ম কারু নৈপুণ্য ও মননশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না ছবিটিতে।

বহুগুণের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বোধ সত্যজিৎ রায়ের অন্যতম গুণ। তাঁর ছবিগুলি স্বভাবতঃই পরিচ্ছন্নতায় ঝলমল করে। বাহুল্যহীনতা, সংযত সংলাপ তাঁর প্রতিটি ছবির মান উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। অভিযানের পারিপার্শ্বিকতা ও চরিত্র অভিনয় বাস্তবানুগ এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ। সমাজের নীচু স্তরের জীবনযাত্রার চিত্র নির্দেশনার পথে সত্যজিতের পদক্ষেপ এই প্রথম। ছবিতে রোমান্টিসিজমের পান্ মেশানতে সংমিশ্রণের স্বাদ বেড়েছে কিন্তু স্বাদ বাড়াতে গিয়ে সহজ সাবলীলতা (Simplicity) যা সত্যজিতের ছবির বিশেষত্ব তা নষ্ট হয়েছে। গুলাবিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটিতে মধ্য যুগীয় বীরত্ব ব্যঞ্জক রোমান্টিসিজমের গন্ধ পাওয়া যায় দৃশ্যটি দর্শককে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে বাস্তব পরিবেশ থেকে যেন অতীতের একটা রোমান্টিক যুগে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সে যুগের পৃথ্বীরাজের সংযুক্তাকে নিয়ে পলায়নের দৃশ্যটি সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখের উপর ভেসে ওঠে। তফাৎ শুধু বাহনে। ঘোড়ার পরিবর্তে এ যুগের যন্ত্রযান। এখানেই ছবিটির তাল কেটেছে। অতি নাটকীয়তার অসঙ্গতি মূল গ্রন্থনকে আলগা করে দিয়েছে। ছবিটিকে মিলনান্ত রেখেও অধিকতর বাস্তবানুগত্যের খাতিরে যদি গল্পের শেষাংশ একটু ঢেলে সাজতেন সত্যজিৎ তা হলে ভালই হত। এবং এটা তাঁর মত প্রতিভাবানের পক্ষে মোটেই শক্ত ছিল না।

"অভিযানের" স্পীড্ লক্ষ্য করার বিষয়। ক্লাইমেক্সের দিকে যেতে যেতে ছবিটির স্পীড্ বেড়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে তাল রাখছে উৎকণ্ঠা (সাস্পেন্স)।

আরোপ, বিচার, ব্যাখ্যা, রূপক, গতি ও ব্যবহার (Treatment) ইত্যাদিতে সত্যজিতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ, তাঁর সবগুলো ছবিতেই লক্ষ্য করার বিষয়। সূক্ষ্ম রূপায়ণে সাবলীল মনোময়তা তাঁর সমকালীন নির্দেশকদের এখনও অনধিগম্য।

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

বেটন কাপ ফাইনাল ঃ

১৯৬৪ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। এই নিয়ে বেটন কাপ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে চারবারের ফাইনাল খেলায় যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হল—১৯৪১ সালে ভুপাল ওয়াণ্ডারার্স এবং ভগবন্ত ক্লাবকে, ১৯৪৮ সালে ইউ পি একাদশ এবং পোর্ট কমিশনার্সকে, ৯৫১ সালে ইউ পি একাদশ এবং ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়েকে এবং ১৯৬১ সালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলকে মোহনবাগান ক্লাব এই নিয়ে চারবার বেটন কাপ পেল—১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পেয়েছে ৩ বার—১৯৫৭, ১৯৬২ ১৯৬৪ সালে।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় মোহন-বাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের চূড়ান্ত পর্য্যায়ের খেলাতে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় দ্বিতীয়ার্দ্ধের দশম মিনিটে পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার এই সময়ে ইস্টবেঙ্গল দলের গোলসীমানায় ইস্ট-বেঙ্গল দলের অধিনায়ক কুশল কুমার মোহনবাগান দলের বালুকে মারাত্মক আঘাতের চেষ্টা করেন। তাঁর এই অ-খেলোয়াড়ী এবং বে-আইনী খেলার দরুণ আম্পায়ার অপরাধী-খেলোয়াড় কুশলকুমারকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন অগ্রসর হন, সেই সময়ে বালু এবং ইস্টবেঙ্গলের যোগী-ন্দরের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যেও খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। গুরুতর-ভাবে আহত এবং সংজ্ঞাহীন বালুকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। মোহনবাগান দলের অপর এক খেলোয়াড় আনিস-উর-রহমনকেও চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে ছুটতে হয়েছিল। দুই দলের মারামারির ফলে খেলার ১৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়। উভয় দলের খেলোয়াড়রা খেলা পুনরারম্ভের অপেক্ষায় মাঠের মধ্যেই ছিলেন। কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ খেলা আরম্ভ করার স্বপক্ষে ছিলেন না। ফলে আম্পায়ার দু'জন খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন।

এই পরিত্যক্ত খেলাটি পুনরায় খেলানো সম্ভব হয়নি। বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের বাতিল খেলাটি পর্য্যালোচনা ক'রে ইস্টবেঙ্গল দলকে লীগ চ্যাম্পিয়ান এই কারণে ঘোষণা করেছেন, যেহেতু, সমান ১৮টা খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল অপরাজিত অবস্থায় মোহনবাগানের থেকে দু পয়েণ্টে

অগ্রগামী ছিল এবং মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের পরিত্যক্ত খেলায় কোন পক্ষেই গোল হয়নি।

হকি টেষ্ট খেলা ঃ

ভারত সফরে কেনিয়া হকি দলের ১১টি টেস্ট খেলার কথা ছিল। কিন্তু এই দলটি তিনটি টেস্ট খেলা বাকি থাকতেই সফর বাতিল করে স্বদেশে ফিরে যায়।

টেস্ট খেলার ফলাফল ঃ প্রথম টেস্টে ২-২ গোলে খেলা ড্র; দ্বিতীয় টেস্টে কেনিয়া ৩-২ গোলে জয়ী: তৃতীয় টেস্টে ভারতবর্ষ ১-০ গোলে জয়ী; চতুর্থ টেস্টে ভারতবর্ষ ২-১ গোলে জয়ী; পঞ্চম টেস্টে কেনিয়া ৩-০ গোলে জয়ী; ৬ষ্ঠ টেস্টে ভারতবর্ষ ১-০ গোলে জয়ী; ৭ম টেস্টে ভারতবর্ষ ৩-১ গোলে জয়ী এবং অস্টম টেস্টে ভারতবর্ষ ৩-০ গোলে জয়ী। আটটি টেস্টে ভারতবর্ষের জয় ৫, কেনিয়ার জয় ২ এবং খেলা ড্র ১।

এফ এ কাপ ফাইনাল ঃ

১৯৬৪ সালের ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশন কাপের ফাইনালে প্রথম বিভাগের ওয়েস্টহাম ইউনাইটেড দল ৩-২ গোলে দ্বিতীয় বিভাগের প্রেসটন নর্থ এ্যাণ্ড দলকেপরাজিত করে। ওয়েস্টহাম দলের এই দ্বিতীয় এফ. এ কাপ ফাইনাল খেলা এবং প্রথম এফ এ কাপ জয়। ইতিপূর্ব্বে ১৯২৩ সালের ফাইনালে বল্টন ওয়াণ্ডারার্স দল ২-০ গোলে ওয়েস্টহাম ইউনাইটেড দলকে পরাজিত করেছিল। বর্ত্তমানে ল্যাঙ্কাশায়ার ফুটবল লীগ খেলার অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় বিভাগের প্রেসটন নর্থ এণ্ড দল এই বছরের খেলা নিয়ে ৭ বার এফ এ কাপের ফাইনালে খেলে দু'বার (১৮৮৯ ও ১৯৩৮) এফ এ কাপ জয় করেছে।

বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতা ঃ

লিমাতে (পেরু) অনুষ্ঠিত মহিলাদের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় রাশিয়া অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়া দ্বিতীয় এবং বুলগেরিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান লন টেনিসপ্রতিযোগিতায় ফিলিপাইন অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ভারতবর্ষকে নিয়ে প্রতিযোগিতায় সাতটি দেশ যোগদান করেছিল। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পায় জাপান এবং তৃতীয় স্থান ভারতবর্ষ।

সাহিত্য সংবাদ

স্বামী অখণ্ডানন্দ (সচিত্র জীবনী) —

স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত

আলোচ্য গ্রন্থখানি স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির পথে নব আলোক সম্পাত করেছে। এই জীবনীর মাধ্যমে গ্রন্থকর্ত্তা শুধু জীবনী ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্মৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে তার গৌরবোজ্জ্বল দিনের ধারাবাহিক ইতিহাসই দেননি, তদানীন্তন সমাজের অবস্থা, শাসক-সম্প্রদায়ের আচার ও আচরণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্য্য-কলাপের পরিচয় দিয়েছেন এ'তে গ্রন্থটির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হয়েছে। গ্রন্থকারের লিখন শৈলী উত্তম, প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা-নৈপুণ্যে গ্রন্থখানি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থখানি একাধিকবার পাঠ করেও পাঠের আগ্রহ হ্রাস হয় না, এইটিই হচ্ছে এর বৈশিষ্ট্য।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'মন্ত্র-দীক্ষিত অন্যতম ত্যাগী শিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ।' তাঁর মধ্যে ছিল মনস্বিতার বিরাট শিখর, জ্ঞানের বারিধি, অধ্যাত্মলোকের অনির্ব্বাপিত যজ্ঞানল আর ত্যাগের হোম শিখা। তিনি একাধারে কর্ম্মযোগী ও কর্ম্মবীর। তাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম গঙ্গাধর। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আবির্ভাব আর তিরোভাব ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। উদাসী সাধুর সঙ্গে প্রথম গৃহত্যাগ করেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের পিতা শ্রীমন্ত তর্করত্ন মহাশয় ছিলেন উচ্চস্তরের সাধক। কিছুকাল সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করে তন্ত্র সাধনা করেন কামাখ্যার মহাপীঠে। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তেইশ বছরের বালক গঙ্গাধর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীগুরুর প্রদত্ত গৈরিক ধারণ করে সর্ব্বপ্রথম বেরিয়ে পড়লেন কপর্দ্দক শূন্য অবস্থায়, বরাহনগর মঠ থেকে, হিমালয়ের পথে গুরু-ভ্রাতাদের অজ্ঞাতসারে। তিনি একাধিক ভাষা জননীর স্তন্য পান করেছেন, মুখরিত করেছেন তাঁর কণ্ঠে তিব্বতী ভাষাও, বিদগ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন নানা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে আর লিখে। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী স্কুলে মাত্র কিছুকাল তিনি বিদ্যাভ্যাস করে ত্যাগ করেছিলেন সংসার ধর্ম্ম।

আলোচ্য গ্রন্থের বাইশটি অধ্যায়ের বৈচিত্র্যময় ঘটনার পরিবেশের মধ্যে একটি সুর বেজে উঠেছে। সেটিতে রয়েছে অপরাজেয় মনুষ্যত্বের জয়গাথা, বৃহত্তর মানবতার আদর্শ ও বাণী—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' আর্য্য ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার তপোভূমিতে রামকৃষ্ণ বীজের নভোচুম্বী বনস্পতি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ আর তাঁকে কেন্দ্র করে যে সব, বিরাট মহীরুহ উদ্বোধিত করেছিলেন মহা-ভাগবত শক্তিকে, গঙ্গাধর মহারাজ তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর তিব্বতে হিমালয়ে অধ্যাত্মশক্তির স্ফুরণ, 'দশরথ কী ডাণ্ডাতে' শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন, তিব্বতের দরিদ্র-নারায়ণের দুঃখ-কষ্টে ব্যথানুভব, লামাদের উৎপীড়ন, কাশ্মীরে কারাবাস ও অনশন, বিবেকানন্দের অন্বেষণে মাসের পর মাস আজ-মীড়, পুষ্কর, বরোদা, জুনাগড়, প্রভাস প্রভৃতি স্থানে গমন। মাণ্ডবী থেকে আশী মাইল দূরবর্ত্তী নারায়ণ সরোবরে পদব্রজে বিবেকানন্দের সন্ধানে গমন সময়ে ডাকাতদের হস্তে নির্য্যাতন প্রভৃতির মধ্যে যে সব রোমাঞ্চকর ঘটনা বিবৃত হয়েছে তা সত্যই পাঠককে বিস্ময়াপিষ্ট করে তোলে।

স্বামী অখণ্ডানন্দ জামনগরে যে সেবাব্রতের সূচনা করেছিলেন, মুর্শিদাবাদে তার প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ ঘটে। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে দেখানোর' দৃষ্টান্ত তাঁর মধ্যে আমরা দেখেছি। দীন ও দরিদ্রের জন্যে তাঁর অন্তরের দরদ, তাঁর জন হিতৈষণা, তাঁর নিরক্ষর সমাজকে মানুষ করে তোলার জন্যে শিক্ষা প্রদানের

ব্যবস্থা, গণস্বার্থ সেবী সুযোগ্য নেতার মত তাঁর কর্ম্ম পদ্ধতি প্রভৃতি আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে পাঠ করে বুঝেছি এই কপর্দ্দকশূন্য সন্ন্যাসী এই দেশ ও জাতিকে নিজের রক্ত দিয়ে যা দান করে গেছেন তা একাধিক ধন কুবেরের ভাণ্ডার উজাড় করেও তার মূল্য নিরূপণ হয় না। এজন্যেই এই গ্রন্থখানি বিশেষ তাৎপর্যাপূর্ণ এবং প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই পাঠ করা উচিত। আমরা এর বহুল প্রচার কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট ও চিত্রগুলি সুন্দর। গ্রন্থখানি উপহার দেবার মত।

[প্রকাশক—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ।
উদ্বোধন কার্য্যালয়। ১, উদ্বোধন লেন কলি-৩
মূল্য ৪. টাকা।]

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তুপর পর্যন্ত : রামগোপাল নাথ

কবির দীর্ঘদিনের (১৯৪৭-৯৬১) কাব্য সাধনার সিদ্ধি এ কাব্য সংকলনে নিবদ্ধ হয়েছে। কবিতা-রসপিপাসুরা এ গ্রন্থ পাঠে তৃপ্ত হবেন। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

[প্রকাশক শ্রীগোপালচন্দ্র নাথ। মিত্র প্রকাশন,
কলিকাতা—৩। মূল্য ১. টাকা ০ নয়া পয়সা]

মানবী ও পৃথিবী : শ্রীদেবকুমার মুখোপাধ্যায়

কবির কবিতায় ছন্দের মাধুরী আছে, ভাবের বৈচিত্র্য আছে, নব নব রসের অবতারণা আছে। তাঁর কাব্য-সাধনার সিদ্ধিকে আমরা অভিনন্দিত করছি।

[প্রকাশক—শ্রীতাপস কুমার ঘোষাল।
১৩৩ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—৭।
মূল্য ১. টাকা।]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

মেঘ ডম্বরু : শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী

কাহিনী চিনার মুন্সীয়ানার জন্যে প্রশান্ত বাবু সুপরিচিত। এ উপন্যাসখানা তাঁর সে খ্যাতি আরও বাড়িয়ে দেবে বলেই মনে হয়। সাহিত্য-রসিক পাঠকপাঠিকা আনন্দ বর্ধনে সার্থক হবে কাহিনীকারের কাহিনী রচনা।

[প্রকাশক—বলাকা প্রকাশনী। ২৭সি, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯। মূল্য ৮. টাকা।]

দেবীর পকেট বই : বন্দনহীন গ্রন্থি—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

কুহেলির কান্না—সুধীন্দ্র চৌধুরী
নায়িকার মন—হরেন ঘোষ
রজনীগন্ধার আয়ু—
বিজন কুমার ঘোষ।

'দেবী' প্রকাশকের কয়টি গল্পের বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটির কাহিনী মনোরম, প্রচ্ছদ চমৎকার : কিন্তু মূল্য মাত্র এক টাকা। শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের কাহিনী সম্পর্কে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। তাঁর কাহিনীতে বর্তমান যুগের ভোগান্ধতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা কোনরূপ প্রশ্রয় পায় নি। মানুষের অন্তরে যে স্নেহমেদুর হৃদয় রয়েছে তারই প্রকাশ কাহিনীকে রসঘন করে তুলেছে।

[প্রকাশক—শ্রীশক্তি মৈত্র। ৩৯, ডাঃ সুন্দরী মোহন
এভিনিউ, কলিকাতা—১৪]

—শ্রীশৈলেন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীকানন ঘোষাল প্রণীত উপন্যাস "অধস্তন পৃথিবী—৫., "অন্ধকারের দেশে" (২য় সং)—৫.

(৩২শ সং)—১.২৫, "রামের সুমতি" (৪২শ সং)—১.

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" (৩৮শ সং)—২.৫০, "চন্দ্রগুপ্ত" (৩৫শ সং)—২.৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিন্দুর ছেলে"

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,)
কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ৫।৬।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত